উচ্চ-মাধ্যমিক

প্রবন্ধ বিচিন্তা

সাধারণ শাখা

অধ্যাপক পি. আচার্য

প্রবন্ধ বিচিন্তা

□

'এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে
ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'……রবীন্দ্রনাথ

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের অনুমোদিত ও সংশোধিত পাঠ-সূচী অনুসারে **একাদশ** ও **দ্বাদশ** শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে বাংলা বিষয়ের উজ্জ্বলতম দিগন্ত।

উচ্চ-মাধ্যমিক

প্রবন্ধ বিচিন্তা

সাধারণ শাখা

পি. আচার্য

প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ [সিটি কলেজ, দক্ষিণ কলকাতা দিবা শাখা] ও ভূতপূর্ব অধ্যাপক, উমেশচন্দ্র কলেজ [সিটি কলেজ, সূর্য সেন স্ট্রীট, প্রভাতী শাখা] এবং 'রচনা বিচিন্তা' ও 'বাণিজ্য বিচিন্তা' ইত্যাদি বহু বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা : ৭০০০০৯
৩৪-৮৬৪৪

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৭
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : জুন, ১৯৭৯

[আংশিক ভারত সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

প্রকাশ করেছেন ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা : ৯ থেকে শ্রীঅনিমেষ মণ্ডল, প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীঅরুণ গুপ্ত, ছেপেছেন পাইওনিয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭/এফ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা : ৬ থেকে শ্রীসুকুমার ঘোষ, অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৭, বলাই সিংহ লেন কলকাতা : ৬ থেকে শ্রীঅশোককুমার পান এবং শান্তিনাথ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা : ৬ থেকে শ্রীজগন্নাথ পান।

মূল্য : চব্বিশ টাকা মাত্র

প্রবন্ধ বিচিন্তা

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা
বাণীপুর

'প্রবন্ধ বিচিন্তা'র প্রেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

- পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের অনুমোদিত পাঠ-সূচী অনুযায়ী **একাদশ ও দ্বাদশ** শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে লিখিত।
- **সুনির্বাচিত এবং সময়োপযোগী ৭৯টি পূর্ণায়ত সুলিখিত প্রবন্ধ** এবং **৪৮টি প্রবন্ধ-সংকেত** সন্নিবেশিত, যাদের অনুসরণে আরো প্রায় ৪০০টি নতুন প্রবন্ধ স্বাধীনভাবে রচনা করে নেওয়া সম্ভব।
- প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধে-আলোচিত সমস্ত প্রসঙ্গ প্রবন্ধ-সংকেতের আকারে সন্নিবেশিত, যা নিঃসন্দেহে **পরীক্ষায় দ্রুত-প্রস্তুতির সহায়ক।**
- প্রতিটি প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-সংকেতের পাদটীকায় সেই প্রবন্ধের অনুসরণে আরো কত নতুন নতুন প্রবন্ধ রচিত হতে পারে, তার উল্লেখ আছে।
- স্বল্প প্রয়াসে প্রবন্ধ-সংকেতগুলি থেকে পূর্ণায়ত প্রবন্ধগুলি রচনা করে নেওয়া সম্ভব।
- প্রবন্ধগুলির মধ্যে **● আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ● পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা ● পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকট ● বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের দ্বি-শতবার্ষিকী ● বইমেলা ● ভারতে দূরদর্শন ● গৃহকার্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার ● ভারতে গণতন্ত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ● কলকাতার পাতাল-রেল ● মানুষের চন্দ্রলোক-বিজয় ● ঋতুরঙ্গময়ী রূপসী বাংলা ● পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি ● শহরবাসের সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা** ইত্যাদি ছাড়া অতি-সাম্প্রতিক বিষয়াবলী নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ভারতের বিভিন্ন দিক্‌দিগন্ত নিয়ে **১৪টি**, বাংলার বিভিন্ন দিক্-দিগন্ত নিয়ে **৩৮টি** এবং সাম্প্রতিক বিষয়াবলী নিয়ে **২৭টি** প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- মহাপুরুষগণের জীবনী নিয়ে রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৪।
- উদ্ধৃতি-বাক্যভিত্তিক প্রবন্ধের সংখ্যা ৯।
- তাছাড়া বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ, মানব-চরিত্রের মহৎ গুণাবলী ও আদর্শমূলক প্রবন্ধের সংখ্যাও প্রচুর।
- **প্রবন্ধগুলি পরীক্ষকগণের প্রীতিকর, সহজ অথচ শিল্পময় চলিত ভাষায় রচিত।**
- বাণিজ্যিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত **পত্রের আদর্শ-সংখ্যা** মোট **৫০**, গল্প-রচনার আদর্শ-সংখ্যা ২০ ও গল্পের সংকেত-সংখ্যা **৩৫**, বিভিন্ন উপলক্ষের জন্যে প্রস্তুত-ভাষণের সংখ্যা ২০ ও সংকেতের সংখ্যা প্রায় ৫০ এবং কাল্পনিক সংলাপের সংখ্যা ১০ ও সংকেতের সংখ্যা ২০। এগুলি আধুনিক আঙ্গিকে চলিত ভাষায় রচিত।

△ **সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম, বস্তু-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণে** পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে অনুচ্ছেদ বা রচনাংশ সংগৃহীত হয়েছে এবং চলিত ভাষায় **শ্রেষ্ঠ উত্তর রচনার** আদর্শ প্রদত্ত হয়েছে।

△ **সাহিত্যের ইতিহাস** পর্যায়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আদর্শ উত্তর-রচনার সমস্ত উপকরণ সহজ ও শিল্পময় চলিত ভাষায় সুবিন্যস্ত হয়েছে।

△ **উচ্চতর ব্যাকরণ** অংশে সূত্র ও বিশ্লেষণ চলিত ভাষায় রচিত এবং **দৃষ্টান্তগুলি বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ—উচ্চ-মাধ্যমিক বাংলা সঞ্চয়নের বিভিন্ন রচনা থেকে সংগৃহীত।**

△ **পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক ব্যাকরণের** বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য আলোচনা, দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ পরিবেশিত হয়েছে। **বিশেষ ব্যাকরণগত টীকায়** পরীক্ষায় প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

△ দ্রুতপঠন পর্যায়ে **দেবী চৌধুরাণী, চারিত্রপূজা, বৈকুণ্ঠের উইল, পথে-প্রবাসে, বর্তমান ভারত** এবং **আরণ্যকের** সুরচিত বস্তু-সংক্ষেপ ও তাদের **আদর্শ প্রশ্নোত্তর** প্রদত্ত হয়েছে।

△ প্রতি পর্যায়ের শেষে আদর্শ উত্তরের সংকেতসহ সম্ভাব্য প্রশ্ন-সম্ভার পরিবেশিত হয়েছে।

প্রকাশক

Revised Syllabus for Higher Secondary Examination, 1980 & thereafter.

[General Stream Course]

[Classes XI & XII]

BENGALI : Full marks 200.

Paper I : Marks 100.

1.	Prose	... 40 Marks
2.	Poetry	... 40 „
3.	Drama	... 20 „

Paper II : Marks 100.

1.	Essay	... 15 Marks
2.	Précis, Substance, Summary and Amplification	... 15 „
3.	Story-writing, Letter-writing [Commercial, Social and Personal], Prepared Speech for various occasions, imaginary dialogue, etc.	... 15 „
4.	History of Literature	... 20 „
5.	Grammar [Grammar should be Text-based. Knowledge of Grammar is expected to be of a standard higher than that acquired at the secondary stage.]	... 15 „
6.	Rapid Reader	... 20 „

॥ উচ্চ-মাধ্যমিক বাংলা সঞ্চয়ন ॥ **প্রথম পত্র**

গদ্যাংশ

১. বীরবর কাহিনী : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২. দেব মন্দির : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩. ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় : শিবনাথ শাস্ত্রী
৪. ভিখারী সাহেব : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৫. বাহিরে যাত্রা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলা ভাষা : স্বামী বিবেকানন্দ
৭. একাদশী বৈরাগী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৮. বই পড়া : প্রমথ চৌধুরী

পদ্যাংশ

১. প্রার্থনা : বিদ্যাপতি
২. শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
৩. অভিসার : গোবিন্দদাস কবিরাজ
৪. মেঘনাদ বধ : মধুসূদন দত্ত
৫. শ্রাবণে : অক্ষয়কুমার বড়াল
৬. সবুজের অভিযান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭. কেমনে আনিবে বন্ধু : প্রিয়ংবদা দেবী
৮. যক্ষের নিবেদন : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৯. বৃন্দাবন অন্ধকার : কালিদাস রায়
১০. অভিশাপ : কাজী নজরুল ইসলাম
১১. যদি ফিরে আসি : প্রেমেন্দ্র মিত্র
১২. ভাদ্রের দিনে ভাবনা : বুদ্ধদেব বসু

নাট্যাংশ

১. গান্ধারীর আবেদন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. ঔরংজীব ও জাহানারা : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সাহিত্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় পত্র

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নিম্নলিখিত লেখক ও বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে :

বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলী, বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ, শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তাগণ এবং তাঁদের পদাবলী, ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গল-কাব্যের বিভিন্ন শাখার প্রধান কবি ও তাঁদের কাব্য, চৈতন্য-চরিত সাহিত্য।

নিচের বইগুলি দ্রুত পঠনের জন্যে অনুমোদিত [যে কোন একটি পড়তে হবে]:

১. দেবীচৌধুরাণী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২. চারিত্রপূজা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৩. বৈকুণ্ঠের উইল : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৪. পথে-প্রবাসে : অন্নদাশঙ্কর রায়। ৫. বর্তমান ভারত : স্বামী বিবেকানন্দ। ৬. আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'তৃতীয় সংস্করণে'র ভূমিকা

কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে, যাঁদের অকুণ্ঠ প্রীতি ও শুভেচ্ছায় 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'র তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ সম্ভব হলো। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা, ছাপাখানার ধর্মঘট এবং বিদ্যুৎ-সংকট ইত্যাদি অনিবার্য কারণে 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'র এই সংস্করণের প্রকাশ অযথা বিলম্বিত হলো। সেজন্যে ক্ষতিগ্রস্তদের জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি।

পাঠ-সূচী সংশোধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংগতি রেখে এই সংস্করণে গ্রন্থখানির প্রকৃত পরিমার্জনা ও সংযোজন সাধিত হয়েছে। বিশেষতঃ, প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, সাহিত্যের ইতিহাস, কাল্পনিক সংলাপ, গল্প-রচনা, প্রস্তুত-ভাষণ ও দ্রুতপঠন অংশে। কৌতূহলী ও গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে তা অবশ্যই ধরা পড়বে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরো উপকৃত হয় এবং আরো সাফল্য লাভ করে, তাই ছিল লক্ষ্য।

আশা করি, পূর্ববর্তী সংস্করণগুলির মতো 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'র বর্তমান সংস্করণও গুণগ্রাহী সতীর্থ শিক্ষক-অধ্যাপক এবং প্রীতিভাজন ছাত্রছাত্রীদের প্রীতিলাভে সমর্থ হবে।

নমস্কারান্তে ॥
হেরম্বচন্দ্র কলেজ
কলকাতা : ৭০০০২৯
২১শে জুন, ১৯৭৯

বিনীত
গ্রন্থকার

'প্রথম সংস্করণে'র ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-সংসদ যেমন নতুন, উচ্চ-মাধ্যমিক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্যে অনুমোদিত পাঠ-সূচী যেমন নব-রচিত, 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'-ও তেমনি তার ধারানুসরণে প্রাক্তন গ্রন্থ-সমাজের গতানুগতিকতা পরিহার করে রচিত হলো সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। যুগ এবং যুগ-মানস যেখানে পরিবর্তনমুখী, সেখানে গতানুগতিকতার প্রতি আত্যন্তিক আসক্তিবশে ছাত্র-সমাজের ওপর অভ্যস্ত রক্ষণশীলতা চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। 'প্রবন্ধ বিচিন্তা' তাই গতানুগতিকতা পরিহার করে সম্পূর্ণ নতুন পথে চলার চেষ্টা করেছে; এবং তার সেই নতুনত্বের পরিচয় গুণগ্রাহী দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

'প্রবন্ধ বিচিন্তা'য় অনুসৃত নতুন রীতিটির সফলতা বিদগ্ধজনেরা ইতিপূর্বে আমার রচিত 'রচনা বিচিন্তা', 'বাণিজ্য বিচিন্তা' এবং 'সাহিত্য বিচিন্তা'য় অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন। শুভানুধ্যায়ীরা তারই পরিণত রূপ 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'য় লক্ষ্য করবেন, আমার বিশ্বাস।

এই আঙ্গিক-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ বিদ্যায় অতি-নির্ভরতা থেকে সরিয়ে এনে স্বনির্ভরতার আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের অন্তর্নিহিত স্বকীয় রচনা-শক্তিকে মাতৃভাষা-প্রীতির উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্বোধিত করা। 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'য় তাই যতগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবন্ধ-রচনা শক্তি অর্জন করবে এবং নতুন নতুন প্রবন্ধ-রচনায় অনুপ্রাণিত হবে।

শুধু প্রবন্ধ-রচনায় কেন, পত্র-রচনায়, গল্প-রচনায়, বিভিন্ন উপলক্ষের জন্যে ভাষণ-রচনায়, কাল্পনিক সংলাপ-রচনায় এবং সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম, বস্তু-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ রচনায় ছাত্রছাত্রীদের নতুন শক্তিতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে এই পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রথম পরিচয় ঘটছে। যদিও কেবলমাত্র পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর লেখকগণ এবং তাঁদের রচনাবলী পাঠ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত, তবু স্মরণীয় যে, এই পর্বের ইতিহাস বহু-বিতর্কিত বিষয়ের সমাহারে কণ্টকিত। কাজেই, এই সব পর্বে কেবল তথ্য-নিবেদনই যথেষ্ট নয়, সুচিন্তিত এবং যুক্তিসঙ্গত মতামতের প্রতিষ্ঠাও একান্তভাবে আবশ্যিক। সেই পথেই পরীক্ষায় প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতাও যথেষ্ট। 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'য় এই অংশটি তদনুসারেই রচিত হলো। আদর্শ উত্তর-রচনার দিকে ছাত্রছাত্রীদের পরিচালিত করাই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ব্যাকরণ-অংশে নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের দিকেই নজর রেখেছি।

দ্রুত-পঠন অংশে আদর্শ উত্তর-রচনার প্রয়োজনে সহজ অথচ শিল্পসম্মত চলিত ভাষার ব্যবহার করেছি। এমন-কি, সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম ও বস্তু-সংক্ষেপ রচনায় দ্রুত-পঠনের জন্যে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি থেকে প্রচুর অংশ সংকলিত হয়েছে, যাতে পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা সেদিক থেকেও শ্রেষ্ঠ উত্তর-রচনার শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সর্বোপরি, যে পরিকল্পনাটি গ্রন্থটির আদ্যন্ত প্রচ্ছন্ন, তা হলো ছাত্রছাত্রীদের একটি নিজস্ব স্টাইল বা ভাষা-শৈলী গড়ে তোলার প্রয়াস।

মোট কথা, গ্রন্থটিকে ছাত্রছাত্রীদের ভাষার ভিত গড়ে দেবার জন্যে এবং পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ উত্তর-রচনার ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী করে তোলার জন্যে সব দিক দিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। যত্নের তো কোন ত্রুটি ছিল না; তবু যদি ত্রুটি থেকে থাকে, পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন অবশ্যই হবে। গ্রন্থটির উপযোগিতা-বৃদ্ধি ও মনোন্নয়নের জন্যে বিদগ্ধজনের যে-কোন পরামর্শ সসম্মানে গৃহীত হবে। গুণগ্রাহী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের সহৃদয়তা লাভ করলে এবং যাদের জন্যে গ্রন্থখানি রচিত, সেই প্রীতিভাজন ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলে আমার সকল প্রয়াসকে সার্থক মনে করবো।

নমস্কারান্তে ॥

হেরম্বচন্দ্র কলেজ
কলকাতা : ৭০০০২৯
২১শে অক্টোবর, ১৯৭৬

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রবন্ধ-সংকেত ২৪৩-২৫৬

সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম, বস্তু-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ ১-৭৮

দ্রুতপঠন ১-১৯২

প্রবন্ধ বিচিন্তা

প্রবন্ধ

'—ওরে, তুই ওঠ্‌ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্‌ অন্ধকারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া।'

—রবীন্দ্রনাথ

উচ্চ-মাধ্যমিক

প্রবন্ধ বিচিন্তা

প্রবন্ধ বিচিন্তা

'রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিত ভাবে বুঝায় ; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।' —রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

প্রবন্ধও রচনার অন্তর্গত এবং সেইজন্যে সাহিত্য—প্রবন্ধ-সাহিত্য। শিল্পে ও সাহিত্যে বাহিরের সামগ্রী অন্তরচারী হয়ে শিল্পী বা সাহিত্যিকের 'আপন মনের মাধুরী'র স্পর্শে রসোত্তীর্ণ শিল্প-সাহিত্যের স্থায়ী রূপ লাভ করে। তেমনি যিনি প্রাবন্ধিক, তিনিও বাহিরের জগৎ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চয়ন করে, পরিকল্পিত উপায়ে সাজিয়ে, তাকে মনের রসে জারিয়ে আপন বাচনভঙ্গির অনুসরণে রূপময় করে তোলেন। বাহিরের বিষয় ও চিন্তা-ভাবনা সংগ্রহ করে, অন্তরের ভাবৈশ্বর্যের দুয়ার খুলে, তাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করতে পারলে প্রবন্ধ যথার্থই শিল্প হয়ে ওঠে। সকল সাহিত্যের মতো প্রবন্ধও এক রকমের সাহিত্য এবং সকল শিল্পের মতো প্রবন্ধও এক প্রকারের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম।

প্রবন্ধের শিল্প-সুষমা

'প্রবন্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। কিন্তু কিসের বন্ধন ?—ভাবের বন্ধন, চিন্তার বন্ধন, উপযুক্ত ভাষার বন্ধন। 'প্রবন্ধ' বলতে কেবল ভাবের অদম্য উচ্ছ্বাস নয়, এলোমেলো চিন্তার বিহ্বলতা নয় বা শব্দাড়ম্বরের ঢক্কানিনাদও নয়। প্রবন্ধের জন্যে চাই ভাবের উচ্ছলতার নিয়ন্ত্রণ, চাই চিন্তার যুক্তি-শৃঙ্খলিত পারম্পর্য এবং চাই ভাষার একটা জীবন্ত রূপ, যাকে বলে সুষ্ঠু পরিবেশনা। আসল কথা হলো, ভাবকে সংযত অথচ তীব্র করে তুলতে হবে, যুক্তি-শৃঙ্খলার দ্বারা তাকে শাসন করতে হবে এবং একটি প্রাণবন্ত ভাষার সাহায্যে তাকে সুন্দর, শিল্পময় ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলতে হবে। প্রবন্ধে কতো পরিমাণ চিন্তার সঙ্গে ভাষার কতো পরিমাণ শিল্পরূপ পরিবেশিত হবে এবং তা কিভাবে হৃদয়স্পর্শী করে তুলতে হবে, তা নির্ভর করে প্রাবন্ধিকের সুমিতিবোধের ওপর।

প্রবন্ধে সুমিতিবোধ

প্রবন্ধকে কেউ কেউ বলেন 'রচনা' [Composition]। এই 'রচনা' নামের মধ্যেও তার বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত। 'রচনা' কথাটির মধ্যে যেমন চয়নের ব্যাপার আছে, তেমনি আছে পরিকল্পিত উপায়ে বিন্যাস এবং সৃষ্টির ইঙ্গিত। গল্প, উপন্যাস, নাটকের মতো প্রবন্ধও তাই একটি শিল্পকর্ম। ভাব, বিষয়, তথ্য, তত্ত্ব—বাহিরের এসব সামগ্রীতে সকল মানুষের সমান অধিকার। তবু একই বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা হয় ভিন্ন ভিন্ন রকমের। এর মধ্যেই নিহিত আছে শিল্পের রহস্য—সৃষ্টির রহস্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে ; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।'

'রচনা'

'প্রবন্ধ' কথাটির আবার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Essay'। এই 'Essay' শব্দটির মৌলিক অর্থ হলো 'প্রয়াস'। বাহিরের অভিজ্ঞতা অন্তরে সঞ্চিত হয়ে একটা ছায়ামূর্তি ধারণ করে বাহিরে প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভাষার মধ্যস্থতায় সেই ব্যাকুলতাকে রূপদানের জন্যে চাই প্রয়াস, চাই অনুশীলন। প্রয়াস ও অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে একটা style বা 'রচনা-ভঙ্গি'। 'Style is the man.' সেই স্টাইলে লেখকের ব্যক্তিত্ব থাকে প্রতিফলিত। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সেইজন্যে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনা-ভঙ্গিও স্বতন্ত্র এবং তার মধ্যেই লেখক বেঁচে থাকেন।

Essay—style

অবশ্য, প্রবন্ধের মূল ভিত্তি হলো মননশীলতা। মননশীলতায় প্রবন্ধের জন্ম, কিন্তু শেষ নয়। মননশীলতার শুষ্ক প্রান্তরে আবেগের বারিবর্ষণও প্রয়োজন। তাতেই প্রবন্ধের বীজ বপন করতে হবে। তবেই সোনার ফসলের লগ্ন সমাগত হয়। কিন্তু ভাবাবেগের অতিবর্ষণ আবার শস্যের পক্ষে হানিকর। ভাবের উন্মত্ত বন্যায় মূল বক্তব্য যেন ভেসে না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু সমাহারেই প্রবন্ধের চরম সফলতা। কিন্তু কতখানি মননশীলতার সঙ্গে কতখানি আবেগ সংমিশ্রিত হবে, তা নির্ভর করে প্রাবন্ধিকের মাত্রাবোধের ওপর। এখানেও প্রাবন্ধিকের চাই সেই সুষ্ঠু সুমিতিবোধ।

হৃদয় ও মনের সুষ্ঠু সমাহার

তথ্য হচ্ছে প্রবন্ধের কঙ্কাল। তা দিয়ে প্রবন্ধের একটি কাঠামো [Structure] গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তা প্রবন্ধ নয়। তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারা চাই। তথ্যগুলিকে পরিকল্পনামতো প্রথমে সাজাতে হবে। তারপর পরিবেশনের কাজ। পরিবেশন-নৈপুণ্য আনতে হলে প্রকাশভঙ্গি কোথাও হবে গুরুগম্ভীর, কোথাও হবে লঘু পরিহাস-চটুল ; কোথাও বিদ্রূপ-বক্রোক্তির তির্যক্ কটাক্ষ হানতে হবে, কোথাও-বা কবি এবং মনস্বী মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী-মঞ্জরীর দু' একটি চয়ন করে উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করতে হবে। তারপর আছে প্রারম্ভিক-বাক্য ও সমাপ্তি-বাক্য রচনার শিল্প-নৈপুণ্য। বাক্য দুটি নির্ভুল, নিটোল ও দৃঢ়পিনদ্ধ হওয়া চাই। বাক্য দুটির সাফল্য প্রবন্ধের সামগ্রিক সাফল্যের দুয়ার খুলে দেবে। তারপর প্রতি পদক্ষেপে নতুন নতুন সৌন্দর্যের উন্মোচন করতে হবে ; সব-শেষে এক আশ্চর্য জগতের আবিষ্কার। স্মরণীয় যে, প্রবন্ধের ভাষা আদ্যন্ত সাধু অথবা চলিত ভাষা হবে। দুয়ের মিশ্রণে 'গুরুচণ্ডালী'-দোষে সমগ্র প্রবন্ধটি দুষ্ট হতে পারে।

পরিবেশন-নৈপুণ্য

'প্রবন্ধ বিচিন্তা'য় প্রতিটি প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধ-সূত্র প্রদত্ত হয়েছে। তাতে বিষয়টির উপলব্ধি ও মনে রাখা সহজ এবং তা দ্রুত পরীক্ষা-প্রস্তুতিরও সহায়ক। প্রবন্ধ-শেষে পাদ-টীকায় অনুসারী প্রবন্ধ-সূচী প্রদত্ত হয়েছে। তার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীরা স্বনির্ভরভাবে প্রবন্ধ রচনার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারবে। তাছাড়া, বহু প্রবন্ধের বিস্তারিত প্রবন্ধ-সংকেতও দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনায়াসে সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করে নিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, 'প্রবন্ধ বিচিন্তা' ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ-রচনার শক্তি জাগিয়ে তাদের আত্মনির্ভর করে তুলবে॥

শেষকথা

১

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। প্রকৃতির মর্মবাণী। শিশুর পরিচর্যা। স্নেহের অভিষেক। শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। 'যে ফুল না ফুটিতে'। খুনী সমাজ-ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। উপসংহার।

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।' —কাজী নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

শিশুরাই আগামী দিনের পৃথিবীর উজ্জ্বল স্বপ্ন। শিশুদের মধ্যেই ঘুমিয়ে আছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর এক নতুন ইতিহাস। আজ যারা নবজাতক, যারা সদ্য চোখ মেলে পৃথিবীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করছে কিংবা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে পৃথিবীর বুকে যারা পদচারণা শুরু করেছে, ভুললে চলবে না, তারাই একদিন পৃথিবী শাসন করবে। নতুন নতুন ভাব, নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ তাদের জন্যে প্রতীক্ষা-কাতর। তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে আগামী দিনের কত রবীন্দ্রনাথ, কত গান্ধী, কত সুভাষচন্দ্র, কত কার্ল মার্কস, কত লেনিন, কত টলস্টয়। কত সুপ্ত প্রতিভা তাদের মধ্যে বিকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তাদের বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ দিতে হবে। তবেই তো 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।'

প্রকৃতির মর্মবাণী

এই ক্রমপরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আজ যা কুঁড়ি, কাল তা পূর্ণ বিকশিত, বর্ণগন্ধময়, আকর্ষণীয় কুসুম ; আজ যা প্রস্ফুটিত পুষ্প, কাল তা রসমধুর, পরিপূর্ণ ফল। প্রকৃতির এই পরিণামমুখী বিবর্তন-সূত্রে বর্তমান পৃথিবীর শিশুরাও একদিন 'কৈশোরের কিশলয়ে'র পথ ধরে 'যৌবনের শ্যামল গৌরবে' উপনীত হবে। পৃথিবীর প্রবীণেরা সেদিন নতুনদের স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে যাবে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জীর্ণ পুরাতনকে অবশ্যই সরে যেতে হবে। তখন চির-নতুন পৃথিবী সাদরে বরণ করে নেবে নবাগতদের। কবি তাই প্রকৃতির এই নির্মম মর্মবাণীকে রূপদান করে বলেন, 'Old order changeth yielding place to new.' নতুনকে স্থান ছেড়ে দিয়ে পুরাতনকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

শিশুর পরিচর্যা

অথচ যে শিশুদের জীবন বিচিত্র সম্ভাবনাপূর্ণ, যাদের ভবিষ্যৎ কর্ম-সাধনার মধ্যে নির্ভর করছে আগামী দিনের পৃথিবীর স্বপ্ন ও সফলতা, তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ অবজ্ঞামিশ্রিত, অবহেলা-পূর্ণ—তাচ্ছিল্যভরা। এ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। একটি তরুশিশুর পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং পরিণতির জন্যে প্রয়োজন কত পরিচর্যা, প্রয়োজন পর্যাপ্ত জল-আলো-বাতাসের সুব্যবস্থা। আর, একটি মানব-শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্যে কোন ব্যবস্থাদির প্রয়োজন নেই ? শিশুরাই তো জাতির বনিয়াদ। তাদের সাধনা ও সিদ্ধির ওপর নির্ভর করে জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কাজেই, তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে অবহেলা প্রদর্শনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ তো জাতীয় প্রয়োজন।

শিশু-অবস্থায় মানুষের শরীর ও মন থাকে কাদামাটির মতো কোমল, নমনীয়। সেই কাদামাটি দিয়ে পরিকল্পিত উপায়ে প্রতিমা নির্মাণ করা যায়। তাকে যদি উপেক্ষা আর অনাদর দিয়ে দূরে ফেলে রাখা হয়, তবে সে অচিরে অনড় অসাড় মাটির ঢেলায় পরিণত হবে—পৃথিবীর কোন কাজে লাগবে না।

শিশুরা এই পৃথিবীতে নবাগত অতিথি। পৃথিবীর রীতিনীতি, হালচাল তাদের জানা নেই। জীবনের ক্রম-বিবর্তনের প্রতিটি স্তর অতিক্রম করে তাদের বর্তমান সভ্যতার পুরোধায় এসে দাঁড়াতে হয়। তা সম্ভব হয় তার একটানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটি সংগ্রাম শেষ হয়, শুরু হয় পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রাম-জীবন-সংগ্রামের নবতর প্রস্তুতি। তাই শিশুরা স্বভাবতঃই হয় স্নেহের কাঙাল। মানুষের স্নেহ-মমতা লাভের জন্যে তাদের অবোধ হৃদয় এই সময় উন্মুখ হয়ে থাকে। অন্ধ স্নেহক্ষুধা নয়, পরিমিত স্নেহ-মমত্বের স্পর্শে শিশুর জীবন ফুলের মতো সুন্দর ও সাবলীলভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

স্নেহের অভিষেক

কিন্তু আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত শিশুদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যেমন অবজ্ঞামিশ্রিত, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল তেমনি হৃদয়হীন কঠোরতায় পূর্ণ। প্রহার ও নানাপ্রকার শারীরিক ক্লেশ ছিল তাদের বিদ্যাশিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বেত্রদণ্ডের যথেচ্ছ আস্ফালনের মুখে সূচিত হতো তাদের সরস্বতীর সাধনা। তাতে সরস্বতী তো দূরের কথা, সরস্বতীর হাঁসটিও ভয়ে দূরে পালিয়ে বাঁচতো। ফলে, জড়, অপদার্থ, স্বভাবভীরু মানব-সন্তানে ভরে উঠতো পৃথিবী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৃথিবীর কতিপয় জ্ঞানী গুণী মনীষীর দৃষ্টি শিশুদের সেই অমানুষিক শিক্ষা-প্রকরণের ওপর নিবদ্ধ হয়। তাঁরা বিশ্বের হতভাগ্য অসহায় শিশুদের সেই পৈশাচিক শাসন-ত্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলেন কৃতসংকল্প। পুষ্পের মতো নিষ্পাপ শিশুদের জীবনে রক্তচক্ষুর বিভীষিকা, বেত্রদণ্ডের আস্ফালন এবং স্নেহহীন, ছায়াহীন, কৃত্রিম মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তারের পরিবর্তে আহ্বান করলেন সহজ সুন্দর প্রকৃতিকে। তার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই দেশে দেশে শিশুদের জীবনে ছায়াশীতল স্নেহধারা বর্ষিত হতে লাগলো, বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তনে বিশ্বের শিশুজীবন লাভ করলো স্বাভাবিক বিকাশের সার্বিক সুযোগ। দিকে দিকে ডাকলো আনন্দের জোয়ার। রুশো, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ থেকে যার সূচনা, ইংলণ্ডের সিসেমি ক্লাবে তার পরিণতি। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই পথেই শান্তি-নিকেতনে প্রবর্তন করলেন যে আনন্দবাদী শিক্ষাধারা, তাতে অবগাহন করে রক্তচক্ষু ও বেত্রদণ্ডের শাসনক্লিষ্ট ভারতীয় শিশুরা যেন নবজীবন লাভ করলো। ভগিনী নিবেদিতা ও মহাত্মা গান্ধী মূলতঃ সেই ধারারই অনুগামী।

শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

স্মরণীয় যে, প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায় বিশ্বের শিশুসমাজের এক অতি সামান্য ভগ্নাংশই। বৃহদংশই পচে মরে অশিক্ষার অন্ধকারে। এইভাবে নিঃশব্দে বিনষ্ট হয়ে যায় কত উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিভা। কত বর্ণগন্ধময় অখ্যাত কুসুম অবহেলায় এবং

'যে ফুল না ফুটিতে'

মানুষের অনাদরে অকালে ঝরে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। কে তাদের খবর রাখে? অথচ উপযুক্ত সুযোগ পেলে তাদের ভেতর থেকে অনেক রবীন্দ্রনাথ, অনেক আইনস্টাইন, অনেক টলস্টয়ের আবির্ভাব সম্ভব হতো। তাদের প্রতিভার অবদানে সমৃদ্ধ হতো পৃথিবী। এ তো পৃথিবীর একটি সুনিশ্চিত অপচয়।

তাছাড়া, পৃথিবীর বহু শিশুর ভাগ্যেই তো অন্ন জোটে না, বস্ত্র জোটে না, ঔষধ-পথ্য জোটে না। তাদের বাস করতে হয় অস্বাস্থ্যকর, স্যাঁতসেঁতে, পূতিগন্ধময় বস্তি নামক নরককুণ্ডে। অপুষ্টি, ক্ষয়রোগ এবং নানা দুরারোগ্য ব্যাধি তাদের জন্মসঙ্গী। অবশেষে পৃথিবীর বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সঙ্গে লড়াই করে অকালে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয় পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শিশু। কোন্ অপরাধে তাদের এই অকাল বিনষ্টি? অপরাধ কার? কেন পৃথিবীর এই অস্ফুট কুসুমগুলি অকালেই ঝরে যায়? তাদের কোন অপরাধ নেই। অপরাধ অসম সমাজ-ব্যবস্থার। যে সমাজ-ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের ঘৃণ্য বৈষম্যের সৃষ্টি, সেই সমাজ-ব্যবস্থাই বস্তির স্রষ্টা। সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিষ-নিঃশ্বাস পৃথিবীতে শিশু-মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলেছে। এই খুনী সমাজ-ব্যবস্থার আশু সংশোধন প্রয়োজন।

খুনী সমাজ-ব্যবস্থা

পৃথিবীর দেশে দেশে সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তাই বিশ্বের শিশু-সমাজকে অকাল বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে রাষ্ট্রসংঘ একটি বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে ১৯৭৯ সালকে তাঁরা ঘোষণা করেছেন আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ রূপে। দেশে দেশে যেখানে শিশু-সমাজ অন্ন-বস্ত্র-বাসগৃহ-শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে পীড়িত, যেখানে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ কুণ্ঠিত, সেখানে রাষ্ট্রসংঘ তার কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করে দিতে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী শিশুদের প্রতি একটি সুস্থ ও সংবেদনশীল মানসিকতা সৃষ্টিও রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

বিশ্বের শিশুদের জন্য এই সংবেদনশীলতার জন্যে রাষ্ট্রসংঘকে ধন্যবাদ। আজ কোটি কোটি দরিদ্র জননীর কোলে কাঁদছে কোটি কোটি শিশু ভগবান। ক্ষুধার্ত তারা, তাদের পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাব, মাথার ওপরে হৃদয়হীন আকাশ ব্যতীত আর কোন আচ্ছাদন নেই; শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, রোগের ঔষধ নেই, পথ্য নেই। জীবনধারণের স্বল্পতম উপকরণ তাদের ভাগ্যে জোটে না; 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার স্বল্পতম উপকরণটুকু তাদের দুয়ারে বয়ে আনুক। এগুলির অভাবে যেন কোন শিশু অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ না করে—আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের কাছে এই আমাদের কামনা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'
- 'কাঁদে কোটি মা'র কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।'
- শিশু-পালন

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ বন্যার চারটি পর্যায় ও স্বল্পমেয়াদী কারণ ॥ বন্যার দীর্ঘমেয়াদী কারণ ॥ ক্ষয়-ক্ষতি ॥ ত্রাণ ও উদ্ধার-কার্য ॥ পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ॥ উপসংহার ॥

২
পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যা

'বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।'
—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

প্রকৃতির নিদারুণ রুদ্ররোষে উনিশশো আটাত্তর সালের শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গে বাঁধের পর বাঁধ ভেঙে যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে দিকে দিকে লক্ষ-কোটি ভয়ার্ত, অসহায় মানুষের যে প্রবল ক্রন্দন-কলরোল উঠেছিল, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বাস্তবিকই, এবারের বন্যায় যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল, তার পরিমাণ যেমন বিশাল, তার পরিণাম তেমনি সুদূরপ্রসারী। তাছাড়া, প্রকৃতির নির্মম রোষের কাছে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য যে কত দুর্বল, কত অকিঞ্চিৎকর, তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হলো। সেই সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণে যে অজস্র ত্রুটি এতদিন আত্মগোপন করেছিল, তা আদিগন্ত প্রলয়ের মধ্যে প্রবল দুঃখের মূল্যে এবার আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হলো।

বন্যার চারটি পর্যায় ও স্বল্পমেয়াদী কারণ

পশ্চিমবঙ্গের আটাত্তর সালের বন্যাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ এক. প্রথম পর্যায়ে জুলাই মাসে তিস্তার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় উত্তরবঙ্গ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলা। দুই. দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বন্যা-বিক্ষুব্ধ জলধারা পশ্চিমবঙ্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা প্লাবিত হয়। এই সময় ভাগীরথীর জলসীমা যখন বিপজ্জনক উচ্চতায় উঠেছিল, তখন জোয়ারের জলধারায় প্লাবিত হয় চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও হাওড়া। তিন. তৃতীয় পর্যায়ের বন্যা আসে সেপ্টেম্বর মাসের সূচনায়। তাতে দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী ও কংসাবতী ফুঁসে ওঠে এবং বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা তার প্রলয়-লোলুপ রসনার শিকার হয়। এই সময়ে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা আবার বন্যা-কবলিত হয়। চার. চতুর্থ পর্যায়ের বন্যা আসে সেপ্টেম্বরের শেষে। ২১শে সেপ্টেম্বরের সকালে উড়িষ্যার বালেশ্বরের অনতিদূরে এক গভীর নিম্নচাপ করমণ্ডল উপকূল অতিক্রম করে ২৫শে সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় মধ্যপ্রদেশের পেণ্ড্রা ঘুরে বিহারে ডাল্টনগঞ্জের কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তারপর সেই নিম্নচাপ ২৭শে সেপ্টেম্বরের সকালে আসানসোলের কাছে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ধীরে ধীরে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিমধ্যে আন্দামান থেকে আগত অপর একটি ঘূর্ণিঝড় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। এই দুই ঘূর্ণিঝড়ের মিলিত প্রভাবে কলকাতা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে নামে শতাব্দীর সুতীব্রতম বৃষ্টি। তার ফলে ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত আটটায় পূর্ববর্তী চব্বিশ

ঘণ্টার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯০ মিলিমিটার। এবং মধ্যরাত্রেই তার পরিমাণ পৌঁছায় ৫০০ মিলিমিটারে। একমাত্র চেরাপুঞ্জী ছাড়া এত স্বল্প সময়-সীমার মধ্যে এত প্রচুর বৃষ্টিপাতের নজীর আমাদের দেশে আর স্মরণকালের মধ্যে নেই। তার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব নদীই একযোগে স্ফীত হয়ে ফুঁসে ওঠে এবং তাদের সম্মিলিত জলোচ্ছ্বাসে সমগ্র অঞ্চলই অভূতপূর্ব বন্যার করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। ভৌগোলিক কারণে হুগলী-ভাগীরথীই সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের জলনিকাশীর প্রধান উপায়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস জলবিষুবের সময়। এই সময় প্রবল সামুদ্রিক বন্যার ফলে হুগলী-ভাগীরথীতে যে প্রবল জলস্ফীতি ঘটে, তাতে বন্যার জল দ্রুত নিকাশের পথে প্রচণ্ড বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এগুলি পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক সর্বনাশা বন্যার স্বল্পমেয়াদী কারণ। এগুলির পাশাপাশি আছে বহু দীর্ঘমেয়াদী কারণ—বহু মারাত্মক ভুল, বহু স্তূপীকৃত পাপ। এক. স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের মতে, মধ্যযুগে গঙ্গা-বদ্বীপে যে সেচ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তা সম্ভবতঃ মিশরের তুলনায় ছিল অনেক ব্যাপক, অনেক উন্নত। কিন্তু ইংরেজ-আমলে রেলপথ, বাঁধ ও সেতুর কৃত্রিম বন্ধনে এই অঞ্চলের নদীগুলিকে নির্বিচারে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করা হয়। এইভাবে সেই 'শয়তানের বাঁধগুলি'র সাহায্যে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক ও সনাতন সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করা হয়। এবারের বন্যা-সৃষ্টিতে এই 'শয়তানের বাঁধগুলি'র ভূমিকা ছিল অসামান্য। আর, অবরুদ্ধ প্রাকৃতিক জলধারা উত্তাল হয়ে এই বাঁধগুলির ওপরই হেনেছে তার ক্রুদ্ধ আঘাত। দুই. স্বাধীন ভারতে দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতীতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র জলনিকাশীর উপায় হুগলী-ভাগীরথীর নদীগর্ভ পলিপূর্ণ হয়ে তার স্বাভাবিক জলধারণ ও জলবহন-ক্ষমতা হারিয়ে বন্যার সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তুলেছে। তিন. বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন—এই ত্রিবিধ প্রকল্পের রূপায়ণের জন্যে নদীগুলিতে বাঁধ দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদীই আজ একেবারেই মৃতপ্রায়। প্রকল্পগুলির রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির তলকর্ষণ ও পলিমোচন ছিল একান্তভাবে আবশ্যিক। কিন্তু তা উপেক্ষা করে এই অঞ্চলের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে। চার. দামোদরে যতগুলি বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন ছিল, ততগুলি বাঁধ দেওয়া হয়নি; যে আকারের জলাধার নির্মাণ করা উচিত ছিল, তাও নির্মিত হয় নি। ফলে, তার বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বভাবতঃই খর্ব হয়েছে। পাঁচ. জলাধারগুলির পলিমোচনের কোন ব্যবস্থা নেই, এবং উচ্চ-অববাহিকায় বনভূমি সৃষ্টি করে ভূমিক্ষয়ও রোধ করা হয় নি। তাতে জলাধারগুলি পলিপূর্ণ হয়ে ক্রমশঃ তাদের জলধারণ-ক্ষমতা হারাচ্ছে। ছয়. ফরাক্কা-প্রকল্পের রূপায়ণের উদ্দেশ্যই ছিল হুগলী-ভাগীরথীর জলবৃদ্ধি। তাতে হুগলী-ভাগীরথীর নদীগর্ভ পলিমুক্ত হয়ে জলনিকাশী ব্যবস্থাকে সহজ করবে, আশা ছিল। কিন্তু হুগলী-ভাগীরথী প্রত্যাশিত জল না পাওয়ায় ফরাক্কা-প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। সাত. একই প্রকল্পে বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন একটি পরস্পর-

বন্যার দীর্ঘমেয়াদী কারণ

বিরোধী চিন্তাধারা। কারণ, জলাধারগুলি যত বেশী জলপূর্ণ থাকবে, সেচ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে ততই সুবিধা ; আবার, জলাধারগুলি যত বেশী জলশূন্য থাকবে, বন্যানিয়ন্ত্রণের পক্ষে ততই সুবিধা। কাজেই, বন্যার পূর্বাভাস ঘোষণার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় জলাধারগুলির জল-নিয়ন্ত্রণের ভার সর্বতোভাবে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিতে হয়। তার ওপর, গত কয়েক দশক ধরে নিম্নাঞ্চলে জনবসতি যথেচ্ছভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক।

দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী কারণসমূহের সম্মিলিত চক্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের বুকে নেমে আসে শতাব্দীর যে সর্বনাশা বন্যা, তার ধ্বংসলীলা যেমন বিপুল, তেমনি ভয়াবহ। চতুর্থ পর্যায়ের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন আজ ছিন্নভিন্ন, তার অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত। তার ষোলটি জেলার মধ্যে বারোটি জেলাই দীর্ঘদিন ছিল জলের তলায়। তার ফলে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এক কোটি বাহান্ন লক্ষ মানুষ। প্লাবিত হয়েছে ত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারেরও বেশী ফসলের এলাকা, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েছেন ৮১৩ জন মানুষ, গবাদি পশু মারা গেছে দু লক্ষ এবং

ক্ষয়-ক্ষতি

ঘরবাড়ি ভেঙেছে এগারো লক্ষেরও বেশী। তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের ক্ষতি হয়েছে ভয়াবহ। রাস্তাঘাট সেতু বিধ্বস্ত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। রেলপথ, টেলি-যোগাযোগ, টেলিফোন এবং জলসরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতির পরিমাণও ব্যাপক। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোন কিছুই রেহাই পায় নি বন্যার ধ্বংসলোলুপ হাত থেকে। এই প্রলয়ঙ্কর বন্যায় প্রায় পনেরো লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং কুড়ি লক্ষ ভূমিহীন কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান্ থেকে জানা যায়, এই মহাপ্রলয়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। এমন-কি, বন্যার প্রলয়লোলুপ রসনা থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীও রক্ষা পায় নি।

ফলে, ত্রাণ-ব্যবস্থায় পড়ে তার অনিবার্য প্রভাব। রেল ও সড়ক এবং টেলিফোন ও টেলি-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সরকারী ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য সূচিত হতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। কিন্তু স্থানীয় যুবসমাজ ও স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলি স্বতঃ-

ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য

প্রণোদিত হয়ে যেভাবে আর্ত ও বিপন্নের উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তারপরই সেনা-বাহিনীর সাহায্যে বিপুল উদ্যমে সরকারী ত্রাণ-ব্যবস্থা সূচিত হয়। ঘোষণা করা হয়, অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় একজনকেও মরতে দেওয়া হবে না। সরকারী ও নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনাহারে মৃত্যু এবং সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

বন্যার জল অপসারিত হতে সময় লাগে যথেষ্ট। কিন্তু তার পরেই জরুরী হয়ে দেখা দেয় নানা অর্থনৈতিক সমস্যা। সর্বাগ্রে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের মেরামত ও পুনর্নির্মাণ এবং লক্ষ লক্ষ গৃহহারা মানুষের পুনর্বাসন-সমস্যার

মোকাবিলা করতে হয়। কেবল, ত্রাণকার্য সমাধা ও বাসগৃহ নির্মাণেই সকল সরকারী দায়িত্ব অবসিত হয় না। সেই সঙ্গে চাই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। নতুবা কিছুতেই আসন্ন দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করা যেতো না। এককভাবে কেবল পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য। সেজন্য চাই কেন্দ্রীয় সাহায্য। পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে কেন্দ্রের কাছে তাই পশ্চিমবঙ্গের আবেদন ৩৫০ কোটি টাকার বাজেট অনুদান। অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সুযোগে যাতে পণ্য-মূল্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, তার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ফলে, মূল্যসীমা থাকে অবিচল এবং বণ্টন-ব্যবস্থা থাকে স্বাভাবিক।

পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় যে চিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, তা হলো দুর্বার প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মানুষের অসহায়তা ও পরাজয়। কিন্তু তার পাশাপাশি দেখা দিয়েছে অন্য চিত্র। তা মানুষের অপরাজেয় মনোবল এবং বাঁচার জন্যে দুর্জয় সংগ্রামী শক্তি। তবে এ কথাও সত্য, প্রকৃতিকে যদি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দেশগঠনের কাজে ব্যবহার করা হতো, তা হলে এই অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ ঝরে পড়তো পশ্চিমবঙ্গের মাথায়। দামোদর ইত্যাদি জলবাহী নদীগুলির উচ্চ-অববাহিকায় সুচিন্তিতভাবে বাঁধ দিয়ে ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, জলাধারগুলিকে পলিমুক্ত করে ও তাদের আয়তন সম্প্রসারিত করে এবং নদীগুলির নিম্নভাগের চর ও পলিমোচন করে বন্যার সম্ভাবনাকে এখনও প্রতিরোধ করা যায়। অবিলম্বে সেই চেষ্টাই সূচিত হওয়া উচিত। নচেৎ, বারে বারে বাঁধ ভেঙে বন্যার জল এই বিশাল জনপদের মধ্যে মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করবে এবং লক্ষ-কোটি বিপন্ন মানুষের অসহায় কান্নায় আকাশ বাতাস ভরে উঠবে—কেউ রোধ করতে পারবে না॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- আটাত্তরের বন্যা
- বন্যা ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ
- বন্যাবিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠন।

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ অন্ধকারময় যুগ ॥ ভারতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত ॥ গণতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ ॥ স্বৈরতন্ত্রের নখরাঘাত ও নির্বাচন ঘোষণা ॥ বৈধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী ॥ ফলাফল : গণতন্ত্রের জয় ॥ উপসংহার ॥

৩ ভারতে গণতন্ত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের প্রবল দাপটে ঘনিয়ে এসেছিল ভারতের গণতন্ত্রের মৃত্যুলগ্ন। জনগণের কণ্ঠরোধ করে, তার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অপহরণ করে স্বৈরাচারী শক্তি ভারতের ইতিহাসে যে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করলো, স্বাধীন ভারতের বত্রিশ বছরের ইতিহাসে তার আর দ্বিতীয় নজীর নেই। ভারতে গণতন্ত্রের শ্মশানভূমির ওপরে বংশানুক্রমিকতার 'রাবণের সিঁড়ি' নির্মাণের সমস্ত আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু ভারতের ভাগ্য-বিধাতার নির্মম অঙ্গুলি-হেলনে একনায়কতন্ত্রের সেই দম্ভের প্রাচীর তাসের প্রাসাদের মতো পড়লো ভেঙে। ভারতের ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে দুর্ধর্ষ স্বৈরতন্ত্রের 'সাজানো বাগান' গেল শুকিয়ে ; জয় হলো গণতন্ত্রের, জয় হলো ভারতের গণদেবতার। 'নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি।'

ভূমিকা

যখন ভারতের অর্থনীতি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যে প্রতীক্ষাকাতর, তখনই এই কদর্য একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব। তার আক্রমণে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি সমূলে বিনষ্ট হয়। সেই কালিমাকলঙ্কিত একনায়কতন্ত্র অর্বাচীন স্তাবকদের ভাষায় বন্দিত হয় 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' নামে। তারপরই গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিণত হলো প্রহসনে, অর্থনৈতিক প্রান্তরে দেখা গেল বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা, জনকণ্ঠ অবরুদ্ধ, বিরোধীদল নিশ্চিহ্ন, আইন-আদালত পঙ্গু। এই নগ্নতাকে ঢাকা দেবার জন্যে ভারতের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হলো বিশদফা কর্মসূচী এবং তার সন্তান পাঁচদফা কর্মসূচীর প্রবল ঢক্কানিনাদ। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সে এক অন্ধকারময় যুগ।

অন্ধকারময় যুগ

জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে, জনগণের শাসনব্যবস্থাই বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্রের আদর্শতম রূপ। প্রাচীন ভারতের কোথাও কোথাও সীমিতভাবে গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলেও গণতন্ত্র ভারতে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে গৃহীত ও প্রবর্তিত। ভারতের গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের উদাহরণ। কিন্তু কালক্রমে ব্যক্তি-ক্ষুধা ও ব্যক্তি-পূজার প্রাবল্যে তার যে অকাল-সমাধি ঘটবে এবং তার রন্ধ্রপথে একনায়কতন্ত্রের কদর্য আবির্ভাব হবে, তা আগে কে জানতো ?

ভারতের গণতন্ত্র প্রবর্তিত

স্বাধীন ভারত তার আত্মবিকাশের উপায় হিসেবে গণতন্ত্রকেই স্বীকার করে নিয়েছিল। পরে তার চোখে লাগলো সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। তারপর সে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্র স্থাপনের। বলাবাহুল্য, তার সেই স্বপ্নের নায়ক ছিল কংগ্রেস। তখনও কংগ্রেস

মনেপ্রাণে গণতান্ত্রিক গঠন-বিন্যাসের প্রতি ছিল শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু ১৯৬৯ সালে শাসক-কংগ্রেস সংগঠন-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যাঙ্ক-রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রগতিশীল কর্মসূচীর রূপায়ণে অগ্রসর হয়। পরে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব শাসক-কংগ্রেসকে পরায় জনপ্রিয়তার মুকুট। সেই থেকে শাসক-কংগ্রেসই পরিচিত হলো কংগ্রেস নামে। ১৯৭১ সালে এলো পঞ্চম লোকসভা নির্বাচন। তাতে কংগ্রেস ৫১৮টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি আসন অধিকার করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এবার এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আড়ালে শুরু হয় ব্যক্তি-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সুপরিকল্পিত আয়োজন। মিসা প্রবর্তিত হলো, চালু হলো কঠোরতর নিবারণমূলক আটক আইন, ঘোষিত হলো ভারতময় জরুরী অবস্থা। একদিকে, নানা কৌশলে রাজ্যে রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারগুলির পতন ঘটিয়ে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কবরভূমি রচিত হলো; স্থায়ী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নামে রাজ্যসরকারগুলির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অপহরণ করা হলো। অন্যদিকে, কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়ে গেল গুরুত্বহীন, অনিয়মিত ব্যাপার; আর, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পরিণত হলো একটি অক্ষম ক্রীড়নক যন্ত্রে। ব্যক্তিপূজার সমারোহ ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গেল ভেসে। সেই সুযোগে যুব-কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে স্বৈরতন্ত্রের বংশানুক্রমিকতার সম্ভাবনাকে আরো উজ্জল করে তোলা হলো। এইভাবে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে তার ধ্বংসস্তূপের ওপর স্থাপন করা হলো একনায়কতন্ত্রের বিশাল ইমারত।

গণতন্ত্রের আড়ালে স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ

গণতন্ত্রের বিকাশের জন্যে প্রয়োজন স্বাধীন ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচন, শক্তিশালী বিরোধী দল, সকল স্তরে গণতান্ত্রিক প্রশাসন, অর্থনীতির সম্প্রসারণ, সামাজিক ন্যায়বিচার, জনগণের সচেতন নাগরিকত্ব, বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্র ইত্যাদির অতন্দ্র প্রহরা। স্বৈরাচারী শক্তি তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এগুলিকে একে একে ধ্বংস করলো। বিশ্বের দায়িত্বশীল মহল মনে করলো, গণতন্ত্রের পক্ষে ভারত অযোগ্য। তার ওপর যেখানে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা ভয়াবহ, সেই ভারতে গণতন্ত্র প্রহসন মাত্র। অবশেষে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা বিঘোষিত হলে সেই অভিমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। সরকারী প্রচারযন্ত্রগুলিকে স্বৈরতন্ত্রের যথেচ্ছ প্রচারের কাজে লাগানো হয়। প্রচার করা হতে থাকে, নির্বাচন গণতন্ত্রের পক্ষে কোন জরুরী ব্যাপার নয়। তারপর সংবিধানের ৪২তম ধারাটির সংশোধন ঘটিয়ে লোকসভা ও আইন-সভাগুলির আয়ুষ্কালকে দীর্ঘায়িত করা হলো। যাই হোক, সবশেষে ১৯৭৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিকে ঘোষণা করতে হলো, পরবর্তী মার্চেই অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন।

স্বৈরতন্ত্রের নখরাঘাত ও নির্বাচন ঘোষণা

এবার দিকে দিকে লৌহকারার দুয়ার খোলার ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। জরুরী অবস্থার কালা-কানুনগুলি শিথিল করা হলো। আসন্ন নির্বাচনে যোগদানের জন্যে বিরোধী নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হলো। দিকে দিকে দেখা গেল অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা। বিরোধী পক্ষদল—সংগঠন-কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, বি. এল. ডি., গণতন্ত্রী কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট পার্টি—লোকনায়ক জয়প্রকাশের নির্দেশে তাদের সমস্ত বিরোধ ভুলে গিয়ে গঠন করলো জনতা দল। এবার বিরোধী দলগুলির দাবী হলো বৈধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনার দিলেন বৈধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি। সেই সঙ্গে রচনা করে দেওয়া হলো প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় শিবিরের পালনীয় তেইশ-দফা আচরণ-বিধি। তাতে হিংসা, ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধাপ্রদান, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও চরিত্রহনন ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়।

বৈধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবী

তবু এই নির্বাচন ছিল সব দিক দিয়েই 'অসম যুদ্ধ'। নবনির্মিত জনতা দলের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকায় জনগণের কাছ থেকে ছিলেন বিচ্ছিন্ন। অর্থবল ও সাংগঠনিক শক্তিতে তাঁরা ছিলেন দুর্বল। অপরপক্ষে, ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ছিল অনেক বেশী সুসংহত ও শক্তিমান্। কিন্তু জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করলো জনতা দল এবং ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল হলো প্রত্যাখ্যাত। দিকে দিকে দম্ভের প্রাচীর পড়লো ভেঙে, তার ধ্বংসস্তূপের ওপর আবার উড্ডীন হলো গণতন্ত্রের বিজয়-নিশান। ফলাফলে দেখা গেল, ৫৪২টি আসনের মধ্যে জনতা দল লাভ করেছে ২৭২টি আসন, আর কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১৫৩টি আসন। স্তম্ভিত সারা বিশ্বকে স্বীকার করতে হলো, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপ সত্ত্বেও ভারতে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ়; গণতন্ত্রের বিজয়-অভিযানে ভারতীয় জনগণের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয়।

ফলাফল : গণতন্ত্রের জয়

ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র। জনগণের সচেতন নাগরিকতাই তার ভিত্তি। ভারতে সেই ভিত্তি যে অত্যন্ত মজবুত, তা বিগত নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। গণতন্ত্রের বক্ষোরক্ত পান করে স্বৈরতন্ত্র কখনও প্রবল হয়ে জনগণের বুকে পদস্থাপনে উদ্যত হলে তাকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবার শক্তি রয়েছে এদেশের জনগণের হাতেই। একনায়কতন্ত্রের পক্ষচ্ছেদন করে তাকে গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে তারাই। কোন প্ররোচনা কিংবা মিথ্যা-প্রচার তাদের বিভ্রান্ত করতে পারে না। সে বিচারে ভারতের দরিদ্র, নিরক্ষর জনগণ বিশ্বের গণতন্ত্র-প্রেমীদের অবশ্যই শ্রদ্ধার্হ, নমস্য॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে গণতন্ত্রের জয়
- ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা
- ভারতে স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। মৌনীতাপস গ্রীষ্ম : ধূসর রুক্ষতা। সজল বর্ষা : শ্যামল-সুন্দর রূপশ্রী। শারদ লক্ষ্মী : ছুটির রাগিণী : অনুপম রূপসৌন্দর্য। হেমন্ত-লক্ষ্মী : মমতাময়ী নারী। শীতের বার্ধক্য : সীমাহীন শূন্যতা। রূপময় ও রসময় বসন্ত : পুষ্প-পর্যাপ্তি। উপসংহার।

৪
ঋতুরঙ্গময়ী রূপসী বাংলা

ক. প্রা. '৬৫

'ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি মধুর হাসি।'
—রবীন্দ্রনাথ

ঋতুরঙ্গময়ী রূপসী বাংলা। বঙ্গ-প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় তার কী ছন্দোময়, সংগীতময় অনুপম রূপ-বিস্তার! ঋতু-পরিবর্তনের বর্ণ-বিচিত্র ধারাপথের অনুসরণে নিয়ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার অন্তহীন রূপের খেলা, রঙের খেলা, সুরের খেলা। আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতির প্রেরণায় পৃথিবী তার অনন্ত সূর্য-পরিক্রমার পথে চলে এগিয়ে। তার সঙ্গে সুরছন্দলয় মিলিয়ে চলে ঋতুর পর ঋতুর অন্তহীন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ঋতুরঙ্গের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। তাই রূপমুগ্ধ কবি তাঁর আবেগের স্নিগ্ধ উচ্চারণে বাংলাদেশকে বলেছেন—'রূপসী বাংলা।' প্রতিটি ঋতু এখানে তার আপন বর্ণময়, সংগীতময় রূপ-স্বাতন্ত্র্যের ডালি নিয়ে আসে, বঙ্গ-প্রকৃতিকে সাজায় তার বৈচিত্র্য-বিলসিত স্বাতন্ত্র্যের অনুপম রূপসজ্জায়। রূপের ঐশ্বর্যে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। তারপর বেজে ওঠে তার বিদায়ের করুণ রাগিণী; সে তার রূপ-বিস্তারের অন্তিম স্মৃতিচিহ্নটুকু নিঃশেষে মুছে নিয়ে চলে যায় কালের অনন্ত যাত্রাপথে। নৃত্য-চপল নটরাজের হাতের রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরে চলে। এক ঋতু যায়, আসে অন্য ঋতু। এক যবনিকার পতন হয়, ওঠে আর এক যবনিকা। রূপসী বাংলার রূপ-সাগরে ওঠে ঢেউ।

ভূমিকা

বঙ্গ-প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালার প্রথম ঋতু-নায়ক গ্রীষ্ম। বর্ষচক্রের প্রথম দৃশ্যেই ক্রুদ্ধ দুচোখে প্রখর বহ্নিজ্বালা নিয়ে রুদ্র আবির্ভাব ঘটে এই মহাতাপসের। নির্দয় নিদাঘ-সূর্য কঠিন হাতে ছুঁড়ে মারেন তাঁর খরতপ্ত জ্বালাময় তীর। জীবধাত্রী ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়, চৌচির হয়ে যায় তার দিগন্তশায়ী প্রান্তর। গ্রীষ্মের মরু-রসনায় ধরিত্রীর প্রাণ-রস শোষিত হয়ে কম্পিত শিখায় উঠতে থাকে মহাশূন্যে। কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই, নেই শ্যামলতার আভাস। সর্বত্রই এক ধূসর মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তার। সমগ্র জীব-জগতে নেমে আসে এক প্রাণহীন, রসহীন পাণ্ডুর বিবর্ণতা। তারই মধ্যে একদিন 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' নিয়ে 'তপঃক্লিষ্ট, তপ্ততনু ভীষণ ভয়াল' গ্রীষ্ম অপরাহ্ণের দিকে ডাক দেয় কাল-বৈশাখীকে। শুধু অনন্ত রূপময়ী বাংলাদেশের আকাশেই দেখা যায় এই রূপনায়কের সেই রুদ্র-সুন্দর রূপ। গ্রীষ্ম ফুলের ঋতু নয়, ফুল ফোটাবার তাড়া তার নেই; শুধু ফলের ডালা সাজিয়েই নিঃশব্দে বিদায় নেয় সে।

মৌনীতাপস গ্রীষ্ম : ধূসর রুক্ষতা

তারপর একদিন গ্রীষ্মের লেলিহান হোমশিখাকে আবৃত করে দূর-দিগন্তে স্তরে স্তরে জমে ওঠে নবীন মেঘের স্তূপ। এক অপূর্ব সমারোহে আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত করে রাজ-রাজ্যেশ্বরের মতো আসে শ্যামল, সুন্দর, নয়নাভিরাম বর্ষা। বর্ষ-মঞ্চের দ্বিতীয় শিল্পী সে। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-বিকাশ ও গুরুগম্ভীর বজ্রনিনাদের 'অতি-ভৈরব হরষে'র মধ্যে সূচিত হয় তার শুভাগমন। সেই সঙ্গে নিদাঘ-দগ্ধ পৃথিবীর ধূসর বুকে ঘনিয়ে আসে স্নিগ্ধ-শীতল 'শ্যামছায়াঘন দিন'। আকাশে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘরাজির অপূর্ব স্তর-বিন্যাসে, নিম্নে শ্যামায়মান বন-প্রকৃতির বুকে মেঘ-মেদুর ছায়া-বিস্তারে জেগে ওঠে পৃথিবীর বহু-প্রতীক্ষিত, মর্মর-মুখর মহোল্লাস।

সজল বর্ষা: শ্যামল-সুন্দর রূপশ্রী

দূর দিগন্ত থেকে দুরন্ত বায়ু ছুটে আসে হা হা শব্দে। শুরু হয় শীতল ধারাবর্ষণ। বহুদিন পরে বাংলার শুষ্ক প্রান্তর, নদীনালা ও খালবিলে জাগে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস। মাটির কঠিন শাসন ভেদ করে নবীন শস্যশিশুর দল বেরিয়ে পড়ে নবজীবনের জয়যাত্রায়। প্রকৃতির ধূলি-বিষণ্ন অঙ্গ থেকে গ্রীষ্মের ধূসর অবসাদ মুছে গিয়ে ফুটে ওঠে সজল বর্ষার শ্যামল-সুন্দর রূপশ্রী। এক অপূর্ব শ্যাম-সমারোহের মধ্যে ঘনিয়ে আসে বর্ষা-প্রকৃতির পুষ্প-বিকাশের লগ্ন। কদম্ব-কেয়া-যূঁই-গন্ধরাজ-হাসনুহানার বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধের উৎসবে বঙ্গ-প্রকৃতির হৃদয়ের দ্বার যেন খুলে যায়। তারপর বেজে ওঠে বর্ষা-বিদায়ের বিষণ্ন মাদল। শেষ-বর্ষণের পালা-গান গেয়ে, পথে পথে কদম্ব-কেশরের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে, বাংলার পল্লী-প্রকৃতিকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে বিদায় গ্রহণ করে রূপময়ী বর্ষা।

বাংলার রূপের রঙ্গমঞ্চে এবার আবির্ভূত হয় বর্ষ-নাট্যের তৃতীয় নায়ক শরৎ। বর্ষণক্লান্ত লঘুভার মেঘ অলস-মন্থর ছন্দে নিরুদ্দেশে ভেসে যায়। বর্ষণ-ধৌত, মেঘমুক্ত আকাশের সুনীল রূপ-কান্তি, আলোছায়ার লুকোচুরি, শিউলিফুলের মন-উদাসকরা গন্ধ নদীতীরে কাশফুলের অপূর্ব সমারোহ, প্রভাতে তৃণ-পল্লবে নব-শিশিরের আলিম্পন, তাতে প্রভাত-সূর্যের রশ্মিপাত এবং শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রি—এই অনুপম

শারদ-লক্ষ্মী: ছুটির রাগিণী: অনুপম রূপসৌন্দর্য

রূপরাশি নিয়ে বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে শারদ লক্ষ্মীর ঘটে আনন্দময় আবির্ভাব। তারই মধ্যে বেজে উঠে মন-কেমন-করা ছুটির বাঁশী। বাঙালীর আনন্দঘন শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার আয়োজনে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার গ্রাম ও নগর। তার আকাশে-বাতাসে, দিগন্ত-বিস্তৃত শস্য-প্রান্তরে, ভরা নদীর কূলেকূলে এবং ভাবপ্রবণ বাঙালীর অন্তরে অন্তরে অনুভূত হয় শারদ-লক্ষ্মীর স্নিগ্ধমধুর নিঃশব্দ আবির্ভাব। রূপালি জ্যোৎস্নার অপরূপ রথে চড়ে সৌন্দর্যের নানা উপচার ছড়াতে ছড়াতে যখন শারদ লক্ষ্মীর ঘটে স্বপ্নঘন মর্ত্যাবতরণ, তখন চারদিকে রূপের দুয়ার যেন খুলে যায়, বাংলাদেশের অনির্বচনীয় রূপমাধুরী যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

হেমন্ত শরতেরই বিলম্বিত রূপ। বঙ্গ-ঋতুনাট্যের সে চতুর্থ শিল্পী—উদাসীন, প্রৌঢ় এবং বিষণ্ন। হেমন্তের নেই শরতের বর্ণৈশ্বর্য, আছে সুদূর-ব্যাপ্ত এক বৈরাগ্যের বিষণ্নতা। হেমন্ত-লক্ষ্মী ধূমল কুয়াশায় নয়ন ঢেকে ফসল ফলাবার নিঃসঙ্গ সাধনায়

থাকে মগ্ন। ক্ষেতে-খামারে রাশি-রাশি ভারা-ভারা সোনার ধান উঠতে থাকে, চারদিকে অন্তহীন কর্মব্যস্ততা। প্রাচুর্যময়ী হেমন্তের ফুলের বাহার নেই, সৌন্দর্যের জলুস্ নেই, রূপসজ্জারও প্রাচুর্য নেই; আছে মমতাময়ী নারীর এক অনির্বচনীয় কল্যাণী রূপশ্রী। সে আমাদের ঘর সোনার ধানে ভরে দিয়ে শিশিরের নিঃশব্দ চরণে বিদায় গ্রহণ করে।

হেমন্ত-লক্ষ্মী: মমতাময়ী নারী

হেমন্তের প্রৌঢ়ত্বের পর আসে জড়তাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। শুষ্ক-কাঠিন্য, পরিপূর্ণ রিক্ততা ও দিগন্তব্যাপী সুদূর বিষাদের প্রতিমূর্তি সে। তার তাপ-বিরল রূপমূর্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এক মহামৌনী তপস্বীর তপশ্চর্যা এবং অনন্ত বৈরাগ্যের ধূসর অঙ্গীকার। বিবর্ণ কাননবীথির পাতায় পাতায় নিঃশেষে ঝরে যাবার নির্মম ডাক এসে পৌঁছায়। এক সীমাহীন রিক্ততায় অসহায় ডালপালাগুলি একদিন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। তাকে সব দিয়ে দিতে হয়, দিয়ে যেতে হয়। ওদিকে, ধান-কাটা মাঠে কী সীমাহীন শূন্যতা, কী বিশাল কারুণ্য! ত্যাগের কী অপরূপ মহিমা!

শীতের বার্ধক্য: সীমাহীন শূন্যতা

তারপর 'মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি।' আসে ঋতু-শ্রেষ্ঠ বসন্ত, আসে পুষ্প-পর্যাপ্তির লগ্ন। বঙ্গ-ঋতুনাট্যের অন্তিম রূপ-শিল্পী সে। মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বাতাসের যাদুস্পর্শে বর্ণবিরল পৃথিবীর সর্বাঙ্গে লাগে অপূর্ব পুলক-প্রবাহ, বন-বীথির রিক্ত শাখায় জাগে কচি কিশলয়ের অফুরন্ত উল্লাস। বাতাসের মৃদু এবং মর্মর ধ্বনি, দূর বনান্তরাল থেকে ভেসে-আসা কোকিলের কুহুগীতি পৃথিবীতে সৃষ্টি করে এক অপরূপ মায়া-নিকেতন। অশোক-পলাশের রঙীন বিহ্বলতায় ও শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার উল্লাসে, মধুমালতী ও মাধবী-মঞ্জরীর গন্ধমদির প্রগল্‌ভতায়—সারা আকাশতলে গন্ধ, বর্ণ ও গানের তুমুল কোলাহলে লেগে যায় এক আশ্চর্য মাতামাতি। এইভাবে বাঙালীর সঙ্গে হোলি খেলে, ফুল-ফোটানো ও ফুল-ঝরানোর খেলা সাঙ্গ করে চলে যায় রূপ-নায়ক বসন্ত।

রূপময় ও রসময় বসন্ত: পুষ্প-পর্যাপ্তি

রূপসী বাংলার এই ঋতুরঙ্গ-মালা নানা বর্ণ-গন্ধ-গানের সমারোহে নিত্য আবর্তিত হয়ে চলে। কিন্তু শহরবাসী ও শহরমুখী বাঙালী আজ আর অন্তরে অনুভব করে না তার সাদর নিমন্ত্রণ। ঋতু-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি যখন বিবাহের কন্যার মতো অপরূপ সাজে সেজে উঠবে, বাঙালী তখন শুনবে কলকারখানার যন্ত্র-ঘর্ঘর-ধ্বনি কিংবা অঙ্ক মেলাতে ব্যস্ত থাকবে সওদাগরী অফিসে। আজ আমরা প্রকৃতিকে নির্বাসিত করে আমাদের জীবনে বরণ করে নিচ্ছি উগ্র নাগরিকতা। কিন্তু উপেক্ষিতা প্রকৃতি একদিন নয় একদিন নেবে তার চরম প্রতিশোধ। কে জানে, সেই প্রতিশোধের রূপ কেমন হবে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ঋতুচক্র ও বাংলার পল্লী-প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য
- বাংলার ঋতু-পর্যায়
- বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুর সৌন্দর্য, ক. প্রা. '৬৫

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ বর্ষার আবির্ভাব ॥ রূপ-বিস্তার ॥ বর্ষায় গ্রাম-বাংলার অনির্বচনীয় রূপশ্রী ॥ বাঙালীর জীবনে বর্ষার প্রভাব : অর্থ নৈতিক জীবনে ॥ সাংস্কৃতিক জীবনে ॥ তার কাব্যে ॥ উপসংহার ॥

৫

বাংলাদেশে বর্ষা

ক. প্রা. '৬২

'আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা—' —রবীন্দ্রনাথ

বাংলাদেশে মেঘমেদুর বর্ষার রূপ শ্যামল, সুন্দর—নয়নাভিরাম। স্নেহস্নিগ্ধ তার সেই অনুপম কোমল রূপের যেন জুড়ি নেই। মরুময় গ্রীষ্মের লেলিহান হোম-হুতাশনের অবসানে বাংলাদেশের আকাশে 'অতি ভৈরব হরষে' আবির্ভাব ঘটে সজল সঘন নব-বর্ষার। দিকে দিকে মেঘের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে সে আসে রাজ-রাজ্যেশ্বরের মতো। তার আবির্ভাব রং ও রসের অপরূপ সৌন্দর্য-বিস্তারে, তার আবির্ভাব ভাবের সুদূরাভিসারে, তার আবির্ভাব সংগীতের অপূর্ব সুর-মূর্ছনায়।

ভূমিকা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সে যখন আসে, তখন কেবল আমাদের বাইরের আকাশটাই নয়, আমাদের মনের আকাশটাকেও সে তার মেঘ-মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে আসে, অবিশ্রান্ত রস-বর্ষণে তাকে কোমল ও সিক্ত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে নিদাঘ-তপ্ত বঙ্গ-প্রকৃতির রূপমূর্তি সৌন্দর্যের নবধারাজলে স্নান করে যেন অপরূপ হয়ে ওঠে। তার চোখে লাগে লাবণ্যের সুস্নিগ্ধ মায়াকাজল। তার অঙ্গে অঙ্গে নেমে আসে কোমল প্রশান্তি, এক সুদূর-ব্যাপ্ত স্নিগ্ধতা; উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক নয়ন-লোভন অনুপম শ্যামশ্রী!

বাংলাদেশে বর্ষার আবির্ভাব যেমন রাজসিক, তার আয়োজনও তেমন সুবিপুল। কাজল-কালো সজল মেঘের স্তর-বিন্যাসে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হয়ে যায় অবগুণ্ঠিত। সুদূর কোন্ দিগন্তের কারাপ্রাচীর থেকে মুক্ত হয়ে বন্ধন-বিহীন বায়ু এই 'শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরের দ্বার' ভাঙবে বলে ছুটে আসে রূপকথার রাজপুত্রের মতো। মেঘ-গর্জনে ধ্বনিত হয় তার শুভাগমন-বার্তা; বিদ্যুৎ-স্ফুরণ তার আগমন-পথের সুদূর-ব্যাপ্ত আলোক-সজ্জা, গগন জুড়ে মেঘে মেঘে তার জয়ধ্বজা এবং নিম্নের তৃণাঙ্কিত ধরণী তার আগমন-পথের সবুজ গালিচা। 'তমালতালীবনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘর-ধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্-বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না।'

বর্ষার আবির্ভাব

স্নিগ্ধ শীতল ধারা-বর্ষণে রোমাঞ্চ জাগে ধরিত্রীর সর্বাঙ্গে। উদ্যত-বাহু অরণ্যের বুকে জেগে ওঠে বহু-প্রতীক্ষিত মর্মর-মুখর মহোল্লাস। তাপদগ্ধা পৃথিবীর সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার ঘটে অবসান। মাঠ-ঘাট, নদীনালা, খালবিল পূর্ণ হয়ে ওঠে কানায় কানায়। ধূলি-ধূসর পৃথিবীর খর-তপ্ত দিনের হয় অবসান। এবার দূর পরবাসীদের ঘরে-ফেরার পালা। নদীপথে মাঝি-মাল্লাদের কণ্ঠ থেকে শোনা যায় সারিগানের অপূর্ব উল্লাস। এদিকে, ছিন্ন হলো

রূপ-বিস্তার

মাটির কঠিন বাধা। শস্য-শিশুর দল নব-অঙ্কুরের জয়পতাকা বহন করে ধরাপৃষ্ঠে হলো অবতীর্ণ। চারদিক শ্যামল সৌন্দর্যে প্লাবিত। তার মধ্যে ঘনিয়ে আসে পুষ্প-বিকাশের আনন্দঘন লগ্ন। কেয়া-কদম্ব-যুঁই-গন্ধরাজ-হাস্নুহানার গন্ধবাহারে, জলের কলোচ্ছ্বাসে, বনের পত্র-মর্মরে বর্ষা-প্রকৃতির উন্মুখ হৃদয়ের কী অনবদ্য প্রকাশ!

বর্ষায় গ্রাম-বাংলার নয়ন-রঞ্জন শ্যামশ্রী এবং তার আকাশে অপরূপ মেঘ-মাধুর্য সত্যিই অনির্বচনীয়। দূরে শ্যামায়মান গ্রাম-রেখা, আদিগন্ত জল-বিস্তারের মধ্যে শস্যশিশুর বায়ুসহ নৃত্য, আকাশে কৃষ্ণ-ধূসর সজল মেঘের স্তর-বিন্যাস, সুদূর দিগন্ত-বিলাসী বক-পঙ্‌ক্তির নিরুদ্দেশ-যাত্রা—রচনা করে যে দুর্লভ দৃশ্য, বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও তা দৃষ্ট হয় না। এদিকে, 'নানা শস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে নাই। ধানের কোমল-মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই।' এই আলোহীন, বৈচিত্র্যহীন মেঘমেদুর দিনে মত্ত দাদুরী ও ডাহুকীর ডাকের যেন তুলনা হয় না। বর্ষার এই কোমল পটভূমিতে জলময় শস্য-প্রান্তরে কর্মব্যস্ত কৃষকদের সংগীত-মুখরতা সৃষ্টি করে এক অপরূপ সুরবিন্যাস, এক সমবেত গীতি-ঝংকার।

বর্ষায় গ্রাম-বাংলার অনির্বচনীয় রূপশ্রী

বর্ণাঢ্য ঋতু-চক্রের মধ্যে বর্ষাই বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। এই সজল শ্যামল বর্ষার সঙ্গে আছে বাঙালীর প্রাণের সম্পর্ক। তার সারা বছরের খাদ্য-উৎপাদনে, তার অর্থনৈতিক জীবন-সংগঠনে বর্ষার অবদান অসামান্য। গ্রাম্য পথ কর্দমাক্ত, পঙ্কিল; মাঠে বাঁকাজলের খেলা, অবিরল ধারা-বর্ষণ, বজ্র-বিদ্যুৎ ও ঝড়-বন্যার ভয়াল রূপ—সমস্ত তুচ্ছ করে বাংলার আবহমান কালের কৃষক-সম্প্রদায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে এ সময় মাঠে মাঠে বীজ বোনে, চারাগাছ তোলে, চারাগাছ রোপণ করে। হেমন্তের পরিপূর্ণ খামারে যে রাশি-রাশি সোনার ধান তোলা হবে, তার জন্যে বর্ষার এই দুরূহ কৃচ্ছ্র-সাধনা। স্নেহময়ী বর্ষাই বাংলাকে করেছে শস্যশ্যামলা। তার সারা বছরের অন্নবস্ত্র, তার আর্থিক সচ্ছলতা—সব কিছুই নির্ভর করে বর্ষার প্রসন্নতা ও দাক্ষিণ্যের ওপর। অতিবর্ষণের ফলে বর্ষা তার স্নেহশালিনী রূপের পরিবর্তে ধারণ করে ভয়াবহ সর্বধ্বংসী রূপ। তখন প্রচণ্ড ঝটিকা ও বন্যার তাণ্ডবে বহু গ্রাম-জনপদ ধ্বংস হয়, বহু প্রাণ মৃত্যুর করালগ্রাসে নিপতিত হয়, ক্ষেতের ফসল এবং বহু কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ বিনষ্ট হয়।

বাঙালীর জীবনে বর্ষার প্রভাব: অর্থনৈতিক জীবনে

তবু বর্ষা বাংলার জীবন-সাধনা ও ভাব-সাধনার অনন্য রূপকার। বাঙালীর অর্থ-নৈতিক জীবনের মতো তার সাংস্কৃতিক জীবন-গঠনে ও বিকাশে বর্ষার অবদান অপরিসীম। বর্ষা বাঙালীর মনকে করেছে সরস ও সৃষ্টিশীল। সে অফুরন্ত ফসল ফলিয়ে বাঙালীর হাতে তুলে দেয় অফুরন্ত অবসর ও আর্থিক সঙ্গতি। তাইতো বাঙালী রচনা করে নিতে পারে তার আনন্দমুখর উৎসবের নিত্য-নব পরিকল্পনা। রথযাত্রা,

জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাখীবন্ধন ইত্যাদি উৎসব বর্ষা-মুখরিত বাংলার নিজস্ব অবদান। তার ওপর নির্ভর করে রচিত হয়েছে বাংলার কত কাহিনী, কত সংগীত, কত নৃত্য, কত কবিতা! মেঘ-কজ্জল বর্ষার নয়নাভিরাম পটভূমিকায় বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, শেষ-বর্ষণ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি সৃষ্টিশীল বাঙালী হৃদয়ের আধুনিকতম সংযোজন। অপূর্ব রূপময়ী বর্ষার স্নিগ্ধসজল পটভূমিতে আনন্দঘন এই উৎসবগুলি অনবদ্য সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সাংস্কৃতিক জীবনে

তাইতো দেখি, বাংলা কবিতায় ও গানে পড়েছে আকাশের ঘনায়মান মেঘের স্নিগ্ধসজল ছায়া। কবি জয়দেব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বর্ষার কবিতা ও সংগীতের যেন অন্ত নেই। বর্ষা কেবল বাংলাদেশের মৃত্তিকাকেই শ্যামল সরস করেনি, সে বাঙালীর মনোভূমিকেও করেছে রস-সিক্ত। সেই সঙ্গে সে তার কাব্য-সংস্কৃতিকেও দান করেছে চির-শ্যামলতা, চির-নবীনতা। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আকাশে নব-মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন বাংলার কবি-হৃদয়েরও উৎসমুখ খুলে যায়। তার ভাবের ময়ূরপঙ্খীর পালে লাগে জলসিক্ত পুবালি হাওয়া। তার কাব্যক্ষেত্রে চলতে থাকে রসের ধারাবর্ষণ, তার সংগীতে লাগে নবীন সুরের আমেজ, আসে সৃষ্টির জোয়ার। বর্ষা বাংলার কাব্য-সাহিত্যকে করেছে রস-সমৃদ্ধ, তার সংগীতকে করেছে অপূর্ব লাস্যময়।

তার কাব্যে

বর্ষা বাংলার প্রাণের ঋতু। তার মন্ত্রবলে কঠিন পাষাণ গলে গিয়ে ফলে অফুরন্ত ফসল। মরু-বিজয়ের শ্যামল কেতন উড়তে থাকে দিকে দিকে। গুরু গুরু মেঘের মত্ত মাদল বাজিয়ে সে মেতে ওঠে এক সজল উৎসবের উল্লাসে। মেঘের সীমাহীন সামিয়ানার নীচে শুরু হয় বর্ষা-প্রকৃতির বিচিত্র জলসা। বাদল মেঘে বাজে তার উৎসবের মাদল। বর্ষণমুখর প্রকৃতির বিচিত্র সুর-মূর্ছনায় মুখর হয়ে ওঠে তার সংগীতের আসর। তার মধ্যে তার দক্ষিণ হাত থেকে ঝরে পড়ে বরাভয়। কিন্তু তার বাম হাত থেকে নির্মম অভিশাপের মতো নেমে আসে মরণ-ঢালা ভয়ঙ্করী বন্যা। তাছাড়া, বন্যা-মহামারী ইত্যাদি বর্ষার ধ্বংসাত্মক রুদ্র-লীলার মধ্য দিয়ে বাংলার প্রাণ-প্রাচুর্যের হয়ে যায় কঠিন পরীক্ষা। বর্ষা বাঙালীর বড়ো দুঃখের ঋতু, বড়ো প্রিয় ঋতু। সে কোন্ পুব সাগরের পার থেকে তার জন্যে বহন করে নিয়ে আসে সজল আশ্বাস, সফল অভিব্যক্তি। তার ধারাবর্ষণ, তার ঝিল্লির মঞ্জীর, তার নয়নাভিরাম শ্যামল-শোভার বুকে বিদ্যুতের ছটা, বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা তার বরণমালা—সমস্তই বাঙালীর হৃদয় হরণ করেছে। বর্ষা তাই বাঙালীর বড়ো মায়াময় ঋতু, বড়ো প্রাণের ঋতু॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- বাংলাদেশের বর্ষা ঋতু, ক. প্রা. '৬২
- বর্ষায় বাংলাদেশ
- তোমার প্রিয় ঋতু

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা। শারদ-লক্ষ্মীর অনুপম রূপকান্তি। শরৎ ছুটি-মঞ্জুরীর ঋতু। উৎসবের ঋতু : শরৎ। শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। শরৎ-বিদায়। শরতের অর্থনৈতিক অবদান। উপসংহার।

আমার প্রিয় ঋতু : শরৎ

মা. '৬৬, '৬৯

'শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।' —রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

রৌদ্রবরণ, মোহন, সুন্দর শরৎই আমার প্রিয় ঋতু। তার আবির্ভাব বর্ষণ-বিধৌত সুনির্মল আকাশের আদিগন্ত গাঢ়নীল ব্যাপ্তিতে, তার আবির্ভাব শিশির-সিক্ত তৃণ-পল্লবের কোমল শিহরণে, তার আবির্ভাব কানায়-কানায় ভরা নদীর মহিমান্বিত গতি-মন্থরতায়, তার আবির্ভাব নদীতীরের শুভ্র কাশের অনবদ্য সমারোহে এবং তার আবির্ভাব ভাবপ্রবণ বাঙালীর হৃদয়ে-হৃদয়ে। সে যখন তার নয়ন-ভোলানো রূপ নিয়ে ক্ষান্তবর্ষণ, স্ফটিক-নীল আকাশের প্রান্ত থেকে শিউলি-ঝরানো পথের শিশির-সিক্ত ঘাসে ঘাসে তার অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে বাংলার কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন বাঙালীর হৃদয় ও মন প্লাবিত হয়ে যায় এক পরিপূর্ণ আনন্দের জোয়ারে। আকাশে-বাতাসে এক উৎসবের মধুর আগমনী—'স্থলে জলে আর গগনে গগনে বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে।' চারদিকে লাবণ্যের জোয়ার, আনন্দের কলোচ্ছ্বাস! নিম্নে শস্য-প্রান্তরে সবুজের সমারোহ, অরণ্যের পাতায় পাতায় সবুজের ছড়াছড়ি! দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-পুলকিত সবুজের ঢেউ! নদীতীরে লাস্যময় শুভ্র কাশের গুচ্ছে লীলায়িত মৃদু চামর! বনে বনে ফুলের জোয়ার আর দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়ার অপূর্ব সংগীত-মূর্ছনা, সেই সঙ্গে সুমধুর ভ্রমর-গুঞ্জন। রৌদ্রময় শরতের এই বর্ণাঢ্য শোভায় বাংলার পল্লী-প্রকৃতি যেন আনন্দময়ীর রূপ ধারণ করে।

শারদ-লক্ষ্মীর অনুপম রূপকান্তি

বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশের পটভূমিকায় শরতের এই উদার আনন্দময় আবির্ভাব সত্যিই নয়নাভিরাম। তার রৌদ্রের রং কচি-কাঁচা তরল সোনার মতো। নৈশ নীলাকাশে রূপালি জ্যোৎস্নার সমারোহের মধ্যে যখন শুভ্র মেঘের মন্থর রথে শারদ-লক্ষ্মীর মর্ত্যাবতরণ ঘটে, তখন তার অনুপম রূপশ্রী যেন দিগন্ত ছাপিয়ে যায়। বর্ষণ-ক্লান্ত লঘুভার মেঘের অলস-মন্থর নিরুদ্দেশ-যাত্রা, আকাশের সুনীল প্রশান্তি, ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি, পথে পথে শিউলি-ফুলের গন্ধ, নদীতীরে কাশফুলের আন্দোলন, প্রভাতে তৃণ-পল্লবে নবশিশিরের আলিম্পন এবং তাতে সূর্যকিরণের বিচ্ছুরিত স্বর্ণকান্তি—সবই শারদ-লক্ষ্মীর অনুপম রূপশ্রীর অনবদ্য প্রকাশ। শরতের এই সৌন্দর্যময় পটভূমিকায় শস্য-বিচিত্রা ধরিত্রীর অনির্বচনীয় রূপ-লাবণ্য মনকে এক নিরুদ্দেশ ভাবাবেগে আবিষ্ট করে। তার সঙ্গে নদীর ভরা-স্রোতে ভাসমান পালতোলা নৌকাশ্রেণী এবং শুভ্র জ্যোৎস্নার পুলকিত সমারোহ পৃথিবীকে পরিণত করে এক অপরূপ সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

শরতের এই অনবদ্য সুষমার মাঝখানে তারপর বেজে ওঠে ছুটির মন-কেমন-করা বাঁশি। প্রকৃতই শরৎ আমাদের ছুটির ঋতু, অবকাশের ঋতু। হাতে তার অবকাশ-মঞ্জুরীর চিঠি। তার মন-কেমন-করা আকাশের নিবিড় নীলিমা, তার প্রাণ-উদাস-করা স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস, তার হৃদয়-ভোলানো আলোর লিখন আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে পাঠায় ছুটির সাদর নিমন্ত্রণ। তার শিউলি-বিতানে, নবশিশিরের আলিম্পনে আর ভ্রমরগুঞ্জনে এক নিরুদ্দেশ ছুটির আভাস। 'তাই দেখি, শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে—বর্ষার মত সে অভিসারে চলা নয়, সে অভিমানের চলা।'

শরৎ ছুটি-মঞ্জুরীর ঋতু

তারপর ধীরে ধীরে উৎসবের সাজে সেজে ওঠে শস্যময়ী পৃথিবী। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বেজে ওঠে মাটির কন্যার আগমনীর গান। মেঘের নন্দী-ভৃঙ্গীর দল শিঙা বাজাতে বাজাতে গৌরী শারদাকে ধরা-জননীর কোলে রেখে যায়। বাস্তবিকই, ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশের নীল চন্দ্রাতপের নীচে, বৃক্ষলতা ও ওষধির অজস্র সফল অভিব্যক্তির মাঝে প্রকৃতি যেন বিশ্বজননীর পূজার অপূর্ব আয়োজনে মেতে ওঠে। বাতাসে ভেসে আসে উৎসবের বাঁশির সুর। পাখি-ডাকা গ্রামগুলির ছায়া-সুনিবিড় আঙিনায় পড়ে উৎসবের আলপনা। এ পূজা যেন শরৎ-ঋতুরই পূজা। তারপর আসে সেই দীর্ঘ-প্রতীক্ষার লগ্ন। জগজ্জননীর পূজার আনন্দ-উৎসবের রূপসজ্জায় সেজে ওঠে সারা বাংলাদেশ। বাংলার ঘরে ঘরে নতুন বসন-ভূষণে সাজবার ধুম পড়ে যায়। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া—সবই শরৎ-ঋতুর আলোকোজ্জ্বল অবদান।

উৎসবের ঋতু : শরৎ

শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রির রূপ যেন অতুলনীয়। সে যেন এক অনির্বচনীয় রূপশ্রী নিয়ে বাংলাদেশের হৃদয়ের দ্বারে এসে দাঁড়ায়। শস্য-শ্যামলা ধরিত্রীর ওপর শুক্লা রজনীর রজতকান্তি জ্যোৎস্না ধারা যেন এক স্বর্গীয় শোভায় চারদিক অনির্বচনীয় করে তোলে। আকাশে ও মাটিতে শুভ্রতার অপূর্ব সমারোহের মধ্যে যেন শারদ-লক্ষ্মীর হৃদয়ের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাওয়া যায়। জ্যোৎস্নার বিগলিত রজতধারায় স্নান করে বিশালাক্ষীর মন্দিরের পুলকিত লক্ষ্মীপেঁচাটি সেই পরম লগ্নে এক গভীর আবেগে ডেকে ওঠে। তার আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে মর্ত্যে লক্ষ্মীর আগমনী বিঘোষিত হয়। সেই অনির্বচনীয়তার মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্য যেন এক স্বপ্নময় সুষমায় একাকার হয়ে যায়।

শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি

বাংলাদেশের এই আনন্দঘন শরতের অন্তরের অন্তস্তলে আছে অফুরন্ত অশ্রুজলের উৎস। সুদূরব্যাপ্ত ছুটি আর আনন্দ-উৎসবের কলোচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়। আসে দৈনন্দিন কর্মের আহ্বান, আসে বিষাদখিন্ন বিচ্ছেদের লগ্ন। তাই 'আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সে ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়। যে লইয়া যায়, সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো

উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।' তাই শরৎ যখন আসে, তখন আমাদের মনের সমস্তটাই সে খুব সহজেই দখল করে আসে। আবার যখন চলে যায়, তখন সমস্তটাই একেবারে শূন্য করে দিয়ে চলে যায়। শরতের মতো অন্য কোন ঋতুর বিচ্ছেদ-বেদনা আমরা এত গভীরভাবে অনুভব করি না। শরৎ-বিদায়ের

শরৎ-বিদায়

পর আমাদের অন্তরলোক সত্যিই বিজয়ার গানের মতো বেদনায় খিন্ন ও অশ্রুবিধুর হয়ে ওঠে। বিগত উৎসবের স্মৃতি নিয়ে ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারপর আমরা কর্ম-জগতের দিকে পা বাড়াই। কিন্তু আমাদের বেদনা-বিহ্বল মন পড়ে থাকে পেছনে, যেখানে শিউলি-বিছানো শিশির-সিক্ত পথে শরৎ তার করুণ কোমল শেষ পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

শরৎ ফসলের ঋতু নয়। শরৎ তাই ফসল কাটে না। ফসল পাকানোও তার কাজ নয়, ফসল কাটারও তাড়া নেই তার। সে শুধু বহন করে নিয়ে আসে আগামী ফসলের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বাণী। বাংলাদেশ বর্ষায় যে ফসল ফলিয়েছে এবং যা হেমন্তে খামারে উঠবে, শরৎ সেই ফসলের শুভ সম্ভাবনার খবর এনে

শরতের অর্থনৈতিক অবদান

বাংলাদেশের অন্তরে বইয়ে দেয় এক অনবদ্য আনন্দের বান। ক্রমে সেই আনন্দ পরিণত হয় এক বর্ণাঢ্য উৎসব-সজ্জায়। শরতের এই উজ্জ্বল অর্থনৈতিক পটভূমিকায় রচিত হয় শারদীয় উৎসবের প্রাণোচ্ছল আয়োজন। আর, শরৎ যে আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণী বহন করে নিয়ে আসে, তার সুগভীর আশ্বাসেই কৃষি-মাতৃক বাংলাদেশের সারা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রচিত হয়ে যায়। সেই আশ্বাসের নিবিড় স্পর্শে বাঙালীর মুখে ফুটে ওঠে উৎসবের অমলিন হাসি। শরৎ বাংলাদেশের আনন্দের অগ্রদূত, বাঙালীর উৎসবের বার্তাবহ, তার সচ্ছলতার নিপুণ কারিগর।

তারপর শরৎ বাংলাদেশকে আগমনী ও বিজয়া গান শুনিয়ে, উৎসবের আনন্দে হাসিয়ে এবং বিসর্জনের বেদনায় কাঁদিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। তার চলার পথে পড়ে থাকে বিষণ্ণ ঝরা-কাশের গুচ্ছ, ছিন্ন-ম্লান শেফালির মালা, আর নবীন ধানের অজস্র

উপসংহার

মঞ্জরী। শিশিরাশ্রুপূর্ণ চোখে বাংলাদেশ তার বিদায়-পথের দিকে করুণ বিষণ্ণ হৃদয়ে চেয়ে থাকে। বর্ষা বাঙালীর প্রিয় ঋতু, কিন্তু শরৎ বাংলাদেশের হৃদয়ের ঋতু। বর্ষা তার স্বাচ্ছন্দ্যের কারিগর; আর শরৎ তার আনন্দের অগ্রদূত। তাই শরতের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের হৃদয়ের মণিকোঠায়। তাই এই নয়নবিমোহন, আনন্দময় শরৎই আমার প্রিয় ঋতু॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- শরৎকালে বাংলাদেশ, মা. '৬৯
- বাংলাদেশে শরৎকালের উৎসব ও আনন্দ, মা. '৬৬

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ বাঙালীর উৎসব একটি সুষম জীবনের অভিব্যক্তি ॥ প্রাচীন বাংলার প্রাণবন্ত উৎসব-চিত্র ॥ বাংলার ধর্মীয় উৎসব ॥ বাংলায় ঋতু-উৎসব ॥ সামাজিক উৎসব ॥ জাতীয় উৎসব ॥ উপসংহার ॥

৭ বাংলার পালা-পার্বণ

বাংলাদেশ উৎসব-প্রাচুর্যের দেশ। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বাঙালীর সৃজনধর্মী প্রতিভারই আনন্দমুখর অভিব্যক্তি। উৎসবের পর উৎসব তাদের আনন্দ-কলহাস্তে তার ঘর আলো করে আসে। তার এই অতিরিক্ত উৎসব-প্রিয়তার পটভূমিতে আছে তার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য, আছে বঙ্গ-প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতা এবং নয়ন-লোভন সৌন্দর্যের অনুপম রূপশ্রী; আর আছে তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতার প্রতিশ্রুতি—অনায়াস অন্ন-সংস্থান, বঙ্গ-প্রকৃতির অকৃপণ করুণার দান। ঋতুর পর ঋতু আসে, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে বঙ্গ-প্রকৃতিকে অপরূপ সৌন্দর্যময়ী অন্নপূর্ণারূপে সাজিয়ে দিয়ে যায়। তার সুরে সুর মিলিয়ে বাঙালী তার প্রাচুর্যে-ভরা প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উল্লাসে মেতে ওঠে নিত্য-নব উৎসব-রচনায়। কবি তাই বিস্ময়-পুলকিত কণ্ঠে বলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা।' কত বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে কত দৈব-দুর্বিপাকে, কত রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায় বাঙালীর ভাগ্যাকাশে বিধাতার রুদ্ররোষের মতো কতবার ঘনিয়ে এসেছে দুর্যোগের কালো মেঘ। কতবার বাঙালী প্রত্যক্ষ করেছে প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে নির্মম মৃত্যুর ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা। কিন্তু বাঙালী তার দুর্বার প্রাণ-প্রাচুর্যের দ্বারা জয় করেছে মৃত্যুর বিভীষিকা। মৃত্যুর ধ্বংসস্তূপের ওপর সে রচনা করেছে তার আনন্দ-উৎসবের নিত্য-নতুন পরিকল্পনা।

ভূমিকা

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে তখন ছিল অফুরন্ত শস্য-প্রাচুর্য; দারিদ্র্য ও অভাবের ভ্রূকুটি তখন ছিল বাঙালীর অজ্ঞাত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। সেদিন মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতায় জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ছিল অনুপস্থিত। তার হাতে যে উদ্বৃত্ত অবকাশ সঞ্চিত হয়ে উঠতো, বাঙালীর উৎসবগুলি ছিল তারই সজীব অভিব্যক্তি। সেই অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপূর্ণতার দিনে এইভাবে বাঙালীর একটি সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তার 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' সেই অনবদ্য জীবন-ছন্দেরই উজ্জ্বল আনন্দঘন প্রকাশ।

বাঙালীর উৎসব একটি সুষম জীবনের অভিব্যক্তি

'তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোন ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী পসারীরা গতিবিধি শুরু করিত। অন্তঃপুরে কুম্ভকার-পত্নী নূতন বরণ-ডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা

ঘষিয়া আল্‌তা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনী মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত; এবং বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী স্বহস্ত-কর্তিত কয়গাছি পৈতার স্থতা আনিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া গল্প করিতেন।' প্রাচীন বাংলার উৎসবের এই অতি স্থলভ চিত্রের অন্তরালে চলতো যে আত্মিক আদান-প্রদান, তা অদৃশ্য শুভেচ্ছা ও মঙ্গল-কামনারই অনবদ্য দ্যোতক।

প্রাচীন বাংলার প্রাণবন্ত উৎসব-চিত্র

বাংলার প্রচলিত উৎসবগুলিকে চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়: এক. ধর্মীয় উৎসব; দুই. ঋতু উৎসব; তিন. সামাজিক উৎসব এবং চার. জাতীয় উৎসব। যুগ যুগ ধরে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান—নানা ধর্মের উপাসকদের সহাবস্থান এই বাংলাদেশে। তাদের ধর্মীয় উৎসবের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের উৎসবগুলির মধ্যে নববর্ষে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা দিয়ে বর্ষারম্ভ স্থচিত হয়। তারপর দশহরা, রথযাত্রা, রাখি-পূর্ণিমা, মনসা-পূজা, বিশ্বকর্মা পূজার পর আসে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এই পূজায় জগজ্জননীর আরাধনা ও মাতৃ-বিসর্জনের মাধ্যমে বাঙালী সকলকেই অন্তরের মধ্যে পায়। পরবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমায় বাঙালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজা আর তার পরের অমাবস্যায় শ্যামাপূজা এবং বাঙালীর দীপান্বিতা উৎসব। বহুবিচিত্র আতসবাজি এবং সারি সারি প্রদীপের আলোকে স্বর্গের দেবতাকে মর্ত্যের কুটিরে বরণ করে নেবার জন্যেই যেন এই দীপান্বিতা বা দীপালি উৎসবের পরিকল্পনা। কার্তিক পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার পর মাঘমাসে আসে সরস্বতী পূজা। বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয় অন্নপূর্ণা পূজা। তাছাড়া আছে মুসলমান সমাজের মহরম, ইদল-ফেতর, শবেরাৎ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বুদ্ধ-পূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান উৎসব। খ্রীস্টানদের বড় উৎসব বড়দিন, ইস্টার স্যাটার ডে, গুড্‌ ফ্রাই ডে ইত্যাদি নানা বিশিষ্ট উৎসব।

বাংলার ধর্মীয় উৎসব

ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রকৃতিরও ঘটে রূপের পরিবর্তন। প্রকৃতির সেই রূপসজ্জার বৈচিত্র্যই রচনা করে দেয় বাংলার উৎসবগুলির বর্ণোজ্জ্বল পটভূমি। অতি প্রাচীনকাল থেকে ঋতু-উৎসবগুলি বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বর্ষা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হতো বৃক্ষরোপণ উৎসব। তাছাড়া, বীজবপন, ধান্যরোপণ ইত্যাদি উৎসব তো ছিলই। বর্ষামঙ্গল, শেষ-বর্ষণ ইত্যাদি উৎসব আধুনিক সংযোজন। শরৎকালের শারদীয় উৎসব বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ঋতু-উৎসব। তারপর মাঠে মাঠে নতুন ধান পেকে উঠলে অনুষ্ঠিত হয় ধান্যচ্ছেদন। অগ্রহায়ণ মাসে হয় নতুন ধান্যে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে নানা স্থানে হয় পৌষ-মেলা, পিঠা-পার্বণ, তুষ-তুষালি উৎসব। ফাল্গুন মাসে প্রকৃতি যখন বর্ণাঢ্য রূপসজ্জায় সেজে ওঠে, তখন রঙের খেলা খেলবার জন্যে আসে হোলি। তারপর চৈত্রের শূন্য প্রান্তরে গাজনের বাজনা বাজিয়ে পুরাতন বছর বিদায় নেয়।

বাংলার ঋতু-উৎসব

বাংলার নানা সামাজিক উৎসবের বৈচিত্র্য তার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্যেরই প্রতিচ্ছবি। সারা বছর বাংলার ঘরে ঘরে উৎসব লেগেই থাকে। কী অফুরন্ত জীবনী-শক্তি, কী আশ্চর্য প্রাণ-প্রাচুর্য! অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ-শান্তি, জামাই-ষষ্ঠী, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া ইত্যাদিতে সেই প্রাণশক্তিরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। জন্মগ্রহণে উৎসব, মৃত্যুতে উৎসব, উৎসব জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। তাছাড়া, তার এই উৎসব-প্রাচুর্যের পশ্চাতে রয়েছে তার জাতীয় চরিত্রের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ কবির দেশ, গানের দেশ, কবি-ভাবনার দেশ। জীবনের অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব দিকটিও তার সেই কবিত্বের অবলেপনে অনবদ্য হয়ে ওঠে। তার প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্যে রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র উৎসব, প্রতিটি উৎসবের জন্যে রচিত হয়েছে স্বতন্ত্র সংগীত। এইখানেই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা থেকে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারা স্বতন্ত্র ও গৌরবশ্রীমণ্ডিত।

সামাজিক উৎসব

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বাঙালীর উৎসব-তালিকায় কয়েকটি নতুন উৎসব সংযোজিত হয়েছে। এই নবাগত উৎসবগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় জাতীয় মর্যাদা লাভ করেছে। তাদের মধ্যে প্রধান পনেরোই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতা দিবস ও ছাব্বিশে জানুয়ারী—ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। তাছাড়া, পঁচিশে বৈশাখ এবং তেইশে জানুয়ারী সমগ্র ভারতেই একটি সর্ব-ভারতীয় মর্যাদা লাভ করেছে। ধর্মীয় উৎসব, ঋতু-উৎসব ও সামাজিক উৎসব থেকে এই উৎসবগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।

জাতীয় উৎসব

বাংলার এই উৎসবময়তার পশ্চাতে ছিল প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং বাঙালীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণৈশ্বর্য। আজ আর সেদিনের বাংলাদেশ নেই। রাজনৈতিক চক্রান্তে বাংলাদেশ আজ দ্বিধা-বিভক্ত। রাজনৈতিক সীমারেখার দুই প্রান্তে আজও উৎসবের আহ্বান আসে। কিন্তু বাঙালীর অন্তরে আর সেদিনের মতো সাড়া জাগে না। নানা গুরুভার সমস্যার চাপে তার উৎসবগুলি আজ নিষ্প্রাণ। নাগরিক সভ্যতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠুর আক্রমণে তার উৎসবের আত্মা আজ তিরোহিত। আজ তার শুষ্ক, নীরস, প্রাণহীন, যান্ত্রিকতাময় উৎসবে প্রচুর মাইক্রোফোন আসে, হিন্দী গান বাজান হয় অসংখ্য, ঘটা করে মণ্ডপসজ্জা এবং আলোকসজ্জাও হয়। কিন্তু প্রাণ নেই। বহিরঙ্গ বিলাসে উৎসবের আত্মা আজ যেন গেছে হারিয়ে।

উপসংহার

'যেখানে শুকায় পদ্ম—বহুদিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;
যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার
কাঁকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর!'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাংলার উৎসব
- 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশে তবু রঙ্গভরা'
- বাংলার পূজা-পার্বণ

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ নববর্ষের দার্শনিক তাৎপর্য ॥ নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ॥ মানসিক তাৎপর্য ॥ নববর্ষের প্রতিশ্রুতি ॥ নববর্ষ উদ্‌যাপন : পল্লী-অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে ॥ উপসংহার ॥

৮
শুভ নববর্ষ

"পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী !"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'র অবসানে আমাদের জীবনের উদয়-দিগন্তে ঘটে নববর্ষের উদার অভ্যুদয়। চৈত্র-শেষের অন্ধ তমসাময়ী রাত্রির অন্ধকার-বক্ষ বিদীর্ণ করে নতুন বছরের যে শিশু-সূর্য ভেসে ওঠে পূর্ব দিগন্তে, তাকে বরণ করবার জন্যে আজ মর্ত্যের মানুষের আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশ সেজেছে মনোরম সাজে, প্রকৃতির মধ্যেও রূপসজ্জার অনবদ্য আয়োজন, পাখীর কণ্ঠে বেজে ওঠে পুলকিত বন্দনা-গীতি। আর, মানুষ বাজায় নতুন আশার অভিনন্দন-শঙ্খ। তারা আজ ঘর থেকে দলবদ্ধভাবে বাহির হয়ে অবারিত আকাশের নীচে ছুটে এসেছে। আজ তারা দেখবে, নববর্ষের শিশু-সূর্য তাদের জন্যে কী নতুন বাণী বহন করে এনেছে, কী নতুন আশ্বাস, কী নতুন প্রতিশ্রুতি! আজ দিগন্ত-প্রসারিত আকাশ কী মহিমময়! উদাত্ত-গম্ভীর বাতাস কী মধুময়! অমল সূর্যালোকে কী উদার আহ্বান!

নববর্ষের দার্শনিক তাৎপর্য

নৃত্যে মেতেছেন নৃত্যচপল নটরাজ। দু'হাতে তাঁর কালের মন্দিরা। মহাকাল তিনি! তাঁর এক পদপাতে ধ্বংস, অন্য পদপাতে সৃষ্টি। এক পদপাতে আবরণ, অন্য পদপাতে উন্মোচন। ধ্বংস ও সৃষ্টি, আবরণ ও উন্মোচন, বিদায় ও বরণ—এই দুইই তাঁর লীলা। পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে তিনিই আমাদের জীবনে নতুন বছরকে করবেন প্রতিষ্ঠিত। নৃত্যরত মহাকালের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ বেয়ে একটি বছর বিপুল অন্ধকারের 'কাল-সিন্ধুনীরে' পড়লো খসে। একবার ঘুরে গেল তার করধৃত রুদ্রাক্ষের মালা। পুরাতনের হাত ধরে আমরা এতদিন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ছিলাম, গতানুগতিকতার রুদ্ধশ্বাস ধূমাঙ্কিত কালিকে ভেবেছিলাম জীবনের অঙ্গীকার। কিন্তু নৃত্যরত নটরাজের নৃত্যের ছন্দ অনুভব করলাম অন্তরের অন্তঃস্তলে। তিনি পুরাতনের বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত করলেন, আমাদের চিরাভ্যাসের মেলাখানিকে তিনি দস্যুর মতো নির্দয় হাতে দিলেন ভেঙে-চুরে। আমরা পুরাতনের সেই ধ্বংসস্তূপের পরপারে আজ প্রত্যক্ষ করলাম নববর্ষের নবোদিত সূর্যের পরম আশ্বাস-ভরা রূপ।

'গমন করে' বলেই আমাদের এই পৃথিবীর আর এক নাম 'জগৎ'। এই পৃথিবী আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ছন্দে অনাদ্যন্ত রবে ছুটে চলেছে সূর্য-পরিক্রমার পথে। আবার, সূর্যও মহাকাশে তার বিশাল গ্রহ-পরিবার নিয়ে কোন

মহাসূর্য-পরিক্রমার পথে সঞ্চরমান। নববর্ষে পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণ-ব্রত একবার সমাপ্ত হলো। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, প্রাচীন মিশরে নীলনদের বন্যা এবং তার সমকালীন আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি থেকে মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বের প্রথম পঞ্জিকা সৃষ্টি করেন। প্রাচীন কালে ভারতে অগ্রহায়ণ মাসকেই বলা হতো বর্ষারম্ভ। 'অগ্র' অর্থাৎ প্রথম, 'হায়ণ' অর্থাৎ বছর। অগ্রহায়ণকে মনে করা হতো বছরের প্রথম মাস। কিন্তু কালক্রমে এ দেশের দরিদ্র, ঋণজর্জর কৃষক-সমাজের মহাজনের দেনাপাওনা মেটাতে এসে পড়তো বৈশাখ মাস। এই সময়ে 'বিশাখা' নামক নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থিতি। তাই বৈশাখ মাস এসে সবলে কেড়ে নিল অগ্রহায়ণের নববর্ষ-গৌরবের দাবী। নববর্ষের সিংহাসনে হলো বৈশাখের সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠা। কৃষকদের ঋণশোধের চালচলন দেখে মহাজনেরাও এই মাসটিকে ধরে নিলেন বর্ষারম্ভ—তথা দেনাপাওনার লাভজনক হালখাতা।

নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূর্য প্রতিদিনই ওঠে, প্রতিদিনই পৃথিবী তার আলোকের ঝরনা-ধারায় স্নান করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নববর্ষের দিনটিও প্রতিদিনের মতো একটি সাধারণ দিন মাত্র। কিন্তু মানুষ তাকে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দান করে হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করেছে নববর্ষের সিংহাসনে। মানুষ এই-যে তার 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে এই দিনটিকে সুন্দর করে রচনা করে নিয়েছে, তা পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেবার জন্যে, গতানুগতিক প্রাত্যহিকতার জীর্ণ বন্ধন ছিন্ন করে জীবনের শুভ কর্মপথে নির্ভয়-প্রাণে চলবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্যে।

মানসিক তাৎপর্য

বর্ষ-পরিক্রমার পথে এই দিনটি যে স্মরণীয়তা লাভ করেছে, তাতে সে তার গুরুত্বের পূর্ণ মূল্যে প্রতিষ্ঠিত। সারা বছর ধরে আমরা নিজেদের প্রয়োজনবোধের সীমিত পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র 'অহং'-এর পূজা করি। নিজেদের চারদিকে স্বার্থপরতার একটি দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে আমরা বৃহৎ সংসার থেকে, মহাবিশ্ব-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি। নববর্ষের পুণ্য-প্রভাতে আমরা স্বার্থমগ্নতার ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে মহাজীবনের উদার সান্নিধ্য অনুভব করি। আমাদের হৃদয় আজ নবোদিত সূর্য-রশ্মির মতো আকাশের দিকে দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ুক। সম্মিলিতভাবে আমরা সকলে সমাগত নববর্ষের কাছে প্রার্থনা করি: 'তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান কর!—বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান কর! আজ উৎসবের দিন, শুদ্ধমাত্র ভাব-রসের সম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তি-সংগ্রহের দিন।'

নববর্ষের প্রতিশ্রুতি

বাংলার পল্লী-অঞ্চলের কোথাও কোথাও নববর্ষের বেশ বর্ণাঢ্য মেলা বসে। মেলার আনন্দ-উৎসবে, মেলামেশার অম্লান খুশিতে এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়িক লেনদেনে নববর্ষ মুখর হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ীদের নানা বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানে

হালখাতার শুভ মহরৎ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা। আমন্ত্রিত ক্রেতাদের মিষ্টান্ন সহযোগে আপ্যায়িত করে সূচিত হয় নববর্ষের শুভ বিক্রয়ারম্ভ। তাছাড়া, দরিদ্র-ভোজনে, নৃত্য-গীতে, শোভাযাত্রায়, সভাসমিতিতে, খেলাধূলায়, আনন্দ-অনুষ্ঠানে ও প্রমোদ-উৎসবে সূচিত বর্ষের প্রথম দিনটি অনবদ্য হয়ে ওঠে। শহরাঞ্চলে নানা গীত-বাদ্যযোগে প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে এই দিনটির শুভ সূচনা হয়। পল্লীতে পল্লীতে নববর্ষ-উদ্‌যাপনের জন্যে রচিত হয় সুসজ্জিত উৎসব-মণ্ডপ। তাতে অপরাহ্নে হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পতাকা-অভিবাদন। তাছাড়া, ঐদিন সবান্ধবে চড়ুইভাতির আমন্ত্রণ তো আছেই। রঙে, রসে, আনন্দে সারা বাংলাদেশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে উৎসবের এক পরিপূর্ণ মহিমায়।

নববর্ষ উদ্‌যাপন : পল্লী-অঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে

সারা বছরের অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে, তার চিরায়ত দারিদ্র্যের মধ্যে কোথায় লুকানো ছিল এত রূপ, এত আনন্দ? বাঙালী সারা বছরের মধ্যে কখনো তার অন্তরের এই রূপটির পরিচয় পায় নি। আজ পুরাতনের গ্লানিময়, স্বার্থকলুষময় একটি জীর্ণ আবরণ খসে গিয়েছে, তার অনাবৃত অন্তরলোক আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নববর্ষের প্রভাতের নবীন সূর্যালোকে। সেই নতুন আলোকে সে আজ লাভ করবে তার আত্মদর্শন, লাভ করবে তার অন্তরের নির্ভুল পরিচয়। তৃপ্ত মনে, দৃপ্ত চেতনায় সে আজ চিত্ত ভরে বরণ করে নেবে নববর্ষের কল্যাণদীপ্ত বাণী। সেই বাণী হলো মানবতার বাণী, প্রেমের বাণী, মৈত্রীর বাণী। অন্তরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-বিষকে বিদায় দিয়ে আজ সেখানে জলে উঠুক মিলনের দীপশিখা। দূর হোক অন্তরের কালিমা, সেখানে আজ নেমে আসুক দেবতার স্বর্গীয় সুষমা। নববর্ষ আজ আমাদের ললাটে এঁকে দিক প্রেমের জয়টিকা।

আধুনিক যুগে যান্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাস থেকে নববর্ষ-অনুষ্ঠানটিও মুক্তি পায়নি। নাগরিক সভ্যতার হৃদয়হীন যান্ত্রিকতা এই অনুষ্ঠানের কল্যাণময়তার দিকটিকে গ্রাস করেছে। নববর্ষের অরুণোদয়ের আগে থেকে বিকট যান্ত্রিক আওয়াজে 'লাউড্-স্পীকারে' বাজতে থাকে চটকদার সিনেমার গান। এতে বাঙালীর হৃদয়-দৈন্যের নগ্ন দিকটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আমরা যে অন্তরে-অন্তরে এমন দেউলে হয়ে পড়েছি, তা আগে কে জানতো? কিন্তু বাহিরের চোখ-ঝলসানো চাকচিক্যের মধ্যে নববর্ষের সার্থকতা নয়, এর সার্থকতা আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছার বিনিময়ে।

উপসংহার

'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।' আমাদের নববর্ষের উৎসবে কবে সেই কল্যাণী-ইচ্ছার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বর্ষবরণ উৎসব
- আমাদের নববর্ষ উৎসব
- নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠান

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয়। বাংলার সংস্কৃতির মূল-সূত্র। ধর্ম: বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। লোক-সাহিত্য। লোক-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। কারুশিল্পে বঙ্গ-সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর। বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর। বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট। উপসংহার।

৯

বাংলার সংস্কৃতি

গো. প্রা. '৬৪

ভূমিকা

সংস্কৃতি হলো জাতির চিৎ-প্রকর্ষের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের সম্মিলিত যোগফল। জাতির যুগ-যুগান্তের স্বপ্ন ও সাধনা, তার ভাব-লোকের গৌরব-সমুন্নতি তিলে তিলে দান করে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির ধারা। সমগ্র জাতির চিন্তাধারা, ভাবধারা ও কর্মধারার গৌরবময় প্রতিচ্ছবিই হলো তার সংস্কৃতি। মানবীয় আচার-পদ্ধতি, শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পরিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবের সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অপূর্ব মনোভাবই তো সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি জাতির সর্ববিধ বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণাম-ফল।' কাজেই, সংস্কৃতির মুকুরে ধরা পড়ে জাতির এমন একটি মানস-প্রবণতা, এমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানময়তা, শিল্প-সাহিত্যের এমন কারুকৃতি, ধর্মের ভাব-প্রেরণা ও ঐতিহ্যের চরম সমুন্নতি, যা জাতির আনন্দময় অবচেতন মনের সামগ্রিক প্রয়াস, যা যুগ-যুগান্তরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। সংস্কৃতি সমগ্র সমাজের যৌথসৃষ্টি, সম্মিলিত সফলতা, জাতির প্রাণচ্ছন্দের চিন্ময় ও কর্মময় অভিব্যঞ্জনা। কাজেই, সংস্কৃতির ইতিহাসের স্বর্ণ-তারেই বেজে ওঠে সমগ্র জাতির কল্লোলিত মর্মর-ধ্বনি।

সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয়

'সংস্কৃতি'র মধ্যে আছে যেন সামগ্রিকতার সমানাধিকার, তেমনি আছে তার 'কৃতি' বা কৃতিত্বময়তার দিক। যে জাতি বেঁচে আছে, সে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে চলেছে একটি জীবন্ত সংস্কৃতির বহমান ধারা। সংস্কৃতিই জাতীয় প্রাণময়তার সামগ্রিক অভিব্যক্তি। মানুষ তার কথায়-বার্তায়, চলনে-বলনে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, খেলাধূলায়, আমোদ-প্রমোদে প্রতি মুহূর্তে তার বিচিত্র সংস্কৃতি-ধারা রচনা করে চলেছে, রক্ষা করে চলেছে সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবহমানতা। যে জাতির সংস্কৃতির রূপান্তর নেই, নেই ক্রম-বিবর্তন, তার সংস্কৃতি মৃত, সেই জাতিও মৃত। কারণ, সংস্কৃতির মধ্যেই নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সমগ্র জাতির প্রাণের হৃৎস্পন্দন।

বাংলার সংস্কৃতির সৃষ্টি ও বিকাশের মূলে রয়েছে তার অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য এবং তার প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্য। সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার নিবিড় যোগ-বন্ধন থাকা সত্ত্বেও তা তার স্বতন্ত্র প্রাণ-রসের সফল অভিব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র্য-মণ্ডিত, 'আপনাতে আপনি বিকশিত।' সর্ব-ভারতীয় প্রাণ-গঙ্গা যেমন বাংলাদেশের কোমল মৃত্তিকা স্পর্শ করে পদ্মা ও ভাগীরথী নাম পরিগ্রহ করেছে, তেমনি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারা বাঙালী মনীষার বিশিষ্টতায় এবং হৃদয়াভিব্যক্তির

অনন্যতায় স্বতন্ত্র বাঙালী সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কাজেই, কেবল অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-গোষ্ঠীই নয়, এখানে 'শক হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।' সর্বশেষে এসেছে 'প্রবল ইংরাজ'। বাঙালী কাউকেই দূরে সরিয়ে রাখেনি। সকলের সংস্কৃতির তিল তিল সোনা সংগ্রহ করে সে রচনা করেছে তার সংস্কৃতির অনবদ্য তিলোত্তমা-মূর্তি। সে সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির কমলমণির ওপর সংযোজিত করেছে তার স্বাতন্ত্র্যের দ্যুতি। বাঙালী সংস্কৃতি তাই সর্ব-ভারতীয় সংস্কৃতির উপধারা হয়েও পৃথক্‌, স্বতন্ত্র।

বাংলার সংস্কৃতির মূল-সূত্র

বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র হলো তার ধর্ম। ধর্ম যেমন তার সমাজের চালক-শক্তি, তেমনি ধর্মকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির এক বিশাল ধারা। সেই ধর্ম লৌকিক ও পৌরাণিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে রচিত। লৌকিক দেব-দেবী ও পৌরাণিক দেব-দেবী এখানে যুগ যুগ ধরে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। সহাবস্থানের ফলে তাঁরা কখনো কখনো অভিন্ন হয়ে পড়েছেন। চণ্ডী, ষষ্ঠী, মনসা, ধর্মঠাকুর, ওলাবিবি—ওঁদের নিয়ে রচিত হয়েছে নানা মূর্তি, নানা চিত্র এবং লোক-সাহিত্যের বিশাল ধারা। সেই লোক-সাহিত্যের বিশাল দর্পণে ধরা পড়েছে সমগ্র সমাজের অব্যর্থ রূপচিত্র।

ধর্ম: বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় তার লোক-সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। শিবায়ন-মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা-পাঁচালী ও কবিগানে, বাউল-ভাটিয়ালি-জারি-সারি-মুর্শিদা ও কীর্তনের গানে বেঁচে আছে বাঙালীর অফুরন্ত প্রাণসত্তা। ফুল্লরা-খুল্লনা, বেহুলা-লখীন্দর, কালু-লখ্যা, মেনকা-উমা, মহুয়া-মলুয়া, লীলা-কঙ্ক, সোনাই-কাজলরেখা—এরা আমাদের প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি। এদের মধ্যে রয়েছে যেমন বিপুল বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি, তেমনি আছে অশ্রু-ধারার অফুরন্ত উৎস। এ সবের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতির মর্মের রুদ্ধ দুয়ার যেভাবে উন্মুক্ত হয়েছে, তেমন অন্য কিছুতে হয়নি। এদের আশ্রয় করে বাঙালী যত কেঁদেছে, তার তুলনা আর কোন জাতির ইতিহাসে নেই। সেই রূপসৃষ্টির অপূর্ব মায়া-কাজলে অপরূপ হয়ে উঠেছে তার ব্রতকথা, রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়াগুলি। সংস্কৃতির স্বর্ণপাত্রে পরিবেশিত হয়ে এগুলি প্রবাহিত হয়ে এসেছে যুগ থেকে যুগান্তরের ঘাটে। সামাজিক নানা পরিবর্তনের মধ্যেও তাদের দীপ্তি আজও অম্লান, ভাস্বর।

লোক-সাহিত্য লোক-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি

বঙ্গ-সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর রয়েছে তার গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতিতে, তার স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও মৃৎশিল্পে। বাঙালী কারিগরের মতো আট-চালা নির্মাণের নৈপুণ্য আর কারো নেই। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, কালীঘাটের অঙ্কিত পট, বাংলার মেয়েদের আঁকা আল্‌পনা, নক্সী-কাঁথা আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া, হাঁড়ি-কলসী, বাসন ও বস্ত্রে সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে, স্বর্ণকারদের জড়োয়া-শিল্পে, শীতলপাটি-মাদুর, মোড়া ও আসন-তৈরীতে বাঙালী সংস্কৃতির রয়েছে স্মরণীয় স্বাক্ষর। স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কারু-শিল্পে বঙ্গ-সংস্কৃতির অম্লান স্বাক্ষর

মতে, বাঙালী জাতির মতো ঢোল বাজাতে পৃথিবীর কোন জাতি পারে না। তার ঢাকে, ঢোলে, মৃদঙ্গে তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিত্য ধ্বনিত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম। দ্রাবিড়-অস্ট্রিক-ভোট ব্রহ্ম সংস্কৃতির মৌল প্রেরণায় এবং ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের প্রভাবে যে বাঙালী-সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল, দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে তার ওপর এসে পড়ে মুসলমান-সংস্কৃতি, বিশেষ করে স্থফী সাধনার প্রভাব। আজ বাংলার লোক-সংস্কৃতি তো হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি। তারপর অষ্টাদশ শতকে এলো ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবাহ। বাঙালী তাকেও বেঁধেছে নিবিড় যোগ-বন্ধনে। কিন্তু প্রাচীন বাংলার লোক-সংস্কৃতিতে লাগলো যে ভাঙনের নির্মম আঘাত, পল্লী-কেন্দ্রিক বঙ্গ-সংস্কৃতি সেই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হয়ে পড়লো নগর-কেন্দ্রিক এবং তার অফুরন্ত প্রাণ-উৎস ধীরে ধীরে এলো শুকিয়ে।

বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর

আজ বঙ্গ-সংস্কৃতি এসে দাঁড়িয়েছে চরম সংকটের মুখে। রাজনৈতিক চক্রান্তে আজ বাংলাদেশ দ্বিধা-বিভক্ত। দেশ বিভক্ত হয়েছে; রাজনৈতিক ছুরিকাঘাতে বাংলার প্রাণ-প্রবাহিনী পদ্মাও হয়েছে বিভক্ত। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বাঙালী তার সম্মিলিত সাধনার দ্বারা যে অনবদ্য সংস্কৃতির উপচার সাজিয়েছে, তা কি কখনো বাইরের চক্রান্তে বিভক্ত হতে পারে? বঙ্গ-প্রেমিকের আজ তাইই একমাত্র আশা-ভরসা, তাইই একমাত্র সান্ত্বনা। আজ দেশ-বিভাগের সীমারেখার ওপারে কাঁদছে মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার দল, এপারে কাঁদছে ফুল্লরা-বেহুলা-খুল্লনার দল। ওপারে ভাটিয়ালি, এপারে বাউল। তার ওপর আজ এসে পড়ছে প্রবল মার্কিনী প্রভাব। যা অবশিষ্ট ছিল, উৎকট যান্ত্রিকতার বিষ-নিশ্বাসে এবং মার্কিনী সংস্কৃতির অগ্নিশিখায় তা ভস্মীভূত হতে চলেছে। ভিতরের ও বাইরের আঘাতে বাংলার সংস্কৃতি আজ ক্ষতবিক্ষত, বিপর্যস্ত।

বঙ্গ-সংস্কৃতির সংকট

রবীন্দ্রনাথ তাই একদিন সখেদে বলেছিলেন—'সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে-প্রহরে, আর সেই সময়ে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।' তবু আশা করবো, বঙ্গ-সংস্কৃতি তার এই সংকট উত্তীর্ণ হবে, এই রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করবে আগামীকালের প্রাণোচ্ছল, উজ্জ্বল বঙ্গ-সংস্কৃতি ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- বাঙালীর সংস্কৃতির পরিচয়
- বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ-রূপান্তর
- বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, গৌ. প্রা. '৬৪

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ কলকাতায় প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ॥ কলকাতায় বর্ষার আগমন॥ বর্ষায় কলকাতার রাস্তার দৃশ্য॥ শিশুর ...॥ কলকাতার বর্ষায় নাগরিক জীবন॥ আলোকের পেছনে অন্ধকার॥ অন্ধকারের ইতিকথা॥ উপসংহার॥

১০ কলকাতায় বর্ষা

"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

ঋতুতে ঋতুতে বঙ্গ-প্রকৃতির যে বর্ণ-বিলাস, যে অনির্বচনীয় রূপবিস্তার, তা কলকাতার ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন সীমায়তন থেকে নির্বাসিত। নিষ্ঠুর পাষাণ-কায়া কলকাতা! বর্ষা-প্রকৃতির অপরূপ মোহিনী মায়া, যূথীবন-বিধৌত কুসুমাসার, শারদ-প্রকৃতির মোহন-সুন্দর বিগলিত স্বর্ণ-কান্তি ও অমলিন শিউলি-সুরভি, শীতের কুয়াশা-গুন্ঠিত বৈধব্য-মূর্তি, মায়াবী বসন্তের গন্ধবিভোর রূপাভিসার ও তার রক্তিম প্রগল্‌ভতার এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এখানে কেবল মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তার, পাষাণপুরীর হৃদয়হীন মরুমায়া! আমরা সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অলকাপুরী থেকে মরু-যন্ত্রণাময় রামগিরি শিখরে প্রভুশাপে চির-নির্বাসিত।

কলকাতায় প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ

তবু পাষাণপুরীর কঠিন নিষেধ লঙ্ঘন করে কলকাতার আকাশে নিদাঘ-সূর্যের ক্রোধ প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়ে, বর্ষার আকাশে মেঘের পর মেঘ জমে ওঠে, আকাশের নিবিড় নীলিমা ঘোষণা করে শরতের আগমন, উত্তরের হিম-শীতল বাতাস বয়ে আনে শীতের আবির্ভাব, আবার দক্ষিণের মৃদু-মন্দ সমীরণ জানিয়ে দেয় নব-বসন্তের শুভাগমন। সমস্তই রুটিন-মাফিক; সবই যেন কুণ্ঠিত, সীমাবদ্ধ এবং সংকুচিত। অনাদৃত, উপেক্ষিত ঋতুগুলি এখানে তাদের সৌন্দর্য-বিস্তারের সুযোগ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কলকাতাও ঋতুদের অবাধ আবির্ভাব পছন্দ করে না। বিবিধ রূপসজ্জায় সজ্জিত প্রকৃতিকে সে দ্বারের বাইরে নির্বাসিত রেখে লাভ-ক্ষতির হিসাবের অঙ্ক কষে মরে।

কলকাতায় বর্ষার আগমন

তবু ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন নিষেধ অমান্য করে কলকাতার আকাশে আবির্ভাব হয় নববর্ষার। 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি' গরজে গগনে গগনে।' আকাশের বিদ্যুৎ-বিকাশে ও বজ্র-নিঃস্বনে কলকাতায় বর্ষার শুভাগমন বিঘোষিত হয়। আষাঢ়ের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের নবোদয়ে সওদাগরী অফিসের হিসাব-রক্ষকের হিসাবের ভুল হয় কিনা জানি না; কিন্তু গ্রীষ্মের দাবদাহের পর নববর্ষার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শে কলকাতার ক্লান্তিকর নাগরিক জীবনে নেমে আসে একটা প্রশান্ত স্বস্তির ভাব। বর্ষার স্নিগ্ধ সজল আবির্ভাবে কলকাতার দুরন্ত জ্বালাময় পিচ-গলা দিনগুলির মরুমায়ার হয় অবসান।

কলকাতার আকাশে নবযৌবনা বর্ষা যখন অতি-ভৈরব-হরষে আবির্ভূত হয়, তখন তার জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভে ক্লান্ততপ্ত নাগরিক হৃদয়ে নেমে আসে এক

সংগীতময়, সুগভীর প্রশান্তি। বর্ষায় অবারিত সৌন্দর্য-বিস্তারের জন্যে এখানে বনভূমি নেই, নদ-নদী নেই, বিস্তীর্ণ প্রান্তর নেই। দিগন্ত এখানে কুণ্ঠিত, কারাগারের কয়েদীর মতো আকাশ এখানে সংকুচিত, ভুবনমনোমোহিনী বর্ষার আগমনও এখানে তাই অবগুণ্ঠিত। কিন্তু সেজন্যে কলকাতার বর্ষা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎ-বিকাশের মধ্যে কলকাতার আকাশে নববর্ষার আগমন সূচিত হয়। ধূলিঝড়ের যবনিকা অপসারিত করে কুণ্ঠিত বর্ষার নৃত্যচপল রূপ ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করে। গলির মুখে ঘোলা জল থই থই করে, জলে ভাসতে থাকে বড় বড় রাজপথ, পার্কগুলি যেন লেকের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছাতা ও বর্ষাতির ভিড়ে কলকাতার পথ-ঘাটের চেহারা যায় বদলে। পথচারীদের কেউ-বা গাড়ি-বারান্দার নীচে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে, কেউ-বা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ধোপদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাঁটুজল ভেঙে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। ভারী জাহাজের মতো শহরের বাসগুলি রাস্তার জলে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করে ভীষণ আক্রোশে চলে ছুটে। বিশেষতঃ 'ডবল ডেকার'গুলির জল ভেঙে অগ্রগমনের দৃশ্য সত্যিই উপভোগ্য। আরোহীরা কলকাতার রাস্তায় স্টীমার-ভ্রমণের আনন্দ লাভ করে। বাঁকা জলের আবর্ত-রেখা দোকানগুলির উপকূল স্পর্শ করে। পথচারীদের বেশবাস সিক্ত করে দিয়ে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বর্ষার আগমনে কলকাতায় শিশুদের মনেই আনন্দের জোয়ার আসে বেশী। তারাই প্রথমে ছড়া কেটে বর্ষার আগমনী গেয়ে উঠে: 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।' কেউ বৃষ্টিতে ভেজে, কেউ রাস্তার ঘোলাজলে সাঁতার কাটে, কেউ ভাসায় কাগজের ময়ূরপঙ্খী, কলার মোচার সপ্তডিঙা, কিংবা চটি-জুতার মধুকর। ময়ূরপঙ্খী-সপ্তডিঙা-মধুকরের সারি বাঁকা জলের স্রোতে হেলে দুলে সুদূর কোন্ কল্পনা-রাজ্যের উদ্দেশে ভেসে চলে।

বর্ষায় কলকাতার রাস্তার দৃশ্য

শিশুর দল

সমস্ত আকাশ কৃষ্ণ ধূসরিমায় ঢাকা। আকাশ ভেঙে চলে অবিরল ধারা-বর্ষণ। মেঘে মেঘে কখন বেলা হয়ে যায়, কেউ জানতে পারে না। কে যাবে অফিসে? যারা গেছে, তারা মাঝপথে বিপদে পড়েছে কিংবা অফিস থেকে ফেরার পথের দুর্ভাবনায় ব্যাকুল। যারা অফিসে যায় নি, তারা বাড়িতে মহানন্দে মেতে উঠেছে তাসখেলায়। স্কুল-কলেজের আজ বহু-বাঞ্ছিত 'রেনি ডে'। ছাত্রদের আজ অনধ্যায়। তাদের কেউ সিনেমায়, কেউ-বা খেলার মাঠে লাইন দিয়েছে। বাড়িতে খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজার ধুম। দোকানে তেলেভাজার গন্ধ। সমস্ত মিলে কলকাতার বর্ষণ-মুখর আকাশকে বড়ো মায়াময় করে তুলেছে। ঘরে-ঘরে আজ অলস আড্ডা, চায়ের দোকানে-দোকানে গল্পের মজলিস। বাহিরের ধারাবর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে রাজনীতি-অর্থনীতি-সাহিত্য-আলোচনার তুমুল তর্ক। তারই মাঝখানে একটি করুণ রাগিণীর মতো বেজে চলেছে রাস্তার রিক্সায় ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ।

কলকাতার বর্ষায় নাগরিক জীবন

বর্ষায় কলকাতার দিনগুলিও কালো মেঘের ধূসরিমায় ঢাকা। অতিবর্ষণের ফলে রাস্তাগুলি নদীর রূপ ধারণ করে। ফলে, তার যানবাহন-চলাচল বিপর্যস্ত হয়ে যায়। জলমগ্ন রাস্তার খানাখন্দগুলি যানবাহনের মরণ-ফাঁদ বিস্তার করে নিঃশব্দে ওত পেতে থাকে। গৃহে প্রত্যাবর্তন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গৃহমুখী মানুষকে আকাশের ধারাজলে স্নান করতে করতে রাস্তার হাঁটুজল ভেঙে বাড়ি ফিরতে হয়। পায়ের জুতোর ঘটে পদোন্নতি ; পরনের কাপড়েরই যত দুর্গতি। মহিলাদের অসুবিধার অন্ত থাকে না। ধোপদুরস্ত বাবুরা যখন ঠেলাগাড়িতে চড়ে জলমগ্ন রাস্তা পার হন, তখন একটি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। ঘরে ঘরে ভিজে ছাতা, বর্ষাতি আর ভিজা কাপড়ের স্তূপ। নবধারাজলে স্নানের আনন্দ প্রাসাদময়ী কলকাতার মুখে ফুটলেও দারিদ্র্য-পীড়িত ও অভিশপ্ত বস্তিগুলির চোখে জল আর ধরে না। ওপরের টালির চালা ভেদ করে ঝরতে থাকে বৃষ্টির জল ; ঠিক তখনই রাস্তার জল ঘরে ঢুকে চারদিক একাকার করে দেয়। রান্না-খাওয়া বন্ধ। নোংরা জলের আক্রমণ থেকে গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী ও বিছানাপত্র বাঁচাতে তখন বস্তিবাসীদের প্রাণান্ত হতে হয়।

আলোকের পেছনে অন্ধকার

প্রাসাদ-নগরী কলকাতার কলেবর যত বেড়েছে, তার লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তার জল-নিষ্কাশন-ব্যবস্থা তদনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি। তাই এই চিত্র বর্ষাকালের একটি চিরন্তন ব্যাপার। বর্তমানে সি. এম. ডি. এ. এর সমাধানে যত্নশীল। কিন্তু যারা বস্তিবাসী, স্টেশনের প্লাটফর্ম কিংবা ফুটপাত যাদের একমাত্র আশ্রয় এবং যারা রোজ আনে রোজ খায়, সেই ফেরিওয়ালাদের রুজিরোজগারের উপায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ফলে, তাদের অসুবিধার অন্ত থাকে না। রিক্সাওয়ালাদের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তারা এই সময় বেশ দু'পয়সা রোজগার করার সুযোগ পায়। এই হলো কলকাতার অন্ধকারময় জীবনের ইতিকথা।

অন্ধকারের ইতিকথা

প্রাসাদময়ী কলকাতায় বর্ষার মেঘ-সৌন্দর্য নেই, নেই বৃষ্টি-বাহার ; পত্র-মর্মর নেই, পক্ষী-কাকলি নেই, জলের কলধ্বনিও নেই—পল্লী-বাংলার বর্ষণ-সৌন্দর্যের কিছুই এখানে নেই। মেঘের 'পরে মেঘ জমে আকাশ আঁধার করে এলে কেউ মেঘদূত পড়ে না, দিদিমারাও আর বলেন না সেই চির-নতুন রূপ-কথার গল্প। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আর আকাশে ঘনায়মান মেঘের দিকে চেয়ে সুর করে ছড়া কাটে না—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।' শিবঠাকুরও এখানে আর বিবাহের সাজে সাজেন না। কলকাতা 'রাজধানী পাষাণ-কায়া'! তবু বাতায়ন-পথে শোনা যায় রবীন্দ্র-কাব্যের আবৃত্তি কিংবা বেতারে বর্ষার রবীন্দ্র-সংগীত। কলকাতার বর্ষার তাইই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য !!

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় ;

- কলকাতায় বর্ষা
- কলকাতায় বর্ষার রূপ

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ সাম্প্রদায়িকতা, দেশ-বিভাগ ও জাতীয় সংহতি॥ জাতিগঠনের উপকরণ॥ ভারত-সংস্কৃতি॥ স্বাধীন ভারতে শিক্ষার একদেশদর্শিতা॥ প্রাদেশিকতা॥ রাজনৈতিক দলাদলি॥ ভাষা-সমস্যা॥ উপসংহার॥

১৯

ভারতের জাতীয় সংহতি

'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে।'—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

আজ ভারতের ঘোর দুর্দিন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষ, আঞ্চলিক বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নানা বিষাক্ত বিদ্বেষের হিংস্র কার্যকলাপ স্ফীতকায় হয়ে আমাদের সংহতি-হত্যায় মেতে উঠেছে দিকে দিকে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রক্তাগ্নি-শিখায় ঘটে বহু মৃত্যু ও সংখ্যাতীত গৃহদাহ, আঞ্চলিক বিদ্বেষের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে ভস্মীভূত হয় আমাদের জাতীয় সম্প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের স্নিগ্ধ বাস-মন্দির, হরিজন-বিদ্বেষের রক্তাগ্নি-শিখায় রচিত হয় মনুষ্যত্বের অন্তিম চিতাশয্যা, রাজনৈতিক ছুরিকাঘাতে আর্তনাদ করে ওঠে আমাদের সংবিধানসম্মত নিরাপত্তাবোধ আর ভাষা-সমস্যার অবিরল রক্ত-মোক্ষণে রক্ত-লাঞ্ছিত হয় আমাদের পবিত্র জাতীয় সংগীত। এক কথায়, আজ আমাদের জাতীয় সংহতি বিপন্ন, আমাদের ঐক্যবোধ বহুধা-বিভক্ত।

সাম্প্রদায়িকতা, দেশ-বিভাগ ও জাতীয় সংহতি

'১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে আমাদের বহু-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এলো, কিন্তু তার সঙ্গে এলো দেশ-বিভাগ এবং অব্যবহিত পরে দুই রাষ্ট্র-সীমানার উভয় দিকে সুরু হলো বীভৎস নরহত্যা; দেখা দিল লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা। আমরা আশা করেছিলাম, আপসে স্বীকৃত দেশ-বিভাগের ফলে দুটি পৃথক্ রাষ্ট্র বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কারণ, ভৌগোলিক সংস্থানই শুধু নয়; ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা এবং অন্যান্য বহু বন্ধনেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। কিন্তু যা উচিত ছিল, তা হলো না। দেশ-বিভাগের পরবর্তী ঘটনাগুলিতে কেবল বিদ্বেষ ও তিক্ততাই সৃষ্টি হলো।' জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ-প্রচারিত দ্বিজাতি-তত্ত্বকে কোনকালে স্বীকার না করলেও পাকে-চক্রে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ স্বীকার করে নিল। ফলে, আকুমারিকা-হিমাচল ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ছুরিকাঘাতে হলো ত্রিধা-বিভক্ত। ধর্মকে রাজনীতির লেজুড়ে বেঁধে যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, তার ফল কিন্তু শুভ হয়নি। তাই দেশ-বিভাগের পরবর্তীকালের কাহিনী হলো ভেদ-বিদ্বেষ এবং হিংসা-তিক্ততার কলঙ্কিত ইতিহাস। এবং হবে 'তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।'

জাতি-গঠনের জন্যে প্রয়োজন কতকগুলি মৌলিক উপাদান। প্রথমতঃ, এক এবং অবিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক ভূখণ্ড। দ্বিতীয়তঃ, তার জনগোষ্ঠী। তৃতীয়তঃ, একটি সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন। চতুর্থতঃ, সাংস্কৃতিক ঐক্য। এই সাংস্কৃতিক ঐক্য-চেতনা

বা ভাবগত ঐক্যবোধ থেকেই জাতির জন্ম। তাই ভারত একটি 'নেশন' কিনা ? —একদা পরাধীন ভারতের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে প্রায়ই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। স্যার জন স্ট্রেচি থেকে শুরু করে সাইমন কমিশন পর্যন্ত সবাই ভারতের এক-জাতীয়তার দাবীকে বিদ্রূপ হেনে মন্তব্য করেছেন, ভারতীয়েরা প্রকৃতপক্ষে বহু জাতি ও বহু ধর্মের এক বিমিশ্র জনপিণ্ড। সাম্রাজ্যবাদীর কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি পায়নি ভারতাত্মার সন্ধান, দেখতে পায়নি ভারতের ভাবগত ঐক্যকে।

জাতিগঠনের উপকরণ

ভারতের মতো য়ুরোপও একই ভূখণ্ড। অথচ য়ুরোপ জন্ম দিয়েছে বহু জাতির ; আর, ভারতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে একটিমাত্র জাতি। 'নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা পরিধান' সত্ত্বেও ভারত 'বিবিধের মাঝে' প্রত্যক্ষ করেছে 'মহান্ মিলন'কে। সে 'একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।' আকুমারিকা-হিমাচল—এই বিশাল ভূখণ্ডে বিকশিত হয়েছে একটিমাত্র জাতি। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র থেকে কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী পর্যন্ত কেবল একটিমাত্র প্রাণ-ধারা প্রবাহিত। সেই প্রাণ-ধারাই ভারত-সংস্কৃতি। তাই-ই পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গে নানারূপে নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই-ই প্রকৃত ভারতবর্ষ, তাই-ই নানা পরিবর্তনের মাঝখানে অপরিবর্তনীয় ভারতীয়তা। সেই ভারত-সংস্কৃতিকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা হয় না এবং ভারতবর্ষকে না জানলে তার ঐক্যের সাধনাও নিষ্ফলা হতে বাধ্য।

ভারত-সংস্কৃতি

আজ ভারতব্যাপী যে জাতীয় অনৈক্য দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে বহু বিষয়ে আমাদের অদূরদর্শিতা ; আছে জাতীয় স্তরে গৃহীত কতকগুলি মূঢ়, হঠকারী সিদ্ধান্ত, দেশ-বিভাগ তাদের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া, আমাদের অত্যধিক বস্তুমুখীনতা অনুরূপ একটি ভ্রান্তিবিলাস। স্বাধীন ভারত তার বৈষয়িক ভাগ্য-পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে চেয়েছে কেবল ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং কারিগরি-বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের দর্শন-চর্চা, ইতিহাস-চিন্তা এবং ভাষা ও সাহিত্যালোচনাও তো জাতির ঐক্য-চেতনার নীরব কারিগর। তা নইলে এই বিশাল দেশে বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-চেতনার উন্মেষ হবে কি করে ?

স্বাধীন-ভারতে শিক্ষার একদেশদর্শিতা

তাছাড়া রয়েছে প্রাদেশিকতা, বৈষয়িক উন্নয়নে বৈষম্য এবং রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি প্রশ্ন এবং সেজন্যে বৈষয়িক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুবিবেচনা, দূরদর্শিতা ও সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। রাজ্যের শিল্প-চাকরি-ব্যবসায়ে কেবলমাত্র রাজ্যবাসীদেরই একচ্ছত্র অধিকার—এই সংকীর্ণ মনোভঙ্গি হবে আত্মহত্যারই নামান্তর। ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষম উন্নয়ন চাই, চাই সমান সচ্ছলতা।

প্রাদেশিকতা

সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ভারতে নানা রাজনৈতিক দল স্বীকৃত। কিন্তু সমস্ত দলকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে

তাদের কর্মধারা সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সেজন্যে পরিচ্ছন্ন নির্বাচন যেমন কাম্য, তেমনি কাম্য গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং রাজনৈতিক সহনশীলতা। কারণ, গণতন্ত্র বহুদিনের বহু সাধনার ফসল। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। তার যথেচ্ছ পরিবর্তন যেমন কাম্য নয়, তেমনি কাম্য নয় তার যথেচ্ছ ব্যাখ্যা। মনে রাখা দরকার, ভারতীয় সংবিধান জাতীয় সংহতির পবিত্র সংহিতা।

রাজনৈতিক দলাদলি

জাতীয় সংহতির নানা জটিল প্রশ্নের সঙ্গে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে নতুন একটি সমস্যা—ভাষা-সমস্যা যার নাম। এই ভাষা-সমস্যা বহুবার ভারত-ভাগ্যে বহন করে এনেছে বহু দুঃখ ও বেদনা। ভারত বহুভাষাভাষী দেশ। সংস্কৃত এবং ইংরেজি ছাড়া চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা সংবিধানে স্বীকৃত। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার সিংহাসনে অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্তে ভারতে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে সুতীব্র ভাষা-সমস্যা। অবশ্য, ত্রিভাষা-সূত্রে হিন্দীকে অহিন্দী-ভাষীদের কাছে ঐচ্ছিক করায় ভাষা-সমস্যা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আবার অতিরিক্ত হিন্দী-প্রীতির পরাকাষ্ঠায় ভারতময় সুপ্ত ভাষা-সমস্যাকে জাগিয়ে তোলার অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, বহু-ভাষাভাষী সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাকে বিকাশের সুযোগ দিলে সমাধান ত্বরান্বিত হবে।

ভাষা-সমস্যা

আমরা বিশ্বাস করি, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষাই দেশময় গড়ে তোলে নানা গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সুষ্ঠু ভূমি-সংস্কার ও কর্ম-সংস্থানের মধ্যস্থতায় জীবন-যাত্রার উন্নত মান অর্জিত হবে এবং দেশব্যাপী শিক্ষা-বিস্তারের ফলে গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার প্রাচীর ভেঙে ভেঙে পড়বে। তাহলে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি ভেদ-বৈষম্যকে পরাস্ত করে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা আর সুদূরপরাহত হবে না। আর, 'দেশ মানে তো কেবল মাটির দেশ নয়, সে যে মানব-চরিত্রের দেশ।' এই বোধ প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে। তখন ঐক্যসূত্রে বাঁধা জননীর স্নেহধন্য পুত্র-সংঘ মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে অনুতপ্ত, দুঃখদীর্ণ, বেদনা-বিহ্বল কণ্ঠে প্রার্থনা করবে: 'জননি, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে···এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতল-পাটির উপরে আমাদের ছোট-বড় সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদগদ আশীর্বাদের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের জাতীয় সংহতি
- ভারতের জাতীয় ঐক্য
- ভারতের জাতীয় সংহতির অন্তরায়গুলি দূর করিবার উপায়

১২
কল্যাণব্রতী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঃ ভারত

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ভারতে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র-গঠন ॥ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ॥ ভারত-রাষ্ট্রের কল্যাণাদর্শের প্রতিশ্রুতি ॥ কল্যাণাদর্শ ও শ্রমিক-সমাজ ॥ শিল্প-প্রতিষ্ঠান : জাতীয় আয় ॥ বিশ্ব-কল্যাণ ॥ উপসংহার ॥

ভূমিকা

সুদীর্ঘকালের দাসত্ব-মুক্তির পর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কল্যাণ-পূত গণতন্ত্র। এতকাল ভারতের অসহায় জনগণ নিষ্ঠুর বিদেশী শাসকের কাছে অত্যাচারিত এবং হৃদয়হীন স্বদেশী সমাজের কাছে নিগৃহীত হয়ে এসেছে। ভারতের সম্পদ কোন কালেই ভারতবাসীদের ভোগ-কল্যাণে নিয়োজিত হয়নি। তাইতো চিরকাল তারা সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে তারা স্বদেশে পরবাসীর মতো জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। এর চেয়ে পরিতাপের আর কি হতে পারে? বিদেশীরা ভারতবাসীদের প্রবঞ্চিত করে ভারতের সম্পদ যথেচ্ছভাবে শোষণ করেছে। তারা ভারতকে কামধেনুর মতো দোহন করে, তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে সাজিয়েছে নিজেদের স্বদেশকে। তাদের স্বদেশের কল্যাণ ভারতের কল্যাণের কণ্ঠরোধ করেছে। আর, ঠিক তখনই আমাদের সমাজপতিরা সমাজে ডেকে এনেছে ঘৃণ্য দলাদলি ; অকথ্য নিগ্রহে নিগৃহীত করেছে সমাজের লক্ষ-কোটি মূঢ়, ম্লান, অসহায় মানুষকে। সেই দলাদলির সুযোগে বিদেশীদের ভাগ্যে জুটেছে সৌভাগ্য ও সম্পদ ; আর, আমাদের ভাগ্যে জুটেছে দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা।

ভারতে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র-গঠন

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত প্রতিষ্ঠিত করেছে তার কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রাদর্শ। সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সাদর নিমন্ত্রণ, সমান প্রতিষ্ঠা, সমান অধিকার। এবার থেকে স্বদেশের সম্পদ আর বিদেশীর ঘর সাজাতে ব্যয়িত হবে না, স্বদেশের সরকারী কার্যাবলী আর কোন বিদেশী পার্লামেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করবে না। সকল জনগণের সর্বাত্মক কল্যাণের ভিত্তির ওপর আজ স্থাপিত হয়েছে ভারত-রাষ্ট্রের বিশাল সৌধ। তার শীর্ষে যে জাতীয় পতাকা উড়ছে, তাতে লাঞ্ছিত রয়েছে সুমহান্ অশোক-চক্র। এই অশোক-চক্র ভারতের পবিত্র সংবিধানের কল্যাণকামী রাষ্ট্রাদর্শের অম্লান প্রতীক।

প্রাচীন ভারতে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহামতি অশোক। সেই রাষ্ট্রে ছিল সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু বর্তমান ভারতের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রাদর্শ নানা দিক থেকে ভিন্ন। তার মূলে রয়েছে বহু অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের অবদান। ব্যক্তির কল্যাণ-কামনা থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রে যদি ব্যক্তি-স্বার্থ নিষ্পেষিত হয়, অবরুদ্ধ হয় মানুষের সার্বিক বিকাশের পথ, তবে মানুষ ইতিহাসের কোন্ সুদূর অতীতে বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে কেন রাষ্ট্র গঠন করেছিল?

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের এটাই হলো গোড়ার কথা। আবার, রাষ্ট্রই যদি মানুষের সকল কাজ সংসাধিত করে দেয়, তবে সংগ্রামী ব্যক্তি-মানুষেরই বা গৌরব কোথায়? সে যে অচিরকালের মধ্যেই রাষ্ট্র-নির্ভর জড় পুত্তলিকামাত্রে পরিণত হবে। যাঁরা কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র-গঠনের প্রবক্তা, তাঁদের মতে, রাষ্ট্রের কাজ হলো মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং অন্যায়-অবিচারের প্রতিরোধ-সাধন। কিন্তু এ সব তো কেবল পুলিশী-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপত্র। তার মধ্যে জনগণের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি কোথায়? সমাজতন্ত্রবাদীরা তাই বলেন, কেবল পুলিশী-ব্যবস্থার রূপায়ণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য নিঃশেষিত হলে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য জনগণের সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। কাজেই, তার জন্যে প্রয়োজন সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র

ভারত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে, ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে কল্যাণকামী রাষ্ট্রাদর্শের সুস্পষ্ট ঘোষণা। তাতে রয়েছে সম্পদ ও আয়-বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করবার, বেকারত্ব দূর করবার এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করবার সোচ্চার প্রতিশ্রুতি। নরনারী-নির্বিশেষে সকল শ্রমিক পাবে তাদের পরিশ্রমের ন্যায়সঙ্গত মূল্য। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অত্যধিক আয়ের বৈষম্য হ্রাস করা হবে। সকল নাগরিক যাতে উপযুক্ত কর্মলাভের সুযোগ পায়, অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ভাতা পায়, রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করবে। বৃদ্ধ বয়সে বার্ধক্য-ভাতা দানের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে করতে হবে। তাছাড়া, নারী-শ্রমিকেরা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাবে উপযুক্ত ছুটি ও ভাতা। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্র শিক্ষা-বিস্তার ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের করবে ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক অর্থ নৈতিক বিকাশের জন্যে রাখা হয়েছে উপযুক্ত রক্ষা-কবচ।

ভারত-রাষ্ট্রের কল্যাণাদর্শের প্রতিশ্রুতি

শিল্পায়তনগুলিতে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা-বিধানের জন্যে ভারতে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই আইনগুলিতে শ্রমিকদের মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রতি রাখা হয়েছে বিশেষ দৃষ্টি। কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত হলে কিংবা তার কর্মক্ষমতা লুপ্ত হলে উপযুক্ত ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর করা হয়েছে ধর্মঘট ও লক-আউট নিবারণের জন্যে ট্রাইবুন্যাল গঠনের ব্যবস্থা। তাছাড়া, ভারত শ্রমিক-সংঘ আইন প্রণয়ন করে শ্রমিক-সংঘ গঠনের পথও সুগম করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের উপযুক্ত বোনাস দানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কল্যাণাদর্শ ও শ্রমিক-সমাজ

ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারত-রাষ্ট্রে স্বাধীন ধর্মাচরণের পথও উন্মুক্ত। ভারত আজ সাম্রাজ্যবাদীর শাসনমুক্ত হয়েছে। এতদিন সাম্রাজ্যবাদ তার অধিবাসীদের দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে চালিয়েছে অবারিত নির্যাতন। ভবিষ্যতে তারা যাতে ধনতন্ত্রের

রথচক্রতলে পিষ্ট হয়ে না মরে, আজ ভারতে তার জন্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। শ্রেণী-বৈষম্য দূর করবার জন্যে নানারূপ প্রগতিশীল কর-বিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। আবার, বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ করতে না পারে, তারও সমুচিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া, সারা দেশে আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাস করবারও রয়েছে সোচ্চার প্রতিশ্রুতি।

শিল্প-প্রতিষ্ঠান : জাতীয় আয়

ভারত তার কল্যাণাদর্শ তার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নি। ভারতের জনগণের কল্যাণ সে চায়, সেই সঙ্গে চায় বিশ্বের সমগ্র মানব-জাতির বৃহত্তর কল্যাণ। বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়িত মানব-জাতির মুক্তি-সাধনায় সে রচনা করেছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। পৃথিবীর যেখানে যত অসহায়, নিপীড়িত মানুষ রয়েছে, তারা জানে, তাদের পাশে কেউ না থাকুক, ভারত আছেই। তারা জানে, ভারত বিশ্ব-কল্যাণের একজন সদা-জাগ্রত প্রহরী। তাছাড়া, ভারত বিশ্ব-শান্তি এবং নিরস্ত্রীকরণেরও একজন মহান্ প্রবক্তা। তার এই প্রেরণার মহান্ উৎস পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবটি আজ বিশ্ববাসী সসম্মানে গ্রহণ করছে।

বিশ্ব-কল্যাণ

কিন্তু বিগত জরুরী অবস্থায় ভারতের কল্যাণাদর্শ এক চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত হয়ে সব দিক দিয়ে ডেকে এনেছিল জাতির সর্বনাশ। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র সেদিন সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতালোভী কুখ্যাত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধী, পুঁজিপতি ও ধনিক-সমাজের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, তার শাসনযন্ত্রের সর্বস্তরে সেদিন বাসা বেঁধেছিল দুরপনেয় দুর্নীতি। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যকেও দুর্নীতির রাহু গ্রাস করেছিল। এইভাবে ভারতের রাষ্ট্রীয় কল্যাণাদর্শ যখন কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে ধূলিলুণ্ঠিত হতে চলেছিল, যখন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে একনায়কতন্ত্রের কদর্য রূপ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল, তখনই ভারতের গণতন্ত্রপ্রেমী জনগণ নিঃশব্দ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে এবং তার কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রীয় আদর্শকে স্বমহিমায় পুনঃস্থাপিত করে। সমগ্র বিশ্ব আজ তার গণতান্ত্রিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণাদর্শকে সম্মান জানায়। গণতন্ত্র মানে যে শ্রেণী-বিশেষের গণতন্ত্র নয় এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণ মানে যে শ্রেণী-বিশেষের কল্যাণ নয়—আজ একথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার দিন এসেছে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে জনকল্যাণ
- স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রাদর্শ
- কল্যাণকামী রাষ্ট্র : ভারত
- ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ

১৩

নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ রাষ্ট্রীয় অধিকার : পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার ॥ অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ॥ কর্তব্য : রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, দেশরক্ষা, আইনরক্ষা ও করপ্রদান ॥ ভোটাধিকার ॥ ব্যক্তিস্বার্থ বনাম রাষ্ট্রস্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা ॥ উপসংহার ॥

ভূমিকা

নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর কেন্দ্র-বিন্দু। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধের সুষ্ঠু রূপায়ণের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রীয় ইমারত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রমাত্রেই নাগরিকদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পাশাপাশি সহাবস্থান করে কতকগুলি পবিত্র ও মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই সমস্ত অধিকার সংরক্ষণের জন্যে রাষ্ট্রের হলো সদা-জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা এবং সংবিধান হলো তার পবিত্র সংহিতা। রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বে প্রত্যেক নাগরিক তার পবিত্র অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্র দেয় সেই সমস্ত অধিকার-সংরক্ষণের রক্ষা-কবচ। বিনিময়ে নাগরিককে দিতে হয় কতকগুলি পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য উদ্‌যাপনের প্রতিশ্রুতি। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের হলো নিরপেক্ষ মধ্যস্থতার ভূমিকা। অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করলে সংবিধানানুসারে যে-কোনো নাগরিকই দণ্ডনীয়। আবার, রাষ্ট্রের নামে যদি নাগরিকের অধিকার খর্ব হয়, তবে তাও দণ্ডনীয় অপরাধ। এই দ্বি-পাক্ষিক আদান-প্রদানের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং নাগরিক-সাধারণের আত্মিক বিকাশ।

রাষ্ট্রীয় অধিকার : পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্র-স্বীকৃত অধিকারগুলিকে দু'ভাগে বিন্যস্ত করা হয় : এক. পৌর অধিকার এবং দুই. রাজনৈতিক অধিকার। পৌর অধিকারগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র আমাদের দিয়েছে জীবন-রক্ষণের অধিকার, সম্পত্তি-গঠন ও সম্পত্তি-সংরক্ষণের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার অধিকার; আর দিয়েছে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা, কর্তব্য-সম্পাদনের স্বাধীনতা এবং শিক্ষালাভের স্বাধীনতা। এই পৌর অধিকারগুলির সঙ্গে কতকগুলি রাজনৈতিক অধিকারও স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেগুলি হলো : ভোট-প্রদানের অধিকার, সরকারী চাকুরী-লাভের অধিকার, সরকারের কাছে আবেদন করবার অধিকার ইত্যাদি। রাষ্ট্র-প্রদত্ত অধিকার-বাহুল্য ও অধিকার-বৈচিত্র্যই রাষ্ট্রের প্রগতিশীলতা ও কল্যাণ-নিষ্ঠতার পরিচায়ক।

অধিকার-ভোগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যেখানে অধিকার,

সেখানেই দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিককে দিয়েছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার। নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের প্রতিদানে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো অন্য নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। নাগরিকের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রতি রয়েছে নাগরিকের নানা পবিত্র এবং দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য। আসল কথা হলো, বিনা-প্রতিদানে কোন অধিকার ভোগ করা যায় না।

অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত

যে রাষ্ট্র সুখশান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে বহুতর মূল্যবান ও পবিত্র অধিকার স্বীকার করে নেয়, তার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য স্বীকৃতি প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকেরই কর্তব্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবার জন্যে সকল নাগরিককেই কৃতসংকল্প হতে হবে। নাগরিক-সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্যে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্র যে সব আইন প্রণয়ন করে, সকল নাগরিকের সেই সকল আইন মেনে চলা চাই। শাসন-যন্ত্র পরিচালনার জন্যে সরকার যে করারোপ করেন, নিয়মিতভাবে সেই কর-প্রদানও নাগরিকদের কর্তব্য। মোট কথা, অধিকার ভোগের জন্যে নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু করভারে নাগরিক-সাধারণের জীবন যাতে জর্জরিত না হয়, তাও প্রত্যেক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের লক্ষণীয়। করারোপ যদি দুঃসহ কর-পীড়নে পরিণত হয়, তবে তাতে রাষ্ট্র ও নাগরিকের জীবনে ঘনিয়ে আসে বড়ো দুঃসময়।

কর্তব্য ঃ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য, দেশরক্ষা, আইনরক্ষা ও করপ্রদান

ভোটাধিকার আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রের একটি পবিত্র অধিকার। রাষ্ট্রীয় শাসক-গোষ্ঠী-নির্বাচনে অংশগ্রহণের দায়িত্ব এই অধিকারবলে স্বীকৃত। তাই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নাগরিক তার বাঞ্ছিততম ব্যক্তিকেই শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তার এই অতি মূল্যবান অধিকার প্রয়োগ করবে, তাইই কাম্য। কারণ, অযোগ্য ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতারূঢ় হলে প্রত্যেক নাগরিককেই নানা দুঃখকষ্টের ফলভোগী হতে হবে। আবার, শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে নাগরিকদের জীবনে ঘনিয়ে আসে ঘোরতর দুর্দিন। কেবলমাত্র দায়িত্বশীল, সচেতন নাগরিকদের সদাজাগ্রত অধিকার ও কর্তব্য-বোধের দ্বারা স্বৈরতন্ত্রের অবদমন সম্ভব।

ভোটাধিকার

সকল নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কেন্দ্রস্থলে থাকবে জনসেবা, দেশসেবা ও রাষ্ট্রসেবা। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির কল্যাণও সংসাধিত হয়। কাজেই, ব্যক্তিস্বার্থ নয়, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণই প্রত্যেক নাগরিকের কাম্য। নিরুপদ্রব জীবনযাপন এবং আত্মিক বিকাশের সকল সুযোগকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই বিচারবুদ্ধির স্ফুরণ, আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তির অবদমন, অজ্ঞতা, উদ্যমহীনতা ও সংকীর্ণ দলাদলি বর্জন এবং আত্মবিকাশের অনুকূল শিক্ষা গ্রহণ। বৃহত্তর কল্যাণের ক্ষেত্র থেকে অপসৃত হয়ে নাগরিকেরা যদি নিরুদ্যম জড়তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, তবে পবিত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার ঘটবে অপঘাত মৃত্যু।

স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী নাগরিকদের উদ্যমহীন জড়তার সুযোগ নিয়ে যাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপহরণে উন্মত্ত হয়ে উঠতে না পারে, যাতে রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তি-স্বার্থকে লুণ্ঠন করতে না পারে, তার জন্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধগুলিকে সদা-জাগ্রত রাখতে হবে। আবার, রাষ্ট্রস্বার্থ তথা সমষ্টি-স্বার্থের জন্যে ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া অবশ্যই কাম্য। কিন্তু যখন রাষ্ট্র মুষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষার জন্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠের স্বার্থ পদদলিত করে, তখন বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়বোধের আলোকে সমগ্র পটভূমিটির পর্যালোচন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নাগরিক-সাধারণের নিষ্ক্রিয়তায় উদ্যমশীল সক্রিয় মুষ্টিমেয় নাগরিকদের হাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠরা শোষিত এবং লাঞ্ছিত হতে পারে। তখনই গণতন্ত্রের শিথিল কাঠামো ভেদ করে স্বৈরাচারী একনায়ক-তন্ত্রের কংকাল আত্মপ্রকাশ করে বীভৎসভাবে। তখনই নির্লজ্জ ব্যক্তিপূজা ও ফ্যাসিজ্‌মের হিংস্র নখরে গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গ থেকে শুরু হয়ে যায় অবারিত রক্তমোক্ষণ।

ব্যক্তিস্বার্থ বনাম রাষ্ট্রস্বার্থ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা

সুদীর্ঘ দু'শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে বহু-প্রত্যাশিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ। আজ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু পিছনে ফেলে গেছে এক মহাশ্মশানের ধ্বংসস্তূপ। নিদারুণ দারিদ্র্য এবং বেদনাবহ নিরক্ষরতা সারা দেশের মর্মমূলে বাসা বেঁধে আছে। তাই সচেতন নাগরিকতার অভাবে ভারতের গণতন্ত্র মুষ্টিমেয় ধনপতি-গোষ্ঠীর হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়তে পারে। সেই স্বার্থান্ধ ধনপতি-গোষ্ঠীর হাতে ঘটতে পারে আমাদের কষ্টলব্ধ গণতন্ত্রের অপমৃত্যু। সচেতন নাগরিকতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন নিরক্ষরতা-মুক্তি ও দারিদ্র্য-বিনাশ। যেখানে আজও জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত, সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপযোগী সচেতন ও সদাজাগ্রত নাগরিকতা কিরূপে সম্ভব? শিক্ষাহীন, বিত্তহীন নাগরিক ধনতন্ত্রের রথচক্রতলে পিষ্ট হবে, তাতে আশ্চর্য কি? দুঃখের বিষয়, ভারতের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এখনও উপযুক্ত জীবনধারণের মান লাভ করতে পারে নি; এখনও প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের জনসংখ্যার পঞ্চাশ-শতাংশকেও স্পর্শ করতে পারে নি। তার সুযোগ নিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন থেকে দীর্ঘ আঠারো মাস ভারতের বুকের ওপর জরুরী অবস্থা চেপে বসেছিল। সেই কুখ্যাত জরুরী অবস্থার আড়ালে চলেছিল নির্লজ্জ ব্যক্তিপূজা ও নানা দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ। কিন্তু ভারতের জনগণের সচেতন ও সদাজাগ্রত নাগরিকতাই একনায়কতন্ত্রের কারাগার থেকে ভারতের গণতন্ত্রকে নিঃশব্দ নির্বাচনের মাধ্যমে মুক্ত করে এনেছে। এই সাফল্যের কারিগর চির-উপেক্ষিত ভারতের জনগণ—তারা আজ বিশ্বের শ্রদ্ধার্হ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রে নাগরিকের কর্তব্য কি হওয়া উচিত?
- রাষ্ট্র ও নাগরিক
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নাগরিকের ভূমিকা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা ॥ সংবাদপত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ॥ সংবাদপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাস ॥ 'It is the people's Parliament always in session' ॥ উপসংহার ॥

১৪ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা

ক. প্রা. '৬৪

সংবাদপত্র বর্তমান পৃথিবীর বার্তাদূত। পূর্ব-দিগন্তে আলোকের বিজয়-ঘোষণার পূর্বেই সে বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করে আমাদের দুয়ারে এসে করাঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গেই গৃহবদ্ধ মানুষ এক মুহূর্তে তার চার দেয়ালের গণ্ডীবদ্ধ সমস্ত সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বিশাল পৃথিবীর উদার আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়। সংবাদপত্র দৈনন্দিন জীবনের সীমাবদ্ধ মানুষকে বিশ্ব-মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ করে দেয়। মানুষ স্বভাবতঃই সুদূরকে জানতে চায়, আপন হাতের মুঠোয় পেতে চায় বাইরের বৃহৎ বিশ্বকে। সংবাদপত্র তার সেই সুদূরের পিয়াসী আকাঙ্ক্ষাকে সফলতা দান করেছে। সংবাদপত্র মানুষের দুয়ারে বহন করে আনে সেই বাঞ্ছিত সুদূরকে, ঘরের প্রাঙ্গণে এনে উপস্থিত করে সুদূর বিশ্বকে।

ভূমিকা

তাছাড়া, আজ বিশ্বময় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সংবাদপত্র তার সদা-জাগ্রত প্রহরী। গণদেবতার বিচার-শালায় সে নিপীড়িত মানুষের পক্ষ সমর্থন করে। সর্বদা ন্যায় ও সত্যের মন্ত্রে সে করে জন-গণেশের পূজা। কোথাও জন-গণেশের পূজার ব্যাঘাত হলে, গণতন্ত্রের মর্যাদা ধূলিলুণ্ঠিত হলে সংবাদপত্রের নির্ভীক কণ্ঠ সেখানে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন তার কালো-কালো অক্ষরগুলি অগ্নি-শিখার মতো জ্বলে ওঠে, সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী গণতন্ত্রের শত্রুদের হৃদয় লক্ষ্য করে বুলেটের মতো ছুটে চলে, জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে সে ফিরে আসে বিজয়গর্বে। অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের, জয় হয় গণতন্ত্রের। লেখনী যে তরবারির চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী, তা সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় নতুন করে প্রমাণিত হয়। সংবাদপত্র তাই জনগণের পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের সদা-জাগ্রত প্রহরী।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার একটি অতি-প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সংবাদপত্র ছাড়া বর্তমান সভ্যতা অচল। সংবাদপত্র তাই বর্তমান সভ্যতার দৃষ্টিশক্তিস্বরূপ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানব-ভাগ্যে যখন দুর্দিন ঘনিয়ে আসে, তখন সংবাদপত্রই সেই দুঃসংবাদ গণ-দুয়ারে পৌছিয়ে দিয়ে ত্রাণকার্যকে করে ত্বরান্বিত। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অগ্নি-পরিধি, মহাসাগরের দুস্তর ব্যবধান কিংবা গিরি-কান্তার ও মরু-প্রান্তরের দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে সে সংগ্রহ করে আনে বিশ্ববার্তা। রোগজর্জর পৃথিবীর শিয়রে বসে সে মহাতাপসীর মতো অনুভব করে তার বক্ষঃস্পন্দন এবং পৃথিবীর মানুষের কানে

সংবাদপত্রের নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পৌঁছিয়ে দেয় তার সকল সংবাদ, দূর করে মানুষের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুল সংবাদ-তৃষ্ণা। বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ—সকল ক্ষেত্রেই তার অবাধ পদসঞ্চার। মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, তার ক্ষমতার অহংকার, তার পৈশাচিক উল্লাস, সরকার ও মানুষের নানা অসামাজিক ও দুর্নীতিপূর্ণ কার্যকলাপ—সকল বিবরণ এনে সে উপস্থিত করে মানুষের বিবেকের দরবারে, গণদেবতার নির্মম বিচারশালায়। আর, পৃথিবীর যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সেখানেই সংবাদপত্রের নির্ভীক ধিক্কার-বাণী ধ্বনিত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর লক্ষকোটি মূক কণ্ঠস্বরও প্রবল বিক্ষোভে সোচ্চার হয়ে ওঠে। শক্তিমদমত্ত অত্যাচারীর দল সেই প্রবল গণ-বিক্ষোভের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না। তখন ভীত, সন্ত্রস্ত অত্যাচারীর দল নতি স্বীকার করে সেই জাগ্রত জনমতের কাছে। অন্যায়ের পরাভবে ন্যায়ের মর্যাদা হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। পরাজিত হয় অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র, জয় হয় মানবতার। নির্ভীক সংবাদপত্রই সেই কৃতিত্বের কারিগর।

যুগ-প্রয়োজনেই সংবাদপত্রের প্রথম আবির্ভাব। যুগে যুগে তার সেই প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুগের অনিবার্য প্রয়োজনে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্বও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যুগের শিক্ষা ও সভ্যতা সংবাদপত্রের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কাগজ ও মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের মতো সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম গৌরবও চীনদেশের প্রাপ্য। ভারতবর্ষেও মোগল-রাজত্বকালে ছিল হস্তলিখিত সংবাদপত্রের সীমিত প্রচলন। একমাত্র প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যেই তার প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ। য়ুরোপে সংবাদপত্রের প্রথম আত্ম-প্রকাশ ঘটে ইতালি দেশে। বাংলাদেশে মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব সূচিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে। সেই সূত্রে বাংলা সংবাদপত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-লগ্নে আত্মপ্রকাশ করে শ্রীরামপুরের খ্রীস্টান মিশনারীদের হাতে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্রই আজ সংবাদপত্রের অবাধ পদসঞ্চার। সংবাদপত্রহীন আধুনিক জীবন সম্পূর্ণরূপে অচল, অসম্ভব ও অকল্পনীয়। বর্তমান ভারতে প্রচলিত সংবাদ-পত্রের মোট-সংখ্যা ১২,২১৮। তার মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭৬০ এবং তাদের বিক্রয়-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক দু' কোটি। স্বাধীন বাংলাদেশে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুখের ভাষা বাংলা। সেখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'ইত্তেফাক', 'গণকণ্ঠই' প্রধান।

সংবাদপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাস

সংবাদপত্র মহামানবের দরবার, গণদেবতার বিচারশালা। জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে গৃহীত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ ও তার সাফল্য বা ব্যর্থতার চিত্র গণদেবতার দরবারে উপস্থাপিত হওয়া চাই। সংবাদপত্র সেই চিত্র উপস্থাপনায় বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল মাধ্যম। কোথাও গণস্বার্থ পদদলিত হয়ে মুষ্টিমেয়ের স্বার্থ

স্বীকৃত হলে সংবাদপত্রের নির্ভীক কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাছাড়া, জনসাধারণের চিঠিপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে জাগ্রত গণমতকে প্রতিফলিত করে সে পালন করে তার পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব। এভাবে যখন সারা দেশে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে, তখন নীতিভ্রষ্ট স্বৈরাচারী সরকারকে নিরুপায়ভাবে শাসকের আসন থেকে নেমে আসতে হয়—গণদেবতার বিচার-শালার কাঠগড়ায় ন্যস্ত দায়িত্ব বহনে অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করে তাকে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে হয়। তাই মনে হয়, 'It is the people's Parliament always in session'—মন্তব্যটি সর্বতোভাবে সার্থক। সংবাদপত্র, আক্ষরিক অর্থেই, জনগণের সদাজাগ্রত লোকসভা।

'It is the people's Parliament always in session'

বর্তমান পৃথিবীতে সংবাদপত্রের এই ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু সংকটমুক্ত নয়। সংকটের নানা রাহুগ্রাসে নিপতিত হয়ে সংবাদপত্র মাঝে মাঝে তার পবিত্র দায়িত্ব বহনে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ভারতে বিগত জরুরী অবস্থায় সংবাদ-পত্রের ওপর সেন্সর-প্রথা চালু করে তার কণ্ঠরোধ করা হয়। কিন্তু নিন্দাকে রসনা থেকে নির্বাসন দিয়ে ভরাডুবির হাত থেকে যে বাঁচা যায় না, গত লোকসভার নির্বাচনই তার বড়ো প্রমাণ। তাছাড়া, সংবাদপত্রের প্রকাশনা আজ একটি লাভজনক ব্যবসায়। বলাবাহুল্য, অন্যান্য বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মতো সংবাদপত্র-প্রকাশন ব্যবসায়ও ধনিক-সমাজের কুক্ষিগত। সংবাদপত্রের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার জন্যে ক্ষমতারূঢ় শক্তিশালী শাসকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনে আত্মনিয়োগ করে থাকে। তাতে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যাবলীও সমর্থিত হয় এবং পবিত্র জনস্বার্থ নির্মমভাবে হয় পদদলিত। তখন জাতির সত্যিই বড় দুর্দিন। নানা কায়েমী স্বার্থের কাছে সংবাদপত্র তার নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার মাত্রাকে তোলে আরও বাড়িয়ে। যেখানে 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', সেখানে যদি সংবাদপত্রের কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি সংবাদপত্র লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবতার মূঢ়, মূক, ম্লান মুখে ভাষা যোগাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই আধুনিক পৃথিবীর লক্ষ-কোটি নিঃসহায় মানুষ বিচারের প্রার্থনায় কার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবে? মুষ্টিমেয় শক্তিমান্, বুদ্ধিমান্ ও ধনবানের হাতে যদি সংবাদপত্র অমূল্য গণস্বার্থকে বিকিয়ে দেয়, তবে এই লোভ-জটিল পৃথিবীতে মানুষের আর আশা-ভরসা কি থাকে? সংবাদপত্র কবে এই রাহুমুক্ত হবে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র
- জনগণের সেবায় সংবাদপত্র
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা
- সংবাদপত্র ও তাহার দায়িত্ব, ক. প্রা. '৬৪
- সংবাদপত্র-পাঠের প্রয়োজনীয়তা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ যন্ত্রের জন্ম ও তার প্রতিশ্রুতি ॥ যন্ত্রের শক্তি-সামর্থ্য ও মানব-সেবা ॥ মানব-বিরোধী যন্ত্র ঃ সভ্যতার অভিশাপ ॥ মানুষের জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ॥ দোষ যন্ত্রের নয়, যন্ত্র-মালিকের ॥ যন্ত্র-বিচ্ছেদ অসম্ভব ॥ ভারতে অটো-মেশন ॥ অটোমেশনের সপক্ষে অভিমত ॥ অটো-মেশনের বিপক্ষে অভিমত ॥ উপসংহার ॥

১৫
মানুষ বনাম যন্ত্র ঃ অটোমেশন

উ. মা. '৬০

ভূমিকা

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ যন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। যন্ত্র পৃথিবীতে এসেছিল মানুষের বোঝার ভার লাঘব করবার জন্যে। মানুষও সেদিন চেয়েছিল, সে যন্ত্রের বিপুল শক্তি করায়ত্ত করে লড়াই করবে দৈব-শক্তির বিরুদ্ধে, যন্ত্রকে বশীভূত করে সে হয়ে উঠবে অসীম শক্তিধর। তার যন্ত্র-সাধনা মূলতঃ বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে যান্ত্রিক ক্ষমতা লাভের সাধনা। এই সংগ্রামে নিজের অজ্ঞাতে সে হৃদয়হীন যন্ত্রের কাছে করেছে আত্মসমর্পণ। যন্ত্র আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে মানুষেরই সঙ্গে। আজ সে বিদ্রোহী হয়ে দুর্জয় শক্তির উন্মত্ত দম্ভে মানুষের বুকের ওপর পদস্থাপনে উদ্যত।

যন্ত্রের জন্ম ও তার প্রতিশ্রুতি

কিন্তু স্মরণীয়, বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে ছিল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ-চেতনা। বিপুলা এ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদা যখন ক্রমবর্ধিষ্ণু, অন্যদিকে খনির অন্ধকারে যখন পৃথিবীর খনিজ-সম্ভার কঠিন ঘুমে অচেতন, মানুষের ক্ষুধাহরণের জন্যে কৃষিভূমি যখন পাষাণী অহল্যার মতো অভিশপ্তা, মানুষের শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যখন সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে নিম্নমুখী, তখনই মানুষ প্রয়োজন বোধ করেছিল এমন একটি শক্তির, যা পৃথিবীর সম্পদ ও মানুষের শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহারীকরণের মাধ্যমে মানুষের হাতে এনে দেবে বহুল উৎপাদনের চাবিকাঠি, যা মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষার চাহিদা মিটিয়ে এনে দেবে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। এই প্রয়োজনবোধ থেকে যন্ত্রের জন্ম। তারপর খনির অন্ধকার গহ্বর আলোকিত হলো, নির্মিত হলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন। এলো যন্ত্র, এলো যন্ত্রযুগ। মানুষ সেইখানেই থামেনি; সে আবিষ্কার করেছে বিদ্যুৎকে, করায়ত্ত করেছে দুর্জয় শক্তিধর পরমাণু ও ইলেকট্রন শক্তিকে।

যন্ত্রের শক্তি-সামর্থ্য ও মানব-সেবা

য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকেই পৃথিবীতে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত। কালে কালে সেই যন্ত্রের ঘটেছে কত রূপ-রূপান্তর, তার চালক-শক্তির ঘটেছে কত পরিবর্তন। তার চালক-শক্তির স্থান কখনও নিয়েছে পশু, কখনও বায়ু, কখনও বাষ্প, কখনও বৈদ্যুতিক শক্তি, সর্বশেষে পারমাণবিক শক্তি। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দুর্বার দৈত্যের মতো যন্ত্র তার শক্তিবলে পাহাড় ভেঙে রাস্তা বানিয়েছে, নদীর তট-যুগলকে বেঁধেছে শক্ত কংক্রিটের সেতুবন্ধনে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জয় করে এনে দিয়েছে

আমাদের দুয়ারে। তাছাড়া, সে কৃষিকে করেছে শস্যশালিনী, শিল্পকে করেছে অধিক উৎপাদনশীল, পথ ও পরিবহণকে করেছে সুদূরাভিসারী। যন্ত্রের শক্তিতে শক্তিমান্ মানুষ শীত-গ্রীষ্ম, বন্যা-ঝড়-ঝঞ্ঝা ইত্যাদি দুর্জয় প্রাকৃতিক উপদ্রবের সঙ্গে আজ পাঞ্জা লড়তে পারে ; আর পারে দূরদূরান্তের আর্ত, পীড়িতের কাছে সেবা ও সাহায্যের কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করে দিতে।

এ পর্যন্ত ছিল যন্ত্রের মিতালি। হিতৈষী বন্ধুর মতো সে মানুষের পরম উপকারে লেগেছে। তার জীবনযাত্রাকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ করবার জন্যে সে প্রসারিত করে দিয়েছে তার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের হাত। কিন্তু তারপরই যন্ত্র আবির্ভূত হলো মানুষের বিরোধী ভূমিকায়। আজ অতিরিক্ত যন্ত্রানুগত্যের ফলে মানুষ তার নিজস্ব কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যন্ত্র-দানব তার ধূমময় বিষাক্ত নিঃশ্বাসে মানব-জীবনের শ্যামলতাকে বিধ্বস্ত করে প্রসারিত করে দিয়েছে মরুভূমির কঠোর ধূসরতা, জীবনের বৈচিত্র্যকে হরণ করে তার হাতে তুলে দিয়েছে অকাল-মৃত্যুর পরোয়ানা। সে আজ অসহায় যন্ত্রনির্ভর মানুষকে রজ্জুবদ্ধ পশুর মতো টেনে নিয়ে চলেছে মহাধ্বংসের যূপকাষ্ঠের দিকে।

মানব-বিরোধী যন্ত্র : সভ্যতার অভিশাপ

সভ্যতার অভিশাপের এখানেই শেষ নয়। যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিয়েছে, হরণ করে নিয়েছে তার জীবন-কাঠি। কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে একটি, আর লক্ষ-লক্ষ তাঁতির তাঁত গেছে বন্ধ হয়ে। বেকার শিল্পী কৃষিতে কিংবা গোলামিতে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এইভাবে প্রাচীন, সুন্দর, সনাতন জীবনছন্দের তার গেল ছিঁড়ে। তেলের কল কেড়ে নিল কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিল লক্ষ-লক্ষ অসহায় ধান-ভাঙানী গ্রামীণ মেয়েদের। এইভাবে দুর্জয় যন্ত্র-দানব মানুষের জীবন-কাঠি অপহরণ করে তাকে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে।

মানুষের জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা

কিন্তু দোষ কার? যন্ত্রের,—না যন্ত্র-মালিকের? যন্ত্রের জন্মলগ্নে ছিল মানব-জাতির সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আজ যন্ত্র বিশ্বের মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে সভ্যতার ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছে, ডেকে এনেছে কোটি-কোটি মানুষের লাঞ্ছনা ও জীবন-সংকট। যন্ত্রকে হাতিয়ার করে বিশ্বের মুষ্টিমেয় মানুষ আজ লক্ষ-কোটি মানুষকে শোষণ করে তাদের ঠেলে দিয়েছে অনিবার্য ক্ষুধার দিকে। কাজেই, দোষ যন্ত্রের নয়, দোষ যন্ত্র-মালিকের। যতদিন তাদের শুভবুদ্ধির উদয় না হয়, ততদিন মানব-লাঞ্ছনার পরিসমাপ্তি নেই, পরিসমাপ্তি নেই মানবতার চরম অবমাননার।

দোষ যন্ত্রের নয়, যন্ত্র-মালিকের

এই যন্ত্র-দাসত্ব থেকে আজ আর মানব-সভ্যতার মুক্তি নেই। বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার এই-যে চরম সমুন্নতি, তার মূলে রয়েছে যন্ত্র। যান্ত্রিক বিস্ময়ের অনবদ্য প্রকাশ বর্তমান সভ্যতার এই বিলাসী চাকচিক্যময় রূপ। তাছাড়া, যন্ত্রই দেশকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার, জড়তা ও অনগ্রসরতার হাত থেকে মুক্ত করে চলমান জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারে।

যন্ত্র-বিচ্ছেদ অসম্ভব

যন্ত্র মানুষের সভ্যতাকে করেছে অধিকতর গতিশীল, তার কৃষি ও শিল্পকে করেছে উৎপাদনমুখী। যন্ত্র-বিচ্ছেদ এ-যুগে তাই অসম্ভব, অকল্পনীয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এই সূত্রেই স্বশাসিত যন্ত্র—অটোমেশনের আবির্ভাব। অটোমেশন প্রবর্তনের ফলে সেই ভাগ্যবান্ দেশগুলিতে সমৃদ্ধির বান ডেকেছে।

ভারতে অটোমেশন

ভারতের ধারণা, অটোমেশনের প্রবর্তনে তারও ভাগ্যে সমৃদ্ধির জোয়ার আসবে। মানব-শক্তির বিকল্পরূপে অটোমেশনের ব্যবহারে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোনা ফলবে। তাই সে জীবন-বীমা, ব্যাঙ্ক, রেল ও অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন প্রবর্তনে বদ্ধ-পরিকর।

ভারতে অটোমেশন ইতিমধ্যেই বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমর্থক শ্রেণীর মতেঃ এক. এই বৈজ্ঞানিক যুগে অটোমেশনকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। দুই. দেশের প্রগতিশীল অর্থনীতিতে অটোমেশন ব্যবহারে রক্ষণশীলতা অনুচিত।

অটোমেশনের সপক্ষে অভিমত

তিন. মানুষের সাধ্যাতীত অতি-ব্যাপক ও অতি-সূক্ষ্ম হিসাবপত্র ও নথিপত্র-সংরক্ষণ ইত্যাদি অটোমেশনের দ্বারা সম্ভব। চার. অটোমেশনের দ্বারা পুঁজি ও শ্রমের নিবিড়তম ব্যবহার সম্ভব। পাঁচ. হিসাবপত্র ও নথিপত্র-সংরক্ষণে আধুনিকতা এবং শৃঙ্খলা—দুইই আনা যাবে। ছয়. এর দ্বারা কর্মচারিগণও ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা পাবেন। সাত. অটোমেশন ব্যবহারের দ্বারা মুনাফার অঙ্কও বৃদ্ধি পাবে।

অটোমেশন ব্যবহারের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিক-সংঘগুলি এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল মহল আজ সোচ্চার। তাঁদের মতেঃ এক. আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনীতি উন্নত, সেখানে অটোমেশন প্রয়োগের পেছনে

অটোমেশনের বিপক্ষে অভিমত

রয়েছে দীর্ঘকালের কৃষি ও শিল্প-সাধনা। দুই. ভারতে, যেখানে বেকার-সমস্যা ভয়াবহ, সেখানে অটোমেশন ব্যবহার মূঢ়তা। তিন. অটোমেশন ব্যবহারে কিছু ব্যক্তি কর্মচ্যুত হবেন। চার. ভবিষ্যতের কর্মখালির সম্ভাবনা লুপ্ত হবে। পাচ. অটোমেশন আমদানিতে বিদেশী মুদ্রা ব্যয়িত হবে প্রচুর। ছয়. অটোমেশনের ব্যবহারে যে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রয়োজন, ভারতে এখনও তা আসেনি।

কোন দিক থেকেই যন্ত্র-সর্বস্বতার পরিণাম ভাল নয়। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজী প্রমুখ ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা মহাপুরুষেরা যন্ত্রের এই ছিন্নমস্তা রূপ দেখে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, মানুষের এই যন্ত্র-নির্ভরতার জন্যে একদিন না একদিন তাকে চরম

উপসংহার

মূল্য দিতে হবে; কিন্তু সেদিন ঘনিয়ে আসবে সভ্যতার চরম সন্ধিক্ষণ। মানুষকে সেদিন মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো তার কৃতকর্মের জন্যে সভ্যতার শেষ কানাকড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। জানি না, শেষের সেদিন কেমন ভয়ঙ্কর হবে!!

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- মানুষ বনাম কল
- আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি, উ. মা. '৬০

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার॥ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা॥ মানব-জীবনে বিজ্ঞানের অবদান॥ প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবদান॥ বিজ্ঞানের বিভীষিকাময় রূপ॥ বিজ্ঞানের সর্বধ্বংসী অকল্যাণ-মূর্তি॥ দোষ কার? বিজ্ঞানের, না প্রয়োগ-পদ্ধতির? উপসংহার॥

১৬ গৃহকার্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার

উ. মা. '৬৯, '৭৮; মা. '৬০

বর্তমান সভ্যতা মানুষের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন ও সাধনার ক্রমপরিণাম। মানুষ তার যুগ-যুগান্তরের স্বপ্ন ও সাধনার অনবদ্য ফসল দিয়ে গড়ে তুলেছে সভ্যতার এই বিশাল ইমারৎ। আপনার প্রাণশক্তি তিল তিল দান করে, বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিয়ে সে রচনা করেছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা-মূর্তি। সে সভ্যতার বেদীমূলে দিয়েছে বাহুর শক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এবং হৃদয়ের ভালোবাসা। বিজ্ঞানও মানুষের অতন্দ্র সাধনার ফসল। কালক্রমে মানুষ বিজ্ঞানকে তার সভ্যতার বিজয়-রথের বাহন করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এসে উপনীত হয়েছে বর্তমানের পাদপীঠতলে। আজ সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময়।

ভূমিকা

আজ বিজ্ঞান দুর্জয় হলেও পৃথিবীতে তার সূচনা হয়েছিল অত্যন্ত দীনভাবে। সর্বত্যাগী জ্ঞান-তপস্বীদের যুগ-যুগান্তরের সাধনায় বিজ্ঞান রূপকথার দৈত্যপুরী থেকে সংগ্রহ করে এনেছে সোনার কাঠি এবং রূপোর কাঠি। তা হস্তগত করে সভ্যতার প্রত্যূষ-লগ্নের সেই অসহায় মানুষ আজ অসীম শক্তিধর। সেদিনের অরণ্যচারী, গুহাবাসী মানুষ আকাশে মেঘ এবং বিদ্যুৎ দেখলে ভয় পেত। আজ মানুষ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হয়ে সেই মেঘকে করেছে বশীভূত, বিদ্যুৎকে করেছে পদানত।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ খনির অন্ধকারে আলো জেলেছে। ঘুম ভাঙিয়েছে পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার। দৈত্যপুরীর বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে এনে তাকে পরিকল্পনামতো সাজিয়েছে, উদ্ভাবন করেছে উৎপাদনের নব নব প্রকরণ, পৃথিবীর শৈশবের জড়তা কাটিয়ে এনে দিয়েছে যৌবনের অফুরন্ত উল্লাস। অন্যদিকে, বিজ্ঞানের শক্তিবলে মানুষ উচ্ছৃঙ্খল নদীস্রোতকে বশীভূত করে উষর মরু-প্রান্তরকে করেছে জলসিক্ত, ভূগর্ভের সঞ্চিত শস্য-সম্ভাবনাকে করে তুলেছে সফল, দূর করে দিয়েছে অহল্যা-ধরিত্রীর অনুর্বরতার অভিশাপ। বিজ্ঞান আজ উর্বরতা দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু বসুধাকে শস্যবতী করে তুলেছে। নব নব শিল্প-প্রকরণে সে উৎপাদন-জগতে এনেছে যুগান্তর এবং সুদূরকে করেছে নিকটতম। বিজ্ঞানের সাফল্যে জীবধাত্রী বসুধা আজ কলহাস্যমুখর।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

প্রাগৈতিহাসিক মানবের অগ্নি-আবিষ্করণের দিন থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের অতন্দ্র সাধনা বিজ্ঞানকে করেছে সমৃদ্ধ, সভ্যতাকে করেছে জঙ্গম। বাষ্পীয়

শক্তিকে সে করেছে বশীভূত, বিদ্যুৎকে করেছে করায়ত্ত, মুঠোয় পুরে নিয়েছে পারমাণবিক শক্তিকে। ডাঙায় ছুটেছে মোটর-ট্রেন, জলে ঢেউ-এর ঝুঁটি ঝাপটে ধরে জাহাজ ছুটে চলেছে, আকাশ তোলপাড় করে উড়ে চলেছে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান-পোত, মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে রকেট-স্পুটনিক-মহাকাশযান। অন্যদিকে, বিজ্ঞান সাবিত্রীর মতো মৃত্যুর গ্রাস থেকে জীবনকে বাঁচিয়ে তুলতে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ।

মানব-জীবনে বিজ্ঞানের অবদান

আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত প্রভুত্ব। প্রভাতের শয্যাত্যাগ থেকে নিশীথের শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিজ্ঞান মানুষের অত্যন্ত অনুগত অনুচর। রেডিয়োর প্রভাতী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙলো তার। বিজ্ঞানের কৌশলে তৎক্ষণে কলে জল এসে গেছে। প্রয়োজনমতো কখনো সে জল উষ্ণ, কখনও-বা শীতল। মাথার ওপরে ঘুরছে সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিয়োতে বাজছে বিচিত্র সুরের গান। কোথাও-বা দূর-দূরান্তরের ছবি ও বাণী চক্ষের নিমেষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো টেলিভিশনের পর্দায়। প্রতিদিন বাজারে যাবার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের দৌলতে 'ফ্রীজে'র মধ্যে একটি আস্ত বাজারকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে। এদিকে, বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের উনানে চা-কফির জল গরম হলো, প্রস্তুত হলো প্রাতরাশ। সম্মুখের টেবিলে সংরক্ষিত সংবাদপত্র; তাও বিজ্ঞানের অবদান। একপাশে রক্ষিত নীরব টেলিফোনটি সহসা বেজে উঠলো। তাতে ভেসে এলো হাজার মাইল দূরের বন্ধুর কণ্ঠস্বর। 'কলিং বেল' বেজে উঠলো। কোন অতিথি সাক্ষাৎ-প্রার্থী। অতিথির সঙ্গে আলাপান্তে ঘড়িতে চোখ পড়লো। ওদিকে, বিজ্ঞানের হাতে বাথরুমে স্নানের জল প্রস্তুত। স্নানাহার সেরে বাইরে যেতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ আগে থেকেই ওয়াশিং মেশিনে কেচে ইলেকট্রিক ইস্ত্রিতে ইস্ত্রি করে রাখা হয়েছে পরিপাটি করে। বিজ্ঞানের কল্যাণে কোন কোন পোশাক-পরিচ্ছদের আবার ইস্ত্রি করবার প্রয়োজনই নেই। যাই হোক, 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।' সে সৌভাগ্য যাদের নেই, তাদের জন্যে রয়েছে ইলেকট্রিক ট্রেন, ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সি। অফিসে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, কোন অফিস হয়তো-বা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গেই উর্ধ্বলোক থেকে রথ নেমে এলো; সেই লিফ্‌ট্‌ তাকে নামিয়ে দিল অফিসের দ্বার-প্রান্তে। 'টাইপ-রাইটার'-এ চিঠিপত্র টাইপ করা হয়; কম্‌পিউটারের সাহায্যে রক্ষিত হচ্ছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। ছুটির পরে আমোদ-প্রমোদের জন্যে রয়েছে সিনেমা-বায়োস্কোপ। ইতিমধ্যে শরীর অসুস্থ বোধ করলে আছে ডাক্তারখানা, আছে ওষুধ। রাত্রে আহারান্তে ঘুম না এলে বিজ্ঞান রেডিয়োর সাহায্যে শোনাবে ঘুম-পাড়ানিয়া গান। ঘুমিয়ে পড়লেও বিজ্ঞান তার শিয়রে সারারাত অক্লান্ত হাতে পাখা ঘোরাবে কিংবা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র চালু রেখে মানুষের সুখনিদ্রার ব্যবস্থা করবার জন্যে সারারাত বীতনিদ্র থাকবে।

প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের অবদান

এ সমস্ত হলো বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতার উজ্জ্বল দিগন্ত। অন্য দিগন্তে জমেছে অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা, অনেক প্রবঞ্চনা। বিজ্ঞান এসে জোর করে মানুষের

হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে, তার জীবনধারণের চাবিকাঠি অপহরণ করে তাকে নিশ্চিত অনাহারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে তার শান্ত, সুন্দর, সনাতন জীবন-ছন্দের তার দিয়েছে ছিঁড়ে। মানুষের এই বোবা দুঃখ পৃথিবীর বুকে আজ সৃষ্টি করেছে এক দুরপনেয় ক্ষত। সে পৃথিবীর একদল মানুষকে ভোগসুখ-সর্বস্ব পশুতে পরিণত করেছে, আর একদল মানুষকে পরিণত করেছে ক্ষুধার্ত আহারান্বেষী জানোয়ারে। বিজ্ঞানের এই যন্ত্র-সিদ্ধ বিভীষিকা থেকে মানুষের মুক্তি নেই, মুক্তি নেই তার সর্বনাশা পরিণাম থেকে।

বিজ্ঞানের বিভীষিকাময় রূপ

বিজ্ঞান যে সভ্যতার শরীরে জীবন প্রতিষ্ঠা করেছে, আজ তারই বিনাশে সে মেতে উঠেছে রুধির-তৃষাতুর ছিন্নমস্তার মতো। বর্তমান শতাব্দীতে সংঘটিত দু'দুটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বিজ্ঞানের দানবীয় শক্তি সম্বন্ধে মানুষের মনে এনে দিয়েছে এক ঘোরতর আতঙ্ক। আজ বিজ্ঞান কী চায়? জীবন, না মৃত্যু? সে কি আজ পৃথিবীতে মানবজাতির কবরভূমি রচনা করতে চায়? পৃথিবীর মানুষের মনে আজ জেগেছে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিজ্ঞানের সর্বধ্বংসী অকল্যাণ-মূর্তি

কিন্তু দোষ কার? বিজ্ঞানের, না যারা বিজ্ঞানকে স্বার্থ-লোলুপ দানবীয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে প্রয়োগ করে, তাদের? সেই স্বার্থপর নরপিশাচদের হাতেই বিজ্ঞান বারে-বারে তার কল্যাণব্রত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে করেছে নরমেধ-যজ্ঞের আয়োজন। দোষ সেই লোভী শয়তানদের সংকীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধির, দোষ সেই শক্তি-স্পর্ধিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার। আজ আর বিজ্ঞানের হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীতে প্রাচীনকালের অবৈজ্ঞানিক জীবনাচরণ সম্ভব নয়। কাজেই, আজ প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রয়োগ-পদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের।

দোষ কার? বিজ্ঞানের, না প্রয়োগ-পদ্ধতির?

কিন্তু আর কতকাল বিজ্ঞান-লক্ষ্মী হৃদয়হীন স্বার্থলোলুপ নর-পিশাচের গৃহে দাসীবৃত্তি করবেন? যিনি কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি কি তাঁর কল্যাণপূত দক্ষিণ হস্ত সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যে প্রসারিত করে দেবেন না? বিজ্ঞান যদি সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্র নির্মাণ থেকে বিরত হয়ে সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ-কর্মে ব্যবহৃত হয়, তবেই মানুষের এই দুঃখ-রজনীর অবসান হবে, অভিশাপের পরিবর্তে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ ঝরে পড়বে মানবজাতির মাথায়, রক্ত-বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাবে জীবধাত্রী বসুধা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব, মা. '৭০
- প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান, উ. মা. '৬৯
- সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের দান

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ মহাকাশ মানুষ ॥ স্বপ্ন ও সাধনা ॥ রকেটের জন্ম-ইতিহাস ॥ মহাকাশ-অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ : স্পুটনিক ॥ সোভিয়েট মহাকাশ-অভিযান ॥ মার্কিন মহাকাশ-অভিযান ॥ চন্দ্র-বিজয় : এক. আর্মস্ট্রং, অলড্রিন ও কলিন্‌স ॥ চন্দ্র-বিজয় : দুই. শেপার্ড, রুসা ও মিচেল ॥ উপসংহার ॥

১৭ মানুষের চন্দ্রলোক-বিজয়

উ. মা. '৬০, '৭০

"আকাশ, 'এসো এসো' ডাকিছ বুঝি ভাই ?"—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

মানুষের চন্দ্রলোক-বিজয় পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৬৯ সাল, ২০শে জুলাই। ভারতীয় সময় : সোমবার, সকাল ৮টা ২৬ মি. ২০ সেকেণ্ড। মানুষের বহু শতাব্দীর স্বপ্ন সফল হলো সেদিন। পৃথিবীর দুঃসাহসী দুই মানব-সন্তান—নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন সেদিন মহাকাশের লক্ষ-লক্ষ মাইল অন্ধকার অতিক্রম করে জনহীন চন্দ্রের বুকে এঁকে দিলেন তাঁদের বিজয়সূচক পদচিহ্ন। মহাবিশ্বের ইতিহাসে লেখা হলো মানুষের জয়।

মহাকাশ ও মানুষ

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ মহাকাশকে ডেকে বলেছে : 'খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।' কিন্তু আমাদের মর্ত্য-জননী বড় মমতাময়ী। তার মাধ্যাকর্ষণের বিপুল স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করে গ্রহ-গ্রহান্তরে যাত্রার জন্যে চলেছে মানুষের নিরলস প্রচেষ্টা। একদিন গ্যালিলিও-র দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সুদূর মহাকাশের রহস্যময় জানালাটা খুলে দিল। তখন কেপ্‌লারের গ্রহ-গতিতত্ত্ব এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব তার মহাকাশের ঠিকানা আবিষ্কারের হলো বড় হাতিয়ার। তারপর অ্যালেন পো, হেল, ওয়েল্‌স, জুল ভার্ন, সিয়ল্কভস্কি এবং গডার্ডের রচনায় মানুষের সেই স্বপ্ন সুদূরের আকাজ্ক্ষা হয়েছে আরো উদ্দীপিত। এ সবের মধ্য দিয়ে মানুষের মন হয়েছে মহাকাশমুখী, মহাকাশের পথ আবিষ্কারের জন্যে সূচিত হয়েছে নবতর প্রয়াস।

স্বপ্ন ও সাধনা

রকেটের জন্ম-ইতিহাস

মহাকাশ-অভিযানের পথ-নির্মাণে সর্বাধিক কার্যকরী হয়েছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সৃষ্টি—রকেট। রকেট-নির্মাণের প্রাথমিক গৌরব চীন দেশেরই প্রাপ্য। সেখান থেকে তা ভারতে আনীত হয়। মহীশূরের টিপু সুলতানের ছিল একটি উন্নত রকেট-বাহিনী। সেখান থেকে ইংলণ্ডে এবং পরে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে তা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতি আধুনিককালে রকেটের গতিপথ-নিয়ন্ত্রণের কলা-কৌশল এবং তার গতিবেগের যতই উন্নতি হতে লাগলো, মানুষের মহাকাশ-বিজয়ের সম্ভাবনাও ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা আগস্ট : সেদিন রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত প্রথম 'স্পুটনিক' প্রায় ৯১৮

কিলোমিটার উর্ধ্বলোকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শেষ করে ফিরে এলো মর্ত্যের মাটিতে।

মহাকাশ-অভিযানে প্রথম পদক্ষেপ : স্পুটনিক

তারপর ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর একটি জীবন্ত কুকুরকে বহন করে রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক প্রায় ১,৫১৪ কিলোমিটার উর্ধ্বলোকে পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করে 'মাটির মায়ের কোলে' ফিরে এলো। এবার উৎসাহিত বিজ্ঞানীদল স্বপ্ন দেখতে লাগলেন চন্দ্রলোক-বিজয়ের। ১৯৫৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর রাশিয়ার রকেট চন্দ্র-বিজয় সমাপ্ত করলো।

এবার মহাকাশের কলম্বাস গাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মহাকাশের যবনিকা উত্তোলন করে ফিরে এলেন। তারপর মহাকাশে যাঁরা নিজেদের নাম লিখে এলেন, তাঁরা হলেন টিটভ, নিকোলায়েভ, পোপোভিচ, বিকোভস্কী এবং ভ্যালেন্তিনা

সোভিয়েট মহাকাশ-অভিযান

তেরেস্‌কোভা। তারপর কোমরভ, ইয়েগোরভ ও ভিয়োকতিস্তোভ ভস্কদ : এক-যোগে ১৯৬৪ সালে এবং লিওনভ ও বেলায়েভ ভস্কদ : দুই-যোগে ১৯৬৫ সালে মহাকাশ পরিক্রমা সমাপ্ত করে আসেন। তারপর মহাকাশ-পরিক্রমাকালে সোভিয়েট নভশ্চর কোমরভ দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর ১৯৬৮ সালে এককভাবে বেরগোভয় এবং ১৯৬৯ সালে যৌথভাবে সাতালভ, ইলিসিয়েভ ও গ্রুনভ এবং ভলিনভ ও গ্রুনভ সাফল্যের সঙ্গে সেরে আসেন তাঁদের মহাকাশ-অভিযান।

মহাকাশ-অভিযানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সাফল্য মার্কিন-বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে। ১৯৬১ সালে মার্কিন মহাকাশচারী শেপার্ড ও গ্রিসম, ১৯৬২ সালে গ্লেন, কার্পেন্টার ও সিরা এবং ১৯৬৩ সালে কুপার সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ-পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে যুগ্মভাবে গ্রিসম ও ইয়ং, হোয়াইট ও ম্যাকডিভিট,

মার্কিন মহাকাশ-অভিযান

কুপার ও কন্‌রাড, বোরম্যান ও জেমস লোভেল এবং সিরা ও স্ট্যাফোর্ড মহাকাশ-পরিক্রমা সেরে মর্ত্যে ফিরে আসেন। ১৯৬৬ সাল : এবার মার্কিন মহাকাশ-অভিযানের যুগ্ম নাবিক হলেন যথাক্রমে নীল আর্মস্ট্রং ও ডেভিড স্কট, টমাস স্ট্যাফোর্ড ও ইউজেন সারনাজ, ইয়ং ও কলিন্‌স, কন্‌রাড ও গর্ডন, লোভেল ও অল্‌ড্রিন। তারপর ১৯৬৮ সালে সিরা, ইজল ও কানিংহাম—এই অভিযাত্রীত্রয় মহাকাশ পরিভ্রমণ করে আসেন।

এ সব 'সাঁঝবেলাকার পিদিম জ্বালার আগে সকালবেলার সল্‌তে পাকানো'র মতো চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতিমাত্র। সেই প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৬৮ সালে বোরম্যান, লোভেল ও এণ্ডের্স চাঁদের প্রায় ১১২ কিলোমিটার দূরত্ব থেকে ফিরে

চন্দ্র-বিজয় : এক. আর্মষ্ট্রং, অল্‌ড্রিন ও কলিন্‌স

আসেন। তারপর ১৯৬৯ সালে ম্যাকডিভিট, স্কট ও সোয়েকার্ট মহাকাশে সমাপ্ত করে এলেন চন্দ্রাভিযানের পরীক্ষা-কার্য। সব শেষে স্ট্যাফোর্ড, ইয়ং ও সারনাজ চন্দ্রযানে চাঁদের প্রায় ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে পরিভ্রমণ করে আসেন। তারপর ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই। ঐদিন অ্যাপোলো : এগারো-যোগে আর্মস্ট্রং, কলিন্‌স ও অল্‌ড্রিন চন্দ্রাভিমুখে শুরু করলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিকতম অভিযান

২০শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত্রি ১টা ৫৩ মি.-এ চন্দ্রযান 'ঈগল' আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে চন্দ্রের মৃত্তিকা স্পর্শ করলো। ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় : সকাল ৮টা ২৬ মি. ২০ সেকেণ্ড। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় মুহূর্ত। নীল আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন প্রাণহীন, জলহীন, ধূসর চন্দ্রবক্ষে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত করে দিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাঁরা চন্দ্রের প্রান্তরে বিচরণ করে যথানির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সমাধা করেন। 'ঈগল' চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করে উঠে এলো পৃথিবীর পথে। রাত ৩টার সময় কলিন্‌স-চালিত অ্যাপোলো-যানের সঙ্গে 'ঈগলের' মিলন হলো। 'ঈগল'কে দূরে নিক্ষেপ করে অ্যাপোলো : এগারো মহাকাশচারীত্রয়কে নিয়ে ফিরে এলো মাটির মায়ের কোলে। ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৯ মি.-এ তাঁদের মহাকাশযান নিরাপদে অবতরণ করলো প্রশান্ত মহাসাগরে।

এ জয় কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের বা জাতি-বিশেষের জয় নয়; এ জয় সমগ্র বিশ্বমানবের জয়, মানব-সভ্যতার জয়। আবার, ১৯৭০ সালের মার্কিন চন্দ্রাভিযান ব্যর্থ হওয়ার পরে ১৯৭১ সালের ৩১শে জানুয়ারী অ্যাপোলো : চৌদ্দ অ্যালেন শেপার্ড, স্টুয়ার্ট রুসা ও এড্‌গার মিচেলকে নিয়ে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করে। ৫ই ফেব্রুয়ারী চন্দ্রযান 'আন্তারাস' স্পর্শ করলো চাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলের মাটি। চাঁদের বুকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি-সমেত রিক্‌শা টেনে অভিযাত্রীত্রয় কয়েক কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করেন। তারপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এবং সেই অঞ্চলের মাটি সংগ্রহ করে অভিযাত্রীত্রয় মূল মহাকাশ-যানে এলেন ফিরে। তারপর ঘরে-ফেরার পালা। মহাকাশযান তাঁদের নিয়ে পাড়ি দিল মর্ত্য-জননীর অভিমুখে। অবশেষে প্রশান্ত মহাসাগরে ঘটলো তাঁদের সফল প্রত্যাবর্তন।

চন্দ্র-বিজয় : দুই, শেপার্ড, রুসা ও মিচেল

সাফল্যের পর আবার সাফল্য। সোভিয়েট স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-গবেষক লুনাখোদ : ৯ চাঁদের 'বর্ষণ সাগর' এলাকায় খুঁজে পেয়েছে অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, সিলিকন, টাইটেনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়ামের আকর। এইভাবে অবশেষে সফলতা লাভ করলো মানুষের যুগ-যুগান্তরের চন্দ্রলোক-বিজয়ের স্বপ্ন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই বিপুল ব্যয়-বহনের বিনিময়ে মানুষ কি পেয়েছে? মানুষের ইতিহাসের পাতায় তো জমা পড়েছে কয়েক মুঠো বালি এবং কয়েক টুক্‌রো পাথর। অথচ সেই অর্থে একটি অনুন্নত দেশের উন্নয়ন সম্ভব হতে পারতো। কিন্তু স্মরণীয় যে, প্রতিটি আবিষ্কারের মূল্য আছে। কে জানে, 'সুদূরের পিয়াসী' মানুষের গ্রহান্তর-বিজয়ের স্বপ্নও হয়তো একদিন এইভাবে সাফল্যমণ্ডিত হবে। কিন্তু—'নিদারুণ দুঃখরাতে/মৃত্যুঘাতে/মানুষ চূর্ণিবে যবে নিজ মর্ত্য-সীমা/তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- মহাকাশ-অভিযান
- মানুষের আকাশ-বিজয়, উ. মা. '৬০
- মানুষের অন্তরীক্ষ-বিজয়, উ. মা. '৬৩

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ দূরদর্শনের আবিষ্কার॥ নামকরণে ত্রুটি॥ দূরদর্শনের গঠন-কৌশল॥ ভারতে দূরদর্শন ঃ দিল্লীতে॥ ভারতের অন্যান্য স্থানে দূরদর্শনের জাল-বিস্তার॥ দূরদর্শন-কেন্দ্র ঃ কলকাতায়॥ উপকারিতা॥ অপকারিতা॥ উপসংহার॥

১৮ ভারতে দূরদর্শন

যে অলৌকিক শক্তিবলে মহাভারতের মহামতি সঞ্জয় হস্তিনানগরে বসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করতে পারতেন, আজ বৈজ্ঞানিকের সাধনায় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সেই অবিশ্বাস্য শক্তির অধিকারী হয়েছে। মানুষ আজ বিজ্ঞানের অবদানে ঘরে বসে দূর-দূরান্তের যে-কোন ঘটনার দৃশ্য ও বাণীকে একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও শ্রবণগোচর করতে পারে। বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর আবিষ্কারটি এই অসাধ্য সাধন করেছে, তার নাম টেলিভিশন—'দূরদর্শন'। চিত্র ও বাণীর সমাহারে রচিত বিজ্ঞানের এই দুর্লভ আবিষ্কারটি পৃথিবীর দূরতম অংশের, এমনকি, মহাকাশের সুদূরলোকের দৃশ্য ও ধ্বনিকে তার অতিপ্রভ পর্দায় মুহূর্ত-মধ্যে রূপায়িত করে মানুষের কৌতূহল চরিতার্থ করবার সহায়ক হয়েছে।

ভূমিকা

মানুষের অন্তহীন কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার কাছে একদিন বিদ্যুৎ-রহস্যের গোপন চাবিকাঠিটি ধরা পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ঈথার এবং ইলেক্‌ট্রন তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলো। অন্যদিকে, সুদূরকে নিকটতম করার আকুল আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং গ্রামোফোন যন্ত্র। তারপর আবিষ্কৃত হলো চলচ্চিত্র—মানুষের চিত্র জীবন্ত মানুষের মতো হয়ে উঠলো সজীব এবং সবাক্‌; আবিষ্কৃত হলো বেতার-যন্ত্র। সুদূরের কণ্ঠস্বর মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে ধরা দিল। কিন্তু শুধু সুদূরের কণ্ঠস্বরই নয়, সুদূরের মূর্তিকেও সে চাইলো প্রত্যক্ষ করতে। একদিন তার সেই আকাঙ্ক্ষারও এলো সাফল্যের লগ্ন। ১৯২৬ সাল—আবিষ্কৃত হলো দূরদর্শন। সুদূরের চিত্র ও বাণীর বিশ্বস্ত বাহক এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা জন বেয়ার্ডের কাছে সেজন্যে বিশ্ববাসী চিরকৃতজ্ঞ।

দূরদর্শনের আবিষ্কার

'টেলি' একটি গ্রীক শব্দ, তার অর্থ 'দূর'; 'ভিসিও' একটি ল্যাটিন শব্দ, তার অর্থ 'দৃশ্য'। এই দুই শব্দের সংমিশ্রণে 'টেলিভিশন' বা 'দূরদর্শন' শব্দটির উদ্ভব। কিন্তু টেলিভিশন তো কেবল 'দূরদর্শন' নয়, সে তো সেই সঙ্গে 'দূরবাণী'ও বটে। কাজেই, এই যন্ত্রটির টেলিভিশন বা দূরদর্শন নাম তার জন্মলগ্ন থেকেই ত্রুটিপূর্ণ। যাই হোক, ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ ব্রড্‌কাস্টিং কর্পোরেশনই পৃথিবীতে প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালু করেন দূরদর্শন-প্রচার।

নামকরণে ত্রুটি

দূরদর্শনের একদিকে বেতার-যন্ত্র, অন্যদিকে চলচ্চিত্র। এই দুইয়ের সমাহারে দূরদর্শনের গঠন-কৌশল সুরচিত। উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর কোনও শব্দ মহাশূন্যের ঈথার-সমুদ্রে প্রেরিত হয়। সেই সঙ্গে উচ্চশক্তিসম্পন্ন

চিত্রগ্রহণযন্ত্রের সাহায্যে উর্ধ্বের ঈথার-লোকে প্রেরিত হয় ক্রমান্বয়ে ত্বরিতগতিতে-গৃহীত সংখ্যাতীত আলোকচিত্র। তারপর এক বিশেষ প্রকার গ্রাহক-যন্ত্রের দর্পণে আলোক-চিত্রগুলির ক্রমিক প্রতিফলনে এবং প্রেরিত ছবির সম্প্রসারণে সুদূরের দৃশ্য ও বাণী প্রতিভাত হয়। প্রযুক্তিবিদ্যার পরিভাষায়, ভিডিও কম্পাঙ্ক, রেডিও কম্পাঙ্ক ও শ্রুতি-কম্পাঙ্কের মিলিত তরঙ্গ দূরদর্শনের প্রেরক-যন্ত্রের আকাশ-তারের মধ্যস্থতায় চারদিকে ঈথার-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তা গ্রাহক-যন্ত্রের এণ্টেনায় প্রতিহত হয়ে বিশ্লিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন পথে সম্প্রসারিত হলে তার চিত্র-রশ্মিগুচ্ছ অতিপ্রভ পর্দায় প্রতিফলিত হয় ও শব্দতরঙ্গ বহুস্বনা-যন্ত্রে ধ্বনিত হয়। এইভাবে দূরদর্শন মুহূর্তমধ্যে সুদূরের চিত্র ও বাণীকে বহন করে এনে মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর করে তোলে।

দূরদর্শনের গঠন-কৌশল

দূরদর্শনের আবিষ্কার ইদানীং কালের। ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অত্যন্ত সীমিতভাবে ভারতে দূরদর্শন-যুগের সূত্রপাত ঘটে। অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে তা এখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। সূচনায় নয়াদিল্লীর চব্বিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে তার প্রচার-পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে তা সম্প্রসারিত হয়ে নয়াদিল্লীর চারদিকের ষাট কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত দর্শকদের কাছে দূরদর্শনের প্রচার-সূচীকে মূর্ত করে তুলেছে। 'বিদ্যালয়' দূরদর্শন কার্যসূচী, 'কৃষি-দর্শন' কার্যসূচী এবং 'নগর-নাগরিক' কার্যসূচীর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কয়েক লক্ষ ছাত্র, কৃষক ও শহুরে মানুষ।

ভারতে দূরদর্শন: দিল্লীতে

পঞ্চম যোজনায় দিল্লীর দূরদর্শন-কেন্দ্রের উন্নয়ন ও প্রসার এবং অন্যান্য স্থানে নতুন নতুন দূরদর্শন-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। ১৯৭২ সালে বোম্বাই-কেন্দ্রের এবং ১৯৭৩ সালে শ্রীনগর ও অমৃতসর কেন্দ্র দুটির উদ্বোধন হয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালের ৮ই আগস্ট উদ্বোধন হয়ে গেছে কলকাতা-কেন্দ্রের; মাদ্রাজ-কেন্দ্রেরও উদ্বোধন হয়ে গেছে ১৯৭৫ সালেই। উদ্বোধন হয়ে গেছে লক্ষ্ণৌ দূরদর্শন-কেন্দ্রেরও। কানপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল এবং মুসৌরিতে স্থাপিত হবে পুনঃ-সম্প্রচার কেন্দ্র। কালক্রমে, দিল্লীই হবে সারা দেশে দূরদর্শন প্রসার-বিন্যাসের প্রাণকেন্দ্র। এই কেন্দ্রের প্রচার-পরিধি ব্যাপ্ত হবে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

ভারতের অন্যান্য স্থানে দূরদর্শনের জাল-বিস্তার

এইভাবে কয়েকটি মূল কেন্দ্র ও তাদের অন্তর্গত কয়েকটি উপকেন্দ্র নিয়ে ভারতের দূরদর্শন-প্রচার বিন্যাসটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কলকাতার রাধা ফিল্ম স্টুডিওটি অধিগ্রহণ করে সেখানে স্থাপিত হয় কলকাতা দূরদর্শন-কেন্দ্র। ১৯৭৮ সালে উদ্বোধন হয়ে গেছে তার নিজস্ব কেন্দ্রের। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টার মধ্যে এর প্রচার-সূচী সীমিত। এর দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায়, কলকাতা-কেন্দ্র এখনো তার প্রারম্ভিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দূরদর্শন-কেন্দ্র: কলকাতায়

দূরদর্শনের সাফল্য যেমন বিস্ময়কর, তার সম্ভাবনাও তেমনি বহুবিস্তৃত। এক. দূরদর্শন মানুষের আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের মূল্যবান উপকরণ। দুই.

বিশ্বের সুদূরতম প্রান্তের সংবাদ ও ঘটনা সে মুহূর্ত-মধ্যে প্রত্যক্ষ ও জীবন্তরূপে তুলে ধরতে পারে। তিন. দূরদর্শন গত চন্দ্রাভিযানগুলির রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলির দৃশ্য ও বাণী তার নিপুণ দর্পণে বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত করে পৃথিবীর মানুষের কৌতূহল-নিরসনে সাহায্য করেছিল। তেমনি যে-কোন দুর্গম অভিযানের দৃশ্য ও বাণী সে তার দর্শকদের সামনে উপস্থিত করতে পারে। চার. সে খেলার মাঠে দর্শকদের ভিড় হ্রাসের সহায়ক হবে। পাঁচ. সিনেমা-থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহগুলিতেও ভিড় হ্রাস পাবে। ছয়. সাহিত্যবাসর, সংগীতবাসর, নৃত্যানুষ্ঠান, লোক-সংগীত ও লোক-নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে একদিকে যেমন ভিড় হ্রাস পাবে, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতি-চর্চার একটি নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। সাত. আধুনিক শিক্ষার সফলতা-সাধনে এবং সম্প্রসারণে দূরদর্শনের ভূমিকা হবে অনবদ্য। আট. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে দূরদর্শন তার সার্বজনীন আবেদনের দ্বারা নিরক্ষর কৃষক ও শ্রমিকদের নৈপুণ্য সম্পাদনের খুবই সহায়ক হবে। নয়. বহু ভাষা ও সংস্কৃতি-অধ্যুষিত ভারতের মতো বিশাল উপমহাদেশে জাতীয় সংহতি সৃষ্টির ব্যাপারে দূরদর্শনের ভূমিকা হবে তুলনা-রহিত। দশ. দূরদর্শনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিরও নব নব দুয়ার খুলে যাবে। তাছাড়া, দূরদর্শন-সেট উৎপাদনে ও মেরামত-কর্মে যেমন বহু লোক কর্মনিযুক্ত হবে, তেমনি দূরদর্শন-শিল্পীদেরও হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান।

উপকারিতা

কিন্তু কোন গোলাপই কণ্টকবিহীন নয়। দূরদর্শনেরও কুফল আছে। এক. দূরদর্শন প্রমোদ-বিতরণ ও অবসর-বিনোদনের বিশিষ্ট মাধ্যম হলেও এর মধ্যস্থতায় অশ্লীলতা এবং রুচি-বিকার সম্প্রসারিত হবে। দুই. রেডিয়ো ও চলচ্চিত্র-শিল্প কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিন. এই শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শিল্পী-কারিগরদের কেউ কেউ কর্মচ্যুতও হতে পারেন। চার. দূরদর্শন বিলাস-সামগ্রীরূপে পরিগণিত হবে। কিন্তু উপকারিতার তুলনায় এই অপকারিতা হবে অত্যন্ত নগণ্য।

অপকারিতা

ভারতে দিল্লী, বোম্বাই, শ্রীনগর, অমৃতসর, পুনা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, কলকাতা ও ভুবনেশ্বরে দূরদর্শনের মুখ দেখা গেলেও অন্যত্র দূরদর্শন এখনো অচেনা বস্তু। কাজেই, দূরদর্শন-কেন্দ্রের সম্প্রসারণই যথেষ্ট নয়, ভারতের জনগণের ক্রয়শক্তির দিকে তাকিয়ে স্বল্পমূল্যে দূরদর্শন-সেট উৎপাদনের দিকে এখনই মন দিতে হবে। তবেই দূরদর্শনের সার্থকতা ভারতবাসীর জীবনে সফল হবে ; নইলে, এই অর্থ-সংকটের দিনে নতুন একটা বহুমূল্য বিলাসের ফাঁস হয়ে তা জাতির গলায় নির্মমভাবে আটকে বসবে ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে টেলিভিশন
- ভারতে শিক্ষা-প্রসারে দূরদর্শনের অবদান
- ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নে দূরদর্শনের ভূমিকা
- দূরদর্শনের উপকারিতা ও অপকারিতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ কলকাতার যান-বাহন-সমস্যার মূলে ॥ কলকাতার পথঘাট ॥ কলকাতার যানবাহন ॥ কলকাতার পাতাল-রেল ॥ সময় ও ব্যয়-বরাদ্দ ॥ পাতাল-রেলের সম্ভাব্য উপকারিতা ॥ উপসংহার ॥

১৭
কলকাতার পাতাল-রেল

ভূমিকা

বিশাল জনসংখ্যার চাপে কলকাতার পথ ও পরিবহণ আজ বিপর্যয়ের মুখোমুখি। তার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার মুখের দিকে চেয়ে যদি নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত না হয়, যদি পথ ও পরিবহণের নতুন নতুন প্রকল্প রূপায়িত না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা-মহানগরীর পরিবহণ-ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়বে। কলকাতাকে বাঁচাতে হলে তার পথ ও পরিবহণ-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো আজ জরুরী প্রয়োজন।

কলকাতার যানবাহন-সমস্যার মূলে

কলকাতায় ইংরেজদের কুঠি-স্থাপন এবং দুর্গের প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষী, কর্মান্বেষী ও জ্ঞানান্বেষীর স্রোত অব্যাহত ধারায় এখানে প্রবাহিত হয়ে এসেছে ; কলকাতা কাউকে ফিরিয়ে দেয়নি। একথা সর্বজনবিদিত যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার পথ ও পরিবহণের ওপর পড়ে প্রচণ্ড চাপ ; কারণ, কলকাতাই ছিল তখন এশিয়ার সমস্ত সমরাঙ্গণে রসদ-সরবরাহের সর্বপ্রধান ঘাঁটি। তার ফলে, তার পথ-ঘাট হয়ে পড়ে ভগ্নপ্রায়। অথচ হৃদয়হীন ব্রিটিশ সরকার কলকাতার রাস্তাঘাট সম্পর্কে থাকে উদাসীন। নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ তো দূরের কথা, সামান্যতম মেরামতের কাজেও হাত দেওয়া হয়নি। তারপর দেশবিভাগের পর অগণিত বাস্তহারার দল কলকাতার উপকণ্ঠে এসে গড়ে তুলেছে বিশাল বিশাল উপনিবেশ। অন্যদিকে, কলকাতার আশেপাশে শিল্প-প্রসারের ফলে সমগ্র ভারত থেকে বহুলোক ব্যবসা-বাণিজ্যের আকর্ষণে অথবা কর্মের অন্বেষণে ছুটে এসেছে এখানে। রোজ প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনস্রোত রুজিরোজগারের ধান্ধায় প্রবাহিত হয়ে আসে কলকাতায়। দিনান্তে ফিরে যেতে হয় তাদের। ফলে, কলকাতা-মহানগরীর পরিবহণ-ব্যবস্থাতে সৃষ্টি হয় মারাত্মক সমস্যা।

কলকাতার পথঘাট

জন্মলগ্ন থেকেই কলকাতা মূলতঃ একটি অপরিকল্পিত নগরী। তার রাস্তাঘাট মান্ধাতার আমলের—অপ্রশস্ত এবং অসরল। কলকাতার এই বিশাল বর্ধিত কলেবর এবং সাম্প্রতিককালের এই জনবাহুল্য সেদিনের কল্পনারও অগোচর ছিল। মান্ধাতার আমলের সেই অপ্রশস্ত ও ভগ্নপ্রায় পথঘাট বর্তমানকালের যানবাহন এবং লোক-চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি কয়েকটি নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু ভিড় কমছে কই ?

ট্রাম এবং বাস কলকাতায় লোক-চলাচলের প্রধান উপায়। তাছাড়া আছে মোটরগাড়ি, ট্যাক্সি আর মানুষে-টানা রিক্শা। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশনের একতলা ও দোতলা বাসের সংখ্যা ১,৩৭৯। কিন্তু মেরামতের অভাবে

তার মধ্যে ৮১২টি প্রতিদিন অচল অবস্থায় পড়ে থাকে। কলকাতা-শহরে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের পাশাপাশি বেসরকারী বাসগুলিকেও নিয়মিত যাত্রীবহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাতেও সমস্যার সুরাহা হয়নি। পরে মিনিবাস চালু করা হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই সেই 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' রব। শহরতলির যাত্রীবহনের জন্যে বৈদ্যুতিক রেল চালু হয়েছে হাওড়া এবং শিয়ালদা—উভয় প্রান্তেই। হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনকে অতিরিক্ত যাত্রী-চলাচলের জন্যে ঢেলে সাজানো হয়েছে। টালা, গড়িয়াহাট এবং বালিগঞ্জে অধিসেতু নির্মিত হয়েছে; শিয়ালদায় একটি 'হাম্প' বা অধিসেতু নির্মিত হচ্ছে। কলকাতায় মাল-চলাচলের জন্যে রয়েছে লরী, টেম্পো এবং মান্ধাতার আমলের গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি আর মনুষ্যবাহিত ঠেলাগাড়ি। এ ব্যাপারে কলকাতা নতুনকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু প্রাচীনকেও পরিত্যাগ করেনি। স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত বসা আর ছুটির সময় কলকাতার রাস্তাঘাটগুলি বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। গন্তব্যস্থলে পৌছোবার জন্যে সবারই ক্ষিপ্র ব্যস্ততা। কিন্তু যানবাহনের সংখ্যা সীমিত, সীমিত রাস্তাঘাটগুলির যানবাহন-ধারণের ক্ষমতাও।

কলকাতার যানবাহন

এই সমস্যার সমাধানকল্পে পূর্বরেলের মহানাগরিক পরিবহণ প্রকল্পের [Metropolitan Transport Project] পাতাল-রেল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটি বহুদিনের পুরাতন। তার ওপরে অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ধূলোবালি কম জমেনি। যাই হোক, বহু টাল-বাহানার পর ১৯৭৫ সালে শুরু হয়েছে পাতাল-রেলের কাজ। কলকাতার এই প্রভূত ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ পাতাল-রেলের কার্যসূচীর রূপায়ণের পথে বাধা অনেক, অসুবিধা অনেক। কাজের সুবিধার জন্যে এই কার্য-সূচীকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায় টালিগঞ্জ থেকে এস্প্লানেড। দ্বিতীয় পর্যায় দমদম থেকে শ্যামবাজার। তৃতীয় পর্যায় শ্যামবাজার থেকে এস্প্লানেড। মোট দৈর্ঘ্য সতেরো কিলোমিটার। এতে থাকবে দমদমসহ সতেরোটি স্টেশন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। বিকল্প পরিবহণ-ব্যবস্থা চালু না করে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করা যাবেনা। অর্থাৎ, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মোট বারো কিলোমিটার পথও কবে চালু হবে জানা নেই। সম্ভবতঃ ১৯৮৫ সালের আগে নয়।

কলকাতার পাতাল-রেল

প্রকল্পটির জন্মলগ্নে অনুমিত হয়েছিল, এতে ব্যয় হবে চল্লিশ কোটি টাকা; সময় লাগবে পাঁচ বছর। কিন্তু রূপায়ণের মন্থরতায় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণাদির মূল্য-বৃদ্ধির দরুন এখন অনুমান করা হচ্ছে, এতে ব্যয় হবে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এবং যদি কাজের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকে, তাহলে হয়তো পাতাল-রেলের উদ্বোধন হবে ১৯৮২ সালে। ১৯৭৮ সালের মার্চ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। ১৯৭৮-৭৯ সালে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ১১ কোটি টাকা। বলা হয়েছে, আগামী বছরগুলিতে পাতাল-রেলের বরাদ্দের টাকা লাফিয়ে-লাফিয়ে ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ব্যয়ের বর্তমান মন্থরতায়

সময় ও ব্যয়-বরাদ্দ

কাজের অগ্রগতির মন্থরতাই প্রতিফলিত। এইভাবে মন্থর গতিতে কাজ চললে সমাপ্ত হতে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় হবে এবং সময় লাগবে আরো বেশী।

তবে পাতাল-রেলের কাজ সমাপ্ত হলে জনবহুল কলকাতার পরিচিত রূপ বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। স্মরণীয় যে, সূচনা-লগ্নে কলকাতার প্রাণ-প্রবাহ ছিল গঙ্গা। নদীর পরিবহণ-ক্ষমতাকে অবলম্বন করে সেদিন বন্দর গড়ে উঠেছিল। নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি ছিল সেদিনের আশা-ভরসা। তাই সেদিনের কলকাতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল গঙ্গার তীরের সান্নিধ্যে। কিন্তু পরবর্তীকালে এলো মোটর, বাস, লরী ইত্যাদি যানবাহন। কলকাতা গঙ্গাতীরের সান্নিধ্য ছেড়ে সম্প্রসারিত হতে লাগলো রাজপথের দুধারে। এর পর পাতাল-রেল চালু হলে কলকাতা কেন্দ্রীভূত হবে পাতাল-রেলপথের দুপাশেই। দ্রুতগতিসম্পন্ন পাতাল-রেল তখন কলকাতার চেহারা দেবে বদলে। স্বভাবতঃই, অন্যান্য পথ ও পরিবহণের গুরুত্ব তখন অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-কাছারি তখন পাতাল-রেলের ওপরেই নির্ভরশীল হবে বেশী। পথেঘাটে মানুষের ভিড় হ্রাস পাবে। মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ হবে।

পাতাল-রেলের সম্ভাব্য উপকারিতা

কিন্তু কলকাতার জনসংখ্যা হ্রাস না পেয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েই চলবে। তাতে পাতাল-রেল কলকাতার বর্তমান যানবাহনে মানুষের ভিড় কমাতে সক্ষম হলেও আগামী কালের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় সেই ভিড় যে বাড়তে থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। হাওড়া এবং শিয়ালদায় যখন বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হয়, তখন আশা করা গিয়েছিল, কলকাতায় ট্রাম-বাসের ভিড় হ্রাস পাবে। কিন্তু কলকাতার ট্রাম-বাসের ভিড় যথাপূর্বম্। বরং বেড়েছে বৈ কমেনি। পাতাল-রেল চালু হলে কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দৌলতে অন্যান্য পরিবহণ অচল হয়ে যাবে না, তা নিঃসন্দেহ।

অন্যান্য পথ ও পরিবহণের ভবিষ্যৎ

যাই হোক, পাতাল-রেল জনভারে জর্জরিত কলকাতার ভিড় হ্রাসে অনেকাংশে সক্ষম হবে। কলকাতার পাতাল-রেলের দাবি বহুদিনের। কিন্তু নানা অজুহাতে সেই দাবি এতকাল উপেক্ষিত হয়েছে। তার ফলে কলকাতার যানবাহনের পরিস্থিতি আজ এক অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। যাত্রী-মাশুল বাড়ে, কিন্তু ভিড় কমে না। অতিরিক্ত ভাড়া গুণেও ট্রামে-বাসে পা রাখার স্থানের সংকুলান হয় না। যাত্রীদের দুঃখ যত বাড়ে, যানবাহনের মালিকদের মুনাফার তহবিল ততই ফুলে কেঁপে ওঠে। এবার বিলম্বে হলেও পাতাল-রেল চালু হলে কলকাতার মানুষদের এই চরম দুর্গতির অনেকটা সুরাহা হবে। কলকাতার মানুষদের যাতায়াত অনেকটা সহজ এবং সংকটমুক্ত হবে, অবসান হবে তাদের দিনগত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- কলকাতার যানবাহন-সমস্যা ও পাতাল-রেল
- কলকাতার পাতাল-রেলের প্রয়োজনীয়তা
- কলকাতার পাতাল-রেল ও তার সম্ভাব্য উপকারিতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ আবির্ভাব ॥ বাল্য-কাল ॥ ভক্তির উন্মেষ ॥ সাধু-সঙ্গ ॥ কলকাতায় আগমন ॥ যাজকতা ॥ ভবতারিণী দেবী-মন্দিরে পূজারীর ভূমিকা ॥ ভাব-বিহ্বলতা ॥ বিবাহ ॥ ভক্তি-সাধনা ॥ বেদান্ত-সাধনা ॥ সাধনায় সিদ্ধি-লাভ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী ও শিষ্য-সম্প্রদায় ॥ মহাপ্রয়াণ ॥ উপসংহার ॥

২০ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির অন্ধ তামসিকতার প্রাচীর পড়লো ভেঙে। দেখতে দেখতে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-সংস্কৃতি, জ্ঞান-সাধনা ও কর্ম-সাধনায় এলো রূপান্তর। বহুদিনের সুপ্তিমগ্ন সমাজ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে গতির আবেগে সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাঙালীর চিন্তায়, মনীষায় এলো অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এলো রেনেসাঁস্। কিন্তু জ্ঞানের শুষ্ক বালুরাশিতে বাঙালীর হৃদয় তৃপ্তি পায়নি। তার তৃষিত হৃদয় এমন এক মহামানবের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল, যিনি ভাবের বন্যায় বাঙালীর মনোভূমিকে শ্যামল, সরস করে তুলবেন, যিনি বহু মতের ও বহু পথের সমন্বয় সাধন করে ধর্মের গণ্ডীকে প্রসারিত করে দেবেন মানবতার সুদূর আকাশে। তিনি এলেন—তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

আবির্ভাব

'স্বরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এলো মহাজন্মের লগ্ন—'

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম। নব-ভারতের তীর্থক্ষেত্র। ১৮৩৩ সাল। এখানেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত পর্ণকুটিরে আবির্ভূত হলেন নব-যুগের আধ্যাত্মিকতার মূর্তবিগ্রহ—গদাধর। গয়ার শ্রীশ্রীগদাধরের মানত

বাল্যকাল

করে মাতা চন্দ্রমণি তাঁকে পেয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-নাম রাখা হয়েছিল গদাধর। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় হলো গদাধরের শিক্ষারম্ভ। কিন্তু পাঠশালার সেই কেতাবী বিদ্যা তাঁর বিশাল মানস-ভূমিকে পারলো না তৃপ্তি দিতে। অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতিই হলো তাঁর শিক্ষানিকেতন। তীক্ষ্ণ বোধ-শক্তি এবং অসাধারণ অনুভব-ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন গদাধর। মূর্তি-রচনা, যাত্রা, গান, কথকতা ইত্যাদির প্রতি তাঁর ছিল অস্বাভাবিক ঝোঁক এবং

ভক্তির উন্মেষ

ভাব-তন্ময়তা ছিল তাঁর আবাল্য প্রকৃতি। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি তাঁর দেখা যেত প্রগাঢ় অনুরাগ। কিন্তু সর্বোপরি, শৈশবের সেই দিনগুলিতেই তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ পেত এমন একটি অসাধারণ দৈবী প্রকাশ, এমন একটি আশ্চর্য অসাধারণত্ব, যা সবাইকে বিস্মিত করতো এবং সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতো।

কামারপুকুরের ভেতর দিয়ে ছিল পুরী যাত্রার হাঁটা-পথ। সেই পথে যে সব সাধু-সন্ন্যাসী যাতায়াত করতেন, তাঁরা মধ্যে মধ্যে তাঁদের গ্রামে বিশ্রাম করতেন। বাল্যেই তিনি সেই সব ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হন। মনের মধ্যে ছিল ধর্ম-ভাবনার অমোঘ বীজ, অনুকূল পারিপার্শ্বিকতায় তা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে।

সাধু-সঙ্গ

পাঠশালার গ্রন্থসর্বস্ব লেখাপড়ায় তৃপ্তি হলো না গদাধরের। যিনি বিশ্বের অনাথ আতুরজনের জন্যে মুক্তির বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন, তাঁকে বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা বাঁধবে কোন্ শক্তিতে? ইতিমধ্যে তিনি ধর্মের অমৃত-বাণী কণ্ঠে নিয়ে জনগণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যাত্রা-কথকতা করে দিন কাটাচ্ছেন শুনে অগ্রজ রামকুমার যাজকতা-কার্যে সাহায্য করবার জন্যে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

কলকাতায় আগমন

কলকাতায় এসে গদাধরের পূজা-অর্চনা, স্তবপাঠ ইত্যাদিতে দেখা দিল আশ্চর্য ভাব-তন্ময়তা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রামকুমার তাঁকে শাস্ত্রসম্মত যাজন-ক্রিয়া শেখাতে পারলেন না। যে শাস্ত্রীয় পূজার্চনায় হৃদয়ের স্পর্শ নেই, নেই অন্তরের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা, সেই পূজার প্রতি গদাধরের কোনদিনই সমর্থন ছিল না। সম্পূর্ণ মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন হয়েও কেবল ভাবাকুতির দ্বারা স্বর্গের দেবতাকে বুকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

যাজকতা

ক্রমে গদাধর দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী বিগ্রহের বেশকারীর পদে নিযুক্ত হলেন। সেই থেকে গদাধর ভাবতন্ময় হয়ে দেবীর সাজসজ্জায় আত্মনিয়োগ করলেন। দেবী যে প্রস্তরময়ী, ভক্তিবিহ্বলতার প্রবল আবেগে তিনি তাও বিস্মৃত হলেন। পরে রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর বৃত হলেন ভবতারিণী-মন্দিরের পূজারীর পদে। তাঁর ভক্তিপ্লুত পূজা-নিবেদনের অভূতপূর্ব আকুতি দেখে সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। এই সময়ে গভীর নিশীথে পঞ্চবটী বনের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তিনি একাকী গোপনে ধ্যানস্থ হতেন।

ভবতারিণী দেবী-মন্দিরে পূজারীর ভূমিকা

পূজার প্রচলিত শাস্ত্রীয় রীতি পরিত্যাগ করে গদাধর যখন থেকে ভক্তি-ব্যাকুল কণ্ঠে স্তবপাঠ করতেন, কিংবা গান করতেন, কিংবা 'মা খাও', 'মা পর' বলে নৈবেদ্য অন্ন তুলে বিগ্রহের মুখের কাছে ধরতেন, তখন অনেকের এই ধারণা হলো যে, তাঁর বুঝি মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। ক্রমশঃ গদাধর আনুষ্ঠানিক পূজা করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। তিনি মাতৃধ্যানে সর্বদা তন্ময় হয়ে থাকতেন। ক্রমে, তিনি সর্বভূতেই করতে লাগলেন মাতৃ-দর্শন।

ভাব-বিহ্বলতা

এই সময়ে তাঁর বিধবা জননী তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীসারদামণির সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। কিন্তু

গদাধর সারদামণিকেও মাতৃজ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে গদাধর আবার ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এখানে একদিন ভাব-তন্ময় হয়ে তিনি গঙ্গাতীরে বসে গান করছেন, এমন সময় এক ভৈরবী সন্ন্যাসিনী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর মধ্যে মহাভাবের দিব্য আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং সমস্ত উপকরণাদির আয়োজন করে ভক্তি-সাধন-মার্গে তাঁকে দিলেন পথ-নির্দেশ। তারপর এলেন পরম-সাধক তোতাপুরী। তিনি তাঁর গুরুপদে বৃত হয়ে তাঁকে দিলেন বৈদান্তিক সাধনায় দীক্ষা। যে বেদান্ত সাধনায় মহাসাধক তোতাপুরীর লেগেছিল সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর, গদাধর সেই দুশ্চর সাধনা মাত্র একদিনেই আয়ত্ত করে লাভ করলেন নির্বিকল্প সমাধি। আসল কথা, ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল; অপেক্ষা ছিল কেবলমাত্র বীজ-বপনের। সময়মতো সেই বীজ উপ্ত হলো এবং স্বল্পকালের মধ্যেই ফললো সাফল্য ও সিদ্ধির সোনার ফসল। তোতাপুরী বিস্মিত হলেন। কামারপুকুরের গদাধর হলেন বিশ্বের শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিবাহ

ভক্তি-সাধনা

বেদান্ত-সাধনা

সাধনায় সিদ্ধিলাভ

এবার তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা প্রচারিত হয়ে গেল দিকে দিকে। বহু পিপাসিত চিত্ত ছুটে এলো দক্ষিণেশ্বরে। তিনি সবাইকে পরম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'যত মত, তত পথ।' পৃথিবীর সমস্ত পথই গিয়ে পৌঁচেছে পরমেশ্বরের পদতলে। অন্ধকারে পথহারা মানুষ পেল আলোকের ঠিকানা, মুক্তি-পথের নির্দেশ। এলেন সিমলার দত্ত-পরিবারের নরেন্দ্রনাথ। তিনি এই পরশমণির স্পর্শে হলেন জ্যোতির্ময় বিবেকানন্দ। তিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে গেলেন এবং শিবজ্ঞানে জীব-সেবার গুরু-নির্দেশকে মূর্ত করে তুললেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে। ১৮৮৬ সাল। জগতের সকল পাপ আকণ্ঠ ধারণ করে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে শ্রীরামকৃষ্ণ করলেন মহাপ্রয়াণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণী ও শিষ্য-সম্প্রদায়

মহাপ্রয়াণ

শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙালীর ভক্তি-সাধনার, ভাব-সাধনার, এক কথায়, বাঙালীর হৃদয়ের মূর্ত প্রতীক। খ্রীস্টধর্মের প্রবল বন্যায় যখন সনাতন হিন্দুধর্মের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যখন ভাঙ্গন ধরেছিল মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসে, যখন অজ্ঞান-তিমিরে পথের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিল সমগ্র জাতি, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন আলোকিত পথ—সেবার পথ। সেবাই যুগধর্ম, তাইই পৃথিবীতে প্রচার করেছেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী
- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- বাংলার প্রধান ধর্মগুরু

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ আবির্ভাব ॥ বংশ-পরিচয় ॥ বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা ॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন ও শিষ্যত্ব-লাভ ॥ বিবেক-বাণী ॥ বিশ্ব-বিজয় ॥ আমেরিকার ধর্ম-মহাসভা ॥ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ॥ বলিষ্ঠ ভারত-গঠন ॥ উপসংহার ॥

২১ বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

'আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের একমাত্র ইষ্টদেবতা হচ্ছেন জননী জন্মভূমি। তাঁরই পূজো করো তোমরা। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের কিছুদিন ভুলে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমিকা

পরাধীনতার নীরন্ধ্র অন্ধকারে নিমগ্ন জাতির হৃদয়কে কে বজ্র-গর্ভ অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন?···কে এই জড়তাগ্রস্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, পরানুকরণমত্ত জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন প্রকৃত ভারত-সন্ধানে?···কে এই মৃত্যু-দুর্বল, অন্ধ-তামসিকতাময় বিরাট মহাদেশকে জ্যোতির্ময় মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী শুনিয়ে যৌবধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?—তিনি মহাসন্ন্যাসী বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। তিনি নব-যুগের নব-নির্মিত জিয়ন-কাঠির স্পর্শে এই মোহমুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত জাতির অনড় দেহে সঞ্চারিত করলেন অভূতপূর্ব প্রাণের স্পন্দন।

আবির্ভাব

আকুমারিকা-হিমাচল যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠলো তাঁর উদাত্ত আহ্বানে। পরাধীন, হৃতসর্বস্ব, জীবন্মৃত সমগ্র জাতি ফিরে পেল তার আত্মশক্তি ও লুপ্ত বিশ্বাস। দিশাহারা জাতি এতদিনে খুঁজে পেল প্রকৃত মুক্তিপথের সন্ধান।

বংশ-পরিচয়

১৮৬৩ সাল। উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীর বিখ্যাত দত্ত-পরিবার। দানে-ধ্যানে এই পরিবারের খুব নাম-ডাক। এখানেই ভূমিষ্ঠ হলেন নব-যুগের ভারত-পথিক বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত—কলকাতার স্বনামধন্য, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। বীরেশ্বরের কৃপায় বিবেকানন্দকে লাভ করেছিলেন বলে জননী তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বীরেশ্বর'; ডাক-নাম—'বিলে'। পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ।

বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা

নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক এবং দুরন্ত প্রকৃতির। তাঁর নিত্য-নতুন দুরন্তপনায় সকলেই তটস্থ। কেবল শিব-নাম উচ্চারণে তাঁকে শান্ত করা সম্ভব হতো। প্রশ্ন করা এবং সব বিষয় স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখা ছিল তাঁর আবাল্য প্রকৃতি। ফলে, তাঁর সেই সব প্রশ্ন ও পরীক্ষা নিয়ে বাড়িতে সৃষ্টি হতো নিত্য-নতুন অনর্থ। তাঁর বুদ্ধি ও মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। আর ছিল এক আশ্চর্য ধ্যানের নেশা। তিনি মেট্রোপলিটান্ স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। অন্যদিকে, পাঠ্য-জীবন থেকেই ব্যায়াম ও খেলাধূলা, বিতর্ক, বক্তৃতা এবং সঙ্গীত-চর্চার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ।

প্রথম যৌবনে দর্শন-শাস্ত্র পাঠ এবং তীক্ষ্ণ বিজ্ঞান-বুদ্ধি তাঁকে নাস্তিক করে তোলে। বিশ্বাসের কোথাও কিছু খুঁজে না পেয়ে কিছুকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু সেখানেও তাঁর অবিশ্বাসী মন তৃপ্তি পেল না। এই সময়ে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনে দেখা দিলেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাঁর এক ভক্ত-গৃহে পদার্পণ করলে তাঁকে গান শোনাবার জন্যে ডাক পড়ে সুকণ্ঠ নরেন্দ্রনাথের। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই থেকে নরেন্দ্রনাথকে আশ্চর্য আকর্ষণে কাছে টানতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ সেই আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন ও শিষ্যত্ব-লাভ

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর ভারত-পথিক বিবেকানন্দ যাত্রা করলেন ভারত-ভ্রমণে। অধঃপতিত, জীবন্মৃত জাতিকে তিনি সেদিন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করলেন তাঁর তমোঘ্ন 'অভীঃ' মন্ত্রে। তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণীতে আকুমারিকা-হিমাচল যেন সহসা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হয়ে জেগে উঠলো। এই সময়ে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে এলো আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের আয়োজনের সংবাদ। কয়েকজন ভক্তের অনুরোধে বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে শিকাগো শহরে গমন করেন। গৈরিক পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণ-পরিহিত এই সুদর্শন তরুণ-সন্ন্যাসীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। এই সভায় তিনি মাত্র পাঁচ মিনিট বক্তৃতা-দানের অনুমতি পান ; কিন্তু বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে আমেরিকাবাসীদের 'আমার আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' সম্ভাষণ সৃষ্টি করলো এক অভূতপূর্ব আনন্দ-উত্তেজনা। তারপর তিনি এক ঝড়ের মতো বিপুল হৃদয়াবেগে হিন্দুধর্মের মূল-সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করে বিমোহিত করে দিলেন সমবেত শ্রোতৃবর্গকে। সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসী জানলো, আধ্যাত্মিকতার গভীর উচ্চারণে ও অনুভূতির প্রশান্ত নম্রতায় হিন্দুধর্মই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ। এবং সেই হিন্দুধর্মই বিশ্বের ক্রন্দনাতুর মানব-সন্তানকে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। এতদিনে যেন পাশ্চাত্যের চোখে ভারত আবিষ্কৃত হলো। আমেরিকায় চার বছর কাল হিন্দুধর্ম প্রচার করে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন ভারতে আমেরিকায় বহু জ্ঞানী-গুণী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। য়ুরোপের শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে মার্গারেট নোব্‌ল এদেশে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

বিবেক-বাণী

বিশ্ব-বিজয়

আমেরিকার ধর্ম-মহাসভা

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিবেকানন্দ সাংগঠনিক কার্যে আত্মোৎসর্গ করলেন। এই বিপর্যস্ত, সর্বরিক্ত দেশকে সংগঠিত করবার মহান্ ব্রত নিয়ে তিনি এক আদর্শ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সংগঠনে মন দিলেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর স্বপ্নের সেবা-প্রতিষ্ঠান—'রামকৃষ্ণ মিশন'। তারপর দেখতে দেখতে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সিংহল, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর পরিকল্পিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রতিষ্ঠিত হলো নবযুগের পুণ্যতীর্থ—বেলুড় মঠ। তাঁর দীর্ঘ-লালিত একটি

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা

স্বপ্ন এতদিনে সফল হলো। বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তারপর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে যে বিশ্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগদান করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর দ্রুত স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা জুলাই মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে সমাধিমগ্ন অবস্থায় এই মহাজীবনের ঘটে মহাপ্রয়াণ।

এই পরপদানত, ঐতিহ্য-বিস্মৃত, দুর্বল ভারতবাসীকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই যেন ভারতে বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ঘটেছিল মহান্ আবির্ভাব। তাঁর আবির্ভাবে জন্মলাভ করলো এক বলিষ্ঠ ভারত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের দুর্বলতা ও পরাভবের কারণ—তার ঘৃণ্য জাতিভেদ। এই জাতিভেদ দূর করতে না পারলে হিন্দুসমাজের পুনরুত্থান নেই। তাই তিনি সমগ্র সমাজকে ডেকে বললেন,—'বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার রক্ত, আমার ভাই…।' সেই সঙ্গে তিনি আর্ত পীড়িত বিপন্ন মানবতার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করলেন এই আদর্শহীন জাতিকে। মানবসেবার মাধ্যমে মুক্তির সন্ধান, কর্মের মধ্য দিয়ে শ্রীভগবানকে লাভ করাই ছিল এই বীর-সন্ন্যাসীর বীরবাণী। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি আহ্বান করলেন :

বলিষ্ঠ ভারত গঠন

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-পুত্র এবং ভারত-আত্মার জ্যোতির্ময় প্রতীক। স্বদেশ ও সমাজকে তিনি পরিণত করেছেন মহামানবতার পুণ্য পীঠস্থানে। একদিকে তিনি চির-অবহেলিত ভারতের দিকে বিশ্বের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে ভারতের সমাজ-জীবনে যে যুগ-যুগান্তরের কুসংস্কার স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছিল, তা অপসারিত করে তাকে নব-যৌবনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। এই মহাসন্ন্যাসী ভারতকে কর্মের পথে অগ্রসরণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আজ ভারত তা বিস্মৃত হয়ে নানা দুর্বলতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে। এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমরা যেন শুনতে পাই বিবেকানন্দের সেই অগ্নিগর্ভ বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এবং আমরা যেন ভুলে না যাই তাঁর সেই চির উজ্জ্বল বীরবাণী—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য ॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- কর্ম-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
- স্বামী বিবেকানন্দ, ক. প্রা. '৬৬
- 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়।'

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা ॥ কর্মজীবন ॥ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্য-বিবাহ নিবারণ ॥ শিক্ষা-বিস্তার ॥ দয়ার সাগর ও মাতৃভক্তি ॥ সাহিত্য-কীর্তি ॥ চরিত্র-সুষমা ॥ উপসংহার ॥

২২ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

উ. মা. '৭৮

'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু!'

—কবি শ্রীমধুসূদন

ভূমিকা

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর বাঙালী জাতির কাছে একটি অতি-পরিচিত, প্রিয় মানুষের নাম। শাস্ত্রীয় প্রাচীরের অচলায়তনের মধ্যে যখন নাভিশ্বাস উঠেছিল সমগ্র সমাজের, তখন পৃথিবীর পশ্চিম দিগন্ত থেকে ছুটে এলো দুরন্ত পশ্চিমা-ঝড়। সেই ঝড়ের আঘাতে আমাদের অন্ধকার অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। পশ্চিম আকাশের বিচ্ছুরিত আলোয় আমরা দেখলাম, কতকালের কত অর্থহীন জঞ্জাল আমাদের সমাজের আনাচে-কানাচে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। তাতে লেখা আছে কত অশ্রুর ইতিহাস। সেই কুসংস্কারের আবর্জনা-স্তূপ থেকে মুমূর্ষু সমাজকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করলেন কর্মবীর রামমোহন। তবু সমাজে জমেছিল বহু দুঃখ, বহু ক্রন্দন। সেই দুঃসহ দুঃখ ও অসহায় ক্রন্দন সহৃদয়তার কোমল করস্পর্শে মুছিয়ে দিয়ে যিনি সমাজের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৮২০ সাল। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের সিংহ-শাবক ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হলেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার। কিন্তু দারিদ্র্য তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রের বলিষ্ঠ মানসিকতাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারে নি; বরং দারিদ্র্যের সঙ্গে আশৈশব অবিরাম সংঘাতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্দমনীয় তেজস্বী এবং অনমনীয় জেদী। শৈশবেই তিনি তাঁর দুর্জয় জিদের জন্যে পিতামাতার চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিলেন।

বাল্যকাল ও বিদ্যাশিক্ষা

বালক ঈশ্বরচন্দ্র অতি শৈশবেই গ্রামের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করে দরিদ্র পিতার হাত ধরে পদব্রজে শহর কলকাতায় পাড়ি দিলেন। কলকাতায় অত্যন্ত দীন-ভাবে শুরু হলো এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের শিক্ষা-জীবন। আপন মেধাও প্রতিভা-বলে তিনি দারিদ্র্যের সকল চক্রান্তকে পরাজিত করে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করলেন। অসীম ক্ষমতাবলে তিনি প্রতি বছরই প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তিলাভ করতে লাগলেন। কঠোর পরিশ্রমে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বাসার সব কাজ স্বহস্তে সম্পাদন করতে হতো। একদিকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, অন্যদিকে অসাধারণ অধ্যয়ন-স্পৃহা। দারিদ্র্যের সুতীক্ষ্ণ কশাঘাত তাঁকে বিদ্যার কঠোর সাধনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অসামান্য প্রতিভাবলে

তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে লাভ করলেন দুর্লভ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। কেবল প্রাচ্য সংস্কৃত-বিদ্যাই নয়, পাশ্চাত্য ইংরেজি-শিক্ষার প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা-গ্রহণের পাশাপাশি স্বচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষাও চলেছিল তাঁর। এইভাবে কঠোর অধ্যবসায় ও অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত হয়।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকের পদে বৃত হলেন। কিছুকাল পরে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি সহকারী সম্পাদকের পদ এবং পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করলেন। সেই সঙ্গে গ্রহণ করলেন স্কুল-পরিদর্শকের অতিরিক্ত কার্যভার। কিছুকাল পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করে তাঁর জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এই সময় মেট্রোপলিটন্ কলেজ [বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ] প্রতিষ্ঠা তাঁর কঠোর পরিশ্রমের পরিণাম-ফল।

কর্মজীবন

ভারতে রামমোহনের সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদের ফলে, কৌলিন্য ও বহু-বিবাহ-প্রথার অনুগ্রহে সমাজে বিধবার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘরে ঘরে বৈধব্যের কাতর ক্রন্দনে বিগলিত হলো বিদ্যাসাগরের হৃদয়। জননী ভগবতী দেবীর নির্দেশে সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্যে কৃত-সংকল্প হলেন তিনি। 'সুরধনী যখন মর্ত্যে অবতরণ করে তখন কাহার সাধ্য যে সেই প্রবাহ রোধ করে?' দুর্বার পদবিক্ষেপে অভীষ্ট সিদ্ধির স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চললেন একক পথিক। বহু বাধা ও তীব্র প্রতিরোধ অতিক্রম করে অবশেষে তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হলো। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। বাল্য-বিবাহ নিবারণও তাঁর অন্যতম কীর্তি।

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্য-বিবাহ নিবারণ

তিনি বুঝেছিলেন, ভারতীয় সমাজের যত অন্ধকার, যত দুঃখ, যত ব্যভিচার— তার মূলে আছে শিক্ষার অভাব। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জড়তাগ্রস্ত সমাজে বন্ধনমুক্ত মানবিকতার উদ্বোধনে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি, তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেশময় শিক্ষা-বিস্তার-মানসে তিনি নির্বিচারে গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষা-বিস্তার ছিল তাঁর সমাজ-সংস্কারের প্রাথমিক সোপান। কেবল পুরুষদের মধ্যেই নয়, নারী-সমাজেও শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে ছিল তাঁর সমান উৎসাহ। দেশে বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনও তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা সেকালের এক ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে সত্যিই বিস্ময়কর।

শিক্ষা-বিস্তার

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের প্রকৃত পরিচয় তাঁর 'দয়ার সাগর', 'করুণাসাগর' নামে। বিদ্যাসাগরের দয়ার তুলনা নেই। তাঁর এই সীমাহীন দয়ার মূলে ছিল গভীর

মানবতাবোধ ও অসীম পরদুঃখকাতরতা। করুণার প্রতিমূর্তি জননী ভগবতী দেবীর কাছ থেকে তিনি এই গুণগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তি তো একটি জন-প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং এই মাতৃভক্তিই তাঁকে সব বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে পরের দুঃখ-মোচনের প্রেরণা দান করেছে।

দয়ার সাগর ও মাতৃভক্তি

বাংলা সাহিত্যও বিদ্যাসাগরের প্রতিভার কাছে গভীরভাবে ঋণী। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'বর্ণ পরিচয়', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ কেবল প্রবহমান স্বতঃস্ফূর্ত গদ্যের দৃষ্টান্ত হিসেবেই নয়, শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত প্রাণোচ্ছল গদ্য-রূপেও সকলের হৃদয় হরণ করে। বর্ণ পরিচয়ের 'জল পড়ে পাতা নড়ে', [জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে ?]—রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আদি কবির প্রথম কবিতা।' আর, সীতার বনবাসের আলেখ্যদর্শন বর্ণনার চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল : 'এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়।'

সাহিত্য-কীর্তি

বিদ্যাসাগরের মতো এমন সুদৃঢ় পুরুষকার চরিত্র, এমন সংগ্রামী বলিষ্ঠ চেতনা, যা কেবল পাশ্চাত্য দেশেই সম্ভব, তা এদেশে কিরূপে সম্ভব হলো, তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিতের প্রতি পাতাতেই দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন।' তাঁর মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার হয়েছিল অপূর্ব সংমিশ্রণ। দয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যেমন কুসুমাদপি কোমল, কর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তেমনি বজ্রাদপি কঠোর।

চরিত্র-সুষমা

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই এই অজেয় পৌরুষ-শিখা হলো চির-নির্বাপিত। তাঁর নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঋষির অতলান্ত প্রজ্ঞা, ইংরেজ সৈনিকের দুর্বার তেজস্বিতা এবং বাঙালী জননীর স্নেহ-সুকোমল হৃদয়ের ঘটেছিল অপূর্ব সম্মিলন। সমাজের অর্থহীন কুসংস্কার তাঁকে ব্যথিত করেছিল। শিক্ষা-প্রসার ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। যাঁর সমুচ্চ জীবনাদর্শ এই অধঃপতিত জাতিকে চরম অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, যাঁর বিলাসিতাহীন সরল জীবন এই শুষ্ক, হৃদয়হীন দেশে এনেছিল করুণার প্লাবন, সেই করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর ছিলেন দরিদ্রের পরম বন্ধু, মানবতার মহান্ পুরোহিত এবং সর্বজনপূজ্য শ্রেষ্ঠ বাঙালী। সমগ্র বাঙালী জাতি তাঁর কাছে অসীম ঋণে ঋণী।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, গৌ. প্রা. '৬৩
- সমাজ-সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- তোমার আদর্শ মহাপুরুষের জীবনচরিত, উ. মা. '৭৮

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা॥ পরিবেশ ও আবির্ভাব॥ শৈশব-শিক্ষা॥ কবি-কিশোরের কাব্য-চর্চা॥ সাহিত্য-সাধনা॥ নোবেল পুরস্কার॥ রবীন্দ্র-সংগীত॥ নাটক ও অভিনয়॥ স্বদেশ ও সমাজ॥ বিশ্ব-ভ্রমণ॥ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন॥ মহাপ্রয়াণ॥ উপসংহার॥

২৩ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

'আমার একটিমাত্র পরিচয় আছে ; সে আমি কবি মাত্র।' —রবীন্দ্রনাথ

কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বিশ্বের এক বিরাট বিস্ময়। কেবল কবি-শ্রেষ্ঠ হিসাবেই নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌রূপেও তিনি সারা বিশ্বে সম্মানিত। মানব-জীবনের এমন কোন চিন্তা নেই, এমন কোন ভাব নেই, যেখানে তিনি বিচরণ করেন নি। তিনি মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার পালাগান রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর কাব্যে ব্যথাহত পাবে ব্যথা-বিজয়ের প্রেরণা, দার্শনিক পাবেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান, রাজনীতিক পাবেন নির্ভুল পথের নির্দেশ, মৃত্যুপথযাত্রী পাবেন মৃত্যুঞ্জয়ী সান্ত্বনা। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র কল্পবৃক্ষ ; ব্যথা, বেদনা ও হতাশাময় এই পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাব-তরঙ্গে অবগাহন করি, তাঁর চিন্তা-ধারায় চিন্তা করি, তাঁর সুরে গান গাই, তাঁর ভাষায় কথা বলি। আমরা রবীন্দ্রনাথে মরি ও বাঁচি।

ভূমিকা

কলকাতার জোড়াসাঁকোর প্রখ্যাত ঠাকুর-পরিবার। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। কাব্য-কবিতা ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা থেকে জাতীয় জাগৃতির শুভ উদ্বোধন পর্যন্ত এই পরিবারের সার্থক অবদানের কথা সমগ্র ভারত চিরকাল সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে। সেই সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যোতির্ময় ঔপনিষদিক সাধনা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভূতপূর্ব যোগফল এবং নবোন্মেষিত স্বাদেশিকতা এই পরিবারে যে একটি অভিনব সৃষ্টিমুখর পরিমণ্ডল রচনা করেছিল, তারই মধ্যে ১৮৬১ সালের ৭ই মে [২৫শে বৈশাখ] ভূমিষ্ঠ হলেন এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মহামনীষী রবীন্দ্রনাথ।

পরিবেশ ও আবির্ভাব

ঠাকুর-পরিবারের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা, মার্জিত সাংস্কৃতিক চেতনা এবং পিতার আলোকিত ধর্ম-বিশ্বাস সফল হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও স্বদেশ—রবীন্দ্র-কাব্যের এই চার দিগন্তে পড়েছিল তার জ্যোতির্ময় প্রভাব। শৈশবে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ও নর্ম্যাল স্কুলে কিছুকাল তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু মর্মের গভীরে বিশ্ব-প্রকৃতির উদার আহ্বান তাঁকে স্কুলের গণ্ডীবদ্ধ বন্দী-জীবন বেশীদিন সহ্য করতে দিল না। অগত্যা গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা। স্কুল-কলেজের কুণ্ঠিত বিদ্যায় তাঁর মন ভরেনি, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যার সকল দুয়ার তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়।

শৈশব-শিক্ষা

এবার কবি-কিশোরের শুরু হলো নিরবচ্ছিন্ন কাব্য-চর্চা। তেরো বছর বয়সে রচিত তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। তারপর তাঁর কাব্যোদ্যানে শুরু হয়ে যায় কাব্য-কুসুমের উৎসব। সতেরো বছর বয়েসে অধ্যয়নের জন্যে তাঁকে বিলেতে যেতে হয়। কয়েক বছর পরে পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় পরিচয় এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের সুর-মূর্ছনা নিয়ে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রেরণায় এবার প্রাণে এলো গানের মরশুম, রচিত হলো প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংগীত-চর্চার আশ্চর্য ফসল।

কবি-কিশোরের কাব্য-চর্চা

বাংলা কাব্যের প্রথম রূপশিল্পী তিনি। হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে মানুষের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার ভাষায় তিনি রূপ দিয়েছেন। যৌবনের প্রথম প্রভাতে তাঁর কাব্যের যে উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল, তার মর্মর কলতান ঝংকৃত হয়ে উঠলো সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহের পদাবলী, মানসী ও সোনার তরীতে। এবার সোনার তরীর পালে লাগলো সৌন্দর্যের হাওয়া। চিত্রা, চৈতালি, কণিকা, কল্পনা, কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য, খেয়া এবং গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্যের সোনার ফসলে সেই তরী হলো বোঝাই। তারপর 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' বলাকা, পলাতকা, পূরবী, বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষসপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলীর ধারা বেয়ে তাঁর কাব্যতরী নবজাতক, সানাই, জন্মদিনে ও শেষ লেখার মধ্য দিয়ে দিগন্তের অন্তরালে উধাও হয়ে গিয়েছে। শুধু কাব্যেই নয়, নাটক, প্রবন্ধ, রস-রচনা, সমালোচনা, রূপক-নাট্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু-সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-তত্ত্ব, শিক্ষা-তত্ত্ব, সংগীত, ভ্রমণ-কাহিনী—সব বিভাগেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহারের যোগফল হলো বাংলা সাহিত্যের বর্তমান চরম সমুন্নতি। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের জন্যে তিনি পেলেন 'নোবেল পুরস্কার'। বাংলার কবি হলেন বিশ্বকবি।

সাহিত্য-সাধনা

নোবেল পুরস্কার

আশৈশব সংগীতে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। আশৈশব সুকণ্ঠ কবি নিজের সংগীতে নিজেই সুর-সংযোজনা করে 'রবীন্দ্র-সংগীতের' একটি বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করে যান। সেই সংগীতের সংখ্যা যেমন বিপুল, তেমনি বৈচিত্র্যময়। ভারতের জাতীয়-সংগীত এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁরই অমর লেখনীর সৃষ্টি। আবৃত্তি ও অভিনয়েও তাঁর প্রতিভা আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। স্বরচিত নাটকে স্বয়ং বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মঞ্চ-জগতে অভিনয়ের নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরিণত বয়েসে চিত্র-শিল্পেও তিনি বিশ্বকে বিস্মিত করে দেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির মর্মবাণী বিস্ময়করভাবে রূপলাভ করেছে তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে।

রবীন্দ্র-সংগীত

নাটক ও অভিনয়

স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও কবিতা, প্রবন্ধ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর রচিত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গানটি তো স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত।

স্বদেশ ও সমাজ

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে এবং তার পরবর্তী সকল আন্দোলনে তিনি তাঁর কাব্য-সাধনার অপূর্ব আলোকে প্রোজ্জ্বল করে গিয়েছেন জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ এবং 'স্যার' উপাধি ত্যাগ তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

তিনি চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, পারস্য, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং বাংলা-ভাষার প্রতি বিশ্বের

বিশ্ব-ভ্রমণ

সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। বিশ্বের যেখানে তিনি গিয়েছেন, সেখানেই তিনি ভারতের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীগুলিতে রয়েছে তার স্বর্ণ-স্বাক্ষর।

গঠন-মূলক কার্যেও রবীন্দ্র-প্রতিভা বিস্ময়কর কৃতিত্বের অধিকারী। বীরভূম

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন

জেলার বোলপুরে ভারতীয় আদর্শে তিনি 'শান্তিনিকেতন' নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে স্বয়ং শিক্ষাদানে ব্রতী হন এবং কালক্রমে সেখানে 'বিশ্বভারতী' নামে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া, শান্তিনিকেতনের অদূরে দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-বিধানের জন্যে তিনি 'শ্রীনিকেতন' নামে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে রেখে যান ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের ইংগিত।

মহাপ্রয়াণ

অবশেষে ২৫শে বৈশাখের গৌরব-সূর্য মহাকাশ-পরিক্রমার শেষে অস্তমিত হলো ২২শে শ্রাবণের [১৯৪১] নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ যেন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক। বৈদিক ঋষির মতো ছিল তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টি, বাল্মীকি-বেদব্যাস-কালিদাসের মতো ছিল তাঁর লোকোত্তর কবি-প্রতিভা, আর ছিল গ্যেটে-টলস্টয়ের মতো তাঁর সুগভীর সমাজ-চেতনা। সুন্দরের আরাধনায়, মানবতার পূজায় তিনি তাঁর পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জেলে যেন আরতি করে

উপসংহার

গেছেন। যে গভীর স্পর্শকাতরতা, যে নিবিড় বিশ্বাত্মবোধ এবং যে স্থির ঈশ্বর-চেতনা তাঁর কাব্য-কবিতাকে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্থাপন করেছে, তার নিবিড় অনুষঙ্গ পেতে হলে আমাদের সেই রবীন্দ্র-তীর্থে যাত্রা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের তীর্থভূমি॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ
- কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

২৪

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ জন্ম, পিতৃ-পরিচয় ও বাল্যজীবন ॥ উচ্চ-শিক্ষালাভ ॥ অধ্যাপনা-জীবন ॥ পদার্থ-বিদ্যায় আবিষ্কার ॥ উদ্ভিদ্-বিদ্যায় আবিষ্কার ॥ সাহিত্য-চর্চা ॥ বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা ॥ তরুণ-বিজ্ঞানী-সম্প্রদায় সৃষ্টি ॥ উপসংহার ॥

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এসেছিল যে অভূতপূর্ব নবজাগরণ, নবজাগৃতির সেই অবিস্মরণীয় লগ্নেই বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব। প্রাচীন ভারতে দর্শন ও বিজ্ঞান-সাধনা লাভ করেছিল এক চরম সমুন্নতি। কিন্তু পরবর্তীকালে এক দুঃসহ অধঃপতন-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে তার দর্শন-সাধনা ও বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে এসেছিল এক অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদ। অবশেষে তার সকল সাধনার দুয়ার হয়ে যায় অবরুদ্ধ। 'সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার' দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্যে আবির্ভূত হলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার মধ্য দিয়েই প্রাচ্যের দর্শন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের হলো আশ্চর্য সেতুবন্ধন।

জন্ম, পিতৃ-পরিচয় ও বাল্যজীবন

৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮ সাল। ঢাকার রাড়িখাল গ্রামে বিজ্ঞান-সরস্বতীর বরপুত্র জগদীশচন্দ্রের জন্ম। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু—ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পিতার স্বদেশানুরাগ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠার উৎসাহ এবং মাতৃদত্ত রামায়ণ-মহাভারতের জ্ঞান জগদীশচন্দ্রের জীবনে ব্যর্থ হয়নি। শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়নকালে সাধারণ মানুষের শিশু-সন্তানদের ধ্যান-ধারণা ও অজ্ঞতা-অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাঁর জীবন-পাত্র পূর্ণ করতে লাগলেন। এমন-কি, শৈশবে সংগৃহীত শিল্পী-কারিগরদের কর্ম-কুশলতা ব্যর্থ হয়নি তাঁর জীবনে।

উচ্চ-শিক্ষালাভ

ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে শিক্ষালাভের পর জগদীশচন্দ্র ভর্তি হলেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে এবং তারপর সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এখানে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। এই সময় তিনি পদার্থ-বিদ্যার প্রখ্যাত অধ্যাপক ফাদার লাঁফোর সান্নিধ্য লাভ করেন। তারপর জগদীশচন্দ্র উচ্চ-শিক্ষার জন্যে বিলেত যাত্রা করেন। লণ্ডনে প্রাণিবিদ্যা এবং উদ্ভিদ্-বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেও অসুস্থতার জন্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্-বিদ্যায় ট্রাইপোস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তারপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্-সি. উপাধি গ্রহণ করে ফিরে এলেন স্বদেশে।

এবার জগদীশচন্দ্র অধ্যাপনাকে গ্রহণ করলেন জীবনের ব্রতরূপে। কিন্তু অন্তরে ছিল যে অনুসন্ধিৎসার অনির্বাণ প্রদীপ-শিখা, তা তাঁকে বিশ্রাম করতে দিল না। এদিকে, ব্যয়-বাহুল্যের জন্যে পিতা নিদারুণ অর্থ-সংকটে নিপতিত, ঋণগ্রস্ত ; অন্যদিকে,

প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর স্বল্প বেতন। প্রেসিডেন্সি কলেজে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় অধ্যাপকদের বেতন-বৈষম্যের প্রতিবাদে তিনি তিন বছর-কাল কোন বেতন গ্রহণ করলেন না। এদিকে প্রবল অর্থ-সংকট! এই অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে কিছুতেই ভেঙে পড়লেন না তিনি। অবশেষে তাঁর আত্মসম্ভ্রমবোধেরই হলো জয়। কর্তৃপক্ষ শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় অধ্যাপকদের সমহারে বেতন দেবার যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাঁকে তাঁর তিন বছরের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। সেই অর্থে পিতাকে ঋণ-মুক্ত করলেন জগদীশচন্দ্র।

অধ্যাপনা-জীবন

বিজ্ঞান-নিকেতনের নানা গোপন-রহস্য তাঁকে কোথাও দিল না থামতে। পরাধীন দেশের বৈজ্ঞানিক হওয়ার অভিশাপে তাঁকে বিজ্ঞান-সাধনায় সহস্র দুঃখ-অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। অবশেষে অক্লান্ত গবেষণায় তাঁর হাতেই ঘটলো নব নব রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন, নব নব তথ্যের আবিষ্করণ। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে তাঁর আবিষ্কার তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করলো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস্-সি. উপাধিতে ভূষিত করলো। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বিনা-তারে বার্তা-প্রেরণের সম্ভাব্যতা স্বীকৃত হলো। ব্রিটিশ সরকারও তাঁকে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে ইংলণ্ডে পাঠালেন। তারপর তাঁর কাছে তাঁর গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ আসতে লাগলো য়ুরোপের নানা দেশ থেকে। পাশ্চাত্য জাতিরা সেদিন সসম্ভ্রমে স্বীকার করে নিল এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের মৌলিক আবিষ্কারের কথা। হৃত-গৌরব দরিদ্র জাতির পক্ষ হতে রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারত-জননীর অশ্রুসিক্ত আশীর্বাদ পাঠালেন—'আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী আশীর্বাদখানি।' বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারকের সম্মান, প্রকৃতপক্ষে, জগদীশ-চন্দ্রেরই প্রাপ্য। কিন্তু মার্কনি জগদীশচন্দ্রকে অস্বীকার করে স্বয়ং লাভ করলেন ঐ দুর্লভ মর্যাদা। জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করলেন—'যাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন।' জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সরস্বতীর সাধনা এইভাবে ব্যথার সাধনা—দুঃখের সাধনা।

পদার্থ-বিদ্যার আবিষ্কার

তারপর জগদীশচন্দ্র মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হয়ে পদার্থ-বিদ্যায় গবেষণা ত্যাগ করে ফিরে এলেন উদ্ভিদ্-বিদ্যার ছায়াচ্ছন্ন শ্যামল প্রশান্তির মধ্যে। জড় ও চেতনের সাড়া-সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা লাভ করলো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি। তিনি উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করলেন আমাদের চির-পরিচিত লজ্জাবতী লতার সাহায্যে। জড় ও চেতনের—সর্বত্রই যে প্রাণের নির্বাধ প্রকাশ—ভারতের বৈদিক ঋষিদের এই দার্শনিক উপলব্ধি প্রমাণিত হলো তাঁর বিজ্ঞান-সাধনায়।

উদ্ভিদ্-বিদ্যার আবিষ্কার

জগদীশচন্দ্র একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। তাঁর রচিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থে আছে তাঁর অমলিন স্বদেশপ্রেম, গভীর দর্শন-চিন্তা ও অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের

সুস্পষ্ট পরিচয়। হতমান ভারতবর্ষের সন্তান হিসেবে তিনি যে পরাধীনতার গ্লানি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার পথে সেই পরাধীনতা যে দুরধিগম্য বাধা সৃষ্টি করেছিল, তা তিনি অশ্রুসিক্ত ভাষায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

সাহিত্য-চর্চা

অধ্যাপনা-বৃত্তি থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর পরাধীন ভারতের বিজ্ঞানের গবেষণা-দৈন্য দূর করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর স্থাপন করলেন 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির'। তাঁর জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থই এই গবেষণা-মন্দিরের নির্মাণ ও উপকরণাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হয়। অবশেষে বিজ্ঞানের কক্ষ-কক্ষান্তরে বিচরণ করে তার রহস্যপুরীর দ্বার একে একে উন্মুক্ত করে, ভারতের বিপুল সম্ভাবনাময় বিজ্ঞান-সাধনার দ্বারোদ্ঘাটন করে ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর ভারত-মাতার সুসন্তান এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ পরলোক গমন করেন। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর পদতলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই মহামনীষী তাঁর উত্তর-সাধকদের জন্যে বিজ্ঞান-সাধনার যে একটি অনুকূল পরিবেশ রচনা করে গিয়েছেন, তা ব্যর্থ হয়নি—তা কখনো ব্যর্থ হবারও নয়। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার পীঠস্থানে বাংলার যে সব তরুণ বিজ্ঞানী ভিড় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা প্রধান।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা

তরুণ-বিজ্ঞানী সম্প্রদায় সৃষ্টি

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-সরস্বতীর বরপুত্র, পরাধীন ভারতের এক শ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তান পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে দীনা-হীনা জননীর লাজনম্র শিরে মহিমার গৌরব-মুকুট পরাবার জন্যে তিনি আজীবন যে মৌলিক বিজ্ঞান-সাধনা করে গিয়েছেন, তা জাতি চিরকাল শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করবে। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা ছিল দুঃখের সাধনা। দারিদ্র্য তাঁর পথরোধ করতে পারেনি, পরাধীনতা পারেনি তাঁর মনোবলকে বিধ্বস্ত করতে। আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাঁর দুঃখের সাধনাকে সার্থক রূপদান করবার দিন আজ এসেছে। দুঃখ-রজনীর গাঢ় তমিস্রায় বসে এই মহাসাধক বিজ্ঞানের যে দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন, তা স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-ব্রতীদের আজ মহান্ আদর্শ হোক। জগদীশচন্দ্রের সেই দুঃখের সাধনা জাতির সফল স্বপ্নের মধ্যে আজ লাভ করুক তার চরম সফলতা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র
- বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র

২৫

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অহিংসা-নীতি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ আবির্ভাব ॥ জন্ম ও বংশ-পরিচয় ॥ উত্তরাধিকার ॥ শিক্ষা ও কর্ম-জীবনের শুরু ॥ দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটালে ॥ ভারতে গান্ধীজী ॥ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ॥ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ॥ স্বাধীনতা-লাভ ও মৃত্যু ॥ উপসংহার ॥

অহিংসা দুর্বলের অহংকার নয়, নয় ক্লীবত্বের নিরুপায় আস্ফালন ; অহিংসা শক্তি ও তেজস্বিতার দুর্জয় প্রকাশ। গান্ধীজীর অহিংসার সাধনাও ছিল শক্তির সাধনা, তেজস্বিতার সাধনা। কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত গান্ধীজী ছিলেন সত্য, স্বাধীনতা ও অহিংসার প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবন ও কর্মের মধ্যে সেই শক্তি ও তেজস্বিতার দুর্দমনীয় প্রকাশ। রাজনীতি-ধুরন্ধর উইন্‌স্টন চার্চিলকেও সেদিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়েছিল, গান্ধীজী বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদ। কিন্তু তিনি শুধু একজন রাজনীতি-বিশারদই নন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব-প্রেমিকও। উনবিংশ শতকে যে নব-মানবতাবাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল, গান্ধীজীর মধ্যে দেখা গেল তার সর্বোত্তম প্রকাশ।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের এক অতি দুঃসময়ে তাঁর আবির্ভাব। তখন এদেশে দুর্দমনীয় ব্রিটিশ প্রভুত্ব চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। একদিকে প্রবল রাজশক্তির নির্মম অত্যাচারের মুখে দেশবাসীর অসহায় আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে পরাধীনতার দুর্বিষহ গ্লানি জাতির অন্তরাত্মাকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এখানে-ওখানে রাজশক্তিকে বিপর্যস্ত করবার জন্যে ইতস্তত: চেষ্টা হচ্ছিল—কিন্তু সেই চেষ্টা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও যৎসামান্য। সেই সময়ে হতাশ, নির্বীর্য জাতিকে মহাবলে বলীয়ান্ করবার জন্যেই যেন আবির্ভাব ঘটেছিল এই তেজোদৃপ্ত মহাপুরুষের। তিনি অসহায় জাতিকে অহিংসার দুর্জয় আয়ুধে সুসজ্জিত করে দীক্ষিত করলেন নব-জীবনের মহামন্ত্রে।

আবির্ভাব

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। গুজরাটের পোরবন্দরে এক অতি সাধারণ বণিকবংশে জন্মগ্রহণ করলেন সত্য, অহিংসা ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী, মাতার নাম পুতলী বাঈ। গান্ধীজী পিতার কাছ থেকে প্রবল সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতা এবং মাতার কাছ থেকে গভীর ধর্মানুরাগ ও দয়া-ক্ষমা-করুণা-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি মানবিক সুকুমার গুণগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন। শৈশবে তিনি ছিলেন একটি অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির বালক। কিন্তু সেই ভীরু লাজুক বালকটিই একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হাতে আপসহীন সংগ্রাম করে ভারতের দুর্লভ স্বাধীনতা সবলে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

উত্তরাধিকার

কুসংসর্গ-দোষে শৈশবেই কিছু মারাত্মক বদভ্যাস তাঁর পূত চরিত্রে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ়তা-সহকারে সেই সমস্ত পরিহার করে অচিরেই সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গান্ধীজী বিলেতে গেলেন ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে। ব্যারিস্টারি পাস করে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে শুরু করলেন আইনের ব্যবসায়। এই সময় কয়েকজন ভারতীয় বণিকের অনুরোধে ব্যারিস্টারি করবার আমন্ত্রণে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে যাত্রা করেন। বহু ভারতীয় শ্রমিক সেখানে তাদের ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অত্যাচারে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল। সেখানে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির নগ্ন বর্বরতার বিরুদ্ধে তিনি সেই নির্যাতিত, অপমানিত ভারতীয় শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই নাটালই হলো তাঁর জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র।

শিক্ষা ও কর্ম-জীবন শুরু

সেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রমিক-সমাজের ওপর নাটাল সরকারের অমানুষিক জুলুমের বিরুদ্ধে গান্ধীজী শুরু করলেন তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ভারতীয়দের অধিকার-রক্ষার জন্যে তিনি গড়ে তুললেন অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন। শুরু হলো আপসহীন সত্যাগ্রহ সংগ্রাম। একদিকে হিংস্র ঔপনিবেশিক প্রভুদের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী, অন্যদিকে অসহায় অসংখ্য মানুষের পুরোধায় নিরস্ত্র তিনি একা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত মানবিক দাবি মানতে বাধ্য হলো শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়। তারপর গান্ধীজী দীর্ঘ একুশ বছর নাটালে থেকে 'নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস' গঠন করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নানা সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করে ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনের করেন শুভ সূচনা।

দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটালে

১৯১৪ সালে বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি এবং দু'চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে তিনি ফিরে এলেন ভারতে। সবরমতী নদীতীরে একটি আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেবা ও সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন তিনি। এই সময়ে য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠলো। বিপন্ন ব্রিটিশকে সাহায্যদানের বিনিময়ে চতুর ব্রিটিশ যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু যুদ্ধান্তে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ তার পরিবর্তে ভারতকে উপহার দেয় 'রাউলাট আইন'। ব্রিটিশের এই অকৃতজ্ঞতায় বিক্ষুব্ধ ভারতে হরতাল বিঘোষিত হলো। ১৯২০ সালে গান্ধীজী ভারতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ভারতবাসীর হাতে তুলে দিলেন অসহযোগের হাতিয়ার। সমগ্র জাতি হাতে তুলে নিল সেই নতুন হাতিয়ার। অহিংসার হাতিয়ারে নিরস্ত্র জাতি হয়ে উঠলো দুর্জয় শক্তিশালী।

ভারতে গান্ধীজী

১৯২৪ সালের পর গান্ধীজী রাজনীতি ছেড়ে মনোনিবেশ করলেন ঈশ্বর-চিন্তায়। এই সময়ে চরকা ও খদ্দর প্রচারের জন্যে তিনি কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। তারপর সহসা তাঁর অন্তরে জাগলো নতুন প্রেরণা। জাতীয় শক্তিকে সংহত করবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩০ সালে শুরু করলেন 'লবণ সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। বোম্বাই-এর ডাণ্ডি

অভিমুখে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে লবণ-আন্দোলনে যে দুর্জয় পদযাত্রা করেন, তা ইতিহাসে 'ডাণ্ডি-অভিযান' নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন—'আমি যখন যাত্রা শুরু করবো, সারা ভারত সাগর-তরঙ্গের মতো ফুঁসে উঠবে।' সত্যিই, সেদিন ফুঁসে উঠেছিল আসমুদ্র-হিমাচল। কিছুদিন পরে ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেবার সূত্র আবিষ্কারের জন্যে বিলেতে বসে এক 'গোলটেবিল কনফারেন্স'। কিন্তু ইংরেজদের দুরভিসন্ধি ও অনমনীয় মনোভাবে গান্ধীজীকে নিরাশ মনে ফিরে আসতে হয় সেই সম্মেলন থেকে।

ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম

তারপর বাধলো বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। গান্ধীজী আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর কোন ছলনায় না ভুলে ১৯৪২ সালে দিলেন 'আগস্ট আন্দোলন' বা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক। ফলে, তিনি গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু এই আন্দোলন প্রচণ্ড আঘাতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল একেবারে শিথিল করে দিল। কিন্তু যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বীজ তারা ভারতের মাটিতে বপন করেছিল, তার বিষময় ফল ফললো ১৯৪৬ সালের নৃশংস ভ্রাতৃ-হত্যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতা ও নোয়াখালিতে অহিংসার দূত গান্ধীজী করলেন শান্তি-পদযাত্রা। কলকাতা ও নোয়াখালি হল শান্ত।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়

এদিকে, গান্ধীজীর প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট এই ভারত-ভূমি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে জন্ম দিল ভারত ও পাকিস্তানের। সে দিনটি ছিল গান্ধীজীর দুঃখের দিন, গভীর বেদনার দিন। তারপর বেশীদিন বাঁচেননি তিনি। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীর প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতে যাবার প্রাক্কালে অহিংসার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে নামে এক ভারতীয় যুবকের পিস্তলের গুলিতে নিহত হন।

স্বাধীনতা-লাভ ও মৃত্যু

গান্ধীজীর বাণী সত্য ও অহিংসার বাণী, মানবতার বাণী। মানব-প্রেম ও ঈশ্বরানুরাগ তাঁকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমাজের যারা পতিত, অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়, গান্ধীজী তাদের 'হরিজন' নাম দিয়ে তাদের সেবার মানসে গড়ে তুলেছিলেন 'হরিজন আন্দোলন'। উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে মানবতার যে উদার অভ্যুদয় ঘটেছিল, গান্ধীজীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা গেল তার চরমতম অভিব্যক্তি। বর্তমান বিশ্বে গান্ধীজী তাই প্রেম, অহিংসা ও স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম প্রতীক॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- অহিংসার বিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী
- গান্ধীজীর জীবন ও বাণী

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ জন্ম ও পিতৃ-পরিচয় ॥ ঘটনাবহুল ছাত্রজীবন ॥ সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ॥ কর্ম-জীবন : কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ॥ কংগ্রেসের সভাপতি ও কংগ্রেস-ত্যাগ ॥ নিরুদ্দেশ ও সিঙ্গাপুরে মুক্তিফৌজ গঠন ॥ নেতাজীর ডাক—ভারত-আক্রমণ ও পরাজয় ॥ উপসংহার ॥

২৫
মুক্তি-পথিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর জীবন ত্যাগে শুভ্র, বৈরাগ্যে গৈরিক, দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচনে উৎসর্গীকৃত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সকল শক্তি স্বাধীনতার এই অনির্বাণ প্রদীপ-শিখাটিকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করবার জন্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ জাতির সকল দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত ব্যর্থ করে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল বার্লিনে-সিঙ্গাপুরে, শোনা গেল ভারতের পূর্ব-সীমান্তে ইম্ফলে। সুভাষচন্দ্র হলেন ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক, ভারতের মুক্তি-পথের বিজয়পথিক, ভারতবাসীর চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় নেতাজী।

ভূমিকা

১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী। উড়িষ্যার কটক শহরে ভারত-জননীর বিদ্রোহের এই অগ্নি-শিশু ভূমিষ্ঠ হলেন। পিতা—প্রখ্যাত সরকারী উকিল জানকীনাথ বসু, মাতা—প্রভাবতী দেবী। জানকীনাথের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে। বিদ্রোহের এই অগ্নি-শিশুর জন্মক্ষণে নবজাতকের ক্রন্দন-ধ্বনিতে যে প্রথম বিদ্রোহ বিঘোষিত হয়েছিল, কে বলতে পারে যে, তাতে 'দিল্লী চলো'—এই উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়নি ?...কে বলতে পারে, তাঁর জন্মলগ্নে পুরনারীগণ যে শঙ্খধ্বনি করেছিলেন, তাতে মুহুর্মুহুঃ কামানের ধ্বনি শোনা যায়নি ?...সেই নবজাত শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হাতে কে বলতে পারে ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা বাঁধা পড়ে নি ? তাঁর জন্মের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্রোহের নবজন্ম হলো, যেন নবজন্ম হলো ভারতের স্বাধীনতার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার।

জন্ম ও পিতৃ-পরিচয়

সুভাষচন্দ্রের শৈশবের শিক্ষারম্ভ হয় বাংলার বাইরে—উড়িষ্যায় কটকের মিশনারী স্কুলে। পরে র‍্যাভন্ শ' কলেজিয়েট্ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে লাভ করলেন দ্বিতীয় স্থান। সেই সময় মুক্তির সন্ধানে শ্রীরামকৃষ্ণের বৈরাগ্য-মন্ত্র ও স্বামী বিবেকানন্দের বীরবাণীর প্রেরণায় তিনি গৃহত্যাগ করে হিমালয়ে করলেন গভীর সাধনা। কিছুকাল পরে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তীব্র দেশাত্মবোধ ছিল তাঁর অন্তরের চালক-শক্তি। তাই অধ্যাপক ওটেনের ভারতীয়দের প্রতি অসম্মানকর উক্তির তীব্র প্রতিবাদে তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পরিণামে তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়; কিন্তু পরে স্যার

ঘটনাবহুল ছাত্রজীবন

আশুতোষের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজে তিনি স্থানলাভ করেন এবং দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম. এ. পড়তে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বেই ১৯১৯ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ১৯২০ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করে স্বদেশে ফিরে এলেন। এদিকে আসতে লাগলো সরকারী চাকরির নানা প্রলোভন। কিন্তু গোলামির সমস্ত প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে যোগদান করলেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে। এবার ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সংযোজিত হলো এক নতুন অধ্যায়।

সিভিল সার্ভিস প্রত্যাখ্যান ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান

সুভাষচন্দ্রের কর্ম-জীবন যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি রূপকথার কাহিনীর মতো রোমাঞ্চকর। দেশবন্ধুর নির্দেশে তিনি গ্রহণ করলেন জাতীয় শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ-পদ। সেই সঙ্গে থাকলেন কংগ্রেস কমিটির প্রচার-সচিব। তারপর ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত-আগমন উপলক্ষে পূর্ণ হরতালের আহ্বায়করূপে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারামুক্তির পর তিনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। এই সময় উত্তরবঙ্গের বন্যায় ত্রাণকার্যে তাঁর গৌরবময় ভূমিকার কথা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর তিনি হলেন 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং সসম্মানে নির্বাচিত হলেন কলকাতা পৌর নিগমের প্রধান কর্মকর্তা। কিন্তু সরকার-বিরোধী স্বাধীন মনোভাবের জন্যে তাঁকে অচিরকালের মধ্যেই কারাবরণ করতে হলো। তিনি যতদিন কারা-প্রাচীরের বাইরে ছিলেন, বিদেশী শাসকদের ততদিন মানসিক স্বস্তি ছিল না। ফলে, স্বাধীনতার অদম্য সৈনিক সুভাষচন্দ্রকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটাতে হয়েছে বিদেশী শাসকের কারাগারের অন্ধকারে।

কর্ম-জীবন : কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র

দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে এবং ভগ্ন-স্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্যে য়ুরোপ যাত্রা করতে হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আবার অন্তরীণ করা হয়। মুক্তিলাভ করে তিনি ১৯৩৯ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন; ১৯৪০ সালে নির্বাচিত হলেন ত্রিপুরী অধিবেশনের সভাপতি। কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে সংঘাত অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থীদের অগ্রনায়ক। তাঁর সভাপতি পদ লাভে নরমপন্থীরা ক্ষুব্ধ হলে সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

কংগ্রেসের সভাপতি ও কংগ্রেস-ত্যাগ

এদিকে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে চাইলেন। কিন্তু বিদেশী সরকার ১৯৪০ সালেই তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্যে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হলো তাঁকে। ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী। দিকে দিকে

সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ। ওদিকে, তিনি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে রহস্যজনকভাবে বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলেছেন একক পথিক—স্বদেশের মুক্তি-পূজারী। কাবুল—বার্লিন—সিঙ্গাপুর।

নিরুদ্দেশ ও সিঙ্গাপুরে মুক্তিফৌজ গঠন

অসুস্থ দেহেও তিনি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এক প্রচণ্ড আগ্নেয় ঝড়ের মতো ছুটে গেছেন। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে আর এক বিপ্লবী-বীর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। রাসবিহারী বসুর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র হলেন তার সর্বাধিনায়ক, হলেন রূপকথার রাজপুত্র—ভারতের প্রিয় নেতাজী।

সিঙ্গাপুরে সেদিন এলো এক অভূতপূর্ব প্রাণের জোয়ার। নেতাজী উদাত্ত কণ্ঠে ডেকে বললেন—'তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেবো।' সঙ্গে সঙ্গে অকাতরে প্রাণ দেবার জন্যে দেখা দিল প্রবল উন্মাদনা। সে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। তারপর গঠিত হলো আজাদ হিন্দ্ সরকার। ১৯৪৩ সালে এই সরকার দুর্দমনীয় মনোবল নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলো প্রবল প্রতাপান্বিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে। ১৯৪৫ সালের ১৮ই মার্চ।

নেতাজীর ডাক—ভারত-আক্রমণ ও পরাজয়

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মৃত্তিকায় উত্তোলন করলো স্বাধীন জাতীয় পতাকা। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে নেতাজী ডাক দিলেন, 'দিল্লী চলো'। শুরু হলো দিল্লী-অভিযান, জয় হলো দুর্দমনীয় মনোবলের, জয় হলো স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষার। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজ-বাহিনী ব্রহ্মদেশ পুনর্দখল করায় ও জাপান তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় এবং প্রকৃতির বিমুখতায় ও বিভ্রান্ত স্বদেশবাসীর নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে আজাদ হিন্দ্ সরকারের হলো পতন। দুঃসহ পরাজয়ের বেদনা নিয়ে নেতাজী নতুন পথের সন্ধানে বিমানে জাপান যাত্রা করেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি নাকি পথিমধ্যে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত।

কিন্তু দেশবাসী তাঁর এই মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করে না। ভারতের প্রিয় নেতাজী মরণ-বিজয়ী গৌরবে আজও ভারতবাসীর হৃদয়ের সিংহাসনে চির-প্রতিষ্ঠিত। তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর কোন শক্তিই নেতাজীকে বন্দী করে রাখতে পারে না,

উপসংহার

পারে না তাঁকে অকালে হত্যা করতে; আর, বিমান-দুর্ঘটনার কাহিনী একটি মিথ্যা অপপ্রচার ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই তারা আজও নেতাজীর প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রতীক্ষা-কাতর। বরণ-মাল্য রচনা করে ভারতের যাট কোটি নরনারী তাদের বিজয়ী বীরকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে আজও ব্যাকুল। 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো।'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী
- তোমার প্রিয় নেতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ বাংলার সমাজের কলঙ্কিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র ॥ সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ॥ শরৎ-সাহিত্যের চরম জিজ্ঞাসা ॥ শরৎ-চন্দ্র বস্তুবাদী নন, আদর্শবাদী ॥ শরৎচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ॥ জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্য ॥ উপসংহার ॥

২৭ অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই—যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত—মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালো আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।'

—শরৎচন্দ্র

ভূমিকা

শরৎচন্দ্র বাংলার একান্ত দরদী কথা-শিল্পী, বাঙালীর বেদনার বিশ্বস্ত রূপকার। তাঁর লেখনীতেই বাংলার ব্যথিত মানুষের বাণীহারা বেদনা পেয়েছিল প্রকাশের ভাষা। তাঁর হাতেই বাংলার নিরুদ্ধ অশ্রুর উৎসমুখ গিয়েছিল খুলে। বাংলার সাহিত্য-গগনে যখন বঙ্কিম-প্রতিভা অস্তমিত এবং রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর, তখনই শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য আবির্ভাব। সাহিত্যের দরবারে তিনি শোনালেন সমাজের চির-বঞ্চিত, চির-পতিত, চির-অবহেলিতদের জীবন-কাহিনী, মর্মস্পর্শী ভাষায় রচনা করলেন তাদের বেদনাময় অশ্রু-নির্বেদ।

বাংলার সমাজের কলঙ্কিত চিত্র ও শরৎচন্দ্র

বাংলার সনাতন রক্ষণশীল সমাজে নারীর স্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তার ওপর কৌলীন্য-প্রথা সমাজে সৃষ্টি করেছিল এক দুরপনেয় ক্ষত। রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বাংলাদেশে নারী-নিগ্রহের কিছুটা উপশম ঘটালেও লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়ত রচিত হচ্ছিল নারী-সমাজের পচন এবং অবক্ষয়ের নিত্য-নতুন করুণ কাহিনী। অন্যদিকে, কৃত্রিম জাতিভেদকে হাতিয়ার করে ব্রাহ্মণ-সমাজ সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির ওপর শুরু করেছিল হৃদয়হীন লাঞ্ছনা ও মানবতার দুঃসহ অপমান। তার ওপর, লর্ড কর্নওয়ালিশ-প্রবর্তিত জমিদারী-প্রথায় ক্ষমতাবান্ দাম্ভিক জমিদার-শ্রেণী ব্রাহ্মণ-সমাজের ভণ্ডামির প্রশ্রয়ে স্ফীতকায় হয়ে অকথ্য অত্যাচারে তাদের জীবন করে তুলেছিল দুর্বিষহ। বাংলার সমাজে সেদিন 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কেঁদে ফিরছিল। শরৎচন্দ্র বাংলার সেই ব্যথাদীর্ণ বেদনার ওপর বুলিয়ে দিলেন সমবেদনার স্নিগ্ধ করস্পর্শ, ন্যায় বিচারের আশায় সেই নিপীড়িত, বঞ্চিত, হতভাগ্যদের করুণ কাহিনীর অন্তরালে আর্জি পেশ করলেন মানবতার বিচারশালায়।

১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর। হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম। এখানেই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে শরৎচন্দ্রের জন্ম। পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়

মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। শৈশবে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় এবং সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের বাংলা স্কুলে শুরু হয় তাঁর শিক্ষা-জীবন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি চলে যান ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। সেখানে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট হাই স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষার ফী সংগ্রহ করতে না পারায় এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া তাঁর ভাগ্যে জোটেনি।

সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব

তারপর কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি চলে যান সুদূর রেঙ্গুনে। কৈশোরে রচিত তাঁর 'কাশীনাথ' গল্পটিকে বাদ দিলে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রাপ্ত 'মন্দির' গল্পটিই তাঁর সম্ভবতঃ প্রথম রচনা। দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশের পর হঠাৎ একদিন কলকাতার 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' নামে বড় গল্পটি। এই গল্পটির আবেদনে শরৎচন্দ্র একদিনেই বাঙালীর হৃদয় হরণ করে নিলেন। এ যে সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ! কাহিনী, চরিত্র ও বক্তব্য সমাজের নিরুদ্ধ বেদনা থেকে সংগৃহীত।

শরৎ-সাহিত্য তাই যুগ-যন্ত্রণায় কাতর, সামাজিক ব্যথা-বেদনায় অশ্রুসিক্ত। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই। তাঁর দেবদাস, অরক্ষণীয়া, বামুনের মেয়ে, বিপ্রদাস, চন্দ্রনাথ, গৃহদাহ, চরিত্রহীন, দেনাপাওনা, দত্তা, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন, পথের দাবী ইত্যাদি উপন্যাস এবং নিষ্কৃতি, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে ইত্যাদি উপন্যাসোপম বড় গল্প বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁর চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী, কিরণময়ী,

শরৎ-সাহিত্যের চরম জিজ্ঞাসা

রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি একদিন বাঙালী মনীষার সামনে রেখেছিল এক চরম জিজ্ঞাসা এবং বাঙালীর সমাজ-চেতনায় সৃষ্টি করেছিল এক বিপুল আলোড়ন। যে সমাজ ব্যক্তি-মানুষকে দিল না সুখ, দিল না শান্তি, দিল না সুস্থ সাবলীল জীবনের অধিকার, সেই সমাজের কী প্রয়োজন? নারীর সতীত্ব দেহে না প্রেমে? নারী-সমাজের প্রতি কেন এত কঠোর সামাজিক অনুশাসন, অথচ পুরুষ-সমাজের প্রতি কেন এত পক্ষপাতমূলক শৈথিল্য? পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমাজের সামনে তিনি তাঁর ব্যথাদীর্ণ অনন্য উপন্যাসগুলির মধ্যস্থতায় রাখলেন রুধিরাক্ত কাতর জিজ্ঞাসা।

নারী-চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব সর্বাধিক। বাঙালী নারীর বাণীহারা বেদনা শরৎ-সাহিত্যে পেয়েছে প্রকাশের প্রকৃত ভাষা। সমাজ-জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে

শরৎচন্দ্র বস্তুবাদী নন, আদর্শবাদী

তিনি স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে তাঁকে 'রিয়ালিস্ট' বা বস্তুবাদী বলা কখনই উচিত হবে না। এক স্থলে তিনি বলেছেন, 'যারা শুধু দিলে, বিনিময়ে পেলে না কিছুই,…তারাই পাঠালো আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।' তাঁর সাহিত্যে তিনি রূঢ় বাস্তবকে রূপ দিয়ে অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরকে খুঁজেছেন, পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে ফুটিয়েছেন মানবতার শতদল পঙ্কজ। সেদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র অবশ্যই আদর্শবাদী।

শরৎ-সাহিত্যে আমরা দেখি আমাদের সমাজের বহু-কলঙ্কিত মুখ, শুনি আমাদেরই লাঞ্ছিত, নির্যাতিত আত্মার কাতর ক্রন্দন। কিন্তু শুভ্র সমুজ্জ্বল মানবাত্মা

সামাজিক পচন ও অবক্ষয়ের মধ্যেও থাকে নিষ্কলঙ্ক। শরৎচন্দ্র সেই নিষ্কলঙ্ক মানবাত্মার জয়গান করেছেন। তাঁর 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'একাদশী বৈরাগী'—ছোটগল্পগুলি শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও বিশিষ্ট মর্যাদা দাবী করে। এখানে শরৎচন্দ্র নিপীড়িত বাংলার নিরুদ্ধ বেদনার অশ্রুমুখ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা

শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্রকে নতুন করে গ্রহণ করা উচিত ছিল, উচিত ছিল তাঁর সাহিত্যের নতুন মূল্য বিচার করবার। উগ্র আধুনিকতায় শরৎ-সাহিত্যকে দূরে সরিয়ে না রেখে যথার্থ সংবেদনশীল পাঠকের মতো শরৎ-সাহিত্যের পূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করা উচিত ছিল। শরৎ-সাহিত্য বহু পূর্ব থেকেই প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই অনূদিত হয়ে ভারতীয় পাঠকের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। জন্ম-শতবার্ষিকীর আলোকে শরৎ-সাহিত্যকে নতুন করে উপলব্ধি করবার প্রয়াস সূচিত হওয়া উচিত ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শরৎচন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়। সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্-দিগন্ত বিষয়ে আলোচনা, শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রধান অঙ্গ। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের একটি প্রামাণ্য জীবনী-চিত্র উপহার দেন এবং শরৎচন্দ্রের রচিত দুটি কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে শরৎ-সাহিত্য সুলভে প্রকাশের ব্যবস্থা করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনগণের ধন্যবাদার্হ হতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। শুধু আনুষ্ঠানিক উৎসব-সজ্জার মধ্যে, শরৎচন্দ্রকে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করেছি মাত্র।

জন্মশতবার্ষিকীর প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্য

বাঙালী জাতি শরৎচন্দ্রের কাছে বহুভাবে ঋণী। কেবল বাঙালী জাতিই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষই, এমন-কি, স্বাধীন বাংলাদেশও শরৎচন্দ্রের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। সেই দরদী, মরমী, প্রিয় কথাশিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কি তাঁর কাছে আমাদের ঋণ শোধ করতে পেরেছি ?…পেরেছি কি সমাজের দরিদ্র, শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ গফুর জোলা ও অভাগীদের সামাজিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে ? সড়ক কিংবা রাজপথের নামকরণ নয়, বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার উচ্ছ্বাস নয়, এমন-কি, মূর্তি-প্রতিষ্ঠাও নয় ; সমাজের অবহেলিত, অত্যাচারিত মানুষদের পূর্ণ সামাজিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াই হতো শরৎ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সেদিক থেকে শরৎ-জন্মশতবার্ষিকী কি সার্থক হয়েছে আমাদের উৎসবের বক্তৃতামালায় আর বর্ণোজ্জ্বল আলোকমালায় ?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলা সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র
- বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান
- দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা॥ জন্ম ও শিক্ষা-জীবন॥ কর্ম-জীবন ও ভাষার সাধনা॥ পরিব্রাজক সুনীতিকুমার॥ ভাষা-সাধকের সম্মান॥ 'মহাগুরু-নিপাত'॥ ভারতের ভাষা-সমস্যায় সুনীতিকুমার॥ উপসংহার॥

২৮ ভাষা-সাধক সুনীতিকুমার

'যাচ্ছে পুড়ে নতুন করে সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা।' —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

ভাষা-সাধক সুনীতিকুমার ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-গবেষণার জগতে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় জ্ঞানপূজারীর উজ্জ্বলতম নাম। মানুষের ভাষার মধ্যে, তার ব্যবহৃত নানা শব্দ এবং তাদের বিচিত্র ধ্বনি-পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে বিশ্বের মানব-জাতির যে ঐক্য-চেতনা সদা-ক্রিয়াশীল, সুনীতিকুমার তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে তাকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মানুষে-মানুষে যত পার্থক্যই থাকুক, ভাষার ক্ষেত্রে তারা মূলতঃ এক। সকল ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসই শুধু এক নয়, তার বিবর্তনের মূল প্রবণতাগুলিও এক। অন্যান্য কারণে না হোক, শুধু এই একটিমাত্র কারণেই বিশ্ববাসী ভাষার এই মহাসাধকের কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবে।

জন্ম ও শিক্ষা-জীবন

১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর। সেদিনটি ছিল রাসপূর্ণিমা, গুরু নানকের জন্মদিন এবং চন্দ্রগ্রহণ। এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্যে তাঁর জন্মদিবসটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। হাওড়ার শিবপুরের এক নিম্নবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবার। সেখানেই ভাষা-সরস্বতীর এই মহা-পূজারীর জন্ম হয়। পিতামহ এবং পিতৃদেব ছিলেন সামান্য মসীজীবী। শৈশবে পিতামহের কাছ থেকে কয়েকটি ফার্সী বয়েৎ শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর ভাষার সাধনা সূচিত হয়। কলকাতার সুকিয়াস স্ট্রীটের বাসা থেকে কলুটোলার ফ্রী স্কুল—এই দীর্ঘপথ বালক-সুনীতিকুমার খালিপায়েই যাতায়াত করতেন। এইভাবে দুঃখের সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স-পরীক্ষায় ষষ্ঠ, আই. এ. পরীক্ষায় তৃতীয়, বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্সে প্রথম এবং এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্ম-জীবন ও ভাষার সাধনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেও জীবনে তাঁর শিক্ষা-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তিনি ছিলেন আজীবন ছাত্র। বিদ্যাসাগর কলেজে মাত্র এক বছর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করার পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক পদে বৃত হন। এই সময়ে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ভাষাতত্ত্ব-বিষয় অধ্যয়নের জন্যে বিলেতে যান এবং ১৯২১ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। তারপর লণ্ডনে মধ্যযুগীয় নানা ভাষা সম্পর্কে অধ্যয়ন করে তিনি প্যারিসে যান। সেখানে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলি সম্পর্কে অধ্যয়ন সাঙ্গ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। স্যার আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খয়রা অধ্যাপক'রূপে বরণ করে নিলেন।

এর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'দি অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশিত হয়। বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে সেদিন সুনীতিকুমারের অবদান সসম্মানে স্বীকৃত হলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই তরুণ ভাষাবিদ্‌কে পরম স্নেহে জানালেন স্বীকৃতি এবং তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন।

এরপর সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণের হলেন অন্যতম সঙ্গী। সুনীতিকুমার যে কেবল নীরস ভাষাবিজ্ঞানীই নন, তিনি একজন সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সংবেদনশীল শিল্পী, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর পত্রে সসম্মানে তা স্বীকার করলেন। সুনীতিকুমারের এই পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণের ফলশ্রুতিই হলো তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'দ্বীপময় ভারত।' রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার সম্পর্কে লিখলেন, 'আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম।...কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন।'

পরিব্রাজক সুনীতিকুমার

এই শক্তির মূলে ছিল বিশ্ব-ব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। অর্থাৎ, তাঁর মনের সুগভীর তত্ত্ব বিশ্ব-ব্যাপারের জীবন্ত চিত্রপ্রবাহকে ডুবিয়ে মারতে পারেনি। এইখানেই সুনীতিকুমারের সাধনার স্বাতন্ত্র্য। ভাষা যাদুঘরের মৃত জড়পুঞ্জ নয়, ভাষা নিত্যপ্রবহমান জীবন-ধারা—এই হলো সুনীতিকুমারের ভাষার সাধনার মর্মবাণী। তাই তিনি গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, তাঁর সাধনার পূর্ণতার জন্যে তিনি পরিভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর। তিনি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই পরিভ্রমণ করেছেন। এই পরিভ্রমণ নিছক দেশভ্রমণ নয়, তা ছিল তাঁর আবিষ্কার-যাত্রা। বিশ্বের নানা মানব-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনচর্চাকে তিনি তাঁর ভাষার সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর সারস্বত-সাধনাকে দিয়েছেন এক আশ্চর্য সম্পূর্ণতা।

রবীন্দ্রনাথ পরম বিস্ময়ে তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে তাঁকে 'ভাষাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করলেন। এলাহাবাদ হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন তাঁকে সম্মানিত করলো 'সাহিত্য-বাচস্পতি' উপাধিতে। ভারত সরকার তাঁকে এরপর 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ভারতের 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে বৃত হন। ১৯৭৭ সালের ২৯শে মে—তাঁর পরলোকগমনের দিন পর্যন্ত তিনি সেই পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভাষা-সাধকের সম্মান

ভাষা-সাধক সুনীতিকুমারের মহাপ্রয়াণকে বাংলার 'মহাগুরু-নিপাত' বলা যেতে পারে। তিনি যেমন আজন্ম শিক্ষক ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তেমনি তিনি তাঁর শিক্ষাব্রতকে রেখেছিলেন অম্লান। তাঁর উজ্জ্বল সান্নিধ্য থেকে অগণিত শিক্ষক পেয়েছেন মৌলিক জ্ঞানের সন্ধান, অসংখ্য ছাত্র পেয়েছে নিত্য-নতুন জ্ঞানার্জনের প্রেরণা, বহু গবেষক পেয়েছেন মহামূল্য পথনির্দেশ। শিক্ষকতা থেকে অবসর

গ্রহণের পর তিনি কিছুকালের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেও জ্ঞানচর্চার উজ্জ্বল মার্গ থেকে তিনি কোনকালেই বিচ্যুত হননি। এমন-কি, মৃত্যুর এক বছর আগেও তিনি তাঁর সংস্কারমুক্ত, সত্যসন্ধানী মন নিয়ে রামায়ণের উৎস ও রচনাকালের ওপর যে আলোকপাত করেন, তাতে ভারতের সনাতনপন্থী, রক্ষণশীল পণ্ডিতসমাজে এক বিপুল আলোড়ন স্থচিত হয়।

মহাগুরু-নিপাত

স্থনীতিকুমারের ভাষার সাধনা ছিল সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের সাধনা। বহুভাষাভাষী ভারতের মতো দেশে স্থনীতিকুমারের এই সাধনার মূল্য ছিল অপরিসীম। বিশ্বের ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, ভারতের ভাষার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। তাই যখনই ভারতে ভাষা-সমস্যার আগুন জ্বলে উঠেছে, ভারতের নেতৃবৃন্দ তাঁর মূল্যবান মতামত গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর উদার মতামত লাভ করে তাঁরা উপকৃত হয়েছেন, সমগ্র জাতি ভাষাগত রক্তক্ষরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচেছে।

ভারতের ভাষা-সমস্যায় স্থনীতিকুমার

এইভাবে স্থনীতিকুমার ভাষা-চর্চাকে প্রাচীনকালের গ্রাম্য গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত করে তাকে বিশ্বজনীনতার উদার আকাশের নীচে সংস্থাপিত করেন। সেদিক থেকে স্থনীতিকুমার বিশ্ববিশ্রুত ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাক্স্‌মুলার এবং গ্রীয়ার্সন সাহেবের মতো সর্ববন্দিত আসনের অধিকারী। স্থনীতিকুমারের জীবন অনুসন্ধিৎসা এবং অন্বেষণের জীবন। সেই অন্বেষণ সত্যের অন্বেষণ, আলোর অন্বেষণ। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জীবন্ত মানব-গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তিনি খুঁজেছেন ভাষাগত গভীর ঐক্য। রুদ্ধদ্বার গ্রন্থাগারের চার দেয়ালের মধ্যে বসে গ্রন্থকীটের মতো জ্ঞান-চর্চার মধ্যে তিনি তৃপ্তি খুঁজে পাননি। তাইতো দেখা যায়, জীবন্ত মানব-সত্যের অনুসন্ধানে তিনি পরিব্রাজকের মতো বেরিয়ে পড়েছেন জগতের দেশ-দেশান্তরে। স্থনীতিকুমারের ভাষার সাধনা তাই ছিল সত্যের সাধনা—জীবন্ত মানব-সত্যের সাধনা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- আচার্য স্থনীতিকুমারের জীবন ও সাধনা
- একজন মনস্বী বাঙালীর জীবন-কথা
- একজন বাঙালী মনীষী

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা॥ স্বাধীন ভারত ও শিক্ষার ধারা॥ শিক্ষা ও উন্নয়নের বৈচিত্র্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা॥ শিক্ষা-সংস্কারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত? শিক্ষার নববিধান॥ সম্ভাব্য ফলাফল॥ উপসংহার॥

২৯ সাম্প্রতিক ভারতে শিক্ষা-সংস্কার

'দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।'
—রবীন্দ্রনাথ

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন—জাতীয় জীবনের এই দুটি মৌল দিকের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্য প্রয়োজন। আজ ভারতের জাতীয় উন্নয়ন শুরু হয়েছে। স্বাধীনতালাভের বত্রিশ বছরেও সেই উন্নয়ন-ধারা আমাদের জাতীয় জীবনের সকল দিক স্পর্শ করতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কারও সূচিত হয়েছে।

ভূমিকা

বহু কমিটি ও বহু কমিশন বসিয়ে ইংরেজ-আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে কেবল আপস-রফাই করা হয়েছে। একদিকে কর্মহীন দুঃসহ বেকারত্ব, অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়নের বেদনাবহ আড়ষ্টতা। এই দুই দিগন্তের মধ্যে সংগতি-স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা। তরুণ-সমাজ শিক্ষা-ব্যবস্থার এই সংগতিহীনতায় দিশাহারা, অভিভাবকগণ বিমূঢ়। শক্তির এই বিপুল অপচয় ভারত-ভাগ্যবিধাতা আর ক্ষমা করবেন না বেশীদিন।

ইংরেজ-আমলে ভারতে য়ুরোপীয় ভাবধর্মী শিক্ষাধারা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতের সার্বজনীন শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে সেখানে শেক্সপীয়ার, শেলী, কীট্স্, বায়রনের কবিতার পঠন-পাঠন শুরু হলো; কিন্তু যে শিক্ষা জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির বনিয়াদ রচনা করতে পারে, তার ব্যবস্থা হলো না। 'নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক; আর, পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান অন্যরূপ।' ইংরেজ এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ তৈরীর অপচেষ্টাই করেছিল। সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যিক হিসাব-রক্ষার উদ্দেশ্যে তারা এদেশে চেয়েছিল ইংরেজি-শিক্ষিত একদল সিবিলিয়ান ও কেরানী সৃষ্টি করতে। তাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো : ভারতীয়েরা অচিরে পরিণত হলো অত্যন্ত অনুগত একটি কলম-পেষা যন্ত্রে।

দুর্ভাগ্যের কথা, স্বাধীন ভারতেও সেই কলঙ্ক এখনো ঘোচেনি। গণ-শিক্ষার দিক থেকে ভারতের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। এখনো শতকরা কুড়ি-বাইশজন মাত্র সাক্ষর।

অবশ্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অনুগ্রহে এই সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাতে ভারতের লাভ হ'য়েছে কতটুকু? যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁরা যে শিক্ষা পান, তাতে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের কোন্ প্রয়োজনই বা মেটে? ষাট কোটি জনসংখ্যা থেকে কয়েক হাজার স্নাতক হলেই কি দেশ কৃতার্থ হবে? ডিগ্রী-ডিপ্লোমা হাতে তারা অবশেষে সব দুয়ার থেকে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেবলমাত্র কেরানীগিরি তাদের কতজনের ভাগ্য-সংস্থান করে দিতে পারে? কর্মসংস্থান-কেন্দ্রে তাদের অধিকাংশই পড়বে বাতিলের খাতায়। তার ফলে সমাজের সকল স্তরে অশান্তি ও বিক্ষোভ উঠবে দানা পাকিয়ে। আর, তখন অন্যদিকে ভারতের সার্বিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনার উপকরণ হাতে নিয়ে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা বসে মুখ টিপে হাসবেন।

স্বাধীন ভারত ও শিক্ষার ধারা

আসল কথা, শিক্ষার সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং তাতে ধনী-দরিদ্র—শ্রেণী-ভেদ করলে চলবে না। কারণ, গরীবের ছেলেও তো বড়ো ডাক্তার কিংবা বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে চাই সমানাধিকার, চাই প্রতিভার পূর্ণ সদ্ব্যবহার। সেই সঙ্গে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের সকল দুয়ার খুলে দিয়ে সবার শক্তিকে সমান সুযোগ দিতে হবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশময় ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে এবং শিক্ষা-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য সাধন করে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিতে পারলে শক্তির মর্মান্তিক অপচয় অবরুদ্ধ হবে এবং জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির বান ডাকবে।

শিক্ষা ও উন্নয়নের বৈচিত্র্য-সাধনের প্রয়োজনীয়তা

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করবার উপযুক্ত আয়ুধে সজ্জিত হওয়াই আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ তাই শান্তিনিকেতনের পাশে বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যার কেন্দ্র শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভাবের সঙ্গে ভাতের ব্যবস্থাও করেছিলেন সর্বদর্শী কবি। গান্ধীজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বাস্তবায়িত করলে তা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে। আমাদের শিক্ষাকে গ্রন্থকেন্দ্রিক না করে কর্মকেন্দ্রিক করে তুলতে হবে, মুক্তিলাভ করতে হবে কেরানী-জীবনের ঘৃণ্য নাগপাশ থেকে।

শিক্ষা-সংস্কারের ভিত্তি কি হওয়া উচিত?

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার নববিধানে প্রবেশিকা তুলে দিয়ে স্কুল ফাইন্যাল চালু করা হয়। পরে শিক্ষার বহুমুখিতা আনয়ন করবার জন্যে বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা এবং ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। স্কুল-ফাইন্যাল বিদ্যালয়গুলির কিছু-সংখ্যক উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্যে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ-সূচী প্রবর্তিত হয়। তারা প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সঙ্গে ত্রৈ-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করছিল। ১৯৭৪ সালে আবার উচ্চ-মাধ্যমিক তুলে

দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা-সূচী চালু করা হয়েছে। তাতে উত্তীর্ণ হলে দু' বছর উচ্চ-মাধ্যমিক পড়তে হবে। তাতে সফল হলে দ্বি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সে প্রবেশাধিকার লাভ করা যাবে। সাম্মানিক বিষয়ের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে অতিরিক্ত আরো একটি বছর। বিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষার পদ্ধতির আংশিক সংস্কার করা হলেও উচ্চ-শিক্ষায় পরীক্ষা-পদ্ধতির পূর্ব-ঐতিহ্য 'যথাপূর্বম্' বহাল আছে।

শিক্ষার নববিধান

লক্ষ্য ছিল, পাঠ-সূচীর বোঝা কিঞ্চিৎ লাঘব করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে কিছুটা স্বস্তিময়, আনন্দময় করে তোলা। কিন্তু তা কি এ পর্যন্ত হয়েছে ? বরং শাকের আঁটির নামে পাঠ-সূচীর বোঝাই বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। স্নাতক শ্রেণীতে শুধু ইংরেজি এবং মাতৃভাষাকে ঐচ্ছিক করে তাদের এবং সেই সঙ্গে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের প্রকাশ-ক্ষমতার গঙ্গাপ্রাপ্তির পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠ-সূচীর রচয়িতা যাঁরা, তাঁদের এ বিষয়ে মনোযোগ, দূরদর্শিতা এবং সুবিচার আবশ্যিক।

এত করেও স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস করা যায়নি। এখনো শিক্ষক-পিছু ছাত্র-সংখ্যার অনুপাত বিশাল। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটি কোর্স চালু করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, তাতে দু'বছর পড়ে উকিলের মুহুরিগিরি থেকে শুরু করে আধা-চিকিৎসা [Para-Medical], ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স, কৃষি-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নয়টি বিষয়ে যোগদান করা যাবে। ছাত্র ও অভিভাবকদের অনীহায় এবং শিক্ষক ও পঠন-পাঠনের উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অকাল-সমাধি রচিত হতে চলেছে। তাছাড়া,

সম্ভাব্য ফলাফল

এ সব পরীক্ষার পর চাকরি বা জীবিকার কি সংস্থান হবে, তা নিয়ে আছে মহা-অনিশ্চয়তা। এই কর্মমুখী শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করছে কলকারখানার নতুন নিয়োগ-পদ্ধতির ওপর এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার ওপর। তা না হলে আমরা অন্নে মরবো, স্বাস্থ্যে মরবো, বুদ্ধিতে মরবো, চরিত্রে মরবো। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এই জাতীয় মড়ক কিছুতেই ঠেকানো যাবে না।

আসল কথা, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন একই খাতে প্রবাহিত হলে তবেই সুফল পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, কেবল শিক্ষা-সংস্কারেই চলবে না, তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ব্যাপক সুযোগ-সৃষ্টির জন্যে দেশময় কর্মোদ্যোগের একটি জোয়ার আনতে হবে। তবেই শিক্ষা-সংস্কারের পূর্ণ সফলতা

উপসংহার

লাভ করা সম্ভবপর হবে। এবং সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে স্থাপন করতে হবে একটি নিবিড় যোগ-বন্ধন। নচেৎ, জাতীয় অর্থ এবং শক্তির এই বিরাট অপচয় রোধ করা যাবে না।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- আমাদের শিক্ষা-সংস্কার
- ভারতের বৈষয়িক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সংস্কার
- শিক্ষা-সংস্কারের মূল লক্ষ্য

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ॥ ইংরেজী ভাষা-সর্বস্বতার পরিণাম ॥ জাতীয় অপচয় ॥ মাতৃভাষার অভিষেক ॥ শিক্ষা ও জীবনে মাতৃভাষা ॥ চিত্র-মুক্তি ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি ॥ মাতৃভাষার মুক্তি-আন্দোলন ॥ পূর্ব-বাংলা ও তামিলনাড়ু ॥ বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন ॥ উপসংহার ॥

৩০ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান

মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত জাতির ক্রমমুক্তি নেই। এতকাল আমরা বিদেশী ভাষার দাসত্ব গ্রহণ করেছি। দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ সেই ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন, বিতর্কমূলক আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছেন এবং দেশময় হৈ-চৈ শুরু করেছেন। ইংরেজী ভাষার সেই দুর্বোধ্য সাইক্লোনে দেশের অগণিত অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সেই মুক্তি-যজ্ঞে জনসাধারণের আমন্ত্রণ ছিল না। দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ বিশাল মানবগোষ্ঠীকে ইংরেজী ভাষার কৃত্রিম গণ্ডির বাহিরে নির্বাসিত রেখে তারা শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, রাজনীতি-সমাজনীতিতে একটি বিজাতীয় নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার অপচেষ্টা করেছিল। দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে, দেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে যার কোন নিবিড় যোগ-বন্ধন ছিল না।

ভূমিকা

কিন্তু একদিন আমাদের জাতীয় জীবনের সেই দুর্দিনে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষারও প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন যুগের সেই অজ্ঞতার অন্ধকার-অপসারণ ও মূঢ়তা-মুক্তির জন্যে আমাদের প্রাচ্য কূপমণ্ডুকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য চিত্ত-সংঘাতের প্রয়োজন ছিল। বিশাল বিশ্ব থেকে নির্বাসিত হয়ে আমরা যে এক আলোহীন, প্রাণহীন অন্ধকূপে নিমজ্জিত হয়েছিলাম, নানা অন্ধ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সেই জড়তাগ্রস্ত, স্থবির অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করলো য়ুরোপীয় মনের জঙ্গম শক্তি। এ কথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের হাত ধরে আমরা প্রাচীন রক্ষণশীলতার দুয়ার ভেদ করে আধুনিক যুগের আলোকিত প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং তার বাহন ইংরেজী ভাষা সেদিক থেকে ছিল আমাদের নবাগত মুক্তিদূত।

ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের চিত্তমুক্তি ঘটলেও এদেশে ইংরেজী ভাষা-প্রবর্তনের মূলে ছিল ভারতের মনোবিজয়ের চক্রান্ত। সেই চক্রান্ত সফল হয়। আর, তার ফলে এ দেশের যে নবজাগরণ এলো, তা আমাদের অতিরিক্ত লাভ। কিন্তু তাই বলে বিদেশী ভাষা-সর্বস্বতা কোন জাতির পক্ষেই গৌরবজনক নয়। ইংরেজী ভাষার মধ্যস্থতায় আমরা সুদূর বিশ্বকে জেনেছি, বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছি ; কিন্তু আমরা আমাদের ঘরকে, ঘরের মানুষকে, কিংবা ঘরের মানুষের সুখ-দুঃখকে জানতে পারিনি।

ইংরেজী ভাষা-সর্বস্বতার পরিণাম

তাই স্কুল-কলেজে ইংরেজী ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতঃই আমাদের মনের সহবর্তিনী হতে পারেনি। সেজন্যে আমরা যে পরিমাণ শিক্ষা পাই, সে পরিমাণে বিদ্যা পাই না। আমাদের শিক্ষার ভোজে ঘটে তাই অপরিমেয় অপচয়। সেই অপচয় হলো শক্তির অপচয়, সম্পদের অপচয়, এক কথায় জাতীয় অপচয়। রবীন্দ্রনাথ তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, 'চারিদিকের আবহাওয়া থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না।'

জাতীয় অপচয়

দীর্ঘকালের পরাধীনতার অবসানে আজ নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। সেখানে কত দুঃখ, বেদনা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তা দূর করতে হবে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব হবে না। সেখানে আহ্বান করতে হবে মাতৃভাষাকে। দেশব্যাপী দুঃখ-যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যের সিংহাসনে আজ আমাদের অবহেলিত মাতৃভাষাকে সসম্মানে অভিষিক্ত করতে হবে। কারণ, সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারের ভাষা দিয়ে আর যাই হোক, কোনদিন কোন জাতির মাতৃ-পূজার বোধন-মন্ত্র কখনই রচিত হতে পারে না।

মাতৃভাষার অভিষেক

'আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার অনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম স্থাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতামাতা—আমাদের সুহৃৎ-বন্ধু—আমাদের ভ্রাতাভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা—আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী-স্রোতস্বিনীর কোন সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।'

শিক্ষা ও জীবনে মাতৃভাষা

যে ভাষায় শিশুর মুখে বুলি ফোটে, সে ভাষা তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে, তার শোণিত-ধারার সঙ্গে মিশে থাকে। মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশ তার জন্মগত অধিকার। সেই ভাষাতেই তার চিত্ত-মুক্তি ঘটা সম্ভব। সোভিয়েট রাশিয়ায় আজ যে বিজ্ঞান-সাধনার চরম সমুন্নতি, তার মূলে রয়েছে তার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজন। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে, আমাদের জীবনের সকল ভাব-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক রূপায়ণ বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। যে ভাষায় মধুসূদন,

চিত্ত-মুক্তি ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যের দিক্‌পালগণ তাঁদের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার দিয়ে নৈবেদ্য রচনা করে গিয়েছেন, তা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

পূর্ব-বাংলায় [বর্তমান বাংলাদেশ] কেবলমাত্র উর্দু‌কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যখন চক্রান্ত করা হয়, তখন বুকের রক্তের মূল্যে তারা রক্ষা করে মাতৃভাষার পবিত্র অধিকার। ভারত-রাষ্ট্রেও মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় অগ্রণী হয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্য। অন্যদিকে, সীমান্তের অপর পারে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় টেলিগ্রাম-প্রেরণ, এমন-কি মুদ্র-লিখন যন্ত্র নির্মাণ সম্ভব করে তুলেছে। আমরা এখনও তা পারিনি। সেদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ যে পশ্চাদ্বর্তী, তা স্বীকার করা ভালো। রাজ্যের সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে চালু করবার ব্যাপারে গড়িমসি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

মাতৃভাষার মুক্তি-আন্দোলন : বাংলাদেশ ও তামিলনাড়ু

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ প্রমুখ মনীষীগণের চেষ্টায় বহুদিন হলো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। আবার, বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে উচ্চশিক্ষায়ও বাংলা ভাষার মাধ্যম স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যম যে স্বীকৃতি লাভ করে নি, তার মূলে ছিল বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব। সম্প্রতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ-রচনার জন্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদের সাহায্য করবার যে প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। অবশ্য, সেই সঙ্গে উদ্যোগী হতে হবে যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন

কিন্তু সরকারী কার্যে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সাফল্য এতদিনে যতখানি অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, সরকারী আমলাদের চক্রান্তে তা সম্ভব হয় নি। তারা বাংলা ভাষাকে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজীকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বহাল রাখতে চায় এবং সরকারী কার্যে ইংরেজী শিক্ষিতদের একাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়। তথাপি আমরা প্রার্থনা করি, মাতৃভাষার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় জীবন—এই দুয়ের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক। এইবার 'মাতৃভাষার অপবাদ দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক্, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধ্বনি॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা
- 'বিনা স্বদেশীয় ভাষা মিটে কি আশা ?'
- মাতৃভাষার মুক্তি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ অতীত ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা ॥ ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা। ইংরেজ-আমলে কারিগরী-শিক্ষার পরিণতি ॥ স্বাধীন ভারতে কারিগরী-শিক্ষা ॥ কারিগরী শিক্ষার উপকারিতা ॥ অপকারিতা ॥ উপসংহার ॥

৩১
কর্মমুখী শিক্ষা

আজ ভারতের দিকে দিকে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্যের হাহাকার। ইংরেজ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির যা-কিছু সম্বল ছিল, তার সেই কৃষি ও শিল্প-সম্পদকে সমূলে ধ্বংস করে তাকে একটি দীনতার বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপরূপে পরিত্যাগ করে গেছে। ভারতের সেই উন্নত বৃত্তিমুখী শিক্ষা, যা ভারতের প্রতিটি পরিবারের ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ভারতের প্রতিটি পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতো, তা আজ কোথায়? ভারতের সেই প্রখ্যাত শিল্পী-কারিগরেরা, যারা তাদের কুশলী শিল্প-নৈপুণ্যে বিশ্বের মনোরঞ্জন করতো, তারাই বা আজ কোথায়? ভারতের এই সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের পিছনে রয়েছে তার কারিগরী-শিক্ষার অভাব, তার কর্মমুখী শিক্ষার অবলুপ্তি।

ভূমিকা

অথচ কারিগরী-শিক্ষার সাহায্যে ঘরে বসেও মানুষের জীবিকা-নির্বাহ হয়ে যেত। তাঁতী তাঁত বুনে, ডোম ঝুড়ি-চুবড়ি-ধামা-কুলো ইত্যাদি তৈরী করে, কুমোর হাঁড়ি-কলসী তৈরী করে, কামার নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে, মৃৎশিল্পী নানাপ্রকারের মাটির পুতুল তৈরী করে জীবিকা অর্জন করতো। স্বদেশে-বিদেশে সেই সমস্ত সূক্ষ্ম শিল্প-রুচিমণ্ডিত দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রি হতো উচ্চমূল্যে এবং অর্থ-নৈতিক শক্ত বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো প্রতিটি পরিবার। তার ফলে সমগ্র সমাজে একটা সচ্ছলতার হাওয়া বইতো। ঘরে আসতো সুখ, আসতো শান্তি। প্রাচীন ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি ছিল তাইই। আজ আমরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তা হারিয়ে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করে জাতিকে কেবল কেরানীগিরির দিকে পথ-নির্দেশ করছি। এক দিগন্তে রইলো শিক্ষা, অন্য দিগন্তে দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবন; জাতির মুক্তি কোথায়?

অতীত ভারতে বৃত্তি-শিক্ষা

প্রাচীন ভারত ছিল বর্ণাশ্রম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্ব-স্ব বৃত্তি অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল। পরিবারের বৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক। বংশ বংশ ধরে একই বৃত্তির অনুশীলনে প্রত্যেক পরিবারই হয়ে উঠতো এক-একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তন। পিতা পুত্রকে তাঁর নিজস্ব কারিগরী বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দান করে যেতেন। এইভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে অনুশীলিত ও কর্ষিত হবার ফলে প্রাচীন ভারত এক বিস্ময়কর কারিগরী উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজ ও বৃত্তি-শিক্ষা

তারপর নানা কলকারখানাজাত পণ্যসামগ্রী নিয়ে ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজ আমাদের উপকূলে এসে ভিড়লো। ইতিহাস বলে, সে আমাদের পণ্যসামগ্রীর কারিগরী উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে এদেশে বাণিজ্য করতে ছুটে এসেছিল। শক্তিমান্ ইংরেজ আমাদের সেই সনাতন কারিগরী শিক্ষা-নিকেতনের ওপর হানলো প্রথম আঘাত। তাদের শিল্পজাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের কারিগরদের হাতের তৈরী শিল্পদ্রব্য পরাজিত হলো। বিলিতি পণ্যের চাকচিক্য আমাদের মনোহরণ করলো এবং আমরাও ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে বিদেশী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হলাম। ফলে, কারিগরী সাফল্যজনিত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে আমরা বিদেশী-প্রবর্তিত ডিগ্রীর মোহে আকৃষ্ট হয়ে স্বাধীন জীবিকার পরিবর্তে পরাধীন কেরানীগিরির জন্যে উমেদারী করতে লাগলাম।

ইংরেজ-আমলে কারিগরী শিক্ষার পরিণতি

তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হৃতসর্বস্ব ভারতীয়দের একদিন জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ হলো। সেদিন তারা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলে নিলো। ম্যাঞ্চেস্টার-বাকিংহাম পরিত্যক্ত হলো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো। তারপর দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন ভারতে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষার নব-বিধানে বনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক পাঠ-স্থচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদিকে, উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে দু' বছর পাঠ গ্রহণের পর ছাত্র-ছাত্রীরা উকিলের মুহুরিগিরি থেকে আধা-চিকিৎসা, ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স, কৃষি-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নয়টি বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করে কর্ম-জীবনে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করছে নতুন-নতুন নিয়োগ-সম্ভাবনার স্থযোগ-স্থষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতার ওপর।

স্বাধীন-ভারতে কারিগরী শিক্ষা

কর্মমুখী শিক্ষা জাতির অর্থনৈতিক বনিয়াদ রচনা করে দেয়। এর দ্বারা সমাজের প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারে। জাতির স্থখ ও সমৃদ্ধি রচনা করে কর্মমুখী শিক্ষা দেশের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠন করে। বেকার-সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করে তা নানা অশান্তির সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করে। কর্মমুখী শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ভিড় হ্রাস পাবে। এক কথায়, কর্মমুখী শিক্ষা ভারতের মতো দেশের হাতে তুলে দেবে তার দারিদ্র্য-বিজয়ের স্থনিশ্চিত হাতিয়ার। আজ দেশের তরুণ-সমাজ যে অন্তহীন নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধের মধ্যে ভবিষ্যৎ-জীবনের কোন স্থনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ছে, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজনের মধ্যে তারা তাদের স্থনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে খুঁজে পাবে। ধীরে ধীরে তাদের মনে নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধ কেটে গিয়ে পূর্ণ দায়িত্ববোধ বিকশিত হয়ে উঠবে। তাছাড়া, বৃত্তি-সাধনার মধ্য দিয়ে ভারতে অবহেলিত কুটির-শিল্প

কারিগরী শিক্ষার উপকারিতা

পুনর্জীবন লাভ করবে এবং তার ফলে নানা সমস্যায় জর্জরিত জাতির সম্মুখে খুলে যাবে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার এক নতুন দিগন্ত।

কর্মমুখী শিক্ষার অপকারিতাও আছে। তা ব্যক্তিকে বড় বেশী বাস্তবমুখী করে তোলে। রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে মানুষ সূক্ষ্ম ও উচ্চ চিন্তা থেকে বিরত হয়। তাদের জীবন ক্রমে যান্ত্রিক ও গতানুগতিক হয়ে পড়ে।—এই অপপ্রচারের দ্বারা আমাদের বিদেশী প্রভুরা এতদিন এদেশে কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তনকে অভিসন্ধিমূলকভাবে বিলম্বিত করেছে। আমরাও তাদের অভিসন্ধিপূর্ণ অপপ্রচারের ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু একথা বোঝা উচিত যে, শূন্য উদরে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে উচ্চ চিন্তা বেশীদিন চলে না। দলে দলে ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে রাস্তার চৌমোহানায় দেশের কী উচ্চ চিন্তার বিকাশ হয়, জানি না।

অপকারিতা

যান্ত্রিকতা ও গতানুগতিকতার ভয়ে যদি তরুণেরা বৃত্তি-চর্চা থেকে বিরত হয় এবং আপন মেধাশক্তির সামর্থ্যকে উপেক্ষা করে যদি উচ্চশিক্ষার জন্যে তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করে, তবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর তিলধারণের স্থান থাকবে না, পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা হবে ক্রমবর্ধমান, শিক্ষার মানও হবে নিম্নমুখী এবং দেশে বেকার-সমস্যার তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর, মানবশক্তির এই দুঃসহ অপচয় জাতির ভাগ্য-বিধাতাও বেশীদিন সহ্য করবেন না। অলস কর্ম-বিমুখদের কাছে যা গতানুগতিকতা, তাই-ই উৎসাহী ও উদ্যোগীদের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং নিপুণ সৃজনশীলদের হাতে প্রতিদিন নতুনত্বের দ্বারা পুরাতনের হবে অভিষেক।

এদিকে, খুব ঘটা করে সারাদেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাঠ-সূচী প্রবর্তিত হলো। কিন্তু তার রূপায়ণের জন্যে নেই পঠন-পাঠনের উপকরণ, নেই শিক্ষাদানের শিক্ষক—ছাত্রও নেই। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক—সকলের অনাগ্রহে তার অকাল-সমাধি হতে বসেছে। স্মরণীয় যে, ডিগ্রি বা চাকুরির মোহ জাতির কর্মদক্ষতা ও শিল্প-নৈপুণ্যকে

উপসংহার

পঙ্গু করে ফেলে। একটা বিশাল জাতির মুক্তি পরাধীন চাকরিতে নেই। তাই আজ নতুন নতুন যুগোপযোগী শিক্ষার দুয়ারগুলি একে একে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। কারিগরী শিক্ষা জাতীয় জীবনের ভিত্তি রচনা করে দেবে এবং তার ফলে দূর হবে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অভিশাপ। 'ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে॥'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- জীবিকামূলক শিক্ষা
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা
- কারিগরী শিক্ষা
- বৃত্তি-শিক্ষা ও বৃত্তি-নির্বাচন

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ ফটোগ্রাফি ও ম্যাজিক লণ্ঠন। চলচ্চিত্রের আবিষ্কার : এডিসন ও ইষ্টম্যানের অবদান ॥ শব্দ-ফটোগ্রাফি ॥ চলচ্চিত্রের দ্বৈত দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র : য়ুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি ও তার পরিণাম। উপসংহার ॥

৩২
শিক্ষা-প্রসারে চলচ্চিত্রের ভূমিকা

উ. মা. '৬২

ভূমিকা

শিক্ষা-সম্প্রসারণ ও আনন্দ-পরিবেশন—এই দ্বৈত দায়িত্ব আধুনিক যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্করণের মাধ্যমে সংসাধিত হচ্ছে, তার নাম 'চলচ্চিত্র'। প্রমোদমূলক শিল্প হিসেবে এর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। চলচ্চিত্র-শিল্প আজ সমাজের সর্বস্তরের ওপর যে অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। এর সর্বব্যাপী প্রভাব ও মায়া-মদির আকর্ষণের দুর্বারতার কাছে আমাদের চিরাচরিত রঙ্গমঞ্চের আবেদন-জলুস্‌ও আজ নিষ্প্রভ। এর আবেদনের মনোহারিত্ব ও সার্বজনীনতা একে দান করেছে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের মর্যাদা। বিশেষতঃ, লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এর সাফল্যের সম্ভাবনা অসামান্য।

ফটোগ্রাফি ও ম্যাজিক লণ্ঠন

আজ চলচ্চিত্র আমাদের কাছে আর বিস্ময়ের বস্তু নয়। কিন্তু একদিন এমন ছিল, যেদিন ছবির মানুষের হাত-পা-মুখ নেড়ে রক্ত-মাংসের জীবন্ত নরনারীর মতো কথা বলা বা গান গাওয়া ছিল এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। চলচ্চিত্র আবিষ্করণের পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল ফটোগ্রাফি। আর, তাকে পর্দায় প্রতিফলিত করবার জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল ম্যাজিক লণ্ঠন। পর্দায় প্রতিফলিত নিশ্চল ছবির সঙ্গে চলতো কথকতার মতো নীতিগর্ভ বক্তৃতা। তাও সেদিন লোকশিক্ষা ও লোক-রঞ্জনের দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

চলচ্চিত্রের আবিষ্কার : এডিসন ও ইষ্ট্‌ম্যানের অবদান

মানবের চক্ষু-তারকায় কিভাবে ছবি প্রতিফলিত হয়, সে সম্বন্ধে গবেষণায় রত পিটার মার্ক রজেট্‌ নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক একদা আবিষ্কার করলেন যে, মানুষের চক্ষু-তারকায় বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে, বস্তুটি চোখের সামনে থেকে অপসারিত হবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিবিম্ব স্থায়ী হয়। কালক্রমে এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে চলচ্চিত্র-শিল্প। চলচ্চিত্রে যে চিত্র প্রতিফলিত ও প্রদর্শিত হয়, তা ফিল্মে দ্রুত-গৃহীত কয়েকটি ছবির সমষ্টি মাত্র। ক্রমান্বয়ে গৃহীত গতিশীল ভঙ্গির প্রতিটি চিত্র ক্রমান্বয়ে সাজানো থাকে—যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত আবর্তনের ফলে ছবির পর ছবি এসে পর্দায় পড়ে এবং সেই চলমান গতিটি তখন আমাদের মায়া-বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই শিল্পকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ

বিজ্ঞানী এডিসন। তবে এই কার্যে ফটোফিল্ম-আবিষ্কর্তা ইস্ট্‌ম্যান তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। এডিসন তাঁর গবেষণাগারে সর্বপ্রথম এই চলন্ত ছবি দেখান ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে।

তারপর শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন চলচ্চিত্র-নির্মাণের কাজে। সেলুলয়েড ফিতার ওপর মুদ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র-সম্বলিত রীল থেকে চিত্রক্ষেপণ-যন্ত্রের দ্বারা তীব্র আলোকের সাহায্যে পর্দার ওপর বড় করে প্রতিফলিত করে ছবি দেখানো হতে লাগলো। চলন্ত ছবি দেখতে বেশ ভিড় জমে দেখে ব্যবসায়ীরাও তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। ক্রমশঃ সৃষ্টি হলো সবাক্ চলচ্চিত্র। ছবির ফটোগ্রাফের পাশে পাশে সেলুলয়েডের ফিল্মের ওপর উঠতে লাগলো শব্দেরও ফটো। তখন গল্প, উপন্যাস, নাটক, অভিনয় ইত্যাদি নিত্য-নতুন আনন্দের আয়োজনে যোগ দিল লক্ষ-লক্ষ লোক।

শব্দ-ফটোগ্রাফি

চলচ্চিত্রের আনন্দ-বিতরণী ও চিত্ত-বিনোদিনী ক্ষমতা অসামান্য। তাই চলচ্চিত্র তার ভূমিষ্ঠ-লগ্ন থেকেই সগৌরবে লোক-রঞ্জনী ভূমিকায় অবতীর্ণ। আনন্দাভিলাষী কর্মক্লান্ত মানুষের দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে নতুন কর্মোদ্যম ও কর্মপ্রেরণা সঞ্চারে তার জুড়ি নেই। কিন্তু সকল শিল্পের কাছে যেমন সমাজের একটা দাবি আছে, চলচ্চিত্র-শিল্পের কাছেও তেমনি আছে সমাজের মহত্তর দাবি। তা হলো চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় ভূমিকা—লোকশিক্ষা। ছায়াচিত্র আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদানে অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ, ভারতের মতো দেশে, যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা সামগ্রিক জন-সংখ্যার সত্তর-শতাংশ, সেখানে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। শিক্ষাহীন মানুষ অন্ধ। তার দৃষ্টিতে অক্ষর নিষ্ফল হতে পারে, কিন্তু চিত্র নিষ্ফল হয় না। এখানেই চিত্রের সার্বজনীনতা। চলচ্চিত্র আবার চলমান জীবনের শিল্পিত বিবৃতি। সকল মানুষের দৃষ্টিতেই রয়েছে তার সার্বজনীন আবেদন। ভারতের উচিত, এর পূর্ণতম সুযোগ গ্রহণ করে লোক-শিক্ষার জনপথ উন্মুক্ত করে দেওয়া।

চলচ্চিত্রের দ্বৈত দায়িত্ব

য়ুরোপ ও মার্কিন দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্র-ব্যবহারের সাফল্য বিস্ময়কর। জার্মানীর বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের ব্যবহার সর্বাধিক। সোভিয়েট রাশিয়াও এ-বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে শিক্ষা দান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-কার্যে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানচর্চায় চলচ্চিত্রের ভূমিকা অনবদ্য। ইংলণ্ডের বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও চলচ্চিত্রের ব্যবহার বহুল। কিন্তু ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ একান্তভাবে কুণ্ঠিত। চলচ্চিত্র আমাদের দেশের কেবল বিলাসের সামগ্রী। জাতি-গঠনে ও চিত্তের উদ্বোধনে এর যে ভূমিকা আছে, তা রাষ্ট্র কর্তৃক পুরোপুরি উপেক্ষিত। কেবল বিদ্যায়তনগুলিতেই নয়, সমগ্র সমাজের শিক্ষার দায়িত্ব বহনে চলচ্চিত্রের তুলনা নেই। যারা নিরক্ষর, চলচ্চিত্র সেই হতভাগ্যদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে

জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসতে পারে। পৃথিবীর নানা বৈচিত্র্যময় রূপ, দেশ-বিদেশের মানুষের জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি, ইতিহাস-বিশ্রুত দ্রষ্টব্য স্থান ইত্যাদি আমরা এর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে আমাদের জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রশমিত করতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির লোক-রঞ্জনী ভূমিকা যাই থাকুক, শিক্ষামূলক ভূমিকা নগণ্য। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত ডকুমেণ্টারী ফিল্মগুলির প্রচারমূলক ভূমিকা যতখানি, শিক্ষামূলক ভূমিকা ততখানি নয়। কাজেই, চলচ্চিত্র আজ জাতির গলায় শুধুমাত্র বিলাসের ফাঁস হয়েই বসেছে।

বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র : য়ুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে

কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রের কুশিক্ষা ও কুরুচি সৃষ্টির ভূমিকা অসামান্য। সেদিক দিয়ে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের দায়িত্ব অসীম হলেও দেশে কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্রের সৃষ্টি-ধারা অবারিত। আজ ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেই কোন সুস্থ জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রতিফলন, নেই কোন মহৎ হৃদয়-বৃত্তির রূপায়ণ, নেই উদার চরিত্র-মহিমা, নেই বাস্তবের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি ; কোন উচ্চতর শিল্প-সুষমার উপস্থাপনাও দুর্লভ। আছে কেবল অসুস্থ মনোবিকার, দেহ-কামনার উন্মত্ত উল্লাস, যৌন-বিলাসের নিরাবৃত প্রকাশ। এতে প্রযোজক-পরিচালকদের অর্থাগমের পথ সুগম হয়েছে, কিন্তু সর্বনাশ হচ্ছে জাতির।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের রুচি-বিকৃতি ও তার পরিণাম

ভারতীয় চলচ্চিত্র আজ বিশ্ব-বিজয় সমাপ্ত করেছে। বাঙালী চলচ্চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ই সেই সাফল্যের পথিকৃৎ। কিন্তু অন্যদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে রুচি-বিকারের রাহু গ্রাস করেছে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ভারতে চলচ্চিত্রের উপযুক্ত শ্রেণী-বিন্যাস নেই। উন্নত দেশগুলিতে কারখানার শ্রমিক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে আছে পৃথক্ পৃথক্ চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতে যে চিত্র কারখানার শ্রমিক-সাধারণ দেখে চিত্ত-বিনোদন করে, সেই চিত্র দেখবার জন্যে দুগ্ধপোষ্য বালকেরাও ভিড় করে। যে ছবি কারখানার শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করে, তা অল্পবয়স্ক বালকদের যে সর্বনাশ সাধন করে, তা এই দুর্ভাগা দেশে কেউ বুঝতে চায় না। তাই দেখা যায়, 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' নির্মিত ছবি দেখবার জন্যে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশবাহিনীকে ডাকতে হয়। তাতে চলচ্চিত্র-নির্মাতা, সরকার, শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক—কারো লজ্জায় মাথা কাটা যায় না। 'সত্য সেলুকাস্, কি বিচিত্র এই দেশ !!'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- শিক্ষা-প্রসারে চলচ্চিত্রের ভূমিকা
- ছায়াছবির উপকারিতা ও অপকারিতা

৩৩
নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা ঃ বৈদিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে ॥ মধ্যযুগে ভারতীয় নারী ॥ উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-মুক্তির আন্দোলন ॥ স্বাধীন ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি ॥ নারী-প্রগতির মূলসূত্র ॥ উপসংহার ॥

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার ?'
—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

আজ নবযুগের প্রভাতে দিকে দিকে বিঘোষিত হচ্ছে নারী-প্রগতির জয়ধ্বনি। নারী এতকাল ছিল পুরুষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তার কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত ছিল না সমাজে। নারীর পরিচয় ছিল কখনও কন্যারূপে, কখনও ভগ্নীরূপে, কখনও পত্নীরূপে, কখনও-বা মাতারূপে। সর্বত্রই প্রকটিত ছিল তার নিঃসহায় গলগ্রহতার রূপ। সুখের বিষয়, নারী আজ আর সেই বিগত শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মৌন ম্লান মুখে বসে নেই। সে আজ সেই আলোহীন, প্রাণহীন অন্ধকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে আলোকিত জগতের উদার প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছে। যে দুর্জয় চালক-শক্তি অন্তরালবর্তিনী, অসূর্যম্পশ্যা নারীকে অন্ধকার পাষাণ-পুরী থেকে মুক্ত করে আধুনিক জগতের আলোকিত প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়েছে, তা হলো আধুনিক শিক্ষা। সেই শক্তিবলে নারী আধুনিক যুগে লাভ করেছে আপন ভাগ্য জয় করবার দুর্লভ অধিকার।

ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা : বৈদিক যুগে ও বৌদ্ধ যুগে

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে নারী-স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল সমাজে। নারী-শিক্ষারও ছিল অবাধ অধিকার। ব্রহ্মবাদিনী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী প্রমুখ মহীয়সী নারীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। নারী সেদিন পুরুষের শুধু সহধর্মিণীই ছিলেন না, সহকর্মিণীও ছিলেন। এমন-কি, বেদের আলোকিত বিদ্যায়ও ছিল তাঁদের সমান অধিকার। উপবীত-ধারণে, বৈদিক মন্ত্র-রচনায় তাঁরা স্মরণীয়া হয়ে আছেন। বৌদ্ধ যুগেও নারীর সম-অধিকার ছিল স্বীকৃত। সুজাতা, সুপ্রিয়া, সংঘমিত্রার নাম বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের ইতিহাসে অম্লান মহিমায় আজও ভাস্বর।

তারপর এলো অন্ধকারময় মুসলমান যুগ। এবার শিক্ষা ও স্বাধীনতার উন্মুক্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নারী হলো অন্তরালবর্তিনী, নিক্ষিপ্ত হলো সূচীভেদ্য অন্ধকারময় অন্তঃপুরের পাষাণ-বেষ্টনীর মধ্যে। বাহিরের জগতে সূর্য উঠেছে, সূর্য অস্ত গেছে, যুগচক্র আবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীতে নব-নব অভ্যুদয়ের জয়ধ্বনি বিঘোষিত হয়েছে, নব-নব সাফল্য ও সিদ্ধির বাণী ধ্বনিত হয়েছে দিকে দিকে। কিন্তু ভারতের

নারীজাতি 'যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।' সেই চরম অগৌরবের মধ্যে কোনদিন আসেনি তাদের মুক্তির আহ্বান, উন্মুক্ত হয়নি অন্ধকার পাষাণকারার রুদ্ধ দুয়ার। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারের আচার-অনুষ্ঠানকে নিত্যসঙ্গী করে তারা সেই অন্ধকারে যাপন করেছে নিতান্তই গৌরবহীন জীবন। জগদ্দল পাষাণের মতো, তাদের বরণ করতে হয়েছে সমাজের সকল পরাভবের গ্লানি। সেই সুযোগে তাদের গ্রাস করে কৌলিন্য-প্রথা, বাল্য-বিবাহ প্রথা ও সতীদাহ ইত্যাদি নানা নিষ্ঠুর প্রথার নিষ্ঠুরতম শাসন। জীবনের স্বাধীনতা হারিয়ে, জগতের প্রগতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথানুগত্যের অজস্র জঞ্জাল জমিয়ে তুলে সমাজকে পরিণত করলো একটি ঘৃণ্য নরককুণ্ডে।

মধ্যযুগে ভারতীয় নারী

তারপর প্রগতির জয়ধ্বজা উড়িয়ে আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়ালো আধুনিক য়ুরোপ। য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের শুরু হলো চিত্ত-সংঘাত। তাদের জঙ্গম শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার অভিঘাতে আমাদের স্থবির সমাজে জাগলো প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভ। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশের সকল বন্ধন-মুক্তির নেতৃত্ব পুরুষেরা গ্রহণ করলেও সেই সব আন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠেছে নারী-সমাজকে কেন্দ্র করে। রামমোহন সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ আনলেন, বিধবা-বিবাহ এবং তৎসহ নারী-শিক্ষার প্রবর্তন আনলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর। সহস্র যুগের বন্দিনী নারী কুসংস্কারময় অন্ধকার অন্তঃপুর থেকে আলোকোজ্জ্বল আধুনিক যুগের উদার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো। এত আলো, এত জীবন! আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ নারী সেদিন উচ্চারণ করলো—'আমি নারী, আমি মহীয়সী!'

উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-মুক্তির আন্দোলন

এবার দেশে নারী-শিক্ষার অগ্রগতির জন্যে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো দিকে দিকে। নারী জাতির চিত্তোন্মেষ ঘটতে লাগলো। নব-নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শে ভারতের চিত্ত-শতদলও বিকশিত হতে লাগলো। এলো ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম। জাতির সেই মুক্তি-সংগ্রামে নারীরা এসে পুরুষদের পাশে তাদের যোগ্য স্থান গ্রহণ করলো। স্বাধীন ভারতে সকল প্রকার শিক্ষায়-দীক্ষায়, কর্ম-সংস্থানে নারী-জাতির সমানাধিকার আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নারী আজ আপন ভাগ্য জয় করবার পেয়েছে পূর্ণ অধিকার। বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাংবাদিকতা, রাজনীতি ইত্যাদিতে আজ আমরা দেখতে পাই আধুনিক যুগের স্ব-প্রতিষ্ঠ নারীকে।

স্বাধীন ভারতে নারী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি

উন্নত মানসিকতা-সম্পন্ন, সবল, বলিষ্ঠ জাতি-গঠনের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী-জাতির শিক্ষা ও প্রগতি। যে হাত দোলনা দোলায়, সেই হাতই বিশ্ব শাসন করে। শিশুর জীবনে জননীর শিক্ষা ও প্রগতিশীলতার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাছাড়া, সমাজের অর্ধাংশকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা কেবল সামাজিক অপচয় নয়, আত্মহত্যার সামিল। কাজেই, সমাজে নারী-জাতিকে যুগের

সহবর্তিনী হতে হবে। কেবল নারী-জাতির প্রয়োজনেই নয়, পুরুষের প্রয়োজনে—সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে নারী-জাতির উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা, মুক্তি-মানসিকতা আজ আবশ্যিক। আমরা চাই শিক্ষায়-দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল পরিবার এবং সেই সুখী, সন্তুষ্ট ও আদর্শ পরিবার-রচনায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই, সেক্ষেত্রে নারী-শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব সন্দেহাতীত। কিন্তু নারী-শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের কেন্দ্র-বিন্দু এবং নারীকেই কেন্দ্র করে আমাদের পরিবার-চক্র আবর্তিত হয়ে চলে। নারীকে তাই পরিবার-চক্রের সুযোগ্য মধ্যমণি করে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্যে তাকে সাহিত্য, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিশু-মনস্তত্ত্ব, সূচীশিল্প এবং রন্ধনশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হবে। সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার দুয়ারও উন্মুক্ত রাখতে হবে প্রতিভাসম্পন্না নারীদের জন্যে। আসল কথা, আমাদের সমাজে আমরা চাই আদর্শ জননী, চাই আদর্শ পত্নী, চাই আদর্শ কন্যা। তাদের হাতেই গড়ে উঠবে সমাজের সুখী পরিবার—যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ পরিবার।

নারী-প্রগতির মূলসূত্র

গত ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষরূপে পালিত হয়েছে। ভারতেও তা সাড়ম্বরে পালিত হয়। আমরাও বিশ্বাস করি, নারী-জাতির মুক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের বহু যুগের অচল রথচক্র আবার সচল হয়ে উঠবে। আমাদের সমাজের প্রয়োজনে, আদর্শ পরিবার-গঠনের প্রয়োজনে, আদর্শ জীবন-গঠনের প্রয়োজনে চাই উপযুক্ত নারী-শিক্ষা। সেই যুগোপযোগী নারী-শিক্ষা নির্মাণ করে দেবে নারী-প্রগতির বহু-প্রসারিত পথ, নারীর ভাগ্য-রচনার তা হবে প্রধান হাতিয়ার।

উপসংহার

কিন্তু সেই নারী-প্রগতির অর্থ কল্যাণহীন যথেচ্ছাচার নয়। আমরা চাই নারীর মেধা ও বুদ্ধির সঙ্গে ঔদার্য ও মহত্ত্বের সুসমঞ্জস্ বিকাশ। মাদাম কুরী, পার্ল বাক, ভ্যালেন্তিনা তেরেস্‌কোভার মতো ভারতীয় নারীও বিশ্বসম্মান অর্জন করুক। সে ঘর আর বাহির, অন্তঃপুর ও বহির্বিশ্ব—এই দু'য়ের মধ্যে উপযুক্ত যোগবন্ধন রচনার মধ্য দিয়ে স্ব-মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠুক, সারাদেশে সাফল্য ও সিদ্ধির বীজ রোপণ করে জাতিকে নব-নব কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করুক, তার মাঙ্গলিকবোধে অভিষিক্ত হয়ে কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত হয়ে উঠুক ভারতের সমগ্র সমাজ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা
- ভারতে নারী-প্রগতি
- আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষের শিক্ষা
- স্ত্রী-শিক্ষা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় সনাতন শিক্ষাধারার সংকোচ। প্রাচীন ভারতীয় লোক-শিক্ষার ধারা-বিপর্যয়। লোক-শিক্ষার বেদনাময় পরিণতি। লোক-শিক্ষার নব-রূপায়ণ প্রয়োজন। বেতার কার্য-সূচী ও প্রাচীন লোক-শিক্ষার ধারার আধুনিকীকরণ। সংবাদপত্র চলচ্চিত্র। উপসংহার।

৩৪ ভারতের লোকশিক্ষা

ক. প্রা. '৬১

ভূমিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরে সমগ্র ভারত জুড়ে অজগর-নিদ্রার মতো পড়ে রয়েছে অজ্ঞানতার সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেখানে লোক-শিক্ষার বাতি নেবানো। অথচ ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশে সনাতন শিক্ষার ধারা ছিল বহুস্রোতা। পঞ্চবটী-ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম-ভারতে সেদিন সার্বজনীন শিক্ষার ছিল অবারিত দ্বার। সেই শিক্ষা আক্ষরিক ছিল না বটে, কিন্তু আত্মিক ছিল। সেই আনন্দ-ঘন সজীব শিক্ষার ধারাবর্ষণে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতো সমগ্র জাতির অফুরন্ত প্রাণধারা। নব-নব ভাবের উদ্বোধনে এবং ভক্তিপূত সনাতন আদর্শের উচ্চারণে সমগ্র সমাজের বিকাশ সেদিন কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত হয়ে উঠতো। কিন্তু ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর পরিবর্তনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আক্রোশে ভারতের সেই বহু-স্রোতা সনাতন শিক্ষার ধারা তার নিজস্ব গৌরব-সুষমা হারিয়ে গেল লুপ্ত হয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় সনাতন শিক্ষাধারার সংকোচ

শিক্ষার সেই সার্বজনীন ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাকে চার-দেয়ালের বজ্র-আঁটুনির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে তার নামকরণ করলো বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। মুষ্টিমেয়, ভাগ্যবান যারা উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে প্রবেশাধিকার পায়, তারা শুধু স্বজাতিকে, স্বজাতির ইতিহাস-সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেই শেখে। তাই 'একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল, অন্যদিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হলো, তার প্রবাহ বইল না সার্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা।' শিক্ষার সেই নববিধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত গণ্ডীর বাইরে পড়ে রইলো নিরক্ষর, অজ্ঞতার অন্ধকারাবৃত, বিশাল ভারতবর্ষ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কূপ-বেষ্টনীর বাইরে আছে যারা, সেই কোটি-কোটি মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা যোগাতে, সেই শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশার বাণী ধ্বনিত করে তুলতে না পারলে দেশের মুক্তি নেই, জাতির মুক্তি নেই।

অথচ আবহমান কাল থেকে কৃষক, মজ্‌দুর, শিল্পী-শ্রমিক, যারা জাতির মেরুদণ্ড, তাদের কর্মক্লান্ত জীবনে আনন্দ-ঘন শিক্ষার ধারা বিতরণের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছিল সেদিনের হৃদয়বান্ সমাজ। যাত্রা, কথকতা, ব্রতকথা, ছড়া ও সংকীর্তনের

মাধ্যমে অভিনয়, গান ও আবৃত্তির আঙ্গিকে হিন্দুধর্মের সারমর্ম সংস্কৃতের জটাবন্ধন থেকে বহু-স্রোতা হয়ে প্রবাহিত হয়ে যেত। 'বার বার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচ দান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ।' পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে সেই বহু-স্রোতা অমৃতধারা আজ বিলুপ্ত। কোথায় গেল রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর দল? কোথায় গেল যুধিষ্ঠির-ভীষ্ম-দাতাকর্ণের মতো মহান্ আদর্শ-নিষ্ঠের দল? আর, সেই বেহুলা-চাঁদসদাগর-বিল্বমঙ্গলের দলই বা কোথায়? যাত্রার অভিনেতারা আজ আর নেই, কথকঠাকুর বিদায় নিয়েছেন, পাঁচালী ও লোক-সাহিত্যের গণ-কবিরা হয়েছেন নিরুদ্দেশ। আমাদের লোক-শিক্ষার সেই আনন্দের হাট এভাবে গেল ভেঙে। সারাদেশ এক সূচীভেদ্য অন্ধকারে হলো নিমজ্জিত।

প্রাচীন ভারতীয় লোক-শিক্ষার ধারা-বিপর্যয়

ভারতের গৃহলক্ষ্মীরা স্বামী ও শ্বশুরকুলের সঙ্গে নগরবাসিনী হয়ে ত্যাগ করেছেন প্রাচীন ব্রতাচার। এলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্তুতি। পল্লীগীতির স্থানে ধ্বনিত হলো স্বদেশী-গান। স্বাধীনতা-লাভের পর সে ধারাও এলো শুকিয়ে। তারপর এলো সিনেমা ও সিনেমা-পত্রিকার যুগ। এই নব্য-সংস্কৃতির ভক্তদল হলো স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, আপিস-কেরানী ও গৃহস্থ-বধূর দল। এদিকে, গ্রাম-ভারতের 'সমস্ত দিনের দুঃখ-ধান্ধার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে, ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।' এভাবেই ভারতের লোক-শিক্ষার ধারা—যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, ব্রতকথা হলো নিশ্চিহ্ন।

লোক-শিক্ষার বেদনাময় পরিণতি

স্বাধীন ভারতে যুগের তাগিদে গণ-শিক্ষার নব-রূপায়ণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। লোক-রঞ্জনী শিক্ষার প্রসার আজ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতে আজ গণতন্ত্র প্রবর্তিত। পাশ্চাত্যের ঘরে গণতন্ত্রের যে সাফল্য, তার মূলে রয়েছে সার্বজনীন শিক্ষা, যা ছাড়া গণতন্ত্রের রথ অচল। এদেশে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে গণতন্ত্রের চলেছে নানা অগ্নি-পরীক্ষা। সেইজন্যে গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রয়োজনে লোক-শিক্ষাকে আরো শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

লোক-শিক্ষার নব-রূপায়ণ প্রয়োজন

সাম্প্রতিক কালে লোক-রঞ্জনী শিক্ষা-প্রচারের প্রধান বাহন হলো বেতার-শিল্প। ১৯৪৭ সালে ভারতে ছিল মাত্র ছয়টি বেতার-কেন্দ্র। এখন ভারতে বেতার-প্রচার-কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বমোট সত্তর। সংগীত প্রচার হলো বেতার-সূচীর প্রায় অর্ধাংশ। কথিকা, বেতার-রূপক ও নাটক বেতার-সূচীর প্রধান আকর্ষণ। কথকতা, কবিগান, পাঁচালী-গান, পল্লীগীতি এবং যাত্রা আজ আর অবহেলিত নেই।

বেতার কার্য-সূচী ও প্রাচীন লোক-শিক্ষার ধারার আধুনিকীকরণ

আধুনিকীকরণের মাধ্যমে জন্মান্তর ঘটেছে তাদের। কৃষি-কথার আসর ও মজ্‌দুর-মণ্ডলীর আসর এখন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহজবোধ্য আলোচনার প্রচার-সূচীও আজ আর উপেক্ষিত নেই। কৃষি-বিষয়ক সমস্যাদির সমাধানে প্রশ্নোত্তরের আসর আজ বেশ জনপ্রিয়। তাছাড়া, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ পরিবেশনেরও রয়েছে ব্যবস্থা।

পশ্চিমী দুনিয়ায় গণ-শিক্ষা ও গণ-সংযোগের বাহন হলো সংবাদপত্র। সেখানে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। ভারতে সবেমাত্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতে বর্তমানে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার। গণ-শিক্ষা ও জন-সংযোগের ব্যাপারে যুগ-সর্বস্ব চলচ্চিত্রের ভূমিকা অসাধারণ। পাশ্চাত্য দেশে জনশিক্ষার দ্বারোদ্‌ঘাটনে চলচ্চিত্রের সাফল্য বিস্ময়কর। কিন্তু ভারতে গণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ একান্তভাবে নৈরাশ্যজনক। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র কেবলমাত্র বিলাসের সামগ্রী, জাতি-গঠনে ও গণ-চিত্তের উদ্বোধনে এর প্রয়োগ অতি নগণ্য।

সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্র

প্রাচীন ভারতের সনাতন ও সার্বজনীন শিক্ষার ধারা আজ রুদ্ধ; কিন্তু সেজন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোন লাভ নেই। যুগ বদ্‌লেছে, যুগ-প্রয়োজনে লোক-শিক্ষার রূপও গিয়েছে বদ্‌লে এবং তা কালের গতির অনিবার্য পরিণাম। যুগধর্মকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আধুনিক রীতি-প্রকরণের মাধ্যমে প্রাচীন ঐতিহ্য-ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে জাতির চেতনা ও সম্ভাবনার শুভ উদ্বোধন ঘটানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে একথা চিন্তা করবার দিন এসেছে যে, জনশিক্ষার বিস্তারে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনাময় ছাত্রসমাজকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সীমিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিয়োজিত করতে পারলে তাতে জাতির ভাগ্যে সোনা ফলবে। লোক-শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন ছাড়া গণতন্ত্রের তরুশিশু দেশের সর্বব্যাপী শিক্ষাহীনতা ও জ্ঞানহীনতার তপ্ত মরু-নিঃশ্বাসে যাবে শুকিয়ে, তার বিকাশের সকল সম্ভাবনা হবে অবলুপ্ত। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেবার দিন আজ এসেছে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের গণ-শিক্ষা ও তার রূপ-রূপান্তর
- লোক-শিক্ষা [প্রাচীন যুগ ও বর্তমান যুগ], ক. প্রা. '৬১
- বয়স্ক-শিক্ষা
- ভারতের জন-শিক্ষা

প্রবন্ধ-সংকেতঃ ভূমিকা॥ ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা ও সীমান্ত-রেখার বিস্তৃতি॥ ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শন॥ প্রাচীন ভারতে সামরিক শিক্ষা॥ মোগল ও ব্রিটিশ আমলে সামরিক শিক্ষা॥ স্বাধীন ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ও সামরিক শিক্ষার বিপর্যয়॥ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা॥ ফলাফল-বিচার॥ উপসংহার॥

৩৫ ভারতে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ক. প্রা. '৬৪

ভূমিকা

স্বাধীনতা মানুষের অমূল্য সম্পদ। সুদীর্ঘ দু-শতাব্দীর পরাধীনতার অবসানে ভারত লাভ করেছে তার দুর্লভ স্বাধীনতা। কত অকথ্য দুঃখ-বরণ ও অমূল্য প্রাণ-বলিদানের বিনিময়ে তার এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তার সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অপহরণ করবার জন্যে আজ চারদিকে চলেছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কত ষড়যন্ত্র। ভারতকে আজ তার সেই দুঃখ-লব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্যে চাই উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা, চাই উপযুক্ত সর্বাত্মক প্রস্তুতি।

ভারতের ভৌগোলিক বিশালতা ও সীমান্ত-রেখার বিস্তৃতি

ভারত-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিশালতার বিচারে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার ভৌগোলিক বিস্তৃতি যেমন বিশাল, তার সীমান্তরেখাও তেমনি সুবিস্তৃত। দেশবিভাগের পর সেই সীমান্ত-রেখা আরও প্রসারিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমে যে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ছিল, তা পড়লো পাকিস্তানের ভাগে। আর ভারতের ভাগ্যে পড়লো সুদীর্ঘ সমতল-সীমান্ত, যার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। তাছাড়া, স্বাধীনতা-লাভের পর পাকিস্তানের জঙ্গী-শাসন ক্রমাগত সেই প্রয়োজনীয়তাকে দিয়েছে আরও বাড়িয়ে। অন্যদিকে, ভারতের 'উত্তরস্যাং দিশি নগাধিরাজ হিমালয়ে'র প্রাকৃতিক পার্বত্য বন্ধুরতাও আজ আর যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। এই আলোকে ভারতের সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শন

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ভারত চিরকালই সামরিক ক্ষেত্রে গৌরবহীন। ইতিহাস সাক্ষী, ভারত কোনোদিন পররাজ্য আক্রমণ করেনি। শুধু তাই নয়, যখনই কোনো বৈদেশিক শক্তির দ্বারা সে আক্রান্ত হয়েছে, তখনই তার প্রতিরক্ষার ব্যূহ তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়েছে। বহিঃশত্রুর হাতে পরাভব এবং বৈদেশিক শক্তির কাছে গ্লানিময় দাসত্বের কলঙ্ক হয়েছে তার চিরন্তন ললাট-লিপি। ভারতের এই-যে দুর্ভাগ্য, তার মূলে আছে তার নিরুদ্বেগ, পরলোক-বিশ্বাসী জীবনদর্শন। তার দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই পার্থিব জীবন মায়াময়, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—এতকাল এই যুদ্ধ-বিরোধী জীবন-দর্শনই তার প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতির বেদনাবহ অবহেলার জন্যে দায়ী।

অবশ্য, প্রাচীন কাল থেকে ভারতে সামরিক প্রস্তুতির আয়োজন ছিল। বেদ-

বেদান্ত শিক্ষার পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল সামরিক শিক্ষার ধারা। কিন্তু সেই সামরিক শিক্ষা লাভের অধিকার ছিল কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়-সন্তানদের। সেই সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নিরঙ্কুশ রাজশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা, জ্ঞাতি-কলহে কিংবা প্রতিবেশী-কলহে জয়লাভ। আর, সমাজের বৃহত্তম শক্তি শূদ্র-সন্তানেরা মহাভারতের একলব্যের মতো দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা দিয়ে চির-পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। তাতে ভারতের সামরিক শক্তি হয়েছে চির-দুর্বল। অন্যদিকে, ক্ষত্রিয়-সীমিত সামরিক শক্তি জ্ঞাতি-কলহে কিংবা প্রতিবেশী-সংঘর্ষে হয়ে পড়েছে হীনবল। তারপর যখন প্রবল বহিঃশত্রুর দল বন্যার মতো ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন পরাজয়ই হয়েছে তার ভাগ্যলিপি।

প্রাচীন ভারতে সামরিক শিক্ষা

মোগল-আমলে সামরিক শিক্ষার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। যেটুকু হয়েছিল, তার কৃতিত্বের দাবিদার হলেন বাবর, শেরশাহ এবং আকবর। কিন্তু তাও ছিল গতানুগতিক সমর-কৌশলের জীর্ণ পুনরাবৃত্তি। বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধাস্ত্র ও সমর-কৌশলের আধুনিকতার মূল্য অসীম। তবে ব্রিটিশ আমলে দু-এক স্থানে আধুনিক পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তাতে ভারতীয়রা যোগদান করে আধুনিক সমর-রীতি আয়ত্ত করে। ইংলণ্ডের সামরিক শিক্ষায়তনেও তারা শিক্ষা-লাভের অধিকারী হয়েছিল। ভারতীয় যুবকেরা স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী—সামরিক বিভাগের সকল শাখাতেই উজ্জ্বল কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

মোগল ও ব্রিটিশ আমলে সামরিক শিক্ষা

স্বাধীন ভারতে নানা কারণে সামরিক শিক্ষার প্রতি একটা প্রতিকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অহিংসা, নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতির প্রতি আনুগত্যই ভারতের সেই সামরিক দুর্বলতার মূল কারণ। বর্তমান জগতে এই নীতিগুলির মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু স্মরণীয় যে, মহামতি অশোকের সুমহান্ শান্তি ও অহিংসা-নীতির ওপর অতি-নির্ভরতা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যিক পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

স্বাধীন ভারতের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ও সামরিক শিক্ষার বিপর্যয়

তাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে তার স্বাধীনতার প্রদীপ-শিখাকে রক্ষা করবার জন্যে ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। এন. সি. সি. ও এন. সি. সি. আর. সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে সমর্থ ছাত্রদের যোগদান বর্তমানে স্বেচ্ছামূলক। ছাত্রেরা ইচ্ছানুযায়ী স্থল, নৌ বা বিমান—সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগদান করতে পারে। এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে রাষ্ট্রীয় সৈনিক-স্কুল আছে দেরাদুনে। আহম্মদনগরে আছে যান্ত্রিক যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র আছে দেরাদুনে ও বাঙ্গালোরে।

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা

ভারতে সমর-শিক্ষা যতদিন স্বেচ্ছাবৃত ছিল, ততদিন নৈপুণ্য বা কৃতিত্ব প্রদর্শন ছিল সীমাবদ্ধ। ১৯৬২ সালে সীমান্ত-সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক সমর-শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্প্রসারিত হয়। কেবল তাই নয়, যে দেশপ্রেম ছিল সুপ্ত, আজ তা

সামরিক শিক্ষার সুযোগে হয়েছে জাগ্রত। সীমান্তে যে ভারতীয় জওয়ানেরা দেশের নিরাপত্তা-রক্ষায় ব্যাপৃত, তারা যে একা কিংবা অসহায় নয়, তাদের পশ্চাতে রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময়, উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সদাজাগ্রত যুব-সম্প্রদায়, তা আজ স্পষ্ট এবং তা আজ অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর দৃঢ় মনোবলের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। এরা প্রয়োজন-বোধে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আগামীকাল তাদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে।

ফলাফল-বিচার

ভারতে সেই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়। যেখানে ছাত্র-সমাজের একাংশ দরিদ্র, কায়ক্লেশে যাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা-ব্যয় সংগ্রহ করতে হয়, সেখানে তাদের ওপরে এই সামরিক শিক্ষার দুরূহ গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া অসঙ্গত। তাছাড়া, মুসোলিনী-হিটলারের মতো জঙ্গী-নীতি প্রবর্তনের দ্বারা দেশের জনমনের সুকোমল বৃত্তিগুলিকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করলে দেশের সামূহিক সর্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তা অনেকেরই সুচিন্তিত অভিমত। কারণ, লাইকারগাসিজ্‌ম স্পার্টাকে যতই শক্তিশালী করে তুলুক, বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয় এথেন্সের শিল্প-সৌন্দর্যের নব-নব উপহার। তবু স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে সামরিক শক্তি-বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে আবশ্যিক। পরাধীনতার ক্ষত-চিহ্নগুলির তিক্ত যন্ত্রণা আমরা আজও ভুলতে পারি নি। আমাদের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে বহিঃশত্রুরা বারে-বারে আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করে আমাদের হাতে-পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে—ভারতের ইতিহাসে রয়েছে তার বেদনাদায়ক সাক্ষ্য। কাজেই, ভবিষ্যতে যাতে আমাদের স্বাধীনতা দুর্ধর্ষ বিদেশী দস্যুদের হাতে অপহৃত না হয়, তার জন্যে উপযুক্ত সামরিক শক্তি-সংগঠন আমাদের দরকার। তাই স্বাধীন ভারতে ব্যাপক সামরিক শিক্ষা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সামরিক শক্তির ওপর আত্যন্তিক প্রাধান্য আবার দেশের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। ইতিমধ্যে তাই ভারতে সামরিক শিক্ষাকে করা হয়েছে স্বেচ্ছাবৃত॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে সামরিক শিক্ষার গুরুত্ব
- দেশরক্ষায় ছাত্রদের কর্তব্য
- সামরিক শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা-বাহিনী

প্রবন্ধ-সংকেতঃ ভূমিকা ॥ ছাত্র-সমাজের অপরাজেয় শক্তি ॥ ছাত্র-সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্ব ॥ ভারতে ছাত্র-সমাজ ॥ লোকসেবায় ছাত্র-সমাজ ॥ ছাত্র-সমাজের স্বেচ্ছাবৃত লোকসেবা ॥ লোকসেবায় ছাত্র-সমাজের একটি সুচিন্তিত কার্য-সূচী ॥ উপসংহার ॥

৩৬ সমাজ-কল্যাণ ও ছাত্র-সমাজ

উ. মা. '৬৯

যখন সমগ্র সমাজ থাকে অজগর-নিদ্রায় নিমগ্ন, তখনই ছাত্র-সমাজের ঘুম ভাঙে। যুগে-যুগে ছাত্র-সমাজের ইতিহাসে রয়েছে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। সমাজের অন্যায়, অসত্য ও প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের চিরন্তন সংগ্রাম। যেখানে ব্যথা-বেদনার হাহাকার, আর্ত-পীড়িতের ক্রন্দন-রোল, সেখানেই ছাত্র-সমাজের নির্ভীক উপস্থিতি। সবুজ, সতেজ ছাত্র-সমাজ জাতির সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠতম অংশ। নবীন প্রাণশক্তির অফুরন্ত উচ্ছ্বাসে ভরপুর তাদের দেহমন; হৃদয়ে তাদের অসীম দুঃসাহস, 'বাহুতে নবীন বল'। তাদের চোখে উদ্দীপনার জ্বলন্ত মশাল, বক্ষে অসম্ভবকে 'চ্যালেঞ্জ' করবার দুর্জয় প্রতিশ্রুতি। প্রাণ-প্রাচুর্যে-ভরা এই তরুণ গরুড়ের দল জাতির অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক। সামাজিক স্বাধীনতা, প্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে জীবন-বলিদানের জন্যে তারা চির-অঙ্গীকারবদ্ধ।

ভূমিকা

অথচ সামাজিক নেতৃত্বের দায়িত্বভার ধূসর বার্ধক্যের পশ্চিম দিগন্তে পুঞ্জিত হওয়ায় জীবন-প্রভাতের পূর্ব-দিগন্ত চিরকালই অবহেলিত। সামাজিক শক্তির এই সর্বাপেক্ষা সতেজ অংশটি বিকাশের যথাযোগ্য সুযোগ লাভ করলে বহু অসাধ্য সাধিত হতে পারে, সামাজিক কল্যাণের বহু রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জরাগ্রস্ত সমাজ এই দুর্জয় শক্তির সন্ধান রাখে না, কোন মহত্তর সামাজিক কল্যাণের মন্ত্রে তাকে অনুপ্রাণিতও করে না। ফলে, যে শক্তি সামাজিক কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হয়ে সোনা ফলাতে পারতো, তা নানা বিধি-নিষেধ ও নৈষ্কর্ম্যের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে সামাজিক অকল্যাণের অভিমুখে ধাবিত হয় ও মেতে ওঠে সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে।

ছাত্র-সমাজের অপরাজেয় শক্তি

তবে দোষ কার? সাধারণতঃ ছাত্র-সমাজের ঘাড়েই এই দোষের দায়ভাগ চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অকর্মণ্য অভিভাবকত্বের পরিণামেই যে তরুণ ছাত্র-সমাজ আজ বিপথগামী, তা অস্বীকার করবে কে? আসল কথা হলো, ছাত্র-সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত জীবনী-শক্তির দ্যোতক। তাদের মধ্যে অগ্রগতির আহ্বান, নিত্য-নতুন কর্মের নেশা। কিন্তু নেতৃত্বের দিগন্তে জরা এবং বার্ধক্যের অনড় লৌহ-প্রাচীর। সামাজিক অভিভাবকদের দিক্-নির্দেশনা ও কর্ম-প্রবর্তনার অভাবে অফুরন্ত গতি ও কর্মোন্মাদনার উৎস ছাত্র-সমাজ সৃষ্টির বিপরীত দিগন্তে ধ্বংসের নেশায় ওঠে মেতে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-সমাজের এই অর্থহীন ধ্বংসমূলক কার্যকলাপ অবশ্যই নিন্দনীয়; কিন্তু সামাজিক নেতৃত্বের নিশ্ছিদ্র জড়তা ও নৈষ্কর্ম্যও কি প্রশংসাযোগ্য?

ছাত্র-সমাজ ও সামাজিক নেতৃত্ব

কাজেই, অতি-সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

ও বিপথগামিতার জন্যে ছাত্র-সমাজ যতখানি দায়ী, তদপেক্ষা অধিকাংশে দায়ী জড়তা-গ্রস্ত সামাজিক নেতৃত্ব। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রও একদিন তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে গভীর আক্ষেপে বলেছিলেন, আমাদের দেশে ছাত্র-সমাজ গৃহে ভর্ৎসনার পাত্র, বিদ্যালয়ে শাসনের পাত্র এবং সমাজে উপেক্ষার পাত্র। কেবলই ভর্ৎসনা, শাসন ও উপেক্ষা আমাদের হতভাগ্য ছাত্র-সমাজের ভাগ্যলিপি। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে, শুভকর্মে আহ্বানের অভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তির দুর্মর প্রকাশ ছাত্র-সমাজ যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে সামাজিক অশুভকর্মে লিপ্ত হয়, তখন চারদিকে প্রবল চীৎকার ও তিরস্কার ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সমাজের বোঝা উচিত, দোষ কার?...দায়ী কে?

ভারতে ছাত্র-সমাজ

ভারতের মতো দেশে, যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্ত নেই, অশিক্ষা-কুশিক্ষার শুষ্কতাপে যেখানে নিরানন্দ মরুভূমি তার স্থায়ী আসন পেতে বসেছে, যেখানে রোগ-তাপ-জর্জরতায় এবং প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে কোটি-কোটি মানুষের জীবন প্রতিবছর বিপন্ন ও অসহায় হয়ে পড়ে, সেখানে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা অসামান্য। অর্থাৎ, ভারতের মতো দারিদ্র্য-জর্জর, রোগ-জর্জর, সমস্যা-জর্জর দেশে ছাত্র-সমাজের সম্মুখে পড়ে আছে লোকসেবার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রকৃতির নিষ্করুণ রুদ্রশাপে এদেশে মানুষের দুঃখ-দুর্গতির অন্ত নেই। বন্যা-প্লাবন-জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্প-ঘূর্ণিবাত্যা-ধসের ফলে প্রতি বছরই ভারতের জনগণের ভাগ্যে ঘনিয়ে আসে দুঃখের অমারাত্রি। তাছাড়া, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মনুষ্য-সৃষ্ট মহাবিপত্তিসমূহ তো আছেই। মানবতার আর্ত হাহাকারে আকাশ-বাতাস যখন পূর্ণ হয়ে ওঠে, অকাল-মৃত্যুর হাতে অসহায় জনগোষ্ঠীর অক্ষম আত্মসমর্পণে যখন নিত্য-নতুন বেদনার অশ্রুসিক্ত ইতিহাস রচিত হয়, তখন আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজের কি কিছুই করণীয় নেই?

লোকসেবায় ছাত্র-সমাজ

লোকসেবায় অনুপ্রাণিত হবার জন্যে যখন সমাজ বা রাষ্ট্র ছাত্র-সমাজকে আহ্বান করে না, তখন ছাত্রগণ স্বেচ্ছাবৃতভাবেই অনেক সময় সমাজসেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষের অসহ দুঃখ-বেদনার নীরব দর্শক হয়ে তারা কিছুতেই থাকতে পারে না। দুঃখ-সংকটের আবর্ত-মাঝে নিজেদের নিক্ষেপ করে তারা বিপন্নের উদ্ধারে রচনা করে আত্মত্যাগের নতুন ইতিহাস। ছাত্র-সমাজ স্বভাবতঃই লোকসেবার ব্রতধারী। সে কথা সমাজ অনায়াসে অস্বীকার করে। বন্যার্ত বা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবায় টিফিনের পয়সা দিয়ে কি ছাত্রেরা ত্রাণ-তহবিল গড়ে তোলে না? দলবদ্ধভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কি তারা আর্ত-পীড়িতের সেবায় সাহায্য সংগ্রহ করে বেড়ায় না? জীবন বিপন্ন করে কি তারা আক্রান্ত এলাকায় ছুটে যায় না? 'চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করে, সারাদিন রিক্সা চালিয়ে, এমন-কি জুতো পালিশ করে তারা আর্তসেবায় রাখে গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

ছাত্র-সমাজের স্বেচ্ছাবৃত লোকসেবা

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিভাবকেরা তাদের এই মহান্ মানবিকতার দিকটি দেখতে

পান না। কিন্তু সমাজের সজীবতম অংশ ছাত্র-সমাজকে কোন সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কর্মে অনুপ্রাণিত করতেও তাঁরা পারেন নি। এই ব্যর্থতা তাঁদের অভিভাবকত্বের ব্যর্থতা। একথা সত্য যে, সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দারিদ্র্য ও রোগ-জর্জরতার মূলে আছে তাদের শতাব্দী-লালিত অশিক্ষা। অশিক্ষার সেই জগদ্দল পাথরটাকে জনজীবনের বুকের ওপর থেকে অপসারিত করতে পারলে জনগণকে সচেতন ও স্বনির্ভর জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করা যায় এবং লোক-সেবার মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজে, এমন কি কোন কার্যসূচী চালু করা যায় না, যার ফলে ছাত্র-সমাজ বছরের অন্ততঃ দু-তিন সপ্তাহের জন্যেও দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণে কার্যতঃ বাধ্য থাকে? বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করবার জন্যে সেবাই কি শুধু লোকসেবা? সম্ভাব্য বিপদের মূলোৎপাটন কি লোকসেবা নয়? তাছাড়া, স্কুল-কলেজে আর্তত্রাণ দল সংগঠিত করে লোকসেবার স্থায়ী ব্যবস্থা করেও রাখা যায়। অবশ্য, সেজন্যে 'স্কাউট দল', 'সেন্ট জন্স অ্যাম্বুলেন্স কোর' ইত্যাদি সেবা-সূচী অত্যন্ত সীমিতভাবে চালু আছে।

লোকসেবায় ছাত্র-সমাজের একটি সুচিন্তিত কার্যসূচী

কিন্তু তাইই যথেষ্ট নয়। স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে লোকসেবার সম্প্রসারিত কার্যসূচীর প্রচলন চাই। তার দ্বারা শুধু লোকসেবার মহত্তম দৃষ্টান্তই স্থাপিত হবে না, তার দ্বারা ছাত্র-সমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধেরও উন্মেষ ঘটবে। এইভাবে গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারলে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিপথগামিতা প্রতিরুদ্ধ হবে। ফলে, একদিকে যেমন নবীন প্রাণের উৎস ছাত্র-সমাজের শক্তি-সামর্থ্য জাতির সেবায় সার্থকতা লাভ করবে, অন্যদিকে তেমনি সমগ্র জাতি এর জন্যে চির-নিন্দিত ছাত্র-সমাজের কাছে থাকবে চির-কৃতজ্ঞ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- আর্তের সেবা ও ছাত্র-সমাজের কর্তব্য
- জনসেবায় ছাত্র-সমাজ
- ছাত্র-সমাজের শক্তির অপচয় দূর করবার উপায়

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। জীবনে শৃঙ্খলা-বোধের প্রয়োজনীয়তা। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা। শৃঙ্খলা ও মানব-সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলানুশীলনের উপযুক্ত সময়। শৃঙ্খলা শৃঙ্খল নয়। বর্তমানে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। উপসংহার।

৩৭
ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ভূমিকা

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু থেকে সুদূর মহাকাশের বিশালকায় গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত—সর্বত্রই বিরাজিত এক কঠোর নিয়মের শাসন। প্রভাতে পূর্ব-দিগন্তে সূর্যোদয় এবং সায়াহ্নে পশ্চিম-দিগন্তে সূর্যাস্ত—সবই এক দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মাধীন। মানব-জীবনেও প্রয়োজন সেই কঠোর নিয়মের শাসন। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে হলে তার জীবনেও আহ্বান করতে হবে শৃঙ্খলাবোধ। কারণ শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য।

জীবনে শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজনীয়তা

প্রকৃতির রাজ্যে যে শৃঙ্খলা বিরাজিত, তারই শাসনে মানুষের দেহ-মনে আসে অনিবার্য ক্রমবিবর্তন। কোন মানুষ সেই নিয়মকে অস্বীকার করতে পারে না। শৈশব কালই মানব-জীবনে প্রবেশের সিংহদ্বার। কাজেই, শৈশবের শুভ লগ্নেই নিয়মানুশীলনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। আসল কথা, এই মানব-জীবনে সোনা ফলাতে হবে। দুর্লভ মানব-জীবন কেবল ছন্দোহীন অপচয়ের জন্যে নয়। মানব-জমিনে সোনা ফলাতে হলে চাই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের বিশ্বস্ত অনুশীলন।

সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা-বোধের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি কর্মানুশীলনের আছে একটি বিশেষ ধারাক্রম, যার নাম ছন্দ। সেই ছন্দই শৃঙ্খলা, সেই ছন্দই সাফল্যের পুরোহিত। শৈশব থেকে মানুষকে সমাজে বিচরণ করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় নানা সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি খেয়াল-খুশিমতো যথেচ্ছাচার শুরু করে, তাহলে সমগ্র সমাজটাই উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মাদাগারে পরিণত হবে। অবিশ্রান্ত সংঘর্ষে মানব-জীবনের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়বে। সৌরজগতে নিয়মের সামান্যতম ব্যতিক্রমে যেমন সর্বধ্বংসী বিপর্যয় ঘটতে পারে, তেমনি নিয়মের ব্যতিক্রমে সমগ্র সমাজ-জীবনে ঘনিয়ে আসতে পারে এক ঘোরতর বিশৃঙ্খলা।

শৃঙ্খলা ও মানব-সমাজের সামগ্রিক উন্নতি

মানব-সভ্যতার চরম বিকাশের মূলেও আছে মানুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কর্মোদ্যোগ। যেখানে শৃঙ্খলা নেই, সেখানে শ্রী নেই, কল্যাণ নেই, আনন্দ নেই, শান্তি নেই। সেই নিরানন্দ, কল্যাণশ্রী-সুষমাহীন অশান্ত অরাজকতায় ঘনিয়ে আসে মানব-জীবনের অন্তিম লগ্ন। শৃঙ্খলা-বদ্ধ, নিয়মানুবর্তী, সুসংহত সৈন্যবাহিনীই যুদ্ধ-বিজয় করতে পারে। তাই তো সুশৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে সাফল্যের জয়টিকা এবং উচ্ছৃঙ্খল জাতির ভাগ্যে জোটে পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি।

ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের উপযুক্ত সময়। এই সময় কোমল মানব-ভূমিতে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার বীজ উপ্ত হলে উত্তরকালে তাতে অমৃত-ফল ফলে। ভারতের বৈদিক সমাজ তাই ছাত্র-জীবনে কঠোর ব্রহ্মচর্য-পালনের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই ব্রহ্মচর্য-পালন ও ব্রতানুবর্তিতা জীবনের মৃত্তিকায় শৃঙ্খলা-বোধ-উৎকর্ষণের ভূমিকা। শৃঙ্খলানুশীলন তাই সর্বদেশের সর্বকালের ছাত্র-জীবনের অবশ্য-আচরণীয় বিধি।

ছাত্র-জীবনই শৃঙ্খলানু-শীলনের উপযুক্ত সময়

শৃঙ্খলাবোধ জীবন-গঠনের বোধন-মন্ত্র। কিন্তু শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খল হয়ে প্রতিনিয়ত পদযুগলে নির্দয়ভাবে বাজে, যদি অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, তাহলে জীবন কূপমণ্ডুকতার পাষাণ-প্রাচীরে মাথা কুটে মরে এবং সমাজ প্রাণহীন নিয়ম-শৃঙ্খলার আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিণত হয় এক কঠিন কারাগারে। যুগে যুগে দেখা গিয়েছে, অর্থহীন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়ে বারে বারে সামাজিক প্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়েছে, জীবন পরিণত হয়েছে শুষ্ক মরুভূমিতে।

শৃঙ্খলা শৃঙ্খল নয়

সম্প্রতি ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতায় সকলেই উদ্বিগ্ন। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার কলঙ্কিত স্বাক্ষর পড়ে পরীক্ষা-মন্দিরে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, সমাজ-জীবনের অলিতে-গলিতে। ছাত্র-সমাজ অগ্রযাত্রীর দল। তারা স্বভাবতঃই অগ্রসর হতে চায়, চায় কর্ম-ব্যস্ততা। কিন্তু যেখানে অগ্রসরণের পথ রুদ্ধ, সেখানে কর্ম-হীনতার বিশাল অবকাশ মানস-ক্ষেত্রকে শয়তানের কারখানায় পরিণত করে। দেশব্যাপী আশাহীনতা, কুরুচি ও দুর্নীতিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ছাত্র-সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চালিত করে। ছাত্র-সমাজে যদি শৃঙ্খলাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার মূল কারণগুলিকে বিলুপ্ত করতে হবে। কেবল ছাত্র-সমাজকে তিরস্কৃত করে কিছু হবে না।

বর্তমানে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ

ছাত্র-সমাজেরও মনে রাখতে হবে যে, ছাত্র-জীবনই জীবন-গঠনের সময়, জীবনের প্রস্তুতির কাল। আর, শৃঙ্খলাবোধ হলো জীবনের ভিত্তিশিলা। বর্তমানের যে নৈরাশ্যবোধ কিংবা রুচি-বিকৃতি, তা অপসারিত করে অচিরে নতুন আশা ও আদর্শের সূর্যোদয় ঘটবে। এর পর আসবে নতুন দিন, নতুন জীবন। আমাদের ছাত্র-সমাজ তাকে বরণ করবার জন্যে যেন প্রস্তুত থাকে ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ ও প্রতিকার
- ছাত্র-সমাজের শৃঙ্খলাবোধ
- শৃঙ্খলাবোধ
- নিয়মানুবর্তিতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ পরিশ্রম : ভাগ্যরচনা ও প্রতিভার বিকাশ ॥ পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর পূজার উপচার ॥ পরিশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ, জাতিভেদের কুফল ॥ শ্রমিক-লাঞ্ছনা ॥ শ্রমিক-শোষণ ॥ শ্রমিক-সংঘ ॥ শ্রমের জয় ॥ উপসংহার ॥

৩৮ পরিশ্রমের মর্যাদা

উ. মা. '৬১, '৬৩

'বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন-দুনিয়াটা
মানুষই তাঁহার মহা মূলধন, কর্ম তাহার খাটা।'
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভূমিকা

এই বিশাল পৃথিবী বিশ্ব-বিধাতার মহা-কারখানা। এখানে সবাইকে সাধ্যমতো পরিশ্রম করতে হয়। সবাইকে যে-যার ক্ষমতামতো সাজাতে হয় পরিশ্রমের অনবদ্য উপচার। তাতেই সভ্যতার সৌধ হয়ে ওঠে অপরূপ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই চরম সমুন্নতির দিকে তাকিয়ে আমরা মাঝে মাঝে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। সভ্যতার এই চরম বিকাশের মূলে আছে যুগ-যুগান্তরের লক্ষ-কোটি মানুষের অফুরন্ত শ্রম। বহু মানব তাদের বহু দিনের শ্রম তিলে তিলে দান করে গড়ে তুলেছে সভ্যতার এই তিলোত্তমা মূর্তি। তাদের নাম ইতিহাসে লেখা নেই। তারা পাহাড় ভেঙে পথ প্রস্তুত করেছে, সেতু-বন্ধনে বেঁধেছে নদীর উভয় তটভূমিকে, নির্মাণ করেছে প্রাসাদ-অট্টালিকা। কেউ ফলিয়েছে সোনার ধান, কেউ বুনেছে লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র, কেউ-বা জীবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে রচনা করেছে সৌন্দর্য-বিলসিত, শিল্প-সৌকর্যময় নানা দ্রব্য-সামগ্রী। সকলের পরিশ্রমের যৌথ প্রয়াসে সম্ভব হয়েছে সভ্যতার এই অনবদ্য বিকাশ। সভ্যতা মানুষের পরিশ্রমেরই সম্মিলিত যোগফল।

পরিশ্রম : ভাগ্যরচনা ও প্রতিভার বিকাশ

মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা, অন্যদিকে সে তেমনি আপন ভাগ্যেরও নির্মাতা। নিজের ভাগ্যকে মানুষ নিজেই নির্মাণ করতে পারে। তার ভাগ্য-নির্মাণের হাতিয়ার হলো তার পরিশ্রম। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে সুপ্ত প্রতিভা। পৃথিবীতে যেসব ব্যক্তি প্রতিভাবান্ বলে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা আশৈশব করেছেন কঠোর পরিশ্রম এবং তার ফলে তাঁদের প্রতিভা ফুলের মতো বিকশিত হয়ে পৃথিবীকে বিতরণ করেছে অনাবিল সৌরভ। পরিশ্রম ছাড়া তাঁদের প্রতিভা কখনই বিকশিত হতে পারতো না। পরিশ্রমই মানুষের ভাগ্য-গঠনের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র।

পরিশ্রম ছাড়া পৃথিবীর কোন কাজই সম্পাদিত হতে পারে না। সমস্ত কাজই পৃথিবীর কাজ। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের পরিশ্রমের উপচারে করা হয় বিশ্ব-জননীর

পূজার আয়োজন। পৃথিবীর মানুষ হিসেবে সকল কাজই মানুষের করণীয়। তাতে যেমন কাজের কোন জাতিভেদ নেই, যারা সেই কাজ করে, তাদেরও কোন জাতিভেদ নেই। সুতরাং পরিশ্রমের মাধ্যমে জগতের যে কাজ সংসাধিত হয়, তা আর কিছু নয়, বিশ্ব-জননীর পূজা। আর, পরিশ্রম হলো বিশ্ব-জননীর সেই পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। সেই পূজার বিনিময়ে বিশ্ব-জননী আমাদের মুখে তুলে দেন অন্নজল, পরনের বস্ত্র এবং প্রয়োজনের নানা সামগ্রী।

পরিশ্রম বিশ্ব-জননীর পূজার উপচার

মানুষ এই পৃথিবীতে সুস্থ, সাবলীল জীবনের প্রয়োজনে সমাজ রচনা করেছে। সেই সমাজের উন্নতি-বিধানের জন্যে সকল মানুষেরই নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করা উচিত। কিন্তু সব মানুষের পক্ষে সমাজের সব কাজই করে ওঠা সম্ভব নয়। তাতে দেখা দেয় নানা অবাঞ্ছিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা পরিহার করবার জন্যে মানুষ করেছে কর্মের শ্রেণী-বিভাগ। এই শ্রেণী-বিভাগের পরিণামে সমাজে এসেছে ঘৃণ্য জাতিভেদ-প্রথা। পৃথিবীর সব দেশেই এই কর্ম-ভিত্তিক, শ্রম-ভিত্তিক জাতিভেদ প্রথা ছিল। কিন্তু তাতে মানুষকে করা হয়েছে ঘৃণা, তাতে মানবতার ঘটেছে চরম অপমান। কিন্তু জাতিভেদ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাস ভারতবর্ষের মতো বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায়নি।

পরিশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণী-বিভাগ, জাতিভেদের কুফল

সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ যারা, তারা গ্রহণ করেছে সমাজের সম্মানের কাজ, গৌরবের কাজ। সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধা নিজেদের কুক্ষিগত করে তারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষকে নিক্ষেপ করেছে ঘৃণা ও বঞ্চনার নীরন্ধ্র অন্ধকারে। অথচ সেই শ্রমিকেরা চিরকাল 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে' বীজ বুনেছে, পাকা ধান কেটেছে। তারা ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করে ফলিয়েছে সোনার ফসল, তাঁতী বসে তাঁত বুনেছে, জেলে ধরেছে মাছ। 'বহু দূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' অথচ স্বার্থপর, পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমাজের কাছ থেকে তারাই পায়নি মানুষের সম্মান।

শ্রমিক-লাঞ্ছনা

সমাজের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ এইভাবে নিম্নস্তরের হতভাগ্য মানুষগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে স্বার্থপর সমাজ রচনা করেছে মানব-শোষণের এক কলঙ্কিত ইতিহাস। চিরকালের শ্রমিক যারা, তারা বিশ্ব-জননীর পদতলে সাজিয়েছে তাদের শ্রমের অনবদ্য উপচার। কিন্তু সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর মানুষেরা তাদের শ্রম-শোষণে দিনের পর দিন পুষ্ট ও স্ফীতকায় হয়ে সেই শ্রমজীবী মানুষগুলিকে নিক্ষেপ করেছে নিগ্রহের নরক-কুণ্ডে। যুগে যুগে তাদের শ্রমে স্ফীত হয়ে উঠেছে স্বার্থপর, অর্থলোলুপ ধনপতিদের মুনাফার অঙ্ক। অথচ বিশ্বের সেই সর্বংসহ শ্রমজীবীর দল কোনকালেই সমাজের কাছ থেকে পায়নি মানুষের যোগ্য সম্মান।

শ্রমিক-শোষণ

আসল কথা, মানুষের পরিশ্রমকে কোন সমাজ কোন কালেই তার যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। বঞ্চিত, শোষিত শ্রমিক-সমাজ তাই আধুনিক যুগের প্রভাতে তাদের শ্রমশক্তির মর্যাদা উপলব্ধি করে শ্রমিক-সংঘের পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। উৎপাদনের চতুরাঙ্গিক উপাদানের মধ্যে শ্রম যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তা আজ তারা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় যেমন সমাজ কর্মমুখর হয়ে ওঠে, তাদের নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতায় তেমনি পৃথিবীর উৎপাদনের সমস্ত কলকারখানা একযোগে অচল হয়ে যেতে পারে।

শ্রমিক-সংঘ

শ্রমিক-সমাজ আজ বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবিক শ্রমকে তার যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কালের যাত্রায় একমাত্র তারাই আজ সমাজের রথকে গতি দিতে পারে, একমাত্র তারাই পারে সমাজে কর্মমুখরতার ঢেউ আনতে। তাই আজ শ্রমের জয় বিঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে। শ্রমিক দুনিয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আজ আকৃষ্ট হয়েছে। দেশে দেশে আজ শ্রমিক-সংঘ এবং শ্রমিক-কল্যাণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমাজ-কাব্যে উপেক্ষিত এই শ্রমকে তার যোগ্য সম্মান না দিলে যে আজ সমাজের উত্থান নেই, অগ্রগতি নেই—একথা আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

শ্রমের জয়

যুগের পর যুগ চলে গেছে, পার হয়ে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। কত রাজ্য-ভাঙাগড়া হয়েছে, পৃথিবীতে ঘটেছে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। কিন্তু শ্রমিকেরা 'যে তিমিরে, সেই তিমিরে।' শ্রমিক-দুনিয়াকে অভুক্ত রেখে কিংবা তাদের ঘৃণায় অপমানে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীতে পরিণত করে দেশে উৎপাদনের জোয়ার আনা যায় না, জাতীয় সমৃদ্ধির স্বপ্ন রচনা করা যায় না। আজ পৃথিবীতে এসেছে নতুন যুগ, নতুন সমাজ-বিন্যাস। শ্রমিক-স্বার্থ আজ দিকে দিকে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায়, কম্যুনিস্ট চীনে শ্রমিক-সমাজ আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ব্রিটেনেও রয়েছে শ্রমিক দল। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে তাদেরও। ভারতেও এখন সেই পুরাতন সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ-বিন্যাসের কাজ শুরু হয়েছে। জাতিভেদ-প্রথা এখন অতীত ইতিহাসের বিষয়। তাছাড়া, ভারতে অনেক শ্রমিক-কল্যাণ সমিতিও স্থাপিত হয়েছে। আজ ভারতে কোনো কাজ, কোনো পরিশ্রমই ঘৃণ্য নয়। পরিশ্রমের গৌরব আজ বিঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে। নিপীড়িত শ্রমিক-সমাজ আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

উপসংহার

'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়, জয় নব-উত্থান॥'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- শ্রমের মূল্য
- শ্রমের মর্যাদা, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬১, '৬৩ ; পৌ. প্রা. '৬৩

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ গ্রন্থাগার ভাব-চিন্তার যোগ-মিলনের সেতু ॥ গ্রন্থাগারের সুবিধা ॥ গ্রন্থাগারের আদিম অবস্থা ॥ প্রাচীনকালের গ্রন্থাগার ॥ গ্রন্থাগার ধ্বংসের অপকীর্তি ॥ গ্রন্থাগারে জাতির পরিচয় ॥ ভারতে গ্রন্থাগার ॥ বরোদার গ্রন্থাগার ॥ উপসংহার ॥

৩৯ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

গৌ. প্রা. '৬২

'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই কারাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর-আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?'—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

গ্রন্থাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যোগ-মিলনের অক্ষর-নির্মিত সেতু। নদীর স্রোতের মতো জ্ঞান-প্রবাহ দেশ-দেশান্তর ও যুগ-যুগান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে। এক হৃদয়ের ভাবরাশি নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়ে যায় হৃদয়ান্তরে। গ্রন্থাগার তাই জ্ঞানান্বেষী লক্ষ-কোটি মানুষের নীরব আলাপনের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে চিন্তাবিদ্ পায় তার নানামুখী চিন্তার খোরাক এবং নানা দুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর, ভাবুক পায় ভাবরসের সন্ধান। হৃদয় ও মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির এমন বিপুল আয়োজন আর কোথায় আছে? গ্রন্থাগার, তাই, ভাব-তৃষিত ও জ্ঞানপিপাসু সহস্র চিত্তের তৃপ্তি-সরোবর, অমৃত-সরোবর।

গ্রন্থাগার ভাব-চিন্তার যোগ-মিলনের সেতু

অনন্ত বিশ্বের জ্ঞানরাজি, ভাবরাশিও অফুরন্ত। বিভিন্ন ভাব ও চিন্তার বিষয়ে রচিত হয়েছে কত গ্রন্থ-সম্ভার। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সেই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বহু মানুষের যৌথ প্রতিষ্ঠান। সেখানে বহুর প্রয়াসে সংগৃহীত বহু গ্রন্থ-পাঠের সুযোগ মেলে। তাছাড়া, গ্রন্থাগার থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা স্ব-স্ব অভিরুচিমতো যে-কোন বিষয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করতে পারেন।

গ্রন্থাগারের সুবিধা

গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। সভ্যতার আদিম প্রত্যূষেই মানুষের মনে জেগেছিল যে অদম্য জ্ঞান-পিপাসা, তারই তাগিদে শুরু হয় মানুষের একনিষ্ঠ জ্ঞান-চর্চা। ভারতে অতি প্রাচীনকালে সেই জ্ঞান-চর্চার ফসল বেদের আকারে সমাহৃত হয়েছিল। 'বেদ' কথার আক্ষরিক অর্থ 'জ্ঞান', অন্য অর্থ 'শ্রুতি'। যখন লেখার অক্ষর আবিষ্কৃত হয়নি, আবিষ্কৃত হয়নি গ্রন্থ-রচনার কলা-কৌশল, তখন কেবল মানুষের

গ্রন্থাগারের আদিম অবস্থা

স্মরণ-শক্তিকে আশ্রয় করেই চলতো জ্ঞান-চর্চা আর তার মূল্যবান আদান-প্রদান। মানুষের স্মরণ-শক্তিই ছিল জ্ঞানাধার। সেদিন শ্রুতিধর পণ্ডিতরাই ছিলেন জ্ঞানের উন্নত প্রতিষ্ঠান। শিষ্য-পরম্পরায় সেই সকল জ্ঞান যুগ-যুগান্তরে, দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হয়ে যেত। পথের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দৈব-দুর্বিপাক তুচ্ছ করে জ্ঞান-আহরণের জন্যে দেশ-দেশান্তর থেকে আসতেন জ্ঞান-পিপাসু পরিব্রাজকের দল। কঠিন দুঃখের মূল্যে তাঁদের সংগ্রহ করতে হতো মানুষের জ্ঞান। এইভাবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির পূর্বে জ্ঞানের ধারা সীমিতভাবে হলেও দেশ-দেশান্তরে, যুগ-যুগান্তরে প্রবাহিত হয়ে যেত।

তারপর অক্ষর আবিষ্কৃত হলো। কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লো মানব-মনের অসংখ্য ভাব-চিন্তা। রচিত হলো গ্রন্থ। তালপত্রে ও ভূর্জপত্রে হস্তলিখিত গ্রন্থ উঠলো জমে। এলো পশুচর্ম। পশুচর্মে জ্ঞান-সম্ভারকে বন্দী করা হলো। প্রাচীন মিশর 'প্যাপিরাস্'-এর পাতা জোড়া দিয়ে কাগজ প্রস্তুত করে আবিষ্কার করলো জ্ঞান-সংরক্ষণের পদ্ধতি। শেষে আবিষ্কৃত হলো কাগজ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত হলো গ্রন্থ। তারপর বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বক্ষে ধারণ করে আমাদের ঘরের দুয়ারে স্থাপিত হলো গ্রন্থাগার। সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপনের কৃতিত্ব রোম দেশের। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারকল্পে সেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। তাছাড়া, ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বত, মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের আছে নিদর্শন। প্রাচীন ভারতের নালন্দা ও বিক্রমশীলার গ্রন্থাগার ছিল বিখ্যাত। হিন্দু দেব-মন্দির ও বৌদ্ধমঠ ছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। বারাণসীতেও ছিল বিশাল গ্রন্থাগার। বিদ্যোৎসাহী শ্রীহর্ষের ছিল এক বিপুলায়তন গ্রন্থাগার।

প্রাচীন কালের গ্রন্থাগার

কিন্তু মুসলমান-আক্রমণে ভারতের গ্রন্থাগারগুলি বিধ্বস্ত হয় এবং তার মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার লেলিহান অগ্নিশিখায় সমর্পিত হয়। সোমনাথ মন্দিরের গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন সুলতান মামুদের দুরপনেয় অপকীর্তি। বারাণসীর গ্রন্থাগারের ধ্বংস-সাধন মুসলমান-আক্রমণের আর একটি কলঙ্ক-চিহ্ন। নালন্দা ও বিক্রমশীলার বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলিও তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি। গ্রন্থ ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। তাই মুসলমান-আক্রমণ থেকে গ্রন্থগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণকে তুচ্ছ করে নালন্দা-বিক্রমশীলা মহাবিহারের ভিক্ষুগণ বহু মূল্যবান গ্রন্থ নেপাল ও তিব্বতে নিয়ে যান। নেপালের রাজ-গ্রন্থাগারে সেই গ্রন্থগুলি আজও সসম্মানে সংরক্ষিত আছে। মুসলমানদের এই গ্রন্থাগার-ধ্বংসের অপকীর্তি আছে ভারতের বাইরেও। আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ ও সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস-সাধনের কলঙ্ক-কালিমা আজও ইতিহাস বিস্মৃত হতে পারে নি।

গ্রন্থাগার-ধ্বংসের অপকীর্তি

সেই সব গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান গ্রন্থ। কিন্তু জনসাধারণের জন্যে কোন কালেই তাদের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। ইংরেজরা কোন গ্রন্থাগার নষ্ট হতে দেয় নি।

বরং লুপ্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার আবিষ্কারের উৎসাহ দান করে এবং বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে তারা ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়। গ্রন্থাগার সভ্যতার প্রতীক। কোন সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে তার গ্রন্থাগারেই। যে জাতির সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার নেই, সে জাতি অন্ধ। গ্রন্থাগার সার্বজনীন পাঠশালা। এখানে সকল মানুষের অবাধ আমন্ত্রণ। বিদ্যার নানা উপচার সাজিয়ে গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞান-পিপাসুদের জ্ঞান-তৃষ্ণা দূর করবার জন্যে দেশ-দেশান্তরে পবিত্র মন্দিরের মতো আছে দাঁড়িয়ে।

গ্রন্থাগারে জাতির পরিচয়

দিল্লীতে সম্রাট হুমায়ুনের ছিল বিখ্যাত গ্রন্থাগার। কিন্তু ভারতে আধুনিক গ্রন্থাগার সূচিত হয় ইংরেজ আমলে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক স্থানে ইংরেজদের অনুকরণে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগার-গুলি ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বসাধারণের জন্যে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থাগার বিখ্যাত। ইংরেজ-আমলে স্থাপিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী স্বাধীন ভারতে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বাসভবনে আজ স্থানান্তরিত।

ভারতে গ্রন্থাগার

সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা একটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বিজ্ঞানসম্মত-ভাবে গ্রন্থাগার-পরিচালনা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে আজ স্বীকৃত। ভারতের মধ্যে বরোদাই গ্রন্থাগার পরিচালনায় সমধিক প্রাগ্রসর। সেখানে আছে উন্নত ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। গ্রামে গ্রামে তার পুস্তক লেনদেনের দৃষ্টান্ত সমগ্র ভারতের অনুকরণযোগ্য। সেখানকার পাঠকরাও অত্যন্ত দায়িত্বশীল।

বরোদার গ্রন্থাগার

অতীতের কোলে যে মনীষীদের কণ্ঠ চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেছে, গ্রন্থাগারের গ্রন্থরাজির মাধ্যমে আমরা তাঁদের আলোকিত সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। তাঁদের আবিষ্কৃত জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করে লাভ করতে পারি বিমল আনন্দের অনুভূতি। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে দেশময় গ্রন্থাগারের একটি জাল বিস্তৃত হওয়া উচিত, যাতে বাঁধা পড়বে গ্রাম ও শহর, যাতে ধনী-দরিদ্র সকলের থাকবে প্রবেশের সমান অধিকার॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- পুস্তকাগার
- পাঠাগার
- সাধারণ পাঠাগার

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন ক্ষুদ্র, তাই সময় মূল্যবান ॥ সময় অমূল্য ॥ সময়ের অবহেলাই সময়ের অপচয় ॥ সময়ের মূল্য-বোধের অর্থ ॥ সময়ের অপচয়ের অর্থ ॥ উপসংহার ॥

৪০ সময়ের মূল্যবোধ

মা. '৫৭, '৭৩

'হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে, নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।'
—রবীন্দ্রনাথ

মর্ত্যের মানুষের চিরন্তন বাণীহারা কান্না—'নাই নাই, নাই যে সময়।' পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, অরণ্য-পর্বত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে ওঠে সেই এক হাহাকার—'নাই নাই, নাই যে সময়।' অনন্ত-প্রসারিত সময়ের যাত্রাপথ। পৃথিবীর পথিক-মানুষ সময়ের সেই পথ-রেখা ধরে অগ্রসর হয়। সময়ের মতো মানব-জীবন যদি অন্তহীন হতো, তবে দুঃখ থাকতো না মানুষের। সময় নিরবধি, কিন্তু মানব-জীবন সংক্ষিপ্ত। এইখানেই গরমিল। মানুষ চায় তার সংক্ষিপ্ত জীবনায়তনের মধ্যে বহুতর কর্মের উদ্‌যাপন। কিন্তু সময় তা মঞ্জুর করে না। কর্ম-উদ্‌যাপনের পূর্বেই তার বিদায়ের ডাক এসে পড়ে। মানুষের কাছে সময় তাই অমূল্য ধন। 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—।' বাস্তবিকই, নদীর স্রোতের মতো সময়ও সর্বদা অস্থির। চিরন্তন প্রবহমানতাই তার মৌল বৈশিষ্ট্য। মুহূর্তের জন্যেও কোথাও সে স্থির থাকে না, কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। 'চরৈবেতি চরৈবেতি—' চলো, চলো, চলো—এই অনাহত রবে ছুটে চলাই তার মর্মবাণী। মানুষের জীবনও সময়ের সেই অনন্ত ছন্দে সুর বেঁধেছে। সময়ের অন্তহীন প্রবাহে সে ছুটে চলেছে জন্ম থেকে মৃত্যুর অভিমুখে।

ভূমিকা

সময়ের এই অস্থির ধাবমানতার জন্যেই জীবন মানুষের কাছে পরম মূল্যবান। সময় অনন্ত; কিন্তু জীবন সীমাবদ্ধ। তার এক প্রান্তে জন্ম, অন্য প্রান্তে মৃত্যু। এই জন্ম ও মৃত্যুর শাসনে জীবন সদা-সঙ্কুচিত। মানুষ চায় সময়ের অন্তহীনতার মতো অন্তহীন জীবন। কিন্তু পায় না। মানব-জীবনের চরম ট্র্যাজেডি এখানেই। পলায়নপর সময়ের দিকে তাকিয়ে বিষাদখিন্ন কণ্ঠে কবি সুইন্‌বার্ন শেষ পর্যন্ত বলেন—'His life is a vision or a watch between a sleep and a sleep.' দুই প্রান্তেই ঘুম, ঘুমের মতো অন্ধকার। মাঝখানে শুধু একটুখানি চোখ মেলে চাওয়াই জীবন। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার জন্যে বাংলার লোককবিও অশ্রু বিসর্জন করেছেন—'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।' এক পারে জন্ম, অন্য পারে মৃত্যু;

সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন ক্ষুদ্র, তাই সময় মূল্যবান

মাঝখানে সংক্ষিপ্ত, সীমাবদ্ধ জীবন। অনন্ত সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে এসে জীবনের সংক্ষিপ্ত চরে ওঠা ; তারপর অনন্ত সাঁতার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলে-যাওয়া। এরই নাম জীবন—যা শুধু ঘণ্টা আর মিনিটের সমাহার মাত্র। জীবনের এই সীমাবদ্ধতার জন্যেই সময় এত আদরের, এত মূল্যবান। সময় অনন্ত, কিন্তু জীবন তার অতি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। তাই তো জীবন আমাদের কাছে পরম আদরণীয় এবং আমাদের কাছে অমূল্য ও আকর্ষণীয়।

সময়ের চলমানতার জন্যেই তা মানব-জীবনের একটি চির-আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ। সদা-চঞ্চল সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। অর্থবান ধনিকেরা ইচ্ছামতো জগতের যে-কোন দ্রব্য ক্রয় করতে পারেন, পারেন হীরে-মণি-মাণিক্যের যে-কোন খনি ক্রয় করতে। কিন্তু ধাবমান সময়কে কোন মূল্যেই ক্রয় করা যায় না। সময় মানুষের সকল ক্রয়-ক্ষমতার উর্ধ্বে। পার্থিব জগতের সমস্ত কিছুকে অনায়াসে উদ্ধত অবহেলা করে সময় বাধাবন্ধহারারূপে ছুটে চলে যায়। তার কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই, নেই অহেতুক আকর্ষণ। শুধু চলা,—চলা,—চলা। তার এই নির্মম নিষ্ঠুর চলার জন্যেই তো সময় এমন কাঙ্ক্ষিত, এত মূল্যবান।

সময় অমূল্য

জীবনের এই সীমাবদ্ধ অবসরে দুর্লভ সময়ের যে ভগ্নাংশটুকু পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই জীবন সার্থক এবং সুখময় হয়ে ওঠে। কাজেই, জীবনের সংক্ষিপ্ত সীমায়তনের মধ্যে যে পরম মূল্যবান সময় আমরা হাতে পাই, তা যদি অবহেলা করি, যদি আলস্যভরে সেই দুর্লভ সময় কাটিয়ে দিই, তা হলে তা সময়ের নির্বোধ অপচয় মাত্র। সেই অপচয়ের বেদনা আমাদের জীবনে একদিন মর্মান্তিক অনুশোচনার দুঃখের আকারে নেমে আসবে। তখন বুক-ফাটা আর্তনাদে কিংবা অজস্র অশ্রুবর্ষণে কিংবা অনুতাপের অন্তর্দাহে সেই আলস্য-অতিবাহিত সময় আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

সময়ের অবহেলাই সময়ের অপচয়

প্রকৃতপক্ষে, সময়ের যথার্থ মূল্যবোধই জীবনে সাফল্য অর্জনের সোপান। সময়ের মূল্যবোধ হলো, যে সময়ের যে কাজ, তা সেই সময়ে সম্পাদন করা। যে তা করে না, সে করে সময়ের অমর্যাদা ; পরাজয়ই হয় তার জীবনের ভাগ্যলিপি। সময়ের এই অবহেলার জন্যে ভবিষ্যতে তাকে অশ্রুমোচন করতে হবে। যে কৃষক ফসলের ঋতুতে ফসলের বীজ বপন না করে আলস্যে সময় অতিবাহিত করে, সে কিরূপে ফসল-ওঠার সময় খামার-পূর্ণ ফসল আশা করতে পারে? ফসল-ওঠার সময় ফসলের বীজ-বপনেও নেই ফসলের প্রতিশ্রুতি। সময় চলে গেছে, ফসলের ঋতু কবে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন কেঁদে কিছু হবে না। মানব-জীবনেও সেই এক কথা। জীবনে যখন শক্তি থাকে, সামর্থ্য থাকে, তখন আলস্যে অযথা কালহরণ করে জীবন কাটালে জীবন-সায়াহ্নে অবশ্যই দুঃখ-ভোগ করতে হবে। তাই রোদ থাকতে ধান শুকিয়ে নিতে হয়।

সময়ের মূল্যবোধের অর্থ

সময়ের মূল্যবোধের অভাবের পেছনে আছে মানুষের নিরাসক্ত জীবনবোধ, আলস্য, উদাসীনতা এবং অদৃশ্য সময়ের নিঃশব্দ অনন্ত যাত্রা। সময়কে চোখে দেখা যায় না, তার অনন্ত যাত্রার সুদূর ঘণ্টাধ্বনিও শোনা যায় না। মানুষ তাই মনে করে, সময়ও বুঝি তার আলস্যের অনড় পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে। তাই সময় পৃথিবীর অলস, কর্মবিমুখ মানুষদের ফাঁকি দিয়ে তার অনাদি যাত্রাপথে প্রস্থান করে। সে কিন্তু পৃথিবীর সেই অলস, কর্মবিমুখদের আলস্য ও কর্মবিমুখতাকে ক্ষমা করে না।

সময়ের অপচয়ের অর্থ

সে তাদের কপালে দুঃখময় ভবিষ্যতের অভিশাপ এঁকে দিয়ে যায়। কিন্তু যারা আলস্য ও জড়তা পরিহার করে নিজেদের শ্রম ও শক্তি দিয়ে সময়ের পূজার আয়োজন করে, নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণপূত কর্মে নিয়োজিত করে, তাদের মাথায় কালের দেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। তারা কখনো জীবনে দুঃখ পায় না। জীবনের সঙ্গে বা সময়ের সঙ্গে যারা প্রবঞ্চনা করে না, সময়ও তাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে না। প্রকৃত অর্থে বাঁচতে জানে তারাই। জীবন এবং সময় অমূল্য। সময়ের অব্যবহারের অর্থ যেমন অপচয়, দুর্লভ মানব-জন্মও তেমনি অপচয়ের জন্যে নয়।

শৈশবই কর্ম-জীবনে প্রবেশের তোরণ-দ্বার। এই সময়ই জীবনের প্রস্তুতির কাল। ভবিষ্যৎ কর্ম-জীবনে সকল দায়িত্ব-ভার বহনের যোগ্যতা এই সময়েই অর্জন করতে হয়। শৈশবকালের প্রতিটি মুহূর্তকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে এবং অমূল্য সময়ের অপচয় না করে তার প্রতিটি দুর্লভ মুহূর্তকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে পরবর্তীকালে সুখ ও শান্তি—দুই-ই পাওয়া যাবে। শৈশবেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সময় অমূল্য সম্পদ। সেই অমূল্য সম্পদ আছে আমাদের সকলের

উপসংহার

অধিকারে। কাজে লাগাতে পারলেই হবে তার পরম সদ্ব্যবহার। কর্মই সময়ের পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কে কত কাজ সম্পন্ন করতে পারে, তা দিয়েই তার সাফল্য বিবেচিত হয়। তাই জীবনে মানুষ কতদিন বেঁচেছে, তা বড়ো কথা নয় ; সে কত কাজ করেছে, তাইই তার সাফল্যের বিচারক। তাই আবাল্য অভ্যাসের দ্বারাই দুর্লভ সময়ের সদ্ব্যবহার আয়ত্ত করা যায় ; সেই অভ্যাসের ফলে জীবনে আসে সময়ানুবর্তিতা। সময়ানুবর্তিতাই জীবনে সাফল্য-লাভের চাবিকাঠি এবং সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে কল্যাণপূত কর্মেই জীবনের চরম সার্থকতা ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- সময়ের সদ্ব্যবহার, মা. '৫৭
- সময়ানুবর্তিতা, মা. '৭৩
- 'জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে।'

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ স্বদেশ-প্রীতি কি ? স্বদেশ-প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ॥ স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষ ॥ স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃত স্বরূপ ॥ অন্ধ স্বদেশ-প্রেমের ছিন্নমস্তা রূপ ॥ স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেম ॥ রবীন্দ্রনাথের মতে : স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সম্পর্ক ॥ উপসংহার ॥

৪১
স্বদেশ-প্রেম

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালোবেসে ॥'

মা, '৬৯

—রবীন্দ্রনাথ

যে দেশ আলো দিল, বাতাস দিল, মুখে দিল অন্ন-জল, দিল পরনের বস্ত্র, তার প্রতি যদি সেই দেশের শ্যামলস্নেহে প্রতিপালিত সন্তানদের ভালোবাসা না থাকে, তবে তারা কেবল অকৃতজ্ঞ নয়,—অধন্য। স্বদেশের মানুষ, স্বদেশের রূপ-প্রকৃতি, তার পশুপাখি, তার প্রতিটি ধূলিকণা তার সন্তানদের কাছে প্রিয়, পরম পবিত্র। দেশমাতৃকার মৃন্ময়ী মূর্তি কেবল কাদা-মাটি-জলে নির্মিত প্রতিমা মাত্রই নয়, হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসায় এবং গভীর মমত্ববোধে সে সন্তানের অন্তরের অন্তঃস্থলে পরিগ্রহ করে চির-আরাধ্যা চিন্ময়ী মূর্তি। স্বদেশের কাছে মানুষ সকল দিক দিয়েই ঋণী। স্বদেশ-প্রীতি সেই ঋণ-স্বীকার ও ঋণ-শোধের উপায় মাত্র।

ভূমিকা

যে ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং বড়ো হয়ে ওঠে, তার প্রতি, সেখানকার মানুষের প্রতি তার একটি স্বাভাবিক আন্তর আকর্ষণ গড়ে ওঠে। স্বদেশের পশুপাখি, তরুলতা থেকে শুরু করে তার প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত তার পরম কামনার ধন। সে তখন আবেগবিহ্বল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—'আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।' দেশের প্রতি এই আজন্ম আকর্ষণ থেকেই স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষ। তখন মানুষ উপলব্ধি করে, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

স্বদেশ-প্রীতি কি ?

স্বদেশ-প্রীতি মানুষের অন্তরে কখনও থাকে সুপ্ত, কখনও জাগ্রত। কিন্তু স্বদেশ-প্রীতির মূল প্রোথিত থাকে অন্তরের অন্তস্তলে। ঐক্যবদ্ধভাবে যখন দেশের সকল মানুষ একই জীবনধারায়, একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারায় পুষ্ট হয়ে, একই আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখনই মৃন্ময়ী দেশ হয়ে ওঠে চিন্ময়ী। 'ফুলে ও ফসলে, কাদা-মাটি-জলে' দেশ তখন যথার্থ মাতৃভূমি হয়ে ওঠে। 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী জন্মভূমিকে তখন সবাই পূজা করে ; সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্যশ্যামলা দেশের তখন অভিষেক হয় জননীরূপে।

স্বদেশ-প্রীতির বহিঃপ্রকাশ

সুখের দিনে স্বদেশ-প্রেম থাকে সুপ্তিমগ্ন। কিন্তু দুঃখের দিনে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে স্বদেশ-প্রেমের হয় শুভ উদ্বোধন। পরাধীনতার দুঃখ-বেদনায়,

পরদেশীর অকথ্য নির্যাতনে অন্তরের সুপ্ত স্বদেশ-প্রেমের ঘুম ভাঙে। কিংবা দেশ যখন বিদেশী শত্রুর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়, তখন সমগ্র জাতি স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের মর্যাদা-রক্ষাকল্পে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে দলে দলে ছুটে যায়। তখন মনে হয়, 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' দেশ-দেশান্তরের ইতিহাসই তার সাক্ষী। দলে দলে প্রাণ বলি দিতে গিয়ে কোন কোন দেশ হয়েছে অবীরা এবং মহিলারা জহর-ব্রত অনুষ্ঠান করে কিংবা জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে রেখে গেছে স্বদেশ-প্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ভারতের রাজপুতানার স্বদেশ-প্রেমের কথা কে না জানে?

স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষ

বস্তুতঃ, দেশপ্রেমের উদ্ভব আত্মসম্ভ্রম-বোধ থেকে। যে জাতির আত্মসম্ভ্রমবোধ যত প্রখর, সেই জাতির স্বদেশ-প্রেম তত প্রবল। স্বদেশ-প্রেম একপ্রকার পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ। নিঃস্বার্থ, হিংসাবিহীন দেশপ্রেমই প্রকৃত স্বদেশ-প্রেম। ক্ষুদ্র-স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর স্বার্থের দিকে যখন মন পরিচালিত হয়, যখন আত্ম-কল্যাণের চেয়ে বৃহত্তর কল্যাণবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই জলে ওঠে স্বদেশ-প্রেমের নিষ্কলুষ প্রদীপশিখা। স্বদেশের মান-মর্যাদা এবং তার গৌরব-রক্ষাকল্পে শহীদ হয়েছে কত অমর প্রাণ। দেশসেবার পথে বাধা বিস্তর, অত্যাচার সীমাহীন। কিন্তু পথের ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কাছে মিথ্যা। পরদেশী শাসকের রক্তচক্ষু কিংবা উদ্যত অস্ত্র তাদের নিবৃত্ত করতে পারে না। রাণা প্রতাপ, শিবাজী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বীর সূর্য সেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় স্বদেশ-প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বদেশ-প্রীতির প্রকৃত স্বরূপ

স্বদেশ-প্রেম দেশ ও জাতির গৌরবের বস্তু, পরম শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু অন্ধ স্বদেশ-প্রেম ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপ; সে জাতিতে জাতিতে অনিবার্য করে তোলে সংঘাত ও সংঘর্ষ। অন্ধ স্বদেশ-প্রেম কেবল স্বদেশের কথাই চিন্তা করে। আমার স্বদেশের জয়গান যদি অপরের স্বদেশ-প্রেমকে আহত করে, তবে সেই অন্ধ স্বদেশ-প্রেম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ডেকে আনে ভয়াবহ রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মানুষের বক্ষ-ক্ষরিত রক্ত-পিচ্ছিল পথে চলতে থাকে উগ্র দেশপ্রেমের নৃশংস অভিযান। হিটলারের জার্মানি এবং মুসোলিনীর ইতালি উগ্র জাতীয়তার সেই নগ্ন বীভৎস প্রকাশের মধ্য দিয়ে সেদিন বিশ্ব-মানবতার বক্ষে পদস্থাপনে উদ্যত হয়েছিল। যখন অন্ধ জাতীয়তার মোহে উন্মত্ত য়ুরোপ পরস্পর-হানাহানিতে ব্যস্ত, তখন রবীন্দ্রনাথ তার উগ্র ছিন্নমস্তা রূপের সমালোচনা করে ও সাবধানবাণী উচ্চারণ করে অনেকের বিরাগভাজন হন।

অন্ধ স্বদেশ-প্রেমের ছিন্নমস্তা রূপ

আসল কথা, স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কোন অমিল নেই। স্বদেশ-প্রেম তো বিশ্বপ্রেমেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। স্বদেশ, বলাবাহুল্য, বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশের মধ্যস্থতায় বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা স্বদেশকে ভালোবেসে তার পদমূলে যে পূজা নিবেদন করি, তা গিয়ে পৌছোয় বিশ্ব-দেবতারই

পদতলে। কাজেই, স্বদেশ-প্রেম, বলা যায়, বিশ্বপ্রেমেরই প্রথম সোপান। স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমরা বিশ্বপ্রেমের জগতে উপনীত হই। স্বদেশবাসীকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারলে আমরা বিশ্ববাসীকেও মনেপ্রাণে ভালোবাসতে পারি। আবার, যে স্বদেশবাসী, সে বিশ্ববাসীও বটে। কাজেই, স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের উৎস এক ও অভিন্ন।

স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেম

জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেম যখন সংকীর্ণতার অন্ধকূপে বন্দী হয়ে উগ্র ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ করে, তখন বিশ্বপ্রেম পদদলিত হয়। স্বদেশকে একমাত্র পরম প্রিয় মনে করে আমরা বিশ্বকে শত্রু মনে করি এবং তাকে ধ্বংস করবার জন্যে ধাবিত হই। তখন শুভ বিচার-বুদ্ধি স্বদেশ-প্রেমের অন্ধ আবেগে লুপ্ত হয়। ফলে, পরস্পর-হানাহানি এবং অবারিত রক্তক্ষয় অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। আর, নানা মারণাস্ত্র আবিষ্করণের ফলে সেই হানাহানি অচিরেই ধারণ করে চরম বিভীষিকাময় রূপ। কাজেই, উগ্র জাতীয়তাবোধে কল্যাণ নেই। তাই রবীন্দ্র-কণ্ঠে শুনি :

রবীন্দ্রনাথের মতে : স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে সম্পর্ক

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর—তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

দেশজননী ও বিশ্বজননী এক এবং অভিন্ন। কারণ, দেশজননীর বক্ষের ওপর বিশ্বজননীরও আঁচল পাতা। স্বদেশ ও বিশ্ব আমাদের ঐক্য-চেতনার এপিঠ আর ওপিঠ।

স্বদেশ-প্রেম আমাদের অন্তরের জলন্ত বহ্নিশিক্ষা। সেই বহ্নিশিখায় হয় বিশ্বজননীর পূজার আরতি। য়ুরোপীয়দের আগমনের পূর্বে আমাদের স্বদেশ-প্রেম ছিল সুপ্তিমগ্ন। পরে বিদেশীর নির্মম অত্যাচার ও ইংরেজ-বিদ্বেষের ফলে ঘটে তার ঘনীভূত প্রকাশ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে আমরা দেশমাতৃকাকে ভেঙে তিন টুক্‌রো করেছি, পূজার নামে করেছি মাতৃবিগ্রহের অঙ্গচ্ছেদ। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ কি এই মাতৃ-বিগ্রহ কল্পনা করেছিলেন? ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর দল কি এই মাতৃ-বিগ্রহ-মূর্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছিল? আমাদের স্বদেশ-প্রেম মাতৃ-বিগ্রহকে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে, এই আত্মগ্লানির হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্বপ্রেম
- স্বদেশ-প্রীতি
- 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ জীবনে শরীর-চর্চার প্রয়োজনীয়তা ॥ স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রথম শর্ত ॥ স্বাস্থ্যই দ্বন্দ্ব-সংঘাত জয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ ॥ জীবনে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের প্রধান উপায় ॥ শরীর-চর্চার দিক-দিগন্ত ॥ শিক্ষার অঙ্গ ঃ খেলাধূলা ॥ উপসংহার ॥

৪২

শিক্ষার অঙ্গ-হিসাবে খেলাধূলা

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।'

মা. '৬৯

—রবীন্দ্রনাথ

মানুষের শরীরই তার যথাসর্বস্ব। এই সংগ্রামময় পৃথিবীতে শরীরই তার প্রথম এবং শেষ পরিচয়। এই শরীরকেই পুঁজি করে মানুষ পৃথিবীতে আসে। এই পুঁজি ভাঙিয়েই চলে তার জীবনের কারবার। কাজেই, জীবন-পথে তার পরিক্রমণের প্রধান অবলম্বনই হলো শরীর। শরীরই হলো তার ভেলা। তাতে চড়েই তাকে জীবন-সমুদ্র সাবলীলভাবে পার হতে হবে। সেজন্যে চাই সুস্থ, সবল, নীরোগ শরীর। ধনৈশ্বর্য নয়, বিষয়-আশয় নয়, শরীরই সব। শরীরই সুখ, শরীরই সম্পদ, শরীরই জীবন-যাত্রার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পাথেয়।

ভূমিকা

কবি তাই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে কামনা করেন—'চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।' সংসার-যাত্রায় আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু পরম কাম্য। কিন্তু তা লাভের প্রকৃষ্টতম উপায় হলো সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীর-গঠন। শরীর-চর্চাই হলো সুস্থ, সবল জীবন-গঠনের গোড়ার কথা। শরীর-চর্চা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যলাভের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যই জীবনে সাফল্যলাভের প্রধানতম হাতিয়ার। মানবজীবনে সাফল্যলাভের জন্যে মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়, করতে হয় কঠোর সংগ্রাম। বহু দুঃখ-দহন ও কষ্ট-সহনের পরিণামে একদিন মানুষের কপালে জোটে সাফল্যের বিজয়-তিলক। দুর্বল, রুগ্ণ ও অক্ষম শরীরের অধিকারী যারা, তাদের দ্বারা সম্ভব নয় পৃথিবীর কষ্টসাধ্য কর্মের সুষ্ঠু উদ্‌যাপন ; জীবনে সাফল্যের ইমারত নির্মাণও তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। সাফল্যের অমৃত-ভাগ তাই তাদের ভাগ্যে দুর্লভ।

জীবনে শরীর-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

মানুষ মাত্রই সুখের প্রত্যাশী। সুখের অন্বেষণে সে জীবনের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সুস্থ শরীরই সেই সুখলাভের প্রথম শর্ত। অসুস্থ শরীর যাদের, রোগ-যন্ত্রণায় যারা সর্বদা কাতর, তারা প্রকৃতই হতভাগ্য। কারণ, তারা জীবনে দুর্লভ সুখ আস্বাদন করতে পারলো না। জীবনে যারা সুখের মুখ দেখলো না, তাদের জীবন ব্যর্থ। আবার, সুস্থ ব্যক্তির কাছে যা সুখ, অসুস্থ ব্যক্তির কাছে তাই-ই চরম অসুখের কারণ। কাজেই, সুখ ব্যক্তি-সাপেক্ষ এবং স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রধানতম উপকরণ।

স্বাস্থ্য সুখলাভের প্রথম শর্ত

আসল কথা, সুখী জীবন মানুষ-মাত্রেরই কাম্য। কিন্তু সেজন্যে চাই সুস্থ শরীর। এই পৃথিবীতে অসুস্থ শরীর নিয়ে সুখের মুখ দেখা যায় না; জীবনে সফলতাও লাভ করা যায় না।

অপর পক্ষে, জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; যন্ত্রণাজর্জর, কণ্টকাকীর্ণ। এখানে পদে পদে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর গোপন হাতছানি। তাকে ঘিরে নিয়ত উঠছে জ্বালা-যন্ত্রণার প্রবল ঝড়, তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে বিপদ-বাধার অশান্ত ঘূর্ণি। প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ-শক্তি এবং রোগ-তাপ-জরা জীবনের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে নিয়ত গোপন চক্রান্তে লিপ্ত। সেই চক্রান্তকে পরাস্ত করে জীবনের ললাটে জয়টিকা পরাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো শরীর-চর্চা। স্বাস্থ্যই পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মৃত্যুর চক্রান্ত-বিজয়ের একমাত্র আয়ুধ।

স্বাস্থ্যই দ্বন্দ্ব-সংঘাত জয়ের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ

কাজেই, স্বাস্থ্যই জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মূলধন। যারা নীরোগ এবং সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী, তারাই জীবনের ব্যবসায়ে লাভ করে বাঞ্ছিত সফলতা। এই পৃথিবী প্রতিদ্বন্দ্বিতাময়, এই জীবন প্রতিযোগিতায় পূর্ণ। তাতে জয়লাভ করবার প্রধান উপায় হলো শরীর। সুস্থ শরীরই মানুষকে দান করতে পারে অদম্য তেজস্বিতা, অনম্য উদ্দীপনা। সুস্থ শরীর মনের যে শক্ত ও সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনা করে দেয়, তাতে মানুষ হয় অপরাজেয় মনোবলের অধিকারী। তার দ্বারাই জীবনের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ সহজ হয়। কিন্তু এ সবের মূল দাবী হলো নিয়মিত এবং পরিমিত শরীর-চর্চা। নিয়মিত ও পরিমিত শরীর-চর্চার মধ্য দিয়ে শরীরের মাংসপেশীগুলি সুদৃঢ় হয়ে উঠবে এবং শরীর হয়ে উঠবে মজবুত ও অধিক দুঃখ-সহনক্ষম। রোগজর্জর, দুর্বল দেহ নির্ভরযোগ্য নয়; তার কাছ থেকে জীবন-যুদ্ধে প্রার্থিত জয়ও আশা করা যায় না।

জীবনে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের প্রধান উপায়

জীবনের প্রত্যূষকাল থেকে প্রতিটি মানুষের শরীর-চর্চা সূচিত হওয়া উচিত। সব দেশে সব কালে সাধারণতঃ জননীদের হাতেই সন্তানদের সুস্থ সাবলীল জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে মানুষ নিজের হাতেই গ্রহণ করে শরীর-চর্চা ও শরীর-গঠনের দায়িত্ব। এই সময় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে আবশ্যিক জ্ঞান শৈশবকালেই সকলকে স্বাস্থ্য-গঠনে সচেতন ও সচেষ্ট করে তুলবে। কেবল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান-লাভেই শরীর-চর্চার দায়-দায়িত্ব নিঃশেষিত হয় না। সেজন্যে চাই উপযুক্ত ব্যায়াম-চর্চা। সম্প্রতি শিক্ষার নব-বিন্যাসে আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে দেশী-বিদেশী নানাপ্রকার ব্যায়াম-চর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রতচারী-ড্রিল-কুচকাওয়াজ থেকে শুরু করে বাইচ্-ফুটবল-ক্রিকেট-হকি পর্যন্ত সবই ব্যায়াম-চর্চার জন্যে পরিকল্পিত। দৌড়, কুস্তি, সন্তরণ ইত্যাদি ক্রীড়াও শরীর-চর্চার পক্ষে বিশেষভাবে হিতকর। কিন্তু অনিয়মিত ব্যায়াম যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, তাও

শরীর-চর্চার দিক্-দিগন্ত

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নিয়মিত ব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত খাদ্য-গ্রহণের দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টি হবে অবধারিত। সেই সঙ্গে মানসিক প্রফুল্লতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পর নির্ভর-সাপেক্ষ।

শিক্ষার নব-বিন্যাসে বিদ্যালয়-পর্যায়ে খেলাধূলাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করে দূরদর্শিতার পরিচয় রাখা হয়েছে। কারণ, শিক্ষা কেবল মানসিক শৃঙ্খলার কারিগর নয়, দৈহিক শৃঙ্খলারও বিধায়ক; শারীরিক শৃঙ্খলাকে বাদ দিয়ে মানস-শৃঙ্খলার ভিত্তি রচনা ব্যর্থ এবং অর্থহীন। শরীর এবং মনের যৌথ শৃঙ্খলাই জীবন-শৃঙ্খলার ভিত্তিভূমি রচনা করে দেয়। এবং তাইই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। অথচ এতদিন আমাদের দেশ শরীর-চর্চা ও খেলাধূলার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল এবং বলিষ্ঠ জীবনের অনুকূল শিক্ষাদান থেকে ছিল বিরত। তাতে ক্ষতি হয়েছে দুদিক থেকে: বলিষ্ঠ জাতি গঠনের স্বপ্ন যেমন ভেঙে গেছে, তেমনি শারীরিক দুর্বলতা মানসিক দুর্বলতার প্রশ্রয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশ থেকে বিচ্যুত হয়ে ধরেছে নানা বিকৃতির পথ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থের এক স্থানে বলেছেন, 'রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মের পথ রাখা চাই, নইলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়।' বীরধর্মের প্রতি আসক্তি মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। সুসভ্য সমাজে বসবাসের পরিণামে সে বাইরে ভদ্রসভ্য হয়ে উঠলেও তার ভেতরের সেই বীরধর্মের প্রতি আদিম প্রবণতা লুপ্ত হয়ে যায় না। সেই বীরধর্ম প্রকাশের পথ উন্মুক্ত না থাকলে তা অন্তরচারী হয়ে নানা সামাজিক অপরাধের খতিয়ান্ বৃদ্ধি করে। তাই সকল রাষ্ট্রেই শিক্ষাদীক্ষার পাশাপাশি খেলাধূলার বিধিব্যবস্থাও থাকা দরকার। তাতে সমাজের শরীর ও মনের বহু অবাঞ্ছিত উপসর্গ নির্গত হয়ে সুস্থ সমাজ-গঠনের অনুকূল মানসিকতা গড়ে তুলবে। এ ব্যাপারে বিদেশী খেলাগুলি গৃহীত হলেও আমাদের দেশের নিজস্ব খেলাগুলি যেন পরিত্যক্ত না হয়।

শিক্ষার অঙ্গ: খেলাধূলা

কিন্তু স্মরণীয়, ভারতের মতো দরিদ্র দেশের লক্ষ-কোটি মানুষ যেখানে দেহধারণের উপযুক্ত খাদ্য-গ্রহণে অসমর্থ, যেখানে লক্ষ-কোটি শিশু অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় পূর্ণ পরমায়ু পায় না, যেখানে অনাহারে, অর্ধাহারে মানুষের মৃত্যুসংখ্যা ভয়াবহ, সেখানে খেলাধূলা ও শরীর-চর্চার কথামৃত, প্রকৃতপক্ষে, বিদ্রূপের মতো শোনায়। শরীর-চর্চার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য যোগাতে হবে। তার অর্থ, দেশের দারিদ্র্য-সংহার। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে অপুষ্টি ইত্যাদির জন্যে 'শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্' হয়ে উঠবে এবং জীবন হয়ে উঠবে বিধাতার অভিশাপের মতো দুর্বিষহ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা
- স্বাস্থ্যই সম্পদ

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা॥ ক্রিকেট-খেলার ইতিহাস॥ সরঞ্জাম ও ক্রীড়া-বিধি॥ ক্রিকেটের পোশাক ও ক্রীড়ার আনুপূর্বিক অনুষ্ঠান॥ খেলার আরম্ভ ও খেলার নিয়ম॥ আউট-বিধি॥ ক্রিকেট-জগৎ॥ ক্রিকেট-জগতে ভারত॥ উপসংহার॥

৪৩ খেলার রাজা ক্রিকেট

ক্রিকেট যেমন খেলার রাজা ; তেমনি আবার রাজার খেলাও বটে। ক্রিকেটে যেমন আছে প্রবল গৌরবময় অনিশ্চয়তা, তেমনি আছে ক্রীড়া-পরিচালনায় সময়-সীমার সুদীর্ঘ ব্যাপ্তি এবং তদনুপাতিক যথেষ্ট ব্যয়-বাহুল্য। উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জনপ্রিয়তায় আজ ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেটের স্থান সর্বোচ্চে। তেমনি ক্রিকেট-খেলার ব্যয়-বাহুল্য এবং ক্রীড়া-পরিধির দীর্ঘায়ত ব্যাপ্তি একে দান করেছে রাজকীয় খেলার মর্যাদা। তাছাড়া, এই খেলার নিয়ম-বিধির কড়াকড়িরও তুলনা নেই। আবার, এই খেলা উপভোগের জন্যে হাতে চাই অফুরন্ত অবকাশ, চাই অনুকূল আর্থিক সচ্ছলতা। সেদিক থেকেও এই খেলার গৌরব অনস্বীকার্য।

ভূমিকা

ইংলণ্ড ক্রিকেটের জন্মভূমি। ইংরেজ জাতির সদাসৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী শক্তিতে এর উদ্ভব, তাদের উৎসাহে এর বিকাশ, তাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য-বিস্তারে এর প্রতিষ্ঠা এবং খেলার উন্নত ক্রীড়শৈলীতে এর শ্রেষ্ঠতা। সাম্রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত করে দিয়েছিল তার ক্রিকেট-সাম্রাজ্য। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গৌরব-সূর্য অস্তমিত, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রিকেটের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য এখনও গভীর নিষ্ঠা এবং আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলিত। এমন-কি, কোথাও কোথাও তা জাতীয় ক্রীড়ার সম্মানে অভিষিক্ত।

ক্রিকেট-খেলার ইতিহাস

পূর্বে এই খেলার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। উপকরণগুলিও ছিল অদ্ভুত আকৃতির। ক্রমে বিবর্তিত হয়ে তাদের রূপ-রূপান্তর ঘটেছে। ক্রিকেট-খেলার সরঞ্জাম হলো—এক জোড়া ব্যাট্, ছয়টি স্টাম্প ও একটি বল। বৃত্তাকার মাঠের কেন্দ্রস্থলে বাইশ গজ সুনির্মিত জমি—ক্রিকেটের পরিভাষায় এর নাম 'পীচ'। পীচের উভয় প্রান্তে প্রোথিত 'বেল'-নিবদ্ধ তিনটি করে স্টাম্প। এক প্রান্তের স্টাম্পের সম্মুখে ব্যাট্‌স্‌ম্যান 'ব্যাট্' করেন এবং অন্য প্রান্তে প্রতিপক্ষের বোলার করেন 'বল'। বল পড়ে, ব্যাট নড়ে। চলে ব্যাট্ ও বলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই। উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য-বিস্তারের জন্যে চলে প্রাণপণ প্রয়াস।

সরঞ্জাম ও ক্রীড়া-বিধি

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দুজন আম্পায়ার মাঠে উপস্থিত হয়ে পীচের উভয় প্রান্তে উইকেট রচনা করে দেন। আম্পায়ার-যুগলের পোশাকও বিচিত্র। কালো প্যাণ্ট, আলখাল্লার মতো সাদা কোট এবং মাথায় সাদা গোল টুপি। ক্রীড়ারম্ভের সংকেতমাত্র উভয় পক্ষের ক্যাপ্‌টেন বা স্কীপারসহ এগারো জন করে বাইশ জন

খেলোয়াড় প্যাভিলিয়ান বা শিবির থেকে বাহির হয়ে আসেন। প্রত্যেকের পরনে সাদা ফুলপ্যান্ট, পায়ে কেড্‌স, গায়ে সাদা ফুলশার্ট, মাথায় ক্যাপ্। খেলা আরম্ভ হবার আগে উভয় পক্ষের ক্যাপ্‌টেন পীচ পরীক্ষা করে উইকেটটিকে ভাল করে দেখে যান। উইকেটের চরিত্র দেখেই তাঁরা বোলিং বা ব্যাটিং-এর ধারা নির্ধারিত করে নিতে পারেন। তারপর 'টস্' করে স্থির হয়, কোন্ পক্ষ ব্যাটিং করবেন কিংবা কোন্ পক্ষ ফিল্ডিং করবেন।

ক্রিকেটের পোশাক ও ক্রীড়ার আনুপূর্বিক অনুষ্ঠান

'টসে' বিজয়ী দলের দুজন দক্ষ ব্যাট্‌স্‌ম্যান 'ওপেনার' হিসেবে ব্যাট্ করতে নামেন। তাঁদের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের ওপর সমস্ত খেলাটির ভাগ্য নির্ভর করে। তাঁরাই ইনিংসের গোড়াপত্তন করেন। প্রতিপক্ষের ক্যাপ্‌টেন নির্দিষ্ট বোলারের হাতে বল দিয়ে বিশেষ কৌশলে আক্রমণ-ধারা রচনা করবার নির্দেশ দেন। বিধি-বহির্ভূত বল হলো 'নো বল'। পীচে বল পড়ামাত্র উইকেটটিকে আড়াল করে ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ বল মেরে 'রান্' তুলতে থাকেন। বল হয় নানা ধরনের—ফাস্ট, স্পিন, অফ-স্পিন, ইন্‌সুইং, গুগ্‌লি, অফ্‌ব্রেক, ইয়র্কার, বাম্পার, ফুলটস্ ইত্যাদি। ব্যাট্ করার ভঙ্গিও নানা প্রকারের—ড্রাইভ, সুইপ, স্ট্রোক ইত্যাদি।

খেলার আরম্ভ ও খেলার নিয়ম

বোলার করে ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আউট করবার চেষ্টা। আর ব্যাট্‌স্‌ম্যান উইকেট রক্ষা করে চেষ্টা করবে বলকে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে রানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। এইভাবে খেলা বেশ জমে ওঠে। প্রতিপক্ষের এগারোজন খেলোয়াড় বিভিন্ন স্থানে শিকারী বাঘের মতো ওত পেতে থাকেন। তাঁরা বলকে সীমানার বাইরে যেতে না দিয়ে রান্ রক্ষা করবেন কিংবা মাটি স্পর্শ করবার আগে শূন্যে বলটি ধরে ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে 'ক্যাচ আউট' করবার চেষ্টা করবেন। ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের পক্ষে লজ্জাজনক আউট হলো বোল্‌ড্ আউট হওয়া। তাছাড়া আছে রান্ আউট, লেগ বিফোর উইকেট, স্টাম্প আউট ইত্যাদি। ইনিংসে দ্বিতীয় পক্ষ যদি প্রথম পক্ষের অপেক্ষা দুশো রান কম করেন, তাহলে তাঁরা অসম্মানজনক 'ফলো অন' করতে বাধ্য হন।

আউট-বিধি

ক্রিকেট-জগৎ ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অস্ট্রেলিয়াই বর্তমান ক্রিকেট-জগতে দুর্ধর্ষ দল। ভারতের জাতীয় ক্রিকেটের রন্‌জি ট্রফির প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলাগুলি। উন্নত ক্রীড়াধারা, প্রতিযোগিতার তীব্রতা এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের সংমিশ্রণে সেই খেলাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ভারতীয় ক্রিকেটে রনজিৎ সিংজী, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, মানকড়, মুস্তাক আলী প্রভৃতির নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্ব-ক্রিকেটে জন ব্রাড্‌ম্যান এবং ওরেল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বর্তমান ক্রিকেট-

ক্রিকেট-জগৎ

বিশ্বে যাঁরা ক্রিকেটকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে উজ্জ্বল ও উপভোগ্য করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে ওরেলই সর্বাগ্রগণ্য; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ধনকুবের জন প্যাকার যেভাবে সুপার টেস্টের আয়োজন করেছেন এবং বিশ্বের নামী খেলোয়াড়রা যেভাবে তার ফাঁদে পা দিয়েছেন, তাতে বিশ্ব-ক্রিকেটের সম্ভবতঃ সমাধি রচিত হতে চলেছে।

ভারতীয় ক্রিকেটের গত দশকের ইতিহাস জয়-পরাজয়ের সংমিশ্রণে রচিত আলো-অন্ধকারময় ইতিহাস। কিন্তু গৌরবদীপ্ত জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান দশকের হয় শুভ সূচনা। ১৯৭১ সালে ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংলণ্ড সফরে অর্জন করে দুর্লভ 'রাবার' জয়ের গৌরব। বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট-দলের সেই জয়লাভ ক্রিকেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আর, সেই নব-ইতিহাস রচনার কৃতিত্বের কারিগর ছিলেন সুযোগ্য অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার। ১৯৭২-৭৩ সালে ভারত তার স্বদেশের মাটিতে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে তার 'রাবার-বিজয়ী' গৌরব অম্লান রাখে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড-সফর পরাজয়ের গ্লানিতে ভরা। এদিকে, ১৯৭৪-৭৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলও ভারত-সফরে এসে ভারতের হাত থেকে রাবার ছিনিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে। ইতিমধ্যে ওয়াদেকারের অবসর গ্রহণের পর দলনায়ক নির্বাচিত হন বিষেণ সিং বেদী। তাঁর অধিনায়কত্বে ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারতীয় দলের নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর পরাজয়ের বেদনায় ভারাক্রান্ত। ১৯৭৬-৭৭ সালে নিউজিল্যাণ্ড দল ও ইংলণ্ড দল ভারত-সফরে আসে। তাতে ভারত নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ড্র করে এবং ইংলণ্ডের কাছে পরাজিত হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া সফরে পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। ১৯৭৮ সালে ভারতীয় দলের পাকিস্তান সফরও পরাজয়ের গ্লানিতে ভরা। ১৯৭৮-৭৯ সালে ভারত-সফরে আসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। এবার ভারতীয় দলের অধিনায়ক হন সুনীল গাভাসকার। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল ওয়েস্ট-ইণ্ডিজকে পরাস্ত করে।

ক্রিকেট-জগতে ভারত

ভারতীয় দলের এই উত্থান আনন্দজনক। ভারতের ফিল্ডিং বর্তমানে উন্নত শ্রেণীর। তার ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে-এও আজ লেগেছে দীপ্তি এবং শ্রীর উজ্জ্বল স্পর্শ। সুনীল গাভাসকারের ব্যাটিং এবং তরুণ কপিলদেবের বোলিং ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি আজ বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এবার অধিনায়ক হয়েছেন বেঙ্কট রাঘবন্। তবু জয়ের জন্যে চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, চাই কঠিন অনুশীলন। তা যদি সফল হয়, তবে খেলার রাজা ক্রিকেটে 'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ক্রিকেট-খেলা
- বিশ্ব-ক্রিকেটে ভারতের স্থান

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ মানব-সেবাই ঈশ্বর-সেবা॥ ভারতের মর্মবাণী : মানব-সেবা॥ মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা॥ অতিথি-সেবা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা॥ দুঃস্থের সেবাই শ্রেষ্ঠ মানব-সেবা॥ উপসংহার॥

মা. '৬২, '৬৮

ভূমিকা

মানুষের সেবাই পরম আরাধ্য ঈশ্বরের পূজা। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, নরের মধ্যেই তাঁর সুনিশ্চিত বসতি; তাই তো তিনি নারায়ণ। মানুষের মধ্যে তাঁর দিব্য আবির্ভাবকে সপ্রমাণ করে তোলার জন্যে এই দুঃখ-বেদনা-পরিকীর্ণ মর্ত্যের মাটিতে কতবার তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কতবার 'আমাদের এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।' অথচ ভ্রান্ত মানুষ দেখতে পায় না মানুষের মধ্যে তাঁর উজ্জ্বল আবির্ভাব। সে তাই মানব-জনপদ পরিত্যাগ করে সুদূর গিরি-গুহায় কিংবা অরণ্য-কান্তারের নির্জনতায় করে ঈশ্বরের উপাসনা। মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্পর্শ পরিহার করাকেই, তারা মনে করে, ঈশ্বর-লাভের প্রথম সোপান। কিন্তু ঈশ্বরের বাস গিরিগুহায় নয়, অরণ্য-কান্তারে নয়, নয় মন্দিরের পাষাণ-বেষ্টনীর মধ্যে; ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে, তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে। আমাদের চারদিকে অহরহ কত আর্ত-ব্যথিত-পীড়িত ভগবান তাঁদের আকুল বাহু প্রসারিত করে আমাদের সেবা প্রার্থনা করছেন, কত ক্ষুধার্ত ভগবান কাতর কণ্ঠে চাইছেন ক্ষুধার অন্ন। আমরা যদি তা শুনতে না পাই, কিংবা শুনেও যদি উপেক্ষা করি ঈশ্বরের ব্যাকুল আহ্বান, তাহলে মিথ্যে আমাদের ঈশ্বর-উপাসনা, মিথ্যে আমাদের ঈশ্বর-সাধনা।

মানব-সেবাই ঈশ্বর-সেবা

ভারতবর্ষের আবহমান কালের শিক্ষাই হলো, মানুষের অন্তরেই শ্রীভগবানের বাস; এবং মানব-সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পূজা। তিনি নানা রূপে, নানা বেশে আমাদের পূজা গ্রহণের জন্যে আমাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমাদের অমূলক শুচিতাবোধের জন্যে আমরা তাদের আমাদের দুয়ার থেকে বিতাড়িত করি। এইভাবে কত দরিদ্র ভগবান, কত ছদ্মবেশী ভগবান প্রতিদিন আমাদের দুয়ার থেকে ডাক দিয়ে ফিরে চলে যান: 'জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে, গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।' ব্রজের রাখালকে আমরা সামান্য রাখাল ভেবে বিতাড়িত করি, শ্মশানের শিবকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল মনে করে ঘৃণা করি। 'ওকি, চণ্ডাল? চম্‌কাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব। ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র,

ওই শ্মশানের শিব।' আসল কথা, ভারতের মর্মবাণীই হলো, মানুষের দেহই জাগ্রত ভগবানের বাস-মন্দির। মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের সেবা করে আমরা আমাদের পরম প্রার্থিত ঈশ্বরের সন্নিহিত হই।

ভারতবর্ষ এই মহান্ আদর্শের প্রবক্তা হয়েও বারে বারে সে তার আদর্শচ্যুত হয়ে মানুষকে করেছে ঘৃণা, মানুষের স্পর্শকে দূরে ঠেকিয়ে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের করেছে অপমান। এইভাবে সমগ্র দেশ যখন মানব-সেবায় আদর্শভ্রষ্ট হয়ে নর-নিগ্রহের নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে, তখনই এই মর্ত্যের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন অবতারকল্প মহামানব। তিনি অপমানের ধূলিশয্যা থেকে ব্যথিত, অবমানিত মানবতার উদ্ধার-সাধন করে তাকে সম্মানের সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে মহামানবতার জয়গান করে গেছেন। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবানকে আবিষ্কার করে সমগ্র জাতিকে তাদের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। কারণ, 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

ভারতের মর্মবাণী : মানব-সেবা

কেবলমাত্র মন্দিরেই ভগবানের অধিষ্ঠান নয় ; তাঁর মন্দির বিশ্ব-জোড়া। তিনি বিশ্বের স্বার্থপরদের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে বন্দী না থেকে নেমে এসেছেন বিশ্ব-মানবের মধ্যে। সেখানেই অগণিত মানুষের অবারিত বিশ্ব-দেবালয়ে আজ ঘটেছে তাঁর অধিষ্ঠান। কবি-শ্রেষ্ঠের ভাষায়—

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।'

মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা

মানুষের ভগবান আছেন 'সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।' বঞ্চিত, বুভুক্ষু, পীড়িত, আর্ত, আশাহীন, ভাষাহীন সেই সব মানুষের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

প্রাচীন ভারতে অতিথি-সেবা ছিল গৃহস্থের পরম ধর্ম। প্রত্যেক পরিবারেই সেকালে একটি করে থাকতো অতিথিশালা। তাছাড়া, দরিদ্রদের সেবার নাম দেওয়া হয়েছিল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের আলোকিত আবির্ভাব। দীন-দুঃখীর বেশে তিনি সর্বদাই আমাদের হৃদয়ের চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রবেশের পথ। আমরা কি তাঁকে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার দেব না? পৃথিবীর মানুষের অজস্র দুঃখ। প্রাকৃতিক কারণে সেই দুঃখ অন্তহীন। ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-অগ্ন্যুৎপাত এবং রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি পৃথিবীর মানুষকে বেষ্টন করে নিত্য শ্মশান-নৃত্যে মেতে আছে। তারাই তো আমাদের পীড়িত ঈশ্বর। তাদের সেবার মধ্য দিয়ে অন্তরে যে অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দের আলোকিত উদ্ভাস ঘটে, তাইই তো ঈশ্বরের

অতিথি-সেবা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?'

আবির্ভাব। আমাদের চারদিকে কাঁদছেন কত ক্ষুধার্ত ভগবান, কত পীড়িত ভগবান! ভগবান বুদ্ধ ও মহামতি অশোক মানব-সেবার জন্যে গড়ে তুলেছিলেন নানা প্রতিষ্ঠান। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজদের আগমনের পর খ্রীস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে জনসেবার আয়োজন দেখা দেয়। তার প্রায় এক শতাব্দী পরে ভারতে গড়ে উঠে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম ইত্যাদি নানা জনসেবাভিত্তিক, জনকল্যাণমূলক সেবা-প্রতিষ্ঠান। গান্ধীজীও জনসেবার আদর্শে আত্মনিয়োগ করেন সমাজের অবহেলিত হরিজন-সেবায়।

দুঃস্থের সেবাই শ্রেষ্ঠ মানব-সেবা

সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে আর্ত ও পীড়িতের প্রতি কর্তব্য-বোধ স্বাভাবিক। সব দেশেই দুঃস্থ, পীড়িত, বিকলাঙ্গ, বৃদ্ধ, অসমর্থদের সেবার জন্যে প্রতিষ্ঠান আছে। 'আন্তর্জাতিক রেড্‌ক্রশ' প্রতিষ্ঠান এরূপ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, প্রত্যেক দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, ধর্মশালা, গরীবখানা ইত্যাদি আছে। এই বিশ্বজোড়া দুর্দিনে মানুষ মানব-সেবার মহৎ আদর্শটি বিস্মৃত হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কোন আকস্মিক বিপৎপাতের সময়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি সংঘটিত হলে আর্তের সেবায় মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সব স্বতঃস্ফূর্ত সেবার দৃষ্টান্ত দেখে মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাস ফিরে আসে।

উপসংহার

জনসেবাই ঈশ্বর-সেবা। সেই সেবার পশ্চাতে কোন প্রত্যাশা কিংবা অভিসন্ধি থাকা উচিত নয়। প্রত্যাশাবিহীন কিংবা স্বার্থবিমুক্ত জনসেবার মাধ্যমে দেবসেবার ন্যায় এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দের প্রসাদ অন্তরে লাভ করা যায়। তাইই প্রকৃত জনসেবকের চরম এবং পরম প্রাপ্তি। জনসেবার আছে বহু দিক। প্রকৃত সেবক শুদ্ধ মনে কাজ করে গেলে সেবার মধ্য দিয়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করতে পারেন। অনেক ভণ্ড জনসেবক আত্ম-স্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্যে পরোপকারের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। তারা সমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ। তারা ক্ষুধিতের অন্ন চুরি করে, দুঃস্থের ত্রাণ-ব্যবস্থায় ভাগ বসায়, আত্মসাৎ করে সরকারী হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্রের বহুলাংশ। তারা মানবতার জঘন্যতম শত্রু, সমাজের ঘৃণ্যতম অপরাধী॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- জনসেবা, মা. '৭২
- 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', মা. '৬৮
- সেবাধর্ম
- অস্পৃশ্যতা নিবারণ
- রোগীর সেবা

৪৫
'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু, সে জাতির নাম মানুষ-জাতি'

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, জাতি মানুষের ॥ পরস্পর-বিদ্বেষের পরিণাম ॥ জাতি-বিদ্বেষ ॥ ধর্ম-বিদ্বেষ ॥ বর্ণ-বিদ্বেষ ॥ বিদ্বেষের নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশ ॥ ভারতে জাতিভেদ-প্রথা ॥ উপসংহার ॥

উ. মা. '৬০

মানুষই তো মানুষ-জাতি। মানুষের আবার জাতিভেদ কিসের? মানুষের কোন জাতিভেদ নেই, মানুষের কোন জাতিভেদ থাকতে পারে না। পৃথিবীর যে-কোন দেশের অধিবাসীই হোক, মানুষের একমাত্র পরিচয় হলো—সে মানুষ। সে ভারতীয়, ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, অথবা রাশিয়ান, চীনা, আমেরিকান, যা-কিছুই হোক—সাদা, কালো, হলুদ যে রঙেরই হোক তার গাত্রবর্ণ—তার সত্য পরিচয় হলো, সে মানুষ। এবং 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

ভূমিকা

কেবল রাষ্ট্রীয় সীমানার বাধ্যবাধকতায়, কেবল ভৌগোলিক সীমানার যুক্তিতে কিংবা সাদা-কালো-হলুদ গায়ের রঙের ভিত্তিতে তার নাম-নামান্তর; কিন্তু মূলতঃ সে মানুষ। মানুষ বিশ্ব-বিধাতার সন্তান। তাঁর সৃষ্টিতে নেই কোন ভেদাভেদ, নেই কোন ভেদ-বৈষম্যের পার্থক্য-রেখা। কিন্তু মানুষ রচনা করেছে কৃত্রিম জাতি, সৃষ্টি করেছে ঘৃণ্য জাতিভেদ। ভেদবুদ্ধি-প্রণোদিত স্বার্থপর মানুষ সৃষ্টি করেছে মানুষে-মানুষে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এবং জগতের যত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যত কলঙ্কময় রক্তপাত, তার মূলে আছে এই অবাঞ্ছিত মানবিক ভেদ-বৈষম্য।

মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি, জাতি মানুষের

ধূলার এই ধরণীতে যখন মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন ছিল না কোন জাতিভেদ, ছিল না কোন জাতি-বিদ্বেষ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিবর্তনের পথে মানুষ যতই অগ্রসর হলো, ততই তার মনে সঞ্চারিত হলো জাতি-বিদ্বেষের তীব্র বিষ। সেই বিষজ্বালায় জর্জরিত পৃথিবী রুধিরস্নাত হয়ে খিন্নকণ্ঠে বারে-বারে আর্তনাদ করে উঠেছে। ছিন্নমস্তার মতো মানুষ আপন রুধির-পানে হয়ে উঠেছে উন্মত্ত। সেই বিভেদের কুটিল বিষক্রিয়ায় মানুষের সহজ দৃষ্টিশক্তি হয়ে গিয়েছে অন্ধ। সেই অন্ধ জাতি-বিদ্বেষ, বর্ণ-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ-নিঃশ্বাসে বারে বারে পৃথিবী শিউরে উঠেছে। য়ুরোপে যে উগ্র জাতীয়তাবোধ মহাযুদ্ধের আগুন জেলেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায় এবং লণ্ডনে আজ চলেছে যে মানবতার নির্লজ্জ

পরস্পর-বিদ্বেষের পরিণাম

অপমান এবং ভারত-উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত মেখে যে ভারত ও পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছে, তার মূলেও আছে এই কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যের একই কলঙ্কিত ইতিহাস।

পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে এই সংঘাত ও রক্তপাতের শুরু অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ভৌগোলিক সীমাবেষ্টনীর মধ্যে ভূমিষ্ঠ মানব-গোষ্ঠী অপর স্থানের মানব-গোষ্ঠীকে ঘৃণা করতে শিখলো। এই পর-বিদ্বেষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক সীমা-বেষ্টনীর মধ্যে গঠিত হয়ে উঠলো ভিন্ন ভিন্ন জাতি। ক্রমে তারা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে হলো রূপান্তরিত। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে চললো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বৃহত্তর সর্বধ্বংসী প্রস্তুতি।

জাতি-বিদ্বেষ

তারপর পৃথিবী থেকে রক্তপাতের শেষচিহ্ন মুছে ফেলবার জন্যে এলো ধর্ম। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য পৃথিবীর মানুষকে শান্তি-স্বর্গের ঠিকানা দেবার জন্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষের হাতে সেই ধর্ম হয়েছে কলঙ্কিত। ধর্মের ছুরিকাঘাতে পৃথিবী হয়েছে রক্ত-পিচ্ছিল ; ধর্ম-পাষণ্ডদের হুঙ্কারে মানব-সভ্যতার উঠেছে নাভিশ্বাস। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত রক্তপাত ঘটেছে, এমন আর কোন কিছুতেই হয় নি। যুগে-যুগে ধর্ম ডেকে এনেছে ঘৃণ্য পরধর্ম-বিদ্বেষ। তাতে রুধির-উৎসবে আত্মঘাতী হয়েছে মানুষ। আজ পৃথিবী হতে ধর্মের সেই ভ্রান্তিবিলাস ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। অহিফেনবৎ ধর্মের বটিকা পরিত্যাগ করে আজ জাগছে অন্তরের মানুষ, মনুষ্যত্ববোধের হচ্ছে শুভ উদ্বোধন।

ধর্ম-বিদ্বেষ

রাষ্ট্রীয় ভেদ-বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় সীমা-পার্থক্য ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে। কিন্তু বর্ণ-বৈষম্য আজও পৃথিবীতে বর্তমান। প্রাচীনকাল থেকে শ্বেতকায় জাতিরা অশ্বেতকায়দের ওপর করে এসেছে অকথ্য অত্যাচার। তাদের প্রতি করেছে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার। সুসভ্য শ্বেত-নখরে কৃষ্ণকায়দের কম রক্ত ঝরেনি পৃথিবীতে। বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণে যখন পৃথিবীর মনীষীগণ এক-রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করছেন, তখনও দেখি, পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে বর্ণ-বৈষম্যের এই দুরপনেয় কলঙ্ক-চিহ্ন দূরীভূত হয় নি।

বর্ণ-বিদ্বেষ

এইভাবে আমরা এই পৃথিবীতে দেখেছি মানুষের চরম বর্বরতা, দেখেছি মানবতার দুঃসহ লাঞ্ছনা। দেহের বর্ণের জন্যে কোন মানুষই দায়ী হতে পারে না। বিশ্বের জলবায়ুর পার্থক্য থেকেই মানবের দেহ-বর্ণের বিভিন্নতা। তার জন্যে মানুষ দায়ী হবে কেন? কেন অশ্বেতকায়দের ওপর শ্বেতকায়দের চলবে অকথ্য অত্যাচার? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও, 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা।' আর আশ্চর্য, বৈজ্ঞানিক ধারণায় প্রাগ্রসর শ্বেতকায়রা কৃষ্ণকায়দের অর্ধ-মানব [half-man] মনে করে তাদের ওপর করে বর্বর অত্যাচার। বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উন্নত শ্বেতকায়রা

বর্ণ-বিদ্বেষের নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশ

জাতি-বিচারের সময় বিজ্ঞানকে দূরে সরিয়ে আদিম বর্বরতার কাছে করে আত্মবিক্রয়। বর্ণাভিমানের নির্লজ্জ প্রকাশ যে মানুষকে কত মূঢ় নিষ্ঠুর পশুতে পরিণত করতে পারে, দক্ষিণ আফ্রিকাই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ রোডেশিয়ায়ও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আমেরিকায়ও সম-অধিকারের দাবির স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন নিগ্রো-নেতা মার্টিন লুথার কিং, প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং রবার্ট কেনেডি।

প্রাচীন ভারতবর্ষ এই মহান্ সত্য আবিষ্কার করেছিল যে, মানুষ এক; মানুষে-মানুষে কোন বিভেদ নেই—সকল মানুষের অন্তরেই শ্রীভগবানের বাস। কিন্তু বৈদিক যুগের অবসানে মনুষ্যত্বের সেই মহিমা হয় ধূল্যবলুণ্ঠিত। বৈদিক সমাজ গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘৃণ্য জাতিভেদ করে আত্মপ্রকাশ, শুরু হয় মানবতার নির্লজ্জ অপমান। সমগ্র সমাজ ভেদ-বৈষম্যের অসংখ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে আত্মহননের পথে অগ্রসর হয়েছে। যে ভারতবর্ষ মানুষের অন্তরে ঈশ্বরকে আবিষ্কার করেছিল, সেই ভারতবর্ষই তার এক বিশাল গণ-সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে অস্পৃশ্য, পতিত, অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল দীর্ঘকাল। পুনরায় বিংশ শতাব্দীতে অপমানের ধূলিশয্যা থেকে মানবতাকে তুলে এনে তার যথাবিহিত পূজার আয়োজন করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনই তার সাক্ষী। কিন্তু গান্ধী-শতবার্ষিকীতে ভারতে যখন ক্রোধ ও বিদ্বেষের লেলিহান অগ্নিশিখায় হরিজন-বালককে পুড়িয়ে মারা হয়, তখন ভারতবাসী হিসেবে লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে যায়।

ভারতে জাতিভেদ-প্রথা

আত্মাভিমানী আমেরিকা চির-অবহেলিত নিগ্রোদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার স্বীকার করে নেবে কিনা, জানি না, । জানি না, শ্বেতকায়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় অশ্বেতকায়দের মানুষের মর্যাদা দেবেন কিনা। কিন্তু জানি, মহাকাল মিলনবিলাসী। মানুষে-মানুষে অবাধ মিলনই তাঁর কাম্য। সেই মিলন যদি শান্তি ও সামাজিক বিবর্তনের পথে না আসে, তবে মহাকালের হাতের রুদ্র-বীণা অবশ্যই বেজে উঠবে। যারা ঘৃণা করে দূরে আছে, তাদের একদিন নয় একদিন মহা-মানবের মিলনতীর্থে সম্মিলিত হতে হবে। যখন এই ঘৃণা-পঙ্কিল ও ভেদ-ক্লিষ্ট পৃথিবীতে সেই মহামিলনের পরম লগ্ন সমাগত হবে, তখন হিটলার ও ভেরউডের প্রেতাত্মা কি করবে, জানি না। কিন্তু জানি, বিধাতা-পুরুষ সেদিন সমগ্র মানব-জাতিকে আশীর্বাদ করবেন॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'
- মানব-প্রীতি
- 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'

৪৩ 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা'

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ পৌরুষ ও দৈব-নির্ভরতা ॥ আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি ॥ সংগ্রামময় পৃথিবী ॥ মনুষ্যত্বের বিজয় ॥ মানুষের শত্রু : ভয় ॥ আত্মশক্তির পুরস্কার ॥ উপসংহার ॥

উ. মা. '৬৮

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।' —রবীন্দ্রনাথ

এই সংগ্রামময় পৃথিবীতে জীবনের পথে আসে বহু বিপদ, আসে মৃত্যুর বিভীষিকাময় হাতছানি। আর, চিরকালের সংগ্রামী মানুষ, দুর্নিবার বিপদ ও মৃত্যুর কুটিল বিভীষিকাকে উপেক্ষা করে জীবনের বিজয়-সংগীত রচনা করে চলেছে। পৃথিবীর চারদিকে কত সংঘাত, কত হিংসা এবং মৃত্যুর কত গোপন চক্রান্ত। পদে-পদে হিংসার উন্মত্ততা, দিকে-দিকে পশু-শক্তির নির্লজ্জ আস্ফালন। সেই সব বিপদ এক চরম ক্ষণে মৃত্যুর দূতরূপে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু বিপদের আগমনে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ের অন্ধকার কোটরে আত্মগোপন করলে বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মানুষকে মৃত্যুর ওপরে জয়ী হতে হবে। তাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব, তাতেই মনুষ্যত্বের অমর মহিমা। তাই, মৃত্যুভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষকে কবি মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বলেন—'মৃত্যু যারা বুক পেতে নেয় বাঁচতে তাঁরাই জানে।'

ভূমিকা

মৃত্যুর ঘোর-কুটিল চক্রান্ত পদদলিত করে বাঁচার নামই প্রকৃত বাঁচা। বিপদের মুহূর্তে মানুষ অন্তরে-অন্তরে বড় দুর্বল হয়ে পড়ে। 'রক্ষা করো, রক্ষা করো'—বলে সে ঈশ্বরের কাছে করে কাতর প্রার্থনা। ভগবান তাঁর পরম নিশ্চিত হাত প্রসারিত করে দিয়ে মানুষকে বিপন্মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তাতে মানুষের আত্মশক্তি ও পৌরুষের ঘটে পরাজয়। মানুষের মধ্যেই আছে যে পৌরুষের দুর্জয় শক্তি, তা দিয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারে, সকল বিপদ-বাধা উত্তীর্ণ হয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু দৈব-নির্ভরতা দুর্বলতারই পরিচায়ক। দৈব-নির্ভরতা মানুষের পৌরুষকে করে খর্ব, মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের করে অপমান। যুগে-যুগে দেব-নির্ভর মানুষ শক্তিহীন হয়ে মদমত্ত শক্তির কাছে হয়েছে পরাজিত। তার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে, তার ব্যক্তিত্ব, জীবন-যাত্রা হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। ইতিহাসে রয়েছে তার কলঙ্কময় সাক্ষ্য। আসল কথা হলো, মৃত্যু জীবনের বিজয়পত্র হাতে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করে ঘুরে বেড়ায়। তার হাত থেকে সেই বিজয়পত্র ছিনিয়ে নিতে হবে। দুঃখ তার ছায়া-অনুচর। সেই দুঃখের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে বাঁচতে হবে। পৃথিবীকে খাঁটি সোনা করাই তার অভিপ্রায়।

পৌরুষ ও দৈব-নির্ভরতা

তাই দেখা গিয়েছে, যে সব মানুষ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্ হয়ে বিপদ-বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মনুষ্যত্বের বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরা মনুষ্য-সমাজে হয়েছেন সম্মানিত। ইতিহাস কেবল তাঁদেরই নাম এবং তাঁদেরই গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি-কাহিনী মনে রাখে। উত্তরকালও তাঁদের জন্যে রচনা করে বিজয়-অর্ঘ্য। তাঁরা চিরকালের স্মরণীয় ও বরণীয়। প্রাচীন ভারতের ঋষি-কণ্ঠ থেকে তাই উচ্চারিত হয়েছে : 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' আত্মাকে বলহীন ব্যক্তিরা লাভ করতে পারে না। তার জন্যে চাই শক্তি, চাই পৌরুষ, চাই দুর্জয় সংগ্রামী শক্তি।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি

এই পৃথিবী সংগ্রাম-মুখর। এখানে বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তি ভয়াল কুটিল রূপ ধারণ করে মানুষের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করবার জন্যে অহরহঃ করছে ঘোর চক্রান্ত। সেই চক্রান্তের ওপরে উঠে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তার নিজের অস্তিত্বকে। দুর্বার মরণ-পণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জয়ী হয়ে যদি সে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, তাতেই তার চরম গৌরব। এই পৃথিবীতে শক্তিমানেরাই বেঁচে থাকে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে মানুষের এই-যে সংগ্রাম, এর সূচনা হয়েছে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাত থেকে। চারদিকে হিংস্র শ্বাপদ, চারদিকেই ভয়াল মৃত্যুর করাল গ্রাস। পদে-পদে তার অস্তিত্বকে গলা টিপে হত্যা করবার জন্যে মৃত্যুর গোপন চক্রান্ত। মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে এবং অবশেষে জয়লাভ করে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সেই যুদ্ধই হলো তার জীবন-যুদ্ধ—'Struggle for Existence.' কত বিপদ-বাধা, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা জয় করে সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই মানুষ আজও সগৌরবে বেঁচে আছে। কিন্তু কোন্ শক্তিবলে তার এই দুর্বার বিজয়-অভিযান ? কোন্ শক্তির দুর্দমনীয় তেজে সে ললাটে পরেছে দেব-দুর্লভ বিজয়-ললাটিকা ? তা আর কিছুই নয় ; তা তার মৃত্যু-তারণ দুর্জয় আত্মশক্তি।

সংগ্রামময় পৃথিবী

যারা দুর্বল-হৃদয় কিংবা ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ, কুব্জ-দেহ এবং সদা-শঙ্কিত ও পরমুখাপেক্ষী, তারা সেই দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান রাখে না ; পৃথিবী তাদের প্রতি চিরকালই বিমুখ। ঈশ্বরের অনুকম্পা প্রার্থনা করে তারা দেবতার দেউলে মাথা কুটে মরে, আসন্ন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা প্রার্থনা করে অলক্ষিত দেবতার বরাভয়। তখন তারা ভুলে যায় যে, তারাও মানুষ, তাদেরও প্রাণ আছে, বাহুতে আছে অমিত শক্তি, অন্তরে রয়েছে অপরাজেয় পৌরুষ। তাই তারা হয় বিপদের বলি। দু-বেলা তারা তাই মরে বেঁচে থাকে। কিন্তু সেইভাবে মরে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায় ? অন্তরের অপরাজেয় পৌরুষের দ্বারা বিপদ-বাধা জয় করে মনুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করতে হবে। যুগ যুগ ধরে যে জীবন-ধারা নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, মনুষ্যত্বের বিজয়-গৌরবে তা সার্থকতা লাভ করবে।

মনুষ্যত্বের বিজয়

ভয় মানুষের অবধারিত শত্রু। সে তার আত্মশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করে

দিয়ে সাধন করে তার চরম সর্বনাশ। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ভয়কে জয় করতে হবে এবং পৌরুষে আস্থাশীল হতে হবে। 'শক্তি মরে ভীতির কবলে।' সেই শক্তিকে ভীতির কবল-মুক্ত করে, ভয়কে পদদলিত করে ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে এই পৃথিবীতে যথার্থ মানুষের মতো বাঁচতে হবে। নিশ্চেষ্ট ও পর-নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। সেই মৃত্যুতেও আছে গৌরব। আর, দুর্বল ও ভগবৎ-নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকা চরম অবমাননাকর। যারা ভীরু, ভয়ের গুহায় যারা জীবনে আত্মগোপন করে থাকে, মৃত্যুর পূর্বে যারা বহুবার মরে কাপুরুষের মৃত্যু, মানুষ তাদের প্রতি নির্মমভাবে শ্রদ্ধাহীন, ইতিহাস তাদের সম্পর্কে কঠিনভাবে নীরব। ঘৃণ্য ধিকৃত জীবনই তাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

মানুষের শত্রু : ভয়

আত্মশক্তির আছে অপরাজেয় মহত্ত্ব, আছে গৌরবময় পুরস্কার। আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে যারা বিপদ-বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়, তারাই এই সংগ্রামময় পৃথিবীতে সসম্মানে বাঁচতে পারে, মনুষ্যত্বের গৌরবে তারা হয় গৌরবান্বিত, তারাই লাভ করে মনুষ্যত্বের অমর-মহিমা। কিন্তু পরমুখাপেক্ষীদের আত্মধিক্কারে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে মরতে হয় পৃথিবীতে। দৈবানুগৃহীত জীবনও অনুরূপভাবে বেদনাদায়ক ও গ্লানিময়।

আত্মশক্তির পুরস্কার

এই পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে আছে বিপদ-মৃত্যু, আছে দুঃখ-যন্ত্রণা, আছে ব্যথা ও বেদনা। কিন্তু ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করার মতো অপমান আর নেই। যারা বিপদকে ভয় করে, বিপদ তাদেরই বেশী করে গ্রাস করে, তারাই বেশী করে বিপন্ন হয়। কাজেই, ভয়ের কাছে নতি-স্বীকার নয়, ভয়কে নিজের শক্তি ও সাহসের দ্বারা জয় করতে হবে। ভীরুতা, কাপুরুষতা ও ক্লীবতা পরিহার করে নির্ভীক পুরুষকারের শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ওঠো, জাগো, আত্মার ভাস্বর তেজে তেজস্বী হয়ে জেগে ওঠো। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' তাই কবি বলেন—'দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।' আসুক বাধা, আসুক বিপদ, আসুক মৃত্যু। ভীরু পলাতকের মতো ঘরের কোণকে আশ্রয় করে কিছুতেই আমরা মরে বেঁচে থাকতে পারবো না। ভাগ্যকে ডেকে বলবো, 'পূজা দিয়ে পদ করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা, কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা—আনিব তোমারে বাঁধিয়া॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- 'বিপদে আমি না যেন করি ভয়'
- 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কী মহীতে?' উ. মা. '৬১

Indian Naval Service
western Naval Command.

৪৭

যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা ও তার বিকাশ-প্রয়াস। মানুষের দুঃখের জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। পৃথিবী কর্মময়, কর্মেই মানুষের পরিচয়। উপসংহার।

উ. মা. '৬১, '৬৭; মা. '৫২

'পূজা দিয়ে পদ করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা, আনিব তোমারে বাঁধিয়া।' —রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

মানুষ নিজেই নিজের সৌভাগ্যের স্থপতি, তার সাফল্যের একনিষ্ঠ কারিগর। কর্মময় পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত আসে মানুষের নানা কর্মের আহ্বান। কিন্তু যারা জড়, অলস, কর্মবিমুখ, তারা সেই আহ্বানে সাড়া দেয় না ; আরামের শয্যাতল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্মের সুকঠিন পথে নিজেকে স্থাপিত করে জীবনের জয়গান রচনা করবার কলাকৌশল তারা জানে না। আসল কথা, পৃথিবীর জড়, অকর্মণ্যের দল নিজেদের শক্তির সন্ধান রাখে না, নিজেদের কর্মক্ষমতার দিক্-দিগন্ত তাদের জানা নেই। এবং জানা নেই বলেই তারা নৈষ্কর্ম্যের জড়তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই জীবন অচিরে পরের গলগ্রহতায় ওঠে হাঁপিয়ে, দুঃসহ অভিশাপের মতো হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত। অথচ মানব-জীবন এভাবে আলস্য ও কর্মহীনতার মধ্যে তিলে তিলে অপচয় করবার জন্যে নয়। জীবন মহত্তর। এবং কর্মই জীবন। কর্মের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। কর্মের মধ্যেই মানুষ পায় দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান, কর্মের মধ্যেই সে লাভ করে নিজের জীবনকে, নিজের ভাগ্যকে নির্মাণ করবার দুর্লভ সুযোগ। কাজেই, নৈষ্কর্ম্যের গড্ডলিকা-স্রোতে ভাসিয়ে দেবার জন্যে জীবন নয় ; জীবন নিজেকে, নিজের ভাগ্যকে নির্মাণ করবার অনবদ্য সুযোগ।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যেমন অসীম, তার রূপদানের ক্ষমতাও তেমনি প্রচুর। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে শক্তির স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু সেই স্ফুলিঙ্গ থাকে ভস্মাবৃত। চেষ্টা কিংবা পরিশ্রমের জোরে সেই ভস্মরাশি অপসারিত হলে মানুষের অন্তর্লীন অগ্নিশিখা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। মানুষের অন্তরশায়ী সুপ্তিময় চেতনার উদ্বোধনে ব্যক্তি-জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে। চাই কেবল সুপ্তি-ভঙ্গের আয়োজন, চাই কর্মনিষ্ঠা, চাই আত্মবিশ্বাস। মানুষ যখন জড়তাগ্রস্ত থাকে, যখন তার চেতনা-শক্তি থাকে অন্ধ তামসিকতায় আচ্ছন্ন, তখন সে ভীত, দুর্বল

এবং পরমুখাপেক্ষী। সেই অবস্থায় সে তার দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান পায় না। তাই সে তখন কর্মমুখর পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় শিশুর মতো সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। বিচার-বিবেচনাহীন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে খোঁজে জীবনের ঠিকানা। তখন সে শক্তিহীন ; বিশ্বের সকল কর্মের অযোগ্য এবং সকলের কৃপার পাত্র। কিন্তু যখন মানুষ স্ব-বলে সেই জড়তা-মোচন করে, যখন ছিন্ন করে তার মোহাবরণ, তখন জাগ্রত চেতনার প্রখর সূর্যালোকে ঘটে তার আত্মোপলব্ধি। সেই আত্মোপলব্ধি খুলে দেয় তার জীবনের সকল সম্ভাবনার দুয়ার।

মানুষের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে তার বিপুল সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার সীমানা তার জানা নেই। গভীর আত্মানুসন্ধান ছাড়া সেই সম্ভাবনার পরিচয় লাভও অসম্ভব। মানুষ যখন নিজেকে জানতে পারে, যখন সে চিনতে পারে তার গভীর সম্ভাবনার স্বরূপ, তখন সে শক্তির উল্লাসে উল্লসিত হয়ে ওঠে, সে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে নব নব কর্ম-প্রেরণায়। তখন তার চারদিকে জড়তা ও নৈষ্কর্ম্যের পাষাণ-প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এক বিশাল কর্ম-প্রভাত তার সম্মুখে ফেটে পড়ে। তরুণ গরুড়ের মতো তার কর্ম-ক্ষুধা তখন বিশ্বগ্রাস করতে চায়। প্রাণোন্মাদনায় সে তখন বলে ওঠে :

মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা ও তার বিকাশ-প্রয়াস

'আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনিয়া ফেলেছি,
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।'

মানুষ যখন আত্ম-পরিচয় লাভ করে, তখন তার সকল বাঁধনই খুলে যায়, খুলে যায় তার আত্ম-বিকাশের সিংহদ্বার। দিয়াশলাইর বাক্সে ক্ষুদ্র, সামান্য বারুদ-লিপ্ত কাঠিগুলি থাকে সুপ্তিমগ্ন। তার মধ্যে যে কী প্রচণ্ড বিস্ফোরণ লুকানো আছে, সুপ্ত আছে কী বিপুল দাবানল, তা সে জানে না। স্বল্প ঘর্ষণেই সে বাধিয়ে দিতে পারে এক প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড।

পৃথিবীতে মানুষের যে দুঃখ, তার জন্যে দায়ী সে নিজেই। অলস, কর্মবিমুখ কত মানুষ দুঃখের বোঝা বয়ে মরে, কত মানুষ দুর্দশা-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে অশেষ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু কেন সে দুঃখের বোঝা বয়ে মরে ? কেন তাকে দুর্দশার পঙ্ককুণ্ডে পড়ে তিলে-তিলে মৃত্যু বরণ করতে হয় ? সে না মানুষ ? তার মধ্যেই না সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ? তবু সে দুর্দশার অন্ধকূপে শ্বাসরোধ হয়ে মরে কেন ? তার কারণ, সে তার নিজের পরিচয় জানে না। কী অসীম শক্তি তার মধ্যে প্রকাশের জন্যে প্রতীক্ষা-কাতর, তা সে জানে না। তা যদি সে কোনদিন জানতে পারে, যদি সে পায় তার নিহিত শক্তির সন্ধান, অত্যাচারীর অত্যাচার, বলদর্পীর অন্যায় সে মুখ বুজে আর সহ্য করবে না। সুপ্তি ভঙ্গ হলে তার প্রতীক্ষা-কাতর শক্তি একদিন সকলকে সচকিত করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়বে, বিপুল উল্লাসে ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে।

মানুষের দুঃখের জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী

কর্মময় এই পৃথিবী। 'গুরু-গুরু গর্জন—গুন্ গুন্ স্বর। দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।' এখানে আলস্যের শয্যায় ঘুমিয়ে জীবন কাটাতে কেউ জন্মগ্রহণ করে নি। যে দুর্ভাগ্য আলস্য-নিদ্রায় জীবন কাটলো, পৃথিবীকে তার জানা হলো না, তার আত্মস্বরূপও উপলব্ধ হলো না। ঘুম ভেঙে সে যদি একবার বহির্বিশ্বের দিকে তাকায়, তাহলে দেখতে পাবে, দিকে দিকে চলেছে কী বিপুল কর্মোচ্ছ্বাস, দিক্-দিগন্ত থেকে আসছে কত কর্মের আহ্বান। তারই মধ্যে জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, পৃথিবী কর্মময়, কর্মেই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। আর, কর্মই হলো ভাগ্যদেবীর পূজার বোধন-মন্ত্র। কর্মের সেই মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা লাভ হয় ভাগ্য-দেবীর উদার প্রসন্নতা। তাঁর এক হাতে বিজয়-মাল্য, অন্য হাতে তরবারি। তরবারির দ্বারা কর্ম-সংগ্রামে জয়লাভ করলে তবেই গলায় জুটবে তাঁর হাতের বিজয়মাল্য।

পৃথিবী কর্মময়, কর্মেই মানুষের পরিচয়

অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!' আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন ভাগ্য-রচনায় ব্রতী হতে হবে। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী প্রতিনিয়ত ইশারায় মানুষকে আহ্বান করছে। পথ দুর্গম, অন্তহীন। কিন্তু মানুষ পথের সেই দুর্গমতাকে পদদলিত করে একদিন সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে জয় করে আনবে। কোন বাধা তাদের জয়যাত্রা-পথের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কোন নিষেধ তাদের চলার গতিকে ব্যাহত করতে পারে না। যারা এইভাবে আপন ভাগ্য-রচনায় ব্রতী হয়, তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য-বিধাতা। তারা নতজানু হয়ে লক্ষ্মীর করুণা ভিক্ষা করে না, প্রতীক্ষাও তাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। লক্ষ্মীকে চ্যালেঞ্জ করে তারা বলে :

উপসংহার

> 'পূজা দিয়ে পদ করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা ;
> কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা, আনিব তোমারে বাঁধিয়া।'

সেই শক্তি-পরীক্ষায় আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ মানুষের জয় অনিবার্য। দুর্ভাগ্যকে পরাজিত করে সে নিজের দুর্দমনীয় শক্তিবলে ছিনিয়ে আনবে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর হাতের দুর্লভ বিজয়মাল্য। সেদিন সার্থক হবে তার মানব-জন্ম, সফল হবে তার জীবন-সাধনা ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- স্বাবলম্বন, উ. মা. '৬৭
- 'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?' উ. মা. '৬১

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ প্রতিভা ও প্রকাশ ॥ কলেজ-পত্রিকা জীবনে সোনা ফলাবার ক্ষেত্র ॥ রচনা-বৈচিত্র্য ও কলেজ-পত্রিকার রূপ ॥ প্রাচীর-পত্রিকা ॥ বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥ সংগঠনী ও সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ ॥ স্বর্ণকণ্ঠ বিহঙ্গের বাক্-ঝঙ্কার ॥ প্রকাশ-কাল ॥ উৎকর্ষ-সাধন ॥ উপসংহার ॥

৪৮ কলেজ-পত্রিকা

'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।' —রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

যৌবনের প্রথম প্রভাতে একদিন স্বপ্নভঙ্গ হয় নির্ঝরের। মানুষের হৃদয়ে সেদিন অদম্য উচ্ছ্বাস, আকুল আবেগ প্রকাশের জন্যে মাথা কুটে মরে। 'বাহিরিতে চায় খুঁজিয়া না পায় কোথায় কারার দ্বার।'—শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুগ্রহে আমাদের যৌবনের উন্মেষ-লগ্ন কলেজে অধ্যয়নকালেই সমাগত হয়। অফুরন্ত প্রাণ-প্রেরণার অদম্য নির্ঝর ঐ সময় আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারে প্রকাশ-ব্যাকুলতার মহা-বেদনায় হয়ে ওঠে উথাল-পাথাল। নবজাগ্রত কত ভাব হৃদয়ের গোপন গুহায় কেঁদে মরে, খোঁজে প্রকাশের ভাষা। কিন্তু প্রকাশের পথে সহস্র বাধা। এ সময়ে প্রকাশের সামান্যতম সুযোগে জীবনের সম্ভাবনার প্রথম দুয়ারটি হয় উন্মুক্ত। কলেজ-পত্রিকা জীবনের প্রথম প্রকাশের সেই বহু-সম্ভাবনাময় স্বর্ণদ্বার।

প্রতিভা ও প্রকাশ

কলেজ-পত্রিকাই সেই তোরণ-দ্বার, যে পথ দিয়ে ছাত্র-সমাজের অন্তরশায়ী প্রতিভা লাভ করে প্রকাশের দুর্লভ সুযোগ। তরুণ-জীবনের এই প্রথম স্বীকৃতি ভবিষ্যৎ-জীবনে কখনও ব্যর্থ হয় না। প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যেই তার নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে। সে তা অন্যকে জানাতে চায়, শোনাতে চায় তার অন্তররুদ্ধ স্বগত কাকলি। কিন্তু সে তা জানাবে কিরূপে? বুকের মধ্যে মাথা কুটে মরে কত রবীন্দ্রনাথ, কত নজরুল, কত সুকান্ত। কূলপ্লাবী কত দুরন্ত বন্যা অন্ধ আক্রোশে চারদিকে পথ খুঁজে মরে।

কলেজ-পত্রিকা জীবনে সোনা ফলাবার ক্ষেত্র

নতুন নতুন বিষয় অধ্যয়নের ফলে বহু কথা হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে। এই সব চিন্তা-ভাবনাকে সে কলেজ-পত্রিকার পাতায় মুক্তি দেবে। আসল কথা হলো, প্রত্যেকেই চায় তার প্রতি সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হোক। যৌবনের প্রভাত-লগ্নে এই আকর্ষণ-প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তা বিকৃতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। এই সময় মানুষের মানস-প্রবণতাকে স্থূলতা থেকে সূক্ষ্মতার দিকে পরিচালিত করতে পারলে তাতে সোনা ফলানো যেতে পারে। সেদিক দিয়ে কলেজ-পত্রিকার আয়োজন অল্প, কিন্তু তার সাফল্য অসাধারণ।

কলেজের পাঠ্য-পুস্তকের অন্তর্গত ও বহির্গত নানা আলোচনায় ছাত্রদের মনে বহু খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবের উদয় হয়। সেই সকল ভাবানুচিন্তনের বিচ্ছিন্নতাকে তারা কলেজ-পত্রিকার প্রকাশ-উপলক্ষে একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত করে একটি সংহত রূপ দান করতে পারে। সেই ভাব-প্রেরণার প্রকাশের তাগিদে কেউ লিখবে কবিতা, কেউ লিখবে প্রবন্ধ, কেউ লিখবে গল্প, কেউ লিখবে ব্যঙ্গ-কবিতা বা রঙ্গ-প্রবন্ধ। কলেজ-

রচনা-বৈচিত্র্য ও কলেজ-পত্রিকার রূপ

পত্রিকা তাকে সযত্নে নিজ বক্ষে স্থান দেবে। কেউ-বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলে কোন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে এসেছে—সে বিষয়ে সে লিখবে বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। কেউ-বা কোন জটিল সমস্যার সমাধান করেছে—সে বিষয়ে সে লিখবে ধাঁধা। কেউ-বা রং-তুলি নিয়ে এঁকেছে ছবি। তার তুলিতে ফুটে উঠেছে কবেকার-দেখা এক স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা কোন বিষণ্ণ মুখ—সে কলেজ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে দিয়েছে। কেউ-বা অন্যকে হাসাতে ভালোবাসে—সে আঁকলো একটি কার্টুন বা ব্যঙ্গ-চিত্র। এইভাবে বিভিন্ন প্রকাশোন্মুখ প্রতিভার অবদানে কলেজ-পত্রিকার সোনার তরীটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বন্ধন-মুক্ত এবং পাঠ্য-তালিকাতিরিক্ত বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান ও ধ্যানধারণা কতখানি অগ্রসর, তা কলেজ-ম্যাগাজিনের দর্পণে এক নজরে দেখা যায়। এই ম্যাগাজিন

প্রাচীর-পত্রিকা

প্রথমে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ না করে হাতে-লেখা প্রাচীর-পত্রিকার আকারে প্রকাশ করলে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বড় কম হয় না। তারপর সারা বছরের প্রাচীর-পত্রিকা থেকে সংকলিত উৎকৃষ্ট রচনা-গুলিকে মুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশ করলে কলেজ-পত্রিকার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

অনেকে মনে করেন, ছাত্রেরা নিজেদের পাঠ্য বিষয়ই ভাল করে লিখতে পারে না, তাদের আবার এ সব পাকামি কেন? নিজেদের ভাব-ভাবনাকে ছাত্রেরা রূপ

বিরুদ্ধ সমালোচনা

দিতে পারে না—এই চিন্তা অনুচিত। কোন রচনা যদি স্বতঃ-উৎসারিত হয়, তবে তার মতো মধুর সাহিত্য আর হয় না। সরল অপ্রকাশিত আবেগের যেমন বাক্যাতীত মাধুর্য থাকে, তেমনি থাকে তার এক সাহিত্যাতীত সৌন্দর্য। সে দিক দিয়ে কলেজ-পত্রিকা যেন নবীন প্রতিভার আখড়া বা ভাবী কবি-সাহিত্যিকদের বৈঠকখানা।

কলেজ-পত্রিকা ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত, সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হলে ছাত্রদের সংগঠনী এবং সৃজনী প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব। কিন্তু দু-একজন উৎসাহী ও

সংগঠনী ও সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ

যোগ্য অধ্যাপক উপদেষ্টা হিসেবে থাকলে কাজটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুন্দর হয়। এই কাজে ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা ও সৌন্দর্যবোধ ফুটে ওঠে। এই ব্যবস্থায় সুফলের আশা যখন প্রচুর, তখন প্রত্যেক কলেজেই এর আয়োজন প্রত্যাশিত।

প্রথম যৌবনে ছাত্রেরা সৃজনী-শক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে অনেক সময় বিপথগামী হয়। এই সৃজনী-শক্তিকে যদি এ-রকম গঠনমূলক কাজে প্রবাহিত করা

যায়, তার ফলে তাদের পাঠানুরাগ বৃদ্ধি পায় বৈ হ্রাস পায় না। ভাষাজ্ঞান এই সহজ পরিবেশে আপনি বৃদ্ধি পায়। আজকের ছাত্র আগামী কালের নাগরিক। তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, শিল্পী, দার্শনিক, রাষ্ট্র-নেতা—সবাই রয়েছেন। আজ যা বীজ, কাল তাই-ই বৃক্ষ। তার অঙ্কুরোদ্‌গমের ও বৃদ্ধির একটা উপযুক্ত পরিবেশ করে দিতে পারলে 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।' তাছাড়া, কলেজ-পত্রিকা পাঠাতিরিক্তএকটি আনন্দদায়ক খেলার মতো। এ ব্যাপারে ছাত্রেরা অত্যন্ত উৎসাহ পায় এবং সেই উৎসাহের তাগিদে অনেক প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে। যশের আকাঙ্ক্ষায় অনুকরণ-স্পৃহার বশবর্তী হয়ে কেউ লেখে গল্প, কেউ-বা বাক্যের পর বাক্য সাজিয়েও অর্থের সঙ্গে তার সম্পর্ক-স্থাপনে ব্যর্থকাম হয়—তবু লেখার মধ্যে কোথাও-কোথাও বিদ্যুদ্দীপ্তিও চোখে পড়ে—শোনা যায় স্বর্ণকণ্ঠ বিহঙ্গের অপূর্ব বাক্‌-ঝঙ্কার।

স্বর্ণকণ্ঠ বিহঙ্গের বাক্‌-ঝঙ্কার

বছরে একবার কলেজ-পত্রিকা প্রকাশের প্রথা থাকলে ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। পত্রিকায় একটি 'সাময়িক প্রসঙ্গ' বিভাগ রাখলে কলেজের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী তাতে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়। তাছাড়া, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকেরাও এর মাধ্যমে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণের কথা বলতে পারেন এবং ছাত্রদের নানা বিষয়ে উৎসাহিত করবার জন্যে প্রবন্ধ লিখতে পারেন।

প্রকাশ-কাল

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেও কলেজ-পত্রিকার উৎকর্ষ সাধন করা যায়। প্রতি বছর পত্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ হস্তাক্ষর, শ্রেষ্ঠ ছবি ইত্যাদির জন্য পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করলে ছাত্রদের মধ্যে অধিক উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

উৎকর্ষ-সাধন

মোট কথা, ছাত্রদের ভাবাবেগ ও চিন্তাশক্তিকে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। প্রকাশের যে মহা-বেদনায় তাদের হৃদয় অস্থির, তাকে মুক্তির পথনির্দেশ দেওয়া চাই। ধিক্কার, শাসন ও অবজ্ঞায় আমাদের দেশের ছাত্রদের সৃজনী-শক্তিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়। তাতে ডেকে আনা হয় কত রবীন্দ্রনাথ, কত নজরুল, কত সুকান্তের অকাল-মৃত্যু। তাদের ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে এবং তাদের স্বাভাবিক চাপল্যকে শাসন করে তাদের সর্বনাশ সাধন করা হয়। তাই এই দুর্ভাগা দেশে প্রকৃত মানুষ তৈরী হয় না, প্রতিভা যথার্থ বিকশিত হতে পারে না। কোটি-কোটি মানুষ জন্মায় এদেশে, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠে কজন? এইখানেই দেশের দুর্ভাগ্য॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

● কলেজের বার্ষিক-পত্রিকা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ প্রস্তুতি ॥ কলেজে প্রথম অনুভূতি ॥ প্রথম ক্লাস : বাংলা ॥ দ্বিতীয় ক্লাস : ইংরেজী ॥ তৃতীয় ক্লাস : অর্থনীতি ॥ বন্ধুলাভ ॥ উপসংহার ॥

৪৯ কলেজে প্রথম দিন

অবশেষে এলো আমার জীবনের সেই শুভতম দিনটি। স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করে আমিও একদিন কলেজে ভর্তি হয়ে উন্নত মানের পাঠ গ্রহণ করবো, এ কল্পনা আমার বহুদিনের। কলেজের পঠন-পাঠন এবং সেখানকার রীতিনীতি সম্বন্ধে শুনেছি অনেক। তাতে আমার মনের মধ্যে কলেজ-সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাব গড়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমার কল্পনার কলেজের একটি ভাবগম্ভীর সৌম্য-মূর্তি, যা আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে।

ভূমিকা

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল-প্রকাশের পর একদিন অনিশ্চয়তার মহা-আশঙ্কা মনের কোণে বহন করে ভয়-দুরুদুরু বক্ষে কলেজে ভর্তি হয়ে এলাম। ভয় ছিল, যদি কলেজে আমার প্রবেশের সুযোগ না জোটে, তবে আমার এতদিনের স্বপ্ন, এত কল্পনা সব মিথ্যে হয়ে যাবে। শেষে আমার কাঙ্ক্ষিত কলেজেই স্থান হলো। কিন্তু আমার এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে প্রথমেঃআমার মন বিশ্বাস করতে পারছিল না। পরে একদিন কলেজে গিয়ে রুটিনটা লিখে নিয়ে এলাম। এবার আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিনটির জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কত আশঙ্কা, কত দুর্ভাবনা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করে বসেছিল! সেখানে সব নতুন সতীর্থ, নতুন পরিবেশ, নতুন অধ্যাপক!—না জানি, ওঁরা সব কেমন হবেন? আমাকে ওঁরা কিভাবে গ্রহণ করবেন? এ যেন আমি এক পরিচিত জগৎ থেকে এক অপরিচিত জগতের দিকে যাত্রা করছি।

প্রস্তুতি

নির্ধারিত দিনে কলেজ-ভবনের উন্নত প্রবেশ-দ্বার দিয়ে নতমস্তকে আমি প্রবেশ করলাম। এই সেই আমার সাধের, আমার আকাঙ্ক্ষার কলেজ-ভবন। মনে মনে তাকে নমস্কার জানিয়ে তার প্রশস্ত সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। পাশাপাশি অনেকে চলেছে। কিন্তু কোন চাপল্য নেই, নেই কোন বাচালতা। আমাদের সমস্ত চপলতা, সমস্ত বাচালতা—সব যেন আমরা আমাদের স্কুলের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ফেলে এসেছি। আজ সহসা আমরা যেন আমাদের বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করে যৌবনের ভাব-গম্ভীর প্রান্তরে পদার্পণ করেছি।

কলেজে প্রথম অনুভূতি

ঘণ্টা পড়ার পূর্বেই আমি আমাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। সঙ্গে একটি নোটবুক এবং একটি কলম। প্রথম ক্লাসটি ছিল বাংলার ক্লাস। কলেজের

জনৈক প্রখ্যাত অধ্যাপক ক্লাসটি নেবেন। আমি তাঁর অধ্যাপন-কুশলতা এবং উদাত্ত বাচনভঙ্গি সম্পর্কে আগে থেকেই অনেক শুনেছি। অদম্য কৌতূহল নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম বহুশ্রুত অধ্যাপক মহাশয়ের। তিনি এলেন। শুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবী-পরিহিত দীর্ঘকায় যুবক। প্রশস্ত ললাট। দ্যুতিময় সপ্রতিভ চোখ। মুখে স্মিত হাস্য। হাতে রেজিস্টার নিয়ে তিনি অধ্যাপন-মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন। আমরা আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালাম। তিনি তারপর রেজিস্টারটি খুলে আমাদের 'রোল-কল' করলেন। 'রোল-কলে'র পর তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ। যেমন উদাত্ত তাঁর কণ্ঠস্বর, তেমনি সুবিন্যস্ত তাঁর বাক্-সুষমা। সমস্ত শ্রেণী-কক্ষটি এক অপূর্ব বাক্-ঝংকারে যেন মুখরিত হয়ে উঠলো। তারপর তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির ভূমিকা হিসেবে শুরু করলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণটি। তাতে আমার সম্মুখে 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যেতে লাগলো। যৌবনের সেই প্রভাত-লগ্নে বলাকার যৌবনের জয়গান আমাকে প্রতিক্ষণে বিস্মিত, পুলকিত এবং রোমাঞ্চিত করেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর ভাষণের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রথম ক্লাস : বাংলা

দ্বিতীয় ক্লাসটি ছিল ইংরেজীর। একজন প্রৌঢ় অধ্যাপক ক্লাস-রেজিস্টার হাতে এলেন। তাঁরও পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। তিনিও 'রোল-কলে'র পর ইংরেজীতে আমাদের কিছু উপদেশ দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে আমাদের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জানিয়ে জন মেসফিল্ডের 'সী ফিভার' কবিতাটি পড়াতে শুরু করলেন। তাঁর অননুকরণীয় ইংরেজীর উচ্চারণ এবং ভাবগম্ভীর বাক্য-বিন্যাস সেদিন আমার মনে যে আশ্চর্য মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল, তা অবিস্মরণীয়। তিনি তাঁর অনবদ্য বাক্-ঝংকারে মেসফিল্ডের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর আলোচনা সাঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা পড়লো। তাঁর বক্তৃতা বন্ধ হলেও আমার মনের মধ্যে তাঁর বাক্-ঝংকার তখনও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয় ক্লাস : ইংরেজী

তৃতীয় ক্লাসটি ছিল অর্থনীতির। একজন প্যাণ্ট-শার্ট-পরিহিত তরুণ অধ্যাপক এলেন। হাতে ক্লাস-রেজিস্টার, চোখে-মুখে এক আশ্চর্য সপ্রতিভতা। অধ্যাপন-মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি 'রোল-কল' সমাপ্ত করলেন। তারপর সুললিত বাংলায় অর্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র সম্বন্ধে আমাদের সামনে রাখলেন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক কি এবং সেই সঙ্গে সমাজে অর্থনীতির গুরুত্ব কতখানি, সে বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করলেন, তা আমি কোনদিনই ভুলবো না। তাছাড়া, ইংরেজী ক্লাসের পর বাংলায় তাঁর ভাষণটি আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে বিশ্বের বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন পর্যন্ত সবই যে

তৃতীয় ক্লাস : অর্থনীতি

অর্থনীতির শাসনের পরিণাম-ফল, তা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। ফলে, একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর যেন অধিকারী হলাম আমরা।

তারপর সেদিনের মতো ছুটি। ছুটির পরেও স্কুলের চাপল্য এবং কোলাহল-মুখরতা নেই। আমাদের সমস্ত চাপল্য ও বাচালতাকে কে যেন একদিনেই স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমাদের চালচলনের মধ্যে এক আশ্চর্য গাম্ভীর্য। আমরা একদিনেই যেন এক ভাব-গম্ভীর সমুদ্রের মধ্যে সমাহিত হয়েছি। আমরা সবাই নিঃশব্দে শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন বাড়ী ফিরে এলাম ; মনে মনে কিছু বাংলা, ইংরেজী এবং অর্থনীতির বক্তৃতার ঝংকার বহন করে নিয়ে এসেছিলাম। বক্তৃতার স্মরণীয় অংশ-গুলিকে নোটবুকে 'নোট' করে নিতেও ভুলিনি। আর, সেদিন পেয়েছিলাম নতুন কয়েকজন বন্ধুর সহৃদয় বন্ধুত্ব। তাদের অমায়িক ব্যবহার এবং মধুর আলাপচারিতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণের ভাষণে এবং সহপাঠী বন্ধুদের কথাবার্তায় সেদিন একটি কথা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, আমি যা জানি, অতি অল্পই জানি ; এবং আমাকে আরো অনেক বেশী জানতে হবে। কিন্তু কলেজের নতুন পরিবেশ সম্বন্ধে যে ভীতি মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, তা সেদিন তিরোহিত হলো। কলেজের সঙ্গে একটা গভীর সম্পর্ক খুঁজে পেলাম আমি। বলাবাহুল্য, সেই সম্পর্ক মাধুর্যমণ্ডিত এবং প্রীতিপ্রদ।

বন্ধুলাভ

প্রথম দিনেই আমার কলেজ আমাকে আপন করে নিয়েছিল। তার এতদিনের রহস্য, বিদ্যার ভাণ্ডার, অধ্যাপকগণের স্নেহ ও শুভেচ্ছা এবং বন্ধুদের প্রীতি প্রথম দিনেই সে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। পরে কলেজের পরিবেশের সঙ্গে আমি আরো পরিচিত হয়েছি, অধ্যাপকগণের নিবিড় সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছি, সতীর্থদের বন্ধু-প্রীতি ও সহৃদয়তায় অভিষিক্ত হয়েছি ; কিন্তু প্রথম দিনের সেই আনন্দ, সেই মুগ্ধতা ও সেই বিস্ময়ের ঘোর আজও আমার কাটে নি। সেদিনটি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরকালের জন্যে সযত্নে সঞ্চিত হয়ে থাকবে ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- কলেজে প্রথম দিনের স্মৃতি
- কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। শিষ্টাচার আত্মীয়তা ও সামাজিকতার মধ্যে সেতু-স্বরূপ। সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার। স্পষ্টবাদিতা ও শিষ্টাচার। শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তি। চক্ষুলজ্জা ও শিষ্টাচার। শিষ্টাচারহীন বর্তমান সমাজ। কারণ ও প্রতিকার। উপসংহার।

৫০ শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

দেহের সৌন্দর্য অলংকার, কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। অলংকার বাহিরের সামগ্রী আর শিষ্টাচার অন্তরের এবং সৌজন্যবোধ হলো তার মার্জিততম প্রকাশ। মানুষ যতদিন অরণ্যচারী ছিল, ততদিন সে শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করে নি। যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হলো, তখন থেকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের প্রয়োজন অনুভূত হলো। শিষ্টাচার সমাজ-সরসীর শুভ্র সমুজ্জ্বল বিকশিত শতদল। তা শুধু আমাদের ব্যক্তি-জীবনের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের সমাজ-জীবনেরও গৌরবজনক আভরণ।

ভূমিকা

রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর মতে, 'ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।' এই পৃথিবীর কোন মানবসন্তানই স্বয়ম্ভূ নয়। সে একদিকে যুক্ত তার পরিবারের সঙ্গে, অন্যদিকে যুক্ত তার সমাজের সঙ্গে। উভয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, উভয়ের প্রতি তার কর্তব্যও তেমনি গভীর। তার এই দ্বৈত কর্তব্য-অনুষ্ঠানে তাকে একদিকে প্রীতিময় আত্মীয়তা ও অন্যদিকে সুমার্জিত সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়। ভদ্রতা বা সৌজন্যবোধ আত্মীয়তার মতো সুগভীর কিংবা সামাজিকতার মতো আনুষ্ঠানিক নয়।

শিষ্টাচার আত্মীয়তা ও সামাজিকতার মধ্যে সেতু-স্বরূপ

যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত মার্জিত, সদ্ভাবমূলক এবং সুরুচিব্যঞ্জক। সেই লোক-ব্যবহারকে কোথাও-কোথাও আন্তরিকতাহীন বাহ্যিক রীতিমাত্র বলে ভ্রম হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার জন্যে কতকগুলি সাধারণ সার্বজনীন নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হয়, যাকে বলা হয় রীতি। কিন্তু ভদ্রতা বাইরের আচরণীয় রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিঞ্চিৎ উদার। রীতি কেবল বাইরের অভ্যাস-মাত্র, যাতে অন্তরের স্পর্শ থাকে না। কিন্তু শিষ্টাচার, অপর পক্ষে, অন্তর-সমুদ্র-মন্থন-সঞ্জাত দুর্লভ অমৃত-ফল, অন্তরের বিকশিত কুসুম, হৃদয়ের অমূল্য সম্পদ।

সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার

আশৈশব আত্ম-সংযম ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির অনুশীলন-ফল হলো শিষ্টাচার। কাজেই, আত্যন্তিক স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে আছে শিষ্টাচারের মৌলিক গরমিল। 'অপ্রিয় সত্য' যতই শ্রদ্ধেয় হোক, আদরণীয় কিছুতেই নয়। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্র-প্রয়োগ সামাজিক শালীনতাবোধকে পীড়িত করে।

স্পষ্টবাদিতার মধ্যে প্রচুর চটক আছে, আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা। তার ফলে স্পষ্টবাদীদের কপালে সমসাময়িক প্রচুর হাততালি জোটে এবং তার প্রলোভনে অপ্রিয় রূঢ় ভাষণ সামাজিক শিষ্টাচারের গণ্ডী অনায়াসে অতিক্রম করে যায়।

স্পষ্টবাদিতা ও শিষ্টাচার

তথাকথিত স্পষ্টবাদীর দল লোকসমক্ষে নিজেদের অসাধারণরূপে জাহির করবার দুর্বার লোভ সংবরণ করতে না পেরে সামাজিক শিষ্টাচারকে পদদলিত করে এক-এক সময় অত্যন্ত রূঢ় ভাষণ করে বসেন। অথচ সেই সত্য বাক্যটিকে অপ্রিয়ভাবে না বলে মার্জিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারলে আত্মিক সমৃদ্ধি প্রকাশ পেত।

তবে কি ভদ্রতা ও খোসামুদি—শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তি এক? ভদ্রতা হলো সকল মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি, আর খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি নিবদ্ধ। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ নিজের অসুবিধা করে পরের সুবিধা করে দিতে উৎসুক। চাটুকার-বৃত্তি খোঁজে শুধু নিজের সুবিধা আর খোঁজে আত্ম-সুখ ও আত্মসমৃদ্ধি। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ সৌষ্ঠবমণ্ডিত, সরল ও সুন্দর। চাটুকার-বৃত্তি সৌষ্ঠবহীন, কুটিল ও কুৎসিত। শিষ্টাচারে আছে বিশ্বমুখীনতা, চাটুকার-বৃত্তিতে আছে আত্মমুখীনতা।

শিষ্টাচার ও চাটুকার-বৃত্তি

'চক্ষু-লজ্জা' নামে একটি দুরপনেয় সামাজিক উপসর্গ শিষ্টাচারের বেনামিতে লোক-সমাজে প্রচলিত আছে। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে মানুষ অসত্যকে সত্য বলে স্বীকার করে। তা একটি সামাজিক ব্যাধি, সন্দেহ নেই। শিষ্টাচারের সঙ্গে দৃঢ়তার সংমিশ্রণই এই ব্যাধির সঠিক চিকিৎসা। এদেশে অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ—এমন মানুষের এত অভাব কেন? কেন খাঁটি লোক-মাত্রই রুক্ষ-স্বভাব? কেন শিষ্ট, শান্ত ব্যক্তির ওপর চলে অকথ্য সামাজিক জুলুম? অর্থাৎ, আমাদের সমাজ এখনও শিষ্টাচার পুরোপুরি শিখে উঠতে পারে নি।

চক্ষু-লজ্জা ও শিষ্টাচার

অথচ শিষ্টাচার একটি অমূল্য সামাজিক অলংকার—সমাজের গর্বের এবং গৌরবের বস্তু। অর্থ কিংবা ঐশ্বর্য দিয়ে শিষ্টাচার ক্রয় করা যায় না। আমাদের সমাজে লক্ষ্মীর ক্রোড়ে পালিত এবং ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা শিষ্টাচারের ব্যাপারে নিঃস্ব এবং দরিদ্র। বাইরের অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য তাদের অন্তরের অমূল্য ঐশ্বর্যকে অপহরণ করে তাদের অন্তঃসারশূন্য, হৃদয়হীন পশুদের পর্যায়ে নিক্ষেপ করেছে। হৃদয়হীন মুদ্রারাক্ষস তাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য ও সুকুমার সুষমাগুলি শোষণ করে তাদের ছায়াহীন পত্রপুষ্প-সুগন্ধহীন মরুভূমিতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে, সমাজের দরিদ্রশ্রেণী দিনের পর দিন অর্থপতিদের কাছ থেকে চক্ষুলজ্জাহীন, নির্লজ্জ দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে বুঝে নিয়েছে যে, সমাজে শিষ্টাচারের কোন স্থান নেই, শিষ্টাচার দুর্বলের ভীরুতার নিরুপায় প্রকাশ মাত্র। মানুষকে অপমান এবং মানুষের আত্মাকে নির্যাতনই বুঝি আজ আভিজাত্যের নির্ভুল বৈশিষ্ট্য। দুর্বাক্য, দুর্ব্যবহার ও

শিষ্টাচারহীন বর্তমান সমাজ

দুর্মুখতাই বুঝি আজ সমাজের উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহণের নিশ্চিত সোপান। তাই তো আজ সামাজিক দুর্ব্যবহারের মাত্রা ক্রমবর্ধমান। মানুষ মাত্রই আজ উদ্ধত। তাদের আচরণ, চলন-বলন, আলাপ-আলোচনা সবই আজ অমার্জিত। সদ্ব্যবহার, সুশোভন আচরণমাত্রই আজ মানুষের দুর্বলতা বলে উপহসিত। আজ কোথায় গেল তাদের শিষ্টাচার? কোথায় গেল মানুষের চিৎ-প্রকর্ষের দীর্ঘ-অনুশীলিত সৌজন্যবোধ? বিংশ শতাব্দীর বেলাশেষে এসে মানুষ যে অন্তরে-বাইরে এতখানি নিঃস্ব এবং দেউলে হয়ে যাবে, তা আগে কে জানতো?

বস্তুতঃ, সমাজের নানা সমস্যাবৃদ্ধির ফলে আজ মানুষের মূল্যবোধগুলির ভিত ধসে গেছে। নতুন কোন মূল্যবোধের ভিত তৈরী হয়নি। অন্যদিকে, সামাজিক অসাম্য, ন্যায়বিচারের অভাব এবং অর্থপতিদের হৃদয়হীন ঔদ্ধত্য ও অশোভনীয়তা মানুষকে অশিষ্ট ও উদ্ধত করে তুলেছে। বাইরের এই ঔদ্ধত্য হৃদয়ের অন্তঃসারশূন্যতারই পরিচয়বাহী। সমাজকে এই অমার্জিত শিষ্টাচারহীনতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে গৃহে, স্কুল-কলেজগুলিতে এবং নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ শিক্ষাদানের প্রয়াস-সূচিত হওয়া উচিত।

কারণ ও প্রতিকার

আসল কথা হলো, দৈনিক কর্মজীবন-যাত্রায় সংসার-চক্রের অনিবার্য ঘর্ষণে আমাদের জীবনের চারদিকে যে শ্বাসরোধকারী ধূলিজাল উত্থিত হতে থাকে, শিষ্টাচারের স্নিগ্ধ শান্তিবারি-সিঞ্চনেই তা নিবারিত হতে পারে। তাতে এই দুঃখ-দ্বন্দ্বময় পৃথিবী হয়ে ওঠে মানুষের বাসযোগ্য। শিষ্টাচার ধূলি-ম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে কোমলতা দান করে দৈনিক জীবন-যাত্রাকে শ্রীশোভা-মণ্ডিত করে তোলে। তাই ঋষি-কবি কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন—"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"—যা ভদ্র, যা কল্যাণ, তাইই, হে ঈশ্বর, আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- শিষ্টাচার
- সমাজে সৌজন্যবোধের মূল্য
- ভদ্রতা
- সৌজন্যবোধ

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা ॥ বৃহতের সংস্পর্শে নবজন্ম লাভ ॥ মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র ॥ জীবন-চরিত স্পর্শমণি-স্বরূপ ॥ তা দিক্-দর্শন-যন্ত্র-স্বরূপ। জীবন-চরিত নির্বাচন ॥ উপসংহার ॥

৫৬ জীবন-চরিত পাঠ

'আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার সাফল্য হয়—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে সে ভালো হয়।'

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

এই পৃথিবীর ধূলি-মালিন্যময় সাধারণ মানুষ আমরা। ক্ষুদ্র সংসারের সীমা, এমনকি, নিজেদের ব্যক্তি-সীমাও আমরা অতিক্রম করতে পারি না। কাজেই, অসাধারণত্বের ঐশ্বর্য বলতে আমাদের কিছুই নেই। সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব। কিন্তু মানব-সমাজে যাঁরা অসাধারণ কিংবা অনন্যসাধারণ, যাঁদের মধ্যে আমরা দেখেছি মনুষ্যত্বের অপার বিস্ময়, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। হৃদয়ের ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে, আমরা তাঁদের উদ্দেশ্যে রচনা করি অর্ঘ্য-ডালা। মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের অন্তরে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য-ডালা রচনার প্রেরণা জাগায়। তাই আমরা পাঠ করি তাঁদের অমূল্য জীবন-চরিত এবং হৃদয়কে তদনুসারে বিকশিত করে তোলার প্রেরণা পাই।

জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা

আমরা যে জীবন-চরিত পাঠ করি, তাতে মহাপুরুষগণের কল্যাণ হয় না, কল্যাণ হয় আমাদেরই। যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, তাঁরা ইতিহাসের পাতায় তাঁদের মহানুভবতা ও জাগতিক কল্যাণ-ব্রতের অম্লান স্বাক্ষর রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু পশ্চাতে রেখে গিয়েছেন অক্ষয় কীর্তির নানা উজ্জ্বল কাহিনী। আমরা সেই সব কাহিনী পাঠ করে তাঁদের মহান্ কীর্তির স্পর্শে অভিষিক্ত হই, ধন্য হই। তাঁদের পবিত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে আমাদের মানসিক উৎকর্ষ ঘটে, আমাদের চিত্ত-শতদল বিকশিত হয়।

বৃহতের, মহতের সংস্পর্শে নবজন্ম লাভ

কাজেই, আমাদের জড়, ধূলি-মালিন্যপূর্ণ, তামসিকতাময় জীবনের উদ্বোধনের জন্যে মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত পাঠ একান্তভাবে আবশ্যিক। পৃথিবীর অতি সাধারণ মানুষ আমরা। সহস্র ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা নিয়ে এই ধূলিময় পৃথিবীতে আমরা আমাদের দুঃখসুখের ঘর বাঁধি। সংকীর্ণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ-গ্লানিময় আমাদের দৈনন্দিন জীবন। সহস্র ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে আমাদের প্রাণ। মহাপুরুষগণের উদার, বিশ্বমুখী জীবনের সংস্পর্শে এসে উদ্বোধন হয় আমাদের তমসাচ্ছন্ন চেতনার। আমরা আমাদের স্বার্থমগ্নতার সীমা-বেষ্টনী থেকে তাঁদের হাত ধরে মানবতার আলোকিত

উদার উন্মুক্ত জীবনে বাহির হয়ে পড়ি। বৃহতের, মহতের সংস্পর্শে আমরা যেন নবজন্ম লাভ করি।

মৃত্যু-জয়ের মন্ত্র

যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানে 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু।' আছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আছে সুতীব্র সংগ্রাম। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীতে দুরন্ত দুঃশাসনের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে আমরা অশ্রু-মোচন করি, মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মৃত্যু বরণ করি। তখন মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের সম্মুখে এঁকে দেয় আলোকিত পথ-রেখা, আমাদের প্রাণে ঢেলে দেয় দুঃখ-জয়ের অমৃত-বাণী। তা মৃত্যু-জয়ের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাদের যথার্থ মানুষ করে, রক্ষা করে অনিবার্য নৈরাশ্যের হাত থেকে। তাঁরা যেভাবে দুঃখ-সংকটের সঙ্গে সংগ্রাম করে অবশেষে জয়লাভ করেছেন, তা আমাদের দেয় সংকট-উত্তরণের প্রেরণা।

জীবন-চরিত স্পর্শমণি-স্বরূপ

স্পর্শমণি আমরা দেখিনি ; তা কাব্য-কথিত বস্তু। কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের কাছে প্রকৃত স্পর্শমণি। তার স্পর্শে আমাদের হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা তিরোহিত হয়ে মহান্ আদর্শের বীজ উপ্ত হয়। অচিরে সেই আদর্শ মহীরুহের রূপ ধারণ করে এবং আমাদের জীবনকে তদনুযায়ী রচনা করে। ইতিহাসে সেই হৃদয়-সংশোধন বা চিত্ত-শুদ্ধির আছে অনেক দৃষ্টান্ত। ভগবান বুদ্ধের জীবনী ও বাণী কিরূপে চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত করে, তা নিশ্চয়ই কাল্পনিক সত্য নয়। বিধাতা-পুরুষ সকল মানুষকে একটা স্বাভাবিক উচ্চতা দান করেন। কিন্তু এই পৃথিবীর কতিপয় মানুষ লাভ করেন স্বাভাবিকতার অধিক উচ্চতা—চতুর্দিকের দীনতা, হীন-মন্যতার ক্ষুদ্র ওষধিপুঞ্জের মধ্যে তাঁরা বৃহৎ বনস্পতির মতো অসামান্যতার ঊর্ধ্বগগন স্পর্শ করেন। আমরা সামান্য মানুষ, তাঁদের মহৎ ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াই—আশ্রয় খুঁজি। মানুষের দেবত্ব দেখে বিস্মিত হই।

জীবন-চরিত নির্বাচন

বর্তমান পৃথিবীতে জীবন-চরিত অনেকেরই রচিত হয়। কিন্তু সকল জীবন-চরিতের প্রয়োজন নেই। যে জীবন-চরিত আমাদের দুঃখজয়ের প্রেরণা দেয় না, যে জীবন-চরিত আমাদের মহতের মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত করে না, যে জীবন-চরিত আমাদের মানবতার বৃহত্তর আকাশে উত্তীর্ণ করে দেয় না বা জীবনের সঠিক পথ-নির্দেশ করে না, সেরূপ জীবন-চরিত পাঠের সার্থকতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'যে নাচে তাহার জীবন-চরিত, যে গান করে তাহার জীবন-চরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবন-চরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে তাহারই জীবন-চরিত। কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবন-চরিত সার্থক ; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য।' আসলে, মানুষের জন্যে যিনি জীবন দান করে গেছেন, তাঁর জীবনই গ্রন্থের পাতায় ধরে রাখা প্রয়োজন। মানুষের সেবায়, মানুষের মহত্তর মুক্তির জন্যে যিনি সভ্যতার বেদীমূলে

জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁরই জীবন-চরিত রচিত হবার যোগ্য, তাঁর জীবন-চরিতই যুগ যুগ ধরে পঠিত হবার যোগ্য। বর্তমান কালে জীবন-চরিতের ভিড়ে প্রকৃত মহাপুরুষের জীবন-চরিতের নির্বাচন এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অপদেবতাদের ভিড়ে প্রকৃত কল্যাণময় দেবতা গেছেন হারিয়ে। কিন্তু যাঁরা মানব-সভ্যতার আলোকস্তম্ভ, যাঁরা সভ্যতার সোনার তরীর জ্যোতির্ময় কাণ্ডারী, তাঁদের চিনে নিতে আমাদের যেন ভুল না হয়।

এই পৃথিবীর 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'র দুঃখ-বেদনাপূর্ণ ঘূর্ণাবর্তে অনেক সময় আমরা দিশাহারা হয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ি। প্রকৃত পথের ঠিকানা খুঁজে পাই না। চারদিকের অন্ধকারের প্রাচীরে-প্রাচীরে তখন আমরা মাথা কুটে মরি। জীবন-চরিতে বর্ণিত মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী আমাদের দেয় সঠিক পথ-নির্দেশ। এই উত্তাল তরঙ্গ-সংকুল জীবন-সমুদ্রে আমরা দিশাহারা পথিক। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত আমাদের কাছে দিক্-দর্শন যন্ত্র-স্বরূপ।—আমাদের পার্থিব জীবনের চির-উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ। তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে জীবনকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করে আমরা কৃতার্থ হই।

তা দিক্-দর্শন যন্ত্র-স্বরূপ

মানুষমাত্রই অমৃতের পুত্র। তার ললাটে অমৃতের জয়টিকা। কিন্তু ধূলিধূসরিত পার্থিব জীবনের নানা কুটিল চক্রান্তে মানুষ তার সেই সত্য পরিচয় বিস্মৃত হয়ে যাপন করে কদর্যতার কালিমালিপ্ত জীবন। বাইরে সে যতই অন্ধতামসিকতায় মগ্ন হোক, তার আত্মা অমৃতের পিয়াসী। মহাপুরুষগণের জীবন তাকে দেয় সেই অমৃতলোকের ঠিকানা। বর্তমান কালের পৃথিবী অন্ধ-তমসামগ্ন, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা-স্বার্থপরতার ক্লেদ-কলঙ্কে পঙ্কিল। চতুর্দিকে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং দুর্নীতির অট্টহাসি—সর্বদা মানবতার বিরুদ্ধে চলেছে কুটিল চক্রান্ত। আজ মানুষের চিত্ত-শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন পাপ-পঙ্কিল হৃদয়ের যথার্থ সংশোধন। আজ কে মানুষকে এই নিবিড়ঘন অন্ধকারে পথ দেখাবে? কে তাকে দেবে প্রকৃত পথের ঠিকানা?…কে তাকে এই বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্যের মধ্যে শোনাবে উজ্জ্বল আশার বাণী। আজ মহাপুরুষগণের জীবন-চরিতই আমাদের একমাত্র ভরসা। তাই-ই আধুনিক পৃথিবীর প্রকৃত মুক্তি-বেদ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- জীবন-চরিত পাঠের মূল্য
- জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা, মা. '৬৯
- কেন আমরা জীবন-চরিত পাঠ করি
- মহাপুরুষগণ ও আমরা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ইতিহাস কাকে বলে ॥ 'শব হতে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়' ॥ ইতিহাসের উপজীব্য বিষয় ॥ ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা ॥ ইতিহাস-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ॥ উপসংহার ॥

৫২ ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা

ইতিহাস কি জীবিত?···ইতিহাস কি কথা বলে? সাধারণ মানুষের ধারণা, ইতিহাস মৃত, ইতিহাস মূক, ইতিহাস কোন কথা বলে না। কিন্তু তা সত্য নয়; ইতিহাস কথা বলে, ইতিহাস মুখর। ইতিহাস হলো মানব-সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির জীবন্ত কাহিনী। যুগ-যুগান্তরের কত ঘটনাপুঞ্জের সে নীরব সাক্ষী। কত 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য় মানব-সভ্যতা যুগ থেকে যুগান্তর-পানে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ইতিহাসেই শোনা যায় মানব-সভ্যতার সেই রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি। মানব-সভ্যতার সেই পেছনে-ফেলে-আসা কাহিনীগুলিকে সবাই বিস্মৃত হয়; কিন্তু বিস্মৃতির সেই অন্ধকারে ইতিহাসই জ্বালিয়ে রাখে জাতিস্মরের অনির্বাণ প্রদীপ-শিখা। সেই প্রদীপ-শিখার বিচ্ছুরিত আলোকে দেখা যায় অতীতের মুখ; চেনা যায় বর্তমানের স্বরূপ, পাওয়া যায় ভবিষ্যতের নির্ভুল পথযাত্রার ইংগিত।

ভূমিকা

ইতিহাস অতীতের নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়। তা কেবল রাজা-মহারাজাদের জন্ম-মৃত্যু ও বংশ-লতিকার স্তূপীকৃত বিবরণ নয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়, দিগ্বিজয়ী বীরের সাম্রাজ্য-বিস্তারের কাহিনীও নয় কিংবা রাষ্ট্র-শাসন-ব্যবস্থার সীমিত বিবৃতিও নয়; ইতিহাস হলো চলমান মানব-সভ্যতার ক্রমাভিব্যক্তির সামগ্রিক বাণী-বিগ্রহ। কাজেই, তা কেবল রাজ্য-ভাঙ্গাগড়ার রোমহর্ষক কাহিনী নয়, মানুষের সমাজের বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ নয়, অতীতের পরিকীর্ণ কংকালস্তূপও নয়; তা সমগ্র মানব-সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক চলচ্চিত্র। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে পৃথিবী-পৃষ্ঠে মানব-জাতির আবির্ভাব-কাল থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কিরূপে সে তার সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সংগঠিত করেছে, ইতিহাস তার ক্রমাভিব্যক্তি। বিস্মৃত সেই সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই গতি-রেখার প্রসার। আবার সেই গতি-রেখা ভবিষ্যতের যে পথনির্দেশ দেয়, তাও তো ইতিহাসের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। কাজেই, ইতিহাস কেবল সাল-তারিখ-কণ্টকিত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন কাহিনীর অবিন্যস্ত তথ্যপুঞ্জ নয়; তা মানুষের সামগ্রিক পরিচয়-বাহী অম্লান দর্পণ; মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্রান্ত প্রতিবেদন।

ইতিহাস কাকে বলে?

ইতিহাস সভ্যতার মর্মবাণীর মহান্ প্রবক্তা। সভ্যতার অবিভাজ্য ধারাবাহিকতার মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা। মানুষ ক্রমক্রমে তাকে স্থান দিয়েছে

অতীতের ধূসর যাদুঘরে। কিন্তু ইতিহাস মৃতের নীরব কবরখানা নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে প্রসারিত তার উজ্জ্বল স্বর্ণসূত্র। যা কিছু মৃত, যা কিছু অর্থহীন এবং যা কিছু জঞ্জাল, ইতিহাস তাকে পরিহার করে ; ইতিহাস-দেবতার স্বর্ণ-তরণীতে তার স্থান নেই। কিন্তু যা কিছু মহৎ, সুন্দর এবং শাশ্বত, ইতিহাস তাকে সযত্নে গ্রহণ করে। সভ্যতার ঘাটে ঘাটে জঞ্জালের বোঝা নামাতে নামাতে সেই তরণীর অগ্রগতি। 'সেই পণ্য অগণিত মানুষের শব। শব হতে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়।'

'শব হতে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়'

জন-জীবনের কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস। জনসমষ্টির জাতি-গঠন, জাতির অভ্যুদয়, বিকাশ ও বিশেষ পরিণামমুখী অগ্রগতি নিয়েই রচিত হয় জাতির ইতিহাস। মানুষের পরিবার, সমাজ ও জাতি-গঠনের ধারাবিধৃত কাহিনীকেই ইতিহাস তার পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। পার্থিব সুখ-সুবিধা ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের জন্যে সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে মানুষের চেষ্টার আর বিরাম নেই। তারই জন্যে সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠন, তারই জন্যে মানুষের জীবনপাত পরিশ্রম। সে কথা মানুষ বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তা কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। আজ মানুষ সে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তা যে একদিনেই সম্ভব হয়নি, তা অর্জন করবার জন্যে মানুষকে যুগ যুগ ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে, কত দুঃখ-নির্যাতন মাথা পেতে সহ্য করতে হয়েছে, কত অমূল্য প্রাণ বলি দিতে হয়েছে, তা আজ আর মানুষের মনে নেই, মনে থাকবার কথাও নয়। কিন্তু ইতিহাস মানুষকে সেই সব গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ভুলতে দেয় না। বিস্মরণের উপকূলে মানব-সভ্যতার মূল্যবান স্মৃতির আলোকসৌধই তো ইতিহাস-দেবতার মন্দির।

ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়

ইতিহাস তাই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কারিগর। ইতিহাস আছে বলেই তো ইতিহাস-পাঠের মাধ্যমে মানুষ অতীতের সভ্যতার উত্থান-পতন ও নানা রূপ-রূপান্তরের পরিচয় লাভ করে ভবিষ্যতের নির্ভুল পথে পদচারণা করতে পারে। ইতিহাস না থাকলে মানুষকে আবার সভ্যতার সূচনা-লগ্ন থেকে জীবন শুরু করতে হতো এবং তার ফলে সভ্যতার এই চরম সমুন্নতি কখনই সম্ভব হতো না। ইতিহাসই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার অমূল্য উত্তরাধিকারের কথা। এইভাবে ইতিহাস রচনা করে দেয় জাতীয় সংহতির সুদৃঢ় পথ। কাজেই, ইতিহাস কেবল জ্ঞান-ভাণ্ডারই নয়, তা মানুষ ও জাতি-গঠনের সুযোগ্য শিক্ষকও বটে। তার কাছে শাসক পাবে সুশাসনের নির্দেশ, ধনিক পাবে অর্থের সদ্ব্যবহারের ইংগিত, জ্ঞানী পাবে অভ্রান্ত জ্ঞানচর্চার সংকেত এবং সাধারণ মানুষ পাবে মানুষের মত বাঁচবার উপায়।

ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা

সুতরাং ইতিহাস-রচনা একটি অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এতে প্রতি পদক্ষেপে ঐতিহাসিকের পদস্খলন সম্ভাবনা। সত্যের ছদ্মবেশে মিথ্যার ভণ্ডামি বহু ক্ষেত্রে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ফলে, ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাঁর পক্ষে ভ্রান্ত

কাহিনী রচনা করে বসা সম্ভব। তাই ঐতিহাসিকের ওপর দায়িত্ব অসীম। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও অর্থ-ব্যবস্থার রূপ-রূপান্তরের সকল বিশ্লেষণই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটি কথা ঐতিহাসিককে স্মরণ রাখতে হবে। পার্থিব সুখ ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ যেমন গণ-জীবনের লক্ষ্য, তেমনি সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক রূপ-রূপান্তরের চালক-শক্তি হলো অর্থনীতি। অর্থনৈতিক কারণেই জাতির পরাধীনতা ও তার দাসত্ব-মোচন, অর্থনৈতিক কারণেই সাম্রাজ্য-বিস্তার ও শত শত সাম্রাজ্যের বিলয়। ইতিহাস সেইভাবে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে রচিত হওয়া উচিত। প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন ইতিহাস রচিত হয় নি। টোডরমলের ইতিহাস ছিল মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। এত বড় একটি জাতি ;—অথচ তার কোন লিখিত ইতিহাস নেই ; সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীবৃন্দের পরিতাপের সীমা ছিল না। জাতীয় দুর্গতি-মোচনের জন্যে তাই তাঁরা ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বাগ্রে উচ্চারণ করেছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা যেমন পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট, তেমনি বিভ্রান্তিপূর্ণ। অথচ ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ ভারতের মৃত্তিকায়, ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। সুখের কথা, বর্তমানে অল্পবিস্তর বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচিত হচ্ছে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের হাতেই।

ইতিহাস-রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

জন্মলগ্ন থেকেই 'যুগ-যুগ-ধাবিত' মানব-যাত্রীদল সুন্দরতর জীবনের স্বপ্ন দেখেছে এবং তাকে সফলতা দান করবার জন্যে করেছে কত বিচিত্র আয়োজন। ইতিহাস তার ধারাবাহিক বিবৃতি। ইতিহাসের কাছেই আমরা লাভ করি সেই সুন্দরতর জীবনের দীক্ষা। সুন্দরতর জীবন লাভের জন্যে সে বর্তমানের গতি-পরিবর্তনের মুখে জেলে ধরে উজ্জ্বল মশাল। সেই পরিশুদ্ধ মশালের আলোকে আমরা ভবিষ্যতের অন্ধকারেও সঠিক পথটি চিনে নিতে পারি। কারণ, ইতিহাস কখনও ব্যর্থ নয়, ইতিহাস কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারে না॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ইতিহাস-পাঠের সার্থকতা
- ইতিহাস ও আমরা
- ইতিহাসের শিক্ষা
- ইতিহাস-পাঠ ও জাতীয় সংহতি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ চলাই জীবনের মর্মবাণী ॥ জানার আগ্রহ ও দেশভ্রমণ ॥ শিক্ষার অঙ্গ-রূপে দেশভ্রমণ ॥ তীর্থ-ভ্রমণের মতো হৃদয়ের প্রসারতা লাভ ॥ রক্তের নেশা : নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কার ॥ দেশভ্রমণ-ব্যবস্থার উন্নতি ॥ পারস্পরিক বোঝাপড়া : জাতীয় সংহতি ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ ॥ উপসংহার ॥

৫৩ দেশভ্রমণ

মা. '৭১, '৭০

'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি।'

—জীবনানন্দ দাশ

মানুষের রক্তে আছে ভ্রমণের নেশা। তাই স্বভাবতঃই সে ভ্রমণ-বিলাসী। বিপুলা এই পৃথিবী। বিশাল তার আয়োজন। কত বৈচিত্র্যময় দেশ-দেশান্তর,—কত নদী-নির্ঝর, কত গিরি-পর্বত, অরণ্য-কান্তার সৌন্দর্যের অপরূপ ডালি সাজিয়ে পৃথিবীর বুক জুড়ে আছে। তার কতটুকুই-বা আমাদের জানার সৌভাগ্য হয়? চারদিকে সবই অজানা, সবই অচেনা। আমাদের নিত্যকার পরিচিত পৃথিবীর বাইরে অপরিচয়ের দুস্তর মহাসমুদ্র। সেই মহাসমুদ্রের অদৃশ্য তরঙ্গ প্রতিনিয়ত আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই অজানা, অচেনা বিপুলা পৃথিবীকে জানবার জন্যে আমাদের অসীম আগ্রহ, অনন্ত উৎকণ্ঠা। তাই দুর্নিবার আকর্ষণে পরিচিত পৃথিবীর রুদ্ধ দুয়ার খুলে আমরা বের হয়ে পড়ি অজানার সন্ধানে।

ভূমিকা

'দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

তাই সমুদ্র-নদী-পর্বত-মরু-উপবন-শোভিত এই বিশাল বিপুল বিশ্ব আমাদের অন্তরকে প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বিশ্বের এই বিশাল আয়োজনের সঙ্গে রয়েছে আমাদের অন্তরের একটি নিগূঢ় যোগসূত্র। 'চরৈবেতি চরৈবেতি' —চলো, চলো, চলো—সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো চলো, পাখির গানের মতো চলো, প্রভাতের আলোর মতো চলো। আমাদের অন্তরাত্মার মর্মবাণীই তো তাই। কত অজ্ঞাত দেশ-দেশান্তর, কত বিচিত্র মানব-সমাজ, তাদের কত বিচিত্র জীবনধারা—কিছুই আমাদের দেখা হলো না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কত অফুরন্ত পসরা নিয়ে কত ভূখণ্ড অধীর আগ্রহে আমাদের আগমনের প্রতীক্ষারত। তার আকর্ষণে আমরা গৃহ-প্রাচীরের আবেষ্টনী-মুক্ত হয়ে সুদূরের অনন্ত আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে মহাবিশ্বের মুক্তাঙ্গনে ছুটে চলি।

চলাই জীবনের মর্মবাণী

এইভাবে আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব নব রূপায়তনের

মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রত্যক্ষ এবং অবারিত সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা সুদূরের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ লাভ করে অন্তরে অনুভব করি অপার আনন্দ। এই আনন্দ দেশভ্রমণের পরম অবদান। যারা দিগ্বিজয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, সেই শক্তিমদমত্ত হতভাগ্যের দল এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

জানার আগ্রহ ও দেশভ্রমণ

আমরা স্কুল-কলেজে ভূগোল-ইতিহাস পাঠ করি। কিন্তু পৃথিবী মানে তো আর মানচিত্রের কতগুলি মৃত রেখা নয়, দেশ মানেও নয় ভূগোলের নিষ্প্রাণ বিবৃতি। পৃথিবী বহু মানুষের কলরব-মুখরিত সজীব-সুন্দর বিচিত্র বিস্ময় এবং দেশ রক্তমাংসের মানুষের হাসি-কান্নার সংমিশ্রিত শ্যামল-শোভন প্রাণোচ্ছল ভূখণ্ড। তাই কেবল ইতিহাস ও ভূগোল পাঠই জ্ঞানলাভের পরিপূর্ণতা আনতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন দেশভ্রমণ। ইতিহাস-ভূগোলের বাইরে অবাধ উন্মুক্ত আকাশের নীচে জীবন্ত দেশটি দেখে তার অধিবাসীদের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করে তাদের জীবনধারা সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

শিক্ষার অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ

মানুষ দিনের পর দিন তার বাসগৃহের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্দী থেকে হাঁপিয়ে ওঠে। সে সেই চার দেয়ালের স্বরচিত কারাগার থেকে খোঁজে মুক্তি। মানুষ বৃহতের সন্তান। সে বৃহতের মধ্যে দেখতে চায় নিজেকে। অনেকের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে খোঁজার জন্যে তার অনন্ত আকুতি। ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির অবারিত সান্নিধ্যে স্থাপিত তীর্থস্থানগুলির পাদপীঠতলে দাঁড়িয়ে তার মুগ্ধ হৃদয় ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যের দিকে দিকে, বহু মানবের পবিত্র স্পর্শ লাভ করে ঘটে তার নবজন্ম। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের তীর্থভ্রমণের রহস্য এইখানেই।

তীর্থ-ভ্রমণের মতো হৃদয়ের প্রসারতা লাভ

ভ্রমণের নেশাই গতির নেশা। এই গতির নেশা যার রক্তে দোলা দিয়েছে, তার কাছে গৃহ-বন্দী জীবনের সুখ মিথ্যা, রুটিন-বাঁধা জীবনাচরণ মিথ্যা। যাঁরা স্মরণীয় পরিব্রাজক, তাঁরা এই গতির নেশায় জীবনকে তুচ্ছ করে অজানিতের পথে পাড়ি দিয়ে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করে দেশ-দেশান্তরে ছুটে গিয়েছেন। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, ইবন্ বতুতা, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় লাভের জন্যে দূর অজানা বন্ধুর পথে জীবনকে বাজি রেখে দুর্বার পাড়ি দিয়েছিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস, লিভিংস্টোন, ক্যাপ্টেন কুক, মার্কো পোলো প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত পর্যটকগণের দুঃসাহসিক পর্যটনের ফলে আজ পৃথিবীর বহু দুর্গম দেশ-দেশান্তর মানুষের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁদের দুর্বার দেশ-পর্যটন ও আবিষ্কার-যাত্রার ফলে পৃথিবীর কত নামহীন গিরি-নদী, কত অজানা অরণ্য-জনপদ, কত বালুকাময় মরুভূমি ও কত তুষারাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশ আবিষ্কৃত হয়ে আজ মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

গতির নেশা : নামহীন গিরি-নদী আবিষ্কার

অতীতকালে দেশভ্রমণ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে পথ ও পরিবহণের নানা সুবিধার ফলে দেশভ্রমণ সহজসাধ্য হয়েছে। দেশ-দেশান্তরে রেলপথ বিস্তৃত হয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে বিশালকায় সেতু। রেল, মোটর, এরোপ্লেন ইত্যাদি প্রচলনের ফলে পথের বাধা-বিপত্তি প্রায় উধাও। ভ্রমণ-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে এখন দেশে দেশে 'ট্যুরিস্ট ব্যুরো' স্থাপিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ, পথের বর্ণনা, মানচিত্র ইত্যাদি প্রকাশ করে ভ্রমণার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করা হয়।

দেশভ্রমণ-ব্যবস্থার উন্নতি

বর্তমান কালে দেশভ্রমণ শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত। দেশ-দেশান্তরের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানকার নর-নারীদের জীবনাচরণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ দেশভ্রমণের মাধ্যমেই সম্ভব। আনন্দলাভই দেশভ্রমণের একমাত্র ফলশ্রুতি নয়; মনের প্রসারতা, হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও সেই সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে অখণ্ড সংহতি-সৃষ্টিও দেশভ্রমণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফল। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত জ্ঞানলাভও দেশভ্রমণের পরোক্ষ ফল। অন্যদিকে, ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে একটা ভাবমূলক সংহতি গড়ে উঠে, তা জাতীয় সংহতির পক্ষে, মানবিক সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পারস্পরিক বোঝা-পড়া: জাতীয় সংহতি ও সৌভ্রাত্রবোধের উন্মেষ

সারা পৃথিবীতেই দেশভ্রমণের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। রাষ্ট্রসংঘও দেশভ্রমণকে 'বিশ্বশান্তির ছাড়পত্র' অভিহিত করে বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাই আজ পৃথিবীর দেশে দেশে লক্ষ-কোটি ভ্রমণ-বিলাসীর দল ঘর ছেড়ে বাহির হয়ে পড়েছে। অজানিতের পথে পাড়ি দেবার জন্যে সুদূর বিশ্ব আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে; 'উত্তর-মেরু মোরে ডাকে, ভাই, দক্ষিণ-মেরু টানে।' সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে সংকীর্ণ গৃহকোণ ছেড়ে আমরা অনন্ত বিশ্বে বাহির হয়ে পড়ি—অক্লান্ত পথিক॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- দেশভ্রমণের উপকারিতা, মা. '৬১, '৬৩
- শিক্ষার অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ
- দেশভ্রমণের শিক্ষাগত মূল্য

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ী সিদ্ধান্ত ॥ দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবসানের প্রাচীন ও আধুনিক রীতি ॥ বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান ॥ বিতর্ক-সভার নিয়মানুসরণ ॥ ভাব-প্রবণতার নিয়ন্ত্রণ ॥ সত্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা ॥ বিতর্ক-সভার উপকারিতা ॥ উপসংহার ॥

৫৪
বিতর্ক-সভা

অনুধাবন-শক্তির অভাবে অথবা উপলব্ধির দুর্বলতায় মানুষকে কখনো কখনো বাস করতে হয় কত ভুলের স্বর্গলোকে। দৃষ্টিশক্তির সংকীর্ণতা এবং অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্যে সে আপন অন্তরালে রচনা করে এক নির্বোধের স্বর্গরাজ্য। এইভাবে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন মনে সে একটি স্বরচিত জগৎ সৃষ্টি করে সেখানে যাপন করে নির্বাসিত জীবন। কিন্তু সত্যের স্বরূপ বড় কঠিন এবং তার পথও ক্ষুরধার-নিশিত, দুর্গম। তাই মানুষ সত্যের নামে মনের কোণে সাজায় বসে কত দুর্জয় ভ্রান্তি-বিলাস। সারা জীবন সেই ভ্রান্তিরই করে উপাসনা। জগতে তাই বিষয়-বৈচিত্র্যের মতো আছে সহস্র রকমের মত-বৈচিত্র্য। মতবাদে-মতবাদে কত বিভিন্নতা, চিন্তাধারায়-চিন্তাধারায় কত অসীম পার্থক্য! দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সেই বিভিন্নতার প্রকাশ। জগতের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে আছে তাই অনন্ত ভ্রান্তি-বিলাস, ভ্রান্তির অন্ধকারময় একনিষ্ঠ উপাসনা।

ভূমিকা

মানুষকে তাই মাঝে মাঝে তার ভুলের দুর্গ থেকে বাহির হয়ে আসতে হয়, তাকে স্বীয় মতবাদের পাষাণ-প্রাচীরের বাইরে এসে অন্যের মতবাদের যুক্তি-তর্কের ঘর্ষণে স্বীয় মতবাদের মূল্য নিরূপণ করতে হয়, তার সত্যতা যাচাই করতে হয়। এইরূপে পৃথিবীর বহু অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করা যায় এবং বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটি সমন্বয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু সেই বাদ-প্রতিবাদকে মনের মধ্যে সন্তর্পণে পুষে রাখলে চলে না। তাদের বাইরে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকাশ্যে যুক্তি-তর্কের আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের মূল্য বিচার করতে হবে। বিতর্ক-সভা সেই প্রক্রিয়ারই অনুশীলনী-সভা।

বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ী সিদ্ধান্ত

বর্তমানে মানব-সভ্যতা তার প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। মানব-মনে সভ্যতার আলো বহু পূর্বেই প্রবেশাধিকার পেয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন অসভ্য বর্বর ছিল, তখন সকল মত-পার্থক্যের অবসান হতো রক্ত-পিচ্ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে। প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত মত-পার্থক্য অবসানের সেই বর্বর-রীতি সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মনোবৃত্তি অবলুপ্ত হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি। ভুল-বোঝাবুঝির ফলে এখনো সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে আছে। কিন্তু যুক্তি-তর্কের পথে আলাপ-আলোচনার মধ্যস্থতায় যখন সেই

দ্বন্দ্ব-সংঘাত অবসানের প্রাচীন ও আধুনিক রীতি

অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করা চলে, তখন সেই রক্ত-পিচ্ছিল বর্বর-রীতি অনুসরণের সার্থকতা কি?

বর্তমানে স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে তাই বিতর্ক-সভার আয়োজন করা হয়। অন্যান্য সভার মতো এরও একজন সভাপতি থাকেন, আর থাকেন বিচারকমণ্ডলী। বিতর্কের বিষয় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে। অংশ-গ্রহণকারীদের তার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যোগদান করতে হয়। সপক্ষ দলের এবং বিপক্ষে দলের দলপতিই বিতর্কের সূচনা করে। তারপর উভয় পক্ষের অংশগ্রহণকারীদের তর্ক-বিতর্কের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে চলে বিতর্কের ঢেউ; সর্বশেষে উভয় পক্ষের দলপতিরা বিতর্কের করে উপসংহার। বিচারক-মণ্ডলীর রায়ই এ বিষয়ে চূড়ান্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রোতাদের মতামতও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান

বিতর্ক-সভায় বক্তৃতার কতকগুলি অবশ্য-পালনীয় নিয়ম আছে, সেগুলি অনুসরণীয়। বক্তব্যটিকে যুক্তনিষ্ঠ উপায়ে পরিবেশন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারা চাই। অতি-সংক্ষিপ্ত ভাষণ যেমন ঠিক নয়, অতি-বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রও তেমনি বিতর্ক-সভা নয়। তাছাড়া, ক্রোধ প্রকাশ বা কটূক্তি বর্ষণ বা ব্যক্তিগত আক্রমণ অবৈধ। অর্থাৎ, বিতর্ক-সভায় অংশ-গ্রহণকারীরা যাতে শ্রোতা ও বিচারকমণ্ডলীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অন্যদিকে, সচেতন থাকতে হবে—বিতর্ক-সভার ধারানুসরণে যেন মার্জিত রুচির পরিচয় মুদ্রিত থাকে।

বিতর্ক-সভার নিয়মানুসরণ

মানুষ মূলতঃ ভাবপ্রবণ। এই ভাবপ্রবণতাই মানুষের বহু ভ্রান্তিবিলাসের মূল। তার ফলে, মানুষের সমাজ লাভ করেছে বহু রক্তক্ষয়ী সংঘাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে হলো যুক্তিবাদের সূর্যোদয়। মানুষ ধীরে ধীরে যুক্তির আলোকে তার ভাবপ্রবণ মতবাদগুলিই যাচাই করতে শিখলো। এইভাবে পৃথিবীতে হলো যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাবপ্রবণতার হাত থেকে মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি নেই। তাই যে ভাবপ্রবণতা সমাজের পক্ষে, মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, তার নিয়ন্ত্রণের জন্যে যুক্তিবাদের আমন্ত্রণ প্রয়োজন। সেজন্যে বিতর্ক-সভা সমাজে অত্যন্ত আবশ্যিক। বিতর্ক-সভার মধ্যস্থতায় মানুষের অকল্যাণকর ভাবপ্রবণতা যুক্তিবাদের কঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হলে সমাজে শুভফল ফলাবে।

ভাবপ্রবণতার নিয়ন্ত্রণ

মানুষ তার যুগ-যুগান্তরের সাধনার দ্বারা সমাজে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক কালে মানুষের চিন্তাশক্তির বিস্ময়কর বিকাশের পেছনে আছে মানুষের বহু শতাব্দীর সাধনা। সেই চিন্তাশক্তি দিয়ে সে আজ নিজের এবং বিশ্বের ভাবধারা, চিন্তাধারা এবং কর্মধারার নির্মম বিচারক। সুসভ্য সমাজে এই কারণেই বিতর্ক-

সভার প্রবর্তন। বিশ্বের নানা ভাবধারা, চিন্তাধারা ও কর্মধারার যাথার্থ্য নিরূপণের জন্যে বিতর্ক-সভার কষ্টিপাথর প্রয়োজন। এখানে নানা বাদ-প্রতিবাদের যুক্তিতর্কের ঘর্ষণে যা সত্য, যা শাশ্বত এবং যা কল্যাণকর, তা প্রতিষ্ঠিত হয়; আর যা মিথ্যা, মেকী এবং অকল্যাণকর, তা নিন্দিত, ধিক্কৃত এবং পরিত্যক্ত হয়। বিতর্ক-সভা তাই সভ্য সমাজের একটি অপরিহার্য কল্যাণকর অনুষ্ঠান। এখানে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বহু-বিতর্কিত বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান হয়ে একটি সুনিশ্চিন্ত পথনির্দেশ অঙ্কিত হয়ে যায়। অভ্রান্ত সেই পথরেখা এবং সেই পথেই মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ক্রমমুক্তি সম্ভব।

সত্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা

বিতর্ক-সভার মাধ্যমে অংশ-গ্রহণকারীদের বাক্-পটুতা, যুক্তিনিষ্ঠতা এবং আলাপ-আচরণের মার্জিত রুচির বিকাশ হয়; বিতর্ক-সভাগুলিতে আগামীকালের সুদক্ষ রাজনীতিক, উকিল-শিক্ষক-অধ্যাপকের মতো বাক্য-ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ মেলে। এতে যেমন অংশগ্রহণকারীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়, তেমনি তাদের উপস্থিত-বুদ্ধি প্রাখর্য লাভ করে। কখনো গুরু-গম্ভীর, কখনো পরিহাস-তরল বাচনভঙ্গি এর দ্বারা আয়ত্ত হয়। এর মধ্যস্থতায় মানুষের বাক্-বিভূতির যেমন সমৃদ্ধি ঘটে, তেমনি তার বাগ্মিতারও ঘটে শুভ উদ্বোধন। সেই সঙ্গে বিতর্ক-সভার মাধ্যমে পৃথিবীতে বহু ভুলের স্বর্গ যায় ভেঙে এবং বহু অপ্রীতিকর বিবাদ-বিসম্বাদ ও বহু অবাঞ্ছিত রক্তক্ষয়ের অবসান ঘটে। দেশে দেশে আজ যে গণতন্ত্রের বিজয়-অভিযান সূচিত হয়েছে, তাতে পার্লামেণ্ট বা বিধান সভায় বিতর্কের দ্বারা সমাধানের প্রয়োজনে প্রকৃত পথ-সন্ধানের জন্যে রয়েছে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

বিতর্ক-সভার উপকারিতা

এই গণতন্ত্রের যুগে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কিন্তু সেই মতামত যুক্তিসঙ্গত এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া চাই। বিপক্ষীয় যুক্তির কষ্টিপাথরে নিজের বিশ্বাসের সত্যকে যাচাই করে নিতে না পারলে সত্যের পূর্ণ মূল্যায়ন হয় না। তার ফলে অনিবার্যরূপে এসে পড়ে ভ্রান্তি-বিলাস। সেই ভ্রান্তি-বিলাসের ফলে মানুষের দুর্গতির অন্ত থাকে না; তার জীবনে ঘনিয়ে আসে এক চরম সর্বনাশ। একচক্ষু হরিণের মতো মানুষ চলে ভ্রান্তি-বিলসিত পথে এবং তা হয় মৃত্যুরই নামান্তর। বিতর্ক-সভা পারস্পরিক বোঝাপড়ার তীর্থক্ষেত্র, সত্যের মূল্যায়নের যথার্থ বিচারালয়॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিতর্ক-সভায় যোগদানের উপকারিতা
- বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা
- একটি বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ নাগরিক জীবনের বিকাশ ॥ নগর ও নগরের প্রাণ-প্রবাহ ॥ নাগরিক জীবনের ক্রমপরিণাম ॥ শহরবাসের সুশিক্ষা ॥ শহরবাসের কুশিক্ষা ॥ উপসংহার ॥

৫৫ শহরবাসের সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা

ক. প্রা. '৬২

ভূমিকা

সভ্যতার প্রভাত-লগ্নে মানুষ যেদিন তার গিরিগুহা ও অরণ্যবাস পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত আকাশের নীচে স্নেহশালিনী নদীর সান্নিধ্যে রচনা করলো ছোট ছোট গ্রাম, সেদিনই তার সভ্যতার নবতর অধ্যায়ের সূচনা। ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ জনপদ বিস্তৃত হয়ে ধারণ করলো রাজ্যের রূপ। তখন জনগোষ্ঠী বা সমাজের দলপতি হলেন রাজা। এবার বন্যাপ্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার খাতিরে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান-নির্বাচনের প্রয়োজন অনুভূত হলো। তখন স্বভাবতঃই পাহাড়ের ওপরে নিরাপদ স্থানই রাজধানীর উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। এইভাবে মানুষের ইতিহাসে হলো নগরের উদ্ভব। 'নগ' অর্থাৎ পাহাড়; 'নগর' অর্থাৎ পাহাড়ের উপরিস্থ নিরাপদ স্থান।

নাগরিক জীবনের বিকাশ

নগরে রাজা এবং রাজপুরুষদের বাস। সেই সঙ্গে প্রতিরক্ষার দুর্গ এবং রাজ্য-প্রশাসন বিভাগের স্থান হলো সেখানে। তখন সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ও তাদের ধন-প্রাণ-রক্ষার খাতিরে এবং নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দুর্বার আকর্ষণে হলো নগরবাসী। রাজ-সান্নিধ্যে বা দুর্গের সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে দস্যু-লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণ থেকে ধনসম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হতো; প্রাণও হতো সুরক্ষিত। তাই ধনপ্রাণের নিরাপত্তার জরুরী প্রয়োজনে এবং ভোগ-বিলাসের দুর্নিবার আকর্ষণে তারা নগরবাসকেই শ্রেয় মনে করেছিল। এভাবেই নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি।

নগর ও নগরের প্রাণ-প্রবাহ

কেবল ধনপ্রাণের নিরাপত্তা-বিধানের খাতিরেই নয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নাগরিক জীবনের জলুস্ ও চাকচিক্য অভিজাত-সম্প্রদায়কে নগরবাসে আকৃষ্ট করে। সেই থেকে গ্রামীণ জীবন অর্থাৎ প্রকৃতির কোলে দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবন এবং নাগরিক জীবন অর্থাৎ সুখ ও বিলাসিতাময় জীবন—এই কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি। কিন্তু নাগরিক জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জলুসের চূড়ায় স্থাপিত হলেও তার রসদ, তার প্রাণ-প্রবাহ আসে নিম্নের সমভূমিতে স্থাপিত, অবহেলিত গ্রামগুলি থেকে। আবহমান কাল থেকে গ্রামগুলিই শহরের খাদ্যদ্রব্য এবং নানা ভোগসামগ্রী সরবরাহ করে তার স্বাস্থ্য এবং শ্রীবৃদ্ধি করে আসছে।

বর্তমানকালে গ্রাম মানে প্রকৃতির শ্যামল পরিবেশে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ছোট ছোট কুটিরের সারি, সন্নিহিত কৃষি-জমি, খামার এবং শিক্ষাহীন বিশাল জনপদ; এবং শহর

মানে কৃত্রিম পরিবেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অট্টালিকা, রাজপথ, যানবাহন, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-অফিস-কাছারি এবং উন্নত জীবন-ধারায় অভ্যস্ত জনসমষ্টি। শহরে রাজা কিংবা রাজপুরুষদের বাস; ধনাঢ্য বণিক-শ্রেণী কিংবা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীও শহরবাসী। কাজেই, কেবল রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-যন্ত্রই নয়, আর্থিক দুনিয়ার রজততন্ত্রও শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত। যন্ত্র-সভ্যতার বিকাশের পর সেখানে স্থাপিত হলো কলকারখানা। এলো বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, এলো উন্নত যানবাহন, এলো উন্নত জীবন-ধারা। ফলে, শহরের বিলাসী জীবন আরো বিলাসী হয়ে উঠলো, বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার তাকে চালিত করলো তৃপ্তিহীন প্রাণহীন ভোগসর্বস্বতার দিকে।

নাগরিক জীবনের ক্রমপরিণাম

তাই নগরের আকর্ষণ প্রবল। মানুষকে সে তার বাইরের জলুস্ ও চাকচিক্যের প্রলোভনে টানে এবং অবিচ্ছেদ্য এক নির্মম আকর্ষণে বাঁধে। তবু শহরবাসের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সুশিক্ষা আছে: এক. নাগরিক জীবন বিজ্ঞানসম্মত, সুসভ্য, পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন শিক্ষা দেয়। দুই. শহরে বিভিন্ন বিষয়ে এবং উচ্চতর বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ অনেক। তিন. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের বহু মানুষের সমাগমে এখানে জাতীয় সংহতি-চেতনা ও বিশ্বাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে। চার. বিশ্বজীবনের প্রভাবে এখানে রক্ষণশীলতার অবসানে সামাজিক কুসংস্কারগুলির বিলোপ ঘটে। পাঁচ. পোশাক-পরিচ্ছদে, খাদ্য-তালিকায়, চলনবলনে ঘটে তার অনিবার্য প্রতিফলন। ছয়. ফলে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দ্রুত সম্ভব হয়। সাত. শহুরে জীবন মানুষের জড়তা ও আলস্য দূর করে তাকে ক্ষিপ্র ও কর্মমুখী করে তোলে। আট. নাগরিক জীবন নিত্য-নতুনত্বের প্রয়াসী। তাই তার নিত্য-নতুন অভাববোধের তাগিদে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দ্বার খুলে যায়। নয়. নতুন নতুন ভাবধারা ও চিন্তাধারার বিকাশে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয় এখানেই। দশ. এসব কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতাগুলির উদ্ভব নগরের কোলেই সম্ভব হয়েছে।

শহরবাসের সুশিক্ষা

এসব হলো শহরের আলোকিত দিক। অন্য দিগন্তে আছে অনেক অন্ধকার, অনেক কুশিক্ষা। সেগুলি হলো: এক. নাগরিক জীবন কৃত্রিম; তার জলুস্ ও চাকচিক্য বেশী হওয়ায় মানুষকে অন্তঃসারশূন্য করে ভিতরে-ভিতরে সম্পূর্ণ দেউলে করে তোলে। দুই. বিলাস এবং ভোগসর্বস্বতার ফলে মানুষ তার মানবিক গুণাবলী বিস্মৃত হয়ে বড়ো বেশী বহির্মুখী হয়ে পড়ে। তিন. শহরে বৈচিত্র্য এবং নানা বিষয়ের আকর্ষণ এত বেশী যে, তাতে মানুষের মানসিক একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এবং প্রায়ই চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটে। চার. শহরের কৃত্রিম পরিবেশে জীবন তার স্বাভাবিক বিকাশ হারিয়ে ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। পাঁচ. কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে সেই জীবন ক্রমশঃ দুঃসহ ও গতানুগতিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ছয়. শহুরে মানুষ মুদ্রা-রাক্ষসের ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করে ক্রমাগত অর্থান্বেষী ও বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে। সাত. এইভাবে মানুষের জন্মগত সুকুমার বৃত্তিগুলির

শহরবাসের কুশিক্ষা

কণ্ঠরোধ করে নাগরিক সভ্যতা মনুষ্যত্বের অকালমৃত্যু ডেকে এনেছে। আট. অন্যদিকে নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা ও ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আপাতমধুর আমোদ-প্রমোদে মানুষ লিপ্ত হয়। নয়. এইভাবে রুচি-বিকৃতি তাকে গ্রাস করে এবং তাতে মানুষের ঘটে নৈতিক অধঃপতন। দশ. আধুনিক ব্যয়বহুল জীবনের মাশুল যোগাতে গিয়ে মানুষকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে লিপ্ত হতে হয় এবং নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এগারো. শহরের জনবাহুল্য, কলকারখানা ইত্যাদি দ্বারা জলহাওয়ার দূষণের ফলে নানা জটিল ও সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে মানুষকে অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে হয়।

দিনে দিনে শহরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বাহ্যিক জলুস, তার গগনচুম্বী অট্টালিকাশ্রেণীর অহংকার ও বিলাসিতা ক্রমশঃ যায় সীমা ছাড়িয়ে; তার প্রাচীরে-প্রাচীরে, ইটে-ইটে লিখিত হয় নাগরিক পচন, বিকৃতি ও নৈতিক অধঃপতনের কালিমালিপ্ত, কুৎসিত ইতিহাস। অন্যদিকে, শ্যামল শান্তির নীড় গ্রামগুলি শহরের হাতে তার যথাসর্বস্ব তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত, লক্ষ্মীশ্রীহীন মরুভূমিতে পরিণত হয়। এইভাবে দেশের মধ্যে সমতা ও সংগতির সূত্র ছিন্ন হয়ে যে ভার-সাম্যহীন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়, তার পরিণাম মানুষের পক্ষে কখনই শুভ হতে পারে না। শহরগুলি এইভাবে দেশের প্রাণরস শোষণ করে দিনের পর দিন স্ফীতকায় হয়ে ওঠে।

উপসংহার

সেগুলি যতই স্ফীতকায় হয়ে ওঠে, তাদের বিকৃতি এবং পচনও ধারণ করে ততই ভয়াবহ রূপ। শেষে সেই বিকৃতি ও পচন শহরের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র দেশকেই বিকৃতির নরককুণ্ডে পরিণত করে। কবি তাই নাগরিক সভ্যতাকে চরম ধিক্কার জানিয়ে উচ্চারণ করেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' কারণ, শহর জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধগুলিকে হত্যা করে মানুষকে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করে তোলে। প্রগতিশীলতার নামে সে ডেকে আনে জীবনের সর্বনাশ। তাই আজ গ্রাম ও শহরের মধ্যে চাই একটি সুষম ও স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য, চাই সৌভ্রাত্র ও সম্প্রীতির একটি বাঞ্ছিত সম্পর্ক। নইলে 'দিবে আর নিবে'-র যোগবন্ধন ছিন্ন হয়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যে গড়ে উঠবে তিক্ততা ও বিদ্বেষের প্রাচীর; যার ফলে নাগরিক বিকৃতি ও নানা পচন গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে সেখানে মানবিকতার মড়ক ডেকে আনবে॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- শহরবাসের সুপ্রভাব ও কুপ্রভাব
- বর্তমান নাগরিক জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা. ক. প্রা. '৬২
- সাম্প্রতিক কালের রুচি-বিকৃতি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ভারতে পল্লী ও নগরের বিকাশ। গ্রাম-ভারতের গঠন-বৈশিষ্ট্য ॥ গ্রাম-ভারতের ভাঙনের চিত্র ॥ ভাঙনের পরিণতি ॥ গ্রাম ও নগরের সংঘাত ॥ গ্রাম ও নগরের ব্যবধান অপসারণ ॥ উপসংহার ॥

৫৬ গ্রাম বনাম শহর

গ্রামে-গাঁথা ভারতের অবস্থা-দৈন্যের কথা আজ সর্বজনবিদিত। অথচ এককালে সুস্থ সাবলীল গ্রামই ছিল ভারতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার মূল উৎস। যাযাবর আর্যজাতির মানুষেরা তাদের যাযাবর-জীবনের চলমানতায় ছুটতে ছুটতে এসে একদা ভারতবর্ষের মৃত্তিকা স্পর্শ করলো। এখানে তারা রচনা করলো 'ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।' সমাপ্তি ঘটলো তাদের যাযাবর-জীবনের। বিশ্বের সমস্ত দেশের গ্রাম-রচনার ইতিহাস মূলতঃ তাই। সেদিন দেশ-দেশান্তরে সঞ্চরণ-ক্লান্ত ছিন্নবাধা যাযাবর-সম্প্রদায় যে সুন্দর, সাবলীল, বলিষ্ঠ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল, গ্রামই হলো তার সহজ পরিণতি।

ভূমিকা

ঈশ্বরের হাতে রচিত হয়েছিল প্রথম ভুবন। মানুষের হাতে তারপর রচিত হলো গ্রাম ; তা দ্বিতীয় ভুবন। সুসভ্য মানুষ রচনা করলো নগর—তা হলো তৃতীয় ভুবন। আজ ভারতে এই উগ্র নাগরিকতার তপ্ত নিঃশ্বাসে আবহমানকালের আনন্দ-মুখরিত, শ্যামল, সুন্দর পল্লী-জীবনে ঘনিয়ে এসেছে চরম বিপর্যয়। নগর তার শুষ্ক মরু-রসনা বুলিয়ে গ্রামগুলির প্রাণরস শোষণ করে তাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। পল্লী-জীবনের সেই ভয়াবহ অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় কেউ কেউ ছুটে এসেছে আলো-ঝলমল নগরের দিকে। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার আশি-শতাংশ এখনও বাস করে গ্রামে। কাজেই, সেখানে বৈষয়িক উন্নয়নের কাজ অবিলম্বে শুরু না করলে গ্রামে-গাঁথা ভারতের সৌষ্ঠব ও সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

ভারতে পল্লী ও নগরের বিকাশ

জোত-জমি, ক্ষেত-খামার এবং সংলগ্ন পতিত জমি নিয়েই গঠিত ভারতের পল্লীভূমি। কেন্দ্রস্থলে মাটির দেয়াল ও খড়ের চাল দিয়ে তৈরী ছোট ছোট কুটির এবং খামার বাড়ি। তার সান্নিধ্যে তরঙ্গ বিস্তার করে বয়ে যেত স্নেহশালিনী নদী। সে কেবল তার কলতানে পল্লীর শ্যামল বক্ষ সংগীত-মুখরিত করে তুলতো না, জল দান করে জনপদ ও শস্য-প্রান্তরের তৃষ্ণাও দূর করতো। সেদিন সেই প্রাণোচ্ছল গ্রামগুলিতে বাস করতো বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ। প্রাচীন পল্লী-ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল তার অফুরন্ত প্রাচুর্য ও স্বনির্ভরতা।

গ্রাম-ভারতের গঠন-বৈশিষ্ট্য

ভারতে পাশ্চাত্য জাতিগুলির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের 'ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি'র ছিল সুখ, ছিল শান্তি, ছিল স্বাস্থ্য, ছিল শ্রী, ছিল প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। তারপর এলো পরস্বাপহারী সাম্রাজ্যবাদীর দল। তারা শাসনতান্ত্রিক কারণে, বাণিজ্যবিস্তারে এবং যন্ত্র-দানবের উগ্র অহংকারে পাশ্চাত্যের ধাঁচে গড়ে তুললো শহর, বন্দর ও গঞ্জ। সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের পঞ্চবটী-ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলিকে ধ্বংস করলো। এক নিরবচ্ছিন্ন জনস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হতে লাগলো লুণ্ঠিত-সর্বস্ব গ্রামগুলি থেকে চাকচিক্যময় শহরের অভিমুখে। অফুরন্ত প্রাণ-নির্ঝর পল্লী-ভারতের হৃৎস্পন্দন স্তিমিত হয়ে এলো, ভেঙে পড়তে লাগলো তার সনাতন শান্তিনিকেতন।

গ্রাম-ভারতের ভাঙনের চিত্র

উৎসব-আনন্দে নিত্য-মুখরিত তার সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে উঠলো তার পথঘাট, আর সেই দিগন্ত-শায়ী শ্যামল শস্য-প্রান্তর, যা একদিন সোনার ফসলের অফুরন্ত প্রাচুর্যের সংবাদ বহন করে আনতো এবং রচনা করে দিত সমগ্র ভারতের অর্থনীতির সমৃদ্ধ বনিয়াদ, তা বন্ধ্যা, পতিত, অনাবাদী হয়ে ম্লানমুখে পড়ে রইলো। কোথায় গেল তার সেই অফুরন্ত কৃষি-সম্পদ? কোথায় গেল তার সেই কুটির-শিল্প? কোথায় গেল তার সেই সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা? বিগতশ্রী পল্লীর ঘরে ঘরে নেমে এলো দারিদ্র্যের হাহাকার। অনশন, অর্ধাশন স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার সূচীভেদ্য অন্ধকার হলো তার নিত্য-সহচর। পঞ্চবটীছায়াচ্ছন্ন গ্রাম প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত মধুময় শান্তিনিকেতন; ইট-কাঠ-পাথরময় শহর মানুষের রচিত দ্বন্দ্ব-কোলাহলময় কঠিন প্রয়াস। জনৈক ইংরেজ কবি তাই বলেছিলেনঃ গ্রাম ঈশ্বরের সৃষ্টি, শহর মানুষের। আকর্ষণের তুলাদণ্ডে বিজয়মাল্য শহরেরই প্রাপ্য। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার প্রয়োগে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে এখন গ্রামের লোক বলতে হতভাগ্য, নিরক্ষর 'চাষা' এবং শহরের লোক বলতে সভ্যতাভিমানী 'বাবু'—এই কৃত্রিম মনুষ্যত্ব-বিরোধী ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি। পল্লীর প্রাণরসে উজ্জীবিত শহরগুলি আজ কৃত্রিমতাহীন, সহজ, সরল পল্লীগুলিকে করে নির্লজ্জ ঘৃণা। কিন্তু গ্রামীণ কৃষি-নির্ভর জীবনের প্রতি এই ঘৃণা ও অবহেলার বিষময় পরিণামে শহরবাসীদের জীবনে একদিন ঘনিয়ে আসবে চরম দুর্দিন। কারণ প্রকৃতির শান্তিনিকেতন গ্রামকে হত্যা করে তার প্রাণরসে বিলাসী স্বার্থপর নগর বেশীদিন বাঁচতে পারে না।

ভাঙনের পরিণতি

নাগরিক জীবনে আকর্ষণের জলুস্ বেশী; চাকচিক্য বেশী। শহরে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন অফুরন্ত। সিনেমা, থিয়েটার, ক্লাব, লাইব্রেরী, যানবাহন, বিদ্যুৎ-বিলাস এবং সর্বোপরি অট্টালিকাময় শহরের জলুসময় আকর্ষণ মারীচ-মায়ায় মানুষকে প্রতিনিয়ত করে আকৃষ্ট। কিন্তু লৌহ-লোষ্ট্র-কাষ্ঠ-প্রস্তরময় নগরের পাষাণ-কায়ার অভ্যন্তরে ইটের 'পরে ইট দিয়ে মাঝে মানুষ-কীট বাস করে। এখানে প্রাণ

কোথায়? এখানে মানুষ মানুষ নয়, যান্ত্রিকতার শাসনে যন্ত্রমাত্র; এখানে মানুষের নেই মানবিক মূল্য, কেবল সংখ্যা-মূল্যই ললাট-লিপি। মানুষের মনুষ্যত্বকে লুণ্ঠন করে যন্ত্র-সর্বস্ব নাগরিক সভ্যতা তাকে পশুত্বের পর্যায়ে এনেছে নামিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ নাগরিক জীবনের এই মরুময় শুষ্কতার প্রতি প্রবল ধিক্কার-বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক জলুস্ নয়, চাই প্রাণোচ্ছল গ্রামীণ জীবন, স্বস্তি ও প্রসন্নতার শান্তিনিকেতন।

গ্রাম ও নগরের সংঘাত

কিন্তু নগরকে ধ্বংস করে এই বিজ্ঞান-নির্ভর যুগে আর গ্রামে গিয়ে বাস করা যায় না। সভ্যতার গতিকে পশ্চাদভিমুখীন্ করা যায় না। তবে গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যে পার্থক্য, গ্রামীণ জীবন ও নাগরিক জীবনের মধ্যে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, তা দূর করা যায় গ্রামগুলির সুষ্ঠু উন্নয়নের মাধ্যমে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনে সঞ্চারিত হবে নতুন শ্রী, নতুন সৌন্দর্য। কেবল শহরে আলো জ্বাললে চলবে না, অন্ধকার গ্রামগুলিতেও আজ আলো জ্বালতে হবে—সভ্যতার আলো। সেখানে আজ 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।'

গ্রাম ও নগরের ব্যবধান অপসারণ

তার জন্যে ভারতে স্বাধীনতালাভের পর এক বিরাট কর্মযজ্ঞের অবতারণা করা হয়েছে। গ্রামকে লুণ্ঠন করে দিকে দিকে যে অসংখ্য শহর স্ফীত হয়ে উঠেছে, আজ সেই লুণ্ঠিত গ্রামগুলিকে তার সকল সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ ভারতের গ্রাম-দেবতা আবার জেগেছেন। এতদিন তাকে অবহেলা করে আমরা যে পাপ করেছি, আজ আমাদের তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী একদিন তাঁর 'India of My Dreams' গ্রন্থে এক সহজ, সচ্ছল, বলিষ্ঠ গ্রাম-ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজ তাঁর সেই স্বপ্নের মহাভারত রচনার কাজ শুরু হয়েছে। মহাভারতের মহানির্মাণ-যজ্ঞশালার বিপুল কর্মোন্মাদনায় আজ ঘুম ভেঙেছে আসমুদ্র-হিমাচলের, ঘুম ভেঙেছে ভারতের সুপ্তিমগ্ন পঞ্চান্ন লক্ষ গ্রামের। ভারতের দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সফল হোক, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে স্থাপিত হোক একটি বহু-বাঞ্ছিত কল্যাণপ্রদ ভারসাম্য ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- পল্লী-জীবন ও নাগরিক জীবন
- গ্রাম ও শহর
- পল্লী-জীবন ও শহর-জীবন

৫৭ পরীক্ষায় গণ-টোকাটুকি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও টোকাটুকি ॥ টোকাটুকির শাস্তির নিষ্ফলতা ॥ গণ-টোকাটুকির কারণ ॥ ফলাফল ॥ উপসংহার ॥

ভূমিকা

গণ-টোকাটুকি একটি সম্মিলিত সামাজিক অপরাধ। সাম্প্রতিক সামাজিক অবক্ষয় ও পচনের বিকৃত রূপ আজ স্পর্শ করেছে আমাদের শিক্ষা-মন্দিরকে, আমাদের পরীক্ষা-মন্দিরকে—এক কথায়, আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে। বিগত কয়েক বছরে সে সর্বব্যাপী অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতায় আমাদের সমাজের নাভিশ্বাস উঠেছিল, আমাদের শিক্ষা-মন্দির ও পরীক্ষা-মন্দিরগুলি তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। বরং সামাজিক অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রথম ও প্রধান শিকার হয়েছিল আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা। গণ-টোকাটুকি হলো তার নির্লজ্জ অভিব্যক্তি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানে তার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হলেও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও টোকাটুকি

পরীক্ষায় টোকাটুকি ছাত্রদের মধ্যে একটি সাধারণ অপরাধ। এই অপরাধের বিরুদ্ধে পরীক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাবধান-বাণী উচ্চারিত থাকে। সেই নিষেধ অমান্য করে যারা অপরাধ করে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে। প্রত্যেক ছাত্রই তার নিজস্ব মেধা, প্রতিভা এবং বোধশক্তির পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে এবং তদনুযায়ী পুরস্কৃত হবে—এটাই কাম্য। পরীক্ষায় কৃতিত্বের বিচারে যারা উত্তীর্ণ হবে, তারা তাদের মানানুযায়ী সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পাবে। পরীক্ষা-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই তাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, গত কয়েক বছর পরীক্ষায় ছাত্রদের কৃতিত্ব বিচারের এই ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পরীক্ষা-মন্দিরে ছাত্ররা পরস্পরের প্রতিযোগী না হয়ে সহযোগী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বই দেখে কিংবা বাড়ী থেকে লিখে-আনা উত্তর কিংবা পরীক্ষা-মন্দিরের বাইরে থেকে প্রেরিত উত্তর পরীক্ষার উত্তর-পত্রে টুকে দিয়ে কৃতিত্ব জাহির করে পুরস্কার দাবি করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিসের কৃতিত্বের পরীক্ষা হবে? ছাত্রদের নিজস্ব মেধা, প্রতিভা এবং বোধশক্তির? কিংবা, তাদের দুর্নীতির?

স্বভাবতঃই, পর্ষৎ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা-মন্দিরে যে-কোন দুর্নীতি অবলম্বনের অপরাধের দণ্ডদানের অধিকারী। কিন্তু কার বিরুদ্ধে দণ্ডদান? যেখানে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়, সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে শাস্তি দিয়ে শাস্তির মান রক্ষা হলেও তাতে পরীক্ষার মান রক্ষিত হয় না। এবং তাই হয়েছে। পরীক্ষায় থাকে সবই—প্রশ্নপত্র,

উত্তরপত্র, ছাত্র, শিক্ষক, পরীক্ষক, পরীক্ষা-নিয়ামক ; কিন্তু থাকে না শুধু বিদ্যা। প্রকৃত-পক্ষে, সারা দেশ থেকে যেন গত ক'বছর বিদ্যা বিদায় নিয়েছিল। পরীক্ষা-কর্তৃপক্ষের সমস্ত পরীক্ষাগুলিই বাতিল ঘোষণা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। কারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রেতনৃত্যের তাণ্ডব ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। অথচ তাকে শোধন করে সেখানে সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টির জন্যে কর্তৃপক্ষের ছিলনা কোন আন্তরিক প্রয়াস, বিদ্যাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সূচিত হয়নি কোন সফল আয়োজন। ফলে, পরীক্ষা পরিণত হয়েছিল যেমন প্রহসনে, পরীক্ষার প্রমাণ-পত্র তেমনি পরিণত হয়েছিল মূল্যহীন চোথা কাগজে।

টোকাটুকির শাস্তির নিষ্ফলতা

কিন্তু কেন এমন হলো ? প্রথমতঃ, তীব্র বেকার-সমস্যা ছাত্রদের সামনে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা কোন আশার আলো তুলে ধরতে পারে নি। দেশের শিল্প-বাণিজ্য-জগতে বাণিজ্য-মন্দা, শ্রমিক-অশান্তি ইত্যাদি কারণে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে তালা দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, সরকারও বিভিন্ন সরকারী বিভাগে লোক-নিয়োগ বন্ধ রাখেন। এইভাবে ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্তমান যেখানে প্রতিশ্রুতিহীন, সেখানে বিদ্যা-শিক্ষা ছাত্রদের কাছে অর্থহীন মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই কারণে পরীক্ষা ব্যাপারটা তাদের কাছে মনে হয়েছে একটা ব্যয়বহুল স্থূল রসিকতা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, দেশের ছিন্নমস্তা রাজনীতির সর্ব-গ্রাস। গত ক'বছর রাজনীতির সর্বগ্রাস শিক্ষাক্ষেত্রের যে সর্বনাশ সাধন করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার আর দ্বিতীয় নজীর নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার, নীতিগত এবং আদর্শগত যতই পার্থক্য থাকুক, অতি-রক্ষণশীল এবং অতি-প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলভুক্ত ছাত্রবাহিনী পরীক্ষায় নকল করার ব্যাপারে কিন্তু একমত ; সেখানে তাদের ঐকমত্য বিস্ময়কর। তৃতীয়তঃ, চিরাচরিত পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতা। বলাবাহুল্য, আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ উচ্ছিষ্ট একটি বহু-নিন্দিত ব্যবস্থা। স্বভাবতঃই, স্বাধীন দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে তার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলা অসম্ভব।

গণ-টোকাটুকির কারণ

কিন্তু তাই বলে স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়েদের পক্ষে পরীক্ষায় নকল করা কি যুক্তিযুক্ত ? কোন দেশের স্বাধীনতা এই সর্বনাশ সমর্থন করতে পারে না। ফলে, গত ক'বছরে যারা পাস করেছে, তাদের সাফল্যের প্রমাণপত্রকে সরকারী বা বে-সরকারী ক্ষেত্রে কোথাও কোন মূল্য দেওয়া হচ্ছে না। নতুন পরীক্ষা দিয়ে সে সব ক্ষেত্রে প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করতে হচ্ছে। পরীক্ষা ও পরীক্ষায় সাফল্যের প্রমাণপত্রের এই মূল্যহ্রাসের [Devaluation of Certificates] কারিগর যেমন ছাত্ররা, তার ফলভাগীও তারাই। শিক্ষা-সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত ওঠে, তাতে জাতির নতুন করে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় ; তার পরিণামে দিকে দিকে সাফল্য ও কৃতিত্বের জোয়ার ডাকে। দেশের এই বহু-নিন্দিত শিক্ষা-ব্যবস্থা তা যতই ভর্ৎসিত ও সমালোচিত হোক, তাইই তোদেশকে এতদিন বহু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীকে

ফলাফল

উপহার দিয়েছে। সে যাই হোক, আজ শিক্ষা-সমুদ্র মন্থন করে যে বিষ উঠেছে, আজ তা ছাত্র-সমাজকেই আকণ্ঠ পান করতে হচ্ছে। তাই আজ এক দুঃসহ মড়কের মতো অকালমৃত্যুর তাণ্ডব চলেছে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষক-অধ্যাপক, ছাত্র-অভিভাবক —সবাই আজ বিচলিত। তবে এই বিপর্যয়ের একটি সুফল লাভ করা গেছে। তা হচ্ছে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং তা সম্প্রতি সূচিতও হয়ে গেছে। শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন চাই। কিন্তু তা সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হওয়া চাই। নতুবা যথেচ্ছ পরিবর্তনের পরিণামে বিষময় ফল ফলবে এবং তাতে জাতির সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা।

উপসংহার

স্মরণীয় যে, শিক্ষাই জাতি-গঠনের ক্ষেত্র। এখানেই জাতীয় চরিত্র সংগঠিত হয়। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বিশাল মহীরুহের বীজ উপ্ত হয় এখানেই। শিক্ষাকে কেউ কেউ বলেছেন জাতির মেরুদণ্ড। অথচ, শিক্ষাক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরে যত বিশৃঙ্খলা এবং অস্থিরতাকে প্রশ্রয় ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য একটিই—রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। সাম্প্রতিক পরীক্ষা-ব্যবস্থার যে বিপর্যয়, তার গোপন ইতিহাস নিহিত এইখানেই। অথচ জাতি-গঠনের দিক থেকে দেশের প্রতিরক্ষা-বিভাগের চেয়ে শিক্ষা-বিভাগের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। কিন্তু এখানেই যদি কচিবাঁশে ঘুণ ধরে, তাহলে সম্পূর্ণ ঝাড়টাই যে অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ কি? শিক্ষায় ও পরীক্ষায় দুর্নীতি অবলম্বন করে যারা কর্ম-জীবনের ছাড়পত্র পায়, তারা সমগ্র সমাজকেই যে দুর্নীতির নরককুণ্ডে পরিণত করবে, তাতে আশ্চর্য কি? কাজেই, অবিলম্বে এ-বিষয়ে সচেতন না হয়ে উপায় নেই। আজ এ-বিষয়ে শিক্ষক-অধ্যাপক, ছাত্র-অভিভাবক ও সরকার সচেতন হচ্ছেন—এটা নিঃসন্দেহে একটি জাতীয় সুলক্ষণ॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি
- পরীক্ষায় দুর্নীতি
- গণ-টোকাটুকির বিষময় পরিণাম
- গণ-টোকাটুকি আত্মহত্যার সামিল

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। রাজপথ-নির্মাণের ইতিহাস। রাজপথের রূপসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য॥ রাজপথের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা॥ উপসংহার॥

একটি রাজপথের স্মৃতিকথা

ভূমিকা

আমি শহরের একটি অতি-পরিচিত রাজপথ। আকৃতিতে, প্রকৃতিতে এবং অঙ্গ-প্রসাধনে আমার কিঞ্চিৎ আভিজাত্য আছে। তাই আমি পথের রাজা—রাজপথ। আজ দেশে দেশে রাজতন্ত্র উচ্ছিন্ন হলেও আমার নামের মধ্যে আমার রাজমহিমা কিন্তু অক্ষুণ্ণ আছে। নাম যা-ই হোক, আমি জনগণের জন্যে আমার হৃদয় প্রসারিত করে দিয়েছি। রাজপথের পরিবর্তে আমার নাম 'জনপথ' রাখলেও আমার আপত্তি নেই। আমি জনগণের সেবার জন্যে প্রতিশ্রুত; আজীবন জনগণের সেবাই আমার ব্রত।

রাজপথ-নির্মাণের ইতিহাস

সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখনও এতদঞ্চলে পথঘাট বিশেষ নির্মিত হয় নি। যাতায়াতের ব্যাপারে জনসাধারণের কষ্টের সীমা ছিল না। তখন আমি ফাঁকা মাঠ হয়ে পড়ে ছিলাম। আমার বুকের ওপর ছিল কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় আর বুনো আগাছার জঙ্গল। এখানে-ওখানে খেলা করতো খরগোশ আর বেজি। রাতে ডাকতো শেয়াল। একদিন কয়েকজন সাহেব আমার বুকের ওপরে ফিতা ফেলে মেপে কাগজে কী সব লিখে নিয়ে গেল। তারপর একদিন বহু লোক এসে আমার বুকের ওপরে খোয়া, ঝামা, ইট ইত্যাদি ফেলে সমান করতে লাগলো। আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারা বদলে গেল দেখে আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম, ওরা কি চায়! গৈরিক পোশাকে আমাকে দেখতে বেশ লাগছিল। আমি শুধু শুধু তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে কেবল নিজেকেই দেখতে লাগলাম। কিন্তু একদিন সকালে একটি 'ষ্টীম-রোলার'কে ভীষণ গর্জন করতে করতে আমার দিকে আসতে দেখে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। কি আর করি? আমি তো আর তোমাদের মতো পালাতে জানি না। অগত্যা শ্বাস বন্ধ করে ঐ বিকট পেষণ-যন্ত্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ধীরে এবং অবধারিতভাবে সে এলো; এবং নির্মমভাবে আমার বুকের ওপর দিয়ে দুর্বিষহ নিষ্পেষণ চালাতে লাগলো। বেশ কয়েকদিন ধরে সে আমাকে পিষ্ট করে গেল। তার পেষণ-পীড়নে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমি বুঝি আর বাঁচবো না। কিন্তু একদিন আমার জ্ঞান ফিরে এলো। চেয়ে দেখলাম, আমাকে দেখতে বেশ শক্ত-সমর্থ লাগছে। আমার বলিষ্ঠ গড়নের দিকে চেয়ে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর একদিন সকালে বেশ কিছু-সংখ্যক লোক গরম পীচের গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। আবার, ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। সেবার যদি বা বেঁচে-

ছিলাম, এবার আর আমি বাঁচবো না। আমি চোখ বন্ধ করে অবধারিত মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে লাগলাম। একদল লোক আমার গায়ে গরম পীচ ঢেলে দিতে লাগলো। আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। কিন্তু কি করি? আমার যে নড়বার শক্তি নেই। আবার, পরমুহূর্তেই আর-একদল লোক আমার গায়ে শীতল বালি ছড়িয়ে দিতে লাগলো। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার আমাকে দেখতে হলো ভারী চমৎকার। একদিন এক মন্ত্রীমহোদয় ফিতা কেটে আমার উদ্বোধন করে গেলেন। সেদিন কী ভীড়! বহুলোক আমাকে দেখতে এলো। আর, আমার সম্বন্ধে মন্ত্রীমহোদয় কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বক্তৃতা করে গেলেন! আমি যে তোমাদের জীবনে এত মূল্যবান, এত গুরুত্বপূর্ণ, তা আমি জানতাম না। আমি যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে তোমাদের অনেক উপকারের জন্যে প্রতিশ্রুত—এ সব শুনে আমার বুক ভরে উঠলো। মন্ত্রীমহোদয়ের বক্তৃতা আমি জীবনেও ভুলবো না।

দেখতে দেখতে আমার দু'পাশেই সুদৃশ্য বাতিস্তম্ভ, সুদীর্ঘ সাতনরী তারের হার গলায় ঝুলিয়ে টেলিগ্রাফ পোস্টও দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক বছরের মধ্যেই আমার দু'ধারে বহু সুদৃশ্য বাড়ি নির্মিত হলো, দোকান-পাটও খোলা হলো অনেক। মন্ত্রীমহোদয়ের কথাই হলো ঠিক। স্বল্প-কালের মধ্যেই আমি বেশ জমজমাট হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় কত লোক, যাতায়াত করে কত গাড়ি; তাদের বিচিত্র ধ্বনি-কোলাহলে আমার বুক ভরে যায়। সন্ধ্যার পর যখন আমার দু'পাশে আলোর মালা জ্বলে ওঠে, বিজ্ঞাপনের রঙীন আলো-গুলো জ্বলতে-নিভতে থাকে, তখন আমার আলো-ঝলমলরূপে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। নিশুতি রাতে টেলিগ্রাফের পোস্টগুলি আমাকে সেতার বাজিয়ে শোনায়। সকাল হয়। আবার জনারণ্যে আমি ডুবে যাই।

রাজপথের রূপসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য

এমনি করেই কাটছিল আমার দিন। তোমাদের সেবায় আমি আমার জীবনটাকে সার্থক মনে করি। কত মানুষ আমার বুকের ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা করে। তাদের কত দুঃখ, কত বেদনা। আমি তার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকি। আবার কত মানুষ তাদের আনন্দ-কলোচ্ছ্বাসে আমার বুক ভরে দিয়ে যায়। আমি তারও নীরব সাক্ষী থাকি। আমি দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হই; আবার সুখীর আনন্দে আনন্দ অনুভব করি। আমি তোমাদের সুখ-দুঃখের সাথী, জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় পথ, একান্ত আপন জন। আমি তোমাদের যেমন দূরে নিয়ে যাই, তেমনি তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে আনি। আমি পৃথিবীর সঙ্গে তোমাদের মিতালি পাতিয়ে দিই। তোমরা স্বীকার করো, আর নাই করো, আমি তোমাদের বিশ্ব-মৈত্রীর রূপকার। তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তোমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন, তোমাদের বহুবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে ছাড়া অচল।

কার্যাবলী

একদিন মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নে দূরাগত এক প্রচণ্ড কোলাহলে আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, অসংখ্য মানুষের একটি বিরাট শোভাযাত্রা আমার বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে নিশান, গলায় শ্লোগান, হাত মুষ্টিবদ্ধ, পদক্ষেপ সুনিশ্চিত। শুনলাম, খাদ্যের দাবিতে সেই শোভাযাত্রা। কিন্তু তাদের আর বেশী-দূর অগ্রসর হতে হলো না। বিপরীত দিক থেকে সগর্জনে ছুটে এলো ডজনখানেক পুলিশের ভ্যান। মুহূর্ত-মধ্যে তারা আমার বুকের ওপর একটি ব্যূহ রচনা করে ফেললো। অকুতোভয় শোভাযাত্রীরা দুর্বার পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হয়ে আসছে। পুলিশ তাদের আর অগ্রসর হতে নিষেধ করলো। কিন্তু ক্ষুধায় যারা কাতর, খাদ্য যাদের দাবী, তারা শুনবে কেন সেই নিষেধ-বাক্য? ক্ষুধা কি কোন নিষেধ মানে? পুলিশ প্রথমে 'কাঁদানে গ্যাস' ছুঁড়লো। ক্ষুধার্ত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। তারপর গুলি। গুলির শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বহুলোক হতাহত হলো। ছত্রাখান হয়ে গেল জনতা। পুলিশ বহু নিরপরাধ মানুষকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুললো। তারপর ভিড় কমে গেল। যে যার ঘরে ফিরে গেল। আহত ও মৃত দেহগুলিকে 'অ্যাম্বুলেন্স' এসে তুলে নিয়ে গেল।

রাজপথের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা

রাত নিশুতি হলো। চারদিক জনশূন্য। নিস্তব্ধতার মধ্যে চেয়ে দেখলাম, আমার শূন্য বুকে স্থানে স্থানে চাপ-চাপ রক্ত জমে আছে। উঃ, সে এক নির্মম দৃশ্য! আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। আহা, কার সোনার বাছা মরলো? কোন্ মায়েদের ঘর অন্ধকার করে তাদের সোনার দুলালেরা বিদায় নিল? আমি ভেবে পেলাম না, কী তাদের অপরাধ। ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্যের দাবী কোন শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। কিন্তু সরকার কোন্ বিচারে খাদ্যের পরিবর্তে সেই ক্ষুধার্ত মানুষগুলিকে দিলে নৃশংস বন্দুকের গুলি? আমি নিজের মনে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। দু'পাশের বাড়িগুলির দরজা-জানালা সেদিন আর খুললো না। রাতে ঝড় উঠলো—তুমুল ঝড়। আকাশ কাঁপিয়ে নামলো বৃষ্টি। আমার বুকের ওপর থেকে রক্তের দাগ সেই বৃষ্টির জলে ধুয়ে গেল। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কিন্তু আজও আমি সেই ক্ষুধার্ত জনতার রক্তের দাগ স্পষ্ট দেখতে পাই॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- একটি বটগাছের আত্মস্মৃতি
- একটি ভাঙাবাড়ির আত্মকাহিনী
- একটি নদীর আত্মকথা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ভাগীরথীর জল-কার্পণ্যের কারণ ॥ ভাগীরথীর জলাবনতির পরিণাম ॥ ফরাক্কা-বাঁধ প্রকল্পের কার্যসূচী ও অর্থব্যয় ॥ পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ॥ ফরাক্কা-বাঁধের সম্ভাব্য উপকারিতা ॥ ভাগীরথী উন্নয়ন ॥ ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গাজল চুক্তি, ১৯৭৭ ॥ উপসংহার ॥

ফরাক্কা-বাঁধ

ভূমিকা

ভাগীরথীর স্রোত-কার্পণ্যে ঘনিয়ে এসেছে কলকাতা-বন্দরের মৃত্যু-আশঙ্কা। সেই আশঙ্কা থেকেই জন্মলাভ করেছে ফরাক্কা-বাঁধ। একদিন গঙ্গার মূল জল-প্রবাহ ভাগীরথী-নদীবক্ষকে পূর্ণ করে বয়ে যেত খরস্রোতে। কিন্তু আজ গঙ্গার মূল জল-প্রবাহ ভাগীরথী-বক্ষ পরিহার করে আশ্রয় করেছে পদ্মা-বক্ষ। ফলে, ভাগীরথীর নাব্যতা-গৌরব আজ অস্তমিত। স্রোত-মন্থরতায় নদীগর্ভে জমছে পলি, চর জেগে উঠছে ইতস্ততঃ। পলি-মোচনের বিপুল ব্যয়-বহন সত্ত্বেও ভাগীরথীর গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তাই ভারী জাহাজগুলি কলকাতা-বন্দরে আর ভিড়তে পারে না। এইভাবে কলকাতা-বন্দরের ভাগ্যে ঘনিয়ে আসছে চরম বিলুপ্তির মুহূর্ত। কলকাতা-বন্দরের এই অবলুপ্তির অর্থ সমগ্র পূর্ব ভারতের সর্বনাশ। কলকাতা-বন্দরকে তথা পূর্ব-ভারতকে সেই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে ফরাক্কা-বাঁধ।

ভাগীরথীর জল-কার্পণ্যের কারণ

ভূ-তত্ত্ববিশারদদের মতে, আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে গঙ্গার মূল প্রবাহ খাত বদল করে পূর্ব-বাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়। অন্যদিকে, ভাগীরথী-নদীখাত জল-স্বল্পতায় ধীরে ধীরে এলো ভরাট হয়ে। ভাগীরথীর স্রোত-কার্পণ্যের মূলে যে গঙ্গার নিষ্করুণ ঔদাসীন্যই রয়েছে, তা নয়; দামোদর ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের সাফল্যও তার এই জলাবনতির অন্যতম কারণ। ফলে, ভাগীরথীর নদীখাত তার পূর্ব-প্রসারতা ও পূর্ব-গভীরতা হারিয়ে হয়েছে কলকাতা-বন্দরের দুর্ভাগ্যের কারণ।

ভাগীরথীর জলাবনতির পরিণাম

এইভাবে সিকিম-ভূটানসহ প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের কুড়ি কোটি মানুষের প্রয়োজনীয় বন্দর কলকাতার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। অন্যদিকে, ভাগীরথীর জল-সংকটে কলকাতা-মহানগরীর জল-সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার হলো উপক্রম। জোয়ার-ভাঁটার প্রাধান্যে ভাগীরথীর জলে লবণাক্ত আস্বাদ দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠছে। তাছাড়া, তার এই স্রোত-সংকোচের ফলে কলকাতা ও তার সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা-রাশি বঙ্গোপসাগরে নিক্ষিপ্ত না হয়ে সারা অঞ্চলটিকে অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছে। এদিকে, ভাগীরথীই তো সমগ্র পূর্ব-ভারতের একমাত্র জলপথ। তার এই ধারা-বিপর্যয়ে পূর্ব-ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের হৃৎপিণ্ড কলকাতা-বন্দর, তার পশ্চাদ্‌ভূমি এবং তার সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলের গৌরব-সূর্য আজ অস্তমুখী।

এই অবস্থার প্রতিকারের সোচ্চার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে ফরাক্কা-বাঁধ। গঙ্গা-ভাগীরথীর মিলনস্থল থেকে ৩২·২০ কিলোমিটার উজানে গঙ্গার উভয় তীর

যেখানে ভারতের অন্তর্গত, সেই স্থানের নাম ফরাক্কা। এই ফরাক্কায় বাঁধ তৈরী করে ভাগীরথীর জল-সংকট ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরাক্কা-প্রকল্প ত্রি-পার্বিক : এক. ফরাক্কার মূল-বাঁধ, রেল-সড়ক ও সেতু-নির্মাণ, দুই. ফীডার খাল খনন এবং তিন. ভাগীরথী-উন্নয়ন। প্রথম পর্বের কাজ হলো, ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর আড়াআড়িভাবে মূল-বাঁধ নির্মাণ করে জল-কপাটের সাহায্যে গঙ্গার জলপ্রবাহের আংশিক রোধ করা এবং তার ওপরে রেলপথ ও সড়ক-নির্মাণ। দ্বিতীয় পর্বে, বাঁধের পেছনে গঙ্গার দক্ষিণ-তীর থেকে একটি সাড়ে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ জল-প্রবাহী ফীডার খাল কেটে জঙ্গীপুরে ভাগীরথীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। এবং তৃতীয় পর্বে, জঙ্গীপুরে ভাগীরথী ও ফীডার খালের সংযোগ-স্থলের ওপরে ভাগীরথীর ওপর আড়াআড়িভাবে একটি বাঁধ নির্মাণ ও ভাগীরথীর পলিমোচন। তাছাড়া, ফরাক্কা থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে স্টীমার-চলাচলের উপযোগী একটি পৃথক্ খাল জঙ্গীপুরের কিছু আগে যুক্ত হয়েছে মূল খালের সঙ্গে। এই কার্যসূচীর রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ১৬০ কোটি টাকা।

ফরাক্কা-বাঁধ প্রকল্পের কার্যসূচী ও অর্থব্যয়

ফরাক্কায় নির্মিত বাঁধের দৈর্ঘ্য ২·২৪ কিলোমিটার। তাতে রয়েছে জল-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১০৯টি জল-ফটক। প্রতিটি ফটক আবার ১৮·২৯ মিটার দীর্ঘ। বাঁধের ওপর প্রস্তুত হয়েছে ১৫·২৪ মিটার চওড়া একটি রাস্তা; তাতে আছে রেল ও মোটরগাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা। বাঁধের দুদিক হয়েছে উঁচু, যাতে বাধাপ্রাপ্ত জলকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। ফীডার খালটি হয়েছে ৭৬ মিটার প্রশস্ত এবং ২·৭৫ মিটার গভীর।

পরিকল্পনার খুঁটিনাটি

গঙ্গার মূল জলধারা থেকে ফীডার খালটি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার কিউসেক জল এনে ভাগীরথীর শুষ্কপ্রায় খাতে ঢেলে দেবে। তাতে ভাগীরথীর বুকে আর অবাঞ্ছিত চর সৃষ্টি হবে না, নতুন নাব্যতা ফিরে পাবে মুমূর্ষু ভাগীরথী। কলকাতা-বন্দর কর্তৃপক্ষকে ভাগীরথীর পলিমোচনের জন্যে আর অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে না। ভারী জাহাজেরা কলকাতা-বন্দরে অনায়াসে ভিড়তে পারবে। বন্দরের আয় বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, ছোট ও মাঝারি ধরনের বহু জলযান ভাগীরথী ও গঙ্গার বুকে উত্তর-ভারতে বহুদূর পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবে। ভাগীরথী ও তার উপনদী জলঙ্গী ও চূর্ণীর জলধারণ ও জলবহন-শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং অববাহিকা-অঞ্চলের শস্যোৎপাদন আকস্মিক বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। মশা ও ম্যালেরিয়া দূর হবে। শীতের সময় জলসেচের মাধ্যমে অববাহিকা-অঞ্চলের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভাগীরথীর উভয় তীরের শিল্পায়তনগুলিও বিকাশের সুযোগ পাবে। কলকাতা-নগরীর জল-সরবরাহ ব্যবস্থা এবং জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হবে। ১৯৭১ সালে ফরাক্কার রেল-পথ ও মোটর-সড়ক খুলে দেওয়া হয়েছে। ফরাক্কা সমগ্র পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে কলকাতার দূরত্ব হ্রাস করেছে। ভবিষ্যতে ওখানে কতকগুলি শিল্পও গড়ে উঠবে।

ফরাক্কা-বাঁধের সম্ভাব্য উপকারিতা

ফরাক্কা-বাঁধের সম্পূর্ণ রূপায়ণে ভাগীরথী নব-জীবন লাভ করবে। কিন্তু ভাগীরথীর পলি অপসারিত না হলে জলস্ফীতির ফলে ভাগীরথীর উভয় কূল প্লাবিত হবে। তাই ভাগীরথীর সমস্যাসমূহের মোকাবিলার জন্যে কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সেচ-দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ফরাক্কা-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ্। ফরাক্কার সাহায্যে ভাগীরথীর জলের কমপক্ষে ৮ মিটার গভীরতা পাওয়া যাবে।

ভাগীরথী-উন্নয়ন

বহু আলোচনা ও মত-বিনিময়ের পর শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালের ১৮ই এপ্রিল ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তিবলে ফরাক্কা-বাঁধ ও ফীডার খাল চালু করা হয়। কিন্তু তারপর দু'বছরে ফরাক্কা দিয়ে ভাগীরথীতে যত না জল প্রবাহিত হয়েছে, কূটনৈতিক টানাপোড়েনে জল ঘোলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। সেই ঘোলা জলের প্রবাহ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনেও গিয়ে পৌছোয়। অবশ্য, রাষ্ট্রপুঞ্জে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও চুক্তির ভারতীয় প্রস্তাবটিই গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব-অনুসারে ঢাকা এবং দিল্লীতে কয়েক দফা আলোচনার ফলশ্রুতিই সাম্প্রতিক চুক্তি। এই চুক্তির শর্তগুলি হলো: এক. ২১শে এপ্রিল থেকে ৩০শে এপ্রিল—শুখা মরশুমের এই দশদিন ভারত ও বাংলাদেশ পাবে যথাক্রমে ২০,৮০০ কিউসেক এবং ৩৪,৭০০ কিউসেক পরিমাণ জল। দুই. ১লা মে থেকে শুখা মরশুমের বাকি দিনগুলিতে ভারত যাতে ৪০,০০০ কিউসেক জল পায়, সেজন্যে ভারতে দ্রুতহারে ক্রমাগত জল সরবরাহ বৃদ্ধি করা হবে। তিন. স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে ফরাক্কার নীচে স্থানীয় ব্যবহারের জন্যে ভারত কিছু পরিমাণ জল নিতে পারবে। কিন্তু তার রূপায়ণের জন্যে উভয় পক্ষের নদী-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হবে। চার. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে উভয় সরকারের পক্ষ থেকে গঙ্গার জলের সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে যৌথ উদ্যোগে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গাজল চুক্তি, ১৯৭৭

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা-জল চুক্তি যে স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে প্রতিফলিত হয়েছে উভয় রাষ্ট্রের সদিচ্ছা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। কলকাতা-বন্দর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবিও সংরক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বার্থও অগ্রাধিকার পেয়েছে। এবার 'নবযৌবন-জলতরঙ্গে' কলকাতা-বন্দর বাঁচুক এবং জলাভাব বা অবাঞ্ছিত বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাক প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কলকাতার মুখে হাসি ফুটুক, হাসি ফুটুক বাংলাদেশের মুখেও॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ফরাক্কা-বাঁধ ও কলকাতা-বন্দর
- ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গাজল-চুক্তি

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ তাম্রলিপ্তের ঐতিহ্যে হলদিয়ার জন্ম ॥ হলদিয়া-বন্দরের প্রয়োজনীয়তা ॥ অবস্থান ও পশ্চাদ্‌ভূমি ॥ যোগাযোগ, পরিবহণ ও জল-সরবরাহ ॥ হলদিয়া-প্রকল্প ও নির্মাণ-ব্যয় ॥ সম্ভাব্য অবদান ॥ হলদিয়ার ভবিষ্যৎ ॥ উপসংহার ॥

৯০

হলদিয়া-বন্দর

হলদিয়া-বন্দর পূর্ব-ভারতের 'নতুন উষার স্বর্ণদ্বার'। কলকাতা-বন্দরের মৃত্যু-আশঙ্কা থেকেই তার জন্ম। হুগলী নদীর দাক্ষিণ্যেই কলকাতা-বন্দরের সমৃদ্ধি ; আবার, হুগলী নদীর দাক্ষিণ্য-সংকোচে তার ভবিষ্যৎ-দিগন্তে দেখা দেয় এক মহা-আশঙ্কা। সেই সঙ্গে পূর্ব-ভারতের বাণিজ্য-বৃদ্ধি ও কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণের ফলে কলকাতা-বন্দরের ওপর পড়েছে অত্যধিক চাপ। অথচ, হুগলীর স্রোত-কার্পণ্যে কলকাতা-বন্দরের অস্তিত্বই বিপন্ন। এইভাবে একদিকে যখন কলকাতা-বন্দরের ভবিষ্যৎ-দিগন্তে মহা অনিশ্চয়তা ঘনিয়ে আসছে, তখনই ভারতের অতীত বাণিজ্যের ধূসর দিগন্তে দেখা দিচ্ছে নতুন সম্ভাবনার প্রতীকরূপে হলদিয়া-বন্দর। ললাটে তার ভারতের অতীত বাণিজ্য-গৌরবের তিলক, চোখে তার ভবিষ্যৎ বাণিজ্য-সম্ভাবনার বিপুল আশ্বাস। তাকে ঘিরে পূর্ব-ভারতের বাণিজ্যিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই।

ভূমিকা

কয়েক বছর আগেও হলদিয়া ছিল এক অখ্যাত গণ্ডগ্রাম। সে অখ্যাত হলেও বিশ্ব-বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের গৌরবময় ঐতিহ্যের কোলে তার জন্ম। যীশু খ্রীস্টের জন্মের বহু পূর্বেই প্রাচী-ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-বন্দররূপে তাম্রলিপ্ত খ্যাতিলাভ করেছিল। এখান থেকে সমুদ্রপথে সুদূর সিংহল [শ্রীলঙ্কা], পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এমন-কি, চীনদেশেও যাত্রা করতো দুঃসাহসী বণিকদল। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন এখান থেকেই স্বদেশে যাত্রা করেছিলেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এই বন্দরের সমৃদ্ধিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। এখানে ছিল একটি বৌদ্ধমঠ, ছিল মহামতি অশোকের নির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ। তারপর বিশাল ধূসর বালুকাময় চর তাম্রলিপ্তের কপালে রেখে বঙ্গোপসাগর সরে গেল সুদূর দক্ষিণে। ফলে, অষ্টম-নবম শতকের পর বিশাল বালুকাময় প্রান্তরে তাম্রলিপ্তের গৌরব-সূর্য অস্তমিত হলো। বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্ণে সে আবার জাগছে ; কিন্তু নতুন নামে। তবে তাম্রলিপ্তের স্বার্থে নয়, কলকাতার স্বার্থে।

তাম্রলিপ্তের ঐতিহ্যে হলদিয়ার জন্ম

গঙ্গার মূল জলধারা পদ্মাবক্ষ আশ্রয় করায় এবং দামোদর ও ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের সাফল্যে হুগলী নদীতে দেখা দিয়েছে নিদারুণ জল-সংকট। হুগলী নদীর অতীতের নাব্যতা-গৌরব আজ আর নেই। কলকাতা-বন্দর তাই আজ আর ভারী জাহাজের মুখ দেখতে পায় না। হলদিয়ায় কিছু পণ্যাবতরণ ঘটিয়ে ভারী জাহাজগুলি আংশিক ভারমুক্ত হয়ে কলকাতা-বন্দরে ভিড়তে পারবে। তাই টোকিয়োর ইয়াকোহামার মতো কলকাতার সহায়ক বন্দর রূপে গড়ে উঠছে হলদিয়া।

হলদিয়া-বন্দরের প্রয়োজনীয়তা

হলদিয়া মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায়, হুগলী ও হল্‌দি নদীর সঙ্গম-স্থলে হল্‌দি নদীর বাম উপকূলে অবস্থিত। কাঁসাই ও কেলেঘাই—এই নদী-যুগলের যৌথ প্রবাহেই হল্‌দি নদীর সৃষ্টি। এই অঞ্চলের জনবসতি ঘন এবং কৃষি ও শিল্প-সম্পদ প্রচুর। পশ্চাদ্‌ভূমিরূপে হলদিয়া পাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ। দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা, ভিলাই ও বোকারোর শিল্পাঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার কৃষি ও শিল্প-সমৃদ্ধ অঞ্চল যে হলদিয়ার সমৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেবে, তা বলাবাহুল্য। তার সমৃদ্ধি-রচনায় আসাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশও আসবে এগিয়ে। তাছাড়া, যন্ত্রপাতি, সিমেণ্ট, কাগজ, চীনা বাসন, সার ও পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানার এখানে রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা।

অবস্থান ও পশ্চাদ্‌ভূমি

বন্দর গড়ে তোলার জন্যে সর্বাগ্রে চাই উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা। সেজন্যে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশনের সঙ্গে হলদিয়ার ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন ব্রড্‌গেজ রেলপথের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জলপথে, সড়কপথে ও রেলপথে ওড়িশার সঙ্গেও তার যোগাযোগ সহজ হবে। এই ব্যাপারে ওড়িশা ক্যানেল এবং হিজলী টাইড্যাল্‌ ক্যানেলের ভূমিকা হবে অসামান্য। ছয় নং জাতীয় সড়ক থেকে পাঁশকুড়া-তমলুক-সুতাহাটা হয়ে হলদিয়া পর্যন্ত ইতিমধ্যে সড়ক নির্মিত হয়েছে। আশা করা যায়, বন্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থার আরো উন্নতি হবে। হলদিয়ার ভূগর্ভস্থ জল থেকে দৈনিক চার কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করা যাবে। পরে উলুবেড়িয়া থেকে হুগলী নদীর স্বাদু জল আনা যেতে পারে।

যোগাযোগ, পরিবহণ ও জল-সরবরাহ

কলকাতা থেকে ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠছে হলদিয়া। এখানে থাকছে ছয়টি বার্থ: কয়লার জন্যে দুটি বার্থ, আকরিক লৌহের জন্যে একটি, পেট্রোলিয়ামের জন্যে একটি এবং সাধারণ জাহাজী মালের জন্যে দুটি। আবার, বৃহৎ ড্রাই-ডকও নির্মিত হচ্ছে একটি। এ পর্যন্ত এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১২৭ কোটি টাকা। ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে এর নির্মাণ সমাপ্ত হবার কথা। তখন হলদিয়াই হবে ভারতের কয়লা-রপ্তানির প্রধান বন্দর। এখানে পাঁচশো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে একটি সার-কারখানা ও একটি তৈল-শোধনাগার।

হলদিয়া-প্রকল্প ও নির্মাণ-ব্যয়

হলদিয়া ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার অবদান রাখবে নানাভাবে: এক. ভারতীয় কারখানাগুলি বিদেশী কারখানা-সমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতার শক্তি সঞ্চয় করবে। দুই. হলদিয়া-বন্দরের সুযোগ-সুবিধা রপ্তানি-বাণিজ্যের জন্যে বহু নতুন প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করবে; সেই সঙ্গে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সম্প্রসারণের জন্যে প্রলুব্ধ করবে। তিন. হলদিয়ায় যে সব কারখানা স্থাপিত হবে, তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারত থেকেই সংগৃহীত হবে। ফলে, ভারত ঘরের দুয়ারে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারবে। চার. ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজী ব্যবসায়

ইত্যাদির মাধ্যমেও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব হবে। পাঁচ. বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ অঞ্চলে সরবরাহের জন্যে এবং ভারতে রপ্তানির জন্যে এখানে প্রচুর যন্ত্রোপকরণ এবং অংশবিশেষ মজুত রাখবে। ক্রেতারা এই সমস্ত পণ্য অধিক পরিমাণে মজুত না রেখে ঐ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারবে। ছয়. ভারতে রপ্তানির জন্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপন্ন বা আংশিক-উৎপন্ন যন্ত্রাংশ-যোজনা এবং প্যাকিংয়ের জন্যে ভারতীয় পণ্য ভোগ করতে হবে এবং নিয়োগ করতে হবে ভারতীয় শ্রমিকদের। ফলে, ভারতের বেকার-সমস্যার কিছুটা লাঘব হবে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কারিগরী দক্ষতা লাভও সম্ভব হবে। বর্তমানে হলদিয়ায় রাজ্য-বিদ্যুৎ পর্ষদ্ বিদ্যুৎ-সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে। এর পর সাঁওতাল-ডিহি হলদিয়াকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে। তার সঙ্গে হাত মেলাবে কোলাঘাট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ভবিষ্যতে হলদিয়াতেই একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হবে।

সম্ভাব্য অবদান

ইতিমধ্যে হলদিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করেছে চিন্তাশীল মহলে। হলদিয়া কলকাতার সহযোগী বন্দররূপে পরিকল্পিত হলেও শেষে কলকাতারই প্রতিযোগী-বন্দর হয়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। সম্প্রতি প্রস্তাব উঠেছে, হলদিয়াকে পৃথক্ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু হলদিয়ার জন্ম কলকাতার সহযোগী হিসেবে, প্রতিযোগী হিসেবে নয়। কাজেই, হলদিয়া এবং কলকাতা একই প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

হলদিয়ার ভবিষ্যৎ

কিন্তু হলদিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত হবার মতো কারণ আছে অন্যদিকে। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে হুগলী নদীর অববাহিকায় অনুরূপ বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠে দেশের সর্বনাশ সাধন করেছিল। সেই কলঙ্কিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, পূর্বাহ্ণে তার জন্যে সতর্কতা প্রয়োজন। আর, সেই সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে সম্ভাব্য নানা দুর্নীতি ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ দমন করবার জন্যে। চোরাই কারবার, দুর্নীতি ও নানা সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের স্বর্গ সিঙ্গাপুর ও হংকং-এর মতো হলদিয়া-বন্দরও যদি গড়ে ওঠে, তবে আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেজন্যেও সরকারের সতর্কতা প্রয়োজন। এতদিনে হলদিয়ার যে উন্নয়ন হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। পূর্ববর্তী সরকারের গাফিলতিতে সেখানে একটি হাসপাতাল তো দূরের কথা, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি। পেট্রো-কেমিক্যাল কম্‌প্লেক্স কারখানাটি ন্যাপথার অভাবের অজুহাতে হলদিয়াকে বঞ্চিত করে ওড়িশার দিকে প্রস্থানে উদ্যত হয়েছিল। বর্তমান রাজ্য-সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত হলদিয়ারই হয়েছে জিত। এবার কলকাতা-দুর্গাপুর-আসানসোলের মতো কলকাতা-হলদিয়া-খড়্গপুর যে এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠছে, তার ফলে একদা পূর্ব-ভারতে আসবে উন্নয়নের জোয়ার। হলদিয়াই হবে সেদিন পূর্ব-ভারতের 'নতুন উষার স্বর্ণদ্বার॥'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- হলদিয়া-বন্দরের প্রয়োজনীয়তা
- হলদিয়া-বন্দরের উপকারিতা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ প্রাচীন ভারতের সেচ-ব্যবস্থা ॥ খরা-নিয়ন্ত্রণ : জলসেচ ॥ জলসেচের অগ্রগতি ও পঞ্চম যোজনা ॥ নদীপ্রকল্পসমূহ : উত্তর-ভারত ॥ পূর্ব-ভারত ॥ দক্ষিণ-ভারত ॥ পশ্চিম-ভারত ॥ অগ্রগতি ॥ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ॥ উপসংহার ॥

৬১ ভারতে খরা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

বৈচিত্র্যময় ভারতের কোথাও নদী-জলধারার অন্তহীন প্রাচুর্য, কোথাও বৃষ্টির অফুরন্ত আশীর্বাদ ; কোথাও তৃষ্ণার্ত প্রান্তর কাতরকণ্ঠে আমন্ত্রণ করে নদী-প্রবাহকে, আহ্বান জানায় বৃষ্টি-বারিধারাকে। কিন্তু নিষ্করুণ নদী মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, মৌসুমী-মেঘও ভেসে যায় নিরাসক্তভাবে। ফলে, খরা ও বন্যা হয় তার বার্ষিক ভাগ্যলিপি।

ভূমিকা

কৃষি-নির্ভর ভারতের বাজেট নিয়ে মৌসুমী-মেঘের চলে সর্বনাশা জুয়াখেলা। কিন্তু ভারতের আছে স্রোতস্বিনী নদী, আছে কর্ষণযোগ্য ভূমি, আর আছে রাশি-রাশি সোনার ফসল ফলাবার উপযোগী ভূমির উর্বরতা। তবু ভারতের কৃষি আজও দৈবাধীন। কারণ এতদিন ছিল না এমন কোন পরিকল্পনা, যা নদীর জলধারার সাহায্যে তৃষ্ণার্ত শস্য-প্রান্তরের তৃষ্ণা দূর করতে পারে, সর্বনাশা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তার বিপুল শস্যসম্ভারকে।

কিন্তু এককালে ভারতের নদীগুলি তৃষ্ণার্ত কৃষিক্ষেত্রে বহন করে আনতো অফুরন্ত তৃষ্ণার জল ; অতিরিক্ত জল-নিষ্কাশন এবং যাতায়াত-পরিবহণেরও তারা ছিল বড়ো অবলম্বন। রাজা-মহারাজারা দেশের সেই হিতৈষী নদীগুলির পলি-মোচন করে দিতেন, প্রতিষ্ঠা করতেন অসংখ্য বিশালাকার জলাশয় ও কূপ এবং খনন করে দিতেন বহু শাখা-প্রশাখা-যুক্ত খাল। ভারতের কৃষি-প্রসিদ্ধির মূলে ছিল সেই উন্নত সেচ-ব্যবস্থা। কিন্তু হৃদয়হীন ইংরেজ-শাসনে সংস্কারের অভাবে নদীগুলি পলিপূর্ণ হয়ে হারালো তাদের জলবহন-ক্ষমতা, জলাশয়গুলো এলো মজে, কূপগুলো হারালো জলধারণ-শক্তি আর খালগুলো ভরাট হয়ে এক-মুখো মরানদীরূপে টিকে রইলো অতীতের করুণ সাক্ষীরূপে। যেখানে সামান্য করুণা বর্ষিত হলে সোনা ফলতে পারতো, সেখানে বিজাতীয় সরকারের হৃদয়হীনতায় জমে উঠতে লাগলো আদিগন্ত নিষ্ফলতা। অনাবৃষ্টির বছরে মরুভূমির ঊষরতা, অতিবৃষ্টির বছরে প্রলয়ঙ্করী বন্যা—এই হলো ভারতের কৃষি-জমির ভাগ্যলিপি। যে সব অঞ্চল ছিল ভারতের অফুরন্ত শস্যভাণ্ডার, সেখানেই নেমে এলো দুর্নিবার দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা। এইভাবে অন্নপূর্ণার দেশ হলো অন্নহীন।

প্রাচীন ভারতের সেচ-ব্যবস্থা

বৃষ্টিহীন মরু-প্রান্তর এবং বন্যাবিক্ষুব্ধ নদনদী নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। খরা ও বন্যার দাপটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নবতর কর্মকাণ্ডের রূপায়ণে হাত লাগানো হলো। খরার মোকাবিলার জন্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত জলসেচ এবং বন্যার মোকাবিলার জন্যে প্রয়োজন নদীপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু জল-নিষ্কাশন। জলসেচের প্রয়োজনে ভারতে জলসূত্র মূলতঃ দুটি : এক. নদীপ্রবাহ ও দুই. ভূগর্ভস্থ জল। স্বাধীনতালাভের পর খরা ও বন্যার মোকাবিলার জন্যে নদীপ্রবাহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে

খরা-নিয়ন্ত্রণ : জলসেচ

হাত লাগানো হয়। বর্তমানে ভারতের সকল নদীপ্রবাহই নিয়ন্ত্রিত। এখন নজর দেওয়া হয়েছে ভূগর্ভস্থ জলরাশির সদ্ব্যবহারে।

স্বাধীনতালাভের পর এ পর্যন্ত বৃহৎ এবং মাঝারি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে প্রায় ৬১০টি; তার মধ্যে ৩৮০টি পূর্ণ রূপায়িত হয়েছে এবং বাকিগুলি রূপায়ণের পথে। সেদিক থেকে এ পর্যন্ত ভারতে কূপের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঁয়ষট্টি লক্ষ এবং নলকূপের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে আট লক্ষ। তার ফলে, ভারতের বর্তমান সেচ-সেবিত জমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার কোটি হেক্টর। বৃহৎ ও মাঝারি প্রকল্পগুলির রূপায়ণে এ পর্যন্ত ব্যয়িত হয়েছে প্রায় ৩,৩৫০ কোটি টাকা। পঞ্চম যোজনায় সেচখাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ৩,৮০০ কোটি টাকা।

জলসেচের অগ্রগতি ও পঞ্চম যোজনা

ভারতের তৃষ্ণার্ত কৃষি-প্রান্তরকে পর্যাপ্ত জলদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে তার বৃহৎ ও মাঝারি নদীপ্রকল্পগুলি। জলসেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের বহুমুখিতার জন্যে তারা বহুমুখী—সমৃদ্ধিমুখী। তাদের মধ্যে হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের যৌথ প্রয়াসে নির্মিত ভারতের বৃহত্তম নদীপ্রকল্প—ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প বর্তমানে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ হেক্টর শুষ্ক কৃষি-প্রান্তরকে জলদান করছে। বিপাশা-বাঁধ এবং শতদ্রু-বিপাশা সংযোগের দ্বারা রাজ্য তিনটির বহু নিরম্বু জমি জলস্পর্শ করবে। রাজস্থান খাল প্রকল্প তার মরু-প্রান্তরে 'মরুবিজয়ের কেতন' উড়িয়ে দিয়েছে। রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের যৌথ উদ্যোগে অভিশপ্ত চম্বল উপত্যকার শাপমোচন ঘটলো। তার সঙ্গে তাওয়া-প্রকল্প সেখানকার বহু তৃষ্ণার্ত জমির তৃষ্ণা দূর করবার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এদিকে, নেপালের সঙ্গে চুক্তিক্রমে গণ্ডক-প্রকল্প বিহার ও উত্তর প্রদেশের জমিতে সেচ-সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে কুশী ও রামগঙ্গা প্রকল্প যথাক্রমে বিহার ও উত্তর প্রদেশের জমির তৃষ্ণা দূর করতে।

নদী-প্রকল্পসমূহ : উত্তর-ভারত

পূর্ব-ভারতে নদী-প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হলো দামোদর উপত্যকা প্রকল্প। সে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জমিতে জলদানে নিয়োজিত। ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী পশ্চিমবঙ্গের নির্জলা জমিকে সুজলা সুফলা করে তুলতে হাত লাগিয়েছে। আর, ফরাক্কা শীতকালে ভাগীরথীর অববাহিকায় দেবে জলের যোগান। হীরাকুঁদ বাঁধ এবং মহানদী ব-দ্বীপ প্রকল্প ওড়িশার বৃষ্টিহীন জমিতে শস্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলবে।

পূর্ব-ভারত

দক্ষিণ-ভারতের নদীপ্রকল্পগুলির অন্যতম হলো নাগার্জুনসাগর। সে এবং পোচাম্বাদ অন্ধ্রপ্রদেশের জমির মুখে শ্যামল হাসি ফুটিয়ে তুলবে। ওদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প উভয় রাজ্যের জমির জলতৃষ্ণা দূর করবে। কর্ণাটকে এ ছাড়া রূপায়িত হচ্ছে আরো তিনটি প্রকল্প : ভদ্রা, উচ্চতর কৃষ্ণা এবং মালপ্রভা। তাছাড়া, তামিলনাড়ু ও কেরালার যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত হচ্ছে পরম্বিকুলম্ আলিয়ার প্রকল্প।

দক্ষিণ-ভারত

এবার পশ্চিম-ভারতের নদীপ্রকল্প। মহারাষ্ট্রে ভীমা এবং জয়কবাদী প্রকল্প দুটি বিশাল অঞ্চলের জমির তৃষ্ণার জল সরবরাহ করবে। অন্যদিকে, কাকড়পাড়া গুজরাটের নির্জলা জমিতে জল দান করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাছাড়া, উকাই ও মাহী প্রকল্প গুজরাটের জমির নিষ্ফলতার অভিশাপ দূর করবে। এইভাবে স্থচিত হয়েছে ভারতের নদী-গুলিকে কল্যাণময়ী করে তোলার বহুমুখী প্রয়াস।

পশ্চিম-ভারত

স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের বত্রিশ বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষি-জমির ৭৫ শতাংশই এখনো সেচের আওতার বাইরে। অর্থাৎ, তার অধিকাংশ জমিই আজও সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেচের অগ্রগতি এইভাবে চলতে থাকলে বর্তমান শতাব্দীর শেষে তার অর্ধেক কৃষি-জমিও সেচ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অগ্রগতি

ভারতে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় দু' কোটি একর। এই অঞ্চলগুলিকে বন্যার তাণ্ডব থেকে রক্ষা করবার মানসে জাতীয় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর রূপায়ণে হাত লাগানো হয়। উত্তরবঙ্গ ও আসামে বন্যার প্রচণ্ড তাণ্ডব দূর করবার জন্যে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথাক্রমে ব্রহ্মপুত্র বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ ও উত্তরবঙ্গ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ গঠন করেছেন। গাঙ্গেয় অববাহিকার বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছেন গঙ্গা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ ও গঙ্গা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ কমিশন। তার ফলে, দুশো পাঁচটি শহর, সাড়ে চার হাজার গ্রাম এবং একাত্তর লক্ষ হেক্টর কৃষি-জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ

ভারতের নদী-প্রবাহগুলিকে শস্যক্ষেত্রমুখীন করে তোলার সমস্ত সম্ভাবনা এখন প্রায় নিঃশেষিত। এখন যা বাকি, তা হলো ঃ বর্ষাকালের নদীগুলির উদ্বৃত্ত জলধারাকে বিশালাকার জলাধারে সংরক্ষণ ও খরা মরশুমে তার ব্যবহারীকরণ এবং ভূগর্ভস্থ জলরাশির সদ্ব্যবহার। তা সফল হলে খরার অনল-নিঃশ্বাসে ভারতের বৃষ্টিবিহীন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বুক আর মরুতৃষ্ণায় ফেটে যাবে না, বন্যায় ঘটবে না তার সর্বনাশ ; তার পাণ্ডুর, বিষণ্ণ মুখে ফুটবে আদিগন্ত শ্যামল হাসি। খরা ও বন্যা জয়ের মধ্য দিয়ে ভারত জয় করতে পারবে দুর্ভিক্ষকে, শস্য-সমৃদ্ধি ও শক্তি-সম্পদের সাহায্যে সে জয় করতে পারবে তার চিরায়ত দারিদ্র্যকে। এইভাবে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক হবে, সফল হবে ভারতের মাটি, সফল হবে ভারতের পুণ্য জলধারা ॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় ঃ

- ভারতের বহুমুখী নদীপ্রকল্পসমূহ
- ভারতে জলসেচের অগ্রগতি
- ভারতের সেচব্যবস্থা ও সবুজ-বিপ্লব

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যা ॥ অতিক্রান্ত সময় ॥ ভারতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ॥ ভারতের জনসংখ্যা ও জাতীয় সম্পদ ॥ ভীতিপ্রদ চিত্র ॥ ভারতের সাম্প্রতিক জনবৃদ্ধির কারণ ॥ জনবৃদ্ধির প্রতিরোধ ॥ জরুরী অবস্থা ও তারপর ॥ উপসংহার ॥

৬২ ভারতের জনবৃদ্ধির সমস্যা

জনবন্যায় আজ টালমাটাল ভারতের অর্থনীতি। জলবন্যার মতো জনবন্যা-নিয়ন্ত্রণেরও কোন পরিকল্পনা ছিল না ব্রিটিশ ভারতে। শোষণের দ্বার অবারিত রাখার জন্যে ইংরেজ এদেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, ভারতবাসীরা সমৃদ্ধ দেশের দরিদ্র অধিবাসী। তার ঘরে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ আর পর্যাপ্ত জনশক্তি; নেই তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন বলিষ্ঠ পরিকল্পনা।' দেশের সম্পদের পূর্ণ-ব্যবহারীকরণের অভাবে অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে বেকার-সমস্যা ও দুর্নিবার দারিদ্র্য। অন্যদিকে, শিক্ষা সমাজের সচ্ছল অংশেই রয়েছে সংকুচিত। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অভিশাপে সমাজের বৃহত্তর অংশ আজও অভিশপ্ত জীবনযাপনে বাধ্য। তার ভয়াবহ পরিণতি হলো অতিরিক্ত জনবৃদ্ধি।

ভূমিকা

বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি প্রথা যখন জনবৃদ্ধির হারকে দ্রুততর করে তুলেছে, তখন অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ভারতে সতীদাহ, বৈধব্য-চর্যা, কৌলিন্য-প্রথা ইতাদি নানা নৃশংস ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্যে। তাছাড়া, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা বেদনাদায়ক সামঞ্জস্য রক্ষিত হতো। এখন সেই সামাজিক প্রথাগুলি অবলুপ্ত এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে অকালমৃত্যু ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বহুল পরিমাণে তিরোহিত। জনসংখ্যা আজ তাই স্বভাবতঃই ঊর্ধ্বমুখী।

প্রাচীন ভারতের জনসংখ্যা

বর্তমানে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণে হাত লাগানো হয়েছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন জনবৃদ্ধির হারকে চ্যালেঞ্জ করে বৈষয়িক উন্নয়নে হাত লাগালে জনবৃদ্ধির হারকে জব্দ করা যেত। কিন্তু এখন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ প্রতিনিয়ত বৈষয়িক উন্নয়নকে চালেঞ্জ করে পরিকল্পনাগুলিকে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছে। তবে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারী, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সহযোগে একটা বেদনাময় সমীকরণ মাঝে মাঝে অবশ্য হয়ে যায়। কিন্তু ভয় হয়, না জানি শেষের সেদিন কেমন ভয়ঙ্কর হবে, যেদিন মাতা বসুমতী তাঁর সংখ্যাতীত সন্তানের মুখে আর অন্ন তুলে দিতে পারবেন না! ভারতীয় অর্থবিজ্ঞানীরা সেই ধারায় চিন্তা করতে বসেছেন এবং তাঁদের কপালে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভয়ের বলিরেখা।

অতিক্রান্ত সময়

ভারতের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, একমাত্র খাদ্যোৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যার বিচার একদেশদর্শিতার নামান্তর। প্রাকৃতিক সম্পদ, তার পূর্ণ-ব্যবহারীকরণ, ন্যায়-সঙ্গত সুষম বণ্টন, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং জনসংখ্যার বিচারেও কি ভারত অতিজনতাগ্রস্ত? প্রথমতঃ, ভারত অমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় স্বার্থে তার পূর্ণ-ব্যবহারীকরণ কখনও হয়নি। ইংরেজ-রাজত্বে তা ব্যবহৃত হয়েছে বিজাতীয় স্বার্থে এবং পূর্ণ-ব্যবহারীকরণ এখনও দূর অস্ত্‌! তৃতীয়তঃ, ন্যায়সঙ্গত সুষম বণ্টনের প্রতিশ্রুতি এখনও কাগজ-কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চতুর্থতঃ, যা হবার তাই হয়েছে! টাটা-বিড়লা-ডালমিয়ার বার্ষিক আয়ের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিক-মজুরের বার্ষিক আয় যুক্ত হয়ে বার্ষিক জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়ে যায়। পঞ্চমতঃ, ভারতের জনসংখ্যা ইতিমধ্যে প্রায় যাট কোটি। কাজেই, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ-ব্যবহারীকরণের জন্যে যে মানবশক্তির প্রয়োজন, তা ভারতের আছে। সুতরাং ভারতের এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখের দিকে চেয়ে তার কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ত্বরান্বিত করা উচিত।

ভারতের জনসংখ্যা ও জাতীয় সম্পদ

ভারতের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদন-রীতি ও বণ্টন-পদ্ধতি এতই দুর্বল যে, অদূর ভবিষ্যতে অশুভ আশঙ্কা আছে। জনসংখ্যা, উৎপাদন-বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন—এই তিনের মধ্যে অতি শীঘ্র ভারসাম্য স্থাপিত না হলে ভারতের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়তে পারে। অর্থবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম অভিমত আরো ভীতিপ্রদ। তাঁদের মতে, ভারতের এই জন্ম-বৃদ্ধিহার অব্যাহত থাকলে ১৯৯৯ সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটি।

ভীতিপ্রদ চিত্র

কাজেই, ভারতের জনসংখ্যা শিল্পোন্নয়নের মন্থরতার সমস্যা, অসম বণ্টনের সমস্যা ও সামাজিক কাঠামোর সমস্যা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে জনসংখ্যা উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। ভারতেও এখন বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কিছুটা দূরীভূত হয়েছে; সংক্রামক মহামারীর প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। এইসব কারণে এবং চিকিৎসার সহজলভ্যতার ফলে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তার ওপর সাম্প্রতিককালে বিবাহ-ব্যাপারে সামাজিক উদারতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বৈষয়িক উন্নয়নের প্রাথমিক কল্যাণে জন্মহার-বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা স্বাভাবিক-ভাবেই উর্ধ্বমুখী হয়েছে। কিন্তু এতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। দারিদ্র্য ও গ্রাম্যতার হাত থেকে ক্রমমুক্তি, শিক্ষা-প্রসার, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির মাধ্যমে এই জন-বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে। সম্প্রতি, জনসংখ্যার যে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার কারণ ভারতের জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। সেখানে এখনো দারিদ্র্য ও অশিক্ষা চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে আছে। সেখানে পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে হবে।

ভারতের সাম্প্রতিক জনবৃদ্ধির কারণ

কাজেই, জনবৃদ্ধির প্রতিরোধের জন্যে দ্বিমুখী কার্যসূচী অবিলম্বে সূচিত হওয়া উচিত। একদিকে, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতর ও গভীরতর ব্যবহারীকরণ ত্বরান্বিত করতে হবে, অন্যদিকে জন-বন্যা নিয়ন্ত্রণের সকল সম্ভাব্য পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। ১৯৫২ সালে পরিবার পরিকল্পনার জন্ম এবং ১৯৬৬ সালে তার পূর্ণায়ন। পঞ্চম যোজনার জন্যে এই খাতে ৫১৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে গ্রামে ও শহরে বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে মোট যথাক্রমে ৫,২৪৩ ও ১,৯১৯টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র। তাদের অন্তর্গত অবর-কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৩,০৪৮। পঞ্চম যোজনায় এক-একটি অবর-কেন্দ্র দশ হাজার জনসংখ্যার জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই সব প্রয়াসের দ্বারা এ পর্যন্ত প্রায় দু' কোটি শিশুর জন্ম পরিহার করা গেছে।

জনবৃদ্ধির প্রতিরোধ

বিগত জরুরী অবস্থায় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তা জন-নিগ্রহেরই নামান্তর। বর্তমান সরকার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরকে পরিবার কল্যাণ দপ্তরে রূপান্তরিত করেছেন এবং জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সরকারী উদ্যোগকে জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তাকে স্বেচ্ছা-মূলক করেছেন। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছামূলকই হওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষা ও সচ্ছলতা ছাড়া জনগণকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করা যাবে কিরূপে? প্রথমে জনগণকে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে চাই আর্থিক সচ্ছলতা।

জরুরী অবস্থা ও তারপর

দারিদ্র্য-মুক্তি ও শিক্ষা-বিস্তার—ভারতের এই দুই সাধনার সিদ্ধির ওপর নির্ভর করছে ভারতের জন-বন্যা নিয়ন্ত্রণ ; পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র। এই তিনটি আয়োজনকে ভারতবাসীর জীবনে সফল করে তুলতে হবে, বহুযুগের অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অচল পাথরটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে জন-জীবনের বুকের ওপর থেকে। দুঃখ-দুর্দশার অভিশাপে অভিশপ্ত জীবন-যাপনের চেয়ে অবিবাহিত কিংবা নিঃসন্তান জীবন যে সহস্রগুণে শ্রেয়—একথা উপলব্ধি করার দিন এখন এসেছে। ভারতে কোন কোন সম্প্রদায়ে এখনও একাধিক বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে। জনভারে জর্জরিত ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নের প্রতি এটা কি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন নয়? এক হাকিমের দুই হুকুম কেন? তাছাড়া, যে জনসংখ্যা রক্ষণশীল অর্থনৈতিক কাঠামোয় জনাধিক্য বলে মনে হচ্ছে, সেই জনসংখ্যাই প্রগতিশীল অর্থনীতির কাঠামোয় হয়তো আর জনাধিক্য বলে মনে হবে না। কাজেই, ভারতের জনসংখ্যার দিকে তাকিয়ে প্রগতিশীল অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা আর কিছুতেই বিলম্বিত হওয়া উচিত নয়॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ
- ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়
- ভারতের বৈষয়িক উন্নতি ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি
- ভারতে জন-বিস্ফোরণ

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ ভারতের বেকার-সমস্যার কারণঃ যন্ত্রের ব্যবহার ও মুনাফাবৃদ্ধি॥ পল্লী-অর্থনীতির দুর্বলতাঃ কৃষি ও কুটির-শিল্প॥ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে ভারতীয় শিল্প॥ যোজনাকালীন বেকার-সমস্যা ও পঞ্চম যোজনা॥ পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার রূপচিত্র। পরিণাম ও প্রতিরোধ॥ উপসংহার॥

৬৩ ভারতে বেকার-সমস্যা

অবশেষে দু' শতাব্দীর শোষণের পর ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে চলে গেল আর উপঢৌকন দিয়ে গেল শতাব্দী-লালিত দুর্বিবহ বেকার-সমস্যা। পরাধীনতার অবসানে ভারতের যুব-মানস স্বপ্ন দেখেছিল এক নয়া ভারতের। সে স্বপ্ন তাদের ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কর্মহীন বেকার যুব-সমাজ নিদারুণ অপচয়ে আজ দেউলে, হতাশাক্লিষ্ট। সৃজনশীল যে কর্মশক্তি সৃষ্টির নব-নব প্রেরণায় মেতে উঠতে পারতো, আজ তা অপচয় ও অবক্ষয়ের শোচনীয় পরিণামে ক্লান্ত, অবসন্ন ও দিশাহারা।

ভূমিকা

ইংরেজরা এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করে বেকার-সমস্যার প্রাথমিক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সস্তায় শ্রমিক সহজলভ্য করে রাখার জন্যে তারা এদেশে তাকে জিইয়ে রাখে। তারপর এলো স্বাধীনতা। এবার মালিক-গোষ্ঠী সস্তায় শ্রমিক নিয়োগ করে মুনাফা-বৃদ্ধির দিকেই হলো যত্নশীল। তারা বেকার-সমস্যার সমাধানের দিকে নজর না দিয়ে মুনাফা-বৃদ্ধির তাগিদে শ্রমিকদের দিয়ে অধিক পরিশ্রম করাবার জন্যে এবং সস্তায় শ্রমিক-সংগ্রহের জন্যে বেকার-সমস্যাকে লালন-পালন করতে লাগলো। মুনাফার লালসা আরো বৃদ্ধি পেলে তারা মানব-শক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারে মন দেয়। এইভাবে যন্ত্র এসে মানুষের হাতের কাজ নিয়েছে কেড়ে। কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা, শত শত তাঁতির তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। তেলের কল কেড়ে নিয়েছে শত শত কলুর হাতের কাজ, ধানের কল বেকার করে দিয়েছে ধান-ভাঙানী গ্রামীণ মেয়েদের।

ভারতের বেকার-সমস্যার কারণঃ যন্ত্রের ব্যবহার ও মুনাফা-বৃদ্ধি

স্মরণীয় যে, ভারতে চাষাবাদ ঋতুগত পেশা। তার ওপর ভারতের ঐতিহ্যময় কুটির-শিল্প বিধ্বস্ত হওয়ায় এবং শস্যাবর্তন ও জীবিকান্তরের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের বছরের অধিকাংশ সময় বেকার থাকতে হয়। আবার, চাষাবাদের কাজ অধিক-সংখ্যক কৃষকদের হাতে অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় কর্মহীনতার কাল-পরিমাণ যায় বেড়ে। এই প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের অভিশাপ শিল্পাঞ্চলকেও স্পর্শ করে। কর্মহীন কৃষক ও কৃষি-শ্রমিক কর্মের সন্ধানে শিল্পাঞ্চলে এসে ভিড় করে। শিল্পাঞ্চলে আবার বেকার-সমস্যা তীব্র হলে শিল্প-শ্রমিকেরা দল বেঁধে কৃষিতে করে প্রত্যাবর্তন। গ্রামাঞ্চলে এই অর্ধ-নিয়োগ ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের মৌল কারণ হলো ঃ

পল্লী-অর্থনীতির দুর্বলতা ঃ কৃষি ও কুটির-শিল্প

গ্রামাঞ্চলে দ্রুতহারে জনবৃদ্ধি, কৃষিতে শস্যাবর্তনের অভাব এবং গ্রামীণ ও কুটির-শিল্পের বিলুপ্তি।

প্রাক্-স্বাধীনতা কালে শ্রমিকদের অধিক শ্রম করিয়ে বহু ব্যক্তির কর্ম-সংস্থানের সম্ভাবনাকে জোর করে চেপে রাখা হতো। যুদ্ধের চাহিদা মেটাবার জন্যে দেশে বহু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বহু লোকের কর্ম-সংস্থান হয়; কিন্তু যুদ্ধোত্তর-কালে তাদের অনেকগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং স্বাধীনতা-লাভের পর বহু বিদেশী শিল্পপতি এদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যাওয়ায় বহু ব্যক্তিকে বেকারত্ব বরণ করতে হয়। দেশ-বিভাগের ফলে পাট-এলাকা পূর্ববঙ্গ হাতছাড়া হয়ে যায়; তাতে বহু চটকল-শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। আবার, যোজনাকালে শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কারের ফলে এবং বিকল্প নিয়োগ-ব্যবস্থার অভাবে বেকারত্ব অনিবার্যরূপে দেখা যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে অস্বাভাবিক বাণিজ্য-মন্দার ফলে বহু প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাই শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার দু'বছর লোক নিয়োগ স্থগিত রেখেছিলেন। এমন-কি, রেল, ডাক ও তার-বিভাগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাও কিছুকাল বন্ধ ছিল।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে ভারতীয় শিল্প

যেখানে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অতি দ্রুত এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি অতি মন্থর, সেখানে বেকারের খতিয়ান্ ভয়াবহরূপে বেড়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু তার চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, এখন ভারতে বেকারের সংখ্যা কত, তার সঠিক হিসেব প্রস্তুত করে ওঠা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালে দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ১·৮৭ কোটি। কিন্তু বেকারের প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রগুলি কেবলমাত্র শহরাঞ্চলের বেকারদেরই তালিকাভুক্ত করে, গ্রামাঞ্চলের বেকারেরা থাকে পুরোপুরি বাইরে। শহরাঞ্চলের বেকারদের সবাই আবার কর্ম-বিনিময় কেন্দ্রের তালিকায় নাম লেখায়ও না। সেই হিসেবে সরকারের অনুমান, ১৯৮৬ সালের দিকে ভারতে উদ্বৃত্ত বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে সাড়ে ছয় কোটি। সেদিক থেকে বেকার-সমস্যা পঞ্চম যোজনার সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। তাই পঞ্চম যোজনা জোর দিয়েছে স্ব-নিয়োগ প্রকল্পগুলিতে। সেইজন্যে এতে কৃষি, ক্ষুদ্র-শিল্প, সেবা ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে নতুন সুযোগ-সৃষ্টির প্রধান উপায়রূপে গণ্য করা হয়েছে।

যোজনাকালীন বেকার-সমস্যা ও পঞ্চম-যোজনা

ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। পুরাতন ব্যাধির মতো বেকার-সমস্যা আজ তার অর্থনীতিকে জীর্ণ করে ফেলেছে। তার ওপর মন্দাকালীন ছাঁটাই এবং কোথাও কোথাও অটোমেশন-কম্পিউটার প্রবর্তনের ফলে অসংখ্য কর্মচারী আজ অন্নের তাগিদে পথের কাঙাল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার তরুণ, অর্ধ-বেকার যুবক, প্রৌঢ়-বয়স্ক উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও আক্ষরিক-জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থ-বধূরা পর্যন্ত আজ পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সমাধান-কল্পে কর্মপ্রার্থিনী। পশ্চিম-

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার রূপচিত্র

বঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের কর্মহীনতার চিত্র আরো ভয়াবহ। কর্মাভাবে, খাদ্যাভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বহু পরিবার নিদারুণ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অবশ্য, কলকাতার পাতাল-রেল, হুগলীর ওপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণ ইত্যাদি এবং হলদিয়া-বন্দর ও আনুষঙ্গিক কলকারখানা নির্মাণ-কার্যসূচীর রূপায়ণে কিছু লোক-নিয়োগ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এগুলির রূপায়ণের পর উদ্বৃত্ত কর্মীদের নিয়ে আবার ভাবতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে।

স্মরণীয় যে, বেকারের সংখ্যা নিছক সংখ্যামাত্র নয়। দেশের বেকার-সংখ্যার পশ্চাতে থাকে বুভুক্ষু ও নৈরাশ্য-পীড়িত অগণিত নরনারী। সুস্থ-বিকাশের জন্মগত অধিকার হারিয়ে তারা ভাবতে শুরু করে : তাদের জন্মগ্রহণ সঙ্গত হয়েছে কিনা? কাজেই, বেকার-সমস্যার অর্থ হলো, দেশের বিপুল সম্ভাবনার অপমৃত্যু। মানুষের যে শক্তি সমাজের সম্পদ-বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হতে পারতো, তার অব্যবহারের অর্থ এক বিশাল সামাজিক ক্ষতি। তার ওপর, বেকারত্ব কর্মহীন ব্যক্তির উৎপাদন-নৈপুণ্যকে বিনষ্ট করে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এনে দেয় এক গভীর নৈরাশ্যবোধ, যা থেকে বিক্ষোভ ও বিপ্লবের বারুদ ফেটে পড়তে পারে।

পরিণাম ও প্রতিরোধ

কিন্তু বেকার-সমস্যার সমাধান কেবল চাকরিতে নেই। বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্যে দেশময় কর্ম-সংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। চাষাবাদকে কেবল ঋতুগত পেশা হিসেবে না রেখে সারা বছরে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। তাছাড়া, সেচ-সুবিধা, সার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তার গ্রামীণ শিল্পে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নতুন রক্ত সঞ্চারিত করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। এবং যেখানে বিজ্ঞানের প্রয়োগে বেকার-সমস্যা তীব্র হয়ে উঠবে, সেখানে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ না করে, যেখানে বিজ্ঞান বেকার-সমস্যাকে জয় করতে পারে, সেখানেই আজ বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে।

সমাজের সতেজ শক্তির এই দুঃসহ অপচয় বেশীদিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। কাজেই, আর শূন্যগর্ভ বাগ্‌বিস্তার নয়, দেশময় শিল্প-বিস্তারের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হবে কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া। কৃষির আধুনিকীকরণ, কৃষি-শিল্পের বিকাশ, পথ ও পরিবহণের উন্নয়ন, শিক্ষার বৈচিত্র্যীকরণ, ঘরোয়া ও বৈদেশিক বাণিজ্যের নব-নব দিগন্ত উদ্ভাবন ইত্যাদির মাধ্যমে বেকার-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। অন্যদিকে, পরিবার-পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠায় মন দিলে শুভফল ফলবে। তাহলে এই কর্মহীনতা ও দুঃখ-দুর্দশার দুঃসহ নিশার অবসানে জন্মলাভ করবে এক বিশাল প্রাণ। প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সমৃদ্ধিময় ভারত-রচনার স্বপ্ন সার্থক হবে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতে বেকার-সমস্যা সমাধানের উপায়
- পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা
- বেকার-সমস্যার ফলাফল ও সমাধান

৬৪ বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন-সংকট

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ মধ্যবিত্ত-সমাজের ইতিহাস : উদ্ভব ও ক্রম-পরিণাম ॥ সমাজের নববিন্যাস ও মধ্যবিত্ত সমাজ ॥ মধ্যবিত্ত সমাজের গতি কোন্‌দিকে ? ॥ সংকট ॥ পুনর্জীবনায়নের পথ ॥ পথ-নির্দেশ : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ॥ শিক্ষার ধারা পরিবর্তন ॥ উপসংহার ॥

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত-সমাজের জ্ঞান-সাধনা, কর্ম-সাধনা ও ভাব-সাধনার গৌরবে রচিত হয় আধুনিক ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাস। আর, গত শতাব্দীর রেনেসাঁস—তাও এই সমাজেরই চিন্তা ও ভাব-বিপ্লবের প্রত্যক্ষ পরিণাম। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস-অর্থনীতি—সর্ব বিষয়ে মুদ্রিত রয়েছে মধ্যবিত্ত-মনীষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিন যারা ছিল জন-জাগরণের মহান্ পুরোহিত, যাদের অতন্দ্র তপস্যায় সমগ্র জাতির মরাগাঙে প্রাণের প্লাবন ছুটেছিল, আজ তারা চরম অবক্ষয়ের পথে দ্রুত চলেছে এগিয়ে, নিয়তির নির্মম পরিহাসে তারা আজ চরম সংকটের সম্মুখীন। কে তাদের এই সংকটের হাত থেকে বাঁচাবে ? কে তাদের শোনাবে অভ্যুদয়ের বাণী ?

মধ্যবিত্ত-সমাজের ইতিহাস : উদ্ভব ও ক্রম-পরিণাম

মধ্যবিত্ত সমাজ ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় সমর্থক লর্ড মেকলের পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও শাসনচক্রের সমর্থক একদল প্রভাবশালী যুবক-সৃষ্টির পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমাজের উদ্ভব। অন্যদিকে, ব্রিটিশ বাণিজ্য ও অর্থনীতির আক্রমণে ভারতের ঐতিহ্যময় কৃষি ও কুটির-শিল্পের ধ্বংস-স্তূপের ওপর লর্ড কর্নওয়ালিশের কৃতিত্বে প্রবর্তিত হলো বহু-কলঙ্কিত জমিদারী-তন্ত্র। নব্য-তন্ত্রের জমিদারী-পরিচালনা, হিসাবপত্র-সংরক্ষণ ও আইন-সংক্রান্ত দিকের অভিভাবকত্ব সেদিন গ্রহণ করেছিল এই মধ্যবিত্ত সমাজ। শুধু তাই নয়, এরাই সেদিন দলে দলে সিবিলিয়ান হয়ে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। আবার, এরাই সেদিন ব্রিটিশ বাণিজ্যের হিসাব-পত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে ভারতকে তাদের কাম-ধেনুতে পরিণত করে। সেদিন এরা ইংরেজানুগ্রহের গৌরবে এদেশের কৃষিজীবীদের ঘৃণা করেছে, তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজাতীয় সভ্যতার 'আশার ছলনে ভুলে' সেইদিকে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষার মধ্যস্থতায় তাদের অন্তরে জাগ্রত হলো যে দুর্জয় আত্মসম্ভ্রমবোধ, তা তাদের ইংরেজ-বিদ্বেষী করে তুললো, নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে তাদের এনে দাঁড় করালো জাতির সকল মুক্তি-আন্দোলনের পুরোধায়। স্বদেশের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে আবার তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হলো। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজকে এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হলো। আশা ছিল, জাতীয় সরকারের অনুগ্রহে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। কিন্তু নিদারুণ নৈরাশ্যে আজ সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজ ক্লান্ত, অবসন্ন।

ভারতে নতুনতর সমাজ-বিন্যাসের কাজ আরম্ভ হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা-কাল থেকেই। ফলে, শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে কেউ হয়েছে ধনী, কেউ হয়েছে দরিদ্র। উৎকট ধন-বৈষম্যের ফলে সমাজ আজ দ্বিধা-বিভক্ত। একদিকে শ্রমিক-সমাজ, অন্যদিকে পরশ্রমজীবীর দল—একদিকে সর্বহারা, অন্যদিকে ধনিক-সমাজ। এই দ্বিধা-বিভক্ত সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থান কোথায়? এরা ধনিক-শ্রেণীভুক্ত নয়; নয় পরশ্রমজীবী। এরা আত্মশ্রমে 'আপনাতে আপনি বিকশিত।' কিন্তু সেই শ্রম মানসিক। এরা তাই, বলা চলে, মস্তিষ্কজীবী-সম্প্রদায়।

সমাজের নববিন্যাস ও মধ্যবিত্ত সমাজ

সমাজের যে রূপান্তর প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে শুরু হয়, জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদের পর তা আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করলো। একদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতেই ছিল সমাজ-রথের রশিগাছি। আজ সেই রশিগাছি হাত-বদল হয়ে গেছে। ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার—আজ সমাজের অবহেলার পাত্র। যুগ-প্রবণতার প্রতিক্রিয়ায় তারা আজ ধনিক-সমাজের সমর্থক হতে পারে না। বরং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সহানুভূতি শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে। নেতৃত্বহীন শ্রমিক-সমাজের পুরোধায় ভবিষ্যতে তাই তারাই এসে দাঁড়াবে।

মধ্যবিত্ত সমাজের গতি কোন্‌দিকে?

মধ্যবিত্ত সমাজের এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের সূচনা হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে। দেশের কৃষি-সভ্যতার বনিয়াদ ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের দাক্ষিণ্যে শিল্পের বিকাশে উদ্ভব হলো শ্রমিক শ্রেণীর। অতি স্ফীত হয়ে উঠলো ধনপতি-গোষ্ঠী। অন্যদিকে, শ্রমিক-সমাজের হাতে এলো কাঁচা টাকা। বাজার-দর হলো ঊর্ধ্বমুখী। মধ্যবিত্ত সমাজের মাসিক বেতন, সরকারী বৃত্তি বা মাসিক রোজগার তার সাথে পাল্লা দিতে পারলো না। সেই ঘনীভূত সংকটের ফাঁকে এসে পড়লো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেশব্যাপী পণ্যাভাব ও মুদ্রা-স্ফীতি ইত্যাদি যুদ্ধের যাবতীয় প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্ত সমাজের ভিত্তিমূল দিল বিধ্বস্ত করে। তারপর পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ-বিভাগ মধ্যবিত্ত-সমাজের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিয়েছে। আর, যে স্বাধীনতার জন্যে তাদের শতাব্দীব্যাপী অতন্দ্র সাধনা, সেই স্বাধীনতাই তাদের বঞ্চিত করেছে বেশী। মধ্যবিত্ত-সমাজের আজ মাথা গুঁজবার স্থান নেই, স্বাস্থ্য নেই, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নেই। এক সূচীভেদ্য অন্ধকার গ্রাস করেছে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে।

সংকট

এই বিপুল সম্ভাবনাময় মধ্যবিত্ত-সমাজকে তিলে তিলে মরতে দেওয়া যেতে পারে না। পূর্ব শতাব্দীর ঐতিহ্য-গৌরবের কথা স্মরণ করে তার পুনর্জীবনায়নের সঞ্জীবনী মন্ত্র রচনা করতেই হবে। যার বুদ্ধি-মনীষার একদা সমগ্র ভারতের মুক্তির পথ অঙ্কিত হয়েছিল, আজ তার মুক্তির জন্যে অন্যের বুদ্ধি-মনীষার ওপর নির্ভর করতে হবে—এই আত্মধিক্কারের হাত থেকে মুক্তি কোথায়? তার চেয়ে আপন প্রাণ-প্রাচুর্যের গৌরবে, মনন-মনীষার গরিমায়

পুনর্জীবনায়নের পথ

সে আবিষ্কার করবে তার জীবন-কাঠি। অবশ্য, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সংবেদনশীল দৌত্যকর্মও চাই।

মধ্যবিত্ত সমাজের যে সংকট, তা মূলতঃ অর্থনৈতিক। কাজেই, মধ্যবিত্ত-সমাজের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্যে ক্রেতা-সমবায় বিপণি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উপকৃত হবেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমের প্রতি মধ্যবিত্ত-সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবার দিন এসেছে। তৃতীয়তঃ, বর্তমান প্রগতিশীল যুগে নারী-সমাজকে অন্তঃপুরচারিণী রাখার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। চতুর্থতঃ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের অসারতা ও অর্থনৈতিক অপচয় উপলব্ধির সময় কি এখনো আসেনি? পঞ্চমতঃ, সমাজের কর-বিন্যাস এমন হওয়া উচিত, যাতে মধ্যবিত্ত-সমাজ অব্যাহতি পায়। তাছাড়া, বাণিজ্যে মধ্যবিত্ত-সমাজকে উৎসাহিত করবার জন্যে সুবিধাজনক শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ষষ্ঠতঃ, ইংলণ্ডের মতো সামাজিক বীমার প্রচলনে মধ্যবিত্ত সমাজ উপকৃত হবে।

পথ-নির্দেশ : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

ইংরেজানুগত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা মধ্যবিত্ত-সমাজের উদ্ভব-ভূমিটি রচনা করে দিয়েছিল। আজ ইংরেজও নেই, তার সেই ইংরেজানুগত্যও নেই। কিন্তু শিক্ষাধারার 'সেই tradition সমানে চলেছে।' আজ মধ্যবিত্ত-সমাজকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যা তাকে রুজি-রোজগারের সন্ধান দিতে পারে, বাঁচার আশ্বাস দিতে পারে। আজ তাদের একথা বোঝার দিন এসেছে যে, গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিক্ষা লাভ করে চাকরি-শিকারের মধ্যে তার বাঁচার আশ্বাস নেই। বর্তমান অর্থ-শাসিত সমাজে সামান্য মাইনের শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, কেরানী ও দোকানদারদের সম্মান কোথায়?

শিক্ষার ধারা পরিবর্তন

মোটকথা, মধ্যবিত্ত-সমাজ সমগ্র পৃথিবীতে আজ চরম অবক্ষয়ের মুখোমুখি। তবু বুকে আশা জাগে, যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের বাস-ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার, হকার ও কারখানার শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখি! মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমবিমুখ, একথা আজ আর সত্য নয়। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথিকৃৎ মধ্যবিত্ত-সমাজ আজ বাঁচার জন্যে সত্যিই সংগ্রামশীল। তথাপি প্রশ্ন জাগে মনে, মধ্যবিত্ত-সমাজের এই-যে জীবন-সংকট, তার হাত থেকে কি তার সত্যিই মুক্তি নেই? ভারতের মধ্যবিত্ত-সমাজ তাহলে কি সত্যিই স্থান লাভ করবে অতীত ইতিহাসের ধূসর যাদুঘরে?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত-শ্রেণীর সমস্যা
- বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সংসারের সংকট
- বর্তমান সময়ে বাঙালীর জীবনযাত্রার মান

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ভারতের কুটির-শিল্পের পরাভব ও তার কারণ ॥ বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন ॥ ভারতের কুটির-শিল্পের চরম সংকট ॥ ভারতের কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়ন ॥ কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস ॥ উপসংহার ॥

৬৫

কুটির-শিল্প

বৈষয়িক পুনর্জাগরণের স্বার্থে আজ ভারতের কুটির-শিল্পের পুনর্জাগরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। অতি প্রাচীনকালেই তার কুটির-শিল্প লাভ করেছিল বিশ্ববিশ্রুত মর্যাদা। ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্যসম্ভার কিনবার জন্যে পৃথিবীর বিলাসী জাতিরা হাতে কড়ি নিয়ে ভারতীয় পণ্য-সম্ভারের পথ চেয়ে বসে থাকতো। বিশ্বের অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ কুটির-শিল্পের মাধ্যমে এদেশে প্রবাহিত হয়ে আসতো। আসতো ভারতের সুখ, আসতো ভারতের সমৃদ্ধি। সেদিন ভারত 'সোনার ভারত' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সেই সোনার খনি ছিল তার উর্বর শস্য-প্রান্তরে, ছিল কুটির-শিল্পীদের শিল্পের উপকরণগুলিতে। আজ কোথায় গেল তার ঢাকাই মসলিন? কোথায় গেল তার চন্দ্রকোণা? স্বদেশ-প্রেমিক কবি তাই পরম বেদনায় তাদের গৌরবময় স্মৃতিকে অশ্রুসিক্ত করে গাইলেন :

ভূমিকা

'বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।'

ভারতের সেদিন আজ অস্তমিত। ভারতীয় তাঁতিরা আজ আর বিশ্বমানবকে ঢাকাই মসলিনে সাজায় না। কাশ্মীরের সৌন্দর্য-বিলসিত শাল, দিল্লীর কারুকার্যময় রেশমী বস্ত্র আজ লুপ্তগৌরব। পরম বেদনার বিষয়, ভারতের যখন কুটির-শিল্পের স্বর্ণযুগ, তখন ইংরেজদের পূর্বপুরুষেরা ছিল 'চিত্রিত বর্বর'। কিন্তু শিল্প-সংঘাতে ভারত পরবর্তীকালে সেই বর্বরদের উত্তর-পুরুষদের হাতে পরাজিত হলো, হলো পদানত।

ভারতের এই পরাজয়ের কারণ—সে কোনদিন শক্তিচর্চা করেনি, করেছে শিল্প ও সৌন্দর্য-সাধনা। তাই সে শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদপুষ্ট প্রবল য়ুরোপীয় জাতিগুলির হাতে নির্মমভাবে পরাজিত হলো। তাদের কলকারখানাজাত দ্রব্য-সামগ্রীর কাছে ভারতের কুটির-শিল্পের ঘটলো পরাভব। ঢাকার মসলিন-শিল্পীদের এবং চন্দ্রকোণার তন্তুবায়দের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-ছেদনের কাহিনী এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনৈতিক বিজয় ইংরেজদের অর্থ নৈতিক সিদ্ধি এনে দিয়েছিল; আর, ভারতের ভাগ্যে এনে দিয়েছিল চরমতম অভিশাপ। অসম প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির-শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রী ইংরেজদের কলকারখানাজাত পণ্য-সামগ্রীর কাছে পরাজিত হলো। সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত-পুষ্ট বিজাতীয় পণ্যের কাছে পরাস্ত হয়ে তার কুটির-শিল্প একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভারতের কুটির-শিল্পের পরাভব ও তার কারণ

বিদেশী শক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের কুটির-শিল্প ছিল সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-মণ্ডিত এবং বৈচিত্র্য-বিলসিত। রেশম ও পশম-শিল্প, তন্তুবয়ন-শিল্প, দুগ্ধজাত

পণ্যশিল্প, চর্মশিল্প, কর্মকৃতি, কুম্ভকৃতি, শঙ্খকৃতি, বেত্র-শিল্প, কাগজ-শিল্প, অলংকার-শিল্প, কার্পেট, সূচী-শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প, ভাস্কর্য-শিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাঁচের চুড়ি, ঝিনুক-নির্মিত দ্রব্য, চীনামাটির বাসনপত্র, কাংস্য-শিল্প, ছাতা, মিষ্টান্ন-শিল্প, গন্ধদ্রব্য, রঞ্জন-শিল্প ও প্রসাধন-সামগ্রী ইত্যাদি ছিল ভারতের কুটির-শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তারপর বিদেশী শক্তির আবির্ভাবে ভারতের কুটির-শিল্পের সেই গৌরব-সূর্য হলো অস্তমিত।

বৈচিত্র্য-বিলসিত ভারতের কুটির-শিল্পের বিপুল আয়োজন

একদিন ভারতের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের জীবিকান্নের সংস্থান করে দিত তার কুটির-শিল্প। সেদিন কুটির-শিল্পের শ্রমিক-সংখ্যা ছিল প্রায় দু'কোটি। বিলেতের কাপড়ের কলের আক্রমণে একমাত্র তাঁতশিল্পেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যায়। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে সংঘাতে ভারতের কুটির-শিল্পের গৌরব পরিণত হলো ইতিহাসের এক বিস্মৃততম অধ্যায়ে। দীর্ঘকাল চর্চার অভাবে লুপ্ত হলো অতীতের কারিগরি দক্ষতা, শিল্প-প্রকর্ষ ও উৎপাদন-নৈপুণ্য। ঋণগ্রস্ত, অর্ধভুক্ত, রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন গ্রামীণ শিল্পীরা প্রতি মুহূর্তে শুনেছে মৃত্যুর পদশব্দ। নতুন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো তাদের উন্নত যন্ত্রপাতি নেই, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল নেই, শৈল্পিক দক্ষতা নেই, মূলধন নেই ; নতুন আবিষ্কারের জন্যে নেই গবেষণা, পণ্য-বিক্রয়ের জন্যে নেই কোন বৈজ্ঞানিক বাজার-পদ্ধতি।

ভারতের কুটির-শিল্পের চরম সংকট

কুটির-শিল্পের এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত স্বাধীন হলো। এলো পরিকল্পনার যুগ। শিল্পায়নের আয়োজন চলতে লাগলো দিকে দিকে। কিন্তু তার কুটির-শিল্প? ভারতের সেই বহু-ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির-শিল্প? ১৯৫৫ সালে হার্ভে কমিটি কুটির-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্পের দুর্গতি-মোচনের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলো। ভারতের অর্থনীতিতে কুটির-শিল্প যাতে তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্যে সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন সজাগ হয়েছেন। প্রথম পরিকল্পনায় একটি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়। তা ভারতের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে, তাঁত-শিল্প, রেশম-শিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, নারিকেল-ছোবড়া-শিল্প, হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট্—এই বোর্ডগুলি সমবায় আন্দোলন থেকে প্রাণপ্রবাহ সংগ্রহ করে নবজীবনের পথে চলেছে এগিয়ে। ঋণদান, কারিগরী প্রশিক্ষণ, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি-সরবরাহ, উপযুক্ত পণ্য-বিক্রয়-ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে চলেছে কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়নের আধুনিকতম আয়োজন।

ভারতের কুটির-শিল্পের নব-জীবনায়ন

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র-শিল্পের মধ্যে সুষম ভারসাম্যের গাঁট-ছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ভারত সরকার। কিন্তু বৃহৎ-শিল্পের আগ্রাসী অভিযানে ক্ষুদ্র-শিল্প ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বৃহৎ-শিল্প ও ক্ষুদ্র-শিল্প যাতে পরস্পরের পরিপূরকরূপে গড়ে ওঠে, সে জন্যে পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেছেন : এক. উৎপাদনবৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করবার

জন্যে শৈল্পিক দক্ষতা-বৃদ্ধি, কারিগরি পরামর্শ-দান, উন্নত যন্ত্রপাতি ও ঋণ-সরবরাহ; দুই. বিক্রয়-ব্যবস্থায় উৎসাহ-সৃষ্টির জন্যে রিবেট, দান ও সংরক্ষিত বাজারের ব্যবস্থা; তিন. ক্ষুদ্র শহর ও গ্রামাঞ্চলে কুটির-শিল্পের সম্প্রসারণ; এবং চার. শিল্পীদের মধ্যে সমবায় প্রথার বহুল প্রচলন। তাছাড়া, ব্যাঙ্ক-রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খুবই সহায়ক হয়েছে।

কুটির-শিল্পের উন্নয়ন-প্রয়াস

ভারতের কুটির-শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ধানভানা, তৈল-উৎপাদন, চর্মশোধন, দিয়াশলাই, গুড়, মক্ষিকা-পালন, তালগুড়, হস্ত-নির্মিত কাগজ, সাবান, সূতা ইত্যাদি উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং তাতে সুফল লাভ করা গেছে। এইভাবে সাতাশ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের খাতে ব্যয়িত হয় দুশো নব্বই কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে সরকারী খাতে ৬১১.১২ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ১.০৫০ কোটি টাকা। এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লোক-নিয়োগ ও স্ব-নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির ওপর। কিন্তু কেবল এতেই ভারতের কুটির-শিল্পের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়। ভারতের অবলুপ্ত কিংবা লুপ্তপ্রায়—অথচ একদা-বিখ্যাত—কুটির-শিল্পের সেই অনবদ্য সৃষ্টিগুলিকে আজ ফিরিয়ে আনতে হলে চাই পণ্য-বৈচিত্র্য ও উৎপাদন-উৎকর্ষের সাধনা। সম্প্রতি তাও শুরু করেছে ভারতের কুটির-শিল্প। ভারতে ভোগ্যপণ্যের যে বাজার আছে, তা জয় করে বিদেশের বাজারও আজ দখল করতে হবে। তার জন্যে ভারত সরকারের শিল্প-বিভাগ উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে প্রশিক্ষণ-দানের ব্যবস্থা করেছেন। এই উৎপাদন-বৈচিত্র্য ও উৎপাদন-উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্যে আধুনিকতম উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবার প্রয়াস সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন পৃথিবীতে ভারতের কুটির-শিল্পের হারানো বাজার পুনরধিকার করবার জন্যেও ভারত সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। ভারতের অর্থনীতির এই মরাগাঙে আজ বহুদিন পরে আবার জোয়ারের নতুন আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। কুটির-শিল্পের সমবায়ী নৌকার পালে আজ লেগেছে নতুন যুগের হাওয়া। অভূতপূর্ব গতির প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে কুটির ও গ্রামীণ-শিল্প। বহু শতাব্দীর জড়তা থেকে ভারতের গ্রামীণ-শিল্পের এই নব-জাগরণ ভারতবাসীর জীবনে সত্য হোক, সফল হোক॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতের কুটির-শিল্প
- বাংলার কুটির-শিল্প
- বাঙালীর শিল্প-সাধনা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ ॥ আধুনিক যুগ ॥ বাণিজ্যে বাঙালীর পরাভবের কারণ ঃ ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা, শিক্ষার ত্রুটি ॥ অন্যান্য ত্রুটি ঃ কৃষি ও শিল্পের অবনতি, বিজ্ঞান-চর্চার অভাব ॥ দুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্য-হীনতা, ভাবপ্রবণতা ॥ ত্রুটি-মোচন ॥ বাঙালীর নব-জাগরণ ॥ উপসংহার ॥

৬৬ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

'আজ পৃথিবীতে যে সমস্ত দেশ সম্পদশালী হয়েছে তাদের মূলে রয়েছে ব্যবসা।…কিন্তু আজ বাংলার লক্ষ্মীশ্রী বড়বাজারে, অন্তর্বাণিজ্যই বলুন, আর বহির্বাণিজ্যই বলুন, একে একে বাঙালীর হাত থেকে সব চলে গেছে বা যাচ্ছে।'

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভূমিকা

বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর অধিবাস। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া বাঙালী আজ বাণিজ্যে পরাজিত, হতমান। অথচ বাংলাদেশ বহু-বিচিত্র শিল্প ও বাণিজ্য-সম্ভাবনাময়। বঙ্গ-প্রকৃতি অকৃপণ হাতে নানা প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করে তার মাথায় ঢেলে দিয়েছে। ছোটনাগপুর থেকে উদ্ভূত বাংলার খরস্রোতা নদীগুলিতে প্রচুর জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা, রাণীগঞ্জ-আসানসোলে কয়লার প্রাচুর্য, উৎকৃষ্ট লৌহখনির সান্নিধ্য, ধান-পাট-চা ইত্যাদি অফুরন্ত কাঁচামালের দাক্ষিণ্য সত্ত্বেও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বাংলা একটি শিল্পে অনগ্রসর দেশ এবং বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ একটি জাতি। শ্রমবিমুখতা ও নৈষ্কর্ম্যের পরিণামে সে আজ সকল প্রকার বাণিজ্য থেকে বিতাড়িত।

বাঙালীর শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, ধনপতি-চাঁদসদাগর-শ্রীমন্তসদাগর-বিহারীদত্তের বাংলাদেশ কোনকালেই শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ ছিল না। অতি প্রাচীন কালেই বাঙালীর বাণিজ্য-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দররূপে গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত। সমুদ্রের সান্নিধ্য হারিয়ে তাম্রলিপ্তের পতন হলে বাঙালীর বাণিজ্য-চর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠলো সরস্বতী-তীরবর্তী সপ্তগ্রাম। সেখান থেকে উৎকৃষ্ট পণ্য-সামগ্রী নিয়ে বাঙালীর মধুকর-সপ্তডিঙা যাত্রা করেছে দেশ-দেশান্তরে। জলপথ ও স্থলপথ উভয় পথেই চলতো বাঙালীর বাণিজ্য। বিদেশের বিলাসী জাতিগুলি বাংলার পণ্য-সম্ভারের পথ চেয়ে হাতে কড়ি নিয়ে থাকতো বসে।

তারপর বাংলার সমৃদ্ধির আকর্ষণে এলো শক্তিমদগর্বী বিদেশীরা। তারা বাংলার কুটির-শিল্পকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। সরস্বতীর স্রোত-কার্পণ্যে সপ্তগ্রামের হলো পতন। এদিকে, বৈদেশিক জলদস্যুদের দৌরাত্ম্যে তার সমুদ্র-যাত্রাও হলো নিষিদ্ধ। তারপর পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠলো হুগলি-বন্দর। বাঙালী বণিকেরা হুগলি-বন্দরেও ভিড় করলো। শক্তি-সংঘর্ষে পর্তুগীজদের পরাজয়ে ও হুগলী নদীর স্রোত-কার্পণ্যে হুগলি-বন্দরেরও আয়ুষ্কাল এলো ফুরিয়ে। তারপর কলকাতা। কিন্তু য়ুরোপীয় বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে তাদের কেউ গেল কৃষিতে ফিরে, কেউ ডিগ্রির মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চাকরির অন্বেষণে পড়লো বেরিয়ে। নিজভূমে পরবাসীর মতো

বাঙালী কলকাতার মাটি আঁকড়ে পড়ে রইলো সামান্যতম জীবিকা ও সুদিনের আশায়। তারপর এলো পার্শী, মাড়োয়ারী, চীনা এবং পাঞ্জাবী ভাগ্যান্বেষীর দল।

আধুনিক যুগ

সংকট হলো আরো ঘনীভূত। কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ইতিপূর্বে বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। হাতে ছিল কলকাতার মাটি। এবার তাও চলে গেল পার্শী-মাড়োয়ারীদের হাতে। বড়বাজার, চৌরঙ্গী, পার্ক-সার্কাসের দিকে তাকালে আসল চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

'বাংলার টাকা আজ স্রোতের বেগে বাংলার বাইরে চলে যাচ্ছে। আর, আমরা কেবল চন্দনবাহী গাধার মতো চন্দন কাঠের ভারটুকুই অনুভব করছি।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতে, বাঙালীর ব্যবসাবুদ্ধির অভাব, তার শ্রমবিমুখতা এবং তার শিক্ষার ত্রুটির ত্র্যহস্পর্শে বাঙালীর বাণিজ্য তার হস্তচ্যুত হয়ে গেছে। কিন্তু

বাণিজ্যে বাঙালীর পরাভবের কারণ: ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, শ্রমবিমুখতা, শিক্ষার ত্রুটি

তার কৃষির অবনতি, কুটির-শিল্পের অধঃপতন, বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতার অভাব, বিজ্ঞান-চর্চার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, ভাব-প্রাধান্য ইত্যাদিও তার বাণিজ্যে পরাজয়ের জন্যে দায়ী। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু তার শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের। সেই ভাব-প্রধান বিদেশী শিক্ষা তার ব্যবসা-বুদ্ধি হরণ করে নিয়ে তাকে শ্রমবিমুখ করে তুলেছে ; আর, তার হাতে তুলে দিয়েছে হরিপদ কেরানীর উত্তরাধিকার। একটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি শুধুমাত্র হরিপদ কেরানী হবার জন্যে ফুরিয়ে যায়, তবে আর বাকি রইলো কি?

এদিকে, শক্তি-সংঘর্ষে বাংলার কুটির-শিল্প পড়লো ভেঙে। বেকার কুটির-শিল্পীরা এসে ভিড় করলো কৃষির দুয়ারে। ফলে, অতি-জনতার চাপে এবং বিদেশের

অন্যান্য ত্রুটি: কৃষি ও শিল্পের অবনতি, বিজ্ঞান-চর্চার অভাব, দুঃসাহসিকতার অভাব, মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, ভাবপ্রবণতা

কলকারখানার ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে তার কৃষি দেউলে হয়ে গেল। বাংলার কুটির-শিল্প আর কাঁচামাল পেল না। এদিকে, বাঙালীর নেই বিজ্ঞান-চর্চা, নেই বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতা। তার হাতে মূলধন নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনোবল নেই ; সে কি নিয়ে ব্যবসা করবে? আছে কেবল তার সস্তা ভাব-প্রবণতা। কিন্তু কেবল ভাবপ্রবণতায় কোন জাতি বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। রোম, গ্রীস, ব্যাবিলন বৈষয়িকতার শক্ত বনিয়াদ হারিয়ে যেদিন উৎসব-মত্ততায় ভেসে গিয়েছিল, সেইদিনই সূচিত হয়েছিল তাদের অধঃপতন।

অতএব কেবল উৎসব-উচ্ছ্বাস নয়, ভাবপ্রবণতা নয়, বাঙালী জাতির সর্বাগ্রে চাই বাণিজ্যের প্রতি অনুকূল মনোভাব এবং চাই উপযুক্ত বৈষয়িক শিক্ষা। আর

ত্রুটি-মোচন

চাই পুঁজি। সরকারকে আজ ব্যবসার প্রয়োজনীয় পুঁজি বাঙালীর হাতে পেঁছিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা ও পুঁজির কল্যাণে তার মনে বাণিজ্যের দুঃসাহসিকতা সঞ্চারিত হবে। ভয় কেটে যাবে, জড়তা কেটে যাবে ; বাঙালী আবার বাণিজ্যে জাগবে।

স্বাধীনতালাভের পর বাঙালীর ভাগ্য-বিপর্যয় পরিগ্রহ করেছে চরমতম রূপ। দেশবিভাগের শানিত খড়্গ বাংলাদেশের ওপরেই নিপতিত হলো। স্বাধীনতার বলি বাংলাদেশের বাণিজ্য-সম্ভাবনারও অপমৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু বাণিজ্যে বাঙালীকে আবার জাগতে হবে। আজ তার ঘর ভেঙে গেছে; তার দেশ ভেঙে গেছে; আজ তাকে দণ্ডকারণ্য ডাকছে, আন্দামান-নিকোবর ডাকছে, বিশ্বজগৎ ডাকছে। তার কাছে দণ্ডকারণ্য, আন্দামান-নিকোবর—কোন কিছুই সুদূর নয়। সে আজ সেই ডাকে সাড়া দেবে। আর, এদিকে সামান্য অর্থ আর কায়িক শ্রমকে মূলধন করে বাঙালী যুবকেরা ফুটপাতে নেমে পড়েছে। বাঙালীর আজ যেন নবজন্ম ঘটেছে। তার এই নবজন্ম লাভ সার্থক হোক। কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণে, বিজ্ঞান-চর্চার শুভারম্ভে ও বাণিজ্যিক সচেতনতায় তার এই নবজন্ম সার্থক হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও শিল্পীয় অর্থদান সংস্থার আনুকূল্যে এবং সমবায়-শক্তির দাক্ষিণ্যে তার পুঁজির অভাব দূর হবে। আর, বাণিজ্য-শিক্ষা সরবরাহ করবে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক জ্ঞান।

বাঙালীর নব-জাগরণ

আজ ভারতে এসেছে নব-জাগৃতি। নব-জাগৃতি এসেছে বাংলায়ও। বাঙালী কি তাতে আজ অংশ গ্রহণ করবে না? বৈষয়িক সমৃদ্ধির যে জোয়ার আসছে ভারতে, তা বাংলার মাটিকেও স্পর্শ করছে। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের মরা গাঙে আজ বহুদিন পরে বান এসেছে। শক্তহাতে আজ আবার তার ব্যবসা-বাণিজ্যের নাও খুলতে হবে। আবার, বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও শিল্পীদের উৎপাদনের জোয়ার এনে তাতে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের অনড় নৌকোটাকে সম্মিলিতভাবে ভাসিয়ে দিতে হবে। আজ আবার বাঙালীকে তার বহুকালের পরিত্যক্ত মধুকর-সপ্তডিঙাকে বাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী দিয়ে সাজাতে হবে, যেতে হবে দেশ-দেশান্তরে। পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে সে আবার সাগরপারের দেশগুলির কাছে গিয়ে বলবে—'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না?'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ব্যবসায়ে বাঙালী
- বাণিজ্য-সাধনায় বাঙালী
- বাঙালীর বাণিজ্য-সাধনা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা। বাংলার লোক-সাহিত্যের পরিচয়। লোক-সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ। এক. শিশু-সাহিত্য। দুই. মেয়েলি ব্রতকথা। তিন. ধর্ম-সাহিত্য। চার. পল্লী-সাহিত্য। পাঁচ. সভা-সাহিত্য। ছয়. ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য। সাত. প্রবচন-সাহিত্য। উপসংহার।

৬৭ বাংলার লোক-সাহিত্য

ভূমিকা

কেবল লোক-সাহিত্যের দর্পণেই পাওয়া যায় জাতির হৃদয়ের অন্তরতম পরিচয়। জাতির যুগ-যুগান্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, কাব্য-কল্পনা লোক-সাহিত্যের স্বর্ণ-রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হয়ে অমরত্ব লাভ করে। যুগ যুগ ধরে পঞ্চবটীছায়াচ্ছন্ন গ্রাম-বাংলা তার লোক-মানসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অপরূপ পসরা সাজিয়েছে তার লোক-সাহিত্যের সোনার তরীতে। যুগ-যুগান্তরের শত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পদ্মা-মেঘনা-ভাগীরথী-মহানন্দা-ইছামতীর স্রোত বেয়ে সেই সোনার তরী এসে ভিড়েছে বর্তমানের উপকূলে। লোক-সাহিত্যেই তার আত্মিক পরিচয় মুদ্রিত। তার লোক-সাহিত্যে সে হেসেছে, কেঁদেছে, মরেছে, বেঁচেছে। লোক-সাহিত্য তার হাসি-কান্না, মরণ-বাঁচনের অপরূপ কল-সংগীত।

বাংলার লোক-সাহিত্যের পরিচয়

বাংলার লোক-সাহিত্য বাঙালীর হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার শিবায়ন-মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা-পাঁচালী ও কবি-গানে, বাউল-ভাটিয়ালি-জারি-সারি-মুর্শিদা ও কীর্তনের গানে বেঁচে আছে বাঙালীর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণসত্তা। ফুল্লরা-খুল্লনা, বেহুলা-লখীন্দর, কালু-লখ্যা, মেনকা-উমা, মহুয়া-মলুয়া, লীলা-কঙ্ক, সোনাই-কাজলরেখা—এরা আমাদের প্রাণেরই প্রতিচ্ছবি। এদের আশ্রয় করে বাঙালী যত কেঁদেছে, তার তুলনা আর কোন জাতির ইতিহাসে নেই। সেই রূপসৃষ্টির অপূর্ব মায়াকাজলে অপরূপ হয়ে উঠেছে তার ব্রতকথা, রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি।

লোক-সাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ

বাংলার লোক-সাহিত্য তার প্রাণ-গঙ্গার মতো শতধারায় উৎসারিত। তার বাণীরূপও বহু-বিচিত্র। জীবনের বহু-বিচিত্র বর্ণবাহারে তা আমাদের সমাজ-জীবনকে চিত্রিত করে রেখেছে। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে তাদের অন্ততঃপক্ষে সাতটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। যেমন: এক. শিশু-সাহিত্য; দুই. মেয়েলি ব্রতকথা; তিন. ধর্ম-সাহিত্য; চার. পল্লী-সাহিত্য; পাঁচ. সভা-সাহিত্য; ছয়. ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য এবং সাত. প্রবচন-সাহিত্য।

বাংলার শিশু-সাহিত্য শাখায় পড়ে বাংলার রূপকথা, উপকথা, ছেলে-ভুলানো ছড়া ও ঘুম-পাড়ানি গান। রূপকথা ও উপকথা আধুনিক 'উপন্যাসের বাস্তুপুরুষ'। 'আমাদের দেশের রূপকথা—বহুযুগের বাঙালী বালকের চিত্ত-ক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য-পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া

আসিয়াছে; ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।' আর, ছেলে-ভুলানো ছড়া এবং ঘুম-পাড়ানি গানগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন পরিবর্তনশীল, বিবিধ-বর্ণে-রঞ্জিত, যদৃচ্ছ-ভাসমান মেঘের সঙ্গে। এই ছড়া ও গানগুলি মেঘবারি-ধারায় নেমে এসে শিশু-শস্যকে প্রাণদান করেছে এবং স্নেহরসে বিগলিত হয়ে কল্পনাবৃষ্টিতে উর্বর করে তুলেছে শিশু-হৃদয়কে।

এক. শিশু-সাহিত্য

'কবির নিকট ব্রতকথা বাংলার আদিম কাব্য। ঐতিহাসিকদের নিকট ইহা বঙ্গের গৃহ ও সমাজের ধর্ম ও কর্মের পুরাতন ইতিহাস। আর, মাতৃভক্ত বাঙালীর নিকট ব্রতকথা বঙ্গ-জননীর স্তন-নিঃসৃত প্রথম ক্ষীরধারা।' সাবিত্রী ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, তুষ-তুষালি ব্রত, পুণ্যপুকুর ব্রত ইত্যাদি শতসহস্র ব্রত উদ্‌যাপন এবং তাদের যুগ-যুগান্তর-রচিত মন্ত্রগুলির মাধ্যমে যে গার্হস্থ্য শান্তি ও প্রিয়কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা রূপলাভ করে, তার তুলনা কোথাও নেই।

দুই. মেয়েলি ব্রতকথা

বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি শাখা ধর্মের গানে মুখরিত। বাঙালী হিন্দুর সমাজে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান। সেই সব দেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তার মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী-সাহিত্য। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শিবায়ন, শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং লক্ষ্মীর পাচালীকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রাণের গভীরতম কান্না ব্যক্ত হয়েছে। তাছাড়া, কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত, আগমনী-বিজয়ার গান, বাউলগান ইত্যাদিতে বাঙালী হৃদয়ের অশ্রুর উৎসমুখ যেন খুলে গেছে।

তিন. ধর্ম-সাহিত্য

বাংলার পল্লী-সাহিত্যগুলি একেবারে পল্লীর মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত। তাদের গায়ে লেগে আছে বাংলার মৃত্তিকার ঘ্রাণ। পল্লীর মানুষের হৃদয়-ভূমিতেই তাদের জন্ম। ময়নামতীর গান, মানিকচাঁদের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, মুর্শিদা গান, সারিগান, জারিগান, ভাটিয়ালি গান, তরজা গান, পূর্ববঙ্গগীতিকা, টুসু গান—হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে বাঙালীর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে বাঙালীর সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

চার. পল্লী-সাহিত্য

প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি সভা-সাহিত্য প্রচলিত ছিল। গ্রামের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই পাশাপাশি বসে ভাব-বিহ্বল চিত্তে শুনতো কথকতা ও যাত্রাগান। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার সতীধর্ম, কর্ণ-হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগধর্ম, ধ্রুব-প্রহ্লাদের ভক্তি-বিহ্বলতা, ভীষ্ম-দধীচির আত্মত্যাগ ইত্যাদি কাহিনীর অভিনয় দেখে কিংবা ব্যাখ্যা শুনে গ্রামের সরল-প্রাণ পল্লীবাসীরা যে কত হেসেছে, কেঁদেছে, এবং ভক্তিস্রোতে ভেসেছে, তার তুলনা নেই। প্রাচীন ও আধুনিক কালের যুগ-সন্ধিকালে সৃষ্টি হয়েছিল যে কবিগান, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী গান ইত্যাদি সভা-সাহিত্য, তাতেও বাঙালীর সৃজনধর্মী প্রতিভার স্বাক্ষর আছে গভীরভাবে মুদ্রিত।

পাঁচ. সভা-সাহিত্য

প্রাচীন বাংলায় প্রকৃত ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য নেই। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক কাহিনী কিংবা কোন দৈব-দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনী অবলম্বন করে গণ-মানসে রচিত হতো লোক-সাহিত্য। মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের সাহিত্য। মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া, মলুয়া, সোনাই, কাজলরেখা বাংলার হৃদয়ের কোমলস্নিগ্ধ অভিব্যক্তি। এরা বাঙালী-হৃদয়ের অশ্রু-নির্ঝরের উৎসমুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

ছয়. ইতিবৃত্তমূলক সাহিত্য

বাঙালীর গণ-মানসে যুগ-যুগান্তর ধরে যে জ্ঞানচর্চা হয়েছে, তা সঞ্চিত হয়েছে তার প্রবচন-সাহিত্যের চিরায়ত ভাণ্ডারে। এইভাবে দিনের পর দিন জনগণের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রান্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ ফসলের আকারে ফলে উঠেছে। খনার বচন, ডাকের কথা, শুভঙ্করের আর্যা—তাছাড়া, অজস্র প্রবাদ-বাক্য প্রবচন-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে হৃদয় অপেক্ষা মননের স্বাক্ষর রয়েছে বেশী।

সাত. প্রবচন-সাহিত্য

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আক্রোশে আমাদের লোক-সাহিত্যের আনন্দ-লোক গেল ভেঙে। পল্লীর শান্তিনিকেতনও ভেঙে গেল। স্বামী ও শ্বশুরকুলের সঙ্গে নগরবাসিনী হয়ে গৃহলক্ষ্মীরাও ত্যাগ করলেন ব্রতাচার। এদিকে, 'পল্লীবাংলার বুকে সমস্ত দিনের দুঃখধান্ধার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।' আবার, বাংলার যে লোক-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি, দেশ-বিভাগের ফলে তাও আজ দ্বিখণ্ডিত। এপারে ফুল্লরা-খুল্লনার দল কাঁদছে, ওপারে মহুয়া-মলুয়া-কাজলরেখার দল। বিদেশীর ছুরিকাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন দুই বাংলার লোক-সাহিত্য কি কোনদিনই মিলিত হবে না? স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর যে আশা চকিতের জন্যে জ্বলে উঠেছিল, বঙ্গবন্ধু মুজিবের হত্যায় তা আবার হঠাৎ নিভে যায়। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি এভাবে ব্যর্থ হতে পারে না। বাঙালীর সংস্কৃতি এবং তার লোক-সাহিত্যের জয় হবেই হবে। লালন ফকির এবং গগন হরকরা কি বলেন?

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বাংলার গণ-সাহিত্য
- গণ-সাহিত্য ও গণ-শিক্ষা
- বাংলার লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা ॥ আধুনিক যুগ : বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা ॥ আচার্য জগদীশচন্দ্র ॥ বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ॥ সত্যেন্দ্রনাথ বসু; মেঘনাদ সাহা ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণ ॥ উপসংহার ॥

৬৮ বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙালী

'তাপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শবসাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিশাইয়া।'

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

বাংলাদেশ ভাব-প্রবণতার দেশ, অন্ধবিশ্বাসের দেশ ;—এই কলঙ্কময় অপবাদ মুছে ফেলে নবযুগের বাঙালী জাতি আজ মেতে উঠেছে বিজ্ঞানের সাধনায়। নবযুগের প্রভাতে বাঙালী জেগে উঠে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো, অতন্দ্র সাধনায় বিশ্বের বহু জাতি লাভ করেছে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর অমেয় আশীর্বাদ। বাঙালী আর কালবিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিজ্ঞান-সাধনায়। পরিণামে, তার কপালে জুটল বিশ্বের জয়মাল্য, বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। এখন বাঙালী বিজ্ঞান-সাধনার ক্লান্তিহীন সাধক। উপযুক্ত সুযোগ এবং অনুকূল পরিবেশে বাঙালীও যে বিজ্ঞানের বহু রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে, আজ সে তার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছে।

কিন্তু এতকাল এক দুঃসহ বার্ধক্য গ্রাস করেছিল তার ব্যক্তি ও সমাজ-মানসকে। প্রকৃতির নিয়মে সূর্য উঠেছে, সূর্য ডুবেছে, ফুল ফুটেছে, ফুল ঝরেছে—ঋতুর পর ঋতুর চলেছে নিরবচ্ছিন্ন শোভাযাত্রা ; এদিকে, জন্মমৃত্যু-বেষ্টিত জীবনের ওপর গাঢ় ছায়া বিস্তার করেছে জরা এবং ব্যাধি। কিন্তু কোনদিনই সে প্রশ্ন করেনি : কেন ? আসল কথা, 'বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেইদিকে সে মস্ত একটা কল।' আমরা সেই কল ঘুরতে দেখেছি, কিন্তু তার কারণ অনুসন্ধান করিনি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা

সমস্ত জগৎ জুড়ে বিশ্বকর্মার যে বৃহৎ কারখানা দিবারাত্রি নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ঘুরে চলেছে, সেই রহস্য-চক্রের লক্ষ্যভেদ করতে পারা চাই ; কিন্তু বাঙালী কোনদিন সে চেষ্টা করেনি। তাই দেখা যায়, যুগ-যুগ ধরে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক আর যাদুশক্তির ওপর তার অবিচল বিশ্বাস। সেখানে কোনদিনই বিজ্ঞান প্রবেশ করতে পারেনি। ডাকের বচন, খনার বচন এই সমস্ত তো কেবল পর্যবেক্ষণ এবং যুগ-যুগান্তরের অভিজ্ঞতার সংকলন মাত্র। তাই প্রাগাধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চার দৃষ্টান্তও একান্তভাবে দুর্লভ।

আধুনিক যুগের সূচনায় বিজ্ঞান-ব্রতী য়ুরোপ এসে দাঁড়ালো আমাদের দ্বারে। সে ভাঙলো আমাদের মনের অনড় অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার, নব নব জিজ্ঞাসার

মহাক্ষুধায় ভরে দিল আমাদের অন্তর। আমরাও বেরিয়ে পড়লাম বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর রহস্য-নিকেতনের রুদ্ধদ্বার খোলার জন্যে। বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা তাই সম্পূর্ণরূপে একালের ইতিহাস। বিজ্ঞাননিষ্ঠ ইংরেজ জাতির কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করলাম বিজ্ঞানের প্রথম দীক্ষা। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চার একটি অনুকূল মানসিকতা ও বাতাবরণ গড়ে উঠলো। কালক্রমে, সেখানে ফলে উঠলো রাশি রাশি সোনার ফসল। জয়যুক্ত হলো বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা।

আধুনিক যুগ : বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা

অবরুদ্ধ বিজ্ঞানের অনড় সিংহদ্বারে প্রথম করাঘাত হানলেন বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর বরপুত্র আচার্য জগদীশচন্দ্র। জড় ও চেতনের স্পর্শকাতরতা-সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি লাভ করলেন বাঞ্ছিত সাফল্য। আমাদের বহু-পরিচিত লজ্জাবতী লতার সাহায্যে তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজে উদ্ভিদের প্রাণ-স্পন্দনের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত করলেন। জড় ও চেতন—সর্বত্রই যে প্রাণের নির্বাধ প্রকাশ, আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সাফল্যে তা আজ আর অজ্ঞাত সত্য নয়। ইতিপূর্বে তিনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের দ্বারা বিনা-তারে বার্তাপ্রেরণের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। সেদিক দিয়ে বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারকের সম্মান, প্রকৃতপক্ষে, জগদীশচন্দ্রেরই প্রাপ্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বাংলাদেশের কেবল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীই নন, তিনি বাংলাদেশে বিজ্ঞান-সাধনার একটি গগনচুম্বী প্রতিষ্ঠান। তিনি এই পরাধীন জাতির বিজ্ঞানের গবেষণা-দৈন্য দূর করবার জন্যে জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থ দিয়ে ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর স্থাপন করলেন বসু-বিজ্ঞান-মন্দির। বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর পদতলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই মহামনীষী বিজ্ঞান-সাধনার যে অনুকূল পরিবেশ রচনা করে গিয়েছেন, তা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর সাধনার পীঠস্থানে বাংলার উদীয়মান তরুণ বিজ্ঞানীরা এসে ভিড় করলেন। তাঁরাও তাঁদের প্রতিভার দীপশিখা জ্বালিয়ে বিজ্ঞানের কক্ষ-কক্ষান্তর আলোকিত করে গেছেন। স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং মেঘনাদ সাহা পরবর্তীকালের সেই বিজ্ঞান-সাধকদের মধ্যে অন্যতম।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালী বিজ্ঞান-সাধকদের মধ্যে আর একটি স্মরণীয় নাম। কঠোর গবেষণার দ্বারা তিনি আবিষ্কার করলেন 'মার্কুরিয়াস্ নাইট্রেট'। বিপরীত-ধর্মী মার্কারি ও নাইট্রোজেনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিজ্ঞান-বীর প্রফুল্লচন্দ্র যে অসাধ্য-সাধন করেছেন, তাতে বিশ্ববাসী বিস্মিত, চমৎকৃত। মৌলিক আবিষ্কার ছাড়া তিনি তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানীদের আহ্বান করে বিজ্ঞান-সাধনার জন্যে রচনা করলেন একটি সুস্থ পরিমণ্ডল। অন্যদিকে আবার, বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে জন-জীবনে পৌঁছে দেবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল।' তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার সঙ্গে অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম যুক্ত হয়ে যে পরিশুদ্ধ ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছিল, বেঙ্গল কেমিক্যাল তারই মূর্ত প্রতীক।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র বাংলাদেশে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন, তা দেখতে দেখতে পবিত্র অগ্নিশিখার আকারে ছড়িয়ে পড়লো বাঙালী মনীষায়। এলেন বিজ্ঞান-সরস্বতীর তরুণ পূজারী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তখন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদ দিয়ে বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে যোজনা করলেন নতুন সূত্র। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত থিওরির সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো। পরমাণুর ক্ষেত্রে 'বোস এণ্ড আইনস্টাইন থিওরি' থাকবে চিরস্মরণীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে বিজ্ঞানবীর মেঘনাদ সাহার অধীনে পারমাণবিক বিজ্ঞান-চর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর পর তাঁর স্থলে ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী অভিষিক্ত হন। অন্যদিকে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে পরলোকগত দেবেন্দ্রমোহন বসুর পরিচালনায় বহু তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানী পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া, বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডঃ সহায়রাম বসু পেনিসিলিনের সমতুল পলিপরিন আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন। স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে শুধু বাঙালী জাতির কাছেই নয়, সমগ্র মানব-জাতির কাছে কৃতজ্ঞভাজন হয়ে আছেন। বাঙালী মহিলা-বিজ্ঞানীরাও আজ পিছিয়ে নেই বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে। নভোরশ্মি গবেষণায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে বাঙালী মহিলা-বিজ্ঞানী শ্রীমতী বিভা চৌধুরীর নাম।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণ

আসল কথা হলো, বিজ্ঞান-চর্চার জন্যে চাই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-তপস্বী মন এবং উপযুক্ত গবেষণাগার। বাংলাদেশে কেবলমাত্র বসু-বিজ্ঞান-মন্দির এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-ভবন ছাড়া উপযুক্ত গবেষণাগার আর নেই। তবু সেই অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে সামান্য উপকরণ নিয়ে যে বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙালী বৈজ্ঞানিকরা ব্রতী হয়েছেন, তাতে আজ বাঙালীর সম্মুখে বিজ্ঞানের নতুন নতুন দ্বার খুলে যাচ্ছে। বাংলার উদীয়মান তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজ নবচেতনার সাড়া পড়ে গেছে। নতুন নতুন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে আজ ঘটছে নব নব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন। এ অত্যন্ত আশার কথা। নব নব আবিষ্কারের মধ্যে আজ সফল হোক নবযুগের বাঙালীর বিজ্ঞান-তপস্যা॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- বিজ্ঞানে বাঙালী
- বাংলাদেশে বিজ্ঞান-চর্চা
- বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ ভারতের কৃষির সেকাল ও একাল॥ ভারতীয় কৃষির ত্রিবিধ মৌলিক সমস্যা : এক. ভূমি-সমস্যা : ভূমি-সংস্কার : মধ্যস্বত্বের বিলোপ, প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা, জমির সর্বোচ্চ-সীমা নির্দেশ, চকবন্দীকরণ॥ দুই. কৃষি-প্রকরণগত সমস্যা : জলসেচ॥ উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রপাতি, শস্য-চিকিৎসা ও শস্য-সংরক্ষণ॥ তিন. কৃষক-সমাজের সমস্যা : দারিদ্র্য ও অশিক্ষা॥ উপসংহার॥

৬৯ ভারতের কৃষি-বিপ্লব

'আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই।'

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

কৃষিই ভারতের অর্থনীতির মূল বনিয়াদ। এখনো ভারতের জনসংখ্যার সত্তর-শতাংশের জীবিকার সংস্থান কৃষি-নির্ভর। ক্ষুধার্ত জনগণের মুখে খাদ্য জোগানো ছাড়া কাপড়ের কল, চটকল ও চিনির কল ইত্যাদির রসদ জোগায় এই কৃষিই। তাছাড়া, রপ্তানির কড়ির বিশাল অঙ্ক ঘরে আনে কৃষিজাত পণ্যই। ভারতীয় কৃষির ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার কৃষি-প্রভাত কেবলই বিলম্বিত হয়েছে। অবশ্য, কৃষিতে এ পর্যন্ত ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা; কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারতের সেই অভিশপ্ত কৃষির শাপ-মোচন হয়নি।

ভারতের কৃষির সেকাল ও একাল

অথচ ভারতের কৃষি-গৌরব অতি প্রাচীনকালেই বিশ্বকে বিস্মিত করেছিল। তার শস্যের বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে ভারতের সঙ্গে একচ্ছত্র বাণিজ্যের জন্যে পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছিল সুতীব্র প্রতিযোগিতা। তার সেই বিশ্ব-বিশ্রুত কৃষি-গৌরবই হয়েছে তার দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার কারণ। শিল্প-বিপ্লবের আশীর্বাদপুষ্ট ব্রিটেন দুশো বছর ভারতের কৃষিকে কামধেনুর মতো দোহন করেছে। স্বাধীনতালাভের পর প্রথম যোজনায় তার পরিবর্তন-বিমুখ কৃষি-প্রান্তরে লাগলো প্রথম গতির স্পর্শ। তবু এখনো ভারতের কৃষি বিশ্বের কৃষি-প্রধান দেশগুলির পাশে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ।

ভারতের কৃষির সেকাল ও একাল

প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'মান্ধাতার আমলের হালবলদ নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।' ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আজ কৃষি-গবেষণাগারে সাফল্য লাভ করেছেন; কিন্তু সেই সাফল্যকে নানা কারণে কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ ত্রিবিধ—ভূমি-সমস্যা, কৃষি-প্রকরণগত সমস্যা ও কৃষক-সমাজের সমস্যা। এই ত্রিবিধ সমস্যার ত্র্যহস্পর্শে আজ নাভিশ্বাস উঠেছে ভারতীয় কৃষির।

ভূমি-সমস্যাই ভারতীয় কৃষির মৌল সমস্যা। তাই ভারত সরকার প্রথম যোজনাতেই ভূমি-সংস্কারে হাত দেন। মধ্যস্বত্বের বিলোপ, প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা, জমির সর্বোচ্চ-সীমা নির্দেশ, জোতজমির চকবন্দীকরণ—এই ব্যবস্থাগুলির ফলে, প্রায় দু'কোটি কৃষক সরাসরি ভূমি-মালিকানা লাভ করে। কিন্তু জমির সর্বোচ্চ-সীমা রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন হওয়ায় এবং তা মাথা-পিছু কিংবা পরিবার-পিছু হবে, তা এখনও বহু রাজ্যে স্থিরীকৃত না হওয়ায় উদ্বৃত্ত জমির ঘোষণা ও বিলি-বিতরণ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তার ফলে সরকারও পঞ্চম যোজনার দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছেন, ভূমি-সংস্কার আইনে বহু গল্‌তি থেকে গেছে। নতুন সরকার তাই ভূমি-সংস্কারকে সফল করে তুলতে কৃতসংকল্প।

এক. ভূমি-সমস্যা : ভূমি-সংস্কার, মধ্যস্বত্বের বিলোপ, প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা, জমির সর্বোচ্চ-সীমা নির্দেশ, চকবন্দীকরণ

ভূমি-সংস্কার কৃষি-প্রগতির পথ রচনা করে দেয়; আর, উৎপাদন-পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করে সবুজ-বিপ্লবের শুভ সূচনা। ভারতীয় কৃষির দৈব-নির্ভরতা দূর করে উৎপাদনের নিশ্চয়তা আনবার জন্যে উচ্ছৃঙ্খল নদীগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, খরা-নিবারণ ও জলসেচ—এই ত্রিবিধ কার্যসূচীর রূপায়ণে ভারত অগ্রসর হয়। ভারতের আবাদী জমির প্রায় পঁচাত্তর-শতাংশ এখনও সেচ-আওতার বাইরে। এতে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। পঞ্চম যোজনায় এই প্রকল্পে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। ভারতের জলসূত্রগুলির প্রায় সমস্তই আজ নিঃশেষিত। এবার তাই দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে বৃষ্টি-মরশুমের উদ্বৃত্ত জল ও ভূগর্ভস্থ জলের দিকে। খরা এবং বন্যা—এই দুই দানবীর লোলুপ রসনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে ভারতীয় কৃষি এবার স্বপ্রতিষ্ঠ হবে।

দুই. কৃষি-প্রকরণগত সমস্যা : জলসেচ

ভারতের সবুজ-বিপ্লবে সর্বাধিক কৃতিত্বের গৌরব কৃষি-বিজ্ঞানীদের প্রাপ্য। তাঁরা এমন কতকগুলি সংকর-বীজ উৎপাদনে সফল হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে ভারতের কৃষি-সমৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তাঁদের আবিষ্কৃত উচ্চফলনশীল বীজের ব্যাপক ব্যবহারের পথে বাধা প্রধানতঃ দুটি : এক. জলসেচের অপ্রসরতা এবং দুই. সার-প্রয়োগের স্বল্পতা। অর্থ, মনোযোগ ও সংগঠনের অভাবে ভারতের আবাদযোগ্য তিন-চতুর্থাংশ জমিতে উচ্চফলনক্ষম বীজের ব্যবহার কুণ্ঠিত। উচ্চফলনশীল বীজের সাফল্যের দ্বিতীয় শর্ত পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের কৃষক পৃথিবীর দরিদ্রতম হয়েও তাকে পৃথিবীর উচ্চতম মূল্যে সার কিনতে হয়। আজ একথা উপলব্ধি করবার দিন এসেছে যে, প্রাচীন চিরাচরিত কৃষি-যন্ত্রপাতি দিয়ে একালের কৃষি-সংকটের মোকাবিলা করা যাবে না। দেশে কিছু পাম্প-সেট এবং ট্রাক্টার নির্মিত হচ্ছে সত্য; কিন্তু সেগুলির মূল্য এবং বণ্টন-ব্যবস্থা এমন উচ্চগ্রামে বাঁধা যে, সাধারণ কৃষক তার নাগাল পেতে পারে না। শস্য চিকিৎসা ও শস্য-সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ঔষধপত্র ভারতে প্রস্তুত হচ্ছে।

উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রপাতি, শস্য-চিকিৎসা ও শস্য-সংরক্ষণ

কিন্তু তার উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারে যেন কোন অব্যবস্থা না থাকে। এ সব শর্তপূরণ না হলে সবুজ-বিপ্লবের ডাক অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তারপর আসে ভারতের কৃষিকাণ্ডের যারা পুরোহিত, সেই কৃষকদের কথা। হালের পেছনের এই মানুষগুলোকে নতুন যুগের কৃষি-ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে ভারতের কৃষির রাহুমুক্তি নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পচনশীল অর্থনীতি তাদের দীর্ঘদিন শোষণ করেছে। আজ ভূস্বামী, মহাজন, ব্যবসায়ী, ক্ষুদে অফিসার এবং রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা তারা শোষিত এবং প্রতারিত। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা তাদের চিরসঙ্গী। নবযুগের শোষকেরা তার সুযোগ গ্রহণ করে; কৃষির ওপরেও পড়ে তার অনিবার্য ছায়া। বলাবাহুল্য, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া ভারতের অর্থনীতিতে সবুজ-বিপ্লবের উচ্চফলনশীল বীজ হবে নিষ্ফলা। সাম্প্রতিক কালে পাঞ্জাবের সবুজ-বিপ্লবের মূলে আছে সেখানকার কৃষক-সমাজের সচেতন এবং সক্রিয় ভূমিকা। কৃষক-সমাজকে সর্বাগ্রে তাদের কৃষি-সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। তবেই কল্পিত সুফল লাভ করা সম্ভব হবে।

তিন. কৃষক-সমাজের সমস্যা : দারিদ্র্য ও অশিক্ষা

ভারতের চির-অবহেলিত কৃষি আজ নবযুগের সংবেদনশীল করস্পর্শের জন্যে প্রতীক্ষা-কাতর। সরকারও আজ দিকে দিকে সবুজ-বিপ্লবের বার্তা ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। বন্যাপ্রবণ নদীগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং ভূগর্ভস্থ জলরাশির পূর্ণ-ব্যবহারীকরণের মাধ্যমে খরাপ্রবণ অঞ্চলকে জলসিক্ত করবার জন্যে সরকার আজ কৃতসংকল্প। কৃষি-ক্ষেত্রে সার, উন্নত বীজ ও কীটঘ্ন ঔষধ পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেবে প্রয়োজনীয় পুঁজি। কিন্তু সেই সঙ্গে ভূমি-সংস্কারে হাত লাগিয়ে তাকে সর্বাগ্রে সফল করে তুলতে হবে। তা নইলে কৃষি-বিপ্লবের আশীর্বাদ শুধুমাত্র ধনবান জোতদারদের মাথায় ঝরে পড়বে; ভূমিহীন কৃষক বা প্রান্তিক চাষী বঞ্চিত হবে তার আশীর্বাদ থেকে। সেদিক থেকে ভূমি-সংস্কার কৃষি-বিপ্লবের প্রথম শর্ত। এ সব শর্ত যদি সফল হয়, তাহলে রাশি রাশি সোনালি শস্যসম্ভার নিয়ে আমাদের দুয়ারে ফেটে পড়বে আমাদের দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত কৃষি-প্রভাত॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাঙালী কৃষিজীবীর সমস্যা
- ভারতের কৃষি-সমস্যা
- ভারতের কৃষি-উন্নয়নের উপায়
- ভারতের কৃষি-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ অমাবস্যার রাত্রি ঃ ঝড়ের সূত্রপাত ॥ সন্ধ্যায় ঝড় ॥ অধিক রাত্রে ঝড় ॥ ঝড়ের নতুন অভিজ্ঞতা ॥ সকালের দৃশ্য ॥ স্মরণীয় কেন ? উপসংহার ॥

তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা

মানুষের জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে ; সব ঘটনাই স্মরণীয় হয় না। কিন্তু এমন এক-একটি ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে, যার কথা মানুষ সহস্র চেষ্টাতেও ভুলতে পারে না। হৃদয়-পটে সেই ঘটনার চিত্র যেন স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হয়ে যায়। আমার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতাও অল্প। তবু সেই ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা আমার মনের মণি-কোঠায় চিরদিনের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। যখন কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একা থাকি, তখন সেই ঝড়ের রাত্রি তার বিভীষিকাময়ী মূর্তি নিয়ে আমার মনের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। মনে মনে তার ঘোর তমসাময় ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠি।

ভূমিকা

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত্রি। সকাল থেকে মেঘ জমছিল আকাশে। কালো-কালো পুঞ্জীভূত মেঘের আড়ালে যে একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি। দেখতে দেখতে ঘনঘোর হয়ে উঠলো আকাশের চেহারা। সারাদিন ঝড়ো হাওয়ার কামাই ছিল না। তারই মধ্যে শুরু হলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। পথ জনবিরল। পশ্চিমবঙ্গের এক মফঃস্বলের শহর। সেই দমকা বাতাস এবং বৃষ্টির জন্যে পথে লোক-চলাচল প্রায় ছিল না। সারাদিন কেউ সূর্যের মুখ দেখেনি। সমস্ত শহর জলসিক্ত। তারই মধ্যে কখন সূর্যদেব অস্ত গেলেন, কেউ জানে না। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারে সারাটা দিনই রাত্রির মতো মনে হচ্ছিল। সেদিন ভোরে বাড়ির সবাই কৃষ্ণনগরে মামার বাড়ি চলে গেছে। আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু সামনে পরীক্ষা ; তাই আমার যাওয়া হলো না। স্থির হয়েছিল, সেই কয়টা দিন আমি আমার সহপাঠী বন্ধু রতনের বাড়িতে খাবো এবং বাড়িতে পড়াশোনা করবো। পরীক্ষা হয়ে গেলে আমিও মামার বাড়ি চলে যাবো। কথা ছিল, পাছে আমি ভয় পাই, তাই রতনও এসে রাতে আমার ঘরে ঘুমোবে। দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে আমি অতিকষ্টে রতনের বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যের পর থেকে ঝড় ও বৃষ্টির বেগ যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়তে লাগলো, তাতে রাতে রতনের বাড়িতে আমার খেতে যাওয়া আর হলো না। রাতে না খেয়ে থাকতে পারি ; কিন্তু রতন যদি না আসে, তবে একা ঘরে থাকবো কি করে ? এমনই দুর্ভাগ্য, সেদিন রাতে সত্যিই রতন এলো না। সন্ধ্যের পর ঝড় বাড়তে লাগলো। অন্ধকারে ঘরের বাইরে যখন ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছে, তখন ঘরের ভেতরে একা বসে আমি প্রতি মুহূর্তে ভয়ের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলাম।

অমাবস্যার রাত্রি ঃ ঝড়ের সূত্রপাত

সূর্যাস্তের পর শহরের বুকে যেন গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। শহরের বুকের ওপরের গাছগুলি শোঁ শোঁ শব্দ করে সেই দুর্জয় বাতাসের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে টিকে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তারপর শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। দুর্যোগের রাত্রি তার ভয়াবহতা নিয়ে বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় এবং বৃষ্টির বেগও যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো। কিছু শোনা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে যেন পৃথিবী দুলে উঠছে। কেবল ঝড়ের গর্জন আর মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের গগন-বিদারী শব্দ। পৃথিবী যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভয়ে আত্মগোপন করে আছে। অন্ধকারের এমন ভয়াল রূপ আমি কখনও দেখি নি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। কিন্তু তার পরের অন্ধকারের বর্ণনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই।

সন্ধ্যার ঝড়

ঝড়ের বেগ আরও বাড়তে লাগলো। ভাবলাম, এবার বুঝি পৃথিবীর অন্তিম লগ্ন উপস্থিত। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে এক ধ্বংসের অতলে যাবে তলিয়ে। দরজা-জানালায় ঝটিকার পদাঘাত অনুভব করছি। এক সময়ে হঠাৎ একটি জানালার কপাট খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডবে ঘরের ভেতরের সমস্ত কিছু ভিজে ও উড়ে গিয়ে তছনছ হয়ে গেল। জানালা বন্ধ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝড়ের বিক্রমের সঙ্গে যেন আমি পাঞ্জা লড়ছি। জানালাটা বন্ধ করলাম তো ওদিকে দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। এখন কোন্‌দিক সামলাই? দরজাও বন্ধ করে শক্ত করে খিল তুলে দিলাম। কিন্তু সমস্ত ঘর জলময় হয়ে গেছে। বৃষ্টির জলে আমিও ভিজে একাকার।

অধিক রাত্রে ঝড়

এখন শীত করছে। খোলা জানালা ও দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের ঝড়ের যে ভয়ানক রূপ দেখেছিলাম, তাতে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। বাইরে ঝড় সমানে চলেছে। যেন ঝড়ের তাণ্ডবে প্রকৃতির রাজ্যে ঘটে চলেছে এক সর্বধ্বংসী মহাপ্রলয়। কিছুক্ষণ পরে দরজায় বাইরে থেকে করাঘাত শুনে মনে করলাম, রতন বুঝি এসেছে। কিন্তু যদি রতন না হয়ে অন্য কেউ হয়? প্রথমে দরজা খুলবো কি খুলবো না, ভেবে পেলাম না। পরে বহু মানুষের আর্তকণ্ঠের চীৎকারে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে ঘরের ভেতরে ছিটকে এসে ঢুকলো কুড়ি-পঁচিশটি জল-সিক্ত অসহায় মানুষ। এরা আমার ঘরের একটু দূরে বস্তীর কুঁড়েঘরগুলিতে বাস করে। তাদের ঘরগুলি খড় আর গোলপাতায় ছাওয়া। সেই খড় আর গোলপাতায়-ছাওয়া দুর্বল চালাগুলি আর কতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে লড়তে পারে? ঝড় তার প্রচণ্ড তাণ্ডবে কখন তাদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তখন নিরুপায় হয়ে সেই নিরাশ্রয় মানুষগুলি আশ্রয়ের প্রত্যাশায় ঝড় আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমার ঘরের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছে।

ঝড়ের নতুন অভিজ্ঞতা

তারা প্রায় ঠাসাঠাসি হয়ে বসে আমার ক্ষুদ্র ঘরে সমবেতভাবে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির দ্রুত অবসান কামনা করতে লাগলো। জলময় আমার ঘর। তারাও জলসিক্ত। শীতে সবাই অসহায়ভাবে কাঁপছিল। অথচ আমার করবার কিছুই ছিল না। একটি বৃদ্ধা বড়ো করুণ স্বরে বুক ফাটিয়ে কাঁদছিল। দেয়াল চাপা পড়ে তার রুগ্‌ণ ছেলেটি মারা গেছে। সমবেত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় শেষে সেই ঘোর তমসাময়ী ঝটিকামুখর রাত্রির অবসান হলো। পূর্বদিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সকালের দৃশ্য

বাইরে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর যে বিধ্বস্ত চেহারা দেখলাম, তাতে মনে হলো, যেন কাল রাত্রে ধ্বংসের দেবতা তাণ্ডবে মেতে পৃথিবীর বুকের ওপর একটি মহাশ্মশান সৃষ্টি করে গেছেন। কত গাছপালা ভেঙে পড়েছে, কত কুঁড়েঘর নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কত মানুষ মরেছে, কত মানুষ আহত হয়েছে, পশু যে কত মরেছে, তার সংখ্যা নেই। চারদিকে সর্বস্বান্ত মানুষের বুকফাটা হাহাকার, আহত শোকার্তদের কাতর ক্রন্দন! যাই হোক, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় যুবকেরা উদ্ধার-কার্যে নেমে পড়লো। দুপুরের দিকে সদর থেকে সরকারী উদ্ধারকারীর দল এসে পড়লো। ধ্বংসস্তূপ অপসারিত করে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হতে লাগলো।

কেন জানি না, সেই ঝটিকাবিক্ষুব্ধ, দুর্যোগময়ী রাত্রির স্মৃতিকে আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। তবে মনে হয়, সেই রাত্রির যে ভয়াবহ মৃত্যুময় রূপ দেখেছি, সেইজন্যেই তাকে ভুলতে পারি না। সেই সঙ্গে অসহায় মানুষগুলির আমার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ সেই ভয়াবহতাকে দিয়েছিল আরও বাড়িয়ে। সকালে রাত্রির ঝড়ের যে

স্মরণীয় কেন?

ধ্বংসাত্মক রূপ দেখতে পেলাম, তাতে ভয়ে আমার অন্তরাত্মাও কেঁপে উঠেছিল। পরের দিন সকালে রতন এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কাল রাতে আমি আসতে পারিনি বলে তুই একা ভয় পাস নি তো?' মনে মনে রতনের ওপর ভারী-রাগ হয়েছিল। কিন্তু রতন সেদিন আসেনি বলেই তো আমি সেই ঝড়ের ভয়াবহতার এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছিলাম।

ঝড়ের রাত্রির সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে শিখেছি যে, প্রকৃতির মধ্যে যেমন শান্তির প্রলেপ আছে, তেমনি আছে ধ্বংসের তাণ্ডব-নৃত্য। শুভ্র-জ্যোৎস্না-

উপসংহার

পুলকিত যামিনী দেখে কখনও ভাবতে পারি না যে, তার আড়ালে অন্ধ-তমসাময়ী ঝটিকা-সংক্ষুব্ধা রাত্রি লুকোনো আছে। এরা প্রকৃতির দুটি রূপ। সেই ঝড়ের রাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে ভুলবো না॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- তোমার বাল্যস্মৃতি, ক. প্রা. '৬২
- তোমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা
- একটি ঝড়ের অভিজ্ঞতা
- একটি ঝড়ের বর্ণনা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ জীবনের লক্ষ্য স্থির করবার প্রয়োজন কি? আমার লক্ষ্য কি? এরূপ লক্ষ্য স্থির করার কারণ ॥ দেশের অবস্থার সঙ্গে আমার লক্ষ্যের যোগ ॥ সার্থকতা ॥ সংকল্পের সাধনা ॥ উপসংহার ॥

৭১ তোমার জীবনের লক্ষ্য

'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' —ভারতচন্দ্র

ভূমিকা

শৈশব বা কৈশোর মানুষের স্বপ্ন দেখার সময়। এই সময় মানুষ যে স্বপ্ন দেখে, তা কি কখনও সফল হয়? কারো হয়, আবার কারো স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। সবাই জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে না। তবু বড় হবার জন্যে সব মানুষেরই স্বপ্ন থাকা দরকার। সেই স্বপ্নই জীবনের লক্ষ্য। জীবনের সাফল্য-লাভের জন্যে চাই অবিচল লক্ষ্য। মহাসমুদ্রে নাবিক যেমন ধ্রুব-নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির রেখে বিশাল বারিধি-বক্ষে দিক্-নির্ণয় করতে পারে, তেমনি শৈশবেই মানুষ লক্ষ্য স্থির করে—সেই লক্ষ্যকে জীবনের ধ্রুব-তারা করে জীবন-মহাসমুদ্রে পাড়ি দিলে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে বিপথগামী হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। তবেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারা যায়।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবে কত মানুষ এই সীমাহীন পৃথিবীতে দিশেহারা হয়ে কাণ্ডারীহীন তরণীর মতো ঘুরে বেড়ায়; এইভাবে কত জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। জীবনে সাফল্য লাভের জন্যে চাই সুদৃঢ় সংকল্প। সেই সংকল্পই হবে তার জীবন-তরণীর সদা-জাগ্রত কাণ্ডারী, জীবন-পথের ক্লান্তিহীন অভিভাবক।

'মনরে, কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

জীবনের লক্ষ্য স্থির করবার প্রয়োজন কি?

আসল কথা, আমাদের এই মানব-জমিনে সোনা ফলাতে হবে। জমিনে সোনার ধান ফলাতে হলে যথাসময়ে বীজ-বপন এবং আনুষঙ্গিক পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনার দরকার। তেমনি জীবনের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন একাগ্র সাধনা, প্রয়োজন আন্তরিক ব্রতানুষ্ঠান, চাই অগ্রসরণের সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত পথ-রেখা। সেই পথ-রেখাই মানুষকে উপনীত করে দেবে তার জীবনের সফলতার তোরণ-দুয়ারে। সেই সফলতার সাধনাই তো তার জীবন-সাধনা। সেইজন্যেই জীবনের সূচনাতেই লক্ষ্য স্থিরীকৃত হওয়া উচিত।

আমি আধুনিক ভারতবর্ষের একজন সুদক্ষ কৃষক হবো। কৃষির উন্নয়নই হলো আমার জীবনের স্থির লক্ষ্য। আমার লক্ষ্যকে অনেকে সামান্য এবং দীন মনে করতে পারে। যারা এরূপ মনে করে, আমি তাদের দোষ দিই না। কারণ, দোষ তাদের নয়; দোষ তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার। কৃষক বলতে সবাই গতানুগতিক ধারায় মান্ধাতার আমলের কৃষকদের কথা ভেবে থাকে। আমাদের দেশের কৃষক-সমাজের

শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতেও পায় না। তাদের দারিদ্র্য চিরন্তন। তাদের বীজধান নেই, হালবলদ নেই, নেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষাবাদ করবার ধ্যানধারণা। তার সামর্থ্যও তাদের নেই। আমি সেরূপ ভগবৎ-নির্ভর, পরিবর্তন-পরাঙ্মুখ, রক্ষণশীল কৃষক হতে চাই না। আমি আধুনিক যুগের শিক্ষিত, সুদক্ষ, বিজ্ঞান-নির্ভর প্রগতিশীল কৃষক হতে চাই।

আমার লক্ষ্য কি?

আমার বন্ধুদের কেউ হতে চায় ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ-বা মুন্সেফ। চাকরিকেই সবাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করেছে। কিন্তু স্বাধীন কৃষক-বৃত্তিকে কেউ জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করতে রাজী নয়। অথচ প্রাচীন ভারতে কৃষিকে লক্ষ্মী মনে করা হতো। কৃষিই ছিল তখন সমগ্র দেশের ধন-সম্পদের উৎস। এখনো কৃষিই কৃষি-মাতৃক ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল সূত্র। যে কৃষি আমাদের দেশের অর্থনীতির মূল উৎস এবং নানা উপায়ে আমাদের দেশের লোক-সংখ্যার অধিকাংশের জীবিকার আয়োজন করে দেয়, তার পরিচালন-দায়িত্ব মুষ্টিমেয় নিরক্ষর, রুগ্‌ণ, পরিবর্তন-বিমুখ, দরিদ্র কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। কৃষিক্ষেত্র কিছু নতুনের আবির্ভাব-প্রত্যাশায় পথ চেয়ে বসে আছে। আমাদের শিক্ষিত যুব-সমাজের কেউ কি এই মাটির ডাকে সাড়া দেবে না? বস্তুতঃ, আমার এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পশ্চাতে আছে কবিগুরুর একটি গানের সুমহান্ প্রেরণা: 'ফিরে চল্ মাটির টানে।' আমি মাটির টানে মাটির কাছে ফিরে যেতে চাই।

এরূপ লক্ষ্য স্থির করার কারণ

ইংরেজরা সুদীর্ঘ দু'শতাব্দী ধরে ভারতের কৃষিকে কামধেনুর মতো দোহন করে দীনতার আবর্জনা-স্তূপরূপে পরিত্যাগ করে গেছে। ভারতের কৃষি আজ সর্বস্বান্ত। স্বাধীনতালাভের পর পরিকল্পিত উপায়ে ভারত-গঠনের আয়োজন সূচিত হয়েছে। দীর্ঘ বত্রিশ বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতের কৃষির অবস্থা আজও 'যথা পূর্বম্'। কোন উন্নতি হয়নি। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, কৃষির উন্নতি ভিন্ন শিল্পের উন্নতি নেই। কৃষিক্ষেত্রে আজও ভারতের সেই চির-পরিচিত হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের দল তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে চলেছে। ভোঁতা লাঙ্গল, রুগ্‌ণ হালবলদ, নিকৃষ্ট বীজ নিয়ে তারা সারহীন জমিতে যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণে ফসল ফলায়। তাতে তাদের পেটও ভরে না, দারিদ্র্যও ঘোচে না। চাষের জল তারা পায় না, চোখের জলে আর ঘামে মাটি ভিজে ওঠে। আমি আবার বুক বেঁধে মাথা উঁচু করে সেই দরিদ্র, হতাশাক্লিষ্ট কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে চাই। আমার স্বপ্নের কৃষি-সেবার মাধ্যমে যতটুকু সাধ্য দেশ-সেবা করে যাবো।

দেশের অবস্থার সঙ্গে আমার লক্ষ্যের যোগ

সার্থকতা

স্বপ্নের সিদ্ধির জন্যে চাই সাধনা। তাই আমি বিজ্ঞান পড়তে মনস্থ করেছি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান নয়, কৃষি-বিজ্ঞানই হবে আমার পাঠ্য। কৃষি-বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি আমাদের কৃষিক্ষেত্রে নেমে পড়বো। আমাদের যেটুকু জমি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, সন্নিহিত জমির মালিকদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে বিনিময়ের সাহায্যে তাদের একজোট করবার চেষ্টা করবো। আমার সেই চেষ্টা সফল হলে উঁচু বাঁধ দিয়ে মধ্যবর্তী সব আলবাঁধ অপসারিত করবো। তারপর আমাদের সামান্য যে পুঁজি আছে, তা দিয়ে একটা ট্রাক্টার কিনবার ব্যবস্থা করবো। তারপর একটা গভীর নলকূপ বসাবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং

সংকল্পের সাধনা

সেই সঙ্গে একটু উঁচু করে একটি মাপসই জলাধার নির্মাণ করে নিতে হবে। নলকূপ থেকে উত্তোলিত জল তাতে সঞ্চিত থাকবে এবং প্রয়োজন-মতো তা ব্যয় করা হবে। উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ক্রয় করে ফসলের রকমফেরের ব্যবস্থাও করবো। আসল কথা, আমি আমাদের এলাকার কৃষকদের সম্মুখে একটা উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো। আমার কৃষি-উৎপাদন-পদ্ধতির প্রতি সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হলে আমি তাদের সম্মুখে রাখবো সমবায় কৃষি-খামারের প্রস্তাব। আমি তাদের সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে থাকতে চাই। তাতে তাদের কল্যাণ হবে, দেশেরও কল্যাণ হবে।

এই আমার জীবনের স্বপ্ন, আমার জীবনের প্রিয় আকাঙ্ক্ষা। এর সাফল্যের সাধনাই আমার জীবনের লক্ষ্য। আমি জানি, জীবন-লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে আসে নানা বাধা, নানা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু আমি যদি আমার লক্ষ্য-সিদ্ধির পথ থেকে বিচ্যুত না হই, কোন বাধাই আমাকে টলাতে পারবে না। অদম্য উৎসাহই

উপসংহার

হবে আমার স্বপ্নের সফলতার পুঁজি। আমার বিশ্বাস, যদি আমার সাধনায় কোন শৈথিল্য না থাকে এবং মনের একাগ্রতা যদি অটুট থাকে, তবে আমার স্বপ্ন অবশ্যই সফলতা লাভ করবে। আমার একাগ্রতাই আমাকে সাফল্যের সিংহদ্বারে দেবে পৌঁছিয়ে, আমার প্রাণে যোগাবে নতুন উদ্যম ও নতুন প্রেরণা। সেই সঙ্গে আমার শপথ হবে—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন॥'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- তোমার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ও তাহা সফল করবার উপায়, উ. মা. '৬৪
- লক্ষ্যহীন জীবন নোঙরহীন নৌকার মতো, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০
- জীবনের লক্ষ্য
- আমার জীবনের লক্ষ্য

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ দুর্গেশনন্দিনী-পাঠের প্রথম অভিজ্ঞতা ॥ দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব ॥ দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাসের দ্বারোদ্ঘাটন ॥ প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ॥ রূপ-সৌন্দর্য ও চরিত্র-বিশ্লেষণ ॥ শক্তির মধ্যে সৌন্দর্য ॥ পাশ্চাত্য প্রভাব ? বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি ॥ উপসংহার ॥

৭২ আমার প্রিয় উপন্যাস ঃ দুর্গেশনন্দিনী

অবহেলিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যখন বয়ঃসন্ধিকাল, তখনই মূর্তিমতী কিশোরীর মতো বাংলা সাহিত্যের প্রান্তরে আগমন ঘটেছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'র। বাংলা সাহিত্যের সেই প্রত্যুষ-লগ্নে প্রাচীন যুগের অন্ধকার যখন সম্পূর্ণ অপসৃত হয়নি, যখন আধুনিক যুগের আলো আমাদের প্রাঙ্গণে পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি, ঠিক তখনই দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব। তার অভূতপূর্ব প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং অপরূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ বাংলাদেশের মনোহরণ করেছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বয়ঃসন্ধিকালের সেই উদ্বেল সৌন্দর্য ও অপরূপ লাবণ্য আমি খুঁজে পাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাই আমার অতি প্রিয় উপন্যাস।

ভূমিকা

শৈশবে পিতৃদেবের নির্দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পড়েছিলাম। শৈশবের সেই আলো-আঁধারী মায়ায় অদম্য কৌতূহল যখন জিজ্ঞাসার আলোক-বর্তিকা হাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ-রত, তখন প্রথম পরিচয়েই দুর্গেশনন্দিনী আমার মনোহরণ করে নেয়। সে তার রহস্যের তীব্র আকর্ষণে, নব-নব সৌন্দর্য-বিস্তারে, আকাশের ইন্দ্রধনুর মতো বীরত্বের বর্ণচ্ছটায় আমাকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীকালে বহু লেখকের বহু উপন্যাস পড়েছি। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী-পাঠের সেই কিশোরকালের মুগ্ধতা আমার আজও কাটেনি। দুর্গেশনন্দিনী আজও আমার প্রিয় উপন্যাস।

দুর্গেশনন্দিনী-পাঠের প্রথম অভিজ্ঞতা

১৮৬৫ সাল। বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় বর্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের নবীনা প্রতিভা সাহিত্যের সুধাভাণ্ড নিয়ে এ বছর আবির্ভূত হয়। বাংলা সাহিত্যে এলো যুগান্তর, এলো নবজীবনের উচ্ছ্বাস। 'পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই-কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়-বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।' দুর্গেশনন্দিনী নব-ভারতের সেই প্রথম প্রাণস্পন্দন।

দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব

ষোড়শ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের একটি ঘটনাবহুল পটভূমি। সেই

পটভূমিতেই বঙ্কিম স্থাপন করেছেন তাঁর প্রথম সৃষ্টি—'দুর্গেশনন্দিনী'কে। উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগ্রত প্রাণচেতনাকে তিনি অতীতের ইতিহাস-প্রবাহিনী করেছেন। আসল কথা, নব-জাগৃতির আলোকে তিনি ভারতের জীবন-ধারায় মহাভারত রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মানসিংহ-পুত্র জগৎসিংহ অশ্বারোহণে দুর্বার বিক্রমে চলেছেন গড় মান্দারণের পথে। অশ্বক্ষুরে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে রাঢ় বাংলার পথের ধূলো। পথিমধ্যে উঠলো ঝড়—প্রবল ধূলোর ঝড়। অশ্বারোহণে অগ্রসরণ অসম্ভব ভেবে জগৎসিংহ অশ্বটিকে ছেড়ে দিয়ে পদব্রজে অগ্রসর হতে লাগলেন। রাত্রি এলো—মেঘমুক্ত আকাশে হলো চন্দ্রোদয়। চন্দ্রালোকে জগৎসিংহ দেখলেন, সম্মুখে ধবলাকৃতি মন্দির। মন্দির-দ্বারে উপনীত হয়ে জগৎসিংহ বুঝলেন, দ্বার ভেতর থেকে অর্গল-বদ্ধ। জগৎসিংহের করাঘাতে মন্দির-দ্বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। কেবল গড় মান্দারণের শৈলেশ্বর মন্দির-দ্বারই সেই দুর্জয় আঘাতে উন্মুক্ত হলো না, সেইসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের নব-নব সম্ভাবনারও হলো শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন।

দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবে বাংলা উপন্যাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন

দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকৃত উপন্যাস ছিল না। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস'—উপন্যাসের খসড়া-জাতীয় রচনা। শিথিলগ্রন্থী সমাজের খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলির পরিহাস-তরল চটুল বিবৃতির মধ্য দিয়ে সামাজিক নক্‌শাই রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হলো বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী।

প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে নির্মাণ করেছেন সৌন্দর্যের এক মর্মর-মন্দির। এর কক্ষে-কক্ষান্তরে অপূর্ব সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সৌন্দর্য-জগৎ থেকে তিল-তিল সৌন্দর্য আহরণ করে তিনি যেন রচনা করেছেন এক অনবদ্য তিলোত্তমা মূর্তি। নায়িকা তিলোত্তমা সেই সৌন্দর্যেরই রূপমূর্তি—বাংলার উপন্যাস-উদ্যানে—'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল।' তার কমনীয়তা, তার সহজ সরল প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গিমা অপূর্ব, অবিস্মরণীয়। বিমলা চরিত্রের মধ্যে বাঙালীর নব-জাগ্রত প্রাণ-চেতনার স্ফুরণ অবশ্যই লক্ষণীয়। তার নানা উত্থান-পতনময় রহস্যঘন জীবনকাহিনী, তার অপূর্ব তেজস্বিতা বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বলাবাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কালের নারীর সেই প্রথম আবির্ভাব। আর, আয়েষা সৌন্দর্য, প্রেম ও ত্যাগের অপূর্ব প্রতিমূর্তি। বঙ্কিমের মতো আমাদেরও জিজ্ঞাসা—'আয়েষা দেবী, না মানবী ?'

রূপ-সৌন্দর্য ও চরিত্র-বিশ্লেষণ

এই দুর্বল শক্তিহীন দেশে বঙ্কিমই প্রথম দেখালেন যে, বীরত্বেরও একটি সৌন্দর্য আছে। জগৎসিংহের বীরত্ব, বীরেন্দ্রসিংহের অনমনীয় তেজস্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রেমিকের প্রতি ওসমানের জলন্ত প্রতিহিংসা এবং কতলু খাঁর শৌর্য-বীর্যের যে মূর্তি বঙ্কিম অঙ্কন করেছেন, তা অভূতপূর্ব। বঙ্কিম শক্তির মধ্যে সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করে নবযুগের জীবন-ভাষ্য রচনা করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে, তার সমাজের মধ্যে তিনি মহত্তর সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন। উত্তরকালে দেশ যাতে দুর্জয় আত্মশক্তির সন্ধান পায়, যাতে শক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়, সেজন্যে বঙ্কিম এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন এক স্বপ্নময় অনবদ্য জগৎ। 'দুর্গেশনন্দিনী' এক দিক দিয়ে সেই আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত-আবিষ্কার।

শক্তির মধ্যে সৌন্দর্য

কোন কোন সমালোচকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কটের 'আইভ্যান্ হো' এবং মধ্যযুগীয় য়ুরোপের 'নাইট'দের 'শিভাল্‌রিময় জীবনের অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বা জীবনধারার অনুবর্তন করেন নি, তিনি নবজাগ্রত কল্পনার দৃষ্টিতে ভারতীয় জীবনেরই সৌন্দর্যময় গতিচ্ছন্দ আবিষ্কার করেছেন।

পাশ্চাত্য প্রভাব

'দুর্গেশনন্দিনী' উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির প্রথম ভাব-তরঙ্গ। সেই ভাব-তরঙ্গে বাঙালী পাঠক কান্না-হাসির জীবন-দোলায় হেসে কেঁদে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। দুর্গেশনন্দিনী তাই বাঙালীর প্রথম জীবনবেদ। যদি সাহিত্যের মধ্যেই সমগ্র সমাজের দুর্বার মুক্তিবাসনা নিহিত থাকে, যদি সাহিত্য স্বকাল ও স্বদেশের মূর্ত প্রতিচ্ছবি হয়, তবে দুর্গেশনন্দিনী নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার, হাসি-কান্নার মণি-মঞ্জুষা।

বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের ভগীরথ, বাংলা ভাষার প্রথম রূপদক্ষ শিল্পী এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের প্রথম জাতীয় পুরোহিত। আজ একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সমগ্র দেশ কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। কি সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কি সমাজ-গঠনে, কি স্বদেশপ্রেমের বেদমন্ত্র-উচ্চারণে, কি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক রূপায়ণে তিনি বাঙালী জাতির অশেষ উপকার সাধন করে গিয়েছেন। দুর্গেশনন্দিনীতেই তাঁর সেই স্বজাতি-দর্শন ও ভারত-আবিষ্কারের শুভ সূচনা। এবং এই দুর্গেশনন্দিনীতেই আমার কৈশোরে প্রথম ভারত-দর্শন ঘটেছিল। সেইজন্যে দুর্গেশনন্দিনী আমার বিস্ময়মুগ্ধতার উপন্যাস—আমার প্রিয় উপন্যাস॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- একখানি শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস

৭৩
আমার প্রিয় গ্রন্থকার : বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ বঙ্গ-সরস্বতীর পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ॥ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-সমন্বয় ॥ কেন প্রিয় গ্রন্থকার ? বঙ্কিম-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য ॥ স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্গাতা ॥ উপসংহার ॥

'আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী-কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালী পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিম রশ্মি নিপতিত হইল।'

—রবীন্দ্রনাথ

যখন বাংলায় কোন সাহিত্যাদর্শ ছিল না, অবহেলায় হতাদরে যখন বাংলা সাহিত্য নিমজ্জিত-প্রায়, তখনই যিনি রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাংলার সাহিত্যকে, বাঙালীর ভাষাকে সেই চরম অধঃপতন ও অবমাননার হাত থেকে উদ্ধার করলেন, তিনিই আমার প্রিয় গ্রন্থকার—বঙ্কিমচন্দ্র। সেদিন ছিল সত্যিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঘোর দুর্দিন। একদিকে, ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে বাংলা ভাষা ছিল বর্বরের ভাষা ; অন্যদিকে, সংস্কৃতজ্ঞদের কাছে তা ছিল চণ্ডালের ভাষা। সমাজের উভয় শ্রেণীর এই অপমান ও অনাদর মাথায় নিয়ে আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চলেছিল দীনা হীনা অবমানিতার বেশে। তার কোলের সন্তানেরা তাকে পরিত্যাগ করে 'পরধন-লোভে' মত্ত হয়ে যখন কুক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করে ফিরছিল, ঠিক তখনই তৎকালীন শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভার উপচার সাজিয়ে বঙ্গ-সরস্বতীর পদতলে ভক্তি-নম্র শিরে এসে দাঁড়ালেন।

ভূমিকা

তখন চারদিকের ঘৃণা ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করে দৃঢ়চেতা বঙ্কিম বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে তাঁর পূজা-নিবেদনের অর্ঘ্য রচনা করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রবেশ করলেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কৃপা প্রদর্শন করতে আসেন নি ; প্রকৃত পূজারীর মতো, শ্রদ্ধাশীল ভক্তের মতো তিনি প্রতিভার নৈবেদ্য সাজিয়ে আনলেন। বঙ্গ-সরস্বতীর মুখে হাসি ফুটলো, সাহিত্যের নানা উপচার যেন আশীর্বাদের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

বঙ্গ-সরস্বতীর পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র

'বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই

বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর

বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।'

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাব-সমন্বয়

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সংঘাতে উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবের যে বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস উত্থিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অপূর্ব বাণীমূর্তি দান করলেন। তিনি ঋষি অগস্ত্যের মতো পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশিকে যেন এক গণ্ডূষে পান করে আত্মস্থ করেছিলেন এবং পশ্চিমবাহিনী সকল নদীকে পূর্ববাহিনী করে বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশা স্বহস্তে মোচন করলেন। নব-নব সৃষ্টির উল্লাসে বাংলা সাহিত্যে এলো ফসলের জোয়ার, বাংলা ভাষা সহসা উর্বরা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো, বাসভূমি হলো যথার্থ মাতৃভূমি। আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই সব ফলে উঠতে লাগলো।

কেন প্রিয় গ্রন্থকার?

কেবল এই জন্যেই যে বঙ্কিমচন্দ্র আমার প্রিয় গ্রন্থকার, তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমাদের সুপ্ত চেতনার প্রথম জাগৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলাম—আমাদের বন্দিনী ভাবনাসমূহের প্রথম মুক্তি দেখেছিলাম। কল্পনার অবাধ বিস্তার এবং হৃদয়ের অবারিত প্রসার সেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। সেই সঙ্গে সমাজকে, স্বদেশকে আমরা ভালোবাসতে শিখলাম। সেই ভালোবাসা অন্ধের ভালোবাসা নয়, চক্ষুষ্মানের জাগ্রত প্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চিত্তের উদ্বোধন ঘটিয়ে আমাদের হৃদয়ে দেশ-প্রীতির জোয়ার বইয়ে দিলেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে, তাঁর প্রবন্ধাবলীতে, তাঁর কমলাকান্তে, তাঁর মুচিরাম গুড়ের জীবনকাহিনীতে আমাদের কেবল চিত্ত-মুক্তিই ঘটলো না, আমাদের আত্মদর্শনও ঘটলো। সেদিন বঙ্কিম-রচনাবলীর মধ্যস্থতায় আমরা নিজেদের চিনতে পারলাম।

বঙ্কিম-রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' আমাদের মনোহরণ করেছিল। দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহের মতো তিনিও যেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্বার অশ্বারোহণে এলেন। ফলে, গড় মান্দারণের কেবল শৈলেশ্বর মন্দিরেই নয়, বাংলা সাহিত্যের মন্দির-দ্বারেও পড়লো দুর্জয় করাঘাত। সৌন্দর্যবিলসিত ভাষার অনবদ্য সুষমায়, বর্ণনার চমৎকারিত্বে, ঘটনার উপস্থাপনায় ও রোমান্সের বর্ণাঢ্য আলোক-সম্পাতে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম দর্শনেই আমাদের চিত্ত জয় করে নিল। তারপর এলো কপালকুণ্ডলা। তরঙ্গমুখর নির্জন সমুদ্র-তীরের প্রেক্ষাপটে বন-বালিকা কপালকুণ্ডলার যে বাণী-বিগ্রহ বঙ্কিম রচনা করলেন, তা অনবদ্য। তারপর অপূর্ব তরঙ্গ বিস্তার করে এলো বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, রজনী, ইন্দিরা ও সীতারাম। এলো কমলাকান্ত, মুচিরাম গুড়, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র। তাঁর 'কমলাকান্ত' চির-নতুন সোনার সম্মার্জনী এবং তাঁর 'আনন্দমঠ' দেশাত্মবোধ-উদ্বোধনের প্রথম জাতীয় বেদগ্রন্থ। আর, তাঁর 'বন্দে মাতরম্' সংগীত দেশ-মাতৃকার পূজার অপূর্ব বেদমন্ত্র।

ইতিমধ্যে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কাব্য-কবিতায় এবং ভাবে-চিন্তায় আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ধীর-মন্থর উন্মেষ ঘটছিল। কিন্তু স্বদেশের ছিল না কোন রূপমূর্তি, ছিল না মাতৃ-প্রতিমার স্বরূপ। বঙ্কিম মানবী-জননী, দেশ-জননী এবং দেবী-জননীর সমাহারে দেশ-মাতৃকার এক অনবদ্য বাণী-বিগ্রহ রচনা করে দেশবাসীর হাতে তুলে দিলেন। ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে যেন ত্যাগ-সমুজ্জ্বল সন্তান-ধর্মে দীক্ষিত করলেন তিনি। তাছাড়া, সেদিন সমগ্র জাতিকে তিনি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের মহালগ্নকে ত্বরান্বিত করেছেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমাহারে তিনি তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে নবযুগের মাতৃ-বিগ্রহ তুলে ধরেছিলেন, তা জাতির জীবনে ব্যর্থ হয় নি। এতদিন জাতির হৃদয়-মন্দিরে ছিল না মাতৃ-বিগ্রহ, শূন্য পড়েছিল পূজা-বেদী। বঙ্কিম সেই শূন্য আসনে দেশমাতৃকার নিরুপম মূর্তি স্থাপন করে আমাদের মাতৃ-পূজার আয়োজন করলেন। দেখতে দেখতে হৃদয়ের মন্দিরে মন্দিরে সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হতে লাগলেন। মাতৃ-পূজার হলো শুভ উদ্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম যথার্থ রূপকার, মাতৃ-পূজার বোধন-মন্ত্রের প্রথম বৈদিক ঋষি।

স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্গাতা

সামগ্রিকতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যেন ষাট সহস্র সগর-সন্তানের মতো ভস্মীভূত হয়ে পড়েছিল। কোথাও ছিল না প্রাণের স্পন্দন, কোথাও ছিল না শ্যামলতার আভাস। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিভাবলে ভাব-মন্দাকিনীর ধারাস্রোত বাংলা সাহিত্যের ধূসর ঊষর প্রান্তরে বহন করে আনলেন। বাংলা সাহিত্যের মৃত এবং ভস্মীভূত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাসমূহ পুনর্জীবন লাভ করলো এবং সোনালী ফসলের আকারে থরে থরে করলো আত্মপ্রকাশ। পতিত, বন্ধ্যা সাহিত্য-প্রান্তরে এবার ফললো সোনার ধান। পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী সেই ধানে বোঝাই হলো, বাংলা ভাষার চরণতীর্থে সমগ্র জগৎ যাওয়া-আসা শুরু করলো। বাংলা সাহিত্যের এই চরম সমুন্নতির দিনে বঙ্কিমের কাছে আমরা কতখানি ঋণী, তা স্বীকার না করলে আমাদের জাতীয় জীবনের হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্য-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী যেন না ভোলে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র
- আমার প্রিয় সাহিত্যিক ও তাঁহার গুণাবলী, উ. মা. '৬১

প্রবন্ধ-সংকেত : ভূমিকা ॥ আবির্ভাব ও বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠালাভ ॥ কৈশোর ও প্রথম যৌবন ॥ নজরুল-প্রতিভার প্রেরণা-উৎস ॥ বিদ্রোহী যৌবনের কবি ॥ নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার সৌন্দর্য ॥ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ ॥ উপসংহার ॥

৭৪ আমার প্রিয় কবি : নজরুল ইসলাম

যে কবির কাব্যে মৃত্যুঞ্জয়ী চির-যৌবনের জয়ধ্বনি শুনেছিলাম, শুনেছিলাম অগ্নি-বীণার সুর-ঝঙ্কার, যিনি ধীর স্থির অচঞ্চল বাংলা কাব্যে বয়ে এনেছিলেন দুর্বার কালবৈশাখীর ঝড়, সেই বিদ্রোহী-কবি কাজী নজরুল ইসলামই আমার প্রিয় কবি।

ভূমিকা

এই পরাধীন জড়তাগ্রস্ত সমাজের বুকে তিনিই তো সঞ্চারিত করেছিলেন নব-যৌবনের শোণিত-ধারা। তাঁর কবিতাগুলি নব-ভারতের সঞ্জীবনী মন্ত্র, তাঁর সংগীত সর্বহারাদের কান্নার বাণী। তাঁর সংগীত ও কবিতায় সেদিন 'নবযৌবন-জলতরঙ্গে'র বিপুল আবেগে নেচে উঠেছিল 'হিমাচল-চাপা প্রাচী'।

বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে ধূমকেতুর মতো নজরুল ইসলাম দুর্বার পদ-বিক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাভূমিতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটিই, প্রকৃতপক্ষে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশের প্রথম ছাড়পত্র-স্বরূপ। উদাত্ত-কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন—

আবির্ভাব ও বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠালাভ

> "বল বীর—
> বল, উন্নত মম শির
> শির নেহারি' আমারি নত-শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।
> বল বিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
> চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
> উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর।"

কেবলমাত্র এই 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই বাংলা কবিতার আসরে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। কবি নজরুল হলেন বাংলার বিদ্রোহী-কবি।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। ধর্মপ্রাণ দরিদ্র পিতা নাম রেখেছিলেন দুখু মিঞা। পিতৃ-বিয়োগের পর কবি-কিশোর নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং অভিভাবকহীনতার জন্যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময়ে লেটো

কৈশোর ও প্রথম যৌবন

গানের দলে গান রচনা ও সুর-সংযোজনা করার প্রয়াসের মধ্যে নজরুল-প্রতিভার প্রথম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পরে মাংসের দোকানে চাকরি ও সিয়ারশোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি—এ সব নজরুলের জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা। কিন্তু তার চেয়েও চমকপ্রদ ঘটনা হলো তাঁর বাঙালী পল্টনে যোগদান। কারও মতে, তিনি করাচী পর্যন্ত গিয়েছিলেন; কারও মতে, মেসোপটেমিয়ায়। সে যাই হোক, সেনাবাহিনীতে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে তিনি 'হাবিলদার' পদে উন্নীত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হলো। ছাঁটাইয়ের খাতায় নাম উঠলো নজরুলের। মনে মহাযুদ্ধের স্মৃতি এবং হৃদয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবাগ্নি জেলে দুদ্দাড় আবেগে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে এলেন বাংলার হাবিলদার কবি। এবার তিনি বিদ্রোহের বহ্নিচ্ছটা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে অবতীর্ণ হলেন। পুরাণ-কোরান-গীতা-মহাভারতের গভীর জ্ঞান এবং আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-বাংলার শব্দ-ভাণ্ডারের দুর্লভ চাবিকাঠি ছিল তাঁর হাতে। আর ছিল উদাত্ত কণ্ঠ এবং রাগ-রাগিণীর জ্ঞানের সঙ্গে বাংলার কীর্তন-বাউল-সারি-ভাটিয়ালির প্রতি প্রাণের টান ও সেই সঙ্গে পার্শী-গজলের প্রাণ-মাতানো সুর-বাহার।

নজরুল-প্রতিভার প্রেরণা-উৎস

নজরুল চির-যৌবনের কবি। প্রাণ-প্রাচুর্যই যৌবনের নিশ্চিত প্রাণ-লক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আশাভঙ্গ-হেতু সেই যৌবন বিদ্রোহ-ধর্মী। রক্তাক্ত কাপালিকের মতো সর্ব শোষণ-শাসন-শৃঙ্খলা সবলে ভাঙবার দুর্জয় সাধনায় সে ব্রতচারী। নজরুলের কাব্যে শোনা গেল সেই বিদ্রোহী যৌবনের নির্বাধ পদধ্বনি। রবীন্দ্রনাথও বিস্মিত স্নেহে নজরুলকে স্বীকার করে নিলেন।

বিদ্রোহী যৌবনের কবি

বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে নজরুল দেখলেন, দেশব্যাপী পরাধীনতার নীরন্ধ্র অন্ধকারে, ধনিক শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের নির্লজ্জ শোষণে সমগ্র সমাজে রচিত হয়েছে এক বিশাল শ্মশান-ভূমি। তিনি উদ্ধত কাপালিকের মতো সেই শ্মশান-ভূমিতে উচ্চারণ করলেন শব-সাধনার ভৈরবী মন্ত্র—

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতার সৌন্দর্য

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।" —ভাঙ্গার গান

বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

"আমি বেদুয়িন, আমি চেঙ্গিস্
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুনিশ।" —বিদ্রোহী

কারণ 'সোহহং'—আমিই সেই। আমার ললাটে ঈশ্বরের আশীর্বাদের ললাটিকা; আমি কারও কাছে মস্তক অবনত করতে পারি না। মানুষ যতদিন অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্দী থাকে, ততদিন সে নিজেকে চিনতে পারে না, সন্ধান পায় না নিজের শক্তির। কবি তাই বললেন—'আমি সহসা আমারে চিনিয়া ফেলেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।' আত্মশক্তির সন্ধান লাভ করলে পরাধীনতার বন্ধন আর স্থায়ী হয় না। কবির বিদ্রোহ যেমন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, তেমনি তাঁর বিদ্রোহ সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধেও। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদই কৃত্রিম এবং মিথ্যা। তিনি বললেন—

"ও কি, চণ্ডাল! চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব—
ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব!" —সাম্যবাদী

সামাজিক জড়তা ও ক্লান্তিকর নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো তিনি আবেগ-খিন্ন কণ্ঠে গাইলেন—

"মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা তুলে দাও হাতে, একবার মরে বাঁচি।" —সব্যসাচী

তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' প্রভৃতি কাব্যগুলির মধ্যে বিদ্রোহেরই সোচ্চার জয়ধ্বনি।

দেশে তখন একদিকে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশীর চক্রান্তে মাথা তুলে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাণ্ডারীকে ডেকে তিনি আদেশ করলেন—

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।" —কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

এইভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির মিলন-মন্ত্র রচনা করে গিয়েছেন তিনি। নজরুলের কাব্য তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অগ্নি-উদ্গার করেছে। সাম্রাজ্যবাদীর পেষণ-চক্রতলে নিষ্পিষ্ট মানব-আত্মার আকুল ক্রন্দন-ধ্বনি তিনি শুনেছেন। তাই তিনি ব্যথাহত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—

"বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা—
প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা থাকে আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।" —আমার কৈফিয়ৎ

নজরুল সেই রক্ত-লেখার কবি, সেই ব্যথিত মানবাত্মার কবি, আমার প্রিয় কবি। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট বিদ্রোহী কবি ঢাকায় ইহলোক ত্যাগ করেন। ভারতে তাঁর মরদেহ আনবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। শুধু তাঁর কবরের একমুঠো মাটি বর্ধমানের চুরুলিয়ায় পত্নী প্রমীলা ইসলামের কবরভূমিতে এসে পৌঁছোয়।

উপসংহার

তিনি তো বিদ্রোহী যৌবনের কপালে জয়-তিলক এঁকে দিয়ে তাকে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' উত্তরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন; কিন্তু বাংলাদেশের একগুঁয়েমির দুর্লঙ্ঘ্যতা তিনি আর লঙ্ঘন করতে পারেন নি। সমগ্র জাতি নজরুলের কবি-প্রতিভার কাছে ঋণী রইলো অসীম ঋণে॥

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- বিদ্রোহী-কবি নজরুল ইসলাম
- নজরুল-প্রতিভা

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ রবীন্দ্রনাথ ও কবি-পঞ্চক ॥ প্রথম বিদ্রোহ ঃ মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম ॥ আধুনিক যুগ-লক্ষণ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনানন্দ দাশ ॥ বুদ্ধদেব বসু ॥ অমিয় চক্রবর্তী ॥ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ॥ বিষ্ণু দে ॥ সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য ॥ চল্লিশের কবি। পঞ্চাশ ও ষাটের কবি ॥ উপসংহার ॥

৭৫ সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে শুরু হয়েছে সমাজের দ্রুত ভাঙাগড়ার কাজ। কাব্য-কবিতায়ও ঘটেছে তার অনিবার্য প্রতিফলন। বাংলা কবিতায়ও চলেছে সেই ভাঙা-গড়ার প্রয়াস। এককালে বাংলা কবিতা যখন বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমাবেষ্টনীর মধ্যে ক্ষীণ-স্রোতা, গতানুগতিকতার শুষ্ক বালুকাময় প্রান্তরে যখন মৃতপ্রায়, তখন রবীন্দ্রনাথই বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা কবিতার স্থাপন করলেন প্রথম যোগবন্ধন। বিশ্ব-কবিতার ভাব-তরঙ্গ অস্থির করে তুললো বাংলা কবিতার ক্ষেত্রকে। শুরু হলো ভাঙাগড়ার কাজ। আজ বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—উভয় ক্ষেত্রেই চলেছে দ্রুত-পরিবর্তন, চলেছে নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিভার মধ্য-গগনে, তখন কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী—এই 'কবি-পঞ্চক' পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে রবি-প্রদক্ষিণ করেছিলেন। বিশ্ব-জীবনের ভাব-তরঙ্গ তাঁদের কবিতার বেলাভূমিকে স্পর্শ করেনি। এমন-কি, রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিশ্বচারী এবং অতলান্ত, তাঁরা সেখানে কাব্য-ভাবনায় এবং আঙ্গিকে কেবলমাত্র বঙ্গবাসী এবং গোষ্পদ।

রবীন্দ্রনাথ ও কবি-পঞ্চক

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতায় আধুনিকতা এসেছিল বিদ্রোহের মাধ্যমে। সেই বিদ্রোহ প্রচলিত জীবনবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারার লৌহকপাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আসল কথা হলো, সামাজিক পরিবর্তনের ধারা-স্রোতের সঙ্গে সেকালের কবিরা বাংলা কবিতার গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছিলেন মাত্র। তাঁরা হলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রথম বিদ্রোহ : মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম

কিন্তু যে সামাজিক অবক্ষয় বাঙালীর জীবন-ধারাকে স্পর্শ করেছিল, তীব্র বেদনাবোধে এবং গভীর নৈরাশ্যে তাতে ধূসর হয়ে উঠলো বাংলা কবিতার পটভূমি। যুগ-যন্ত্রণাই এই ধূসর বিষণ্ণতার উৎস-ভূমি। বহিরঙ্গের দিক থেকেও এলো পরিবর্তন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ, গদ্যধর্মিতা, শব্দ-চয়ন ও উপমা-রূপকল্পের নতুনত্বে নবজন্ম লাভ করলো বাংলা কবিতা।

আধুনিক যুগ-লক্ষণ

সেই বিদ্রোহ গভীরচারী হলো কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিদের হাতে। প্রেমেন্দ্র

মিত্রের হাতে বাংলা কবিতায় কামার-ছুতোর-মুটেমজুর প্রবেশাধিকার লাভ করলো। সংবেদনশীল কবির কণ্ঠে শোনা গেল :

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"বিকৃত ক্ষুধায় কাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।"

তাঁর কবিতার পটভূমি কুয়াশার মতো ধূসর—

"তারপর জীবনের ফাটলে ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।"

আধুনিককালের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ও প্রভাবশালী কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। তাঁর ধূসর ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে বর্তমান জীবনের সর্বব্যাপী ধূসরতা একাকার হয়ে গেছে। স্বপ্ন-ভঙ্গতার মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যেখানে জীবন-যন্ত্রণা ও অতীন্দ্রিয়-চেতনার দিগন্ত-রেখা এক রহস্য-নিবিড় ধূসর কুয়াশায় বিলীন :

জীবনানন্দ দাশ

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য। অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে। বলছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

জীবনানন্দ স্বপ্নের মধ্যে আধুনিক যুগকে দেখেছেন ; কিংবা বলা যায়, আধুনিক যুগের মধ্যে দেখেছেন এক ধূসর স্বপ্নকে।

তিরিশ দশকের কবিতা-আন্দোলনের অগ্রনায়ক হলেন বুদ্ধদেব বসু। 'বন্দীর বন্দনা'য় তাঁর বিদ্রোহের সোচ্চার প্রকাশ। কিন্তু সে বিদ্রোহ সমাজ-সচেতনতার বিদ্রোহ নয়, ইন্দ্রিয়ের কারাগার থেকে মুক্তির বিদ্রোহ। সৃষ্টির মধ্যে প্রেম ও কামনার যে অন্তর্বিরোধ, বুদ্ধদেবের কবিতায় তারই প্রতিফলন :

বুদ্ধদেব বসু

"প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রচেছ আমায়—
নির্মম নির্মাতা মম!"

কিন্তু শুধুমাত্র কামনার জয়গানই নয়। স্রষ্টার কাছে তাঁর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি—

"বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার অমৃতের তরে।"

কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্র-কাব্যের বেলা-শেষের আলো থেকে রোদ্দুরের সুতো এনে তাঁর কাব্যের তাঁতে বসিয়েছেন। পরিবেশ ও জীবনের মধ্যে অসংগতি, সুদূর আধ্যাত্মিকতা এবং ভৌগোলিক বিশ্বময়তা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর কবিতা চিত্ররূপময়, পরিচ্ছন্ন এবং প্রাণের মার্জিত আবেগে স্পন্দমান।

অমিয় চক্রবর্তী

এই গোষ্ঠীর আর-এক বলিষ্ঠ কবি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ধ্রুপদী পন্থাই তাঁর কাব্য-কৃতি। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতার ভিত্তি ; আবেগ ও পাণ্ডিত্যের সমাহারে নির্মিত তাঁর ক্লাসিক কাব্য-কায়া :

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"তোমার যোগ্য গান বিরচিব বলে
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে
পুষ্পিত তৃণদলে।"

সুধীন্দ্রনাথ মিতভাষী কবি, শব্দ-নির্বাচনে তিনি রূপদক্ষ-পন্থী। তাঁর তথাকথিত আপাত-দুর্বোধ্যতার অন্তরালে 'যুগ-সংশয়ে পীড়িত, প্রশ্নাত এবং মীমাংসা-জিজ্ঞাসু এক অসাধারণ শিল্পী-মানসের সান্নিধ্য পাওয়া যায়।'

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে একটি স্মরণীয় নাম। যুগ-সচেতনতা এবং এলিয়টীয় পাণ্ডিত্য ও কবি-মানস তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি। আবেগ থেকে মননের দিকে তিনি বাংলা কবিতাকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু যেখানে তাঁর কবিতা আবেগে প্রগাঢ়, সেখানেই তাঁর কবিতার সিদ্ধি।

বিষ্ণু দে

"জলসমুদ্রে নেমেছে তোমার
হৃদয়ে আমার চড়া
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?"

জীবন-সচেতনতা ও সমাজনিষ্ঠতায় বিষ্ণু দে এক বিশেষ প্রভাবশালী কবি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় যেমন নজরুল ইসলামের আবির্ভাব, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাঙনের পটভূমিকায় তেমনি আবির্ভাব তিনজন যুগ-নিষ্ঠ ও সমাজ-নিষ্ঠ কবির: সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য
সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রোম্যান্টিকতা সুকান্তর কবি-চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে গণ-চেতনা ও সাম্যবাদের সংমিশ্রণে তিনি এক নতুন পথের পথিক। মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় যন্ত্রণা এবং সমাজের সর্বহারা শ্রেণীর কথা সুকান্তর মতো অন্য কার কবিতায় এত গভীরভাবে ভাষা পেয়েছে?

"আমার প্রহর কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে কাতর সাইরেন ডেকে যায়।"

সুকান্তর চোখে ছিল যেমন ব্যর্থতার বেদনা, তেমনি ছিল নতুন সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। তাঁর দৃষ্টিতে 'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।' সুকান্ত যেখানে সংগ্রামী-চেতনার প্রতীক, সমর সেন সেখানে যুগনিষ্ঠ পুরোহিত। যুদ্ধকালীন সামাজিক সংগতিহীনতা সমর সেনের কবিতায় বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছে। এঁদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। আটপৌরে ভাষার আত্মীয়তা এবং ছন্দ ও রূপকল্পের নতুন স্বাদুতাই শুধু নয়, সংগ্রামী ও মেহনতী জীবনের শিল্পমূল্যও তাঁর কবিতায় স্বীকৃত।

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দুটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য। মানস-প্রবণতার দিক থেকে এঁরা রোম্যান্টিক এবং রবীন্দ্র-পথিক। সঞ্জয় ভট্টাচার্য যেখানে তীক্ষ্ণ অনুভূতির সহজ রূপকার, অজিত দত্ত সেখানে গভীর ভাবানুভূতির গাঢ়বন্ধ রূপদক্ষ শিল্পী। এঁদের কবিতা আধুনিক জটিলতার তিক্ততা এবং তীক্ষ্ণতা থেকে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। প্রেম এবং সৌন্দর্যই এই কবি-যুগলের কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়।

অজিত দত্ত ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য

পরবর্তীকালের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, গোলাম কুদ্দুস, সুশীল রায়, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর সেন ও রাম বসুর নাম স্মরণীয়। এঁরা সকলেই যুগ-যন্ত্রণার ভিন্ন ভিন্ন রূপকার।

চল্লিশের কবি

তারপর একেবারে সাম্প্রতিক কাল। একদিকে স্বাধীনতার ব্যর্থতা, অন্যদিকে দুর্নিবার অবক্ষয় গভীর ভাষা পেল এঁদের কবিতায়। শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, আনন্দ বাগচী, শিবশম্ভু পাল, উৎপলকুমার গুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ আচার্য, তারাপদ রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এপার-বাংলার মতো ওপার-বাংলার শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় পালা-বদলের পালা সূচিত। এপার-বাংলার ষাটের কবিদের মধ্যে আছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সামসুল হক, রত্নেশ্বর হাজরা, আশিস সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, তুষার রায়, সত্য গুহ, রথীন্দ্র মজুমদার প্রমুখেরা। এরপর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এসে দানা বাঁধছেন সত্তরের কবিরা। হতাশা, ক্ষয়িষ্ণুতা ও ব্যর্থতার বেদনার পরপারে এঁরা বর্তমানে নতুন একটি অনাবিষ্কৃত জগতের সন্ধানে নিরত।

পঞ্চাশ ও ষাটের কবি

গভীর জীবনবোধে, আবেগের তীব্রতায় এবং প্রকাশের তীক্ষ্ণতায় সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা আজ বিশ্ব-কবিতার নিকটতম প্রতিবেশী। পুরাতন মূল্যবোধ দ্রুত অপস্রিয়মাণ। অথচ সমাজে ও জীবনে নতুন কোন মূল্যবোধ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও দেখা যাচ্ছে তার আশ্চর্য প্রতিফলন। তাই কবিতায় অধুনা এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এপার ও ওপার বাংলার কবিগোষ্ঠী বর্তমানে একই যন্ত্রণার সমান অংশীদার। কিন্তু নতুন কালের বাংলা কবিতা এখনও রচিত হয়নি। নতুনের আবির্ভাব-সম্ভাবনায় এখন তাই যবনিকা কম্পমান॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি
- রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা
- সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার রূপ-রূপান্তর

প্রবন্ধ-সংকেতঃ ভূমিকা ॥ ছোটগল্প কাকে বলে ? ॥ ছোটগল্পের জন্ম ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্প ॥ ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ ॥ শরৎচন্দ্র ॥ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের অনুসারী লেখকবৃন্দ ॥ কল্লোল-কালিকলম-উত্তরার লেখক-গোষ্ঠী ॥ চল্লিশের লেখক-গোষ্ঠী ॥ পঞ্চাশ ও ষাটের লেখক-গোষ্ঠী ॥ উপসংহার ॥

৭৫ সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প

ভূমিকা

ছোটগল্পেই বাংলা সাহিত্যের আত্মার পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির স্বাক্ষর সগৌরবে মুদ্রিত হয়েছে তার ছোটগল্পে। অথচ ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে নবাগত। পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এই শিল্প-রীতিটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে আসে। ইতিমধ্যে বাংলা ছোটগল্প যে বিস্ময়কর সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তাতে তা বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন সম্মান দাবি করতে পারে। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং রীতি-প্রকরণের নব-নব উদ্ভাবনে বাংলা ছোটগল্পের জগৎ আজ চঞ্চল।

ছোটগল্প কাকে বলে ?

স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে ছোটগল্প উপন্যাসের নিকট-প্রতিবেশী তো নয়ই, বরং বলা চলে, গীতি-কবিতার সমধর্মী। ছোটগল্পের স্বভাব-নিরূপণে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন, ছোটগল্প ছোটও বটে, আবার গল্পও বটে। কেউ বলেন, যে গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়,—'Can be finished at a single sitting,' তাইই ছোট-গল্প। কিন্তু সংক্ষিপ্ততাই ছোটগল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। কেউ কেউ আবার বলেন, একাগ্রতা বা একমুখীনতাই ছোটগল্পের প্রাণ। 'Singleness of purpose', 'singleness of effect' এবং 'singleness of treatment'—ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে, কিন্তু একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ছোটগল্পের চোরা-লণ্ঠনের আলোয় যেটুকু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তাতে খণ্ডের মধ্যে সমগ্রের একটা পরিচয় লাভ করা যায়। ছোটগল্প হলো সেই বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ-কথা
নিতান্তই সহজ সরল···
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

অর্থাৎ ইঙ্গিতবহতা, তথা ব্যঞ্জনাই ছোটগল্পের আত্মা ; যা গীতি-কবিতারও প্রাণ।

অনেকে আবার যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে ছোটগল্পের আবির্ভাবের একটা সংযোগ-সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। কেবল যান্ত্রিকতাই নয়, মনোবিশ্লেষণের অগ্রগতি এবং ব্যক্তি

বনাম সমাজের সংঘাত ছোটগল্পের প্রেরণাভূমি। পাশ্চাত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার স্বীকার করেছেন—"All of us are born of Gogol's Overcoat." রুশ-কথাশিল্পী নিকোলাই গোগোলের 'ওভারকোট' গল্পটি এক দুঃস্থ কেরানীর করুণ জীবন-কাহিনী। কিন্তু ফরাসী গল্প-লেখক মোপাসাঁর স্থান সর্বোচ্চে। তাঁর পরে শেকভ একটি স্মরণীয় নাম। তাছাড়া, যাঁরা পাশ্চাত্যের ছোটগল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ব্যালজাক্, আলফাঁস দোদে, লরেন্স, ডস্টয়েভ্স্কি, গোর্কি, ফ্লবেয়ার, কাম্যু, সমারসেট মম, টমাস মান এবং আরো অনেকে।

ছোটগল্পের জন্ম ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের বিকাশ রবীন্দ্রনাথের হাতে। বঙ্কিম-প্রতিভা ছোটগল্প রচনার অনুকূল ছিল না। তাঁর 'ইন্দিরা' ও 'যুগলাঙ্গুরীয়' সংক্ষিপ্তাকারে উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হলো বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী'। তারপর বাংলা সাহিত্যে জোয়ারের আবেগে এলো রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলি। চলমান জীবনের খণ্ড-ভগ্নাংশের মধ্যে তিনি সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনাকে করেছেন সার্থক রূপদান। তাঁর 'পোস্ট মাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'ছুটি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'কঙ্কাল', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'শুভা', 'আপদ', 'রবিবার', 'হৈমন্তী', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্প বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ছোটগল্প রচনার অনুকূল ছিল না। কারণ কাহিনী-বিন্যাস ও কাহিনী-বিস্তারের চেয়ে রূপ, রস ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রাধান্যই ছোটগল্পের প্রাণ। তবু শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'মন্দির' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ, 'মহেশ' গল্পটিতে পল্লীবাংলার ভাঙনের অশ্রুসিক্ত আলেখ্য সর্বাগ্রে তাঁরই লেখনীর অবদান।

শরৎচন্দ্র

তারপর বাংলা ছোটগল্পে জোয়ার আনলেন রবীন্দ্রানুসারী লেখক-গোষ্ঠী। প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা শরৎচন্দ্রের আদর্শের অনুবর্তনে বাংলা গল্প-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনুসারী লেখকবৃন্দ

এদিকে, প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত এসে লাগলো সমাজ-শরীরে। বাংলাদেশে সেই সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় গড়ে উঠলো সাহিত্যের আন্দোলন। কল্লোল-কালিকলম-উত্তরা হলো সেই আন্দোলনের অগ্রদূত। সামাজিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক ভাঙনের প্রেক্ষাপটে মানব-হৃদয়ের সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে রচিত ছোটগল্পে যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার

রায়চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ। তাঁদের গল্পে ভিড় করে এলো নানা অঞ্চলের পতিত, অবমানিত মানুষ। তাঁরা অঙ্কিত করলেন পল্লীসমাজের ভাঙ্গনের মর্মান্তিক চিত্র, রচনা করলেন পচনশীল শহরবাসের ইতিকথা। তাঁদের সঙ্গে তির্যক্ ব্যঙ্গ ও শাণিত বিদ্রূপের চাবুক হাতে এলেন বনফুল ও পরশুরাম।

কল্লোল-কালিকলম-উত্তরার লেখক-গোষ্ঠী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় বাংলার সমাজ-বিন্যাসে এসেছে নবতর রূপান্তর। তার বিপুল ভাঙ্গনের যন্ত্রণাকে ভাষা দেবার জন্যে এসেছেন চল্লিশের গল্পকারেরা। সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, সতীনাথ ভাদুড়ী, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু প্রমুখ লেখকেরা ভাঙ্গনের পটভূমিকায় ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। আজ ম্লান অবক্ষয়ের মধ্যে জীবনের অন্তঃসার-শূন্যতা ও বিশ্বাসহীনতা অনিবার্যরূপে গ্রাস করেছে সমগ্র সমাজ-মানসকে। সাম্প্রতিক কালের সেই দুঃখ-বেদনাকে বিশ্বস্তভাবে রূপ দিয়ে চলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী, মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শিশির লাহিড়ী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কবিতা সিংহ, ফণিভূষণ আচার্য, মিহির মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, প্রলয় সেন, অভ্র রায়, তুলসী সেনগুপ্ত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত প্রমুখ তরুণতর লেখকেরা।

চল্লিশের লেখক-গোষ্ঠী

পঞ্চাশ ও ষাটের লেখক-গোষ্ঠী

সম্প্রতি ভারতের সমাজ-জীবনে চলেছে অতিদ্রুত ভাঙাগড়ার কাজ। সমাজ ও জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলি দ্রুত অপস্রিয়মাণ। সমাজ এখন এক বিশাল এবং গভীর পরিবর্তনের মুখোমুখি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-মানুষের নিদারুণ জীবন-যন্ত্রণা আজ তীব্রতর। সেই ভাঙ্গনের পরিণামে নিঃসহায় অবক্ষয়ের মুখে জীবন কখনো তীব্র আর্তনাদে ভেঙে পড়ছে, কখনো ক্রুদ্ধ উচ্চারণে ফেটে পড়তে চাইছে। জীবন-যন্ত্রণার রুধিরাক্ত অনুভূতির তীব্রতায় আজ বাংলা ছোটগল্প দ্রুত অগ্রগতির পথে চলেছে এগিয়ে। আজ বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালী জীবনের আত্মিক পরিচয় পাওয়া যাবে তার ছোটগল্পেই॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প
- সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকট

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সংকট ॥ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-উৎপাদনের বর্তমান ক্ষমতা ॥ বিদ্যুৎ-সংকটের কারণ ॥ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকটের কারণ ॥ ফলাফল ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা ॥ সংকট-উত্তরণের প্রয়াস ॥ উপসংহার ॥

ভূমিকা

বিদ্যুৎ একালের শিল্প ও সভ্যতার প্রাণ। বিদ্যুতের দুর্জয় শক্তিবলে দুর্বার কর্মচাঞ্চল্য জাগে সভ্যতার সর্বস্তরে। বিদ্যুৎই সহস্র যুগের জড়তা ও অচল অনড়তার অবসাদ ঘুচিয়ে মানুষের সভ্যতাকে দিয়েছে অভূতপূর্ব গতি। সে শিল্পকে করেছে উৎপাদনমুখর, কৃষির অনুর্বরতার অভিশাপ ঘুচিয়ে তাকে করেছে অধিক উৎপাদনশীল, সভ্যতার অনগ্রসরতার অপবাদ মুছিয়ে দিয়ে তাকে সে পরিয়ে দিয়েছে আধুনিকতার মুকুট। বিদ্যুতের অভাবে কলমুখরিত সভ্যতার হৃৎস্পন্দন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। বিদ্যুৎ ছাড়া কৃষি-প্রান্তর রুগ্‌ণ, কলকারখানার চাকা অচল, জনজীবন পঙ্গু। বিদ্যুতের অভূতপূর্ব সংকটে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে তাইই ঘটেছে। তার কৃষি আজ ম্রিয়মাণ, তার কলকারখানার চাকা আজ বিকল, তার জনজীবন বিপর্যস্ত।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ-সংকট

বেকার-সমস্যা ও নানা দুরূহ সংকটে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের এখন প্রয়োজন নতুন নতুন কলকারখানার স্থাপন, স্থাপিত কলকারখানাগুলির সম্প্রসারণ এবং তাদের শক্তির পূর্ণতম ব্যবহার, প্রয়োজন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটা কর্মমুখরতার জোয়ার আনা। বিদ্যুৎই হবে সেই কর্মমুখরতার প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, একদিকে যখন তার বেকারসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে বিদ্যুৎ-সংকটের ঘনীভূত কালো ছায়ায় নতুন নতুন কলকারখানার উদ্বোধন তো দূরের কথা, বর্তমান কলকারখানাগুলির উৎপাদনও প্রায় স্তব্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-উৎপাদনের বর্তমান ক্ষমতা

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যস্তরে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের শুভ সূচনা প্রথম পরিকল্পনায়। কিন্তু তার ভাগ্যে বিদ্যুৎ এসে পৌঁছোয় অনেক বিলম্বে। তার বিদ্যুতের প্রথম সূত্র দামোদর উপত্যকা প্রকল্প। বহু বাগাড়ম্বর ও ঢক্কা-নিনাদের পর তা থেকে তাকে দেওয়া হলো মাত্র ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় সূত্র দুর্গাপুর। দুর্গাপুরে তিনটি ইউনিট চালু হলো, যার উৎপাদন-ক্ষমতা ২৯০ মেগাওয়াট। ব্যাণ্ডেল তার বিদ্যুৎ-উৎপাদনের তৃতীয় সূত্র। ব্যাণ্ডেলে স্থাপিত চারটি ইউনিটের উৎপাদন-ক্ষমতা ৩৩০ মেগাওয়াট। চতুর্থ সূত্র সাঁওতালডি। তার তিনটি ইউনিটের বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ক্ষমতা ৩২০ মেগাওয়াট। তাছাড়া আছে উত্তরবঙ্গে জালঢাকা প্রকল্প, যার উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যন্ত সামান্য এবং কলকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ সংস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের এই বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। সাড়ে আটশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ হলেই তার কোনমতে চলে যায়। কিন্তু নিয়মমাফিক বার্ষিক মেরামতি কাজের জন্যে প্রতিটি ইউনিটকে দেড় মাস উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়। তার ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-ঘাটতি ঘটে, তার মোকাবিলা করার মতো কোন বিকল্প সূত্র আর পশ্চিমবঙ্গের হাতে নেই। তার ওপর হঠাৎ কোন কারণে কোন ইউনিটে যদি যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, তাহলে তো কথাই নেই, মধ্যদিনে অমাবস্যার অন্ধকারে সারা রাজ্য ডুবে যায়। তাছাড়া, ওয়াগনের অভাবে কয়লার যোগান যদি ব্যাহত হয়, তাহলে সোনায় সোহাগা!—বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দেবে স্বাভাবিক কারণেই। কয়লা নিম্নমানের হলে শুধু উৎপাদন-ঘাটতিই দেখা দেয় না, অনিবার্যভাবে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। তার সঙ্গে প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা, রাজনৈতিক অন্তর্ঘাত ইত্যাদি কারণ যদি যুক্ত হয়, তাহলে বিদ্যুৎ-সংকটের ভয়াবহতা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিদ্যুৎ-সংকটের কারণ

স্মরণীয় যে, এমনিতে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-পরিস্থিতি 'রোজ আনি রোজ খাই' অবস্থা। অর্থাৎ, সমস্ত ইউনিট যদি ঠিকঠাক চলে এবং কয়লার যোগান, দক্ষ প্রশাসন ও স্বাভাবিক কাজকর্মের ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তবে তার উৎপন্ন বিদ্যুতে পশ্চিমবঙ্গের কোনমতে চলে যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। যান্ত্রিক গোলযোগ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি তার বিদ্যুৎ-উৎপাদন ইউনিটগুলির পেছনে দুর্ভাগ্যের দুরন্ত শনিগ্রহের মতো তাদের জন্ম থেকেই লেগে আছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সংকটের মূল কারণ এখানেই। সম্প্রতি তার মাত্রা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে, তাকে বিদ্যুৎ-সংকট না বলে বিদ্যুৎ-দুর্ভিক্ষ বলাই ভালো।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকটের কারণ

মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন বিদ্যুতের প্রায় পঁচানব্বই শতাংশই তাপ-বিদ্যুৎ। জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে যেমন সংরক্ষণের সুবিধা আছে, তাপবিদ্যুতের ক্ষেত্রে তা নেই। ফলে, বিদ্যুতের উৎপাদন এবং সরবরাহ একই সঙ্গে চালু না রেখে পশ্চিমবঙ্গের উপায় নেই। সম্প্রতি ব্যাণ্ডেলে ও সাঁওতালদিতে যখন একটি ইউনিটের বার্ষিক মেরামতির কাজ চলছিল, ঠিক তখনই একই দিনে ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালদিতে আরও একটি করে ইউনিটে দেখা দিল আকস্মিক যান্ত্রিক বিভ্রাট। দুর্গাপুর প্রকল্পে যান্ত্রিক ও প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে সেখানকার বিদ্যুৎ-উৎপাদন দীর্ঘকাল ধরে কুণ্ঠিত। বহু-উচ্চারিত দামোদর উপত্যকা প্রকল্প চুক্তিমতো ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎও দিতে পারছে না। কলকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ সংস্থার উৎপাদনও ব্যাহত হয় নিয়মিত কয়লার যোগানের অভাবে। তার ফলে, যা হবার তাই হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যুৎ-হাহাকার ভয়াবহ বিদ্যুৎ-দুর্ভিক্ষের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিদ্যুতের এই অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এবং জনজীবনের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। তার কলকারখানা আজ স্তব্ধ, ট্রাম ও ট্রেনের চাকা অচল,

স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-বাজারের আজ অসহনীয় অবস্থা। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের অভাবে পাম্প-সেটের সাহায্যে জল-উত্তোলন বন্ধ, ছোট ছোট শিল্পগুলির মুমূর্ষু অবস্থা। এই সার্বিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্যে কঠোর বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। স্বল্পকালের জন্যে উচ্চশক্তির বিদ্যুৎগ্রাহী শিল্পগুলিকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে হয়। আবশ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যানবাহন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বাসস্থানগুলিতে বিদ্যুৎ-সরবরাহ অব্যাহত রাখবার জন্যে শহরাঞ্চলের আবশ্যিক পণ্য ও ঔষধপত্রের দোকান ছাড়া অন্যান্য সব দোকানের খোলা-বন্ধের সময়ের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রেও কিছুটা আইনানুগ বিধি-নিষেধ চালু করা হয়েছে।

ফলাফল ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা

আসল কথা, বিদ্যুৎ-উপাদনের ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোন স্থান নেই। রাজ্যে বিদ্যুতের ব্যবহার যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারীদের সংখ্যাও। অতীতে যেমন সময়মতো নতুন নতুন বিদ্যুৎ-প্রকল্প গৃহীত হয়নি, তেমনি সময়মতো স্থাপিত ইউনিটগুলির মেরামতির ব্যবস্থাও করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকট তারই পরিণাম-ফল। তবে তার বিদ্যুৎ-সংকটের এই অমারাত্রি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই কেটে যাবে। আগামী ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সাঁওতালদির চতুর্থ ইউনিট এবং ব্যাণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিট চালু হবে। তাতে অতিরিক্ত ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। ১৯৮১-৮২ সাল থেকে কোলাঘাটের ইউনিট তিনটি দিতে শুরু করবে তার ৬৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কলকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ সংস্থা ১৯৮২-৮৩ সালেই তার টিটাগড় প্রকল্প থেকে দেবে ২২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। তাছাড়া, ফরাক্কা, জলঢাকা-২ এবং রম্মাম প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত হবে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যেই। তত দিন বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বসানো চলেছে পাঁচটি গ্যাস টারবাইন ইউনিট। এগুলি থেকে ১৯৭৯ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই পাওয়া যাবে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

সংকট উত্তরণের প্রয়াস

এই সব ব্যবস্থাবলীর মধ্যস্থতায় হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-দুর্ভিক্ষের অবসান হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আত্ম-সন্তুষ্টির কোন প্রশ্নই নেই। স্মরণীয়, তার জন-সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তার মোকাবিলার জন্যে চাই দ্রুত কর্ম-যোজনা। অদূর ভবিষ্যতে হলদিয়া ও ফরাক্কার শিল্পাঞ্চল, কলকাতার ভূগর্ভ-রেল এবং অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশ হাজার গ্রামের জন্যে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে। সেজন্যে যেমন অবিলম্বে বিদ্যুৎ-উৎপাদনে হাত দিতে হবে, তেমনি বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ধারাবাহিক প্রয়াস চালু রাখতে হবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গের মুখে হাসি ফুটবে, তার অর্থনীতির মরাগাঙে আবার সমৃদ্ধির বান ডাকবে॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

- পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-ঘাটতির ফলাফল
- পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সংকটের কারণ ও ফলাফল
- পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ-সংকট ও তার সমাধান

৭৮

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা ॥ ভাব-বিপ্লব ও মুদ্রণ-শিল্প ॥ মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও গুটেনবার্গ ॥ বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের জন্ম : ১৭৭৮ ॥ বিকাশ ॥ কর্ম-সংস্থান ॥ অগ্রগতি ও তার শর্তাবলী ॥ উপসংহার ॥

বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের দ্বি-শতবার্ষিকী

বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের দুশো বছর পূর্ণ হলো। বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের বয়স মাত্র দ্বি-শতাব্দী. কিন্তু এই স্বল্প অবকাশে তার বিকাশ ও সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। আধুনিক যুগের সূচনায় যখন পাশ্চাত্যের বাণী আমাদের চেতনার রুদ্ধ দুয়ারে করাঘাত হানছিল, তখন কে তাকে তার সস্নেহ পত্রপুটে সযত্নে বহন করে আমাদের হৃদয়গোচর করবার মহান্ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল? আবার, পাশ্চাত্য ভাবধারার অনিবার্য সংঘাতে যখন আমাদের চিত্ত-শতদল বিকাশের মহাবেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তখন কে তাকে সস্নেহে লালন করে তাকে পূর্ণ প্রকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল? তারপর যখন এলো সৃষ্টির জোয়ার, যখন সাহিত্যের 'নবযৌবন-জলতরঙ্গে' নেচে উঠলো আসমুদ্র বাংলাদেশ, তখন কে গ্রহণ করেছিল তার প্রচার ও পরিবেশনার সেই সুমহান্ দায়িত্ব? সে এই মুদ্রণ-শিল্প। সেই দায়িত্ব-ভার মুদ্রণ-শিল্প আজও সগৌরবে বহন করে চলেছে। বাস্তবিকই, বাংলার শিল্প-সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বাংলার মনন ও মনীষা—এক কথায়, বাঙালীর জীবন ও সমাজ মুদ্রণ-শিল্পের কাছে অসীম ঋণে ঋণী।

ভূমিকা

অতীতের ভাব-ভাবনা ও চিন্তার ঐশ্বর্য-সম্ভারকে বর্তমানের আঙিনায় বহন করে নিয়ে এসেছে মুদ্রণ-শিল্পই। আবার, বর্তমানের ভাবরাশি ও চিন্তার ঐশ্বর্য-সম্ভারকে সে-ই বহন করে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিগন্তে। এইভাবে মানব-জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, স্মরণীয় এবং স্থায়ী সম্পদ, মুদ্রণ-শিল্প তাকে দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিশ্বের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। আজ পৃথিবীর ভাব-ভাবনা ও চিন্তার জগতে যে দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংসাধিত হচ্ছে, তার মূলে মুদ্রণ-শিল্পের অবদান অসামান্য। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে মানব-সভ্যতার বিকাশ ছিল অত্যন্ত কুণ্ঠিত। তখন মানুষের জ্ঞানচর্চা সূচিত হলেও তাকে স্থায়িত্ব এবং ব্যাপ্তি দেবার ছিলনা কোন বিজ্ঞান-সম্মত উপায়। তারপর পারস্পরিক জ্ঞান-বিনিময়ের জন্যে এলো ভাষা। সেই ভাষাকে স্থায়ী রূপদানের জন্যে আবিষ্কৃত হলো 'লিপি' বা 'হরপ'। তার মধ্যস্থতায় মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গাছের ছাল, পশুচর্ম, প্রস্তরফলক, ধাতুপত্র, তালপত্র, ভূর্জপত্র, তুলট কাগজ ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করার রীতি প্রবর্তিত হয়।

ভাব-বিপ্লব ও মুদ্রণ-শিল্প

কিন্তু সমস্তই ছিল হস্তলিখিত; তা যেমন শ্রমসাপেক্ষ, তেমনি সময়সাপেক্ষ। স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত ছিল তার প্রচার এবং প্রসার। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তার চর্চাকে

সেই আড়ষ্টতার হাত থেকে মুক্তি দিল চিন্তা-জগতের মুক্তিদূত মুদ্রাযন্ত্র। তার ফলে পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এলো যুগান্তর, সভ্যতার রথের চাকা হয়ে উঠলো গতিময়। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের প্রথম গৌরব চীন-দেশের প্রাপ্য। প্রথমে চীনে এবং তারপর জাপানে কাষ্ঠ-ফলকে খোদিত লিপি বা হরপ থেকে জন্ম লাভ করে ছাপাখানা। তার অনুকরণে য়ুরোপও হাত লাগায় পুস্তক-প্রকাশে। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে জার্মান মুদ্রাকর গুটেনবার্গ ধাতু গলিয়ে ছাঁচে অক্ষর নির্মাণ করে গ্রন্থ-প্রকাশের করেন ব্যবস্থা। সে ভাবে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ হলো বাইবেল। আধুনিক মুদ্রণ-শিল্পের জন্ম এই গুটেনবার্গের কর্মশালা থেকেই।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও গুটেনবার্গ

আধুনিক যুগের সূচনা-লগ্নে নব-জাগ্রত য়ুরোপ এসে উপস্থিত হলো বাংলাদেশের গাঙ্গেয় উপকূলে। এলো প্রবল ইংরেজ। তাদের হাতেই বাংলা ছাপাখানার জন্মলগ্ন ত্বরান্বিত হলো। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচনা করলেন বাংলা ব্যাকরণ—'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। তার লিপি প্রস্তুত করলেন চার্লস উইল্‌কিন্‌স্। তাঁকে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করলেন পঞ্চানন কর্মকার এবং শেপার্ড। ১৭৭৮ সাল। হ্যালহেডের ব্যাকরণ শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় প্রথম আলোর মুখ দেখলো। গ্রন্থখানির ভাষা ইংরেজী, লিপিও ইংরেজী; তবু এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায়ই বাংলা লিপির মুদ্রিতরূপ প্রথম আলোর মুখ দেখেছিল বলে সেই ১৭৭৮ সালই আধুনিক বাংলা লিপি ও মুদ্রণ-শিল্পের জন্মলগ্ন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে রইলো।

বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের জন্ম : ১৭৭৮

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই বাংলা লিপিতে মুদ্রিত হয় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাদের মধ্যে ১৭৮৫ সালে মুদ্রিত 'ইম্পে কোড' এবং ১৭৯৩ সালে মুদ্রিত 'কর্নওয়ালিশ কোড' মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের জন্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিকে, অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়েকটি হরপ-ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হয় এবং তার পাশাপাশি লাভজনক শিল্প-প্রতিষ্ঠানরূপে দিকে দিকে স্থাপিত হতে থাকে বহু-সংখ্যক ছাপাখানা। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বেই দেখা গেল, বাংলাদেশে ১,০৯৪টি ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে এবং তাতে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা অন্ততঃপক্ষে দু'হাজার। তারপর ১৯৩৫ সালে এলো 'লাইনো' যন্ত্র এবং ১৯৩৭ সালে এলো 'মনো' যন্ত্র। এগুলি ছাপাখানার জগতে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী ঘটনা। এখন আবার অতি স্বল্প সময়ে রীল থেকে কাগজ কেটে ছেপে ভাঁজ করে বের করে দেয় নবাগত 'রোটারি' যন্ত্র। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে লক্ষ্য করা গেল, একমাত্র কলকাতায়ই স্থাপিত ছাপাখানার সংখ্যা ৬,০০০ এবং তাতে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক।

বিকাশ

অনেকের অনুমান, ইংরেজী 'Press' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'ছাপাখানা' বাংলা 'চাপ' [Press] শব্দ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, ছাপাখানা শব্দটির উদ্ভব বাংলা 'ছাপা' [Print] শব্দ থেকে। সে যাই হোক, ছাপাখানা স্থাপিত হবার আগে

লিপিকরদের হাতে বাংলা পুঁথি নকল হয়ে বিক্রী হতো ; এবং তাতে তাদের রুজি-রোজগারের সংস্থান হতো। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের জীবিকাচ্যুতির আশঙ্কায় সমাজের রক্ষণশীল অংশে ছাপাখানার বিরুদ্ধে দেখা দেয় প্রবল বিদ্বেষ। কিন্তু সেই বিদ্বেষ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কারণ, মুদ্রণ-শিল্প স্থাপনের ফলে যেমন মুষ্টিমেয় কতিপয় লিপিকর জীবিকাচ্যুত হয়, তেমনি কয়েক লক্ষ বেকার-ব্যক্তি মুদ্রণ-শিল্প এবং তার সহযোগী ও পরিপূরক শিল্পে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ পায়। হরপ-ক্ষোদন, হরপ-ঢালাই, হরপ-যোজনা, পৃষ্ঠাসজ্জা, অলংকরণ, নকশা-তৈয়ারি ও মুদ্রণ-ফলক নির্মাণ, যন্ত্র-চালনা, কাগজ ও কালির কারখানার কাজকর্ম ইত্যাদিতে আজ লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তি নিয়োজিত। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত না হলে মুদ্রণ-শিল্প কিছুতেই এই বৃহদায়তন শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করতো না।

কর্ম-সংস্থান

মুদ্রণ-শিল্প আজ আমাদের সমাজ-জীবনে এনে দিয়েছে এক যুগান্তর। প্রথমতঃ, সে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তিকে দিয়েছে সফল রূপ। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কাল থেকে আজ পর্যন্ত মুদ্রণ-শিল্প আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে দিয়েছে মুদ্রিত বাণী-রূপ। শিল্প-বাণিজ্য এবং চিন্তার জগতেও সে এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বের প্রগতিশীলতার সমসূত্রে আমাদের দিয়েছে যুক্ত করে। বর্তমান শিক্ষার প্রসার তো মুদ্রণ-শিল্পের অবিস্মরণীয় অবদান। কিন্তু বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের মুদ্রণ-পারিপাট্য, অলংকরণ-সৌষ্ঠব আকর্ষণীয় হলেও তার যন্ত্রপাতি ও কর্ম-পদ্ধতি অনাধুনিক—ত্রুটিপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে কম্পিউটারের মধ্যস্থতায় দ্রুত হরপ-যোজনার কাজে যেখানে গতির সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে এদেশে এখনো হাতের সাহায্যে হরপ-যোজনার কাজ চলেছে অত্যন্ত বিলম্বিত গতিতে। বাংলা মুদ্রণ-জগতে যদি গতি সঞ্চারিত করতে হয়, তবে সর্বপ্রথমে বাংলা বর্ণমালা ও বানানের সংস্কার আবশ্যিক। সেই সঙ্গে হরপ-ডালার পুনর্বিন্যাস এবং হরপ-যোজনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন জরুরী প্রয়োজন। তাছাড়া, যারা মুদ্রণ-জগতের শিল্পী-কারিগর-কর্মচারী, তাদের বেতনের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচ্য।

অগ্রগতি ও তার শর্তাবলী

বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের দ্বি-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতার বিড়লা তারা-মণ্ডলের সামনে একটি বিরাট ঐতিহাসিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র, পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ এবং পুরাতন ছাপাখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হয়। আজ মুদ্রণ-শিল্পের শুধু অতীতের স্মৃতিচারণা নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে লেখক, প্রকাশক, ছাপাখানার মালিক-কর্মচারী—সবাইকে একসঙ্গে উদ্যোগী হতে হবে। তবেই বাংলা মুদ্রণ-শিল্পে সূচিত হবে নতুন যুগ। বাংলার মুদ্রণ-শিল্পের কাছে জনগণের প্রত্যাশা সুপ্রচুর॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলা ছাপাখানার দ্বি-শতবর্ষপূর্তি
- সভ্যতার বিকাশে মুদ্রাযন্ত্রের অবদান

প্রবন্ধ-সংকেত ঃ ভূমিকা॥ সবল জাতি-গঠনের স্বার্থে গ্রন্থপাঠ আবশ্যিক ॥ বইমেলা ॥ বইমেলার খুঁটিনাটি ॥ জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাব-সাধনার নীরব পথ-প্রদর্শক ॥ উদ্দেশ্য ॥ বইমেলার দৈন্য ॥ উপসংহার ॥

৭৯

বইমেলা

'একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।' —প্রমথ চৌধুরী

ভূমিকা

গ্রন্থ মানুষের অবকাশের সঙ্গী, জ্ঞানের উদ্বোধক, আত্মার পরম আত্মীয়। নির্জন, নিঃসঙ্গ অবসর যখন মানুষের জীবনে দুঃসহ বোঝা হয়ে ওঠে, একঘেয়ে ক্লান্তিকর সময় যখন কিছুতেই অতিবাহিত হতে চায় না, একাকিত্বের বেদনায় যখন মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায় না, তখন কে তার জীবন অমৃত-মাধুর্যে পূর্ণ করে দেয়?···কে তার নির্জন, নিঃসঙ্গ অবসর আনন্দঘন অপার্থিব রসে অভিষিক্ত করে তাকে দেয় বাঞ্ছিত মুক্তির ঠিকানা?···কে তাকে জ্ঞানের নব-নব দিগন্তের সন্ধান দিয়ে তার চির-অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি-সাধন করে?—তা গ্রন্থ। গ্রন্থই তাকে এই গতানুগতিক ক্লান্তিকর জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ দান করে, তাকে মৃত্যুময় দৈনন্দিন জীবনে দেয় অমৃত-লোকের সন্ধান, তার বিষাদ-মলিন মরুময় জীবনকে অনাবিল আনন্দের রসে সিক্ত করে তাকে দেয় নবজীবনের ঠিকানা। কাজেই, গ্রন্থ মানুষের পরম বন্ধু, তার অনুভূতি ও ভাবনার ক্ষেত্রগুলির উদ্বোধনের মহান্ কারিগর।

সবল জাতি-গঠনের স্বার্থে গ্রন্থপাঠ আবশ্যিক

কিন্তু তাই বলে গ্রন্থপাঠ কেবল অবকাশ-বিনোদনের নিরীহ উপায় মাত্র নয়, গ্রন্থপাঠ আমাদের মহত্তর সুন্দরতর জীবন-রচনার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের দেশে কেবলমাত্র পরীক্ষা-বৈতরণী উত্তরণের জন্যে মরণকালে হরিনামের মতো গ্রন্থপাঠের রীতি পরিলক্ষিত হয়। এখানে পরীক্ষায় উত্তরণ ও কর্মপ্রাপ্তিই একমাত্র পরমার্থ। নিছক আনন্দলাভের জন্যে কেউ গ্রন্থপাঠ করে না। কাজেই, বাধ্যতামূলক গ্রন্থপাঠে আমরা আজ এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, কেউ স্বেচ্ছায় আনন্দ কিংবা জ্ঞান-লাভের জন্যে গ্রন্থ পাঠ করলে তাকে আমরা নিষ্কর্মার দলভুক্ত করি। পুস্তককে যারা উদরপূর্তির উপায় হিসাবে গণ্য করে, তারা মূঢ়। তারা সরস্বতীর হাঁসের কাছে সোনার ডিমই প্রত্যাশা করে; তাদের কাছে মনের শুভ্রতা, জ্ঞানের অমলতা কিংবা অনাবিল আনন্দের কোন মূল্যই নেই। কিন্তু যে জাতির মনের মুক্তি নেই, প্রাণের স্ফূর্তি নেই, জীবনে নেই আনন্দের সতেজ স্পর্শ, সে জাতি মৃত; তার ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই মনস্বী লেখক প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী।' কাজেই, সুস্থ, সবল, বিপুল সম্ভাবনাময় জাতি-গঠনের স্বার্থে গ্রন্থপাঠ আবশ্যিক।

সেই মৌলিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এদেশে বইমেলার অভূতপূর্ব

আয়োজন। উদ্যোক্তা 'প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা সংঘ।' প্রতি বছর শীতের অবসানে বসন্তের প্রাক্কালে ময়দানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয় 'বইমেলা'। গত চার বছর ধরে এই মেলা সগৌরবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বইমেলা তো আসলে জ্ঞানের মেলা, ভাবের মেলা, আনন্দের মেলা। ১৯৭৯ সালের বইমেলা আবার বাংলা বইয়ের প্রকাশন ও মুদ্রণ-শিল্পের দ্বি-শতবর্ষ-পূর্তির জন্যে ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের প্রদর্শনীর জন্যে এ বছরের বইমেলা ছিল তাই অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

বইমেলা

বইমেলা লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের ত্রিবেণী-সঙ্গম। সে বিচারে বইমেলার সার্থকতা অতুলনীয়। জ্ঞানের হাটে, ভাবের হাটে বিকিকিনির উদ্দেশ্যে এখানে সবাই সমবেত হয়। কেবল আঞ্চলিক ভাষাতেই নয়, সকল ভারতীয় ভাষায়—এমনকি, আন্তর্জাতিক ভাষায় রচিত বইও এখানে সুলভে বিক্রী হয়। সাহিত্য, নাটক, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে আধুনিক রন্ধন-শিল্প, সূচী-শিল্প, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ের বহু-বিচিত্র পুস্তকের সমাবেশ ঘটে এখানে। তবে কলকাতায় অবস্থিত বলে বইমেলায় বাংলা বইয়ের প্রাধান্য সমধিক। এখানে সব বই-ই দস্তুরিতে বিক্রী হয়। মেলার শেষ তিনদিন অনুষ্ঠিত হয় 'বই-বাজার'। সেখানে নানা বই স্বল্প মূল্যে বিক্রী হয়ে বইমেলার পরিবেশকে তোলে বেশ জমজমাট করে। সান্ধ্য-ভ্রমণ, পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, বহু অপরিচিত পুস্তকের সমাবেশ ইত্যাদির পাশাপাশি ছিল পুস্তকের বেচাকেনা, পুস্তক-সংগ্রহ এবং জ্ঞানবৃদ্ধির আনন্দময় আয়োজন।

বইমেলার খুঁটিনাটি

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একদা মন্তব্য করেছিলেন, 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত। তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই কারাগারের তুলনা হইত, এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।' বই মেলা উপলক্ষে কবিগুরুর সেই আলোকিত মন্তব্যটি স্মরণীয়। এখানে বহু হৃদয়ের বন্যা যেমন নীরব হয়ে আছে, তেমনি বহু বিপ্লবের পরিশুদ্ধ অগ্নিও এখানে স্তব্ধ হয়ে আছে ; তেমনি কত বিস্ময়কর আবিষ্কার, বৈষয়িক সমৃদ্ধির কত বিচিত্র সম্ভাবনা, কত অশ্রুত সংগীত, কত অভূতপূর্ব সৃষ্টি এখানে পুস্তকের পাতায় পাতায় মৌন-ভাবে সুযোগ্য হৃদয় এবং উন্নত মননের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। বইমেলা অনাগত ভবিষ্যতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাব-সাধনার নীরব পথ-প্রদর্শক।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাব-সাধনার নীরব পথ-প্রদর্শক

পুস্তক সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনাগ্রহ সর্ববিদিত। সাধারণ মানুষের মনের অনাগ্রহের সেই শীতল শিলাখণ্ডকে অপসারিত করে সেখানে স্বাস্থ্যকর আগ্রহ সৃষ্টিই বইমেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া, পুস্তক-প্রকাশক এবং পুস্তক-বিক্রেতাদের পুস্তক বিক্রীর প্রচ্ছন্ন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য তো আছেই। কিন্তু এহ বাহ্য! পুস্তক-প্রচার এবং পুস্তক-সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ সৃষ্টিই বইমেলার মৌল উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ দায়ে না পড়লে বা পরীক্ষা-সাগর উত্তরণের তাগিদ না থাকলে কেউ পুস্তক-বিপণির ছায়া মাড়াতে চান না। জ্ঞানদেবীর সঙ্গে এইভাবে শত হস্তের দূরত্ব যে জাতির পক্ষে আদৌ কল্যাণকর নয়, তা বলাবাহুল্য। জাতিকে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করা, নতুন নতুন জ্ঞানচর্চার পথে দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করা বইমেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, সে জাতির ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল। নব নব জ্ঞান-ক্ষুধা, নব নব কৌতূহল, নিত্য-নতুন অনুসন্ধিৎসায় পুরাতন জ্ঞানের স্থানে নতুন জ্ঞানের নিত্য অভিষেক হবে। তবেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে জাতির অগ্রগমনের ভবিষ্যৎ পথরেখা।

উদ্দেশ্য

সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে জাঁকজমক মণ্ডপসজ্জা সত্ত্বেও বইমেলার পুস্তক-পসরার দৈন্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে। এখানে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক এবং হাল্কা সাহিত্যের সমাবেশ যত বেশী, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তকের আয়োজন তত স্বল্প। প্রকাশকেরা পুস্তক-প্রকাশনার মাধ্যমে কেবল দ্রুত ব্যবসায়িক সিদ্ধি কামনা করেন ; জাতির জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করবার মহান্ প্রয়াস তাঁদের নেই। তাই তাঁদের প্রকাশ-ভাণ্ডারে কেবল হাল্কা ও নিম্নমানের পুস্তকের বাড়াবাড়ি। অর্থ-শিকার তথা মুনাফা-মৃগয়াই আজ তাঁদের একমাত্র পরমার্থ। সেজন্যে উত্তেজনাকর, নিম্নমানের পুস্তক প্রকাশের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পুস্তক-প্রকাশনার জগৎ বর্তমানে রাহুগ্রস্ত।

বইমেলার দৈন্য

বইমেলার মাধ্যমে পুস্তক-সম্পর্কে জন-সমাজকে উৎসাহিত করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কর্ম। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয়, যে দেশে সাক্ষরতা জনসংখ্যার মাত্র ত্রিশ-শতাংশকে কোনমতে স্পর্শ করেছে, সে দেশে এই অনুষ্ঠানের সফলতা যে অত্যন্ত সীমিত, তা বলাবাহুল্য। পুস্তক-পাঠ ও পুস্তক-সংগ্রহ একটি অনাবিল অভ্যাস। কিন্তু এই দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে দেশের প্রায় সত্তর-শতাংশ মানুষকে হিমসিম খেতে হয়, সেখানে বই কেনার সামর্থ্য ক'জনের আছে? বিশ্ব-বিশ্রুত পুস্তকপ্রেমিক মার্ক টোয়েনের পদ্ধতিতে পুস্তক-সংগ্রাহকের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পেলে তাতে গ্রন্থ-জগতের উন্নতি কোথায়? কাজেই, দেশে শিক্ষা-বিস্তার ও দারিদ্র্য-সংহার ভিন্ন বইমেলার সার্থকতা নেই॥

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

- বইমেলার উপযোগিতা
- বইমেলার সাফল্য ও ব্যর্থতা
- পুস্তক-পাঠ ও পুস্তক-সংগ্রহ

প্রবন্ধ বিচিন্তা

প্রবন্ধ-সংকেত

॥ বাংলার গ্রাম ॥ ১.

☐ ভূমিকা—গ্রামের নাম—গ্রামের সৌন্দর্য-বর্ণনা—গ্রামের কর্মব্যস্ততার রূপ—গ্রামের সামাজিক জীবন—গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন—গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবন—তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য—গ্রামের অতীত জীবন—বর্তমান জীবন—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায় :

● তোমার গ্রাম ● তোমার দেখা একটি গ্রাম ● গ্রামীণ জীবন ● একটি গ্রাম

॥ একটি গ্রাম্য মেলা ॥ ২.

☐ ভূমিকা—'মেলা'র আক্ষরিক অর্থ—মেলার তাৎপর্য : মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক—শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা—মেলায় যাত্রার প্রস্তুতি—যাত্রা—মেলার পথে—মেলার নিকটে—মেলার বর্ণনা—মেলার অভিজ্ঞতা—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায় :

● একটি মেলার অভিজ্ঞতা ● মেলার প্রয়োজনীয়তা ● তোমার দেখা একটি মেলা

॥ গ্রামের হাট ॥ ৩.

☐ ভূমিকা—গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা সৃষ্টিতে হাটের ভূমিকা—হাটের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবদান—হাটের বণ্টনগত অবদান—হাটের স্থান—হাটে যাতায়াতের ব্যবস্থা—হাট ও বাজারের পার্থক্য—হাটের ভিড় ও বেচাকেনার দৃশ্য—ভাবের আদান-প্রদান ও যোগাযোগের স্থান—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায় :

● একটি হাটের বর্ণনা ● পল্লীর জীবনে হাটের স্থান ● গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাটের ভূমিকা

॥ বাংলার পশু-পাখি ॥ ৪.

☐ ভূমিকা—বাংলার প্রধান গৃহপালিত পশু : গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল—বাংলার অরণ্য-পালিত পশু : হাতী, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, সজারু, খরগোশ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, শেয়াল, নেউল—

বাংলার পাখি : ডাঙার পাখি : দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, পাপিয়া, বুলবুল, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বউ-কথা-কও, ঘুঘু, পায়রা, বাদুড়, লক্ষ্মীপেঁচা, কাক, দাঁড়কাক—জলের পাখি : পাতিহাঁস, রাজহাঁস, বেলেহাঁস, বক, সারস, মাছরাঙা, ভরতপাখি, ধনেশ, কাদাখোঁচা, জলপিপি, পানকৌড়ি, কাস্তেচরা, গাঙ্‌চিল, গাঙ্‌শালিক—পশু-পাখি হত্যা বন্ধ করার প্রয়াস—অভয়ারণ্য—পক্ষীরালয়—পশু-সপ্তাহ—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● বাংলাদেশের পশু-পাখির পরিচয় ● বাংলার পশু-পাখির বৈশিষ্ট্য ● পশু-সপ্তাহ

॥ বাংলার একটি উৎসব ॥ ৫.

☐ ভূমিকা—উৎসবপ্রধান বাংলার দুর্গোৎসব—শারদোৎসব—বৈশিষ্ট্য—সময়—প্রাকৃতিক পটভূমি—পৌরাণিক কাহিনী—উৎসবের প্রস্তুতি : প্রতিমা-নির্মাণ, ফেস্টুন, চাঁদা-আদায়, পূজা-মণ্ডপ নির্মাণ, আলোকসজ্জা—ঘরে ঘরে উৎসবের প্রস্তুতি : নতুন জামা-কাপড়, সাজসজ্জা—পূজার দিনগুলি—পূজামণ্ডপের বর্ণনা—যান্ত্রিকতার সমালোচনা—প্রতিমা-বিসর্জন—বিজয়ার প্রীতি-বিনিময়—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● দুর্গাপূজা ● দুর্গোৎসব ● বাংলার শারদীয় উৎসব ● বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব

॥ শীতের সকাল ॥ ৬.

☐ ভূমিকা—সূর্যোদয়ের পূর্বে শীতের সকাল—শীতের সকালের ভাব-রূপ—শীতের সকালের বৈরাগ্য-মূর্তি—ত্যাগের মূর্তি—রূপ-বদল—শীতের সকালের সৌন্দর্য—কুয়াশা, শিশির ও হিমেল বাতাসের মিষ্টি-মধুর আমেজ—শহরের শীতের সকাল—গ্রামের শীতের সকালের সঙ্গে তার পার্থক্য—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● বাংলার শীতের সকাল ● একটি শীতের সকাল ● শীতের সকালের সৌন্দর্য

॥ সার্বজনীন পূজা ॥ ৭.

☐ ভূমিকা—বাংলার প্রধান তিনটি সার্বজনীন পূজা : দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী পূজা—বিবর্তনের পরিণতি : সার্বজনীন পূজা—অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও সার্বজনান পূজা—বারোয়ারী পূজা ও সার্বজনীন পূজা—জমিদারী উচ্ছেদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ এবং সার্বজনীন পূজা—সার্বজনীন পূজা ও ভক্তিহীনতা—যান্ত্রিকতা—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● বারোয়ারী পূজা ● বাঙালীর পূজা-পার্বণের রূপান্তর

॥ বনভোজন ॥ ৮.

☐ ভূমিকা—আনন্দের অনুসন্ধান ও বনভোজন—প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজাদের মৃগয়াযাত্রা—প্রকৃতির সান্নিধ্যে নির্মল আনন্দ উপভোগের আয়োজন—রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে বনভোজনের বর্ণনা—বনভোজনের আধুনিক রূপ : মাছ-মাংস ইত্যাদির আহার-সর্বস্বতা—প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগের চেয়ে মাইক্রোফোনের চীৎকার—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● চড়ুই-ভাতি ● একটি ছুটির দিনের সদ্ব্যবহার ● বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক

॥ একটি ভ্রমণ-কাহিনী ॥ ৯.

☐ ভূমিকা—যাত্রার আয়োজন—যাত্রা—যাত্রাপথের বর্ণনা—ভ্রমণ-স্থানের প্রথম অভিজ্ঞতা—দর্শনীয় স্থানগুলির দর্শন ও অনুভূতি—প্রাকৃতিক দৃশ্য—স্থাপত্য-শিল্প বা মানুষের শিল্পকর্ম—ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ—অতীতের স্মৃতিচারণা অথবা প্রকৃতির রূপরসের মধ্যে অবগাহনের অনুভূতি—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● একটি তীর্থস্থান ভ্রমণ ● একটি দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ ● কোন স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

॥ অধ্যবসায় ॥ ১০.

☐ ভূমিকা—অধ্যবসায় ও জীবনের চিরায়ত সংগ্রামী শক্তি—মানুষের সংগ্রাম ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ—সংগ্রামের লক্ষ্য : জীবনের সাফল্য—সংগ্রামে জয়-পরাজয়—ব্যর্থতাই সাফল্যের জননী—অধ্যবসায়ের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত : রবার্ট ব্রুস এবং নেপোলিয়ন—সাধারণ মানুষের জীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ● ধৈর্য ধরো ধৈর্য ধরো বাঁধো বাঁধো বুক

● ব্যর্থতাই সাফল্যের জননী

॥ মিতব্যয়িতা ॥ ১১.

☐ ভূমিকা—জীবনে দুঃখের জন্য দায়ী কে? মিতব্যয়িতার মূলে জীবন-বৈশিষ্ট্য—মিতব্যয়িতার অর্থ—সঞ্চয়শীলতা ও মিতব্যয়িতা—কৃপণ ও মিতব্যয়ীর পার্থক্য—লক্ষ্মী ও কুবের—অমিতব্যয়ী জীবনের বেদনাময় পরিণাম—সতর্কতা—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● ব্যয়-সংকোচ ● ব্যয়-সংযম ● পরিমিত জীবন ● সঞ্চয়শীলতা

॥ জীবনে খেয়ালখুশির মূল্য ॥ ১২.

☐ ভূমিকা—মানুষের অন্তরের চিরশিশু—অবকাশ ও বিমল আনন্দের আয়োজন—অবকাশ-যাপনের বিচিত্র আয়োজন: ছবি-আঁকা, ছবি-তোলা, কবিতা-লেখা, গান-গাওয়া, বাগান-করা, ডাকটিকিট জমানো ইত্যাদি—নব নব সৃষ্টির আনন্দ—খেয়ালখুশির প্রয়োজনীয়তা: নতুন কর্মোদ্যম লাভ ও স্নায়ুর চাপ হ্রাস করার জন্যে স্নায়ু-মার্জনা—উপসংহার॥

অনুসরণে লেখা যায়:

● তোমার শখ ● অবসর-বিনোদন ● অবকাশ যাপন ● অবকাশ ও আমোদ-প্রমোদ

॥ বিশ্বশান্তি-স্থাপনে ভারত ॥ ১৩.

☐ ভূমিকা—বিশ্বশান্তি ও ভারত—ভগবান বুদ্ধ—মহামতি অশোক—স্বাধীন ভারত—শান্তি স্থাপনে ভারত—ভারতের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব ও প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু—ভারতের নিরপেক্ষতা-নীতি—কোরিয়ায়, কঙ্গোয়, ভিয়েৎনামে, লাওসে, অ্যাঙ্গোলায়, দক্ষিণ রোডেশিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়—উপসংহার॥

অনুসরণে লেখা যায়:

● বিশ্বশান্তি ও ভারত ● ভারতের আদর্শ ও তার বিশ্বমৈত্রী

● ভারতের নিরস্ত্রীকরণ-নীতি ও জোট-নিরপেক্ষ নীতি

॥ ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা ॥ ১৪.

☐ ভূমিকা—ব্রিটিশ-শোষিত ভারতের সর্বস্বান্ত গ্রাম—প্রাচীন ভারতের স্বয়ংসিদ্ধ গ্রাম—পল্লী-ভারতের অবক্ষয়ের চিত্র—সংগঠনের সূত্রপাত: ২রা অক্টোবর, ১৯৫২ সাল: সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার যাত্রা-শুরু—লক্ষ্য ও অগ্রগতি—গঠন-বিন্যাস: কেন্দ্রীয় পর্যায়—রাজ্য পর্যায়—জিলা পর্যায়—অঞ্চল পর্যায়—সম্প্রসারণ সংগঠন—কার্যাবলী—অর্থ-সংস্থান—উপসংহার॥

অনুসরণে লেখা যায়:

● পল্লী-অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন ● গ্রাম-ভারতের পুনর্জাগরণ

● গ্রাম-বাংলার উন্নয়ন কোন্ পথে?

॥ ভারতে সমবায় আন্দোলন ॥ ১৫.

☐ ভূমিকা—সমবায়ের মূল নীতি: স্বনির্ভরতা, পারস্পরিক সহযোগিতা—সমস্বার্থে সংঘবদ্ধতা, স্বেচ্ছাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয়—সমবায়ের গোড়ার কথা: জার্মান সমাজ-সংস্কারক রাইফেজিন—ভারতে সমবায়ের সূচনা—সমবায় আন্দোলনের

অগ্রগতির ইতিহাস—সমবায় পরিকল্পনা কমিটি—উপদেষ্টা কমিটি—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ও সমবায় আন্দোলন—গত দশকে সমবায়ের অগ্রগতি—অন্যান্য দিগন্তে সমবায়—পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের অগ্রগতি—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- জাতীয় উন্নয়নে সমবায়ের স্থান
- গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায়ের অবদান
- গ্রাম-ভারত ও সমবায় আন্দোলন

॥ বিশ্বশান্তি ও রাষ্ট্রসংঘ ॥ ১৬.

□ ভূমিকা—জাতি-সংঘের ব্যর্থতা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—রাষ্ট্রসংঘের জন্ম—গঠন—সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ—শান্তি-স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা—কোরিয়ায়, কঙ্গোয়, মিশরে, লেবাননে, ভিয়েৎনামে, লাওসে, আরব-ইস্রাইল সংঘর্ষে, কাশ্মীরে—রাষ্ট্রসংঘের নানা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড, ভবিষ্যৎ অশান্তির মূলোচ্ছেদের প্রয়াস—দুর্বল রাষ্ট্রগুলির অভ্যুত্থান—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- ইউ. এন. ও.
- রাষ্ট্রসংঘই বিশ্বশান্তির একমাত্র রক্ষাকর্তা

॥ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বাণিজ্য ॥ ১৭.

□ ভূমিকা—বিজ্ঞানের জন্ম ও তার অবদান—সাহিত্যের জন্ম ও তার অবদান—বাণিজ্যের জন্ম ও তার অবদান—বিজ্ঞান, সাহিত্য ও বাণিজ্যের বিরোধ—এই বিরোধ আপাত-বিরোধ মাত্র, মূলতঃ কোন বিরোধ নেই ; কারণ, সবই জীবনের প্রয়োজনে—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্রমাগত প্রাধান্য লাভ—পরিণাম—জীবনে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য ও বাণিজ্যের প্রয়োজন আছে—প্রয়োজন সংগতিবোধের—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- সাধারণ জীবনে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রয়োজন
- বিজ্ঞান বড়, না সাহিত্য বড় ?
- বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সাহিত্যের মধ্যে কোন্‌টি বড় ?

॥ শান্তির দূত জওহরলাল ॥ ১৮.

□ ভূমিকা—শৈশব ও শিক্ষা—কর্মময় জীবন—জাতীয় কংগ্রেস ও নেহরু—স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেহরু—প্রধানমন্ত্রী নেহরু—কংগ্রেস-সভাপতি নেহরু—সাহিত্য-কীর্তি, ইতিহাস-চেতনা ও দার্শনিকতা : 'লেটার ফ্রম ফাদার টু হিজ ডটার', 'গ্লিম্পসেস্ অব ওয়ার্লড হিস্ট্রি', আত্ম-জীবনী এবং 'ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া'।

জাতির হুঁশিয়ার কাণ্ডারী—বিশ্বশান্তির মহান্ প্রবক্তা : আইনস্টাইনের অভিনন্দন : 'তোমার পদচিহ্ন আগামীকালের পৃথিবীর কক্ষপথ।'—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● ভারতের একজন সুখ্যাত প্রধানমন্ত্রী ● জাতির সেবায় জওহরলাল

॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ॥ ১৯.

☐ ভূমিকা—আবির্ভাব : ১৮৭০—বংশ-পরিচয়—ছাত্র-জীবনে কৃতিত্ব—কর্ম-জীবনে কৃতিত্ব—দেশসেবায় চিত্তরঞ্জন—'দেশবন্ধু' উপাধি লাভ—কংগ্রেস ও 'দেশবন্ধু' —'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক—কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র দেশবন্ধু—মহাপ্রয়াণ : ১৯২৫—কাব্য-সাধনায় চিত্তরঞ্জন : 'মালঞ্চ', 'মালা', 'অন্তর্যামী', 'কিশোর-কিশোরী' ও 'সাগর-সংগীত'—সাহিত্য-সেবা—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● একজন মহান্ দেশপ্রেমিক ● দেশসেবায় দেশবন্ধু ● একজন মহান্ দেশপ্রেমিক

॥ ভগিনী নিবেদিতা ॥ ২০.

☐ ভূমিকা—জন্ম : ১৮৬৭, আয়ার্লণ্ডের ডানগ্যানন শহর—বংশ-পরিচয়—বাল্যনাম : মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল—বাল্য-জীবন ও শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎলাভ—ভারত-আগমন—'ভগিনী নিবেদিতা' নাম—কর্ম-জীবন—ভারত-সেবা —রচিত গ্রন্থ : 'The master as I saw him', এবং 'Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda.'—এদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ—পরলোকগমন : ১৯১১—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● একজন মহীয়সী মহিলা ● ভগিনী নিবেদিতার ভারত-সেবা

॥ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ॥ ২১.

☐ ভূমিকা—জন্ম : ১৫ই আগস্ট, ১৮৭২—বংশ-পরিচয়—শিক্ষা-জীবন : আই. সি. এস. পরীক্ষায় সাফল্য ; কিন্তু অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় অনুপস্থিতি—কর্ম-জীবন : বরোদার শিক্ষাবিভাগে কর্মগ্রহণ, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনা—কারাবরণ : মুরারিপুকুর বোমার মামলার প্রধান আসামী—মুক্তিলাভ—ব্রিটিশ-ভারত থেকে অন্তর্ধান—নতুন সাধনা—পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা—দেহাবসান : ১৯৫০—উপসংহার : 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার ॥'

অনুসরণে লেখা যায় :

● ভারতে শ্রীঅরবিন্দ ● শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-সাধনা ● শ্রীঅরবিন্দের ভারত-সাধনা

॥ যে সহে সে রহে ॥ ২২.

☐ ভূমিকা—দুঃখময় পৃথিবীতে সহনশীলতা—সহনশীলতাই পৃথিবীতে টিকে থাকার উপায়—ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও সহনশীলতা—সহিষ্ণুতার শক্তি—সহনশীলতা ও জীবন-সংগ্রাম—সহনশীলতার জয়—উপসংহার ।

অনুসরণে লেখা যায় :

● সহনশীলতা ● সহিষ্ণুতা ● জীবনে সহনশীলতার মূল্য

॥ সাধুতাই শ্রেষ্ঠ উপায় ॥ ২৩.

☐ ভূমিকা—সমাজ-গঠনের মূল উদ্দেশ্য ও সাধুতা—অসৎ ব্যক্তিরা সমাজের শত্রু—বর্তমান সমাজে সামাজিক দুর্নীতি ও অপরাধ—সাধুতা ও সততাই অন্ধকারে আলো—সমাজকে দুর্নীতি ও অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় সততা ও সাধুতা—সকল আদর্শের মূল ভিত্তিই সাধুতা—স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি : 'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সম্পাদিত হয় না।'—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● সমাজ-জীবনে সাধুতারই জয় ● ব্যক্তি ও জাতির জীবনে আদর্শের ভূমিকা

॥ 'দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ' ॥ ২৪.

☐ ভূমিকা—আদিম মানব ও ঐক্য-সাধনা—মানব-ঐক্য ও জাতি-গঠন—জাতির অগ্রগতি ও ঐক্য-চেতনা—সভ্যতার অগ্রগতি ও ঐক্য-চেতনা—সভ্যতার বিকাশের বর্তমান সমুন্নতি এবং মানুষের ঐক্য-সাধনা—'একত্বে বরেণ্য তুমি'—সংঘবদ্ধতার ফল—পরিণাম—অনৈক্যের ফলাফল—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● একতাই শক্তি ● 'একজাতি, একপ্রাণ, একতা' ● ঐক্যহীনতার ফলাফল

॥ 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি' ॥ ২৫.

☐ ভূমিকা—ধনিকের ধনবৃদ্ধির উপায়—দরিদ্রের দারিদ্র্যের কারণ—বর্তমান পৃথিবীতে ধন-বৈষম্যের চিত্র—মানুষের আদিম প্রবণতা : লোভ-সর্বস্বতা—তার হাত থেকে পরিত্রাণ-লাভের উপায় : সমাজে ধন-বণ্টনে সাম্য—দরিদ্রকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি' ● দারিদ্র্য ● সমাজে অসাম্য

॥ একটি রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ॥ ২৬.

□ ভূমিকা—রেল-ভ্রমণ সম্বন্ধে পূর্ব-ধারণা—রেল-ভ্রমণের উপলক্ষ—যাত্রা—রেলের জন্য অপেক্ষা—রেলগাড়িতে আরোহণ—প্রথম অভিজ্ঞতা—যাত্রী, ফেরিওয়ালা, বাইরের অপস্রিয়মাণ দৃশ্যাবলী—গ্রাম, মাঠ, টেলিগ্রাফের তার, তাতে বসা লেজদোলা পাখি, স্টেশনঘর, বিপরীত মুখে ধাবমান অন্য রেলগাড়ি, রেলসেতু—বিচিত্র অভিজ্ঞতা—যাত্রা-সমাপ্তি—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার জীবনের প্রথম রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা
- রেল-ভ্রমণ

॥ ভারতীয় জীবনে রামায়ণের প্রভাব ॥ ২৭.

□ ভূমিকা—ভারতের জীবন-গঠনে রামায়ণ—ন্যায় ও সততার শিক্ষা—স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-ভক্তি শিক্ষা : পুত্র-স্নেহ, ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃ-ভক্তি, পতিপ্রেম, প্রজাপ্রীতি—পরিবার-গঠনে রামায়ণ—সমাজ-গঠনে রামায়ণ—রাজ্য-গঠনে রামায়ণ—রামায়ণে জীবনদর্শন—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- রামায়ণের শিক্ষা
- রামায়ণ ও ভারতীয় সমাজ
- ভারতবাসীর জীবনে রামায়ণ

॥ গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয়তা ॥ ২৮.

□ ভূমিকা—গৃহসজ্জার উপকারিতা—মানুষের গৃহসজ্জার ইতিহাস : প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত—গৃহসজ্জার বিভিন্নতা—মানুষের মনের ওপর সুসজ্জিত গৃহের প্রভাব—গৃহসজ্জা মানুষের একটি উন্নত ধরনের শখ—অবকাশ যাপনের উপায়—বাঙালী জাতির গৃহসজ্জার বৈশিষ্ট্য—উপসংহার ।

অনুসরণে লেখা যায় :

- মানুষের মনের ওপর বাসগৃহের প্রভাব
- গৃহসজ্জার সার্থকতা
- গৃহসজ্জা

॥ নগর-সজ্জার সার্থকতা ॥ ২৯.

□ ভূমিকা—উপযোগিতা—নগর-সজ্জার ইতিহাস—নেপোলিয়নের নগর-সজ্জার বৈশিষ্ট্য—ভারতের নগর-সজ্জা : আকবরের ফতেপুর সিক্রির এবং জাহাঙ্গীরের আগ্রার সৌন্দর্য-সম্পাদন—নগর-সজ্জার মধ্যস্থতায় বেকার-সমস্যার সমাধান ও সংস্কৃতির নিদর্শন রক্ষা—ভারতের বর্তমান নগর-সজ্জা—কলকাতার সৌন্দর্য-বর্ধন—নাগরিকদের কর্তব্য—তোমার মতে কলকাতাকে কিভাবে সাজানো উচিত—উপসংহার ।

অনুসরণে লেখা যায় :

- নগরীর সৌন্দর্য-সম্পাদন
- নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখায় নাগরিকদের কর্তব্য

॥ ভারতের প্রথম পরমাণু-বিস্ফোরণ ॥ ৩০.

☐ ভূমিকা—বিস্ফোরণ : ১৮ই মে, ১৯৭৪—বিস্ফোরণের প্রস্তুতি—ভারতে পরমাণু-বিজ্ঞানের গবেষণা—গবেষণায় সাফল্য—পরমাণু-চুল্লী স্থাপন : অপ্সরা, সাইরাস, জারলিনা ও পূর্ণিমা—বিস্ফোরণের বৈজ্ঞানিক ফলাফল—সাফল্যের সাধনা—আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া—অর্থনৈতিক ফলাফল—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● ভারতের সাম্প্রতিক একটি বৈজ্ঞানিক সাফল্য ● পারমাণবিক শক্তিতে ভারত

॥ কর্তব্যপরায়ণতা ॥ ৩১.

☐ ভূমিকা—কর্তব্যপরায়ণতার মূল কথা—কাজ বা কর্তব্য কি?—মানুষের যথানির্দিষ্ট কর্তব্য করণীয় কেন?—কর্তব্যপরায়ণতার মূল্য—কাজই বিশ্বদেবতার পূজা ; তাইই মানুষের কর্তব্য—কল্যাণকর্ম মাত্রই মানুষের কর্তব্য—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● কর্মই জীবন ● কর্মময় জগৎ ● কর্মেই মানুষের প্রকৃত পরিচয়

॥ সাম্প্রতিক পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও গণজীবন ॥ ৩২.

☐ ভূমিকা—ভারতের অর্থনীতির মৌলিক ত্রুটি—পণ্যমূল্য ও ক্রয়শক্তি—পণ্যমূল্য : চাহিদা ও যোগান—জনসংখ্যাবৃদ্ধি—জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি ও উৎপাদন-বৃদ্ধির মন্থরতা—করপীড়ন—ঘাট্‌তি-ব্যয়—মজুতদারী ও চোরা-কারবার—কালো টাকা ও পি. এল. ৪৮০—মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য—মূল্যানুকূল্য ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধি—বাজেট-প্রকাশ ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধির হিড়িক—প্রতিকার-প্রয়াস—ব্যর্থতা—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● ভারতে পণ্যমূল্যবৃদ্ধি : তার কারণ ও প্রতিকার ● প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার ● প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ওপর পণ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

॥ ধর্মঘট ॥ ৩৩.

☐ ভূমিকা—শ্রেণী-সংঘাত ও ধর্মঘট—শিল্প-বিপ্লব ও ধর্মঘট—শ্রমিক-সংহতি—সংঘশক্তির উপলব্ধি—ধর্মঘটের কারণ ও ফলাফল—ধর্মঘট ও প্রতিক্রিয়াপন্থী—ধর্মঘট অবাঞ্ছিত কেন—ধর্মঘট পরিহার করা উচিত কেন—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● শ্রমিক-অশান্তির কারণ ও প্রতিকার ● শ্রমিক-অশান্তির ফলাফল

॥ সাম্প্রতিক কালে নৈতিক মূল্যবোধের অবনতি ॥ ৩৪.

☐ ভূমিকা—সাম্প্রতিক কালে নৈতিক মূল্যবোধের অবনতির চিত্র—কারণ : এই শতাব্দীতে দু' দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধ, ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিবর্তন—দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি, ধনবণ্টনে অসাম্য—মজুতদারী, চোরাকারবার, ভেজাল-মিশ্রণ—অতি-যান্ত্রিকতা—প্রতিকার : ধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বোধ ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির শাস্তিদান—সামাজিক কল্যাণবোধ ও মানবিক শুভবুদ্ধির বিকাশ—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- সমাজে দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার
- বর্তমান সমাজে নীতিবোধের স্থান

॥ ভারতের সাম্প্রতিক খাদ্য-সংকট ॥ ৩৫.

☐ ভূমিকা—ভারতে খাদ্য-সংকটের ঐতিহাসিক পটভূমি—ভারতে সাম্প্রতিক খাদ্য-সংকটের কারণ : কৃষির অবনতি, শিল্পোন্নয়নের মন্থরতা, পরিবহণের বিপর্যয়, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, বণ্টনগত সমস্যা—প্রতিকারের উপায়—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যার কারণ ও প্রতিকার
- খাদ্য-সমস্যার স্থায়ী সমাধান
- বর্তমানকালে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও ফলাফল

॥ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন-সমস্যা ॥ ৩৬.

☐ ভূমিকা—দেশবিভাগ ও তার প্রতিক্রিয়া : পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্যের সূচনা—বর্তমান সমস্যার রূপ—কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, জনসংখ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসগৃহের সমস্যা—রাজনৈতিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিণাম—কলকাতার নানামুখী সমস্যা—উন্নয়নের স্বাক্ষর : দুর্গাপুর, হলদিয়া, ফরাক্কা, শিলিগুড়ি, সাঁওতালডিহি—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- পশ্চিমবঙ্গের সংকট ও তার উত্তরণ
- অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গ
- পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

॥ ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ : 'ভাস্কর' ॥

☐ ভূমিকা—মহাকাশ-গবেষণায় ভারত—তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ : 'আর্যভট্ট' —দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ : 'ভাস্কর'—প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্যের নামানুসারে নামকরণ—ভাস্করাচার্য কর্তৃক মহাবৈজ্ঞানিক আর্যভট্টের আবিষ্কৃত পৃথিবীর গতিতত্ত্ব অস্বীকার : প্রান্তরে প্রোথিত বায়ুতাড়িত নিশানের সাহায্যে

—আর্যভট্টের পর ভাস্কর—৭ই জুন, ১৯৭৯ : বিকেল চারটা। সোভিয়েট রাশিয়ার একটি উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র থেকে সাফল্যের সঙ্গে ভাস্করকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন—ওজন ৪২৫ কিলোগ্রাম—তাতে আছে দুটি টেলিভিশন ক্যামেরা, তিনটি অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের রেডিওমিটার—জল, খনি ও বনসম্পদের গবেষণায় কার্যকর হবে—আবহাওয়া-গবেষণার সহায়ক হবে—সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কলাকুশলীদের সফল প্রয়াস—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- মহাকাশ গবেষণায় ভারত
- আবহাওয়া-বিজ্ঞান ও ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ

॥ হুগলীর দ্বিতীয় সেতু ॥ ৩৮.

□ ভূমিকা—হুগলীর দ্বিতীয় সেতু বা 'নেতাজী সেতু'র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা—হাওড়ার 'রবীন্দ্র-সেতু'র ওপর ভিড় হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা—কলকাতার সঙ্গে জামশেদপুর-রৌরকেলা-ভিলাই, আসানসোল-দুর্গাপুর, হলদিয়া-খড়্গপুর এবং ভারতের অন্যান্য অংশের সুষ্ঠু সংযোগ-স্থাপন—পরিকল্পনা : ১৯৬৯ সালে সেতু আইন, ১৯৭৩ সালে সেতু কমিশনার্স কর্তৃক রূপায়ণের সূত্রপাত—খুঁটিনাটি : পূর্ব-প্রান্ত প্রিন্সেপ ঘাটে, পশ্চিমপ্রান্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল পার্কে, প্রায় ৮১৯ মিটার দীর্ঘ, মূল অংশের দৈর্ঘ্য ৪৫৫ মিটার ; দুপাশে ২.৩ মিটার চওড়া ফুটপাত, ১০.৯ মিটার চওড়া যানবাহন-চলাচলের দুটি দ্বিমুখী রাস্তা, মাঝখানে ৩.০৩ মিটার চওড়া একটি দীর্ঘ আইল্যাণ্ড ; উভয় প্রান্তে থাকছে দুটি ১০৯.২ মিটার উঁচু গম্বুজ ; জোয়ারের সময় নদীর জলরেখা থেকে সেতুর উচ্চতা হবে ৩৪.৩ মিটার। কলকাতার চারটি রাস্তা এবং হাওড়ার দিকে পাঁচটি রাস্তার সঙ্গে থাকবে যুক্ত। ব্যয় হবে ১৬ কোটি টাকা, সময় লাগবে অন্ততঃ পাঁচ বছর—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- হুগলীর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা
- হুগলীর দ্বিতীয় সেতু ও কলকাতার যানবাহন সমস্যার সমাধান
- কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও 'নেতাজী-সেতু'

॥ কলকাতা মহানাগরিক পরিকল্পনা ॥ ৩৯.

□ ভূমিকা—কলকাতার সমস্যার ভয়াবহ চিত্র—সমস্যার কারণ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংস্কারের অভাব, দেশবিভাগ এবং অন্যান্য কারণে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি, বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ ; বাড়তি ৩০ লক্ষ লোক প্রত্যহ জীবিকার প্রয়োজনে কলকাতায় প্রবাহিত হয়ে আসে—সমাধান-প্রয়াস ও বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা—সি. এম. ডি. এ.—পানীয় জল সরবরাহ—জলনিষ্কাশন—রাস্তাঘাট ও যানবাহন—বস্তি-উন্নয়ন—জঞ্জাল-অপসারণ—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- কলকাতা-মহানগরীর সমস্যাবলী
- কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন-সমস্যা
- 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'

॥ ভারতের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥ ৪০.

☐ ভূমিকা—দারিদ্র্য ও অসাম্য বিজয়ের জন্যে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংগ্রাম—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনা : লক্ষ্য ও সাফল্যের মূল্যায়ন—পঞ্চম যোজনার প্রতিশ্রুতি : দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন-হার বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতিকে জব্দ করা এবং অনুন্নত অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন—বিনিয়োগ : ৫৩,৪১১ কোটি টাকা—লক্ষ্য ও কর্মধারা : প্রাক্তন যোজনাগুলির সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং জনসংখ্যার দুর্বলতর অংশের উন্নয়ন—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা হয় :

- ভারতের পঞ্চম যোজনার আশা-আকাঙ্ক্ষা
- পঞ্চম যোজনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা মোকাবিলায় পঞ্চম যোজনা

॥ ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ॥ ৪১.

☐ ভূমিকা—ভারতের বিশাল সীমান্ত ও উপকূল—ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের সংঘর্ষ—চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা—প্রতিরক্ষা ও পরিকল্পনা—প্রতিরক্ষার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : ১৯৬৪-৬৯—ব্যয়-বরাদ্দ ৫,০০০ কোটি টাকা—স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণ—ভারত মামুলি অস্ত্রশস্ত্রে বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ—নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৮.২৮ লক্ষ : এদিক দিয়ে ভারত বর্তমানে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম শক্তি—তার বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক অপরাজেয়—বায়ুসেনা : ৪৫টি স্কোয়াড্রনে বিভক্ত, জঙ্গী বিমান : এস. ইউ-৭, হান্টার, ন্যাট, মিগ-২১, এইচ এফ—নৌবাহিনী : দুটি নৌবহরে বিভক্ত : বিক্রান্ত, ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার, অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট ফ্রিগেট, অ্যান্টি-সাবমেরিন ফ্রিগেট এবং সাবমেরিন—পৃথিবীর ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তি : শান্তিপূর্ণ মানবকল্যাণমূলক কর্মই লক্ষ্য—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

- ভারতের দেশরক্ষা-ব্যবস্থা
- ভারতের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা
- ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার আধুনিক রূপ

॥ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষা : বাংলা ॥ ৪২.

☐ ভূমিকা—গণতন্ত্র ও মাতৃভাষা—রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ও বাংলা ভাষার সরকারী ভাষার মর্যাদালাভ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাংলা ভাষা—বাংলা ভাষার সরকারী ভাষা হবার পথে বাধা : ইংরেজী-পারদর্শী আমলাচক্রের চক্রান্ত, পরিভাষার

দুর্বোধ্যতা এবং আগ্রহ ও আন্তরিকতার অভাব, কর্তৃপক্ষের দ্বিধা—বাংলা ভাষার প্রকাশ-যোগ্যতা এবং সরকারী ভাষা হবার যোগ্যতা—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায়:

- সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার আবশ্যকতা
- সরকারী ভাষা রূপে বাংলা
- বাংলা ভাষার সরকারী ভাষা হবার যোগ্যতা

॥ নিরক্ষরতা-দূরীকরণ অভিযান ॥ ৪৩.

☐ ভূমিকা—জনগণই দেশের শক্তি—জনগণকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা—গণতন্ত্রের প্রয়োজনে, আদর্শ পরিবার, উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রয়োজনে—দেশের সমৃদ্ধির প্রয়োজনে দেশের নিরক্ষরতা-দূরীকরণ আবশ্যিক—উপায়: বয়স্ক-শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন—অঞ্চল-কেন্দ্রে সমাজ-শিক্ষা বিভাগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার—স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বছরের কয়েক মাস গ্রামে প্রেরণ ও নিরক্ষরতা-দূরীকরণ অভিযানে সার্থক অংশ গ্রহণ—দেশের অর্থে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-লাভ—ছাত্র-ছাত্রীদেরও দেশের প্রতি কর্তব্য আছে—সদ্য-সাক্ষরদের জন্যে সরকারের পুস্তক-প্রকাশ—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও ছাত্র-সমাজ
- নিরক্ষরতা-দূরীকরণ অভিযানে ছাত্রদের ভূমিকা

॥ সমাজে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ॥ ৪৪.

☐ ভূমিকা—কর্মময় পৃথিবী ও কর্মময় জীবন—ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীকরণে উৎসব—নতুন কর্মোদ্যম সৃষ্টির জন্যে উৎসব—উৎসব জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ—ভারতের নানা উৎসব: ধর্মীয় উৎসব, ঋতু-উৎসব, জাতীয় উৎসব ইত্যাদি—যুগ-যুগান্তরের বিবর্তন-পথে ভারতের উৎসব—উৎসব ও মানুষের উদ্ভাবন-শক্তি—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায়:

- ভারতীয় সমাজের বহুমুখী উৎসব
- জীবনে উৎসবের সার্থকতা
- সমাজে উৎসবের ভূমিকা

॥ তোমার দেখা একটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ॥ ৪৫.

☐ ভূমিকা—চলচ্চিত্রটির নাম—পরিচালকের নাম—শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—ফটোগ্রাফি—কাহিনী—চরিত্র—অভিনয়—সার্বজনীন আবেদন—সুর—শিল্প-সৌন্দর্য—অবিস্মরণীয়তা—উপসংহার।

অনুসরণে লেখা যায়:

- তোমার ভালো-লাগা একটি চলচ্চিত্র
- এ বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র

॥ একটি সভার অনুষ্ঠান ॥ ৪৬.

☐ ভূমিকা—সভার উপলক্ষ্য—আয়োজন ও প্রস্তুতি—উদ্বোধন—সভাপতি বরণ ও প্রধান অতিথি বরণ—প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের ভাষণ—প্রধান অতিথির ভাষণ—সভাপতির ভাষণ—সভাপতি, প্রধান অতিথি ও শ্রোতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● একটি স্মরণীয় সভা ● তোমার আয়োজিত একটি সভা ● একটি সভার বর্ণনা

॥ যুব-মানসে সভা-সমিতির প্রভাব ॥ ৪৭.

☐ ভূমিকা—যুব-মানসের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য—গতানুগতিকার প্রতি অনীহা—নতুনত্বের পিয়াসী—সভায় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের নানা দিকে আলোক-সম্পাত—আবেগ ও চিন্তার সমাবেশ—যুবক-সমাজের আবেগ-নিয়ন্ত্রণ ও চিন্তার খোরাক—নতুন কর্ম-প্রেরণা ও কর্মোদ্দীপনা—অসম্পূর্ণ শিক্ষার সম্পূর্ণতা—শৃঙ্খলাবোধ—উন্নততর সমাজিকবোধের বিকাশ—পরিণতমনস্কতা—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● সভা-সমিতিতে যোগদানের উপকারিতা ● সভ্যতার বিকাশে সভা-সমিতির অবদান

॥ সংবিধান-সংশোধনের যৌক্তিকতা ॥ ৪৮.

☐ ভূমিকা—সংবিধান কি ?—সংবিধানের গুরুত্ব—সংবিধানের পবিত্রতার তাৎপর্য—সংবিধানের অপরিবর্তনীয়তার ভালোমন্দ—সমাজ ও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা—সেরূপ ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধন কাম্য—রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণই মুখ্য—সামান্য কারণে কিংবা যে-কোন উপলক্ষে সংবিধান-সংশোধন অনুচিত—সংবিধান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বেদগ্রন্থ—উপসংহার ॥

অনুসরণে লেখা যায় :

● সংবিধান ও নাগরিক জীবন ● সংবিধান-সংশোধনের মূল ভিত্তি কি হওয়া উচিত ?

প্রবন্ধ বিচিন্তা

সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম, বস্তু-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ

'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া'...
—রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ বিচিন্তা

'সাহিত্যে মানুষ নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে।' —রবীন্দ্রনাথ

সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম, বস্তু-সংক্ষেপ ও ভাব-সম্প্রসারণ

প্রস্তাবনা

ভাব বা চিন্তা নিয়েই সাহিত্যের কারবার। মানুষের সভ্যতা যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই নতুন নতুন ভাব বা চিন্তা তার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করছে। সাহিত্যের সৃষ্টি-কাল বর্তমান কাল হলেও তার লক্ষ্য হলো চিরকাল—চিরকালের মানুষ। কিন্তু চিরকালের মানুষের পরিচয় কী? সে বস্তুবাদী নয়, সে ভাবুক। ভাবের মধ্যেই তার পরিচয়, ভাবের গুণেই কালের ঘাট থেকে ঘাটে তার উত্তরণ। সেইজন্যে সাহিত্যে—বিশেষতঃ কবিতা বা কাব্যধর্মী রচনায় ভাবেরই কারবার। ভাবই ঐসব রচনার প্রাণ। নিত্য-ব্যবহারিক জীবনের ভাষাই কাব্য-কবিতায় ভাবের গৌরবে হয়ে ওঠে অনবদ্য সুষমামণ্ডিত। ভাবের সেই সমুচ্চ জগতে উত্তরণই কাব্য বা সাহিত্য পাঠের মূল লক্ষ্য। শব্দের সিঁড়ি বেয়ে, ভাষার নানা স্তর অতিক্রম করে ভাব-লোকে উত্তীর্ণ হওয়াই বড়ো কথা। সেই ভাবটিকে প্রকাশ করবার জন্যে কত আয়োজন! ছন্দ, অলংকার, শব্দ-বিন্যাস—সবই ভাবের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্যে। ভাবের স্বর্গলোকে পৌঁছতে হলে শব্দ-বিন্যাসের সেই আবরণ ভেদ করতে হবে, ছন্দ ও অলংকারের প্রসাধনে বিভ্রান্ত হলে চলবে না; ওগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে ভাবের মর্মলোকে প্রবেশ করতে পারার মধ্যেই কাব্য-সাহিত্য পাঠের সার্থকতা।

□ সার-সংক্ষেপ [Pre´cis]

কাকে বলে ?

বহু চিন্তা, যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও উপমা-অলংকার-যোগে বিবৃত কোন উদ্ধৃতাংশকে সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত, সুসংহত রূপদানের নাম সার-সংক্ষেপ। উদ্ধৃতাংশে যে ভাবগুলি গৌণ বা অপ্রধান, সেগুলি বর্জন করতে হবে। মূল অংশে যে প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই, তার অবতারণাও পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ, কেবলমাত্র মূল ভাবটিকেই যুক্তি-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে প্রকাশ করার নামই সার-সংক্ষেপ; সার-সংক্ষেপে বস্তুতঃ ডালপালা ছেঁটে মূল ভাবটিকে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করতে হয়।

সার-সংক্ষেপ সম্পর্কে কতকগুলি পালনীয় নির্দেশ: এক. প্রথমে মূল অংশটি

কয়েকবার সযত্নে পাঠ করতে হবে এবং মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনীয় অংশগুলি রেখাঙ্কিত [under-lined] করলে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়। দুই. প্রারম্ভিক বাক্যটিতে মূল ভাব সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। তিন. কোন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় সার-সংক্ষেপে থাকবে না। চার. অপ্রধান ভাবগুলিকে পরিহার করতে হবে। পাঁচ. মূল অংশে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলে তার সার-সংক্ষেপ নিজের বিবৃতিতে প্রকাশ করতে হবে। ছয়. মূল অংশে উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকার, অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ বা কোন দৃষ্টান্ত থাকলে তা বর্জনীয়। সাত. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনবোধে তার সার-সংক্ষেপ করে দেওয়া চাই। সব সময় মনে রাখতে হবে, সার-সংক্ষেপে সব রকমের বাহুল্য যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। এমন-কি, যে-সব শব্দ মূল ভাব প্রকাশে সাহায্য করছে না, তাকে নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ রচনার নিয়ম

সার-সংক্ষেপ সম্পর্কে কতকগুলি অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ : ১. প্রথমে শব্দ-সংখ্যা দিতে হবে। ২. তারপর দিতে হবে সার-সংক্ষেপের মূল-কাঠামো। মূলের প্রয়োজনীয় অংশগুলি সুচিন্তিতভাবে রেখাঙ্কিত করলে তার সাহায্যেই মূল-কাঠামো রচনা করা সম্ভব। ৩. তারপর Title বা শীর্ষনাম। মূল-কাঠামোর ভাব-নির্যাস থেকে একটি বা দুটি নির্বাচিত শব্দের সাহায্যে শীর্ষনাম রচনা করা যায়। কোথাও তা সম্ভব না হলে মূল-কাঠামো থেকে নির্বাচিত একটি বা দুটি শব্দ দিয়ে তা সেরে নিতে হয়। ৪. সার-সংক্ষেপণ। ৫. সব শেষে সার-সংক্ষেপিত অংশের শব্দ-সংখ্যা। কাজেই, মনে রাখতে হবে, সার-সংক্ষেপের মোট পাঁচটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এর কোনটিই অপ্রয়োজনীয় নয়। সার-সংক্ষেপ রচনার সময় পাঁচটি অঙ্গই যথাযথভাবে উল্লিখিত হওয়া চাই।

সার-সংক্ষেপের বিভিন্ন অঙ্গ

সার-সংক্ষেপ [Pre´cis] এবং বস্তু-সংক্ষেপের [Summary] মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেই পার্থক্যটি কোথায়, তা এখানে জেনে নেওয়া দরকার। সার-সংক্ষেপে মূল ভাবটি যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু বস্তু-সংক্ষেপে প্রকাশ করতে হয় মূল চিন্তা বা মূল বক্তব্যটিকে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সার-সংক্ষেপ রচনার জন্যে সাধারণতঃ 'সার-সংক্ষেপ লিখ' বা 'সার কথাটি সংক্ষেপে লিখ', 'মূল রচনার অর্ধেক পরিসরের মধ্যে মর্মার্থ বুঝাইয়া দাও'—এরূপ নির্দেশ প্রদত্ত হয়। এরূপ নির্দেশ যে সার-সংক্ষেপ রচনার নির্দেশ, তা বুঝতে ছাত্রছাত্রীদের মনে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়।

সার-সংক্ষেপের সংকেত

□ সারমর্ম [Substance]

সারমর্ম রচনার জন্যে প্রশ্নপত্রে কাব্য-ধর্মী রচনার কিছু অংশ প্রদত্ত হয়। উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মূল ভাবটি থাকে সংগুপ্ত। তাকে আবিষ্কার করে নিজের ভাষায় পরিস্ফুট করতে হয়। সারমর্ম উদ্ধৃতাংশের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবের পরিস্ফুটন হলেও শিল্প-সৌষ্ঠববর্জিত নয়। সারমর্মের আয়তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ, সংক্ষেপে অথচ শিল্প-সৌকর্যময় ভাষায় মূল তাৎপর্যটির পরিস্ফুটন করতে হবে। তার আয়তন সম্পর্কে স্মরণীয় যে, তা সব সময় উদ্ধৃতাংশের চেয়ে ক্ষুদ্রাকার হবে—তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে প্রশ্নপত্রে আয়তন সম্পর্কে কোন সীমা-নির্দেশ থাকলে তা অবশ্যই পালনীয়। সারমর্ম উদ্ধৃতাংশের চেয়ে বড়ো কিংবা ক্ষুদ্রাকার হতে পারে অথবা সমান-সমানও হতে পারে।

সারমর্মের বৈশিষ্ট্য

আসল কথা, অলংকার ও শব্দ-বিন্যাসের ভেতর থেকে ভাববস্তু বা তাৎপর্যটিকে আবিষ্কার করে সহজ, সরল ও নিরলংকারভাবে প্রকাশ করতে হবে। সেজন্যে যেটুকু পরিসর প্রয়োজন হয়, তা অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য। ভাষা সহজ, সরল হলেই শিল্প-সৌষ্ঠব-বর্জিত হয় না। বরং সরল পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। সেখানে বাচনভঙ্গী এমন সুষ্ঠু এবং সুনিপুণ হবে, যাতে তা অন্তরস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে। ভাষা যথাসম্ভব জীবন্ত হলে তবেই তা সম্ভব। এবং মূল ভাব বা তাৎপর্যটিকে আবিষ্কার করতে পারলেই ভাষাও স্বাভাবিক কারণেই জীবন্ত হয়ে উঠবে।

প্রকাশ-ভঙ্গী

সারমর্ম সম্পর্কে কয়েকটি অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ : এক. প্রদত্ত অংশটি কয়েকবার পাঠ করা চাই এবং প্রতিবারেই অর্থোপলব্ধির চেষ্টা করা চাই। দুই. উদ্ধৃতাংশের প্রতিটি শব্দের প্রয়োগ-সার্থকতার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তিন. তারপর মূল অর্থটিকে নিজের ভাষায় প্রকাশের জন্যে অগ্রসর হতে হবে। চার. প্রারম্ভিক বাক্যটিতে সুসংহত আকারে ভাবটি পরিবেশিত হবে। পাঁচ. প্রদত্ত অংশে উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলে তাকে নিজের বিবৃতিতে প্রকাশ করতে হবে। ছয় প্রদত্ত অংশে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার সার-সংকলন করে দিতে হবে। সাত রূপক, উপমা ইত্যাদি অলংকার বর্জনীয়। প্রদত্ত অংশে যে কথার উল্লেখ নেই, তা লেখা অনুচিত।

সারমর্ম রচনার নিয়ম

সারমর্ম, সার-সংক্ষেপ এবং বস্তু-সংক্ষেপের মধ্যে পার্থক্যটি বুঝে নেওয়া দরকার। সারমর্মে রচনাংশের সার বা ভাবটুকুকে শিল্পসম্মত ভাষায় রূপদান করতে হয়। সার-সংক্ষেপে শিল্পসুষমাময় ভাষা প্রয়োগ করবার সুযোগ নেই ; তাতে শুধুমাত্র মূল ভাবটিকে সংক্ষেপে নিরলংকার ভাষায় প্রকাশ করতে পারলেই হলো। বস্তু-সংক্ষেপে মূল ভাবটির সঙ্গে গৌণ বা অপ্রধান ভাব-গুলিকেও সংক্ষেপে প্রকাশ করা চাই। প্রশ্ন-পত্রে সারমর্ম রচনার জন্যে সাধারণতঃ 'সারাংশ প্রদান কর' বা 'সারাংশ লিখ' বা 'সারাংশ লিপিবদ্ধ কর' বা 'ভাবার্থ লিখ' বা

সারমর্মের সংকেত

ভাবসত্য পরিস্ফুট কর' বা 'মর্মার্থ লিখ' বা 'মর্ম প্রকাশ কর' বা 'মর্মসত্য প্রকাশ কর' বা 'মর্মবাণী লিপিবদ্ধ কর' বা 'সারমর্ম লিখ'—এরূপ নির্দেশ প্রদত্ত হয়। এরূপ নির্দেশ থাকলে যে সারমর্ম রচনা করতে হয়, ছাত্রছাত্রীরা সে বিষয়ে যেন অবহিত থাকে।

□ বস্তু-সংক্ষেপ [Summary]

উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকার এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ-যোগে উচ্ছ্বাসপূর্ণ রচনাংশ থেকে বস্তু-সংক্ষেপ রচনা করবার সময় প্রথমতঃ প্রধান ভাববস্তুটি আবিষ্কার করা দরকার। তারপর দেখতে হবে, সেই প্রধান ভাববস্তুটির সুপ্রকাশের জন্যে কতকগুলি গৌণ ভাব বা অপ্রধান ভাবকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বস্তু-সংক্ষেপের

কাকে বলে ?

ক্ষেত্রে মূল বা প্রধান ভাববস্তুটির সঙ্গে গৌণ বা অপ্রধান ভাববস্তুগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকার ভাববস্তু নিয়েই বস্তু-সংক্ষেপের কারবার। কিন্তু বস্তু-সংক্ষেপ প্রকাশের ভাষা হবে সার-সংক্ষেপের মতো সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত এবং নিরলংকার। তবে সার-সংক্ষেপের যে পাঁচটি অঙ্গ আছে, তার উল্লেখ যেমন তাতে আবশ্যিক, বস্তু-সংক্ষেপে সে রকম কিছু নেই।

বস্তু-সংক্ষেপ রচনার ব্যাপারে কয়েকটি অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ : এক. প্রদত্ত রচনাংশটি একাধিকবার সযত্নে পাঠ করো; এবং প্রতিবারেই অন্তর্নিহিত ভাববস্তুটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করো। দুই. তারপর লক্ষ্য করো, মূল ভাববস্তুটিকে প্রকাশ করবার জন্যে কতকগুলি অপ্রধান ভাবের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে; সেগুলিকে আবিষ্কার করো। তিন. এবার বস্তু-সংক্ষেপ রচনার জন্যে অগ্রসর হও। চার. উপমা-রূপক ইত্যাদি অলংকার এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদির বাহুল্য

বস্তু-সংক্ষেপ রচনার নিয়ম

অবশ্য-বর্জনীয়। পাঁচ. এখন ভাব ও উপভাবগুলিকে উপযুক্ত যুক্তি-শৃঙ্খলাযোগে প্রকাশ করো। ছয়. মূল রচনাংশে কোন দৃষ্টান্ত থাকলে তারও বস্তু-সংক্ষেপ করে দেওয়া দরকার। সাত. উদ্ধৃত রচনাংশে কোন উক্তি-প্রত্যুক্তি বা উদ্ধৃতি থাকলে এবং তা প্রয়োজনীয় অংশ হলে তারও বস্তু-সংক্ষেপ করে দেওয়া চাই। আট. মূল রচনাংশের কোন দৃষ্টান্ত বা উক্তি-প্রত্যুক্তি মূল ভাববস্তুর সঙ্গে অন্বিত না হলে কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে ওসব বর্জন করাই উচিত। নয়. বস্তু-সংক্ষেপ নিরলংকৃত, সহজ, সরল ভাষায়ই রচিত হওয়া উচিত। দশ. বস্তু-সংক্ষেপ রচিত হবার পর কোন প্রধান বা অপ্রধান ভাববস্তু বাদ পড়ে গেছে কিনা যাচাই করে দেখো।

অনেকে সার-সংক্ষেপ [Precis], সারমর্ম [Substance] এবং বস্তু-সংক্ষেপ [Summary]—এই তিনটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি যথাযথভাবে বুঝতে না পেরে ভুল করে থাকে। সার-সংক্ষেপে এবং সারমর্মে প্রধান ভাবটির প্রাধান্য; কিন্তু বস্তু-সংক্ষেপে প্রধান ও অপ্রধান—উভয় ভাবেরই প্রাধান্য। কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে সার-সংক্ষেপের এবং বস্তু-সংক্ষেপের ভাষা সাদামাঠা—নিরলংকার; অথচ সারমর্মের ভাষাটি

শিল্প-সুষমাময়। প্রশ্নপত্রে বস্তু-সংক্ষেপ রচনার জন্যে সাধারণতঃ 'ভাববস্তু সংক্ষেপ লিখ' বা 'বক্তব্য বিষয়টি সংক্ষেপে লিখ' বা 'বস্তু-সংক্ষেপে লিখ' বা 'সংক্ষেপে বিষয়বস্তুটি লিখ' বা 'সংক্ষেপে বিষয়বস্তুটি পরিস্ফুট কর' —এরূপ নির্দেশ প্রদত্ত হয়। এরূপ নির্দেশ যে বস্তু-সংক্ষেপ রচনার নির্দেশ, সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা যেন নিঃসংশয় থাকে।

বস্তু-সংক্ষেপের সংকেত

□ ভাব-সম্প্রসারণ [Amplification]

সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত কোন ভাবকে শিল্প-সৌকর্যময় ভাষার সাহায্যে পল্লবিত করে তোলার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। কবিতার দু'একটি ছত্রে কিংবা গদ্যের দু'একটি বাক্যে—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে—বিশাল সমুচ্চ ভাব বীজাকারে অন্তর্নিহিত থাকে। ইংগিতে সেখানে অনেক কথা বলা হয়, ব্যঞ্জনায় অনেক ভাব রূপলাভ করে। ব্যঞ্জনায় কিংবা ইংগিতে ব্যক্ত সেই সব অকথিত কথাকে নিজের ভাষায় বিকশিত করে তোলার নাম ভাব-সম্প্রসারণ। যে সব ভাব সংকুচিত কিংবা কুণ্ঠিত অবস্থায় নিদ্রিত আছে, তার বিস্তার বা সম্প্রসারণই ভাব-সম্প্রসারণের লক্ষ্য। অর্থাৎ, উদ্ধৃতাংশের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আশ্রয় করে নিজের চিন্তা বা কল্পনার পথে স্বাধীনভাবে পাড়ি জমাতে হবে। সাধারণতঃ মহৎ কোন ভাব বা মহৎ কোন আদর্শের কথা বা মানব-চরিত্রের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের কথা উদ্ধৃতাংশে নিহিত থাকে। তাকে অবলম্বন করে কবি বা লেখকের চিন্তা ও কল্পনার অনুসরণে সেই ভাবাদর্শের জগতে স্বনির্ভরভাবে বিচরণ করতে হবে।

কাকে বলে ?

ভাব-সম্প্রসারণ সম্পর্কে কতকগুলি অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ: এক. প্রদত্ত কাব্যাংশ বা গদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েকবার পাঠ করতে হবে। দুই. কাব্যাংশে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করতে হবে। তিন. মূল ভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কিভাবে সফল হয়েছে, লক্ষ্য করো। চার. প্রারম্ভিক বাক্যটি সুরচিত, দৃঢ়নিবদ্ধ এবং ক্রিয়াপদবর্জিত হলে ভাব-সম্প্রসারণটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পাঁচ. প্রদত্ত অংশে ব্যবহৃত বিভিন্ন মূল ভাবের সঙ্গে যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে, তাদের সম্প্রসারিত করতে হবে। ছয়. সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কোন ক্ষুদ্র কথিকা বা কবি এবং মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণীমঞ্জরীর দু'একটি যোগ্য স্থানে উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু লক্ষণীয়, উদ্ধৃতিটি যেন নির্ভুল হয় এবং মূল ভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক হয়। সাত. ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের মতো বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম বা ভাব-সংক্ষেপের মতো ক্ষুদ্র হবে না। আট. ব্যাখ্যার [Explanation] মতো ভাব-সম্প্রসারণে 'কবি বলিতেছেন' কিংবা 'এখানে কবির বক্তব্য হইল'—এ ধরনের মন্তব্য, নিষ্প্রয়োজন। নয়. আবার অনেকে ভাব-সম্প্রসারণকে প্রবন্ধের মতো মনে করে তাকে ক্রমশঃ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে চলে। তাতে বিপদ হয় চার দিক থেকেই। প্রথমতঃ, মূল ভাবের সম্পর্কহীন এমন অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা তাতে বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাতে পরীক্ষকের

ভাব-সম্প্রসারণের নিয়ম

বিরক্তির উদ্রেক হয়। তৃতীয়তঃ, বহু বানান ভুলের সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থতঃ, পরীক্ষা-মন্দিরে বহু মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। ভাব-সম্প্রসারণের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন স্থির-নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তাই বলে তাকে যথেচ্ছভাবে দীর্ঘ করার কোন যুক্তি নেই। তবে তার দৈর্ঘ্য পরীক্ষার উত্তরপত্রের এক পৃষ্ঠার বেশী করার কোন অর্থ নেই।

অনেকের ধারণা, এবং ভুল ধারণা—ব্যাখ্যা এবং ভাব-সম্প্রসারণ মূলতঃ এক এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাখ্যা এবং ভাব-সম্প্রসারণ—দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়। ব্যাখ্যায় স্বাধীনতার সুযোগ নেই; তাতে উদ্ধৃতাংশের সীমা লঙ্ঘনেরও উপায় নেই। কিন্তু ভাব-সম্প্রসারণে স্বাধীনতার সুযোগ প্রচুর এবং সেইজন্যে উদ্ধৃতাংশের অল্প-বিস্তর সীমা-লঙ্ঘন নিয়মবিরুদ্ধ নয়। ভাব-সম্প্রসারণে কোন সংক্ষিপ্ত ভাবকে অবলম্বন করে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিস্তার-পরিধির পরীক্ষা করা হয়। ভাব-সম্প্রসারণে 'কবি বলিতেছেন' বা 'এখানে কবির বক্তব্য হইল'—এ ধরনের মন্তব্য শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়, নিয়মবিরুদ্ধ। প্রশ্নপত্রে ভাব-সম্প্রসারণের জন্যে 'কেন্দ্রীয় ভাবটি সম্প্রসারিত কর' বা 'ভাব-বিস্তার কর' বা 'ভাবার্থ সম্প্রসারিত কর' বা 'মর্মসত্য সম্প্রসারিত কর' বা 'মর্মার্থ সম্প্রসারিত কর'—এরূপ নির্দেশ প্রদত্ত হয়। এরূপ নির্দেশ যে ভাব-সম্প্রসারণের নির্দেশ, তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে কোনরূপ সংশয় থাকা উচিত নয়॥

ভাব-সম্প্রসারণের সংকেত

১.   ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি ;
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে ;
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি দাঁড়াবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে ;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুকুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে ;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার ;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে ভীরুতা আপনার
মনে মনে।'

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১৪৮

মূল-কাঠামো ঃ নতশির—নিষ্পেষণ—অসহায় আত্মসমর্পণ—আশাহীন, ভাষাহীন, নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধতা—প্রতিরোধ—জয়লাভ।

শীর্ষনাম ঃ জয় নব-উত্থান

বলদর্পীদের অত্যাচারে জগতের ভাগ্যহত সর্বহারাদের যুগ যুগ ধরে অসহায়ভাবে নিষ্পেষিত হবার করুণ কাহিনীই তাদের যুগ-যুগান্তরের জীবন-ইতিহাস। ভাগ্যের কাছে এইভাবে অসহায় আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়ে তারা বাঁচে এবং মরে। আশাহীন, ভাষাহীন এই চির-নিপীড়িত সর্বহারাদের বুকে আশা এবং মুখে ভাষা দিয়ে শক্তিমদমত্তদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানাতে হবে। তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে আত্ম-প্রত্যয়হীন, স্বভাব-ভীরু অত্যাচারীদের পরাজয় অনিবার্য। ঈশ্বর তাদের প্রতি নির্মম। তাদের সেই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে জয়যুক্ত হবে জগতের ভাগ্যহত সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ নব-উত্থান॥

শব্দ সংখ্যা ঃ ৭২

২. বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।
কিসেরই বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ।
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

মূলের শব্দ-সংখ্যাঃ ৩৩

মূল-কাঠামোঃ বিশ্বপ্রেমের আবির্ভাব—স্বার্থমগ্নতার অবসান—দুঃখের সংগ্রামে সাড়াদান।

শীর্ষনামঃ বিশ্বপ্রেমের আবির্ভাব

অন্তরে বিশ্বপ্রেমের শুভ আবির্ভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থমগ্নতার ঘটে অবসান। বিশ্বের বিশাল দুঃখের অবসানকল্পে রক্তাক্ত সংগ্রামের আসে উদাত্ত আহ্বান। সেই আহ্বানে বিশ্বপ্রেমিক ছিন্ন করেন তাঁর ক্ষুদ্রস্বার্থসুখময় জীবনের সকল বন্ধন॥

শব্দ-সংখ্যাঃ ২৭

৩. শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদরাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; প্রলয়মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নামধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

মূলের শব্দ-সংখ্যাঃ ৬২

মূল-কাঠামোঃ হিংসার উন্মত্ততা—সভ্যতার অন্তিম লগ্ন—স্বার্থ-সংঘাত—লোভের সংগ্রাম—সভ্যতার বেশে বর্বরতা—জাতিপ্রেম—মানব-ধর্মের নির্বাসন।

শীর্ষনাম ঃ সুসভ্য বর্বরতা

হিংসার উন্মত্ততায় নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে আজ সভ্যতার অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আজ স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভের সঙ্গে লোভের লেগেছে সংগ্রাম। সভ্যতার ছদ্মবেশে আজ বর্বরতার ঘটছে নির্লজ্জ প্রকাশ। এর মূলে আছে অন্ধ জাতিপ্রেম। মানব-ধর্ম আজ পৃথিবী থেকে নির্বাসিত ॥

শব্দ সংখ্যা ঃ ৩৯

৪. হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে, দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাটে তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির-উজ্জল,
নীরব আশিস্-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ,
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ-'পর।

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে—
অমর-ঋষির হৃদয় ভেদিয়া ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
হিরণ-কিরণে-গাঁথা—
তখন ভারতে শুনি চারি ভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গীতে
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে, শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব, তব গান মোর স্বদেশে।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১১৩

মূল-কাঠামো ঃ বিশ্বদেবতার প্রকাশ—স্বদেশের পূর্ব-গগনে, হিমাচলে, সমুদ্রোপকূলে, জাহ্নবীর জলধারায়—ঋষিকণ্ঠের স্তবমন্ত্রে—পক্ষী-কাকলিতে—কবির আশা।

শীর্ষনাম ঃ বিশ্বদেবতা

বিশ্বদেবতার প্রকাশ স্বদেশের পূর্ব-গগনে, হিমাচলে, সমুদ্রোপকূলে, জাহ্নবীর জলধারায়, পক্ষী-কাকলিতে এবং ঋষিকণ্ঠের স্তবমন্ত্রে। সুদূর অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিশ্বদেবতার অমল প্রকাশ স্বদেশের মৃত্তিকায় প্রতিভাত হয়েছে। কবির সংস্কারমুক্ত হৃদয়ে সেই মূর্তির ঘটেছে উজ্জ্বল প্রকাশ ॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৩২

৫.

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি—
ধরিতে দরিদ্রবেশ। শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে আররে,
ভুলি জয়পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্তচিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে;
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল;
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল;
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ৬৫

মূল-কাঠামো ঃ ভারতের রাজার আদর্শ—বীরের আদর্শ—কর্মীর আদর্শ—গৃহীর আদর্শ—ভোগ ও সংযম, দৈন্য ও বৈরাগ্য, সম্পদ ও কল্যাণ—ব্রহ্মে সর্বস্ব সমর্পণ।

শীর্ষনাম ঃ ভারতের আদর্শ

ভারতের রাজার আদর্শ হলো রাজ্য-সিংহাসন ত্যাগ করে দারিদ্র্য-বরণ, বীরের আদর্শ শত্রুকে ক্ষমা, কর্মীর আদর্শ কর্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ, গৃহীর আদর্শ উদার আতিথেয়তা। ভারতবর্ষ ভোগকে সংযমের দ্বারা, দৈন্যকে বৈরাগ্যের দ্বারা এবং সম্পদকে কল্যাণের দ্বারা পরিশোধিত করে ব্রহ্মপদে সর্বস্ব সমর্পণ করেছে॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৩৮

৬.

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,—মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান—
তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালি-সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবনস্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন—

বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

মূলের শব্দ-সংখ্যা : ৭১

মূল-কাঠামো : ভদ্র, শান্ত বাঙালী জাতি আচার-আচরণে শিষ্ট—গৃহমুখী—নিদ্রালুতা—আলস্য—এর চেয়ে মরুদেশের আরব বেদুয়িন শ্রেয়—প্রাণোচ্ছলতা।

শীর্ষনাম : জীবনের স্বাদ

চিরাচরিত ভদ্র, শান্ত, ঘরকুনো বাঙালী জাতি বাক্যে ও আচরণে অত্যন্ত শিষ্ট। তার আলস্য, নিদ্রালুতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ভণ্ডামি সর্ববিদিত। কিন্তু এই জীবনযাপনের চেয়ে মরুদেশের দুর্ধর্ষ আরব বেদুয়িন জাতির বাধাবন্ধহীন, সংগ্রামী জীবন শ্রেয়। কারণ তাতে আছে পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ॥

শব্দ-সংখ্যা : ৩৬

৭. অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

মূলের শব্দ-সংখ্যা : ১০৩

মূল-কাঠামো : অণুবীক্ষণে ছোট জিনিসকে বড় দেখায়—বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাবার যন্ত্র—তার পাশে স্বদেশের সব বড় ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালীত্বও ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতার মাঝখানে বিদ্যাসাগরের মূর্তি সর্বাপেক্ষা উন্নত।

শীর্ষনাম : বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছোট জিনিসকে বড় দেখাবার যন্ত্র; আর, বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাবার প্রয়াস। তার পাশে আমাদের স্বদেশের সব পরিচিত উন্নত ব্যক্তিত্ব এবং বাঙালীত্বের দম্ভও অত্যন্ত ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হয়। এই সর্বব্যাপী ক্ষুদ্রতার মাঝখানে বিদ্যাসাগরের মূর্তি সর্বোন্নত,—অপরাজেয়॥

শব্দ-সংখ্যা : ৩৭

৮. বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর-সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিসকে জীবনের কাজে লাগাইয়া, যেন-তেন-প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবনযাত্রায় দৌড়াইয়া চলিতেছে; আশে-পাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশেপাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর-সাধারণকে যখন দেখান, তখন তাহারা নূতন কি দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন—'দেখ, কত বাস্তবিক সত্য, তা তুমি এতদিন দেখ নাই; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজনসিদ্ধি, জীবন-যুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে।' সাহিত্যিক

বলেন—'দেখ, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি তুমি এতকাল তাকাও নাই, ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবন-যুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়।' একজন যেখানে সত্যের, অন্যজন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে ; আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে—সুন্দরকে, শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১৩৭

মূল-কাঠামো ঃ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আপাত-বিরোধ—গভীর সাদৃশ্য—সাধারণ মানুষ—বৈজ্ঞানিক—সাহিত্যিক।

শীর্ষনাম ঃ বিজ্ঞান ও সাহিত্য

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আপাত-বিরোধ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। জীবন-যাত্রার ব্যস্ততায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে চারদিকে বহু বিষয়ই আকৃষ্ট করে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সেই উপেক্ষিত বিষয়গুলির ভেতর থেকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের জন্যে নানা বাস্তব সত্য আবিষ্কার করেন। সাহিত্যিকেরা সেই অবহেলিত বিষয়গুলির ভেতর থেকে আবিষ্কার করেন কত দুর্লভ সৌন্দর্য। একজন আবিষ্কার করেন সত্যকে, অন্যজন আবিষ্কার করেন সৌন্দর্যকে। উভয় আবিষ্কারই মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উৎস ও সম্মিলন-বিন্দু এক এবং অভিন্ন॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৬৮

৯. ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক না কেন, ভরতের অপূর্ব ভ্রাতৃস্নেহ সমস্ত জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। রামকে আমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। যখন চিত্রকূটের পুষ্পোদ্যাননিভ এবং ক্বচিৎ ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রান্ত অধিত্যকায় বিলম্বিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছেন, 'এই স্থানে তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজপদ অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেছি,' তখন দম্পতির নির্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে। রামচন্দ্রের আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন। কিন্তু ভরতের চিরবিষণ্ণ চিত্রটি মর্মান্তিক, করুণার যোগ্য। রামকে যখন ভরত ফিরাইয়া লইতে আসেন, তখন তাঁহার জটিল, কৃশ ও বিবর্ণ মূর্তি দেখিয়া রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ৯৯

মূল-কাঠামো ঃ ভরতের ভ্রাতৃস্নেহের জটিলতাকে সহজ করবার শক্তি—চিত্রকূটের পুষ্পময় শৈল-অধিত্যকায় সুখী রামচন্দ্র—তাঁর জীবন দুঃখসুখময়—ভরতের চিত্র চির-করুণ—চিত্রকূটে তাঁর জটিল, কৃশ, বিষণ্ণ মূর্তি।

শীর্ষনাম ঃ চির-বিষণ্ণ ভরত

ভরতের ভ্রাতৃস্নেহের মধ্যে ছিল সমস্ত জটিলতাকে সহজ করবার আশ্চর্য শক্তি। চিত্রকূটের পুষ্পময় শৈল-অধিত্যকায় সুখী রামচন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর জীবন দুঃখসুখময়। কিন্তু ভরতের চিত্র চির-করুণ। চিত্রকূটে তাঁর জটিল, কৃশ, বিষণ্ণ মূর্তি দেখে রামচন্দ্র তাঁকে অতিকষ্টে চিনতে পেরেছিলেন॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৩৬

১০. নক্ষত্র রায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ

মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—'হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না! এ সংসারে হিংসা-লোভই এত বড়ো হইয়া উঠিল, আর স্নেহপ্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না! এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন একগৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে।' গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্র-জন্তুপূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১০৮

মূল-কাঠামো ঃ নক্ষত্র রায়ের মুখের দিকে চেয়ে গোবিন্দমাণিক্যের চিন্তা—ভ্রাতৃস্নেহে হিংসার অনুপ্রবেশ—মানুষের হিংস্রতায় ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ—একান্ত আপন ভ্রাতৃ-হৃদয় হিংসাপূর্ণ—সমস্ত সংসার তাঁর কাছে দন্তনখরযুক্ত হিংস্র-জন্তুপূর্ণ প্রতিভাত।

শীর্ষনাম ঃ হিংস্র পৃথিবী

আপন ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের মুখের দিকে চেয়ে গোবিন্দমাণিক্যের ব্যথিত মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, ভ্রাতৃস্নেহে হিংসার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মানবিক হিংস্রতায় আসন্ন তাঁর ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ। তাঁর একান্ত আপন ভ্রাতৃ-হৃদয়ও যখন হিংসাপূর্ণ, তখন সমস্ত সংসারই তাঁর কাছে দন্তনখরযুক্ত হিংস্রজন্তু-পূর্ণরূপে প্রতিভাত হলো॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৩৮

১১ পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর-একজন আসিল; উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উসখুস করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধহয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে।' পিতা কহিলেন, 'না।' তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, 'ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।' আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল; টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১৫১

মূল-কাঠামো ঃ পথে একটি বড় স্টেশনে গাড়ি থামলে টিকিট-পরীক্ষকের টিকিট-পরীক্ষা—

অন্যজনকে ডেকে আনলো—তৃতীয় বারে স্টেশনমাস্টার—লেখকের এগারো বছর বয়স সম্পর্কে সন্দেহ—পুরো ভাড়া দাবি—লেখকের পিতা নোট দিয়ে টিকিট কেটে ফেরত টাকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

শীর্ষনাম : আত্মসম্মান-বোধ

পথে একটি বড় স্টেশনে গাড়ি থামলে টিকিট-পরীক্ষক লেখকের হাফ-টিকিট পরীক্ষা করে লেখকের এগারো বছর বয়স সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে আর-একজন টিকিট-পরীক্ষককে ডেকে আনলো। বয়সের তুলনায় লেখকের বৃদ্ধি ছিল কিঞ্চিৎ বেশী। উভয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে চলে গেলে শেষে স্টেশনমাস্টার স্বয়ং এসে লেখকের পুরো টিকিট দাবি করে। তাতে লেখকের পিতা অসন্তুষ্ট হয়ে নোট দিয়ে পুরো টিকিট কেটে ফেরত টাকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন॥

শব্দ-সংখ্যা : ৬০

১২. কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাইকাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশালাইকাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে—ঋণে এবং সর্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে, এই সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে।

মূলের শব্দ-সংখ্যা : ১৪৫

মূল-কাঠামো : কাগজে বিজ্ঞাপন—জ্যোতিদাদার সাত হাজার টাকায় জাহাজের খোল ক্রয়—দেশে দেশালাই ও তাঁতের কল চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা—দেশের মানুষকে জাহাজ চালাতে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে পুরা জাহাজ নির্মাণ—ফলে ঋণ এবং সর্বনাশ—নিজে ক্ষতি স্বীকার—দেশের উন্নিত।

শীর্ষনাম : স্বদেশপ্রীতি

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে জ্যোতিদাদা একবার সাত হাজার টাকায় একটি জাহাজের খোল ক্রয় করেন। দেশে দেশলাই ও তাঁতের কল চালাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর দেশের মানুষকে জাহাজ চালাতে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে তা দিয়ে একটি পুরো জাহাজ নির্মাণ করলেন। তার ফলে তিনি ঋণে সর্বস্বান্ত হলেন। এইভাবে নিজে ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি দেশের উন্নতির যে চেষ্টা করে যান, তা স্মরণীয় হয়ে আছে॥

শব্দ-সংখ্যা : ৫৯

১৩. মানবজাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীন কাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধহয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার

যত সূতী কাপড়, তূলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তাছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মত কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ, এলাচ, মরিচ, জায়ফল, জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মশলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই, অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করত। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত ; একটি ডাঙা পথে আফগানী ইরাণী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড সী হয়ে। সিকন্দর শা ইরান বিজয়ের পর নিয়ার্কুস নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল, ইরান, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত তা অনেকে জানে না।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১৫২

মূল-কাঠামো ঃ মানব-জাতির উন্নতির মূলে ভারতের বাণিজ্য—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত ভারতের তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি, সূতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র এবং পশমিনা কিংখাব এবং নানা মশলা—সুসভ্য দেশগুলিতে রপ্তানি—সেই বাণিজ্যের দুটি পথ—সমৃদ্ধ দেশগুলির সমৃদ্ধির উৎস।

শীর্ষনাম ঃ ভারতের কাছে মানবজাতির ঋণ

মানব-জাতির উন্নতির মূলে আছে ভারতের বাণিজ্য। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত ভারত তার উৎকৃষ্ট তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি, সূতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র এবং পশমিনা কিংখাব এবং নানা মশলা পৃথিবীর সুসভ্য দেশগুলিতে রপ্তানি করতো। তার সেই বাণিজ্য চলতো দুটি পথে—জলপথে ও স্থলপথে। বাবিল, ইরান, গ্রীস ও রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে ভারতের ওপর নির্ভর করতো, তা অনেকের অজ্ঞাত॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৬০

১৪. পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা —মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্য-বাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোন বুড়ো মানুষের কাতরানি শুনিতে পাইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরীমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, 'মা, তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?'

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১৬৭

মূল-কাঠামো ঃ পথের শেষে প্রফুল্ল বেলা দশ দণ্ডের সময় পুরাতন ইট দেখলো—নিবিড় জঙ্গলমধ্যে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ—অভগ্ন ঘরগুলিতে মনুষ্যবাসের চিহ্ন—এক বৃদ্ধের কাতরানি—একটি কুঠরীর মধ্যে একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধ—শয্যাপার্শ্বে প্রফুল্লকে দেখে আশ্বস্ত।

শীর্ষনাম ঃ মুমূর্ষু বৃদ্ধ

পথের রেখা শেষে বিলুপ্ত হলো। বেলা দশ দণ্ড। প্রফুল্ল পুরাতন ইট দেখতে পেয়ে সেগুলির অনুসরণে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখতে পেল। তার কয়েকটি ঘর তখনো অভগ্ন। সেগুলিতে মনুষ্যবাসের চিহ্ন। একটি বৃদ্ধের কাতরানি শুনে সে একটি কুঠরীর মধ্যে গিয়ে একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধকে আবিষ্কার করলো। বৃদ্ধটি তাঁর মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে প্রফুল্লকে দেখতে পেয়ে খুবই আশ্বস্ত হলেন ॥

শব্দ সংখ্যা ঃ ৫৩

১৫. বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবীরাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ শোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারিবার এ কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এ দিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারিদিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, 'ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।' হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুইজন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর এক রকম। তিনি বরাবর রংপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টর শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন, আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কি পুরস্কার দিবেন বলুন।'

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১৩৯

মূল-কাঠামো ঃ বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসন্ন—দেবীর ঋণশোধের সামর্থ্য সত্ত্বেও হরবল্লভ নিশ্চেষ্ট—ব্রজেশ্বরের পীড়াপীড়ি—হরবল্লভের পাচক, চাকর ও লাঠিয়ালসহ টাকার সন্ধানে যাত্রা—দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে দেবার জন্যে রংপুরের কালেক্টরের কাছে সিপাহী দিতে অনুরোধ ও পুরস্কার প্রার্থনা।

শীর্ষনাম ঃ হরবল্লভের ঋণশোধ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসন্ন। দেবীর ঋণশোধে হরবল্লভের এখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ও-ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট দেখে ব্রজেশ্বর পিতাকে দেবীর ঋণশোধের জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। হরবল্লভ পাচক, চাকর ও লেঠেলসহ টাকার সন্ধানে যাত্রা করে রংপুরের কালেক্টরের কাছে উপস্থিত হলেন। দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে দেবার জন্যে তিনি সিপাই দিতে কালেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করলেন। সেজন্যে তিনি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও প্রার্থনা করলেন সাহেবের কাছে।

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৫৮

১৬. জীবন-সংগ্রামে একদিকে কর্ম—যাহার ক্ষিপ্র আবর্তে আমরা বিঘূর্ণিত, আর একদিকে সব ধীর স্থির; সবাই যেন নিবৃত্তি-উন্মুখ, চারিদিকে শান্তিময়—কোনরূপ শব্দ

বা কোলাহল নাই, কেবল জীবজন্তু বৃক্ষপুষ্প-পর্বতরাজি-সমন্বিত প্রকৃতির শান্তিময় ছবি। এই দুইটির কোনটিই সম্পূর্ণ চিত্র নয়। যেমন গভীর সমুদ্রের মৎস্য উপরে আসিবামাত্র খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়—কারণ জলের প্রবল চাপেই উহা জীবিত থাকিতে সমর্থ, তেমনি শান্তিপূর্ণ স্থানে বাস করিতে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি সংসারের এই মহাবর্তের সংস্পর্শে আসিবামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার যে-ব্যক্তি কেবল সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের কোলাহলেই অভ্যস্ত, সে কি কোন নিভৃত স্থানে স্বস্তিতে বাস করিতে পারে? যন্ত্রণায় হয়তো তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে। আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নির্জনতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১০৬

মূল-কাঠামো ঃ জীবন-সংগ্রামের একদিকে কর্ম, অন্যদিকে নৈঃশব্দ্য—দুইই অসম্পূর্ণ চিত্র। নৈঃশব্দ্যে অভ্যস্ত মানুষের কর্ম-চাঞ্চল্যে এবং কর্মে অভ্যস্ত মানুষের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা—আদর্শ পুরুষ—নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কর্ম এবং কর্মের মধ্যে নৈঃশব্দ্যের অনুভব।

শীর্ষনাম ঃ আদর্শ পুরুষ

জীবন-সংগ্রামের একদিকে প্রবল কর্মচাঞ্চল্য, অন্যদিকে নিবিড় নৈঃশব্দ্য। দুইই অসম্পূর্ণ চিত্র। নৈঃশব্দ্যে অভ্যস্ত মানুষ প্রচণ্ড কর্ম-কোলাহলের মধ্যে কিংবা কর্ম-কোলাহলে অভ্যস্ত মানুষ নিবিড় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সামূহিক সম্ভাবনা। কিন্তু যিনি নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কর্মে অভ্যস্ত এবং কর্ম-কোলাহলের মধ্যে নৈঃশব্দ্যের অনুভবে সক্ষম, আদর্শ পুরুষ তিনিই ॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৪৪

১৭. দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ-প্রমোদের পর ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়া-বিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চকচকে সাদা বালি-মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথ-রাত্রে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরী-রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এইসব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্না-লোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১২৩

মূল-কাঠামো ঃ লেখক দরজার বাহিরে—নিঃশব্দ অরণ্যে নিস্তব্ধ অনির্বচনীয় জ্যোৎস্নারাত্রি—লেখকের অদৃষ্টপূর্ব—অপার্থিব সৌন্দর্য—এক অজানা পরীরাজ্যে যেন লেখকের অনধিকার প্রবেশ।

শীর্ষনাম ঃ অপার্থিব জ্যোৎস্নারাত্রি

লেখক দরজার বাহিরে এসে সেই নিঃশব্দ অরণ্যে নিস্তব্ধ জনহীন অনির্বচনীয় জ্যোৎস্নারাত্রি দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। সেরূপ ছায়াহীন জ্যোৎস্নারাত্রি লেখকের অদৃষ্টপূর্ব। অরণ্যের বনঝাউ ও কাশবন ছায়াবিরল, অন্যদিকে চকচকে সাদা বালি ও শুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না সৃষ্টি করেছিল এক

অপার্থিব সৌন্দর্য। লেখকের মনে হলো, সেই অজানা অপার্থিব পরীরাজ্যে তাঁর অনধিকার প্রবেশ উচিত হয়নি।

শব্দ-সংখ্যা: ৫০

১৮. একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই, এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিব না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ-রুদ্রমূর্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড—ক্যাল্‌সিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে,—জানা-অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি-কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ইথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া প্রতি তৃণপত্রের শিরা-উপশিরা সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝলসাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা। চাহিয়া দেখিলাম, দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের।

মূলের শব্দ-সংখ্যা: ১৬

মূল-কাঠামো: এক অদৃষ্টপূর্ব নিদাঘ দ্বিপ্রহর—বাংলাদেশের নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের এ রুদ্রমূর্তির অভাব—সূর্য একটি কোটি-কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত বিরাট অগ্নিকুণ্ড—নানা জ্বলন্ত ধাতু ও গ্যাসের আগুনের ঢেউ—এখানকার অরণ্যের রস-শোষণ, দিক্-দিগন্তে তাপ-তরঙ্গের দহনের তাণ্ডব-লীলা—পাখির দল দেশছাড়া। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের কী ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য!

শীর্ষনাম: ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য

এক অদৃষ্টপূর্ব নিদাঘ দ্বিপ্রহর! বাংলাদেশের নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের এ ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি নেই। সূর্য একটি কোটি-কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। তাতে লোহা নিকেল কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতু এবং ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস প্রচণ্ড তেজে দগ্ধীভূত হচ্ছে। তার আগুনের উত্তাল তাপ-তরঙ্গ এখানকার অরণ্যের তৃণপত্রের রসশোষণ করে দিক্-দিগন্তে দহনের তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করে চলেছে। তার পরপারে তাপজনিত অস্পষ্ট কুয়াশা। পাখির দলও আজ দেশছাড়া। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের কী ভয়ঙ্কর তুলনারহিত সৌন্দর্য!

শব্দ-সংখ্যা: ৬১

১৯. লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্যসাগর। দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে এই দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটালো বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের

মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেন নি, লেসেপ্স তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্য ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটাতে গোটা-কয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হতে হতে শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি লেসেপ্স একজন বিশ্বকর্মা; তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে।

মূলের শব্দ-সংখ্যা: ১৭৭

মূল-কাঠামো: এশিয়া-আফ্রিকার মধ্যে ছিল সুয়েজ যোজক—এখন সেখানে সুয়েজ কেনাল। এশিয়া-আফ্রিকার বিচ্ছেদ; কিন্তু লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের মিলন—ভারত ও ইউরোপের মিলন—বহু সহস্র মাইলের দূরত্ব হ্রাসের প্রয়াস—লোহিত ও ভূমধ্যের মধ্যবর্তী ভূভাগের হ্রদগুলির মধ্যে সংযোগ—লেসেপ্স—বিশ্বকর্মা।

শীর্ষনাম: মিলনের বিশ্বকর্মা লেসেপ্স

এশিয়া-আফ্রিকার মধ্যে পূর্বে ছিল সংযোগের সুয়েজ যোজক। এখন সেখানে সুয়েজ খাল। লেসেপ্সের সুয়েজ খাল এশিয়া-আফ্রিকার মধ্যে বিচ্ছেদ আনলো; কিন্তু মিলন ঘটালো লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে, মিলন ঘটালো ভারত ও ইউরোপের মধ্যে। মিশরের রাজারা বহুকাল থেকে লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে জল পথে বহু সহস্র মাইলের দূরত্ব হ্রাসের উপায় খুঁজছিলেন। লোহিত ও ভূমধ্যের মধ্যবর্তী ভূভাগের হ্রদগুলির মধ্যে সংযোগেই তা সম্ভব হলো। লেসেপ্সই তার রূপকার। সেদিক থেকে লেসেপ্স দূরকে নিকট করার বিশ্বকর্মা॥

শব্দ-সংখ্যা: ৬৭

২০. প্রচণ্ড শীতে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায় দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহ রক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে, হয় উপনিষৎ লিখতে, নয় মোহমুদ্গর লিখতে, ইউরোপের লোক কোনদিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহমনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে-বাহিরে কেবলি দ্বন্দ্ব, কেবলি ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ-সমরে, তাদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজেদের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরণার জল এত হিমেল যে স্টোভে গরম না করলে ব্যবহারে লাগে না।

মূলের শব্দ-সংখ্যা ঃ ১২৫

মূল-কাঠামো ঃ শীতপ্রধান দেশে দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তোড়জোড় চাই—নচেৎ মৃত্যু—ইউরোপীয়রা ভারতীয়দের মতো তাই দেহকে 'মায়াময়' বলতে অক্ষম—দেহমনে তাপ-সঞ্চারের জন্যে তারা নিয়ত ব্যাপৃত—শীতল শান্তির অবকাশ দুর্লভ—তাদের দ্বন্দ্বময় জীবনে মনন-মানসিকতাও তাই দ্বন্দ্বময়—প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কও শত্রুতার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শস্যজল তাই তাদের প্রকৃতির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়।

শীর্ষনাম ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জাতীয় চরিত্র

শীতপ্রধান দেশে দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রচুর তোড়জোড় চাই; নচেৎ মৃত্যু অবধারিত। ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দের মতো তাই দেহকে 'মায়াময়' বলতে অক্ষম। কারণ দেহমনে তাপ-সঞ্চারের জন্যে তারা নিয়ত ব্যাপৃত। তাদের জীবনে তাই শীতল শান্তির অবকাশ দুর্লভ। তাদের দ্বন্দ্বময় জীবনের মনন-মানসিকতাও তাই দ্বন্দ্বময়। প্রকৃতির সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক শত্রুতার। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শস্যজল তাই তাদের প্রকৃতির কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে হয়॥

শব্দ-সংখ্যা ঃ ৫৭

অনুসরণী

১. সার-সংক্ষেপ লিখ ঃ

ক. স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতি কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এইজন্য সভ্যরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা-কাঠির মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায়। কিন্তু সে তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত-সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খ.

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাহি গ্রাসি,

পৌরুষেরে করেনি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

গ. একদা এ ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময় ; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'
আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা-আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে নাহি অন্য পথ।

ঘ. কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সব আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে—তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

ঙ. কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়ান্ধকার কুটির মধ্যে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। এইরূপ চারিদিক

চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, কাহাকে যেন সংকেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আর একটা আসিল, তারপর আরও একটা আসিল। কত আসিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়ান্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তিসকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

চ. রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন-প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম; বিজ্ঞের নিকট বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারিনা, কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদন-প্রবণতা মনুষ্য-চরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ।

ছ. নিজের জন্য যে কাজ করিবে, তাহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কার্য যদি সৎ হয়, তোমাকে উহার শুভ ফল ভোগ করিতে হইবে, অসৎ হইলে উহার অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, তাহা যদি তোমার নিজের জন্য কৃত না হয়, তাহা হইলে উহা তোমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আমাদের শাস্ত্রে এই ভাবব্যঞ্জক একটি বাক্য পাওয়া যায়ঃ 'যদি কাহারও জ্ঞান থাকে যে, আমি ইহা নিজের জন্য করিতেছি না, তবে তিনি সমগ্র জগৎকে হত্যা করিয়াও বা নিজে হত হইয়াও হত্যা করেন না, বা হত হন না।' এইজন্যই কর্মযোগ আমাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়, 'সংসার ত্যাগ করিও না; সংসারে বাস কর, সংসারের ভাব যত ইচ্ছা গ্রহণ কর; কিন্তু নিজের সুখভোগের জন্য কাজ একেবারেই করিও না।' 'ভোগ যেন লক্ষ্য না হয়। প্রথমে নিজের ক্ষুদ্র 'আমি'কে মারিয়া ফেল, তারপর সমুদয় জগৎকে আপনার করিয়া দেখ, যেমন প্রাচীন খ্রীস্টানেরা বলিতেন, 'পুরাতন মানুষটি মারিয়া ফেলিতে হইবে।'

২. সার কথাটি সংক্ষেপে লিখ :

ক. কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটিরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণ যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, 'রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিব।' অযোধ্যার সন্নিকটবর্তী হইয়া ভরত বলিলেন, 'অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।' নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন? তাঁহারা সকলে কাষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কাষায়বস্ত্র-পরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন।

খ. হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মান রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইতে তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার সরদারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে।

গ. তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধূলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে—

তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাওনা কি
নেমেছে ধূলার তলে হীনপতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান ॥

ঘ. ত্যাখ্‌ মানুষের কষ্ট থাকে না হয় যদি লোক খাঁটি,
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি!
মাটিরই যদি না এ-হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই?
এ সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।
বিশ্ব-পিতার মহা-কারবার এই দিন্‌-দুনিয়াটা,
মানুষই তাঁহার মহা মূলধন, কর্ম তাহার খাটা;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন অন্ন তো তার মুখে—
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুখে।
তবে সে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

ঙ. সব্‌জি-বাজারে আসিয়া দেখি যে—পড়িয়া হাটের ফাঁদে
ফলে-ফুলে-পাতে শীতের প্রভাতে মাঠের শিশির কাঁদে।
মোটা-বাঁধা-বাঁধা লোটে লাউডগা, মোলাম্‌ পালম্‌ আঁটি,
মূর্ছিত চিতে চাহে কি স্মরিতে মাঠের কোমল মাটি!
সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্তা কি স্মরিছে রে বার্তাকু?
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে ফলে ফালা দিল চাকু!
মাটির বক্ষ খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা কত মূল, কত কন্দ,—
ধুয়ে মুছে ডালি ভরেছে রে, তবু রয়েছে মাটির গন্ধ।
টাট্‌কা ফলের মট্‌কিয়ে বোঁটা দেখে লয় নির্যাস,—
গন্ধে তাহার ভেসে ভেসে আসে মাঠের দীর্ঘশ্বাস।
হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি বিবাগিনী হল ভাই?
কচি-বয়সেই ছাঁচি কুমড়াকে দুহাতে মাখাল ছাই।

চ. প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি মূল্যবান দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর—প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে। অন্য কোন দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।

কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর,

সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।

ছ. নারীত্বের কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শ এদেশের নারীর সামনে তেমন ধরা হয়নি যেমন আমাদের সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এ দেশের নারী এক একটি আদর্শ, কোনো দুজন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তি হিসাবে নয়, type হিসাবেও এক নয়। সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারী জাতিকে আমরা সীতা-সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেকখানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত লেখা হলো না, অথচ হেলেন ও পেনেলোপীর পরবর্তিনীদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত কাব্যই লেখা হয়ে গেলো, কত ছবিই আঁকা হয়ে গেলো। ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্যা বা পশুচর্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর রূপসজ্জা রূপকথার Cinderella-র মতো।

৩. মূল রচনার অর্ধেক পরিসরের মধ্যে মমার্থ বুঝাইয়া দাও :

ক. আমার গুরুদেব বলিতেন, 'নিজ সন্তানদের উপর দাসী ও ধাত্রীর ভাব অবলম্বন কর।' দাসী তোমার শিশুকে লইয়া আদর করিবে, তাহার সহিত খেলা করিবে, অতি যত্নের সহিত লালন করিবে, যেন তাহার নিজের সন্তান; কিন্তু দাসীকে বিদায় দিবামাত্র সে গাঁটরি বাঁধিয়া তোমার বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত। এত যে ভালবাসা ও আসক্তি, সবই সে ভুলিয়া যায়। সাধারণ দাসীর পক্ষে তোমার সন্তানদের ছাড়িয়া অপরের ছেলের ভার লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। তুমিও যাহা কিছু তোমার নিজের মনে কর, সে-সবের প্রতি এইরূপ ভাব পোষণ কর। তুমি যেন দাসী, আর যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হও, তবে বিশ্বাস কর, যাহা কিছু তোমার মনে কর, সবই তাঁহার।

খ. রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে সব জায়গায় চৈত্রে শাল-মঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমুল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথাকও প্রভৃতি গায়ক পাখীরা থাকে না, এ সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্নছাড়া রূপ, বোধ হয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-একদিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘনছায়াভরা অপরাহ্ণ। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া। দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে

এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

গ. অচিন-শূন্যে-ওড়া পাখি চেনে আপন নীড়,
জানে বিজন-মধ্যে কোথায় আপন-জনের ভিড়।
অসীম আকাশ মিলেছে ওর বাসার সীমানাতে—
ওই অজানা জড়িয়ে আছে জানাশোনার সাথে।
তেমনি ওরা ঘরের পথিক, ঘরের দিকে চলে
যেথায় ওদের তুল্‌সিতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে।
দাঁড়ের শব্দ ক্ষীণ হয়ে যায় ধীরে,
মিলায় সুদূর নীরে।
সেদিন দিনের অবসানে সজল মেঘের ছায়ে
আমার চলার ঠিকানা নেই, চলল ওরা গাঁয়ে।

ঘ. অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে
আলোর নৌকো ভাসিয়ে দিল আকাশ-পানে চেয়ে।
মা যে তাহার স্বর্গে গেছে, এই কথা সে জানে—
ওই প্রদীপের খেয়া বেয়ে আসবে ঘরের পানে।
পৃথিবীতে অসংখ্য লোক, অগণ্য তার পথ,
অজানা দেশ কত আছে, অচেনা পর্বত—
তারি মধ্যে স্বর্গ থেকে ছোট্ট ঘরের কোণ
যায় কি দেখা যেথায় থাকে দুটিতে ভাই বোন?
মা কি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে,
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে?
মেয়ের হাতের একটি আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে—
সেই আলো মা নেবে চিনে অসীম দূরের থেকে।
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটির 'পরে॥

ঙ. শহর যেমন সব দেশেই প্রায় একই রকম গ্রামও দেখলাম সব দেশেই প্রায় এক রকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট-পাথরের দেয়ালের ওপর খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে, ছাদের উপর ঘাস গজিয়েছে—এরি নাম কটেজ। তবে নতুনের সঙ্গে সন্ধি না করে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ, কিন্তু কাঁচের সার্শী। সেকেলে গড়ন, কিন্তু একেলে সরঞ্জাম; মুদির দোকানে ডাকঘর বসেছে, তামাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেলস্টেশনের ভিতরে সস্ত্রীক স্টেশন মাস্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাবলিক লাইব্রেরী আছে। স্কুলের চেয়েও এ দুটো জিনিস উপকারী। স্কুলের সংখ্যা কমে এ দুটোর সংখ্যা বাড়লে ছেলেগুলি বাঁচে।

---

১. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে সদানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন ; সে নহে আমার ;
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

সাংসারিক বন্ধনের মধ্যেই আছে মুক্তির সুনিশ্চিত ঠিকানা। এই বন্ধনময় সংসারকে ত্যাগ করে অরণ্য-কান্তারে বৈরাগ্য সাধনায় মুক্তি নেই। সংসারের স্নেহ-প্রেম-দয়া-ক্ষমার নানা বন্ধনের মধ্যেই আছে প্রকৃত মুক্তির সন্ধান। বিশ্ব-সংসারই ঈশ্বরের বাসমন্দির। এই পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের মধ্যে তাঁরই তো প্রকাশ। কাজেই, এই সংসারের বন্ধনের মধ্যেই সাংসারিক সমস্ত অনুভূতির মধ্যেই লাভ করা যায় মানুষের প্রার্থিত মুক্তি॥

২. মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তারপরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

সুন্দর এই ধরাতল। সুন্দর এই ধরার মানুষ। তাই এই রূপরসগন্ধময় পৃথিবী সৌন্দর্য-প্রেমিক কবির অতি প্রিয় স্থান। এখানে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার মধ্যে তিনি কামনা করেন এক শিল্পীর জীবন। এই পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনের সংগীত রচনা করে তিনি উপহার দিয়ে যাবেন সৌন্দর্য-রসিক মানুষদের। প্রয়োজনমতো পৃথিবীর মানুষ সেই সংগীতের রস গ্রহণ করবে। প্রয়োজন নিঃশেষিত হলে তারা সেগুলি বিস্মৃত হলেও কবির কোনও ক্ষোভ নেই॥

৩. আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অক্ষয় শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

আঘাত-সংঘাতের মধ্যেই মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকৃত প্রকাশ। বিলাসিতাময় জীবন ত্যাগ করে এই কর্মময় পৃথিবীতে কঠিন কর্তব্য-উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব। তাতে আঘাত আসে আসুক, ব্যাঘাত আসে আসুক; বুক পেতে সেই সব দুঃখ এবং আঘাত গ্রহণ করে জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হবে। জীবনের সংগ্রামের আছে সাফল্য, আছে ব্যর্থতা। তাতে কী যায় আসে। বিলাস-জীবনের চেয়ে কর্মময় জীবনই মানুষের কাছে পরম গৌরবের॥

৪. হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে-মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'—
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।'

পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

বঙ্গভাষা বিবিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। তার সম্ভাবনাও সুবিপুল। যারা তার সন্ধান পায় না, তারা কেবল বিদেশী ভাষার পেছনে মোহগ্রস্তের মতো ছুটে মরে। তাতে দুঃখ পায়, পায় দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা। কিন্তু একদিন তাদের সেই ভ্রান্তির অবসান ঘটে। বিদেশী ভাষার অসচ্ছলতা ও মাতৃভাষার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য সেদিন তাদের কাছে ধরা পড়ে। তখনই তারা পরভাষা-চর্চা থেকে বিরত হয়ে মাতৃভাষা-চর্চায় করে আত্মনিয়োগ। এবং তখনই তারা মাতৃভাষার ঐশ্বর্য আবিষ্কার করে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়॥

৫. তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

প্রত্যেক মানুষের সংস্কারহীন বিবেক-বুদ্ধিতেই ন্যায়-বিচারের অধিষ্ঠান। বিবেকস্থিত সেই ন্যায়শক্তিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ন্যায়ের অম্লান গৌরব অটুট রাখা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। ক্ষমা যেখানে দুর্বলতার প্রকাশরূপে উপস্থিত, সেখানে ন্যায়ধর্মের নির্দেশে কঠোরতা অবলম্বনও সমর্থনযোগ্য। কারণ অন্যায়কারী এবং অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়েই সমান অপরাধী॥

৬. পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়োনা ধরে।
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়োনা ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে,
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি।

গৃহমুখী বাঙালী জাতি নানা সামাজিক বিধি-নিষেধের চাপে আজ বিশ্ববিমুখ। কিন্তু সেই বিধি-নিষেধের অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে প্রাণের পরিপূর্ণ মুক্তি নেই, নেই চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। সেই বিধি-বন্ধনময় জীবনের বাইরে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম জীবন, মহত্তম জীবনের স্বাদ। স্বদেশের গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে দুঃখ-বেদনাকীর্ণ বৃহত্তর জীবনের উত্থান-পতনময় পথে উত্তরণের মধ্যেই মানব-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ॥

৭. এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরম-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে,
উদার আলোকমাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

দাসত্বের বন্ধনের মধ্যে নেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। লোকভয়, রাজভয় ও মৃত্যুভয়ের মতো অজস্র ভয় মানুষের জীবনকে গ্রাস করে রাখে। আত্ম-অবমাননার চরম লাঞ্ছনার মধ্যে মানুষকে যাপন করতে হয় অতি ঘৃণ্য, ধিক্কারময় জীবন। তাতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা হয় ধূল্যবলুণ্ঠিত। সেই জীবন থেকে মুক্তি অবশ্যই কাম্য। তবেই সেই উদার মুক্তির মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব॥

৮ একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে বিশ্বে, "শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা-আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা। রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে নাহি অন্য পথ।

প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠে একদিন প্রথম বিঘোষিত হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ী পরম অমৃতবার্তা। সৃষ্টির মর্মমূলে রয়েছে যে এক জ্যোতির্ময়, আনন্দঘন প্রাণসত্তা, তার উপলব্ধিতে ভারতবর্ষ সেদিন জয় করেছিল সকল মৃত্যুভয়। আজ ভারতবর্ষ তার সেই ধ্যানলব্ধ উপলব্ধি হারিয়ে অধঃপতিত। আজ একমাত্র সেই আনন্দময় উপলব্ধিই ভারতবর্ষকে পুনর্জাগরিত করতে পারে। তাছাড়া, অন্য পথ নেই।

৯. তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে ;
'জয় বিশ্বেশ্বর' বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে, পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্বতীর্থসার
তাই, মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।

জননী ও জন্মভূমি সকল তীর্থের সার। মানুষ জীবনে অনেক দেশ পরিভ্রমণ করে, দর্শন করে কত পুণ্য তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু তার অতৃপ্ত হৃদয়ে সে কোথাও তৃপ্তি খুঁজে পায় না। মানুষের অতৃপ্ত হৃদয়ের যে ক্ষুধা, তার অতৃপ্ত আত্মার যে অভাববোধ, তার পরিতৃপ্তি কোন তীর্থক্ষেত্রে নেই, কোন দেববিগ্রহদর্শনে নেই। সেই ক্ষুধার তৃপ্তি আছে জননীর স্নেহে, জন্মভূমির রূপপ্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যে।

১০. রাজছত্র ভেঙে পড়ে ; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে ;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।

গুরু গুরু গর্জন—গুন্ গুন্ স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে॥

কাল-প্রবাহ অনাদি, অনন্ত। অনন্তকাল ধরে বিশ্বের মেহনতী মানুষেরা তাদের নানা কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজের সেবা করে আসছে। তাদের কথা ইতিহাসে লেখা থাকে না। কিন্তু যারা সাম্রাজ্যলোভী, যারা মানুষের সৃষ্টিকে ভেঙে চুরমার করে, শুধু তাদেরই কথা ইতিহাসে স্থান পায়। অথচ যাদের নানামুখী কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব কর্মমুখর, কোনরূপ বিনিময়ের প্রত্যাশা যারা করে না, সেই নামহীন পরিচয়হীন বিশাল জনতা যুগ যুগ ধরে তাদের অকুণ্ঠ শ্রম দান করে সমাজের সেবা করে এসেছে, এবং অনাদ্যন্ত ছন্দে তারা ওভাবেই কাজ করে যাবে॥

১১. বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপূর্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন ঃ তিনি বাঙ্গালায় সাময়িক পত্র প্রচার করেন, বাঙ্গালায় বেদান্ত শাস্ত্র প্রকাশ করেন; দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার জন্য দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী, তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই।

স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমে উদভ্রান্ত বাঙ্গালীর চেতনাকে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিকে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর আগে মহাত্মা রামমোহন দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গালী জাতিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিকে পথনির্দেশ করেছেন॥

১২. আমি কেবল চিরকাল গর্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহবন্ধনে তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্য-জাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ, কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

স্বার্থ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের মধ্যে সুখ নেই। বিশ্বের কল্যাণ-সাধনেই একমাত্র সুখ। আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি বিশ্ববিমুখ হয়ে নিজের নিঃসঙ্গ একাকীত্বে নির্বাসিত হয়। তার ভাগ্যে সুখ জোটে না। সেই

জীবনাচরণ ঘৃণ্য ও মূল্যহীন। মানুষ পরিবার-পরিজনকে ভালোবেসে বিশ্বজগৎকে ভালোবাসতে শেখে। কিন্তু প্রিয় পরিজনের মাধ্যমে সে যদি সমগ্র মানব-জাতিকে ভালোবাসতে না শেখে, তবে তার সংসার-জীবন বৃথা॥

১৩. তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফোটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু—যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নশীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজীতে নশীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়িতে নাচ, গান, যাত্রাপর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়; কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নশীবাবু বাগানে যান তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিঁপিড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না।

যেখানে প্রাচুর্য আছে, স্বার্থ-সিদ্ধির পর্যাপ্ত সুযোগ আছে, জগতের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা সেখানেই গিয়ে দলে দলে ভিড় করে এবং সর্বপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নানারকম হীন স্তাবকতায় মেতে ওঠে। তারা সুখের সাথী, দুঃখের দিনের কেউ নয়। তাই যখন আশ্রয়দাতার ভাগ্যবিপর্যয় ঘনিয়ে আসে, স্বার্থসিদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন সেই স্বার্থপর, পদলেহী অকৃতজ্ঞের দল নির্লজ্জের মতো আশ্রয়দাতাকে একে একে পরিত্যাগ করে চলে যায়॥

১৪. দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসন-সমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ বা ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেননা, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেইজন্য কেহ কখনও তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় পাইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

যিনি শাসনকর্ত্রী, তাঁর প্রতি প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে সেই শাসনকর্ত্রীকে প্রজাবৎসল এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি হতে হবে দয়াপ্রবণ। দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচনের জন্যে তাদের অবস্থা বিচার করে তিনি মুক্তহস্তে তাদের মধ্যে ধন বিতরণ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁকে হতে হবে নিরহঙ্কার এবং শুদ্ধচিত্ত। উপবাস পালনের মধ্য দিয়ে এই চিত্তশুদ্ধি সম্ভব॥

১৫. প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর পরিচয়ও আছে। গৃহধর্মে বিদ্যাপ্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা-প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা-প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা-প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

সংসারই যথার্থ সন্ন্যাস-আশ্রম। নিজের সুখের জন্য কাজ না করে পরের সুখের জন্যে কাজ করার নামই নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সার্থক এবং সংসার সুখের হয়। গার্হস্থ্যধর্মেও বিদ্যার্জনের প্রয়োজন। কিন্তু গার্হস্থ্য-আশ্রম বিদ্যা-প্রকাশের স্থান নয়। নিষ্কাম কর্ম উদ্‌যাপনের জন্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রয়োজন এবং সেই নিষ্কাম কর্ম উদ্‌যাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্রই হলো গার্হস্থ্য-আশ্রম॥

১৬. লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য-প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—শহরকে এক রকম ভুলিয়া গিয়াছে। নির্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, কবে পিচঢালা বাঁধা-ধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে—পেয়ালার মতো উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরী রাজপথ নাই, ইটের ঘরবাড়ী নাই, মোটর হর্নের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীল-গাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি, আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না।

বন্যপ্রকৃতির অপরূপ রূপসৌন্দর্য মানুষের চোখে এক আশ্চর্য মায়া-কাজল পরিয়ে তাকে একদিকে যেমন তার রূপমুগ্ধ প্রকৃতি-প্রেমিকে পরিণত করে, অন্যদিকে তাকে তেমনই শহরবিমুখ করে তোলে। তখনই ইট-কাঠ-পাথরের শহর তাকে আর আকর্ষণ করেনা, অরণ্যের প্রাকৃতিক রূপবিস্তার তাকে প্রতি মুহূর্তে হাতছানি দিয়ে ডাকে। অরণ্যের সেই অপরূপ রূপ-সৌন্দর্যকে ধ্বংস করতে কোন প্রকৃতি-প্রেমিকের প্রাণই চায় না॥

১৭. চট্ চট্ শব্দ করিয়া বন পুড়িতেছে, দূর হইতে শুনি—কত শোভাময় লতা-বিতান ধ্বংস হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া ভাবি। কেমন একটা কষ্ট হয় বলিয়া ওদিকে যাইনা। দেশের এত বড় সম্পদ মানুষের মনে যাহা চিরদিন শান্তি ও আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিত—একমুঠি গমের বিনিময়ে তাহা বিসর্জন দিতে হইল।

কার্তিক মাসের প্রথমে একদিন জায়গাটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত মাঠটাতে সরিষা বপন করা হইয়াছে—মাঝে মাঝে লোকজনেরা ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ইহার মধ্যেই গরু-মহিষ, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া গ্রাম বসাইয়া ফেলিয়াছে।

শীতকালের মাঝামাঝি যখন সর্ষেক্ষেত হলুদ ফুলে আলো করিয়াছে তখন যে দৃশ্য চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তর দূর দিগ্বলয়সীমা পর্যন্ত হলুদ রঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই,—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীলমণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী। যতদূর দৃষ্টি যায়। ভাবিলাম, এও এক রকম মন্দ নয়।

মানুষের প্রয়োজনে অরণ্যের শ্যামল সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে ফসল ফলাবার জন্তে তার জায়গায় কৃত্রিম জনবসতি স্থাপন করতে যে-কোন প্রকৃতি-প্রেমিকের হৃদয় বেদনা বোধ করে। কিন্তু অরণ্যকে বিদায় করে সেখানে শস্যক্ষেত্র রচিত হলে সেখানে ফুলে ও ফসলে তার যে রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সে-রূপেরও কোন তুলনা নেই। নীলাকাশের নীচে শস্যক্ষেত্রের সেই অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতি-প্রেমিকের মন ভোলায়॥

১৯. ইউরোপের আপনার জিনিস তার ফিলজফী, তার বিজ্ঞান। পরের কাছে ধারকরা থিওলজীকে সে এখনো আপনার করতে পারল না, দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। আবার যদি ধার করতে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধপ্রতিষ্ঠা করবে, ভূমিকম্পে হয়তো ভিত্তি টলবে না, সৌধ ধসে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব, শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব, মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ অর্জন করে উড়িয়ে দেয়; আমরা অমনি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো করে নেবে, খ্রীষ্টিয়ানিটির আত্মাটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চে ঝুলিয়ে রাখল এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল করে তুলল, আমাদের বেদান্ত বা বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই করবে, এবং নিজের বিজ্ঞান-দর্শনের দ্বারা ডিষ্টিল করে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ করবে না।

ইউরোপের সাধনা দ্বন্দ্বভাবের, শত্রুভাবের সাধনা; আর ভারতের সাধনা সন্ধিভাবের, মিত্রভাবের সাধনা। ইউরোপ যদি বাইরের থেকে কোন জিনিস ধার করে, তবে তা সে তার দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তবে গ্রহণ করবে। সে খ্রীষ্টধর্মের সারটুকু বাদ দিয়ে বাইরের কাঠামোকে গ্রহণ

করেছে। সেইজন্যে খ্রীষ্টান হয়েও যুদ্ধপ্রিয় হতে ইউরোপের বাধা নেই। সে যদি ভারতের বেদান্ত বা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে তার বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে যেটুকু খাপ খায়, সেটুকুই গ্রহণ করে অবশিষ্ট সার-অংশটুকু বর্জন করবে॥

১৯. এক হাজার বছর আগেও আমাদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা যে-ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না পেরে সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব করে দরিদ্রের দরিদ্রতার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগতে হয় এবং কোনদিন সে ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই-যে সাধনা, এই ভারসাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে জগতে প্রতিদিন বড় বড় গ্রহনক্ষত্র ভাঙছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড় বড় নৌকাডুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোট ছোট অণু-পরমাণু থেকে নব নব গ্রহনক্ষত্র গড়ে উঠছে, ছোট ছোট প্রবালকীট মিলে অপূর্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুলছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবেনা। সে তার কাঁথা-কম্বল ছাল-বল্কল আঁকড়ে ধরে বিরাগী হয়ে গেছে।

ভারতের বৈরাগী যারা, তারা সর্বতোভাবে সংসারত্যাগী। তারা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ধনবৈষম্য হ্রাস করার দুঃখের সাধনা করেনি। অথচ প্রকৃতির সাধনা হলো ভারসাম্য রক্ষার সাধনা। সে সাধনায় ভারতে কোনদিন কোন সন্ন্যাসী যোগ দেয়নি। প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতির রাজ্যে যে ভাঙাগড়া চলেছে, তাতেও কোনদিন কোন সন্ন্যাসীর যোগ নেই। সে শুধু তার বৈরাগ্যকে এবং বৈরাগ্যের অভিমানকে আঁকড়ে ধ র সমাজ-সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে॥

২০. সভ্যতা কাহাকে বলে? ভিতরের দেবত্বকে অনুভব করাই সভ্যতা। যখনই সময় পাইবে, তখনই এই ভাবগুলি মনে মনে আবৃত্তি কর এবং আকাঙ্ক্ষা কর। এরূপ করিলেই সব হইবে। যাহা কিছু ঈশ্বর নয়, তাহা অস্বীকার কর। যাহা কিছু ঈশ্বর-ভাবান্বিত, তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা কর। দিনরাত মনে মনে এ-কথা বলো। এভাবে ধীরে ধীরে অজ্ঞানের আবরণ পাতলা হইয়া যাইবে।

আমি মনুষ্য নই, দেবতা নই; আমি স্ত্রী বা পুরুষ নই; আমার কোন সীমা নাই। আমি চিৎস্বরূপ—আমি সেই ব্রহ্ম। আমার ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আমার দুঃখ বা সুখ নাই। জন্ম বা মরণ আমার কখনও হয় নাই, কারণ আমি যে জ্ঞানস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ। হে আমার আত্মা; আমি সেই, 'সোঽহং'।

নিজেকে দেহভাবশূন্য অনুভব কর। কোন কালে তোমার দেহ ছিল না। ইহা আগাগোড়া কুসংস্কার। দরিদ্র, আর্ত, পদদলিত, অত্যাচারিত, রোগপীড়িত—সকলের মধ্যে দিব্য-চেতনা জাগাইয়া তোল।

মানুষের অন্তরের দেবত্ব অনুভব করাই সভ্যতা। ঈশ্বর-ভাবকে স্বীকার করলে এবং দেহভাবকে অস্বীকার করে আত্মার ব্রহ্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারলে অন্তরের দেবভাব বিকশিত হয়ে উঠবে। দেহ একটি বাইরের সংস্কার মাত্র। সেই সংস্কার বিস্মৃত হয়ে আত্মার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং তা আর্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করাই সভ্যতার মৌল উদ্দেশ্য॥

॥ **অনুসরণী** ॥

১. সারমর্ম লিখ :

ক. দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন, জীর্ণদীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে—'গৃহ মোর নাহি,
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।'
সে কহিল, 'চলিলাম।' চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে?'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

খ. অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী,
হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহপরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

গ. শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,

কভু শালিকের ডাক, কথনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য 'পরে—
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।

ঘ. আমাদিগের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ 'মেও মেও' শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে। ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী; কেন না, তুমি আফিঙ্গখোর; তুমি কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে খাইয়া তাহার যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।

ঙ. এমন নিষ্কাম কর্মের অর্থ কি? আজকাল অনেকে ইহা এই অর্থে বুঝেন যে, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সুখ বা দুঃখ কোনটিই কর্মীর মন স্পর্শ না করে। ইহার প্রকৃত অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে ইতর প্রাণীরাও নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে, বলিতে হইবে। কোন কোন প্রাণী তাহাদের শাবকগুলি খাইয়া ফেলে, এবং ইহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখ হয় না। দস্যুরা অন্যের ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহাদিগের সর্বনাশ করে। এই কাজ করিবার সময়ে যদি সুখ বা দুঃখের কোন অনুভূতি তাহাদের না থাকে, তবে তাহারাও তো নিষ্কাম হইয়া কাজ করে বলিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মের অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে কঠিনহৃদয় দুরাচারও নিষ্কাম কর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

চ. এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণীমক্ষিকার সংখ্যা বাড়ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হলো। প্রাসাদে আর কুটিরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত নয়, একাধারে স্বর্গ-পাতাল। আল্পস পর্বত ও ভূমধ্যসাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু নিচু হলেও তাদের ব্যবধান দুরতিক্রম্য নয়, কিন্তু হিমালয় পর্বত ও ভারতসাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট ও নিচে বিশ হাজার ফিট—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম্য। ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজারা যে চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষী-মজুররা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিখারীদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুব সম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চলে আসছে।

ভাবার্থ লিখ ঃ

ক. বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে, 'না;
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।'

খ. জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য-সংসারের মহানিকেতনে,
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মত।
তবু-তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনক-কিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা
নিরখিনু সুখে-দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমিষেই মনে হল, মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।
রূপহীন জ্ঞানহীন ভীষণ শকতি
ধরেছ আমার কাছে জননী মুরতি।

গ. চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;

সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে!
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

ঘ. সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!
আর কি হে হবে দেখা?—যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজকর সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

ঙ. ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি; এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।

চ. বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে

দিকে তার বাঁধা নিয়মে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তু-বিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে, বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে লিখেছে, শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে, তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তু-বিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্ব-ভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে। আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

ছ. যখনই আমার কর্মের সহিত নিজেদের অভিন্ন করিয়া ফেলি, তখনই আমরা দুঃখ বোধ করি, কিন্তু কর্মের সহিত ঐরূপ এক না হইয়া গেলে সেই দুঃখ অনুভব করি না। কাহারও একখানি সুন্দর ছবি পুড়িয়া গেলে সাধারণতঃ অপর একজনের কোন দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন তাহার নিজের ছবিখানি পুড়িয়া যায়, তখন সে কত দুঃখ বোধ করে! কেন? দুইখানিই সুন্দর ছবি, হয়তো একই মূল ছবির নকল, কিন্তু এক ক্ষেত্র অপেক্ষা অন্য ক্ষেত্রে অতি দারুণ দুঃখ অনুভূত হয়। ইহার কারণ—একক্ষেত্রে মানুষ ছবির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, অপর ক্ষেত্রে তাহা করে নাই। এই 'আমি ও আমার' ভাবই সকল দুঃখের কারণ। অধিকারের ভাব হইতেই আসে স্বার্থ এবং স্বার্থপরতা হইতেই দুঃখের আরম্ভ।

জ. কি সুন্দর রৌদ্র আর কি অদ্ভুত নীল আকাশ সেদিন। এমন নীল কখনও যেন আকাশে দেখি নাই—কেন যে এক-একদিন আকাশ এমন গাঢ় নীল হয়, রৌদ্রের কি অপূর্ব রং, নীল আকাশ যেন মদের নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করে। কচি পত্রপল্লবের গায়ে রৌদ্র পড়িয়া স্বচ্ছ দেখায়—আর নাঢ়া বইহারের ও লবটুলিয়ার যত বন্য পাখীর ঝাঁক বাসা ভাঙিয়া যাওয়াতে কতক সরস্বতী সরোবরের বনে, কতক এখানে ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের কি অবিশ্রান্ত কূজন।

ঘন বন। এমন ঘন নির্জন অরণ্যভূমিতে মনে একটি অপূর্ব শান্তি ও মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার ভাব আনে—কত গাছ, কত ডালপালা, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর ছড়ানো—যেখানে সেখানে বসিয়া থাক, শুইয়া পড়, অলস জীবন-মুহূর্ত প্রস্ফুটিত পিয়াল-বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কাটাইয়া দাও—বিশাল নির্জন আরণ্যভূমি তোমার শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দিবে।

৩. মর্মার্থ লিখ:

ক.
অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদ্রিত নয়নে
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা

আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষু হতে অশ্রুধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ, খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

খ. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পারো না দিতে সে কারে দিয়োনা;
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক! শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ—ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার।

গ. বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

ঘ. আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কমলীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে,
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপ্সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

ঙ. শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগ্বিজয়ে যাই। আমরা যাই কোন দিকে কোন আপনার লোক অচেনার মতো আত্মগোপন করে রয়েছে তাদের মুখোস খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পর হতে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শৃঙ্গী বলে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাবব পৃথিবীশুদ্ধ আমাকে দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশেহারা হই, কোন শহর থেকে কোন গ্রামে পৌঁছাই, কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন বেড়া টপকাই, কোন গাছের তলায় শুয়ে কোন কোকিলের গলা শুনি, কোন চেরির গুচ্ছ চুরি করে কোন প্রিয়জনকে সাজাই, অপরিচিত শিশুর গায়ে চকোলেটের ঢিল ছুঁড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপ-রাইটারের খট্‌খটানি ফেলে মোরগের কু-ক্রু-কু-উ শুনতে যায়?

চ. আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।

---

১. তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে, দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে। এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু, মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ।
নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নদনদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহু পাশে।

নিত্য-কল্যাণময়ী বঙ্গজননী। তাঁর মাঠে মাঠে, আম্রছায়াচ্ছন্ন কুটিরে কুটিরে, দোহনমুখর গোষ্ঠে, বটের ছায়ায়, নদীর ঘাটে ঘাটে, মন্দিরে মন্দিরে শাশ্বত কল্যাণের নিত্য আয়োজন। সদাহাস্যমুখে বঙ্গ-প্রকৃতি চিরকর্মরত। কিন্তু বিশ্বসমাজে তাঁর সন্তানদের নৈষ্কর্ম্য অত্যন্ত বেদনাবহ। ফুলে-পল্লবে, নদীর কলতানে, ছায়া এবং রাত্রির স্নিগ্ধতায় কেবল কর্মহীন নিদ্রার চিরন্তন আয়োজন॥

২. পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

বাংলার আবহমান কালের দুটি গ্রাম। মাঝখানে চির-প্রবহমান নদীর বিস্তার। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিদিন ঘটে কত উত্থান-পতন, কত রাজ্য-ভাঙাগড়া। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ঘটে গেছে কত রক্তপাত! যুদ্ধশেষে শান্তি স্থাপিত হয়েছে কতবার। কিন্তু বাংলার নদীর দু'তীরের দুখানি গ্রাম পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনাদি-অনন্ত কাল। যুদ্ধ বা রক্তপাত পারেনি তাদের

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে। গ্রামের নির্বিকার মানুষগুলি জন্ম-মৃত্যুর খেয়া-নৌকায় চিরকাল পারাপার করে ॥

৩. চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়—
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা—নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

ভারতে চাই সর্ববন্ধনমুক্ত দীপ্ত মানবতা। সর্ববন্ধনমুক্ত ভারতের প্রতিটি মানুষের চাই নির্ভীক হৃদয়, উন্নত মস্তক, সংস্কারহীন অখণ্ড বিশ্বজ্ঞান, আবেগময় নির্বোধ বাক্‌-স্বাধীনতা। যে মুক্ত পরিবেশ ও ও মানসিকতায় বিশ্বময় দেখা দেয় সুবিপুল সকল কর্মোচ্ছ্বাস, মানুষের অন্তরে ন্যায়বোধ ও বিচারবুদ্ধি এবং অনমনীয় পৌরুষের ঘটে সংস্কারহীন প্রকাশ, ভারতবর্ষে আজ সেই মুক্ত পরিবেশ ও মানসিকতার বড়ো প্রয়োজন। ভারতবাসীর এই সব কর্ম, চিন্তা এবং আনন্দ যেন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট হয়। তবেই ভারত চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গভূমিতে উন্নীত হবে ॥

৪. বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর দীনের সুনিশ্চিত বন্ধু এবং পরম আশ্রিত-বৎসল। যারা বিদ্যাসাগরের বিশ্ব-বিশ্রুত করুণা এবং মহত্ত্বে অভিষিক্ত হয়ে ধন্য হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই তাঁর চরিত্র-মহিমা এবং করুণার মহৎ গৌরব উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর সার্বভৌম করুণা সমগ্র জাতির হৃদয়কে করেছে সরস, সমগ্র দেশকে করেছে উর্বর। বিদ্যাসাগরের করুণা পৃথিবীর সকল দুঃস্থ, পীড়িত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষের কাছে পরম আশ্বাস॥

৫. বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

যিনি মিত্রাক্ষর ছন্দের নির্মাতা, তিনি নিঃসন্দেহে নির্মম। নির্মম মিত্রাক্ষরের নিষ্ঠুর পেষণ-যন্ত্রে ভাষাকে পীড়িত করাই ছিল সেই নিষ্ঠুর নির্মাতার উদ্দেশ্য। তাঁর হৃদয়ে ছিলনা আন্তরিক ভাষাপ্রীতি। যা ছিল, তা প্রীতির প্রকাশ মাত্র—কৃত্রিম, আন্তরিকতাহীন। যে ভাষার সৌন্দর্য স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত, তাকে কৃত্রিম সৌন্দর্যে পীড়িত করা হলে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ম্লান এবং বিকৃত করা হয়। স্বভাব-সৌন্দর্যই ভাষার প্রকৃত সৌন্দর্য॥

৬. ওই পঞ্চনদ, বৎস, এই পুণ্যভূমি
আর্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখো রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদী-কূলে
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! আত্ম-বিসর্জন;
প্রতাপের দেশ এই পদ্মিনীর ভূমি!

ভারতের পঞ্চনদ-অঞ্চল আর্যদের পবিত্র আদিবাসভূমি। এই অঞ্চলই একদা ছিল সামগান-মুখরিত। কত বৈদিক মন্ত্রের রচনাভূমি এই পঞ্চনদ-অঞ্চল। কত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এই অঞ্চলকে

পবিত্র ভূমিতে পরিণত করেছে। স্বাধীনতার পুণ্যভূমি এই অঞ্চলেই বীর পুরুরাজ ভারতের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে বুকের রক্ত দান করেছিলেন। তার নিম্নে মরুময় রাজপুত-ভূমি—প্রতাপ-পদ্মিনীর দেশ। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদীকূলে-কূলে স্বাধীনতার জন্যে আত্মবলিদানের গৌরবগাথা এখনো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়॥

৭. কত কাল পরে, বল ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে।
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে ?
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর-দাসখতে সমুদায় দিলে।
পরহাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহ লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে……
পর দীপশিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

ভারতের জাগরণের আর কত বিলম্ব ? কবে হবে তার এই দুঃখের অবসান ? ক্লান্ত অবসন্ন এই জাতি কি এইভাবে বিলুপ্ত হবে ? স্বদেশেও এদেশের সন্তানদের বিদেশীর মতো জীবনযাপন করতে হয়। স্বদেশের সমস্ত ধনসম্পদ বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে তাকে গলায় তুলে নিতে হয় পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল। আজ দেশ-দেশান্তরে সূচিত হয়েছে জাগরণের আলোকসজ্জা। কিন্তু ভারতের চিরন্তন অন্ধকারের অবসান নেই॥

৮. বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্‌বেলিত দয়ার সাগর—বীর্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার।
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার।
দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্যমূর্তি তেজের স্ফূর্তি চিত্ত-চমৎকার !
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর-অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে – বিদ্যা দিয়ে আর
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারংবার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বীরসিংহের বীর সন্তান—করুণাসাগর এবং পৌরুষের অনন্য পুরুষকার। সাগরে যে অগ্নি থাকে, বিদ্যাসাগরই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দরিদ্র পিতামাতার সন্তান হয়েও তিনি চির-উন্নতশির। ক্ষুদ্রকায় এই মানুষটির হৃদয় ছিল করুণার বিশাল সমুদ্রের মতো উদ্বেল। কোমলতা ও তেজস্বিতার এমন অপূর্ব সম্মিলন বিশ্বে বিরলদৃষ্ট। মাতৃভক্ত এবং অনাথ-আতুর জনের চির-আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনী অদৃষ্টের সঙ্গে তাঁর সকল সংগ্রামেরই কাহিনী॥

৯. দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা,
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'
ঋষি বলে—'ধ্রুব তুমি বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে, 'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে—
'দয়াময় হও হে সদয়।'

জীবন ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন মানুষের কাছে সৃষ্টি ও স্রষ্টা বিভিন্ন তাৎপর্যময়। দুঃখীর কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মিথ্যা এবং পৃথিবীর আবর্তন-বিবর্তন অন্ধের মতো অনিশ্চিত। সুখীরা উপহাস করে দুঃখ এবং অদৃষ্টকে। তাদের মতে, পৃথিবী মানুষের পদানত। জ্ঞানীর কাছে দুর্জ্ঞেয় কারণের পরিণাম-ফল হলো এই পৃথিবী ; কিন্তু একদিন নয় একদিন সৃষ্টির সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। যাঁরা ভক্ত, তাঁরা বিশ্বাস করেন, এই পৃথিবী পরম লীলাময় স্রষ্টার চিরন্তন লীলার প্রেম-বিভূতি। ঋষির কাছে তিনিই একমাত্র সত্য এবং শ্রেষ্ঠ। কবির কাছে তিনি সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু গৃহীর কাছে তিনি জীবন-সংগ্রামের একমাত্র সহায় ; তারা করুণাঘন স্রষ্টার করুণাপ্রার্থী॥

১০. কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে ?"
দেবতা কহিলা, "আমি।" শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা, "আমি।" কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু।"
দেবতা কহিলা, "হেথা।" শুনিল না তবু
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি।
দেবতা কহিলা, "ফির।" শুনিল না বাণী।
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

এই জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠা, এই জীবনের মধ্যেই জীবনেশ্বরের আসন পাতা। এই উপলব্ধির অভাবে সংসার-বিরাগীরা স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মায়া-মমতার বন্ধন ছিন্ন করে ঈশ্বর-লাভের বাসনায় প্রবেশ করে সুদূর গিরিগুহায় কিংবা অরণ্যকান্তারে। কিন্তু ঈশ্বর যে মানুষের পিতামাতা-পত্নী-

পুত্ররূপে প্রেম-ভক্তি-স্নেহের কাঙাল হয়ে তাকে ঘিরে আছেন। সে তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁর নিঃশব্দ আহ্বান অস্বীকার করে বৈরাগ্যের অলীক মোহে সে সংসার ত্যাগ করে। তাতে সে যেমন সংসারকে হারায়, তেমনি হারায় জগতের জগদীশ্বরকে ॥

১১. ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে-ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোন অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারে সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোন বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

রাজনারায়ণ বসুর চরিত্রে ছিল নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ। পলিতকেশ এই বৃদ্ধটির সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠ শিশুরও কোন অমিল ছিল না। বার্ধক্যের আবরণের অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকতো একটি চির-শিশু। অগাধ পাণ্ডিত্য কিংবা জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিণত বার্ধক্য, স্বাস্থ্যহীনতা কিংবা সাংসারিক অসচ্ছলতা তাঁর সদাহাস্যমুখর সহজ সারল্য অপহরণে ব্যর্থ হয়েছে। শিশুসুলভ সহজ সারল্য এই পরিণত বৃদ্ধের ছিল অন্তরের ভূষণ ॥

১২. সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে-গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই; এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্র নানা লোকালয়ে, নানা কাজে, নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্য-নৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে-একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।

সামান্য কাজেও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এক আশ্চর্য ছন্দের ঢেউ জাগে। কর্মময় পৃথিবীর কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে যে মহাসংগীতের ছন্দ অনুরণিত হয়, রবীন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভে একদিন সহসা তাকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যক্ষ করবার শক্তি অর্জন করলেন। তার ফলে বিশ্বব্যাপী কর্মমুখর মানবজগতের মহাসৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পেলেন তিনি। বন্ধুপ্রীতি, মাতৃস্নেহ, এমনকি সমগ্র জীব-জগতের মধ্যেও পারস্পরিক প্রীতি ও স্পর্শকাতরতা তাঁকে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এর মধ্যে যে এক অনন্ত সীমাহীনতা রয়েছে, সেই মহাবেদনায় তাঁর হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে ॥

১৩. তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবীসিংহের ইজারা।

পৃথিবীর ওপারে ওয়েস্ট মিনিস্টর হলে দাঁড়াইয়া এদমন্দ্‌ বর্ক্‌ সেই দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোদ্‌গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক্‌ দেবীসিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্ত কালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই, এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর-ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে।

এদেশে মুসলমান-শাসনের অবসানে এবং ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার প্রাক্কালে এক ঘোর অরাজকতা মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। তার ফলে দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই দুর্গতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কুখ্যাত দেবীসিংহের ইজারা। এই সেই দেবীসিংহ, ওয়েস্ট মিনিষ্টার হলে এদমন্দ বর্কের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় যার নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী শুনে বহু স্ত্রীলোক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার অত্যাচারে মানুষের আহার্য হয়েছিল দুর্লভ, গৃহবাসের ছিল না কোন নিরাপত্তা, লুণ্ঠন-দস্যুবৃত্তি হয়ে উঠেছিল সে সময়ের দৈনন্দিন ঘটনা। চারদিকে ভয়াবহ চোর-ডাকাতের প্রাদুর্ভাব। তাদের দমন করা হয়ে উঠেছিল অসাধ্য॥

১৪. সকল বাবুয়ানা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিসাবী জাত, যেমন ফুর্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রত্যেকের খাজাঞ্চিখানা। ঘরে টাকা না রেখে সেইখানে গছিয়ে দেয়, সে টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংলণ্ডে অগণ্য ব্যাঙ্ক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্কের শাখা। পাড়ায় ঐ ব্যাঙ্কটি না থাকলে পাড়ায় ঐ ন'টি দোকান থাকত না, সমৃদ্ধিও থাকত না, আমাদের বাড়ির ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিংবা মাটিতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই করত না। ব্যাঙ্ক থাকায় আমাদের বাড়ির ঝি-র দশ-বিশ টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরছে, সেই মুহূর্তে হয়ত নিউজীল্যাণ্ডের চাষারা ও-টাকা ধার নিলে কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরা ও-টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ও-টাকার শেয়ারে ওর দুগুণ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলে।

বিলাসিতা সত্ত্বেও ইংরেজরা খুবই হিসেবী জাত। স্ফূর্তি করলেও ওরা পরিশ্রম করে প্রচুর রোজগার করে এবং খরচের চেয়েও বেশী টাকা ব্যাঙ্কে জমায়। সে টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটে এবং তারা তা থেকে সুদ পায়। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বহু, পাড়ায়-পাড়ায় তাদের শাখা-বিস্তার। এই ব্যাঙ্কই ও দেশের সমৃদ্ধির প্রতীক। বাড়ির ঝি-র সামান্য সঞ্চয়ও ঐসব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে খাটছে। সে টাকা নিউজিল্যাণ্ডের চাষীদের কাছ থেকে কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকদের কাছ থেকে কিংবা হাওড়ার পাটকলওয়ালাদের কাছ থেকে দ্বিগুণ টাকার ডিভিডেণ্ড ঘরে আনে॥

১৫. জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে

ভয়ের রূপে, কখনও তাহা আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।

সে-রূপ তাহার না দেখাই ভাল যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে হ্যারী জন্‌স্টন্, মার্কো পোলো, হাড্‌সন, শ্যাকল্টন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা, একবার সে ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

লবটুলিয়া ও বইহারের নির্জন অরণ্য-প্রকৃতির রূপ কখনো ভয়াবহ, কখনো উদাস-গম্ভীর-নিস্পৃহ, কখনো স্বপ্নময়, করুণ, মধুর। সেই অনবদ্য রূপরাশি এক অসীম রহস্যানুভূতিতে লেখকের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে, অপরূপ জ্যোৎস্নায়, ঝিল্লীর তানে কিংবা উল্কার জ্যোতিতে সৃষ্টি হয় এক নীরব সংগীতের অপূর্ব ঐকতান। প্রকৃতির এই মোহিনী রূপের মায়া মানুষকে হ্যারী জনস্টন, মার্কো পোলো, হাড্‌সন, শ্যাকলটনের মতো গৃহত্যাগী, উদাসীন, ছন্নছাড়া করে। যে প্রকৃতির সেই মোহিনী রূপের মায়া একবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার পক্ষে গৃহস্থ সেজে ঘরকন্না অসম্ভব॥

১৬. মানুষ যেদিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সেদিন তার এক মহাদিন। অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবামাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে। সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র। জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই, মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ। তার বাহিরের প্রাণ, অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে। তাই জড়ের উপর তার বাহ্য কর্মভার যতটাই সে না চাপাতে পারবে ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। সুতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় করে শূদ্র করে তুললেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল, সূক্ষ্ম নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে।

জড়ের অন্তরের সত্তার সঙ্গে বাইরের সত্তার যোগ নেই। মানুষের সেই যোগ আছে। তাই মানুষ দ্বিজ। কিন্তু সমাজের একটি অংশকে জড় এবং শূদ্র করে তুলতে না পারলে সমাজের কাজের বোঝা বইবে কারা? তাই বহুকাল শূদ্ররা ছিল সমাজের শিক্ষা-দীক্ষাবঞ্চিত জড় অংশ। সমাজের কাজের সম্পূর্ণ বোঝা তাদের ঘাড়েই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু চাকা আবিষ্কৃত হলে সেই বোঝা চাপানো হলো চাকার ওপর। ফলে, শূদ্ররা পেল মুক্তি। চাকা আবিষ্কারের দিনটি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সেই চাকাকে লাগানো হলো চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়িতে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রে॥

১৭. সমগ্র জগৎ একটা প্রতীক, আর ইহার পশ্চাতে মূলতত্ত্ব ঈশ্বর। এই প্রতীকজ্ঞান পুরোপুরিভাবে মানব-সৃষ্ট নয়। কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বী কয়েকজন ব্যক্তি একস্থানে বসিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বকপোল-কল্পিত কতকগুলি প্রতীকের সৃষ্টি করিলেন—এরূপ নয়। প্রতীকগুলি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা না হইলে কতকগুলি

প্রতীক প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই কতকগুলি বিশেষ ভাবের সহিত জড়িত কেন? কতকগুলি প্রতীক সর্বজনীনভাবে প্রচলিত। তোমাদের অনেকের ধারণা—খ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শেই ক্রুশচিহ্ন প্রথম আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টধর্মের বহু পূর্ব হইতে মুশা জন্মিবার পূর্ব হইতেই, বেদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব হইতে—এমনকি মানুষের কার্যকলাপের কোনপ্রকার মানবীয় ইতিহাস রক্ষিত হইবার পূর্ব হইতেই উহা বর্তমান ছিল।

সমগ্র জগৎটাই ঈশ্বরের প্রতীক। এই প্রতীক কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। এগুলি স্বতঃসৃষ্ট। তাইতো প্রতিটি প্রতীক প্রত্যেক মানুষের মনে একই ভাবের দ্যোতনা করে। সেই হিসেবে কতকগুলি প্রতীক, দেখা যায়, একেবারে সার্বজনীন। অনেকের ধারণা, খ্রীষ্টধর্মই ক্রুশচিহ্নের স্রষ্টা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। খ্রীষ্টধর্মের আগে, মুশার জন্ম এবং বেদের সৃষ্টির পূর্বে, এমনকি মানবেতিহাসের সৃষ্টির আগে থেকেই তা প্রচলিত ছিল॥

১৮. মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবল-বীরগণ-কর্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোনো সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকার প্রধান উন্নতিকর্তা বাহুবলবীর ওয়াশিংটন। হলণ্ড বেলজিয়ামের প্রধান উন্নতিসাধনকর্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলো বকিতে পারিলেই বাক্যবল হয় না। বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ—এঁরা ছিলেন বাক্যবীর। তাঁদের দ্বারা পৃথিবীর যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে, বাহুবলবীরেরা তার শতাংশও সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। তবু আত্মরক্ষা ও জাতির উন্নয়নে বাহুবলও প্রয়োজন। ওয়াশিংটনের বাহুবলে আমেরিকার উন্নতি, অরেঞ্জের উইলিয়মের বাহুবলে হলণ্ডের সমৃদ্ধি। ভারতের দুর্গতির মূলে বাহুবলের অভাব। কিন্তু বাক্যবলেই বাহুবলের চেয়ে পৃথিবীর বেশী উন্নতি হয়েছে। বাহুবল অর্থাৎ পশুবল; আর বাক্যবল অর্থাৎ মানুষের বল। কথার যে শক্তি, তা বাক্যবল নয়। বাক্যে যা প্রকাশিত হয়, তাই বাক্যবল॥

১৯. আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ছিল। পঁচিশ বছর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোক এক-একবার এসে সেই পাঠ শুনছিল আর আবশ্যক মতো খদ্দেরদের দেখাশোনা করছিল। ঠিক সেই আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসে ছিল। তার পাশে বসে ছিল সেই আগেকার মেয়েদের মতো দেখতে দুটি মেয়ে। কোনো মায়ামন্ত্রবলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এলো নাকি? আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতুবন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

কালের যাত্রাপথে বাইরের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের সনাতন জীবনধারা। পঁচিশ বছর আগে এক মুদির দোকানে এক বৃদ্ধকে তাঁর নাতি-নাতনী-পরিবৃত হয়ে রামায়ণ পাঠ করতে দেখা যেত। এক যুবক দোকানের বেচাকেনার ফাঁকে এসে শুনতো সেই রামায়ণ-পাঠ। পঁচিশ বছর পরেও দেখা যায় সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি—নাতি-নাতনী-পরিবৃত এক বৃদ্ধের রামায়ণ-পাঠ, দোকানের বেচাকেনার ফাঁকে এক যুবকের বসে রামায়ণ-পাঠ শ্রবণ। রামায়ণ-পাঠের বিষয়বস্তুও সেই একই —রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের কাহিনী ॥

২০. তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ; তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্য পরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত, সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের মুহূর্তে ভারতবর্ষ ছিল আত্মবিস্মৃত এবং নানা অর্থহীন কুসংস্কারের ভারে আচ্ছন্ন। সামাজিক অগ্রগতির সমস্ত আলো নিবিয়ে সে অগৌরবের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়ে অতীতের স্বপ্নে ছিল নিমগ্ন। এমন সময় তার দ্বারে এলো পশ্চিমী সভ্যতা। চারদিক থেকে প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় আতিথ্যের পরিবর্তে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলো ভারতের স্বর্ণভাণ্ডারে ॥

অনুসরণী

১. বস্তু-সংক্ষেপ লিখ :

ক

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে

মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে,
উদার আলোকমাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

খ. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদলদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনমতে;
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ-'পরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

গ. 'যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারাকুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।

ঘ. পিতা বোধকরি আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।' তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবল বেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

ঙ. লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখীন বাচালতা নয়, সেজন্যে তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না, কেউ না শুনলেও তারা রণে ভঙ্গ দেয় না, যে পর্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে পর্যন্ত তাদের বক্তৃতা চলতে থাকে, বরং তখনই তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দুটি শ্রেণীর লোককে আমি নাছোড়বান্দা হতে দেখেছি—পাণ্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণীর লোক জানে না; বাকি সকলেই অল্পবিস্তর অভিমানী। কিন্তু ইংলণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজী ভাষায় নেই। এতে ইংরেজী ভাষার ক্ষতি হয়েছে কিনা জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বৃদ্ধি হয়েছে।

২. ভাববস্তু সংক্ষেপে লিখ :

ক. আমি ভালোবাসি, দেব, এই বাংলার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবী গান, সে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জনতটে বাজায় কিংকিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি' আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—করো আশীর্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

খ. সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে লাগিছে লাগিবে দু'দিন পরে
মহামানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্ঘ্য রচনা করে।
মালাকার তার মাল্য যোগায় গন্ধবেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তারে তোষে নৃত্যে গানে,
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়, গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী
তাঁতীরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তারে করিছে ধনী।
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায় বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায় কিছু যেন জানা না রয় বাকি।

গ. এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম সাদা—রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;
আকন্দ ফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরণ

রৌদ্রের দুপুর ভরে,—বার বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়,—দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের ধূল,
কবেকার কোকিলের, জান কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতেছিলেন বসে দু'পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়—থেমে থেমে যায়,
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেঙে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধান ক্ষেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।

ঘ. আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে গোধূলিবেলায় রক্তমেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

ঙ. ইউরোপে এতদিন আছি কাঁদতে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাত-বিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্তত হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনি। আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব একটা গভীরতার দাগও কারো মুখে দেখিনে, তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শ তৃপ্তি কারো চোখে মুখে চলনে বলনে দেহের গড়নে লক্ষ্য করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোন কালে ছিল না। ইউরোপের খ্রীস্টধর্ম যীশুর ধর্ম নয়—সেন্ট পলের ধর্ম—রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। তার মধ্যে বীর্য আছে, লাবণ্য নেই।

৩. সংক্ষেপে বিষয়বস্তু পরিস্ফুট কর :

ক. চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথ পাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত

সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

খ. পায়ের তলায় ধুলা, সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।
মানুষ কি সেই ধুলি চেয়ে হীন, সহিবে যে অপমান?
আত্মার সেই মহাদুর্গতি নহে দেবতার দান।
নাই ভগবান নাইক ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানী ইস্কুলে!—
দূর করি সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি সেই ভেক-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে,
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড়া দুর্দিনে।

গ. হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে,
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

ঘ. রামায়ণ-কাব্য অপূর্ব সামাজিক কাব্য। উহা যৌথ-পরিবারের প্রীতি-সমুদ্রের উচ্ছলিত লীলা দেখাইতেছে, কিন্তু মানবগৃহের ঊর্ধ্বে আশ্বাস ও শান্তির যে জয়-দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে, তাহারই অভয় ও নিত্য-উদ্দীপনাময় রব উহার চরিত্রবর্গকে কার্যে প্রলুব্ধ করিতেছে। উহাতে হিন্দুগৃহের পবিত্র প্রেমের চরম কথা উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ আধুনিক হিন্দুগৃহের কাপুরুষতা ও ভীরুতা উহাকে স্পর্শ করে নাই। মাহাত্ম্যের দিব্যদ্যুতিমণ্ডিত হইয়া উহার চরিত্রবর্গ একটি চিরশুভ সহজ

কর্তব্যের পথ দেখিতেছিলেন—রাজপ্রাসাদের বন্দিতান-মুখরিত শুকালাপ-নিনাদিত কক্ষের স্বর্ণাস্তরণময় কোমল শয্যা এবং স্থণ্ডিলভূমি ও ইঙ্গুদীমূলস্থ তৃণশয্যা তাঁহাদের নিকট তুল্য ছিল।

৬ মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি ; দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাশ বসিয়াছে ; অপরাহ্ণে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে নিবিড়ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল ; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া একপ্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্ পাগলি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে ; বাতাসের দম্‌কায় দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায় ; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না, পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ; বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি।

৪. বক্তব্য বিষয়টি সংক্ষেপে লিখ :

ক. কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী ! চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়।' ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে, 'যেতে নাহি দিব।' তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বুকে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে, 'যেতে নাহি দিব।'
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব—
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার, 'যেতে দিব না রে।'

খ. আগুনের তাপে শাঁড়াসির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলি নি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ,
তোমার হস্তে ইস্পাত হয়ে সহি শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাতে কিবা সুখ মোর ;
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিনরাত মরে খেটে,
না বুঝি চাতুরী, নেহাই হাতুড়ি ভাই হয়ে ভায়ে পেটে।

গ. তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব ; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে,
দেখিব খয়েরী ডানা শালিকের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে ;
দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে : সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,
খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—
'পরণকথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কলমীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে—
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চলে যায় কুয়াশায়,—তবু জানি কোনদিন পৃথিবীর ভিড়ে—
হারাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

ঘ. আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকা-বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু, এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না! বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।

ঙ. কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না ; প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহা তোমার দিবার আছে দাও ; ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ইহা ফিরিয়া আসিবে ; কিন্তু ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ কর ; দাও—ব্যস, সেখানেই শেষ। শিক্ষা কর—দান করিবার জন্যই এ-জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে ; সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে—যাহা দেয়, তাহা দিতেই হইবে। তুমি এই সংসারে আসো সঞ্চয় করিবার জন্য। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তুমি গ্রহণ করিতে চাও ; কিন্তু প্রকৃতি গলা টিপিয়া তোমাকে দান করিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই হইবে।

———

১. রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম ;
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী।

জনাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছে জগন্নাথের রথ। ভক্তেরা পথের ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম নিবেদন করছে জগন্নাথের উদ্দেশে। পথ, রথ এবং মূর্তি—এদের প্রত্যেকের দাবি, সে-ই ঈশ্বর এবং ভক্তের প্রণাম তার উদ্দেশে নিবেদিত। কিন্তু পথ, রথ বা মূর্তি – এরা কেউ জগন্নাথ নয়। যিনি জগন্নাথ—জগতের ঈশ্বর—তিনি রয়েছেন এ সবের অন্তরালে—অসীম এবং অনন্ত।

দেবতার নামে এই পৃথিবীতে যে কত অপদেবতার সৃষ্টি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ তার স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রীতির প্রেরণায় যুগে যুগে দেবতার উদ্দেশ্যে রচনা করেছে পূজার অর্ঘ্য। কিন্তু সেই অর্ঘ্য দেবতার কাছে পৌঁছোয় নি। পথিমধ্যে তা গিয়ে পড়েছে লোভী, ভণ্ড, অপদেবতাদের হাতে। এইভাবে বিশ্বের সহজ সরল মানুষগুলিকে প্রতারণা করে সেই অপদেবতার দল নিজেরাই মর্ত্যের দেবতার আসন গ্রহণ করবার জন্যে লিপ্ত হয়েছে নানা জঘন্য চক্রান্তে। দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত ভক্ত-হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির নৈবেদ্য সেই ধর্মষণ্ডের দল মধ্যপথ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে করে আত্মসাৎ। ফলে, একদিকে ভক্তের ভক্তির অর্ঘ্য দেবতার পদতলে পৌঁছিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তারা বিশ্বের সহজ সরল মানুষগুলির সঙ্গে করে প্রতারণা ; অন্যদিকে দেবতার ধন নিজেরা আত্মসাৎ করে তারা আশাতিরিক্তভাবে হয়ে ওঠে ধনী এবং বিত্তশালী। এইভাবেই পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বের যাজক-শক্তির আবির্ভাব। কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। একদিন নয় একদিন মানুষের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হবেই। সেদিন দেবতার সম্মুখ থেকে অপদেবতাদের কদর্য ছায়ামূর্তিগুলি হবে অপসারিত। সত্যের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় প্রকাশ॥

২. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

অন্যায়কারী এবং অন্যায়ের সহকারী উভয়েই সমান অপরাধী। বিশ্বের ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে উভয়ের কারো জন্যেই ক্ষমা নেই। বিশ্বের ন্যায়-দেবতার ঘৃণা তাদের উভয়কেই তৃণের মতো দগ্ধ করবে। তাদের কারো মুক্তি নেই।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই ন্যায়বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ। তার বিবেকের শুভ্রতম এবং শুদ্ধতম বেদীতে ন্যায়াধীশের আসন পাতা। জগতের সমস্ত কাজেই তার অন্তরের বিবেকবুদ্ধি থেকে আসে অমোঘ বিধান, অনড় নির্দেশ। মানুষকে সেই নির্দেশ পালন

করতে হয়। কিন্তু ভীতি বা দুর্বলতার কারণে অনেক সময় মানুষ ন্যায়ের সেই অমোঘ নির্দেশ পালনে হয় পশ্চাৎপদ, সেই মহান্ দায়িত্ব পালনে হয় কুণ্ঠিত, সংকুচিত। কিন্তু ন্যায়াধীশের নির্মম বিচারে তার ক্ষমা নেই। কারণ, ন্যায়ের নির্দেশ পালনে এই অক্ষমতা বা দ্বিধা-দুর্বলতার অর্থ অন্যায়কে স্বীকার করা। অন্যায় সহ্য করা বা উপেক্ষা করাও অন্যায়কে প্রশ্রয়দান। তার ফলে, অন্যায়কারী যথেচ্ছভাবে স্ফীত হয়ে ওঠার শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে আরো অন্যায়কর্মে উৎসাহিত হয় এবং তাতে সারা পৃথিবী অন্যায়ের রাজত্বে আর্তনাদ করে ওঠে। পৃথিবী থেকে এই ভাবে ন্যায়বোধ বিলুপ্ত হয়। কাজেই, অন্যায়কারী এবং অন্যায়-সহনকারী উভয়েই সমান দোষী, উভয়েই শাস্তির যোগ্য। আবার, অন্যায়ের আচরণে কেউ কেউ নীরব উদাসীন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাতে প্রশ্রয় পেয়ে অন্যায়কারী স্ফীত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ন্যায়াধীশ রুদ্রদেবতা বেশীদিন তা সহ্য করবেন না। তাঁর রুদ্রতেজে একদিন নয় একদিন অন্যায়কারী এবং অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা উভয়কেই লাভ করতে হবে পৃথিবীর কঠিনতম শাস্তি॥

৩. দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

দণ্ডদাতা অপরাধীকে নিরাসক্তভাবে নির্মম দণ্ড দান করেন। কিন্তু তা অবিচারেরই নামান্তর। কারণ দণ্ডের আঘাত দণ্ডিতকে যে বেদনা দেবে, তার গভীরতা যদি দণ্ডদাতা উপলব্ধি করতে অক্ষম হন, তাহলে বিচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বিচারের উদ্দেশ্য হলো, অপরাধীর হৃদয়ের সংশোধন ; এবং সেক্ষেত্রে বিচারককে হতে হবে সংবেদনশীল।

ন্যায়ের শুভ্র পাষাণ-বেদীর ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে অপরাধ নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কর্তব্য। বিচারকের কর্তব্য তাই বড়ো সুকঠিন। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ডদানের ব্যাপারে বিচারককে সংবেদনশীল হতে হবে, অনুভূতিপ্রবণ হতে হবে। তা না হয়ে তিনি যদি অপরাধীকে নির্মমভাবে দণ্ডদান করেন, দণ্ডিত অপরাধীর বেদনায় তাঁর হৃদয়ে যদি করুণার উদ্রেক না হয়, তবে তিনি বিচারক পদের অযোগ্য। কারণ যে দণ্ডিত, যাকে তিনি দণ্ডদান করেছেন, সেও কোন হতভাগ্য পিতামাতার সন্তান। সন্তানের ব্যথা-বেদনায় তাঁরাও ব্যথিত হবেন। তাছাড়া, যে-কোন শাস্তিই কষ্টদায়ক। অপরাধীকে সেই শাস্তি ভোগ করতে হয়। বিচারক যদি তার এবং তার পিতামাতার ব্যথা-বেদনার কথা চিন্তা করে ব্যথিত না হন, যদি অন্তরের অন্তস্তলে তাদের জন্যে তিনি সমবেদনা অনুভব না করেন, তাহলে তিনি বিচারক পদের অযোগ্য এবং তাঁর শাস্তিদান নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। কাজেই, দণ্ডিতের প্রতি বিচারককে সমব্যথী হতে হবে। সমব্যথী বিচারকের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার এবং তিনি যে শাস্তিদান করেন, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্তি।

৪. জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে॥

ঈশ্বর পৃথিবীতে দরিদ্রবেশে আমাদের চারদিকে দয়াপ্রার্থীরূপে নিত্য পরিভ্রমণরত। কাজেই, জগতের দরিদ্রদের দয়া বিতরণ করলে আমরা ঈশ্বরলাভে সক্ষম হবো।

মানবতার সেবাই ঈশ্বরলাভের প্রকৃত পথ। ঈশ্বর নিরাকার এবং অনন্ত। মানুষের মধ্যেই তাঁর যথার্থ প্রকাশ। কাজেই, মানুষই আমাদের জাগ্রত দেবতা। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনই আমাদের প্রকৃত ঈশ্বর-সেবা। আমাদের চারদিকে কেঁদে ফেরে কত পীড়িত ঈশ্বর, কত ব্যথিত ভগবান! পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার রাহুগ্রাসে নিপতিত হয়ে মানুষ বড়ো অসহায়ভাবে মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই আর্ত, পীড়িতের দুঃখ-মোচনের জন্যে মানুষের হৃদয়-দুর্গ যদি অর্গলমুক্ত না হয়, তবে এই পৃথিবীতে মানুষ সাহায্যের প্রত্যাশায় কার দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবে? সমাজের একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা জগতের দুঃখী হতভাগ্য মানুষগুলিকে দূরে বিতাড়িত করে, তথাকথিত পবিত্রতা-রক্ষার নামে তাদের স্পর্শকে দূরে ঠেকিয়ে মন্দিরের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে খোঁজেন ঈশ্বরকে। কিন্তু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তো কেবল মন্দিরের পাষাণ-বেদীতেই নয়, তাঁর আবির্ভাব যে মানুষের অন্তরে অন্তরে। জগতের লাঞ্ছিত-উৎপীড়িতদের মধ্যে যে তাঁর আসন পাতা, তাঁর উপস্থিতি যে সবার পিছে সবার নিচে সর্বহারাদের মাঝে। কাজেই, জগতের দরিদ্র-নারায়ণের সেবার মধ্য দিয়েই লাভ করা যাবে ঈশ্বরের অবারিত স্পর্শ। মানুষের দেহই তো জাগ্রত দেবতার পবিত্র মন্দির। তার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর-সেবা। মানবতার সাধনাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-সাধনা॥

৫. কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে আকাশেতে উঠিলেন চাঁদা;
কেরোসিন বলি উঠে, 'এসো মোর দাদা!'

কেরোসিন-শিখা এবং মাটির প্রদীপ—দুইই সগোত্র; আলো-দানই উভয়ের কাজ। কেরোসিন-শিখার আলো-দানের ক্ষমতা কিঞ্চিৎ বেশী, মাটির প্রদীপের কিঞ্চিৎ কম। তারই ভিত্তিতে এই সগোত্রীয়দের মধ্যেও দেখা যায় ভ্রান্ত জাত-বিচার এবং পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ। কিন্তু কালক্রমে তাদের ভাগ্যাকাশে যখন আবির্ভূত হয় তাদের উভয়ের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী চাঁদ, তখন কেরোসিন-শিখার আলোও নিষ্প্রভ হয়ে যায়; এবং সেই বিপদের মুহূর্তে কেরোসিন-শিখা মাটির প্রদীপকে একান্ত আত্মীয় বলে কাছে ডাকে।

ভ্রান্ত আভিজাত্যের গর্বে মানুষ মানুষকে করে ঘৃণা, মানুষের স্পর্শকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে বিশ্বে স্বাতন্ত্র্য জাহির করে। কিন্তু তাতে সে প্রকারান্তরে মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বেচ্ছা-নির্বাসিত জীবন যাপন করে। স্মরণীয় যে, এই পৃথিবীর সকল

মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি—সকলেই সমান। 'জগৎ জুড়িয়া একজাতি শুধু সে জাতির নাম মানুষ জাতি।' একই রক্ত-মাংসের উপাদানে তাদের শরীর গড়া, একই চেতনার উপকরণে গড়া তাদের অনুভূতি। এই পৃথিবীর একই সূর্যের কিরণে, একই জল-হাওয়ায় তাদের জীবন সম্ভব হয়েছে। অথচ বিশ্বের কতিপয় ভ্রান্ত অন্ধ মানুষ মানুষে-মানুষে ভেদ-বৈষম্যের লৌহ-প্রাচীর সৃষ্টি করে তার ওপরে মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের গর্বান্ধ নিশান উড়িয়ে দেয়। তাতে নাকি তাদের আভিজাত্যের জাতি-রক্ষা হয়। তারা নির্বোধ; তাই তারা মানুষের সৃষ্ট জাতি নিয়ে এই বজ্জাতির করে বড়াই। কিন্তু তাতে ঘৃণা করে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মানুষ দুর্বল, পঙ্গু ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ভারতে বর্ণহিন্দুদের এই মানসিকতায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বুকে পুঞ্জিত অভিমান একদিন স্ফীত হয়ে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে প্রবল বৈদেশিক শক্র ভারতের শ্রেণীতে-শ্রেণীতে ভেদ-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও শক্তিহীনতার সুযোগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সমগ্র জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে করে বন্দী। বিদেশীর অত্যাচারের সম্মুখে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সেদিন ভেদ-বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ভ্রান্ত জাতি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন সাবধান-বাণী—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' ভ্রান্ত জাতি-বৈষম্যের পরিণামে ভারত পরাধীনতার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তাতেই তার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়েছে ॥

৬.

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে ॥

নদীর প্রত্যেক তীরই নিজেকে দুঃখী এবং অপর তীরকে সুখী মনে করে। অর্থাৎ, পৃথিবীর কেউই নিজের বর্তমান অবস্থায় সুখী নয়; প্রত্যেকেই পরকে সুখী মনে করে নিজের দুঃখের মাত্রা তোলে আরো বাড়িয়ে।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্তহীন। আর, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনদিনই পরিতৃপ্ত হবার নয়। সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে মানুষ আজীবন ছুটে মরে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেমন অন্ত নেই, তার অবিশ্রান্ত ছুটে চলারও তেমনি শেষ নেই। স্মরণীয় যে, মানুষের আকাঙ্ক্ষা করবার শক্তি অসীম, কিন্তু তাকে সফল রূপদানের ক্ষমতা তার সীমিত। তাই সে আকাঙ্ক্ষা করে প্রচুর, কিন্তু লাভ করে অতি অল্প। কাজেই, তার আকাঙ্ক্ষা চিরকালই অপূর্ণ থেকে যায়। কবি তাই বলেন, 'এ কেবল ফুটা পাত্রে জল ঢেলে দিনরাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।' এই চাওয়া-পাওয়ার গরমিলই মানুষের চিরন্তন অতৃপ্তির কারণ। তাই সে যা পায়, তাতে তার চিত্তের ক্ষুধা মেটে না, মেটে না আকাঙ্ক্ষার তৃষ্ণা। সে চায় আরো, আরো বেশী। আসল কথা, মানুষ কি চায়, তা সে জানে না। তাই সে অনাদি অনন্ত আকাঙ্ক্ষার

অন্তহীন আকর্ষণে উর্ধ্বশ্বাসে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে ধাবিত হয়। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা তো কোনদিনই পূর্ণ হবার নয়। ফলে, নৈরাশ্যের এক সূচীভেদ্য অন্ধকারে সে অবশেষে নিক্ষিপ্ত হয়। কবি তাই গভীর মনস্তাপে উচ্চারণ করেন—'যা চাই তা ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না।' এইভাবে পার্থিব সুখের অন্তহীন অন্বেষণে মানুষ অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে মরে এবং নিজের দুঃখ-বেদনার বোঝা তোলে বাড়িয়ে॥

৭. ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

ধ্বনি থেকেই প্রতিধ্বনির সৃষ্টি। কিন্তু প্রতিধ্বনি তা বিস্মৃত হয়ে ধ্বনিকে সব সময় করে বিদ্রূপ। ধ্বনির প্রতি তার এই বিদ্রূপের মূল কারণ, ধ্বনির কাছে তার যে ঋণ, তা অস্বীকার করা।

বিশ্বের পরোপকারীরা মানুষের উপকারের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দান করেন। বিপদের দিনে মানুষই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। বিপন্ন মানুষ মানুষের দ্বারে এসে আর্তকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করে। তার সাহায্য-প্রার্থনায় মানুষের হৃদয়ের সাড়াও পাওয়া যায়। বিপন্নকে বিপন্মুক্ত করবার জন্যে মানুষ নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিপন্নের উদ্ধারের মধ্য দিয়ে সে লাভ করে পরম পরিতৃপ্তি। যারা প্রকৃত পরোপকারী, তারা তাদের এই সাহায্য-দানের বিনিময়ে কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করে না। কিন্তু মানব-চরিত্র বড়ো বিচিত্র। যে-উপকারীর উপকারের সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তির বিপন্মুক্তি ঘটে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে কোথায় যেন তার বাধে। সে উপকারীর উপকার তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু তাকে বিদ্রূপ করে তার স্বাভাবিক মহত্ত্বকে করে উপহাস। উপকারীর উপকার-স্বীকৃতিতে যে অমূলক আত্মগ্লানি তার অন্তরে জেগে ওঠে, তার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি লাভের সহজতম উপায়ই হলো উপকারী ব্যক্তিকে উপহাস করা, বিদ্রূপ করা এবং সম্ভব হলে তার ক্ষতি সাধন করা। এভাবেই এই পৃথিবীর অমল আলোক-শিখা-গুলিকে গলা টিপে হত্যা করবার জন্যে বিশ্বের কৃতঘ্নেরা সদা-সক্রিয়। জগতের কৃতঘ্নদের শত কৃতঘ্নতা উপেক্ষা করে তাঁরা জীবন বিপন্ন করেও বিশ্বের অকৃতজ্ঞদের জন্যে হৃদয়ের অনাবিল আলো বিকিরণ করে যাবেন। এই কলুষিত বিষাক্ত পৃথিবীতে তাঁরাই তো একমাত্র আশা-ভরসা॥

৮. কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
'আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?'
থলি বলে, 'কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।'

ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলি এবং ধনিকের টাকার থলি মূলতঃ একই উপাদানে তৈরী।

ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলি তার দীনতা ও রিক্ততার জন্যে অনুগ্রহ পাবার আশায় ধনিকের টাকার থলির সঙ্গে মিত্রতা কামনা করে। কিন্তু একই উপাদানে নির্মিত হয়েও ধনিকের টাকার থলি তার অর্থের প্রাচুর্যের অহংকারে স্ফীত হয়ে ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলির সঙ্গে বন্ধুত্বকে করে অস্বীকার। তাদের এই বিভেদের মূলে আছে অর্থের অহংকার, ক্ষমতার অহংকার।

অর্থই সকল অনর্থের মূল! মানুষ জাগতিক সুখের আশায় অর্থ কামনা করে। সে অর্থ পায়, কিন্তু সুখ পায় না। অর্থ একবার লাভ করলে মানুষকে ক্রমাগত অর্থ-লালসায় পেয়ে বসে। তখন সে চায় আরো, আরো বেশী অর্থ। দিনে দিনে তার অর্থভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্থের সঙ্গে আসে অর্থের অহংকার। সেই অহংকারে মানুষ স্ফীত হয়ে ওঠে। তখন সে তার চারদিকের মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। ফলে, বন্ধুবিচ্ছেদ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ, এবং প্রিয়জন-বিচ্ছেদ অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। দু'হাতে অর্থভাণ্ডার আঁকড়ে ধরে সে ধনকুবের সাজে বটে; কিন্তু সবাইকে হারিয়ে সে এক নিঃসঙ্গ নির্জনতায় হয় নির্বাসিত। অন্যদিকে, তার হৃদয় অর্থচিন্তায় সারাক্ষণ থাকে ভারাক্রান্ত। সেখানে স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য —মানুষের এই সব সুকুমার বৃত্তিগুলির আর স্থান-সংকুলান হয় না। তাই অর্থবানেরা স্নেহপ্রীতি-দয়াদাক্ষিণ্যহীন হয়ে একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে ওঠে। সেই শূন্যতা পূরণ করবার জন্যে তখন অনিবার্যরূপে দেখা দেয় ঐশ্বর্যের অহংকার। মুদ্রারাক্ষস এইভাবে মানুষের হৃদয়ের সমস্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অপহরণ করে তাকে একটি দয়াহীন, ছায়াহীন মরুভূমিতে পরিণত করে ॥

৯. পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয় ॥

তীর্থে চলেছেন ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী। উদ্দেশ্য, তীর্থস্থানে তীর্থ-দেবতার পদতলে পূজা-নিবেদন। কিন্তু শুধু তীর্থস্থানেই কি দেবতার বাস? তীর্থ-পথের দু'পাশে প্রকৃতির সৌন্দর্যের যে অনবদ্য সমারোহ, তার মধ্যেও তো দেবতার প্রকাশ। প্রকৃত ভক্ত যিনি, তিনি তীর্থ-মন্দিরে দেববিগ্রহের মধ্যে ঈশ্বরকে খোঁজেন না। তিনি তীর্থ-পথের দুধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করেন।

দেবতার বাস কি কেবল মন্দিরে? যিনি অসীম, অনন্ত, তিনি কি মন্দিরের পাষাণ-আয়তনের মধ্যে বন্দী থাকতে পারেন? অথচ জগতের মূঢ় মানুষেরা ঈশ্বরকে খোঁজে মন্দিরের পাষাণ-বেদীতে। তিনি যে অনাদি, অনন্ত; ঈশ্বরের সেই প্রকৃত স্বরূপকে বিস্মৃত হয়ে তারা পাষাণ-বিগ্রহের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করতে চায়। পাষাণ-বিগ্রহ ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের প্রতীক মাত্র। কিন্তু মন্দিরের বাইরে যে বিশ্বজগৎ, সেখানেই জগদীশ্বরের আসন পাতা। সেখানে মানুষ এবং প্রকৃতির যে অনন্ত লীলা, তার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। প্রকৃতির নানা রূপবৈচিত্র্যের অফুরন্ত সমারোহের মধ্যে ঈশ্বর প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রকাশ করছেন। অরণ্যের পত্রমর্মরে, নানাবর্ণ-

গন্ধময় পুষ্পবিতানে, নদীর জলকলতানে, পাখির কলকাকলিতে, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে আকাশের বর্ণবাহারে যে অনবদ্য রূপবিস্তার, তা তো রূপাতীত অরূপেরই প্রকাশ-লীলা। কিন্তু মানুষ এই প্রাণময় প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ না করে মন্দিরের নিষ্প্রাণ শিলাস্তূপের মধ্যে অন্বেষণ করে ঈশ্বরকে। আবার, প্রকৃতির মধ্যে যেমন ঈশ্বরের রূপের লীলা, মানুষের মধ্যে তেমনি প্রেমের লীলা। মানুষের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভক্তি-ভালোবাসার মধ্যেও তো অনির্বচনীয় ঈশ্বরের মধুর প্রকাশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানসিক মাধুর্যের মধ্যেই সেই চির-সুন্দর এবং চির-মধুরের প্রতিষ্ঠা। সেখানেই খুঁজতে হবে ঈশ্বরকে। যারা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে না খুঁজে মন্দিরের মধ্যে তাঁকে খোঁজে, ঈশ্বর-দর্শন তাদের ভাগ্যে কোনদিনই ঘটে না॥

১০. এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ধনিকের সম্পদ-ক্ষুধা কোনদিনই পরিতৃপ্ত হয় না। তারা ক্রমাগত ধনসঞ্চয়ে স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে। তাদের ধনসংগ্রহ এবং ধন-সঞ্চয়ের পেছনে থাকে শোষণের নগ্ন ইতিহাস। সমাজের দুর্বলতর অংশকে শোষণ করেই দিনের পর দিন তাদের ঐশ্বর্য স্ফীতকায় হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে, বিশ্বের বিত্তহীনেরা তাদের শোষণে সর্বস্বান্ত হয়ে সাজে পথের ভিক্ষুক।

পৃথিবীতে যারা অপর্যাপ্ত সম্পদের মালিক, যাদের ধনৈশ্বর্য অফুরন্ত, তাদের সম্পদ-তৃষ্ণা কোনদিনই পরিতৃপ্ত হয় না। তারা যত পায়, তত চায়। এইভাবে তারা দিনের পর দিন নিজেদের মোটা পেট আরো মোটা করে চলে। তাদের সেই নির্বিচার সম্পদ-সংগ্রহের ফলে গরীবের কানাকড়িতে হাত পড়ে। পৃথিবীর দুঃখী মানুষেরা তাদের যৎসামান্য পুঁজি-পাটা নিয়ে করে জীবনযাপন। ধনিকের ঐশ্বর্যের প্রতি তাদের লোভ নেই, রাজার বিলাস-বৈভবের প্রতি তারা উদাসীন। 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ' রাখে বাঁচিয়ে। কিন্তু ধনিকের অপরিসীম ধনতৃষ্ণা ক্রমাগত স্ফীত হতে হতে একদিন দরিদ্রের পর্ণকুটিরকে স্পর্শ করে। নানা ছলে, নানা কৌশলে কিংবা বল প্রয়োগ করে ধনিকেরা দরিদ্রের সর্বশেষ সম্বল—তাদের সামান্য কানাকড়িটুকু ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সম্পদ-তৃষ্ণার আগুনে আহুতি দেয়। এইভাবে পৃথিবীর দরিদ্রেরা তাদের সব কিছু হারিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে সাজে পথের ভিক্ষুক, অন্নের কাঙাল। কেউ তাদের হিসাব রাখেনা, কেউ তাদের খবর রাখেনা॥

১১. শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রাখো একফোঁটা দিলাম শিশির।

দীঘির জলরাশি থেকেই শৈবালের জন্ম। সেই শৈবালে রাতের শিশির পড়ে। শিশিরের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে দীঘির জলে। তার পরিমাণ এতই সামান্য ও নগণ্য যে, তা দিয়ে দীঘির জলবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু শৈবাল তার সেই সামান্য

দানের কথা অসামান্য বলে জোর গলায় প্রচার করে এবং যে দীঘির জলে তার জন্ম, বৃদ্ধি এবং স্ফীতি, সেই দীঘিকেই এক ফোঁটা শিশিরের জলের জন্যে তার কাছে ঋণী বলে মনে করে সে অহংকারে স্ফীত হয়ে ওঠে।

এই পৃথিবীতে যাঁরা মহানুভব সদাশয় ব্যক্তি, তাঁদের নীরব দানে পৃথিবীর নিঃস্ব অভাবগ্রস্তরা উপকৃত হয়, জীবন পায়। সেই সব মহানুভব সদাশয় ব্যক্তিরা সমাজের প্রকৃত বন্ধু, পৃথিবীর স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ, মানবতার আশা-ভরসার স্থল। জীবন-সংকটে বিপন্ন অসহায় মানুষ তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায় সাহায্যের প্রার্থনায়। আর, সেই সব সর্বত্যাগী মহাপুরুষেরা তাঁদের জীবন তিল তিল করে দান করে বিপন্নকে উদ্ধার করেন এবং মানবতার সেবার রাথে উজ্জল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁদের সেই দান নীরব দান! সেই দানে থাকে না কোন অহংকার, থাকে না আত্মপ্রচারের বড়াই। কিন্তু মানব-চরিত্র বড়োই বিচিত্র। সেই মহান্ উদার-হৃদয় ব্যক্তিদের নীরব দানের বিনিময়ে সামান্য উপকার করে উপকৃত ব্যক্তিরা অহংকারে স্ফীত হয়ে ওঠে। তাদের ঢাকের চোটে গগন ফাটে। কিন্তু এই আত্ম-প্রচার ও আত্মঘোষণার হাস্যকর নিষ্ফলতা প্রকটিত হতে বিলম্ব লাগে না। যাঁরা জীবনধারণের প্রাণরস যোগায়, যাঁরা নিজেদের তিল তিল করে দান করে পৃথিবীর আর্ত-আতুর ও বিপন্নদের রক্ষা করেন, তাঁদের সামান্যতম উপকার যে সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ অকিঞ্চিৎকর, তা সেই ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিরা কোনদিনই বুঝতে পারে না॥

১২. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদামে বাঁধে আসি তারে,
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

নদী যতদিন 'আপন বেগে পাগলপারা', ততদিন তার গতিময় জলধারায় শৈবাল জন্মাতে পারে না। তার জলধারা ততদিন থাকে নির্মল এবং পানযোগ্য। কিন্তু নদীস্রোতের প্রবহমানতা কোন কারণে বাধাগ্রস্ত হলে তার জলধারা ধারণ করে বদ্ধ জলাশয়ের আকার। তখন তাতে শুধু শৈবাল নয়, নানা আগাছা ও রোগজীবাণু জন্মে তার জলকে দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। একথা নদীর ক্ষেত্রেই শুধু নয়, যে-কোন জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য। কোন জাতি যতদিন তার নিজস্ব জীবনধারায় গতিশীল থাকে, ততদিন তার উন্নতিধারা থাকে অব্যাহত। কিন্তু সে জাতি যখন কোন কারণে তার গতিধারা হারিয়ে নিশ্চল হয়ে যায়, তখনই নানা অর্থহীন কুসংস্কারে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার জাতীয় জীবন। তখন তার সমস্ত অগ্রগতিই স্তব্ধ হয়ে যায়।

চলমানতাই জীবন, নিশ্চলতাই মৃত্যু। সেই চলমানতার স্রোতে জীবন সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে। কিন্তু কখনো কোন কারণে যদি তার সেই স্বাভাবিক গতিচ্ছন্দ ব্যাহত হয়, জীবন যদি তার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ অগ্রসরণের পথে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে সে তার সুন্দর স্বাভাবিক বিকাশ

হারিয়ে বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করে। তখন তার মধ্যে নানা বিকার ও কদর্যতার ঘটে প্রাচুর্য। নানা পাপ ও পঙ্কিলতার আবর্তে জীবন ওঠে হাঁপিয়ে। একথা কোন নদীর জীবনে যেমন সত্য, তেমনি সত্য ব্যক্তি ও সমাজের জীবনেও। প্রত্যেক জাতিরই আছে একটি স্বাভাবিক গতির ছন্দ। সেই ছন্দের মধ্যেই জাতির স্বাভাবিক বিকাশ, সেই ছন্দের মধ্যেই জাতির সঠিক পরিচয়। সেই ছন্দে অগ্রসর হয়ে জাতি তার চরম সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কোনদিন যদি সেই জাতি তার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে, তবে তার জাতীয় জীবনের দিকে দিকে দেখা দেয় নানা অবাঞ্ছিত জড়তা ও নৈষ্কর্ম্য। এই জড়তা ও নৈষ্কর্ম্যই জাতীয় জীবনে নানা বিকৃতি ও পচন ডেকে আনে। সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশাচার ও লোকাচারের আবর্জনা-স্তূপ তার জীবনধারা পঙ্গু ও নিশ্চল করে দেয়। তখনই জাতির ভাগ্যে ঘনিয়ে আসে নানা বিপর্যয়। তখনই জাতির হাতে-পায়ে পড়ে নানা বিধি-নিষেধের বেড়ী, তখনই নিষ্ঠুরভাবে বাজতে থাকে পরাধীনতার কঠিন লৌহশৃঙ্খল ॥

১৩.

বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা ?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা !
দিতে যদি হয় দে, মা, প্রসন্ন সহাস।
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস ?
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী,
'আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।'

পৃথিবীর মাটিতে শস্য ফলাতে হলে পর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে হয়। বিনা পরিশ্রমে পৃথিবীর মাটিতে ফসল ফলানো যায় না। এই পরিশ্রমই পৃথিবীর পূজা-উপচার। সেই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ মানুষ যে শস্য লাভ করে, তা তার কষ্টার্জিত সাধনার ধন, তা তার মহাগৌরবময় প্রাপ্তি।

বিশ্বের অকর্মণ্যের দল বিনা পরিশ্রমেই জীবনে সফলতা কামনা করে। কিন্তু পায় না। বিশ্বে সাফল্য লাভের পথ দুঃখ-বেদনা-কণ্টকিত। যে-কোন কর্মে সাফল্য কঠোর পরিশ্রমসাধ্য। এই পৃথিবী সংগ্রাম-ক্ষেত্র। বাঁচার জন্যে, সাফল্য লাভের জন্যে সব মানুষকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যমতো মানুষ পরিশ্রম করবে, পরিশ্রমকে হাতিয়ার করে সে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করবে —তাইই কাম্য। পৃথিবীতে যারা পরিশ্রমী, যারা উদ্যোগী, তারাই সৌভাগ্যলক্ষ্মীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনে সাফল্যের বিজয়মাল্য। আর, যারা অলস, কর্মবিমুখ, তারা নিঃসাড় কর্মহীনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চির-পরাজিতদের দলে স্থান করে নেয়; এবং জীবনে ব্যর্থতার বোঝা তোলে জমিয়ে। অবশেষে তারা বাঁচার তাগিদে ভিক্ষা-পাত্র হাতে তুলে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষা করে বেড়ায়। কিন্তু ভিক্ষার

দ্বারা কোনদিন দারিদ্র্য মোচন হয় না—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' আর, ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবনধারণের অবমাননার হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। সেই ঘৃণ্য ধিক্কৃত জীবন অত্যন্ত গ্লানিময়, বেদনাবহ। কাজেই, বিশ্বের কর্মভীরু শ্রম-পলাতকের দল, যারা পরিশ্রমকে ফাঁকি দিয়ে জীবনে সুখের স্বর্গলোকে পৌঁছতে চায়, তারা কিন্তু জীবনে সুখের মুখ দেখতে পায় না। নৈষ্কর্ম্য ও শ্রমবিমুখতার পরিণামে তাদের স্থান হয় চির-দুঃখের দুঃসহ নরককুণ্ডে॥

১৪. আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয়না কিছুই আলো।

ধূপের মধ্যে যেমন গন্ধ থাকে সুপ্ত, তেমনি দীপের মধ্যে আলো থাকে নিহিত। আগুনে ধূপকে দগ্ধ করলে তার গন্ধ প্রকাশিত হয়; দীপকে প্রজ্বলিত করলে তবেই সে আলো দান করে।

ধূপ বা দীপের ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশের জন্যে যেমন অগ্নিদহন প্রয়োজন, তেমনি মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে তার প্রতিভার নির্মল প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন দুঃখদহন। স্বাভাবিক গতানুগতিক জীবনযাপনের মধ্যে এক অসাড় চেতনাহীনতা মানুষকে গ্রাস করে। তখন তার অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা নিঃসাড় নিশ্চেতনার মধ্যে থাকে আচ্ছন্ন। আত্মপ্রকাশের সমস্ত সম্ভাবনা হারিয়ে তা এক কঠিন আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে। তখন জীবনে প্রয়োজন হয় কঠিন আঘাত, দুঃসহ দুঃখ। দুঃখের আঘাতে সেই কঠোর আবরণ হয় ভিন্ন, অন্তরের সুপ্ত শক্তির প্রকাশ-লগ্ন হয় আসন্ন। গতানুগতিক ক্লান্তিকর জীবনের সুখ ও আরামের কোলে লালিত জীবনে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি তাই প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না। ঠিক তখনই মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে দুঃখের দুঃসহ আঘাত। দুঃখের সুতীব্রদহনে সুখের ক্লান্তিকর অবসাদ পুড়ে ভস্মীভূত হয়, ভস্মীভূত হয় তার আরামের শয্যাতল। তখনই তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রতিভার জাগরণ সম্ভব হয়। আগুনের তীব্র দহনে সোনা খাদমুক্ত হয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। তেমনি দুঃখের দহনে মানুষের হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়, জীবনের নিঃসাড় নিশ্চেতনার কঠোর আবরণ ভস্মীভূত হয়ে হৃদয়কে খাঁটি সোনায় পরিণত করে। তার ফলে মানুষের প্রতিভার সার্বিক প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। কাজেই, জীবনে দুঃখ কাম্য। দুঃখ জীবনকে সাফল্যের গৌরব-মুকুট পরিয়ে তাকে ধন্য করে, তাকে সার্থক করে॥

১৫. বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মধ্যে স্বার্থপর জীবনযাপন মিথ্যা। পৃথিবীর বৃহৎ মানব-গোষ্ঠীর যে বিশাল সুখদুঃখের জীবন, তার সঙ্গে নিজেকে এবং নিজের সুখদুঃখকে সংযুক্ত করতে না পারলে মানুষের জীবনের সার্থকতা নেই।

বিপুলা এই পৃথিবী। সুবিশাল তার মানবগোষ্ঠী। অন্তহীন তাদের দুঃখবেদনা। মানুষের কত ব্যথা, কত কান্না পৃথিবীর বুকে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। বলদর্পীর হৃদয়হীন অত্যাচারে দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয় কত অসহায় মানবগোষ্ঠী। এইভাবে কত বীরের রক্তস্রোত, কত মাতার অশ্রুধারা ধরণীর ধূলায় ব্যর্থ হয়ে যায়। তবু মানব-ভাগ্যে ঘটে না নতুন আশ্বাসের সূর্যোদয়, অবসান ঘটে না তাদের অকথ্য দুঃখ-লাঞ্ছনার। আর, অন্যদিকে পৃথিবীর স্বার্থমগ্ন মানুষ সেই বিশাল জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বার্থপরতার স্বরচিত কারাগারে বন্দী করে রাখে। পাছে জগতের আর্ত-পীড়িতের ক্রন্দনধ্বনি তার সুখ-সম্ভোগের জীবনকে স্পর্শ করে, তাই সে তার স্বার্থ-সর্বস্বতার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে তার মধ্যে যাপন করে ঘৃণ্য ধিক্কৃত জীবন। কিন্তু তা জীবন নয়। তাতে নেই জীবনের মহত্ত্ব, নেই জীবনের গৌরব। স্বার্থসুখসর্বস্বতার এই গণ্ডীবদ্ধ জীবন যে মিথ্যা, ভ্রান্ত এবং নিষ্ফল, তা একদিন ক্লান্তিকর জীবনে উপলব্ধ হয়। তখন স্বার্থপরতার পাষাণ-প্রাচীর ভেঙে পড়ে, ভোগ-সুখসর্বস্বতার অলীক দুর্গ ধূলিসাৎ হয়। নতুন জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সে তখন বাইরের বিশ্বের অসীম মহাকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়। তার ক্লেদমালিন্যময় স্বার্থপর জীবনের বাইরে চলেছে মানুষের যে বিশাল শোভাযাত্রা, সেই মহাবিশ্বজীবনের ছন্দের সঙ্গে, জগতের বিশাল সুখদুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে যুক্ত করে দিয়ে সে লাভ করে জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ, খুঁজে পায় জীবনের চরম এবং পরম সফলতা ॥

১৬. হাউই কহিল, 'মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।'
কবি কহে, 'তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।'

হাউই ক্ষণজীবী। শক্তি তার সীমিত। অগ্নিসংযোগমাত্র হাউই পৃথিবীপৃষ্ঠ ছেড়ে আকাশের কিছু দূর উঠে যায়। তারপর নিঃশেষিত হয় তার অন্তর্নিহিত বারুদ। তখন ছাইয়ের আকারে তা নিপতিত হয় পৃথিবীপৃষ্ঠে। আর, আকাশের নক্ষত্র দীর্ঘস্থায়ী। সে স্থাপিত আকাশের সুদূর উর্ধ্বলোকে। সেখান থেকেই সে তার আলোর বাণী পৃথিবীতে পাঠায়। স্নিগ্ধ তার আলো, দীপ্তি তার প্রীতিময়। কিন্তু হাউইর জীবন ক্ষণিক হলেও প্রখর তার দীপ্তি, স্পর্ধাময় তার আলো। তার লক্ষ্য আকাশের সুদূরলোকের নক্ষত্রকে স্পর্শ করা এবং তার নিজস্ব ভস্ম দিয়ে নক্ষত্রের দীপ্তিময় মুখ কলঙ্কিত করা। কিন্তু তাতে নক্ষত্রের মুখ কলঙ্কিত হয় না। হাউইর ভস্ম তার পেছনে পেছনে ফিরে আসে পৃথিবীর মাটিতেই।

পৃথিবীর জ্ঞানী, গুণী, বরেণ্য মহাপুরুষেরা তাঁদের প্রতিভা ও মহত্ত্বের দীপ্তিতে

পৃথিবীকে আলোকিত করেন। যাঁরা প্রতিভাবান শিল্পী, তাঁদের বিচরণ ভাবের ঊর্ধ্বলোকে। বিশ্বের যাঁরা মহাজ্ঞানী, জ্ঞানের আলোকিত জগৎই তাঁদের বিচরণ-ভূমি। আর, যাঁরা মানবতার মহান্ পূজারী, বিশ্বপ্রীতির ঊর্ধ্বলোকেই তাঁদের প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতি বা বিশ্বপ্রেমে যিনি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, পৃথিবীর স্বল্পশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁদের শ্রেষ্ঠতা সহ্য করতে না পেরে তাঁদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। ঈর্ষাতুর, শত্রুমনোভাবাপন্ন সেই হীনমন্যের দল নিজেদের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তারা কোনদিনই শ্রেষ্ঠত্বের সেই সুদূরলোক স্পর্শ করতে পারবে না। তাই তারা নিন্দা ও কটূক্তিবর্ষণে মহাশিল্পী কিংবা মহাপুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্বকে কলঙ্কিত করবার অপচেষ্টা করে। কিন্তু সেই অপপ্রয়াস কোনদিনই সফল হয় না। তাতে তারা নিজেরাই কলঙ্কিত হয়, পৃথিবীর অপকীর্তির তালিকা বৃদ্ধি করে। মহাপুরুষদের দিব্য জ্যোতিকে তারা পারে না স্পর্শ করতে। নিন্দুকদের পেচকবৃত্তি কোনদিনই কালিমালিপ্ত করতে পারে না সেই সূর্যরশ্মিকে ॥

১৭. ‘কে লইবে মোর কার্য ?’ কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, ‘স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।’

সূর্য সারা দিনমান তার আলোর ঝরনাধারায় পৃথিবীকে করে অভিষিক্ত। ফলে, পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়। কিন্তু দিনের অবসানে সূর্য অস্তমিত হলে পৃথিবীতে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। তখন পৃথিবীর নৈশ অন্ধকার দূর করবার জন্যে কেউ এগিয়ে আসে না। শুধু পৃথিবীর কুটিরে-কুটিরে জ্বলে ওঠে মাটির প্রদীপ। সে তার সীমিত শক্তি নিয়ে পৃথিবীর নৈশ অন্ধকার দূরীকরণের জন্যে আসে এগিয়ে।

যুগে যুগে মানব-সভ্যতার ভাগ্যে যখনই অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে, যখন মানবাত্মার কাতর ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়, তখন এই মাটির পৃথিবীতে আবির্ভূত হন অবতারকল্প মহাপুরুষেরা। তাঁরা ব্যথিত মানবাত্মাকে শোনান নতুন আশা ও আশ্বাসের বাণী, আলোকের বাণী। হতাশায় ও নৈরাশ্যে তমসাচ্ছন্ন মানব-সমাজকে আলোর মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁরা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলেন। যুগে যুগে এইভাবে সভ্যতার সংকটময় মুহূর্তে মহামানবগণের ঘটেছে উদার আবির্ভাব। নিজেদের জীবন তিলে তিলে দান করে তাঁরা ক্রন্দনাতুর মানবজাতির দুঃখবেদনাভার দূর করে পৃথিবীকে শান্তিস্বর্গের ঠিকানা দিয়ে কর্মাবসানে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আবার ঘনিয়ে আসে সভ্যতার সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিন্তু মানব-প্রেমিক মহামানবের আলোকিত বাণী তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় না। তাঁদের ভক্ত-শিষ্য এবং অনুচরদের মধ্যে সেই আলোকিত মন্ত্র গুঞ্জরিত হতে থাকে। তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য যতই ক্ষীণ হোক,

যতই দুর্বল হোক তাঁদের কণ্ঠস্বর, তবু মহামানবদের আরব্ধ কার্যকে সফলতা দানের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন। ভগবান বুদ্ধের দেহাবসানের পর তাঁর অমৃতময় বাণী পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়নি, যীশুখ্রীস্টের প্রাণদানের পর তাঁর অসংখ্য ভক্ত পৃথিবীতে তাঁর আলোকিত বাণী প্রচার করেছেন। এইভাবে মহাপুরুষদের তিরোধানের পরেও তাঁদের অমর বাণী চিরনীরব হয়ে যায় নি, তাঁদের বাণী উত্তরকালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে পৃথিবীকে আলোকিত স্বর্গলোকের ঠিকানা দিয়ে বহুদিন মানব-সভ্যতার অন্ধকার দূর করেছে॥

১৮. পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোনো ছুতা,
'জান না? আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।'

দিবসের সূর্যালোক অন্ধকারের কোটরবাসী পেঁচার অসহ্য। তাই সে দিবালোকে কোটরের অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এটা তার দুর্বলতা। তার সেই দুর্বলতা গোপন করবার জন্যে সে প্রচার করে যে, সূর্যের সঙ্গে তার চির-শত্রুতা।

পৃথিবীর মানব-সভ্যতার যাঁরা পরম বন্ধু, যাঁরা তাদের জীবন তিল তিল দান করে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছেন, তাঁরা সূর্যের মতো হিতৈষী, মানবতার উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। কিন্তু এই পৃথিবীতে তেমন মহাপুরুষের সংখ্যা কত? আর, আমাদের চারদিকে যে সংখ্যাতীত মানুষের ভিড়, তাদের অধিকাংশই খল, কুটিল এবং নীচমনা। তাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাদের চিন্তাধারা অন্ধকালিমালিপ্ত তাদের কার্যকলাপ অন্ধকারের মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। সেই স্বার্থান্বেষী, কপটাচারী, ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিরা মহতের মহত্ব সহ্য করতে পারে না। তারা তাদের হৃদয়, মন ও কার্য-কলাপের অন্ধকার দিয়ে মহাপুরুষদের আলোকিত কীর্তিকে কালিমালিপ্ত করে এক পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠতে চায়। তাই তো অকারণে তারা মহাপুরুষদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে পৃথিবীকে অন্ধকারের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে চায়। আলোর সঙ্গে যেমন অন্ধকারের শত্রুতা, ভালোর সঙ্গে যেমন মন্দের চির-বৈরীভাব, তেমনি মানব-সভ্যতার চিরমিত্রদের সঙ্গে সভ্যতার চিরশত্রুদের চিরশত্রুতা। এই শত্রুতা নিতান্তই সহজাত প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ। কিন্তু পৃথিবীর উদারচরিত মহামানবদের উজ্জ্বল উপস্থিতির সম্মুখীন হবার মতো শক্তি তাদের থাকে না। তাই যথাসাধ্য দূরত্ব বজায় রেখে তারা মহাপুরুষদের নিন্দায়, সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তারা নিঃসন্দেহে মানবতার শত্রু, সভ্যতার চির-কলঙ্কস্বরূপ॥

১৯. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

মানুষের চালচলনে ও আচার-ব্যবহারে—এক কথায়, মানুষের চরিত্র-বিচারে মানব-সমাজকে তিনটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়: উত্তম, মধ্যম ও অধম।

উত্তমের চারিত্রিক পরিচয় হলো, সে শ্রেষ্ঠ; অধমের চারিত্রিক পরিচয়—সর্ব-বিষয়ে সে নিকৃষ্ট। কিন্তু যত গোলমাল মধ্যমকে নিয়ে। উত্তম এবং অধমের শ্রেণী-চরিত্র সুস্পষ্ট; তাতে কোনরূপ ভ্রান্তি-প্রমাদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মধ্যমের শ্রেণী-চরিত্র বড়ই রহস্যময়। তার সুস্পষ্ট পরিচয় জানার উপায় নেই; তাই তার কাছে পদে পদে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর যে-সব মানুষ তাঁদের হৃদয়ের মহত্ত্বে, উদারতায় এবং দুর্লভ চরিত্র-সুষমায় বিশ্বকে মুগ্ধ করেছেন, তাঁরা মানবজাতির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে তাদের হৃদয়ের সিংহাসনে চির-প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। মানুষ নির্দ্বিধভাবে তাঁদের পদতলে রাখে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভক্তি-শ্রদ্ধার নির্মাল্য। তাঁরা মানুষের পরমাত্মীয়। মানুষের দুঃখমোচনের ব্রতে নিজেদের যথাসর্বস্ব, এমন-কি প্রাণ পর্যন্ত দান করে তাঁরা মানব-হিতৈষণার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। অন্যদিকে, যারা খল, কপট এবং মানবতার শত্রু, তাদের সম্বন্ধেও বিশ্ববাসীর মনে কোন সংশয় থাকে না। তারা আলোকের বিপরীত মেরুর অধিবাসী। তাদের নীচতা, ক্রূরতা এবং হীনমন্যতা সম্পর্কে পৃথিবী সচেতন। তাদের চালচলন, রীতিনীতি এবং কথায়-বার্তায় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সুচিহ্নিত; সুতরাং তাদের সম্বন্ধে প্রতারিত হবার কোন সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় মধ্যপন্থীদের নিয়ে। তাদের যেমন শ্রেণীচরিত্র সুস্পষ্ট নয়, তেমনি তাদের চালচলন, রীতিনীতি বড়ই রহস্যাবৃত। তারা শ্রেষ্ঠ মহামানবদের মতো মানবতার পরমাত্মীয় নয়; তারা নীচ, ঘৃণ্য, নরাধমদের মতো মানবতার শত্রুরূপে চিহ্নিতও নয়; তারা ছদ্মবেশী, স্বার্থপর সুবিধাবাদীর দল। তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কখনো ধারণ করে উত্তমের ছদ্মবেশ, কখনো ধারণ করে অধমের বেশবাস। তাই পৃথিবীতে তাদের দ্বারা পদে পদে প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। তাদের সম্পর্কে মানুষকে সদা-সতর্ক থাকতে হয়। তারা সর্বদেশের সর্বকালের বিশ্বাসঘাতক॥

২০. যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি হে, জানি, তাও হয়নি হারা॥

পৃথিবীর কত ফুল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার আগেই অকালে ঝরে পড়ে। পৃথিবীর কত নদী গিরিকন্দর ত্যাগ করে মহাসমুদ্রের পথে যাত্রা করে; কিন্তু অর্ধপথে উত্তপ্ত মরুবালু-রাশির সীমাহীন ব্যাপ্তিতে হারিয়ে ফেলে তাদের উচ্ছল স্রোতোধারা। এই-যে অকালে-ঝরে-যাওয়া অর্ধস্ফুট কুসুম কিংবা অর্ধপথে বিলুপ্ত নদী—এরা কি ব্যর্থ? আপাতদৃষ্টিতে এদের ব্যর্থ মনে হলেও আসলে এরা ব্যর্থ নয়।

এই পৃথিবীতে কোন কিছুর বিনাশ নেই, ধ্বংস নেই। আপাতদৃষ্টিতে যা ধ্বংস, বিনাশ বা মৃত্যু, তা রূপান্তর মাত্র। বিশ্ব-চরাচরে কোন কিছুই ধ্বংস হয় না, বিনষ্ট হয় না। খণ্ডিত দৃষ্টিতে মানুষ বিশ্বের রূপ-রূপান্তরের লীলাকে ধ্বংস, বিনাশ কিংবা মৃত্যু মনে করে ব্যথা পায়, শোক প্রকাশ করে। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে যদি

বিশ্ব-চরাচরকে দেখা যায়, তাহলে উপলব্ধ হবে—যা ধ্বংস, তা আসলে ধ্বংস নয়; যা বিনাশ, তা প্রকৃতপক্ষে বিনাশ নয় এবং যা মৃত্যু, তা আসলে মৃত্যু নয়—রূপান্তর মাত্র। সৃষ্টির মধ্যে যে রূপ-রূপান্তর প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে, তার মূলে আছে সৃষ্টির অপূর্ণতা। তাই অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দানের জন্যে মহা-প্রকৃতির সৃষ্টিশালায় চলেছে নিত্যনতুন ভাঙাগড়ার লীলা। কাজেই, সেই ভাঙাগড়ার চিরন্তন লীলায় যাকে বিনাশ, ধ্বংস বা মৃত্যু বলে মনে হয়, তা আসলে নতুন সৃষ্টিরই পূর্বাভাস। সুতরাং যা আপাত-ব্যর্থতা, তা মূলতঃ ব্যর্থতা নয়; তা বৃহৎ সাফল্যের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এই মহাবিশ্বে কোন কিছুরই লয় নেই, মৃত্যু নেই—সবই কেবল রূপ-রূপান্তরের লীলা। অথচ মানুষ তার অজ্ঞানতার জন্যে, তার মূঢ়তার জন্যে এই মহা-সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। এবং পারে না বলেই দুঃখে, শোকে কাতর হয়, বেদনায় হাহাকার করে কেঁদে ওঠে॥

অনুসরণী

১. কেন্দ্রীয় ভাবটি সম্প্রসারিত কর:

ক. পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না।

খ. প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামাগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
'ধিক্ ধিক্' করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই।'

গ. দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

ঘ. জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে, জীবন-নদে?

ঙ. সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

চ. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

২. ভাব-বিস্তার কর:

ক. রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা।
সূর্য নাহি ফিরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা॥

খ. চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

গ. বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে।

ঘ. হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।

ঙ. সবার উপরে মানুষ সত্য, স্রষ্টা আছে কি নাই।

চ. দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

ছ. দয়া বলে, 'কে গো তুমি মুখে নাই কথা ?'
অশ্রুভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা।'

৩. ভাবার্থ সম্প্রসারিত কর :

ক. ভাবে শিশু বড় হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।
বড় হলে খেলা যত ঢেলা বলি মানে,
দুই হাত তুলে চায় ধনজন-পানে।

খ. তৃষিত গর্দভ গেল সরোবর-তীরে,
ছি ছি কালো জল, বলি চলে এলো ফিরে।
কহে জল, জল কালো জানে সব গাধা
যে জন অধিক জানে বলে জল শাদা !

গ. জাল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর।'
জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

ঘ. এই পৃথিবীতে যে একা, সেই-ই ক্ষুদ্র, সে সামান্য।

ঙ. নর কহে, 'ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,
চিরকাল পড়ে র'লি চরণের নীচে।'
ধূলিকণা কহে, 'ভাই কেন কর ঘৃণা
তোমার দেহের আমি পরিণাম কিনা ?'

চ. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান,
কণ্টক মুকুট-শোভা।

৪. মর্মার্থ সম্প্রসারিত কর :

ক. বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মউচাক
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক ?
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচ দেখে যাই।

খ. সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সংকটের কল্পনাতে হয়োনা ম্রিয়মাণ
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।

গ. মেঘ বলে, 'সিন্ধু, তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নারো একবিন্দু জল।'
সিন্ধু কহে, 'পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হবে পড়িলে এ বুকে।'

ঘ. জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের হোক যত অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

ঙ. শেফালি কহিল, আমি ঝরিলাম, তারা।
তারা কহে, আমারো তো হল কাজ সারা,—
ভরিলাম রজনীর বিদায়ের ডালি
আকাশের তারা আর বনের শেফালি।

চ. মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।

ছ. ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

———

প্রবন্ধ বিচিন্তা

পত্র-রচনা

"কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ॥"
—রবীন্দ্রনাথ

Syllabus

Letter-Writing :

- Commercial,
- Social, and
- Personal.

প্রবন্ধ বিচিন্তা

"আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে বিদেশে এই-যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পত্র-রচনা

চিঠিপত্র হলো মানুষের সভ্যতার প্রতীক। মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল, যখন সভ্যতার আলো বিকশিত হয়নি, তখন পত্র-রচনার রীতিও ছিল না। কিন্তু ক্রমে মানুষ সভ্য হলো। সে ধীরে ধীরে তার হৃদয়-মনের ভাব-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ভাষা সৃষ্টি করলো। সেই ভাষা প্রাথমিক স্তরে ছিল পারস্পরিক ভাববিনিময়ের বাহন। কিন্তু এমন অনেক ভাব আছে, যা শ্রোতার উপস্থিতিতে প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া, মানুষ দূরের মানুষকে তার ভাব এবং প্রয়োজনের কথা নিবেদন করতে চায়। এই প্রয়োজনের তাগিদ থেকেই পত্র-রচনার উদ্ভব।

প্রস্তাবনা

সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিঠিপত্রের রূপের আদল বা কাঠামো পরিবর্তিত হতে লাগলো। কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদির আবিষ্কার, সেই সঙ্গে ডাকের প্রচলন ইত্যাদি পত্র-রচনার রীতি-প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনকে সাহায্য করেছে। তাই অতীতের পত্র-রচনার রীতি-প্রকৃতির সঙ্গে বর্তমানকালের পত্র-রচনার রীতি-প্রকৃতি মেলে না। সেদিনের চিঠিপত্রে উপকরণের দৈন্য ছিল যেমন প্রকট, তেমনি ভাষা, ভাবনা ও আঙ্গিক-প্রকরণও ছিল কুণ্ঠিত। যুগে যুগে চিঠিপত্রের পুরাতন উপকরণ পরিত্যক্ত হয়ে নতুন উপকরণ গৃহীত হয়েছে ; তেমনি নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নানাকালের ভাষা, ভাবনা ও আঙ্গিক-কৌশলও পরিবর্তিত হয়ে নতুন কালের উপযোগী হয়ে উঠেছে।

কালের বিবর্তন-পথে পত্র-রচনা-রীতি

বর্তমানকালে পরস্পরকে চিঠি-লেখা বা পত্র-বিনিময় সুসভ্য সমাজের একটি অত্যন্ত সৌজন্যমূলক, দায়িত্বপূর্ণ রীতি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের দায়িত্বশীল পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গের কাছে নানা কারণে, নানা উপলক্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া, অর্থশাসিত ও বাণিজ্য-নির্ভর বর্তমানকালের সমাজে মানুষকে নানা প্রয়োজনে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বা সরকারী কার্যালয়ের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করতে হয়। এই হিসেবে উচ্চ-মাধ্যমিক

পত্রের শ্রেণী-বিন্যাস

বাংলার [প্রথম ভাষা] পাঠ-সূচীতে তিন রকমের পত্র-রচনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে : এক. বাণিজ্যিক পত্র [Commercial letters], দুই. সামাজিক পত্র [Social letters] এবং তিন. ব্যক্তিগত পত্র [Personal letters]।

বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে যে-সব পত্র রচিত হয়, তাদের বলা হয় বাণিজ্যিক পত্র। চাকরি, পণ্য-ক্রয়-বিক্রয় বা আর্থিক লেনদেনই এই জাতীয় পত্রের মূল লক্ষ্য। কিন্তু মানুষ সেই সঙ্গে সামাজিক জীব। সমাজের নানা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বা নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যে সমাজবদ্ধ মানুষকে পত্র রচনা করতে হয়। এই জাতীয় পত্রকে বলা হয় সামাজিক পত্র। কিন্তু সর্বোপরি মানুষের যে পরিচয়, তা হলো তার ব্যক্তি-পরিচয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ তার পরিবারের এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়বর্গ বা সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে নানা সম্পর্কে যুক্ত। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিবারস্থ বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তাকে পত্রালাপ করতে হয়। এই জাতীয় পত্রকে বলা হয় ব্যক্তিগত পত্র।

বাণিজ্যিক পত্র, সামাজিক পত্র ও ব্যক্তিগত পত্র

'প্রবন্ধ বিচিন্তা'র 'পত্র-রচনা' অংশে তিন প্রকারের পত্রই সন্নিবেশিত হলো। এই তিন প্রকারের পত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশেষ আঙ্গিক বা form এবং সেই সঙ্গে আদর্শ পত্র কি রকম হওয়া উচিত, তার নমুনাও এই অংশে প্রদত্ত হয়েছে। পর্যাপ্ত পত্রাদর্শ সংযোজনের উদ্দেশ্য হলো : বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন আঙ্গিকের পত্র-রচনায় ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করা। তাছাড়া, 'অনুসরণী' অংশে স্বনির্ভরভাবে অনুরূপ ধাঁচের পত্রাবলী রচনায় তাদের উৎসাহিত করবার জন্যে বহু অনুসারী পত্র-রচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করি, ছাত্র-ছাত্রীরা তিন প্রকার পত্রের বিভিন্ন পত্রাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্ব স্ব প্রস্তুতিকে সমৃদ্ধ করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করবে ॥

শেষ কথা

বাণিজ্যিক পত্র

ব্যবসায়ী-মাত্রই জানেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে পত্রের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনে যেমন, তেমনি ব্যবসায়িক জীবনেও পত্র-রচনার মূল্য অসামান্য। বাণিজ্যিক পত্র একটু স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এইজন্যে যে, বাণিজ্যিক পত্রে ব্যক্তিগত পত্রের মতো আবেগ-উচ্ছ্বাসের স্থান নেই, কল্পনার অতিরঞ্জন নেই, মহৎ শিল্প-সৃষ্টির তাগিদও নেই। বাণিজ্যিক পত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো বৈষয়িক বিষয়ের কারবারী এবং সেইজন্যে অত্যন্ত বাস্তব পথের পথিক। বাণিজ্যিক পত্র, বলাবাহুল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরেই রচিত হয়ে থাকে। সেজন্যে বাণিজ্যিক পত্রের ভাষা ও ভঙ্গি হবে যথাসম্ভব সহজ, সরল এবং তার পেছনে থাকবে যুক্তিনিষ্ঠতার একটা সুদৃঢ় কাঠামো। আর থাকবে একটি মার্জিত সৌজন্যবোধ। বাণিজ্যিক পত্রে শিল্প বা কারিগরি বলতে ঐটুকুই; তার বেশী নয়।

বাণিজ্যিক পত্রের বৈশিষ্ট্য

বাণিজ্যিক পত্র ছাড়া বর্তমান কালের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল। বাণিজ্য পারস্পরিক লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল এবং বাণিজ্যকে সাহায্য করবার জন্যে এসেছে বাণিজ্যিক পত্র। প্রাচীনকালের বাণিজ্যের প্রকৃতি ছিল সহজ ও সরল। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের মধ্যেই তা ছিল সীমাবদ্ধ। অতীতে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনায়াসে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে চুক্তিভঙ্গ হতে পারতো; কিন্তু বর্তমান কালে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের প্রাক্কালে যে চিঠিপত্রের বিনিময় হয়, সেগুলি অনেকাংশে চুক্তিপত্রের কাজ করে থাকে। সেইগুলিই ব্যবসা-বাণিজ্যের দলিলরূপে গণ্য হয়।

বাণিজ্যিক পত্রের গুরুত্ব

বাণিজ্যিক পত্রের দ্বারা সুবিধে হয়েছে অনেক। আগে, বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেনের জন্যে পরস্পরকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে হতো। তাতে সময় ও সামর্থ্যের প্রশ্ন জড়িত থাকতো। বাণিজ্যিক পত্র এসব অসুবিধে দূর করেছে। প্রত্যক্ষ আলোচনার সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ [Point] বাদ পড়ে যেতে পারে; যুক্তিসজ্জা দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং ভাষা প্রতারণা করতে পারে। কিন্তু স্নায়ুর [nerve] ওপর অত্যধিক চাপ না থাকায় পত্র-রচনায় এই সব ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে কম। সেদিক থেকে বাণিজ্যিক পত্র বহু অবাঞ্ছিত ঘটনা, আড়ষ্টতা এবং সংকোচের হাত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নিঃসন্দেহে রক্ষা করেছে।

বাণিজ্যিক পত্রের সুবিধা

বর্তমান কালের বাণিজ্যের আছে দুটি ব্যবহারিক রূপ : এক. তার ঘরোয়া রূপ ; দুই. তার আন্তর্জাতিক রূপ। আমাদের বাণিজ্যিক পত্রেরও আছে তেমনি দুটি স্বতন্ত্র রূপ : ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক। এতদিন দালালী, মহাজনী কারবার ও জমিদারী সেরেস্তার যাবতীয় চিঠিপত্র ঘরোয়া রীতিতেই লিখিত হয়ে এসেছে। এখনও দোকানের আদায়-বাকি, বেচাকেনা, দলিল-দস্তাবেজ, সম্পত্তি-বেচাকেনা—সবই সেই রীতিতেই চলে। আংশিক সংস্কৃত, আংশিক ফারসী, আংশিক বাংলা—এই তিন-মিশেলি ভাষায় সেই রীতি গঠিত। এখনও গ্রাম-বাংলার কোর্টকাছারিতে, মহাজনী কারবারে এবং শহরের সোনা-রূপা ও মুদির দোকানে 'সেই tradition সমানে চলেছে।'

দুই রূপ :

আধুনিক বাংলায় বাণিজ্যিক পত্রের রীতি কেমন হওয়া উচিত ? মনে রাখতে হবে, বর্তমান কাল নিতান্তই আধুনিক কাল। বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যও বর্তমান কালে চলছে আধুনিক রীতিতে। কাজেই, তার বাণিজ্যিক চিঠিপত্রও আধুনিক রীতিতে লিখিত হওয়া উচিত। প্রাচীন ও আধুনিক—এই উভয় মতের টানাপোড়েনের মাঝখানে আমাদের অভিমত হলো : উভয় রীতির মধ্যে আপস-রফা করে একটা সর্বজনগ্রাহ্য যুগোপযোগী আধুনিক রীতি গড়ে তোলা যায়। এই মধ্যপন্থাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই পন্থাই দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

মধ্যপন্থা

॥ বাণিজ্যিক পত্রের বৈশিষ্ট্য ॥

বাণিজ্যিক পত্রের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য সহজেই সকলের চোখে পড়ে, তা হলো : তার **সংক্ষিপ্ততা** [brevity]। বাণিজ্যিক পত্রে ভাবাবেগের অনধিকার প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তার কারণ অনেক। বর্তমান ব্যস্ততার যুগে বাণিজ্যিক পত্রের সংক্ষিপ্ততা একান্তভাবে কাম্য। তাছাড়া, বেশী কথা লিখতে গেলে বাণিজ্যের বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে বা আইনগত নানা ফাঁক-ফোকর থেকে যেতে পারে। আবার, বহু অনাবশ্যক কথার ভিড়ে আসল কথাটিই চাপা পড়ে যাওয়া সম্ভব। তাতে বাণিজ্যিক পত্র-রচনার মূল লক্ষ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। কাজেই, পত্রের প্রয়োজনীয় সব কথার জন্যে পত্রের কলেবর যত বড় করা দরকার, বাণিজ্যিক পত্র ঠিক তত বড়ই হবে। তবে পরীক্ষার উত্তর-পত্রের এক পৃষ্ঠার মধ্যে পত্রের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে তা দেখতে সুঠাম ও শিল্প-সুন্দর হবে।

এক. সংক্ষিপ্ততা

বাণিজ্যিক পত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো : তার **ভাষার স্পষ্টতা** [clarity]। যে-সব বাক্যের অর্থ একাধিক বা অস্পষ্ট, সে সব বাক্য বাণিজ্যিক পত্রে ব্যবহার করা অনুচিত। কারণ, সে রকম ক্ষেত্রে পত্র-লেখক লিখলেন এক অর্থে, পত্র-প্রাপক বুঝলেন অন্য অর্থটি—তাতে ভুল-বোঝাবুঝির প্রচুর অবকাশ থেকে যায়। এই ভুল-বোঝাবুঝির পরিণামে অনেক সময় বাণিজ্যের সর্বনাশ

দুই. ভাষার স্পষ্টতা

ঘটতে পারে। কাজেই, বাণিজ্যিক পত্রে কোন বাক্য ব্যবহার করার আগে ওটি একটু ভেবে নেওয়া ভালো।

বাণিজ্যিক পত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো: **ভাষার সারল্য** [simplicity]। সরল ভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ ভঙ্গি। দুর্বোধ্য শব্দ-যোজনা, আভিধানিক শব্দের ব্যবহার, কাব্যিক বর্ণনা বা ভাষার ফুলঝুরি জ্বালাবার স্থান বাণিজ্যিক পত্র নয়। অর্থযুক্ত শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা একটা সহজ, সাবলীল, ঋজু পত্র-লিখন-ভঙ্গি গড়ে তোলা যায়। অবশ্য, সেজন্যে চাই অধ্যবসায়। পারতপক্ষে, দীর্ঘ জটিল বা যৌগিক বাক্য পরিহার করা উচিত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল বাক্য পত্র-লেখকের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

তিন. ভাষার সারল্য

বাণিজ্যিক পত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো: **বাক্যের সংলগ্নতা**। কেবল শব্দ-যোজনা বা বাক্য-যোজনার দ্বারা উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্র লেখা যায় না। বাক্যগুলির মধ্যে পারম্পর্য রক্ষিত হওয়াও উচিত। শিথিল-বন্ধ বাক্য-বিন্যাস বক্তব্যকে দুর্বল করে দেয়। অনেক সময় বক্তব্য সংক্ষেপে লিখতে গিয়ে 'টেলিগ্রাফিক' বাক্যের মতো অনেকগুলি অসংলগ্ন বা খাপছাড়া বাক্যের সমাবেশ ঘটানো হয়। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ হয় বেশী। আবার, অনেক সময় বক্তব্যটিকে প্রকাশ করার জন্যে একই কথার পুনরুক্তি ঘটানো হয়। তাতেও বাণিজ্যিক পত্রের স্বার্থহানি ঘটে। কাজেই, বক্তব্যটিকে লেখার আগে মনে মনে ভালো করে ভেবে নিয়ে পারম্পর্যক্রমে সাজিয়ে নিলে ভালো হয়। প্রস্তুতিপর্বে পত্রটির একটি খসড়া [drafting] করে নিতে পারলে আরো ভালো হয়।

চার. চিন্তার সংলগ্নতা

বাণিজ্যিক পত্রের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো: **সৌজন্যবোধ** [courtesy]। 'Courtesy costs nothing.'—সৌজন্য প্রকাশের জন্যে কোনো রকম অর্থ ব্যয় করতে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাস্তব দেনা-পাওনার দিকটা অত্যন্ত প্রকট। কাজেই, সৌজন্যবোধ দিয়ে সেই অতি-প্রকট দিকটা আবৃত করে বাণিজ্যিক পত্র রচনা করতে হয়। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে সব চেয়ে বড়ো কথা হলো, পারস্পরিক সদিচ্ছা [goodwill]; তাই-ই ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বড়ো মূলধন। কাজেই, মার্জিত সৌজন্যবোধ উৎকৃষ্ট বাণিজ্যিক পত্রের একটি বিশেষ গুণ।

পাঁচ. সৌজন্যবোধ

বাণিজ্যিক পত্রের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো: **অকপটতা** [sincerity]। অকপটতা ব্যবসায়ীদের একটি বড়ো গুণ। বাণিজ্যিক পত্রেও এই গুণটি প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া বা ভুলকে নির্ভুল বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পরিহার করা উচিত। কারণ, সত্য সত্যই। তা একদিন প্রকাশিত হবেই এবং তার ফলে ব্যবসায়ীর বাণিজ্যিক সুনাম ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। বাণিজ্যিক সুনাম একবার নষ্ট হলে আর তা ফিরে পাওয়া যায় না। সেজন্যে বাণিজ্যিক পত্রের ভাষাও হবে অকপট ও নিরলংকার।

ছয়. অকপটতা

বাণিজ্যিক পত্রের সপ্তম বৈশিষ্ট্য হলো : **নির্দিষ্টতা বা নিশ্চয়তা** [Precision or Exactness]। বাণিজ্যিক পত্রের বক্তব্য সর্বদা সুনির্দিষ্ট বা সুনিশ্চিত ভাবে ব্যক্ত

সাত. নির্দিষ্টতা

হওয়া উচিত। মহাভারতে দ্রোণাচার্যের সমীপে পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্র-পরীক্ষাদানের সময় অর্জুন যেমন নীলকণ্ঠ পাখির কণ্ঠটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখেনি, তেমনি বাণিজ্যিক পত্র-লেখকের ভাষা এবং তার ব্যবহার হবে লক্ষ্যের প্রতি অনন্য-দৃষ্টি ও অব্যর্থ।

বাণিজ্যিক পত্রের আর একটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হলো : তার **পরিচ্ছন্নতা** [Neatness]। পরিচ্ছন্নতা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বহন করে এবং পত্র-লেখকের চারিত্রিক

আট. পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্নতার স্বাক্ষর রাখে। যাতে কাটাকুটি না হয়, কালি বেশী না পড়ে—পরীক্ষার উত্তর-পত্রে এসব বিষয়ে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, পরিচ্ছন্নতা সর্বাগ্রে পুরস্কৃত হয়।

বাণিজ্যিক পত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো আঙ্গিক বা Form. বাণিজ্যিক পত্রের আছে নির্দিষ্ট আঙ্গিক। আবার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাণিজ্যিক পত্রের

নয়. আঙ্গিক

আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আঙ্গিক। সেই আঙ্গিক অনুসৃত না হলে বাণিজ্যিক পত্র ত্রুটিযুক্ত বলে পরিগণিত হবে। কাজেই, বাণিজ্যিক পত্রের form-গুলি আগে শিখে নিতে হবে।

বাণিজ্যিক পত্রের যে বৈশিষ্ট্যটি তার উৎকর্ষের পরিচায়ক, তা হলো তার আকর্ষণীয় রূপ [Attractive appearance]। পরিচ্ছন্নতা ছাড়া চাই ভালো কাগজ, শিল্পসম্মতরূপে

দশ. আকর্ষণীয় রূপ

মুদ্রিত শিরোনামা, আনুপাতিক মার্জিন এবং একটি সুদৃশ্য আকৃতি [Frame]। মুদ্রলিখিত [typed] হলে প্রতিটি অক্ষরের চাপও সম-ওজনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাতে-লেখা হলে অক্ষরগুলি সুন্দর এবং লাইনগুলি সোজা হওয়া চাই।

বাণিজ্যিক পত্রের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হলো : তার বিশিষ্ট **লেখন-ভঙ্গি** [Style]। ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্টাইল', সেই লেখন-ভঙ্গি বাণিজ্যিক পত্র-লেখককে ক্রমাগত

এগারো. লেখন-ভঙ্গি

অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করতে হবে। 'Style is the Man.'—লেখন-ভঙ্গিতে পত্র-লেখকের বিশিষ্ট চরিত্রটি থাকে মুদ্রিত। বিশিষ্ট লেখন-ভঙ্গির গুণে বাণিজ্যিক পত্র-রচনায় কেউ-কেউ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হন।

পরিশেষে একটি কথা। বাণিজ্যিক পত্রেও বানানের ভুল এবং ব্যাকরণগত ত্রুটি অমার্জনীয়। তাছাড়া, প্রসঙ্গ [Points]-অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে ভাগ করে বাণিজ্যিক পত্র লেখা উচিত।

বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো

বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুগ যুগ ধরে গ্রহণ-বর্জন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তার কাঠামোটি সুনির্দিষ্টরূপে গড়ে উঠেছে এবং অবশেষে তা স্বীকৃতি লাভ করেছে। কাজেই, বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামোটি সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, পরীক্ষায় কাঠামোটির নির্ভুলতার জন্যে কিছু নম্বর বরাদ্দ করা থাকে। শুদ্ধরূপে তা লিখতে পারলে পুরো নম্বরটিই পাওয়া যায়। কাঠামোটিকে পারম্পর্য-অনুসারে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। যেমন :

বাণিজ্যিক পত্রের বিভিন্ন অংশ

এক. শিরোনামা [Letter-head] ;

দুই. অন্তর্বর্তী ঠিকানা [Inner address] ;

তিন. অভিবাদন [Address] ;

চার. বিষয়বস্তু [Matter or body of the letter] ;

পাঁচ. বিদায়-সম্ভাষণ ;

ছয়. স্বাক্ষর [Signature] ;

সাত. ক্রোড়পত্র [Enclosure]।

বাণিজ্যিক পত্রে শিরোনামার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অংশে পত্র-লেখকের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নাম, বিশেষ পরিচিতি, ঠিকানা, তারিখ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন নং, কোড্ নং, লাইসেন্স নং, আমদানি-লাইসেন্স নং [আমদানির ব্যাপারে], রপ্তানি-লাইসেন্স নং [রপ্তানির ব্যাপারে], পত্র-সংখ্যা, পূর্ব-সূত্র ও বিষয়—এই কয়টি প্রসঙ্গের উল্লেখ একান্তভাবে আবশ্যিক। চিঠির কাগজের শিরোদেশের ঠিক মধ্যস্থলে পত্র-লেখকের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নাম এবং তার ঠিক নীচেই তার বিশেষ ব্যবসায়িক পরিচয় লিখিত থাকবে। তার নীচে ডান প্রান্তে লেখা থাকবে ঠিকানা এবং তার নীচে তারিখ। ঠিকানার সমান উঁচুতে চিঠির কাগজের বাম প্রান্তে পর-পর, নীচে-নীচে থাকবে টেলিগ্রাম, টেলিফোন নং, কোড্ নং এবং আবশ্যক-বোধে আমদানি-লাইসেন্স নং বা রপ্তানি-লাইসেন্স নং [প্রয়োজনমতো]। তার নীচে একটু ফাঁক দিয়ে ঠিক মধ্যস্থলে থাকবে পূর্ব-সূত্র [Reference No.] এবং তার নীচে পত্র-সংখ্যা [Letter No.] ও তার বেশ কিছুটা নীচে—বিষয় [Subject]। এই অংশে যে ভুলগুলি সাধারণতঃ হয়ে থাকে : এক. প্রয়োজনীয় সবগুলি অংশ উল্লিখিত হয় না। দুই. পারম্পর্য রক্ষিত হয় না ; অর্থাৎ, কোন্‌টা আগে এবং কোন্‌টা পরে বসবে, ঠিকমতো না জেনে ইচ্ছেমতো বসিয়ে ভুল করা হয়।

এক. শিরোনামা

পরপৃষ্ঠায় শিরোনামার আদর্শ নমুনাটি অবশ্যই দ্রষ্টব্য :

ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স
[প্রখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : 'পুস্তক'
টেলিফোন : ৩৪-৮৬৪৪
কোড্ নং............
আমদানি-লাইসেন্স নং— বা রপ্তানি-লাইসেন্স নং— [প্রয়োজন হলে]

১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা : ৯
৮ই আগস্ট, ১৯৭৯

পূর্ব-সূত্র : অ/৫২/৭৯
পত্র-সংখ্যা : ক/৩০০১/৭৯
বিষয় : ফরমাস-স্বীকৃতি

এই শিরোনামা বা Letter-head অংশটি সাধারণতঃ 'প্যাডে'র শীর্ষদেশে মুদ্রিত থাকে। কিন্তু পরীক্ষার উত্তর-পত্রের পাতায় অবশ্য এই Letter-head অংশটি রচনা করে নিতে হবে। কিন্তু পত্র-শীর্ষে 'শ্রীশ্রীহরি শরণম্', 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়', '৺কালীমাতা সহায়', 'গণেশায় নমঃ' বা 'ওঁ' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহার অনাবশ্যক এবং সেই হেতু পরিত্যাজ্য। সেই সঙ্গে বাংলার সাল-তারিখের উল্লেখও বর্জনীয়। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্তমান কালে ইংরেজি সাল-তারিখ অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে। তারিখ ইংরেজি হলেও তা বাংলা হরপে লিখতে হবে।

এই অংশে যে ভুলটি সচরাচর ঘটে থাকে, তা হলো : সব কটি প্রসঙ্গ অনেক সময় উল্লিখিত হয় না। কখনো কখনো তাদের স্থাননির্দেশও যথাযথ হয় না। বিশেষ করে, ঠিকানা এবং তার নীচে তারিখ-উল্লেখের ভুল অধিকাংশ চিঠিতেই হয়ে থাকে। কাজেই, এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।

শিরোনামার পরবর্তী অংশ হলো অন্তর্বর্তী ঠিকানা [Inner address]। অর্থাৎ,

দুই. অন্তর্বর্তী ঠিকানা

পত্র-প্রাপকের ঠিকানা। এই অংশটি শিরোনামার নীচে বাম প্রান্তে লিখিত হওয়া উচিত। অন্তর্বর্তী ঠিকানা লিখতে হবে নীচের মতো :

পিপ্‌ল্‌স পাব্‌লিশিং হাউস
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্গ
নয়াদিল্লী : ১

তারপর অভিবাদন। বাংলায় অভিবাদনের রীতি আছে অনেক রকম। তার মধ্যে 'সবিনয় নিবেদন' শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ সব দিক দিয়েই সমধিক উপযোগী। তবে 'সবিনয় নিবেদন, শব্দগুচ্ছের পর একটি কমা [,] দেওয়া উচিত। অনেক সময় ছাত্রেরা ইংরেজি কায়দায় 'প্রিয় মহাশয়' [Dear Sir] বা প্রাচীন বাংলা কায়দায় 'অমুক সমীপেষু' ইত্যাদি লেখে। সে সব বর্জনীয়। কেবল 'সবিনয় নিবেদন'ই যথেষ্ট। স্মরণীয়, 'সবিনয়ে নিবেদন' ভুল।

তিন. অভিবাদন

অভিবাদনের পর চিঠির বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুটিই বাণিজ্যিক পত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশটি সুলিখিত, সংক্ষিপ্ত ও নিটোল হওয়া প্রয়োজন। তাই বলে পরিবেশ সৃষ্টি না করেই মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করে ফেলাও ঠিক হবে না। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ ভঙ্গিতে মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে।

চার. বিষয়বস্তু

এই অংশে যে ভুলগুলি হয়ে থাকে, তা হলো : বানান ভুল, অপরিচ্ছন্নতা এবং বাক্য ও বক্তব্যসমূহের মধ্যে অসংলগ্নতা। সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং দরকার হলে একাধিক অনুচ্ছেদে বক্তব্য পরিবেশন করা উচিত।

তারপর বিদায়-সম্ভাষণ। বিদায়-কালে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন একটি আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার। বাণিজ্যিক পত্রেও সেই শিষ্টাচার রক্ষা করা কর্তব্য। বিষয়বস্তুর সমাপ্তি-বাক্যের পর 'ইতি' এবং নীচের ডান দিকের প্রান্ত-সীমায় লিখিত হবে 'বিনীত', 'নিবেদক', 'ভবদীয়', 'আপনাদের বিশ্বস্ত' বা 'বংশবদ' —এই শব্দগুলির যে-কোন একটি।

পাঁচ. বিদায়-সম্ভাষণ

বিদায়-সম্ভাষণের ঠিক নীচেই স্বাক্ষর। এই অংশে থাকবে স্বাক্ষর এবং প্রতিষ্ঠানের নাম। অনেকক্ষেত্রে স্বাক্ষরটি শীলমোহর দিয়ে সেরে দেওয়া হয়। কিন্তু তা অনুচিত। কারণ, চিঠিপত্র আইনের দিক দিয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণযুক্ত দলিলের মতো। কাজেই, শীলমোহর নয় ; পুরো নামই নিজের হাতে স্বাক্ষর করা উচিত। কারণ, স্বাক্ষরবিহীন পত্র অর্থহীন।

ছয়. স্বাক্ষর

চিঠির গুরুত্ব-বৃদ্ধির জন্যে এবং বক্তব্যকে জোরালো করে তোলার উদ্দেশ্যে অনেক সময় চিঠির সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রশংসাপত্র, সুপারিশপত্র বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদির প্রত্যায়িত অনুলিপি [attested true copy] প্রেরণ করা হয়। কিন্তু চিঠির নীচে ঠিক বাম প্রান্তে তার উল্লেখ থাকা উচিত। ক্রোড়পত্র কতখানা প্রেরিত হচ্ছে, তার সংখ্যাও উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

সাত. ক্রোড়পত্র

চিঠিতে অনেক সময় এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বক্তব্য পত্র-লেখকের অসাবধানতার জন্যে বাদ পড়ে যায়। পরে অবশ্য পত্র-লেখক 'পুনশ্চ' এই শব্দযোগে অনুল্লিখিত অংশটি সংযোজিত করে দিয়ে দোষ-স্খালনের চেষ্টা করেন। তাতে দোষ বাড়ে বৈ কমে না। কারণ, তা পত্র-লেখকের অসাবধানতা, শৈথিল্য, চিন্তার বিশৃঙ্খলা এবং অযোগ্যতা প্রমাণিত করে।

কিন্তু সাবধান

বাণিজ্যিক পত্রের খামের ওপর ঠিকানা লেখাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ খামের ডান দিকের অর্ধাংশের নীচের দিকে 'প্রাপক' কথাটি দিয়ে পুরো নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে হয়। বাম দিকের অর্ধাংশের নীচের দিকে থাকে পত্র-প্রেরকের ঠিকানা। তার ওপরে 'প্রেরক' কথাটি দিতে হয়। আর, যদি পত্রটি প্রাপ্য স্বীকৃতি-রসিদসহ নিবন্ধীকৃত [Registered with Acknowledgement Due] বা নিবন্ধীকৃত [Registered] বা ঝটিতি প্রদান [Express Delivery] হয়, তাহলে খামের মাথায় কথাগুলি লিখে নিম্নরেখাঙ্কিত করে দিতে হবে॥

বাণিজ্যিক পত্রের পরিলেখ :

রূপশ্রী বস্ত্রালয়

[অভিজাত বস্ত্র-বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : 'বস্ত্রম্' — ৪৫, রাসবিহারী এভিনিউ

টেলিফোন : ৩৪-৩৫৬৭ — কলকাতা-১৯

কোড্ নং : ৩৬২ — ১৬ই আগস্ট, ১৯৭৯

পূর্ব-সূত্র : ক/৫২/৭৯

পত্র-সংখ্যা : গ/১০·/৭৯

কর্মাধ্যক্ষ,
মোহিনী মিল্স [প্রা.] লিঃ
৫, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা : ১

বিষয় : মালের ফরমাস

সবিনয় নিবেদন,

____

____________________ নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
পরাশর দাশগুপ্ত
[রূপশ্রী বস্ত্রালয়ের পক্ষে]

ক্রোড়পত্র : ১

থাম এবং তার পিঠে নাম-ঠিকানা ইত্যাদির পরিলেখ :
[নিবন্ধীকৃত পত্র হলে]

প্রাপ্য স্বীকৃতি-রসিদসহ নিবন্ধীকৃত

ডাক-টিকিট

প্রেরক :	প্রাপক :
রূপশ্রী বস্ত্রালয় ৪৫, রাসবিহারী এভিনিউ কলকাতা : ১৯	কর্মাধ্যক্ষ, মোহিনী মিল্‌স [প্রা.] লিঃ ৫, নেতাজী সুভাষ রোড কলকাতা : ১

বি. দ্র. :—প্রশ্ন উঠেছে, পত্র-শেষে 'নমস্কারান্তে। ইতি—'-এই ব্যবহার শুদ্ধ কিনা। এটা যে অশুদ্ধ, তার উৎস কোথায়—প্রমাণ কি ? 'নমস্কারান্তে' অংশটি পত্রের 'বিদায় সম্ভাষণ' অংশের অন্তর্গত। বিদায়-সম্ভাষণ একটি আন্তর্জাতিক শিষ্টাচার। পত্র-শেষে 'নমস্কারান্তে' সেদিক থেকে খুবই জুতসই শব্দ ; অর্থাৎ, অন্তে নমস্কার।

'ইতি' শব্দটির প্রকৃত অর্থ—'এই'। ['ইতি'-এর অর্থ 'শেষ' নয়।] এটি সংস্কৃত থেকে গৃহীত। কোন বক্তব্যের শেষে 'ইতি' ব্যবহার করে বলা হতো, 'ইতি অমুক উবাচ' ; অর্থাৎ, এই কথা অমুক ব্যক্তি বললেন। সংস্কৃতে উদ্ধৃতি-চিহ্ন [inverted commas] ছিল না। 'ইতি' সেই উদ্ধৃতি-চিহ্নের কাজ করতো। বাংলা পত্রে যখন 'সবিনয়' নিবেদন দিয়ে পত্রারম্ভ করা হয়, তখন পত্র-শেষে 'ইতি' দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই, 'নমস্কারান্তে' ও 'ইতি'-র মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

———

১ চাকরির আবেদন-পত্র

উ. মা. '৬১, '৬২ '৬৩, '৬৫, '৬৭, '৭১ ; ক. বি. '৬৪, '৬৯, '৭১, '৭৪, '৭৫ ; ব. বি. '৬১

চাকরির আবেদন-পত্র নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবেদন-পত্রের কাঠামো, বক্তব্যের পারম্পর্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং ভাষা-শুদ্ধির ওপর আবেদনকারীর চরিত্র প্রতিফলিত হয়। চাকরির আবেদন-পত্রের কাঠামো অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্রের কাঠামো থেকে পৃথক্। সেই কাঠামোটি অতি-অবশ্য সর্বাগ্রে আয়ত্ত করতে হবে। কাঠামোর বিষয়গুলি পারম্পর্যক্রমে প্রদত্ত হলো :

এক. আবেদন-পত্রের শীর্ষের ডান দিকের কোণে প্রথমে আবেদনকারীর ঠিকানা ও তার নীচে তারিখ দিতে হয়।

দুই. তার নীচে বাম প্রান্তে লিখতে হবে অন্তর্বর্তী ঠিকানা ; অর্থাৎ, বিজ্ঞাপন-দাতার নাম-ঠিকানা। বিজ্ঞাপনে নামের উল্লেখ না থাকলে এবং বক্স নং থাকলে 'বিজ্ঞাপনদাতা', 'বক্স নং' এইভাবে লিখতে হয়। তার ঠিক নীচেই যে পত্রিকার বক্স নং বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত হয়েছে [বা পোস্ট বক্স নং], তার উল্লেখ করতে হয়। তাহলে এই অংশটি নিম্নোক্তভাবে লিখতে হবে :

বিজ্ঞাপনদাতা,
বক্স নং ৩৩৪৭
যুগান্তর পত্রিকা

আবার, পোস্ট বক্স নং প্রদত্ত থাকলে সেইমতো লিখতে হবে।

তিন. অভিবাদন। যেমন : 'সবিনয় নিবেদন'। ['সবিনয়ে নিবেদন' ভুল]

চার. আবেদন-সূত্র। যেমন : "গত ১৫ই জুন, ১৯৭৭ তারিখের 'রবিবাসরীয় যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম যে," ইত্যাদি। আবার, 'বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম যে,' ইত্যাদিও হতে পারে।

পাঁচ. শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী।

ছয়. বিশেষ যোগ্যতা।

সাত. অভিজ্ঞতা।

আট. কর্মবিনিময়-কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ-সংখ্যা। [এই অংশটি কেবলমাত্র বেকার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।]

নয়. বর্তমান বয়স ও স্বাস্থ্য।

দশ. অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের কারণ। [এই অংশটি কেবলমাত্র বর্তমানে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে প্রযোজ্য।]

এগারো. প্রত্যাশিত ন্যূনতম বেতন।
বারো. প্রশংসাপত্রাদি।
তেরো. সাক্ষাৎকার প্রার্থনা।
চৌদ্দ. উপসংহার।
পনেরো. স্বাক্ষর।
ষোলো. ক্রোড়পত্র।

উল্লিখিত বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে ক্রমানুযায়ী সাজাতে হবে। আবেদন-পত্রের দুটি আদর্শ প্রদত্ত হলো : একটি গতানুগতিক আদর্শ; অন্যটি আধুনিক আদর্শ। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণীয়। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনদাতার নাম উল্লেখ থাকতে পারে, অথবা না-ও থাকতে পারে। কাজেই, বিজ্ঞাপনদাতার নাম অথবা বক্স নং— যেমন থাকবে, আবেদন-পত্রে সেইমতো অন্তর্বর্তী ঠিকানা লিখতে হবে।

১ প্রশ্ন ॥ স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি নূতন শাখা খুলতে এবং তজ্জন্য কিছু-সংখ্যক অধস্তন কর্মচারী [assistants] নিয়োগ করতে ইচ্ছুক। তোমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জানিয়ে একখানি পত্র রচনা কর। উ. মা. '৬৩

[**পত্র-সংকেত** : এই প্রশ্নে নিয়োগকর্তার নাম উল্লিখিত আছে। কাজেই, অন্তর্বর্তী ঠিকানা অংশে প্রদত্ত নিয়োগকর্তার ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। তদনুযায়ী গতানুগতিক আদর্শে অর্থাৎ একটানা বাক্য-যোজনার দ্বারা রচিত আবেদন-পত্রের নমুনা নিয়ে প্রদত্ত হলো। কিন্তু এই রীতিটি পুরাতন। আধুনিক রীতির নমুনাটি হলো ২নং পত্রাদর্শ। ছাত্র-ছাত্রীরা সেই নমুনাটি অনুসরণ করবে।]

পত্রাদর্শ ১ ॥

২৪/১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড
কলকাতা : ১৯
১৫ই মার্চ, ১৯৭৯

কর্মাধ্যক্ষ,
স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া
প্রধান কার্যালয়
৫, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা : ১

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৯ তারিখের 'রবিবাসরীয় যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কিছু-সংখ্যক অধস্তন কর্মচারী প্রয়োজন। তদনুযায়ী আমি জনৈক প্রার্থীরূপে আমার আবেদন-পত্র প্রেরণ করছি।

আমি গত ১৯৭৬ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

গত এপ্রিল মাস থেকে আমি ৩৬, স্ট্র্যাণ্ড রোড কলকাতা : ১-স্থিত 'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া'য় অস্থায়ী অধস্তন কর্মচারী পদে তিন মাসের জন্যে নিযুক্ত ছিলাম। সেই স্বল্প

সময়ের মধ্যে আমি আমার কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সমর্থ হই। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমানে আমি যে-কোন প্রতিষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবো এবং কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবো।

বর্তমানে আমি কর্মহীন এবং আমার কর্মবিনিময়-কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ-সংখ্যা হলো ক/১১৩৭।

আমার বর্তমান বয়স ২০ বৎসর ৭ মাস। আমি সক্ষম স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত।

'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া'য় আমি তিন মাসের জন্যে অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত হয়েছিলাম। বর্তমানে আমি তাই অন্যত্র কর্মানুসন্ধানে বাধ্য হয়েছি।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমি ভাতা-সমেত মাসিক ২৫০.০০ টাকা পেতাম। আপনাদের প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী পদে আমি মাসিক ৩৫০.০০ টাকা পেলে যোগদান করতে প্রস্তুত আছি।

এই আবেদন-পত্রের সঙ্গে চারখানা প্রশংসাপত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি পাঠালাম। তাছাড়া 'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া'য় অনুসন্ধান করলে আমার সততা ও কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ জানতে পারবেন।

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রদান করলে আপনার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্ত জানাতে পারবো।

আপনাদের সহৃদয় নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
সুবিনয় মুখোপাধ্যায়

ক্রোড়পত্র—৪

১. উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি।
২. বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রশংসাপত্র।
৩. 'দি ব্যাঙ্ক অব্ বাঁকুড়া'র কর্মকর্তার প্রশংসাপত্র।
৪. বিধানসভার স্থানীয় সদস্যের প্রশংসাপত্র।

২ প্রশ্ন ॥ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী সহকারী হিসাব-রক্ষক পদের জন্যে বক্স্ নং ৪১৬৭, অমৃতবাজার পত্রিকা—এই ঠিকানায় একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** এই প্রশ্নে বিজ্ঞাপনদাতার নাম-ঠিকানা প্রদত্ত হয়েছে। কাজেই, অন্তর্বর্তী ঠিকানায় তা দিয়ে আবেদন-পত্র রচনা করতে হবে। তবে পূর্ব-অভিজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে কোনও ব্যাঙ্কে সহকারী হিসাব-রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করলে ভালো হয়। আধুনিক রীতি-সম্মত আদর্শে অর্থাৎ 'নিম্নে জ্ঞাতব তথ্যসমূহের বিবরণ প্রদত্ত হলো' বলে উল্লেখ করে শিরোনামা, অন্তর্বর্তী ঠিকানা, অভিবাদন ও আবেদন-সূত্র এবং সাক্ষাৎকার-প্রার্থনা, উপসংহার ও স্বাক্ষর—এই অংশগুলি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করে তদনুযায়ী রচিত আবেদন-পত্রের নমুনা প্রদত্ত হলো।]

॥ পত্রাদর্শ ২ ॥

৫, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলকাতা : ৯
১৯শে মার্চ, ১৯৭৯

পত্র-সূত্র : ১৪. ৩. ৭৯ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনদাতা,
বক্স নং ৪৫৬৭
অমৃতবাজার পত্রিকা

সবিনয় নিবেদন,

উল্লিখিত সূত্রে জানতে পারলাম যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একজন সহকারী হিসাব-রক্ষক প্রয়োজন। তদনুযায়ী উক্ত পদের প্রার্থীরূপে আমি আমার আবেদন-পত্র প্রেরণ করছি।

আপনাদের সহৃদয় বিচার-বিবেচনার জন্যে আমার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদির বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আমার যোগ্যতা ও কর্ম-দক্ষতা প্রমাণিত করবার জন্যে সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভ করলে কৃতার্থ হবো।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

বিনীত
পরিচয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রোড়পত্র—৪

॥ জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহের বিবরণ ॥

১. আবেদনকারীর নাম :	শ্রীপরিচয় বন্দ্যোপাধ্যায়
২. ঠিকানা—স্থায়ী	৫, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলকাতা : ৯
বর্তমান :	ঐ
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা :	উচ্চ-মাধ্যমিক, প্রথম বিভাগ, ১৯৭৮
৪. অন্যান্য যোগ্যতা :	বাংলায় মুদ্র-লিখন, মিনিটে অন্যূন ২৫টি শব্দ।
৫. অভিজ্ঞতা :	৬ মাস 'ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা'য় সহকারী হিসাব-রক্ষকের পদে অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত ছিলাম।
৬. বর্তমান বয়স ও স্বাস্থ্য :	২০ বছর ৫ মাস। স্বাস্থ্য কর্মঠ।
৭. অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের কারণ :	'ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা'য় অস্থায়ী হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলাম। বর্তমানে আমি কর্মহীন।
৮. কর্মবিনিময়-কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ-সংখ্যা :	ক/৭৩৮
৯. প্রত্যাশিত বেতন :	ভাতাসহ মোট ২৫০'০০ টাকা

১০. প্রশংসাপত্রাদির অনুলিপি : মোট চারখানা :

[১] উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্রের প্রত্যায়িত অনুলিপি।

[২] বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের প্রশংসাপত্র।

[৩] 'ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা'র কর্মকর্তার প্রশংসাপত্র।

[৪] স্থানীয় এম-এল-এ-র প্রশংসাপত্র।

১১. স্বাক্ষর ও তারিখ পরিচয় বন্দ্যোপাধ্যায়,

১৯শে মার্চ, ১৯৭৯।

অনুসরণী—১

● ১. গ্রামাঞ্চলে ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জীবন-বীমা কর্পোরেশনে কয়েকজন বিশেষ এজেন্ট আবশ্যক। তোমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর। উ. মা. '৬১

[পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]

● ২. কোনও ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার পদের জন্যে দরখাস্ত কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] ব. বি. '৬১

● ৩. দৈনিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন-অনুসারে কোনও ব্যাঙ্কের হিসাব-রক্ষক পদের জন্যে আবেদন কর। ব. বি. '৬১

[পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]

● ৪. বিমল স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করে কোনও বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় প্রশাসন [Business Administration] বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক। বিমলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবরণ-সহ একখানি যথাযোগ্য আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬২

● ৫. বোম্বাইর 'বেলাকো এণ্ড কোং লিঃ'-এর সাধারণ কর্মাধ্যক্ষের কাছে কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী সহকারী হিসাব-রক্ষকের পদের জন্যে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬১

● ৬. নিউ ইণ্ডিয়া কমার্সিয়াল কর্পোরেশন লিঃ তাঁদের প্রতিষ্ঠানে অফিসার ও ম্যানেজার হিসাবে প্রশিক্ষণদানের জন্যে কয়েকজন উৎসাহী তরুণকে শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন। তুমি এই শিক্ষানবীশ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ও অফিসার হতে মনস্থ করছ। একখানি উপযুক্ত আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬২

● ৭. স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি নতুন শাখা খুলতে ও তজ্জন্য কিছু-সংখ্যক অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করতে ইচ্ছুক। তোমার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জানিয়ে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৩

● ৮. কোন বৃহৎ আমদানি-রপ্তানি কারবারের আপিসে সেক্রেটারির পদ খালি আছে। সংবাদপত্রে তার বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত লেখ। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৬৯

● ৯. কোনও সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে একজন হিসাব-রক্ষক আবশ্যক। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ও ন্যূনতম প্রত্যাশিত বেতন ইত্যাদি জানিয়ে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]

● ১০. তুমি বি-কম. পাস করেছ। তোমার বিশেষ যোগ্যতা উল্লেখ করে ও সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত করবার প্রার্থনা করে কোন সওদাগরী অফিসে দরখাস্ত কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৬৪

● ১১. কোনও ঔষধ-উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে জনৈক অভিজ্ঞ উপার্থক [Canvasser] প্রয়োজন। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাদি জানিয়ে একখানি উপযুক্ত আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]

● ১২. উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাণিজ্য-শিক্ষকের একটি পদ খালি হয়েছে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা জানিয়ে একখানি দরখাস্ত লিখ। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]

● ১৩. মাসিক ৩০০'০০ টাকা বৃত্তিতে ম্যানেজার পদের জন্যে তিন বৎসরের শিক্ষানবীশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন সংবাদপত্রে ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। তোমার যোগ্যতা জানিয়ে একখানি দরখাস্ত লিখ। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]

● ১৪. তোমার শিক্ষা, সন্ধ্যায় আরও শিক্ষার অভিপ্রায়, বয়স, আকৃতি, পারিবারিক প্রেক্ষাপট, অনুসন্ধান-সূত্র, আগ্রহ, আকর্ষণ ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাপন করে প্রশাসনিক পদের আশায় অফিসের কাযে প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে শিক্ষানবিশীর সুযোগ প্রার্থনা করে ইন্টারন্যাশন্যাল ট্রেড কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালকের কাছে একখানি আবেদন-পত্র লিখ। সাক্ষাৎকারের জন্যে অনুরোধ জানাও। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৫

● ১৫. নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনের উত্তরে একখানি দরখাস্ত লিখ : কলিকাতার একটি বৃহৎ সওদাগরী অফিসে কতিপয় অধস্তন কর্মচারী প্রয়োজন। প্রার্থীকে দক্ষ করণিক এবং সংখ্যা-কর্মে ক্ষিপ্র হতে হবে। উৎসাহী বাণিজ্য-স্নাতকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মুদ্র-লিখনে দক্ষতা অতিরিক্ত আকর্ষণরূপে বিবেচিত হবে। পূর্ণ বিবরণ দিয়ে এবং প্রত্যাশিত বেতন উল্লেখ করে বক্স নং ৭২৮৯, স্টেটস্‌ম্যান-এর কাছে আবেদন কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৭

● ১৬. হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে কোন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাছে চাকুরির দরখাস্ত লেখ, যাতে তুমি কোন সান্ধ্য কলেজে বাণিজ্য-শিক্ষা চালিয়ে যেতে পার ; তোমার নিজের সব তথ্যাদি দেবে এবং বিশেষ কিছু লিখবার থাকলে তাও লিখবে।
[পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭১

● ১৭. একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কতিপয় শিক্ষানবীশ নেওয়া হবে। উক্ত পদের জন্যে তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২ দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৭৮

২

অন্যান্য আবেদন-পত্র

ক. বি. '৬৮

কেবল চাকরির ক্ষেত্রেই আবেদন-পত্র রচিত হয় না, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আবেদন-পত্র রচিত হয়। চাকরিতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যেমন ছুটির জন্যে আবেদন-পত্র রচনা করতে হয়, তেমনি ব্যবসায়ীকে সরকারের কাছে ব্যবসা করার অনুমতি [license] চেয়েও আবেদন-পত্র রচনা করতে হয়। তাছাড়া, নানা প্রয়োজনে রেল-কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যবসায়ীর আবেদন-পত্র রচনা করার দরকার হয়।

১ প্রশ্ন ॥ বিশেষ পারিবারিক প্রয়োজনের জন্যে ব্যস্ত থাকায় তুমি দু'দিন অফিসে উপস্থিত হতে পারনি। নৈমিত্তিক ছুটির [Casual leave] জন্যে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর।

॥ পত্রাদর্শ ৩ ॥

৫৫, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা : ৩১
৩রা মার্চ, ১৯৭৯

অধীক্ষক,
শেঠ ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
১৫৯, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা : ১

বিষয় : নৈমিত্তিক ছুটির জন্যে আবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

বিশেষ পারিবারিক প্রয়োজনের জন্যে ব্যস্ত থাকায় গত ১. ৩. ৭৯ এবং ২. ৩. ৭৯ এই দু' দিন আমি অফিসে উপস্থিত হতে পারি নি।

আমার এই অনুপস্থিতির সম্ভাবনার কথা আমি অফিসকে পূর্বেই অবহিত করেছিলাম।

অতএব আমাকে উল্লিখিত দু' দিনের জন্যে নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত
অনিন্দিত বসু
সহকারী হিসাব-রক্ষক

২ প্রশ্ন। তুমি বাংলাদেশে একটি নতুন চিনির কল স্থাপন করতে মনস্থ করেছ। এই কল লাভজনকভাবে চালাবার পক্ষে তোমার কি কি স্থবিধা, তা বিবৃত করে উক্ত কল স্থাপনের অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন-পত্র লিখ।

[**পত্র-সংকেত ঃ** প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ও সংকল্প—অপচয় দুরীকরণ—স্থবিধা—আবেদন—অনুমতি-প্রার্থনা—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ৪ ॥

দত্ত মিত্র (প্রা.) লিঃ

[ক্ষুদ্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান]

বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/১১৫/৭৯

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প অধিকার
নব মহাধিকরণ
কলকাতা : ১

বিষয় : চিনির কল স্থাপনের অনুমতি-প্রার্থনা

সবিনয় নিবেদন,

আমরা দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র-শিল্পের সংগঠন, সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। সম্প্রতি দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আমাদের এ অঞ্চলে এই অবহেলিত শিল্পটির প্রচুর সম্ভাবনা থাকায় আমরা একটি চিনির কল স্থাপন করতে মনস্থ করেছি।

এতদিন এ অঞ্চলে আখের রস থেকে গুড় প্রস্তুত হতো এবং আখের ছিব্‌ড়া জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আমরা এই অপচয় বন্ধ করবার জন্যে আখের রস থেকে চিনি এবং আখের ছোব্‌ড়া থেকে কাগজ প্রস্তুত করবার কল স্থাপন করবো, সংকল্প করেছি। কিন্তু তার জন্যে সরকারের আনুকূল্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রিত বাজারে চিনির সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে; সহযোগী শিল্পরূপে কাগজের কল স্থাপিত হলে স্থানীয় বাজারে কাগজের যোগানও বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে কিছু পরিমাণ বিদেশী-মুদ্রারও সাশ্রয় হবে এবং বহু-সংখ্যক বেকার ব্যক্তির কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। তাছাড়া, এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বৈষয়িক উন্নতির প্রশ্নটিও বিশেষভাবে জড়িত।

উল্লিখিত সম্ভাব্য স্থবিধাগুলির ভিত্তিতে আমাদের একটি চিনির কল ও একটি সহযোগী কাগজের কল স্থাপনের অনুমতি দান করে বাধিত করবেন।

ধন্যবাদান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীদীপ্তিবিকাশ দত্ত
[দত্ত মিত্র (প্রা.) লিঃ-এর পক্ষে]

প্রশ্ন ৩ ॥ তুমি দিল্লী যাবার জন্যে দশদিন আগে রেলওয়ে টিকিট কিনেছিলে। কিন্তু তোমার যাওয়া হলোনা। টিকিট ফেরত দিয়ে ও সঙ্গত কারণ দেখিয়ে টাকা ফেরতের জন্যে উপযুক্ত রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত কর। ক. বি. '৬৮

[**পত্র-সংকেত ঃ** টিকিটের বিবরণ, ক্রয়ের স্থান ও টিকিটের নম্বর—যাত্রা-বাতিলকরণের কারণ ও প্রমাণ—মূল্য ফেরত দানের অনুরোধ।]

॥ পত্রাদর্শ ৫ ॥

১৫, বকুল বাগান লেন
কলকাতা ঃ ২৫
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯

অধীক্ষক,
হাওড়া স্টেশন
পূর্ব রেলপথ
হাওড়া

বিষয় ঃ টিকিটের মূল্য ফেরত

সবিনয় নিবেদন,

আজ [১৭. ১২. ৭৯] রাজধানী এক্স্প্রেস্‌যোগে হাওড়া থেকে দিল্লী যাবার জন্যে গত ৭. ১২. ৭৯ তারিখে একখানি হাওড়া-দিল্লী অগ্রিম টিকিট আপনাদের এস্প্লানেড টিকিট-ঘর থেকে ক্রয় করেছিলাম। আমার টিকিটের নম্বর সি/টি ৫০০১৭।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৪, বণ্ডেল রোড-স্থিত আমার কারখানা—অনুপম টেক্স্টাইল্স্‌-এ গতকাল থেকে শ্রমিক-ধর্মঘট শুরু হওয়ায় বাধ্য হয়ে আজ আমাকে দিল্লী যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো। আজ শহরের সব প্রভাতী পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।

অতএব আমার অনুরোধ, এই অনিচ্ছাকৃত যাত্রা বাতিলকরণের কারণ বিবেচনা করে যথাসম্ভব আমার টিকিটের মূল্য ফেরত দানের ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত
দিগন্ত রায়

ক্রোড়পত্র ঃ

১, হাওড়া-দিল্লী টিকিট
সি/টি ৫০০১৭।

অনুসরণী—২

১. তুমি শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সাতদিন অফিসে উপস্থিত হতে পার নি। চিকিৎসকের প্রমাণ-পত্রসহ ছুটির জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি আবেদন-পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৩ দ্রষ্টব্য]

২. তোমার অসুস্থতার জন্যে কর্তৃপক্ষ তোমাকে দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে তোমার আরও সাত দিনের বিশ্রাম দরকার। তদনুযায়ী আরও সাত দিনের ছুটি প্রার্থনা করে একখানি দরখাস্ত লিখ। [পত্রাদর্শ ৩ দ্রষ্টব্য]

৩. তুমি রেশন-অঞ্চলের বহির্ভূত কোন শহরে চাল, ডাল, গম, ময়দার আড়ত খুলতে চাও। এজন্যে সরকারী খাদ্য-বিভাগের কাছে তোমার অর্থ-সামর্থ্যের প্রমাণ ও প্রচলিত রেশন-বিধি মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথোপযুক্ত আবেদন কর। [পত্রাদর্শ ৪ দ্রষ্টব্য]

৪. তুমি পশ্চিমবঙ্গের রেশন-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনও শহরে একটি ন্যায্য মূল্যের বিপণি খুলতে চাও। অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তোমার অর্থ-সামর্থ্যের প্রমাণ সহ প্রচলিত রেশন-বিধি মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একখানি যথোপযুক্ত আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৪ দ্রষ্টব্য]

৫. তুমি স্বল্প মূলধন নিয়ে কোন কুটির-শিল্পের কারখানা খুলতে চাও। কিসের কারখানা খুলবে, তা জানিয়ে এবং তোমার যোগ্যতা বুঝিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে সরকারের কাছে একখানি আবেদন-পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৪ দ্রষ্টব্য]

৬. উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সিনেমার টিকিটের মূল্য ফেরত চেয়ে প্রেক্ষাগৃহের ম্যানেজারের কাছে একখানি পত্র লেখ। [পত্রাদর্শ ৫ দ্রষ্টব্য]

৭. হলদিয়ার একটি ক্ষুদ্র-শিল্পের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষুদ্র-শিল্পের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে এবং তার সম্ভাবনার নানা দিক্-দিগন্তের কথা উল্লেখ করে সরকারের কাছে লাইসেন্সের জন্যে একখানি আবেদন-পত্র লেখ। [পত্রাদর্শ ৪ দ্রষ্টব্য]

৮. তুমি ফরাক্কায় একটি নতুন কারখানা খুলতে চাও। লাইসেন্স পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্যে উপযুক্ত প্রত্যাভূতির বিনিময়ে ঋণ চেয়ে সরকারের কাছে একখানি দরখাস্ত লেখ। [পত্রাদর্শ ৪ দ্রষ্টব্য]

৩

প্রচার-পত্র

উ. মা. '৬০, '৬১, '৬২ [কম্পার্ট.], '৬২, '৬৩ [কম্পার্ট.], '৬৩, '৬৫, '৬৬, '৬৭, '৬৮ ;
ক. বি. '৬৪, '৬৭, '৭০

প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রচার-পত্র রচিত হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের কোন বিষয় ক্রেতা-সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এর লক্ষ্য।

প্রচার-পত্রের উদ্দেশ্য হলো দুটি : এক. সংবাদ-জ্ঞাপন এবং দুই. চাহিদা-সৃষ্টি ও চাহিদা-বৃদ্ধি।

নানা বিষয়ে সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচার-পত্র রচিত হতে পারে : নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা, নতুন ব্যবসায়ের উদ্বোধন, ব্যবসায় ক্রয় বা বিক্রয়, গৃহ-সম্প্রসারণ, স্থান-পরিবর্তন, অংশীদার-আহ্বান, একাধিক ব্যবসায়ের সংযুক্তি, একই ব্যবসায়ের একাধিক ভাগে বিভক্তি, ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, দায়িত্বশীল কর্মচারীর পদচ্যুতি, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস ইত্যাদি।

চাহিদা-সৃষ্টি ও চাহিদা-বৃদ্ধিকল্পে রচিত প্রচার-পত্র : নতুন পণ্যের আমদানি বা উৎপাদন, পুরাতন পণ্যের উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি।

॥ প্রচার-পত্রের বৈশিষ্ট্য ॥

এক. প্রচার-পত্র সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে লেখা যায়। দুই. বাক্-চাতুর্য বা শিল্প-চাতুর্যের দ্বারা ক্রেতার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারা চাই। তিন. প্রচার-পত্রের কোথাও যেন কোন দম্ভ প্রকাশ না পায়।

১ প্রশ্ন ॥ সম্প্রতি তোমার প্রতিষ্ঠান একটি নতুন পণ্য উৎপাদন করেছে। ক্রেতাসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে একখানি প্রচার-পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত :** এই প্রচার-পত্রখানি সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে লিখতে হবে—তার কোনও নির্দেশ প্রশ্নে নেই। তবে 'ক্রেতা-সাধারণ' কথাটি থেকে এবং প্রশ্নের মর্ম অবগত হয়ে বোঝা যায় যে, পত্রখানি হবে সাধারণ ধরনের। হ্যাণ্ডবিলের আকারে বা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞাপনের আকারে লিখতে হবে। কাজেই, অন্তর্বর্তী ঠিকানার প্রয়োজন নেই।]

॥ পত্রাদর্শ ৬ ॥

স্বদেশী শিল্প-সংসদ্

[শতাব্দীর স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান]

টেলিগ্রাম : 'স্বদেশী'
টেলিফোন : ৩৫-৫৩২৭

৪৫, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা : ৭
২০শে মার্চ, ১৯৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা জানেন যে, যদি রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করা না হতো, তবে যুগযুগান্তরের জ্ঞানচর্চা, কাব্যচর্চা—সমস্তই কোথায় বিলীন হয়ে যেত। গ্রীস, রোম, ব্যাবিলনের ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু তাদের জ্ঞানচর্চা, কাব্যচর্চা ধ্বংস পায় নি। ভারতের আর্য-ঋষি ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের জ্ঞানচর্চার কথা বিশ্ববিশ্রুত। তাঁদের সেই জ্ঞান-প্রকর্ষের নিদর্শনগুলিকে সযত্নে রক্ষা করেছে—'লেখনী'।

যুগে যুগে মানুষের জ্ঞানচর্চা ও কাব্যচর্চার নিদর্শনগুলিকে সযত্নে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই ওপর ভর করে মানব-সভ্যতা এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। বলা যায়, 'লেখনী'ই মানব-সভ্যতার ধারক ও বাহক! বর্তমান ভারতে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বিঘোষিত হয়েছে, 'লেখনী'ই হবে তার সুদৃঢ় হাতিয়ার।

আমরা সম্প্রতি 'লেখনী' নামেই একটি বিশেষ ধরনের ঝরনা কলম প্রস্তুত করেছি, যা দেখতে অত্যন্ত সুশ্রী, গুণে যে-কোন বিদেশী কলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন প্রকারের সাতরকম সুদৃশ্য রঙের 'লেখনী' পাওয়া যাবে। ব্যবহারকারীরা নিজ নিজ পছন্দসই রঙটি নির্বাচিত করে নিতে পারবেন। এর ভিতরের কারিগরী প্রক্রিয়াটি এমনই নিপুণ যে, কালি-নিঃসরণের পথ কখনই রুদ্ধ হবে না। অতিরিক্ত কালি-নিঃসরণ সব সময় আভ্যন্তরীণ কারিগরি-কুশলতায় নিয়ন্ত্রিত হবে। এর নিবটি সূক্ষ্ম, মসৃণ এবং দীর্ঘস্থায়ী।

কথায় বলে, 'কাগজ, কলম, মন—লেখে তিনজন'। 'লেখনী' দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে! আশা করি, 'লেখনী'ই যুগ-যুগান্তরের বাণীকে লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারবে। এর উৎকর্ষ-পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অবিলম্বে আপনাদের ফরমাস আমাদের স্থানীয় বিক্রয়-প্রতিনিধির কাছে লিপিবদ্ধ করুন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীবিশ্বজিৎ দত্ত
[স্বদেশী শিল্প-সংসদের পক্ষে]

অনুসরণী—৩

●১. তুমি তোমার সুপরিচিত কাপড়ের দোকান অধিকতর স্থানবহুল ও অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরিত করেছ। এই স্থানান্তরিতকরণের পক্ষে কারণ দেখিয়ে তা তোমার পৃষ্ঠপোষকবর্গকে একখানি প্রচার-পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দাও। [পত্রাদর্শ ৬ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৩

●২. ভারত কেমিক্যাল্‌স বিশেষ গুণসমন্বিত একপ্রকার নতুন প্রসাধন-সাবান উৎপাদন শুরু করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে একখানি যথোপযুক্ত বিস্তারিত বিজ্ঞাপন রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৬ দ্রষ্টব্য]

●৩. কে. সিন্‌হা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর তার নাম পরিবর্তন করে 'সেন সিন্‌হা এণ্ড কোং' রাখা হয়েছে। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে একটি উপযুক্ত ঘোষণা রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৬ দ্রষ্টব্য]

●৪. 'দি ইউনাইটেড্ ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ লিঃ' তাদের উৎপন্ন নতুন ধরনের ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের বিষয় বিজ্ঞাপিত করতে মনস্থ করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে যথাযোগ্য পদ্ধতিতে একটি বিজ্ঞাপন রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৬ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৭

৫. কয়েকটি গ্রাম থেকে দুধ সংগ্রহ করে তুমি শহরে ডেয়ারি ফার্ম চালাতে চাও। সেজন্যে সাধারণের কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৬ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৬৭

●৬. হিন্দুস্থান লিভারের পক্ষ থেকে 'অনীক' মার্কা ভয়সা ঘি'র গুণ, প্যাকিং, বিভিন্ন টিনের খুচরা ও পাইকারী দাম, সরবরাহের জন্যে ফরমাসের নিম্নতম পরিমাণ ইত্যাদি জ্ঞাপন করে সমস্ত অনুমোদিত বিক্রেতার কাছে একখানি প্রচার-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৬-এর অনুসরণে নিজে রচনা কর।] উ.মা. '৬৫

৪

বিক্রয়-প্রস্তাব, মূল্য-জিজ্ঞাসা, মূল্য-জ্ঞাপন ও ফরমাস-সংক্রান্ত পত্র

বিক্রয়-প্রস্তাব, মূল্য-জিজ্ঞাসা, মূল্য-জ্ঞাপন ও ফরমাস-সংক্রান্ত পত্র—এই চার রকমের পত্র-বিনিময়ের আছে চার রকমের পর্যায়। প্রথমতঃ, বিক্রেতা বা উৎপাদক বা আমদানি-কারক পণ্য-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রয়-প্রস্তাব বিষয়ে পত্র রচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ, তার উত্তরে ক্রেতা পণ্যের উৎকর্ষে আকৃষ্ট হয়ে রচনা করেন মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র। তৃতীয়তঃ, বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান পণ্যের মূল্য-জ্ঞাপন পত্র রচনা করেন। এবং চতুর্থতঃ, ক্রেতা পণ্য-ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রচনা করেন ফরমাস-পত্র। এমনি করে বাণিজ্য গতিলাভ করে।

॥ বিক্রয়-প্রস্তাব ॥

১ প্রশ্ন ॥ তোমার প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে কোন নতুন পণ্য আমদানি করেছে। ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশেষ সুবিধাদির কথা উল্লেখ করে একখানি পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** পূর্ব-পরিচয়—পণ্যোৎকর্ষের বিবরণ—মূল্য-শোধের সুবিধাজনক শর্ত—সুবিধাজনক দস্তরি ইত্যাদি।]

॥ পত্রাদর্শ ৭ ॥

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ

[বিবিধ পণ্যের আমদানিকারক]

টেলিগ্রাম : 'ট্রেড'
টেলিফোন : ৪৬-৮৩৪৭

৩২, পার্ক সাইড রোড
কলকাতা : ২৬
২২শে মার্চ, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/৫০৫/৭৯

নাইডু এণ্ড কোং
১৫৭, রাজাগোপালাচারী রোড
মাদ্রাজ : ১

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের আমদানীকৃত বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে আপনাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আপনাদের কাছ থেকে সেই সব পণ্যের ফরমাস আমরা নিয়মিত পেয়ে থাকি এবং যত্নসহকারে তা সরবরাহ করে থাকি।

আপনারা শুনে খুশী হবেন যে, সম্প্রতি আমরা 'নিভা' নামে জল গরম করবার একরকম স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র জাপান থেকে আমদানি করেছি। সম্পূর্ণরূপে মরিচাবিহীন ইস্পাতে তৈরী এই বিস্ময়কর যন্ত্রটিতে পাঁচ লিটার জল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গরম করা যায়। জল ফুটে গেলে এর সুইচ্‌টি আপনা থেকেই তড়িৎ-প্রবাহের সঙ্গে যন্ত্রটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কাজেই, এই যন্ত্রের বৈদ্যুতিক ব্যয় যেমন সীমাবদ্ধ, ব্যবহারিক নিরাপত্তাও তেমনি নির্ভরযোগ্য।

অন্যদিক থেকে এটি পুরোপুরি মরিচাবিহীন হওয়ায় এতে কখনই জলের দাগ লাগে না। এর মধ্যে জলের বিশুদ্ধীকরণের জন্যে উপযুক্ত ফিল্‌টার-ব্যবস্থাও রয়েছে। তাছাড়া আছে জল বের করবার জন্যে একটি সুদৃশ্য কল।

শহরবাসীর পক্ষে এটির উপযোগিতা অসীম। এটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত এবং গৃহস্থের পরম বন্ধু। সেবার দিক থেকে এর আর্থিক মূল্য অতি সামান্য—স্থানীয় কর ছাড়া ২০০.০০ [দু'শো] টাকা মাত্র। কাজেই, এটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ক্রয়-সীমানার মধ্যে। কিন্তু উৎসাহী ও আগ্রহশীল বিক্রয়-প্রতিষ্ঠান পেলে আমরা শতকরা কুড়ি টাকা হারে দস্তুরি দিতে প্রস্তুত। প্রেরণ-ব্যয় আমাদের। মূল্য-পরিশোধের ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুবিধাজনক। মাল-সরবরাহের প্রাক্কালে মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ শোধ দিতে হবে। অবশিষ্টাংশ দু' কিস্তিতে ছ' মাসের মধ্যে শোধ দিলে চলবে।

আপনারা কাল-বিলম্ব না করে এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ স্থাপন করুন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়
[বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

॥ মূল্য-জিজ্ঞাসা ॥

২ প্রশ্ন ॥ কোন প্রতিষ্ঠান একটি নূতন পণ্য আমদানি করেছে। তুমি সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উক্ত পণ্যের কারবার করবার সংকল্প জানিয়ে একখানি মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত :** ভূমিকা—বিক্রয়-প্রস্তাবমূলক পত্র-প্রাপ্তির স্বীকৃতি—সাধারণ ক্রেতার চাহিদা—দস্তুরির হারবৃদ্ধির অনুরোধ—মূল্য-পরিশোধ-রীতির চিরাচরিত পদ্ধতি—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ৮ ॥

নাইডু এণ্ড কোং

[বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহকারক]

টেলিগ্রাম : 'বিবেক'
টেলিফোন : ৪৩৫৭

১৫৭, রাজাগোপালাচারী রোড
মাদ্রাজ : ২
১লা এপ্রিল, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : জ/১১৫/৭৯

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ
৩২, পার্ক সাইড রোড
কলকাতা : ২৬

পত্র-সূত্র : ক/৫০৫/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২২.৩.৭৯ তারিখের পত্রে জানতে পারলাম যে, আপনারা সম্প্রতি জাপান থেকে 'নিভা' নামে একপ্রকার মরিচাবিহীন ইস্পাতে তৈরী জল গরম করবার স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র আমদানি করেছেন।

এ বিষয়ে আপনারা বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন। সেই সূত্রে আমাদের কাছে কতকগুলি ফরমাসও এসে পৌঁচেছে। আমরা সেই ফরমাস যথাসময়ে সরবরাহ করবো বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি।

আপনাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। আমরা সাধারণতঃ আপনাদের কাছ থেকে শতকরা ২৫ টাকা হারে দস্তুরিতে পণ্য ক্রয় করে থাকি। এক্ষেত্রে আপনারা সাধারণভাবে শতকরা ২০ টাকা হারে দস্তুরি দিবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এই হারে এই নতুন পণ্যের কারবার করতে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি না। নতুন পণ্য বিক্রয়ের জন্যে যে পরিশ্রম করতে হয়, তার তুলনায় এই হার সামান্য। পত্রোত্তরে আপনারা যথারীতি শতকরা ২৫ টাকা হারে দস্তুরি দিতে সম্মত আছেন কিনা জানিয়ে বাধিত করবেন।

মূল্য-পরিশোধের ব্যাপারে আপনারা নূতন শর্ত আরোপ করেছেন দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমরা মাল সরবরাহ নেবার প্রাক্কালে চিরাচরিতভাবে মোট মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ দিতে পারি এবং অবশিষ্টাংশ দুটি কিস্তিতে ছ' মাসের মধ্যে দিতে প্রস্তুত। আপনারা এই শর্তে সম্মত আছেন কিনা জানালে বাধিত হবো।

তাছাড়া, এই মালের ফরমাস দিলে আপনারা কতদিনে তা সরবরাহ করতে

পারবেন, তাও জানাবেন। আমরা একসঙ্গে দু' ডজন মালের ফরমাস দেব। প্যাকিং এবং সরবরাহ-ব্যয় আপনাদের। পত্রপাঠ উত্তর দিলে বাধিত হবো।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীরঙ্গস্বামীনাথন
[নাইডু এণ্ড কোং-এর পক্ষে]

॥ মূল্য-জ্ঞাপন ॥

৩ প্রশ্ন ॥ ক্রেতার মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্রের উত্তরে তোমাদের আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য-জ্ঞাপন করে একখানি পত্র রচনা কর।

[পত্র-সংকেত ঃ ভূমিকা—পণ্য-সরবরাহের সময়-নির্দেশ—পণ্যের বিশদ বিবরণসহ মূল্য-তালিকা—মাল-প্রেরণের ব্যবস্থা—দস্তুরির হার—মূল্য-শোধের রীতি—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ৯ ॥

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ
[বিবিধ পণ্যের আমদানিকারক]

টেলিগ্রাম : 'ট্রেড'
টেলিফোন : ৪৬-৮৩৪৭

৩২, পার্ক সাইড রোড
কলকাতা : ২৬
৭ই এপ্রিল, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/১০০৩/৭৯

নাইডু এণ্ড কোং
১৫৭, রাজাগোপালাচারী রোড
মাদ্রাজ : ২

পত্র-সূত্র : জ/১১৫/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখের পত্র পেয়ে আনন্দিত হলাম। আমাদের কাছে 'নিভা' নামে জল গরম করবার স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র তিন প্রকারের মজুত আছে। আপনাদের ফরমাস-প্রাপ্তির দু'সপ্তাহের মধ্যে আমরা মাল সরবরাহ করতে পারবো, বিশ্বাস করি। পত্রের সঙ্গে একখানি মূল্য-তালিকা প্রেরিত হলো। তৎসত্ত্বেও আপনাদের সুবিধার জন্যে পর পৃষ্ঠায় পণ্যের বিশদ বিবরণ ও মূল্যের তালিকা উল্লেখ করলাম :

সংখ্যা	পণ্যের শ্রেণী	বিশদ বিবরণ	মূল্য [ডজন প্রতি]
১ ডজন	'ক' শ্রেণী	ফিল্টার ও স্বয়ংক্রিয়-সুইচ্ যুক্ত, ১৬ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট	টা. ৪,৮০০.০০
১ ডজন	'খ' শ্রেণী	ফিল্টারহীন, স্বয়ংক্রিয়-সুইচ্ যুক্ত, ১২ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট	টা. ৩,৬০০.০০
১ ডজন	'গ' শ্রেণী	ফিল্টার ও স্বয়ংক্রিয়-সুইচ্ হীন, ৮ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট	টা. ২,৪০০.০০

অন্যান্য মাল আমরা ক্রেতার দায়িত্বে প্রেরণ করে থাকি। কিন্তু 'নিভা'র ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের দায়িত্বে মাল প্রেরণের ব্যবস্থা করেছি। কারণ, তা যত্নসহকারে প্রেরণ করবার প্রয়োজন আছে। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, মালের পরিমাণ বেশী হলে আমাদের পক্ষে তা প্রেরণের বিশেষ সুবিধা হবে।

আমরা সাধারণভাবে ২০% হারে দস্তুরি দেবো, স্থির করেছি। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দীর্ঘকালের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা চিন্তা করে ২৫% দস্তুরি দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়েছে।

মূল্য-শোধের ব্যাপারে আমাদের নতুন রীতি আপনাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না। মালের সরবরাহ নেবার সময় যথারীতি এক-তৃতীয়াংশ শোধ করলেই চলবে। অবশিষ্টাংশ মাল-গ্রহণের ছ' মাসের মধ্যে শোধ করতে হবে।

মূল্য ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে আপনাদের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো হলো। আশা করি, আপনাদের ফরমাস পেতে আমাদের বিশেষ বিলম্ব হবে না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়
[বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

॥ ফরমাস পত্র ॥

৪ প্রশ্ন ঃ কোন বিশেষ পণ্য ক্রয় করবার উদ্দেশ্যে একখানি যথাযোগ্য ফরমাস পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** ভূমিকা—ফরমাসের বিস্তারিত বিবরণ—দস্তুরি ও মূল্য-শোধের রীতি—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ১০ ॥

নাইডু এণ্ড কোং

[বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহকারক]

টেলিগ্রাম : 'বিবেক' — ১৫৭, রাজাগোপালাচারী রোড
টেলিফোন : ৪৩৫৭ — মাদ্রাজ : ২

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : জ/৫২৫/৭৯

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ
৩২, পার্ক সাইড রোড
কলকাতা : ২৬

পত্র-সূত্র : ক/১০০৩/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখের পত্র পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের প্রেরিত মূল্য-তালিকা অনুযায়ী দু' ডজন 'নিভা' নামে জল গরম করবার স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ফরমাস পাঠালাম। নিম্নে ফরমাসের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হল :

সংখ্যা	পণ্যের শ্রেণী	হার	মূল্য
১ ডজন	'ক' শ্রেণী	টা. ৪,৮০০.০০	টা ৪,৮০০.০০
১ ডজন	'খ' শ্রেণী	টা. ৩,৬০০.০০	টা. ৩,৬০০.০০
মোট ২ ডজন			মূল্য = ৮,৪০০.০০ টাকা

আপনাদের ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখের পত্রে উল্লিখিত ২৫% কমিশন বাদ দিয়ে চালান প্রস্তুত করবেন এবং মূল্য-শোধের ব্যাপারে উক্ত তারিখের পত্রের শর্তাদিই অনুসৃত হবে।

বলাবাহুল্য, মাল-প্রেরণের দায়িত্ব আপনাদের এবং মাল ত্রুটিযুক্ত হলে বা মাল-প্রেরণে বিলম্ব হলে আমরা মাল-গ্রহণে বাধ্য থাকবো না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীরঙ্গস্বামীনাথন
[নাইডু এণ্ড কোং-এর পক্ষে]

অনুসরণী-৪

১. 'মাদ্রাজ ট্রেডিং কর্পোরেশনে'র ২৫টি বৈদ্যুতিক পাম্প অবিলম্বে প্রয়োজন। কলকাতার 'ন্যাশন্যাল ইলেকট্রিক্ পাম্পস্'-এর কাছে পণ্যের গুণাবলী ও মূল্য ইত্যাদি জানাবার জন্যে 'মাদ্রাজ ট্রেডিং কর্পোরেশনে'র পক্ষ থেকে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৮ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬২

২. কোন বিদেশী কোম্পানীকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের জন্যে বিদ্যুৎচালিত বয়নযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশ [order] দিয়ে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৯ দ্রষ্টব্য] ব. বি. '৬৪

৩. তোমার প্রতিষ্ঠান একটি নতুন পণ্য উৎপাদন করেছে। সেই পণ্যের গুণাবলী ও বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধাদির কথা উল্লেখ করে একখানি পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৬ দ্রষ্টব্য]

৪. কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ আমদানি করতে মনস্থ করেছ। মূল্য ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৭ দ্রষ্টব্য]

৫. ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করে তোমার প্রতিষ্ঠানে একখানি পত্র এসেছে। তার একখানি উত্তর-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৮ দ্রষ্টব্য]

৬. তোমাদের কলেজ-পত্রিকা প্রকাশনের জন্যে কোন বিশেষ মানের কাগজের মূল্য-জিজ্ঞাসা করে কোন কাগজ-ব্যবসায়ীর কাছে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৭ দ্রষ্টব্য]

ফরমাস-স্বীকৃতি, সম্পাদন, প্রত্যাখ্যান, বাতিল ও সংগ্রহ-সংক্রান্ত পত্র

উ. মা. '৬০, '৬৪, '৬৬, '৭১, '৭২

পণ্যক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্রেতা ফরমাস [অর্ডার] পাঠান। বিক্রেতা সেই ফরমাসের স্বীকৃতি দান করে পত্র রচনা করেন। আবার, ফরমাস-অনুযায়ী মাল-সরবরাহের সময় ফরমাস-সম্পাদন পত্রও লিখতে হয় বিক্রেতাকে।

এমনি সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে বাণিজ্য চলে। কিন্তু সব সময় বাণিজ্য সহজ স্বচ্ছন্দগতিতে চলে না। বিক্রেতা কোন কারণে পণ্য-সরবরাহে অক্ষম হলে ক্রেতা সেই ফরমাস প্রত্যাখ্যান করে থাকেন। পণ্য-সরবরাহে অতিরিক্ত বিলম্ব হলে ক্রেতা বিরক্ত হয়ে ফরমাস বাতিল করেও পত্র দিতে পারেন ি ক্রেতা-প্রতিষ্ঠান ফরমাস-সংগ্রহের জন্যে আবার নতুন করে চেষ্টা করতে পারেন।

॥ ফরমাস-স্বীকৃতি পত্র ॥

১ প্রশ্ন ॥ ক্রেতার পক্ষ থেকে তোমার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত এক হাজার টাকা মূল্যের ফাউণ্টেন পেনের কালির ফরমাস এসেছে। সরবরাহ দেবার সময়, ব্যবস্থা ও অন্যান্য শর্তাদির কথা উল্লেখ করে একখানি স্বীকৃতি-পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** ভূমিকা—ফরমাস-স্বীকৃতি—পণ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা—মূল্য-শোধের শর্ত—পণ্য-সরবরাহের সময়-সূচী—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ১০ ॥

সুলেখা কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্ (প্রা) লিঃ

[বিখ্যাত ফাউনণ্টেন পেনের কালি প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম : 'সুলেখা'
টেলিফোন : ৪৬-৩৪৫৬

৩৬, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
কলকাতা : ৩২
২৮শে মার্চ, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : স/৯২৭/৭৯

ভ্যারাইটি স্টোর্স
৭, গোরক্ষবাসী রোড, দমদম
কলকাতা : ২৮

পত্র-সূত্র : ব/৮৬৪/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২৪শে মার্চ, ১৯৭৯ তারিখের পত্রের জন্যে ধন্যবাদ। আপনারা ১২ গ্রোস

স্থলেখা [বিশেষ] কালির ফরমাস দিয়ে আমাদের সঙ্গে কারবারে যে সহযোগিতার স্বাক্ষর রাখলেন, তাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি।

আপনারা জানেন যে, নির্দেশিত মাল কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে আমরাই আমাদের নিজস্ব মালবাহী গাড়িতে সরবরাহ করে থাকি এবং সেজন্যে কোনরূপ পরিবহণ-ব্যয় দাবি করা হয় না। মূল্য-শোধের শর্তাদি পূর্ব-পত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

আমাদের মাল যথেষ্ট মজুত আছে। তাতে আপনাদের নির্দেশমতো মাল সরবরাহ করতে আমাদের কোন অসুবিধাই হবে না ; কেবল প্যাকিং-এর জন্যে একদিন সময় লাগবে। আগামী ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯ তারিখের বেলা ১২টার মধ্যে আপনারা মাল সরবরাহ পাবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীযামিনীরঞ্জন ঘোষ

[স্থলেখা কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

॥ ফরমাস-সম্পাদন পত্র ॥

২ প্রশ্ন ॥ ফরমাস অনুযায়ী মাল সরবরাহ করা হয়েছে। তদনুযায়ী একখানি ফরমাস-সম্পাদন পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** ফরমাস-সম্পাদনের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মুদ্রিত প্রপত্র থাকে। তা নির্দেশ-অনুযায়ী পূরণ করে শীলমোহর ও ভারপ্রাপ্ত সরবরাহ-আধিকারিকের স্বাক্ষরসহ প্রেরিত হয়। কিন্তু তৎসহ পণ্য ও তার মূল্যের বিশদ বিবরণসম্বলিত সৌজন্যমূলক একখানি পত্র প্রেরণ করা উচিত। এই পত্রে ভূমিকা ও ফরমাস-সম্পাদন সংবাদ—দস্তুরি ও মূল্য-শোধের শর্ত—প্যাকিং সম্পর্কে আশ্বাস—উপসংহার—এই প্রসঙ্গগুলি আলোচিতব্য।]

॥ পত্রাদর্শ ১১ ॥

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ

[বিবিধ পণ্যের আমদানিকারক]

টেলিগ্রাম : 'ট্রেড'
টেলিফোন : ৪৬-৮৩৪৭

৩২, পার্ক সাইড রোড
কলকাতা : ২৬
২২শে এপ্রিল, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/১৮৭৫/৭৯

নাইডু এণ্ড কোং
১৫৭, রাজাগোপালাচারী রোড
মাদ্রাজ : ২

পত্র-সূত্র : জ/৫২৫/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের প্রেরিত ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখের ফরমাস অনুসারে 'নিভা' জল গরম করবার স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের—'ক' শ্রেণীর এক ডজন ও 'খ' শ্রেণীর এক ডজন—মোট দু' ডজন মাল প্রেরিত হলো।

আমাদের ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখের পত্রের শর্তেই এই মাল প্রেরণ করা হয়েছে। তাতে ২৫% হারে দস্তুরি প্রদত্ত হয়েছে এবং মূল্য-শোধের ব্যাপারে প্রথমে এক-তৃতীয়াংশ ও অবশিষ্টাংশ ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ্য।

মাল বিশেষ তত্ত্বাবধানে উত্তম প্যাকিং করা হয়েছে। সঙ্গে চালানী রসিদ পাঠান হলো। প্যাকিং-এর পূর্বে অবশ্য মালগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তবুও মালের কোনপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আমরা ফেরত নিতে বাধ্য থাকবো।

আপনাদের ফরমাস ও সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আশা করি, ভবিষ্যতে অনুরূপ সহযোগিতালাভে বঞ্চিত হবো না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়
[বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

॥ ফরমাস-প্রত্যাখ্যান পত্র ॥

৩ প্রশ্ন ॥ তুমি তোমার সাইকেলের কারবার বন্ধ করে দিয়েছ। ফরমাস প্রত্যাখ্যান করে একখানি পত্র লিখ।

[**পত্র-সংকেত ঃ** ফরমাস-প্রত্যাখ্যান করলেও তা সৌজন্যমূলক পত্রে জানিয়ে দেওয়াই ব্যবসায়-জগতের রীতি। এই পত্রে ভূমিকা—ফরমাস প্রেরণের জন্যে ধন্যবাদ—ফরমাস-সরবরাহে অক্ষমতা—উপসংহার—এই প্রসঙ্গগুলি আলোচিতব্য।]

॥ পত্রাদর্শ ১২ ॥

সেন্ট্রাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ (প্রা) লিঃ
[ঘড়ি, রেডিও ও সাইকেল প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাফ ঃ 'সিল' — ৪, নেতাজী সুভাষ রোড
টেলিফোন ঃ ২২-৫১৫২ — কলকাতা ঃ ১
২৫শে মার্চ, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা ঃ চ/১/৫৩/৭৯

রঞ্জন স্টোর্স
বেলুড় বাজার,
হাওড়া

পত্র-সূত্র ঃ গ/১/৩১/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২০শে মার্চ, ১৯৭৯ তারিখের ফরমাস-পত্রের জন্যে ধন্যবাদ। আপনারা উক্ত পত্রে আমাদের প্রস্তুত এক ডজন 'স্পীড' সাইকেলের ফরমাস দিয়ে আমাদের সঙ্গে কারবারে যে সহযোগিতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার জন্যে আমরা চিরদিন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন অনিবার্য কারণে গত ছয় মাস হলো' আমরা 'স্পীড' সাইকেল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছি। সেই কারণে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে এক্ষেত্রে সম্ভব হলো না।

আশা করি, ভবিষ্যতে আমরা আমাদের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়ে আপনাদের ফরমাস এবং অন্যান্য সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভে বঞ্চিত হবো না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীআব্দুল খালেক চৌধুরী

[সেন্ট্রাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

॥ ফরমাস-বাতিল পত্র ॥

৪ **প্রশ্ন** ॥ তোমার ফরমাসমতো মাল প্রেরণে বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের অত্যধিক বিলম্ব হচ্ছে। ফরমাস বাতিল করে একখানি পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত** ঃ ফরমাস-বাতিল পত্রও সৌজন্যমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ পত্রে ভূমিকা—স্বীকৃতি-পত্রের উল্লেখ—ফরমাস-পত্রের শর্ত—বিলম্বে ফরমাস বাতিলের সম্ভাবনা—উপসংহার—এই প্রসঙ্গগুলি আলোচিতব্য।]

॥ পত্রাদর্শ ১৩ ॥

ইস্টার্ণ ট্রেডার্স লিঃ

[যাবতীয় ফরমাস সরবরাহকারক]

টেলিগ্রাম : 'ইস্ট' — ৩৩৯, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড

টেলিফোন : ২৩-৪৩৮৯ — কলকাতা : ৪৭

৩রা জুন, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : খ/৭০২৬/৭৯

ন্যাশন্যাল রবার কোং লিঃ

২০, জওহরলাল নেহরু রোড

কলকাতা : ১৩

পত্র-সূত্র : ছ/১০৫/৭৯

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে আমরা 'দু ডজন ২৪ নং সাইকেল টায়ারের ফরমাস দিয়ে আপনাদের কাছে পত্র লিখেছিলাম। আপনারাও আপনাদের ১৭ই এপ্রিলের পত্রে উক্ত ফরমাস-প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি আপনাদের মাল বা কোনরূপ পত্র আমাদের হাতে এসে পৌছলো না। আমাদের ফরমাস-পত্রে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছিল যে, ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখের পরে মাল প্রেরিত হলে উক্ত মাল গ্রহণে আমরা বাধ্য থাকবো না।

আমাদের পত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত সেই তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবুও আপনাদের মাল এসে না পৌছানোর ফলে আমরা আমাদের প্রদত্ত ফরমাস বাতিল করে দিতে বাধ্য হলাম। বলাবাহুল্য, এরপর মাল পৌছলে আমরা তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবো না। পত্রোত্তরে আপনারা যদি যথাযথ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি না দেন, ভবিষ্যতে ফরমাস প্রেরণে আমরা বিরত থাকবো।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীপ্রীতিরঞ্জন পাল
[ইস্টার্ন ট্রেডার্স লিঃ-এর পক্ষে]

॥ ফরমাস-সংগ্রহ পত্র ॥

৫ প্রশ্ন ॥ তুমি কোন বিদেশী পণ্য আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো। ফরমাস আহ্বান করে কোন ক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের কাছে একখানি পত্র রচনা কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** পত্রটির সঙ্গে বিক্রয়-প্রস্তাব সংক্রান্ত পত্রের মিল আছে।]

॥ পত্রাদর্শ ১৪ ॥

স্বর নিয়োগী এণ্ড কোং
[যাবতীয় ফরমাস সরবরাহকারক]

টেলিগ্রাম ঃ 'স্বনিকো'
টেলিফোন ঃ ২২-৫২৯৪

৬, রাজা উডমণ্ট স্ট্রীট
কলকাতা ঃ ১

পত্র-সংখ্যা ঃ দ/১৬২/৭৯

৭ই মার্চ, ১৯৭৯

বসুমিত্র এণ্ড কোং
৭৭, গড়িয়াহাট রোড
কলকাতা ঃ ১৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের কারবারের সঙ্গে যে সহযোগিতা করে আসছেন, তার জন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিক্রমে নলকূপের ফিল্টার ইত্যাদি মূল্যবান যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের দেশের মৃত্তিকায় ও জলবায়ুতে এই ফিল্টার অত্যন্ত কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বহু পুনর্স্থাপন-ব্যয়ও বহুলাংশে বেঁচে যাবে।

আমরা বিষয়টির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উপযোগিতার তুলনায় এর মূল্য অতি অল্প। আশা করি, আপনাদের ফরমাস ও অন্যান্য সহযোগিতালাভে আমরা বঞ্চিত হবো না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীধর্মদাস সুর
[সুর নিয়োগী এণ্ড কোং-র পক্ষে]

অনুসরণী-৫

১. ফাউন্টেন পেনের ফরমাস গ্রহণ করে একটি পত্র লিখ; এবং কিভাবে ও কখন ঐ ফরমাসী পণ্য সরবরাহ করা হবে, তা উল্লেখ কর। [পত্রাদর্শ ১০ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭১

২. তুমি পশমী পণ্যের ফরমাস পেয়েছো। কিভাবে এবং কখন ফরমাস সম্পাদিত হবে, তা জানিয়ে একখানি ফরমাস-স্বীকৃতি পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১০ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬০

৩. এক ব্যবসায়ী ফরমাসমতো তৈরী জামার চালান পাঠিয়েছে। প্রেরকের কাছ থেকে পণ্য চালানের সংবাদ এবং অন্যান্য দলিলপত্রাদি পাঠিয়ে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১১ দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭১

৪. ফরমাস অনুযায়ী সরবরাহ করবার মতো মাল তোমার গুদামে মজুত নেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল-প্রেরণের অসামর্থ্যের কথা জানিয়ে একখানি পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১১ দ্রষ্টব্য]

৫. তুমি যে মাল চেয়ে ফরমাস [অর্ডার] দিয়েছিলে, বাজারে তার মূল্য-হ্রাস ঘটেছে এবং তাতে তোমার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ফরমাস [অর্ডার] বাতিল করে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১৩ দ্রষ্টব্য]

৬. তোমার প্রতিষ্ঠানের জনৈক পুরাতন ক্রেতা দীর্ঘদিন ধরে তোমাদের কাছে কোন ফরমাস দিচ্ছেন না। সত্বর ফরমাস পাঠাবার অনুরোধ করে একখানি পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১৪ দ্রষ্টব্য]

৬.

আদায়, দাবি, অভিযোগ ও মীমাংসা-সংক্রান্ত পত্র

উ. মা. '৬১, '৬৪ ; ক. বি. '৫৮, '৬০, '৬২, '৬৪, '৬৫, '৭১, '৭৩ ; ব. বি. '৬৪

আদায়-সংক্রান্ত পত্র বিক্রেতা লেখেন ক্রেতার কাছে। মূল্যশোধের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মূল্য-পরিশোধ না করলে বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান এরূপ পত্র দিতে বাধ্য হন। এরূপ পত্রের আর এক নাম তাগাদা পত্র বা তাগিদ পত্র। এই পত্রের ভাষাও সৌজন্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

চালানী মাল চুক্তি-অনুযায়ী কখনও প্রেরিত হয় বিক্রেতার দায়িত্বে, কখনও প্রেরিত হয় ক্রেতার দায়িত্বে। প্রেরিত মাল অনেক সময় পরিবহণ-কর্তৃপক্ষের হেপাজাত থেকে চুরি যায়, নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা মাল এসে পৌঁছোতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। সেজন্যে ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষ থেকে রেল-কর্তৃপক্ষ, ডাক-বিভাগ, মোটর-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বিমান-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বা জাহাজ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে পত্র লিখতে হয়।

অভিযোগ-পত্রের আর এক নাম হলো প্রতিবাদ পত্র। বিক্রেতার প্রেরিত মাল ত্রুটিযুক্ত হলে কিংবা নিম্নমানের হলে ক্রেতা-পক্ষ অভিযোগ পত্র লিখে থাকেন। আবার অনেক সময় বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী ক্রেতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেও অভিযোগ-পত্র লিখিত হয়।

সর্বশেষ স্তর হলো মীমাংসা-পত্র। ক্রেতা বা বিক্রেতা-পক্ষ পত্র ও পত্রোত্তরের বাদানুবাদের ওপর যবনিকাপাত করে মীমাংসা-পত্র লিখতে পারেন।

॥ আদায় পত্র ॥

১ প্রশ্ন ॥ চুক্তি অনুযায়ী মূল্য-শোধের তারিখ অতিক্রান্ত হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে মূল্য-শোধ করবার জন্যে তাগাদা দিয়ে ক্রেতার কাছে একখানি পত্র লিখ।

[**পত্র-সংকেত ঃ** এই পত্রের ভাষাও সৌজন্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, ভূমিকা—মাল-প্রেরণ ও চুক্তির বিবরণ—তাগাদা-পত্র লেখার কারণ—দেয় অর্থের পরিমাণ—শোধ দেবার সময়-সীমানা নির্দেশ—অনুরোধ—উপসংহার—এই প্রসঙ্গগুলি আলোচিতব্য।]

॥ পত্রাদর্শ ১৫ ॥

ভারত ইলেক্‌ট্রিক্যাল্‌স লিঃ

[ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্‌ ও এয়ারকুলার প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম : 'কুলার' — ১৫, নেতাজী সুভাষ রোড
টেলিফোন : ৩৩-৩২০৮ — কলকাতা : ১
২৭শে মে, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/১১৭৫/৭৯

সোহনলাল মোহনলাল
৯১, মনোহর পুকুর রোড
কলকাতা : ২৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের প্রেরিত গত ২রা আগস্ট, ১৯৭৮ তারিখের নির্দেশানুযায়ী আমরা ৭ই আগস্ট, ১৯৭৮ তারিখে মাল প্রেরণ করেছি। চুক্তি-অনুসারে মালের চালান গ্রহণ করবার সময় আপনারা এক-তৃতীয়াংশ মূল্য শোধ করেছেন এবং অবশিষ্টাংশ ছয় মাসের মধ্যে শোধ দিবেন বলে কথা ছিল। কিন্তু তার পরেও এক বছর তিন মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন মূল্য-শোধের ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়োজন বোধ করছি।

হিসাব-মতো আপনাদের দেয় টা. ৯৭৫.০০ [নয় শো পঁচাত্তর টাকা] মাত্র বাকি। আগামী এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে জুন, ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত বকেয়া দেয় শোধ দেবার ব্যবস্থা করলে বাধিত হবো।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
[ভারত ইলেক্‌ট্রিক্যাল্‌স লিঃ-এর পক্ষে]

॥ ক্ষতিপূরণ দাবিপত্র ॥

২ প্রশ্ন ॥ রেলে তোমার যে মাল চালান এসেছে, তা ঠিকমত আসে নি বলে ক্ষতিপূরণ দাবি করে রেল-কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত রচনা কর। ক. বি. '৫৮

[**পত্র-সংকেত ঃ** এই পত্রে রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু রেল-কর্তৃপক্ষ কেন, যে-কোন পরিবহণ-কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরূপ পত্র লেখার নির্দেশ আসতে পারে। এই সব পত্রে রেল-রসিদের নং উল্লেখ করতে হয়। তাছাড়া, মালের বিবরণ—বুকিংস্থল—তারিখ—অনুসন্ধান ও ব্যর্থতা—তদন্ত করার ও প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণ দাবির প্রপত্র প্রেরণের অনুরোধ—রেল-কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব—মূল্য—চালানের অনুলিপি—উপসংহার—এইপ্রসঙ্গগুলি আলোচিতব্য।]

॥ পত্রাদর্শ ১৬ ॥

নিউ ক্যালকাটা স্টোর্স
[সকল প্রকার ফরমাস সরবরাহকারক]

৬, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা : ১
২৫শে মে, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/২১৮/৭৯

মুখ্য বাণিজ্যিক কর্মকর্তা,
পূর্ব রেলপথ
৩, কয়লাঘাট স্ট্রীট
কলকাতা : ১

বিষয় : ক্ষতিপূরণ দাবি

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখের গ/৩১৪৭/৭৯ সংখ্যক রেল-রসিদ অনুযায়ী তিনটি রেডিও-সেট রেলযোগে দিল্লী স্টেশন থেকে আমাদের কলকাতার ঠিকানায় প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আজ পর্যন্ত তা এখানে এসে পৌঁছোয় নি। আশঙ্কা হয়, ওগুলি সম্ভবতঃ হারিয়ে গেছে। আপনাদের অফিসে বহুবার অনুসন্ধান করে ওগুলির কোন হদিশ পাই নি। তাই বাধ্য হয়ে এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনাকে পত্রপাঠ উক্ত মালের বিষয়ে তদন্ত করতে অনুরোধ করছি। যদি উহা হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ-দাবির প্রপত্র [form] পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

চুক্তি-অনুযায়ী এই মাল পূর্বরেল-কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে প্রেরিত হয়েছিল। কাজেই, এই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব যে পূর্বরেল-কর্তৃপক্ষের, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

চালানে উল্লেখ আছে, উক্ত মালের মূল্য ৩,০০০.০০ [তিন হাজার] টাকা। সেই চালানের একটি অনুলিপি আপনাদের সুবিধার জন্যে এই দরখাস্তের সঙ্গে প্রেরিত হলো।

আশা করি, সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে উক্ত মালের ক্ষতিপূরণ বাবদ আমাদের প্রাপ্য অর্থ সত্বর প্রদানের ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
বিরল দাশগুপ্ত
[নিউ ক্যালকাটা স্টোর্স-এর পক্ষে]

ক্রোড়পত্র : ১

॥ অভিযোগ পত্র ॥

৩ প্রশ্ন ॥ তুমি একটি বিদেশী কোম্পানীর কাছে অগ্রিমসহ যে মালের নির্দেশ দিয়েছিলে, তা সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু তা নিম্নমানের। উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত পাঠাবার অনুরোধ করে কোম্পানীর কাছে পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ১৭ ॥

নিউ ইণ্ডিয়া কটন মিল্‌স (প্রা) লিঃ

[উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুতকারক]

টেলিগ্রাম : 'ফ্যাব্রিক্‌স'
টেলিফোন : ২২-৪২৭৮
আমদানি-অনুজ্ঞাপত্র নং : ইণ্ডিয়া/৩২৩/৭৯-৮০

৩, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ [পূর্ব]
কলকাতা : ১
১৫ই মে, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ক/৭১৬/৭৯

স্মিথ বসির এণ্ড কোং
৬, নাসের এভিন্যু,
কায়রো
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের গত ৩রা মার্চ, ১৯৭৯ তারিখের ফরমাস-পত্র অনুযায়ী আপনাদের দু'টন প্রথম শ্রেণীর তুলা পাঠাতে অনুরোধ করা হয়েছিল ; তার প্রত্যুত্তরে ১৭ই মার্চ তারিখে আপনাদের ভুলক্রমে প্রেরিত দু'টন দ্বিতীয় শ্রেণীর তুলা গত ৭ই মে এখানে এসে পৌঁচেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি যে, প্রথম শ্রেণীর তুলার মূল্যের হিসাবে ৫০ শতাংশ মূল্য অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছিল। কিন্তু যে তুলা আপনারা সরবরাহ করেছেন, তার মূল্য চলতি বাজারে আমাদের অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের ১০ শতাংশ কম।

এই বিতর্কমূলক পরিস্থিতিতে আমরা আপনাদের মাল সরবরাহ নিতে পারছি না। কাজেই, আপনাদের প্রেরিত তুলার দ্বিতীয় শ্রেণীর মালের মূল্য গ্রহণ করতে আপনারা রাজী আছেন কিনা এবং রাজী থাকলে আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ফেরত দেবার জন্যে প্রস্তুত আছেন কিনা জানালে আমরা মাল সরবরাহ গ্রহণে অগ্রসর হবো।

কিন্তু মাল সরবরাহ গ্রহণে এই বিলম্বের জন্যে বিলম্ব-শুল্ক এবং বন্দরে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণও আপনাদের দিতে হবে। পত্রের উত্তরে আপনাদের নির্দেশ এলে সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আশা করি, পত্রপাঠ আপনাদের ভুল সংশোধন করে আমাদের বাধিত করবেন। নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রভাতকুমার চন্দ্র
[নিউ ইণ্ডিয়া কটন মিল্‌স্ (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

॥ মীমাংসা পত্র ॥

৪ প্রশ্ন ॥ তুমি যে মালের ফরমাস দিয়েছিলে, তা সরবরাহ করা হয়েছে ; কিন্তু তার মান ঠিক নেই এবং দরও বাজার অপেক্ষা উচ্চ। তুমি বাজার-দরে যথামানের মাল ঐ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেই প্রেরিত মালের পরিবর্তে নিতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ কর।

[**পত্র-সংকেত ঃ** ভূমিকা—পণ্যের নিম্নমান ও উচ্চমূল্য—যোগ্যমানের মাল পাঠাবার অনুরোধ—মাল ফেরত পাঠাবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ১৮ ॥

পোদ্দার এণ্ড সন্স (প্রা) লিঃ
[প্রথম শ্রেণীর কাগজ বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম : 'কাগজ'
টেলিফোন : ২২-৪৫৬১

২২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
কলকাতা : ১
২৪শে মে, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : খ/৩২৩৭/৭৯

টিটাগড় পেপার মিল্‌স লিঃ
টিটাগড়,
চব্বিশ পরগনা
সবিনয় নিবেদন,

আমরা আপনাদের কাছে ২০০ [দু' শো] রিম্ ২০ কে. জি. ওজনের যে এন্টিক্ কাগজের ফরমাস দিয়েছিলাম, তা গতকাল এখানে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই মাল আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না। কারণ, এই কাগজ নমুনা অপেক্ষা মানে বহু অংশে নিকৃষ্ট এবং মূল্যও অধিক।

এই কাগজের বড় ত্রুটি হলো, তা ওজনে ২০ কে. জি. নয়, রংও সম্পূর্ণ শাদা নয়। তাই মালের চালান বাধ্য হয়ে ফেরত পাঠাতে হলো। সঙ্গে নমুনার কাগজও প্রেরিত হলো।

এই নমুনার ২০ কে. জি. ওজনের এন্টিক্ কাগজ যদি আপনাদের গুদামে থাকে এবং বাজার-দরে অর্থাৎ রিম্-প্রতি ৫০.০০ [পঞ্চাশ] টাকা হারে সরবরাহ করতে যদি আপনারা সম্মত থাকেন, তবে অবিলম্বে আমাদের ফরমাস-অনুযায়ী ২০০ রিম্ এন্টিক্ কাগজ পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

মাল ফেরত পাঠাতে হলো বলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু বাজারের বর্তমান অবস্থায় এ ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। তবে আমাদের ফরমাস-পত্রের উল্লিখিত শর্তাবলী সমস্তই কার্যকরী থাকবে।

আশা করি, এতে আপনাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কোনরূপ অবনতি হবে না এবং ফরমাস-অনুযায়ী মাল পেতে বিলম্ব হবে না।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীযোগেশচন্দ্র পোদ্দার
[পোদ্দার এণ্ড সন্স (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে]

ক্রোড়পত্র : ১

অনুসরণী-৬

১. চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার মূল্য পরিশোধের তারিখ উত্তীর্ণ হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে মূল্য-শোধের নির্দেশ দিয়ে একখানি পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১৫ দ্রষ্টব্য]

২. তোমার চালানী মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করে রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১৬ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৬০,

৩. তোমার প্রেরিত মাল রেল-দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণ দাবি করে রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১৬ দ্রষ্টব্য]

৪. তোমার বস্ত্র-ব্যবসায় আছে। অন্য প্রদেশ থেকে মাল আমদানি করতে হয়। কিছু মাল রেলপথে আসবার সময় খোয়া গেছে। মালের বিবরণ দিয়ে রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করে পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১৬ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৭১

৫. দিল্লী থেকে কলকাতায় তোমার ঠিকানায় বিমানযোগে প্রেরিত কিছু মাল দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণ দাবি করে বিমান-কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ১৬ দ্রষ্টব্য]

৬. জাহাজডুবি হয়ে বিদেশ থেকে আমদানি-করা মাল নষ্ট হয়ে গেছে। উপযুক্ত স্থানে খেসারত দাবি করে পত্রের মুসাবিদা কর। [পত্রাদর্শ ১৬ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৭৩

৭. তুমি যে মালের ফরমাস দিয়েছিলে, তা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের কাছে সেই বিষয়ে অভিযোগ করে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১৭ দ্রষ্টব্য]

৮. ক্রেতা-প্রতিষ্ঠান মালের চালান গ্রহণ করে নিম্নমানের মূল্য দিবার প্রস্তাব করেছে। মাল সঠিক মানের ছিল এবং তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে—ক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের কাছে এই মর্মে একখানি পত্র লিখ।

[নিজে চেষ্টা কর]

এজেন্সী-প্রার্থনা পত্র

ক. বি. '৫৭, '৬২ : ব. বি. '৬৩

উৎপাদক কোন বড় ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের পণ্য বিক্রয়ের এজেন্সী দেন। এজেন্টরা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে সেই পণ্য বিক্রী করে থাকেন। তার বিনিময়ে এজেন্টরা একটা দস্তুরি [কমিশন] পান।

যে-কোন ব্যক্তি এজেন্সী প্রার্থনা পত্র লিখতে পারেন।

এই পত্রে কতকগুলি বিষয়ে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন, স্থানীয় বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের চাহিদার প্রাচুর্য, আবেদনকারীর আর্থিক সংগতি কতখানি নির্ভরযোগ্য, পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও বিক্রয়-শিল্পে নৈপুণ্য, পণ্য-প্রচারের সুযোগ-সুবিধা, দস্তুরি বা কমিশনের স্বল্পতা, পরিচয়-সূত্র ইত্যাদি।

১ প্রশ্ন ॥ বিদেশী কারবারের এজেন্সী নেবার উদ্দেশ্যে সেই কারবারের কর্তৃপক্ষকে নিজের ব্যবসায়ের বিবরণ দিয়ে পত্র লিখ। ক. বি. '৬২

[**পত্র-সংকেত** ঃ ভূমিকা—আত্ম-পরিচয়—বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক—নিজ ব্যবসায়ের সংগতি ও সুবিধা—অন্যান্য শর্ত—পরিচয়-সূত্র—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ১৯ ॥

প্রতিভা পুস্তকালয়

[পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা]

টেলিগ্রাম: 'গ্রন্থ'

টেলিফোন : ৩৫-৫৩৩২

আমদানি-অনুজ্ঞাপত্র নং : ইণ্ডিয়া/৪৫৯/৭৯-৮০

২৫, কলে

কলকাতা : ১২

ভারত

১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯

পত্র-সংখ্যা : ব/২২৩০/৭৯

কার্টিস ব্রাউন লিঃ

৩, ওয়াটার্লু স্কোয়ার

লণ্ডন-৩

বিষয় : এজেন্সী প্রার্থনা

সবিনয় নিবেদন,

গত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে আমরা ভারতে সাফল্যের সঙ্গে পুস্তকের ব্যবসায় করে আসছি। ভারতে পুস্তক-ব্যবসায়ে আমরা যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছি। আমাদের পুস্তকের বাজার সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত। আমাদের বিক্রয়-কলা ও প্রচার-নৈপুণ্যের ফলেই যে তা সম্ভব হয়েছে, তা বলাবাহুল্য।

ইতিমধ্যে আমরা আপনাদের প্রকাশিত সুদীর্ঘ পুস্তক-তালিকার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তালিকা দেখে আমাদের অনুমান, ভারতে আপনাদের প্রকাশিত পুস্তকের একটি সম্ভাবনাময় বাজার আছে। আপনাদের পুস্তকের এজেন্সী পেলে সেই চাহিদা যে আমাদের বিক্রয়-কলা ও প্রচার-নৈপুণ্যের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রতিষ্ঠান কলকাতার অভিজাত এবং প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। আমাদের বর্তমান চলতি মূলধনের পরিমাণ অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকা। স্থানীয় পুস্তক-ব্যবসায়ীদের ওপর আমাদের প্রভাবও অসামান্য। তাছাড়া, ভারতের বিশিষ্ট শহরগুলিতে আমাদের অনেকগুলি বিক্রয়কেন্দ্র থাকায় পুস্তক-বিক্রয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা আছে।

আমরা আপনাদের কাছ থেকে ২৫% হারে দস্তুরি প্রত্যাশা করি। অবশ্য, মাল-প্রেরণ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় আপনাদের।

আমাদের সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাই করবার জন্যে 'রূপা এণ্ড কোং' ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা : ১২, ভারত—এঁদের কাছে অনুসন্ধান করতে পারেন।

আশা করি, সমুদয় বিষয় বিচার-বিবেচনা করে আপনারা আমাদের এজেন্সী প্রদান করে আমাদের উভয়পক্ষের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করবেন।

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য
[প্রতিভা পুস্তকালয়ের পক্ষে]

অনুসরণী-৭

১. সম্প্রতি ভারত সরকার বিদেশ থেকে পুস্তক আমদানির বিধি-নিষেধ শিথিল করেছেন। তার উল্লেখ করে বিলাতের কোন সম্রান্ত পুস্তক-ব্যবসায়ীর কাছে এজেন্সী প্রার্থনা করে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১৯ দ্রষ্টব্য]

২. কোন কোম্পানীর দ্রব্যের এজেন্সী প্রার্থনা করে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১৯ দ্রষ্টব্য]

৩. ব্রিটেনের কোন পুস্তক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রেত ও সামর্থ্য জানিয়ে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ১৯ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৫৭

ব্যাঙ্ক ও বীমা-সংক্রান্ত পত্র

ক. বি. '৫৭, '৭২ ; ব. বি. '৫৩

ব্যাঙ্কের কাজ দ্বি-বিধ: আমানত গ্রহণ ও ঋণদান। কাজেই, ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত পত্র যত রকমেরই হোক, এই দুটি বিভাগেই সীমাবদ্ধ। ঋণ-প্রার্থীর পক্ষ থেকে এবং বহু আমানতকারীর তরফ থেকে ঋণ-প্রার্থনা বা জমাতিরিক্ত প্রার্থনা করে পত্র লিখিত হয়। স্মরণীয় যে, ব্যাঙ্কের সঙ্গে পত্রালাপে ব্যাঙ্কের হিসাব-সংখ্যা [Account No.] সব সময় উল্লেখ করতে হয়।

জীবনবীমা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও অনুরূপভাবে ঋণ গ্রহণ করা যায়। সেজন্যে বীমা-পত্রটি গচ্ছিত রাখতে হয়। অবশ্য, সেই বীমাপত্রের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রত্যর্পণ-মূল্য হওয়া চাই।

এরূপ পত্রে বীমাপত্র-সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

॥ ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত পত্র ॥

●১ প্রশ্ন ॥ বিলাত থেকে মাল আনাবার জন্যে বিদেশী-মুদ্রা চেয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখ।

[**পত্র-সংকেত:** আত্ম-পরিচয়—আমদানিযোগ্য যন্ত্রপাতির বৈশিষ্ট্য—ভারতে উৎপন্ন হয় না, অথচ বিদেশী-মুদ্রা অর্জনে সক্ষম ও ভারতের অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজন—তালিকা—প্রার্থিত বিদেশী-মুদ্রার পরিমাণ ও সমপরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা-প্রদানের প্রতিশ্রুতি—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ২০ ॥

বেঙ্গল ট্রেডিং কোং লিঃ
[যন্ত্রপাতি আমদানি ও রপ্তানিকারক]

টেলিগ্রাম: 'যন্ত্র'
টেলিফোন: ২৫-৭০৩১

১৭, পার্ক স্ট্রীট
কলকাতা: ১৪
২৭শে জুন, ১৯৭৭

পত্র-সংখ্যা: ব/৩০০১/৭৭

আমদানি-অনুজ্ঞাপত্র নং: ইণ্ডিয়া খ/১২০৩/৭৭-৮০

প্রশাসক,
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া,
নয়াদিল্লী

সবিনয় নিবেদন,

দীর্ঘকাল ধরে আমরা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে আসছি। সম্প্রতি আমদানি-ব্যাপারে সরকার বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি শিথিল করায় আমাদের

ভারতের শিল্প-প্রগতির চাহিদানুযায়ী বিদেশ থেকে কতকগুলি কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হচ্ছে। এতে বর্তমানে কিছু পরিমাণ বিদেশী-মুদ্রা ব্যয়িত হলেও ভবিষ্যতে এর দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিদেশী-মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। তাছাড়া, ভারতীয় বাণিজ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই যন্ত্রগুলি ভারতে উৎপন্ন হয় না। সম্প্রতি, অনুরূপ যে সব যন্ত্রপাতির নির্দেশ আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে, আপনাদের অবগতির জন্যে নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হলো :

১. খনিজ তৈল উত্তোলক যন্ত্র : দু'টি।
২. খনিজ তৈল পরিশোধক যন্ত্র : একটি।
৩. ট্রাক্টারের বিশেষ বিশেষ অংশ : এক হাজারটি।
এবং ৪. হিমঘরের জন্যে এয়ারকুলার যন্ত্র : পাঁচটি।

এই যন্ত্রগুলি বিলাতের কয়েকটি বিশিষ্ট কোম্পানী থেকে ক্রয় করতে হবে। ভারত সরকারের বাণিজ্য-মন্ত্রক উল্লিখিত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশগুলি আমদানি করতে আমাদের অনুমতি দিয়েছেন। অনুজ্ঞাপত্র নং পত্রোর্ধ্বে উল্লিখিত হয়েছে। তার একটি অনুলিপি এই সঙ্গে প্রেরিত হলো। কিন্তু বিদেশী-মুদ্রা ছাড়া এই অতি-প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি আমদানি ও সরবরাহ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রায় উক্ত যন্ত্রগুলির মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। কাজেই, পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের স্টার্লিং মুদ্রা এ ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্যে আমরা ভারতীয় মুদ্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা আপনাদের কাছে অর্পণ করবার নির্দেশের প্রতীক্ষায় আছি।

আশা করি, ভারতীয় বাণিজ্য, বিশেষতঃ তার শিল্প-প্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসত্বর আমাদের প্রার্থনা পূরণ করে বাধিত করবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়
[ভারত ট্রেডিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

ক্রোড়পত্র : আমদানি-অনুজ্ঞাপত্রের অনুলিপি।

॥ বীমা-সংক্রান্ত পত্র ॥

২ প্রশ্ন॥ ভারতের বীমা-নিগমের কাছে বীমাপত্র বন্ধক রেখে তুমি ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ; কি শর্তে, কতদিনের মধ্যে, কত ঋণ নিতে পার, জানতে চেয়ে কার্যাধ্যক্ষের কাছে একখানি পত্র লিখ।

[পত্র-সংকেত : উদ্দেশ্য—মূলধনের প্রয়োজন ও সামর্থ্য—বীমাপত্র বন্ধক রাখার প্রস্তাব—ঋণের শর্ত—সময় ও অর্থ-পরিমাণ—উপসংহার।]

॥ পত্রাদর্শ ২১ ॥

টেলিফোন : ৪৬-৩২১৩

১৭, গড়িয়াহাট রোড

কলকাতা : ৩১

২৫শে জুন, ১৯৭৯

কার্যাধ্যক্ষ,
ভারতীয় বীমা নিগম
সিটি শাখা, ইউনিট সংখ্যা-৫
৬৪, গণেশচন্দ্র এভিন্যু
কলকাতা : ১

বীমাপত্র-সংখ্যা : এ/১৭৫৬৩২

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি নারিকেল কাতান-শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনার বিষয় অবগত হয়ে আমি শীঘ্রই একটি কাতান-শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে মনস্থ করেছি। এরূপ একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে প্রায় ৩০,০০০.০০ [ত্রিশ হাজার] টাকার চলতি মূলধন দরকার। কিন্তু আমার হাতে মাত্র ৬০,০০০.০০ [ষাট হাজার টাকার] বীমাপত্র আছে।

আমি উক্ত বীমাপত্র আপনাদের কাছে বন্ধক রেখে আমার প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণ গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত করেছি। কুড়ি বছরের মেয়াদী এই বীমাপত্রের দশ বছরের চাঁদা প্রদত্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় কি শর্তে, কতদিনের মধ্যে এবং কত পরিমাণ অর্থ আপনাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারি, জানালে বাধিত হবো।

আপনাদের কাছ থেকে সত্বর উত্তর প্রত্যাশা করি।
নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীপ্রতুল সরকার

অনুসরণী-৮

●১. কাষ্টম্‌স থেকে মাল খালাস করবার জন্যে তোমার ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ চেয়ে একটি পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য]
ক. বি. '৫৯

●২. একটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকার দাদন চেয়ে ও ব্যবসার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি আবেদন-পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য]
ক. বি. '৬২

●৩. তোমার বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে টাকার দাদন চেয়ে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৬৩

●৪. পশ্চিম জার্মানী থেকে মাল আনাবার জন্যে বিদেশী-মুদ্রা চেয়ে ও তোমার আবেদনের যৌক্তিকতা দেখিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য ; পশ্চিম জার্মানীর মুদ্রার নাম ফ্রাঙ্ক] ক. বি. '৬৬

●৫. তোমার কারবার বাড়াবার জন্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রাদি আনাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে বিদেশী-মুদ্রা চেয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত লিখ। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য] ক. বি. '৬৭

●৬. ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বীমাপত্র জামিন রেখে ঋণের জন্যে বীমা কোম্পানীর কাছে আবেদন কর। [পত্রাদর্শ ২১ দ্রষ্টব্য]

●৭. তোমার গ্রামে চিনির কল বসাবার জন্যে মূলধন আবশ্যক। সেজন্য স্থানীয় স্টেট ব্যাঙ্কে সব কথা জানিয়ে অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন কর। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য]

●৮. তুমি একটি নতুন কুটির-শিল্প স্থাপন করতে মনস্থ করেছ। এটি খুবই লাভজনক এবং প্রভূত সম্ভাবনাময়। তোমার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে এবং এর রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ গ্রহণ করবার পদ্ধতি কি, তা জানতে চেয়ে তোমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২০ দ্রষ্টব্য]

●৯. তুমি কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিছু পণ্য ক্রয় করেছ এবং তার বিনিময়ে একখানি চেক কেটে দিয়েছ। পরে দেখা গেল, ক্রীত পণ্য সমস্তই ত্রুটিযুক্ত। চেকের নম্বর উল্লেখ করে তা ভাঙিয়ে দিতে নিষেধ করে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে একখানি যথোপযুক্ত পত্র লিখ।

●১০. তোমার ধারণা, ইণ্ডিয়ান আয়রনের মূল্য অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতিটি একশো টাকা মূল্যের পঞ্চাশটি শেয়ার ক্রয় করবার নির্দেশ দিয়ে তোমার ব্যাঙ্কের কাছে একখানি পত্র লিখ।

---

১০. বিবিধ-বিষয়ক পত্র

॥ সভার বিজ্ঞপ্তি ॥

১ প্রশ্ন ॥ কোনও যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের সভার একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর।

বেঙ্গল কটন মিল্‌স লিঃ

[প্রসিদ্ধ বস্ত্র-উৎপাদক প্রতিষ্ঠান]

॥ পত্রাদর্শ ২২ ॥

টেলিগ্রাম : 'ধুতি'
টেলিফোন : ৩৫-২৩৭০

১৭, বিডন স্ট্রীট
কলকাতা : ৬
১৯শে এপ্রিল, ১৯৭৯

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৩রা মে, ১৯৭৯ বুধবার সকাল নয় ঘটিকায় বেঙ্গল কটন মিল্‌স লিঃ-এর ১৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা : ৬-ঠিকানায় অবস্থিত কার্যালয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-মণ্ডলীর একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

আপনার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। ইতি—

ভবদীয়
স্বাঃ—শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য
সচিব,
বেঙ্গল কটন মিল্‌স লিঃ

সভার কার্যসূচী :

১. পূর্ববর্তী সভার কার্য-বিবরণী অনুমোদন।
২. কারখানার সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় অনুমোদন।
৩. বিবিধ।

॥ সম্পাদকের নিকট পত্র ॥

২ প্রশ্ন ॥ কলকাতা-শহরকে পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় রাখবার সপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে একখানি পত্র রচনা কর।

॥ পত্রাদর্শ ২৩ ॥

টেলিফোন : ৪৬-৩৪১৫

৩, হিন্দুস্থান পার্ক
কলকাতা : ১৯
২রা আগস্ট, ১৯৭৯

সম্পাদক মহাশয়,
যুগান্তর পত্রিকা
১১/৩, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা : ৪

সবিনয় নিবেদন,

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সি. এম. ডি. এ. কলকাতা-মহানগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখবার যে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

স্মরণীয় যে, কলকাতা মূলতঃ একটি অপরিকল্পিত নগরী এবং গত দু'শতাব্দী ধরে এর গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে এর জনসংখ্যা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি তাদের বাসস্থানের প্রয়োজনে এর আয়তনও ক্রমপ্রসারমান। সম্প্রতি এর জনসংখ্যা প্রায় পঁয়ষট্টি লক্ষকেও ছাড়িয়ে গেছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত মানুষ বাস করে, একমাত্র কলকাতাতেই বাস করে প্রায় তার এক-চতুর্থাংশ।

এই বিশাল জনসমষ্টির স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ-সংস্থানের ব্যবস্থা, তার রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন সমস্যা। সম্প্রতি সি. এম. ডি. এ. সেই সমস্যার সমাধানে ব্রতী হয়েছেন।

সেই সঙ্গে তাঁরা কলকাতা-মহানগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এর প্রধান প্রধান রাস্তাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে ও পার্কগুলিতে যে ফুলের উদ্যান সৃষ্টি করছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

কিন্তু কলকাতা-মহানগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখবার দায়িত্ব কেবল সরকার বা সি. এম. ডি. এ.-র নয় ; এতে জনগণেরও সক্রিয় দায়িত্ব আছে। পথিপার্শ্বের দেয়াল এবং রাস্তাঘাটগুলি পরিচ্ছন্ন রাখবার এবং রাস্তার ও পার্কের উদ্যানগুলির সৌন্দর্য অটুট রাখবার প্রতিশ্রুতি জনগণকেও গ্রহণ করতে হবে।

তাহলে সকলের সমবেত চেষ্টায় কলকাতা হয়তো একদিন 'কল্লোলিনী তিলোত্তমা' হয়ে উঠবে।

নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক
শ্রীসৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুসরণী-৯

১. খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ একটি জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধ দমনের জন্যে কঠোরতর আইন প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই মর্মে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

২. বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের যৌক্তিকতা স্বীকার করে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

৩. কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির কোন যোগ নাই—সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে এই মর্মে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

৪. জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে ভারতের শহরগুলির আবহাওয়া কলুষমুক্ত রাখা উচিত। এই মর্মে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একখানি স্মারক পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

৫. কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার একখানি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২২ দ্রষ্টব্য]

৬. রেল বা বাসে বিনা টিকিটে ভ্রমণ একটি জাতীয় অপরাধ। কিছু কিছু লোকের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একখানি যথোপযুক্ত পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

৭. বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাবতীয় সরকারী কাজকর্ম এবং ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একখানি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

৮. কোন যৌথ প্রতিষ্ঠানের সচিবরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি বিশেষ অধিবেশনের একখানি বিজ্ঞপ্তি রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২৩ দ্রষ্টব্য]

———

১১

ব্যক্তিগত পত্র

চিঠিপত্র পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের একটি বড় মাধ্যম। আবার, পরস্পরের মধ্যে পত্র-বিনিময় সুসভ্য সমাজের একটি সৌজন্যমূলক ও দায়িত্বপূর্ণ রীতিও বটে। প্রতিদিনই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকেই নানা কারণে পত্র লিখতে হয়। কখনো সেই সব পত্র লিখিত হয় প্রয়োজনের তাগিদে, কখনো লিখিত হয় কুশল-সংবাদ বিনিময়ের জন্যে, কখনো-বা লিখিত হয় ভাব-বিনিময়ের জন্যে। কারো কাছ থেকে পত্র এলে ভদ্রতার খাতিরে সেই পত্রের উত্তর দিতে হয়। এইভাবে পত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি অখণ্ড সামাজিকতা গড়ে ওঠে।

প্রস্তাবনা

পত্রের মধ্য দিয়ে দূরের মানুষকে কাছে পাওয়া যায়। তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়। যে ব্যক্তিকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তাকে মনশ্চক্ষুর সাহায্যে সামনে কল্পনা করে নিতে পারলে চিঠির বক্তব্যটি খুবই আবেগপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করো, তুমি বিদেশ থেকে হয়তো তোমার মায়ের কাছে চিঠি লিখছো। চিঠি লেখার আগে তুমি তোমার মাকে সামনে কল্পনা করে নাও। মার সঙ্গে যেভাবে কথা বলো, কল্পনায় ঠিক সেইভাবে কথা বলতে চেষ্টা করো। এবার কাগজ-কলম নিয়ে সেইভাবে লিখতে শুরু করো। কিংবা, তুমি হয়তো কোন প্রবাসী বন্ধুকে চিঠি লিখবে। মনে মনে তাকে সামনে কল্পনা করে তার সঙ্গে স্বগত বাক্যালাপ শুরু করো। এবার কাগজ-কলম নিয়ে তোমার সেই বাক্যালাপগুলি লিপিবদ্ধ করলেই উৎকৃষ্ট পত্র রচিত হবে। মুখে সামনাসামনি আমরা যা বলি, চিঠিতে সেই কথাগুলিকে গুছিয়ে সুন্দরভাবে লিখতে এত বিহ্বলতা কেন?

ব্যক্তিগত পত্র লেখার শ্রেষ্ঠ উপায়

প্রত্যেক ভাষায়ই দীর্ঘদিন ধরে পারস্পরিক পত্র-বিনিময়ের ফলে পত্র-লিখনের একটি নির্দিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছে। সুদীর্ঘকালের চর্চার ফলে বাংলা ভাষায়ও পত্র-লিখনের একটি নির্দিষ্ট রীতি গড়ে উঠেছে। বাংলায় বর্তমানকালে পত্র-লিখনের যে রীতিটি প্রচলিত, প্রাচীন কালের রীতিটি সেরূপ ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনেক গ্রহণ-বর্জনের ফলে বর্তমান রীতিটি গড়ে উঠতে পেরেছে।

বাংলা পত্র-লিখন-রীতি

ব্যক্তিগত পত্রের বৈশিষ্ট্য-অনুসারে তার লিখন-রীতিও পৃথক।

ব্যক্তিগত পত্র মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা বা অভাব-অভিযোগ ব্যক্তিগত পত্রে ভাষা পায়। কাজেই, ব্যক্তিগত পত্রে যেমন ব্যক্তিগত আলাপনের সুযোগ আছে, অন্য পত্রে তা নেই। আবার, ব্যক্তিগত পত্রের কোনটিতে থাকে কেবল তথ্য-বিনিময়, কোনটিতে থাকে ভাব-বিনিময় বা চিন্তা-বিনিময়। পত্রগুলি তদনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ—তথ্যমূলক বা ভাবমূলক হবে। কাজেই, ব্যক্তিগত পত্রের দৈর্ঘ্য তার বর্ণিত বিষয়ের অনুগামী।

ব্যক্তিগত পত্রের বৈশিষ্ট্য : দৈর্ঘ্য

ব্যক্তিগত পত্র বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লিখতে হয়। এই সব পত্রে মনের কথাগুলিকে সুন্দর করে গুছিয়ে সুবিন্যস্তভাবে লিখতে হয়। মনের কথাগুলিকে এইভাবে সুন্দর করে সুবিন্যস্তভাবে গুছিয়ে লিখতে পারলে যিনি চিঠি পাবেন এবং পাঠ করবেন তোমার মনের কথাগুলি তাঁর মনেও একটি প্রভাব বিস্তার করবে এবং তিনি মনে মনে মুগ্ধ হবেন। তোমার লিখিত পত্রটি কতখানি সার্থক হয়েছে, তা তখনই উপলব্ধ হবে।

বিন্যাস

এরূপ ক্ষেত্রে, যাঁকে চিঠি লিখছো, মনে মনে তাঁকে তোমার সামনে কল্পনা করে কল্পনায় তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলে চিঠির বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁকে যে কথাগুলি বলতে চাও, তা ভেবে নাও। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে সেই কথাগুলিকে মনোযোগ সহকারে লিপিবদ্ধ করো। তার ফলে, ব্যক্তিগত স্পর্শে পত্রখানি মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আন্তরিকতা

ভাল চিঠি সবাই লিখতে পারে না। অধিকাংশই চিঠিই এলেমেলো এবং ভুল ভাষায় লেখা হয়। তখনই বুঝতে হবে, যে চিঠি লিখছে, সে কি লিখবে, কিভাবে লিখবে—কিছুই ঠিকমতো ভাবে নি। চিঠির বক্তব্যটিও তার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সেইজন্যে চিঠি লেখার আগে বক্তব্যটি মনে মনে ভেবে ঠিক করে নিতে হয়।

সুস্পষ্টতা

পৃথিবীতে বড় বড় লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ্ এবং মহাপুরুষেরা কত সুন্দর ও মূল্যবান চিঠি লিখে গিয়েছেন। চিঠি সুন্দর এবং সুচিন্তিত হলে, যাকে চিঠি লেখা হয়েছে, সে সযত্নে ওটি রক্ষা করে। ইংরেজীতে জর্জ বার্নার্ড শ-র পত্রগুলি এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদরূপে সযত্নে রক্ষিত আছে।

স্মরনীয় পত্র

বাণিজ্যিক পত্রের মতো ব্যক্তিগত পত্রের মূল্যও যথেষ্ট। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পত্র-লেখকের সিদ্ধান্ত, মতামত বা প্রতিশ্রুতি পত্রগুলির গুরুত্ব দেয় বাড়িয়ে। সেই সব পত্রগুলিকে অনেক সময় প্রমাণ এবং নজীর হিসেবে ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেওয়া হয়। সেইজন্যে এই সব পত্রও খুব সাবধানে সুচিন্তিতভাবে লেখা দরকার। এলোমেলো বা অগোছালোভাবে এসব চিঠি লেখা অনুচিত।

ব্যক্তিগত চিঠির প্রধান অংশ দুটি : ১. ভিতরের অংশ ও ২. বাইরের অংশ।

ভিতরের অংশটিকে আবার পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : ১. শিরোনামা, ২. সম্ভাষণ, ৩. মূল বক্তব্য, ৪. বিদায়-সম্ভাষণ ও ৫. নাম-স্বাক্ষর।

এই পাঁচটি অংশকে মনে রাখার জন্যে একটি গল্প বানিয়ে নাও। মনে করো, তুমি কারো সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ।

১. প্রথমে তুমি বাড়ি থেকে বা বাসস্থান থেকে যাত্রা করছো। তোমার বাড়ির বা বাসস্থানের একটি ঠিকানা আছে। সেখান থেকে তুমি যাত্রা করছো। হ্যাঁ, ভালো কথা, আজ কত তারিখ? এসব কথা মনে করে তুমি যাত্রা করলে। এ পর্যন্ত শিরোনামা অংশ।

২. যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, তার সঙ্গে দেখা হলো। প্রথমে তুমি কি করবে? নিশ্চয়ই তার সঙ্গে শুভ সম্ভাষণ করবে। গুরুজন হলে প্রণাম করবে, সমবয়সী হলে ভালোবাসা জানাবে; আর, তোমার চেয়ে অল্পবয়সী হলে তাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করবে। এ পর্যন্ত হলো চিঠির সম্ভাষণ।

৩. এবার তোমার মূল বক্তব্যটি গুছিয়ে বলতে হবে। তাইই হলো তোমার চিঠির মূল বক্তব্য।

৪. মূল বক্তব্য বলা শেষ হলে কি করবে? নিশ্চয়ই চলে আসবে। তখন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে হবে। গুরুজনদের প্রতি বিদায়-সম্ভাষণ এক রকম, সমবয়সীদের প্রতি অন্য রকম; অল্পবয়সীদের প্রতি আবার আর-এক রকম। চিঠিতে এটাই বিদায়-সম্ভাষণ।

৫. এবার ঘরে ফেরার পালা। যার সঙ্গে দেখা করলে শেষে তার মনে তোমার নামটি মুদ্রিত রেখে আসতে হবে। তা হলো নাম-স্বাক্ষর।

এবার চিঠির এক-একটি অংশ কি করে রচনা করতে হয়, শিখে নাও। প্রথমে একখানা শাদা কাগজ নাও।

১॥ **শিরোনামা :** বাণিজ্যিক পত্রে শিরোনামায় ঠাকুর-দেবতার নাম লেখা অনুচিত। ব্যক্তিগত পত্রেও ঠাকুর-দেবতার নামোল্লেখের প্রয়োজন নেই। কাগজটির মাথায় ডানদিকে তোমার ঠিকানা লেখ। গ্রামের ঠিকানা হলে গ্রামের নাম, ডাকঘরের নাম ও জেলার নাম নীচে-নীচে লিখবে। আর, শহরের ঠিকানা হলে বাড়ির নম্বরসমেত রাস্তার নাম, ডাকঘরের নাম, তারপর শহরের নাম নীচে-নীচে লিখতে হবে। অনেক শহরের ডাকঘরের আঞ্চলিক নম্বর থাকে। সেক্ষেত্রে ডাকঘরের নাম না দিয়ে শহরের নামের সঙ্গে ডাকঘরের আঞ্চলিক নম্বরটি দিলেই চলবে। এখন আবার পিন্ কোড নং চালু হয়েছে। পিন্ কোড নং জানা থাকলে তাই লেখাই উচিত। এবার ঠিকানার

নীচে যে তারিখে চিঠিটি লিখছো, সে তারিখটি বসাও। তারিখটি ইংরেজী হবে, কিন্তু বাংলা হরপে লিখবে। তাহলে শিরোনামা অংশের দুটি ভাগ :

১. ঠিকানা ও ২. তারিখ।

॥ শিরোনামা অংশের নমুনা ॥

হিন্দু-রীতি

গ্রামের ঠিকানা

গ্রাম : বিরামপুর
ডাকঘর : বিরামপুর
জেলা : হাওড়া
১২. ৭. ৭৯

॥ শিরোনামা অংশের নমুনা ॥

হিন্দু-রীতি

শহরের ঠিকানা

২৫, বকুলবাগান রোড
কলকাতা : ২৬
২০. ৯. ৭৯

২ ॥ **সম্ভাষণ :** সম্ভাষণ লেখার জন্যে এবার চিঠির কাগজের বামদিকে মন দাও। সম্ভাষণ হিন্দু-রীতিতে এক রকম, আবার মুসলমান-রীতিতে অন্য রকম। তার ওপর গুরুজনদের একভাবে সম্ভাষণ করতে হয়, সমবয়সীদের অন্যভাবে এবং ছোটদের আবার অন্যভাবে সম্ভাষণ করতে হয়।

হিন্দু-রীতি : গুরুজন পুরুষদের ক্ষেত্রে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু', 'পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু', 'শ্রীচরণেষু', 'শ্রীচরণকমলেষু', 'পূজ্যপাদেষু' এবং 'পূজনীয়েষু', স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু', 'পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু', 'শ্রীচরণেষু', 'শ্রীচরণকমলেষু', 'পূজনীয়াসু' লিখতে

হয়। স্মরণীয়, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ—উভয় ক্ষেত্রেই চলে। কারণ, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' পদটির স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। 'আস্পদ' শব্দ যুক্ত হলে 'স্ত্রীলিঙ্গ' হয় না। কাজেই, শ্রদ্ধাস্পদাসু' কথাটি ভুল। কিন্তু 'পূজনীয়েষু'র স্ত্রীলিঙ্গ 'পূজনীয়াসু' হয়।

সমবয়সী পুরুষদের ক্ষেত্রে 'প্রীতিভাজনেষু', 'সুহৃদ্বরেষু', 'বন্ধুবরেষু' এবং স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 'প্রীতিভাজনাসু' লেখা হয়।

বয়সে ছোট পুরুষদের ক্ষেত্রে 'স্নেহাস্পদেষু', 'কল্যাণীয়েষু' এবং স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 'স্নেহাস্পদেষু', 'কল্যাণীয়াসু' লিখিত হয়।

মুসলমান-রীতি : গুরুজন পুরুষদের ক্ষেত্রে 'পাকজনাবেষু', 'মোবারক জনাবেষু' লিখে পরে 'আদাব তছলিমাত হাজার হাজার বাদ আরজ এই' লিখতে হয়। সম্পর্কহীন মাননীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'পাকজনাবেষু', 'মোবারক জনাবেষু' লিখে পরে 'বহুত বহুত সেলাম বাদ আরজ এই' লিখবে। গুরুজন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে 'বখেদমতে হজরত মখদুমা মাছমা', 'জনাব হজরত সোয়াজুমা' লিখতে হয়।

বয়সে ছোটদের ক্ষেত্রে 'খয়ের তালেব' লিখতে হবে।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'মেহেরবানেষু' লিখলেই চলবে।

॥ শিরোনামাসহ সম্ভাষণের নমুনা ॥

হিন্দু-রীতি

গ্রাম : তাহেরপুর
ডাকঘর : তাহেরপুর
জেলা : বীরভূম
৭. ৯. ৭৯

শ্রীচরণেষু,
পূজনীয় বাবা,

৩। **মূল বক্তব্য :** চিঠির বিষয় যেমন, মূল বক্তব্য তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে। তবে এক-একটি বিষয় এক-একটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত হবে।

॥ শিরোনামা ও সম্ভাষণসহ মূল বক্তব্যের নমুনা ॥

২১, বকুলবাগান রোড
কলকাতা : ২২
২৭. ৯. ৭৯

শ্রীচরণেষু
পূজনীয় বাবা,

....
....
....
....
....

৪ ॥ **বিদায়-সম্ভাষণ :** গুরুজনদের ক্ষেত্রে 'আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন' বা 'প্রণামান্তে', সমবয়সীদের ক্ষেত্রে 'প্রীতিসহ', 'প্রীত্যন্তে', 'শুভেচ্ছা সহ', 'ভালোবাসা গ্রহণ কর' এবং ছোটদের ক্ষেত্রে 'স্নেহাশিস্ গ্রহণ কর', 'স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কর' লিখতে হয়। সম্পর্কহীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে 'নমস্কারান্তে' বা 'সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে' লেখাই রীতি।

৫ ॥ **নাম-স্বাক্ষর :** চিঠির একেবারে নীচে ডানদিকে নাম-স্বাক্ষর করতে হয়। নাম-স্বাক্ষরের ওপরে একটি বিশেষণ দিতে হয়। গুরুজনদের ক্ষেত্রে 'সেবক', 'প্রণত', 'আপনার স্নেহের', সমবয়সী বন্ধুদের ক্ষেত্রে 'তোমারই', 'প্রীতিমুগ্ধ', 'প্রীতিবদ্ধ', ছোটদের ক্ষেত্রে 'আশীর্বাদক', 'শুভার্থী' লেখাই রীতি।

পত্র-লেখক স্ত্রীলোক হলে লিখবে গুরুজনদের ক্ষেত্রে 'প্রণতা', সমবয়সীদের ক্ষেত্রে 'প্রীতিমুগ্ধা', 'প্রীতিবদ্ধা', ছোটদের ক্ষেত্রে 'আশীর্বাদিকা', 'শুভার্থিনী' ইত্যাদি।

মুসলমান-রীতিতে গুরুজনদের ক্ষেত্রে 'খাকসার', 'খাদিম', সমবয়সী ও ছোটদের ক্ষেত্রে 'খয়ের তালেব', 'বান্দা' লেখাই রীতি।

[১]

গ্রাম : মল্লিকপাড়া

ডাকঘর : কৃষ্ণনগর

জেলা : নদীয়া

২০. ৯. ৭৯

[২]

শ্রীচরণেষু,

পূজনীয় বাবা, [৩]

....

....

....

....

....

[৪]

আমি ভাল আছি। আপনি ও মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। রিতা ও অমলকে আমার আদর ও ভালোবাসা দিবেন।

[৫]

আপনার স্নেহের

সুনির্মল

চিঠির বাহিরের অংশ ॥ চিঠির বাইরের অংশ বলতে খাম বা পোস্ট-কার্ডের ওপরে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তার অর্থাৎ পত্র-প্রাপকের নাম-ঠিকানা বোঝায়। খাম বা পোস্টকার্ডের পিঠে ডানদিকের নীচে 'প্রাপক' কথাটি লিখে তার নীচে পত্র-প্রাপকের নাম-ঠিকানা লেখাই আন্তর্জাতিক রীতি। খাম বা পোস্টকার্ডের পিঠে বামদিকে 'প্রেরক' কথাটি লিখে পত্র-প্রেরকের নাম-ঠিকানা লেখা উচিত। কখনো কোন কারণে চিঠি ফেরত এলে ঐ ঠিকানায় ফেরত আসবে।

[বি. দ্র. : ঠিকানায় অনেক সময় C/o [care of] কথাটি ব্যবহার করতে হয়। সেক্ষেত্রে C/o-র বাংলা প্রতিশব্দ 'অবধায়ক/' বা 'প্রযত্নে/' লেখা চলতে পারে।]

॥ পত্রের বাহিরের অংশের নমুনা ॥

ডাক-টিকিট

প্রেরক :

শ্রীবিকাশ চট্টোপাধ্যায়

প্রযত্নে/শ্রীসুগত মুখোপাধ্যায়

গ্রাম : হরিশ্চন্দ্রপুর

ডাকঘর : হরিশ্চন্দ্রপুর

জেলা : মালদহ

প্রাপক :

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

১৬, আশুতোষ মুখার্জী রোড

কলকাতা : ২৬

১২. কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রের আদর্শ

॥ পিতার নিকট পুত্রের পত্র ॥

হিন্দু-রীতি

● কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

১ প্রশ্ন ॥ কলেজে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তোমার বাবাকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ২৪ ॥

১০, রামমোহন সরণি
কলকাতা : ৯
৭. ৪. ৭৯

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাবা, গতকাল ছিল আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিন। আনন্দে, উৎসাহে ও অভিজ্ঞতায় পূর্ণ কালকের দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দুদিন আগেই কলেজে গিয়ে আমার সেক্‌শান ও রোল নম্বর জেনে এসেছিলাম। কলেজে ক্লাস শুরু হবার তারিখ ও সময় নোটিশ-বোর্ডে বিজ্ঞাপিত ছিল।

সেই মতো কাল বেলা দশটায় কলেজে উপস্থিত হই। প্রথমে কলেজ-ভবনটিকে দেখে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করলাম। আমার নতুন বিদ্যা-মন্দির। এখানেই আমার শিক্ষা-জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হবে।

ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীকক্ষে গিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। সকলে সুশৃঙ্খল-ভাবে বসে আমরা সাগ্রহে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। না জানি, তাঁকে দেখতে কেমন হবে, তিনি কেমন মানুষ হবেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর আচরণই বা কিরূপ হবে—ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে মাথা কুটছিল। আমাদের সমস্ত সংশয় ও উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে সৌম্যদর্শন অধ্যাপক পি. এন. সেন হাতে ক্লাস-রেজিস্টার নিয়ে স্মিতহাস্যে আমাদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রদর্শন করলাম। তিনি সস্নেহে আমাদের আসন গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়ে ক্লাস-রেজিস্টার খুলে 'রোল-কল' করতে লাগলেন।

'রোল-কল'-শেষে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের শৃঙ্খলা ও মনোযোগ দাবি করলেন। তারপর আমাদের পাঠসূচীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা। অধ্যাপক সেন বাংলার অধ্যাপক। তিনি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির পটভূমি আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি ভাব-গম্ভীর ভাষণ দিলেন। তাতে আমাদের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেন একটি নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।

গতকাল ছিল বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি আর ইতিহাস—এই চারটি বিষয়ের ক্লাস। প্রতিটি ক্লাসের সূচনায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক এলেন এবং 'রোল-কল' করে তাঁদের বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁদের বক্তৃতা শুনে মনে মনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলাম। সব শেষে ছুটির ঘণ্টা বাজলো। আমরা ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপকের বাচন-ভঙ্গি এবং জ্ঞানের গভীরতা বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু সবার ওপরে আমার মনে বাজছিল অধ্যাপক পি. এন. সেনের উদাত্ত কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন।

কলেজে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না। দিনটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি ভালো আছি। আপনি এবং মা আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। মুন্না ও বাবুইকে আমার আদর ও ভালোবাসা জানাবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
মুকুল

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- কলেজে প্রথম দিন তোমার কিভাবে কেটেছে, সে বিষয়ে তোমার বাবাকে একখানি পত্র লিখ।
- কলেজে প্রথম দিনে নতুন পরিবেশে তোমার মনে যে অনুভূতি হয়েছিল, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে তোমার বাবাকে একখানি পত্র লিখ।
- কলেজ সম্বন্ধে তোমার ধারণা পূর্বে কি ছিল, পরে কি হয়েছে, তা জানিয়ে তোমার বাবাকে একখানি পত্র লিখ।

২ প্রশ্ন ॥ পরীক্ষায় তুমি কৃতকার্য হয়েছো। তোমার কৃতকার্যতার সংবাদ দিয়ে তোমার বাবাকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ২৫ ॥

১৫, বিধান সরণি
কলকাতা : ১২
২. ৮. ৭৯

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাবা, গতকাল আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আপনি শুনে সুখী হবেন যে, আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি।

ফল কি হবে, তা নিয়ে ভীষণ শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু কাল সব আশঙ্কার অবসান হয়েছে। বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস এবং গণিতে আমি আমার প্রত্যাশিত নম্বর পেয়েছি। কিন্তু জীবন-বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও ভূগোলে আশানুরূপ ফল হয় নি। অথচ এই বিষয়গুলিতেও আমি ভালো পরীক্ষাই দিয়েছিলাম। কেন এরূপ হলো, বুঝতে পারছি না।

যাহোক, সর্বসাকুল্যে ৬৩৫ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগেই আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। এবার স্থির করেছি, একাদশ শ্রেণীতে শুরু থেকেই সব বিষয়ে সমান যত্ন নেব। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ও আমাকে সেই উপদেশই দিয়েছেন।

আজ থেকে স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি আর দেরী না করে আজই ভর্তি হয়ে গিয়েছি।

আগামী ১৬ই আগস্ট থেকে স্কুলে যথারীতি ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আমার বইগুলি কিনে ফেলা দরকার। সেজন্যে আপনি যথাসম্ভব মনি-অর্ডারযোগে ৩০০.০০ [তিনশো টাকা] পাঠাবেন।

আমাদের বিদ্যালয়েই উচ্চ-মাধ্যমিক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্যে অন্য কোন কলেজে যেতে হলো না—এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

আগামীকাল থেকে সাতদিনের জন্যে আমি শান্তিনিকেতনে মাসিমার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। সাতদিন পরে ফিরে এসে যেন আপনার মনি-অর্ডার পাই।

আমি ভালো আছি। আপনি ও মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। রুমি ও মনুকে আমার আদর ও ভালোবাসা জানাবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
দিগন্ত

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

● তুমি আগামী পরীক্ষার জন্যে কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছো, তা জানিয়ে তোমার বাবাকে একখানি পত্র দাও।

৩ প্রশ্ন ॥ বেতন ও বইয়ের জন্যে টাকা পাঠাবার অনুরোধ করে তোমার পিতার কাছে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ২৬ ॥

৩, বকুলবাগান রোড
কলকাতা : ১৬
৫. ১০. ৭৯

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বাবা, গত আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে আপনি যে চিঠি ও টাকা পাঠিয়েছিলেন, তার প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়েছিলাম। তারপর আপনার আর কোন চিঠি না পেয়ে বড়ই চিন্তিত আছি।

আপনি সেই-যে একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে কলেজের বার্ষিক ফী এবং আগস্ট মাসের বেতন দিয়েছিলাম। অবশিষ্ট টাকায় ছ' খানা মাত্র বই কিনেছিলাম। এখনও আরও পাঁচখানা বই কিনতে হবে এবং কলেজের দু' মাসের বেতন বাকি পড়ে যাচ্ছে। এখন পূজার ছুটি চলছে। পূজাবকাশের পর ২৬শে অক্টোবর কলেজ খোলার দিনই সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের বেতন দিতে না পারলে নাম কাটা যেতে পারে।

সেজন্যে আপনি পত্রপাঠ আরও ১০০.০০ [একশো টাকা মাত্র] মনি-অর্ডারযোগে পাঠিয়ে দিবেন। অন্যথায় খুবই অসুবিধা হবে। ক্লাসে পুরাদমে পড়াশুনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বইগুলি না থাকায় লেখাপড়ায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

আমি ভালো আছি। আপনি ও মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। সুধা ও অমলকে আমার আদর ও ভালোবাসা দিবেন। ইতি—

আপনারই
স্নেহের কমলেশ

এই আদর্শের সাহায্যে লিখ :

- তোমার হাত-খরচের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। কিছু টাকা পাঠাবার জন্যে মার কাছে একখানি পত্র লিখ।
- ছাত্রাবাসের টাকা বাকি পড়ে গিয়েছে। সত্বর টাকা পাঠাবার জন্যে বাবার কাছে একখানি পত্র লিখ।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাবার জন্যে কলেজে টাকা জমা দিতে হবে। টাকা পাঠাবার জন্যে বাবার কাছে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পিতার নিকট পুত্রের পত্র ॥
[মুসলমান-রীতি]

● অসুস্থতার সংবাদ-জ্ঞাপন

৪ প্রশ্ন ॥ তোমার মাতার অসুস্থতার কথা জানিয়ে তোমার পিতাকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ২৭ ॥

১৭, রফি আহম্মদ কিদওয়াই রোড
কলকাতা : ১৪
৬. ১২. ৭৯

মোবারক পাকজনাবেষু,

আব্বাজান, আপনি বাড়ি থেকে যাবার এক সপ্তাহ পরেই আম্মাজান ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত ৩০শে নভেম্বর তিনি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান। আমি বিলম্ব না করে সেদিন সকালেই ডাঃ মাসুদকে বাড়িতে ডেকে আনি। তিনি এসে একটা ইনজেকশান দিলে তবে আম্মাজানের জ্ঞান ফিরে আসে।

সেদিন থেকে আম্মাজান বড়ো দুর্বল। প্রায়ই জ্বর আসে। ডাঃ মাসুদ আবার একদিন এসে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যান। বর্তমানে আম্মাজান তাঁর ব্যবস্থামতোই ঔষধ সেবন করছেন।

এরূপ অবস্থায় আপনার সত্বর বাড়ি আসা দরকার। আম্মাজানের এখনও জ্বর আসে। কি করতে হবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে আমার কলেজ কামাই হয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনায় যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে।

আমি, হাসিম ও ফিরোজা ভালো আছি। আপনি আমার আদাব গ্রহণ করবেন। ইতি—

খাকসার
মোয়াজুদ্দীন

এই আদর্শের সাহায্যে লিখ :

- তোমার ছোটভাই ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছে। বাবাকে সত্বর বাড়ি আসতে বলে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার ভগিনীর অসুস্থতার খবর জানিয়ে বাবাকে সত্বর বাড়ি আসতে চিঠি লিখ।

॥ মাতার নিকট কন্যার পত্র ॥

[হিন্দু-রীতি]

● কলেজে নতুন পরিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য

৫ প্রশ্ন ॥ তুমি কলেজে নতুন ভর্তি হয়েছো। এখানে তোমার কেমন লাগছে তা জানিয়ে তোমার মাকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ২৮ ॥

১০, বালিগঞ্জ প্লেস
কলকাতা : ১৯
১০. ৮. ৭৯

শ্রীচরণকমলেষু,

মা, আপনার স্নেহাশীর্বাদপূর্ণ পত্র কাল পেয়েছি। কলেজের নতুন পরিবেশে কি রকম লাগছে, তা আপনি আপনার পত্রে জানতে চেয়েছেন।

সত্যিই, এখানে কলেজে একেবারে নতুন পরিবেশ। আমাদের গ্রামের স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে একটুও মিল নেই। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ ক্লাসে এসে রোল-কল করেন। রোল-কল শেষ হলেই তাঁদের বক্তৃতা শুরু করে দেন। এক-একটি বিষয়ে তিন-চারজন করে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা আছেন।

এই অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ সবাই গুণী এবং কৃতী। কারও প্রতি অসম্মান না করে বলতে পারি, এঁদের মধ্যে কয়েকজনের বক্তৃতা ও অধ্যাপনা আমার খুব ভালো লাগছে। যেমন, অধ্যাপক মিত্র। এই সৌম্যদর্শন, সুকণ্ঠ অধ্যাপক এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলা সাহিত্য পড়ান যে, সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর ভাষণ শোনে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি বিস্তৃত প্রারম্ভিক বক্তৃতাযোগে পড়াতে শুরু করেছেন। তেমনি ভালো লাগে অধ্যাপিকা সেনের ইংরেজীর ক্লাস। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন। অধ্যাপিকা হিসাবেও তাঁর খুব সুনাম। তাঁর ইংরেজী বাচন-ভঙ্গি এবং বিশ্লেষণী-ক্ষমতা অসামান্য।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি এই কলেজে ভর্তি হয়েছি। এই কলেজে ভর্তি না হলে আমি এমন উন্নত-ধারার পঠন-পাঠন থেকে বঞ্চিত হতাম।

ইকনমিক্সে ডঃ ঘোষের বক্তৃতায় আমাদের সম্মুখে এক-একটি নতুন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হয়ে যায়। তিনি আমাদের কলেজের উপাধ্যক্ষ। তাছাড়া, অধ্যাপিকা রায়ের ইতিহাসের ক্লাস মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। আমি এঁদের বক্তৃতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং প্রয়োজনমতো 'নোট' করে নিই। তাতে বিষয়গুলি আমার কাছে খুব সহজবোধ্য হয়ে উঠছে।

কলেজে কয়েকজন নতুন বন্ধু পেয়েছি। তাদের মধ্যে রীতা বাগচী ভালো রবীন্দ্র-সংগীত গায়, দীমা সেন ভালো ছবি আঁকতে পারে, মহুয়া মুখার্জী খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারে।

আমি ভালো আছি। আপনি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। বাপী ও রান্নুকে আমার আদর ও ভালোবাসা জানাবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

মণিকা

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় ঃ

- নতুন কলেজে তোমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তোমার বাবার কাছে একখানি পত্র লিখ।
- নতুন কলেজে তুমি আগের চেয়ে যথেষ্ট উন্নতি করছো, জানিয়ে তোমার বাবাকে একখানি পত্র লিখ।
- নতুন কলেজে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের শিক্ষাদান তোমার কেমন লাগছে জানিয়ে তোমার দাদুকে একখানি চিঠি লিখ।
- কলেজে নতুন ছাত্রীদের আচরণ কিরূপ, তা জানিয়ে তোমার মাকে একখানি পত্র লিখ।

॥ মাতার নিকট পুত্রের পত্র ॥
[হিন্দু-রীতি]

● সোয়েটার পাঠাবার অনুরোধ

৬ প্রশ্ন ॥ তোমার শীতের সোয়েটার নেই। শীতের সোয়েটার বুনে পাঠাবার জন্যে তোমার মাকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ২৯ ॥

গ্রাম : বাবুপাড়া
ডাকঘর : গোবরডাঙ্গা
জেলা : ২৪ পরগনা
৪. ১. ৮০

শ্রীচরণকমলেষু,

মা, গতকাল আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে সবার কুশল সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

বাড়ি থেকে আসবার সময় আপনি বলেছিলেন, সত্বর আমার জন্যে একটি নতুন সোয়েটার বুনে পাঠিয়ে দেবেন। আমার বর্তমান সোয়েটারটি এখন আরও ছিঁড়ে গিয়েছে। আপনি আমার জন্যে শীগ্‌গীর একটি নতুন সোয়েটার বুনে পাঠিয়ে দেবেন।

সম্প্রতি এদিকে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। শুনছি, এই জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে আমাদের কলেজ থেকে ঘাটশিলায় একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হবে। তার আগে সোয়েটারটি পেলে সব দিক দিয়ে ভালো হয়।

আমার সোয়েটারের মাপ আপনার ডায়েরিতে লেখা আছে। আমি আপনার হাতে-বোনা সোয়েটারের পথ চেয়ে রইলাম।

আমি ভালো আছি। আপনি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। বিনু ও কেয়াকে আমার আদর ও ভালোবাসা জানাবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
অম্লান

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাড্‌মিট কার্ড ও মার্কশীট পাঠাবার জন্যে বাবার কাছে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার ফাউন্টেন পেনটি হারিয়ে গেছে। একটি ফাউন্টেন পেন কিনে পাঠাবার জন্যে বাবার কাছে একখানি পত্র লিখ।
- আগামী বর্ষায় তোমার একটি ছাতা দরকার। তা কিনে পাঠাবার জন্যে বাবার কাছে একখানি চিঠি লিখ।

॥ অনুজের নিকট অগ্রজের পত্র ॥

[হিন্দু-রীতি]

● লেখাপড়ার মনোযোগ দানের উপদেশ

৭ প্রশ্ন ॥ তোমার ছোট ভাই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করছে না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবার জন্যে উপদেশ দিয়ে তাকে একখানি চিঠি দাও।

॥ পত্রাদর্শ ৩০ ॥

১৭/১, আশুতোষ মুখার্জী রোড
কলকাতা : ২৬
৬. ৯. ৭৯

স্নেহাস্পদেষু,

বাপী, গতকাল মায়ের চিঠিতে জানতে পারলাম, তুমি মোটেই মন দিয়ে এ বছর লেখাপড়া করছো না। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে দিনরাত খেলাধূলা আর দুরন্তপনা করে কাটাচ্ছ। ফলে, স্কুলে তোমার উন্নতির রিপোর্ট আদৌ ভালো হচ্ছে না। একথা শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।

এভাবে তুমি যদি লেখাপড়া না করে তোমার মূল্যবান সময় হেলায় নষ্ট কর, তবে তা আর কখনই ফিরে আসবে না। লেখাপড়ায় অবহেলার জন্যে কখনই তুমি বার্ষিক পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবে না। আর, লেখাপড়া না শিখে জীবনে মানুষ হবে কিরূপে? মনে রেখো, লেখাপড়া মানুষের একটি বড় সম্পদ।

তুমি ভবিষ্যতে যা কিছু হতে চাও, তার জন্যে লেখাপড়া করতেই হবে। লেখাপড়ার মধ্য দিয়েই তো মানুষ জীবনে বড় হবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

আশা করি, আমার চিঠি পেয়ে তুমি নিজের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করবে এবং পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গ ত্যাগ করে ও দুরন্তপনা ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দেবে।

আমি ভালো আছি। তুমি আমার স্নেহাশিস্ জানবে। বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। ইতি—

তোমার দাদা
সুরঞ্জন

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার ছোটভাই অঙ্কে কাঁচা। তাকে ঐ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে একখানি চিঠি লিখ।
- রবীন্দ্র-সংগীত বিষয়ে তোমার ছোট বোনকে কিছু উপদেশ দিয়ে একখানি চিঠি লিখ।
- পরীক্ষায় প্রথম হতে পারে নি বলে তোমার ছোটভাই মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে নতুন উদ্যমে লেখাপড়া করবার উপদেশ দিয়ে একখানি চিঠি লিখ।

॥ বন্ধুর নিকট বন্ধুর পত্র ॥

[হিন্দু-রীতি]

● আরোগ্য কামনা/সান্ত্বনা-দান

৮ প্রশ্ন ॥ তোমার কোন বন্ধু দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ভুগছে। তার নিরাময় [আরোগ্য] কামনা করে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩১ ॥

১৭, বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা : ৬
১২. ৯ ৭৯

বন্ধুবরেষু,

ভাই কল্লোল, সুরঞ্জনের চিঠিতে জানতে পারলাম, তুমি মাসাধিক কাল হলো, টাইফয়েডে 'আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী আছ। এতদিন তোমার খোঁজখবর নিই নি বলে আমি ভীষণ লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করছি। তুমি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে ক্ষমা করবে।

এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্যের পথে। আমি তোমার দ্রুত নিরাময় প্রার্থনা করি। আমাদের সকলের সমবেত শুভেচ্ছায় তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।

পড়াশুনায় সামান্য পিছিয়ে পড়েছো বলে তুমি কোনরূপ চিন্তা করবে না। আরোগ্যের পর কয়েক দিনে তুমি তা শিখে নিতে পারবে। আমি সে বিষয়ে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আমি ভালো আছি। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা তোমাকে সব সময় ঘিরে রাখুক। ইতি—

তোমার প্রীতিবদ্ধ
অশোক

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- ফুটবল খেলায় তোমার বন্ধু পা ভেঙে হাসপাতালে শুয়ে আছে। তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে একখানি চিঠি লিখ।
- তোমার বন্ধুর মাতা দীর্ঘদিন রোগে শয্যাশায়ী। তাঁর দ্রুত নিরাময় কামনা করে তোমার বন্ধুর কাছে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার বন্ধুর বাড়িতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তোমার বন্ধুকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লিখ।
- পরীক্ষায় তোমার কোন বন্ধু অকৃতকার্য হয়েছে। তাকে সান্ত্বনা ও পরের বছরে ভালো করবার উৎসাহ দিয়ে একখানি পত্র লিখ।

॥ বন্ধুর নিকট বন্ধুর পত্র ॥

[মুসলমান-রীতি]

● কৃতিত্বে অভিনন্দন

৯ প্রশ্ন ॥ তোমার কোন বন্ধু পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। তার কৃতিত্বে অভিনন্দন জানিয়ে তাকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩২ ॥

গ্রাম ও ডাকঘর : গোকর্ণ
জেলা : মুর্শিদাবাদ
১৫. ১. ৮০

মেহেরবানেষু,

ভাই ইসমাইল, তোমার চিঠিতে জানতে পারলাম যে, তুমি গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছো। তোমার এই কৃতিত্বের সংবাদে আনন্দে আমার বুক ভরে গিয়েছে। তোমার এই কৃতিত্বের জন্যে প্রথমেই তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাখি ॥

তোমার ক্ষমতার ওপরে আমার আব্বাজান, আম্মাজান এবং আমি গভীর আস্থা রাখি। শৈশব থেকে কোন পরীক্ষাতেই প্রথম ছাড়া তুমি দ্বিতীয় হও নি। কেবল গতবারে কপালদোষে মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্যে তুমি দ্বিতীয় হয়ে গিয়েছিলে। এবারে ভালো ফল হবে না—এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে তুমি পরীক্ষার পরে চিঠি দিয়েছিলে।

যাক্, তোমার সে আশঙ্কা যে অমূলক, তা প্রমাণিত হয়েছে। তুমি আমাদের গৌরবান্বিত করে প্রথম হয়েছো—এতে আনন্দ প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত। তুমি পড়াশোনায় উত্তরোত্তর উন্নতি কর—এই কামনা করি।

আমি ভালো আছি। তোমার আব্বাজান ও আম্মাজানকে আমার আদাব দেবে। তুমি আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। ইতি—

রাকেম নেওয়াজ
নুরুল

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার এক বন্ধু আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি চিঠি লিখ।
- তোমার এক বন্ধু সাঁতার-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার এক বন্ধু সংগীত-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। তাকে একখানি চিঠিতে অভিনন্দন জানাও।

● বন্ধুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন

১০ প্রশ্ন ॥ তোমার কোনও বন্ধুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৩ ॥

১৫।১, সদানন্দ রোড
কলকাতা : ২৬
২১. ৮. ৭৯

প্রিয়বরেষু,

শোভন, আজ তোমার শুভ জন্মদিন। আজ তুমি আঠারো বছরে পদার্পণ করলে। এই শুভদিনে তোমাকে আমার বুকভরা ভালোবাসা এবং গভীর শুভেচ্ছা জানাই।

গত বছর তোমার জন্মদিনে আমি তোমাদের বাড়িতে ছিলাম। সারাদিন কী আনন্দ, উত্তেজনায় কেটেছিল, ভাবলে বিস্মিত হই। এ বছর আমি তোমার জন্মদিনে অনুপস্থিত—আজ সে কথা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে।

আমি উপস্থিত হতে না পারলেও আমার প্রীতি ও শুভ কামনা তোমাকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখবে। তুমি সুস্থ ও খ্যাতিময় দীর্ঘজীবন লাভ কর—তোমার জন্মদিনে এই আমার কামনা।

আমি ভালো আছি। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে। ইতি—

তোমরাই
দিগন্ত

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার কোন বন্ধু সাংঘাতিক পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করেছে। তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার কোন বন্ধু দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার কোন বন্ধু বিদেশ-ভ্রমণে যাচ্ছে। তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একখানি চিঠি লিখ।

● ছুটি কাটাবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা

১১ প্রশ্ন ॥ তুমি পূজার ছুটি কিভাবে কাটিয়েছো, তা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৪ ॥

২২, বিডন স্ট্রীট
কলকাতা : ৬
২৮. ১০. ৭৯

প্রিয়বরেষু,

জয়দীপ, দেখতে দেখতে পূজার ছুটি ফুরিয়ে এলো। প্রতি বছর পূজার ছুটি কেমন মন জুড়ে আসে। আবার যখন চলে যায়, তখন মনটা একেবারে খালি করে দিয়ে চলে যায়। এ বছরেও তাই হলো। পূজা এলো। ঢাকীরা ঢাক বাজালো, মণ্ডপে মণ্ডপে আলো জ্বললো, ভিড় হলো, জামাকাপড়ে সেজে সবাই ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু দেখতে দেখতে পূজার আনন্দময় দিনগুলি কি করে কেটে গেল, বুঝতে পারলাম না।

বিজয়ার আনন্দও শেষে ফুরোলো। তারপর মনে পড়লো—বার্ষিক পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। পড়তে বসে দেখলাম, পড়াশুনার অনেক বাকি। শেষে আমি একটা রুটিন করে প্রত্যহ চারঘণ্টা করে নিয়মিত পড়তে লাগলাম।

মনে মনে ভাবলাম, এ বছরের পূজা চলে গিয়েছে। আগামী বছর আবার আসবে। তাতে আবার আনন্দ করবো। এখন শুধু পরীক্ষার কথাই ভাববো।

তুমি কেমন আছো? তুমি পূজার ছুটি কিভাবে কাটালে, জানাবে। আমি ভালো আছি। তুমি আমার বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি—

তোমারই
অরূপ

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তুমি গরমের ছুটি কিভাবে কাটিয়েছো জানিয়ে বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- এ বছরের বড়দিনের ছুটি কিভাবে কাটালে জানিয়ে বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- তুমি বার্ষিক পরীক্ষার জন্যে কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছো জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

১২ প্রশ্ন ॥ ছাত্রাবাসে তোমার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৫ ॥

শ্রীপুর কলেজ ছাত্রাবাস
ডাকঘর : শ্রীপুর
জেলা : হুগলী
২. ২. ৮০

প্রিয়বরেষু,

চঞ্চল, এখানে ছাত্রাবাসে দেখতে দেখতে আমার দু' সপ্তাহ কেটে গেল। সেদিন তোমাদের ছেড়ে আসতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে ভয় ছিল, আমাদের ছাত্রাবাস না-জানি কি রকম হবে।

ফাঁকা মাঠের মধ্যে আমাদের ছাত্রাবাস। দেখে প্রথমে তাকে আমার কোন বাংলো বলে মনে হয়েছিল।

আমি এসে পৌছলে ছাত্রাবাসের বন্ধুরা সকলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। অঞ্জন চক্রবর্তী খুব ভালো গল্প বলতে পারে। সুনন্দ বসু ভালো রবীন্দ্র-সংগীত গায়। কমলেশ ভালো ক্যারিকেচার করে। অনিন্দ্য স্কুলের সেরা ছেলে—কম কথা বলে।

বিকেলে ছুটির পর আমরা মাঠে খেলা করি। খেলার পর জলখাবার খেয়ে পড়তে বসি। রাত ৯টায় আমরা সকলে খেতে বসি। খাওয়ার পর বসে গল্পের আসর। তারপরই চোখে ঘুম এসে পড়ে। তখন যে যার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি ঘুমের মধ্যে শুধু তোমাদেরই স্বপ্ন দেখি। আমাদের গ্রাম, আমাদের খেলার মাঠ, নদীর ঘাট—সবই আমার স্বপ্নের ভেতরে ফিরে আসে।

আমি ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো? আমার ভালোবাসা জানবে। ইতি—

তোমারই
প্রশান্ত

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তুমি পিতামাতার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়েছো। তোমার সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- তুমি বন্ধুকে ছেড়ে কোনও নতুন স্থানে এসেছো। তোমার এখানকার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- ছাত্রবাসের জীবন কেমন লাগছে, জানিয়ে তোমার কোন বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

১৩ প্রশ্ন ॥ চিড়িয়াখানা ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করে তোমার বন্ধুর কাছে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৬ ॥

৩৭, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা : ২৯
১২. ২. ৮০

প্রিয়বরেষু,

প্রদীপ্ত, কাল আমরা এখানকার কয় বন্ধুতে মিলে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, চিঠিতে তার কিছুটা অংশ তোমাকে পাঠাচ্ছি। ভাবছি, কাল যদি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে, আমার আরও কী আনন্দই না হতো!

শীতের সকাল। আমরা একে একে লোহার ঘোরানো গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। চারদিকে গাঢ় সবুজ ঘাস, মাঝে মাঝে ফুলের বাগান। প্রভাতের রৌদ্রে সমস্ত পরিবেশটাই ঝলমল করছিল।

প্রথমে আমরা ভালুকের খাঁচার সামনে উপস্থিত হলাম। ভালুকটা আমাদের দেখে ভদ্রলোকের মতো পায়চারি করতে শুরু করলো। তারপর আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম জলহস্তীর খাঁচার সামনে। বিশাল আকারের জলহস্তীটা রোদ পোহাবার জন্যে ডাঙায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে আমরা গেলাম শ্বেত ভালুকের খাঁচার কাছে। শ্বেত ভালুক ও বাদামী ভালুকগুলি পাশাপাশি খাঁচায় থাকে। একটু গিয়েই পশুরাজ সিংহের সঙ্গে দেখা। ছবির বইতে সিংহকে যে রকম দেখি, চিড়িয়াখানার সিংহের সেই 'পশুরাজ' 'পশুরাজ' ভাব নাই। হাড়-পাঁজরা বার হয়ে পড়েছে, কেশরের সে মহিমাও নেই। তারপর পাখিদের খাঁচা। সেখানে যেন দেশবিদেশের রঙ-বেরঙের পাখিদের মেলা বসে গেছে। কত বিচিত্র রঙের, কত বিচিত্র নামের পাখি—না দেখলে বিশ্বাস হয় না। একটু অগ্রসর হয়ে বাঁদরের সঙ্গে দেখা। সে কি একটি দুটি? অসংখ্য। বাঁদরের বাঁদরামি দেখতে দেখতে বেলা বারোটা বেজে গেল। বুঝলাম, আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি।

তখন আমরা একটা ছায়াময় ফাঁকা জায়গা দেখে সকলে গোল হয়ে বসে গেলাম। আমাদের সঙ্গে এসেছিল প্রচুর রুটি ও মাংসের তরকারি। সকলে মিলে খুব আনন্দের সঙ্গে সেগুলি খেলাম।

খাওয়ার পরই আমরা গেলাম বাঘের খাঁচা দেখতে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখে আমরা গেলাম রেওয়ার. শাদা বাঘ দেখতে। শাদা বাঘের বাচ্চাগুলিকে আমাদের ভীষণ ভালো লাগলো। লড়াই-লড়াই খেলা খেলতে খেলতে তারা এক সময় তাদের মায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ে গিয়ে লজ্জা পেয়ে আমাদের দিকে এক-একবার তাকায়। তাদের মা কিন্তু একেবারে নির্বিকার।

তারপর হাতী। টিকিট কেটে আমরা দল বেঁধে হাতীর পিঠে চড়লাম। হাতী আমাদের নামিয়ে দিয়ে সেলাম করলো। হাতীর সেলাম নিয়ে আমরা সরীসৃপ-ভবনে গেলাম। এখন শীতকাল। সাপগুলি ঘুমোচ্ছে। কেমন নির্জীব মনে হলো তাদের। সর্বাপেক্ষা নির্জীব মনে হল কুমীর দুটিকে। দুটি বৃহৎ টিকটিকি যেন শীতের রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। সেখান থেকে বার হয়ে বাদাম চিবোতে চিবোতে আমরা হরিণের খাঁচার দিকে গেলাম। কত রকমের হরিণ। হরিণের পর বাইসন, নীলগাই, জেব্রা, উট এবং নানা দেশের ময়ূর দেখলাম। তারপরই শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে দেখা। সে সার্কাসের পাকা খেলোয়াড়ের মতো মনের আনন্দে ব্যায়াম করছিল।

রোদ পড়ে আসছিল। চিড়িয়াখানার গাছগুলির ছায়া দীর্ঘ হচ্ছিল। আমরা সব শেষে ভোঁদড়ের পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ালাম। আহা বেচারা ভোঁদড়! শীতে জলের মধ্যে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে করুণ গলায় নিশ্চয়ই মাছ প্রার্থনা করছিল।

তার ডাক শুনতে শুনতে আমরা লাইন করে চিড়িয়াখানা থেকে বার হয়ে এলাম। বাসে উঠে মনে হলো, আমরা খুব ক্লান্ত। কিন্তু যে আনন্দ কাল পেয়েছি, তা বহুদিন মনে থাকবে।

তুমি কেমন আছো? তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। তুমি আমার ভালোবাসা জানবে। ইতি—

তোমারই
সুখেন্দু

[] এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়:

- কোন ছুটির দিনে তোমরা চড়ুইভাতিতে গিয়েছিলে। চড়ুইভাতির আনন্দের বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- একটি চিঠিতে তোমার বন্ধুকে তোমার প্রথম রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে জানাও।
- নৌকাযোগে বা স্টীমার-যোগে ভ্রমণের আনন্দের বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

১৪ প্রশ্ন ॥ কোনও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৭ ॥

১০, ডোভার লেন
কলকাতা : ১৯
১৫. ১১. ৭৯

প্রিয়বরেষু,

সৌমিত্র, এ বছর পূজার ছুটিতে স্কুলের ভ্রমণার্থী-দলের সঙ্গে আমি আগ্রা বেড়াতে গিয়েছিলাম। যাত্রার পূর্বের চিঠিতে তোমাকে সে সংবাদ দিয়েছিলাম। তার উত্তরে তুমি আমাকে ফিরে এসে আগ্রা-ভ্রমণের কথা চিঠিতে জানাতে লিখেছিলে। সেইমতো আমাদের আগ্রা-ভ্রমণের কথা তোমাকে জানাচ্ছি।

তখনও আগ্রা ফোর্ট স্টেশন আসতে কিছু বিলম্ব আছে। সবে সকাল হয়েছে। দূর থেকে বৃষ্টিধোয়া বেলফুলের কুঁড়ির মতো তাজমহল আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখবার জন্যে আমাদের মধ্যে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল।

ট্রেন আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে দাঁড়ালো। আমরা টাঙ্গায় চড়ে আগ্রা হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। হোটেল থেকে তাজমহলকে আরও বড়ো, আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। আমরা হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে প্রথমে আগ্রা ফোর্ট দেখতে গেলাম। 'অমর সিংহ দরওয়াজা' দিয়ে প্রবেশ করে জাহাঙ্গীর মহল দেখে যেখানে বৃদ্ধ বয়সে শাজাহান বন্দী-জীবন যাপন করেছিলেন, আমরা সেই স্থানটি দেখতে গেলাম। সেখান থেকে যমুনা নদীর তীরে একখানা শাদা মেঘের মতো তাজমহলকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তারপর জুম্মা মসজিদ ও বাদশাহের দরবার-স্থানটি দেখে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

তখন নিজেদের ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। হোটেলে ফিরে স্নানাহার সেরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার আগে ঘুম থেকে উঠে আমরা চা ও জলখাবার খেয়ে তাজমহল দেখতে গেলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। একটু পরেই আকাশে চাঁদ উঠলো। চাঁদের আলোয় তাজমহলকে যতই দেখছিলাম, ততই ভালো লাগছিল। পিছনে যমুনা নদী। আমরা সেদিকের পৈঠায় গিয়ে বসলাম। যমুনার জল অতি ধীরে বয়ে চলেছে। মনে হলো, তা যেন সম্রাট শাজাহানের চোখের জল। অনেক রাতে আমরা দল বেঁধে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরের দিন সকালে আমরা ফতেপুর সিক্রি দেখতে গেলাম। ফতেপুর সিক্রি সম্রাট আকবরের নতুন রাজধানী। যেখানে তাঁর নবরত্ন সভা বসতো, যেখানে সুরসম্রাট তানসেন তাঁহার বিশ্ববিমোহন গানগুলি গাইতেন, সে জায়গাটিও দেখলাম। হাওয়া মহল, বীরবল ও আবুল ফজলের বহু স্মৃতিময় বাসগৃহগুলি দেখলাম। আর দেখলাম

আকবরের গুরু সেলিম চিশ্‌তির কারুকার্যময় সমাধিটি। সুউচ্চ 'বুলন্দ দরওয়াজা' দিয়ে বার হয়ে আমরা আগ্রায় ফিরবার পথে দেখে এলাম সম্রাট আকবরের নীরব নির্জন সমাধি-মন্দির—সেকেন্দ্রা।

সেদিন রাতে হোটেলের বিছানায় শুয়ে আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, আগ্রার পথে অশ্বারোহী মোগলবাহিনী ছুটে চলেছে। তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে আকাশ-বাতাস কম্পিত হয়ে উঠছে। সামনে একটি বাদামী রঙের সুদর্শন, তেজী ঘোড়ায় চড়ে শানিত তরবারি হাতে কে ছুটে চলেছেন? চিনতে বিলম্ব হলো না—তিনিই সম্রাট শাজাহান।

আসলে, আগ্রায় সেই কয়টা দিন আমরা একেবারে ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম। পরের দিনই আমরা আগ্রা ত্যাগ করে দিল্লী চলে গেলাম।

তুমি সুযোগ পেলে একবার আগ্রা ঘুরে এসো। সত্যিই, বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত আগ্রা পরিভ্রমণ করে তুমি প্রচুর আনন্দ পাবে।

আমি ভালো আছি। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। তুমি আমার বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। ইতি—

তোমারই
অংশুমান

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণে তুমি তোমার স্কুলের ভ্রমণার্থী দলটির সঙ্গে কোথাও ভ্রমণ করতে গিয়েছিলে। তার বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের উপকারিতার কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

● দুর্ঘটনার বর্ণনা

১৫ প্রশ্ন ॥ তোমার দেখা একটি দুর্ঘটনা বর্ণনা করে কোন বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৮ ॥

ঐ
২৭, পূর্ণদাস রোড
কলকাতা : ২৯
৭. ৩. ৮০

প্রিয়বরেষু,

চন্দন, আজ আমাদের পাড়ায় যে বীভৎস দুর্ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে, তা চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না। ঘটনাটির ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে শিউরে উঠতে হয়। দুর্ঘটনাটি দেখা অবধি আমি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছি না। তখন সকাল সাড়ে ন'টা। অফিস-যাত্রীদের ভিড় রাস্তায় জমে উঠতে শুরু করেছে। আমি কলেজের পথে নিত্যপ্রথামতো বেরিয়ে পড়লাম। সবে আমাদের রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়েছি, এমন সময় ঘড়ঘড় আওয়াজ করতে করতে একটি লরীকে আসতে দেখলাম। লরীতে রাশীকৃত ভারী লোহার পাত উঁচু হয়ে আছে। একটা লোক সেগুলি ধরে বসেছিল। ঠিক তখনই এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক একটি মোটর-সাইকেলে চড়ে লরীটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় লরীর উপরে উপবিষ্ট লোকটার হাত ফস্‌কিয়ে একটা লোহার পাত সটান তেরছাভাবে নীচে নেমে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটর-সাইকেলের আরোহী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির পাগড়ি-পরা বিচ্ছিন্ন মাথাটা চক্ষের নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

ব্যাপারটা এখানে শেষ হলে কিছুই বলার ছিল না। দুর্ঘটনা মাত্রই দুর্ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনাটা তাকে যেন বহুগুণে ছাড়িয়ে গেল।

মোটর-সাইকেলের আরোহীর মাথা কাটা গেলেও মোটর-সাইকেলের ব্রেক কষা হয় নি। লোকটার দুহাতের আঙুলগুলি খিল ধরে সম্ভবতঃ শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থার দৃশ্যটি অতীব ভয়াবহ। একটা মুণ্ডহীন লোক মোটর-সাইকেল ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে। তার কাটা ধড় থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুট্‌ছে। পথচারীদের কেউ কেউ সেই দৃশ্য দেখে চীৎকার করে ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটতে ছুটতে ভিরমি খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে গেল। শিশুরা ও মেয়েরা ছুটে যে যেখানে পারলো ঢুকে পড়লো। দোকানীরা ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করে দিল। চারদিকে চীৎকার, চেঁচামেচি ও হৈ-চৈ! শেষে মোটর-সাইকেলটা একটা লাইটপোস্টে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তখন ঘটনাটি শেষ হলো। না হলে তা যে কতদূর গড়াতো, কে জানে!

আমি দুর্ঘটনাটির কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। এমন বীভৎস দুর্ঘটনার কথা কেউ কখনো শোনে নি।

আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো জানাবে। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবে। ইতি—

তোমারই
সন্দীপ

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়:

- একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লিখ।
- আজ বিদ্যালয়ে আসবার পথে যা দেখেছ, তা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- যে ঘটনা তোমার জীবনে তোমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিচলিত করেছে, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

- পুস্তক-পাঠের পরামর্শ

১৬ প্রশ্ন॥ কোনও পুস্তক-পাঠের পরামর্শ দিয়ে তোমার কোন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৩৯ ॥

৪০, পণ্ডিতিয়া রোড
কলকাতা: ২৯
৩. ৯. ৭৯

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় অঞ্জন, আমি আজ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসখানি পড়ে শেষ করলাম। তুমি কি উপন্যাসখানি পড়েছ? যদি না পড়ে থাক, আমার অনুরোধ, অবিলম্বে তা পড়ে নিও। বইখানি না পড়লে আমার যে কী ক্ষতি হতো, তা এখন বুঝতে পারছি।

বইখানি পড়তে পড়তে প্রতি মুহূর্তেই আমি বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও কেঁদেছি অনেক বেশী। দরিদ্র গৃহস্থ হরিহর, তাঁর স্ত্রী সর্বজয়া, কন্যা দুর্গা, পুত্র অপু, হরিহরের এক দূর-সম্পর্কীয়া দিদি—এই নিয়ে তাঁর সংসার। অপুর অপূর্ব কল্পনা-শক্তি ও ছেলেমানুষী এবং দুর্গার দুরন্তপনা সারাক্ষণ আমার মন জুড়ে বসেছিল। দুর্গা যেন প্রকৃতিরই কন্যা। সে বনে-বাদাড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। অপু নিজের মনে কত-কী কল্পনা করে বসে। নীলকুঠির মাঠের মধ্য দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেটা তার মনে হয়, রামায়ণ-মহাভারতের দেশে চলে গিয়েছে। শ্রুতি-লিখনের জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরিটিকে সে বড় হয়ে খুঁজে বের করবে। আর, তাদের গ্রামের মাঠের পাশে যে ডোবাটি আছে, সেখানেই মহাভারতের মহাবীর হতভাগ্য কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল।

সর্বজয়ার অভাবের সংসারে ইন্দির ঠাকরুণ যেন একটি অতি অবাঞ্ছিত উপসর্গ। সে কতবার রাগ করে চলে যায়, আবার ফিরে আসে। দুর্গা তাকে ফিরিয়ে আনে—'এই পিতি চ—'। একবার সেই বৃদ্ধা রাগ করে চলে গেল, আর ফিরে এলো না—মারা গেল।

অভাবের তাড়নায় রোজগারের আশায় হরিহর গৃহত্যাগ করলেন। এদিকে, ম্যালেরিয়ায় পড়লো দুর্গা। তার রোগশয্যার পাশে বসেছিল অপু। দুর্গা অপুকে একদিন চুপি চুপি বলেছিল: 'তুই বড় হয়ে উঠলে আমাকে একদিন রেলগাড়ি দেখাবি, অপু?' দুর্গার জ্বর বাড়লো—সে মারা গেল।

হরিহরকে এবার গ্রাম ছাড়তে হলো। সর্বজয়া ও অপুকে নিয়ে তিনি একদিন স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠলেন। দুর্গার কথা সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু অপু তাকে ভোলে নি। রেলগাড়ি চলতে লাগলো। অপুর মনে হলো, তাদের গ্রামের প্রান্তে যেন তার দিদি করুণ দুচোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।—'তুই বড় হয়ে উঠলে আমাকে একদিন রেলগাড়ি দেখাবি, অপু?'

অপু চোখের জলে আর তার গ্রামটিকে দেখতে পায় নি।

আশা করি, বইখানি তুমি শীগ্‌গীর পড়ে ফেলবে। আমার মতো বইখানি নিশ্চয়ই তোমারও ভালো লাগবে।

আমি ভালো আছি। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবে। ইতি—

তোমারই
চিরন্তন

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়:

- কোন বই তোমার বিশেষ ভালো লেগেছে জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- বাংলা সাহিত্যের যে বইখানি তোমার অত্যন্ত প্রিয়, তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে তোমার বন্ধুকে লিখে জানাও।
- যে বই পড়ে তুমি মুগ্ধ হয়েছ, তা পড়বার জন্যে বন্ধুকে অনুরোধ করে একখানি চিঠি লিখ।

১৭ প্রশ্ন ॥ সংবাদপত্র-পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪০ ॥

২০, হিন্দুস্থান পার্ক
কলকাতা : ২৯
৫. ৯ ৭৯

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় মৈনাক, তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠি পেয়েছি। তাতে তুমি সংবাদপত্র-পাঠের উপকারিতার কথা জানতে চেয়েছো। তোমার নির্দেশমতো তোমাকে তা আমি জানাচ্ছি।

প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই সমগ্র পৃথিবী এসে আমাদের দ্বারে করাঘাত হানে। সংবাদপত্র হলো সমগ্র পৃথিবীর জাগ্রত বাণীরূপ।

বর্তমান পৃথিবীতে বাস করতে গেলে সংবাদপত্র পাঠ না করে উপায় নেই। কোথায় যুদ্ধ বাধলো অথবা কোথাও যুদ্ধের অবসান ঘটলো, কে পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করলো বা কে চন্দ্রলোক বিজয় করলো, বিজ্ঞানের কি আবিষ্কার হলো বা কোথায় দৈব-দুর্ঘটনায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ মারা পড়লো—সংবাদপত্র ছাড়া আমরা এসব জানবো কি প্রকারে?

সংবাদপত্র সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন-কি মানুষের ভালোমন্দ খবর দিয়েও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন, কর্মখালি, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সংবাদপত্র আমাদের বহু উপকার করে।

সংবাদপত্র পাঠ না করলে আমরা এসব কিছুই জানতে পারবো না। বর্তমান পৃথিবীতে বাস করে এসব না জানার অর্থ অতীতের জগতে পশ্চাদপসরণ এবং কূপ-মণ্ডুকতার জগতে আত্মনির্বাসন।

তাছাড়া, সম্পাদকীয় নিবন্ধে নির্ভীক মতামত প্রকাশ করে সংবাদপত্র একটি জনমতও গড়ে তোলে। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেও সংবাদপত্র পাঠ করা উচিত।

কাজেই, তুমি নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করে জ্ঞানবৃদ্ধি করো—আমি এই কামনা করি।

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো। তোমার বাবা ও মাকে আমার প্রণাম জানাবে। ইতি—

তোমারই
কমলেশ

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়:

- ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা কি, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- প্রত্যহ সংবাদপত্র পাঠ করলে জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- সংবাদপত্র পাঠ করে কিভাবে উপকৃত হয়েছো, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

● দেশে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা

১৮ প্রশ্ন ॥ দেশে নিরক্ষরতা দূর করবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪১ ॥

২২, পরাশর রোড
কলকাতা : ২৯
১৫. ৯. ৭৯

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় অনুপম, তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্র পেয়েছি। ভারতে অশিক্ষার জন্যে তুমি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছ। বুঝতে পারলাম, তুমি ইদানীং এ বিষয়ে চিন্তামগ্ন।

সত্যিই, আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প। শিক্ষার এই সীমাবদ্ধতার জন্যে দেশের ক্ষতি হচ্ছে। যারা অশিক্ষিত, তারা কিসে তাদের ভালো হয়, তা জানে না। এমন-কি, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও তারা অজ্ঞ। তাই তারা নানা অখাদ্য খেয়ে, অপেয় পান করে এবং অস্বাস্থ্যকর উপায়ে জীবন-যাপন করে নানা প্রকার রোগে ভোগে। আমাদের দেশে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা তাই অত্যন্ত বেশী।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ছাড়া আজ কারও চলে না। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত বলে তারা বিজ্ঞানের ধার ধারে না। আজ কৃষককেও বিজ্ঞানের খবর রাখতে হয়। সামান্য দোকানদারেরও বিজ্ঞান না জানলে চলে না। কিন্তু দেশে নিরক্ষরতা দূর না হলে সেখানে বিজ্ঞান প্রবেশ করবে কিরূপে?

অন্যান্য অভিশাপের মতো নিরক্ষরতাও একটা অভিশাপ। নিরক্ষরতার জন্যে সাধারণ মানুষকে নানাভাবে ঠকতে হয়। তাকে মহাজনে ঠকায়, রাজনীতিবিদ্‌রা ঠকায়, ধূর্ত প্রবঞ্চক মাত্রই ঠকায়।

তাছাড়া, ভারতে যে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে, শিক্ষা-বিস্তার ছাড়া তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কাজেই, দেশে অবিলম্বে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্যে চেষ্টা সূচিত হওয়া উচিত। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান চালাতে হবে। তাতে স্কুল-কলেজের এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও অংশ গ্রহণ করতে হবে।

আশা করি, তুমি এই মত সমর্থন করবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর হবে। তাতে দেশের উন্নতি হবে।

আমি ভালো আছি। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবে। ইতি—

তোমারই
পথিক

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- দেশে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা কি, তা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুর কাছে একখানি পত্র লিখ।
- দেশের লোককে সব বিষয়ে সচেতন করে তুলবার উপায় হলো শিক্ষা-বিস্তার। এ বিষয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একখানি পত্র লিখ।
- নিরক্ষরতা দূর না হলে দেশের উন্নতি নেই—এ মর্মে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

- শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপকারিতা

১৯ প্রশ্ন॥ ছাত্রজীবনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপকারিতা কি, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪২ ॥

১০, মনোহর পুকুর রোড
কলকাতা : ২৯
১৫. ৮. ৭৯

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় জ্যোতির্ময়, তুমি তোমাদের কলেজের পরিচালিত শিক্ষামূলক ভ্রমণে কাশ্মীর যেতে মনস্থ করেছ জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই প্রসঙ্গে তুমি শিক্ষামূলক ভ্রমণের উপকারিতা কি জানতে চেয়েছো। বেশ, সে বিষয়ে সামান্য কয়েকটি কথা তোমাকে জানাচ্ছি।

আমরা বই পড়ে যে শিক্ষালাভ করি, তা সম্পূর্ণরূপে কেতাবী শিক্ষা। তা শুধুমাত্র বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য তো তা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সেই জ্ঞান দান করা, যা আমাদের প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলবে এবং যা আমাদের বাস্তব প্রয়োজনে লাগবে। যে জ্ঞান আমাদের প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারলো না বা যে জ্ঞান আমাদের বাস্তব প্রয়োজনে লাগলো না, সেই জ্ঞানের প্রয়োজন কি?

আমরা ইতিহাস পড়ি। তাতে আমাদের মনে ইতিহাসের একটা অস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয় মাত্র। কিন্তু যদি ঐতিহাসিক স্থানটি দেখে আসি, সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক নথিপত্র যদি দেখতে পাই এবং তার ওপর ইতিহাসের অধ্যাপক মহাশয় যদি আমাদের সমস্ত বুঝিয়ে দেন, তবে আমাদের মনের অস্পষ্ট ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তেমনি ভূগোল বিষয়েও এই উপায়ে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ভূগোল মানে তো বইয়ের নীরস পাতা বা মানচিত্রের রেখামাত্র নয়। ভূগোল হলো জীবন্ত বিবরণ। শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দেশের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সেখানকার জনগণ ও তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটে, তাও কারও জীবনে ব্যর্থ হয় না। তাছাড়া, তাতে যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাও আমাদের মানসিক বিকাশের অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে।

তুমি যে তোমাদের কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছো, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। ফিরে এসে নিশ্চয়ই আমাকে তুমি দীর্ঘ চিঠি লিখবে।

আমি ভালো আছি। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। ইতি—

তোমারই
অনিরুদ্ধ

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- দেশ-ভ্রমণের উপকারিতা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- দেশ-ভ্রমণের দ্বারা কি উপকার হয়, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে চিঠি লিখ।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়—এই মর্মে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

২০ প্রশ্ন ॥ আমাদের জীবনে আনন্দ-উৎসবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪৩ ॥

৩, দেওদার স্ট্রীট
কলকাতা : ১৯
৯. ৯. ৭৯

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় অনিন্দ্য, তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি লিখেছ, আনন্দ-উৎসবে যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তা অর্থের অপচয় মাত্র। এতে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

মানুষের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে। উৎসব তো আনন্দ-লাভের একটি উপায়। এই পৃথিবীতে মানুষকে বাঁচবার জন্যে কাজ করতে হয়। কাজ করতে গেলে পরিশ্রমের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি আসে। মানুষ যদি সারাজীবন দিনের পর দিন একটানা কাজ করে চলে, তবে তার জীবন একেবারে একঘেয়ে ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। তখন জীবনের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ! মানুষ তাতে পাগল হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যদি আনন্দ না থাকতো, তাহলে সমস্ত পৃথিবীটাই একটা পাগলা-গারদে পরিণত হতো।

কাজের সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে মানুষ আনন্দের পরিকল্পনা করেছিল। এখন না হয় মানুষ সুসভ্য হয়েছে। কিন্তু যখন মানুষ বনে-জঙ্গলে বাস করতো, তখনও সে নাচগান ও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করেছিল। আজও সভ্যতার আলোক থেকে দূরে যারা বাস করে, তাদেরও আনন্দ-উৎসবের আয়োজন আছে, তাদের জীবনও মরুভূমির মতো নিরানন্দ নয়।

নৃত্যগীত ও নানা আমোদ-প্রমোদ ছাড়া আমাদের সমাজে নানা রকমের উৎসব আছে। একটু ভালো করে চিন্তা করলে দেখবে, সেই সব উৎসবের পেছনে আছে একটা পটভূমি। সাধারণতঃ ফসল ওঠার পর প্রত্যেক দেশেই একটা উৎসবের ব্যবস্থা থাকে, সুখকর ঋতুর আগমনেও উৎসবের রীতি প্রচলিত আছে। এমনি বারো মাসে তেরো পার্বণের যে পরিকল্পনা, তা তো আমাদের কর্মময় জীবনকে একঘেয়েমির হাত থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন নতুন কর্মে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবার জন্যেই আয়োজিত।

আনন্দ-উৎসব আমাদের ক্লান্তি দূর করে আমাদের নব নব কর্মে উদ্বুদ্ধ করে—আমাদের সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে।

আশা করি, তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো। সমাজে কাজের মতো আনন্দ-উৎসবেরও একান্ত প্রয়োজন।

আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। ইতি—

তোমারই
বিদ্যুৎ

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- সমাজে উৎসবের কি প্রয়োজন, তা বর্ণনা করে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- উৎসবে ব্যয় করা ভালো কিন্তু, অমিতব্যয়িতা ভালো নয়—এই মর্মে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

- জীবনের লক্ষ্য

২১ প্রশ্ন॥ জীবনে লক্ষ্য থাকার প্রয়োজনীয়তা কি এবং তোমার জীবনের লক্ষ্য কি, তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪৪ ॥

৩, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা : ২৯
২৩. ৮. ৭৯

বন্ধুবরেষু,

প্রিয় চিত্রভানু, তুমি তোমার পত্রে জীবনে লক্ষ্য থাকার প্রয়োজনীয়তা কি এবং আমার জীবনের লক্ষ্য কি জানতে চেয়েছো। পত্রে তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

নৌকোর হালের কাছে মাঝি না হলে যেমন চলে না, জীবনেও তেমনি একটি লক্ষ্য না হলে চলে না। নৌকোর হালের কাছে মাঝি না থাকলে নৌকা এদিক-ওদিক চলে যায়। মাঝির হাতের কাছে দিক্-দর্শন যন্ত্র থাকা চাই। কিংবা, সূর্য বা ধ্রুবনক্ষত্র—দিক্-নির্ণয়ের কোন উপায় মাঝির জানা থাকা দরকার। সেই সঙ্গে দরকার নৌকো কোথায় ভিড়বে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। তেমনি মানুষের জীবনেও একটা লক্ষ্য স্থির করে রাখা চাই। জীবনে সে কি হবে, তা যদি সে শৈশবেই স্থির করে না রাখে, তবে বারে বারে সে ভুলপথে গিয়ে পড়বে। তাতে অযথা প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থানে সে পৌছতে পারবে না।

কাজেই, বড় হয়ে তুমি কী হবে, তাহা শৈশবেই ঠিক করে রাখতে হয়। আমার বাবা আমাকে শৈশবে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি তার উত্তরে বলেছিলাম—বড় হয়ে আমি ডাক্তার হবো। তাতে বাবা আমাকে ডাক্তার হতে হলে কি করতে হবে, কি পড়তে হবে এবং কি কি বিষয় জানতে হবে—তা আমাকে বলে দিলেন।

ডাক্তারী পড়বার জন্যে আমাকে বিজ্ঞান পড়তে হবে। বিজ্ঞানের আবার জীব-

বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান বিষয়ে আমাকে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। কারণ, ডাক্তারী-শাস্ত্রে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমি আমার জীবনের এমন লক্ষ্য স্থির করলাম কেন? দেখ চিত্রভানু, আমাদের দেশে বহু লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। দেশে সামান্য যে কয়েকজন ডাক্তার আছেন, তাঁদের অধিকাংশই শহরে থাকেন—কোন ডাক্তারই গ্রামে যেতে চান না। আমি তাঁদের মতো শহরে না থেকে গ্রামে যাবো। গ্রামের রুগ্ণ পীড়িত মানুষকে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দেবো। তাতে আমি মনে যে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করবো—তাই হবে আমার পারিশ্রমিক। আমি জানি, তাতেই আমার জীবন সার্থক হবে এবং আমার লক্ষ্য-পূরণের মধ্য দিয়ে আমি আমার দেশের সেবা করে যাবো।

আমি ভালো আছি। তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবে।

তোমারই
অভীক

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়:

- তোমার শখ কি, সে বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র লিখ।
- জীবনে লক্ষ্য স্থির করবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।
- তুমি বড় হয়ে কি করবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

১৩.

সামাজিক পত্র

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাকে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। সমাজের গণ্ডীবদ্ধ মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার জন্যে এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার জন্যে বিভিন্ন সমাজে রয়েছে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা। তাতে বিভিন্ন উপলক্ষে সামাজিক উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সেই সব উৎসবে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—এক কথায়, সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত মানুষের উপস্থিতি কামনা করা হয়। সকলের উপস্থিতিতে, প্রীতি-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একটা অখণ্ড সামাজিকতা গড়ে ওঠে।

প্রস্তাবনা

প্রকৃতির সুকল্যাণে এবং বাঙালীর সৃজনশীল প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে বাঙালী-সমাজে উৎসবের অভাব নেই। প্রতিটি উৎসবের অনুষ্ঠান যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি তার প্রতিটি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-লিপির প্রকৃতিও পৃথক্। কেবল প্রকৃতিই নয়, তার প্রতিটি নিমন্ত্রণ-লিপির আকৃতি, ভাষা এবং আবেদনও স্বতন্ত্র ধরনের। 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'র এই পর্যায়ে মাত্র কয়েক প্রকার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ-লিপির পত্রাদর্শ প্রদত্ত হলো। বলাবাহুল্য, যে অনুষ্ঠানগুলি নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলি বাঙালী-সমাজের অনুষ্ঠান-সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক জীবনের অনুষ্ঠানগুলির আমন্ত্রণ-লিপি রচনার দিকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পরীক্ষায় প্রশ্নাগমের সম্ভাব্যতার দিকেও।

বাংলা আমন্ত্রণ-লিপির বৈশিষ্ট্য

নববর্ষ প্রত্যেক সমাজেরই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন যে-কোন সভ্য সমাজের একটি সৌজন্যপূর্ণ রীতি। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা, কলেজের অধ্যক্ষ বা কলেজের অধ্যক্ষা নিঃসন্দেহে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানীয় ব্যক্তি। এঁদের কাছে ছাত্র-ছাত্রীকে নানা উপলক্ষে পত্র লিখতে হয়। নববর্ষের শুভেচ্ছা-লিপি এবং কলেজের অধ্যক্ষের নিকট পত্র সেইজন্যে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

নিবেদন ইতি

● নববর্ষের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন

১ প্রশ্ন ॥ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪৫ ॥

২২, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা : ৯
১. ১. ৮০

প্রিয়বরেষু,

চিন্ময়, আজ শুভ নববর্ষ। ইংরেজী ১৯৮০ সাল। তোমাকে আজ নববর্ষের এই শুভ প্রভাতে আমার বুকভরা ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানাই।

নববর্ষের এই শুভ প্রভাত আজ আমাদের জন্যে কি বহন করে এনেছে? নিশ্চয়ই প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। সূর্যের আলোয়, আকাশে, বাতাসে আজ সেই কথাই তো ঝরে পড়ছে!

তোমার নতুন বছরের প্রতিটি দিন শুভ এবং মধুময় হোক। নতুন বছর তোমার নতুন নতুন সাফল্যের বাণী বহন করে আনুক। ইতি—

তোমারই
সুপ্রভাত

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- বাংলা নববর্ষে তুমি তোমার বন্ধুকে একটি পত্রে শুভেচ্ছা জানাও।
- শুভ বড়দিন জানিয়ে তুমি তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তুমি তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

● দিদির বিবাহ উপলক্ষে আমন্ত্রণ

২ প্রশ্ন ॥ তোমার দিদির বিবাহ উপলক্ষে তোমার কোনও বন্ধুকে একখানি আমন্ত্রণ পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪৬ ॥

বি-২৩, রেল কোয়ার্টার্স
ডাকঘর : খড়্গপুর-১
জেলা : মেদিনীপুর
২. ৩. ৮০

প্রিয়বরেষু,

অভিজিৎ, আগামী ১০ই মার্চ, ১৯৮০, রবিবার দিদির বিবাহ। সেই আনন্দ-অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আগামী ৯ই মার্চ, শনিবার তুমি তিনটার ট্রেনে চলে এসো। তোমাকে বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্যে গাড়ি নিয়ে আমি সেদিন বিকেল চারটার সময় স্টেশনে উপস্থিত থাকবো। দেখো, তুমি গাড়ি ফেল করো না।

পরদিন সন্ধ্যায় বিবাহ। বিবাহের পর কয়েকটা দিন আমাদের এখানে কাটিয়ে তারপর ফিরে যেও। দিদি চলে গেলে বাড়িতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তুমি থাকলে তার কিছুটা কেটে যাবে, মনে করি। বাড়িতে সেইমতো বলে এসো।

তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাবে। ইতি—

তোমারই
কুশল

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায়ঃ

- তোমার ভ্রাতার উপনয়ন উপলক্ষে তোমার কোন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার গ্রামের মেলায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার জন্মদিনে তোমার কোন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একখানি চিঠি লিখ।

- অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ

৩ প্রশ্ন ॥ আগামী সরস্বতী পূজায় তোমার বাড়িতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪৭ ॥

১৭/৩, বকুল বাগান রোড
কলকাতা ঃ ২৬
১৭. ১. ৮০

প্রিয়বরেষু,

দেবব্রত, এ বছরও আমাদের বাড়িতে যথারীতি সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে তোমাকে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

তুমি সরস্বতী পূজার আগের দিন আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই প্রতিমা সাজাবো। পরের দিন একসঙ্গে অঞ্জলি দেবো এবং

খেলাধূলো করবো। তার পরের দিনও তুমি বাড়ি ফিরতে পারবে না। সেদিনও খেলাধূলোর নানা ব্যবস্থা আছে। সেদিন বিকেলে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে পরদিন সকালে তুমি বাড়ি ফিরবে। তোমার বাবা ও মাকে সেইমতো বলে আসবে।

মা, মিলি, দীপু ও আমি সাগ্রহে তোমার আসার প্রতীক্ষা করছি।

তুমি আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিবে। ইতি—

তোমারই
সুকল্যাণ

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- আগামী দুর্গাপূজায় তোমার কোন বন্ধুকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে একখানি পত্র লিখ।
- আগামী ভাইফোঁটার দিন তোমার কোন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একখানি চিঠি লিখ।
- আগামী রথের মেলায় তোমার বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে একখানি চিঠি লিখ।

- অধ্যক্ষের নিকট ছুটির আবেদন

৪ প্রশ্ন ॥ তোমার দিদির বিবাহ উপলক্ষে তুমি তিনদিন কলেজে অনুপস্থিত ছিলে। সেই কয়দিনের ছুটি মঞ্জুর করবার অনুরোধ করে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে একখানি আবেদন পত্র লিখ।

॥ পত্রাদর্শ ৪৮ ॥

১৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা : ৯
৫. ৩. ৮০

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,
সিটি কলেজ,
রামমোহন সরণি
কলকাতা : ৯
সবিনয় নিবেদন,

আমি গত ২. ৩. ৮০ থেকে ৪. ৩. ৮০ পর্যন্ত—এই তিনদিন আমার দিদির বিবাহের জন্যে কলেজে উপস্থিত হতে পারি নি।

অতএব অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার উল্লিখিত তিনদিনের অনুপস্থিতির জন্যে ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র,
নীলাঞ্জন রায়

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তুমি তোমার পিতামাতার সঙ্গে কোন আত্মীয়ের বাড়ি যাবে। তিনদিনের ছুটি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে একখানি পত্র লিখ।
- তোমার উপনয়নের জন্যে তুমি সাতদিন স্কুলে যেতে পারবে না। ছুটি প্রার্থনা করে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে একখানি আবেদন-পত্র লিখ।
- গরমের ছুটিতে পড়বার জন্যে স্কুল লাইব্রেরী থেকে 'বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' ধার চেয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে একখানি আবেদন-পত্র লিখ।

- কলেজের সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণ-লিপি

৫ প্রশ্ন ॥ তোমার কলেজে সরস্বতী পূজার একখানি আমন্ত্রণ-লিপি রচনা কর।

॥ পত্রাদর্শ ৪৯ ॥

॥ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যম্ ॥

বর্ধমান রাজ কলেজ
বর্ধমান
২০শে মাঘ, ১৩৮৬

সবিনয় নিবেদন,

সুধী, আগামী শ্রীপঞ্চমী, ২৯শে মাঘ, ১৩৮৬ [ইংরেজী ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০] রবিবার কলেজ-প্রাঙ্গণে আমরা শ্রীশ্রীবাগ্দেবীর পূজার আয়োজন করেছি।

এই অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে। ইতি—

বিনীত
বর্ধমান রাজ কলেজের
ছাত্রবৃন্দ

॥ অনুষ্ঠান-সূচী ॥

২৯শে মাঘ, রবিবার সকাল ৮ ঘটিকায় পূজারম্ভ।

সকাল ১০ ঘটিকায় পুষ্পাঞ্জলি, সকাল ১১ ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণ এবং বিকাল ৪ ঘটিকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১লা ফাল্গুন, সোমবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় প্রতিমা-বিসর্জন।

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার কলেজের পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের একখানি আমন্ত্রণ-লিপি রচনা কর।
- তোমার কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একখানি আমন্ত্রণ-লিপি রচনা কর।
- তোমাদের লাইব্রেরীর বার্ষিক অনুষ্ঠানের একখানি আমন্ত্রণ-পত্র রচনা কর।

- বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র

৬ প্রশ্ন ॥ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ উপলক্ষে একখানি যথাযোগ্য নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা কর।

॥ পত্রাদর্শ ৫০ ॥

॥ শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ ॥

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্,

মহাশয়, আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ বৃহস্পতিবার [ইংরেজী ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৯] গোধূলি পাঁচ ঘটিকায় আমার সহোদর ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলার সঙ্গে কলকাতার যাদবপুর নিবাসী স্বর্গীয় মনোহরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুপ্রভাতের শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব মহাশয়, উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়। নমস্কারান্তে। ইতি—২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬

বিবাহ-বাসর :
১৫/২, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা : ৩১

ভবদীয়
শ্রীঅতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

[**বিঃ দ্রঃ** কোনরূপ উপহারের পরিবর্তে নবদম্পতীকে কেবলমাত্র আশীর্বাদই প্রার্থনীয়।]

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-আপ্যায়ন-বিধি অনুসারে অতিথি-আপ্যায়ন ॥

এই পত্রের অনুসরণে লেখা যায় :

- তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্রের খসড়া রচনা কর।
- তোমার ভাগিনেয়ের উপনয়ন উপলক্ষে একখানি নিমন্ত্রণ-লিপির খসড়া রচনা কর।
- তোমার বাড়ির যে-কোন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা কর।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

গল্প-রচনা

'গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোত্থানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা।'

—কবি শ্রীমধুসূদন

'নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা…
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।' —রবীন্দ্রনাথ

গল্প-রচনা

গল্প-রচনা একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ যুগে যুগে তার মর্মের গভীরে গল্প-রচনার তাগিদ অনুভব করেছে। সেই হিসেবে গল্প-রচনার প্রারম্ভিক যুগকে মানব-সভ্যতার আদিম স্তরে স্থাপন করা যায়। সভ্যতার সেই প্রস্তুতি-লগ্নে মানুষ যখন ছিল অরণ্যচারী কিংবা গুহাবাসী, তখনই দিনান্তে শিকারের অবসানে যখন যূথবদ্ধ মানুষ তার নির্দিষ্ট বাসস্থানে ফিরে এসে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করতো, তখনই শুরু হয়ে যেত তাদের সারাদিনের শিকারের অভিজ্ঞতার বিচিত্র সরস বর্ণনা কিংবা কখনো-কখনো কোন বৃদ্ধ গোষ্ঠী-নেতা তাদের উত্তরপুরুষদের কাছে বিবৃত করতো কোন মৃত ব্যক্তির বীরত্ব, বুদ্ধি এবং শৌর্যের কাহিনী। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তব ঘটনার ওপরে বক্তার কল্পনার পড়তো প্রলেপ। ফলে, বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে সেই আদিম মানবের কথিত গল্পও শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতো। এই ভাবেই সভ্যতার সেই প্রায়ান্ধকার যুগেই গল্প-রচনার সূত্রপাত হয়েছিল।

প্রস্তাবনা

তারপর মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিষয়, বর্ণনা-ভঙ্গি এবং ভাষার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আদিম যুগের গল্পের কাঠামো এবং তার শিল্পগত আবেদন এখনো অপরিবর্তিত আছে। ঈশপের গল্পগুলি কিংবা সংস্কৃতের পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পগুলি লক্ষ্য করলে এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধ হবে। গল্পগুলিতে আদিম যুগের জীবজন্তু ও পশুপাখীর প্রাধান্য যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট সেদিনের মানুষের প্রাচীন আচার-আচরণ। তাছাড়া, গ্রামবৃদ্ধ বা গোষ্ঠী-নেতার গল্প-কথন-ভঙ্গিটিও গল্পগুলিতে সুমুদ্রিত। গল্প-বর্ণনার ছলে উপদেশ-বিতরণ এই গল্পগুলির একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি, গল্পগুলিতে সেই প্রাচীন আরণ্যক যুগের একটি গন্ধ যে লেগে আছে, তা কে অস্বীকার করবে?

আদিম যুগের গল্পমালা

সেই সব গল্পেও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার যুগল-সম্মিলন লক্ষ্য করা যাবে। কেবল বাস্তব ঘটনার বিশ্বস্ত বিবৃতিই গল্প নয়। তার ওপরে কল্পনার প্রলেপ চাই, চাই শিল্পের এক নিপুণ কারিগরি। সংবাদপত্রে ঘটনার নিছক বিবৃতি কত প্রকাশিত হয়;

সেগুলি গল্পপদবাচ্য নয়, নয় শিল্পপদবাচ্য। কাজেই, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণেই গল্প রচিত হয়ে থাকে। 'গল্প' কথাটির উদ্ভব সংস্কৃত 'জল্প' শব্দ থেকে। 'জল্প' শব্দটির অর্থ হলো জল্পনা বা কল্পনা। কল্পনার সংশ্লেষ ছাড়া গল্প রচিত হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার কতটা সংমিশ্রণ থাকবে?

গল্পের উপাদান ও গল্পরস

উত্তরে বলা যায়, নিপুণ গল্প-রচয়িতাই জানেন, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কত পরিমাণে কল্পনা মেশালে গল্প প্রকৃত গল্প হয়ে ওঠে। আসল কথা হলো, একটি সঙ্গতি-বোধ। কি হয়েছে বা কি ঘটেছে, তাইই গল্পের বিষয় নয়; কি হতে পারতো বা কি হতে পারে, তাইই হলো গল্পের বিষয়। অথচ তা অনায়াসেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে। কিন্তু সর্বোপরি, এমন একটা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হবে, যাতে একই সঙ্গে বিস্ময় ও মুগ্ধতা মানুষের মনকে করবে আচ্ছন্ন। এবং তাইই হলো গল্পরস। পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন গল্পের উত্তরণ বা রসোত্তীর্ণতা।

গল্প-রচনা বা গল্প-বলার মতো মানুষের গল্প-শোনার আগ্রহও খুবই পুরাতন। অতি আদিম কাল থেকেই মানুষ যেমন গল্প-বলায় আগ্রহী, তেমনি গল্প-শোনার জন্যেও সে উৎসুক। মানুষের এই গল্প-শোনার আগ্রহের পরিতৃপ্তির জন্যে নিত্য-নতুন গল্প রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু সবাই ভালো গল্প বলতে পারে না। অথচ কেউ কেউ খুব

গল্প-বলার কৌশল

ভালো গল্প বলতে পারে। যারা ভালো গল্প বলতে পারে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের গল্প বলার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যের নেই কিংবা থাকলেও কম আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির গুণে তাদের বলা গল্পগুলি অনায়াসে শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করলে ভালো গল্প বলার উপায়গুলি আয়ত্ত করা যায়। কাজেই, গল্প-বলা বা বাচনভঙ্গি বা যাকে পরিবেশন-নৈপুণ্য বলা হয়, তা গল্পকে উপাদেয় বা রসোত্তীর্ণ রূপ দিতে পারে।

যিনি ভালো গল্পকার, তিনি খুব সহজেই উৎকৃষ্ট গল্প বানাতে পারেন। সব শিল্পের মতো গল্পের নির্মাণ-কৌশলেও চাই নিপুণ মুন্শিয়ানা। নিপুণ গল্পকারদের গল্পগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গল্পের কায়া-নির্মাণের জন্যে তিনি কখনো কল্পনার, কখনো বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করেন। কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে তিনি যে গল্পগুলি রচনা করেন, তা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে সৃষ্টি। কিন্তু স্মরণীয় যে, গল্প বলার উদ্দেশ্যই

গল্পের গঠন ও উদ্দেশ্য

হলো আনন্দ-বিতরণ। কিন্তু শুধু আনন্দ-বিতরণের মধ্যেই গল্পের উদ্দেশ্য নিঃশেষিত হয়ে যায় না। গল্প-বলার অন্য উদ্দেশ্যও থাকে। মানুষের সুকর্মের প্রশংসা ও কুকর্মের সমালোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে গল্পের ভেতরে। মানুষকে সুপথে চালিত করা, সুশিক্ষা দান ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে গল্পকার তাঁর গল্পের মধ্যস্থতায় আনন্দ বিতরণ করে যান। যীশুখ্রীস্ট বা শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে উপদেশ দেবার ছলে অনেক সময় নানা গল্প পরিবেশন করেছেন। তাঁদের সেই অনবদ্য সুষমামণ্ডিত গল্পগুলি তাঁদের উপদেশগুলিকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

কিন্তু এমন অনেক গল্প আছে, যা আমাদের আনন্দ দিলেও প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের দোষত্রুটির তীব্র সমালোচনা করে, আমাদের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে, সৎকর্মে প্রেরণা দেয়, অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করে। কিন্তু গল্পকার এমন ভাষায়, এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে গল্পগুলি বলে যান, গল্পের পরিবেশ এবং গল্পের চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত বলে মনে হয়। সেই পরিবেশের মধ্যে আমরা আমাদের সমাজকে প্রত্যক্ষ করি এবং সেই চরিত্রগুলির মধ্যে আমরা আমাদের চারদিকের মানুষগুলির সন্ধান পাই। সুতরাং, গল্প হলো আমাদের জীবন এবং আমাদের সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিচিত্রও বটে।

বৈশিষ্ট্য

কাজেই, উৎকৃষ্ট গল্প-রচনার জন্যে কয়েকটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন। সেগুলি হলো : কাহিনী, পরিবেশ, চরিত্র, বক্তব্য, কাহিনী-বিন্যাস, সংলাপ, ভাষা, ইত্যাদি।

গল্পের জন্যে প্রথমেই যা প্রয়োজন, তা হলো—কাহিনী। কাহিনীকে ইংরেজীতে বলা হয় 'প্লট'। অর্থাৎ, গল্পে একটা ঘটনার বর্ণনা থাকা চাই। সেই ঘটনার মধ্যে মানুষের কাজকর্ম, চলাফেরা, কথাবার্তার বর্ণনা থাকে। এবং তা দিয়ে মানুষের ভালোমন্দ গুণাগুণের বিচার হয়ে যায় পাঠকের বিবেক ও হৃদয়ের বিচারশালায়। আবার, গল্পে বর্ণিত কাহিনী বা ঘটনাটি হবে গতিশীল। ধারাবাহিক ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনীর স্রোত প্রবাহিত হয়ে যাবে এক চরম লক্ষ্যের অভিমুখে। কাহিনীর শুরু যেমন হবে চিত্তাকর্ষক, সমাপ্তিও তেমনি হবে আকর্ষণীয়। কাহিনীর সমাপ্তিতেই গল্পের চরম পরিণতি। সেখানেই গল্পের রসোত্তীর্ণতা।

কাহিনী

কাহিনী-বর্ণনার মতো পরিবেশ-বর্ণনাও গল্পের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কাহিনীকে প্রত্যক্ষ এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে গল্পের পরিবেশ রচনার দিকে মন দিতে হয়। গল্পটি যে পরিবেশে স্থাপিত হয়, সেই পরিবেশটি যেন নিখুঁত, সংগতিপূর্ণ ও ইংগিতময় হয়। পরিবেশই কাহিনীকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে কাহিনী একাকার হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, পরিবেশ কাহিনীকে নতুন তাৎপর্য, নতুন ইংগিত দান করবে। গল্পে যদি বনের কাহিনী পরিবেশন করতে হয়, তাহলে যেন বনের পরিবেশ নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে ; যদি রাজসভার কাহিনী বর্ণিত হয়, তবে রাজসভার পরিবেশটি নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠা চাই। দিনের পরিবেশ দিনের মতো হওয়া চাই, রাতের পরিবেশ হবে রাতের মতো। মোটকথা, গল্পের আবহাওয়া তার কাহিনীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে ; একটিকে অপরটির থেকে পৃথক করা যায় না।

পরিবেশ রচনা

গল্পের কাহিনী বিকশিত হয় কয়েকটি চরিত্রকে অবলম্বন করে। আগেকার যুগের ধারণা ছিল, কাহিনীই গল্পের প্রধান ভিত্তি এবং চরিত্র আসে কাহিনীর প্রয়োজনে। কিন্তু বর্তমান ধারণায়, চরিত্রই মুখ্য এবং চরিত্র-বিকাশের প্রয়োজনেই কাহিনীর

বিন্যাস। কাহিনী বর্ণনা করতে গেলে কয়েকটি পাত্র-পাত্রীর কথা বর্ণনা করতে হয়। তাদের চলাফেরা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, চিন্তা-ভাবনা এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কাহিনী গতি পায়, ঘটনা প্রবাহিত হয়ে চলে। সেই চরিত্রগুলির কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি সাহসী, কোনটি ভীরু, কোনটি মহৎ, কোনটি খল—এসব তাদের চালচলন,

চরিত্র

কথাবার্তা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। এদের মধ্যে যে চরিত্রটি প্রধান বা যাকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হয়ে চলে, তাকেই বলা হয় নায়ক চরিত্র। গল্পের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের চরিত্রগুলির ভালোমন্দের প্রশংসা বা সমালোচনা করা হয়ে থাকে। পাঠকের মনের মধ্যে একটা গোপন বিচারসভা বসে। সেখানে চরিত্রগুলির ভালোমন্দের নির্মম বিচার হয়ে যায়।

কিন্তু মানুষ কেন গল্প রচনা করে? গল্প রচনার প্রয়োজন কি? আসলে, মানুষের যে-কোন বিষয়ে তার একটি বক্তব্য থাকে। সে সেই বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চায়। সাদামাঠাভাবে বা সরাসরিভাবে সেই বক্তব্যটি প্রকাশিত হলে মানুষের মনের ওপর তেমন কোন দাগ কাটে না, কোন গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু বক্তব্যটি যদি গল্পের আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়, তবে তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, চেষ্টা করেও মানুষ তাকে

বক্তব্য

ভুলতে পারে না। সাধারণতঃ, কোন বক্তব্য পরিবেশন করতে গেলে দৃষ্টান্ত দিতে হয়, উদাহরণের জন্যে কোন ঘটনার উপস্থাপনা করতে হয়। গল্প হলো সেই ঘটনার উপস্থাপনা বা দৃষ্টান্ত; আর, বক্তব্যটি তাতে থাকে অন্তর্নিহিত। এইভাবে বক্তব্যের উপস্থাপনা হয় শিল্পসম্মত এবং তার প্রভাব হয় চিরস্থায়ী। বাইবেলের গল্পগুলি, ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের গল্প, শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত বক্তব্যধর্মী হয়েও উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠেছে। বক্তব্য এগুলিতে নিঃসন্দেহে সোচ্চার; কিন্তু কাহিনী-বিন্যাস ও পরিবেশনার নৈপুণ্যে এগুলির উৎকর্ষ অবিস্মরণীয়।

এই সব গল্পগুলিতে বক্তব্যের পাশাপাশি কাহিনী সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্য ও কাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণতঃ, আমাদের সমাজে ভালোমন্দ দু' রকমেরই মানুষ আছে। বিবেকবান্ মানুষ তাদের সমালোচনা করতে চায়; ভালোকে ভালো এবং

রূপক-গল্প

মন্দকে মন্দ বলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে সে সব কথা বলার অনেক ঝুঁকি থাকে। তাই মানুষকে গল্পের আশ্রয় নিতে হয়। গল্পের মধ্যস্থতায় সমাজের বা সমাজের অন্তর্গত মানুষের সমালোচনা করা যায়। এই সব গল্পকে বলা হয় রূপক-গল্প। রূপক-গল্পে বক্তব্য পরিবেশনের জন্যেই গল্পের আয়োজন। বক্তব্য বা সার-কথাটিই রূপক-গল্পের নীতিবাক্য বা শিক্ষা। গল্পের ঘটনা ও চরিত্রের ভিড়ের ভেতর থেকে নির্যাসের মতো সেই বক্তব্যটুকুকে ছেঁকে নিতে হয়।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সাধারণতঃ গল্পের কেবলমাত্র নীতিবাক্যটি প্রদত্ত হয় কিংবা দু'-একটি পাত্র-পাত্রী বা প্রধান কাহিনী-সূত্রের চুম্বকটুকুর উল্লেখ করে সমগ্র গল্পটিকে

পল্লবিত করে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। গল্প-লেখককে তখন নির্দেশ-মতো গল্পের রচনা সমাপ্ত করে গল্পের শীর্ষে একটি সুচিন্তিত নামকরণ করতে হয় এবং গল্পের অন্তে নীতিবাক্যটি সংযোজিত করতে হয়। গল্পটি তখনই পূর্ণাঙ্গ গল্প হয়ে ওঠে। যথাযথ অনুচ্ছেদ ভাগ করে উপযুক্ত সংলাপ [dialogue] যোজনা করে গল্পটিকে প্রাণবন্ত এবং নিখুঁত করে তোলার মধ্যেই গল্প-লেখকের মুন্শিয়ানা ধরা পড়ে।

পরীক্ষার গল্প-রচনার কৌশল

কেবল গল্প লিখে গেলেই হয় না। গল্প লিখতে জানতে হয়। শ্রেষ্ঠ গল্পকার যিনি, তিনি ঘটনার পর ঘটনা এমন নিপুণ কৌশলে সাজিয়ে যান, কিছুটা বলেন, কিছুটা বলেন না, যে অংশ বলেন না, তা এমন অনবদ্য ভঙ্গিতে ইংগিতময় হয়ে ওঠে যে, সমগ্র প্রয়াসের মধ্যে একটি আশ্চর্য চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়। তখন গল্পটি একটি শ্রেষ্ঠগল্প হয়ে ওঠে। আসলে, গল্পের সবটা বলার প্রয়োজন হয় না। কিছুটা বলে এবং কিছুটা না বলে গল্পরসটিকে জমিয়ে তুলতে হয়। অর্থাৎ, কৌতূহল সৃষ্টি। প্রতিটি বাক্যেই সেই কৌতূহল সৃষ্টি হয়ে এক চরম পরিণতির দিকে গল্পটি চলবে এগিয়ে। তাকেই বলা হয় গল্প-বলার মুন্শিয়ানা। সুগল্প-লেখকের সেজন্যে প্রথমেই চাই উপযুক্ত মাত্রাবোধ বা পরিমিতি-বোধ। শ্রেষ্ঠগল্পের বৈশিষ্ট্যই হলো এই পরিমিতি-বোধ।

কাহিনী-বিন্যাস

কিন্তু সব শেষে কিংবা সবার আগে চাই সুন্দর, অথচ শানিত একটি ভাষা। গল্পের ভাষা হবে সহজ, সরল; কিন্তু ঋজু। ব্যাকরণ-ভুলবর্জিত শুদ্ধ ভাষাই সব নয়। গল্পের ভাষায় থাকবে একটা সুষ্ঠু, শানিত ভঙ্গি। কাজেই, যেমন করেই হোক, গল্পটি প্রকাশ করে ফেলতে পারলেই শ্রেষ্ঠগল্প হয় না; শ্রেষ্ঠগল্প রচনার জন্যে একটা নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করতে হয়। তাকেই বলা হয় গল্প-লেখার 'স্টাইল'। একই বিষয় বা একই প্লট নিয়ে বিভিন্ন জনের লেখা গল্প বিভিন্ন রূপ হয়ে ওঠে। বিষয়টা সকলের, কিন্তু গল্প-রচনা বা গল্প-রচনাভঙ্গি বা 'স্টাইল' এক-একজনের এক-এক রকমের। সম্ভবতঃ, তার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ গল্প-রচনার রহস্য নিহিত আছে।

ভাষা

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত নীতিবাক্যটি অথবা গল্পের সংক্ষিপ্ত কাঠামোটি নিয়ে প্রথমেই নিজের কল্পনা-শক্তিকে খেলাবার চেষ্টা করবে। এইভাবে কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে গল্পটির পূর্ণাবয়ব গড়ে উঠবে। তখনই গল্পটিকে লিখিত রূপ দেবার জন্যে অগ্রসর হতে হবে। গল্প লেখার সময় সহজ, সরল ভাষার আশ্রয় নেবে। সাধু অথবা চলিত—যে কোন একটি ভাষায় গল্পটি লিখবে। অবশ্য, সাধু ভাষায় লিখিত গল্পে চলিত ভাষার সংলাপ ব্যবহার করা যায়। বানানের ভুল পরিহার করবে। বাক্যের গঠনগত অশুদ্ধি যাতে থেকে না যায়, সেদিকে সজাগ থাকবে।। প্রতিটি ঘটনা, এমনকি, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে [paragraph] পরিবেশন করবে। এইভাবে লিখিত গল্প পরীক্ষায় উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হবার যোগ্যতা অর্জন করে॥

শেষকথা

●১. **গল্প-সংকেত ঃ** একটি ইঁদুর একটি ঘুমন্ত সিংহের নাকে ভুলক্রমে প্রবেশ করে। সিংহ তাকে মার্জনা করে ছেড়ে দেয়। পরে একদিন শিকারীর জালে বন্দী হয়ে সিংহ গর্জন করে। ইঁদুর সেই গর্জন শুনে ছুটে এসে জাল কেটে সিংহকে রক্ষা করে।

॥ সিংহ ও ইঁদুর ॥

একদিন একটি সিংহ পর্বতের গুহায় ঘুমুচ্ছিল। একটি ইঁদুর ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ওর সামনে গিয়ে পড়ে। সিংহের নাসিকা-গর্জনে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে পালাতে গিয়ে ভুল করে সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে।

সিংহের হাঁচিতে সে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সিংহের ঘুম ভেঙে যায়। সে ইঁদুরকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারে, এই ইঁদুরই তার নিদ্রাভঙ্গের কারণ। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে নখর-প্রহারের দ্বারা ইঁদুরকে হত্যা করবার জন্যে উদ্যত হয়।

প্রাণভয়ে ভীত ইঁদুর সবিনয়ে বললো, 'মহারাজ, না জেনে আমি অপরাধ করে ফেলেছি, ক্ষমা করে আমায় প্রাণদান করুন। আপনি সমস্ত পশুর রাজা আর আমি বনের একটি ক্ষুদ্র ইঁদুর। আমাকে হত্যা করলে আপনার পশুরাজ নাম কলঙ্কিত হবে।

শুনে সিংহ ঈষৎ হেসে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে ইঁদুরকে ছেড়ে দিল।

এই ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। সিংহও ভুলে গেছে, কবে কোথায় সে একটা ইঁদুরকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিল।

সেদিন সিংহ শিকারের সন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে একটি বনে প্রবেশ করলো। সেই বনে কোন শিকারীর জাল পাতা ছিল। সিংহ ভুল করে সেই জালের মধ্যে গিয়ে পড়ে। সে যতই জাল ছাড়াতে চেষ্টা করে, ততই সে জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে থাকে। শেষে প্রাণরক্ষা অসম্ভব জেনে সে হতাশ হয়ে ভয়ঙ্কর গর্জন করতে থাকে। তার গর্জনে বনভূমি কম্পিত হতে লাগলো।

ইতিপূর্বে সিংহ যে ইঁদুরটির প্রাণরক্ষা করেছিল, সৌভাগ্যক্রমে তার বাস ছিল ঐ স্থানের অনতিদূরেই। সে তার প্রাণদাতার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই সিংহের কোন বিপদ ঘটেছে। সে কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে ছুটে গেল। দেখলো, তার অনুমানই যথার্থ। সিংহ জালের মধ্যে বন্দী হয়ে প্রাণের আশা ত্যাগ করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

ইঁদুর আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে দাঁত দিয়ে জাল কাটতে লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাল কেটে সে সিংহকে মুক্ত করে তার কৃতজ্ঞতা শোধ করলো ॥

নীতিবাক্য ঃ দয়া কখনও নিষ্ফল হয় না।

●২. **গল্প-সংকেত ঃ** একটি বাঘ ঝরনার জল পান করতে গিয়ে নীচে একটি মেষশাবককে জল পান করতে দেখে ওকে ভক্ষণ করতে তার ইচ্ছে হলো। মেষশাবকটি জল ঘোলা করেছে এবং গালি দিয়েছে—এই অজুহাত না টিকলে তার বাপ গালি দিয়েছিল বলে তাকে বাঘটি ভক্ষণ করে।

॥ বাঘ ও মেষশাবক ॥

একটি বাঘ পর্বতের ওপর ঝরনার জল পান করছিল।

এমন সময় সে দেখতে পেল, কিছু দূরে অনেকটা নীচে একটি মেষশাবক একই ঝরনার জল পান করছে। মেষশাবকটি ছিল নধরকান্তি। তাকে দেখে বাঘের ওকে ভক্ষণ করতে প্রবল ইচ্ছে হলো। কিন্তু বিনা দোষে ওকে কি করে খাওয়া যায়? একটা অজুহাত চাই। বাঘ মনে মনে একটা অজুহাত তৈরী করে খুব দ্রুতগতিতে ওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।

সে প্রথমেই প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে হেঁকে উঠলো, 'নচ্ছার কোথাকার! আমি জলপান করছি দেখেও তুই জল ঘোলা করছিস! এত বড় দুঃসাহস তোর! জানিস, আমি কে? কি করতে পারি আমি?'

মেষশাবক বাঘের শাসানিতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'আমি নীচে জল পান করছি, আর আপনি জল পান করছেন ওপরে। নীচের জল ঘোলা হলেও তা তো ওপরে যেতে পারে না। আমি কি করে আপনার জল ঘোলা করলাম?

বাঘ নিজের কথার অসারতা বুঝতে পেরে বললো, 'তা বটে। কিন্তু তুই বছরখানেক আগে আমাকে গালি দিয়েছিলি কেন?'

মেষশাবক কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'আপনি কি বলছেন? একবছর আগে আমার জন্মই হয়নি। আমি আপনাকে গালি দিলাম কি করে?'

বাঘ এবারেও নিজের কথার অসারতা বুঝতে পারলো। বললো, 'তা বটে। সে তুই নস্। তোর বাপই তাহলে আমাকে গালি দিয়েছিল। তুই গালি দিস্ বা তোর বাপ গালি দিক্—একই কথা। আমি তোর আর কোন অজুহাতই শুনতে চাই না।'

এই কথা বলে বাঘ সেই অসহায় দুর্বল মেষশাবকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করলো॥

নীতিবাক্য ঃ দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

●৩. **গল্প-সংকেত ঃ** একটি মুমূর্ষু সাপকে একটি কৃষক গৃহে এনে সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাকে প্রাণদান করে। সাপটি সুস্থ হয়ে কৃষকের পুত্রকে দংশন করতে উদ্যত হলে সে তাকে হত্যা করে।

॥ সাপ ও কৃষক ॥

তখন শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় চারদিক হিম হয়ে জমে যাচ্ছে যেন।

একটি কৃষক মাঠের দিকে যেতে যেতে একটি সাপকে দেখতে পেল। সেই ঠাণ্ডায় সাপটি একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তার নড়বারও শক্তি নেই। আর কিছুক্ষণ ঐভাবে পড়ে থাকলে তার মৃত্যু হবে।

তাকে ঐ অবস্থায় দেখে কৃষকটির বড়ো মায়া হলো। সে তাকে তুলে বাড়ি নিয়ে

এলো। আগুন জেলে তাকে সেঁকে বেশ একটু চাঙ্গা করে তুললো। তাপ পেয়ে, খাবার-দাবার খেয়ে সাপটি একেবারে সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

তখন সাপটি তার স্বাভাবিক শক্তি ফিরে পেয়ে কৃষকের শিশু-সন্তানকে দংশন করতে উদ্যত হল।

তা দেখে কৃষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সাপকে বললো, 'রাস্তার ধারে—ঠাণ্ডায়, হিমে তুই মরতে বসেছিলি। আমি দয়া করে বাড়ি নিয়ে এসে তোকে বাঁচিয়ে তুললাম। তুই সেজন্যে আমার কাছে কৃতজ্ঞ না থেকে আমার ছেলেকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছিস! বুঝেছি, যার যা স্বভাব, তা কখনো দূর হয় না। কিন্তু আর নয়। তোর যেমন কর্ম, তোকে তেমনি ফল ভোগ করতে হবে।'

এই বলে ক্রুদ্ধ কৃষক হাতের কুড়ুল দিয়ে সাপের মাথায় সজোরে আঘাত করলো; এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাপটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

নীতিবাক্যঃ যার যা স্বভাব, তা কখনও যায় না।

●৪ গল্প-সংকেতঃ একটি বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল। সে সবার কাছে গিয়ে গলার হাড় বের করে দেবার বিনিময়ে উপযুক্ত পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কেউ সম্মত হয় না। একটি বক হাড় বের করে দিয়ে পুরস্কার চাইলে, বাঘ তাকে ভক্ষণ করার ভয় দেখালে সে পলায়ন করে।

॥ বাঘ ও বক ॥

একদিন একটি বাঘের গলায় হাড় ফুটেছিল। সে হাড়টাকে গলা থেকে বের করবার অনেক চেষ্টা করলো; কিন্তু কিছুতেই ওটা বের করতে পারলো না। সে তখন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চারদিকে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলো।

সামনে যাকেই পায়, তাকেই সে বলে, 'বন্ধু হে, গলায় হাড় ফুটে গিয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। যদি তুমি আমার গলার ভেতর থেকে হাড়টা বের করে দিতে পারো, তাহলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেবো; এবং চিরদিনের জন্যে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।'

সবাই শুনলো তার কাতর অনুনয়। কিন্তু কেউ ভয়ে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না।

শেষে একটি বক বাঘের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে সম্মত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি তার সামনে থাবা পেতে বসে হাঁ করে মুখ ওপরে তুলে ধরলো। বক তার ঠোঁট বাঘের গলার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে হাড়খানাকে টেনে বের করে আনলো।

বাঘ এখন বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলো। তার গলায় আর কোন যন্ত্রণা নেই—কোন অস্বস্তি নেই। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

বকটি এবার বাঘকে বললো, 'আমার পুরস্কার দিয়ে দিন, আমি চলে যাই।'

পুরস্কারের কথা শুনে বাঘ তার দুচোখ রক্তবর্ণ করে গর্জে উঠলো, 'তোর দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সামান্য একটা বক হয়ে কিনা তুই আমার মুখের মধ্যে ঠোঁট

ঢুকিয়েছিস! তুই যে নির্বিঘ্নে তোর ঠোঁট বের করে নিতে পেরেছিস, সেটা তোরই ভাগ্যি! তারপরেও তুই কোন্ সাহসে পুরস্কার চাইছিস? যদি বাঁচার সাধ থাকে, এই মুহূর্তে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা! নইলে এখুনি ঘাড় মট্‌কে তোকে প্রাতরাশ বানাবো।'

বাঘের ধমক শুনে বক আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলো॥

নীতিবাক্য ঃ অসতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অনুচিত।

●৫. গল্প-সংকেত ঃ এক কাঠুরিয়ার কুড়ুল জলে পড়ে গেলে তার কান্নায় জলদেবতা পর পর সোনার কুড়ুল, রূপোর কুড়ুল দেখিয়ে শেষে তার কুড়ুল দেখালেন। কাঠুরিয়া নিজের কুড়ুলটিই গ্রহণ করায় তার সততায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবতা তাকে সোনার ও রূপোর কুড়ুলও দান করলেন। এই কাহিনী শুনে এক ধূর্ত কাঠুরিয়া জলে কুড়ুল ফেলে দিয়ে কাঁদতে থাকে। জলদেবতা প্রথমেই সোনার কুড়ুল দেখালেন। সে সোনার কুড়ুলটাকেই তার কুড়ুল বলে দাবী করায় জলদেবতা তা হাতে নিয়েই অন্তর্হিত হলেন।

॥ কাঠুরিয়া ও জলদেবতা ॥

এক দরিদ্র কাঠুরিয়া বনের ভেতর নদীর ধারে একটি গাছ কাটছিল। হঠাৎ হাত ফস্‌কে তার কুড়ুলটি ছিটকে গিয়ে নদীর জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই কুড়ুলটি ছিল তার একমাত্র সম্বল। তা দিয়ে কাঠ কেটে তার দিন যায়। কিন্তু এখন কি হবে? সে তার কুড়ুলটি হারিয়ে দুঃখে বেদনায় চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

তার কান্না শুনে জলদেবতা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কাঠুরিয়ার সামনে আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, তুমি কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার?'

কাঠুরিয়া কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'আমার একমাত্র সম্বল কুড়ুলটি নদীতে পড়ে গেছে।'

জলদেবতা নদীর জলে অন্তর্হিত হলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি সোনার কুড়ুল নিয়ে আবির্ভূত হলেন।

'ওহে, এই কুড়ুলটি কি তোমার?'

'না।'

জলদেবতা আবার অন্ত হত হলেন এবং একটি রূপোর কুড়ুল হাতে নিয়ে আবার আবির্ভূত হলেন।

'ওহে, এই কুড়ুলটি কি তোমার?'

'না।'

জলদেবতা আবার অন্তর্হিত হলেন এবং কিছুক্ষণ পরে কাঠুরিয়ার লোহার কুড়ুলটি হাতে নিয়ে পুনরায় আবির্ভূত হলেন।

'এই কুড়ুলটি কি তোমার?'

'হ্যাঁ, এটাই আমার কুড়ুল। আপনি পরম দয়ালু। আমার কুড়ুলটি আমাকে দিন।'

কাঠুরিয়ার সততায় মুগ্ধ হয়ে জলদেবতা তাকে তিনটি কুড়ুলই দান করলেন।

গ্রামে ফিরে কাঠুরিয়াটি তার সেদিনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা তার এক বন্ধুকে বলে। বন্ধুটিও ছিল এক কাঠুরিয়া। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত এবং লোভী। গল্পটি শুনে মনে মনে তার খুব লোভ হলো।

সে পরদিন ঘুম থেকে জেগেই বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। সেও নদীর ধারে একটা গাছ কাটতে লাগলো। গাছ কাটতে কাটতে সে ইচ্ছে করেই তার হাতের কুড়ুলটি জলে ফেলে দিয়ে খুব চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে জলদেবতা আবির্ভূত হলেন।

'কি হে, কি হয়েছে তোমার? এভাবে কাঁদছো কেন?'

'আমার কুড়ুলটি জলে পড়ে গেছে।'

জলদেবতা জলের মধ্যে অদৃশ্য হলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে একটি সোনার কুড়ুল হাতে নিয়ে পুনরায় আবির্ভূত হলেন।

'ওহে, এই কুড়ুলটি কি তোমার?

লোভী কাঠুরিয়াটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, এই কুড়ুলটিই আমার। দিন, আমাকে দিন।'

সে কুড়ুলটি নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। কিন্তু জলদেবতা সোনার কুড়ুলটি জলে ফেলে দিয়ে তাকে বললেন, 'তুই অতি লোভী এবং মিথ্যাবাদী। এ কুড়ুল পাবার তুই যোগ্য ন'স।'

এই বলে তিনি জলের মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

লোভী কাঠুরিয়াটি নিজের কুড়ুলটিও হারিয়ে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো। তারপর বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গেল ॥

নীতিবাক্য ঃ সততাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

●৬. গল্প-সংকেত ঃ এক গৃহস্থের কয়েকজন পুত্র দিনরাত ঝগড়া-বিবাদ করতো। গৃহস্থ তাদের মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্যে একদিন কতকগুলি কঞ্চির আঁটি বেঁধে এনে পুত্রদের একে একে ওটি ভাঙতে বললেন। কেউ ভাঙতে পারলো না। পরে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ওটি খুলে এক একটি গাছি ভেঙে ফেলতে বললেন। সে তৎক্ষণাৎ তা ভেঙে ফেললো। বিবাদ না করে একত্র সদ্ভাবে বাস করবার জন্যে গৃহস্থ উপদেশ দিলেন।

॥ একতা ॥

এক গৃহস্থের কয়েকটি অপদার্থ পুত্র ছিল। তারা দিনরাত পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ আর মারামারি করে দিন কাটাতো। গৃহস্থ তাদের সব সময় ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি না করার জন্যে উপদেশ দিতেন। কিন্তু কেউ তাঁর উপদেশে কান দিত না।

একদিন গৃহস্থ অনেক চিন্তা করে পুত্রদের ডেকে কতকগুলি বাঁশের কঞ্চি কেটে আনতে বললেন।

তারা বাঁশের কঞ্চি কেটে আনলে গৃহস্থ সেগুলি দিয়ে একটি আঁটি বাঁধতে বললেন।

আঁটি বাঁধা হলে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রথমে ডেকে ওটা ভাঙতে বললেন। তাঁর কথামতো জ্যেষ্ঠ পুত্র অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু ভাঙতে পারলো না।

তারপর গৃহস্থ একে একে তাঁর অন্যান্য পুত্রদের ডেকে কঞ্চির আঁটিটা ভাঙতে বললেন। সবাই চেষ্টা করলো। কিন্তু কেউ পারলো না। সবাই মাথা নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

গৃহস্থ তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে আবার ডাকলেন। বললেন, 'আঁটিটা খোল। তারপর একটা করে কঞ্চি নিয়ে ভেঙে ফেল।'

জ্যেষ্ঠ পুত্র আঁটি খুলে একটা করে কঞ্চি হাতে নিয়ে অতি সহজেই ভেঙে ফেলতে লাগলো।

তখন গৃহস্থ তাঁর পুত্রদের বললেন, 'দেখ, যতদিন তোমরা আঁটির কঞ্চির মতো একত্র সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করবে, ততদিন কোন শত্রুই তোমাদের স্পর্শ করতে সাহস করবে না। কিন্তু যখনই তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে, তখনই শত্রুরা তোমাদের উচ্ছিন্ন করবে—নিশ্চিহ্ন করবে।'

গৃহস্থের পুত্ররা সেদিন থেকে আর ঝগড়া-বিবাদ না করে পরস্পর সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলো॥

নীতিবাক্যঃ একতাই শক্তি।

●৭ গল্প সংকেতঃ এক বৃদ্ধা তাঁর দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধারের বিনিময়ে চক্ষু-চিকিৎসককে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। চিকিৎসক প্রকৃত ঔষধ না দিয়ে বৃদ্ধার দৃষ্টিহীনতার সুযোগে তাঁর গৃহের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী অপসারিত করেন। প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগে বৃদ্ধা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে চিকিৎসককে প্রতিশ্রুতি-মতো পুরস্কার দিলেন না। চিকিৎসক আদালতে মামলা করেন। বৃদ্ধা আদালতে বলেন যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন কিনা বুঝতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিশক্তি যখন ছিল, তখন তিনি তাঁর বাড়ির দামী জিনিসগুলি দেখতে পেতেন। এখন তিনি তাঁর কিছুই দেখতে পান না।

॥ বৃদ্ধা ও চিকিৎসক ॥

এক বৃদ্ধা তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না।

কাছেই ছিলেন এক বিখ্যাত চিকিৎসক। বৃদ্ধা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'চিকিৎসক মশাই, আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তাই কিছুই দেখতে পাই না। আপনি আমার চোখ দুটি যদি ভালো করে দেন, তাহলে আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবো। কিন্তু যদি আপনি আমার চোখ ভালো করতে না পারেন, তাহলে কিছুই পাবেন না।

চিকিৎসক বৃদ্ধার প্রস্তাবে রাজী হলেন।

পরদিন সকালে তিনি বৃদ্ধার বাড়ি গিয়ে তাঁর নানা মূল্যবান জিনিসপত্র দেখে তাঁর খুব লোভ হলো। তিনি বৃদ্ধার চোখে প্রকৃত ওষুধ না দিয়ে কিছুদিন বাজে ওষুধ দিয়ে কালহরণ করতে লাগলেন।

সেই সুযোগে তিনি প্রতিদিন বৃদ্ধার বাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিসগুলি একে একে

সরিয়ে ফেলতে লাগলেন। এইভাবে সমস্ত মূল্যবান জিনিস অপসারিত করে চিকিৎসক বৃদ্ধার চোখে প্রকৃত ওষুধ দিয়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনে দিলেন।

বৃদ্ধার চোখ দুটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি সব কিছুই বেশ ভালোভাবেই দেখতে পান। কিন্তু দেখলেন, তাঁর বাড়ির মূল্যবান জিনিসগুলির একটিও নেই—সমস্তই অপহৃত হয়েছে। অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, চিকিৎসকই একে একে সমস্ত জিনিস নিজের বাড়ি নিয়ে গেছেন।

একদিন চিকিৎসক বৃদ্ধার বাড়িতে এসে বললেন, 'আমার চিকিৎসায় আপনার চোখের অসুখ সেরে গেছে। কথা ছিল, চোখের অসুখ সারিয়ে দিলে আপনি আমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করবেন। এখন আপনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। এবার আমাকে পুরস্কৃত করুন।'

বৃদ্ধা চিকিৎসকের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসকের কথার কোন উত্তর দিলেন না।

এইভাবে চিকিৎসক বার বার চেয়েও বৃদ্ধার কাছ থেকে পুরস্কার আদায় করতে না পেরে শেষে তিনি আদালতে মামলা রুজু করলেন।

মামলার শুনানি শুরু হলে বিচারক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আপনার চুক্তি-মতো চিকিৎসককে পুরস্কার দেননি কেন?'

বৃদ্ধা তার উত্তরে বললেন, হুজুর, আমার চোখ সেরেছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ, আমার দৃষ্টিশক্তি যখন ছিল, তখন আমি আমার বাড়ির দামী জিনিস-পত্রগুলি দেখতে পেতাম। চোখ খারাপ হয়ে যাবার পর ওগুলি আর দেখতে পাই না। এখনও ওগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে কি করে বুঝবো যে, আমার চোখের অসুখ সেরে গেছে?'

বিচারক বৃদ্ধার কথার ইংগিত বুঝতে পারলেন। তিনি চিকিৎসককে তিরস্কার করে আদালত থেকে বিদায় করে দিলেন॥

নীতিবাক্যঃ যেমন কর্ম তেমনি ফল।

●৮ **গল্প-সংকেতঃ** এক বৃদ্ধ কৃষক তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে তাদের একটি ঘোড়া বেচতে যাচ্ছিল। ঘোড়ায় না চড়ে হেঁটে যাবার জন্যে একদল লোকের সমালোচনা। ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ায় একদল বৃদ্ধের সমালোচনা। বৃদ্ধটি ঘোড়ায় চড়ে গেলে একদল মহিলার সমালোচনা। এবার পিতাপুত্র উভয়েই ঘোড়ায় চড়ায় একদল কৃষকের তিরস্কার। অবশেষে পিতাপুত্র ঘোড়াটিকে বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ায় সকলের উপহাস। ঘোড়া শেষে দড়ি ছিঁড়ে নীচে নদীতে পড়ে প্রাণত্যাগ করলো।

॥ ঘোড়া ও বৃদ্ধ কৃষক ॥

এক বৃদ্ধ কৃষকের ছিল একটি টাট্টু ঘোড়া। ঘোড়াটিকে তার বিক্রি করবার প্রয়োজন হলো। অবশ্য, সেজন্যে তাকে বাজারে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে সে ঘোড়ার জন্যে ভালো দাম পাবে।

সেদিন সকালে সে তার ছেলেকে সঙ্গে করে ঘোড়া নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা

করলো। রাস্তায় একদল লোকের সঙ্গে তাদের দেখা। তারা এদের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসতে লাগলো। বললো, 'তোমরা কী বোকা! ঘোড়ার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছ কেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে পারো না?'

বৃদ্ধ বুঝলো, কথাটি ঠিক। তখন সে ছেলেকে ঘোড়ায় চড়তে বলে নিজে হেঁটে চললো।

রাস্তায় কতকগুলো বৃদ্ধ এদিকে আসছিল। তারা দৃশ্যটি দেখে খুব ক্ষুব্ধ হলো। একজন বললো, 'দেখ হে, এতক্ষণ যা বলছিলাম, ঠিক কিনা। একালে বৃদ্ধদের কোন সম্মান নেই। ছেলে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে; আর বৃদ্ধ বাপ পায়ে হেঁটে চলেছে।'

এই বলে লোকটি কৃষকের ছেলের কাছে এসে বিদ্রূপের স্বরে বললো, 'তোর একটুও বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। বুড়ো বাপ যাচ্ছে হেঁটে আর তুই দিব্যি আরামে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিস? লজ্জা করে না?'

কৃষকের পুত্র লজ্জিত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। বৃদ্ধ পিতাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে সে হেঁটে যেতে লাগলো।

সামনে একদল মহিলা এদিকে আসছে। তারা দৃশ্যটি দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হলো। একজন আর একজনকে বললো, 'দেখ ভাই, লোকটার আক্কেল দেখ, নিজে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আর ছোট ছেলেটা যাচ্ছে কিনা হেঁটে। ইস্ এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।'

বৃদ্ধ লজ্জিত হয়ে এবার তার ছেলেকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে নিল। দুজনে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে।

খানিক দূরে আসছিল একদল চাষী। তারা একটা ঘোড়ার পিঠে দুজন মানুষকে চড়ে যেতে দেখে ক্ষুব্ধ হলো। একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'এ ঘোড়াটা কার?'

বৃদ্ধ উত্তর করলো, 'আমার ঘোড়া।'

'কিন্তু তোমার আচরণ দেখে তো মনে হচ্ছে না, এ ঘোড়া তোমার। তোমার হলে, তুমি এর ওপর এতটা নির্দয় হতে পারতে না। কোন্ বিবেচনায় তোমরা দুজনে এমন একটা ছোট্ট ঘোড়ার ওপর চড়ে বসেছো। ঘোড়াটাকে অনেক কষ্ট দিয়েছো। এর পর যদি নিয়ে যেতে হয়, ঘোড়াটাকে কষ্ট না দিয়ে কাঁধে করে তোমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত।'

লোকটার তিরস্কার শুনে পিতাপুত্র দুজনে ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে পড়লো। তারপর তারা দড়ি দিয়ে ঘোড়ার পাগুলো বাঁধলো এবং পায়ের ভেতর দিয়ে বাঁশ দিয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চললো।

বাজারের কাছে ছিল একটি নদী। নদীর ওপরে ছিল একটি ছোট্ট সাঁকো। সাঁকোর ওপর দিয়ে যাবার সময় বাজারের লোকেরা এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে হেসে হাততালি দিয়ে উঠলো। একটা জ্যান্ত ঘোড়াকে এভাবে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসতে ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি। বাজারের লোকজনদের তামাশা ও হাততালি এত জোরে হয়েছিল যে, ঘোড়াটি ভয় পেয়ে জোর করে দড়ি ছিঁড়ে নীচে নদীর জলে পড়ে প্রাণত্যাগ করলো।

বৃদ্ধ চাষী হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবলো, সবাইকে খুশী করতে গিয়ে সে কাউকেই খুশী করতে পারেনি। লাভের মধ্যে ঘোড়াটিকে হারাতে হলো।

নীতিবাক্য: সবাইকে একসঙ্গে কখনো খুশী করা যায় না।

●৯. **গল্প-সংকেত ঃ** এক ব্যক্তি কোন দূরবর্তী স্থানে যাবার জন্যে একটি গাধা ভাড়া করে ছায়াহীন পথে বিশ্রামের জন্যে সে গাধার ছায়ায় বসতে গেলে গাধার মালিক তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, সে গাধা ভাড়া দিয়েছে, ছায়া নয়। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া ও মারামারির সুযোগে গাধার পলায়ন।

॥ গাধার ছায়া ॥

এক ব্যক্তি যাবে কোন এক দূরবর্তী শহরে। পায়ে হেঁটে এতখানি পথ অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয় ভেবে সে একটি গাধা ভাড়া করতে মনস্থ করলো।

কাছেই এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। লোকটির প্রস্তাবে সে তাকে তার গাধাটি ভাড়া দিতে রাজী হলো।

লোকটি গাধার পিঠে চড়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে গাধাও চলতে লাগলো গন্তব্য স্থানের দিকে। পেছনে চলতে লাগলো গাধার মালিক।

দীর্ঘ পথ। দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগলো। সূর্য মাথার ওপরে। প্রখর সূর্যকিরণে পরিশ্রান্ত হয়ে লোকটি কোথাও বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে মনস্থ করলো। কিন্তু পথে একটি সরাইখানা তো দূরের কথা, কোথাও একটি গাছও নেই যে, তার ছায়ায় বসে সে দু'দণ্ড বিশ্রাম করতে পারে। শেষে সে গাধাকে দাঁড় করিয়ে তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে গাধার মালিক এসে উপস্থিত। সে লোকটিকে গাধার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে দেখে চটে গেল। তার নিজেরই এখন একটু বিশ্রামের দরকার এবং সে গাধার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করবে, মনস্থ করেছিল।

সে লোকটির কাছে এসে বললো, 'তুমি আমার গাধার ছায়ায় বসেছো কেন? ওতে বসবার তোমার কোন অধিকার নেই।'

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি একথা বলছো কেন? আমি কি তোমার গাধা ভাড়া করিনি?'

'গাধা ভাড়া করেছো। কিন্তু গাধার ছায়া নয়।'

'সে কি কথা? গাধা ভাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর ছায়াটিও ভাড়া করেছি।'

'না, তেমন কোন কথা হয়নি।'

'বলো কী! ছায়ার জন্যে আলাদা চুক্তি করতে হয় নাকি?'

'হয়।'

'এমন কথা জীবনেও শুনিনি। যে গাধা ভাড়া করে, সে তার ছায়াটাও ভাড়া করে।'

'কখ্খনো নয়।'

'খবরদার!'

'খবরদার!'

শেষে পরস্পর পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গালাগালি ও মারামারি সমানে চলতে লাগলো। কেউ কম যায় না।

গাধাটি কাছে দাঁড়িয়ে সেই কাণ্ড দেখছিল। যখন উভয়ের মারামারি চরমে উঠেছে, তখন গাধাটি একবার গলা ছেড়ে খুব বিশ্রী গলায় ডাক দিল। তারপর লেজ তুলে দৌড় দিয়ে মুহূর্ত-মধ্যে দূরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না ॥

নীতিবাক্য ঃ সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া করে মানুষ বৃহৎ জিনিস হারায়।

●১০. **গল্প-সংকেত ঃ** এক কৃষকের ছিল চারটি ছেলে। তারা ছিল অত্যন্ত অলস। বৃদ্ধ কৃষক মৃত্যুকালে বলে গেল, সে জমিতে অনেক ধনরত্ন পুঁতে রেখেছে। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর সমস্ত জমি খুঁড়ে কোন ধনরত্ন না পেয়ে তারা তাতে ফসল বুনলো। প্রচুর ফসল ফললো। তারা বুঝতে পারলো, বৃদ্ধ মিথ্যা-কথা বলেনি। তাদের আলস্য দূর হলো।

॥ গুপ্তধন ॥

এক কৃষকের ছিল চার ছেলে। তারা ছিল অলস এবং অপদার্থ--কোন রকম পরিশ্রম করতো না।

বৃদ্ধ কৃষক একাই তার জমিতে খেটে মরতো। কিন্তু কোন ছেলেই তাকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসতো না। তারা ঘরে কেবল শুয়ে, বসে, খেলাধূলো করে সময় কাটাতো।

অবশেষে একদিন বৃদ্ধ কৃষকের অন্তিম সময় উপস্থিত হলো। মৃত্যুকালে সে তার চার ছেলেকে কাছে ডেকে বিছানার পাশে বসালো। বললো, 'চোর-ডাকাতের ভয়ে আমি আমার সব ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে রেখেছি। সামনেই আমার যে জমি পড়ে আছে, তাতেই আমার সব গুপ্তধন পুঁতে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পর তোরা একদিন ওগুলো খুঁড়ে বের করে আনিস।'

বৃদ্ধ কৃষক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধের অন্তিম কথাগুলো ছেলেদের মনে পড়লো। তারা একসঙ্গে বসে বুদ্ধি-পরামর্শ করে স্থির করলো, একদিন তারা সবাই মিলে জমি খুঁড়ে তাদের পিতার লুকোনো গুপ্তধনের সন্ধান করবে।

পরামর্শমতো একদিন তারা কোদাল ইত্যাদি নিয়ে জমিতে গুপ্তধনের সন্ধান করতে লেগে গেল। কিন্তু অসুবিধা হলো এই, বৃদ্ধ গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে গেলেও ঠিক কোথায় তা পুঁতে রেখে গেছে, তা বলে যায়নি। ফলে, ওদের সমস্ত জমিটাই খুঁড়ে ফেলতে হলো। কিন্তু কোথায় গুপ্তধন ?

বড় ছেলেটি বললো, 'বুড়ো নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলে গেছে।'

সবাই তাকে সমর্থন করলো। বললো, 'মরবার সময় বুড়োর বোধহয় মাথার ঠিক ছিল না।'

ছোট ভাই জমিটার দিকে তাকিয়ে আপশোস করে বললো, 'এতখানি জমি আমরা মিছিমিছি খুঁড়লাম। সব একেবারে পণ্ডশ্রম!'

বড় ভাই একটু চিন্তা করে বললো, 'তা হবে কেন ? তা হতে দেবো না। এতখানি যখন পরিশ্রম করলাম, তখন জমিটা এমনি ফেলে রাখার কোন মানে হয় না। আয়, এতে ফসল বুনে দিই।'

'সেই ভালো।'

সবাই একমত হয়ে ফসল বুনে ফিরে এলো।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই সমস্ত জমিতে রাশি রাশি সোনার ফসল ফলে পেকে উঠলো। ছেলেরা সবাই অবাক হয়ে সেই মাঠের দিকে চেয়ে থাকে।

বড় ভাই একদিন সেই সোনালি ফসলের ক্ষেতের দিকে চেয়ে অন্য ভাইদের ডেকে বললো, 'না রে, বাবা মিথ্যে কথা বলে যায়নি। সোনাই পোঁতা আছে জমিতে। ঠিক-মতো খেটে চাষ করতে পারলে ফসলের গাছে সেই সোনা ফলে। দেখছিস্ না, কেমন ফসল ফলেছে।'

সবাই তার কথা বুঝতে পারলো।

'ঠিক বলেছিস্। বাবা মিথ্যে কথা বলে যায়নি।'

'প্রতি বছর এমনি করে আমরা মাঠ খুঁড়বো, চাষ করবো। তাহলে এমনি সোনার ফসল পাবো, কি বল্?'

'এই সোনার ফসলই তো বাবার গুপ্তধন।'

তারপর থেকেই ওরা আলস্য ত্যাগ করে পরিশ্রম করতে শিখলো॥

নীতিবাক্য ঃ শ্রমের দ্বারা সোনা ফলে।

●১১. **গল্প-সংকেত ঃ** বনের রাজা সিংহের আক্রমণে বনভূমি পশুশূন্য হয়ে যাচ্ছে দেখে বনের পশুরা একমত হয়ে সিংহের কাছে প্রস্তাব রাখলো—প্রত্যহ তার ভোজের জন্যে একটি করে পশু আসবে। একদিন একটি শশকের পালা। সে বিলম্বে সিংহের কাছে গিয়ে তার প্রতিদ্বন্দী অপর একটি সিংহের কথা বললো। ক্রুদ্ধ সিংহকে সে কূপের মধ্যে সেই প্রতিদ্বন্দী সিংহকে দেখালো। ক্রুদ্ধ সিংহ নিজের ছায়াকে তার প্রতিদ্বন্দী সিংহ মনে করে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিল।

॥ বুদ্ধিবল ॥

এক বনে ছিল এক সিংহ। সে প্রতিদিন নির্বিচারে পশুদের প্রাণ সংহার করে ভক্ষণ করতো।

এইভাবে দিনের পর দিন যায়। শেষে বনটি পশুশূন্য হবার উপক্রম হলো।

একদিন বনের পশুরা গোপনে এক সভায় মিলিত হলো। কি করে এই হিংস্র সিংহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?—সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করা হলো। কিন্তু কেউ কোন উপায় খুঁজে বের করতে পারলো না। শেষে স্থির হলো, বনের পশুরা প্রতিদিন পালা করে একটি করে পশু সিংহের কাছে পাঠাবে। কিন্তু সিংহ কোনদিন বলপূর্বক কোন পশুর প্রাণ সংহার করতে পারবে না।

এই প্রস্তাব নিয়ে সিংহের কাছে দূত গেল। সিংহকে আর কষ্ট করে কোন পশু বধ করতে হবে না। প্রতিদিন পালা করে একটি করে পশু তার ভোজের জন্যে প্রেরিত হবে।

সিংহও সেই প্রস্তাবে রাজী হলো।

প্রস্তাবমতো রোজই একটি করে পশু সিংহের ভোজের জন্যে আসে। সিংহও আর কষ্ট করে কোন পশু বধ করে না।

এমনি করে দিন যায়।

একদিন একটি শশকের পালা এলো। শশক দেরী করে সিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। পথে যেতে যেতে সে সিংহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার এবং বনভূমিকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার একটা উপায় ভেবে বের করলো। তারপর সে ইচ্ছে করেই খুব দেরীতে সিংহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।

সিংহের তখন ভোজের সময় পার হয়ে গেছে। সে তখন ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষুধার্ত। তার ওপর সেই ক্ষুধার মুখে সেই ক্ষুদ্র শশকটিকে দেখে সিংহ ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। বললো, 'তুই আসতে এতো দেরী করেছিস কেন?'

শুনে শশকটি নতজানু হয়ে বললো, 'প্রভু, আপনার ক্ষুধার কথা ভেবে যথাসময়েই আসছিলাম। কিন্তু পথে অন্য একটা সিংহ আমাকে ভক্ষণ করার জন্যে আক্রমণ করে। আমি তাকে আপনার কথা বলি। সে আমার কথা শুনে গর্জন করে বললো, 'ডেকে নিয়ে আয় তোর সিংহকে। সে কেমন এ বনের রাজা, তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

একথা শুনে ক্ষুধার্ত সিংহ ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। বললো, 'চল্, কোথায় সেই সিংহ, আমাকে দেখিয়ে দিবি, চল্। তার এত বড় সাহস, আমার বনের মধ্যে এসে কিনা আমার খাবার কেড়ে খেতে চায়!'

'আসুন, প্রভু—'

শশক সিংহকে পথ দেখিয়ে একটা কূপের কাছে নিয়ে গেল। কূপটি ছিল বেশ গভীর। নীচে জলও আছে। সে সিংহকে দূর থেকে কূপটি দেখিয়ে বললো, 'প্রভু, কাছে যেতে আমার ভয় করছে—যদি আমাকে ধরে খেয়ে নেয়। আপনি ঐ কূপের মধ্যে দেখুন, ও বসে আছে। যান—'

শশকের কথায় সিংহ কূপের ধারে গিয়ে ভেতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কূপের জলে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে করলো, শশকের কথাই সত্যি। সে তখন জলের মধ্যে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সিংহের ছায়াটাও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। এবং তার নিজের গর্জনের প্রতিধ্বনিকে ঐ সিংহের গর্জন বলে মনে হলো তার। ক্রোধে অন্ধ হয়ে শেষে সিংহ কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিল। আর উঠতে পারলো না।

শশক আনন্দে লাফাতে লাফাতে গিয়ে অন্যান্য পশুদের এই শুভ সংবাদটি দিল। বনের মধ্যে আনন্দের উৎসব লেগে গেল॥

নীতিবাক্য: বুদ্ধিই বল।

●১২. **গল্প-সংকেত:** একটি কাক এক টুক্‌রো মাংস নিয়ে গাছের ডালে বসে খাচ্ছিল। শেয়ালের ঐ মাংস খেতে লোভ হলো। সে কাকের সমস্ত কিছুর প্রশংসা করে। কিন্তু কাক বোবা বলে সে দুঃখ প্রকাশ করে। কাক তার মুখ থেকে তার কণ্ঠস্বরেরও প্রশংসা শোনার জন্যে শব্দ করতে গেল। অমনি মুখের মাংসের টুক্‌রো শেয়ালের সামনে পড়ে গেল।

॥ কাক ও শেয়াল ॥

একটি কাক কোথা থেকে এক টুক্‌রো মাংস সংগ্রহ করে একটা উঁচু গাছের ডালে বসে খাবার উদ্যোগ করলো।

একটি শেয়াল দূর থেকে তা দেখে তাকে অনুসরণ করতে করতে গাছের নীচে এসে উপস্থিত হলো। তার ঐ মাংসের টুক্‌রোখানি খাবার খুব ইচ্ছে হয়েছে। যেমন করেই হোক, তাকে মাংসের টুক্‌রোটি পেতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

অনেক চিন্তা করে সে একটি ফন্দি-বের করলো।

কাক খুব চতুর পাখি। সে সহজে মুখ হাঁ করবে না। অথচ তার মুখ হাঁ করাতে না পারলে মাংসের টুক্‌রোটি পাবারও আশা নেই।

সে কাকের মুখ হাঁ করাবার চেষ্টা করতে লাগলো। সে কাককে সম্বোধন করে বললো, 'ভাই কাক, আমি তোমার মতো সর্বাঙ্গসুন্দর পাখি আর দেখিনি। যেমনি তোমার ডানা সুন্দর, তেমনি সুন্দর তোমার চোখ। তোমার গলা, তোমার পা, পায়ের নখ —সব সুন্দর। দেখ ভাই, তোমার সব সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোবা—'

কাক শেয়ালের মুখে তার রূপের প্রশংসা শুনে আনন্দে একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। সে মনে করলো, শেয়াল তার কণ্ঠস্বর শোনেনি। শুনলে সে তাকে বোবা না বলে নিশ্চয়ই তার প্রশংসা করতো। এখন যদি সে শব্দ করে, তবে তা শুনে শেয়াল একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

কাক প্রশংসার লোভ সামলাতে না পেরে মুখ 'হাঁ' করে শব্দ করতে গেল। অমনি তার মুখের মাংসের টুক্‌রো শেয়ালের সামনে মাটিতে এসে পড়লো।

শেয়াল তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে দেখে আর এক মুহূর্তও দেরী না করে মাংসের টুক্‌রোটি মুখে পুরে খেতে খেতে মনের আনন্দে চলে গেল।

কাক বোকার মতো মুখ শুকিয়ে বসে রইলো॥

নীতিবাক্য ঃ স্তাবকের চাটুবাক্যে বিগলিত হওয়া উচিত নয়।

●১৩. **গল্প-সংকেত ঃ** এক স্থূলকায় পোষা কুকুরের সঙ্গে এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় বাঘের সাক্ষাৎ। বাঘকে খাদ্যাভাবে উপবাসী থাকতে হয়। কিন্তু কুকুর বাড়ি পাহারা দেয় বলে তার খাদ্যাভাব নেই। বাঘও যদি অনুরূপভাবে প্রভুর বাড়ি পাহারা দেয়, তবে তারও খাদ্যাভাব থাকবে না। কুকুরের এই প্রস্তাবে বাঘ সম্মত হয়। কিন্তু কুকুরের গলায় গলবন্ধের দাগ দেখে স্বাধীনতা-লোপের ভয়ে বাঘ শেষ পর্যন্ত অসম্মত হয়।

॥ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা ॥

একটি বাঘের সঙ্গে একদিন একটি কুকুরের সাক্ষাৎ হলো। বাঘটি শীর্ণকায় এবং ক্ষুধার্ত। আর, কুকুরটি বেশ স্থূলকায়।

প্রথম আলাপের পর বাঘটি কৌতূহলী হয়ে কুকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভাই, কিছু মনে করো না। বলো তো, তুমি কেমন করে এমন সবল আর স্থূলকায় হয়েছো? প্রতিদিন তুমি কী আহার করো, কতখানি আহার করো? সে আহারই বা তোমার কি করে জোটে? আর, আমাকে দেখ। আমি দিনরাত আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কোনদিনই পেটভরে খেতে পাই না। কোন-কোনদিন আমাকে উপোস করে থাকতে হয়। খাদ্যাভাবে আমি দিন-দিন কেমন দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়ছি, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছো? কি করলে আমি তোমার মতো যথেষ্ট

আহার পেতে পারি এবং তোমার মতো সবল ও স্থূলকায় হতে পারি, বলতে পারো, ভাই?'

কুকুর বললো, 'আমি যা করি, তুমি যদি তাই করতে পারো, তাহলে তুমিও আমার মতো আহার পাও।'

বাঘ বললো, 'তাই নাকি? তাহলে শীগ্‌গীর বলো। আমি তাই করবো। ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না।'

কুকুর বললো, 'কাজটা অবশ্য তেমন কিছুই নয়। তুমি তা অনায়াসেই করতে পারো। রাতে প্রভুর বাড়ি পাহারা দিতে হবে, যাতে চোর-ডাকাত এসে প্রভুর ধনরত্ন চুরি করে নিয়ে না পালায়। এই আর কি?

'এই কাজ? আমি তা করতে রাজী আছি। আমাকে তোমার প্রভুর বাড়ি নিয়ে চলো। কিন্তু আমাকে এজন্যে ওঁরা পেট ভরে খেতে দেবেন তো?'

'নিশ্চয়ই দেবেন। নইলে তুমি থাকবে কেন?'

'ভালো কথা। তুমি আমাকে তাহলে নিয়ে চলো। আহারের সন্ধানে বনে বনে আমাকে কত ঘুরে বেড়াতে হয়। রোদে-বৃষ্টিতে বড় কষ্ট পাই। আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। যদি রোদ আর বৃষ্টির সময় বাড়িতে থাকতে পাই, আর ক্ষুধার সময় পেট ভরে খেতে পাই, তাহলে আমি বেঁচে যাই। একটু থাকার জায়গা আর ক্ষুধায় সময় পেট ভরে খাওয়া। ব্যস্, আর কিছু চাই না।'

বাঘের দুঃখের কথা শুনে কুকুর তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, 'আমার সঙ্গে এসো। আমি প্রভুকে বলে, তোমার থাকা খাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দেবো।'

বাঘ কুকুরের সঙ্গে চলতে লাগলো।

খানিক দূরে গিয়ে বাঘ কুকুরের গলায় কিসের একটা দাগ দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই, কিছু মনে করো না। তোমার গলায় ওটা কিসের দাগ?'

কুকুর কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললো, 'ও কিছু নয়—'

বাঘ বললো, 'না ভাই, বলো বলো। আমার জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

বাঘকে নাছোড়বান্দা দেখে কুকুর শেষ পর্যন্ত বললো, 'এটা গলবন্ধের দাগ।'

'গলবন্ধের দাগ? গলবন্ধ কেন, ভাই?'

'গলবন্ধে শিকলি দিয়ে আমাকে আমার প্রভু দিনের বেলায় বেঁধে রাখেন।'

বাঘ ভয়ে চমকে উঠলো। বললো, 'তোমাকে তোমার প্রভু শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখেন? তাহলে তুমি যেখানে খুশী, সেখানে যেতে পারো না?'

কুকুর বললো, 'তা কেন হবে? দিনের বেলায় আমি বাঁধা থাকি বটে, কিন্তু রাতের বেলায় আমি মুক্ত—যেখানে খুশী আমি যেতে পারি। তাছাড়া, প্রভুর ভৃত্যেরা আমাকে কত আদর করে, স্নান করিয়ে দেয়, ভালো খাবার খেতে দেয়। প্রভুও কখনো-কখনো আদর করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। বল দেখি, কেমন সুখ? তুমিও তেমনি সুখে থাকবে।'

বাঘ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, 'না ভাই, তোমার সুখ তোমার থাক। আমার ও সুখে কাজ নেই। পরাধীন হয়ে রাজভোগে থাকার চেয়ে স্বাধীনভাবে অনাহারে থাকা অনেক ভালো। আমাকে মার্জনা করো, ভাই। আমি আর তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না।'

একথা বলে বনের বাঘ বনেই চলে গেল ॥

নীতিবাক্য: পরাধীন সুখী জীবনের চেয়ে স্বাধীন দুঃখী জীবন ঢের ভালো।

●১৪. **গল্প-সংকেত:** একটি দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ নিজের পাখায় বসিয়ে নিয়ে স্বজাতীয়দের গালাগালি দিয়ে ময়ূরের দলে মিশতে গেল। ময়ূরেরা তাকে দাঁড়কাক বলে বুঝতে পেরে তার পাখা থেকে ময়ূরপুচ্ছগুলি তুলে নিয়ে তাকে ঠোক্রাতে ঠোক্রাতে দূর করে দিল। সে এখন স্বজাতীয়দের সঙ্গে মিশতে গেল। তারাও তাকে যথোচিত তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিল।

॥ ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক ॥

বনের এক-জায়গায় কতকগুলি ময়ূরপুচ্ছ পড়েছিল। এক দাঁড়কাক সেগুলি দেখে নিজের মনে ভাবতে লাগলো, যদি সে ওগুলি নিজের পাখায় পরে নেয়, তাহলে তাকেও ময়ূরের মতো সুন্দর লাগবে দেখতে। তাহলে সে ময়ূরের দলে ভিড়ে যেতে পারবে। তাকে আর দাঁড়কাকের দলে ভিড়তে হবে না, দাঁড়কাক বলে পরিচয় দিতে হবে না। আর যা-ই হোক, দাঁড়কাক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়।

ময়ূরপুচ্ছ পরে নিলে সে সেই লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

সে আর দেরি না করে ময়ূরপুচ্ছগুলির কাছে গেল। এক-একটি ময়ূরপুচ্ছ তুলে এনে সযত্নে সে নিজের পাখায় বসিয়ে নিল। এখন তাকে দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগছে।

সে তার সৌন্দর্য দেখাবার জন্যে তার স্বজাতীয় দাঁড়কাকদের কাছে গেল। বললো, 'তোরা অতি নীচ। তোদের দেখতেও অতি বিশ্রী। তোরা ছোটলোক। তোদের সঙ্গে বাস করাও লজ্জাজনক। আমি আর তোদের সঙ্গে থাকবো না।'

সে দাঁড়কাকদের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ময়ূরদের দলে বাস করতে গেল। সে তাদের বললো, 'দেখ ভাইসব, আমি তোমাদের জাতভাই। আমি আর দাঁড়কাক নই। আমি ময়ূর হয়ে গেছি।

ময়ূরেরা তাকে দেখে ঠিক চিনে নিতে পারলো। সবাই তাকে ঘিরে ধরলো। তারপর তারা একটি একটি করে ময়ূরপুচ্ছ তার পাখা থেকে তুলে নিতে লাগলো। ময়ূরপুচ্ছগুলি তোলা হয়ে গেলে তারা সবাই মিলে তাকে এমন ঠোক্রাতে লাগলো যে, জ্বালায় অস্থির হয়ে সে সেখান থেকে পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচলো।

এবার সে তার স্বজাতীয় দাঁড়কাকের দলের কাছে ফিরে এসে বললো, 'ভাইসব, আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। দেখ, আমার পাখায় আর ময়ূরপুচ্ছ নেই। আমি ময়ূর নই, আমি কাক—দাঁড়কাক—তোমাদের জাতভাই।'

'জাতভাই ?'

সব দাঁড়কাক একসঙ্গে তার দিকে তেড়ে এলো।

'ময়ূরপুচ্ছ পাখায় গুঁজে তখন তো তুই অহংকারে মত্ত হয়ে আমাদের ঘৃণা করে আমাদের ছোটলোক বলে গালি দিয়ে ময়ূরদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলি। তাদের কাছে অপমানিত হয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছিস। তখন তো বলেছিলি, আমাদের সঙ্গে মিশতেও তোর লজ্জা করে! তাহলে আবার মিশতে এসেছিস কেন? নির্লজ্জ নির্বোধ কোথাকার! যা, দূর হয়ে যা—'

সব দাঁড়কাক একজোট হয়ে তাকে দূর করে দিল॥

নীতিবাক্য : পরবেশ অপমানকর।

●১৫. **গল্প-সংকেত :** কোন বনে একটি কাক ও একটি হরিণ বন্ধুভাবে বাস করতো। হরিণটিকে দেখে একটি শেয়ালের ওকে খাবার ইচ্ছে হলো। সে হরিণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ওর সঙ্গে বাস করতে এলে কাক সেই অজ্ঞাতকুলশীল শেয়ালকে আশ্রয় দেওয়া পছন্দ করলো না। হরিণ কাকের কথা না শুনে শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো। শেয়াল হরিণকে এক কৃষকের শস্যক্ষেত্রে শস্যভক্ষণে নিয়ে গেলে সেখানে সে জালে বন্দী হয়। বন্ধুর বিপদ আশঙ্কা করে কাক গিয়ে তাকে বাঁচায় এবং কৃষকের লাঠির আঘাতে শেয়াল প্রাণ হারায়।

॥ সুবন্ধু ও কুবন্ধু ॥

এক বনে একটি কাক ও একটি হরিণ একসঙ্গে বাস করতো। দুজনের বন্ধুত্ব ছিল খুবই প্রগাঢ়। একজন আর-একজনকে দেখতে না পেলে ওদের প্রাণ কেঁদে উঠতো।

এমনি করে বেশ সুখে-শান্তিতে দুজনের দিন যায়।

হরিণ ওভাবে সুখে-শান্তিতে থেকে মাঠের ঘাস, নদীর জল খেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলো।

সকাল হলে দুই বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে বিদায় সম্ভাষণ করে যে যার আহারের সন্ধানে যাত্রা করে। আবার সূর্য অস্ত গেলে দুজনেই ফিরে আসে তাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে।

একদিন হৃষ্টপুষ্ট হরিণকে দেখে ওর মাংস খাবার জন্যে একটি শেয়ালের খুব লোভ হলো। সে হরিণের কাছে গিয়ে তাকে খুব প্রিয় সম্ভাষণ করলো। বললো, 'আমি বন্ধুহীন। তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

হরিণ শেয়ালের কথায়-বার্তায়, আলাপ-আচরণে মুগ্ধ হয়ে গেল। বললো, 'বেশ তো, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। এতে আপত্তির কি আছে?'

দিনের শেষে হরিণ শেয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বাসস্থানে ফিরে এলে কাক নবাগত অজ্ঞাতকুলশীল শেয়ালকে আশ্রয় দেওয়া সমীচীন মনে করলো না। সে স্পষ্টভাবেই বলে দিল, 'ভাই হরিণ, অজ্ঞাতকুলশীলকে আশ্রয় দিয়ে তুমি ভালো করোনি।'

শুনে শেয়াল বললো, 'ভাই কাক, হরিণের সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনে তুমিও অজ্ঞাতকুলশীল ছিলে। কাজেই, তোমার ও কথা ঠিক নয়।'

যাই হোক, কাকের আপত্তি না শুনে হরিণ শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো। সে প্রতিদিন শেয়ালের সঙ্গে আহারের সন্ধানে চলে যায়।

শেয়াল তাকে এক কৃষকের শস্যক্ষেত্রে শস্য খাবার জন্যে নিয়ে যায়।

একদিন কৃষক শস্যক্ষেত্রে জাল পেতেছিল। হরিণ শস্য খেতে গিয়ে সেই জালে বন্দী হয়ে পড়ে। তা দেখে শেয়ালের খুব আনন্দ হয়।

হরিণ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে শেয়ালকে অনুরোধ করে। শেয়াল মিথ্যে অজুহাতে বিলম্ব করতে থাকে। কখন কৃষক এসে হরিণকে হত্যা করবে, সে তারই অপেক্ষা করে।

এদিকে, কাক বাসায় ফিরে এসে হরিণকে দেখতে না পেয়ে তার বিপদের আশঙ্কা করে বন্ধুর সন্ধানে যাত্রা করলো। দূরবর্তী শস্যক্ষেত্রে এসে সে দেখলো, তার অনুমানই ঠিক। সে হরিণকে জালে-বন্দী দেখে বললো, 'ভাই হরিণ, তখনই তোমাকে আমি বারণ করেছিলাম। তুমি তা না শুনে শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছো। এখন বুঝতে পারছো, শেয়াল তোমাকে কিভাবে প্রতারিত করেছে?'

'বুঝেছি, বন্ধু, আমাকে এ যাত্রায় তুমি বাঁচাও।'

কাক হরিণকে মৃতের মতো ভান করে পড়ে থাকতে পরামর্শ দিল। হরিণ তাই করলো। কৃষক লাঠি হাতে এসে জালে-বন্দী মৃত হরিণকে দেখে তাকে জাল থেকে মুক্ত করে দূরে ফেলে দিতেই কাকের সংকেত শুনে হরিণ ছুটে পালিয়ে গেল।

তা দেখে কৃষক নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে ক্রুদ্ধ হয়ে কাছে শেয়ালকে দেখে তাকেই লাঠির আঘাতে বধ করলো॥

নীতিবাক্যঃ অজ্ঞাতকুলশীলকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

●১৬. **গল্প-সংকেতঃ** একটি লোক কিছু টাকা নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। পথে এক যাদুকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। যাদুকর তাকে বললো, তাকে একটাকা দিলে সে দু'টাকা করে দেবে। লোকটি তাকে একটাকা দিলে সে দু'টাকা দেখালো। লোকটি তারপর তাকে তার সব টাকা দিয়ে দ্বিগুণ করে দিতে বললো। যাদুকর তার দু'চোখ বেঁধে দিয়ে সব টাকা নিয়ে চম্পট দিল।

॥ অতি লোভের পরিণাম ॥

একটি লোক কিছু টাকা নিয়ে হাটে গেল। অনেকগুলি দরকারী জিনিস তাকে কিনতে হবে। তাই সে সঙ্গে তার সব টাকাই নিয়ে চললো।

যেতে যেতে সে ভাবতে লাগলো, যদি তার আরো কিছু টাকা থাকতো, তাহলে সে আরো কতকগুলি বেশী জিনিস কিনতে পারতো। দুঃখের বিষয়, বাড়িতে তার আর টাকা ছিল না। যা ছিল, সবই সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

এমন সময় রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হলো।

প্রথম আলাপের পর লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি করেন? কোথায় থাকেন?'

অপরিচিত লোকটি বললো, 'আমি যাদুকর। যাদুর খেলা দেখিয়ে আমি চারদিকে ঘুরে বেড়াই।'

'যাদুকর? কি কি যাদুর খেলা আপনি দেখান?'

'অনেক খেলা দেখাই। তবে আমার সেরা যাদুর খেলা হলো এক টাকাকে দু' টাকা করে দেওয়া। আপনি যত টাকা দেবেন, আমি যাদুমন্ত্রের দ্বারা তাকে দ্বিগুণ করে দেবো।'

লোকটি কৌতূহলী হয়ে বললো, 'তাই নাকি? আমি এক টাকা দিচ্ছি। আপনি তাকে দু'টাকা করে দিন তো দেখি।'

লোকটি যাদুকরের হাতে একটি টাকা দিল।

তখন যাদুকর লোকটির দু'চোখে একখানা রুমাল বেঁধে দিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। সেই ফাঁকে পকেট থেকে আর একটি টাকা বের করে লোকটির চোখ থেকে রুমাল খুলে ফেলে তাকে দু'টাকা দেখালো।

লোকটির বিশ্বাস হলো, সত্যি, যাদুকরের নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক শক্তি আছে। তা নইলে এই আশ্চর্য খেলা সে কি করে দেখাতে পারে? সে ভাবলো, তার যত টাকা আছে, সব দিলে সে তার দ্বিগুণ করে দিতে পারে। তাহলে সে হাট উজাড় করে আজ অনেক জিনিসই কিনতে পারবে।

সে তখন যাদুকরের পদধূলি মাথায় নিয়ে বললো, 'আপনি আমার সব টাকা নিন, যাদুমন্ত্র দিয়ে তা দ্বিগুণ করে দিন।'

'বেশ কথা! দিন—'

লোকটি পকেট থেকে তার সমস্ত টাকা বের করে যাদুকরের হাতে তুলে দিল। যাদুকর তার দু'চোখ রুমাল দিয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিয়ে বললো, 'এত টাকা দ্বিগুণ করতে একটু সময় লাগবে। অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি রুমাল খুলবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে কিন্তু সব মাটি হয়ে যাবে।

লোকটি চোখে-রুমাল-বাঁধা অবস্থায় বসে রইলো। যাদুকর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। তার মন্ত্র পড়া থামলো! পরে খস্ খস্ শব্দ হতে লাগলো। লোকটি ভাবলো, তার টাকা দ্বিগুণ হচ্ছে; তাই এই শব্দ! আনন্দে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। চারদিক তারপর কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মন্ত্র পড়ার শব্দও আর শোনা গেল না। মন্ত্রবলে কেমন নিঃশব্দে টাকা দ্বিগুণ হয়ে যায় ভেবে লোকটি রোমাঞ্চিত হতে লাগলো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল।

উৎসাহে, উত্তেজনায় লোকটি অধৈর্য হয়ে উঠলো। সে দ্বিগুণ টাকা দেখার জন্যে আর অপেক্ষা করতে না পেরে চোখের রুমাল খুলে ফেললো। কিন্তু কোথায় যাদুকর?

কেউ কোথাও নেই।

নীতিবাক্য: লোভের শাস্তি সর্বনাশ।

●১৭. **গল্প-সংকেত:** এক ব্যাধ সারাদিন শিকার না পেয়ে নদীতীরে জলপান করতে গিয়ে দেখলো, ঘাটের পাশে ধ্যানমগ্ন একটি সাধুর কোলে, মাথায়, কাঁধে যেন পাখির মেলা বসে গেছে। সে পরের দিন সাধু সেজে ঘাটে বসলো। পাখি এলো না। পরের দিন পাখিরা এসে দূরে-দূরে বসলো। তার পরের দিন ওর কাঁধে, মাথায় এসে বসলো। কিন্তু পাখি ধরতে ব্যাধের হাত সরলো না।

॥ আসল ও নকল ॥

এক ছিল ব্যাধ। সে তীরধনুক নিয়ে সারাদিন বনে বনে পশুপাখি শিকার করে বেড়ায়। দিনের শেষে বাজারে পশুপাখির মাংস বিক্রি করে যা পায়, তাতে বেশ সুখেই তার দিন চলে যায়।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়।

একদিন ব্যাধটি তীরধনুক নিয়ে সারাদিন বনে বনে অনেক ঘুরলো। কিন্তু সেদিন তার ভাগ্যে কোন শিকারই জুটলো না। এমনকি, একটা পাখিও তার নজরে পড়লো না।

হতাশভাবে সারাদিন বনে বনে ঘুরে সে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো। জলপানের জন্যে সে জলের সন্ধান করতে লাগলো। কাছে ছিল একটা নদী। সে জলপানের জন্যে নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলো।

নদীর ঘাটে এসে সে দেখতে পেল, ঘাটের একপাশে এক সাধু ধ্যানে বসেছেন। তাঁর মাথায়, কাঁধে, কোলে অজস্র পাখি নাচছে, খেলছে, লাফাচ্ছে। যেন পাখির মেলা বসে গেছে।

সে ঘাটে নেমে জল পান করলো। মনে মনে ভাবলো, আমি যদি সাধু হতাম, তাহলে পাখিগুলিকে একটি-একটি করে ধরতাম আর গলা টিপে মারতাম! তাহলে বনে বনে আর পাখির সন্ধানে সারাদিন আমাকে ঘুরে বেড়াতে হতো না।

সে মনে মনে স্থির করলো, তাই হবে। কাল থেকে আর শিকারের খোঁজে বনে বনে ঘুরে বেড়ানো নয়, সে এই ঘাটে সাধু সেজে বসে থাকবে। আর, পাখি এলেই ধরবে।

পরদিন সে আর সঙ্গে তীরধনুক আনলো না। নদীর ঘাটে এসে স্নান করে সাধু সেজে একপাশে নিঃশব্দে বসে রইলো। সারাদিন সেইভাবে কেটে গেল। সেদিন কোন পাখি এলো না।

পরের দিন সকালেও সে নদীতে স্নান করে ঘাটের একপাশে সাধু সেজে ধ্যানের ভান করে নিঃশব্দে বসে রইলো। আজ পাখি এলো। কিন্তু কেউ কাছে এলো না। দূরে-দূরে বসে তাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগলো। দূরে-দূরেই তারা সেদিন খেলা করলো। ভয়ে কেউ কাছে এলো না।

তার পরের দিন ব্যাধটি যথারীতি নদীতে স্নান করলো, সাধু সেজে ঘাটের একপাশে ধ্যানের ভান করে বসে রইলো। আজ প্রথমে একটি পাখি এসে তার কোলে বসলো।

তারপর সে অন্য পাখিদের ডাকতে লাগলো। এইভাবে একে একে অজস্র পাখি এসে তার মাথায়, কাঁধে, কোলে বসে খেলা করতে লাগলো।

ব্যাধ এখন ইচ্ছে করলেই অনেক পাখি ধরে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু পাখি ধরতে আজ আর তার হাত উঠলো না।

ব্যাধটি সেদিন থেকে পাখি শিকার ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে গেল॥

নীতিবাক্য ঃ আসলের নকল করতে করতে নকলও আসল হয়ে যায়।

●১৮. **গল্প-সংকেত ঃ** রাজা হবুচন্দ্র মন্ত্রী গবুচন্দ্রের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করেন না। পুকুরের ধারে দুজন বিদেশীকে উনুন খুঁড়তে দেখে প্রহরী তাদের ধরে আনে। মন্ত্রী গবুচন্দ্র তাদের পুকুর-চুরির অপরাধে শূলে চড়াবার আদেশ দেন। শূল দুটির মধ্যে বড়টিতে চড়তে বিদেশী দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি দেখে রাজা এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, বড় শূলে মরলে পরজন্মে রাজা এবং ছোট শূলে মরলে পরজন্মে মন্ত্রী হবে। রাজা বিদেশীদের রাজ্যের বাইরে দূর করে দিয়ে তিনি নিজে বড়টিতে এবং মন্ত্রী ছোটটিতে প্রাণ দিলেন।

॥ হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী ॥

রাজা হবুচন্দ্র। গবুচন্দ্র তাঁর মন্ত্রী। যোগ্য রাজার যোগ্য মন্ত্রী। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করেন না। স্নানাহার থেকে ওঠাবসা—সবই তিনি মন্ত্রীর পরামর্শমতো করে থাকেন।

কারণ তিনি মনে করেন, রাজ্যে গবুচন্দ্রের মতো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আর নেই। মাঝে মাঝে গবুচন্দ্র এমন আশ্চর্য বুদ্ধির পরিচয় রাখেন, হবুচন্দ্র অবাক হয়ে যান, রাজ্যশুদ্ধ লোক প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে।

গবুচন্দ্রের জন্যে রাজা হবুচন্দ্র সেইজন্যে মনে মনে অত্যন্ত গর্বিত।

একদিন দুজন বিদেশী দূরে কোথায় যাচ্ছিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখে তারা রাজ-প্রাসাদের পুকুরের পাড়ে রাত কাটিয়ে পরের দিন প্রভাতে গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করবে, স্থির করলো।

সঙ্গে তাদের আছে চাল ও ডাল। তাই তারা রাতের খাবার রান্না করবার জন্যে পুকুরের পাড়ে একটা উনুন খুঁড়তে লাগলো।

তাদের উনুন খুঁড়তে দেখে সেখানে রাজার প্রহরী এসে হাজির। বিদেশীরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, অন্য কিছুই নয়, তারা রান্নার জন্যে উনুন খুঁড়ছে।

কিন্তু প্রহরী তাদের কথায় কান না দিয়ে তাদের বেঁধে নিয়ে কারাগারে রাখলো।

পরের দিন সকালে যথারীতি বিচার-সভা বসলো। রাজা হবুচন্দ্র এসে সিংহাসনে বসলেন। তাঁর পাশে নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন মন্ত্রীবর গবুচন্দ্র।

তখন প্রহরী বিদেশী দুজনকে তাঁদের সামনে হাজির করে তারা কি করছিল, সমস্তই নিবেদন করলো। রাজা মনোযোগ দিয়ে সমস্ত শুনে চিন্তিত মুখে মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

মন্ত্রী বিদেশীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা রাতের অন্ধকারে পুকুরপাড়ে গর্ত খুঁড়ছিলে?'

বিদেশীরা বললো, 'হ্যাঁ, হুজুর—'

মন্ত্রী গম্ভীর হয়ে রাজার মুখের দিকে তাকালেন। রাজা তো চিন্তিত মুখে মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন।

মন্ত্রী বললেন, 'স্পষ্ট বোঝা গেল, এরা পুকুরচুরির মতলব করেছিল।'

রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই না হলে তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র! রাজসভায় সবাই তাঁর বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এমন মন্ত্রী আর হয় না। আহা, কী বুদ্ধি!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে, শাস্তি?'

'শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড!'

আদেশমতো দুটো শূল রাজসভায় আনীত হলো। শূল দুটির একটি ছিল বড়, অন্যটি একটু ছোট।

বিদেশীরা রাজা এবং মন্ত্রীর বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিল। তারা আদেশ শুনে দুজনে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। তা দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এ রকম করছো কেন?'

তাদের মধ্যে একজন বললো, 'হুজুর, আমি বড় শূলে মরবো।'

সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন বলে উঠলো, 'না হুজুর, আমি বড় শূলে মরবো।'

এই বলে তারা আগের মতন ধস্তাধস্তি করতে লাগলো।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তোমারা বড় শূলে মরতে চাও?'

তাদের মধ্যে একজন বললো, 'হুজুর, যে বড় শূলে মরবে, সে পরজন্মে রাজা হবে। আর, যে ছোট শূলে মরবে, সে পরজন্মে তার মন্ত্রী হবে। আমি ওর মন্ত্রী হতে পারবো না, হুজুর, আমি রাজা হবো। আমি বড় শূলে মরে পরজন্মে রাজা হতে চাই, হুজুর।'

শুনে রাজা বললেন, 'তোমার এত বড় আস্পর্ধা! আমি থাকতে তুমি বড় শূলে মরে পরজন্মে রাজা হতে চাও? প্রহরী, এদের রাজ্যের বাইরে ছেড়ে দিয়ে এসো। আমি বড় শূলে মরবো। আর, মন্ত্রীবর গবুচন্দ্র, তুমি ছোট শূলে মরবে। পরজন্মে তোমার মতো বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী না হলে আমার চলবে না।'

শুনে সভাশুদ্ধ লোক সবাই 'সাধু' সাধু' রব করতে লাগলো॥

নীতিবাক্যঃ যেমন রাজা, তেমনি মন্ত্রী।

●১৯. **গল্প-সংকেতঃ** সিদ্ধার্থ রাজোদ্যানে বসে আকাশের উড্‌ডীয়মান হংসবলাকার সারির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় বাণবিদ্ধ হয়ে একটি হাঁস তাঁর কোলে এসে নিপতিত হলো। সিদ্ধার্থ তাকে বাণমুক্ত করে জল দিয়ে পুনর্জীবন দান করলেন। তারপর দেবদত্ত এসে তার বাণে নিহত হংসটিকে দাবি করলেন। সিদ্ধার্থ তাকে জীবন দিয়েছেন, কাজেই হাঁসটির ওপরে তাঁর দাবিই প্রবল। তিনি হাঁসটিকে দেবদত্তের হাতে না দিয়ে আকাশে মুক্তি দিলেন।

॥ সিদ্ধার্থ ও রাজহংস ॥

শরৎকাল। মেঘমুক্ত আকাশে শাদা মেঘের মালার মতো মানস-সরোবরের দিক থেকে ভেসে আসছে হংসবলাকার সারি

সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তুর রাজোদ্যানের নির্জনে একাকী বসে সেই সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছেন। কী অপূর্ব সেই সৌন্দর্য! সিদ্ধার্থ একমনে বসে সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য অবলোকন করছেন।

কিন্তু হঠাৎ সেই হংসবলাকার মালাটি ছিঁড়ে গেল যেন! একটি হাঁস যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে সিদ্ধার্থের কোলে এসে নিপতিত হলো। তার কাতর কাতরানিতে শরতের আকাশ পরিব্যাপ্ত হলো, পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হলো. সিদ্ধার্থের হৃদয়ে গিয়ে সেই বেদনা জাগিয়ে তুললো এক করুণার প্রস্রবণ।

হাঁসটির বুকে বিঁধেছে একটি শানিত তীর। আহা, কে এমন নিষ্ঠুর, যে হাঁসের কোমল বুকে এই তীর নিক্ষেপ করেছে? সিদ্ধার্থ তাঁর সংবেদনশীল হাতে হাঁসটির বুক থেকে তীর তুলে এনে জল দিয়ে তার ব্যথা উপশমের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর শুশ্রূষায় অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁসটি তার জীবন ফিরে পেল। সে তার দয়ালু প্রাণদাতার দিকে অশ্রুভরা করুণ চোখে চেয়ে রইলো নির্নিমেষে। এদিকে, সিদ্ধার্থও বেদনায় ছল ছল চোখে চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

এমন সময় হাতে তীরধনুক নিয়ে রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন দেবদত্ত। সিদ্ধার্থের কোলে হাঁসটিকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, 'সিদ্ধার্থ, এ হাঁসটি আমার। আমার তীরেই নিহত হয়ে মাটিতে পড়েছে—'

করুণার অপরূপ মূর্তি সিদ্ধার্থ দেবদত্তের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বুঝেছি, তুমিই সেই নিষ্ঠুর, যার বাণে এই হাঁসের কোমল প্রাণ ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু দেবদত্ত, আমি এই হাঁস তোমাকে দেবো না। এ হাঁস আমার।'

'হাঁসটিকে হত্যা করলাম আমি। আর, হাঁসটি হলো তোমার?'

'হত্যাকারী যদি হাঁসটি পায়, যে তাকে জীবন দিয়েছে—সে কেন তাকে পাবে না? কোন্‌টা বড়ো—প্রাণ-দেওয়া না প্রাণ-নেওয়া? আর, তাছাড়া এ হাঁস নিহতও নয়—আহত মাত্র। আমি সেবাশুশ্রূষা করে একে বাঁচিয়ে তুলেছি। আমি একে দেবো না। তুমি কপিলবাস্তুর রাজ্য-সিংহাসন—সব নিতে পারো। তার বিনিময়ে আমাকে তুমি হাঁসটি দাও। আমি আর কিছু চাই না।'

দেবদত্ত সিদ্ধার্থের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফিরে চলে গেলেন।

সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে শরৎকালের মেঘমুক্ত আকাশে দিলেন উড়িয়ে। তার কলকাকলিতে আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে গেল, পরিপূর্ণ হয়ে গেল সিদ্ধার্থের করুণাপ্লাবিত হৃদয়॥

নীতিবাক্য ঃ প্রাণ-নেওয়ার চেয়ে প্রাণ-দেওয়া অনেক বড়ো

●২০. **গল্প-সংকেত ঃ** একজন শ্রমিক বা সাধারণ মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু লোককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল, এমন ঘটনা অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা কর। উ. মা. '৭৮

॥ সার্থক জীবন ॥

ছোট্ট একটি স্টেশন। নাম কল্যাণপুর। লোকজনের ভিড়ভাট্টা কম। সবুজ গ্রামের কোলে লাল রঙের ইটের স্টেশনঘর—ঠিক যেন একখানা ছবির মতো।

সারাদিন লোক্যাল ট্রেনের আনাগোনা। ওদের কুড়ি সেকেণ্ডের বেশী দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। সামনে পেছনে ভোঁ দিয়ে ইস্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি ধরাবার জন্যে ছুটে চলে যায়। কিন্তু মেল ট্রেনের চাল-চলন একটু আলাদা। সে ভি. আই. পি.-র মতো আসে, ভি. আই. পি-র মতো চলে যায়। কল্যাণপুর স্টেশনের দিকে ফিরে তাকায় না।

রামভজন কল্যাণপুর স্টেশনের একমাত্র কুলি। হাঁটুর ওপরে ছোট্ট ময়লা ধুতি, গায়ে লাল কুর্তা, মাথায় তেলচিটে গামছার পাগড়ি। এই হলো রামভজন। স্টেশনের পেছনে রুটি পাকায়, গলা ছেড়ে তুলসীদাসী রামায়ণ গায়, বাবুদের ডাক এলে মোট বয়ে দিয়ে আসে। পয়সা? যে যা দেয়, রামভজন বেশী চায় না।

'তুমি বকশিশ চাও না কেন, রামভজন?'

রামভজন বিরাট গোঁফ-জোড়া প্রসারিত করে বলে, 'বেশী পয়সা কি হবে, হুজুর? মরলে পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।'

'তা যাবে না। কিন্তু বাঁচার জন্যে সবারই তো পয়সা চাই।'

রামভজন যা পয়সা কামায়, তাতে ওর চলে যায়।

সংসার বলতে সে একা এবং একটি কুকুর—লালু তার নাম। সারাদিন সে রামভজনের আস্তানায় পাহারা দেয়। খাবার সময় তার বরাদ্দ ক'খানা রুটি তাকে দিয়ে তবে রামভজন নিজে খায়।

সেদিন রামভজন বাজারে মোট নামিয়ে রেল-লাইন ধরে ফিরছিল। স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে বনগাঁ লোক্যাল। সে পেছনে চেয়ে দেখলো, সেই এক লাইনেই ছুটে আসছে ন'টা-সাঁইত্রিশের মেল-ট্রেন। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা কেঁপে উঠলো। এখুনি একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। কত লোক মারা পড়বে—সর্বনাশ হবে কত পরিবারের। সেই মুহূর্তে তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে গায়ের লাল কুর্তাটা খুলে হাতে তুলে ধরে পেছন ফিরে রেল-লাইন ধরে ছুটতে লাগলো। এ কী! মেল ট্রেনটা থামছে না কেন? আর, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই যে লোক্যাল ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা মারবে ওটা! পাগলের মতো রামভজন ছুটছে। মেল-ট্রেনটা এবার ওর ওপরেই এসে পড়ছে যে! সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই।

শেষে মেল-ট্রেনটা থামলো। কিন্তু লাইনের ধারে রামভজনের রক্ত-মাখা দেহটাকে ঘিরে হাজার মানুষের জটলা। তার জন্যেই আজ হাজার মানুষের প্রাণ বেঁচেছে। সাহসিকতার জন্যে রেল-কর্তৃপক্ষ তাকে পাঁচ হাজার টাকা মরণোত্তর পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কে গ্রহণ করবে সেই পুরস্কার? ত্রিসংসারে রামভজনের যে কেউ নেই। আছে শুধু লালু। সে আজও তার প্রভুর আস্তানায় পাহারা দিয়ে চলে। খাবার সময় হলে সে শুধু কুঁই-কুঁই করে কাঁদে আর রামভজনকে খোঁজে॥

নীতিবাক্য : 'জীবন পরের তরে পরার্থে কামনা।'

অনুসরণী

১. গল্প-সংকেতের অনুসরণে সম্পূর্ণ গল্পটি রচনা কর :

ক. নখ কাটতে কাটতে রাজা আঙুল কেটে ফেলেন। মন্ত্রী বললেন, 'ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন।' একদিন রাজা মন্ত্রীকে নিয়ে বনে গিয়ে তাঁকে একটি শুষ্ক কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। রাজা তারপর দস্যুদলের হাতে পড়েন। কিন্তু ক্ষতযুক্ত রাজাকে বলিদানের অযোগ্য মনে করে তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে। রাজা মন্ত্রীকে কূপ থেকে উদ্ধার করে মন্ত্রীর বাক্য স্বীকার করেন।

খ. এক বৃদ্ধ বাঘ এক স্ত্রীলোককে হত্যা করে ভক্ষণ করে। স্ত্রীলোকটির হাতের কঙ্কণ নিয়ে সে পথিকদের তা গ্রহণ করবার জন্যে প্রলুব্ধ করে তাদের হত্যা করে ভক্ষণ করতো। কেউ আর সেই জরাগ্রস্ত বাঘের ফাঁদে পা দিত না। একদিন এক লোভী ব্রাহ্মণ তার ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ হারালো।

গ. ধোপার নীলের গামলায় পড়ে গিয়ে এক শেয়ালের গায়ের রং নীল হয়ে যায়। সে নিজেকে সেজন্যে পশুদের রাজা বলে দাবি করে। সবাই তা স্বীকার করে তার সেবা করতে লাগলো। একদিন সন্ধ্যের সময় বনের শেয়াল ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে সেও ডেকে উঠলো। সবাই তাকে সাধারণ একটি শেয়াল বলে চিনতে পেরে হত্যা করলো।

ঘ. একটি তৃষ্ণার্ত কাক জলের সন্ধানে উড়তে উড়তে একটি জলের কলসী দেখতে পেল। জল ছিল কলসীর একেবারে তলায়—ওর নাগালের বাইরে। একটু দূরে কিছু পাথরের টুকরো পড়েছিল। সে পাথরের টুকরোগুলি কলসীতে ফেলে জলপান করে তৃষ্ণা দূর করলো।

ঙ. একটি কুকুর মুখে এক টুকরো মাংস নিয়ে একটি সেতুর ওপর দিয়ে নদী পার হচ্ছিল। নদীর জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে সে জলের ভেতরের কুকুরটির মুখের মাংসখণ্ড পাবার জন্যে গর্জন করে উঠলো। অমনি তার মুখের মাংসখণ্ডটি নদীর জলে পড়ে ভেসে গেল।

চ. এক টুপিওয়ালা বাজারে টুপি বিক্রী করতে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। গাছে ছিল অনেকগুলি বাঁদর। তারা টুপিওয়ালার ঘুমের সুযোগে গাছ থেকে নেমে এসে মাথায় এক-একটি করে টুপি পরে গাছে উঠে গেল। ঘুম থেকে জেগে টুপিওয়ালা সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তাদের দিকে নিজের মাথার টুপিটি খুলে ছুঁড়ে দিল। তার অনুকরণে বাঁদরগুলিও তাই করলো।

ছ. একটি তৃষ্ণার্ত সিংহ ও একটি তৃষ্ণার্ত মহিষ একই সঙ্গে নদীতে জলপান করতে যায়। কিন্তু কে আগে জলপান করবে—এই নিয়ে দুজনের বচসা থেকে মারামারি উপক্রম হলো। এমন সময় আকাশে তাদের মাংস খাবার জন্যে কাক ও শকুনের ভিড় দেখে তারা বিবাদে ক্ষান্ত হয়ে জলপান করে যে যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

জ. বিড়ালের আক্রমণে ইঁদুরেরা নির্মূল হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ইঁদুরেরা সভায় মিলিত হয়ে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে লাগলো। একটি বুদ্ধিমান ইঁদুর বললো, যদি বিড়ালের গলায় একটি ঘন্টা বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে বিড়ালের গতিবিধি বুঝতে পেরে তারা সতর্ক হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

ঝ. একটি শেয়াল একটি গভীর গর্তে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারলো না। একটি ছাগল ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে শেয়ালকে দেখে সে ওখানে কি করছে জিজ্ঞেস করলো। শেয়াল জানালো যে, সে শীতল এবং সুস্বাদু জল পান করছে। সে কথা শুনে ছাগল লাফ দিয়ে গর্তে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল তার পিঠে চড়ে গর্ত থেকে উঠে এলো।

ঞ. এক ভিক্ষুক রাজার কাছে ভিক্ষে চাইতে গেল। রাজা মন্দিরে গিয়েছিলেন। ভিক্ষুক দেখলো, রাজা ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষে চাইছেন। ভিক্ষুক আর রাজার কাছে ভিক্ষে না চেয়ে ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষে চাইবে, স্থির করলো।

ট. এক রাখাল গোরুর পাল নিয়ে প্রতিদিন মাঠে গিয়ে খেলাচ্ছলে 'বাঘ' 'বাঘ' বলে চীৎকার করতো। গ্রামবাসীরা তার কথায় বিশ্বাস করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে এসে লজ্জা পেয়ে ফিরে যেত। রাখাল খুব মজা পেত। একদিন সত্যি সত্যিই বাঘ এলো। রাখাল চীৎকার করলো; কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্যে ছুটে এলো না।

ঠ. একটি কৃষকের ছিল একটি আশ্চর্য হাঁস। সে প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম পাড়তো। রোজ

একটি ডিমের জন্যে অপেক্ষা না করে একদিনে হাঁসের পেট কেটে সবগুলি ডিম বের করে নেওয়া ভালো মনে করে সে হাঁসটির পেট কেটে ফেললো। কিন্তু কেটে কোন ডিম খুঁজে না পেয়ে মাথায় করাঘাত করতে লাগলো।

ঙ. একটি শেয়াল ফাঁদে ধরা পড়ে। কৃষক শেয়ালটিকে প্রাণে না মেরে তার লেজ কেটে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। লেজের দুঃখ ভোলার জন্যে সে সব শেয়ালকে ডেকে লেজ না থাকার বহুতর সুবিধার কথা বর্ণনা করে সবাইকে লেজ কেটে ফেলতে পরামর্শ দিল। একটি বৃদ্ধ শেয়াল বললো যে, তার লেজ গজাবার সম্ভাবনা থাকলে সে কখনই লেজ কেটে ফেলার পরামর্শ দিত না।

চ. একটি সিংহ বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হয়ে গুহায় পড়ে থাকতো। শিকার করতে তার শক্তি ছিল না। সে প্রচার করে দিল, সে অসুস্থ, চলচ্ছক্তিহীন এবং মৃতপ্রায়। এক একটি পশু তাকে দেখতে আসে, সে তাকে ধরে ভক্ষণ করে। একদিন একটি শেয়াল আসে। দূর থেকে শেয়ালের সম্ভাষণ শুনে সিংহ পরম আদরে তাকে গুহার ভেতরে ডাকে। শেয়াল পশুদের গুহায় প্রবেশের পদচিহ্ন দেখতে পায়, কিন্তু নির্গত হবার পদচিহ্ন দেখতে পায় না। সে দূর থেকে পশুরাজের নিরাময় কামনা করে পলায়ন করে।

ণ. এক দুঃখী বৃদ্ধ বনে কাঠ কেটে মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছিল। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে সে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে বোঝা ফেলে যমকে ডাকতে লাগলো, তাকে সেই দুঃখের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। তার ডাকে যম এসে উপস্থিত হলে সে তাঁকে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করে। যম তাকে তার ডাকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন বৃদ্ধ যমকে তার মাথায় কাঠের বোঝাটা তুলে দিতে অনুরোধ করে।

২. প্রদত্ত নীতিবাক্যগুলি নিয়ে এক-একটি গল্প রচনা কর :

ক. কালনেমির লঙ্কাভাগ।
খ. অতি দর্পে হত লঙ্কা।
গ. অর্থই অনর্থের মূল।
ঘ. যেমন কর্ম, তেমনি ফল।
ঙ. আঙুর ফল টক।
চ. ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে।
ছ. ধুলেও কয়লার কালত্ব যায় না।
জ. বিবাদে কখনও লাভ হয় না।
ঝ. বাহুবলের চেয়ে বুদ্ধিবল বেশী শক্তিশালী।

৩. ক. একটি ছাত্র বিপন্ন অপর একটি ছাত্রকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। তার সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি বিষয়ে একটি গল্প লিখ।

খ. একটি শ্রমিক একটি জ্বলন্ত গৃহ থেকে একটি শিশুকে রক্ষা করে। কিন্তু সে নিজে আহত হয়। তার সাহস ও ত্যাগের বিষয়ে একটি গল্প লিখ।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

প্রস্তুত ভাষণ

'বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার রক্ত, আমার ভাই……'

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রবন্ধ বিচিন্তা

'বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে।' —বঙ্কিমচন্দ্র

প্রস্তাবনা

প্রাণি-জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষই বাক্‌-শক্তির গৌরবে ভাগ্যবান্। সে তার মনের ভাবকে অন্যান্য মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, যা অন্য কোন প্রাণী পারে না। মানুষ তার মনের ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্যে ভাষা সৃষ্টি করেছে। ভাষা সৃষ্টির পর থেকে তার সাধনাই হলো, কি করে মনের ভাবকে সম্পূর্ণভাবে এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়।

বাক্‌শক্তি

তার সেই সাধনার সূত্রপাত সভ্যতার ঊষাকাল থেকে এবং আজও সেই সাধনার ধারা অব্যাহত।

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। সে চিন্তা করতে পারে। সে তার সেই চিন্তাকে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চায়। সে চায়, অন্যান্য মানুষও তার চিন্তাধারায় চিন্তা করুক, তার চিন্তার সহযাত্রী হোক। এ ব্যাপারে সে তার ভাষাকে করে হাতিয়ার। ভাষার মধ্যস্থতায় সে তার ভাব-ভাবনাগুলিকে মানুষের চিন্তার দরবারে দেয় পৌঁছিয়ে।

ভাব ও ভাষা

স্পষ্টতঃ, ভাব-ভাবনার আদান-প্রদানের ব্যাপারে দুটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম : এক. চিন্তা-ভাবনার শৃঙ্খলা ও যুক্তিগ্রাহ্যতা এবং দুই. উপস্থাপনার সুষমা বা হৃদয়গ্রাহিতা। মানুষের মনে যখন কোন চিন্তার উদয় হয়, সে চিন্তা অন্য মানুষের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হোক বা স্বতোৎসারিত হোক, তা একটি সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতার সূত্রে বিধৃত হয়ে উদিত হয়। কিন্তু মানুষ যেমন চিন্তাশীল জীব, সে তেমনি ভাবপ্রবণও বটে। তাই অনেক সময় তার আত্যন্তিক ভাব-প্রবণতা সেই চিন্তার শৃঙ্খলাকে বিচলিত করে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে এবং চিন্তা-শৃঙ্খলার গ্রন্থি-বন্ধন শিথিল করে দেয়। কাজেই, ভাব-প্রবণতা চিন্তাশীল মানুষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়। কিন্তু সেই সঙ্গে

ভাব ও ভাবনা

স্মরণীয় যে, চিন্তাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে ভাব-প্রবণতাও মানুষের স্বভাব-ধর্ম। সেদিক থেকে অনেক সময় নীরস যুক্তিতর্ক ও চিন্তা-শৃঙ্খলা মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেখানে ভাব-বর্ষণে শ্রোতার শুষ্ক মনোভূমিকে সরস করে উদ্দিষ্ট ফসল তোলা যায়। কাজেই, কেবল নীরস যুক্তি-শৃঙ্খলাই সব নয়, তার সঙ্গে ভাবের সংশ্লেষ ঘটলে বক্তব্য অনেক সময় অধিক সাফল্য লাভ করে।

আবার, কেবল বক্তব্য জোরদার হলেই বা চিন্তা যুক্তিনির্ভর হলেই সাফল্য লাভ করা যায় না। সেই সঙ্গে তার একটি শিল্পসম্মত প্রকাশভঙ্গিও চাই। অর্থাৎ, বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারা চাই। বক্তব্যের মতো বক্তব্যের উপস্থাপনা বা প্রকাশ-ভঙ্গিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার উষাকাল থেকে মনের ভাব-ভাবনাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের সাধনার অন্ত নেই। ভাষার মূল উপকরণ কতকগুলি ইংগিতময় শব্দ বৈ তো নয়। অথচ তার সাহায্যেই মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করতে হয়। এ বড়ো দুরূহ সাধনা। এ ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেয় অনেক। প্রধান যে সমস্যা এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করে, তা হলো মনের ভাব-ভাবনার সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু প্রকাশক্ষম উপযুক্ত শব্দাভাব এবং প্রাপ্ত শব্দগুলির ভিন্নতর ইংগিতময়তা। এ সমস্যা ভাষা-শিল্পী-মাত্রেরই সমস্যা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'আশা' কবিতায় বলেছিলেন: 'হৃদয়ের ধ্যানখানি লভিবে সম্পূর্ণ বাণী/ধন নয় মান নয় হৃদয়ের ভাষা/করেছিনু আশা।' মানুষের সাধনাই হলো তাই, এ-সব সমস্যা জয় করে হৃদয়ের ভাব ও মনের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে ও সুন্দরভাবে মানুষের মনের দরজায় পৌঁছিয়ে দেওয়া।

প্রকাশভঙ্গি

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষণ বা বক্তৃতাও বাক্-শিল্প। নানা উপলক্ষে সমাজবদ্ধ মানুষকে সভাসমিতিতে তার নানা বক্তব্য নিবেদন করতে হয়। বক্তৃতা বা ভাষণ-দান একটি সুসভ্য রীতি। বক্তৃতা-দান তাই সমাজের একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। সেইজন্যে এর কতকগুলি ধারা-বৈশিষ্ট্য আছে। সেই ধারা-বৈশিষ্ট্যকে চারটি অংশে বিন্যস্ত করা যায়: এক. সম্ভাষণ, দুই. ভূমিকা, তিন. মূল বক্তব্য এবং চার. উপসংহার। বক্তাকে এই চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

ভাষণ বা বক্তৃতার ধারা-বৈশিষ্ট্য

যে-কোন বক্তৃতায় সম্ভাষণ-অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের 'আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ'—এই স্মরণীয় সম্ভাষণ শ্রোতৃবর্গের ওপর আশ্চর্য যাদুমন্ত্রের মতো সফল হয়েছিল। কাজেই, সম্ভাষণ বক্তৃতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশের আকর্ষণীয়তার দ্বারা মূল বক্তব্যের প্রতি শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, শ্রোতৃবর্গকে আবিষ্ট করা যায়। প্রথমতঃ, সভার সভাপতিকে [প্রধান অতিথি থাকলে প্রধান অতিথিকে] এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে যথোচিত সম্ভাষণ করে ভাষণের সূচনা করতে হয়। 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় [প্রধান অতিথি থাকলে 'মাননীয় প্রধান অতিথি'] এবং 'সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী' বলে সাধারণতঃ সম্ভাষণ-পর্ব সেরে নেওয়া হয়। কোন সমিতির সভা হলে 'শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ'—এই

সম্ভাষণ

ভাবে সম্ভাষণ করা উচিত। ভোজসভা বা অনুরূপ কোন সভানুষ্ঠান হলে সম্ভাষণ করতে হবে 'মাননীয় অতিথিবৃন্দ'—এইভাবে।

বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশ হলো বক্তৃতার সূচনা। এই অংশেই বক্তৃতার মূল বক্তব্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কাজেই, এই অংশটিও বেশ মজবুতভাবেই রচিত হওয়া চাই। সাধারণতঃ এই অংশে অনুষ্ঠান বা উপলক্ষের সঙ্গে মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখিত হয়। অর্থাৎ, একপ্রান্তে অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ, অন্যপ্রান্তে মূল বক্তব্য ; বক্তৃতার সূচনা-অংশ এই দুটি প্রান্তের মধ্যে সংযোগের সেতু রচনা করে দেবে। সেজন্যে অনুষ্ঠান বা উপলক্ষের সঙ্গে বক্তার বক্তৃতার প্রাসঙ্গিকতার ওপরে এই অংশে আলোকপাত করতে হয়। স্মরণীয় যে, এই অংশের চমৎকারিত্বের ওপর মূল বক্তৃতার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। ধরা যাক্, উপলক্ষটি পনেরোই আগস্ট। বক্তৃতার সূচনা করা যেতে পারে এইভাবে : 'আজ পনেরোই আগস্ট। ভারতের জাতীয় জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত ও পবিত্রতম দিবস। কত শত শহীদের রক্তে স্নান করে এবং বহু ব্যথা-বেদনার স্মৃতি বহন করে এই পবিত্রতম দিনটি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের স্মরণীয় প্রভাতে আমাদের জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল।' এইভাবে সূচনাটি সব সময় অনুষ্ঠান বা উপলক্ষের অনুসারী হবে।

সূচনা-অংশ

মূল বক্তব্যটি বক্তৃতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই অংশে যুক্তি-শৃঙ্খলা-সজ্জার নৈপুণ্যে এবং ভাবাবেগের অভিসিঞ্চনে বক্তৃতায় সাফল্য লাভ করা যায়। যুক্তি-শৃঙ্খলার উপস্থাপনা এবং আবেগের বারিবর্ষণের প্রয়োজনে কোনও কবি-সাহিত্যিকের কিংবা কোনও নেতা-মহাপুরুষের সুভাষিত বাণীমঞ্জরীর দু'-একটি প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করলে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। কিন্তু স্মরণীয়, এক্ষেত্রে ভুল উদ্ধৃতি বক্তব্যের ভাব-মূর্তিটিকে একেবারে বিনষ্ট করে দিতে পারে। সংশয় থাকলে তেমন কোন উদ্ধৃতি পরিহার করাই ভালো। এইভাবে মূল বক্তব্যটিকে কয়েকটি অংশে [point] ভাগ করে তাদের পারম্পর্যক্রমে উপযুক্ত বাক্য-যোজনার দ্বারা পরিবেশন করলে বক্তৃতার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় এবং বক্তব্যটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। তাছাড়া, কোথাও বক্তব্য হবে ভাব-গম্ভীর, কোথাও হবে তির্যক্ পরিহাস-চটুল, কোথাও হবে প্রশ্নাতুর। নইলে বক্তব্যটি শ্রোতাদের কাছে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে লাগতে পারে।

মূল বক্তব্য

পরিশেষে উপসংহার। এই অংশে অত্যন্ত শিল্পসম্মত উপায়ে বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বক্তৃতার উপসংহার করতে হয়। অথচ এমনভাবে উপসংহার করতে হবে, এমন নাটকীয়ভাবে এবং এমন শিল্পসম্মত উপায়ে যে, বক্তৃতা শেষ হবার পরেও যেন শ্রোতৃবর্গের মনে বক্তৃতার রেশ বাজতে থাকে, যেন বক্তার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের মনের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে—তাদের স্বমতে আনতে সাহায্য করে। এখানেও আবেগ ও যুক্তির অদ্বয় সম্মিলন। আবেগ দিয়ে শ্রোতার হৃদয় এবং যুক্তি দিয়ে তার চিন্তাকে প্রভাবিত করে রীতিসম্মতভাবে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

উপসংহার

কিন্তু এহ বাহ্য। বক্তৃতার এই চতুর্বিধ পর্যায়ের প্রতি যথোচিত আনুগত্য সত্ত্বেও অনেকে বক্তৃতামঞ্চে সফলতা লাভ করতে পারে না। অথচ, 'যে পারে সে আপনি পারে…।' তার কারণ, বক্তৃতামঞ্চে সফলতা লাভের জন্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া আরো কতকগুলি অপরিহার্য বিষয় আছে। সেগুলি হলো: এক. আকর্ষণীয় চেহারা, দুই. অনুষ্ঠান বা উপলক্ষের উপযোগী এবং বক্তৃতার ভাবমূর্তি রচনার অনুকূল পোশাক-পরিচ্ছদ, তিন. উদাত্ত কণ্ঠস্বর, চার. উচ্চগ্রামে ও নিম্নগ্রামে কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহ [modulation of voice], পাঁচ. সুস্পষ্ট এবং শ্রুতিমধুর উচ্চারণ, ছয়. উপযুক্ত যতির [Pause] ব্যবহার, সাত. বক্তৃতার লয়-মান রক্ষা এবং আট. সর্বপ্রকার মুদ্রাদোষ পরিহার। স্মরণীয় যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরা এই সব গুণপনার দ্বারা সমন্বিত ছিলেন বলেই তাঁরা সভামঞ্চে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতৃবর্গের হৃদয় জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন॥

শেষ-কথা

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥
স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ॥ উপসংহার ॥

১

পনেরোই আগস্ট

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ,

আজ পনেরোই আগস্ট। ভারতের জাতীয় জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত ও পবিত্রতম দিন। কত শত শহীদের রক্তে স্নান করে এবং বহু ব্যথা-বেদনার স্মৃতি বহন করে এই পবিত্রতম দিনটি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের স্মরণীয় প্রভাতে আমাদের জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল। পরাধীনতার অন্ধকার অপসারিত করে ১৫ই আগস্টের সেই শুভ প্রভাতে ভারত-গগনে যে স্বাধীনতার শিশু-সূর্য উদিত হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

সূচনা

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকুঞ্জে ভারতের যে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, দ্বি-শতাব্দীর অবসানে তা অম্লান গৌরবে সেদিন পুনরায় উদিত হয়। ভারতের এই দুই শতাব্দীর ইতিহাস তার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। 'পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ'—বিভিন্ন সীমান্তে সে প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেছে। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় সিপাহীদের সংহত স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হলে নতুনতর সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হলো ভারত। রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ যে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন, তা জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। অসহযোগের অস্ত্র হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পুরোধায় এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। একদিকে অহিংস সংগ্রাম, অন্যদিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের রক্তাক্ত সংগ্রাম। তার সর্বশেষ পরিণতি দেখা গেল একদিকে গান্ধীজীর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে, অন্যদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত আক্রমণে।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস

তারপর ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হলো। কিন্তু সে দিয়ে গেল এক সর্বস্বান্ত খণ্ডিত ভারত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর শুরু হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম এখনো চলেছে। সেই সংগ্রাম আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগ্রাম। এই ক'বছরে যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে আত্ম-সন্তুষ্টির কোন কারণ নেই। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ভারতের এই সংগ্রাম চলবেই। পনেরোই আগস্ট সেই আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক ॥

উপসংহার

● ভারতের স্বাধীনতা-দিবস

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ রবীন্দ্র-প্রতিভার অবদান ॥ রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিক্-দিগন্ত ॥ উপসংহার ॥

২
পঁচিশে বৈশাখ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত সুধীবর্গ,

সূচনা

আজ পঁচিশে বৈশাখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পবিত্র জন্মদিবস। এই পবিত্র দিনটি তার রৌদ্রের আঁচলে একদিন পরম স্নেহে রবি-কবিকে বরণ করে নিয়েছিল পৃথিবীতে। এই পঁচিশে বৈশাখ তাই চির-নতুন, চির-অম্লান। পঁচিশে বৈশাখ প্রতি বছরই ফিরে ফিরে আসে এবং ডাক দেয় সেই চির-নতুনকে। 'চির-নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।'

রবীন্দ্র-প্রতিভার অবদান

রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় জীবনের কল্পবৃক্ষ, আমাদের ভাব-ভাবনার অক্ষয় সম্পদ। মানুষের এমন কোন ভাব নেই, এমন কোন চিন্তা নেই, যা তাঁর কাব্যবীণার তারে ঝংকৃত হয়নি। মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার পৌষ-ফাগুনের পালাগান রচনা করে আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে তিনি যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের জীবনকে তেমনি সুন্দর করে রচনা করবার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যে ব্যথাহত পাবে ব্যথা-বিজয়ের প্রেরণা, দার্শনিক পাবেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান, রাজনীতিক পাবেন নির্ভুল পথ-নির্দেশ, মৃত্যুপথযাত্রী পাবেন মৃত্যুঞ্জয়ী সান্ত্বনা। ব্যথা-বেদনা ও হতাশাময় এই পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবতরঙ্গে অবগাহন করি, তাঁর চিন্তাধারায় চিন্তা করি, তাঁর সুরে গান গাই, তাঁর ভাষায় কথা বলি। আমরা রবীন্দ্রনাথে মরি ও বাঁচি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিক্-দিগন্ত

যৌবনের প্রথম প্রভাতে হৃদয়ের নিবিড় বেদনায় তাঁর কাব্য-সংগীতের যে উৎসমুখ খুলে গিয়েছিল, তার মর্মর কলতানে ঝংকৃত হয়ে উঠলো সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহের পদাবলী, মানসী, সোনার তরী। এবার সোনার তরীর পালে লাগলো সৃষ্টির হাওয়া। চিত্রা, চৈতালী, কণিকা, কল্পনা, কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য, খেয়া এবং গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্যের সোনার ফসলে সেই সোনার তরী বোঝাই হলো। তারপর বলাকা, পলাতকা, পূরবী, বনবাণী, মহুয়া, পরিশেষ, পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলীর ধারা বেয়ে তাঁর কাব্যতরী জন্মদিনে ও শেষ লেখার মধ্য দিয়ে দিগন্তের অন্তরালে উধাও হয়ে গেছে। শুধু কাব্যে বা সংগীতেই নয়, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণ-কাহিনী—সাহিত্য ও চিন্তাজগতের সর্ব-বিভাগেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণের যোগফল হলো বাংলা সাহিত্যের বর্তমান চরম সমুন্নতি।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ভাব-সাধনার মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর মধ্য দিয়েই ভারতের বেদ-

উপনিষদ্ থেকে ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-বৈষ্ণব কবি এবং নানা সাধকের সাধনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে তিনি যদি ভারতের গঙ্গানদী হন, তবে পঁচিশে বৈশাখ গঙ্গোত্রী। আমরা 'গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে'। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজার প্রধান উপচার তাই রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রকাব্য এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য ॥

উপসংহার

●রবীন্দ্র-জয়ন্তী

৩
নববর্ষ

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ॥ দার্শনিক ব্যাখ্যা ॥ নববর্ষের তাৎপর্য ॥ উপসংহার ॥

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত বুধমণ্ডলী,

সূচনা

আজ নববর্ষ—আজ পুরাতনকে বর্জন করে নতুনকে বরণ করে নেবার দিন। কিন্তু পুরাতনকে কি সম্পূর্ণ বর্জন করা যায় ? 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'র কোলেই তো নতুন বছরের নতুন সূর্যের আবির্ভাব। পুরাতনই নব নব রূপে আমাদের দ্বারে ফিরে ফিরে আসে, আমাদের মনের কালিমা দূর করে নব নব বাণীতে দীক্ষিত করে। নববর্ষ তাই আমাদের নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষা নেবার দিন, নব-প্রেরণার বাণীতে উদ্ভাসিত হবার দিন।

নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

সূর্য-পরিক্রমার পথে পৃথিবীর যাত্রা আজ একবার সম্পূর্ণ হয়ে সূচিত হলো তার নতুন যাত্রারম্ভ। আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির প্রেরণায় সৃষ্টি হয় এক-একটি দিনের। নববর্ষও তেমনি একটি সাধারণ দিন মাত্র। কিন্তু মানুষ তাতে আরোপ করেছে নতুন তাৎপর্য, নতুন মহিমা। তার ফলে নববর্ষ স্বতন্ত্র গৌরবের সুষমায় মণ্ডিত হয়ে লাভ করেছে অসাধারণত্ব। পূর্বে ভারতে অগ্রহায়ণ মাসেই হতো বর্ষারম্ভ। কিন্তু কৃষকদের ক্ষেত্রে জমিদার-মহাজনদের খাজনা এবং ঋণ শোধ করতে করতে বৈশাখ মাস এসে পড়তো। সেইজন্যে জমিদার-মহাজনেরা অগ্রহায়ণের পরিবর্তে বৈশাখের প্রথম দিনটিকেই নববর্ষের পুণ্যাহ-রূপে চিহ্নিত করে নেয়। সেই থেকে নববর্ষেই ব্যবসায়ী-দোকানীদের বিখ্যাত 'হালখাতা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। সেদিক থেকে নববর্ষ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

দার্শনিক ব্যাখ্যা

নৃত্যে মেতেছেন নটরাজ। নৃত্যের তালে তালে তাঁর দক্ষিণ হাতের রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরে চলে। চৈত্র-অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাতের রুদ্রাক্ষের মালার ঘূর্ণন একবার সম্পূর্ণ হলো। তার ফলে একটি বছর মানুষের জীবন থেকে অন্ধকার কালসিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হলো এবং মানুষের জীবনের দ্বারে এসে দাঁড়ালো নতুন একটি বছর। জয় হোক এই নতুনের।

তাকেই বরণ করার জন্যে মানুষের আয়োজনের অন্ত নেই, উৎসাহের অন্ত নেই। কারণ মানুষ জীর্ণ গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি চায়, নতুনের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চায়। তাই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে বছরের অন্যান্য দিনের মতো একটি সাধারণ দিনকে নব-বর্ষের মহিমায় মণ্ডিত করে মানুষ তাকে দান করেছে স্বতন্ত্র রূপ।

নববর্ষের তাৎপর্য

নববর্ষ আমাদের নতুনের মন্ত্রে অভিষিক্ত হবার দিন, নতুনের আলোয় নতুন হয়ে ওঠার দিন। আকাশ আজ কী মহিমময়, বাতাস আজ কী উদার, সূর্যালোক আজ কী উজ্জ্বলবর্ণ! তাই আমরা আজ প্রার্থনা করবো—হে আলোর দেবতা, আমাদের মনের অন্ধকার দূর করে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করো, পবিত্র করো, নব-নব শুভকর্মে উদ্বুদ্ধ করো॥

উপসংহার

●বর্ষারম্ভ

ভাবণ-সূত্র: সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ অরণ্যের কাছে মানুষের ঋণ॥ অরণ্য-সংহার॥ অরণ্য-সৃষ্টি॥ উপসংহার॥

৪ বৃক্ষরোপণ-উৎসব

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে তাপদগ্ধা পৃথিবীতে কে শ্যামল ছায়া বিস্তীর্ণ করে মানবের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিল?...কে তাকে দিয়েছিল আশ্রয়ের প্রথম প্রতিশ্রুতি?...কে তার সামনে তুলে ধরেছিল ক্ষুধার অমৃতমধুর খাদ্য? সে অরণ্য। অরণ্যই তাকে সেদিন অবারিতভাবে দিয়েছিল স্নেহশীতল ছায়া, দিয়েছিল ক্ষুধার খাদ্য এবং জীবনের সুনির্ভর আশ্বাস।

সূচনা

অরণ্যের কোলেই তারপর বিকশিত হয়ে উঠেছিল মানুষের সভ্যতা। মানুষের জ্ঞানের চর্চা, তার প্রথম আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়েছিল এই অরণ্যের শ্যামল কোলেই। অরণ্য সেদিন তাকে দিল নিরাপদ বাসভূমি, ক্ষুধার খাদ্য, পরনের বস্ত্র, এবং নয়না-নন্দকর শ্যামল সৌন্দর্য। তারপর মানুষ সভ্যতার অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়ে এসে পৌঁচেছে বর্তমানের কোঠায়। কিন্তু অরণ্যের অবারিত স্নেহের দানের ধারা এখনো অব্যাহত। অরণ্যের কাছে, অরণ্যের বৃক্ষের কাছে এই পৃথিবীর মানুষ তাই অন্তহীন ঋণে ঋণী।

অরণ্যের কাছে মানুষের ঋণ

কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়ে এসে মানুষ নৃশংস ঘাতকের মতো মেতে

উঠলো অরণ্য-সংহারে। অরণ্যকে ধ্বংস করে তারা গড়ে তুললো শহর। আর, যে তার পরম সুহৃদ্, যার স্নেহে-দাক্ষিণ্যে তার জীবন এতদিন সুরক্ষিত হয়েছে, মানুষ কৃতঘ্নের মতো আজ তাকেই হত্যা করে তার শ্যামল সৌন্দর্যকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীতে ডেকে আনছে মরুভূমির ধূসরতার অভিশাপ।

অরণ্য-সংহার

এ তো শুধু অরণ্য-হত্যা নয়, এ যে আত্মহত্যার নামান্তর। অরণ্য না হলে কে তাকে দেবে শ্যামল ছায়া, ক্ষুধার খাদ্য, ব্যাধির নিরাময় এবং প্রাণধারণের অপরিহার্য পর্যাপ্ত নির্মল অক্সিজেন? অরণ্য ছাড়া কে তাকে দিতে পারে জীবনের আশ্বাস? কাজেই, আর সেই ভ্রান্তিবিলাস নয়। আর, অরণ্য-সংহার নয়, আজ অরণ্য-সংরক্ষণ প্রয়োজন, জীবনের নিরাপত্তার জন্যে চাই পর্যাপ্ত অরণ্য-সৃষ্টি।

অরণ্য-সৃষ্টি

বৃক্ষরোপণ অরণ্য-সৃষ্টির সেই শুভ আয়োজন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন, তার পশ্চাতে ছিল সর্বদর্শী ঋষি-কবির এই গভীর উপলব্ধি। অরণ্যই দিকে দিকে মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়ে দিয়ে জীবনকে দিতে পারে অক্ষয় রক্ষাকবচ। কাজেই, আর অরণ্যের বিনাশ নয়, চাই অরণ্যের সৃষ্টি এবং তার যথাযোগ্য সংরক্ষণ॥

উপসংহার

●মানব-মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ শ্রদ্ধা-নিবেদন॥ মার্জনা-প্রার্থনা॥ সাধ ও সাধ্য॥ উপসংহার॥

৫
বার্ষিক উৎসব

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমাগত অতিথিবৃন্দ এবং বন্ধুগণ,

আজ আমাদের এই বার্ষিক উৎসবে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। দিনের পর দিন আসে, গতানুগতিকতার স্রোতে ভেসে চলে যায়। কিন্তু আমাদের কলেজ-জীবনে আজকের দিনটি অন্যান্য দিন থেকে স্বতন্ত্র। আপনাদের শুভ উপস্থিতি তাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য, তাকে করেছে স্মরণীয়, তাকে করেছে মহিমান্বিত।

সূচনা

আজ আমাদের বিদ্যা-নিকেতনের দ্বাবিংশ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের, যাঁরা তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উৎসাহ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের, যাঁদের একনিষ্ঠ সাধনায় আজ এই প্রতিষ্ঠান বিশাল মহীরুহরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই আপনাদের, যাঁরা তাঁদের মহামূল্য সময় ব্যয় করে আজ আমাদের এই বার্ষিক উৎসবে উপস্থিত হয়ে উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

শ্রদ্ধা-নিবেদন

আমাদের আয়োজন সামান্য, আমাদের সামর্থ্যও অতি সীমিত; কিন্তু আমাদের আন্তরিকতার কোন ত্রুটি নেই। গভীর আন্তরিকতায় আমাদের ছাত্রবন্ধুরা দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসবের জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের সামনে এখনই উপস্থিত হবেন। তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করবেন আপনাদের আনন্দ দান করবার জন্যে। ত্রুটি হয়তো থাকবে; থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা আশা করবো, আপনাদের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে সেগুলি আপনাদের মার্জনা লাভে বঞ্চিত হবে না।

মার্জনা-প্রার্থনা

আমাদের সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য সীমিত। তাই অসীম ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা আপনাদের জন্যে বিশাল অনুষ্ঠান-সূচীর আয়োজন করতে পারিনি। তাই আমাদের অনুষ্ঠান-সূচী অনতিদীর্ঘ, কিন্তু তা একেবারে বৈচিত্র্যহীন নয়। সেদিক থেকে আমরা, আশা করি, সংগীত-আবৃত্তি-নাটকাভিনয়ের মধ্যস্থতায় আপনাদের একটি প্রকৃত বিচিত্রানুষ্ঠানের আনন্দ দান করতে সমর্থ হবো।

সাধ ও সাধ্য

পরিশেষে, আমাদের এই বিদ্যা-নিকেতনের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করে আপনারা যে গভীর সহযোগিতা এবং উদার সহৃদয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন, সেজন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা আমাদের যাত্রাপথের হোক অমূল্য পাথেয়। নমস্কার॥

উপসংহার

●কলেজের সামাজিক উৎসব

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ মিলন-মন্ত্র॥ বিশ্বজননীর পূজা॥ প্রার্থনা॥ উপসংহার॥

৬
শারদোৎসব

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত বুধমণ্ডলী,

বর্ষণক্ষান্ত মেঘ ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আকাশ নীল—গাঢ় নীল; বাতাস স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়। আকাশ আজ কী মহিমময়, বাতাস আজ কী স্পর্শকাতর! নিম্নে শস্যপ্রান্তরে শ্যামল শোভার অফুরন্ত বর্ণবাহার। রোদ্রের রং তরল সোনার মতো অপরূপ। পথে পথে শিউলি ফুলের অপূর্ব সমারোহ। আজ স্থলে জলে আর গগনে গগনে বেজে উঠছে এক আনন্দময় উৎসবের আগমনী। আমাদের অন্তরে-অন্তরেও এক আনন্দঘন উৎসবের কলতান।

সূচনা

এই উৎসব আমাদের শারদোৎসব। এই উৎসব বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এই উৎসবে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ—আমরা সকল বাঙালী একই উৎসব-আঙিনায় সমবেত হয়ে পরস্পরের সন্নিহিত হই। মর্ত্যে গৌরী শারদার আগমন-উপলক্ষে আমরা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্মিলিত হই। শারদোৎসব এইভাবে আমাদের যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের অবসান ঘটিয়ে আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মিলন-মন্ত্র রচনা করে দেয়, আমাদের যথার্থ বাঙালী করে।

মিলন-মন্ত্র

স্মরণীয় যে, শারদোৎসব কেবলমাত্র একটি সাধারণ পূজার উৎসবই নয়। পূজার উৎসবই যদি হয়, তবে এটি শরৎ-ঋতুর পূজা—বিশ্বপ্রকৃতির পূজা—জগজ্জননীর পূজা।

বিশ্বজননীর পূজা

সেই জগজ্জননীর পূজা উপলক্ষে আমরা বিশ্বজননীর সন্তান-সন্ততিরা দৈনন্দিন জীবন-যাপনের সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ, সমস্ত ব্যথা-বেদনা বিস্মৃত হয়ে জগজ্জননীর পূজা-মণ্ডপতলে সম্মিলিত হই।

আজ তাই শারদোৎসব উপলক্ষে ছোটবড় আমরা সবাই একত্র সমবেত হয়েছি। আজ শরতের উদার, প্রসন্ন রৌদ্রালোক আমাদের মনের অন্ধকার অন্তঃপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে

প্রার্থনা

যাক, আজ শরৎ-নিশীথের রজত-শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারা আমাদের অন্ধকার হৃদয়কে প্লাবিত করুক, শরতের প্রাণ-মাতানো স্নিগ্ধ শীতল বাতাস আজ আমাদের অনাবিল প্রীতির মন্ত্রে দীক্ষিত করুক।

শারদোৎসব আজ আমাদের সকল ভাইকে একত্র উপস্থিত করেছে, পরস্পরের মধ্যবর্তী ভেদ-প্রাচীরকে অপসারিত করে মিলনের উন্মুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে দিয়েছে। আজ অন্তরের

উপসংহার

যাবতীয় কলুষ, যাবতীয় গ্লানি মুছে ফেলে আমরা যদি পরস্পরের মধ্যে যথার্থ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তবেই সার্থক হবে আমাদের শারদোৎসব, সার্থক হবে বিশ্বজননীর এই পূজার আয়োজন ॥

●শারদ সম্মেলন

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ ভগবান বুদ্ধের সাধনা ॥ বুদ্ধের বাণী ॥ সাফল্য ॥ উপসংহার ॥

৭
বুদ্ধ-জয়ন্তী

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজ বুদ্ধ-জয়ন্তী। এই দিনটিতে ভগবান বুদ্ধ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে রক্তের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যে কপিলবাস্তু নগরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার, পৃথিবীতে অহিংসার

সূচনা

মহামন্ত্র প্রচারের অবসানে এই দিনটিতেই কুশীনগরে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন সেই মহামানব। সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মহামানব বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত এই দিনটি পরম পবিত্র।

জন্মসূত্রে রাজপুত্র হয়েও ভগবান বুদ্ধ রাজ্য-সিংহাসন, দারা-পুত্র-পরিবার এবং সকল প্রকার ভোগ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে যাত্রা করলেন ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে।

ভগবান বুদ্ধের সাধনা

ত্রিতাপ-দুঃখে জর্জরিত মানুষের মুক্তির সন্ধানে কপিলবাস্তুর রাজপুত্র নিরঞ্জনা নদীতীরে বোধিদ্রুম-তলে শুরু করলেন তাঁর জীবনের চরমতম সাধনা। পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দিকে দিকে কেটে গেল অন্ধকার। ভগবান বুদ্ধের মনেরও সমস্ত অন্ধকার গেল কেটে। সেখানেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সিদ্ধির অনির্বচনীয় আলো। সেদিনও ছিল এই পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা।

কাজেই, বুদ্ধ-পূর্ণিমা ত্রিবিধ মহিমায় মহিমান্বিত : ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, তিরোধান এবং জ্যোতির্ময় সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল এই অমল আলোকিত দিনটিতেই। তাছাড়া, এই দিনটিতেই তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর আলোকিত ধর্মমত। এই দিনটিতেই তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন দুঃখজয়ের মন্ত্র, মৃত্যুজয়ের মন্ত্র। পৃথিবীর দুঃখজর্জর, মৃত্যুশাসিত মানুষ সেদিন পেয়েছিল নবজীবনের আশ্বাস; ব্যথা-বেদনার পরপারে সে খুঁজে পেল জীবনের জ্যোতির্ময় উপকূল।

বুদ্ধের বাণী

বলদর্পীর অত্যাচারে নিগৃহীত মানবগোষ্ঠীকে তিনি অপমানের ধূলিশয্যা থেকে উদ্ধার করে মানবতার সিংহাসনে করলেন প্রতিষ্ঠিত। দিকে দিকে শুরু হয়ে গেল মানবতার পূজার আয়োজন। দেখতে দেখতে সেই পূজার আয়োজনে যোগ দিলেন উচ্চবর্ণের মানুষেরাও। পৃথিবীর রুধিরসিক্ত তরবারি কোষবদ্ধ হলো। অর্থহীন জীব-রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষা পেল জীবধাত্রী বসুধা।

সাফল্য

ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে সূচনা করেছিলেন এক নতুনতর অধ্যায়। আজ মানুষ ভগবান তথাগতের বাণী বিস্মৃত হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীতে ভগবান তথাগতের বাণীই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের আজকের প্রার্থনা তাই—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি ॥

উপসংহার

●ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ মিলনের দিন ॥ পৌরাণিক তাৎপর্য ॥ হারিয়ে-ফিরে-পাওয়া ॥ উপসংহার ॥

৮
বিজয়া-সম্মেলনী

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

প্রতি বছর বিজয়া-সম্মেলনী উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত হই। আমাদের জাতীয় উৎসব আজ সমাপ্ত। সসম্মানে জগজ্জননীর প্রতিমা-নিরঞ্জন সমাধা হয়েছে। মৃন্ময়ী দেবীবিগ্রহ বিসর্জিত হয়েছেন। সেই মৃন্ময়ী দেবীকে আমরা চিন্ময়ী করে নিতে পেরেছি কিনা, আজ তা আমাদের চিন্তার দিন। মৃন্ময়ী দেবীকে বিসর্জন দিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে আমরা চিন্ময়ী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি কিনা, আজ তা আমাদের উপলব্ধির দিন।

সূচনা

আমাদের সামনে পূজার শূন্য-বেদী। উৎসবের কোলাহল আজ স্তব্ধ, উৎসবের আনন্দ আজ বিসর্জনের বিষাদে রূপান্তরিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজয়া-সম্মেলনীর সার্থকতা কোথায়? এর সার্থকতা হলো আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলনের মধ্যে। কাজেই, বিজয়া-সম্মেলনী বিষাদের উৎসব নয়, মিলনের উৎসব। বিজয়া-সম্মেলনী তাই আমাদের প্রীতি-বিনিময়ের দিন, সৌহার্দ্য-বিনিময়ের দিন।

মিলনের দিন

বিজয়া-উৎসবের একটি পৌরাণিক তাৎপর্যও আছে। অকালবোধনের দ্বারা অস্ত্র লাভ করে রামচন্দ্র লঙ্কার রাক্ষস-বংশ নির্মূল করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। এই জয়লাভের পর যে বিজয়-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমান বিজয়া-উৎসব তারই অনুবর্তন। মানুষের পৃথিবীতে অন্যায়ের বিনাশ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই তাই আমাদের এই উৎসবের ভিত্তিভূমি।

পৌরাণিক তাৎপর্য

যে গৌরী-শারদাকে ধরা-জননীর কোল থেকে নিয়ে যায়, সে-ই আবার তাঁকে আমাদের কুটির-দ্বারে প্রতি বছর ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যে নিয়ে যায়, সে-ই আবার ফিরিয়ে আনে। তাই জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দই হলো, এই হারিয়ে-ফিরে-পাওয়ার আনন্দ। সেইজন্যে বিজয়া-সম্মেলনী, হারিয়ে ফিরে-পাওয়ার আনন্দেই পূর্ণ। আমাদের অন্তরেও পৌঁছে সেই আনন্দের বাণী। এই উপলক্ষে মৃন্ময়ী দেবী-বিগ্রহকে হারিয়ে আমরা যেমন অন্তরে চিন্ময়ী দেবী-বিগ্রহকে পাই, তেমনি বিভেদকে হারিয়ে আমরা অন্তরে পাই সম্প্রীতি, সৌভ্রাত্র এবং ঐক্যকে।

হারিয়ে-ফিরে-পাওয়া

তাছাড়াও, বিজয়া-সম্মেলনীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। শরৎ-ঋতু এবং শারদীয় উৎসব আমাদের কর্মক্লান্ত জীবনে ছুটির আমন্ত্রণ নিয়ে আসে। শারদীয় উৎসবের অবসানে সেই ছুটিও তার প্রান্তসীমায় এসে উপনীত হয়। এবার আসে কর্মের আহ্বান, আসে কর্মক্ষেত্রের আহ্বান। পেছনে পড়ে রইলো উৎসবের অনাবিল স্মৃতি, শূন্য পূজামণ্ডপ এবং ঝরা-শিউলির ছিন্ন-মালা। সব ফেলে রেখেই আমাদের কর্মক্ষেত্রের দিকে পা বাড়াতে হয়। বিজয়া-সম্মেলনী আমাদের সেই কর্মক্ষেত্রে যাত্রার প্রাক্কালে মিলন-উৎসব। আগামী কর্মক্লান্ত দিনগুলিতে আজকের এই বিজয়া-সম্মেলনীর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকুক॥

উপসংহার

●বিদায়-উৎসব

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ পথভ্রান্ত পৃথিবী ॥ ভগবান যীশুর বাণী ॥ যীশুর সফলতা ॥ উপসংহার ॥

৯
বড়দিন

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আজ বড়দিন। আজ ঈশ্বরের বরপুত্র মহাত্মা যীশু খ্রীস্টের শুভ আবির্ভাব-দিবস। এমন দিনে দরিদ্র পিতামাতার কুটিরে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন জগতের পাপ-মোচনের জন্যে। আজ তাই পৃথিবীর ঘরে ঘরে এই মহাপ্রেমিকের শুভ জন্মলগ্ন-উদ্‌যাপনের জন্যে আয়োজনের অন্ত নেই। পৃথিবীর ঘরে ঘরে আজ তাই অপরূপ আলোকসজ্জা, গির্জায় গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি—'এলো মহাজন্মের লগ্ন—আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।'

সূচনা

সে সময়ে সারা পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। নানা অনাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত মানুষ বিস্মৃত হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের অমল মহিমা। নানা কলুষ, পাপ ও গ্লানি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছিল দিকে দিকে। দিশাহারা মানুষ স্বর্গের ঠিকানা হারিয়ে কেঁদে ফিরছিল মর্ত্যের সীমাহীন অন্ধকারে। তাদের সমবেত কান্নায় ভরে উঠেছিল সেদিনের বিশ্বের আকাশ-বাতাস।

পথভ্রান্ত পৃথিবী

মানব-সভ্যতার এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে আবির্ভূত হলেন মহামানব যীশু। তিনি প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন পৃথিবীর প্রেমহীন মানুষকে। অপমানের ধূলিতল থেকে তুলে এনে তাকে মনুষ্যত্বের সিংহাসনে করলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে শোনালেন অহিংসার বাণী। মানুষের দেহই ঈশ্বরের দেব-মন্দির। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। অতএব মানুষকে ভালোবাসো, সেবা করো। তাহলে তোমার সম্মুখে স্বর্গের দরোজা খুলে যাবে।

ভগবান
যীশুর বাণী

এইভাবে নবজীবনের মন্ত্রে বিশ্বমানবকে দীক্ষিত করে মহাত্মা যীশু অজ্ঞানান্ধ মানুষকে দেখালেন নতুন পথ, প্রকৃত মুক্তির পথ—তাদের সামনে তুলে ধরলেন যথার্থ জ্ঞানের আলো। যারা পথহারা, তারা খুঁজে পেল প্রকৃত পথের সন্ধান ; যারা আর্ত, পীড়িত, বেদনাতুর, তাদের তিনি দিলেন অনাবিল সান্ত্বনা। পৃথিবীর বুক থেকে রক্তপাতের কলঙ্কচিহ্ন তিনি মুছিয়ে দিলেন। মানুষকে দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত করে পৃথিবীর সমস্ত পাপ হরণ করে স্বয়ং ক্রুশ-কাষ্ঠফলকে প্রাণ দিয়ে পৃথিবীকে শুচি, শুদ্ধ করে গেলেন॥

যীশুর সফলতা
ও
উপসংহার

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ প্রজাতন্ত্র-দিবসের তাৎপর্য ॥ ভারতীয় সংবিধান ॥ উপসংহার ॥

১০
প্রজাতন্ত্র-দিবস

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আজ ২৬শে জানুয়ারী—ভারতের পরম পবিত্র প্রজাতন্ত্র-দিবস। ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট ভারত তার দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী সে লাভ করে তার চির-আকাঙ্ক্ষিত গণপ্রজাতন্ত্র। এই দিনটিতেই ভারতে তার বহু-বাঞ্ছিত গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ভিত্তি হিসেবে এই দিনটিতেই ভারতে চালু হয় তার সুচিন্তিত, সুরচিত সংবিধান, যা ভারতবাসীর জীবনে শুধু পবিত্রই নয়, তার গণতান্ত্রিক অধিকার-সংরক্ষণের রক্ষাকবচও বটে।

সূচনা

সেই দিন থেকে যথোচিত শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা সহকারে এই দিনটি প্রতিপালিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা লাভ করলেই শুধু হয় না, তাকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা চাই এবং উপযুক্ত নিরাপত্তা সহকারে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা চাই। ছাব্বিশে জানুয়ারী প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং তার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি বহন করে নিয়ে এসেছিল। প্রজাতন্ত্র-দিবসের পুণ্য বাসরে ভারতের যে সংবিধান চালু হয়, তাতে রয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের

প্রজাতন্ত্র-দিবসের
তাৎপর্য

সুদৃঢ় আশ্বাস, প্রতিটি ভারতবাসীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের সোচ্চার প্রতিশ্রুতি।

এই পবিত্রতম দিনটিকে ভারতবাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ভারতের সাধনার অন্ত ছিল না। এই দিনটিকে আনবার জন্যে কত শহীদ বুকের রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। কত বীরের রক্তস্রোতে এবং কত মাতার অশ্রুধারায় অবগাহন করে এই ছাব্বিশে জানুয়ারী সেদিন আমাদের দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিল। এর আবির্ভাবের পেছনে আছে কত দুঃখসহন, কৃচ্ছ্র-সাধনের অবর্ণনীয় ইতিহাস।

ভারতীয় সংবিধান

তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি-স্বরূপ, আমরা লাভ করেছি ছাব্বিশে জানুয়ারীর অমূল্য উপহার—আমাদের সংবিধান। এই সংবিধান রচনায় বিশ্বের নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার ক্রমবিবর্তিত রূপের সঙ্গে ভারতীয় জীবনদর্শন, তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তার অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘটেছে নির্ভুল প্রতিফলন। কাজেই, ভারতের সংবিধান ভারতের জীবনদর্শন ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

সেদিক দিয়ে প্রজাতন্ত্র-দিবস ভারতবাসীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে তার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি ভারতবাসীর সদাজাগ্রত সৈনিকের ভূমিকা।

উপসংহার

কোথাও যেন তার মর্যাদাহানি না হয়, কোথাও যেন তার আদর্শচ্যুতি না ঘটে, এবং আমাদের সমস্ত কর্ম-পদ্ধতি যেন তার আনুপাতিক হয়, প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র-দিবস আমাদের তাই স্মরণ করিয়ে দিতে ফিরে ফিরে আসে। ভারতের গণপ্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক ॥

- ভারতের গণপ্রজাতন্ত্র
- ভারতের সংবিধান

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনা ॥ ভারতের দুর্ভাগ্য ॥ উপসংহার ॥

১১. তেইশে জানুয়ারী

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আজ তেইশে জানুয়ারী। আমাদের পরম প্রিয় নেতাজীর শুভ জন্মদিবস। দেশ-মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্যে তিনি এই দিনটিতে ভারতের মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শুভ জন্মক্ষণে তিনি যে প্রথম বিদ্রোহ উচ্চারণ করেছিলেন, কে বলতে পারে, তাতে তাঁর 'দিল্লী চলো' আহ্বান ধ্বনিত হয়নি?

সূচনা

শিশু সুভাষচন্দ্রের মুষ্টিবদ্ধ হাতে কে বলতে পারে, ভারতের চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আবদ্ধ ছিল না? সুভাষচন্দ্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার নবজন্ম হলো।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ত্যাগে গৈরিক, স্বদেশপ্রেমে সমুজ্জ্বল এবং দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচনে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বিদ্রোহের এই অগ্নিপুরুষকে কারা-প্রাচীরের বাইরে বেশীদিন মুক্ত রাখতে সাহস পায়নি। তবু তিনি সদা-জাগ্রত ব্রিটিশ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে স্বদেশের বন্ধন-মোচনের জন্যে একটি প্রচণ্ড আগ্নেয় ঝড়ের মতো ছুটে গেছেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। কাবুল—বার্লিন—সিঙ্গাপুর! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিপন্ন ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বশেষ চরমতম আঘাত হানবার জন্যে তিনি গ্রহণ করলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব। ১৯৪৪ সাল। তিনি একযোগে ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের ওপর। ভারতের আকাশে তিনি উড়িয়ে দিলেন মুক্তির নিশান। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শ্লোগান ছিল সেদিন—'দিল্লী চলো'।

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনা

কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, তার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অমর সৈনিক, পরম প্রিয় নেতাজী তার ঘরের দ্বারপ্রান্তে এসে ডাক দিয়ে ব্যর্থ মনস্কামনা নিয়ে ফিরে চলে গেলেন, তবু তার ঘুম ভাঙলো না। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য, সেদিন সে তার এই মহান্ নেতার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। সেদিন বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লবের প্রবল প্রতি-ক্রিয়ায় ভারতের নেতৃবৃন্দ কারাগারের অন্তরালে বন্দী; অন্যদিকে, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত সমগ্র ভারতবর্ষ জীবন্মৃত। তার ওপর নেতাজীর ভারত-আক্রমণকে, নানাভাবে ভুল ভাষ্য দিয়ে বিকৃতভাবে জনমানসে প্রচার করা হয়।

ভারতের দুর্ভাগ্য

নেতাজীকে তাই ব্যর্থতার বেদনা নিয়ে ভারত-সীমান্ত থেকে ফিরে চলে যেতে হয়। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাসে নেতাজীর কোন অবদান নেই,—এই ধারণা এবং ভুল ধারণা নেতাজীর প্রতি কেবল অকৃতজ্ঞতার পরিচায়কই নয়, নেতাজীর প্রতি এক ধরনের চরম বিশ্বাসঘাতকতা। নেতাজীর ভারত-আক্রমণ সেদিন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়—একথা কে অস্বীকার করবে? হয়তো সেই কারণেই তেইশে জানুয়ারী ভারতবাসীর জীবনে ফিরে ফিরে আসবে, কিন্তু নেতাজী আর কোনদিন ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন না॥

উপসংহার

- নেতাজীর জন্মদিবস
- ভারতের স্বাধীনতা ও সুভাষচন্দ্র

১২.
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর বিদায়-সংবর্ধনা

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ ত্যাগসুন্দর রূপ ॥ জ্ঞানগম্ভীর রূপ ॥ সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব ॥ জন-কল্যাণ ব্রত ॥ অপরূপ চরিত্র-সুষমা ॥ উপসংহার ॥

উ. মা. '৭৮

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, বিদায়ী অধ্যক্ষ এবং সমাগত সুধীবৃন্দ,

সম্ভাষণ

আজ আমাদের কলেজ-জীবনের পরম বেদনার দিন, গভীর দুঃখের দিন। যিনি আমাদের এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছিলেন প্রাণস্বরূপ, যাঁর কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস সাধনায় আমাদের শিক্ষা-নিকেতন দেশের শিক্ষাজগতে সগৌরবে খ্যাতি ও মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যিনি ছিলেন একাধারে ছাত্র-দরদী এবং শিক্ষা-দরদী, যাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যে এবং গভীর সংবেদনশীলতায় আমরা প্রতিনিয়ত মুগ্ধ, বিস্মিত এবং আপ্লুত হয়েছি, আজ আমাদের সেই পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের বিদায়-গ্রহণের দিন। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তাঁকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা, হৃদয়ের ভক্তি এবং চোখের জল দিয়ে বিদায় জানাতে।

সূচনা

আজ আমাদের শিক্ষা-নিকেতন যে দুর্লভ খ্যাতি ও সুনামের গৌরবে গৌরবান্বিত, তার মূলে ছিল আমাদের সর্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের সুদীর্ঘ কুড়ি বছরের নিরলস সাধনা। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সার্বিক বিকাশের জন্যে তিনি তিল তিল করে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর সীমাহীন ত্যাগ এবং অকুণ্ঠ পরিশ্রমের পরিণামে আমাদের বিদ্যা-নিকেতনের বর্তমান গৌরবময় উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

ত্যাগ-সুন্দর রূপ

প্রাচীন ভারতের ঋষিদের আমরা চাক্ষুষ দেখিনি। কাব্য-কাহিনীতে তাঁদের ত্যাগশুভ্র জীবনকথা পাঠ করেছি কিংবা গল্পকাহিনীতে শুনেছি। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি এক ঋষিকল্প পুরুষের ত্যাগসুন্দর, আত্ম-নিবেদিত রূপ। এমন নিরহংকার, অনাড়ম্বর, শুভ্রসমুজ্জ্বল জীবন, যা কর্মে মহান্, জ্ঞানে সুগভীর, ত্যাগে মহিমময়—বর্তমান কালে সত্যিই দুর্লভ। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাগুরুকে তীর্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমরা আমাদের পরমপ্রিয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের মধ্যে এক পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রই অনুভব করেছি, যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র—সকল ছাত্রই সমান—তাঁর ধ্যানগম্ভীর সৌম্য-সুন্দর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ধন্য হয়েছি, তাঁর সংবেদনশীল উজ্জ্বল সান্নিধ্যে কৃতার্থ হয়েছি। বস্তুতঃ, তাঁর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই, আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

জ্ঞানগম্ভীর রূপ

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি তাঁর অতলান্ত প্রজ্ঞা। তাঁর অমল সান্নিধ্যে এসে আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাঁর জ্ঞানগম্ভীর রূপে মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। সেই জ্ঞান কোন একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা বিষয়ের মধ্যে তাঁকে অবাধে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখেছি, দেখেছি তাঁর জ্ঞান-সমাহিত, অচঞ্চল রূপ। জ্ঞানের শূন্যপাত্র হাতে নিয়ে যখনই আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ক্ষণে ক্ষণে তা পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর অযাচিত দানে। অথচ এক সৌম্যসুন্দর বিনয় তাঁর

ব্যক্তিত্বকে সব সময় ঘিরে থাকতো। এই নিরহংকার জ্ঞান-তপস্বীর বিদায়-গ্রহণে আমরা সকলে মর্মাহত—বেদনায় বিহ্বল। তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণপাশে আমরা বন্দী।

ছাত্র-সমাজের সমস্যা অনেক। তাদের যেমন ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, তেমনি আছে সমষ্টিগত সমস্যা। কিন্তু যে-কোন সমস্যা নিয়ে ছাত্ররা এই মহান্ শিক্ষাব্রতীর সান্নিধ্যে গেছে, তারা ব্যর্থমনস্কাম হয়ে ফিরে আসেনি, তারা তাঁর স্নেহময় সমবেদনা ও সহানুভূতি পেয়েছে, পেয়েছে সুচিন্তিত উপদেশ। স্বল্পকালের মধ্যে তাদের সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গেছে। তাতে কত আশ্রয়হীন পেয়েছে আশ্রয়, কত দরিদ্র ছাত্র পেয়েছে পুস্তক, বেতনের ছাড়, কত অসুস্থ, রুগ্ণ ছাত্র পেয়েছে চিকিৎসার সুব্যবস্থা। এইভাবে সমগ্র ছাত্র-সমাজের হৃদয়কে তিনি স্নেহ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, সর্বোপরি মানবিকতার কোমল স্পর্শ দিয়ে জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্র-সমাজের সুযোগ্য শিক্ষক, স্নেহময় অভিভাবক এবং সংবেদনশীল দরদী ব্যক্তিত্ব। আজ তাঁর অবসর-গ্রহণে তাদের জীবনে যে বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা কোনদিন পূরণ হবার নয়।

সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব

এই শিক্ষা-নিকেতনের চার দেয়ালের মধ্যেই তাঁর কর্ম-জগৎ সীমাবদ্ধ ছিল না। এই শিক্ষা-নিকেতনের বাহিরে যে বিশাল জনসমাজ, সেখানেও তাঁর কর্মময় জীবন প্রসারিত হয়েছে। এতদঞ্চলের নানা উন্নয়নমূলক কাজে, নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি তো যুক্ত ছিলেনই। তাছাড়া, যখনই প্রয়োজন হয়েছে কিংবা আর্ত, পীড়িত, অসহায় মানবতার সেবার ডাক এসেছে, তিনি তাতে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষে যখনই এতদঞ্চলের জনগণের দুঃখবেদনা চরম আকার ধারণ করেছে, তখন তিনি তাঁর সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং তাঁর ছাত্র-সমাজকে মহান্ জনকল্যাণব্রতে দীক্ষিত করেছেন। তাঁর বিদায়-গ্রহণে এতদঞ্চলের প্রতিটি মানুষ আজ বেদনায় অশ্রুভারানত।

জনকল্যাণ ব্রত

তাঁর কাছ থেকে আমরা নানা উপলক্ষে, নানা ঘটনায় 'যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।' কিন্তু সবার ওপরে যা পেয়েছি, যাতে আমরা আমাদের ছাত্র-জীবনে সমৃদ্ধ হয়েছি, তা হলো তাঁর অনাবিল চরিত্র-গৌরব, অপরূপ চরিত্র-সুষমা। যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না, যা বর্তমান নীতিভ্রষ্ট সমাজে একান্ত দুর্লভ। চরিত্রের যে অমূল্য ঐশ্বর্য তিনি তাঁর ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপন করে গেলেন, তা কোনদিন ব্যর্থ হবার নয়। বিদায়ের মুহূর্তে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে যান, আমরা যেন তাঁর সেই অতুলনীয় চরিত্র-সম্পদের সুযোগ্য উত্তরাধিকার লাভ করে ধন্য হতে পারি।

অপরূপ চরিত্র-সুষমা

আলোর অতি-ঔজ্জ্বল্য কিংবা অতিরিক্ত সান্নিধ্য অনেক সময় দৃষ্টিশক্তিকে বিভ্রান্ত করে, গুণীর পূর্ণ পরিচয় লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এই মহান্ শিক্ষাব্রতীর উজ্জ্বল গুণাবলী আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারিনি। হয়তো সেজন্যে কত ভুল করেছি আমরা, অজ্ঞাতসারে করেছি কত অপরাধ। বিদায়ের মুহূর্তে তিনি যেন সেই সব দোষ-অপরাধগুলিকে মার্জনা করে যান। এবং

উপসংহার

আশীর্বাদ করে যান, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারি, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি॥

- কোন শিক্ষক বা অধ্যাপকের বিদায়-সংবর্ধনা
- কোন উচ্চপদস্থ অফিসারের বদলি উপলক্ষে বিদায়-সংবর্ধনা
- কোন বন্ধুর বিদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে বিদায়-সংবর্ধনা

১৩. সমাজ-সেবায় ছাত্রদের ভূমিকা

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ। সূচনা। সামাজিক অগ্রসরণের স্বার্থে। দুঃস্থ-ত্রাণে। সামাজিক ঋণ-শোধ। উপসংহার।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

সমাজের সর্বাপেক্ষা সতেজতম, সজীবতম অংশ হলো ছাত্র-সমাজ। তাদের চক্ষে জ্ঞানের মশাল, তাদের হৃদয়ে উদ্বেল ভাবাবেগ এবং বাহুতে নবীন বল। তারাই যুগে-যুগে দেশে-দেশে সমস্ত অসাধ্য সাধনার রূপকার। সমাজ বা রাষ্ট্রের অগ্রগামী সৈন্যদল তারাই।

সূচনা

সবার আগে যে-কোন বিষয়ে ঘুম ভাঙে তাদেরই। সবার আগে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে তাদেরই তো ডাক পড়ে। সমাজ যেখানে নানা কুসংস্কারের জগদ্দল পাষাণ বুকে নিয়ে অচলায়তনে পরিণত কিংবা নানা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে সমাজ যেখানে বিপর্যস্ত, সেখানে সবার আগে ডাক আসে ছাত্র-সমাজেরই।

অথচ সর্বদেশে সর্বকালে ছাত্র-সমাজ চির-নিন্দিত। তারা গৃহে ধিক্কারের পাত্র, স্কুল-কলেজে তিরস্কারের পাত্র এবং সমাজে উপেক্ষার পাত্র। অথচ, 'দারুণ উপপ্লবের দিনে' তারাই যায় এগিয়ে, সমাজের সংকট-ত্রাণের জন্যে সর্বাগ্রে তারাই প্রাণ দান করে শহীদ

সামাজিক অগ্রসরণের স্বার্থে

হয়। সমাজের দুঃখ-মোচনের জন্যে যখন কোন নতুন আদর্শের আহ্বান আসে, যখন সমাজের জড়ত্বের অভিশাপ ছিন্ন করে অগ্রসরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর ছাত্র-সমাজই যায় এগিয়ে। সমাজের সেবায় তারা চির-উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, চিরকালের জন্যে বহুজনহিতায় তারা বলি-প্রদত্ত।

আবার, কোন প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে যখন জনজীবনে ঘনিয়ে আসে দুঃখ-দুর্গতির অমারাত্রি, যখন রোগ-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণায় মানুষের জীবন হয় সংকটাপন্ন, যখন মৃত্যুর ভৈরব উৎসবে সমাজ-জীবনের ওঠে নাভিশ্বাস, তখন ছাত্র-সমাজ জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে

দুঃস্থ-ত্রাণে

যায় সংকট-পরিধির মধ্যে, নিজেদের তিলে তিলে দান করে তারা রাখে দুঃস্থত্রাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। পথে পথে ভিক্ষা করে কিংবা সারাদিন রিক্শা চালিয়ে কিংবা জুতো পালিশ করে তারা সমাজ-সেবায় স্থাপন করে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত।

সমাজের এই সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত অংশকে সামাজিক নেতৃত্ব সমাজ-সেবার নব-নব পরিকল্পনার রূপায়ণে কোনকালেই উদ্বুদ্ধ করেনি। তারা যা করে, তা স্বেচ্ছাকৃতভাবেই করে থাকে। অথচ ছাত্র-সমাজের স্বার্থে সমাজকে তার বিশাল শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে প্রভূত অর্থ-ব্যয় করতে হয়। সেই অর্থ সামাজিক অর্থ। এই অর্থ-ব্যয়ের জন্যে ছাত্র-সমাজ সমাজের কাছে ঋণী। কাজেই, কেবল বিধিনিষেধের জটাজালে ছাত্র-সমাজকে বন্দী না রেখে তাদের সেই ঋণশোধের জন্যে অনুপ্রাণিত করা উচিত।

সামাজিক ঋণ-শোধ

কেবল আর্ত-ত্রাণের জন্যেই নয়, নিরক্ষরতা-দূরীকরণে একটি সুপরিকল্পিত কর্ম-সূচীর রূপায়ণে ছাত্র-সমাজকে বছরে অন্ততঃ কয়েক সপ্তাহের জন্যেও বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করলে ছাত্র-সমাজের দায়িত্ববোধের উন্মেষ হবে এবং সমাজও ছাত্র-সমাজকে তাদের এই নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে আশীর্বাদ করবে। মানবতা ও দেশের সেবার মধ্যে ছাত্র-সমাজ খুঁজে পাবে তাদের জীবনের চরম সার্থকতা ॥

উপসংহার

● ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য
● নিরক্ষরতা-দূরীকরণে ছাত্র-সমাজ

১৪.

সমাজ-সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন ॥ শিক্ষা-বিস্তার ॥ সামাজিক সদাচার ॥ উপসংহার ॥

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত সুধীবৃন্দ,

যখন করুণাসাগর বিদ্যাসাগর তাঁর অফুরন্ত করুণার ভাণ্ডার নিয়ে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন আমাদের সমাজ ছিল নানা কু-সংস্কারের অন্ধকারে নিমগ্ন। ইতিপূর্বে রামমোহনের প্রচেষ্টায় সতীদাহ বে-আইনী ঘোষিত হলেও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত ছিল বহুবিধ অনাচার ও অবিচার, বহুবিধ পাপ ও পঙ্কিলতা এবং বহুবিধ কদর্যতা ও অন্ধকার। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেও বিদ্যাসাগর তাঁর অসাধারণ ক্ষমতাবলে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সব অবিচার ও অনাচার এবং পাপ ও পঙ্কিলতার উৎস কোথায়।

সূচনা

বিদ্যাসাগর তাঁর আত্ম-জীবনীতে স্বীকার করেছেন, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। বাস্তবিকই, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন-প্রহরে রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে বিধবা-বিবাহের মতো এমন একটি মৌলিক সংস্কার-সাধন নিঃসন্দেহে ছিল একটি দুরূহ কাজ। এতে বিদ্যাসাগর বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন তো হয়েছিলেনই ; বহু নিন্দা-তিরস্কার এবং বহু কঠিন আঘাত তাঁকে বুক পেতে সহ্য করতে হয়েছিল। বিধবা-বিবাহের প্রবর্তনে তিনি শুধু ঋণগ্রস্তই হননি, তাঁর জীবনও তাতে বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু নির্ভীক বিদ্যাসাগর সমস্ত নিন্দা-তিরস্কার ও বাধা-

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন

বিঘ্ন তুচ্ছ জ্ঞান করে সমাজের রূপান্তর আনবার জন্যে জীবন-পণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সংগ্রাম কেবল সেকালের পক্ষেই নয়, একালের পক্ষেও অকল্পনীয়।

তাছাড়া, অসামান্য ক্ষমতাবলে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন, সমস্ত সামাজিক অনাচার-অবিচার এবং পাপ-পঙ্কিলতার মূল হলো অশিক্ষা। তাই শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে তিনি সূচনা করলেন তাঁর দ্বিতীয় সংগ্রাম। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়-পাঠ্য উপযুক্ত পুস্তক রচনা এবং মেট্রোপলিটন কলেজ-প্রতিষ্ঠা তাঁর এই সংগ্রামের অঙ্গ।

শিক্ষা-বিস্তার

অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকিরণের সাহায্যে তিনি তাদের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর জগতে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর সেই সংগ্রামে ইংরেজ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি সরকারী কর্মে ইস্তফা দিলেও অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে তিনি জীবনে কখনো বিরত হননি। এখানেই তাঁর জয়।

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সংগ্রাম, শিক্ষার মধ্যস্থতায় মানুষের মনে সামাজিক নীতিবোধের জাগরণের প্রয়াস। তাঁর 'বর্ণপরিচয়ে' বর্ণিত রাখাল যেমন সুনীতির প্রতীক, তেমনি বেণী

সামাজিক সদাচার

নামক বালকের পরিণতি সামাজিক দুর্নীতিপূর্ণ পরিবেশের প্রতি উচ্চারিত ধিক্কার। তাছাড়া, তাঁর 'কথামালা'র গল্পগুলি একদিকে যেমন মানব-চরিত্রের সমালোচনা, অন্যদিকে তেমনি সামাজিকসদাচারের প্রতি পথ-নির্দেশ।

এইভাবে আজীবন সংগ্রামী বিদ্যাসাগর তাঁর ত্রিবিধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ-সংস্কারের ব্রতকে সফলতা দান করে যান। এই ব্রত-পালনের মধ্য দিয়ে তিনি যে সর্ব-

উপসংহার

সংস্কারমুক্ত, পরিচ্ছন্ন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজও রচিত হয়নি। সেদিক থেকে আমরা বিদ্যাসাগরকে আজও মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি—এই আত্ম-ধিক্কারের হাত থেকে আমাদের নিষ্কৃতি নেই॥

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর উত্তরাধিকার
- বিদ্যাসাগর ও বাঙালী-সমাজ

১৫. জাতি-গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা॥ বলিষ্ঠ জাতি-গঠন॥ উপসংহার॥

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

যখন পরাধীনতার অন্ধকারে সমগ্র জাতি অজগর-নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন এই মোহগ্রস্ত আত্মবিস্মৃত আদর্শভ্রষ্ট জাতিকে জাগিয়ে যিনি তার মধ্যে পুনরায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন,

সূচনা

তিনি বীর-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি সমগ্র জাতিকে আহ্বান করে বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' ; তিনি উদাত্ত কণ্ঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে ডেকে বললেন, 'Get up, O Lions, and shake off the delusion that you are sheep.' সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে

যেন নতুন ভাবে, নতুন প্রাণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে উঠলো ; খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, নানা ভ্রান্তি-বিলাসে মগ্ন ভারতবর্ষ সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়ালো।

সেদিন আদর্শভ্রষ্ট ভারতবর্ষে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল নানা ভেদবুদ্ধি। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ সমগ্র জাতির বনিয়াদকে দুর্বল ও শিথিল করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্রূপের কশাঘাত হেনে বললেন, 'আমরা হিন্দুও নই, বৈদান্তিকও নই ; আমরা সব ছুঁৎমার্গগামীর দল। আমাদের মন্দির হচ্ছে রান্নাঘর, আমাদের দেবতা হচ্ছে ভাতের হাঁড়ি এবং ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—এই হচ্ছে আমাদের বেদমন্ত্র।' এই ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতা বর্জন করে সুস্থ সাবলীল জাতি-গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষকে আহ্বান করে বললেন, 'হে ভারত, ভুলিওনা, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী……তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা

সেই ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্যস্থতায় বলিষ্ঠ জাতি-গঠনই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সফলতার জন্যে তিনি সমস্ত প্রকার ভীরুতা ও দুর্বলতা পরিহার করে নবচেতনার মন্ত্রে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার জন্যে তিনি আহ্বান করলেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' অতএব দুর্বলতা, কাপুরুষতা পরিহার করে আত্মশক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। শুধু গীতা-পাঠের দ্বারা নয়, ফুটবল-খেলার মধ্য দিয়েও আমরা স্বর্গের নিকটবর্তী হতে পারবো। নিজের মুক্তির জন্যে ধ্যান কিংবা তপস্যার সাধনা নয়, সেবার মাধ্যমে মানুষের দুঃখমোচনই হোক জীবনের তপস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে সেই মন্ত্রেই দীক্ষিত করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাই ক্ষুধার্তের কাছে ধর্মের বাণী নিবেদন করতে নিষেধ করে বললেন, যে পর্যন্ত ভারতের একজন মানুষও ক্ষুধার্ত থাকবে, ততদিন তিনি মুক্তি চান না। এবং জীব-সেবার মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হবার জন্যে ডাক দিলেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

বলিষ্ঠ জাতি-গঠন

এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ভেদ-বৈষম্যহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন, বলিষ্ঠ জাতি-গঠনের সাধনা করে গিয়েছেন। তাঁর গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন যথার্থ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় নিয়ে সংগঠিত। এই সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে ভারতবর্ষে ত্যাগের আদর্শ, সেবার আদর্শ, এবং বলিষ্ঠ জাতি-গঠনের আদর্শকে সর্বোচ্চে স্থাপন করে স্বামী বিবেকানন্দের বীর-বাণীকে মূর্ত করে তুলেছে। মানুষের জীবনে, জাতির জীবনে সবচেয়ে দুর্বিষহ অভিশাপ হলো পরাধীনতার অভিশাপ। সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকবার জন্যে চাই বলিষ্ঠ চরিত্র বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং বলিষ্ঠ কর্মোদ্দীপনা। স্বামী বিবেকানন্দের সেই সর্ববন্ধনমুক্ত সমাজের আদর্শ বর্তমান ভারতের জাতীয় আদর্শ হোক।

উপসংহার

- ভারত ও স্বামী বিবেকানন্দ
- স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-সাধনা

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ গ্রন্থাগার সভ্যতার আলোক-তীর্থ ॥ চিরন্তন জিজ্ঞাসার তৃপ্তি-সাধন ॥ সীমিত জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ॥ উপসংহার ॥

১৬. গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, প্রধান অতিথি এবং ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

আজ আমাদের এ-অঞ্চলের বড়ো আনন্দের দিন। আজ এতদিন পরে এ-অঞ্চলের একটি দীর্ঘস্থায়ী অভাব দূর হলো। মানুষ কেবলমাত্র রুটিতে বাঁচতে পারে না। দেহের ওপরে আছে তার মন। কাজেই, শুধু দেহের ক্ষুধার, তার উদরের ক্ষুধার পরিতৃপ্তিই যথেষ্ট নয়, তার মনের ক্ষুধারও পরিতৃপ্তি চাই। গ্রন্থপাঠ তার সেই মনের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে এবং গ্রন্থাগার তার সেই মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রধান সহায়। দুঃখের বিষয়, এতদিন এ-অঞ্চলে কোন গ্রন্থাগার ছিল না, এতদঞ্চলের মানুষের মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির কোন আয়োজন ছিল না। সেদিক থেকে আমাদের এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

সূচনা

গ্রন্থ তো কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ গ্রন্থই নয়, গ্রন্থের মধ্যে নিহিত থাকে এক অবিশ্বাস্য আলো। কোন গ্রন্থকার যখন তাঁর আত্মার গভীরে পান কোন নতুন আলোর সন্ধান, তখনই তিনি তা গ্রন্থের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে বিশ্বমানবের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন মানুষ অন্ধের মতো অজ্ঞানতার এক সূচীভেদ্য অন্ধকারে নির্বাসিত জীবন যাপন করে। গ্রন্থ সেই শিক্ষাহীন, জ্ঞানহীন মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের জগতে নিয়ে আসতে পারে। গ্রন্থাগার সেদিক থেকে আত্মার আলোকে আলোকিত সভ্যতার উজ্জ্বলতম আলোকতীর্থ। এখানে মানুষ জ্ঞানের আলোক-ধারায় অবগাহন করে আলোক-প্রাপ্ত হয়, লাভ করে আত্মার অনাবিল তৃপ্তি।

গ্রন্থাগার সভ্যতার আলোকতীর্থ

মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা অসীম। জিজ্ঞাসা বা জানার ইচ্ছা তার আজন্ম প্রকৃতি। সে অজানাকে চায় জানতে, দুর্বোধ্যকে চায় বোধগম্য করতে ; বিশ্বের যা কিছু রহস্যময়, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তাকে জানবার জন্যে তার আকুল আকুতি। সে একদিকে যেমন বিশ্বভুবনকে জানতে চায়, অন্যদিকে তেমনি জানতে চায় তার নিঃসঙ্গ জীবনকে। গ্রন্থ আমাদের সেই বিশ্বভুবনকে এবং নিজের নিঃসঙ্গ আত্মাকে জানবার আলোকিত পথ নির্মাণ করে দেয়। বিশ্বের যে-সব জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বিশ্বরহস্য ও আত্মার রহস্য ভেদ করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁরা গ্রন্থের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে বিশ্বমানবের উদ্দেশে নিবেদন করেছেন। সেই সব গ্রন্থ পাঠ করে আমরা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের চিরন্তন কৌতূহল প্রতিনিবৃত্ত করতে পারি।

চিরন্তন জিজ্ঞাসার তৃপ্তি-সাধন

আমাদের জীবন সীমিত। এই সীমিত জীবন নিয়ে আমরা বিশ্বরহস্যের অতি সামান্য ভগ্নাংশই জানতে পারি। 'দিকে দিকে কত না নগর-রাজধানী, মানুষের কত কীর্তি, গিরি,

সিন্ধু, মরু কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু' এখনো আমাদের জ্ঞানের অগোচরে রয়েছে। সীমিত জীবন নিয়ে সেই সব দুর্গম দেশ-দেশান্তর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পদে পদে বিপদ ও মৃত্যুর প্রবল হাতছানি উপেক্ষা করে যে-সব বিশ্ববিশ্রুত আবিষ্কারক পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর আবিষ্কার করে সব রোমাঞ্চকর আবিষ্কার-কাহিনী গ্রন্থাকারে পরিবেশন করেছেন, গ্রন্থাগার থেকে আমরা সেই সব গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করতে পারি এবং রহস্যময় পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি।

সীমিত জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু কোন একজন মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বহু মানুষের সমবেত সম্মিলিত প্রয়াস। এই গ্রন্থাগারে যেমন এ অঞ্চলের ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকল মানুষের দান রয়েছে, তেমনি রয়েছে সরকারী সাহায্য। আজ এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁদের সবাইকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই। আজ এখানে এই সুন্দরের পাদপীঠতলে সব উৎসুক-চিত্ত আনন্দিত-প্রাণকে জানাই সাদর আহ্বান॥

উপসংহার

- গ্রন্থাগারের উপযোগিতা
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক উৎসব

১৭. বিজ্ঞান ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ

ভাষণ-সূত্র : সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ মানুষ ও বিজ্ঞান॥ মানুষ বনাম বিজ্ঞান॥ উপসংহার॥

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

একদিন মানুষ দুর্জয় প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বিজ্ঞানকে করেছিল হাতিয়ার। প্রতিকূল প্রকৃতির কোলে সেদিন সভ্যতার আদিম লগ্নের মানুষ ছিল অসহায়। ভয়ঙ্করী প্রকৃতি সেদিন ছিল মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু মানুষ সেই দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতির কাছে পরাভব স্বীকার করেনি। সে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্যে শুরু করলো তার অতন্দ্র সাধনা। শেষে অপরাজেয় রহস্যময়ী প্রকৃতি মানুষের হাতে করলো আত্মসমর্পণ। মানুষ প্রকৃতির রহস্যপুরীর চাবিকাঠি করায়ত্ত করে প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে কার্যকারণ-সূত্রে বিধৃত করে বিজ্ঞানের সাধনার করলো শুভ উদ্বোধন। মানুষের অনির্বাণ জিজ্ঞাসা সাফল্যের দীপশিখা হাতে যাত্রা শুরু করলো প্রকৃতির কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। শুরু হলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

সূচনা

সেদিন মানুষ দুর্বার প্রকৃতিকে বশীভূত করবার জন্যে বিজ্ঞানকে করেছিল হাতিয়ার। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ মানুষ আজ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উড়িয়ে দিয়েছে তার বিজয়-

বৈজয়ন্তী। আকাশের বিদ্যুৎকে সে করেছে পদানত; বাষ্পশক্তি, ইলেক্‌ট্রনিক শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি আজ তার করতলগত। বিজ্ঞান আজ তার জীবন-যাত্রাকে করেছে সহজ, সরল; তার পথ ও পরিবহণকে করেছে গতিশীল, রোগ-ব্যাধিকে পরাস্ত করে রচনা করেছে জীবনের জয়গান। এক কথায়, বিজ্ঞান আজ মানব-সভ্যতাকে করেছে উন্নত এবং বিচিত্রগামী। সভ্যতার প্রথম প্রভাতের সেই ভীত, সন্ত্রস্ত, অসহায় মানুষ বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে আজ প্রকৃতিকে করেছে পদানত।

মানুষ ও বিজ্ঞান

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করবার জন্যে মানুষ বিজ্ঞানকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছে। ফলে, যে বিজ্ঞান মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, সেই বিজ্ঞানই আজ শক্তিশালী হয়ে মানুষের বুকের ওপর পদস্থাপনে উদ্যত। অতিরিক্ত বিজ্ঞান-নির্ভরতার ফলে মানুষ আজ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের বশীভূত হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের হাত ছেড়ে দিয়ে মানুষের পক্ষে আজ একপদও অগ্রসর হবার উপায় নেই। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে যন্ত্রে-যন্ত্রে ভরে দিয়ে তাকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। মানুষের জীবন থেকে প্রকৃতিকে নিঃশেষে মুছে ফেলে তাকে অতি-যান্ত্রিকতার বিষ-নিঃশ্বাসে মরুময় করে তুলেছে। অন্যদিকে, নানা মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে বিজ্ঞান আজ পৃথিবী থেকে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করবার জন্যে এক অন্ধ চক্রান্তে লিপ্ত। তার ওপর, বিজ্ঞান অতি-যান্ত্রিকতা দিয়ে মানুষের হাতের কাজ নিয়েছে ছিনিয়ে। মানুষের রুজি-রোজগারের চাবিকাঠি জোর করে কেড়ে নিয়ে বিজ্ঞান মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বুভুক্ষার দিকে। অন্যদিকে, সে আবার ধনিক শ্রেণীকে আরো ধনী করে তাদের ভোগসর্বস্বতার দিকে পরিচালিত করেছে।

মানুষ বনাম বিজ্ঞান

কাজেই, জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানের হাতে আত্ম-সমর্পণ কোনমতেই উচিত নয়। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-পদ্ধতির পরিবর্তন করে তাকে কেবলমাত্র মানবজাতির কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করতে পারলে পৃথিবীতে সোনা ফলানো সম্ভব। তা নইলে বিজ্ঞান মানব-ভাগ্যে বহন করে আনবে দুঃসহ দুঃখ ও চরম লাঞ্ছনা। অনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান মানবজাতির ধ্বংসের মারণ-যজ্ঞেরও সূচনা করতে পারে; সেজন্যে পূর্বাহ্ণেই সতর্কতা প্রয়োজন॥

উপসংহার

- বিজ্ঞান ও মানব-সভ্যতা
- মানুষ বনাম বিজ্ঞান
- বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও মানব-সমাজ

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ ॥ সূচনা ॥ 'সহিত' থেকে সাহিত্য ॥ সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ ॥ উপসংহার ॥

১৮. সাহিত্য ও মানবসমাজ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত সুধীবৃন্দ,

সাহিত্য মানুষের অন্তরের সৃষ্টি। সাহিত্যেই পাওয়া যায় অন্তরতর মানুষের অন্তরতম পরিচয়। অন্যদিকে, সাহিত্য আবার মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণীময় প্রকাশ।

সূচনা

সাহিত্য রচনার মূলে আছে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা, তার সমাজ-জিজ্ঞাসা এবং তার সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা। যিনি শিল্পী, যিনি কবি, যিনি সাহিত্যিক, তিনি তাঁর মর্মের গভীরে জীবনের রহস্য প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। জীবন ও প্রকৃতির অবারিত সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মাধুরীতে যখন তাঁর জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন যে বিস্ময়, আনন্দ এবং যে রসানুভূতি প্রকাশের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সাহিত্য তাকে ভাষায়, ছন্দে, অলংকারে রূপময় করে তোলে। কাজেই, সাহিত্য হলো মানুষের আনন্দঘন রসানুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ।

কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে মানব-সমাজের সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের জন্যে আমাদের 'সাহিত্য' শব্দটির বিশ্লেষণের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। 'সাহিত্য' শব্দটির উদ্ভব 'সহিত' শব্দ থেকে। প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের এবং জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ থেকেই সাহিত্যের জন্ম। প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সংযোগের যে সূত্র, তার স্বরূপ হলো আনন্দ।

'সহিত' থেকে সাহিত্য

আনন্দের গভীর অথচ অদৃশ্য সূত্রে প্রকৃতির সঙ্গে জীবন এবং জীবনের সঙ্গে জীবন অন্বিত। প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের লীলা, আনন্দের মধ্য দিয়েই মানুষ সেখানে পৌঁছায়। মানুষের মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, প্রেমের মধ্য দিয়েই তার পরম অভিব্যক্তি। প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে জীবনের যে সম্পর্ক, আনন্দের মধ্যেই তার উত্তরণ। কবি বা সাহিত্যিক সেই আনন্দকেই কাব্যে বা সাহিত্যে বাণীরূপ দান করেন।

কিন্তু সাহিত্য কেবল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রকাশ করেন না। তার দায়িত্ব আরো ব্যাপক এবং গভীর। 'সহিত' শব্দটির মধ্যে 'হিত' বা 'কল্যাণ' নিহিত আছে। কিন্তু কার কল্যাণ? কিসের কল্যাণ। কল্যাণ,—মানুষের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ।

সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্

অর্থাৎ, সাহিত্য রচিত হবে মানুষের বা সমাজের, সার্বিক কল্যাণের জন্যে। 'Art for art's sake'.—শিল্প কেবলমাত্র শিল্পের জন্যে—এই কলাকৈবল্যবাদে অনেকেই বর্তমানকালে বিশ্বাসী নন। 'সত্যম্' ও 'সুন্দরম্'-এর সঙ্গে যদি 'শিবম্' অর্থাৎ কল্যাণ সংমিশ্রিত না থাকে, তবে তাতে মানব-সমাজের কি প্রয়োজন?

কাজেই, সাহিত্য একদিকে যেমন সমাজের দর্পণ, অন্যদিকে তেমনি সমাজের চালক-

শক্তি। একদিকে, সে যেমন সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত করে সমাজের নির্ভুল পরিচয় তুলে ধরে, অন্যদিকে তেমনি আদর্শ চিত্র অঙ্কন করে সমাজকে দেয় অগ্রসরণের নির্ভুল পথ-নির্দেশ। সে যেমন সমাজের নির্মম সমালোচক, তেমনি সমাজের উজ্জ্বল পথ-প্রদর্শক। কাজেই, সাহিত্য খেয়ালী মানুষের যথেচ্ছাচার নয়; সাহিত্য সমাজের জন্যে, সমাজের কল্যাণের জন্যে এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যে। তাছাড়া, তার অন্য পরিচয় নেই॥

উপসংহার

- সাহিত্য কি ও কেন?
- সাহিত্য ও জীবন
- সাহিত্য ও সমাজ

১৯.

বাণিজ্য ও মানবকল্যাণ

ভাষণ-সূত্র ঃ সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য॥ বাণিজ্যের আদর্শচ্যুতি॥ উপসংহার॥

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

পণ্যের লেনদেনই বাণিজ্যের মূলমন্ত্র; এবং পণ্যের এই লেনদেনের সূত্রপাত মানব-সভ্যতার প্রভাত-লগ্নেরই একটি স্মরণীয় ঘটনা। বস্তুতঃপক্ষে, সেইদিন থেকেই বাণিজ্যের শুভ সূচনা। কিন্তু পণ্যের সেই লেনদেনের পেছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা হলো প্রাণধারণে এবং জীবন-সংগ্রামে পারস্পরিক সহযোগিতা। এক কথায়, মানব-কল্যাণই ছিল পণ্যের আদান-প্রদান বা বাণিজ্যের মূল লক্ষ্য। কালক্রমে, বাণিজ্যে এসেছে নানা জটিলতা। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের দিন আজ অবসিত। বিনিময়ের বা বেচাকেনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে মুদ্রা বা অর্থরূপী দালাল। যার ফলে এসেছে নানা যুক্তি-তর্ক ও নানা জটিল তত্ত্বের মারপ্যাঁচ। তাদের প্রবল ঘর্ষণে এবং প্রচুর ধূম ও ধূলিরাশির উৎক্ষেপণে বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য আজ রহস্যাবৃত।

সূচনা

কিন্তু স্মরণীয় যে, মানব-কল্যাণের জন্যেই বাণিজ্যের জন্ম। মানুষের জীবন-যাপনকে সহজসাধ্য এবং সুন্দর করবার জন্যেই বাণিজ্যের শুভ সূচনা। যখন পণ্যের অভাবে মানুষের জীবন কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল, যখন সামাজিক সম্পদের উৎপাদন এবং মানুষের সর্বোত্তম প্রয়োজন-পূরণের স্বার্থে তার রূপ-রূপায়ণ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, তখনই বাণিজ্য প্রসারিত করে দিয়েছিল তার কল্যাণপূত দক্ষিণ হস্ত। সে তখন মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সামাজিক সম্পদ উৎপাদনে মন দেয় এবং উৎপন্ন পণ্যকে মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট সেবায় নিয়োজিত করবার জন্যে নিত্য-নতুন পণ্য উৎপাদনে হাত লাগায়। মানুষের চাহিদার স্বরূপ-নির্ধারণ করে তার পরিতৃপ্তির জন্যে পণ্য যোগানের দিগন্তে জোয়ার আনবার জন্যে কৃতসংকল্প।

বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য

বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য মানব-কল্যাণ হলেও বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় অপরাহ্ণবেলায়

পৌঁছে বাণিজ্য আজ তার আদর্শচ্যুত হয়ে নর-নিগ্রহের বেদনাময় কারখানায় পরিণত হয়েছে। আজ বাণিজ্য মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা ভাবে না, সুন্দরতর জীবন রচনার কথা ভাবে না, আজ বাণিজ্য বিজ্ঞানের হাত ধরে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের কথা ভাবে। সে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে উৎপাদন-বৃদ্ধি তথা যোগান-বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে না। সে আজ কৃত্রিম উপায়ে যোগান হ্রাস করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সংকটাবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে মুনাফার অঙ্ক স্ফীতকায় করে তুলতে চায়। শুধু তাই নয়, আদর্শভ্রষ্ট বাণিজ্যের মুনাফা-লিপ্সা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, মানুষের নিত্যব্যবহার্য পণ্যে, এমনকি, ঔষধেও ভেজাল মিশিয়ে সে নরহত্যার গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

বাণিজ্যের আদর্শচ্যুতি

সেইজন্যে আজ বাণিজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাশীল মহলে দেখা দিয়েছে ঘোরতর সন্দেহ। যে বাণিজ্য আজ বেবীফুড কিংবা মুমূর্ষর ঔষধে বিষ মিশিয়ে মানবতার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকায় লিপ্ত, সেই বাণিজ্যে আর কাজ কী? বাণিজ্য মানুষের সমাজের জন্যে, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ-সাধনের জন্যে; বাণিজ্য ব্যক্তিগত মুনাফা-বৃদ্ধির জন্যে নয়—এই উপলব্ধি যদি না আসে, তবে রাষ্ট্রকে এগিয়ে এসে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। তবেই বাণিজ্যের মৌল উদ্দেশ্য সফল হবে, নচেৎ নয়॥

উপসংহার

- ভেজাল-মিশ্রণ ও চোরা কারবারের বিরুদ্ধে ভাষণ
- সমস্ত বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত কেন?
- সমাজে বাণিজ্যের ভূমিকা

২০. বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ভাষণ সূত্র: সম্ভাষণ॥ সূচনা॥ বৃত্তিমুখী শিক্ষা॥ ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার স্বরূপ॥ উপসংহার॥

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজ ভারতের দিকে দিকে যে সমস্যা সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করেছে, তা হলো বেকার-সমস্যা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রশ্রয়ে এই বেকার-সমস্যার তীব্রতাও ক্রমবর্ধমান। মানুষ যখন কাজ পায় না, তখনই সে হয় বেকার। সমাজের কোন মানুষকে কাজে লাগাতে না পারলে তা হয় সামাজিক অপচয়। তাকে কাজে লাগাতে পারলে বহুল পরিমাণে সামাজিক সম্পদ-বৃদ্ধি সম্ভব হতো। তাকে কাজে লাগাতে না পারার অর্থ সামাজিক সম্পদ-বৃদ্ধিকে ব্যাহত করা। কিন্তু তার চেয়েও যা ভীতিপ্রদ, তা হলো, বেকারেরা দীর্ঘকাল হতাশা ও নৈরাশ্যে পীড়িত হয়ে সামাজিক সম্পদ ধ্বংস করার নেশায় মেতে ওঠে। কাজেই, বেকার-সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত না করলে সামূহিক বিপদের সম্ভাবনা।

সূচনা

সেইজন্যে বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের চিন্তাশীল মহল আজ উপায়-উদ্ভাবনে নিরত, এটি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক সুলক্ষণ। সেইজন্যে সর্বাগ্রে সকলের দৃষ্টি পড়েছে শিক্ষার সংস্কারের ওপর। দেশের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে পরিকল্পিত ও প্রচলিত হয়েছিল, স্বাধীন ভারতে তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়েছে। সে শিক্ষা দেশের তরুণ-সমাজকে কেবলমাত্র কর্মবিমুখতা শিক্ষা দিয়েছে। দেশের মাটির সঙ্গে, দেশের নাড়ির সঙ্গে সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন যোগসূত্র ছিল না। আজ ভারতে সেই শিক্ষা প্রয়োজন, যা সমাজের উন্নতির সঙ্গে ব্যক্তির রুজি-রোজগার ও জীবন-যাপনের সঙ্গতি স্থাপন করতে পারে। কেবলমাত্র কর্মমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যস্থতায়ই সেই সঙ্গতি হতে পারে।

বৃত্তিমুখী শিক্ষা

কাজেই, বৃত্তিমুখী শিক্ষা আজ ভারতে অপরিহার্য। সেই বৃত্তিমুখী শিক্ষার স্বরূপ কি? কেবল মামুলি কয়েক প্রকার পণ্য-উৎপাদনের বা চিরাচরিত কয়েক প্রকার বৃত্তি অনুসরণের শিক্ষা দিলেই বৃত্তিমুখী শিক্ষার দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না। ভারত একটি বিশাল উপমহাদেশ। তার ভৌগোলিক বিস্তৃতি যেমন বিশাল, তার বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন পণ্য এবং তার সম্ভাবনাও তেমনি বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেই সব পণ্য এবং তার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তি-শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার ফলে সারা দেশে শিল্প-বাণিজ্যের কর্মমুখরতা সূচিত হবে, বৃত্তি-শিক্ষার মাধ্যমে সারাদেশের কর্মের অচল চাকাগুলি সমানভাবে ঘুরতে শুরু করবে। কাজেই, সমগ্র ভারতে কেবল একপ্রকার বৃত্তিশিক্ষার প্রবর্তন অনুচিত।

ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার স্বরূপ

আজ ভারতে বেকার-সমস্যা যেভাবে স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে, তাতে বিভিন্ন বৃত্তির বৈচিত্র্যীকরণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রবর্তন জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং বাজার-চাহিদার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করে পণ্য নির্বাচন করতে হবে; এবং তদনুযায়ী বৃত্তিমুখী শিক্ষা-প্রবর্তন করতে হবে। তা যদি সফল হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে লাগবে কর্ম-মুখরতার অভূতপূর্ব জোয়ার। তাতে একদিকে যেমন বাজারে পণ্যাভাব দূরীভূত হবে, অন্যদিকে তেমনি কর্মহীন বেকারেরা স্বয়ংসিদ্ধরূপে কর্মে আত্ম-নিয়োগ করে সামাজিক উন্নতির জোয়ার আনবে। কাজেই, বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রবর্তন ছাড়া বেকার-সমস্যা সমাধানের অন্য পথ নেই॥

উপসংহার

- বেকার-সমস্যা সমাধানের উপায়
- ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার স্বরূপ কি হওয়া উচিত?

অনুসরণী

*১. কোন জনৈক শিক্ষাব্রতীর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি ভাষণের খসড়া প্রস্তুত কর।
উ. মা. '৭৮

২. স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে তোমার কলেজে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তার জন্যে একটি যথোপযুক্ত ভাষণ প্রস্তুত কর।

৩. শহীদ-দিবস উপলক্ষে তোমাকে একটি অনতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে হবে। ভাষণটি প্রস্তুত কর।

৪. নববর্ষ উপলক্ষে তোমাদের ক্লাবে যে অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে, তাতে প্রদানের জন্যে একটি উপযুক্ত ভাষণ প্রস্তুত কর।

৫. তোমাদের কলেজের শারদোৎসবের জন্যে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রস্তুত কর।

৬. তোমাদের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় সভায় তুমি যে বক্তৃতা দেবে, তার একটি খসড়া প্রস্তুত কর।

৭. প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে একটি স্থানীয় অনুষ্ঠানে তোমাকে একটি ভাষণ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। ভাষণটি প্রস্তুত কর।

৮. তোমাদের ক্লাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানের উপযোগী একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

৯. তোমাদের কলেজে সাড়ম্বরে পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপিত হবে। তার উপযোগী একটি সুচিন্তিত ভাষণ প্রস্তুত কর।

১০. তোমাদের পাঠাগারে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। তদুপযুক্ত একটি অনতিদীর্ঘ ভাষণ রচনা কর।

*১১. 'আজ ভারতে অরণ্য-সংহার নয়, অরণ্য-সৃষ্টির প্রয়োজন।'—এই মর্মে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে একটি ভাষণ রচনা কর।

১২. 'ছাত্রদের সমাজ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করা উচিত'—ছাত্র-সমাবেশে প্রদানের জন্যে এই মর্মে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

*১৩. 'খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল-মিশ্রণ একটি জঘন্য অপরাধ।'—এই মর্মে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

*১৪. 'গণ-টোকাটুকি ছাত্র-সমাজের কলঙ্ক এবং একটি গুরুতর সামাজিক অপরাধ।'—ছাত্র-সমাবেশে প্রদানের জন্যে একটি সুচিন্তিত ভাষণ প্রস্তুত কর।

১৫. বর্তমান কালে কিরূপ সাহিত্য রচিত হচ্ছে এবং কিরূপ সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত—সে বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করে একটি অনতিদীর্ঘ ভাষণ রচনা কর।

১৬. বর্তমান ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা-চক্রে প্রদানের জন্যে একটি বক্তৃতা রচনা কর।

১৭. জনৈক অধ্যাপকের বিদায়-সভায় তোমাকে একটি ভাষণ দিতে হবে। ভাষণটি প্রস্তুত কর।

*১৮. তোমার কলেজে নবীন-বরণ উৎসবের জন্য একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

১৯. জাতীয় বিজ্ঞান-দিবস উপলক্ষে একটি অনতিদীর্ঘ ভাষণ প্রস্তুত কর।

*২০. শিশু-দিবস উপলক্ষে তোমাকে একটি ভাষণ দিতে হবে। ভাষণটি রচনা কর।

২১. সমবায়-সপ্তাহ উপলক্ষে তুমি যে ভাষণ দেবে, তার একটি খসড়া প্রস্তুত কর।

———

প্রবন্ধ বিচিন্তা

কাল্পনিক সংলাপ

"চলি গেল সবে সভাসুজন
মুখোমুখি করি বসিলা দুজন ;
রাজা বলে, 'এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ করো কবি।"
—রবীন্দ্রনাথ

'যিনি যাই বলুন শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যের কেন্দ্র-স্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্‌স্‌পীয়রকে পাওয়া যায়,...যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেস্‌ডিমোনার প্রতি প্রীতি...চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।'

—রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ বিচিন্তা

কাল্পনিক সংলাপ

ইংরেজী শব্দ 'dialogue'-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'সংলাপ'। কথোপকথনের ছলে রচিত যে-কোন সাহিত্যিক রচনাকেই বলা হয় সংলাপ। সাহিত্যের এই বিশেষ রূপটি 'নাটক' নামে চিহ্নিত। নাটকের প্রধান অবলম্বন হলো চরিত্র। চরিত্রকে অবলম্বন করেই নাটক তার মূল লক্ষ্যে উপনীত হয়। সেই মূল লক্ষ্য আবার কাহিনীর কোন বিশিষ্ট পরিণতি বা বক্তব্যের কোন নির্দিষ্ট রূপ হতে পারে। লক্ষ্য যা-ই হোক, চরিত্রগুলির মধ্যে কত দ্বন্দ্ব, কত সংঘাত! এ ব্যাপারে চরিত্রগুলির প্রধান হাতিয়ার হলো দুটি: এক. ক্রিয়া [action] এবং দুই. আবেগ [emotion]। সংলাপই সেই নাটকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং ভাবাবেগের বাহন। সংলাপের মধ্যে দিয়েই চরিত্রের বিকাশ এবং নাটকীয় অগ্রগতি সম্ভব হয়। সেদিক দিয়ে সংলাপ নাটকের শুধু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গই নয়, অপরিহার্য অঙ্গ।

সংলাপ কাকে বলে?

সংলাপ, এক কথায়, নাটকের বাহন; নাট্যরসকে তা পূর্ণ পরিণতির দিকে বহন করে নিয়ে যায়। কাজেই, সংলাপ হওয়া উচিত সজীব এবং প্রাণবন্ত। সংলাপ সজীব এবং প্রাণবন্ত হলে তার সাহায্যে রূপায়িত চরিত্রগুলিও হয়ে উঠবে সজীব ও সাবলীল। নাটকের সাফল্যের বৃহদংশ নির্ভর করে তাই সংলাপ-রচনার কৃতিত্বের ওপর।

সংলাপের গুরুত্ব

শ্রেষ্ঠ সংলাপ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, সংলাপ চরিত্রানুগ হবে। বীর চরিত্রের মুখে বীরত্বপূর্ণ সংলাপই মানানসই। দুর্বল চরিত্রের মুখের সংলাপ হবে তার দুর্বলতারই পরিচয়বাহী। দ্বিতীয়তঃ, সংলাপ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং সুপরিমিত হওয়া চাই। সংলাপ বক্তৃতার মতো সুদীর্ঘ বা বক্তৃতা-ধর্মী হবে না। বক্তৃতার মতো সুদীর্ঘ সংলাপ শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। অন্যদিকে, বক্তৃতাধর্মী সংলাপ নিষ্প্রাণ এবং ক্লান্তিকর হয়; তাতে শ্রোতাদের মনের ওপর তার প্রত্যাশিত প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া আশা করা যায় না। সংলাপ-রচনায় শব্দ-পরিমিতি [economy of words] বড়ো কথা। কাজেই, অনাবশ্যক শব্দের বোঝা চাপিয়ে সংলাপকে ভারাক্রান্ত করে তোলা অনুচিত। তৃতীয়তঃ, সংলাপের ভাষা হবে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। সংলাপের বাক্যগুলিও সুরচিত, শাণিত এবং ঋজু হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'সত্য

সংলাপের বৈশিষ্ট্য:
এক. চরিত্রানুগতা,
দুই. সংক্ষিপ্ততা,
তিন. সুস্পষ্টতা ও ঋজুতা

সেলুকস্, কী বিচিত্র এই দেশ।' কিংবা গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকের 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।'—সংলাপ দুটি পরীক্ষা করলে এ বিষয়ে এদের উৎকর্ষ সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। সংলাপ-রচনার ঋজুতা এবং তীক্ষ্ণতার গুণে এগুলি প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এইখানেই সংলাপ রচনার মুন্সিয়ানা। চতুর্থতঃ, পূর্ববর্তী সংলাপের সঙ্গে পরবর্তী সংলাপের একটা যোগসূত্র থাকা উচিত। পূর্ববর্তী সংলাপকে স্বীকার অথবা অস্বীকার—যাই করা হোক না কেন, তাদের মধ্যে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক—যে-কোন একপ্রকার সংযোগ প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই। পাঁচ. সংলাপ নাট্যগতিসম্পন্ন হওয়া চাই। সেজন্যে সংলাপকে সংক্ষিপ্ত, ঋজু এবং শাণিত হতে হবে। নাট্যগতিই নাটকের প্রাণ। দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই সেই নাট্যগতির প্রকাশ। অর্থাৎ, সংলাপগুলি হবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর। ছয়. সংলাপগুলি তার নিজস্ব প্রয়োজনে কখনো হবে গুরুগম্ভীর, কখনও লঘু পরিহাসচটুল, কখনো বা শাণিত ব্যঙ্গের কশাঘাতে সুতীক্ষ্ণ। এর দ্বারা ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সংলাপগুলি নাট্য-কৌতূহল [dramatic suspense] সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। সংলাপ-রচনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকলে উৎকৃষ্ট সংলাপ রচনা করা যায়। কিন্তু এ সবের ওপরে আছে শিল্পের দাবি—নাট্যশিল্পের অপরিহার্য দাবি। সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন থাকতে হবে।

চার. যোগসূত্রের ধারাবাহিকতা, পাঁচ. নাট্যগতিসম্পন্নতা, ছয়. একঘেয়েমি পরিহার

কাল্পনিক সংলাপে একাধিক কাল্পনিক চরিত্র প্রদত্ত হয়। সেই চরিত্রগুলির মুখে উপযুক্ত সংলাপ যোগ করে নাট্যরস সৃষ্টি করে একটা পূর্ণ পরিণতির দিকে ঘটনাটিকে পরিচালিত করতে হয়। সম্পূর্ণ অংশটিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়: এক. অবতারণা বা মুখবন্ধ, দুই. দ্বন্দ্বের সূচনা, তিন. চরমাবস্থা [climax] এবং চার. উপসংহার বা অবসান। সংলাপের অবতারণা খুব নাটকীয় হওয়া উচিত। তার ফলে, শুরুতেই পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তারপর ধীরে ধীরে দ্বন্দ্বের অবতারণা করে তাকে চরমাবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে হয়। সবশেষে উপসংহার বা নাট্য-কৌতূহলের অবসান॥

কাল্পনিক সংলাপ

১
বুদ্ধ
ও
আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডার॥ আমি বিশ্বাস করি না আপনার অভিমত। আমি মানিনা যে, এই অমূল্য জীবন আপনার নির্দেশিত পথে অপচয় করবার জন্যে।

বুদ্ধ॥ কাকে তুমি অপচয় বলছো, গ্রীক যুবক?

আলেকজাণ্ডার ॥ আপনার ঐ নির্বাণের জন্যে আত্মশাসন আর ঐ জীবসেবা, মানবসেবা। জীবন তো মানুষ একবারই পায়। তাই জীবন দুর্লভ। ভোগ-সুখের মধ্য দিয়ে এই দুর্লভ মানবজীবনের সদ্ব্যবহার না করে তাকে আপনি বলছেন কিনা আত্মশাসন আর জীবসেবার মধ্য দিয়ে সফল করতে ? অপচয় আর কাকে বলে, বলুন ?

বুদ্ধ ॥ তোমার প্রথম কথার জবাব প্রথমেই দিই, কেমন ? মানুষ একবারই তার জীবন পায়, তোমার এ কথাটি ঠিক নয়। মানুষের যেমন জন্ম আছে, তেমনি জন্মান্তর আছে। মানুষকে বারবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়, দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং শেষে মরতে হয়।

আলেকজাণ্ডার ॥ মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং মরতে হয়, তা জানি। কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে বারবার জন্মগ্রহণ করে, তার প্রমাণ কি ?

বুদ্ধ ॥ তার প্রমাণ আমি নিজেই। আমি এ জন্মে পৃথিবীতে জন্মাবার আগে বহুবার জন্মেছিলাম। তার সব স্মৃতি আমার মনে আছে।

আলেকজাণ্ডার ॥ কিন্তু আমার তো মনে পড়ে না, আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম।

বুদ্ধ ॥ মানুষের সব কথা সব সময় মনে পড়ে না। মনে করবার জন্যে একাগ্রতা দরকার। সেই একাগ্রতাই তো ধ্যান—তপস্যা। তুমি আগে মানসিক একাগ্রতা লাভ করো, তাহলে তোমার পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়বে।

আলেকজাণ্ডার ॥ তা না হয় মানলাম। কিন্তু মানুষ এভাবে বারবার জন্মগ্রহণ করে কেন ?

বুদ্ধ ॥ জন্মগ্রহণ করে নয়, তাকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই জন্ম, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে তার মুক্তি নেই।

আলেকজাণ্ডার ॥ কেন ? কেন মুক্তি নেই ?

বুদ্ধ ॥ কারণ, পার্থিব কামনা-বাসনার হাত থেকে তার মুক্তি নেই। জানো তো, মানুষের কামনা-বাসনার অন্ত নেই। সেই অন্তহীন কামনা-বাসনার তাড়নায় মানুষকে বারে-বারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

আলেকজাণ্ডার ॥ আচ্ছা, তা নয় হলো। কিন্তু কামনা-বাসনার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পাবে কি করে ?

বুদ্ধ ॥ কামনা-বাসনাকে জয় করতে হবে।

আলেকজাণ্ডার ॥ তার মানে তরবারি ?

বুদ্ধ ॥ তরবারিতে তা সম্ভব নয়, যুবক—

আলেকজাণ্ডার ॥ কী বলছেন আপনি ? আপনি বোধ হয় আমার তরবারির ধার জানেন না। সুদূর ম্যাসিডন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তরবারির জোরে জয় করলাম। আর, তা দিয়ে এই সামান্য কামনা-বাসনাকে জয় করতে পারবো না ?

বুদ্ধ ॥ কামনা-বাসনাকে জয় করবার মতো তরবারি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, যুবক। কখনও তা সম্ভব নয়।

আলেকজাণ্ডার ॥ তাহলে কামনা-বাসনাকে কোনদিন মানুষ জয় করতে পারবে না ?

বুদ্ধ ॥ পারবে।

আলেকজাণ্ডার ॥ কি করে ?

বুদ্ধ ॥ আত্মশাসনের দ্বারা।

আলেকজাণ্ডার ॥ জয় বলতে আমি বিশ্বজয় বুঝি আর শাসন বুঝতে বুঝি বিশ্বশাসন—

বুদ্ধ ॥ কিন্তু আর এক রকমের জয় আছে যে, যুবক। সে জয়ের নাম আত্মজয়—বিশ্বজয়ের চেয়েও সে জয় কঠিনতর। সেই জয়ই শ্রেষ্ঠ জয়।

আলেকজাণ্ডার ॥ আর আত্মশাসন ?

বুদ্ধ ॥ তা হলো আত্ম-সংযম। তা দিয়ে মানুষ কামনা-বাসনার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আলেকজাণ্ডার ॥ এবং তা হলেই মানুষ তার মানব-জন্মের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কী প্রয়োজন সেই মুক্তিলাভের ? তার চেয়ে ভোগসুখের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন কি আপনার শ্রেয় নয় ?

বুদ্ধ ॥ তাহলে তোমাকে মানব-জীবনের সমস্ত দুঃখ সহ্য করতে হবে যে, ভাই—

আলেকজাণ্ডার ॥ সুখ-সম্ভোগের পাঁচিল তুলে দিয়ে সমস্ত দুঃখকে ঠেকাবো।

বুদ্ধ ॥ সে পাঁচিল আকাশ স্পর্শ করলেও দুঃখকে ঠেকানো যাবে না, যায় না। রোগ, জরা, মৃত্যু—এই ত্রিতাপ দুঃখকে মানুষ কিছুতেই ঠেকাতে পারে না। জীবনে রোগ যেমন অবশ্যম্ভাবী, জরাও তেমনি অনিবার্য ; আর, মৃত্যু—পৃথিবীর কে কবে মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ?

আলেকজাণ্ডার ॥ তা বলে অস্ত্র ত্যাগ করে মৃত্যুর ভজনা করবো ?

বুদ্ধ ॥ আমি তো তোমাকে মৃত্যুর ভজনা করতে বলছিনা, যুবক—

আলেকজাণ্ডার ॥ তবে কি ঈশ্বরের ভজনা ?

বুদ্ধ ॥ আমি তাও বলছি না।

আলেকজাণ্ডার ॥ তাহলে এ জীবন নিয়ে কি করবো ? যুদ্ধজয়, দেশজয় যদি করতে না পারি, তবে শুধু আত্মজয় নিয়ে আমার কি হবে ? এভাবে জীবন অপচয় করার কোন মানে হয় না।

বুদ্ধ ॥ জীবন অপচয় হবে কেন, ভাই ? জীবন নিঃসন্দেহে অমূল্য জিনিস।

আলেকজাণ্ডার ॥ তাহলে এ জীবন কোন্ কাজে লাগবে ?

বুদ্ধ ॥ কেন ? জীবের সেবা করে, মানুষের সেবা করে। শোনো যুবক, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে ?

আলেকজাণ্ডার ॥ বলুন।

বুদ্ধ ॥ তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো ?

আলেকজাণ্ডার ॥ করি। আপনি ?

বুদ্ধ ॥ আমিও করি, আবার করিনাও।

আলেকজাণ্ডার ॥ সেকি ? আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ?

বুদ্ধ ॥ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আমার কোন লাভ নেই। ঈশ্বর থাকুন—না-থাকুন, তাতে

আমার কিছু আসে, যায় না! আমার সামনে রয়েছে পৃথিবীর আর্ত, পীড়িত, অসহায় মানুষ। তারাই আমার জীবন্ত ঈশ্বর। তাদের ছেড়ে আমি স্বর্গের কল্পরাজ্যের ঈশ্বরকে চাই না।

আলেকজাণ্ডার॥ অবাক করলেন আপনি। আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? আপনি না ভারতীয়?

বুদ্ধ॥ সন্ন্যাসী আর শ্রমণের দেশ বলে কিছু নেই। সমস্ত পৃথিবীই তার দেশ।

আলেকজাণ্ডার। আরো অবাক করলেন আপনি। আপনিও যে তাহলে বিশ্বজয় করতে চান। আপনিও দেখছি দিগ্বিজয়ী হবার আশা রাখেন। তাহলে আপনাতে-আমাতে তফাৎ কোথায়?

বুদ্ধ॥ তফাৎ আছে বৈকি ভাই! তোমার দিগ্বিজয় তরবারির দ্বারা; আর, আমার ধর্ম-প্রচারকে যদি দিগ্বিজয় বলো, তাহলে আমার দিগ্বিজয় প্রেমের দ্বারা, ভালোবাসার দ্বারা। তুমি করছো রক্তপাত, আর আমি সেই রক্তের দাগ মুছিয়ে দিয়ে চলেছি। তুমি জয় করেছো দেশ; আর আমি জয় করছি হৃদয়। তোমার সাম্রাজ্য তোমার মৃত্যুর পর ধ্বংস হয়ে গেছে; আর, আমার সাম্রাজ্য আমার মহাপরিনির্বাণের পর সম্প্রসারিত হয়ে গেছে।

আলেকজাণ্ডার॥ যুদ্ধ না করলে কীর্তি প্রতিষ্ঠা হবে কি করে? আমার যুবক-রক্ত যে যুদ্ধ চায়, চায় পৃথিবীতে কীর্তি-সৌধ নির্মাণ করতে।

বুদ্ধ॥ প্রেমের সাহায্যে, অহিংসার সাহায্যে বিশ্ববিজয় যে তোমাকে আরো বৃহত্তর কীর্তি এনে দেবে, ভাই। যুবকেরা শুধু যুদ্ধ করতে জানে—ভালোবাসতে জানে না?

আলেকজাণ্ডার॥ তাহলে সত্যি কথাটি বলবো?

বুদ্ধ॥ বলো—

আলেকজাণ্ডার॥ আমরা ঠাণ্ডা দেশের মানুষ, আমরা ভারতবর্ষের মতো গরম দেশের মানুষ নই। আমাদের উত্তেজনাকর কিছু না করে বসে থাকলে যে ঠাণ্ডায় জমে মরে যাবার সম্ভাবনা।

বুদ্ধ॥ কিন্তু ভাই, আমি তো নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপনে বিশ্বাসী নই। আমি কাজের কথা বলি, আমিও দিগ্বিজয়ের কথা বলি। সারা পৃথিবীতে রক্তপাত বন্ধ করে দাও। নিজে ভালোবাসো, পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসতে শেখাও। দেশজয়ের চেয়ে হৃদয়-জয়ে মন দাও। তাহলে তুমি যে-সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলে, তার চেয়েও অনেক বড়ো সাম্রাজ্য তুমি স্থাপন করতে পারবে। আর, সে সাম্রাজ্যের ধ্বংস হবে না কোনদিন।

আলেকজাণ্ডার॥ আপনি কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছেন। রক্তপাতের দ্বারা যুদ্ধজয়ে আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। তাছাড়া, সে জয় তো ক্ষণস্থায়ী। আমার সাম্রাজ্যও বেশিদিন টেকেনি। বেশ, আপনি তো জন্মান্তরে বিশ্বাসী। তাহলে, আপনার মতে, আমি আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবো। কেননা, আমার কামনা-বাসনার শেষ হয়নি। পরজন্মে আমি আপনার নির্দেশমতো প্রেম এবং অহিংসার সাম্রাজ্য স্থাপন করবো। আমাকে আপনি আপনার পদধূলি দান করুন এবং আশীর্বাদ করুন।

বুদ্ধ॥ প্রেমে তোমার জয় হোক॥

২
অশোক ও চাণক্য

চাণক্য ॥ দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করে যে বিশাল মৌর্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলাম, তুমি তা অহিংসা-অহিংসা করে নষ্ট করে দিলে, অশোক ?

অশোক ॥ আপনার এ অভিযোগ ভ্রান্ত।

চাণক্য ॥ ভ্রান্ত ? তুমি মৌর্য্য-সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে রেখে যাওনি ? কলিঙ্গ-বিজয়ের পর তুমি তোমার তরবারি সেই-যে কোষবদ্ধ করেছিলে, তা আর কখনও উন্মুক্ত করোনি। তার ধারে মরচে পড়েছে কিনা, একবার পরীক্ষা করে দেখোওনি। সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়েছিলে—

অশোক ॥ না, ভেঙে দিইনি। তাদের আমি যুদ্ধের অভিযানে প্রেরণ না করে জনহিতকর কর্মের অভিযানে প্রেরণ করেছিলাম।

চাণক্য ॥ আর অমাত্য, মহামাত্য—এইসব উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের তুমি বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে নিয়োগ করেছিলে। এই কি রাজধর্ম, না রাজকর্ম ?

অশোক ॥ আপনি অযথা আমাকে অভিযুক্ত করছেন। ভগবান তথাগত বুদ্ধের বাণীই হলো অহিংসা পরমো ধর্ম।

চাণক্য ॥ ওই বুদ্ধের বাণীই হলো তোমার সর্বনাশের কারণ, ভারতের সর্বনাশের কারণ—তা জানো ?

অশোক ॥ আমি তা বিশ্বাস করি না।

চাণক্য ॥ দেখো অশোক, আমি কৌটিল্য—চাণক্য। আমি ধর্ম-টর্ম মানিনা। রাজনীতির কাছে, কূটনীতির কাছে ধর্মের প্রশ্ন অবান্তর—মূঢ়তা। আমি আমার এই কূটনীতির দ্বারা মগধের নন্দবংশকে ধ্বংস করে তার ওপরে রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত তোমার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আমার কূটনীতিতেই ভারতের সিংহাসনে মৌর্য-বংশের প্রতিষ্ঠা, আমার কূটনীতিতেই মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিস্তার। আমি তখনই আমার দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলাম, মৌর্য-সাম্রাজ্যের তথা ভারতের দুটি প্রবল শত্রু তাকে ধ্বংস করবার জন্যে ধেয়ে আসছে। তার একটি হলো বিদেশী শত্রু, আর একটি হলো বৌদ্ধধর্ম। বিদেশী শত্রুকে পরাস্ত করে সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলাম। তার প্রতিভূকে তোমার পিতামহের রাজসভায় আটক রেখেছিলাম। এইভাবে বিদেশী শত্রুকে দুর্বল করে সারা ভারতময় মৌর্য-সাম্রাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিয়েছিলাম। অন্যদিকে, আভ্যন্তরীণ বৌদ্ধধর্মের প্লাবনের হাত থেকে মৌর্য-সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্যে সতর্কতা-বাণী উচ্চারণ করেছিলাম। আমি জানতাম, বৌদ্ধ-

ধর্মের আঘাত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করে দেবে এবং তার ফলে তার পতন হয়ে উঠবে অনিবার্য। আর তুমি—আমার সেই সতর্কতা-বাণীকে উপেক্ষা করে নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছো, প্রজাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছো—

অশোক ॥ আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি কিন্তু প্রজাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করিনি। তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তারা ভগবান বুদ্ধের বাণীতে মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল।

চাণক্য ॥ রাখো তোমার মুক্তির ঠিকানা! বৌদ্ধধর্ম-প্রচারে তুমি রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করোনি?

অশোক ॥ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ভগবান তথাগত বুদ্ধের বাণীই তাদের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র-গঠনে সাহায্য করবে।

চাণক্য ॥ নৈতিক চরিত্র-গঠনে সাহায্য করবে? অর্থনৈতিক চরিত্র-গঠনের কথা ভেবেছিলে?

অশোক ॥ তাও ভেবেছিলাম। কৃষক, শ্রমিক—এদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে চেষ্টা করেছিলাম। বণিকদের হৃদয়-শোধণ করে তাদের দূর-দূর দেশে বাণিজ্যে প্রেরণ করেছিলাম।

চাণক্য ॥ বাণিজ্য করবার জন্যে না ধর্মপ্রচারের জন্যে?

অশোক ॥ ধর্মপ্রচার হলেও বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হয়নি।

চাণক্য ॥ আমি অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা কৌটিল্য। আমাকে এসব বিষয় শেখাতে এসোনা। বাণিজ্যের সঙ্গে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়াটা এক ধরনের মূঢ়তা।

অশোক ॥ দেখুন, আপনার কাছে যা রাজনীতি-কূটনীতি, আমার কাছে তা রাজধর্ম। আপনি চেয়েছেন অবিসংবাদিত রাজশক্তি এবং একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিস্তার; এবং সেজন্যে আপনি প্রজাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা—তাদের ব্যথা-বেদনার কথা ভাবেন নি। এমনকি, রক্তক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সম্ভাবনার কথা জেনেও আপনি যুদ্ধকে কাম্য মনে করেছেন। সাম্রাজ্য কি শুধু সম্রাটের জন্যে? প্রজার জন্যে নয়?

চাণক্য ॥ প্রজারা সাম্রাজ্যের কি বোঝে?

অশোক ॥ না বুঝুক। তবু সাম্রাজ্য তো তাদের কল্যাণের জন্যে—

চাণক্য ॥ সম্রাটের কল্যাণে প্রজার কল্যাণ।

অশোক ॥ আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমি বিশ্বাস করি, সাম্রাজ্য প্রজাদের কল্যাণের জন্যে। তাই সৎ জীবন-যাপন ও সদাচার শিক্ষা দেবার জন্যে এবং তাদের ত্রিতাপ-দুঃখময় জীবনে সান্ত্বনার স্পর্শ এনে দেবার জন্যে আমি ভগবান তথাগতের বাণীকে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম মাত্র।

চাণক্য ॥ আর, তোমার সেই তথাগতের বাণী তাদের ব্যক্তিচরিত্র এবং জাতীয় চরিত্রকে দিয়েছে পঙ্গু করে। তুমি তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়েছো, সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করে তাদের পীত কাষায় পরিয়েছো। কিন্তু তুমি জানতে না, তোমার বহিঃশত্রুরা

অস্ত্রত্যাগ করেনি, তারা তোমার মতো কাষায় বস্ত্র পরিধান করেনি। তারা তোমার দুর্বলতার দিকে চোখ রেখে তাদের অস্ত্রে শান দিয়েছে।

অশোক॥ সেজন্যে তাদের নিরস্ত্র করে তথাগতের বাণীতে দীক্ষিত করবার জন্যে আমি দেশ-দেশান্তরে বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রেরণ করেছিলাম।

চাণক্য॥ প্রেরণ করেছিলে। কিন্তু তা নিষ্ফল হয়েছিল। তার প্রমাণ মৌর্য-সাম্রাজ্যের ওপর বহিঃশত্রুদের আক্রমণ এবং মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতন।

অশোক॥ তাতে আমার প্রয়াসের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। আমার পরবর্তী কালের সম্রাটেরা তথাগত বুদ্ধের বাণীকে কি রাজ্যমধ্যে, কি রাজ্যের বাইরে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

চাণক্য॥ নিজের অপরাধ অন্যের ওপরে চাপানোর চেষ্টা কাপুরুষের ধর্ম।

অশোক॥ যা সত্য, তা সত্যই। আমার শাসনকালে কোন বহিঃশত্রুই ভারত আক্রমণ করেনি।

চাণক্য॥ ওটা বহিঃশত্রুদের দয়া।

অশোক॥ দয়া নয়, ওটা আন্তরিক কামনা।

চাণক্য॥ শোন অশোক, রাজকার্য বুদ্ধির খেলা, মস্তিষ্কের ব্যায়াম। ওখানে হৃদয়ের স্পর্শ অনুচিত। শুধু অনুচিত নয়, তার ফলাফলও মারাত্মক। তুমি জানতে না, আরব-জগতে এর পর দুর্ধর্ষ ইসলামের আবির্ভাব হবে। সেই ইসলামই তোমার সর্বনাশের মূল কারণ হবে, তাও তুমি জানতে না।

অশোক॥ কিন্তু তার আগেই তো ভারত তথাগত বুদ্ধের বাণী থেকে দূরে সরে গিয়ে হাতে অস্ত্রধারণ করেছিল। সেই অস্ত্রে কি তারা প্রবল ইসলামকে বাধা দিতে পেরেছে? আসল কথা কি জানেন, অস্ত্র দিয়ে অস্ত্রকে রক্ষা করা যায় না। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘাতে এক পক্ষের অস্ত্র জয়লাভ করবেই। কিন্তু ভগবান তথাগতের বাণীতে হৃদয়-সংশোধনে উভয় পক্ষেরই জয়। এবং সেই জয়ই স্থায়ী জয়।

চাণক্য॥ আমি তা বিশ্বাস করি না।

অশোক॥ আপনারও হৃদয়ের সংশোধন প্রয়োজন।

চাণক্য॥ আমি চাণক্য। আমার হৃদয়ের সংশোধন চাই না। আমার হৃদয় নেই। আমি চাণক্যই থাকতে চাই।

অশোক॥ আমিও তথাগত বুদ্ধের দীন সেবক, জগতের দুঃখী মানুষের দাসানুদাস। আমাকে তাই থাকতে দিন। তবে শুনে রাখুন, আগামী দিনের ভারত যদি ভগবান তথাগতের আদর্শ অনুসরণ করে, তবে তার কল্যাণ হবে।

চাণক্য॥ আর তুমিও শুনে রাখো। সেই কল্যাণ কখনই স্থায়ী হবে না, যদি এই চাণক্যের কূটনীতি তার সঙ্গে যুক্ত না হয়॥

৩
আকবর
ও
ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেব ॥ ধর্ম আপনার কাছে বড় না হতে পারে, আমার কাছে কিন্তু বড়।

আকবর ॥ আমি তো কখনো কোন ধর্মকেই ছোট করিনি।

ঔরঙ্গজেব ॥ আপনি ইসলামকে ছোট করেছেন।

আকবর ॥ আমি ইসলামকে ছোট করেছি? কি বলছো তুমি, ঔরঙ্গজেব?

ঔরঙ্গজেব ॥ আপনি ইসলামকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত চালাবার চেষ্টা করেন নি? তাতে ইসলামের পবিত্রতা আপনি ক্ষুণ্ণ করেছেন।

আকবর ॥ হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণে ইসলামের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় যারা বলে, তারা গোঁড়া। গোঁড়ামিই ধর্মের শত্রু। তোমার জীবনদর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি—সবই গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন। তুমি তাই আমার 'দীন-ইলাহী'র মর্ম উপলব্ধি করতে পারোনি।

ঔরঙ্গজেব ॥ আপনি আমাকে গোঁড়াই বলুন আর যা-ই বলুন, আমি কিন্তু ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমি ইসলামকে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করেছি।

আকবর ॥ তাতে তোমার এবং সাম্রাজ্যের সর্বনাশ করেছো তুমি।

ঔরঙ্গজেব ॥ আপনি আমার প্রপিতামহ—গুরুজন। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি—

আকবর ॥ যে সিংহাসনের লোভে ভ্রাতাকে হত্যা করে, বৃদ্ধ পিতাকে করে বন্দী, তার মুখ থেকে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা শুনলে হাসি পায়।

ঔরঙ্গজেব ॥ আমার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে আপনিও তা করতেন।

আকবর ॥ ঔরঙ্গজেব, ভুলে যেওনা, আমি জ্যেষ্ঠপুত্র না হলে এবং আমীর-ওমরাহ্‌রা আমাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত না করলে আমি কখনই সিংহাসনে বসতাম না। আর তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র না হয়েও প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

ঔরঙ্গজেব ॥ কিন্তু আপনি ভেবে দেখেছেন কি, আমি পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃহত্যা না করলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা সিংহাসনে আরোহণ করতো। তাহলে তাতে হতো ভারতবর্ষ এবং ইসলামের পক্ষে ঘোর দুর্দিন।

আকবর ॥ এ অনুমান তোমার ভ্রান্ত।

ঔরঙ্গজেব ॥ কিন্তু দারা যে বড় বেশী ধর্মপ্রবণ, বড় বেশী কোমল-হৃদয় আর বড় বেশী হিন্দুমনোভাবাপন্ন ছিল।

আকবর ॥ সেই সঙ্গে বলো, সে বড়ো বেশী জনপ্রিয় ছিল; আর তুমি, তার জনপ্রিয়তায়

ভীত এবং ঈর্ষান্বিত হয়েছিলে। আমাকে উত্তর দাও তো, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা জীবিত থাকতে তুমি কেন সিংহাসনে বসবার জন্যে ও রকম হিংস্র হয়ে উঠেছিলে ?

ঔরঙ্গজেব ॥ বিপন্ন ইসলাম এবং আপনার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে।

আকবর ॥ তুমি একথা মনে করছো কেন যে, দারা সিংহাসনে বসলে ইসলাম বিপন্ন হতো এবং আমার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেত।

ঔরঙ্গজেব ॥ দারা যে বড় বেশী হিন্দুভাবাপন্ন আর দুর্বল-হৃদয়ের মানুষ ছিল। তার বদলে যে-কোন হিন্দু সিংহাসনে বসলেও বিশেষ ক্ষতি হতো না। আপনি কি জানেন, যত মুসলমান তার সমর্থক ছিল, তার চেয়ে হিন্দুরা ছিল তার বেশী সমর্থক।

আকবর ॥ তাতেই তো মোগল সিংহাসন এবং মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হতো।

ঔরঙ্গজেব ॥ আপনার সে ধারণা ভুল। আমি শক্ত হাতে হাল না ধরলে যে মোগল সাম্রাজ্যের ভরাডুবি হতো। তাতে ইসলামও—

আকবর ॥ তোমার হাত যখন এতই শক্ত, তাহলে তোমার হাতেই মোগল সাম্রাজ্যের ভরাডুবি হলো কেন ? আর, ইসলাম যদি বিপন্ন হয়ে থাকে, তবে তা তোমার শক্ত হাতেই হয়েছে।

ঔরঙ্গজেব ॥ কি করবো, প্রপিতামহ, হিন্দুরা যে আমার সঙ্গে শুরু থেকেই বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো।

আকবর ॥ সেইজন্যে দারাই ছিল সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত ব্যক্তি। তাহলে তার পেছনে জনসমর্থন থাকতো প্রবল। জনসমর্থনই সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

ঔরঙ্গজেব ॥ কিন্তু সে যে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জানতো না।

আকবর ॥ যে প্রবল হিন্দুশক্তি তোমার সারাজীবন বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারাই তার সাম্রাজ্যের হতো দুর্জয় স্তম্ভ। তারাই তার সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্য রক্ষা করতো। আমার সাম্রাজ্য বিস্তার আর প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল প্রবল হিন্দুশক্তি। তারাই তো একের পর এক যুদ্ধ জয় করেছে, মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করেছে। আমি যেটা ঠেকে শিখেছিলাম, দারা সেটা জন্ম থেকেই পেয়েছিল। আসলে, এদেশটা হিন্দুস্থান—হিন্দুদের দেশ। এখানে যতই স্থায়ীভাবে বসবাস করি না কেন, আমরা কিন্তু আসলে আগন্তুক—বহিরাগত। ইসলামও এখানে আমাদের মতোই আগন্তুক। হিন্দুসমর্থন না পেলে এখানে এতদিন সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব হতো না। আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি এ সত্যটা উপলব্ধি করেছিলাম। তাই হিন্দুরা যাতে শত্রু হয়ে না ওঠে, সেজন্যে আমি তাদের সঙ্গে শুধু মৈত্রী নয়, আত্মীয়তা পর্যন্ত স্থাপন করেছিলাম। উচ্চপদে যোগ্যতা-অনুসারে হিন্দুদের নিযুক্তও করেছিলাম।

ঔরঙ্গজেব ॥ তাতে আপনি আরো ভুল করেছিলেন। আপনি হিন্দুদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাতে আমাদের অসুবিধা হয়েছিল। রক্তের-স্বাদ-পাওয়া বাঘের মতো তারা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস লাভ করেছিল। ক্ষমতার স্বাদ আপনি না দিলে আমাকে এত নাজেহাল হতে হতো না।

আকবর ॥ ঔরঙ্গজেব, ভুলে যেওনা, আমরা হিন্দুদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই এ

দেশের সম্রাট হয়েছিলাম। হিন্দুরা ক্ষমতার স্বাদ জানতো না—তোমার অনেক ভুল ধারণার মধ্যে এ-ও একটা ভুল ধারণা। কিন্তু একটা জাত, তা সে যতই খণ্ড-বিখণ্ড হোক, পরাজিত হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মগোপন করবে, কোনদিন সে আত্মপ্রকাশ করতে চাইবে না, এ হতে পারে না। বিশেষতঃ, এই হিন্দু বহুদিনের প্রাচীন একটা জাতি। এর শৌর্যবীর্যের আছে গৌরবময় ইতিহাস। কাজেই, হিন্দুর সেই বীরত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারলে তুমি ভালো করতে। আমি তাই করেছিলাম। আর, তুমি তাকে শত্রুভাবাপন্ন করে তুলে নিজের এবং সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলে।

ঔরঙ্গজের ॥ তাতে যে ইসলাম দুর্বল হয়ে যেত, প্রপিতামহ।

আকবর ॥ তোমার সে ধারণাও ভুল। হিন্দুদের সহযোগিতায় বরং ইসলাম শক্তিশালী হতো। এবং সাম্রাজ্যও এত দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতো না। সেইজন্যেই আমি 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত প্রচারের চেষ্টা করেছিলাম। তাতে হিন্দু এবং মুসলমানের মিলনের একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিলাম আমি। হিন্দু এবং মুসলমান—উভয়েই ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মসর্বস্ব জাতি। কিন্তু সাধারণ মানুষ ধর্মের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে অন্নবস্ত্রে আর জীবনে। তাতে উভয়ের ভালোটুকু নিয়ে উভয়ের আচরণীয় একটি সাধারণ ধর্মমত গঠন করে, তাদের তাতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান হতো। সেই সঙ্গে অন্নবস্ত্র এবং সুখী জীবনের ব্যবস্থা করতে পারলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি হতে পারতো অটল। তাতে ইসলামেরও ভবিষ্যৎ হতে পারতো মজবুত। কিন্তু আমার পরে আমার 'দীন-ইলাহী' লুপ্ত হলো। কেউ বুঝতে পারলো না তার প্রয়োজনীয়তার কথা। তুমি তো একেবারেই পারোনি। তুমি শুরু থেকেই জেহাদ ঘোষণা করলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তাদের মন্দির ভেঙেছো, জিজিয়া কর বসিয়েছো, হিন্দুকে বিদ্রোহী করে তুলেছো। এসব না করে যদি তুমি একটু হিন্দুদরদী হতে, তাদের সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করতে, মোগল-সাম্রাজ্যের এত শীঘ্র পতন হতো না।

ঔরঙ্গজেব ॥ আপনি যেখানে সফল, আমি সেখানে ব্যর্থ। কাজেই, আপনার কথাই আমাকে আজ স্বীকার করতেই হবে। আমি ভুল করেছিলাম—সারাজীবন শুধু ভুলই করেছি আমি। সেই ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে জীবনটা শেষ করেছি। প্রায়শ্চিত্ত করার যে আর সময় ছিল না, প্রপিতামহ ॥

৪
রুশো
ও
নেপোলিয়ান

নেপোলিয়ান ॥ আপনি ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু বিশ্ববন্দিত মশিয়ঁ রুশো? আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

রুশো ॥ তুমি কে যুবক? তোমাকে তো আমি চিনি না।

নেপোলিয়ান ॥ আমি আপনার দাসানুদাস সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টি।

রুশো ॥ ও তুমিই সেই কর্সিকান যুবক, যে ফরাসী বিপ্লবের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে মাটি করে দিয়েছিল?

নেপোলিয়ান ॥ আপনার এই অভিযোগ সবই অসত্য, মশিয়ঁ। আমি ফরাসী বিপ্লবের ভাবমূর্তি বা তার আদর্শকে বিনষ্ট করি নি। আমি বরং ফরাসী বিপ্লবের ফলাফলকে স্থায়িত্ব দিয়েছি।

রুশো ॥ তুমি ফরাসী বিপ্লবের ফলাফলকে স্থায়িত্ব দিয়েছো? উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক, তুমি ফরাসী বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সফল করেছো। তোমার কাছে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত খেয়াল এবং ব্যক্তিগত উন্নতি ছিল বড়ো। এগুলির কোনটিই ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ছিল না। ফরাসী বিপ্লব চেয়েছিল মানুষের মুক্তি, সকল মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা এবং মানুষে-মানুষে অবাধ মৈত্রী। স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব—এই ছিল ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ। আর, তুমি এগুলির কণ্ঠরোধ করে সেখানে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠা করেছো।

নেপোলিয়ান ॥ মশিয়ঁ আমাকে পুরোপুরি ভুল বুঝেছেন। আপনি যাকে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলছেন, আসলে কিন্তু তা নয়। যখন বিপ্লবের নামে ফ্রান্সে চলেছিল বিভীষিকার রাজত্ব, যখন সমগ্র ফ্রান্সের অন্তরাত্মা রক্তস্নানে আর্তনাদ করে উঠেছিল, তখন কে তাকে সেই অবারিত রক্তপাতের বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা করেছিল জানেন, মশিয়ঁ? সে এই দীন কর্সিকান যুবক—নেপোলিয়ান। সেদিন এই দুঃসাহসিক যুবক যদি স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ না করতো, তাহলে ফ্রান্সে আরো রক্তক্ষয় হতো। বিপ্লবে যত রক্তক্ষয় হয়েছিল, প্রতিবিপ্লবে তার চেয়ে অনেক বেশি রক্তক্ষয় হতো। আমি ফ্রান্সকে সেই ভয়াবহ সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলাম মাত্র।

রুশো ॥ নিজেকে সম্রাট বলে তোমার ঘোষণা করাও কি সেই ভয়াবহ সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার অঙ্গ?

নেপোলিয়ান ॥ আপনি আপনার 'সামাজিক চুক্তি'তে কোথাও একথা উল্লেখ করেননি যে, কেউ কখনো সম্রাট হতে পারবে না। জনগণ তাদের কল্যাণের জন্যে শুভবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের মধ্যে একজনকে রাজা বা সম্রাট নির্বাচন করতে পারে। রাজা বা সম্রাট জনবিরোধী কাজ করলে জনগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। আপনার 'সামাজিক চুক্তি'র বক্তব্য তো মোটামুটি এই। কিন্তু আপনি জানেন, আমি জোর করে কিংবা স্বেচ্ছায় সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিনি। ফরাসী বিপ্লব যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে, আমি সেখানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছি এবং জনগণ গণভোটের মধ্যস্থতায় আমাকে সম্রাট উপাধি দান করে। জনগণ যদি কোনদিন গণভোটের জোরে আমার পদত্যাগ কামনা করতো, আমি নিশ্চয়ই পদত্যাগ করতাম। কিন্তু জনগণ কোনদিন তা চায়নি।

রুশো ॥ জনগণ কোনদিন তোমার পদত্যাগ চাইতে পারেনি। কারণ তুমি তাদের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিলে।

নেপোলিয়ান ॥ মশিয়েঁর এ ধারণাও অসত্য। আমি কোনদিনই ফ্রান্সের জনগণের বিরোধী কাজ করিনি। বরং আমার প্রতিটি কাজের পেছনে ছিল প্রবল জনসমর্থন।

রুশো ॥ আচ্ছা বেশ। তুমি সারা য়ুরোপে যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলে কেন? তাও কি বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

নেপোলিয়ান ॥ হ্যাঁ মশিয়েঁ, তা বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব কেবলমাত্র ফ্রান্সের একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং বিপ্লবে কোথাও কখনো বলা হয়নি যে, এগুলি কেবলমাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অর্থ বিশ্বের মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। আমি বিপ্লবের সেই আদর্শকে যথাযথভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলাম মাত্র। ফ্রান্স যখন বিপ্লবের মধুর ফল ভোগ করছে, তখনই য়ুরোপের অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে জনগণ নিষ্পেষিত হচ্ছিল। রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর নাগপাশ থেকে তাদের মুক্তিদানের জন্যে আমাকে অভিযান চালাতে হয়। যেখানেই অভিযান চালিয়েছি, সেখানেই ও-দেশের জনগণ ফরাসী বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীরূপে, মিত্রবাহিনীরূপে স্বাগত জানিয়েছে। য়ুরোপের রাজন্যবর্গ জোটবদ্ধ হয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সেই বাধা তাসের প্রাসাদের মতো ভেঙে পড়েছে। সারা য়ুরোপকে আমি সেদিন মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলাম।

রুশো ॥ ইংলণ্ডকে তো সে স্বাদ দিতে পারোনি।

নেপোলিয়ন ॥ ওরা দোকানদারের জাত, ওরা বিপ্লব বোঝে না, বিপ্লব চায়ও না।

রুশো ॥ কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি, প্যারিসের প্রতি তোমার এত পক্ষপাতিত্ব ছিল কেন?

নেপোলিয়ান ॥ ফ্রান্সের জনগণই তো আমাকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তাদের প্রতিই তো আমার আনুগত্য। আমি ফরাসী জাতিকে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলাম।

রুশো ॥ অন্যান্য জাতির অপরাধ? অর্থাৎ, তুমি, ফরাসী জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলে।

আর, তাই হলো তোমার এবং সারা য়ুরোপের সর্বনাশের কারণ। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদ সারা য়ুরোপের দেশে দেশে জাতীয়তাবাদের জাগরণ এনে দেয়। তার ফলে, জাতিতে জাতিতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। এমনকি, ফ্রান্সের অধীনতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা সংঘবদ্ধও হয়েছিল। ঠিক কিনা?

নেপোলিয়ান॥ ঠিক। ওটা আমার একটা ভুল। কিন্তু তাছাড়া উপায় ছিল না। আমার দ্বিতীয় ভুল হলো—

রুশো॥ 'স্পেনীয় ক্ষত।' ঠিক। রাজতন্ত্রের হাত থেকে স্পেনের জনগণকে তুমি মুক্ত করেছিলে, ভালোই। কিন্তু সেখানে স্পেনের কাউকে না বসিয়ে তোমার ভাই যোসেফকে বসিয়েছিলে কেন?

নেপোলিয়ান॥ সেইখানেই তো আমার ভুল। বিপ্লবের আদর্শ থেকে যদি কোথাও বিচ্যুত হয়ে থাকি, তবে ঐ দুটি ক্ষেত্রেই হয়েছি।

রুশো॥ তোমার এই স্বীকৃতিতে আমি খুশী হলাম॥

৫
আলেকজাণ্ডার
ও
দস্যু

আলেকজাণ্ডার॥ তাহলে তুমি স্বীকার করছো, তুমি—দস্যু?

দস্যু॥ হ্যাঁ সম্রাট। স্বীকার করছি, আমি দস্যু।

আলেকজাণ্ডার॥ কতদিন তুমি দস্যুবৃত্তি করছো?

দস্যু॥ দীর্ঘদিন।

আলেকজাণ্ডার॥ অপরের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেছো?

দস্যু॥ করেছি।

আলেকজাণ্ডার॥ তাদের বাড়িঘর পুড়িয়েছো?

দস্যু॥ পুড়িয়েছি।

আলেকজাণ্ডার॥ নরহত্যা করেছো?

দস্যু॥ তাও কখনো-কখনো করতে হয়েছে।

আলেকজাণ্ডার॥ কাজেই, তোমার অপরাধ ত্রিবিধ—লুঠ, অগ্নি-সংযোগ এবং খুন। এই ত্রিবিধ অপরাধে তুমি অপরাধী। এবং সেজন্যে তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

দস্যু॥ বিচারক কে? শাস্তিদাতা কে?

আলেকজাণ্ডার ॥ তোমার বিচারক এবং শাস্তিদাতা আমি—সম্রাট আলেকজাণ্ডার।
দস্যু ॥ তার আগে আপনার বিচারটা হয়ে যাওয়া উচিত নয় কি, সম্রাট ?
আলেকজাণ্ডার ॥ আমার বিচার ? আমি সম্রাট আলেকজাণ্ডার—
দস্যু ॥ হ্যাঁ সম্রাট, আপনার বিচার।
আলেকজাণ্ডার ॥ আমার অপরাধ ?
দস্যু ॥ আমার মতো দস্যুবৃত্তি।
আলেকজাণ্ডার ॥ দস্যুবৃত্তি ?
দস্যু ॥ সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক লুঠ, অগ্নি-সংযোগ এবং খুন।
আলেকজাণ্ডার ॥ তুমি উন্মাদ। দিনের পর দিন লুঠ, অগ্নি-সংযোগ এবং খুন ইত্যাদি অপরাধ করে করে তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে।
দস্যু ॥ আমি ক্ষুদ্র মানুষ। আমি আমার সামান্য ক্ষমতায় মানুষের অল্পস্বল্প ধন-সম্পত্তি লুঠ করেছি, অল্প-সংখ্যক ঘরবাড়িতে অগ্নি-সংযোগ করেছি, দু' একটা খুন-খারাপিও করেছি। আর, আপনি দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট আলেকজাণ্ডার! আপনি রাজ্যের পর রাজ্য আক্রমণ করে কোটি-কোটি টাকার ধনরত্ন লুঠ করেছেন, মানুষের ততোধিক মূল্যের বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করেছেন। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, দেশের পর দেশ পুড়িয়ে ছারখার করেছেন। যারা আপনার এই পাপকর্মে বাধা দিয়েছে কিংবা যারা নিরপরাধ, আপনি এবং আপনার বিশাল সেনাবাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন। আমি যদি অপরাধী হই, আপনি আমার চেয়ে সহস্রগুণে বেশী অপরাধী। আমার অপরাধের শাস্তি যদি প্রাণদণ্ড হয়, তবে আপনার অপরাধের শাস্তি—
আলেকজাণ্ডার ॥ চুপ করো, দস্যু। তোমার ঔদ্ধত্য অসহ্য! তুমি ভুলে যাচ্ছ, কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো। আমি গ্রীক-সম্রাট দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার। আমার একটি ইঙ্গিতে পৃথিবীতে রক্তের নদী বয়ে যেতে পারে। সুদূর য়ুরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত ভূখণ্ড আমার পদানত। আমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার এই তামাশা অমার্জনীয়।
দস্যু ॥ আমি জানি, আপনি গ্রীক-সম্রাট দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার। জানি, সুদূর য়ুরোপ থেকে এশিয়া পর্যন্ত ভূখণ্ড আপনার পদানত। এবং আপনিও জেনে রাখুন, আমি সামান্য দস্যু মাত্র। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে তামাশা করবার মতো ঔদ্ধত্য আমার নেই।
আলেকজাণ্ডার। এসব তোমার তামাশা নয় তো কী ?
দস্যু ॥ শুনেছি গ্রীক-সম্রাট আলেকজাণ্ডার বিচক্ষণ, দূরদর্শী এবং বুদ্ধিমান্—
আলেকজাণ্ডার ॥ হীন স্তাবকতা ছেড়ে কি বলছিলে, বলো—
দস্যু ॥ দস্যুবৃত্তির অপরাধে আপনি আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সেইজন্যে আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনিও সেই একই অপরাধে অপরাধী—আমার চেয়ে সহস্রগুণে অপরাধী।

আলেকজাণ্ডার॥ রসনা সংযত করে কথা বলো, দস্যু। তুমি আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

দস্যু॥ আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না, সম্রাট। আপনি আমাকে যে শাস্তি দিতে চান, তা যতই কঠিন হোক, আমি তা মাথা পেতে গ্রহণ করবো। কিন্তু তার আগে আপনাকে আমার কথার জবাব দিতে হবে।

আলেকজাণ্ডার॥ তোমার কথার জবাব দিতে হবে? আচ্ছা বেশ। বলো, তোমার কি কথা? আমি জবাব দেবো।

দস্যু॥ আমি দস্যুবৃত্তি এবং তার আনুষঙ্গিক লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং হত্যা করেছি। ওসব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সম্রাট, আপনি আপনার অপরাধ অস্বীকার করছেন কেন? অপরাধ সব সময়েই অপরাধ।

আলেকজাণ্ডার॥ অবশ্যই। অপরাধ সব সময়েই অপরাধ।

দস্যু॥ তাহলে আপনি কি লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেননি?··· গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, দেশের পর দেশ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেননি?···লক্ষ-লক্ষ লোককে আপনি এবং আপনার সৈন্যবাহিনী কি বিনা অপরাধে হত্যা করেননি? আপনার লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ এবং নরহত্যার তুলনায় আমার অপরাধ তো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আপনি আমার বিচার করে আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করছেন। উত্তম কথা! সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু আপনার এই বিশাল অপরাধের কে বিচার করবে, সম্রাট?

আলেকজাণ্ডার॥ আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। সামান্য দস্যু হয়েও তুমি আজ আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছো। আমার শিক্ষাগুরু বিশ্ববন্দিত এরিস্টট্‌ল যে শিক্ষা আমাকে দিতে পারেননি, তুমি আজ আমাকে সেই শিক্ষা দিয়েছো। আমি আজ পর্যন্ত জানতাম—দিগ্বিজয় বীরের ধর্ম; জানতাম—লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ ও নির্বিচার নরহত্যার মধ্যস্থতায় রাজ্য-বিজয় বীরমাত্রেরই কর্তব্য; জানতাম—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। কিন্তু তোমার কাছেই আজ শিখলাম—দিগ্বিজয়, রাজ্য-বিজয়—দস্যুবৃত্তির নামান্তর; এ সব বৃহত্তর দস্যুবৃত্তিই।

দস্যু॥ কিন্তু পরিহাসের বিষয়, আমার দস্যুবৃত্তির শাস্তি হবে; অথচ আপনার দস্যুবৃত্তির বিচার কোনদিনই হবে না। কারণ আপনি শক্তিমান্, আপনি ক্ষমতাবান্। আমার সেই শক্তি নেই, সেই ক্ষমতা নেই; কাজেই, আমার বিচার হবে। জগতে দুর্বলদেরই শুধু বিচার হয়, ক্ষমতাবান্‌দের কোনদিনই বিচার হয় না। মানুষ মাত্রেই ক্ষমতার দাস। বিচারকও তা থেকে মুক্ত নয়।

আলেকজাণ্ডার॥ আশ্চর্য! তুমি আমাকে তোমার প্রতিটি কথায় বিস্মিত করছো। তোমাকে আমি আর শাস্তি দিই কি করে?

দস্যু॥ না সম্রাট, আপনি শক্তিশালী। আমি আপনার কাছে দুর্বল—নিতান্তই অসহায়। আপনিই আমার শাস্তিদানের যোগ্য ব্যক্তি। আপনি আমাকে শাস্তি দিন। আমি শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত।

আলেকজাণ্ডার ॥ শাস্তি আমি তোমাকে দেবো, দস্যু। শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। যাও বন্ধু, তুমি মুক্ত। তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে আজ আমি তোমাকে শাস্তি দিলাম ॥

৬
সম্রাট ও সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী ॥ সম্রাটের মঙ্গল হোক।
সম্রাট ॥ আপনি কে?
সন্ন্যাসী ॥ আমি এক সন্ন্যাসী।
সম্রাট ॥ তা আমি আপনার পরিচ্ছদ দেখেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন?
সন্ন্যাসী ॥ আমি তোমাকে দীক্ষা দিতে চাই।
সম্রাট ॥ দীক্ষা? কিসের দীক্ষা?
সন্ন্যাসী ॥ ধর্মে দীক্ষা দিতে চাই তোমাকে।
সম্রাট ॥ আমি কি বিধর্মী? আমার কি কোন ধর্ম নেই?
সন্ন্যাসী ॥ আছে। কিন্তু সে ধর্মে আমি তোমাকে দীক্ষিত করতে চাই না।
সম্রাট ॥ তবে আপনি আমাকে কোন্ ধর্মে দীক্ষিত করতে চান?
সন্ন্যাসী ॥ মানবধর্মে।
সম্রাট ॥ কেন? আমি কি যথেষ্ট মানব নই? বনে-জঙ্গলে, পর্বতগুহায় বাস করে আপনি কি যথেষ্ট মানব হয়েছেন?
সন্ন্যাসী ॥ রাজপ্রাসাদে সুখ-সম্ভোগের মধ্যে থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না। বরং সুখের প্রাচুর্যে এবং ভোগের আতিশয্যে মানুষ পশুতে পরিণত হয়।
সম্রাট ॥ সংসার ত্যাগ করে বনেজঙ্গলে শরীরকে কষ্ট দিলেই কি মানুষ হওয়া যায়?
সন্ন্যাসী ॥ না, তা হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্যে সাধনা করতে হয়।
সম্রাট ॥ কি সেই সাধনা?
সন্ন্যাসী ॥ আত্মানুসন্ধান।
সম্রাট ॥ পরিষ্কার করে বলুন।
সন্ন্যাসী ॥ আত্মানুসন্ধানের অর্থ নিজেকে জানা। আমি কে, কোথা থেকে আমার জন্ম, কি আমার পরিণাম—এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণই যথার্থ আত্মানুসন্ধান।
সম্রাট ॥ কি প্রয়োজন এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে?
সন্ন্যাসী ॥ এসব প্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেলে জগৎ ও জীবনকে জানা হয়।

সম্রাট ॥ জগৎ ও জীবনকে জেনে আমার লাভ ?

সন্ন্যাসী ॥ শোনো সম্রাট, জগতের রহস্য এবং জীবনের রহস্য না জানলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। এই-যে পৃথিবীতে মানুষ জন্মায় এবং মরে, সে স্বভাবতঃই জানতে চায়, তার এই জন্মের সার্থকতা কি এবং মৃত্যুর পরে কি তার পরিণাম।

সম্রাট ॥ তা তো সবাই জানে। জন্মের সার্থকতা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মধ্যে আর মৃত্যুর পরে মানুষের দেহ পৃথিবীতে মিশে যায়। এ কথা কে না জানে ?

সন্ন্যাসী ॥ তা যদি জেনে থাক, তবে এই সব ভোগ-সুখ এবং তারপর মৃত্যুর মধ্যে দেহাবসান—এর মধ্যে জীবনের সার্থকতা কোথায় ?

সম্রাট ॥ ভোগের মধ্যে, সুখের মধ্যে।

সন্ন্যাসী ॥ কিন্তু ভোগ আর সুখের কি শেষ আছে ? তাতে কি তৃপ্তি আছে আত্মার ?

সম্রাট ॥ আপনি আবার এর মধ্যে আত্মাকে টেনে আনছেন কেন ?

সন্ন্যাসী ॥ এই আত্মাই তো জীবন। আত্মা দেহের খোলটা ধারণ করেছে বলেই তো জীবন। মৃত্যুতে আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয় ; দেহের খোলটা ফেলে রেখে চলে যায়। কাজেই, দেহটা বাইরের সামগ্রী। ভোগে সেই দেহের তৃপ্তির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দেহ তো সীমিত। আত্মার তৃপ্তি ত্যাগে।

সম্রাট ॥ আপনি তো সব গোলমাল করে দিলেন আমার। আমি তো এতদিন জানতাম, এই দেহটাই সব। দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ।

সন্ন্যাসী ॥ তা হবে কেন ? জীবন অনন্ত। কারণ, আত্মা তো অবিনশ্বর। আত্মার মৃত্যু নেই। দেহের মৃত্যু হতে পারে, ধ্বংস হতে পারে। কিন্তু আত্মা দেহ থেকে দেহান্তরে চলে যায়—নতুন নতুন কলেবর ধারণ করে। সেখানেও তার জন্ম-জন্মান্তর কামনা-বাসনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সম্রাট ॥ আপনি আরও ভাবিয়ে দিলেন আমাকে। তাহলে আমার এই দেহও মরণশীল ? আমারও মৃত্যু হবে ?

সন্ন্যাসী ॥ জগতে কে কবে মৃত্যুকে ঠেকাতে পেরেছে ? মৃত্যু অনিবার্য—অবধারিত।

সম্রাট ॥ তাহলে জীবনের সার্থকতা কোথায় ?

সন্ন্যাসী ॥ ত্যাগে। ত্যাগেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা, সম্রাট।

সম্রাট ॥ কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

সন্ন্যাসী ॥ জগতের মানুষের বহু দুঃখ, বহু বেদনা। প্রাকৃতিক কারণ থেকে মানুষ দুঃখ পায়, আবার মানবিক কারণ থেকেও মানুষ দুঃখ পায়। সোজা কথায়, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী—এসব প্রাকৃতিক কারণজনিত দুঃখ ; এবং মানুষের অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন—এসব মানবিক কারণজনিত দুঃখ। এই দু'রকমের দুঃখ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে তোমার যা আছে, তা থেকে কিছু অংশ ত্যাগ করা প্রয়োজন।

সম্রাট ॥ কিন্তু ওভাবে ত্যাগ করলে যে—যা আমার আছে—তা আমার থাকবে না।

সন্ন্যাসী ॥ তুমি ত্যাগ না করলে কি সেগুলি তোমার থাকবে ? ভুলে যেও না, তুমি নিজেই থাকবে না—

সম্রাট ॥ আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।

সন্ন্যাসী ॥ তুমি সম্রাট। প্রজাদের দুঃখ দূর করাই তোমার কর্তব্য। তাদের দুঃখ বৃদ্ধি করা নয়। কাজেই, কিসে প্রজার কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করে নানা কল্যাণময় কাজে আত্মনিয়োগ করো। এই যে মানুষের সেবা করার কথা, তাদের দুঃখ দূর করে তাদের কল্যাণ করাই ধর্ম। এই হলো মানব-ধর্ম তথা কল্যাণ-ধর্ম।

সম্রাট ॥ আপনি আমাকে মার্জনা করুন। আমি না জেনে আপনাকে আঘাত দিয়েছি। আজ আপনি আমার মনের ভ্রান্তি দূর করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন। আর বিলম্ব করবেন না।

সন্ন্যাসী ॥ তোমার ভ্রান্তি যখনই দূর হয়েছে, যখনই তোমার মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো দেখতে পেয়েছো, তখনই হয়ে গেছে আমার দীক্ষা-দান। আমি চললাম। আমার এই দীক্ষা-দান তোমার জীবনে সফল হোক ॥

৭
মীরজাফর
ও
রবার্ট ক্লাইভ

ক্লাইভ ॥ কি সংবাদ, মি. মীরজাফর ? আপনাকে যেন আজ খুব বিষণ্ণ এবং চিন্তিত মনে হচ্ছে। কি ব্যাপার ?

মীরজাফর ॥ ঠিকই ধরেছেন, সাহেব। আমার মনটা আজ বড়ো বিচলিত, বিক্ষুব্ধ।

ক্লাইভ ॥ বিক্ষুব্ধ ? কি ব্যাপার ? হঠাৎ আপনার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো কেন ? বেশ তো খোশমেজাজে নবাবী করছেন।

মীরজাফর ॥ আপনার কর্মচারীরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।

ক্লাইভ ॥ আমার কর্মচারীরা আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে ? ইংরেজ কখনো দুর্ব্যবহার করতে পারে না। ইংরেজ সুসভ্য জাতি।

মীরজাফর ॥ ইংরেজ সুসভ্য জাতি ; আর, আমরা কি অসভ্য জাতি ?

ক্লাইভ ॥ না না, আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি, ইংরেজদের ব্যবহার সুসভ্য হওয়া উচিত।

মীরজাফর ॥ কিন্তু আমার সঙ্গে তাদের ব্যবহার ঠিক সুসভ্য নয়।

ক্লাইভ। আপনি কি বলতে চান ?

মীরজাফর ॥ ওরা যখন-তখন আমার কাছে গিয়ে টাকার জন্যে চাপ দেয়, ভয় দেখায়। আমি এত টাকা পাবো কোথায় ? আপনাদের যুদ্ধের খেসারত দিতে গিয়ে রাজকোষ তো একেবারে খালি হয়ে গেছে। আপনাদের বরাদ্দের ওপর আমার দিন যায়। বলুন, আমি ওদের টাকার দাবি মেটাবো কি করে ?

ক্লাইভ ॥ ওরা আপনার কাছে টাকার জন্যে চাপ দেয়, ভয় দেখায়? অসম্ভব। এ হতে পারে না।

মীরজাফর ॥ তবে কি আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি?

ক্লাইভ ॥ আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

মীরজাফর ॥ সাহেব, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ছাড়া আপনাকে গোপনে টাকা দিতে হয়েছে। তার ওপর ওরা যদি যখন তখন টাকা চায়, আমি কোথা থেকে দিই বলুন।

ক্লাইভ ॥ ওরা আপনাকে নবাব করেছে। তাই ওরা হয়তো আপনার কাছ থেকে কিছু বকশিশ চায়। আপনি ওটাকে খুশী মনে নিন। দুর্ব্যবহার বলছেন কেন?

মীরজাফর ॥ চাপ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার নামই কি বকশিশ। সাহেব, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না।

ক্লাইভ ॥ কি বলতে চান আপনি? ওরা কি আপনাকে নবাব করেনি?

মীরজাফর ॥ হ্যাঁ, ওরা আমাকে নবাব করেছে। কিন্তু নবাব করেছে কি আমাকে এইভাবে ভয় দেখিয়ে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করার জন্যে?

ক্লাইভ ॥ আমরা আপনাকে নবাব না করলে কি আপনি জীবনে নবাব হতে পারতেন?

মীরজাফর ॥ আমি নবাব হতে চাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ এবং আপনি আমাকে নবাব হতে অনুরোধ করেছিলেন।

ক্লাইভ ॥ আপনি নবাব হতে চাননি?

মীরজাফর ॥ হ্যাঁ, নবাব হতে চেয়েছিলাম দেশের ভালো করার জন্যে।

ক্লাইভ ॥ আপনি আমাকে সত্যি হাসালেন, নবাব মীরজাফর। আপনিও এখানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করছেন। টাকা, ক্ষমতা আর বাংলার মসনদের লোভে আপনি আপনার প্রভু সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বেইমানি করেছেন।

মীরজাফর ॥ সাহেব, আপনার কর্মচারীরাও আমাকে বেইমান বলেছে; আপনিও আমাকে বেইমান বলছেন?

ক্লাইভ ॥ বেইমানকে বেইমান বলতে ইংরেজ জাতি কখনো পিছপা হয় না। যা সত্য, তা সত্যই—দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

মীরজাফর ॥ যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর?

ক্লাইভ ॥ চোরকে চোর বলার মধ্যে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

মীরজাফর ॥ সাহেব, তবে শুনুন, বেইমানি যদি করে থাকি, তবে তা আপনাদের জন্যেই করেছি।

ক্লাইভ ॥ আজ আপনি আমাকে বারেবারেই হাসাচ্ছেন। আপনি আমাদের জন্যে সিরাজের সঙ্গে বেইমানি করেছিলেন? নাকি, নিজে নবাব হবার জন্যে?...টাকা, ক্ষমতা আর বাংলার মসনদ লাভ করবার জন্যে।

মীরজাফর ॥ তাহলে আমি ভুল করেছিলাম।

ক্লাইভ ॥ ভুল তো করেছেনই।

মীরজাফর ॥ তাহলে আমাকে সেই ভুল সংশোধন করার কথা এবার থেকে ভাবতে হবে।

ক্লাইভ ॥ তার সুযোগ পেলে তো ভাববেন।
মীরজাফর ॥ তার মানে—আপনি কি বলতে চান, সাহেব ?
ক্লাইভ ॥ খুব সহজ কথা।
মীরজাফর ॥ কি ?
ক্লাইভ ॥ আপনার মাথাটা যে এত মোটা, তা আমার জানা ছিল না।
মীরজাফর ॥ আপনার কর্মচারীদের মতো আপনিও ঠিক একই কথা বলে আমাকে অপমান করছেন ?
ক্লাইভ ॥ বিশ্বাসঘাতকের আবার মান-অপমান-বোধ আছে নাকি ?
মীরজাফর ॥ আপনিও আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছেন ?
ক্লাইভ ॥ বিশ্বাসঘাতককে কি বিশ্বাসভাজন বলবো ?
মীরজাফর ॥ আপনারা কি আমাকে আর বিশ্বাস করেন না ?
ক্লাইভ ॥ একটুও না ! এই সত্যি কথাটা বুঝে উঠতে আপনার এতদিন লেগে গেল ?
মীরজাফর ॥ উহ্, আমি কী ভুল করেছি ! আমি কী ভুল করেছি !
ক্লাইভ ॥ আর সেজন্যে দুঃখ করে কি হবে ? আপনাকে আমি আজ থেকে নবাবী থেকে পদচ্যুত করলাম।
মীরজাফর ॥ পদচ্যুত করলেন ? তাহলে আমি এখন যাবো কোথায় ?
ক্লাইভ ॥ মুর্শিদাবাদের অত পথঘাট আছে, আপনার যাবার জায়গা নেই ? পৃথিবীটা অনেক বড়ো এবং তার চেয়ে খুব বেশী রহস্যময় ॥

৮
শেক্‌স্‌পীয়ার ও নিউটন

শেক্‌স্‌পীয়ার ॥ আমি দেখলাম, পৃথিবীটা বড়ো সুন্দর। এর যেদিকে তাকাই, সেদিকেই সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। এর আকাশ, বনভূমি, নদী-নির্ঝর, পক্ষিকাকলি সুন্দর, বড়ো সুন্দর।
নিউটন ॥ ধন্যবাদ মহাকবি, আপনি পৃথিবীকে যেভাবে দেখেন, আমি সেভাবে পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত নই। আমার কাছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বড়ো রহস্যময়। এর যেদিকে তাকাই, সেদিকেই অতলস্পর্শ রহস্য। কিন্তু কি জানেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে রহস্যের কারখানা, তার প্রতিটি দরজা খোলার জন্যে একটি জীবনই যথেষ্ট নয়। তার সব দরজা খোলার জন্যে বহু জীবনের দরকার।
শেক্‌স্‌পীয়ার ॥ আশ্চর্য নিউটন, আপনি বৈজ্ঞানিক শুধু নন—আপনি মহা-বৈজ্ঞানিক। আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রহস্যময় দেখলেন। এর কক্ষে কক্ষে কত সৌন্দর্য, আপনার চোখ তার খবর রাখলো না। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—চারদিকে কত বিচিত্র

আয়োজন। আমার মনে হয়, আমি যদি আরো দীর্ঘজীবন পেতাম, এই পৃথিবীর সৌন্দর্যের হাটে আরো কিছুদিন বিকিকিনি করতে পারতাম। কিন্তু জীবন বড়ো ছোট, বুঝলেন বৈজ্ঞানিক মশাই। পৃথিবীর অনেক সৌন্দর্যপুরী অনাবিষ্কৃত থেকে গেল। পৃথিবীর মানুষকে অনেক সৌন্দর্যই উপহার দিতে পারলাম না।

নিউটন॥ আমারও তো সেই একই দুঃখ, মহাকবি। পৃথিবীর বহু রহস্যই অনাবিষ্কৃত থেকে গেল। জীবনটা বড়ো ছোট।

শেকস্পীয়ার॥ তবু আপনাতে আমাতে অনেক তফাৎ, বুঝলেন বৈজ্ঞানিক মশাই। পৃথিবীতে যা আছে, আপনি তার বেশী কিছু করতে জানেন না। আপনি শুধু পৃথিবীর ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যাই করেছেন। তার বেশী কিছু করতে পারেননি। যেমন ধরুন, আপনার মাথায় ঐ আপেল পড়ার ব্যাপারটা। আপেল কি এর আগে কখনো মাটিতে পড়েনি, নাকি কখনো কারো মাথায় পড়বে না? পড়েছে এবং পড়বে। কিন্তু আপনি তা থেকে ব্যাখ্যা করলেন, সব জিনিসই মাটিতে পড়ে। ঠিক পড়ে নয়, পৃথিবী পড়ায়—পৃথিবী তার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দিয়ে শূন্যের সব জিনিসকেই টেনে আনে।

নিউটন॥ আপনার কথা আমি অস্বীকার করিনা, মহাকবি। আপনি আমার ব্যাখ্যা ঠিক বুঝেছেন। কিন্তু এটা কি একটা কম রহস্য, পৃথিবী তার নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সব জিনিসকেই সজোরে তার দিকে আকর্ষণ করে আনছে। শুধু তাই নয়, মহাকাশের যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলোকে আমরা প্রায় প্রতি রাতেই দেখি, তারা তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এবং সেই আকর্ষণের ফলেই মহাশূন্যে স্থিতাবস্থা রক্ষিত হচ্ছে। একচুল এদিক-ওদিক হলেই ঠোকাঠুকি লেগে একটা প্রকাণ্ড ধরনের ভাঙচুর হয়ে যেত। এটা কি কম রহস্যময়?

শেকস্পীয়ার॥ সেই রহস্যময় মাধ্যাকর্ষণ আপনার আগেও ছিল, আপনার পরেও থাকবে। তার মানে আপনার বিজ্ঞান নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। যা আবহমান কাল ধরে আছে, আপনি শুধু তারই ব্যাখ্যা করতে পারেন। তার বেশী কিছু করার ক্ষমতা আপনার নেই।

নিউটন॥ আর, আপনি পৃথিবীতে যা আছে, তার ওপর কল্পনার রং চড়িয়ে একটা মিথ্যে জগৎ তৈরী করে তোলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আপনি মিথ্যে জগৎকে সত্যি বলে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করেন। এইভাবে আপনি কি তাদের প্রতারিত করেন না?

শেকস্পীয়ার॥ আপনার প্রথম অভিযোগ ভ্রান্ত। আমি কল্পনার রং চড়িয়ে যে জগৎ সৃষ্টি করি, সেই জগৎটা বাস্তব জগতের চেয়েও সত্য এবং সুন্দর।

নিউটন॥ সে আবার কি রকম?

শেকস্পীয়ার॥ ধরুন, আমার 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে' আমি যে ভেনিসের ছবি এঁকেছি, তার কোনদিন ধ্বংস হবে না। অথচ বাস্তব ভেনিস একদিন ধ্বংস হবে। আর ধরুন, ডেস্‌ডিমোনা—সে কি বাস্তবে অত সুন্দরী ছিল? আমি তাকে শিশিরসিক্ত

ফুলের মতো সুন্দর এবং নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করেছি। বাস্তব ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যু হবে, কিন্তু আমার ডেস্‌ডিমোনা মরেও বার বার জন্মাবে। তার মৃত্যু নেই।

নিউটন ॥ তার মানে পুরোপুরি অবাস্তব।

শেক্‌স্‌পীয়ার ॥ আপনার এই মৃত্যুময় এবং চিরদিনের অভ্যস্ত পৃথিবীর সঙ্গে না মিললেই বুঝি অবাস্তব? এটাই আপনাদের বৈজ্ঞানিকদের দোষ।

নিউটন ॥ রাগ করছেন কেন?

শেক্‌স্‌পীয়ার ॥ রাগ নয়। আপনাকে শিল্পের অবিনশ্বরতা স্বীকার করতে হবে। আপনার আবিষ্কার দু'দিন বাদে পুরনো হয়ে যাবে। কিন্তু মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াড', 'ওডিসি' কোনদিন পুরনো হবে না।

নিউটন ॥ তা না হয়, মানলাম। কিন্তু ওগুলি মানুষের কোন্ প্রয়োজনে লাগবে? বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনকে কত সাহায্য করে। কিন্তু সাহিত্য কোন্ কাজে লাগে?

শেক্‌স্‌পীয়ার ॥ সাহিত্য মানুষকে যে আনন্দ দেয়, তাতে তার জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। সাহিত্য থেকে মানুষ সুন্দর জীবনের দিকে চলার প্রেরণা পায়।

নিউটন ॥ আচ্ছা বেশ। বিজ্ঞান কি মানুষকে সুন্দর, সুখী, সুস্থ জীবনের প্রেরণা দেয় না?

শেক্‌স্‌পীয়ার ॥ তা দেয়। তবে আপনি শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই রহস্য দেখতে পান, মানুষের হৃদয়ে, তার চরিত্রে কত রহস্য আছে, তার খবর রাখেন কি? সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের বিবৃতি দেয়, তার চরিত্রের রহস্য উন্মোচন করে। আসলে, আপনি চলেন বাইরের দিকে, আমি চলি ভেতরের দিকে। তাই আপনাতে-আমাতে এত গরমিল।

নিউটন ॥ কিন্তু মূলতঃ পৃথিবী, মানুষ, মানুষের জীবন—আমাদের উপজীব্য বিষয় একই। সেইখানেই আমাদের মিল ॥

৯
সাধু ও অসাধু

সাধু ॥ সাধুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। কাজেই, অসাধুতা বর্জন করে সৎপথে চলবার চেষ্টা করো। তাতে তোমার এবং সমাজের ভালো হবে।

অসাধু ॥ আমি বিশ্বাস করি না যে, সাধুতাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সাধুতা মানুষের বানানো একটা কৃত্রিম কথা। পৃথিবীতে সাধু অসাধু বলে কোন কিছুর গায়ে কোন চিহ্ন বা বিজ্ঞাপন নেই।

সাধু॥ তা নেই। কিন্তু তা বলে পৃথিবীতে সাধুতা নেই, অসাধুতা নেই—এটা কেমন কথা ? পৃথিবীতে ভালো-মন্দ বলে দুটি কথা আছে। আছে কিনা ?

অসাধু॥ আছে। কিন্তু ও দুটি কথাও তো মানুষের বানানো—কৃত্রিম কথা। আসলে, পৃথিবীতে ভালো-মন্দ বলেও কিছু নেই।

সাধু॥ তুমি যে কথাগুলো বলছো, খুবই বিস্ময়কর। হাততালি পাবার প্রলোভনে মানুষ এরকম কথা অনেক বলে থাকে।

অসাধু॥ আমি মানুষের হাততালিকে গ্রাহ্য করি না।

সাধু॥ তবে তুমি কি গ্রাহ্য করো ?

অসাধু॥ আমি আমার লাভ বা ভালো ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য করি না।

সাধু॥ তোমার কথাগুলো খুব সাংঘাতিক এবং সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

অসাধু॥ হতে পারে। আমি আমার প্রয়োজন বা লাভালাভের বাইরে কিছু ভাবতে পারি না।

সাধু॥ আচ্ছা বেশ। তুমি তোমার নিজের ভালো-মন্দ বিষয়ে বেশ সচেতন। তোমার কোন্‌টা ভালো এবং কোন্‌টা মন্দ—তা তুমি অনায়াসেই বুঝে নিতে পারো।

অসাধু॥ তা পারি।

সাধু॥ তাহলে ভালো-মন্দ বা কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ—এ জ্ঞান তোমার আছে। ভালো-মন্দ বলে দুটি কথাও পৃথিবীতে আছে। তুমি তা স্বীকার করো বা না করো, কথা দুটি আছে।

অসাধু॥ তা স্বীকার করছি। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি, কাজ মাত্রই কাজ। ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। মানুষ তার সুবিধার জন্যে কোন কাজকে ভালো এবং কোন কাজকে মন্দ বলে থাকে। কাজেই, ভালো-মন্দ—এ সব বাছবিচার না করে কাজ করে যাওয়া উচিত। অন্ততঃ আমি তাই করি।

সাধু॥ আচ্ছা বেশ। আগুনে ঝাঁপ দেওয়াও একটা কাজ। ভালো-মন্দ বাছবিচার না করে তুমি তাতে ঝাঁপ দেবে ?

অসাধু॥ আমি তো আগেই বলেছি। নিজের ভালো-মন্দটা আমি খুব স্পষ্ট বুঝে নিতে পারি।

সাধু॥ ওটা তো পশুতেও বুঝতে পারে।

অসাধু॥ মানুষ তো মূলতঃ পশুই।

সাধু॥ কিন্তু মানুষ পশু নয়। তার একটা অংশ পশু হলেও তার অপর অংশ মানুষ। তাই সে পশু থেকে পৃথক্। তাইতো সে মানুষ।

অসাধু॥ তাই তো সে নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে।

সাধু॥ নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে ; আর, পরের ভালো-মন্দ সে বুঝতে পারে না ?

অসাধু॥ তার দরকার নেই।

সাধু॥ কারণ, তুমি স্বার্থপর।

অসাধু॥ তাতে কিছু আসে যায় না।

সাধু ॥ আসে যায়। শোন, মানুষ যে অংশে মানুষ, সে অংশটি হলো তার মন, তার হৃদয়। মানুষ একই সঙ্গে চিন্তাশীল এবং হৃদয়বান্ প্রাণী। তার বিবেক-বোধ আছে, বিচার-বুদ্ধি আছে, ভালো-মন্দ জ্ঞান আছে। যা তার নিজের পক্ষে মন্দ কিংবা ক্ষতিকর, তা অপরের পক্ষেও সমানভাবে মন্দ বা ক্ষতিকর। যা তার নিজের পক্ষে বেদনাদায়ক, তা অপরের পক্ষেও বেদনাদায়ক। এইখানেই সে পশু থেকে পৃথক্। তাছাড়া, আর একটা দিকও আছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সে সমাজ ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানুষ তাই অতি প্রাচীনকালে সমাজবদ্ধ হয়েছিল। কারণ, সে জানতো, সে যদি সমাজবদ্ধ না হয়ে একা-একা থাকতো, তাহলে হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণে এবং বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তির আঘাতে সে কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাই সে নিজের ভালোর জন্যে সবার সঙ্গে নিরাপদে বসবাস করবার জন্যে সমাজবদ্ধ হয়েছিল।

অসাধু ॥ আমি সে কথা অস্বীকার করি না।

সাধু ॥ কিন্তু সবার সঙ্গে এক জোট হয়ে বসবাস করতে হলে নিজেকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

অসাধু ॥ আমি তাও অস্বীকার করি না। তবে কিছুটা ত্যাগ করতে হয় বলেই সমাজের কাছ থেকে যত বেশী সম্ভব আদায় করে নেওয়া উচিত।

সাধু ॥ বা-রে। দেবে কম, নেবে বেশী—এ কেমন কথা ?

অসাধু ॥ আমি তো তাই বুঝি। সমাজকে যা দেবো, সুদে-আসলে তার অনেক বেশী আদায় করে নিতে হবে। কারণ, সমাজে আমি বাস করতে এসেছি নিজের ভালোর জন্যে, পরের ভালোর জন্যে নয়।

সাধু ॥ কথাটা মোটেই ঠিক হলো না। সমাজে সবার জন্যে কাজ করলে তোমারও ভালো হবে। এই কথা ভেবে সমাজের সবার ভালোর জন্যে কাজ করা উচিত।

অসাধু ॥ আমি ওকথা বিশ্বাস করি না।

সাধু ॥ আচ্ছা বেশ। তুমি শুধু তোমার ভালোটুকুই বোঝো—যে সমাজের ভালো বোঝে না, সে পরের ভালোও বোঝে না। পরের খারাপ করে, সমাজের ক্ষতি করে তুমি নিজের ভালো করতে চাও।

অসাধু ॥ তাতে ক্ষতি কি ?

সাধু ॥ ক্ষতি আছে বৈকি! ধরা যাক্, তুমি অতিরিক্ত লাভের জন্যে বাজে ভেজাল জিনিসকে ভালো বলে বাজারে বিক্রি করতে লাগলে। তাতে প্রচুর লাভ হলো তোমার। কিন্তু বিষাক্ত জিনিস খেয়ে সমাজে বহু লোকের মৃত্যু হলো। তুমি তাতে বিচলিত নও। তোমার প্রচুর লাভ হচ্ছে। তুমি তাতেই খুশী। কিন্তু একদিন তোমাকেই সেই বিষাক্ত জিনিস খেতে হলো। তারপর ?

অসাধু ॥ তাইতো। আপনি মনে বড়ো ভয় ধরিয়ে দিলেন। এখন থেকে ব্যাপারটা তো চিন্তা করতে হয় ॥

১০
শিক্ষক ও ছাত্র

* পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সম্পর্কে

উ. মা. '৭৮

ছাত্র ॥ সততার কথা বলছেন, স্যার? আজ সমাজে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই অসৎ মানুষের ভিড়। প্রতিটি মানুষ অসৎ, প্রতিটি মানুষের কাজকর্ম অসাধু, সেখানে কি করে আপনি আশা করেন, ছাত্ররা সৎ হবে—সৎভাবে পরীক্ষা দেবে?

শিক্ষক ॥ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি এবিষয়টি নিয়ে কিছু ভেবেছো। কিন্তু তোমার চিন্তাধারাটি অন্ধকার কানা গলির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে—আলোকিত পথের সন্ধান পায়নি। তাই তুমি এরকম কথা বলছো। কিন্তু মনে রেখো, স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না।

ছাত্র ॥ স্বামী বিবেকানন্দের কথা ছাড়ুন, স্যার। আজকের দিনে কে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মেনে চলছে। যারা মেনে চলছে বলে দাবি করে, সে শুধু মানুষকে ঠকাবার জন্যে তা বলে থাকে। দোকানের শো-কেশে স্বামী বিবেকানন্দকে সাজিয়ে রেখে ভেতরে প্রতারণার ঢালাও ব্যবস্থা পাকা। এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ কেন, কোন মহাপুরুষের কথা উচ্চারণ না করাই ভালো।

শিক্ষক ॥ তুমি বর্তমান যুগ নিয়ে বড়ো বেশী হতাশায় ভুগ্‌ছো। কিন্তু জানো তো, হতাশায় মানুষের ক্ষতি হয়—সমাজের ক্ষতি হয়। কাজেই, আশাবাদী হও। আশা করতে শেখো।

ছাত্র ॥ এ যুগে মানুষের কাছে আমাদের আশা করবার কিছুই নেই।

শিক্ষক ॥ মানুষ আজও ততখানি নিঃস্ব, দেউলে হয়নি। তুমি নিতান্তই অন্ধ হয়ে গেছ। তাই মানুষের মধ্যে আশাব্যঞ্জক কিছু দেখতে পাও না, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মধ্যে কিছু অন্যায় দেখতে পাওনা।

ছাত্র ॥ আপনি আমাকে যা-ই বলুন, এযুগে সততার কোন মূল্যই নেই। এ অবস্থায় সৎভাবে পরীক্ষা দিয়ে কি লাভ?

শিক্ষক ॥ দেখ, সততার মূল্য সব যুগেই ছিল, এখনও আছে। পরীক্ষায় সততার মূল্য আরও বেশী। অধিকাংশ ছাত্রই সৎভাবে পরীক্ষা দেয়। তারাই পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখায়। আর, কিছু-সংখ্যক ছাত্র আছে, যারা পড়াশোনা করে না, বইয়ের ধার ধারে না; পড়াশোনা না করেই পরীক্ষায় পাস করতে চায়—কৃতিত্ব দেখাতে চায়। বিনা পরিশ্রমে কৃতিত্ব দেখাবার প্রলোভনে তারা পরীক্ষা-মন্দিরে অসদুপায়কেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়। তার ফলে তারা কি করছে, জানো? যে কৃতিত্ব তার প্রাপ্য নয়, সেই কৃতিত্ব তারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা সর্বনাশ হচ্ছে দেশের—সমাজের। এই সব অসাধু ছাত্ররা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, নানা

দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হচ্ছে। তাতে তারা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও অসাধুতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সারা দেশের সর্বনাশ করছে। এই ছাত্ররা ছাত্র-সমাজের আদর্শ বলে পরিগণিত হতে পারে না, সমগ্র ছাত্র-সমাজকেও সেজন্যে পুরোপুরি দায়ী করাও যায় না।

ছাত্র ॥ না স্যার, পরীক্ষার হলে প্রায় সব ছাত্রই নকল করে। আর, করবে না-ই বা কেন? সারা সমাজটাই যেখানে অসাধু মানুষে ছেয়ে গেছে, সেখানে কি করে আশা করতে পারেন, একমাত্র ছাত্র-সমাজ থাকবে ধোয়া তুলসী-পাতা?

শিক্ষক ॥ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সমাজে প্রতিটি মানুষই বুঝি অসাধু। কিন্তু তা ঠিক নয়—ঠিক হতে পারে না। এখনও সমাজে বহু সৎ মানুষ আছেন। নইলে সমাজ কবে ধ্বংস হয়ে যেত। ছাত্র-সমাজেও বহু সৎ ছাত্র আছে। অল্পসংখ্যক ছাত্রের অপরাধে তাদের ওপরেও অপরাধের দায়ভাগ গিয়ে পড়ে।

ছাত্র ॥ কিন্তু স্যার, ছাত্রদের অপরাধকে যে আপনারা এত বড়ো করে দেখছেন, এর কারণগুলো কি একবার চিন্তা করে দেখেছেন? ছাত্ররা কেন পরীক্ষা-মন্দিরে নকল করে?

শিক্ষক ॥ কেন বলো তো?

ছাত্র ॥ সে কি আপনারা জানেন না?

শিক্ষক ॥ জানি। তবু তোমার বক্তব্য শুনতে চাই।

ছাত্র ॥ দেখুন স্যার, একটু আগে আপনি বললেন, আমরা পড়াশোনা করি না, বইয়ের ধার ধারি না। কথাটা ঠিক। আমরা অনেকেই পড়াশোনা করিনা। কেন করবো? করে কি হবে? পরীক্ষায় পাস করে কি চাকরি হবে?

শিক্ষক ॥ থামো, থামো। পরীক্ষায় পাস করে সবার চাকরি হয় না—কথাটা ঠিক। তাহলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে তাতে পাস করার জন্যে তোমাদের এত অপচেষ্টা কেন? ডিগ্রির যদি কোন দাম নেই, তবে অসৎ পথে তা পাবার জন্যে এত ব্যাকুলতা কেন?

ছাত্র ॥ যদি কোন রকমে একটা কিছু জুটে যায়—সেই আশায়।

শিক্ষক ॥ তাহলে চাকরি হবে না—এই হতাশায় নিশ্চয়ই তোমরা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন কর না।

ছাত্র ॥ সত্যি কথা বলবো, স্যার? পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না।

শিক্ষক ॥ তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মানুষ পড়াশোনা করে কেন? তার কারণ, সে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে আসতে চায়। তরুণ-সমাজ, তথা ছাত্র-সমাজই জাতির আশা-ভরসার স্থল। তারাই জাতির ভবিষ্যতের ভাগ্য-নিয়ামক। তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার যদি শূন্য পড়ে থাকে, তাহলে সমগ্র জাতিই দেউলে হয়ে যাবে। কে তাহলে তাকে নতুন নতুন পথ দেখাবে, কে তাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করবে, কে তাতে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে?

ছাত্র॥ কেন? সেজন্যে তো ভালো ছাত্ররা আছে।

শিক্ষক॥ আছে। আছে বলেই রক্ষে। কিন্তু তাই বলে অন্যেরাই বা ভালো হবার চেষ্টা করবে না কেন? জাতি তাদের কাছেও তো কিছু আশা করে?

ছাত্র॥ আপনি আজ আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছেন, স্যার।

শিক্ষক॥ দেখ, তোমাদের হতাশ হবার কারণ নেই। হতাশা মানুষের সর্বনাশ করে। সব সময় পৃথিবীর সব সমাজেই কিছু-না কিছু অসাধু লোক থাকেই। কিন্তু তারাই সব নয়। সমাজে সাধু ব্যক্তিরাও থাকেন। তাঁরা সৎপথে জীবন যাপন করেন। মানুষকে সৎপথে চলবার প্রেরণা দেন। এ যুগেও অনেক সৎ ব্যক্তি আছেন। তাঁরা আছেন বলেই সমাজটা এখনও টিকে আছে। আর, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন? তা আগেও ছিল, এখনও আছে। তবে আগে ছিল অল্প মাত্রায়, এখন তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। আগে অসদুপায় অবলম্বন করতো দু'চার জন; এখন অসদুপায় অবলম্বন করে দু'চার হাজার কিংবা তারও বেশী। তার কারণ, এখন ছাত্ররা পড়াশোনা করে কম। আমি অবশ্য ভালো ছাত্র যারা, তাদের কথা বলছি না। কিন্তু যারা পড়াশোনা করে না বা লেখাপড়া করতে ভালোবাসে না, তাদের লেখাপড়ায় এই অনিচ্ছার মূলে আছে তাদের চিত্ত-বিক্ষেপ। তাদের মনটা নানা বিষয়ে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলো, রাজনীতি ইত্যাদি নানা চটকদার এবং চমকদার ব্যাপার তাদের মনের অনেকটাই জবরদখল করে নেয়। লেখাপড়ার জন্যে মনের মধ্যে আর স্থান সংকুলান হয় না।

ছাত্র॥ তাহলে কি আপনি সমাজ থেকে সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলো, রাজনীতি ইত্যাদি তুলে দিতে বলেন, নাকি ছাত্রদের ওগুলো থেকে সরে থাকতে বলেন?

শিক্ষক॥ না। ওগুলোও সমাজে থাকবে এবং ছাত্ররাও ওগুলো থেকে দূরে সরে থাকবে না। ছাত্ররা সিনেমা-থিয়েটার দেখবে, খেলাধূলো করবে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করবে, দরকার হলে অংশও গ্রহণ করবে। কিন্তু লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে নয়। সব দিক দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে তাদের। সবার আগে তাদের দায়িত্ব-সচেতন হতে হবে। দায়িত্ব নিজের প্রতি, দায়িত্ব তার পরিবারের প্রতি, দায়িত্ব তার সমাজের প্রতি। সিনেমা, থিয়েটার, রাজনীতি ইত্যাদি তাদের জীবন-সত্যের সন্ধান দেবে। খেলাধূলো দেবে প্রতিযোগিতাময় জীবনে জয়লাভের প্রেরণা। তখন তারাই উপলব্ধি করবে, লেখাপড়া হলো জীবনের প্রস্তুতির চাবিকাঠি। তাহলে লেখাপড়ায় অবহেলা নয়, লেখাপড়ায় প্রযত্নই হবে তাদের লক্ষ্য।

ছাত্র॥ আপনার কথাগুলো বেশ ভালো লাগছে, স্যার। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনা, আমাদের দেশে তেমন দিন আসবে। ছাত্ররা মন দিয়ে শুধু লেখাপড়াই করবে, পরীক্ষায় নকল করবে না—এ সব আকাশকুসুম কল্পনা। বাস্তবে কোনদিনই তেমন হবে না।

শিক্ষক॥ আসল কথা কি জানো? অন্ধকারে থেকে থেকে বা অন্ধকার দিক চিন্তা

করতে করতে তোমরা শুধু অন্ধকারই দেখ। আলোকিত দিকটা তোমরা কেউ আজ দেখতে পাচ্ছো না।

ছাত্র॥ কি করে দেখবো স্থার? চারদিকেই তো অন্ধকার। বিশেষতঃ পরীক্ষার ব্যাপারে।

শিক্ষক॥ একটা কথা আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। সেটা হচ্ছে, পড়াশোনা করলে পরীক্ষায় ঠিক সফল হওয়া যায়। যদি ছাত্ররা নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাহলে সাফল্য কেউ আটকাতে পারবে না। তবে একথা ঠিক, আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন দরকার। পাঠ-সূচীরও পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার বৈচিত্র্যীকরণ চাই। অর্থাৎ, সবাইকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কেতাবী শিক্ষায় পাতার পর পাতা মুখস্থ করতে হবে—এই গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তনও একান্ত দরকার। নানা কারিগরি-বিদ্যা ও প্রযুক্তি-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষানিকেতন গড়ে তোলা আবশ্যক। তাহলে বহু ছাত্র সেদিকে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে। তাতে তার শক্তি ও প্রতিভার সদ্ব্যবহার হবে। তা নইলে গতানুগতিক শিক্ষাধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলে শক্তি ও প্রতিভার হবে অপচয়। এখন দেশে তাই হচ্ছে। তবে আশার কথা, সরকার ও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন সে বিষয়ে চিন্তা করছেন। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেশে কারিগরি-বিদ্যা ও প্রযুক্তি-বিদ্যার বহু শিক্ষা-নিকেতন গড়ে উঠবে। তখন দেখবে, দেশে পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। আর, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন? তাও দেখবে, কমে যাবে।

ছাত্র॥ তাহলে তো খুবই ভালো হয়, স্থার। আমাদেরও আর ভালো লাগছে না পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের এই নিন্দার কথা শুনতে। জানেন স্থার, এখন আমাদের মার্কশীট বা সার্টিফিকেটকে কেউ বিশেষ দাম দেয় না? তখন নিশ্চয়ই দেবে?

শিক্ষক॥ নিশ্চয়ই। তার চেয়েও বড়ো কথা, জাতি বাঁচবে। জাতির মর্মমূল থেকে দুর্নীতি ও অসাধুতার বিষ মুছে যাবে। একটা সহজ সচ্ছল হাসি ফুটবে সমাজের মুখে। ছাত্র-সমাজেরও দায়িত্ববোধ বাড়বে। শুধু তাদের কলঙ্কমোচন হবে না, নতুন জন্ম লাভ করে তারা জাতির সেবায় নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে! আমি সেই শুভ দিনের অপেক্ষা করে আছি।

ছাত্র॥ ধন্যবাদ স্থার! আমরাও সেই দিনের অপেক্ষা করে থাকবো॥

অনুসরণী

১. কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর:

সিরাজউদ্দৌলা ও সুভাষচন্দ্র; শ্রীচৈতন্য ও স্বামী বিবেকানন্দ; আলেকজাণ্ডার ও পুরু; শিবাজী ও রামদাস; ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও জোয়ান অব্ আর্ক; কৃত্তিবাস ও মাইকেল মধুসূদন; বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র; কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ; বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধী; বিক্রমাদিত্য ও আকবর।

২. নিম্নলিখিত চরিত্র-যুগ্মক নিয়ে কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর :

কবি ও বণিক ; শ্রমিক ও শ্রেষ্ঠী ; চোর ও শান্তিরক্ষক ; বনের বাঘ ও চিড়িয়াখানার বাঘ ; ধার্মিক ও ভিক্ষুক ; বাক্য-বীর ও অস্ত্র-বীর ; অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ ; যুদ্ধবাদী ও শান্তিবাদী ; কবি ও সমালোচক ; শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী ; মেঘ ও রৌদ্র ; সূর্য ও চন্দ্র ; আলো ও ছায়া ; সুখ ও দুঃখ ; আলো ও অন্ধকার ; কাক ও কোকিল।

*৩. পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্রের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর। উ. মা. '৭৮

*৪. ঔষধে ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল-মিশ্রণ মারাত্মক অপরাধ—এই সম্পর্কে একটি দোকানদার ও ক্রেতার কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

*৫. পাঠসূচী ও পরীক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্রের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

*৬. পণ্যমূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে দু'জন ভদ্রলোকের কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

*৭. চলচ্চিত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে দু'জন ছাত্রের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

*৮. সংবাদপত্র পাঠের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে দু'জন ছাত্রের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

*৯. রেলে এবং বাসে বিনাটিকিটে ভ্রমণ একটি সামাজিক অপরাধ—এই মর্মে দু'জন ছাত্রের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

*১০. পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-সংকট বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

ব্যাকরণ

"আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী, বাবর, হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে, তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।" —রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ বিচিন্তা

"বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ।" —রবীন্দ্রনাথ

ভাষা

প্রস্তাবনা

মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকেই ভাষার উদ্ভব। সভ্যতার সূচনা-লগ্নে জনগণ তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের প্রয়োজনে কতকগুলি মৌখিক ধ্বনির [Sound] সাহায্য গ্রহণ করে। এই ধ্বনিগুলির সাহায্যেই তারা তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-ক্রোধ ইত্যাদি মনের ভাবগুলিকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতো। তার আগে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করতো কেবলমাত্র ইশারা-ইঙ্গিত বা সংকেতের সাহায্যে। পরে সে সেই সংকেতকে ধ্বনিতে আরোপ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভাষায় কেবল এই সংকেতেরই কারবার। ধ্বনির এই সংকেত-শক্তিই হলো ভাষার মূল ভিত্তি।

আবার, বিশেষ বিশেষ জন-গোষ্ঠী এক-একটি ভাষার স্রষ্টা। বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রতিবেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে লালন করে। তাকে অবলম্বন করে সেই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে ওঠে। কথ্য ভাষাই কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ, কথ্য ভাষাই সাহিত্যিক ভাষার আদি জননী।

গতিই ভাষার জীবনীশক্তি এবং জনগণই তার ধারক ও বাহক। কিন্তু কোন কারণে ভাষা যখন জনগণের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন করে আভিজাত্যের গর্বে দূরে সরে গেছে, তখনই ঘটেছে তার অপমৃত্যু। এইভাবে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ভাষা আজ ইতিহাসের যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তবু সেই ভাষাগুলি একেবারে নিষ্ফলা হয়ে নেই। আজ আধুনিক য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষাগুলির উৎস-সন্ধানে যাত্রা করে সেই অধুনা-বিলুপ্ত ভাষাগুলির উপকূলে গিয়ে উপনীত হতে হয়।

বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উদ্ভূত। আর্যভাষা আর্যদের সঙ্গে প্রথমে ভারতে এসেছিল বৈদিক ভাষারূপে। ভারতের প্রাগ্‌-আর্য জাতিগুলির ভাষাসমূহের সঙ্গে অনিবার্য আদান-প্রদানের ফলে আর্যভাষার অবনতি ঘটে। পরে তার সংস্কার-সাধনের ফলে সৃষ্টি হয় সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা হলো কেতাবী ভাষা বা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর, তথা শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা। কিন্তু 'প্রকৃতি' অর্থাৎ লোক-সাধারণের মুখে মুখে নিত্য রূপান্তরিত হয়ে চললো প্রাকৃত ভাষা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণের বিশিষ্ট ভঙ্গি এবং কথ্য ভাষা অনুসারে তা পরিগ্রহ করলো ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

তাদের নাম হল শৌরসেনী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও মাগধী প্রাকৃত। কালক্রমে পূর্বাঞ্চলের মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হলো মাগধী অপভ্রংশ বা মাগধী অবহঠ্‌ট [এই নামটি পণ্ডিত গ্রীয়র্সনের দেওয়া] এবং মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভব হলো বাংলা ভাষার। কাজেই, একপ্রান্তে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা, অন্যপ্রান্তে বাংলা ভাষা ; মাঝখানে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস।

ব্যাকরণ

ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে ; আর ব্যাকরণ[১] সেই মনের ভাবকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। কাজেই, ভাষার সৃষ্টি আগে, ব্যাকরণের সৃষ্টি পরে। জনসাধারণের মুখে মুখে ভাষা রূপান্তরিত হয়ে চলে। ব্যাকরণ ভাষার সেই মৌল প্রবণতা, সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উচ্চারণ-পদ্ধতি বিষয়ে নিয়ম রচনা করে ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের পথ অঙ্কিত করে দেয়। ভাষা হৃদয়-মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং ব্যাকরণ তার শাসন-শৃঙ্খলা। কাজেই, কোন ভাষা শুদ্ধভাবে লিখবার জন্যে, পড়বার জন্যে, বুঝবার জন্যে এবং সেই ভাষায় কথা বলবার জন্যে ব্যাকরণ-পাঠ আবশ্যিক।

বাংলা ব্যাকরণ

বাংলা ব্যাকরণের[২] বয়স এখনো দুশো বছরও হয়নি। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-রচয়িতা পর্তুগীজ পাদ্রী মনোএল-দ্য-আস্সুম্প্‌সাম[৩]। তারপর ইংরেজ পণ্ডিত হ্যালহেড্‌ ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। রামমোহনও বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ; কিন্তু ইংরেজিতে[৪]। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক এবং বাংলায় গ্রন্থটির অনুবাদও হয়েছিল।[৫] তারপর ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়েছেন : নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য পণ্ডিতগণ। কিন্তু আজও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের অভাব ঘোচেনি॥

---

১. "ব্যাকরণ' একটি সংস্কৃত শব্দ। ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে বিশ্লেষণ, বিশেষ-রূপে এবং সম্যগ্‌রূপে বিশ্লেষণ করা।...ইংরেজী Grammar শব্দটি গ্রীক ভাষা হইতে আসিয়াছে, ইহার অর্থ 'শব্দ-শাস্ত্র'। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'ব্যাকরণ' শব্দটি ইংরেজী Grammar-এর অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বলিতে বাংলা ভাষার 'Grammar' বুঝায়।" —আচার্য সুনীতিকুমার

২. "সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরাজী Grammar এক জিনিস নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly....'ব্যক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ব্যাকরণং' অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্যন্তই [সংস্কৃত] ব্যাকরণের সীমা। সুতরাং ইংরাজী গ্রামার ও সংস্কৃত [বা বাংলা] ব্যাকরণ এক নহে।" —মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৩. Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez.

৪. The Grammar of the Bengali Language : 1778.

৫. গৌড়ীয় ব্যাকরণ : ১৮৩৩ ; রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

॥ প্রথম অধ্যায় ॥ বাংলা শব্দ-সম্ভার

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভারের যে সমৃদ্ধি, তার মূলে আছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তনপথ বেয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব। ফলে, অতি স্বাভাবিক কারণেই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বহু শব্দ বিবর্তিত হয়ে বাংলায় নব রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেই সঙ্গে লোক-সাধারণের সৃষ্ট বহু শব্দ এসেও তাতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। আবার, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকেও বহু শব্দ ঋণ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। নানা উপলক্ষে বাংলাদেশে বহু বিদেশী জাতির সমাগম ঘটেছে। তারা দীর্ঘকাল এদেশে বাস করেছে [বা তাদের সঙ্গে সংযোগ হয়েছে] এবং তাদের ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় রেখে গেছে।[১] সব মিলে বাংলা শব্দ-সম্ভারের সমৃদ্ধি আজ সত্যিই বিস্ময়কর।

বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভারকে বিশিষ্টভাবে ছয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়: তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী ও মিশ্র শব্দ।

১ তৎসম শব্দ: [তৎ = সংস্কৃত, সম = সমান; অর্থাৎ, সংস্কৃতের সমান।] যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তাদের বলা হয় তৎসম শব্দ। যেমন: বৃক্ষ, লতা, নদী, সমুদ্র, কাষ্ঠ, হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, সূর্য, সন্ধ্যা, আকাশ ইত্যাদি। এই সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় ঋণ-স্বরূপ গৃহীত। বাংলায় প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দই তৎসম শব্দ।

২. তদ্ভব শব্দ: [তৎ = সংস্কৃত, ভব = জাত; অর্থাৎ, সংস্কৃত থেকে জাত।] যে সব সংস্কৃত শব্দ যুগ-যুগান্তরের বিবর্তন-ধারাপথে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি স্তরের মধ্য দিয়ে রূপ-রূপান্তর লাভ করে বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ। যেমন:

সংস্কৃত >	প্রাকৃত >	বাংলা
হস্ত	হত্থ	হাত
ভক্ত	ভত্ত	ভাত
কাষ্ঠ	কট্ঠ	কাঠ
কৃষ্ণ	কহ্ন [কাহ্ন]	কান [+ আদরার্থে উ = কানু; + আদরার্থে আই = কানাই]

১. 'There is hardly a language that in some sense may not be called a mixed language. No nation or tribe was ever so completely isolated as not to admit a certain number of foreign words'. —ম্যাক্সমুলার

তেমনি : পদ>পা, ব্যাঘ্র>বাঘ, কণ্টক>কাঁটা, পক্ষী>পাখি, চন্দ্র>চাঁদ, সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ, কর্মকার >কামার, দধি>দৈ, স্বর্ণ>সোনা, চক্ষু>চোখ, কর্ণ>কান, বংশ>বাঁশ, হংস>হাঁস, সর্প>সাপ, নৃত্য>নচ্‌চ>নাচ, গ্রাম>গাঁ, মৃত্তিকা>মাটি, মক্ষিকা>মাছি, গৃহ>ঘর, পিতৃস্বসা>পিসি, কার্য>কাজ, সামন্তপাল >সাঁওতাল, লৌহ>লোহা, তাম্র>তামা, অর্ধ>আধ, ইক্ষু>আখ, মৎস্য>মাছ ইত্যাদি। প্রাকৃত থেকে জাত বলে এদের আর এক নাম **প্রাকৃতজ শব্দ**। এই শব্দগুলি বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছে।

আবার, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত অন্যান্য ভাষার বহু শব্দ কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে। সেই শব্দগুলিকে বলা হয় **রূপান্তরিত তদ্ভব**। যেমন : **তামিল শব্দ**—মুটৈ>মুটক [সং] মুডঅ [প্রা]>মোট [বাংলা]—বোঝা। পিল্লৈ—পিল্লিক [সং]>পিলুঅ [প্রা]> পিলে [বাংলা]। **গ্রীক শব্দ**—দ্রাখ্‌মে>দ্রম্য [সং]>দম্মে [প্রা]>দাম [বাংলা]। সুরিংক্‌স্‌> সুরঙ্গ [সং]>সুড়ঙ্গ [বাংলা]। **পারসিক শব্দ**—মোচিক>মোচিঅ [প্রা]>মুচি [বাংলা]। **তুর্কী শব্দ**—তুর্ক>তুরষ্ক [সং]>তুরুক [বাংলা]। তিগীন>ঠক্কুর [সং]>ঠাকুর [বাংলা]। **পহ্লবী শব্দ**—পোস্ত [লিখিবার চামড়া]>পুস্তিকা [সং]>পুঁথি [বাংলা]।

৩. **অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ :** যে সব তৎসম শব্দ বাঙালীর মুখে মুখে উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে রূপান্তর লাভ করেছে, তাদের বলা হয় অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ। যেমন :

তৎসম	> অর্ধ-তৎসম	তৎসম	> অর্ধ-তৎসম
কৃষ্ণ	কেষ্ট	পুত্র	পুত্তর
বিষ্ণু	বিষ্টু	শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ

তেমনি : শ্রদ্ধা>ছেদ্দা, শ্রীদাম>ছিদাম, শ্রী>ছিরি, বিশ্রী>বিচ্ছিরি, নিমন্ত্রণ> নেমন্তন্ন, প্রণাম>পেন্নাম, পুরোহিত>পুরুত, কায়স্থ>কায়েত, কুৎসিত>কুচ্ছিৎ, গৃহস্থ>গেরস্ত, গৃহিণী>গিন্নি, নিশ্চিন্ত>নিশ্চিন্দি, ঘৃণা>ঘেন্না, বৈদ্য>বদ্দি, স্বস্তি> সোয়াস্তি, যজ্ঞ>যজ্ঞি, মিত্র>মিত্তির, হা-প্রত্যাশা>হাপিত্যেশ, স্বাদ>সোয়াদ, অনাসৃষ্টি>অনাছিষ্টি, বৃহস্পতি>বেস্পতি, বিদ্যুৎ, মিথ্যা>মিছা, গ্রাম>গেরাম, রাত্রি>রাত্তির, রৌদ্র>রোদ্দর, জ্যোৎস্না>জোছনা, বৃষ্টি>বিষ্টি, মন্ত্র>মন্তর, তন্ত্র>তন্তর, মহোৎসব> মোচ্ছব, আধিক্যতা [ভুল সংস্কৃত]>আদিখ্যেতা ইত্যাদি। এদের সেমি-তৎসম [Semi-তৎসম] শব্দও বলা হয়।

লক্ষণীয় : তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। তদ্ভব শব্দের উৎস সংস্কৃত, এদের রূপান্তর বহু শতাব্দীর ক্রম-বিবর্তন ফল ; কিন্তু অর্ধ-তৎসম শব্দ প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত থেকে গৃহীত তৎসম শব্দ হলেও তার পরিবর্তন আকস্মিক উচ্চারণ-বিকৃতি-জনিত। যেমন : **তদ্ভব :** কৃষ্ণ>কন্‌হ>কান্‌হ>কান [কানু বা কানাই]। **অর্ধ-তৎসম :** কৃষ্ণ>কেষ্ট।

৪. **দেশী শব্দ :** বাংলা দেশে আর্য-জাতির বংশধর [এবং আর্যভাষার] আগমনের পূর্বে যে জাতি বাস করতো, তাদের কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান গ্রহণ করেছে। তাদের দেশী শব্দ বলা হয়। যেমন : চাউল, মুড়ি, ঢেঁকি, ঝাঁকা, খোয়া,

ধুচুনি, ঝিঙ্গা, ঝাঁটা, খোঁপা, টোপর, খাঁচা, ছাল, ঢাল, পেট, ঢিল, ধামা, ঢোল, মাঠ, খড়, কুলা, কলা, লাঠি, তেঁতুল, বাদুড়, গাড়ি, ঘোড়া, গাড়ু, ঘোমটা, বঁটি, ডাঁসা, ডাব, ঝাড়, ঝাড়া, বোঝা, দোয়েল, ফিঙে, কাতলা, চিংড়ি, চাঙা, ঢোঁড়া, ডিঙি, ঘুড়ি ইত্যাদি।

৫. **বিদেশী শব্দঃ** বাংলা দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ফলে বহু আরবী, ফারসী, ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, তুর্কী, চীনা, জাপানী, বর্মী ও রুশ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। তাদের বিদেশী শব্দ বলা হয়। যেমনঃ **আরবী**—আইন, আদালত, দলিল, দালাল, হাকিম, হুকুম, সমাজ, কোরান, কৈফিয়ত, ইমারত, তালেবর, মজ্‌দুর, মজুর, তলব, খবর, খাজনা, জিলা, মেরামত, তারিখ, তাবিজ, তামাদি, কাগজ, কলম, দরখাস্ত, ফসল, হিসাব, জাহাজ, তামাসা, গোলাম ইত্যাদি। **ফারসী**—আমির, উজীর, সিপাই, মালিক, দোকান, নালিশ, পেশা, মোক্তার, মোকদ্দমা, আবাদ, বাগান, খরচ, জমিদারী, ফরিয়াদ, চশমা, খাতা, দোয়াত, গোলাপ, পর্দা, মশলা, শিশি, সিন্দুক, রুমাল, শরিক, দালান, কারখানা, কারিগর ইত্যাদি। **ইংরেজি**—চেয়ার, টেবিল, গ্লাস, অফিস, জেল, মাইল, সিনেমা, স্টেশন, কলেজ, স্কুল, বল, বেঞ্চ, পকেট, নিব, রেল, মোটর, ট্রাম, বাস, থিয়েটার, ষ্টীমার, হাসপাতাল, পুলিস, কোর্ট, কলেরা, লাট, মাস্টার, ডাক্তার ইত্যাদি। **ফরাসী**—কাফে, কার্তুজ, কুপন, বিস্কুট, ওলন্দাজ, দিনেমার ফিরিঙ্গি, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। **পর্তুগীজ**—আলমারি, আলপিন, কেরানী, গরাদ, জানালা, আলকাতরা, সাবান, তোয়ালে, ফিতা, গামলা, বালতি, পেরেক, পাউরুটি, বোতল, চাবি, কামরা, পেয়ারা, নোনা, আতা, পেঁপে, কামিজ, ফিতা, বোতাম, আনারস ইত্যাদি। **ওলন্দাজ**—ইস্কাপন, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্ক্রুপ ইত্যাদি। **তুর্কী**—আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, চাকু, দারোগা, লাশ, বারুদ, বেগম, বিবি, বাহাদুর, কুলি, উর্দু ইত্যাদি। **চীনা**—কাগজ, চা, তুফান, চিনি, লিচু, লুচি ইত্যাদি। **জাপানী**—রিক্‌শা, হারিকিরি ইত্যাদি। **বর্মী**—লুঙ্গি, ঘুঘনি ইত্যাদি। **রুশ শব্দ**—বলশেভিক, সোভিয়েত, স্পটনিক ইত্যাদি। **পেরু শব্দ**—কুইনিন ইত্যাদি। **ইতালীয় শব্দ**—ম্যাজেন্টা ইত্যাদি। **অস্ট্রেলীয় শব্দ**—ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি। **তিব্বতী শব্দ**—লামা ইত্যাদি। তাছাড়া আছে **হিন্দী শব্দ**—বানি, কচুরী, হুণ্ডি ইত্যাদি। **গুজরাটী শব্দ**—তকলি, হরতাল ইত্যাদি। **মারাঠী শব্দ**—চৌথ, বর্গী ইত্যাদি। **পাঞ্জাবী শব্দ**—চাহিদা, শিখ ইত্যাদি। **সাঁওতালী শব্দ**—কম্বল, ময়ূর ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দঃ তদ্ভব, দেশী ও যে সব বিদেশী শব্দ বহুপূর্বে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়ে বিবর্তন-পথে বাংলা রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাদের খাঁটি বাংলা শব্দ বলা হয়। তদ্ভব ও দেশী শব্দের দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি বিশেষ বিদেশী শব্দ, যেগুলি বিবর্তিত হয়ে খাঁটি বাংলা শব্দরূপে গৃহীত হয়েছে, তারা হলোঃ দাম [<প্রাচীন গ্রীক শব্দ—'দ্রাখ্‌মে'], মুচি [<প্রাচীন পারসিক শব্দ—'মোচিক'] ইত্যাদি।

৬. **মিশ্র শব্দ ঃ** তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের মধ্যে যে-কোন এক শ্রেণীর শব্দের সঙ্গে অপর শ্রেণীর শব্দ বা প্রত্যয়াদির সংযোগে গঠিত শব্দকে মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ [Hybrid words] বলা হয়। যেমন ঃ **দেশী+বিদেশী**—হাট-বাজার, জলাজমি, কাজ-কারবার, জামাই-বাবু, রাজা-উজীর, ধন-দৌলত, শাক-সব্‌জি। **বিদেশী+দেশী**—মাস্টার-মশাই, ডাক্তারবাবু, ডাক্তার-বস্তি, পাউরুটি, অফিস-পাড়া, রেলগাড়ি, হাফ্‌-ছুটি, আইনসঙ্গত, হেড্‌-পণ্ডিত। **বিদেশী + বিদেশী**—উকিল-ব্যারিস্টার, কোর্ট-কাছারি, হেড্‌-মৌলবী, পুলিস-সাহেব, হাফ্‌-আখড়াই। বিদেশী প্রত্যয়যুক্ত মিশ্র শব্দ—পণ্ডিতগিরি, চড়নদার, বাড়িওয়ালা, নস্যদান। বিদেশী উপসর্গ-যুক্ত মিশ্র শব্দ—বে-হেড্‌, বে-হাত, গরমিল।

বাংলা ভাষায় মোট শব্দ-সংখ্যা প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার। তার মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার শব্দ তৎসম শব্দ, প্রায় আড়াই হাজার আরবী-ফারসী শব্দ, চারশো তুর্কী শব্দ, আটশো ইংরেজি শব্দ এবং প্রায় দেড়শো পর্তুগীজ ও ফরাসী শব্দ। তাছাড়া, কিছু অন্য বিদেশী শব্দও আছে। অবশিষ্টগুলি তদ্ভব ও দেশী শব্দ।

বাংলা শব্দ-সম্ভারকে আবার সাধারণভাবে দু' শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়ঃ **মৌলিক শব্দ ও আগন্তুক শব্দ**। সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত রূপে গৃহীত শব্দগুলিকে বলা হয় মৌলিক শব্দ। তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দগুলি তার অন্তর্ভুক্ত। আর, দেশী ও বিদেশী শব্দগুলি হলো আগন্তুক শব্দ। মজার ব্যাপার, বাংলাদেশের মাটিতে জাত দেশী শব্দগুলিও আগন্তুক শব্দ।

পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই আছে দুটি পৃথক রূপ : সাহিত্যিক [Standard Literary] রূপ ও কথ্য [Standard Colloquial] রূপ। প্রথমটি দিয়ে তার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়, দ্বিতীয়টি ফেরে লোকমুখে, ব্যবহৃত হয় দৈনন্দিন জীবনাচরণে। বাংলা ভাষারও আছে তেমনি দুটি রূপ : সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। বর্তমানে চলিত ভাষাও উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা।

ভাষা ও উপভাষা : একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে কোন জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে যে ভাষা গড়ে উঠে, তাকে বলা হয় উপভাষা [Dialect]। অঞ্চল-ভেদে বাংলার উপভাষাগুলিকে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত করা যায় : রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী ও কামরূপী। ভৌগোলিক বিচারে গঙ্গা ও ভাগীরথীবেষ্টিত পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'বরেন্দ্রী', পদ্মা ও ভাগীরথীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের উপভাষা 'বঙ্গালী' এবং ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন উত্তর ও পূর্ববঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী'।

ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি কারণে ভাষা থেকে যেমন উপভাষার উদ্ভব হয়, তেমনি নানা কারণে কোন একটি উপভাষা শক্তিশালী হয়ে অপর ভাষাগুলিকে আওতায় ফেলে বা বিনষ্ট করে ভাষায় পরিণত হতে পারে। যে যে কারণে একটি বিশেষ উপভাষা ভাষায় উন্নীত হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সেই উপভাষায় উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি। অপর প্রধান কারণ হচ্ছে, অঞ্চল বিশেষের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি। এমনি করেই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা বাংলা ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনি করেই কলকাতার উপভাষা আজ সমগ্র শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের কথ্যভাষা। প্রাচীন বাংলার অধিকাংশ কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গদ্য রচনার প্রথা প্রচলিত হয় এবং বাংলা আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিসাহিত্যিকদের প্রায় সবাই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা থেকে জাত বাংলা সাহিত্যের ভাষার পক্ষে বাংলা সাধু ভাষায় পরিণত হতে কোন বাধাই রইলো না।

উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ খ্যাতিমান্ লেখকদের হাতে বাংলা সাধুভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা

চলিত ভাষা বা কথ্য ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। বাংলা চলিত ভাষার প্রথম শক্তির সন্ধান করেন উইলিয়ম কেরী [দৃষ্টান্ত—'কথোপকথন']। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁকে সে বিষয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সন্ধান লাভ করেন এবং তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই সাফল্যের স্বাক্ষরবাহী। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম পেঁচার নক্শা'য় সেই শক্তিরই চর্চা করেন। অবশ্য, প্রায় সমসাময়িক কালে মধুসূদন তাঁর প্রহসন-যুগলে ['বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'] বাংলা চলিত ভাষার সার্থক প্রয়োগ করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ বাংলা চলিত ভাষার শক্তির সঙ্গে তার সৌন্দর্যও আবিষ্কার করলেন। বিবেকানন্দ বাংলা চলিত ভাষার শক্তি সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। তাকে সপ্রমাণ করলেন প্রমথ চৌধুরী [বীরবল], অবনীন্দ্রনাথ ও রাজশেখর বসু [পরশুরাম]। তারপর থেকে অতি-সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাঙালী লেখকদের সাহিত্যসাধনা বাংলা চলিত ভাষাতেই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য: কতকগুলি দিক দিয়ে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট: ১. সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশী; পক্ষান্তরে, চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের প্রাধান্য বেশী। কিন্তু চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি ও সমীকরণ প্রভৃতি নিয়মানুসারে তৎসম শব্দগুলির অল্পবিস্তর পরিবর্তিত রূপই ব্যবহৃত হয়। যেমন: বাহিরে>বাইরে, বাহির>বা'র, বের; উঠান>উঠোন, ভিতর>ভেতর, উনান>উনুন, দেশী>দিশি, বিলাতি>বিলিতি, নাই>নেই, কলিকাতা>কলকাতা, বোম্বাই>বোম্বে ইত্যাদি। ২. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদে এই পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন: সমাপিকা ক্রিয়া—করিতেছে> করছে, করিয়াছি>করেছি, করিয়াছিল>করেছিল, করিলাম>করলাম, করলেম, করলুম, করিতাম>করতাম, করতেম, করিতেছিল>করছিল, করিবে>করবে, ইত্যাদি। অসমাপিকা ক্রিয়া—পড়িয়া>পড়ে, চলিতে>চলতে, বলিবার>বলবার, ধরিবার>ধরবার ইত্যাদি। ৩. সর্বনাম পদেও এই পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। যেমন: তাহারা>তারা, যাহারা>যারা, কাহারা>কারা, তাহার>তার, যাহার >যার, কাহার>কার, তাহা>তা, সেই>সে, এই>এ ইত্যাদি। ৪. অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদ্ভব-প্রাধান্য লক্ষণীয়। যেমন: জন্য>জন্যে, হইতে>হতে [থেকে], দ্বারা, দিয়া>দিয়ে, অপেক্ষা>চেয়ে ইত্যাদি। ৫. চলিত বাংলায় সংস্কৃত অব্যয়গুলির তদ্ভব রূপই ব্যবহার করতে হয়। যেমন: অনন্তর>তারপর, যদ্যপি>যদি, তথাপি >তবুও, বরঞ্চ>বরং, অদ্য> আজ ইত্যাদি। ৬. চলিত বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্যও যথেষ্ট। যেমন: হন্‌হন্, থম্‌থম্, গম্‌গম্, শোঁ শোঁ ইত্যাদি।

এগুলি সাধারণ পার্থক্য; কিন্তু তাছাড়া আছে আরও বহু সূক্ষ্ম পার্থক্য। যেমন: সাধু ভাষার চাল গুরুগম্ভীর; চলিত ভাষার চাল অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু সাধু ভাষার চেয়ে চলিত ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সহজবোধ্য।

বাংলা সাধু ভাষার দৃষ্টান্ত : ১. অনন্তর, দ্বারী বীরবরকে নরপতি গোচরে উপস্থিত করিলে, রাজা, তদীয় আকার প্রকার দর্শনে, তাহাকে বিলক্ষণ কার্যদক্ষ স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বীরবর ! কত বেতন পাইলে, তোমার স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে ?

—বীরবর কাহিনী : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২. আমি জানিনা, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিনা, কিন্তু রমনীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ?

—মনুষ্য-ফল : বঙ্কিমচন্দ্র

৩. এইরূপে যখন একদিকে স্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী ব্যক্তিগণ ক্ষীণ ও দুর্বলভাবে এদেশীয়দিগের অজ্ঞান-অন্ধকার হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন অপরদিকে শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল।

—ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় : শিবনাথ শাস্ত্রী

৪. নিকটে একটা প্রকাণ্ড সুচ্ছায় নিমগাছ, ফুরফুর করিয়া প্রাণ-কাড়িয়া-নেওয়া চৈতী হাওয়া বহিতেছে —গাছটার তলদেশের প্রতি আমি কিয়ৎক্ষণ লুব্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

—ভিখারী সাহেব : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

৫. প্রদীপ জ্বালিয়া আমরা রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া থাকি, এবং তজ্জন্য কাঠ, তেল, চর্বি পোড়াইয়া আলো জ্বালি। একালের লোক গ্যাস পোড়ায়, অথবা কয়লা পোড়াইয়া বা দস্তা পোড়াইয়া বিজুলি বাতি, জ্বালায়।

—উত্তাপের অপচয় : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাংলা চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত : ১. বস্তুত, ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠেনি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে।

—জাপান-যাত্রী : রবীন্দ্রনাথ

২. যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর ; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর ? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয় ?

—বাঙ্গালা ভাষা : স্বামী বিবেকানন্দ

৩. ওস্তাদরা ঘরে বসে কাজ করছে, চেলারা যাচ্ছে সেখানে কাজ শিখতে—ঐসব পাড়ার ছোট-বড় নানা ছেলে। সেখানে ক্লাসরুম টেবিল-চেয়ার লাইব্রেরী লেকচার হল কিছুই নেই, অথচ দেখা যায় সেখান থেকে পাকা-পাকা কারিগর বেরিয়ে আসছে—পুরুষানুক্রমে আজ পর্যন্ত।

—শিল্পের অধিকার : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. বালী নিহত হয়ে যে পথে গেছে তা নিরুদ্ধ হয়নি ; সুগ্রীব, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর, বালীর পথে যেয়ো না। আমার শরে একা বালীই যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কিন্তু তুমি যদি সত্যভ্রষ্ট হও তবে তোমাকে সবান্ধবে হত্যা করব।

—শরৎ-ঋতু : রাজশেখর বসু

৫. একথা আমরা সকলে জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না ; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।

—বই পড়া : প্রমথ চৌধুরী

সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর :

১. দ্বারবান, তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল, মহারাজ ! বীরবল নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ, কর্মের প্রার্থনায় আসিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে।

—বীরবর কাহিনী

দারোয়ান তার মুখ থেকে খুঁটিনাটি সব জেনে নিয়ে রাজার কাছে গিয়ে বললো, মহারাজ। বীরবর নামে একটি সশস্ত্র লোক চাকরির আশায় এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

২. একদিন, নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ গোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে; ত্বরায়, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া, আমাকে সংবাদ দাও। —বীরবর কাহিনী

একদিন নিশুতি রাতে হঠাৎ মেয়েমানুষের কান্নার আওয়াজ রাজা শুনে বীরবরকে ডাকলে, সে তখনি সামনে এসে বললো, মহারাজ, কি হুকুম? রাজা বললেন, দক্ষিণ দিকে মেয়েমানুষের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; শীগগীর তার তথ্যতালাশ করে আমাকে খবর দাও।

৩. আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। —মনুষ্য-ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়ালে, আমার বোধ হয়, মানুষেরা ফলের মতো—মায়ার বোঁটায় সংসার-গাছে ঝুলে রয়েছে, পাকলেই পড়ে যাবে। সবগুলো পাকতে পায় না—কয়েকটা অসময়ে ঝড়ে পড়ে যায়।

৪. লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বী গভর্নর-জেনারেল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নবাগত সিবিলিয়ানদের কিছুদিন কলিকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া পরে রাজকার্যে প্রেরণ করিবেন।

—ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়

লর্ড ওয়েলেস্‌লির মতো প্রতিভাবান্ আর চিন্তাশীল গভর্নর-জেনারেল খুব কমই দেখা গেছে। তিনি স্থির করলেন যে, নতুন-আসা সিবিলিয়ানদের কিছুদিন কলকাতায় দেশীয় ভাষা শিখিয়ে পরে রাজকাজে পাঠাবেন।

৫. আচমনে এক গণ্ডূষ জল আবশ্যক; আমরা হিমালয় হইতে খাল খাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি এবং তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি।

—উত্তাপের অপচয়

আঁচাতে এক গণ্ডূষ জল দরকার; আমরা হিমালয় থেকে খাল কেটে গঙ্গা এনে ঘরের দরজায় হাজির করি, আর সেজন্যে একটা রাজ্যের তহবিল বাজে খরচ করি।

চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষায় রূপান্তর:

১. চেরিফুল যখন ফোটে তখন সারা জাপানের লোকের মন—সেও ফুটে ওঠে, ছুটি নিয়ে ছুট দেয় সেদিকে সব কাজ ফেলে। কই তাতে তো কেউ তাদের অকেজো বলতে সাহস করছে না? পেটও তো তাদের যথেষ্ট ভরছে। —শিল্পের অধিকার

চেরিপুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন সমগ্র জাপানের মনুষ্যের অন্তঃকরণ—তাহাও প্রস্ফুটিত হয়, ছুটি লইয়া ধাবিত হয় সেইদিকে সমস্ত কার্য ফেলিয়া। কোথায়, তাহাতে তো কেহ তাহাদের অকর্মণ্য বলিতে সাহস করিতেছে না? উদরও তো তাহাদের যথেষ্ট পূর্ণ হইতেছে।

২. তর্ক শুরু হল। ঘোড়ার লেজ কেটে তুলি হত; ঘোড়া যদি না থাকতো? পাখির পালক ছিঁড়ে নিতেন। পাখি না পেলে? নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেম। টাক পড়ে গেছে? নাতির গালে আঙুলের ডগার খোঁচা দিয়ে বললেম—দশটা আঙুলের এই একটা নিয়ে। —ঐ

তর্ক আরম্ভ হইল। অশ্বের পুচ্ছ কর্তন করিয়া তুলিকা হইত। অশ্ব যদি না থাকিত? পক্ষীর পালক ছিন্ন করিয়া লইতাম। পক্ষী না পাইলে? স্বীয় মস্তকের কেশ ছিন্ন করিতাম। ইন্দ্রলুপ্ত [টাক] পতিত হইয়াছে? পৌত্রের গণ্ডদেশে অঙ্গুলির অগ্রভাগের আঘাত দিয়া বলিলাম—দশটা অঙ্গুলির এই একটা লইয়া।

৩. রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? সবুজ শোভার ঢেউ একেবারে আকাশের বুকে গিয়ে ঠেকলো; ফুলের পরিমল, ভিজে মাটির সৌরভ বাতাসকে মাতাল করে ছেড়ে দিলে। —ঐ

রসিক, সমস্তই তোমার নিকট হইতে আসিবে, আমার নিকট হইতে তোমার দিকে কি কিছুই যাইবে না? সবুজ শোভার তরঙ্গ একেবারে আকাশের বক্ষে গিয়া ঠেকিল, কুসুমের পরিমল, সিক্ত মৃত্তিকার সৌরভ পবনকে মত্ত করিয়া ছাড়িয়া দিল।

৪. হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস্ রে! সে দু'টাকা এখনও শোধ দিলি নে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেছিস? —একাদশী বৈরাগী

ওরে নফর, তুই কি আমাকে মস্তকে পদ-স্থাপন করিয়া ডুবাইতে চাহিস রে! সেই দুই টাকা এখনও শোধ দিলি না, পুনরায় এক টাকা চাহিতে আসিয়াছিস কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ ইত্যাদি কিঞ্চিৎ আনিয়াছিস?

৫. না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী? আমি বাপ হয়ে তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে—তার বিধবা স্ত্রী শ্রাদ্ধ করতে পারবে, আর তুমি পারবেনা বললে চলবে কেন, বল? দশবিঘে জমি তুমি এতেও পাবে। —অগ্রদানী

না পারিলে উপায় কি, চক্রবর্তী? আমি পিতা হইয়া তাহার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছি, স্বল্পবয়স্কা বালিকা—তাহার বিধবা পত্নী শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, আর তুমি পারিবে না বলিলে চলিবে কেন, বল? দশবিঘা ভূমি তুমি ইহাতেও পাইবে।

● স্মরণীয় যে, একই রচনায় সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে **গুরুচণ্ডালী দোষ** ঘটে। যেমন: 'শব দাহ' কিংবা 'মড়া পোড়ান' শুদ্ধ। কিন্তু 'শব পোড়ান' বা 'মড়া দাহ' অশুদ্ধ।

॥ অনুসরণী ॥

১. ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্য কি? বাংলা সাহিত্যের ভাষা বাংলার কোন্ উপভাষা হইতে উদ্ভূত?

২. তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দ কাহাকে বলে—উদাহরণসহ পরিস্ফুট কর। উ. মা. '৬০

৩. দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও: তদ্ভব, মা. '৫০, '৫৪, '৬২; ব. প্র. '৬২; প্রাকৃতজ শব্দ, উ. মা. '৬১; তৎসম, মা. '৫৩, '৫৫; অর্ধ-তৎসম, মা. '৫৯, মা. [কম্পার্ট.] '৬২; উ. মা. '৬২, '৬৮; ভগ্ন-তৎসম, মা. '৬৩. উ. মা, '৬৩; খাটি বাংলা শব্দ; বিদেশী শব্দ ও মিশ্র শব্দ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২

৪. তদ্ভব শব্দ ও অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। মা. '৬০, উ. মা. '৬৫

৫. উদাহরণসহ তৎসম ও তদ্ভব শব্দের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬১

৬. দেশী ও বিদেশী শব্দ বলিতে কি বুঝায়?—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। ক. বি. '৫৭

৭. প্রাকৃতজ শব্দ এবং মৌলিক ও আগন্তুক শব্দ কাহাকে বলে?—দৃষ্টান্তসহ পরিস্ফুট কর।

৮. বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত পাঁচটি বিদেশী শব্দের ও তাহাদের আকরের উল্লেখ কর। উ. মা. '৬৬

৯. সাধুভাষা ও চলিত ভাষা কাহাকে বলে? কয়েকটি বাক্যের দৃষ্টান্ত সহযোগে উহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। মা. [কম্পার্ট.] '৬১

১০. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য কি? মা. '৬৫। গুরুচণ্ডালী দোষ কাকে বলে বুঝাইয়া দাও।

১১. চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর:

ক. অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া, রাজা আজ্ঞা দিলেন, তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে, বীরবরকে সহস্র স্বর্ণ দিবে; কোনও মতে অন্যথা না হয়। —বীরবর কাহিনী

[অনন্তর—তারপর, কোষাধ্যক্ষ—খাজাঞ্চি, অন্যথা—গোলমাল]

খ. বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল, এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে, সে দিবসের প্রাপ্য নির্ধারিত স্বর্ণ গ্রহণপূর্বক, নৃপনির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। —বীরবর কাহিনী

গ. দেবি! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে, কোনও মতে সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু, যদি এই হৃদয়বিদারণ অমঙ্গল ঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন; আমি, রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত, প্রাণান্ত পর্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। —বীরবর কাহিনী

ঘ. কোনটি সুপক্ব হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণ-ভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। —মনুষ্য ফল

ঙ. লর্ড ওয়েলেস্‌লি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নামক উড়িষ্যাদেশীয় কালেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। —ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়

১২. সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর:

ক. কিন্তু কস্তুরীর ব্যবসা করতে গিয়ে দানা-পানির উপায় ছাড়লে জীবনটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করা যাবে? কোথায় থাকবে তখন রস, কোথায় থাকবে তখন শিল্প? —শিল্পের অধিকার

খ. কবীরের কাজ ছিল সারাদিন তাঁত-বোনা, আফিসে বসে কলম পেশার কিংবা পাঠশালে বসে পড়া মুখস্থর সঙ্গে তার কমই তফাত। তাঁত-বোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা দায় হত। —শিল্পের অধিকার

গ. তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েছে কুল্‌লে সাত টাকা দু' আনা; তার দু' আনাই যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন? —একাদশী বৈরাগী

ঘ. কেন, মিছে কথা বলচি নাকি? ওর এত বড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্য জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি, জানো? —একাদশী বৈরাগী

ঙ. হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর হুঁ। নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে। —অগ্রদানী

বর্ণ

ধ্বনিই ভাষার মূল উপকরণ। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি থেকেই ভাষার সৃষ্টি। কালক্রমে, এক-একটি ধ্বনির জন্যে এক-একটি পৃথক বর্ণ রচিত হলো। এইভাবে রচিত হলো বর্ণমালা [alphabet]। ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, অশোকের ব্রাহ্মীলিপি থেকেই কালক্রমে বাংলা লিপির উদ্ভব। সেই হিসেবে বাংলা বর্ণমালায় আছে মোট একান্নটি বর্ণ।

বর্ণ দু' প্রকার: **স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

স্বরবর্ণ

যে সব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে, তাদের **স্বরবর্ণ** বলা হয়। বাংলায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ [ঌ], এ, ঐ, ও, ঔ—এই বারোটি স্বরবর্ণ। এদের মধ্যে ঌ-র ব্যবহার বাংলায় নাই। কাজেই, বাংলায় ব্যবহৃত স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারো।

স্বরধ্বনি প্রধানতঃ দু' প্রকার: **হ্রস্বস্বর** ও **দীর্ঘস্বর**। যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে অল্প সময় লাগে, তাদের বলা হয় **হ্রস্বস্বর**। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বর পাঁচটি: অ, ই, উ, ঋ, ঌ। আর, যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশী সময় লাগে, তাদের বলা হয় **দীর্ঘস্বর**। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর আটটি: আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ। বাংলায় দীর্ঘস্বর নেই।

সংস্কৃতে স্বরধ্বনির উচ্চারণের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতার ওপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে। কিন্তু বাংলায় তা নির্ভর করে না। তবু বাংলায় স্বরধ্বনির হ্রস্বতা-দীর্ঘতা সম্পর্কে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সাধারণতঃ শব্দের অন্তর্গত অক্ষর [syllable]-সংখ্যার ওপর স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা নির্ভর করে। এক-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন: এক. 'জল' [জ+ল] শব্দের অ-কার দীর্ঘ, কিন্তু 'জলা' শব্দের অ-কার হ্রস্ব। আবার 'কাক' শব্দের আ-কার দীর্ঘ। কিন্তু 'কাকা' শব্দের আ-কার হ্রস্ব। দুই. 'দিন', 'দীন' ও 'দিন' [দান করুন]—এক-অক্ষর-বিশিষ্ট এই তিনটি শব্দ যখন এককভাবে উচ্চারিত হয়, তখন তাদের 'ই' বা 'ঈ' দীর্ঘ। কিন্তু অন্যপদে যুক্ত হলে বা কোন বাক্যে প্রযুক্ত হলে তাদের উচ্চারণ হয় হ্রস্ব। যেমন:

'দিন'-রাত, 'দীন'-দুনিয়ার মালিক, ওকে বলে 'দিন' তো। তিন. 'গুণ' [quality]-এর 'উ'-কার দীর্ঘ; কিন্তু 'গুণী'-র 'উ'-কার হ্রস্ব। তেমনি—'রূপ'-এর 'উ'-কার দীর্ঘ হলেও 'রূপা'র 'উ'-কার হ্রস্ব। চার. 'এক' শব্দের উচ্চারণ 'এ্যাক' হওয়ায় এখানে 'এ' দীর্ঘ; কিন্তু 'একটি' শব্দের উচ্চারণ স্বাভাবিক হওয়ায় তাতে 'এ'-র উচ্চারণ হ্রস্ব। পাঁচ. 'লোক' শব্দের 'ও'-কার দীর্ঘ; কিন্তু 'লোকটি' শব্দের 'ও'-কার হ্রস্ব।

হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ছাড়া আর এক প্রকার স্বরধ্বনি আছে, তা প্লুতস্বর। দূর থেকে ডাকা, কান্না, গান ও আবৃত্তির সময় টেনে টেনে যে স্বরধ্বনিকে উচ্চারণ করতে হয়, তাকে বলে **প্লুতস্বর**। যেমন: কেষ্টা—আ-আ, হরে—এ-এ, 'হে ভবেশ'—'হে-এ-এ ভবেশ, 'এসো হে আর্য'—এসো হে আর্য-অ-অ।

স্বরধ্বনিকে অন্যদিক দিয়ে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: মৌলিক ও যৌগিক স্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর। যে স্বরধ্বনিগুলিকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাদের বলা হয় **মৌলিক স্বরধ্বনি**। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি আছে মাত্র সাতটি। যেমন: অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

অপর পক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে বলা হয় **যৌগিক স্বরধ্বনি** বা **মিশ্র স্বরধ্বনি** বা **সংযুক্তস্বর** বা **সন্ধিস্বর** বা **দ্বিস্বর ধ্বনি** বা **সন্ধ্যক্ষর** [Diphthong]। যেমন: 'ঐ' এবং 'ঔ'। বাংলায় এই দুইটি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ যথাক্রমে ও+ই=ওই এবং ও+উ=ওউ। আচার্য সুনীতিকুমার বাংলায় দুই স্বরধ্বনির সহাবস্থানে সর্বমোট পঁচিশটি যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যক্ষরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। যেমন: অয়্=ভয়, বয়, নয়; অ আ [অওয়া] = লওয়া; অও=হও, বও; আয়=যায়, খায়, দায়; আই=খাই, ভাই; আউ=ঢাউস, চাউল, বাউল; আও=দাও, নাও; অ্যাও=ম্যাও; ইয়া=নাইয়া, খাইয়া; ইএ, ইয়ে=বিয়ে, টিয়ে; ইউ = শিউলি, বিউলি; ইয়, হও, ইয়ো=প্রিয়, দিও, নিয়ো; উয়া=ভুয়া, হালুয়া; উই=যুঁই, রুই, গলুই; উয়ে=ভূঁয়ে, রুঁয়ে; উও, উয়ো,=কুয়ো, দুও; এয়, অ্যায়=নেয়, দেয় [দ্যায়]; এয়া=দেয়া [মেঘ], খেয়া, কেয়া; এই=যেই, সেই; এও=যেও, সেও, এয়ো; এউ=ঢেউ, ফেউ, কেউ; ওয়্=শোয়, দোয়; অআ, ওয়া,=মোয়া, সোয়া; ওউ, অউ=হউক, বউ; ওই=কই, রই, সই।

তাছাড়া, তিন স্বরধ্বনির সহাবস্থান=গিয়েও; চার স্বরধ্বনির সহাবস্থান=আনাইয়াও; পাঁচ স্বরধ্বনির সহাবস্থান=ধোওয়াইয়া; ছয় স্বরধ্বনির সহাবস্থান=খাওয়াইয়াও ইত্যাদি দেখা যায়।

নাসিকার সাহায্যে উচ্চারণের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে আবার দু' ভাগে ভাগ করা যায়: সানুনাসিক বা অনুনাসিক স্বরধ্বনি ও নিরনুনাসিক স্বরধ্বনি। নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য স্বরধ্বনিকে **সানুনাসিক** বা **অনুনাসিক স্বরধ্বনি** বলে।

যেমন : আঁকা, বাঁকা, ফাঁকা, শাঁখা ইত্যাদি। নাসিকার সাহায্য ব্যতীত উচ্চার্য স্বরধ্বনিকে বলে **নিরনুনাসিক স্বরধ্বনি**। যেমন : শাখা, হাসা, কাদা ইত্যাদি।

আবার, শব্দের মধ্যস্থিত কোন বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণকালে নিঃশ্বাসবায়ু তীব্রতর বেগে প্রবাহিত হলে তাকে বলা হয় **প্রস্বর, বল, শ্বাসাঘাত** বা **স্বরাঘাত** [Accent]। যেমন : 'এ **কী** করলেন প্রভু!' '**সেই** আমাদের বাংলা দেশ।'

স্বরধ্বনির উচ্চারণে এই ঝোঁক বা প্রবলতাকে বলে **অক্ষর-পরিবৃঢ়ি**।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থান

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন স্বরবর্ণের বিশেষ পরিচয় :

অ, আ : এদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়; সেজন্যে এরা **কণ্ঠ্য বর্ণ** [Gutturals]।

ই, ঈ : এদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে আকৃষ্ট হয়; সেজন্যে এরা **তালব্য বর্ণ** [Palatals]।

উ, ঊ : এদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ওষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়; সেজন্যে এরা **ওষ্ঠ্য বর্ণ** [Labials]।

ঋ [ৠ] : এদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা মূর্ধাকে স্পর্শ করে; সেজন্যে এরা **মূর্ধন্য বর্ণ** [Cerebrals]।

[ঌ] : এর উচ্চারণ-কালে জিহ্বা দন্তকে স্পর্শ করে; সেজন্যে এটি **দন্ত্য বর্ণ** [Dentals]।

এ, ঐ : এরা কণ্ঠ ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয়; অর্থাৎ, এদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর গা ঘেঁষে কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেজন্যে এরা **কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ**।

ও, ঔ : এরা কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয়; অর্থাৎ, এদের উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ওষ্ঠের গা ঘেঁষে কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেজন্যে এরা **কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ**।

ব্যঞ্জন বর্ণ

যে সব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বয়ং উচ্চারিত হতে পারে না, তাদের **ব্যঞ্জন বর্ণ** বলে। বাংলায় ব্যঞ্জন বর্ণ সাঁইত্রিশটি :

ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম; য, র, ল, [ব]; শ, ষ, স, হ; ড়, ঢ়, য়; ৎ, ঃ। এদের মধ্যে 'অন্তঃস্থ-ব'-এর ব্যবহার বাংলায় নেই; তাই একে অতিরিক্ত হিসেবে ধরা হয় না।

উচ্চারণ-রীতি অনুসারে বিভিন্ন ব্যঞ্জন বর্ণের বিশেষ বিশেষ পরিচয় :

স্পর্শবর্ণ [Stops]: বাংলা বর্ণমালার ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ বা মূলভাগ মুখের ভেতরের বিশেষ বিশেষ অংশকে স্পর্শ করে কিংবা ঠোঁটে ঠোঁটে স্পর্শ হয় বলে তাদের **স্পর্শবর্ণ** বলা হয়।

স্পর্শবর্ণগুলিকে আবার পাঁচটি করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ভাগগুলিকে বলা হয় **বর্গ**। বর্গের আদ্যক্ষর দিয়ে বর্গের নামকরণ হয়। যেমন, ক-বর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ-বর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট-বর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত-বর্গ—ত, থ, দ, ধ, ন। প-বর্গ—প, ফ, ব, ভ, ম।

উষ্মবর্ণ [Spirants]: শ, ষ, স ও হ—এই বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করবার সময় নিঃশ্বাসবায়ুকে শিস্‌ধ্বনির [sibilant] মতো প্রবাহিত করতে হয় বলে এদের **উষ্মবর্ণ** বলা হয়। অর্থাৎ, 'শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য-যুক্ত বর্ণ-চতুষ্টয়'কে উষ্মবর্ণ বলে।

অন্তঃস্থ বর্ণ: স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তর্বর্তী য, র, ল, ব—এই বর্ণ-চতুষ্টয়কে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে। তাদের মধ্যে 'য' ও 'ব'-কে **অর্ধস্বর** [Semi-vowels] [য=ই+অ, ব=উ+অ] এবং 'র' ও 'ল'-কে **তরল স্বর** [Liquids] বলা হয়।

অর্ধ-ব্যঞ্জন [Sonant]: ন, ম, র ও ল—এরা স্বরধ্বনির মতো একা অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্ষর [syllable] গঠন করতে পারে। আবার, এরা এককভাবে ব্যঞ্জনধ্বনির মতো এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্তভাবে স্বরধ্বনির মতো আচরণ করে বলে এদের অর্ধ-ব্যঞ্জন বলা হয়।

অনুনাসিক বর্ণ [Nasals]: বর্গের পঞ্চম বর্ণের বা অন্তিম বর্ণের [অর্থাৎ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম] এবং অনুস্বারের [ং] উচ্চারণ-কালে নিঃশ্বাসবায়ু আংশিকভাবে নাসিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এদের **অনুনাসিক বর্ণ** বা নাসিক্য বর্ণ বলা হয়।

মহাপ্রাণ বর্ণ [Aspirate]: কণ্ঠনালীর পেশী আকুঞ্চিত করে অতিরিক্ত বাধা সৃষ্টি করে বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে উচ্চারণ করা হয় বলে তাদের **মহাপ্রাণ বর্ণ** বলা হয়। 'প্রাণ' কথাটির অর্থ 'নিঃশ্বাস'; উচ্চারণ-কালে 'হ' জাতীয় ধ্বনিতেই তার প্রকাশ। যেমন: ক্+হ=খ, গ্+হ=ঘ, চ্+হ=ছ, জ্+হ=ঝ, ট্+হ=ঠ, ড্+হ=ঢ, ত্+হ=থ, দ্+হ=ধ, প্+হ=ফ, ব্+হ=ভ।

অল্পপ্রাণ বর্ণ [Unaspirated]: বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণে 'হ' জাতীয় ধ্বনির আকারে নিঃশ্বাস বা প্রাণ যুক্ত হয় না বলে তাদের **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলে। যেমন: ক, গ; চ, জ; ট, ড; ত, দ; প, ব।

অঘোষ বর্ণ [Unvoiced]: উচ্চারণে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ মৃদু বা গাম্ভীর্যহীন বলে তাদের **অঘোষ বর্ণ** বলা হয়। যেমন: ক, খ; চ, ছ; ট, ঠ; ত, থ; প, ফ।

ঘোষ বর্ণ [Voiced]: উচ্চারণে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গাম্ভীর্যযুক্ত বলে তাদের **ঘোষ বর্ণ** বা **নাদ বর্ণ** বলা হয়। যেমন: গ, ঘ, ঙ; জ, ঝ, ঞ; ড, ঢ, ণ; দ, ধ, ন; ব, ভ, ম।

নীচে অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ও অনুনাসিক বর্ণের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা দেওয়া হলো :

	অঘোষ বর্ণ	ঘোষ বর্ণ
অল্পপ্রাণ বর্ণ	ক চ ট ত প	গ জ ড দ ব
মহাপ্রাণ বর্ণ	খ ছ ঠ থ ফ	ঘ ঝ ঢ ধ ভ
অনুনাসিক বর্ণ		ঙ ঞ ণ ন ম

অযোগবাহ বর্ণ : ং এবং ঃ অন্য বর্ণের সঙ্গে সংযোগ ছাড়া এদের 'বাহ' বা প্রয়োগ হয় না। সেইজন্যে এরা অযোগবাহ বা **আশ্রয়স্থানভাগী** বর্ণ।

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ-স্থান

সংস্কৃত বর্ণমালা অত্যন্ত বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গঠিত। বাংলা বর্ণমালা উত্তরাধিকার-সূত্রে সংস্কৃত বর্ণমালার সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র অনুক্রমিকভাবে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ নিয়ে গঠিত। নিঃশ্বাসবায়ু প্রথমে কণ্ঠদেশে, পরে তালুদেশে, তারপর মূর্ধাদেশে, তারও পরে দন্ত-পঙ্‌ক্তিতে এবং অবশেষে ওষ্ঠদেশে প্রহৃত হয়ে নির্গত হয়। বাংলা বর্ণমালাও ঠিক সেই পারম্পর্য রক্ষা করে সংগঠিত।

ক-বর্গ : ক খ গ ঘ ঙ : এগুলির উচ্চারণ-কালে জিহ্বামূল ও তালুর কোমল অংশের সাহায্যে অবরোধ সৃষ্টির ফলে নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠদেশে প্রহৃত হয়। সেজন্যে এদের **কণ্ঠ্যবর্ণ** [Gutturals] বলা হয়। এদের উচ্চারণে জিহ্বামূলের ভূমিকা প্রধান বলে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এদের **জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ** নামে অভিহিত করেছেন।

চ-বর্গ : চ ছ জ ঝ ঞ : এগুলির উচ্চারণ-কালে জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিন অংশকে স্পর্শ করে এবং এদের উচ্চারণে তালুর ভূমিকা প্রধান বলে এদের **তালব্য বর্ণ** [Palatals] বলা হয়।

ট-বর্গ : ট ঠ ড ঢ ণ : এগুলির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্‌টিয়ে মূর্ধা [তালুর সামনের খাঁজ-কাটা অংশ] স্পর্শ করে এবং তাতে মূর্ধার ভূমিকা প্রধান বলে এদের **মূর্ধন্য বর্ণ** [Cerebrals] বলা হয়। এদের **প্রতিবেষ্টিত বর্ণ**ও বলা হয়।

ত-বর্গ : ত থ দ ধ ন : এগুলির উচ্চারণ-কালে জিহ্বার অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের গোড়ায় ঠোক্কর খায় এবং তাতে দাঁতের ভূমিকা প্রধান বলে এদের **দন্ত্যবর্ণ** [Dentals] বলা হয়।

প-বর্গ : প ফ ব ভ ম : এগুলির উচ্চারণ-কালে ওপরের ওষ্ঠ নিম্নের অধরকে স্পর্শ করে এবং তাতে ওষ্ঠের ভূমিকা প্রধান বলে এদের **ওষ্ঠ্যবর্ণ** [Labials] বলা হয়।

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ঃ এগুলির উচ্চারণ-কালে মুখের ভেতরের বাতাস কেবল মুখ দিয়ে নির্গত না হয়ে মুখ ও নাক, উভয় পথ দিয়ে নির্গত হয়। তাই এরা **অনুনাসিক বর্ণ** বা **নাসিক্য বর্ণ** [Nasals]। চন্দ্রবিন্দু [ঁ]-ও অনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ। কিন্তু তা স্বর-সংযোগ ভিন্ন উচ্চারিত হতে পারে না।

[অনুনাসিক স্বর দ্রষ্টব্য]

শ, ষ, স, হ ঃ এদের মধ্যে শ=**তালব্য বর্ণ**, ষ=**মূর্ধন্য বর্ণ**, স=**দন্ত্য বর্ণ** এবং হ=**কণ্ঠ্য বর্ণ**।

য, র, ল, ব ঃ এরা 'না-স্বর, না-ব্যঞ্জন।' এদের মধ্যে য=**তালব্য বর্ণ**; র=**মূর্ধন্য বর্ণ**; ল=**দন্তমূলীয় বর্ণ** এবং ব=**দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ**।

॥ উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বাংলা বর্ণ-সমূহের শ্রেণীগত পরিচয় ॥

বর্ণ	উচ্চারণ-স্থান	উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী নাম
অ আ হ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক খ গ ঘ ঙ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়
ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ	তালু	তালব্য
ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য
ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত	দন্ত্য
উ ঊ প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য
ব [অন্তঃস্থ]	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য
এ ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ-তালব্য
ও ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য

ড়, ঢ়—এরা উভয়েই স্পর্শবর্ণ। কিন্তু ড় অল্পপ্রাণ, ঢ় মহাপ্রাণ বর্ণ। এদের উচ্চারণে জিহ্বার নিম্নাগ্রভাগ দিয়ে দন্তমূলে আঘাত করতে হয়। সেইজন্য এদের **তাড়িত** [Flapped] **ব্যঞ্জন** বা **তাড়ন-জাত ধ্বনি** বলা হয়।

বাংলা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য

ক্ষ—এই সংযুক্ত বর্ণের সংস্কৃত উচ্চারণ 'ক্+ষ'। কিন্তু বাংলায় এর উচ্চারণ 'ক্+খ'-এর মতো। যেমন: রক্ষা—রক্খা, পক্ষী—পক্খী, শিক্ষা—শিক্খা ইত্যাদি।

জ্ঞ—বাংলায় এই সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ গ্+গঁ-র মতো। যেমন: যজ্ঞ—যগ্গঁ, বিজ্ঞ—বিগ্গঁ, প্রাজ্ঞ—প্রাগ্গঁ ইত্যাদি।

হ্ন, হ্ন, হ্ম হ্ল, হ্ব—এই সংযুক্ত বর্ণগুলির উচ্চারণে 'হ' সব সময়ই পরে উচ্চারিত হয়। যেমন: অপরাহ্ণ—অপরান্হ, চিহ্ন—চিন্হ, ব্রাহ্মণ—ব্রাম্হণ, কহ্লার—কল্হার, আহ্বান—আওহান ইত্যাদি।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ধ্বনি-পরিবর্তন

ধ্বনির সৃষ্টি বাগ্‌যন্ত্র থেকে। কাজেই, ধ্বনির পরিবর্তনও বাগ্‌যন্ত্র-সঞ্জাত। ধ্বনির পরিবর্তনের মূলে আছে উচ্চারণের সরলীকরণের [simplification] জন্যে বাগ্‌যন্ত্রের একটি সহজ প্রবণতা। অর্থাৎ, শক্ত উচ্চারণকে বাগ্‌যন্ত্র সব সময় সহজ করে উচ্চারণ করতে চায়। তাতে ধ্বনির আসে নানারকম পরিবর্তন। ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, নিম্নলিখিত নিয়মাবলীতে বাংলা উচ্চারণে ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে :

১. **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** : Anaptyxis : [ভক্তি অর্থাৎ বিভাগ ; স্বরভক্তি —স্বর সহযোগে বিভাগ। বিপ্রকর্ষ—বি-প্র-কর্ষ—বিশেষরূপে প্রকৃষ্টভাবে সৌকর্য সৃষ্টি] শব্দের মধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণ-প্রয়াস হ্রাস করবার জন্যে, উচ্চারণের সরলীকরণের জন্যে কিংবা ছন্দের খাতিরে তার মধ্যে একটি স্বরধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শব্দের সৌকর্য বৃদ্ধি করার রীতিকে বলা হয় **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** বা **মধ্য স্বরাগম**। যেমন : মুক্তা—ম্+উ+ক্+ত্+আ>ম্+উ+ক্+উ+ত্+আ=মুকুতা। তেমনি: দর্শন>দরশন, যত্ন>যতন, স্বপ্ন>স্বপন, প্রাণ>পরান, জন্ম>জনম, নির্মল>নিরমল, রত্ন>রতন, স্পর্শ>পরশ, হর্ষ>হরষ, দুর্গম>দুরগম, মূর্তি>মুরতি, ধ্যান>ধেয়ান, প্রীতি>পিরিতি, স্নান>সিনান, দুর্যোগ>দুরুযোগ, ফ্লুট>ফুলুট, গ্রাম>গেরাম, শ্লোক>শোলোক, তৃপ্ত>তিরপিত ইত্যাদি।

২. **অপিনিহিতি** : Epenthesis : শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে তাদের যথানির্দিষ্ট উচ্চারণ-স্থানের অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত হবার একটি বিশেষ প্রবণতা আছে। এই রীতিকে **অপিনিহিতি** বলা হয়। যেমন : করিয়া=ক্+অ+র্+ই+য্+আ>ক্+অ+ই+র্+যা+আ=কইর্যা। তেমনি : চলিয়া>চইল্যা, বলিয়া>বইল্যা, কালি>কাইল, আজি>আইজ, রাতি>রাইত, জালিয়া>জাইল্যা, মাছুয়া>মাউছ্যা, বাদিয়া>বাইদ্যা, হালিয়া>হাইল্যা, বানিয়া>বাইন্যা, চারি>চাইর, ঘাট>ঘাইট ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অপিনিহিতির প্রাধান্য লক্ষণীয়।

৩. **অভিশ্রুতি** : Umlaut : অভিশ্রুতি হলো অপিনিহিতির পরবর্তী স্তর। অপিনিহিত-জনিত স্থানচ্যুত 'ই' বা 'উ' সন্নিহিত স্বরধ্বনিগুলিকে প্রভাবিত করে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে পরিবর্তন সাধন করে, তাকে বলা হয় **অভিশ্রুতি**। যেমন : করিয়া>কইর্যা>ক'রে, চলিয়া>চইল্যা>চ'লে, বলিয়া>বইল্যা>ব'লে, কালি>কাইল>কাল, আজি>আইজ>আজ, রাতি>রাইত>রাত, মাছুয়া> মাউছ্যা>মেছো, জালিয়া>জাইল্যা>জেলে, বাদিয়া>বাইদ্যা>বেদে, হালিয়া> হাইল্যা>হেলে, বানিয়া>বাইন্যা>বেনে, কন্যা>কইন্যা>কন্যে>কনে, মাটিয়া>

মাইট্যা>মেটে, পটুয়া>পউটুয়া>পটো বা পোটো, মাতৃকা>মাইআ>মেয়ে। অভিশ্রুতি পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য।

৪. **অপশ্রুতি :** Ablaut : শব্দের মধ্যে ধাতুর মূল স্বরধ্বনির যদি কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে, তবে তাকে **অপশ্রুতি** বলে। 'গুণবৃদ্ধি-সম্প্রসারণ-প্রক্রিয়া এক কথায় অপশ্রুতি।' যেমন : 'স্বপ্' ধাতু থেকে 'স্বপ্ন' [গুণ], 'স্বাপ' [বৃদ্ধি], সুপ্তি [সম্প্রসারণ]; 'যজ্' ধাতু থেকে 'যজ্ঞ' [গুণ], যোগ [বৃদ্ধি], 'ইষ্টি' [সম্প্রসারিত]। সংস্কৃত 'চলতি' থেকে 'চলে এবং 'চালয়তি' [ণিজন্ত] থেকে 'চালে' উৎপন্ন হলেও বাংলায় 'চলে' এবং 'চালে' এসেছে 'চল্' ধাতু থেকে। তেমনি : পড়্ [সংস্কৃত]>পড়ে [বাংলা], পাড়ে [বাংলায় ণিজন্ত]।

৫. **স্বর-সংগতি :** Vowel-Harmony : শব্দের মধ্যে একাধিক স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণ-কালে তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। ধ্বনি-পরিবর্তনের এই রীতিকে বলা হয় **স্বর-সংগতি**। যেমন : এ+ই>ই+ই ; উ+আ>উ+ও। দ্রষ্টব্য : দেশী>দিশি, বিলাতী>বিলিতি, বিকাল>বিকেল, উড়ানী>উড়ুনি, বিনা> বিনি, ইচ্ছা>ইচ্ছে, মূলা>মূলো, পূজা>পূজো, কুড়াল>কুড়ুল, কুড়ানি>কুড়ুনী, ধুনাচি>ধুনুচি, ধুনারি>ধুনুরি, কুলা>কুলো, রূপা>রূপো, কুঁজা>কুঁজো, মিথ্যা> মিথ্যে, ফিতা>ফিতে, ভিক্ষা>ভিক্ষে, তিনটা>তিনটে, ধূলা>ধুলো, নৌকা> নৌকো, দেখাশুনা>দেখাশুনো ইত্যাদি।

৬. **স্বরাগম :** Prothesis : উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের আদিস্থিত যুক্ত-ব্যঞ্জনের পূর্বে একটি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। এই রীতিকে **স্বরাগম** বলা হয়। যেমন : স্পর্ধা>আস্পর্ধা, স্টেব্‌ল্>আস্তাবল, স্টেশন>ইষ্টিশন, স্পিরিট>ইস্পিরিট, ষ্টীমার> ইষ্টিমার, স্ত্রী>ইস্তিরি, স্কুল>ইস্কুল, স্ক্রু>ইস্ক্রুপ [আদিতে স্বরাগম, অন্তে ব্যঞ্জনাগম] ইত্যাদি।

এগুলি আদি স্বরাগমের দৃষ্টান্ত। শব্দের শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে অন্ত্যস্বরাগম [Apothesis] বলা হয়। যেমন : লিস্ট>লিষ্টি, পথ্য>পথ্যি, বেঞ্চ>বেঞ্চি, কড়া> কড়াই, ইঞ্চ>ইঞ্চি, নস্য>নস্যি, দিশ>দিশা, দুষ্ট>দুষ্টু, সত্য>সত্যি ইত্যাদি।

৭. **বর্ণাগম :** উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে কোন নতুন বর্ণের আগমন হলে তাকে **বর্ণাগম** বলা হয়। নবাগত বর্ণ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ দুই-ই হতে পারে। স্বরাগম, আদি স্বরাগম ও অন্ত স্বরাগমের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে। এবার মধ্য স্বরাগম [স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ দ্রষ্টব্য] এবং ব্যঞ্জন বর্ণ আগমের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো। যেমন : নয়ন>নয়ান, শয়ন>শয়ান, অম্ল>অম্বল, বানর>বান্দর (=বাঁদর), সুনর>সুন্দর, পক্ষীরাজ>পঙ্খীরাজ, সমুদ্র>সমুদ্দুর ইত্যাদি।

৮. **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি :** Euphonic Glides : বাংলায় সন্নিহিত দুটি স্বরধ্বনির উচ্চারণগত আড়ষ্টতা দূর করবার জন্যে তাদের মধ্যে অন্তঃস্থ-'য়' অথবা অন্তঃস্থ -'ব' ধ্বনির আগম হয়। তাদের যথাক্রমে **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি** বলা হয়।

য়-শ্রুতি—দূতীআলি>দূতীয়ালি, দু এক>দুয়েক, ছা আ>ছায়া, বাবু-আনি>বাবু-য়ানি, গো আলা>গোয়ালা, কেআ>কেয়া, দেআ>দেয়া, কে এলো>কেয়েলো, মা এলো>মায়েলো, মা-এ>মায়ে, ঝি-এ>ঝিয়ে ইত্যাদি।

ব-শ্রুতি—মো-আ>মোবা=মোওয়া, দেআল>দেবাল=দেওয়াল, নাআ>নাবা =নাওয়া, খাআ>খাবা=খাওয়া, শোআ>শোবা=শোওয়া, ধোআ>ধোবা =ধোওয়া ইত্যাদি। পদমধ্যে বর্ণাগম, য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতিকে এক কথায় **শ্রুতিধ্বনি ও** [Glides] বলা হয়।

৯. **বর্ণ-সমীকরণ** বা **সমীভবন**: Assimilation: ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পদের মধ্যে সন্নিহিত হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্যে যখন [১] পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করে, অথবা [২] পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে রূপান্তরিত করে অথবা [৩] পরস্পর রূপান্তরিত হয়, তখন তাকে **বর্ণ-সমীকরণ** বা **সমীভবন** বলা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে **প্রগত** [Regressive] **সমীকরণ**, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **পরাগত** [Progressive] **সমীকরণ** এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে **অন্যোন্য** [Mutual] **সমীকরণ** বলা হয়। [১] প্রগত সমীকরণ—ধর্ম>ধম্ম, কর্ম>কম্ম, করতে>কত্তে, কর্তা>কত্তা, পোতদার>পোদ্দার, গল্প>গপ্‌প, সর্প>সপ্‌প, স্বর্গ>স্বগ্‌গ, কর্পূর>কপ্‌পূর, পাঁচ সের>পাঁশসের, চরণামৃত>চন্নামৃত, আর না কালী>আন্নাকালী ইত্যাদি; একে **প্রত্যাবৃত্ত সমীকরণও** বলে। [২] পরাগত সমীকরণ—চন্দন>চন্নন, ব্যঞ্জন>ব্যন্নন; [৩] **অন্যোন্য সমীকরণ**—উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস। সমীকরণের চেয়ে সমীভবন নামটিই অধিক যুক্তিযুক্ত।

১০. অসমীকরণ বা **বিষমীভবন** বা **বিষমবর্ণতা**: Dissimilation: শব্দের মধ্যস্থিত দুটি সমবর্ণের যে কোন একটি পরিবর্তিত হলে তাকে **অসমীকরণ** বা **বিষমীভবন** বা **বিষমবর্ণতা** বলে। যেমন: শরীর>শরীল, লাল>নাল, তরবার>তলোয়ার, আর্মারিও [পর্তুগীজ]>আলমারি [বাংলা], চলচল>চঞ্চল, লাঙ্গল>নাঙ্গল।

১১. **বর্ণ-বিপর্যয়**: Metathesis: উচ্চারণ-কালে বিপর্যয়জনিত শব্দের মধ্যবর্তী বর্ণগুলি স্থান পরিবর্তন করলে তাকে **বর্ণ-বিপর্যয়** বা **বর্ণ-ব্যত্যয়** বা **স্থিতি-পরিবৃত্তি** বলে। যেমন: হ্রদ>হদ>দহ, ডেক্স>ডেস্‌ক, রিক্‌শ>রিশ্‌ক, বাক্স>বাস্‌ক, পিশাচ>পিচাশ, মুকুট>মুটুক, আল্‌না>আন্‌লা, বারাণসী>বেনারসী, নেতা>তেনা, লাফ>ফাল [পূর্ববঙ্গ], কুফ্‌ল্>কুলুপ।

১২. **স্বরলোপ**: উচ্চারণের সময় শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের ওপর অধিক পক্ষপাতহেতু বিশেষ জোর আরোপিত হলে অনাদৃত কোন স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়; তাকে **স্বরলোপ** বলে। যেমন: অলাবু>অলাউ>লাউ, অপিধান>পিধান, উদ্ধার>উধার>ধার, উডুম্বর>ডুমুর, অতসী>তিসি। এইগুলি আদি-স্বরলোপের দৃষ্টান্ত। অন্ত্য-স্বরলোপের দৃষ্টান্ত হলো: রাত্রি>রাত্তি>রাত>রাত্‌, হস্ত>হাত>হাত্‌, ভক্ত>ভাত>ভাত্‌। মধ্য-স্বরলোপের দৃষ্টান্ত হলো: জানালা>জান্‌লা,

বসতি>বস্তি, ভগিনী>ভগ্নী, নাতিনী>নাত্‌নী, নারিকেল>নার্কেল। উচ্চারণ-জনিত মধ্য-স্বরলোপকে বলা হয় **সম্প্রকর্ষ**।

১৩. **বর্ণলোপ :** Haplology : পদের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিযুক্ত বা স্বরধ্বনিহীন কোন বর্ণ যদি লুপ্ত হয়, তাকে বলা হয় **বর্ণলোপ**। যেমন : ফাল্গুন>ফাগুন, আলাহিদা>আলাদা, গোষ্ঠ>গোঠ, নবধর>নধর, অশ্বত্থ>অশথ, স্থান>থান, মজ্‌দুর>মজুর, বড়দিদি>বড়দি, বউদিদি>বউদি, ভাইশ্বশুর>ভাশুর, স্ফটিক>ফটিক, আলোক>আলো, কার্পাস>কাপাস।

১৪. **শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লোপ :** বাংলায় উচ্চারণ-কালে বহু শব্দ-মধ্যবর্তী র-কার ও হ-কার লুপ্ত হয়। যেমন : র-কার লোপ : কর্ম>কম্ম, ধর্ম>ধম্ম, করল>কল্ল, ধরল>ধল্ল, তেপ্রান্তর>তেপান্তর, শৃগাল>শিয়াল। [এগুলি সমীকরণজনিত পরিবর্তনও বটে। কিন্তু কল্ল, ধল্ল ইত্যাদি লেখা উচিত নয়, ওগুলি যথাক্রমে করল, ধরল—এইভাবে লেখা উচিত।] হ-কার লোপ : ফলাহার>ফলার, বাহির>বা'র [দরিয়া], চাহে>চায়, গাহে>গায়, শাহ্‌>শা, মহাশয়>মশায়, তাহার>তার, লোহা>নোয়া, বেহাই>বেয়াই।

১৫. **বর্ণ-বিকৃতি :** শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণ বিকৃতরূপে উচ্চারিত হলে তাকে **বর্ণ-বিকৃতি** বলা হয়। যেমন : কবাট>কপাট, বাষ্প>ভাপ, ধাই>দাই, দুপুর>দুকুর।

১৬. **বর্ণদ্বিত্ব :** উচ্চারণ-কালে পক্ষপাতহেতু কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়ে যায়, তাকে **বর্ণদ্বিত্ব** বলা হয়। যেমন : ছোট>ছোট্ট, একা>এক্কা, একরতি>একরত্তি, পাক>পাক্কা, সবাই>সব্‌বাই, সকলে>সক্কলে, সকালবেলা>সক্কালবেলা, কিছু>কিচ্ছু, বড়>বড্ড।

১৭. **মহাপ্রাণিতকরণ** বা **পীনায়ন :** Aspiration : উচ্চারণ-কালে কোন কোন স্থলে অল্পপ্রাণ বর্ণের সঙ্গে মহাপ্রাণ ধ্বনি যুক্ত হয়। যেমন : পুকুর>পুখুর, শালিক>শালিখ, পাশ>ফাঁস, কাঁটাল>কাঁঠাল, কীল>খিল, অগ্রহায়ণ>অঘ্রাণ, নিবানো>নিভানো।

১৮. **ঘোষীভবন :** Vocalisation বা Voicing : উচ্চারণ-কালে কখনও কখনও অঘোষধ্বনি ঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে বলা হয় **ঘোষীভবন**। যেমন : কাক>কাগ, বক>বগ, ধোপা>ধোবা, শাক>শাগ, ঠক>ঠগ, মকর>মগর।

১৯. **অল্পপ্রাণিতকরণ** বা **ক্ষীণায়ন :** De-aspiration : মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণরূপে উচ্চারিত হলে তাকে **অল্পপ্রাণিতকরণ** বা **ক্ষীণায়ন** বলা হয়। যেমন : হাথ>হাত, পালখ>পালক, ধাত্রী>ধাই>দাই, ধাঁধা>ধাঁদা, অবধি>অব্‌দি, ভাত>বাত, কাঁধ>কাঁদ, বখশিশ>বকশিশ, রফতানি>রপ্তানি, যাচ্ছি>যাচ্চি, মেঝে>মেজে, সাঁঝ>সাঁজ, সভা>সবা [ই]=সবাই।

২০. **অঘোষীভবন :** Devocalisation বা Devoicing : উচ্চারণ-কালে

ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে **অঘোষীভবন** বলা হয়। যেমন : শিগ্‌নি—শিক্‌নি।

২১. নাসিক্যীভবন : Nasalisation : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এই নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণ-কালে যদি লুপ্ত হয়ে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক করে তোলে, তবে তাকে বলা হয় **নাসিক্যীভবন**। যেমন : সন্ধ্যা>সাঁঝ, চন্দ্র>চাঁদ, ফন্দী>ফাঁদ, বন্ধ>বাঁধ। আবার, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াই বহুক্ষেত্রে স্বরধ্বনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সানুনাসিক হয়ে পড়ে। তাকেও বলা হয় নাসিক্যীভবন। যেমন : পুথি>পুঁথি, ছুচ>ছুঁচ, হাসি>হাঁসি, কানা>কাঁনা, পাচনবাড়ি>পাঁচনবাড়ি, পাপর >পাঁপড়, হাসপাতাল>হাঁসপাতাল। পরবর্তী নাসিক্যবর্ণের প্রভাবেও পূর্ববর্তী বর্ণের নাসিক্যীভবন ঘটে। যেমন : শ্রাবণ>শাঙন ; মাগ্‌না>মাঙ্‌না।

২২. উষ্মীভবন : Spirantisation : স্পর্শবর্ণ কখনও উষ্মবর্ণরূপে উচ্চারিত হলে তাকে উষ্মীভবন বা স-কারীভবন [Assibilation] বলা হয়। যেমন : গাছতলা >গাস্‌তলা, পাঁচকুড়া>পাঁশকুড়া, আছে>আসে [পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ] ইত্যাদি।

২৩. মূর্ধন্যীভবন : Cerebralisation : যদি কোন ব্যঞ্জনধ্বনির সাহায্যে অথবা আপনা থেকেই দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে রূপান্তরিত হয়, তবে তাকে **মূর্ধন্যীভবন** বলা হয়। যেমন : মৃত্তিকা>মাটি, পততি>পড়ে, মৃত>মড়া, কনিষ্ঠ>কড়ে।

২৪. র-কারীভবন : Rhotacism : 'দ' মূর্ধন্যীভূত [ড] হয়ে 'র' বা 'ল'-রূপে উচ্চারিত হলে তাকে **র-কারীভবন** বলে। যেমন : পঞ্চদশ>পন্নডহ>পনর, ষট্‌দশ> ষোড়শ>ষোল, কট্‌কৃত্য>কড়চা>করচা ইত্যাদি।

২৫. সাদৃশ্য : Analogy : কোন শব্দের সদৃশ করে ধ্বনি-পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থযুক্ত কোন নতুন শব্দ সংগঠিত হলে তাকে বলা হয় **সাদৃশ্য**। যেমন : 'নাবালক' শব্দের সাদৃশ্যে 'সাবালক', 'ধোপানী'র সাদৃশ্যে 'মাস্টারনী', 'বিধবা'র সাদৃশ্যে 'সধবা', 'ওকালতি'র সাদৃশ্যে 'ব্যারিস্টারী' ও 'জজিয়তি', 'পাখি-পাখালি'র সাদৃশ্যে 'গাছ-গাছালি', 'বউড়ী' [<সং বধূটি]-র সাদৃশ্যে 'শাশুড়ী' ও 'ঝিউড়ী', 'রোদসী'র সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী'।

২৬. মিশ্রণ : Contamination : শব্দের সাদৃশ্যে শব্দ গঠিত না হয়ে যদি কোন ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনি-পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তবে তাকে **মিশ্রণ** বলে। যেমন : পর্তুগীজ 'Ananas' শব্দটি বাংলা 'রস' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'আনারস' শব্দ গঠন করেছে। ঠিক তেমনি : Arm-chair>আরাম-চেয়ার।

২৭. জোড়-কলম শব্দ : Portmanteau Word : দুটি 'কাটা জোড়া' শব্দ নিয়ে কোন নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে **জোড়-কলম শব্দ** বলে। যেমন : [আরবী] 'মিন্নৎ' + [সংস্কৃত] 'বিজ্ঞপ্তি' [> প্রা. বিন্নত্তি>বাংলা বিনতি] = মিনতি, নিশ্চল + চুপ>নিশ্চুপ।

২৮. সংকর শব্দ : Hybrid Word : বিভিন্ন ভাষার অথবা একই ভাষার শব্দ ও শব্দাংশ বা প্রত্যয় উপসর্গ-যোগে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে **সংকর শব্দ** বলা

হয়। যেমন : কহ [বাংলা]+তব্য [সংস্কৃত]=কহতব্য, নি [বাংলা উপসর্গ]+খরচ [ফারসী]=নিখরচা।

২৯. লোকব্যুৎপত্তি বা **লোক-নিরুক্তি :** Folk-etymology : অনেক সময় দুরুচ্চার্য ও অপরিচিত শব্দ জনসাধারণের মুখে ধ্বনি-সংগতি রক্ষা করে নানা অশ্রুতপূর্ব শব্দ গঠন করে, তাকে বলা হয় **লোকব্যুৎপত্তি**। যেমন : ইংলিশ [English]+রাজ=ইংরাজ। তেমনি : 'Martaban' থেকে আনীত কলা লোকমুখে হয়েছে 'মর্তমান', 'Batavia', থেকে আনীত লেবু লোকমুখে হয়েছে 'বাতাবী' লেবু, 'উর্ণবাভ' থেকে হয়েছে উর্ণনাভ, 'বিস্ফোটক' থেকে হয়েছে 'বিষফোঁড়া', স্পেনীয় শব্দ 'dengue' [ন্যাকামি] থেকে হয়েছে 'ডেঙ্গু' [রোগ]।

৩০. ভুয়া শব্দ : Ghost Word : এমন অনেক শব্দ লোক-নিরুক্তির সাহায্যে অথবা অন্য উপায়ে উৎপন্ন হয়, যাদের উৎস নির্দেশ করা যায় না, তাদের বলা হয় **ভুয়া শব্দ**। যেমন : 'প্রোথিত' [বাংলা সাধুভাষায় ব্যবহৃত ; কিন্তু সংস্কৃতে 'প্রোথ্' ধাতুর অস্তিত্ব নাই] থেকে কথ্য বাংলায় 'পোতা' বা 'পোঁতা' শব্দটি গঠিত। সংস্কৃত—নীরাজনা=নীরমজ্জন>প্রা. নিরজ্জন>বাংলা—নিরঞ্জন।

৩১. আদেশ : কোন বর্ণ অথবা শব্দাংশের স্থলে অন্য কোন বর্ণ অথবা শব্দাংশ ব্যবহৃত হলে তাকে **আদেশ** বলা হয়। যেমন : 'আছ্' ধাতুর 'থাক্' আদেশ : আছ্+ইবে=থাকিবে।

৩২. বাক্য-শব্দ : বাক্য বা বাক্যাংশ অর্থ পরিবর্তন করে একটি মাত্র শব্দে সংহত হলে, তাকে **বাক্য-শব্দ** বলে। যেমন : 'কিম্ [কি] বদন্তি [বলে] >কিংবদন্তী, যা ইচ্ছা তাই>যাচ্ছেতাই, 'ইতি [এই] হ [রকমই] আস' [ছিল] >ইতিহাস, 'কে ও কে-টা'>কেওকেটা।

॥ অনুসরণী ॥

১. নিম্নলিখিত শব্দগুলি অবলম্বনে বাংলা 'এ' স্বরবর্ণের উচ্চারণগত বৈচিত্র্য নিরূপণ কর : দেখা, শেখা, একদা, এক, কেন, বেলা [সময়]। মা. '৬৮।

২. উদাহরণসহ নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলির ব্যাখ্যা লিখ : হ্রস্বস্বর ; সন্ধ্যক্ষর বা যৌগিক স্বর, মা. '৫৯, '৬০, '৬১ ; উষ্মবর্ণ, মা. '৫৫, '৬৩, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬১ ; মহাপ্রাণ বর্ণ, উ. মা. '৬৩, '৬৪ ; বর্গীয় বর্ণ ; নাসিক্যধ্বনি ; ঘোষবর্ণ, উ. মা. '৬২ ; অন্তঃস্থ বর্ণ, মা. '৬০, ৬২, উ. মা. '৬০ ; অল্পপ্রাণ বর্ণ, মা. '৫৪, উ. মা. '৬৩, ; মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. '৫২, '৫৮, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২ ; তালব্য বর্ণ, মা. '৫৩, '৬১, স্বরান্ত অক্ষর ; ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত অক্ষর ; কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ ; কণ্ঠতালব্য বর্ণ ; মূর্ধন্য বর্ণ, মা. '৬০ ; দন্ত্যবর্ণ, ক. প্রা. '৬১ ; স্পর্শবর্ণ, মা. '৫৯, উ. মা. '৬৪ ; অনুনাসিক, মা. '৬৫ ; অযোগবাহ বর্ণ বা আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ, মা. '৬০ ; প্লুতস্বর ; তরল স্বর ; পার্শ্বিক ধ্বনি।

৩. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর : ধ্বনি ও বর্ণ ; স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি ; হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর ; মৌলিক স্বরধ্বনি ও যৌগিক স্বরধ্বনি ; অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ, মা. '৬২, মা. [কম্পার্ট.] '৬০ ; ঘোষবর্ণ ও অঘোষবর্ণ, স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ ; হ্রস্বস্বর ও প্লুতস্বর ; শিসধ্বনি ও পার্শ্বিক ধ্বনি ; অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি,

ক্ষীণায়ন ও পীনায়ন ; মহাপ্রাণিতকরণ ও অল্পপ্রাণিতকরণ ; মিশ্রণ ও জোড়-কলম শব্দ : স্বরলোপ ও স্বরাগম ; বর্ণলোপ ও বর্ণাগম ; সমীভবন ও বিষমীভবন : বর্ণ-বিকৃতি ও বর্ণ-বিপর্যয় ; অভিশ্রুতি ও অপশ্রুতি ; স্বরভক্তি ও স্বরসঙ্গতি ; সমীভবন ও স্বরসঙ্গতি।

৪. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ; অভিশ্রুতি ; স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ, মা. [কম্পার্ট্.] '৬২, উ. মা. '৬২ ; সমীকরণ, মা. '৬০ ; বর্ণাগম, মা. '৫৩, উ. মা. '৬০ ; বর্ণ-বিপর্যয়, মা. '৬৮ ; স্বরসঙ্গতি, উ. মা. '৬৪ ; অপিনিহিতি ; নাসিক্যীভবন, ঘোষীভবন, স্থিতি-পরিবৃত্তি ; আদ্য অ-কারের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য, মা. '৬৫ ; অ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ, উ. মা. '৬০ ; এ-কারের বিশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ, মা. '৫৪ ; অ-কার ও এ-কারের বিভিন্ন উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, মা, [কম্পার্ট্.] '৬২।

৫. নিম্নলিখিত বর্ণগুলির উচ্চারণ-স্থান সম্বন্ধে টীকা লিখ : ঐ, ল, ক্ষ, ং, ষ, ণ, ঞ ; মা. '৬২। এ, ও চ, ঢ, অন্তঃস্থ-ব, ঞ, ল ; মা. '৫৯। অ, ঋ, ভ, স, ং, ক্ষ ; ক. প্র. '৪৩। ঋ, ঔ, ঞ, ভ, হ ; ক. প্র. '৪৪। ঈ, ঐ, ঞ, চ, ঙ, শ ; ক. প্র. '৪৭। এ, ও, জ্ঞ ; ক. প্র. '৪৮।

৬. বাংলা বর্ণমালায় কোন্‌গুলির নাম উষ্মবর্ণ তাহা উল্লেখ করিয়া কেন উহাদের উষ্মবর্ণ বলা হয়, লিখ। উ. মা. '৬৮।

৭. ক. বাংলা বর্ণমালার আনুনাসিক বর্ণগুলির উল্লেখ কর : উ. মা. '৬৯।

খ. বাংলা বর্ণমালায় দন্ত্যবর্ণ কোন্‌গুলিকে বলা হয়। ঐরূপ বলিবার কারণ কি, তাহা উল্লেখ কর। উ. মা. [কম্পার্ট্.] '৬৯।

৮। বড় হরফের পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ : লোভী চাষারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে, সেটুকুও **ভাগ্যি** মেনো। রাক্ষসের ঝাড়, অথও **পেরমাই**। দেখ দেখিরে, এক **টুকরো হত্তুকি** কি **সুপুরি** এক কুচি যদি পাস। পরো না মা **বিলিতি** শাড়ি। তুমি **শুদ্দুরদের দাই** ক ডাক দেখি। সংসারে আর একজন ছিলেন—তিনি **ইন্দির** ঠাকরুণ। **কানের** ভিতর দিয়া **মরমে** পশিল গো। তোমার এত বড়ো **আস্পর্ধা**। চোখে **তরোয়ালের** চোট লেগেছে। শীতটা **ছুঁচের** মতো গায়ে বিঁধছে। ব্যাপারের কি **ছিরি**। বামুনমার মত আমিও **সগ্যে** যেতে পাবো। কেউ **ঘেন্না** করতে পারবে না। **রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর** আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া। এখন আর **ক্ষিদে** নেই। সাক্ষী নেই, **পত্তর** নেই—। দেখলেন ছোটলোক ব্যাটার **আস্পর্ধা**? আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধুলা **পড়েছে**, হারামজাদার যোল পুরুষের ভাগ্যি। ব্যাটা **পিচেশ** কিনা পাঁচ গণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখারী **বিদেয়** করতে চায়। রাখালবাবু আমাদের **কুটুম**। দুপুর **রোদ্দুরে** রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ করতে হবে না। তা কাঁধে চড়লে **স্বগ্গে** যাওয়া যায়। বাঃ **পুন্নু** কাকা, তুমি যে খেতে লেগেছ। **নেমন্তন্ন** কি রকম হবে একবার বলে দেন। নিয়েছিল **এখুনি** চিলে।

'সন্ধি' কথাটির অর্থ 'মিলন'। সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে **সন্ধি** বলে। কিংবা বলা যায়, সন্নিহিত দুই বর্ণের একবর্ণে পরিণতিকে সন্ধি বলে। সন্ধি প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় উচ্চারণের বিশেষ প্রবণতার জন্যে। বাক্যের উচ্চারণে পর পর একাধিক শব্দ আসে; শব্দের উচ্চারণে পর পর আসে একাধিক বর্ণ। উচ্চারণের স্রোতে বাগ্‌যন্ত্র সন্নিহিত মিলনকামী বর্ণগুলিকে সন্ধিসূত্রে যুক্ত করে দেয়। তাতে দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে কখনও পূর্ববর্ণের, কখনও পরবর্ণের রূপ প্রাপ্ত হয়। কখনও দুটি বর্ণ মিলিত হয়ে তৃতীয় একটি বর্ণের প্রতিষ্ঠা করে; আবার, কখনও সংশ্লিষ্ট বর্ণযুগলের মধ্যে তৃতীয় একটি বর্ণের আগমন ঘটে। প্রধানতঃ উচ্চারণের সমীকরণ-প্রবণতা বা বর্ণের সমীভবন-প্রবণতাই সন্ধির মৌল কারণ। দৃষ্টান্ত: হিম+আলয়=হ্+ই+ম্+[অ+আ]+ল্+অ+য্+অ=হ্+ই+ম্+[আ]+ল্+অ+য্+অ=হিমালয়; রবি+ইন্দ্র =র্+অ+ব্+[ই+ই]+ন্+দ্+র্+অ=র্+অ+ব্+[ঈ]+ন্+দ্+র্+অ= রবীন্দ্র; নদী+অম্বু=ন্+অ+দ্+[ঈ+অ]+ম্+ব্+উ=ন্+অ+দ্+[য+অ] +ম্+ব্+উ=নদ্যম্বু; আ+চর্য=আ+চ্+অ+র্+য্+অ=আ+[শ্]+চ্+অ র্+য্+অ=আশ্চর্য। প্রথম দৃষ্টান্তে প্রথম বর্ণ ও দ্বিতীয় বর্ণ মিলিত হয়ে দ্বিতীয় বর্ণের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুটি বর্ণ মিলে তৃতীয় একটি বর্ণ হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় বর্ণের প্রভাবে প্রথম বর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে। চতুর্থ দৃষ্টান্তে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের মাঝখানে অন্য একটি বর্ণের আগমন ঘটেছে।

বাংলা ও সংস্কৃত-সন্ধির পার্থক্য

উচ্চারণ-প্রকৃতিই সন্ধির মূল। আবার, বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতি সংস্কৃত উচ্চারণ-প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। কাজেই, বাংলা-সন্ধির বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত-সন্ধির বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন। তবে তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে গৃহীত বলে সংস্কৃত-সন্ধির বিধি সেই শব্দগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যত্র বাংলার নিজস্ব রীতিতে সন্ধি সংঘটিত হয়।

১. সংস্কৃতে বাক্য-মধ্যস্থিত সন্নিহিত পদগুলি সন্ধিসূত্রে মিলিত হয়; কিন্তু বাংলায় তা হয় না। যেমন: সংস্কৃতে—কুশলম্+ইচ্ছসি='কুশলমিচ্ছসি'। কিন্তু বাংলায়—কুশল+ইচ্ছাকর=কুশলেচ্ছাকর হয় না।

২. সংস্কৃতে সন্ধি উচ্চারণ-জনিত হলেও লেখায় আপত্তি নেই; কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ-জনিত সন্ধি সংঘটিত হলেও লেখা যায় না। যেমন: সংস্কৃতে—আনন্দাৎ+হি

হি+এব='আনন্দাদ্ধ্যেব' বলাও যায়, লেখাও যায়। কিন্তু বাংলায়—হাত+ধরা= হাদ্‌ধরা বা হাদ্ধরা বলা যায়, কিন্তু লিখতে হবে 'হাতধরা'।

৩. সংস্কৃত পদান্ত বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সঙ্গে পরবর্তী শব্দের আদিবর্ণের সন্ধিতে কোনরকম বাধা নেই। যেমন: সংস্কৃতে—কর্মণি+এব+অধিকারঃ+তে= 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' ব্যাকরণ-সম্মত এবং নির্ভুল। কিন্তু বাংলায়—'নতুন-দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল' কখনও 'নতুন-দাদারাভিজ্ঞতায়িন্দ্রীষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল' হবে না। সংস্কৃতে—ভবামি+অহম্='ভবাম্যহম্' হয়, কিন্তু বাংলায়—হব+আমি='হবামি' হয় না। তবে লৌকিক উচ্চারণের ফলে 'আর না কালী' ='আন্নাকালী' বা 'যা ইচ্ছে তাই'='যাচ্ছেতাই' হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এগুলি সমীকরণ-ঘটিত এবং দুর্লভ-দৃষ্টান্ত।

৪. সংস্কৃতে সমাসবদ্ধ পদে সম্ভব হলে সন্ধি সংঘটিত হয়। যেমন: লবণাম্বুরাশেঃ +ধারানিবদ্ধেব='লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব'। কিন্তু বাংলায় সমাসবদ্ধ পদে এরূপ হয় না। যেমন: ঘোড়ার+ডিম='ঘোড়াড্ডিম' হয় না, তেমনি, আমা+অপেক্ষা= 'আমাপেক্ষা' হয় না; তা লিখলে অশুদ্ধ হবে।

সন্ধির প্রকার-ভেদ

সন্ধি মূলতঃ দু'প্রকার: স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গসন্ধি মূলতঃ ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্ভুক্ত হলেও তা পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হয়ে থাকে।

● সংস্কৃত স্বরসন্ধি:

স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে বলা হয় **স্বরসন্ধি**।

১. অ-বর্ণে অ-বর্ণে দীর্ঘ হয়। এই দীর্ঘস্বর পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ+অ=আ: পরম+অদ্ভুত=পরমাদ্ভুত, কোষ+অধ্যক্ষ=কোষাধ্যক্ষ, দাব +অগ্নি=দাবাগ্নি, বাড়ব+অগ্নি=বাড়বাগ্নি, সর্ব+অলঙ্কার=সর্বালঙ্কার, তথ্য+ অনুসন্ধান=তথ্যানুসন্ধান, প্রাণ+অত্যয়=প্রাণাত্যয়, প্রাণ+অন্ত=প্রাণান্ত, অর্ধযোজন+অন্তে=অর্ধযোজনান্তে, চরিত+অর্থতা=চরিতার্থতা, ন+অস্তি=নাস্তি, কৃত+অঞ্জলি=কৃতাঞ্জলি, জল+অঞ্জলি=জলাঞ্জলি, অসুর+অরি=অসুরারি, চরণ +অরবিন্দ=চরণারবিন্দ, সপ্ত+অহ=সপ্তাহ, প্র+অহ্ন=প্রাহ্ণ, পূর্ব+অপর=পূর্বাপর, কট+অক্ষ=কটাক্ষ, রাজ্য+অধিকার=রাজ্যাধিকার, অস্ত+অচল=অস্তাচল, শীতল +অংশ=শীতলাংশ, যুগ+অন্ত=যুগান্ত, প্রাণ+অধিকা=প্রাণাধিকা, দৃষ্ট+অন্ত =দৃষ্টান্ত, পরম+অণু=পরমাণু, স্ব+অধীনতা=স্বাধীনতা, মলয়+অনিল=মলয়ানিল।

অ+আ=আ: কর+আঘাত=করাঘাত, অন্যায়+আচরণ=অন্যায়াচরণ, কৌতুক +আবিষ্ট=কৌতুকাবিষ্ট, বিক্রম+আদিত্য=বিক্রমাদিত্য, সঙ্কট+আপন্ন=সঙ্কটাপন্ন, শোক+আকুল=শোকাকুল, বজ্র+আঘাত=বজ্রাঘাত, সম+আদর=সমাদর, শিষ্ট+আচার=শিষ্টাচার, পরম+আত্মীয়=পরমাত্মীয়, পরম+আয়ু=পরমায়ু, ভাব +আপন্ন=ভাবাপন্ন, যজ্ঞ+আগার=যজ্ঞাগার, হত+আশ=হতাশ, কার্য+আলয়

=কার্যালয়, শোণিত+আর্দ্র=শোণিতার্দ্র, গত+আয়াত=গতায়াত, হিত+আকাঙ্ক্ষা=হিতাকাঙ্ক্ষা, জীবন+আদর্শ=জীবনাদর্শ, চতুর+আনন=চতুরানন, মহিষ+আরূঢ়=মহিষারূঢ়, সিংহ+আসন=সিংহাসন। **আ+অ=আ:** তথা+অপি=তথাপি, তথা+অস্তু=তথাস্তু, যথা+অর্থ=যথার্থ, চিন্তা+অন্বিত=চিন্তান্বিত, গলা+অধঃকরণ=গলাধঃকরণ, রক্ষা+অর্থ=রক্ষার্থ, মহা+অরণ্য=মহারণ্য, সন্ধ্যা+অর্চনা=সন্ধ্যার্চনা। পূজা+অবকাশ=পূজাবকাশ, মহা+অর্ঘ=মহার্ঘ, যথা+অর্থ=যথার্থ, আশা+অতীত=আশাতীত, ভাষা+অন্তর=ভাষান্তর, অবস্থা+অন্তর=অবস্থান্তর। **অ+আ=আ:** কশা+আঘাত=কশাঘাত, ক্ষুধা+আতুর=ক্ষুধাতুর, মহা+আশয়=মহাশয়, মহা+আত্মা=মহাত্মা, বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়, মহা+আকাশ=মহাকাশ।

২. ই-বর্ণে ই-বর্ণে দীর্ঘ হয়। এই দীর্ঘস্বর পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। **ই+ই=ঈ:** রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র, মুনি+ইন্দ্র=মুনীন্দ্র, অতি+ইব=অতীব, অতি+ইত=অতীত, অতি+ইন্দ্রিয়=অতীন্দ্রিয়, অধি+ইন=অধীন। **ই+ঈ=ঈ:** গিরি+ঈশ=গিরীশ, অধি+ঈশ্বর,=অধীশ্বর, পরি+ঈক্ষা=পরীক্ষা, প্রতি+ঈক্ষা=প্রতীক্ষা, ক্ষিতি+ঈশ=ক্ষিতীশ, অভি+ঈপ্সা=অভীপ্সা। **ঈ+ই=ঈ:** সতী+ইন্দ্র=সতীন্দ্র, শচী+ইন্দ্র=শচীন্দ্র, মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র, বলী+ইন্দ্র=বলীন্দ্র। **ঈ+ঈ=ঈ:** সতী+ঈশ=সতীশ, শচী+ঈশ=শচীশ, পৃথ্বী+ঈশ্বর=পৃথ্বীশ্বর।

৩. উ-বর্ণে উ-বর্ণে দীর্ঘ হয়। এই দীর্ঘস্বর পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। **উ+উ=ঊ:** অনু+উদিত=অনূদিত, মরু+উদ্যান=মরূদ্যান, কটু+উক্তি=কটূক্তি, মৃত্যু+উত্তীর্ণ=মৃত্যূত্তীর্ণ, গুরু+উপদেশ=গুরূপদেশ, মধু+উৎসব=মধূৎসব, বিধু+উদয়=বিধূদয়, সু+উক্ত=সূক্ত। **উ+ঊ=ঊ:** লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি। **ঊ+উ=ঊ:** বধূ+উৎসব=বধূৎসব, বধূ+উক্তি=বধূক্তি। **ঊ+ঊ=ঊ:** ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব, সরযূ+ঊর্মি=সরযূর্মি।

৪. অ-বর্ণে ই-বর্ণে 'এ' হয়। 'এ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। **অ+ই=এ:** জিত+ইন্দ্রিয়=জিতেন্দ্রিয়, মৃগ+ইন্দ্র=মৃগেন্দ্র, প্রেম+ইন্দ্র=প্রেমেন্দ্র, বীর+ইন্দ্র=বীরেন্দ্র, পূর্ণ+ইন্দু=পূর্ণেন্দু, পুত্র+ইষ্টি=পুত্রেষ্টি, অন্ত্য+ইষ্টি=অন্ত্যেষ্টি, সুর+ইন্দ্র=সুরেন্দ্র, শূর+ইন্দ্র=শূরেন্দ্র, জীমূত+ইন্দ্র=জীমূতেন্দ্র, স্ব+ইচ্ছা=স্বেচ্ছা, শুভ+ইচ্ছা=শুভেচ্ছা, মনুষ্য+ইতর=মনুষ্যেতর। **অ+ঈ=এ:** ব্রজ+ঈশ=ব্রজেশ, দেব+ঈশ=দেবেশ, গণ+ঈশ=গণেশ, পর+ঈশ=পরেশ, বিশ্ব+ঈশ্বর=বিশ্বেশ্বর, পরম+ঈশ্বর=পরমেশ্বর, তারক+ঈশ্বর=তারকেশ্বর, রাজ্য+ঈশ্বর=রাজ্যেশ্বর, নর+ঈশ=নরেশ। **আ+ই=এ:** যথা+ইষ্ট=যথেষ্ট, মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র, মহা+ইম্বাস=মহেম্বাস, তদা+ইব=তদেব। **আ+ঈ=এ:** রমা+ঈশ=রমেশ, মহা+ঈশ্বর=মহেশ্বর।

৫. অ-বর্ণে উ-বর্ণে 'ও' হয়। 'ও' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। **অ+উ=ও:**

নীল+উৎপল=নীলোৎপল, অরুণ+উদয়=অরুণোদয়, সূর্য+উদয়=সূর্যোদয়, ব্যঙ্গ+উক্তি=ব্যঙ্গোক্তি, মহাযজ্ঞ+উত্থিত=মহাযজ্ঞোত্থিত, শারদ+উৎসব=শারদোৎসব, জয়+উৎসব=জয়োৎসব, পরম+উৎসব=পরমোৎসব, দেব+উপম=দেবোপম, হেম+উপম=হেমোপম, পর+উপকার=পরোপকার, উত্তর+উত্তর=উত্তরোত্তর, আত্ম+উপলব্ধি=আত্মোপলব্ধি, সহ+উদর=সহোদর, গাত্র+উত্থান=গাত্রোত্থান, সুপ্ত+উত্থিত=সুপ্তোত্থিত, পাদ+উদক=পাদোদক, তরঙ্গ+উচ্ছ্বাস=তরঙ্গোচ্ছ্বাস, হিত+উপদেশ=হিতোপদেশ, শ্রাদ্ধ+উপলক্ষ=শ্রাদ্ধোপলক্ষ, অতিশয়+উক্তি=অতিশয়োক্তি, কব [< কু]+উষ্ণ=কবোষ্ণ, শীত+উষ্ণ=শীতোষ্ণ [নাতিশীতোষ্ণ], মর্ম+উদ্ভেদ=মর্মোদ্ভেদ, মন্দ+উদরী=মন্দোদরী, কাব্য+উদ্যান কাব্যোদ্যান। **অ+ঊ=ও ঃ** চল+ঊর্মি=চলোর্মি, নব+ঊঢ়া=নবোঢ়া, গৃহ+ঊর্ধ্ব=গৃহোর্ধ্ব, এক+ঊনবিংশতি=একোনবিংশতি। **আ+উ=ও ঃ** গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক, মহা+উচ্চ=মহোচ্চ, অচ্ছা+উদ=অচ্ছোদ, যথা+উচিত=যথোচিত, যথা+উপযুক্ত=যথোপযুক্ত, মহা+উৎসব=মহোৎসব, কথা+উপকথন=কথোপকথন, বিদ্যা+উদয়=বিদ্যোদয়। **আ+ঊ=ও ঃ** গঙ্গা+ঊর্মি=গঙ্গোর্মি, মহা+ঊর্মি=মহোর্মি।

৬. অ-বর্ণে ঋ-বর্ণে 'অর্' হয়। 'অ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং 'র্' রেফ্-রূপে পরবর্ণের মস্তকে যায়। **অ+ঋ=অর্ ঃ** দেব+ঋষি=দেবর্ষি, বীর+ঋষভ=বীরর্ষভ, উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ, অধম+ঋণ=অধমর্ণ। **আ+ঋ=অর্ ঃ** মহা+ঋষি=মহর্ষি, রাজা+ঋষি=রাজর্ষি, ব্রহ্ম+ঋষি=ব্রহ্মর্ষি।

কিন্তু অ-বর্ণে ও 'ঋত' শব্দের ঋ-বর্ণে 'আর' হয়। **অ+ঋত=আর্ত ঃ** শীত+ঋত=শীতার্ত, হিম+ঋত=হিমার্ত, রোগ+ঋত=রোগার্ত।

এবং **আ+ঋত=আর্ত ঃ** তৃষ্ণা+ঋত=তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত।

৭. অ-বর্ণে এ-বর্ণে 'ঐ' হয়। 'ঐ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। **অ+এ=ঐ ঃ** জন+এক=জনৈক, সর্ব+এব সর্বৈব, হিত+এষী=হিতৈষী, শুভ+এষী=শুভৈষী, গূঢ়+এষা=গূঢ়ৈষা। [কিন্তু **বাংলায় অ+এ=এ ঃ** বার+এক=বারেক, জন+এক=জনেক, ক্ষণ+এক=ক্ষণেক, তিল+এক=তিলেক, আধ+এক=আধেক] **অ+ঐ=ঐ ঃ** মত+ঐক্য=মতৈক্য, রাজ+ঐশ্বর্য=রাজৈশ্বর্য। **আ+এ=ঐ ঃ** সদা+এব=সদৈব, তদা+এব=তদৈব। **আ+ঐ=ঐ ঃ** মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য, মহা+ঐরাবত=মহৈরাবত।

৮. অ-বর্ণে ও-বর্ণে 'ঔ' হয়। 'ঔ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। **অ+ও=ঔ ঃ** জল+ওকা=জলৌকা, বন+ওষধি=বনৌষধি, বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বৌষ্ঠ। **অ+ঔ=ঔ ঃ** পরম+ঔষধ=পরমৌষধ, চিত্ত+ঔদার্য=চিত্তৌদার্য, দিব্য+ঔজ্জ্বল্য=দিব্যৌজ্জ্বল্য। **আ+ও=ঔ ঃ** মহা+ওষধি=মহৌষধি। **আ+ঔ=ঔ ঃ** মহা+ঔদার্য=মহৌদার্য, মহা+ঔৎসুক্য=মহৌৎসুক্য, মহা+ঔষধ=মহৌষধ।

৯. ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে ই ঈ-র স্থানে 'য্' হয়; পরের স্বর 'য্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন: যদি+অপি=যদ্যপি, বি+অবস্থা=ব্যবস্থা, নদী+অম্বু=নদ্যম্বু, আদি+অন্ত=আদ্যন্ত, স্বস্তি+অয়ন=স্বস্ত্যয়ন, ইতি+অবসর =ইত্যবসর, অধি+উষিত=অধ্যুষিত, ইতি+আকার=ইত্যাকার, পরি+আপ্ত =পর্যাপ্ত, অধি+অক্ষ=অধ্যক্ষ, অধি+অবসায়=অধ্যবসায়, বি+অগ্র=ব্যগ্র, বি+উৎপত্তি=ব্যুৎপত্তি, প্রতি+এক=প্রত্যেক, ইতি+আদি=ইত্যাদি, আদি +অক্ষর=আদ্যক্ষর। বি+অর্থ=ব্যর্থ, দ্বি+অর্থক=দ্ব্যর্থক, অভি+উদয়=অভ্যুদয়, অতি+আচার=অত্যাচার, প্রতি+আশা=প্রত্যাশা, বি+অবহার=ব্যবহার, প্রতি +অর্পণ=প্রত্যর্পণ, পরি+অটন=পর্যটন, পরি+অব+ঈক্ষণ=পর্যবেক্ষণ, অতি +উৎকৃষ্ট=অত্যুৎকৃষ্ট, পরি+আলোচনা=পর্যালোচনা, প্রতি+অহ=প্রত্যহ, বি+ অতিক্রম=ব্যতিক্রম, নি+ঊন=ন্যূন, প্রতি+ঊষ=প্রত্যূষ [প্রতি+উষ=প্রত্যুষ], অতি+অল্প=অত্যল্প, ত্রি+অহস্পর্শ=ত্র্যহস্পর্শ।

১০. উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে উ ঊ-র স্থানে 'ব্' হয়; পরের স্বরবর্ণ 'ব্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন: সু+অল্প=স্বল্প, সু+আগত=স্বাগত, পশু+অধম=পশ্বধম, অনু+অয়=অন্বয়, অনু+এষণ=অন্বেষণ, মনু+অন্তর=মন্বন্তর, অনু+ইত=অন্বিত, সু+অচ্ছ=স্বচ্ছ, গুরু+ঈ=গুর্বী, তনু+ঈ=তন্বী, সু+অস্তি =স্বস্তি, সাধু+ঈ=সাধ্বী, সু+ঋণ=স্বর্ণ, পূ+ইত্র=পবিত্র।

১১. স্বরবর্ণ পরে থাকলে ঋ-র স্থানে 'র্' হয়; পরের স্বরবর্ণ 'র্'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন: পিতৃ+অর্থ=পিত্রর্থ, পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়, মাতৃ+ অঙ্ক=মাত্রঙ্ক, পিতৃ+ইচ্ছা=পিত্রিচ্ছা, পিতৃ+আদেশ=পিত্রাদেশ, ধাতৃ+উপদেশ =ধাত্রুপদেশ, কর্তৃ+ঈ=কর্ত্রী।

১২. স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-স্থানে 'অয়', ঐ-স্থানে 'আয়', ও-স্থানে 'অব', এবং ঔ-স্থানে 'আব' হয়। যেমন: নে+অন=নয়ন, শে+অন=শয়ন, বে+অন=বয়ন, গৈ+অক=গায়ক, গৈ+ইকা=গায়িকা, নৈ+অক=নায়ক, নৈ +ইকা=নায়িকা, পো+অন=পবন, ভো+অন=ভবন, গো+এষণা=গবেষণা, গো+আদি=গবাদি, শ্রো+অন=শ্রবণ, পো+ইত্র=পবিত্র, পৌ+অক=পাবক, নৌ+ইক=নাবিক, ভৌ+উক=ভাবুক।

১৩. **নিপাতনে স্বরসন্ধি:** সন্ধির সাধারণ নিয়ম-বহির্ভূত স্বরসন্ধিকে নিপাতনে স্বরসন্ধি বলা হয়। যেমন: স্ব+ঈয়=স্বীয়, গো+অক্ষ=গবাক্ষ, প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ়, মনস্+ঈষা=মনীষা, বার+এক=বারেক, অন্য+অন্য=অন্যোন্য, সীমা+অন্ত=সীমন্ত, শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন, মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড, অক্ষ+ঊহিনী =অক্ষৌহিনী, বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ, কুল+অটা=কুলটা, স্ব+ঈর=স্বৈর, স্ব+ঈরিণী =স্বৈরিণী, স্ব+ঈর+আচার=স্বৈরাচার, সার+অঙ্গ=সারঙ্গ, গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র, দশ+ঋণ=দশার্ণ।

● খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি : বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি-অনুযায়ী বাংলা ভাষার সন্ধির নিয়মগুলিও অনেকটা শিথিল। বাংলা সন্ধির নিয়মগুলি মূলতঃ উচ্চারণ-নির্ভর। সমীকরণ, স্বরসঙ্গতি, বর্ণলোপ ইত্যাদি প্রধানতঃ এই সন্ধির বৈশিষ্ট্য।

ক. বাংলা স্বরসন্ধির কতকগুলি ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের নিয়ম অনুসৃত হয়। যেমন : চাষ+আবাদ=চাষাবাদ, জেঠা+আমি=জেঠামি, নষ্ট+আমি=নষ্টামি, দুষ্ট+আমি=দুষ্টামি, ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি, মিতা+আলি=মিতালি, দূত+আলি=দূতালি, ভাঙ্গা+আনি=ভাঙ্গানি, বঙ্গ+আল=বঙ্গাল।

● স্মরণীয় যে, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দে সন্ধি হয় না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে এরূপ সন্ধি প্রচলিত। যেমন : দিল্লী+ঈশ্বর=দিল্লীশ্বর, ঢাকা+ঈশ্বরী=ঢাকেশ্বরী, ইংলণ্ড+অধিপতি=ইংলণ্ডাধিপতি, আইন+অনুসারে=আইনানুসারে, আইন+অনুগ=আইনানুগ, হিসাব+আদি=হিসাবাদি, গ্যাস+আলোক=গ্যাসালোক।

খ. কাছাকাছি, মোটামুটি অর্থে 'এক' প্রত্যয়ের পূর্ববর্তী 'অ'-কার লুপ্ত হয় এবং 'এ' পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন : অর্ধ+এক=অর্ধেক, বার+এক=বারেক, আধ+এক=আধেক, যত+এক=যতেক, দশ+এক=দশেক, শত+এক=শতেক, চার+এক=চারেক, পাঁচ+এক=পাঁচেক।

গ. 'এক' ও 'এ' প্রত্যয়ের পূর্বে 'অ' ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে 'এ'-কার লুপ্ত হয়। যেমন : খানি+এক=খানিক, কোটি+এক=কোটিক, গুটি+এক=গুটিক, কুড়ি+এক=কুড়িক, কলকাতা+এর=কলকাতার, দিল্লী+এর=দিল্লীর।

ঘ. 'ই'-কার ও 'ও'-কারের পূর্ববর্তী 'অ'-কার লুপ্ত হয় এবং 'ই' অথবা 'ও' পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন : আমার+ই=আমারি, সবার+ই=সবারি, তোমার+ই=তোমারি, যখন+ই=যখনি, তখন+ই=তখনি, এখন+ই=এখনি, আমার+ও=আমারো, তোমার+ও=তোমারো, তখন+ও=তখনো, এখন+ও=এখনো, কখন+ও=কখনো, কোন+ও=কোনো, আর+ও=আরো, কার+ও=কারো।

ঙ. সন্নিহিত দুটি স্বরবর্ণের পরবর্তী স্বরটি লুপ্ত হয়। যেমন : যা+ইচ্ছে+তাই=যাচ্ছেতাই।

• চ. ব্যঞ্জনবর্ণের পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হয়। যেমন : কাঁচা+কলা=কাঁচকলা, মিশি+কালো=মিশ্‌কালো, সারি+বন্দী=সারবন্দী, টাকা+শাল=টাকশাল, ঘোড়া+দৌড়=ঘোড়দৌড়, ঘোড়া+গাড়ি=ঘোড়গাড়ি, ঘোড়া+সওয়ার=ঘোড়সওয়ার, ভরা+সাঁঝ=ভরসাঁঝ, ভরা+দুপুর=ভরদুপুর, পিসি+শাশুড়ি=পিসশাশুড়ি, বোকা+চন্দ্র=বোকচন্দ্র।

● সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :

স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে **ব্যঞ্জনসন্ধি** বলা হয়।

১. স্বরবর্ণের পর ছ্ থাকলে ছ-স্থানে 'চ্ছ' হয়। যেমন: স্ব+ছায়=স্বচ্ছায়, অনু+ছেদ=অনুচ্ছেদ, আ+ছাদন=আচ্ছাদন, বি+ছেদ=বিচ্ছেদ, বি+ছিন্ন=বিচ্ছিন্ন, তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া, প্র+ছায়া=প্রচ্ছায়া, প্রেত+ছায়া=প্রেতচ্ছায়া, অ+ছদ=অচ্ছদ, পরি+ছদ=পরিচ্ছদ, পরি+ছন্ন=পরিচ্ছন্ন, পরি+ছেদ=পরিচ্ছেদ, অব+ছেদ=অবচ্ছেদ, স্ব+ছন্দ=স্বচ্ছন্দ, প্র+ছদ=প্রচ্ছদ, প্র+ছন্ন=প্রচ্ছন্ন, এক+ছত্র=একচ্ছত্র, রাজ+ছত্র=রাজচ্ছত্র [বিকল্পে 'রাজছত্র']। দৃষ্টান্ত: 'রাজছত্র ভেঙ্গে পড়ে'।

২. স্বরবর্ণ, গ্ ঘ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ কিংবা য্ র্ ল্ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ-স্থানে বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন: দিক্+অন্ত=দিগন্ত, পৃথক্+অন্ন=পৃথগন্ন, বাক্+অর্থ=বাগর্থ, বাক্+আড়ম্বর=বাগাড়ম্বর, বাক্+ঈশ=বাগীশ, বাক্+ঈশ্বরী=বাগীশ্বরী, প্রাক্+ঐতিহাসিক=প্রাগৈতিহাসিক, ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত, ষট্+আনন=ষড়ানন, উৎ+অয়=উদয়, তৎ+অবস্থা=তদবস্থা, জগৎ+ইন্দ্র=জগদিন্দ্র, জগৎ+অম্বা=জগদম্বা, তৎ+ঈয়=তদীয়, জগৎ+ঈশ=জগদীশ, কিয়ৎ+অংশ=কিয়দংশ, জগৎ+বিখ্যাত=জগদ্বিখ্যাত, জগৎ+বন্ধু=জগদ্বন্ধু, বৃহৎ+আরণ্যক=বৃহদারণ্যক, তৎ+উপরি=তদুপরি, উৎ [উদ্]+ভিদ্=উদ্ভিদ, ঈষৎ+উষ্ণ=ঈষদুষ্ণ, বিদ্যুৎ+বেগ=বিদ্যুদ্বেগ, তড়িৎ+আলোক=তড়িদালোক, জগৎ+ইন্দ্র=জগদিন্দ্র, শ্রীমৎ+ভগবৎ+গীতা=শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জগৎ+আনন্দ=জগদানন্দ, সৎ+বংশীয়=সদ্বংশীয়, সৎ+অসৎ=সদসৎ, সৎ+উক্তি=সদুক্তি, সৎ+উত্তর=সদুত্তর, উৎ+বাস্তু=উদ্বাস্তু, তৎ+দ্বারা=তদ্দ্বারা, তৎ+উৎপন্ন=তদুৎপন্ন, *মৃৎ+অঙ্গার=মৃদঙ্গার, তৎ+রূপ=তদ্রূপ, কৎ+আকার=কদাকার, কৎ+অর্য=কদর্য, তৎ+ঊর্ধ্ব=তদূর্ধ্ব, সৎ+আশয়=সদাশয়, জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর, মৃৎ+অঙ্গ=মৃদঙ্গ, মহৎ+আশ্রয়=মহদাশ্রয়, সুপ্+অন্ত=সুবন্ত।

কিন্তু স্মরণীয়: যাচ্+আক=যাচক [যাজক নয়], পত+অঙ্গ=পতঙ্গ [পদঙ্গ নয়]।

৩. চ্ বা ছ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে 'চ্' হয়। যেমন: উৎ+চারণ=উচ্চারণ, চলৎ+চিত্র=চলচ্চিত্র, উৎ+চকিত=উচ্চকিত, শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র [কিন্তু নামের ক্ষেত্রে সন্ধি হবে না], সৎ+চরিত্র=সচ্চরিত্র, বিপদ্+চিন্তা=বিপচ্চিন্তা, উৎ+ছল=উচ্ছল, উৎ+ছেদ=উচ্ছেদ, সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ।

৪. জ্ বা ঝ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে 'জ' হয়। যেমন: সৎ+জন=সজ্জন, উৎ+জল=উজ্জ্বল, উৎ+জীবন=উজ্জীবন, বিপদ্+জাল=বিপজ্জাল, এতদ্+ঝঙ্কার=এতজ্ঝঙ্কার, কুৎ+ঝটিকা=কুজ্ঝটিকা।

৫. ট্ বা ঠ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে 'ট' হয়। যেমন: তৎ+টীকা=তট্টীকা, মহৎ+ঠক্কুর=মহট্ঠক্কুর, বৃহৎ+টঙ্কা=বৃহট্টঙ্কা, বৃহৎ+ঠক্কুর=বৃহট্ঠক্কুর।

৬. ড্ বা ঢ্ পরে থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে 'ড' হয়। যেমন: উৎ+ডীন

=উড্ডীন, উৎ+ডয়ন=উড্ডয়ন, বৃহৎ+ঢক্কা=বৃহড্‌ঢক্কা, বৃহৎ+ডম্বরু=বৃহড্‌ডম্বরু, বৃহৎ+ডঙ্কা=বৃহড্‌ডঙ্কা।

৭. ল্ পরে থাকলে ত্‌ ও দ্‌ স্থানে 'ল্' হয়। যেমন: উৎ+লেখ=উল্লেখ, উৎ+লিখিত=উল্লিখিত, সম্পদ্+লাভ=সম্পল্লাভ, উৎ+লাস=উল্লাস, উৎ+লসিত=উল্লসিত, উৎ+লম্ফন=উল্লম্ফন।

৮. পদের অন্তঃস্থ ত্‌ বা দ্-এর পর হ্‌ থাকলে ত্‌ ও দ্-স্থানে যথাক্রমে 'দ্' ও 'ধ্‌' হয়। যেমন: উৎ+হত=উদ্ধত, জগৎ+হিতায়=জগদ্ধিতায়, উৎ+হৃত=উদ্ধৃত, উৎ+হার=উদ্ধার, পদ্+হতি=পদ্ধতি, তৎ+হিত=তদ্ধিত।

৯. পদের শেষে ত্‌ বা দ্‌-এর পর শ্‌ থাকলে ত্‌ ও দ্‌-স্থানে 'চ্‌' এবং শ্‌ স্থানে 'ছ্‌' হয়। যেমন: চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি, উৎ+শ্রিত=উচ্ছ্রিত, উৎ+শ্রিয়া=উচ্ছ্রিয়া, উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস, উৎ+শ্বসিত=উচ্ছ্বসিত, উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল।

১০. চ্‌ বর্গের পরস্থিত ন্-স্থানে 'ঞ্‌' হয়। যেমন: যাচ্‌+না=যাচ্ঞা, রাজ্‌+নী=রাজ্ঞী।

১১. ষ্‌-এর পরস্থিত ত্‌ ও থ্‌-স্থানে যথাক্রমে 'ট্‌' ও 'ঠ্‌' হয়। যেমন: বৃষ্‌+তি=বৃষ্টি, হৃষ্‌+ত=হৃষ্ট, রুষ্‌+ত=রুষ্ট. ষষ্‌+থ=ষষ্ঠ, কৃষ্‌+তি=কৃষ্টি।

১২. ন্ বা ম্ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থ ত্‌, দ্ ও ধ্‌-স্থানে 'ন্' এবং ক্-স্থানে 'ঙ' হয়। যেমন: উৎ+নয়ন=উন্নয়ন, উৎ+নীত=উন্নীত, জগৎ+নাথ=জগন্নাথ, উৎ+মুখ=উন্মুখ, উৎ+মন=উন্মন, উৎ+মীলিত=উন্মীলিত, উৎ+মেষ=উন্মেষ, উৎ+মোচন=উন্মোচন, উৎ+নাসিক=উন্নাসিক, চিৎ+ময়=চিন্ময়, মৃৎ+ময়=মৃন্ময়, উৎ+মুক্ত=উন্মুক্ত, বিপদ্+মুক্ত=বিপন্মুক্ত, ক্ষুধ্‌+নিবৃত্তি=ক্ষুন্নিবৃত্তি, দিক্+নির্ণয়=দিঙ্‌নির্ণয়, দিক্+নিরূপণ=দিঙ্‌নিরূপণ [দিগ্‌নিরূপণ], দিক্+মণ্ডল=দিঙ্‌মণ্ডল [দিগ্‌মণ্ডল], বাক্+ময়=বাঙ্ময়, পরাক্+মুখ=পরাঙ্মুখ, বাক্+নিষ্পত্তি=বাঙ্‌নিষ্পত্তি, পদ্+নগ=পন্নগ, দিক্‌নাগ=দিঙ্‌নাগ।

১৩. ক-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা 'স্‌' পরে থাকলে 'দ্' ও 'ধ্‌' স্থানে 'ত্‌' [ৎ] হয়। যেমন: তদ্+ত্ব=ত [ৎ+ত্ব]=তত্ত্ব, *হৃদ্+পিণ্ড=হৃৎপিণ্ড, হৃদ্+কম্প=হৃৎকম্প, হৃদ্+পদ্ম=হৃৎপদ্ম, ক্ষুধ্‌+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা।

১৪. 'উৎ' উপসর্গের পরবর্তী 'স্থা' ও 'স্তন্‌ভ্‌' ধাতুর 'স্' লুপ্ত হয়। যেমন: উৎ+স্থান=উত্থান, মহাযজ্ঞ+উৎ+স্থিত=মহাযজ্ঞোত্থিত, উৎ+স্থাপন=উত্থাপন, উৎ+স্থাপিত=উত্থাপিত, উৎ+স্তম্ভন=উত্তম্ভন।

১৫. স্পর্শবর্ণ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থ ম্-স্থানে 'ং' বা বর্গের

'পঞ্চম বর্ণ' হয়। যেমন: অহম্‌+কার=অহংকার, শম্‌+কর=শংকর বা শঙ্কর, সম্‌+কর=সংকর বা সঙ্কর, সম্‌+গতি=সংগতি বা সঙ্গতি, পরম্‌+তপ=পরংতপ বা পরন্তপ, ভয়ম্‌+কর=ভয়ংকর বা ভয়ঙ্কর, সম্‌+কলন=সংকলন বা সঙ্কলন, গম্‌+গা=গঙ্গা, কিম্‌+নর=কিন্নর, বসুম্‌+ধরা=বসুন্ধরা, বারম্‌+বার=বারংবার, *প্রিয়ম্‌+বদা=প্রিয়ংবদা, স্বয়ম্‌+বর=স্বয়ংবর বা স্বয়ম্বর, স্বয়ম্‌+ভর=স্বয়ংভর বা স্বয়ম্ভর, সম্‌+গীত=সংগীত বা সঙ্গীত, সম্‌+কট=সংকট বা সঙ্কট। তেমনি—স্বয়ম্ভু, সংভার বা সম্ভার, সংকোচ বা সঙ্কোচ, সংগ্রহ, সংঘটিত, ওংকার বা ওঙ্কার ইত্যাদি। কিন্তু—শান্ত=শম্‌+ত, ক্ষান্ত=ক্ষম্‌+ত, কান্ত=কম্‌+ত, কান্তি=কম্‌+তি, সম্‌+দেহ=সন্দেহ।

১৬. 'সম্‌' ও 'পরি' উপসর্গের পর কৃ-ধাতু থাকলে ধাতুর পূর্বে 'স্‌'-এর আগম হয়। যেমন: সম্‌+কৃত=সংস্কৃত, সম্‌+কৃতি=সংস্কৃতি, সম্‌+কার=সংস্কার, সম্‌+করণ=সংস্করণ, পরি+কার=পরিষ্কার।

১৭. য্‌, র্‌, ল্‌, ব্‌ কিংবা শ্‌, ষ্‌, স্‌, হ্‌ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থিত ম্‌-স্থানে 'ং' হয়। যেমন: সম্‌+যম=সংযম, সম্‌+লগ্ন=সংলগ্ন, সম্‌+যত=সংযত, সম্‌+বাদ=সংবাদ, সম্‌+হার=সংহার, সম্‌+শ্লিষ্ট=সংশ্লিষ্ট, সম্‌+যোগ=সংযোগ, সম্‌+যুক্ত=সংযুক্ত, সম্‌+স্থান=সংস্থান।

১৮. বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ বা য্‌, র্‌, ল্‌, ব্‌, হ্‌ পরে থাকলে পদের অন্তঃস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে 'তৃতীয় বর্ণ' হয়। যেমন: বাক+জাল=বাগ্‌জাল, বাক্‌+যন্ত্র=বাগ্‌যন্ত্র, বাক্‌+দান=বাগ্‌দান, বাক্‌+দত্তা=বাগ্‌দত্তা, বাক্‌+বিস্তার=বাগ্‌বিস্তার, ষট্‌+যন্ত্র=ষড়যন্ত্র, সৎ+গুরু=সদ্‌গুরু, উৎ+যোগ=উদ্‌যোগ, অপ্‌+ধি=অব্ধি, হরিৎ+বর্ণ=হরিদ্বর্ণ, উৎ+ভব=উদ্ভব, উৎ+যম=উদ্যম, প্রাক্‌+উক্ত=প্রাগুক্ত, প্রাক্‌+বিশ্ববিদ্যালয়=প্রাগ্‌বিশ্ববিদ্যালয়, দিক্‌+বিজয়=দিগ্বিজয়, উৎ+ভূত=উদ্ভূত।

১৯. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি: তৎ+কর=তস্কর, আ+চর্য=আশ্চর্য, বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি, গো+পদ=গোষ্পদ, ষট্‌+দশ=ষোড়শ, এক+দশ=একাদশ, অষ্ট+দশ=অষ্টাদশ, হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র, পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি, দিব্‌+লোক=দ্যুলোক, আ+পদ=আস্পদ, বিশ্ব+মিত্র=বিশ্বামিত্র, হিরণ্য ['য'-র লোপ] +ময়=হিরণ্ময়।

২০. খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি: বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সংগঠিত হয়।

ক. বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ বা য্‌, র্‌, ল্‌, ব্‌, হ্‌ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে 'তৃতীয় বর্ণ' হয়। যেমন: ছোট+দি=ছোড়দি, এত+দূর=এদ্দূর, পাঁচ+জন=পাঁজ্‌জন, রাত+দিন=রাদ্দিন, এক+গা=এগ্‌গা, এক+ঘা=এগ্‌ঘা।

খ. বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকলে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে সেই বর্গের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ হয়। যেমন: বড়+ঠাকুর= বট্‌ঠাকুর, আধ্‌+খানা=আৎখানা, রাগ+করোনা=রাক্‌করোনা।

গ. শ্‌, ষ্‌, স্‌ থাকলে চ্‌-স্থানে 'শ্‌' হয়। যেমন: পাঁচ+সের= পাঁশ্‌সের, পাঁচ+সিকে=পাঁশ্‌সিকে।

ঘ. চ-বর্গ পরে থাকলে পূর্ববর্তী ত-বর্গের স্থানে 'চ'-বর্গ হয়ে যায়। যেমন: নাতি [নাত্‌]+জামাই=নাজ্জামাই, ভাত+জল=ভাজ্জল, বদ্‌+জাত= বজ্জাত, সাত+জোড়া=সাজ্জোড়া, হাত+জোড়া=হাজ্জোড়া, দুধ+জাল=দুজ্জাল।

ঙ. চ-বর্গ পরে থাকলে পূর্ববর্তী স্বর লুপ্ত হয় এবং চ-বর্গের 'দ্বিত্ব' হয়। যেমন: জুয়া+চোর=জোচ্চোর, যা+ইচ্ছেতাই=যাচ্ছেতাই।

চ. র্‌-কারের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে র্‌-এর লোপ হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের 'দ্বিত্ব' হয়। যেমন: ঘর+জামাই=ঘজ্জামাই, ঘোড়ার+ডিম=ঘোড়াড্ডিম, চার +টি=চাট্টি, মার+না=মান্না, কর+তাল=কত্তাল, হর+তাল=হত্তাল, বাপের+ জন্মে=বাপেজ্জন্মে, ব্যাটার+ছেলে=ব্যাটাচ্ছেলে, দর+জাল=দজ্জাল [দজ্জাল], দূর্‌+ছাই=দুচ্ছাই, দূর্‌+তোর=দুত্তোর।

ছ. ট-বর্গ পরে থাকলে ত-বর্গ স্থানে 'ট-বর্গ' হয়। যেমন: হাত+ টান=হাট্টান, পুরুত+ঠাকুর=পুরুট্‌ঠাকুর, এত+টুকু=এট্টুকু।

জ. ত্‌-বর্গের পর 'স্‌' থাকলে উভয়ে মিলে 'চ্ছ' হয়। যেমন: উৎ+সন্ন=উচ্ছন্ন, বৎ+সর=বচ্ছর, উৎ+সৃষ্ট=উচ্ছিষ্ট, কুৎ+সিত=কুচ্ছিৎ, উৎ+সব=উচ্ছব, মহা+উৎ+সব=মোচ্ছব।

সংস্কৃত বিসর্গসন্ধি:

বিসর্গ দু' প্রকার: র্‌-জাত বিসর্গ; যেমন: অন্তর্‌=অন্তঃ, বহির্‌=বহিঃ, প্রাতর্‌=প্রাতঃ, পুনর্‌=পুনঃ ইত্যাদি। স্‌-জাত বিসর্গ; যেমন: শিরস্‌=শিরঃ, নমস্‌=নমঃ, মনস্‌=মনঃ ইত্যাদি। কাজেই, বিসর্গসন্ধিও দু' প্রকার।

১. চ্‌ বা ছ্‌ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে 'শ্‌' হয়। যেমন: নিঃ+চয় =নিশ্চয়, নিঃ+চিহ্ন=নিশ্চিহ্ন, নিঃ+চেষ্ট=নিশ্চেষ্ট, নিঃ+ছিদ্র=নিশ্ছিদ্র, নিঃ+চল =নিশ্চল, শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ, দুঃ+চরিত্র=দুশ্চরিত্র, দুঃ+চর=দুশ্চর, দুঃ+ চিন্তা=দুশ্চিন্তা, নিঃ+চিন্ত=নিশ্চিন্ত, নিঃ+চিত=নিশ্চিত, প্রায়ঃ+চিত্ত=প্রায়শ্চিত্ত, মনঃ+চক্ষু=মনশ্চক্ষু, নিঃ+চেতন=নিশ্চেতন।

২. ট্‌ বা ঠ্‌ পরে থাকলে বিসর্গের স্থানে 'ষ্‌' হয়। যেমন: ধনুঃ+টঙ্কার =ধনুষ্টঙ্কার, নিঃ+ঠুর=নিষ্ঠুর।

৩. ত্‌ বা থ্‌ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে 'স্‌' হয়। যেমন: নিঃ+তেজ =নিস্তেজ, মনঃ+থ=মনস্থ, ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ, বয়ঃ+থ=বয়স্থ, দুঃ+তর=

দুস্তর, নিঃ+তরঙ্গ=নিস্তরঙ্গ, নিঃ+তার=নিস্তার, নিঃ+তারিণী=নিস্তারিণী, নিঃ+তল=নিস্তল, নভঃ+তল=নভস্তল, মনঃ+তত্ত্ব=মনস্তত্ত্ব।

৪. ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকলে অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে 'স্' হয় এবং অ-আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে 'ষ্' হয়। যেমন: পুরঃ+কার=পুরস্কার, তিরঃ+কার=তিরস্কার, ভাঃ++কর=ভাস্কর, অন্যমনঃ+ক=অন্যমনস্ক, মনঃ+কামনা=মনস্কামনা, আবিঃ+কার=আবিষ্কার, নিঃ+কলঙ্ক=নিষ্কলঙ্ক, নিঃ+কলুষ=নিষ্কলুষ, নিঃ+কৃতি=নিষ্কৃতি, গীঃ+পতি=গীষ্পতি, চতুঃ+পথ=চতুষ্পথ, চতুঃ+পর্ণা=চতুষ্পর্ণা, ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র, নিঃ+প্রদীপ=নিষ্প্রদীপ, নিঃ+ফল=নিষ্ফল, নিঃ+প্রাণ=নিষ্প্রাণ, নিঃ+প্রভ=নিষ্প্রভ, শ্রেয়ঃ+কর=শ্রেয়স্কর, অয়ঃ+কান্ত=অয়স্কান্ত, দুঃ+প্রাচ্য=দুষ্প্রাচ্য, আয়ুঃ+কাল=আয়ুষ্কাল, বনঃ+পতি=বনস্পতি।

৫. স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকলে র্-জাত বিসর্গের স্থানে 'র্' হয়। র্ পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা রেফ্ হয়ে পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন: প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ, প্রাতঃ+ভ্রমণ=প্রাতর্ভ্রমণ, অন্তঃ+ইন্দ্রিয়=অন্তরিন্দ্রিয়, অন্তঃ+অঙ্গ=অন্তরঙ্গ, বহিঃ+অঙ্গ=বহিরঙ্গ, অন্তঃ+ঈক্ষ=অন্তরীক্ষ, অন্তঃ+ঈপ=অন্তরীপ, অন্তঃ+ঘাত=অন্তর্ঘাত, অন্তঃ+জগৎ=অন্তর্জগৎ, বহিঃ+জগৎ=বহির্জগৎ, নিঃ+অতিশয়=নিরতিশয়, অন্তঃ+বর্তী=অন্তর্বর্তী, পুনঃ+আদেশ=পুনরাদেশ, বহিঃ+আগত=বহিরাগত, অন্তঃ+দাহ=অন্তর্দাহ, অন্তঃ+নিহিত=অন্তর্নিহিত, অন্তঃ+জলি=অন্তর্জলি, জ্যোতিঃ+ময়=জ্যোতির্ময়, জ্যোতিঃ+ইন্দ্র=জ্যোতিরিন্দ্র, নিঃ+অন্তর=নিরন্তর, নিঃ+অস্ত=নিরস্ত, নিঃ+আপদ=নিরাপদ, নিঃ+আকার=নিরাকার, নিঃ+আশ=নিরাশ, দুঃ+দশা=দুর্দশা, *দুঃ+অদৃষ্ট=দুরদৃষ্ট, নিঃ+অবধি=নিরবধি, নিঃ+উপায়=নিরুপায়, নিঃ+উপমা=নিরুপমা, নিঃ+ঈক্ষণ=নিরীক্ষণ, চতুঃ+অঙ্গ=চতুরঙ্গ, নিঃ+ঈহ=নিরীহ, নিঃ+অস্ত্র=নিরস্ত্র, নিঃ+অহংকার=নিরহংকার, পুনঃ+উদ্ধার=পুনরুদ্ধার, নিঃ+অপরাধ=নিরপরাধ, স্বঃ+গত=স্বর্গত, *দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা [দুরাবস্থা—অশুদ্ধ], অহঃ+অহ=অহরহ, দুঃ+অন্ত=দুরন্ত, দুঃ+আচার=দুরাচার, বহিঃ+গমন=বহির্গমন, দুঃ+আশয়=দুরাশয়, বহিঃ+আগত=বহিরাগত, দুঃ+বিনীত=দুর্বিনীত, নিঃ+বেদ=নির্বেদ, নিঃ+নয়=নির্ণয়, প্রাদুঃ+ভাব=প্রাদুর্ভাব, পুনঃ+জন্ম=পুনর্জন্ম, অন্তঃ+যামী=অন্তর্যামী, অন্তঃ+গত=অন্তর্গত, অন্তঃ+ভূত=অন্তর্ভূত, অন্তঃ+ভুক্ত=অন্তর্ভুক্ত, দুঃ+বিষহ=দুর্বিষহ, দুঃ+ধর্ষ=দুর্ধর্ষ, অন্তঃ+হিত=অন্তর্হিত, দুঃ+জয়=দুর্জয়, দুঃ+বার=দুর্বার, দুঃ+যোধন=দুর্যোধন, দুঃ+অভিসন্ধি=দুরভিসন্ধি, দুঃ+অপনেয়=দুরপনেয়, আশীঃ [আশিস্]+বাদ=আশীর্বাদ, অন্তঃ+ধান=অন্তর্ধান, অন্তঃ+হিত=অন্তর্হিত, মুহুঃ+মুহুঃ=মুহুর্মুহুঃ।

৬. অ-কার, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে 'ও-কার' হয়, ও-কার পূর্ব-বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন : মনঃ+যোগ=মনোযোগ, মনঃ+মন্দির=মনোমন্দির, মনঃ+দুঃখ=মনোদুঃখ, মনঃ+হর=মনোহর, মনঃ+হরণ=মনোহরণ, মনঃ+রঞ্জন=মনোরঞ্জন, মনঃ+জ=মনোজ, মনঃ+মোহন=মনোমোহন, মনঃ+রম=মনোরম, মনঃ+রথ=মনোরথ, নভঃ+মণ্ডল=নভোমণ্ডল, তেজঃ+দৃপ্ত=তেজোদৃপ্ত, ততঃ+অধিক=ততোধিক, অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র, অধঃ+গতি=অধোগতি, বয়ঃ+বৃদ্ধি=বয়োবৃদ্ধি, শিরঃ+দেশ=শিরোদেশ, শিরঃ+মণি=শিরোমণি, সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত, তপঃ+বন=তপোবন, সরঃ+বর=সরোবর, রক্ষঃ+বর=রক্ষোবর, সরঃ+জ=সরোজ, *পুরঃ+হিত=পুরোহিত, পুরঃ+ধা=পুরোধা, অকুতঃ+ভয়=অকুতোভয়, সর্বতঃ+ভাবে=সর্বতোভাবে, যশঃ+লাভ=যশোলাভ, ছন্দঃ+বন্ধন=ছন্দোবন্ধন, ছন্দঃ+ময়ী=ছন্দোময়ী, ত্রয়ঃ+দশ=ত্রয়োদশ, যৎ+পরঃ+ন+অস্তি=যৎপরোনাস্তি।

কিন্তু স্মরণীয় : বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা শ্, ষ্, স্ পরে থাকলে এই নিয়ম প্রযুক্ত হয় না। যেমন : অন্তঃ+করণ=অন্তঃকরণ, অন্তঃ+পুর=অন্তঃপুর, শিরঃ+পীড়া=শিরঃপীড়া, স্রোতঃ+পথ=স্রোতঃপথ, স্বতঃ+প্রবৃত্ত=স্বতঃপ্রবৃত্ত. মনঃ+প্রাণ=মনঃপ্রাণ, উচ্চৈঃ+স্বরে=উচ্চৈঃস্বরে, মনঃ+কষ্ট=মনঃকষ্ট, অতঃ+পর=অতঃপর।

৭. র্ পরে থাকলে ই-কার ও উ-কারের পরবর্তী বিসর্গের লোপ হয় এবং তার পূর্বস্বর 'দীর্ঘ' হয়। যেমন : নিঃ+রোগ=নীরোগ, নিঃ+রস=নীরস, চক্ষুঃ+রোগ=চক্ষূরোগ, নিঃ+রক্ত=নীরক্ত, নিঃ+রন্ধ্র=নীরন্ধ্র, নিঃ+রব=নীরব, নিঃ+রাজন=নীরাজন।

৮. অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী অ-কারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যেমন : অতঃ+এব=অতএব, শিরঃ+উপরি=শিরউপরি।

কিন্তু বাংলায় শিরোপরি এবং মনঃ+অন্তর=মনান্তর ইত্যাদির ব্যবহার আছে।

৯. স্বরবর্ণ পরে থাকলে 'অহন্' শব্দের পর বিসর্গ 'র-কার' হয়। এবং 'রাত্রি' শব্দ পরে থাকলে 'ও-কার' হয়। যেমন : অহঃ+নিশি [নিশ] =অহর্নিশ, অহঃ+অহঃ=অহরহঃ। কিন্তু অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র।

॥ অনুসরণী ॥

১. সন্ধি কাহাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকারের? উ. মা. '৬৩; এবং কি কি?

২. উদাহরণসহ সংস্কৃত ও বাংলা সন্ধির পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২

৩. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা লিখ: খাঁটি বাংলা সন্ধি, মা. '৫৬; ব্যঞ্জন সন্ধি; বিসর্গ সন্ধি, মা. '৫৪, নিপাতনে সন্ধি, মা. ৬১, মা. [কম্পার্ট.] '৬২, মা. '৬৩

৪. সূত্র নির্দেশ পূর্বক সন্ধি বিচ্ছেদ কর: নীরোগ, বিচ্ছেদ, মনোভাব, অভ্যুদয়, স্বচ্ছ, চলচ্ছক্তি, যাবজ্জীবন; মা. '৫৭। প্রতীক্ষা, স্বাগত, উচ্ছ্বাস, ধনুষ্টঙ্কার, নীরব, অন্বেষণ, উল্লেখ, উচ্ছন্ন; মা. '৫৮। নীরব, দিগন্ত, উচ্ছ্বাস, তদ্ধিত, অহরহঃ পশ্বধম, মহৌষধ; মা. '৫৯। অন্বেষণ, বিদ্যুল্লেখা, নীরক্ত, উচ্ছৃঙ্খল, স্বচ্ছ, সপ্তর্ষি, পর্যবেক্ষণ [পরি+অব+ঈক্ষণ], শিরচ্ছেদ, শাখাচ্ছেদ, উচ্ছেদ; মা. '৬১। প্রৌঢ়, দুশ্চর, ষড়যন্ত্র, ভাস্কর, অহোরাত্র, উত্তমর্ণ, প্রতীক্ষা; মা. '৬২। শীতার্ত, যদ্যপি, অধমর্ণ, তদ্ধিত, ত্র্যহস্পর্শ [ত্রি+অহস্পর্শ]; ব্যুৎপত্তি, বহিশ্চর, বাঙ্নিষ্পত্তি; মা. '৬২। ক্ষুধার্ত, বাগীশ, উচ্ছ্বাস, পিত্রালয়, নদ্যম্বু, চলচ্চিত্র, উদ্ধৃতি; মা. '৬৩। মনোমোহন, নীরোগ, পিত্রালয়, তন্ময়, স্বাগত, সঙ্গীত, উচ্ছ্বাস; মা. '৬৫। স্বাগত, নীরন্ধ্র, উচ্ছ্বাস, শীতার্ত, নবোঢ়া, অন্ত্যেষ্টি, শুদ্ধোদন, যৎপরোনাস্তি [যৎ+পরঃ+ন+অস্তি]; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬১। উদ্ধত, দিগন্ত, গোষ্পদ, পুরোহিত, প্রাতরাশ, স্বস্তি, রাজর্ষি; উ. মা. '৬২। ব্যুৎপন্ন, উত্তমর্ণ, অনূদিত, মন্বন্তর, শীতার্ত, শিরশ্ছেদ, উচ্ছৃঙ্খল; ক. প্রা. '৬১। যথেচ্ছাচার, তথৈবচ [তথা+এব +চ], উপর্যুপরি, অহরহঃ, দ্ব্যর্থ, শিরশ্ছেদ, ততোধিক; ক. প্রা '৬৩। পবিত্র, গবেষণা, নিরীক্ষা, পন্নগ, শকাব্দ [শক+অপ্+দ্], দশার্ণ, শরদভ্রচ্ছায়া [শরৎ+অভ্র+ছায়া], যথেচ্ছাচার, নিরতিশয়, উচ্ছ্বাস, প্রত্যূষ, কুজ্ঝটিকা, মহাবজ্রোত্থিত, কাব্যোদ্যান, মনোমন্দির; মা. '৬৬। বিচ্ছেদ, নিশ্চিহ্ন, বিপন্মুক্ত, গ্রামাঞ্চল, জগদম্বা, প্রাতরাশ, উল্লেখ; উ. মা. '৬৬। মুনীন্দ্র, পরিচ্ছেদ, গোষ্পদ, স্বাবলম্বী, বিশ্বামিত্র, নিশ্চেষ্ট, ষোড়শ, গবাক্ষ; উ. মা. '৬৮। উদ্ধত, তপোবন, শয়ন, উচ্ছ্বাস, মহর্ষি, দিগন্ত, নিষ্ফল; উ. মা. '৬৯। নিস্তব্ধ, নীরোগ, শুদ্ধোদন, জগন্নাথ, মনীষা, অন্বেষণ, হিতৈষণা। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯। দিঙ্নাগ, কিন্নর, পুরোহিত, প্রৌঢ়, গোষ্পদ, অন্বেষণ, প্রত্যাখ্যান। উ. মা. '৭০। সপ্তর্ষি, প্রত্যহ, গায়ক, ধনঞ্জয়, উত্থান, ষড়ানন, বাঙ্ময়, মনস্তাপ, নমস্কার, কিঞ্চিন্মাত্র, প্রত্যেক, দেবর্ষি, উত্তমর্ণ, আবিষ্কার, প্রত্যূষ, উদ্ধত, তন্ময়, গতিচ্ছেদ, মনীষা, দিগন্ত। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০

*৫. সন্ধি বিচ্ছেদ কর এবং সূত্র নির্দেশ কর: [পাঠ্যগ্রন্থভিত্তিক] স্বীয়, তদীয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত, ব্যর্থ, পরীক্ষা, কোষাধ্যক্ষ, যৎকিঞ্চিৎ, সায়ংকালে, পরাঙ্মুখ, সর্বালঙ্কারভূষিতা, উচ্চৈঃস্বরে, প্রাণাত্যয়, পরমাদ্ভুত, অধোগতি, ইত্যাকার, কথোপকথন, যৎপরোনাস্তি, কৃতাঞ্জলি, জীবিতাধিক, শিরশ্ছেদন, সর্বতোভাবে, প্রায়শ্চিত্ত, আবির্ভূতা, সুপ্তোত্থিত, গাত্রোত্থান, চরণারবিন্দ, পুনর্জীবিত, প্রার্থনাধিক, অন্তর্হিতা, ভবন, প্রতীক্ষা, পুরস্কার, স্বেচ্ছায়, হরিদ্বর্ণ, উচ্চারণ, পরিচ্ছদ, তদবস্থা, যাত্রা, পরিষ্কার, ইত্যবসরে, তেজোদৃপ্ত, সপ্তাহ, অন্যমনস্ক, ভ্রাতুষ্পুত্র, ব্যাধি, অন্বেষণ, অন্তর্ধান, উত্থাপন, উল্লেখ, প্রত্যর্পণ, ইতস্ততঃ, অপরাহ্ণ, যথেষ্ট, আশ্চর্য আবিষ্কার, কিম্ভূতকিমাকার, তদ্দ্বারা, তদুৎপন্ন, কিয়দংশ, উদাহরণ, অত্যুৎকৃষ্ট, মৃদঙ্গাররাশি, নাতিশীতোষ্ণ, গবাক্ষ, অদ্যপি, যথেচ্ছ, অতএব, সন্ধ্যাহ্নিক, প্রত্যাগত, মর্মোদ্ভেদ, তত্ত্ব, পুনরুদ্ধার, কদাচার, আশীর্বাদ, নিরীক্ষণ, নিষ্ঠুর, নীরব, ব্যঙ্গোক্তি, অষ্টাদশ, ষোড়শ, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, প্রত্যাশাপন্ন, বয়োভেদ, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, মনোরথ, পুরোহিত, অন্তর্লঘু, নামাবলী, কদর্য, অভ্যুদয়, উদাসীন, পুনর্গ্রহণ, হিতৈষী, নিষ্প্রয়োজন, ব্যাকরণ, পর্যবসিত, তদনুসারে, অধীন, বিদ্যালঙ্কার, তিরস্কার, স্বর্ণ, নিশ্চয়, বহিরঙ্গন, অন্তর্নিহিত, অত্যাশ্চর্য, তপোবন, হ্লাদৈকময়ী, স্বস্ত্যয়ন, পুত্রেষ্টি, দুর্দান্ত, অহরহ, ব্যস্ত, গলাধঃকরণ, মেঘাচ্ছন্ন, চতুরানন, শয়ন, দিনেশ, পবিত্র, বৃষ্টি, সানুদেশ, মলয়ানিল, শয়ন, রুদ্রাক্ষ, মৃগেন্দ্র, স্বচ্ছ, রক্ষোমণি, জীমূতেন্দ্র, রাক্ষসরাজানুজ, তারকারি, মহেষ্বাস, মহিষারূঢ়, বামেতর, রাক্ষসেন্দ্রাণী, পাবক, ত্বিষাম্পতি, কটাক্ষ, প্রাক্ত, সিংহাসনারূঢ়, জলোচ্ছ্বাস, অসূর্যম্পশ্যা, উচ্ছৃঙ্খল, দুরাশয়, অভীষ্ট, শশাঙ্ক, যশোবিম্ব, অহর্নিশি, অন্তর্যামী, মহারণ, সাধ্বী, নিরবধি, নির্বৃতি, যুধিষ্ঠির। [‘পাঠ্যগ্রন্থভিত্তিক-ব্যাকরণ’ অংশ দ্রষ্টব্য]

● ণত্ব-বিধান ●

যে নিয়মানুসারে 'ন' 'ণ'-তে পরিণত হয়, তাকে বলা হয় **ণত্ব-বিধান**।

বাংলায় 'ন' ও 'ণ'-র উচ্চারণে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বাংলায় প্রায় পঞ্চান্ন হাজারের মতো সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছে। বাংলায় সেই সংস্কৃত বা তৎসম শব্দগুলিতে মূর্ধন্য 'ণ' এবং দন্ত্য 'ন'-র উচ্চারণ একই হলেও লেখার সময় 'ণ' ও 'ন'-র পার্থক্য মানতে হবে। কাজেই, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে কেবল 'ন' প্রযোজ্য। যেমন: রানা, রানী, ঝরনা, অঘ্রান, সোনা, ঠাকুরানী, কানা, অফুরান, কোরান, কুর্নিশ, কার্নিশ, গর্দান, ফরমান, পরান, পরানো, পুরানো, জাফরান, ট্রেন, রানার, গভর্নমেণ্ট ইত্যাদি। কিন্তু তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ণত্ব-বিধান অবশ্যই প্রযোজ্য।

১. ঋ, র ও ষ-এর পর পদমধ্যবর্তী 'ন' 'ণ' হয়। [স্মরণীয় যে, 'ন' ঋ, র ও ষ-এর পরে আসবে, কিন্তু পদের মধ্যবর্তী হবে; অর্থাৎ, 'ন'-র পরে আরও বর্ণ থাকতে হবে। তবেই 'ন' 'ণ' হবে।] যেমন: হরিণ=হ্+অ+র্+ই+'ন'+অ= হ্+অ+র্+ই+'ণ'+অ=হরিণ। তেমনি: ঋণ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, বর্ধিষ্ণু, কৃষ্ণ, পূর্ণ, বর্ণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ, ভূষণ।

কিন্তু একপদে ঋ, র, ষ এবং অন্যপদে ন-র সমাস হলে 'ন' 'ণ' হয় না। যেমন: হরিনাম, ত্রিনয়ন, রঘুনন্দন, দুর্নাম, সর্বনাম, দুর্নীতি।

২. ঋ, র ও ষ এবং ন-এর মধ্যে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ ও ং থাকে, তবে 'ন' 'ণ' হয়। যেমন: দর্পণ, হরিণ, রামায়ণ, ভক্ষণ, স্বর্ণ, গ্রহণ, ধারণ, ধরণী, কৃপণ, পাষাণ, লক্ষণ, লক্ষ্মণ, ব্রাহ্মণ, চরণ, যন্ত্রণা, অর্পণ, ম্রিয়মাণ, বৃংহণ, রুগ্ণ।

কিন্তু ঋ, র ও ষ এবং ন-এর মধ্যে অন্য বর্ণ থাকলে 'ন' 'ণ' হয় না। যেমন: রচনা, অর্চনা, প্রবর্তন, নর্তন, বর্ণনা, কীর্তন, প্রার্থনা, গর্জন, মূর্ছনা, রটনা, নির্ধন, আরাধনা।

৩. প্র, পরা, অপর এবং পূর্ব—এদের পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের 'ন' 'ণ' হয়। যেমন: প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

৪. প্র, পরি, নির্—এই উপসর্গগুলির পরবর্তী হ্ন, নশ্, নী, নুদ্, অন্ ও নম্ ধাতুর 'ন' 'ণ' হয়। যেমন: প্রণব, প্রণাশ, প্রণয়, পরিণয়, নির্ণয়, প্রণীত, প্রণোদিত, প্রাণ, প্রণাম, পরিণাম।

৫. পর, পার, উত্তর, চন্দ্র, নার ও রাম শব্দের পরস্থিত 'আয়ন' প্রত্যয়ের 'ন' 'ণ' হয়। যেমন: পরায়ণ, পারায়ণ, নারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, রামায়ণ।

৬. ট, ঠ ও ড-এর পূর্বস্থিত 'ন' 'ণ' হয়। যেমন: কণ্টক, ভণ্ড, দণ্ড, কণ্ঠ, বণ্টন, চণ্ড, কাণ্ড, লণ্ঠন, লুণ্ঠন, মণ্ড, পাষণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, খণ্ড, গণ্ড, তাণ্ডব, গাণ্ডীব, অবগুণ্ঠন, ঘণ্টা।

৭. ত, থ, দ, ধ-এর পূর্বে সব সময়ই 'ন' থাকে। যেমন: দন্ত, মন্দ, গ্রন্থ, অন্ধ, বন্ধ, গন্ধ, ছন্দ, রন্ধ্র, সন্দেহ, নন্দন, চন্দন, রন্ধন, ক্রন্দন, স্পন্দন, বন্ধু, অন্ধকার, বৃন্দাবন, দ্বন্দ্ব।

৮. ভিন্ন শব্দে সমাস হওয়া সত্ত্বেও আম্রবণ, ইক্ষুবণ, শরবণ ইত্যাদির 'ন' 'ণ' হয়।

৯. নাম বোঝালে 'শূর্প' শব্দের পরবর্তী নখ শব্দের 'ন' 'ণ' হয়। যেমন: শূর্পণখা।

১০. শ্রীমান্ ও মৃন্ময় শব্দে 'ন' 'ণ' হয় না। কিন্তু হিরণ্ময় শব্দে 'ণ' হয়।

কতকগুলি নিত্য 'ণ':

গণ, গুণ, ব্রণ, মাণিক্য, পণ, নিপুণ, বণিক, বাণী,
কল্যাণ, মণি, কঙ্কণ, বেণী, রেণু, চিক্কণ, পাণি,
ঘুণ, বীণা, বেণু, গৌণ, পরমাণু, পুণ্য, বিপণি, কোণ,
লাবণ্য, কণা, তূণ, বাণ, ফণা, বাণিজ্য, নিক্কণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কতকগুলি তদ্ভব শব্দে 'ণ' ও 'ন'—এই দুইই ব্যবহৃত হয়। যেমন: রাণী ও রানী, সোণা ও সোনা, পরণ ও পরন, কাণ ও কান, ঠাকরুণ ও ঠাকরুন, ঠাকুরাণী ও ঠাকুরানী। তবে এসব ক্ষেত্রে 'ণ'-র স্থলে 'ন'-র ব্যবহারই ক্রমবর্ধমান।

আবার, ণত্ব-বিধানের অনুসরণে কিছু সংখ্যক বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে 'ন'-র স্থলে 'ণ' ব্যবহৃত হয়। যেমন: কোরাণ, কুর্ণিশ, ট্রেণ, রিপণ, জার্মাণ ইত্যাদি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে 'ন'-ই প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

● ষত্ব-বিধান ●

যে নিয়মানুসারে 'স' 'ষ'-তে পরিণত হয়, তাকে বলা হয় ষত্ব-বিধান।

বাংলায় 'স' ও 'ষ'-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বাংলায় গৃহীত তৎসম শব্দগুলির ক্ষেত্রে [এবং তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে] ষত্ব-বিধান মানতে হবে। তবে বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে 'স'-ই প্রযোজ্য। যেমন: শার্সি, আপিস, খোস-মেজাজ, গ্লাস, স্টেশন, ইস্কুল, ইস্ক্রুপ। কিন্তু তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে ষত্ব-বিধান অবশ্যই প্রযোজ্য।

১. অ, আ ভিন্ন স্বর এবং ক ও র—এই সকল বর্ণের পরবর্তী প্রত্যয়ের 'স' 'ষ' হয়। যেমন: চিকীর্ষা, মুমুক্ষু, শ্রীচরণেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রীতিভাজনেষু, ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু।

কিন্তু অ, আ-র পর 'স' 'ষ' হয় না। যেমন: জিজ্ঞাসা, পিপাসা, কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু। *'শ্রদ্ধাস্পদা' শব্দটি অশুদ্ধ; শুদ্ধ রূপ—শ্রদ্ধাস্পদ [স্ত্রীলিঙ্গ হয় না]। তাই 'শ্রদ্ধাস্পদাসু' শব্দটিও অশুদ্ধ।

তেমনি 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' এই নিয়মানুসারে 'ষ' হয় না। যেমন: ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ।

২. ঋ-কারের পর 'স' 'ষ' হয়। যেমন: ঋষি, বৃষ, কৃষক, বৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, দৃষ্টি, তৃষা, তৃষ্ণা, ঘৃষ্ট, পিষ্ট, বৃক্ষ, দিদৃক্ষা।

৩. 'ই' ও 'উ'-কারান্ত উপসর্গের পরস্থিত স্থা, সিধ্, সিচ্, সঞ্জ্, সদ্ ইত্যাদি ধাতুর 'স' 'ষ' হয়। যেমন: বিষাদ, বিষয়, প্রতিষেধ, নিষেধ, অভিষেক, নিষাদ, পরিষদ, আনুষঙ্গিক, পরিবেষণ, অধিষ্ঠান, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠিত।

ব্যতিক্রম: অনুসন্ধান, বিসর্গ, অনুস্বার ইত্যাদি।

৪. বি—উপসর্গের পর √সহ্ ধাতুর 'স' 'ষ' হয়। যেমন: দুর্বিষহ।

৫. নাম বোঝালে অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্তী 'সেনা' শব্দের 'স' 'ষ' হয়। যেমন : সুষেণ, হরিষেণ। কিন্তু যদুসেনা, কপিসেনা [এগুলি নাম নয়]।

৬. সু, দুর্, বি—উপসর্গের পরবর্তী 'সম' শব্দের 'স' 'ষ' হয়। যেমন : সুষম, বিষম, দুঃষম।

৭. 'ভূমি' ও 'গো' শব্দের পরবর্তী 'স্থ' শব্দের 'স' 'ষ' হয়। যেমন : ভূমিষ্ঠ, গোষ্ঠ।

৮. ট-বর্গের পূর্বে সব সময়ই 'ষ' হয়। যেমন : দুষ্ট, দষ্ট, কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, স্পষ্ট।

৯. 'স্বসৃ' শব্দ পরে থাকলে 'মাতৃ' ও 'পিতৃ' শব্দের সঙ্গে সমাসে 'স্বসৃ' পদের প্রথম 'স' 'ষ' হয়। যেমন : মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

১০. 'যুধি' পদের পরবর্তী 'স্থির' শব্দের 'স' এবং 'সু' উপসর্গের পর 'স্থ' শব্দের 'স' 'ষ' হয়। যেমন : যুধিষ্ঠির। কিন্তু 'সুস্থ' শব্দে 'স' হয়।

১১. কোন কোন বাংলা শব্দের সংস্কৃত ষত্ব-বিধান প্রযুক্ত হয়। যেমন : ষাট, আঁষ, পোষা, সর্ষে, পুষ্কর্ণী।

কতকগুলি নিত্য 'ষ' :

বৃষ, বিষ, রোষ, শ্লেষ্মা, পাষাণ, ঘর্ষণ,
শেষ, গ্রীষ্ম, পুষ্প, ভাষা, ঊষর, কর্ষণ,
আষাঢ়, মূষিক, ঈর্ষা, হর্ষ, বিশেষণ,
ঔষধ, গণ্ডূষ, শ্লেষ, বিশেষ, শোষণ,
প্রদোষ, প্রত্যুষ, ভীষ্ম, তুষার, ভূষণ,
মহিষ, পুরুষ, উষ্মা, পাষণ্ড, তোষণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিছু-সংখ্যক অ-সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃতের অনুকরণে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'আমিষ' শব্দের অনুকরণে, 'আঁষ', 'মহিষ' শব্দের অনুকরণে 'ভয়ষা' ইত্যাদি।

আবার, কিছু-সংখ্যক বিদেশী শব্দেও সংস্কৃতের অনুকরণে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যেমন : ষ্টল, ষ্ট্রীট, ষ্টেশন, ষ্টীল, ষ্টীমার ইত্যাদি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে 'স' ব্যবহৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

॥ অনুসরণী ॥

১. ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও।

২. যে যে নিয়মে 'ন' 'ণ' হয়, সেই নিয়মগুলি লিখ।

৩. নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে 'ন' ও 'ণ' এবং 'স' ও 'ষ'-এর ব্যবহারের যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দাও। ম্রিয়মাণ, কীর্তন, কণ্টক, দুর্নাম, করকমলেষু, সুচরিতাসু, বুভুক্ষু, ভূমিসাৎ, পরিবেষিত। উ. মা. '৬০

৪. শুদ্ধ করিয়া লিখ ও সংশোধনের যুক্তি দেখাও : শ্রদ্ধাস্পদাসু, কল্যাণীয়াষু, মৃয়মান, অপরাহ্ন, নিবারণ, করনীয়, মন্থন, শ্রীমাণ।

৫. ষত্ব-ণত্ব বিধানের প্রধান দুইটি নিয়ম নির্দেশ করিয়া উদাহরণ দাও। উ. মা. '৬৩

৬. ণত্ব অথবা ষত্ব-বিধানের মূল সূত্র অনুসারে পাঁচটি শব্দ গঠিত কর।

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

পদ ও পদের প্রকারভেদ

যে সার্থক ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টির সাহায্যে কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা কার্যের নাম প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় **শব্দ** [word]। যেমন : কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, চিনি, সোনা, মানুষ, গোরু, দয়া, করুণা, চলন, বলন ইত্যাদি।

আর, যে সার্থক ধ্বনি-সমষ্টির সাহায্যে কোন কাজ করা বোঝায়, তার নাম ধাতু [verb]। যেমন : করা, খাওয়া, যাওয়া, আসা, পড়া ইত্যাদি।

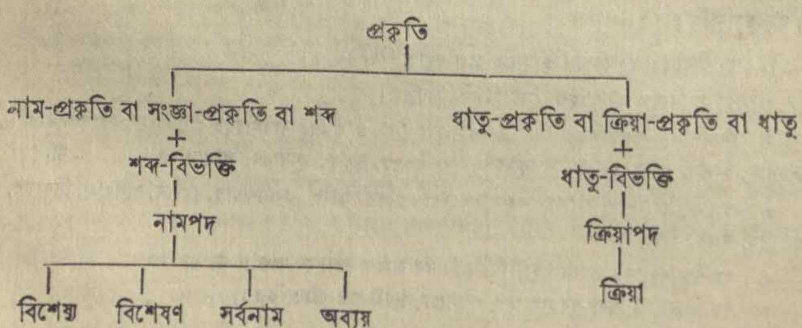
কোন্ পদকে বিশ্লেষ করলে যে মৌলিক শব্দ অবশিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় **প্রকৃতি**।

যে প্রকৃতির সাহায্যে কোন দ্রব্য, জাতি বা গুণ দ্যোতিত হয়, তাকে বলা হয় **নাম-প্রকৃতি** বা **সংজ্ঞা-প্রকৃতি**।

আর, যে প্রকৃতির সাহায্যে কোনপ্রকার ক্রিয়া বা কার্য দ্যোতিত হয়, তাকে বলা হয় **ধাতু-প্রকৃতি** বা **ক্রিয়া-প্রকৃতি**।

নাম-প্রকৃতির সঙ্গে শব্দ-বিভক্তি যুক্ত হয়ে **নামপদ** গঠিত হয়। এবং ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে ধাতু-বিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত হয় ক্রিয়াপদ।

নামপদ চার প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। কাজেই, পদ পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। প্রকৃতি ও পদের উৎপত্তির ধারাসূত্র নীচে দেওয়া হলো :



বিশেষ্য ॥ যে পদের দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার নাম প্রকাশিত হয়, তাকে বলে বিশেষ্য পদ। যেমন: বঙ্কিমচন্দ্র, সোনা, কলকাতা, বৌদ্ধ, ক্ষমা, পঠন ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ সাত রকমের: ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য, বস্তুবাচক বিশেষ্য, স্থানবাচক বিশেষ্য, জাতিবাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য, সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

বিশেষণ ॥ যে পদের দ্বারা কোন বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদের গুণ, অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় বিশেষণ পদ। যেমন: 'স্বচ্ছ' সরোবর, 'অজ্ঞ' দাস, 'ক্ষুদ্রমতি' নর, 'প্রফুল্ল' কমল।

বিশেষণ পদ পাঁচ রকমের: বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, সর্বনামের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ।

আরো কয়েক প্রকার বিশেষণ আছে। তার মধ্যে একটি হলো **পূরণবাচক** বা **ক্রমবাচক** বিশেষণ। যেমন: 'প্রথম' বালক, 'দ্বিতীয়' দিবস, 'পয়লা' তারিখ ইত্যাদি।

বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কোনটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে বিশেষণকে কেন্দ্র করে যে তুলনা করা হয়, তাকে বলা হয় **বিশেষণের তারতম্য** বা অতিশায়ন [comparison]। 'তর' ও 'তম' বা 'ঈয়স্' ও 'ইষ্ঠ' যোগে এই তারতম্য বোঝানো হয়। যেমন: বৃহৎ—বৃহত্তর—বৃহত্তম, গুরু—গরীয়ান্—গরিষ্ঠ।

সর্বনাম ॥ পুনরুক্তি পরিহারের জন্যে বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা হয় সর্বনাম। সর্বনাম অনেক রকমের হয়ে থাকে। যেমন: ব্যক্তিবাচক, নির্দেশক, অনির্দেশক, নৈকট্যসূচক, দূরত্বসূচক, সাপেক্ষমূলক, প্রশ্নসূচক ইত্যাদি।

সর্বনামের রূপ: 'আমি' ব্যক্তিবাচক সর্বনাম।

	একবচন	বহুবচন
কর্তা	আমি, মুই [গ্রাম্য ব্যবহার]	আমরা, মোরা [কবিতায়]
কর্ম	আমাকে, আমায়, মোরে, আমাকে, মোকে	আমাদিগকে, আমাদেরকে, আমাদের
করণ	আমার দ্বারা, আমা দ্বারা, আমাকে দিয়া, আমায় দিয়া, আমা কর্তৃক	আমাদিগের দ্বারা, আমাদিগ দ্বারা, আমাদিগ কর্তৃক, আমাদের দ্বারা, আমাদের দিয়া
সম্প্রদান	আমাকে, আমায়, মোরে, আমারে, মোকে	আমাদিগকে, আমাদেরকে, আমাদের
অপাদান	আমা হইতে, আমা থেকে, আমা হতে, আমার থেকে	আমাদিগ হইতে, আমাদের হতে, আমাদিগের নিকট হইতে, আমাদিগের কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	আমার, মোর, মম [কবিতায়]	আমাদিগের, আমাদের, মোদের
অধিকরণ	আমাকে, আমায়, মোতে [কবিতায়]	আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে।

অব্যয় ॥ লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন বা পুরুষ-ভেদে যে পদের রূপের কোন পরিবর্তন হয় না, তাদের অব্যয় পদ বলা হয়। যেমন : ও, এবং, ছিঃ, বাহবা, মরি, কিন্তু, তবু ইত্যাদি।

কার্যের ভিত্তিতে অব্যয় তিন প্রকার : পদান্বয়ী, সমুচ্চয়ী ও অনন্বয়ী। পদান্বয়ী অব্যয়কে আবার **অনুসর্গ** বলা হয়। যেমন : বাহির 'পানে' তাকায় না যে কেউ। মাটির 'পরে' চরণ ফেলে ফেলে।

অনন্বয়ী অব্যয় অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো : **বাক্যালঙ্কার অব্যয়**। যে সব অব্যয় বাক্যের অলঙ্করণের জন্যে ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া বাক্যের অর্থপ্রকাশে কোনরকম সাহায্য করে না, তাদের বলা হয় বাক্যালঙ্কার অব্যয়। যেমন : শুধু কাঁদলেই 'ত' হয় না বাপু! এক একটা ছেলে 'যে' একটা হাতির সমান।

ক্রিয়া ॥ বাক্যের অন্তর্গত কার্যবোধক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। গঠন-অনুসারে ধাতু চার প্রকার : মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু, সাধিত ধাতু, যৌগিক ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতু।

যে ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, অর্থাৎ যাকে আর বিশ্লেষ করা যায় না, তাকে বলা হয় **মৌলিক বা সিদ্ধ ধাতু**। যেমন : কর্, চল্, খা, পা, চা ইত্যাদি।

সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় **সাধিত ধাতু**। যেমন : করা, চলা, বলা, খাওয়া ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সিদ্ধ বা মৌলিক যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় **যৌগিক ধাতু**। যেমন : দাঁড়িয়ে থাক্, কাঁদিয়ে যা, খেয়ে নে, বলে যা ইত্যাদি। 'দাঁড়িয়ে আছো' তুমি আমার গানের ওপারে। 'চলে এসো' ঘরে পরবাসী। আমি তরী নিয়ে 'বসে আছি' নদী-কিনারে।

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় **সংযোগমূলক ধাতু**। যেমন : সাঁতার কাট্, ভিক্ষা দে, মানুষ হ, সুখী হ ইত্যাদি। আবার তোরা 'মানুষ হ'। শতাব্দীর সূর্য আজি 'অস্ত গেল'। পাখিটাকে 'শিক্ষা দাও'।

সাধিত ধাতু আবার চার প্রকারের : নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নিজন্ত ধাতু বা প্রেরণার্থক ধাতু বা প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতু।

১. বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয়—এই নামপদগুলির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ধাতু গঠিত হলে তাকে বলা হয় **নামধাতু**। যেমন : 'উত্তরিলা' কাতরে রাবণি। 'রুষিলা' বাসবত্রাস। 'নিষ্কোষিলা' অসি। 'ঝলসিলা' ফলক-আলোকে নয়ন।

২. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলা হয় **ধ্বন্যাত্মক ধাতু**। যেমন : যাচ্ছে কারা 'হনহনিয়ে'। উড়ছে মাছি 'ভনভনিয়ে'। রোদ উঠেছে 'ঝিলমিলিয়ে' বাঁশের ডালে ডালে।

৩. কর্তার প্রেরণায় অন্য কেউ ধাতু নিষ্পন্ন করলে সেই ধাতুকে **ণিজন্ত** বা **প্রেরণার্থক** বা **প্রযোজক** ধাতু বলে। যেমন: 'কাঁপাইয়া' রণস্থল, 'কাঁপাইয়া' গঙ্গাজল, 'কাঁপাইয়া' আম্রবণ উঠিল সে ধ্বনি। 'কাঁদালে' তুমি মোরে। না বুঝে কারে তুমি 'ভাসালে' আঁখিজলে। 'জ্বালাও' আলো আপন আলো, 'সাজাও' আলোয় ধরিত্রীরে।

৪. সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতুর সঙ্গে কর্মবাচ্যের আ-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে **কর্মবাচ্যের ধাতু** গঠিত হয়। যেমন: কথাটা ভালো 'শোনায়' না। এ কাজ তোমায় 'মানায়' না। বাজারে 'বিকায়' ফলতণ্ডুল।

অতিরিক্ত কয়েক প্রকার ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত:

পঙ্গুক্রিয়া: এমন কতকগুলি ধাতু আছে, যাদের সব ভাবের [mood], সব কালের [tense] রূপ পাওয়া যায় না। অন্য ধাতুর সেই ভাবের বা সেই কালের রূপ ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে নিতে হয়। তাদের বলা হয় পঙ্গুক্রিয়া বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া। যেমন: √'যা' ধাতুর পুরাঘটিত বর্তমানে 'গিয়াছে' এবং অতীত কালে 'গিয়াছিল' সংস্কৃত √'গম্' ধাতুর বিবর্তিত বাংলা রূপ √'গ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। √'আছ' ধাতুর ভবিষ্যৎকালে 'থাকিবে' √'থাক্' ধাতুরই রূপ। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া 'গিয়াছে'।

নঞর্থক ধাতু: 'ন' এই অব্যয়ের সঙ্গে 'হ' ধাতুর যোগে গঠিত 'নহ্' ধাতু নেতিবাচক অর্থদ্যোতক বলে তাকে নঞর্থক ধাতু বলা হয়। যেমন: 'নইলে' মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে?

সনন্ত ধাতু: যে সব ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে 'সন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাদের সনন্ত ধাতু বলে। যেমন: জ্ঞা+সন্+ঘঞ্+আ=জিজ্ঞাসা, পা+সন্+ঘঞ্+আ= পিপাসা, হন্+সন্+ঘঞ্+আ=জিঘাংসা। শ্রু+সন্+ঘঞ্+আ=শুশ্রূষা।

যঙন্ত ধাতু: যে সব ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য বা আতিশয্য অর্থে যঙ্ প্রত্যয় হয়, তাদের যঙন্ত ধাতু বলা হয়। যেমন: জ্বল্+যঙ্+শানচ্=জাজ্বল্যমান্, দুল্+যঙ্ +শানচ্=দোদুল্যমান, রুদ্+যঙ্+শানচ্=রোরুদ্যমান্।

● ক্রিয়ার কাল ●

ক্রিয়া-সংঘটনের সময়কে ব্যাকরণে বলা হয় ক্রিয়ার কাল [tense]। ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার: বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আবার, ক্রিয়া-সংঘটন কালের সূক্ষ্মতার বিচারে প্রত্যেকটি কাল আবার চার ভাগে বিভক্ত।

ক. বর্তমান কাল: Present tense.

১. সাধারণ বা নিত্য বর্তমান: Present Indefinite: যেখানে ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ ঘটে, তার কালকে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান বলা হয়। যেমন: কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া 'যায়'। যে 'খায়', সেই 'মরে'। আমি 'বলি'। তাঁহাদের আমি শিমুলফুল 'ভাবি'।

২. ঘটমান বর্তমান: Present continuous: যে ক্রিয়ার কাজ এখনো সংঘটিত হচ্ছে, তাকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান। যেমন: সই 'আসছে'—সই

'আসছে'। সে আমি নিয়ে 'যাচ্ছি'। খাঁচাখানা 'দুলছে' মৃদু হাওয়ায়। কোত্থেকে 'আসচেন'। চৈতী হাওয়া 'বহিতেছে'।

৩. **পুরাঘটিত বর্তমান ঃ** Present Perfect : যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু ফল বিদ্যমান, তার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান। যেমন ঃ সুদ ত' 'হয়েছে' কুললে সাড়টাকা দু'আনা। এই চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে 'এসেচি'? সব পুড়ে 'গেছে'। চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া 'লইয়াছে'।

৪. **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :** Present Imperative Mood : বর্তমান কালের প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝাতে বর্তমান কালের অনুজ্ঞা হয়। যেমন ঃ চোখ দুটো 'দেখ'। 'দাও' 'দাও', ষোলোটা 'দাও'। বসতে আজ্ঞা 'হোক'। 'যাও', তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে 'এস'।

খ. অতীত কাল ঃ Past Tense.

১. **সাধারণ বা নিত্য অতীত ঃ** Past Indefinite : যে ক্রিয়া অতীতকালে সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং তার ফলও বর্তমান নেই, তার কালকে সাধারণ অতীত বা নিত্য অতীত বলা হয়। যেমন ঃ তাহার মুখে হাসি 'ফুটিল'। লোকটা পা ছড়াইয়া 'বসিল'। আমি মনে মনে 'হাসিলাম'। তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্বিক 'বলিলাম'। সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া 'রহিল'।

২. **ঘটমান অতীত ঃ** Past Continuous : যে ক্রিয়া অতীতকালে সংঘটিত হচ্ছিল, অর্থাৎ অতীতে যে ক্রিয়ার কাজ চলছিল, তার কালকে ঘটমান অতীত বলা হয়। যেমন ঃ ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টেপাটেপি করিয়া 'হাসিতেছিল'। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম 'পাড়াইতেছিল'। ঠাকুর আপন মনেই কাজ 'করিতেছিল'।

৩. **পুরাঘটিত অতীত ঃ** Past Perfect : অতীতকালে সংঘটিত হয়েছিল, এমন ক্রিয়ার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত অতীত। যেমন ঃ সম্প্রতি আমার এক ইংরাজ বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে 'আসিয়াছিলেন'। দুই তিন দিন সকালবেলা ভিজিয়া ভিজিয়া ফুল 'তুলিয়াছিল'। এখনি রোগীকে মারিয়া 'ফেলিয়াছিল' আর কি!

৪. **নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ** Habitual Past : অতীতে প্রায়ই সংঘটিত হতো, এরূপ অর্থে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত বলা হয়। যেমন ঃ সে সময়ে কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ 'করিত'। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে হেনরি রাগিয়া অনর্থপাত 'করিত'। হাভানা সিগার কোথা হইতে 'আনিত'? গিরিবালার প্রসঙ্গমাত্রেই সে আনন্দিত 'হইত'।

গ. ভবিষ্যৎ কাল ঃ Future Tense.

১. **সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ** Future Indefinite : যে ক্রিয়া এখনো সংঘটিত হয়নি, কিন্তু পরে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ বলা হয়। যেমন ঃ হেনরিকে আমি ধরাইয়া 'দিব'? দুইটা উপবাস দিলেই মারিয়া 'যাইবে'। গরীবের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার 'করব' তবে 'ছাড়ব'।

২. **ঘটমান ভবিষ্যৎ :** Future Continuous : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে পারে, অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে চলতে থাকবে, তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলা হয়। যেমন : তুমি যখন পড়িতে থাকিবে, তখন আমি পথে 'চলিতে থাকিব'। তখন বৃষ্টি 'পড়িতে থাকিবে'।

৩. **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** বা **পুরাঘটিত সম্ভাব্য [সম্ভাব্য অতীত] :** Future Perfect : ভবিষ্যৎকালে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকবে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালে কোন ক্রিয়ার কাজ সমাপ্ত হয়ে থাকবে, এরূপ অর্থে যে ক্রিয়ার কাজ হয়, তাকে বলা হয় পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। যেমন : কেহ জানিবে না, সে কখন হয়তো মরিয়া 'পড়িয়া থাকিবে'। ততক্ষণে সে হয়তো চলিয়া 'গিয়া থাকিবে'।

৪. **ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা :** প্রার্থনা, আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদির কার্যকাল ভবিষ্যতে বোঝালে যে অনুজ্ঞা হয়, তাকে ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা বলা হয়। যেমন : কদাচ মিথ্যা কথা 'বলিবে' না। তুমি আর এখানে 'আসবে' না।

বাংলায় বিভিন্ন কালের ক্রিয়ার আরো চার প্রকারের নিত্যবৃত্ত রূপ দেখা যায়। যেমন :

১. **নিত্যবৃত্ত বর্তমান :** বর্তমানকালে যে ক্রিয়ার কাজ সর্বদা নিয়মিত ঘটে থাকে, তাকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান বলা হয়। যেমন : তিনি প্রত্যহ পার্কে 'বেড়াইয়া থাকেন'। সে রোজ একসের দুধ 'খেয়ে থাকে'।

২. **নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান :** যে ক্রিয়ার কাজ নিয়মিতভাবে যেমন ঘটে থাকে, তেমনি ঘটছে, তাকে নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান বলা হয়। যেমন : লোকটিকে দেখে তোমরা সবাই 'হাসতে থাক' কেন ? এখনো নদীর ধারে মেঘ বুক ফাটিয়ে কাকে যেন 'ডাকতে থাকে'।

৩. **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত :** যে ক্রিয়ার কাজ অতীতে সংঘটিত হতে থাকতো, তাকে ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত বলা হয়। যেমন : আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে বসিয়া গল্প 'করিতে থাকিতাম'। কাছেই ছেলেরা 'খেলিতে থাকিত'।

৪. **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত :** যে ক্রিয়ার কাজ অতীতে সংঘটিত হয়ে থাকতো, এখন আর হয় না, তাকে পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বলা হয়। যেমন : আকাশ আমাদের মুখের দিকে 'চাহিয়া থাকিত'। সে রাস্তার ধারে দিনরাত 'বসিয়া থাকিত'।

॥ অনুসরণী ॥

১. প্রকৃতি কাহাকে বলে, উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২

২. শব্দ ও ধাতু কি করিয়া পদে পরিণত হয়, উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া দেখাও। পদ কয় প্রকারের দৃষ্টান্ত সহকারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখাও। উ. মা. '৬৩

৩. অব্যয় পদ কাহাকে বলে ? মা. '৬১ ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৫

৪. দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও : অব্যয়, উ.মা. '৭০ ; পূরণবাচক বিশেষণ, মা. '৬৩ ; বাক্যালঙ্কার অব্যয়, বিশেষণের অতিশায়ন, নামপদ, নাম-প্রকৃতি, ধাতু-প্রকৃতি, সাধিত ধাতু, মা.'৬৪ ; উ. মা. ৬৯ ; ক.প্রা. '৬২ ; নামধাতু, মা. '৫৬ ; উ. মা. '৬১, '৬৪, '৬৮, '৭০ ; ব. প্রা. '৬৩, ব. প্র. '৬২ ; যৌগিক ক্রিয়া, মা. '৫৮, '৬০, '৬২, উ. মা. '৬২ [কম্পার্ট.] '৬৯ ; ক. প্রা. '৬৩ ; ধ্বন্যাত্মক ধাতু, মা, '৫৯ ; প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া, মা. '৫৫, '৫৯, '৬৩ : সিদ্ধধাতু, উ. মা. '৬৯ ; পঙ্গু ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ধাতু।

৫. দৃষ্টান্ত দিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর : যৌগিক ক্রিয়া, প্রযোজক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া, মা. '৬১।

৬. পার্থক্য বুঝাইয়া দাও : মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, উ. মা. '৬০ ; নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতি, সনন্ত ও যঙন্ত ধাতু।

৭. ধাতু ও ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ? মৌলিক ধাতু ও সাধিত ধাতু কাহাকে বলে ? দুইটি উদাহরণ সহযোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০

৮. সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও : নিত্যবৃত্ত অতীত, মা. '৫৫, '৬১, '৬৩ ; উ. মা. '৬২ ; পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ. মা. '৫২, '৫৮, উ. মা. '৬০ ; ঘটমান অতীত, উ. মা. '৬২ ; ক. প্রা. '৬২ ; ব. প্র. '৬১ ; ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা, মা. '৫৬, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত।

৯. নিত্য অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত—এই চারিটি কালের পার্থক্য বুঝাইয়া প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও। মা. '৬৪।

১০. ব্যাকরণগত টীকা লিখ : শুভকর্মে বিলম্ব করা কর্তব্য 'নহে'। অবিলম্বে উহারে লইয়া 'আইস'। রামার বাপ জ্বরের চোটে বাড়ি 'ছাড়িয়াছিল'। লোকে সম্ভ্রমের সহিত ইহাদের দিকে 'তাকাইত'। তেওয়ারি অপ্রসন্ন কুটিল দৃষ্টিতে সাহেবের পানে 'চাহিয়া রহিল'। 'বোসো' তুমি, আমি জল খেয়ে আসছি। তোমারও জলখাবার 'আসছে'। পাপের দুয়ারে পাপ সহায় 'মাগিছে'। কইগো কই মেঘ উদয় 'হও'। দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে 'দমিনু' সংগ্রামে। 'রুষিলা' বাসব-ত্রাস।

● লিঙ্গ ●

যে-ধারণার দ্বারা শব্দ-সম্ভারের স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব—এই ভেদ-প্রতীতি ঘটে, তাকে ব্যাকরণে বলা হয় **লিঙ্গ** [Gender] ।

বিশ্ব-জগতের প্রাণী ও বস্তু-সম্ভারের মতো ভাষার শব্দ-সম্ভারেরও লিঙ্গ তিন প্রকার: পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। যে সব শব্দ পুরুষ-সূচক, তাদের **পুংলিঙ্গ** [Masculine Gender] বলা হয়। যেমন: পুরুষ, বালক, ছাত্র, ময়ূর, কোকিল, সুন্দর। যে সব শব্দ স্ত্রী-সূচক, তাদের বলা হয় **স্ত্রীলিঙ্গ** [Feminine Gender]। যেমন: নারী, বালিকা, ছাত্রী, ময়ূরী, কোকিলা, সুন্দরী। যে সব শব্দে পুরুষ বা স্ত্রী না বুঝিয়ে চেতনাহীন, প্রাণহীন বস্তুকে নির্দেশ করে, তাদের **ক্লীবলিঙ্গ** [Neuter Gender] বলে। যেমন: বাতাস, পাথর, বালি, জল, ঘর, মেঘ, আলো, মাটি, ফুল, ফল, পথ, কাপড়।[১]

সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ শব্দের সংস্কার মাত্র, বলা যায় আভিধানিক। বাস্তব ক্ষেত্রের সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের লিঙ্গ-ভেদের অনেক স্থানে মিল নেই। কিন্তু বাংলায় বাস্তব ক্ষেত্রের সঙ্গে সেই মিল আছে। সংস্কৃতে 'মিত্র' শব্দ সূর্য অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, আবার বন্ধু অর্থে পুংলিঙ্গ; 'দার'—শব্দের অর্থ স্ত্রী হলেও শব্দটি পুংলিঙ্গ। কাজেই, সংস্কৃতে লিঙ্গ ও অর্থের দ্যোতনা [sense]-র মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল নেই। বাংলায় লিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অর্থ-দ্যোতনা-নির্ভর।

সংস্কৃতে 'সভা' স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন: সুমহতী সভা। কিন্তু বাংলায় 'বিরাট্ সভা' হয়। অর্থাৎ, বাংলায় 'সভা' ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতে বিশেষ্যের যে লিঙ্গ হয়, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ প্রযুক্ত হয়। যেমন: 'সুন্দরী কন্যা'। সাধু বাংলায় এই নিয়ম অনুসৃত হলেও চলিত বাংলায় কিন্তু 'সুন্দর মেয়ে' ব্যবহৃত হয়। কেতকীর মতো 'বোকা' মেয়ে আর নেই। চন্দন খুব 'লক্ষ্মী' ছেলে। আমাদের রমাদি খুব 'চালাক'।—এ রকম ব্যবহার চলিত বাংলায় প্রচলিত।

লিঙ্গ-পরিবর্তন

॥ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ॥

সংস্কৃত বা তৎসম পুংলিঙ্গ শব্দগুলিকে তিন প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়: এক. স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে, দুই. ভিন্ন শব্দের দ্বারা এবং তিন. স্ত্রী-বোধক শব্দ যোগ করে।

১. বৈয়াকরণগণ আরও একপ্রকার লিঙ্গ স্বীকার করেন। তা উভয়লিঙ্গ [Common Gender]। যে সমস্ত শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্দেশ করে, তাদের উভয়লিঙ্গ বলা হয়। যেমন: শিশু, বন্ধু, শত্রু, কবি, শিল্পী, কেরানী, লোক, সন্তান, বাছুর, মন্ত্রী ইত্যাদি।

১. স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে :

ক. আ-প্রত্যয় যোগে : অ-কারান্ত শব্দের সঙ্গে আ-প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। অজ—অজা। *অনাথ—অনাথা [বাংলায় : অনাথিনী]। আর্য—আর্যা। মহাশয়—মহাশয়া। নবীন—নবীনা। প্রবীণ—প্রবীণা। প্রাচীন—প্রাচীনা। জ্যেষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা। কনিষ্ঠ—কনিষ্ঠা। অনুজ—অনুজা। মলিন—মলিনা। চতুর—চতুরা। কৃপণ—কৃপণা। নিপুণ—নিপুণা। *পণ্ডিত—পণ্ডিতা। সেবক—সেবকা [সেবাকারিণী অর্থে—সেবিকা]। সভ্য—সভ্যা। অশ্ব—অশ্বা। *নিরপরাধ—নিরপরাধা [নিরপরাধিনী—অশুদ্ধ]। শিষ্য—শিষ্যা। আধুনিক—আধুনিকা। স্থূল—স্থূলা। কৃশ—কৃশা। চপল—চপলা। কুটিল—কুটিলা। তনয়—তনয়া। পাপিষ্ঠ—পাপিষ্ঠা। সারদ—সারদা। *শোভমান—শোভমানা। *বিদ্যমান—বিদ্যমানা। ধর্মপরায়ণ—ধর্মপরায়ণা। উপনীত—উপনীতা। বহমান—বহমানা। ভীত—ভীতা। ভয়ার্ত—ভয়ার্তা।

খ. অক্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অক্ স্থানে ইক্ এবং শেষে আ-প্রত্যয় যোগে : অভিভাবক—অভিভাবিকা। পাচক—পাচিকা। *গায়ক—গায়িকা। সাধক—সাধিকা। *শিক্ষক—শিক্ষিকা। গ্রাহক—গ্রাহিকা। স্বেচ্ছাসেবক—স্বেচ্ছাসেবিকা। পরিব্রাজক—পরিব্রাজিকা। পরিচালক—পরিচালিকা। *অধ্যাপক অধ্যাপিকা। *বিদূষক—বিদূষিকা। কিন্তু নর্তক—নর্তকী, *রজক—রজকী [বাংলায় : রজকিনী—'শুন রজাকনী রামী'—চণ্ডীদাস]।

গ. ঈ-প্রত্যয় যোগে : সিংহ—সিংহী [বাংলায় : সিংহিনী]। *সম্রাট—সম্রাজী [বাংলায় : সম্রাজ্ঞী]। *নর্তক—নর্তকী। রাক্ষস—রাক্ষসী। মানব—মানবী। ভুজঙ্গ—ভুজঙ্গী। মাতামহ—মাতামহী। পৌত্র—পৌত্রী। চণ্ডাল—চণ্ডালী [চণ্ডালিকা, চণ্ডালিনী—'ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।'—রবীন্দ্রনাথ]। ব্যাঘ্র—ব্যাঘ্রী। মৃগ—মৃগী। গুরু—গুর্বী। নাগ—নাগী [নাগিনী]। নট—নটী [নটিনী]। ময়ূর—ময়ূরী। ঘোটক—ঘোটকী। *সাধু—সাধ্বী। চাতক—চাতকী [বাংলায় : চাতকিনী—'একি গান ধরিয়াছে চাতকিনী মেদুর অম্বরে!—দেবেন্দ্রনাথ সেন]। কিংকর—কিংকরী। মার্জার—মার্জারী। দৌহিত্র—দৌহিত্রী। শ্বেতাঙ্গ—শ্বেতাঙ্গী। তাপস—তাপসী। শ্যামাঙ্গ—শ্যামাঙ্গী। [শ্যামাঙ্গিনী—'অয়ি শ্যামাঙ্গিনি ধনি।'—দেবেন্দ্রনাথ সেন]। মাতুল—মাতুলী [মাতুলানী]। মহিষ—মহিষী। বিহঙ্গ—বিহঙ্গী। কুরঙ্গ—কুরঙ্গী। [কুরঙ্গিনী—'কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে।'—শ্রীমধুসূদন]। তন্ব—তন্বী। করভ—করভী। ষোড়শ—ষোড়শী। *হেমাঙ্গ—হেমাঙ্গী [হেমাঙ্গিনী]। *মনুষ্য—মনুষী।

ঘ. নী-প্রত্যয় যোগে : রাজা—রাজ্ঞী। পতি—পত্নী। নামা—নাম্নী।

ঙ. আনী-প্রত্যয় যোগে : শিব—শিবানী। ঈশ—ঈশানী। বন—বনানী। ভব—ভবানী। রুদ্র—রুদ্রাণী। অরণ্য—অরণ্যানী। বরুণ—বরুণানী।

চ. **ইন্-প্রত্যয়ান্ত পদে ইনী-প্রত্যয় যোগেঃ** অভিমানী—অভিমানিনী। প্রিয়দর্শী—প্রিয়দর্শিনী। *অনুগামী—অনুগামিনী। দুঃখী—দুঃখিনী। বিজয়ী—বিজয়িনী। মায়াবী—মায়াবিনী। পূজারী—পূজারিণী। *মুচি—মুচিনী। ব্যাধ—ব্যাধিনী। পক্ষী—পক্ষিণী। হস্তী—হস্তিনী। পাতকী—পাতকিনী। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী। বিলাসী—বিলাসিনী। ব্রতচারী—ব্রতচারিণী। উদাসী—উদাসিনী। শিখী—শিখিনী। প্রতিযোগী—প্রতিযোগিনী। মেধাবী—মেধাবিনী। প্রার্থী—প্রার্থিনী। পরীক্ষার্থী—পরীক্ষার্থিনী। শুভার্থী—শুভার্থিনী। তেজস্বী—তেজস্বিনী। তপস্বী—তপস্বিনী। স্রোতস্বী—স্রোতস্বিনী। ওজস্বী—ওজস্বিনী। মনস্বী—মনস্বিনী। শুভাকাঙ্ক্ষী—শুভাকাঙ্ক্ষিণী।

ছ. **তৃচ্-প্রত্যয়ান্ত পদে ঈ-প্রত্যয় যোগেঃ** গ্রহীতা—গ্রহীত্রী। দাতা—দাত্রী। কর্তা—কর্ত্রী। নেতা—নেত্রী। *বিধাতা—বিধাত্রী। *প্রণেতা—প্রণেত্রী। অভিনেতা—অভিনেত্রী। ভর্তা—ভর্ত্রী। শিক্ষয়িতা—শিক্ষয়িত্রী। *আবিষ্কর্তা—আবিষ্কর্ত্রী। নিয়ন্তা—নিয়ন্ত্রী।

জ. **পূরণবাচক শব্দে ঈ-প্রত্যয় যোগ করেঃ** চতুর্থ—চতুর্থী। পঞ্চম—পঞ্চমী। ষোড়শ—ষোড়শী। [কিন্তুঃ প্রথম—প্রথমা। দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া। তৃতীয়—তৃতীয়া।]

ঝ. **বৎ, মৎ ও ঈয়স্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে বতী, মতী ও ঈয়সী যোগেঃ** ভগবান্ [ভগবৎ]—ভগবতী। গুণবান্ [গুণবৎ]—গুণবতী। বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমতী। শ্রীমান্ [শ্রীমৎ]—শ্রীমতী। রূপবান্ [রূপবৎ]—রূপবতী। আয়ুষ্মান্—[আয়ুষ্মৎ]—আয়ুষ্মতী। ধনবান্ [ধনবৎ]—ধনবতী। *ভাগ্যবান্ [ভাগ্যবৎ]—ভাগ্যবতী। ভক্তিমান্—ভক্তিমতী। গরীয়ান্—গরীয়সী। বর্ষীয়ান্—বর্ষীয়সী। পাপীয়ান্—পাপীয়সী। প্রেয়স্—প্রেয়সী। *ভূয়ান্—ভূয়সী। শ্রেয়স্—শ্রেয়সী। *মহীয়ান্—মহীয়সী।

ঞ. **বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদের অন্তে অঙ্গবাচক শব্দ থাকলে আ অথবা ঈ যোগেঃ** *সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী [বাংলায়ঃ সুকেশিনী]। চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী। চন্দ্রবদন—চন্দ্রবদনা, চন্দ্রবদনী। সূর্পনখ—সূর্পনখা, সূর্পনখী। ত্রিনয়ন—ত্রিনয়না, ত্রিনয়নী।

২. **ভিন্ন শব্দের দ্বারাঃ**

পিতা—মাতা। পুত্র—কন্যা। জনক—জননী। পুরুষ—প্রকৃতি, স্ত্রী, মহিলা। *বিদ্বান—বিদুষী। স্বামী—স্ত্রী, পত্নী, ভার্যা ভ্রাতা—ভগ্নী, ভ্রাতৃবধূ। *সম্রাট—সম্রাজ্ঞী [বাংলায়—সম্রাজ্ঞী]। যুবরাজ—যুবরাজ্ঞী। বর—বধূ [কনে]। শ্বশুর—শ্বশ্রূ। যুবা বা যুবক—যুনী, যুবতি, যুবতী। শ্বা—শুনী। এগুলিকে **নিপাতনে সিদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গও** বলা যায়।

৩. স্ত্রী-বোধক শব্দ যোগ করে :

কর্মকার—কর্মকার-পত্নী। রাজপুত্র—রাজকন্যা। ব্রাহ্মণ-তনয়—ব্রাহ্মণ-তনয়া। মুনি—মুনি-পত্নী। ব্যাধ—ব্যাধ-পত্নী। যক্ষ—যক্ষ-পত্নী। সাহিত্যিক—মহিলা-সাহিত্যিক।

তৎসম শব্দের লিঙ্গান্তর সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা :

ক. স্ত্রীলিঙ্গে দুই রূপে দুই রকম অর্থ : *আচার্য—আচার্যা [যে মহিলা অধ্যাপনা করেন], আচার্যানী [আচার্যের পত্নী]। উপাধ্যায়—উপাধ্যায়া [যে মহিলা অধ্যাপনা করেন], উপাধ্যায়ানী [উপাধ্যায়ের পত্নী]। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী [ক্ষত্রিয় বংশ-জাতা], ক্ষত্রিয়ী [ক্ষত্রিয়ের পত্নী]। শূদ্র—শূদ্রা [শূদ্রবংশ-জাতা], শূদ্রী, শূদ্রানী [শূদ্রের স্ত্রী]। চণ্ড—চণ্ডা [কোপন-স্বভাবা নারী], চণ্ডী [দেবী-বিশেষ]। সূর্য—সূর্যা [সূর্যের পত্নী], সূরী [কুন্তী]।

খ. ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রী-প্রত্যয় : পুস্তক—পুস্তিকা। নাটক—নাটিকা। কথা—কথিকা। গীত—গীতিকা। কোষা—কুষি। বটী—বটিকা।

গ. বৃহদর্থে স্ত্রী-প্রত্যয় : *হিম [শীত]—হিমানী [বৃহৎ বরফ]। অরণ্য—অরণ্যানী [বৃহৎ অরণ্য]। বন—বনানী [বৃহৎ বন]।

ঘ. কতকগুলি নিত্য-পুংলিঙ্গ শব্দ : স্ত্রৈণ, বিপত্নীক, মৃতদার, অকৃতদার, জামাতা, পুরোহিত, কবিরাজ।

ঙ. কতকগুলি নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ : সপত্নী, রূপসী, অবীরা, ধনী [সুন্দরী], ধর্মপত্নী, অঙ্গনা, কমলা, ললনা, বিমাতা, গর্ভিণী, লক্ষ্মী [কিন্তু বাংলায় 'লক্ষ্মী ছেলে' এবং 'লক্ষ্মী মেয়ে' দুই হয়]।

চ. কতকগুলি উভয়-লিঙ্গবাচক শব্দ : সন্তান, শিশু, দম্পতি, বন্ধু [স্ত্রীলিঙ্গে বন্ধু-পত্নীও হয়, কিন্তু 'বান্ধবী' 'বান্ধব' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ] কবি [স্ত্রীলঙ্গে মহিলা-কবিও হয়], শত্রু [স্ত্রীলিঙ্গে শত্রু-পত্নীও হয়]।

ছ. উভয়লিঙ্গে একই রূপ : *সুশ্রী, বিশ্রী।

॥ খাঁটি বাংলা শব্দ ॥

খাঁটি বাংলা শব্দগুলিকেও তিন প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবাতত করা হয়। যেমন : এক. স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে, দুই. ভিন্ন শব্দের দ্বারা এবং তিন. স্ত্রী-বোধক শব্দ যোগে।

১. স্ত্রী-প্রত্যয় যোগে :

ক. ঈ [কখনও কখনও আ] প্রত্যয় যোগে : [পত্নী অর্থে]

কাকা—কাকী। জেঠা—জেঠী। মামা—মামী। চাচা—চাচী। খুড়া, খুড়ো—খুড়ী। দাদা, দাদু—দাদী [দিদিমা]। বামুন—বামনী। এই সম্পর্কবাচক শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গে-'মা' [কখনও কখনও-'মণি'] শব্দ যোগ করে শব্দগুলির মাধুর্য সৃষ্টি করা হয়। যেমন : কাকীমা, কাকীমণি ; জেঠীমা, জেঠীমণি ইত্যাদি।

[সম-জাতীয়া অর্থে ঈ-প্রত্যয়] বুড়া—বুড়ী। ঘোড়া—ঘুড়ী। বিড়াল—বিড়ালী। ভাগনে—ভাগ্‌নী। সখা—সখী [> সই]। বোষ্টম—বোষ্টমী। অভাগা—অভাগী। হিংসুটে—হিংসুটী। নেকা—নেকী। কানা—কানী। মোরগ—মুরগী। ডাহুক—ডাহুকী। ব্যঙ্গমা—ব্যঙ্গমী। শাহাজাদা—শাহাজাদী। কিষান—কিষানী।

খ. ক্ষুদ্রার্থে ই-প্রত্যয় যোগে: পোঁটলা—পুঁটলি। ঝোড়া—ঝুড়ি। ঝোলা—ঝুলি। গোলা—গুলি। কোষা—কুষি। ঘট—ঘটি। ছোরা—ছুরি।

গ. আনী, ইনি ও নী-প্রত্যয় যোগে: গয়লা—গয়লানী। নাপিত—নাপতানী, নাপতিনী, নাপিতনী। চৌধুরী—চৌধুরাণী। ঠাকুর—ঠাকুরাণী [ঠাকরুণ]। রাজপুত—রাজপুতানী। মেথর—মেথরানী। গোয়ালা—গোয়ালিনী। ভিখারী—ভিখারিনী। কাঙালী—কাঙালিনী। পসারী—পসারিনী। বৈরাগী—বৈরাগিণী। রজক—রজকিনী। সাপ—সাপিনী। ধোপা—ধোপানী। ডাক্তার—ডাক্তারনী। মাস্টার—মাস্টারনী।

ঘ. বিদেশী প্রত্যয়ান্ত শব্দে ঈ-প্রত্যয় যোগে: ফুলওয়ালা—ফুলওয়ালী। দইওয়ালা—দইওয়ালী। মুড়িওয়ালা—মুড়িওয়ালী। বাসনওয়ালা—বাসনওয়ালী।

ঙ. নিত্য-পুংলিঙ্গ শব্দ: দারোগা, কুস্তিগীর। **নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ:** ধাই, সধবা, বিধবা, সতীন, এয়ো, সজনী। **উভয়-লিঙ্গ শব্দ:** মন্ত্রী, চালক।

২. ভিন্ন শব্দের দ্বারা: কর্তা—গিন্নী, ননদাই—ননদ, ননদী। *শুক—সারি, সারিকা। *বেহাই—বেয়ান। রাজা—রানী। বর—কনে [বধূ]। *চাকর—ঝি। *জ্যাঠা—জ্যাঠাইমা। কাকা—কাকীমা।

বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে: লর্ড, লাট—লেডী। ল্যাণ্ড-লর্ড—ল্যাণ্ড-লেডী। মিস্টার—মিস্‌ [কুমারী], মিসেস্‌ [বিবাহিতা]। *নবাব, বাদশাহ—বেগম। সাহেব—মেম, বিবি, সাহেবা, খাতুন। খানসামা—আয়া। গোলাম, বান্দা—বাঁদী।

৩. স্ত্রী-বোধক শব্দ যোগ করে:

কবি—স্ত্রী-কবি, মহিলা-কবি। হুলো-বিড়াল—মেনী বিড়াল। *গোসাঁই—মা-গোসাই, গোসাঁই-মা। গুরু—গুরু-মা। প্রতিনিধি—মহিলা-প্রতিনিধি। বন্ধু—বন্ধুপত্নী। [কিন্তু 'বান্ধবী'র পুংলিঙ্গের রূপ—'বান্ধব']। পুরুষমানুষ—মেয়েমানুষ। ঔপন্যাসিক—মহিলা-ঔপন্যাসিক। জমিদার—জমিদার-গিন্নী। বলদ-গোরু—গাই-গোরু। হাতী—মাদী-হাতী। উট—মাদী-উট।

● বচন ●

পদের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বুঝান হয়, তাকে **বচন** [Number] বলে। সংস্কৃতে বচন তিন প্রকার: একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। কিন্তু বাংলায় শুধুমাত্র একবচন ও বহুবচন। অর্থাৎ, বাংলায় বচন দু' প্রকার।

পদের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একটি মাত্র বস্তু বা ব্যক্তির সংখ্যা নির্দেশ করা হয়, তাকে **একবচন** বলে। যেমন: লোকটা, ছেলেটি, বইখানা, লাঠিগাছি। আর,

পদের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়, তাকে **বহুবচন** বলে। যেমন : লোকেরা, ছেলেরা, বইগুলো, লাঠিগুলো।

সংস্কৃতে বিশেষ্যের যে বচন, তার বিশেষণেরও সেই বচন হয়। কিন্তু বাংলায় তা হয় না। যেমন : সংস্কৃতে 'মধুরানি ফলানি' শুদ্ধ। কিন্তু বাংলায় 'মধুরগুলি ফলগুলি' হয় না। হয়—'মধুর ফলগুলি'।

১. একবচন নির্দেশের নিয়ম :

ক. শব্দের সঙ্গে কিছু যোগ না করে : লোক, ছেলে, মেয়ে, পুতুল, বই, কমলালেবু, আম, হাতী, ঘোড়া, গোরু, ছাগল। **খ. টা, টি, টুকু, গাছ, গাছি, খানা, খানি** ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে : লোকটা, ছেলেটি, কাজটুকু, লাঠিগাছি, মালাগাছি, বইখানা, কাপড়খানি। **গ.** বিশেষ্য পদের আগে **এক** যোগ করে : একজন, একদিন, একটাকা, একসপ্তাহ, একমাস। **ঘ.** বিশেষ্য পদের আগে **একটা** বা **একটি** যোগ করে : একটা পাগল, একটি কথা। **ঙ.** পদের শেষে **বিভক্তি** যোগে : কাকার ঘড়ি, দাদার জামা, মায়ের কথা, হরির লুট।

লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত একবচনাত্মক শব্দগুলির আগে কিংবা পরে বিশেষ কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ [যেমন : টা, টি, টুকু, গাছ, খানা, গাছি, খানি ইত্যাদি] বিশেষণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে শব্দের আকার, প্রকার, সংখ্যা ও পরিমাণ নির্দেশ। এদের পদাশ্রিত নির্দেশক বলা হয়।

২. বহুবচন নির্দেশের নিয়ম :

ক. পদের শেষে **বহুত্ব-বোধক প্রত্যয়** [রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলো, দিগ, দের ইত্যাদি] **যোগে :** শিল্পীরা, লোকেরা, মনুষ্যদিগের, ছেলেদের, আমরা, তোমরা, তোরা, তারা, ঘোষেরা, রামদের, আমগুলি, খাতাগুলা, বইগুলি, ফলগুলা। **খ.** পদের সঙ্গে **বহুত্ব-বোধক শব্দ** [গণ, আদি, কুল, বর্গ, বৃন্দ, রাজি, সমূহ, রাশি, দাম, চয়, নিচয়, মালা, আবলী, মহল, মণ্ডলী ইত্যাদি] **যোগে :** শিশুগণ, বৃক্ষাদি, নরকুল, রাজন্যবর্গ, রমণীবৃন্দ, নক্ষত্ররাজি, আইনসমূহ, জলরাশি, শৈবালদাম, পুষ্পচয়, কুসুমনিচয়, তরঙ্গমালা, গ্রন্থাবলী, শিশুমহল, মজ্‌দুরমণ্ডলী। **গ. বহুত্ব-বোধক বিশেষণ** [বহু, অনেক, কত, সকল, বিস্তর, অসংখ্য, অগণ্য ইত্যাদি] **যোগে :** বহু লোক, অনেক জন, কত ফুল, সকল দেশ, বিস্তর পয়সা, অসংখ্য তারা। **ঘ. সংখ্যাবাচক বিশেষণ** [এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি] **যোগে:** দুই ছেলে, তিন মেয়ে, চার ভাই, পাঁচ জন। **ঙ. সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে টি, টা যোগে:** চারটি পয়সা, সাতটা আম। **চ. বিশেষ্য পদের দ্বিত্ব করে :** চালে চালে, পথে পথে, বনে বনে, গাছে গাছে, ফুলে ফুলে, দেশে দেশে, দিশে দিশে। **ছ. সর্বনাম পদের দ্বিত্ব করে :** যে যে, সে সে, কে কে, কি কি। **জ. বিশেষণ পদের দ্বিত্ব করে :** সুন্দর সুন্দর ছবি, কালো কালো মেঘ, নীল নীল ফুল, বড় বড় ফল। **ঝ. ক্রিয়াবিশেষণ যোগে :** মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সে কুল পেড়ে টপাটপ্‌

খেতে লাগল। **ঞ. যুগ্ম শব্দের দ্বারা:** চাকর-বাকর, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি-কুড়ি, তরি-তরকারি। **ট. অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে:** বই পড়ে পড়ে সে পাগল হয়ে গেছে। পাঁঠা কেটে কেটে সে একেবারে কসাই হয়ে গেছে। **ঠ. একবচনান্ত শব্দ যোগে:** মানুষ বাঁচতে চায়। ভারতবাসী শুধু কাঁদতে জানে।

● **বহুবচনের অর্থে একবচনের ব্যবহার:** যেমন: '**বিষ্টি** [অনেক বৃষ্টি] পড়ে টাপুর টুপুর।' '**মানবের** [বহু মানব] মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।'

● **একবচনের অর্থে বহুবচনের ব্যবহার:** যেমন: **আমরা** [সম্পাদক] সম্পাদকীয়তে বহুবার এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছি। একবার **আমাদের** [বিনয়] বাড়ি যেতে হবে।

● **নিষিদ্ধ অথচ প্রচলিত বহুবচন:** সংজ্ঞাবাচক, বস্তুবাচক, গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে তাদেরও বহুবচন হয়। যেমন: গ্রামের মধ্যে **নন্দীরাই** একমাত্র বড়লোক। স্যাকরা তার সব গয়নার **সোনাগুলো** একেবারে ঠকিয়ে দিয়েছে। তোমার **দানগুলো** অপাত্রে হয়েছে। **খেলাগুলো** আমার মনের মতো হয়নি। **মীরজাফরেরা** চিরকালই দেশের শত্রু।

● **বচন-সংক্রান্ত অশুদ্ধি:** ওসব ছেলেদের কি করে শায়েস্তা করতে হয়, জানি।—অশুদ্ধ। ওসব ছেলেকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়, জানি।—শুদ্ধ। এই সব বইগুলো কোথায় রাখবে?—অশুদ্ধ। এই সব বই [অথবা, এই বইগুলো] কোথায় রাখবে?—শুদ্ধ। সকল লোকদের ডাক।—অশুদ্ধ। সকল লোককেই ডাক।—শুদ্ধ।

● বচন-সংক্রান্ত আরও অশুদ্ধি লক্ষ্য কর:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মা-গণ	মায়েরা	শিক্ষকরাশি	শিক্ষকগণ	ফুলরাশি	ফুলগুলি
ছেলেগণ	ছেলেরা	কবি-সমুদয়	কবিগণ	পুষ্পগুলি	পুষ্পরাশি
মেয়েগণ	মেয়েরা	সাধু-নিকর	সাধুগণ	শিক্ষকেরা	শিক্ষকগণ
কুমোর-মণ্ডলী	কুমোরেরা	ছাত্রপুঞ্জ	ছাত্রগণ	জেলেগণ	জেলেরা

● পুরুষ ●

শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বক্তাকে কিংবা শ্রোতাকে কিংবা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করা হয়, তাকে শব্দের **পুরুষ** [Person] বলে। পুরুষ তিন প্রকার: উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ।

ক্রিয়ার বক্তাকে **উত্তম পুরুষ** [First Person] বলে। যেমন: আমি, আমরা, মুই, মোরা।

বক্তা যাকে উদ্দেশ করে কিছু বলে, তাকে **মধ্যম পুরুষ** [Second Person] বলে। যেমন: তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা।

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ ছাড়া আর সমস্ত শব্দই **প্রথম পুরুষ** [Third Person]। যেমন : সে, এ, ও, উনি, তাহা, উহা, তাহারা, বই, মাটি, পাখি, গাছ, মানুষ ইত্যাদি।

॥ অনুসরণী ॥

১. বাংলা শব্দের পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তনের যে-কোন পাঁচটি নিয়মের উদাহরণসহ উল্লেখ কর। মা. '৫৩, উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬০।

২. বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর। উ. মা. '৬৪

৩. বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন স্ত্রী-প্রত্যয়গুলির উল্লেখ করিয়া তাদ্দারা নিষ্পন্ন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের দৃষ্টান্ত দাও। মা. '৬০।

৪. লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

সাধু, প্রণেতা, মহীয়ান্, পণ্ডিত, গোসাঁই, আচার্য, বিদুষী, নন্দন ; মা. '৫৯। বিধাতা, গরীয়ান্, অনাথ, নিরপরাধ, হেমাঙ্গ, বিদ্বান্, বিদ্যমান, বিদ্যাবান, আচার্য, রজক ; মা. '৬০। অনুগামিনী, নিরপরাধ, কর্তা, নায়ক, ভাগ্যবান, চাকর, বিদ্বান, ঘোড়া ; মা. '৫৭। অধীন, মাস্টার, শিক্ষক, সভাপতি, হতভাগা, মুচি ; মা. '৬৬ ; গায়ক, নর্তক, শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অভিনেতা, বাঁদর, শুক, বেহাই, জ্যাঠা ; মা. '৬৮ ; আবিষ্কর্তা, আচার্য, ক. প্রা. '৬১। সাধু, তন্বী, গুরু, সূর্য।

৫. লিঙ্গান্তর কর : [পাঠ্যগ্রন্থ ভিত্তিক] পত্নী, অনুগামিনী, সেবক, অনাথ, স্ত্রী, ভিখারী, সাহেব, চাকর, বাবু, ভূত, মহাশয়, সর্দার, গৃহিণী, প্রাণাধিকা, দুহিতা, সাধু, পিশাচ, ভ্রাতুষ্পুত্র, পারদর্শী, মানুষ, জীবধাত্রী, বুদ্ধিমান, মালী, বৈরাগী, ধোপা, নাপিত, জমিদার, ব্যাটা, ভাগিনী, ঠাকুর, মনুষ্য, আশীর্বাদক, মোহিনী, কটুভাষী, জাতীয়, দেশহিতৈষী, উদাসীন, প্রবাসী, সভাপতি, মনস্বী, প্রতিভাশালী, বয়স্ক, অভিভাবক, চিত্রকর, বন্দী, অধিকারী, পিতামহী, মাসীমা, শ্রীমন্ত, সাধু, জননী, শিখী, বিবাগী, রমণী, মরাল, গাভী, বধু, সহোদর, গুণহীন, আরূঢ়, মূঢ়, ইন্দ্র, রাক্ষসেন্দ্রাণী, কোকিল, মহারাজ, বিদ্রোহী, বাদশাহ।

৬. নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, কারণ দেখাইয়া বিচার কর : নিরপরাধিনী, উ. মা. '৬০ ; সম্রাজ্ঞী, উ. মা. '৬০ ; শ্যামাঙ্গিনী, সুকেশী, ত্রিনয়নী, অনাথিনী, চণ্ডালিনী।

৭. অর্থ-পার্থক্য নির্দেশ কর : আচার্য, আচার্যানী ; শূদ্রা, শূদ্রানী ; ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী।

৮. নিত্য-পুংলিঙ্গ, নিত্য-স্ত্রীলিঙ্গ ও উভয়-লিঙ্গ বাচক কয়েকটি শব্দের দৃষ্টান্ত দাও।

৯. একবচন শব্দকে বহুবচনে পরিবর্তিত করিবার নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর।

১০. দৃষ্টান্ত দাও : শব্দের দ্বিত্বের দ্বারা বহুবচন ; মা. '৫৪। যুগ্মশব্দের দ্বারা বহুবচন, একবচন দ্বারা বহুবচন।

১১. অশুদ্ধি সংশোধন কর : ও সব লোকেরা অন্ধের ভাল দেখতে পারে না। বাড়ির সব লোকদেরই ডাক। শিক্ষকগুলো চলে যাচ্ছেন। ছাত্রগুলো আজকাল পড়াশোনা করতে চায় না। মহিষগণ জলে সাঁতার কাটতে পারে। জেলেগণ মাছ ধরিবে। মা-গণেরা আশীর্বাদ করিবেন। তাঁহার ছেলেমেয়েগণ কেহই কাছে ছিল না।

১২. উদাহরণসহ তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও : প্রথম পুরুষ, মা. '৬৫।

পদ পাঁচ প্রকার হলেও পদ-পরিবর্তন বলতে কেবলমাত্র বিশেষ্য থেকে বিশেষণে এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিবর্তনকেই বুঝায়। এই পরিবর্তন-কর্ম কতকগুলি নিয়মের অনুসরণে সংঘটিত হয়। নিম্নে সেই নিয়মগুলি দৃষ্টান্তসহ প্রদত্ত হলো :

● বিশেষ্য থেকে বিশেষণ

১. সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় যোগে :

অনুবাদ—অনূদিত। অনুগ্রহ—অনুগৃহীত। অনুরাগ—অনুরক্ত। অনুভব—অনুভূত। অনুষ্ঠান—অনুষ্ঠিত। অন্তর্ধান—অন্তর্হিত। অধ্যয়ন—অধীত। অবধান—অবহিত। অবসাদ—অবসন্ন। অবসান—অবসিত। অবিরাম—অবিরত। অভিপ্রায়—অভিপ্রেত। অভিধা—অভিহিত। অভিলাষ—অভিলষিত। অভিষেক—অভিষিক্ত। অভ্যাস—অভ্যস্ত। আরম্ভ—আরব্ধ। আরোহণ—আরূঢ়। আক্রমণ—আক্রান্ত। *আসন—আসীন। আবরণ—আবৃত। আহ্বান—আহূত। আকর্ষণ—আকৃষ্ট। আঘাত—আহত। আদর—আদৃত, আদরণীয়। আদেশ—আদিষ্ট। আহরণ—আহৃত। ইচ্ছা—ইষ্ট। উদয়—উদিত। উচ্ছেদ—উচ্ছিন্ন। উন্মাদ—উন্মত্ত। *উৎকর্ষ—উৎকৃষ্ট। উৎসর্গ—উৎসৃষ্ট। উত্তেজনা—উত্তেজিত। উদ্ধার—উদ্ধৃত। উদ্যম—উদ্যত। *উদ্বেগ—উদ্বিগ্ন। উপকার—উপকৃত। উপদ্রব—উপদ্রুত। ক্রোধ—ক্রুদ্ধ। ক্ষয়—ক্ষীণ। *ক্ষুধা—ক্ষুধিত। ক্ষোভ—ক্ষুব্ধ। গ্রহণ—গৃহীত। চৈতন্য—চেতন। ছেদ—ছিন্ন। জরা—জীর্ণ। জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসিত। ত্যাগ—ত্যক্ত। দুর্গতি—দুর্গত। নিরুদ্দেশ—নিরুদ্দিষ্ট। পান—পানীয়, পীত। প্রণয়ন—প্রণীত। *প্রত্যর্পণ—প্রত্যর্পিত। প্রসাদ—প্রসন্ন। পরাজয়—পরাজিত। *পরিত্যাগ—পরিত্যক্ত। পরীক্ষা—পরীক্ষিত। পূজা—পূজনীয়, পূজ্য, পূজিত। *প্রশ্ন—পৃষ্ট। প্রণতি—প্রণত। *প্রীতি—প্রীত। *বধ—হত। বপন—উপ্ত। বিনয়—বিনীত। বিপদ—বিপন্ন। *বিশ্রাম—বিশ্রান্ত। বিরাম—বিরত। বিশ্বাস—বিশ্বস্ত। *বিষাদ—বিষণ্ণ। বিধি—বিহিত। *বিবেচনা—বিবেচিত। ব্যবহার—ব্যবহৃত। ব্যাঘাত—ব্যাহত। ভঙ্গ—ভগ্ন। ভেদ—ভিন্ন। ভ্রম—ভ্রান্ত। *মোহ—মুগ্ধ, মোহিত। মদ—মত্ত। মূল—মৌল, মৌলিক। *মোচন—মুক্ত, মোচিত। রোগ—রুগ্‌ণ। রোধ—রুদ্ধ। রোষ—রুষ্ট। লোভ—লুব্ধ, লোভন। শয়ন—শয়ান, শয়িত। শোভা—শোভিত, শোভন। *শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধেয়। শোষণ—শুষ্ক, শোষিত। সমাদর—সমাদৃত। সমাস—সমস্ত। স্পর্শ—স্পৃষ্ট। স্নেহ—স্নিগ্ধ, স্নেহবান্। হরণ—হৃত। হর্ষ—হৃষ্ট।

২. সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে ঃ

অংশ—আংশিক। অতিথি—আতিথেয়। *অন্ত—অন্ত্য, অন্তিম। অনুমান—আনুমানিক। অরণ্য—আরণ্য, আরণ্যক। অনুষ্ঠান—আনুষ্ঠানিক। অনুপূর্ব—আনুপূর্বিক। অন্তর—আন্তর, আন্তরিক। অণু—আণবিক। অসুর—আসুরিক। ইতিহাস—ঐতিহাসিক। ইচ্ছা—ঐচ্ছিক। ইহ—ঐহিক। ঈশ—ঐশিক। ঈশ্বর—ঐশ্বরিক। *ঋষি—আর্ষ। কায়—কায়িক। কল্পনা—কাল্পনিক। কুল—কুলীন। কূল—কূলিক। কৌতূহল—কৌতূহলী। গিরি—গৈরিক। গুণ—গুণী, গুণবান্। গ্রাম—গ্রামীণ, গ্রাম্য। গো—গব্য। গঙ্গা—গাঙ্গেয়। চন্দ্র—চান্দ্র। চরিত্র—চারিত্র। চির—চিরন্তন। জটা—জটিল। জল—জলীয়। জাতি—জাতীয়। তড়িৎ—তাড়িত। দর্শন—দার্শনিক, দর্শনীয়। দক্ষিণা—দাক্ষিণাত্য। দক্ষিণ—দাক্ষিণ্য। দিন—দৈনিক। দেব—দৈব। দেহ—দৈহিক। ধর্ম—ধার্মিক। ধাতু—ধাতব। নগর—নাগরিক। নিশা—নৈশ। পঞ্চবর্ষ—পঞ্চবার্ষিক। পুরাণ—পৌরাণিক। পিতা—পৈতৃক। পঙ্ক—পঙ্কিল। পরম্পর—পারম্পরিক। প্রত্যহ—প্রাত্যহিক। *ফেন—ফেনিল। বর্ষ—বার্ষিক। বন—বন্য। বায়ু—বায়ুবীয়। *বস্তু—বাস্তব, বাস্তবিক। *বিধি—বৈধ, বিধেয়। বিতান—বিতানিক। বিদ্যা—বিদ্বান্। বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক। বিরহ—বিরহী। বিবাহ—বৈবাহিক, ব্যূঢ়। বেতাল—বৈতালিক। বেতন—বৈতনিক। বৈকাল—বৈকালিক। *বিশেষ—বিশেষ্য, বিশেষত্ব। ভগবৎ—ভাগবত। ভূত—ভৌতিক। ভূগোল—ভৌগোলিক। *মন—মানস, মানসিক। *মল—মলিন। মাতা—মাতৃক, মাত্রেয়। মাত্রা—মাত্রিক। মানব—মানবিক। মুখ—মৌখিক। মূল্য—মূল্যবান্। মাংস—মাংসল। শরীর—শারীর, শারীরিক। *শরৎ—শারদ, শারদীয়। শক্তি—শাক্ত, শক্তিমান্। শিব—শৈব। শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধেয়। শীত—শীতল। শিব—শৈব। *সন্ধ্যা—সান্ধ্য। সর্প—সর্পিল। সম্পদ—সম্পন্ন। সর্বজন—সর্বজনীন ['সার্বজনীন'ও প্রচলিত]। স্বর্ণ—স্বর্ণিল। *সিন্ধু—সৈন্ধব। স্নায়ু—স্নায়বিক। হেম—হৈম। হৃদয়—হৃদ্য। *হেমন্ত—হৈমন্তিক।

৩. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় যোগে ঃ

উঠা—উঠতি। উড়া—উড়ো, উড়ন্ত, উড়ুক্কু। কালো—কালচে, কালোপানা। কাঁদা—কাঁদুনে। খেলা—খেলুড়ে। গাওয়া—গাইয়ে। ঘুম—ঘুমন্ত। চড়া—চড়াই। চলা—চলতি. চলন্ত। জানা—জান্তা। জমা—জমাট। ঝোলা—ঝুলন্ত। ডুব—ডুবু। পড়া—পড়ন্ত। পড়া—পড়ুয়া। পূজা—পূজারী। ফেরা—ফিরতি। বাড়া—বাড়ন্ত। বাজান—বাজিয়ে। বসা—বসত। বলা—বলিয়ে। ভরা—ভরাট। মিশা—মিশুক। লাজ—লাজুক। সেবা—সেবাইত। সাঁতার—সাঁতারু।

৪. বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে ঃ

অলক্ষণ—অলক্ষুণে। আঠা—আঠালো। আকাশ—আকাশী। আলাপ—আলাপী। কাগজ—কাগুজে। কাজ—কেজো। কুলো—কুলোপানা। গোলাপ—

গোলাপী। *গাঁ—গেঁয়ো। ঘর—ঘরোয়া। ঘা—ঘেয়ো। ঘুম—ঘুমন্ত। চৈত—চৈতী, চৈতালী। চাঁদ—চাঁদপানা। চোর—চোরা, চোরাই। ছ্যাদা—ছেঁদো। ছুঁচ—ছুঁচালো। জঙ্গল—জংলী। জল—জলো। জোর—জোরালো। ঝড়—ঝোড়ো। *ঝগড়া—ঝগড়াটে। ঢাকা—ঢাকাই। তামা—তামাটে। তেঁতুল—তেঁতুলে। দরদ—দরদী। দাঁত—দেঁতো, দাঁতাল। দুধ—দুধে। পাথর—পাথুরে। পাহাড়—পাহাড়ে। পেট—পেটুক। *ফেন—ফেনিল। বৃন্দাবন-বৃন্দাবনী। বন—বুনো। বান—বেনো। বেনারস—বেনারসী। বালি—বেলে। *বৈঠক-বৈঠকী। ভাত—ভেতো। ভূত—ভূতুড়ে। *মাটি—মেটে। *মাঠ—মেঠো। মিথ্যা—মিথ্যুক। মাছ—মেছো। মেঘ—মেঘলা। মেয়ে—মেয়েলী। *রস—রসিক, রসালো।

● বিশেষণ হইতে বিশেষ্য

১. সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে :

অকৃতজ্ঞ—অকৃতজ্ঞতা। অধিক—আধিক্য। অধীন—অধীনতা। অনুকূল—আনুকূল্য। অভিজাত—আভিজাত্য। অনুগত—আনুগত্য। অলস—আলস্য। অতিশয়—আতিশয্য। অশুচি—অশৌচ। অসমর্থ—অসামর্থ্য। উচিত—ঔচিত্য। উপকারী—উপকারিতা। উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য। উদার-উদারতা, ঔদার্য। উৎকৃষ্ট—উৎকর্ষ। *কুলীন—কৌলিন্য। কোমল—কোমলতা। কৃপণ—কৃপণতা, কার্পণ্য। কুমার—কৌমার্য। *ক্ষীণ—ক্ষীণতা, ক্ষয়। গরিষ্ঠ—গরিষ্ঠতা। *গুরু—গৌরব, গুরুত্ব, গরিমা। গম্ভীর—গাম্ভীর্য। চঞ্চল—চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য। চতুর—চাতুর্য, চতুরতা। চপল—চপলতা, চাপল্য। জটিল—জটিলতা। জড়—জড়তা, জড়িমা, জাড্য। জীর্ণ—জীর্ণতা। তনু—তনিমা। তরুণ—তারুণ্য। তেজস্বী—তেজস্বিতা। দীন—দৈন্য, দীনতা। দীপ্ত—দীপ্তি। *দরিদ্র—দারিদ্র্য, দরিদ্রতা। দুরাত্মা—দৌরাত্ম্য। নিপুণ—নৈপুণ্য, নিপুণতা। *নিরস্ত—নিরসন। নৈতিক—নৈতিকতা। নীল—নীলিমা। নিরাশ—নৈরাশ্য। নিরাপদ—নিরাপত্তা। পণ্ডিত—পাণ্ডিত্য। পৃথক্—পার্থক্য। পার্থিব—পৃথিবী। প্রধান—প্রাধান্য। প্রচুর—প্রাচুর্য। প্রবল—প্রাবল্য। প্রসন্ন—প্রসাদ, প্রসন্নতা। প্রফুল্ল—প্রফুল্লতা। প্রৌঢ়—প্রৌঢ়ত্ব। *বিচিত্র—বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা। বিপরীত—বৈপরীত্য। বিভিন্ন—বিভিন্নতা, বিশিষ্ট—বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা। *বিশাল—বিশালতা, বিশালত্ব। *বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধি, বিশুদ্ধতা। বিষম—বৈষম্য, বিষমতা। বিরক্ত—বিরক্তি। বিকল—বৈকল্য। বিচ্ছিন্ন—বিচ্ছিন্নতা। বীর—বীর্য। বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমত্তা। বৃদ্ধ—বার্ধক্য। *ব্যাপক—ব্যাপকতা। ভ্রান্ত—ভ্রান্তি। মন্দ—মান্দ্য। *মহৎ—মহত্ত্ব, মহিমা। মধুর—মধুরতা, মধুরত্ব, মধুরিমা, মাধুরী, মাধুর্য। মহাত্মা—মাহাত্ম্য। মুনি—মৌন। *লঘু—লাঘব, লঘুতা, লঘুত্ব, লঘিমা। শিথিল—শৈথিল্য, শিথিলতা। শীত—শৈত্য। শিশু—শৈশব। শূর—শৌর্য। স্বতন্ত্র—স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা। সৎ—সত্তা। *সুরভি—সৌরভ। সুজন—সৌজন্য। সুহৃদ্—সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য। সদৃশ—সাদৃশ্য। সুষ্ঠু

—সৌষ্ঠব। স্তব্ধ—স্তব্ধতা। সম—সাম্য, সমতা। সরল—সারল্য, সরলতা। সচ্ছল—সচ্ছলতা, সাচ্ছল্য। স্বচ্ছন্দ—স্বাচ্ছন্দ্য। সর্বজনীন—সর্বজনীনতা। স্বাধীন—স্বাধীনতা। সাধু—সাধুতা। *হৃদয়বান্—হৃদয়বত্তা।

২. বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে :

কুঁড়ে—কুঁড়েমি। খ্যাপা—খ্যাপামি। গরিব—গরিবানা। গোঁড়া—গোঁড়ামি। গিন্নী—গিন্নীপনা। চালাক—চালাকি। চতুর—চতুরালি। জ্যাঠা—জ্যাঠামি। ডাকাত—ডাকাতি। দুরন্ত—দুরন্তপনা। ধূর্ত—ধূর্তামি। ন্যাকা—ন্যাকামি। পাকা—পাকামি। পাগল—পাগলামি। বড়—বড়াই। বাবু—বাবুগিরি, বাবুয়ানা, বাবুয়ানি। *বোকা—বোকামি। *বুড়ো—বুড়োমি। ভণ্ড—ভণ্ডামি। ভাঁড়—ভাঁড়ামি। সাহেব—সাহেবিয়ানা।

❁ কয়েকটি পরিবর্তিত শব্দের প্রয়োগ :

অবসান—অবসিত ॥ আমাদের সকল শক্তি কি নৈষ্কর্ম্যের মধ্যেই অবসিত হইবে? **উদ্বেগ—উদ্বিগ্ন** ॥ আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন আছি। **মহৎ—মহত্ত্ব, মহিমা** ॥ মহত্ত্ব মহতের ধর্ম। ঈশ্বরের মহিমা অপার। **গাঁ—গেঁয়ো** ॥ গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না। **বিচিত্র—বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা** ॥ বাংলাদেশে ঋতুর বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। নানা পুষ্পের বর্ণ-বিচিত্রতায় বনস্থলী অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। **বস্তু—বাস্তব, বাস্তবিক** ॥ সমাজের বাস্তব চিত্রের বিশ্বস্ত পরিবেশনে শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয়। বাস্তবিকই তিনি একজন ঋষি। **সন্ধ্যা—সান্ধ্য** ॥ প্রার্থনা-সঙ্গীতে সান্ধ্য আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। **সূর্য—সৌর** ॥ সৌর কিরণে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। **বপন—উপ্ত** ॥ দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্বারা ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। **কুলীন—কৌলিন্য** ॥ কৌলিন্য-প্রথার পাষাণ-ভার বুকে লইয়া বাংলাদেশ বহু শতাব্দী আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়াছে। **গম্ভীর—গাম্ভীর্য** ॥ বিশাল গাম্ভীর্য লইয়া দেবতাত্মা হিমালয় শিয়রে দণ্ডায়মান। **ফেন—ফেনিল** ॥ 'মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।' —দ্বিজেন্দ্রলাল। **আহ্বান—আহূত** ॥ অনুষ্ঠানে সমস্ত দেশের জ্ঞানীগুণীরা আহূত হইয়াছিলেন। **আরম্ভ—আরব্ধ** ॥ উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার আরব্ধ কার্য আর সমাধা হইল না। **সুজন—সৌজন্য** ॥ বিদেশীগণের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। **স্নেহ—স্নিগ্ধ, স্নেহবান্** ॥ 'গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'—রবীন্দ্রনাথ। তিনি একজন স্নেহবান্ পিতা। **সিন্ধু—সৈন্ধব** ॥ সাধারণ লবণের চেয়ে সৈন্ধব লবণের দাম বেশী। **রস—রসিক, রসালো** ॥ কাব্যরসিক পাঠকমাত্রেই জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়িয়াছেন। মামলা নিয়ে এমন রসালো গল্প আমি আর পড়িনি। **অনুপূর্ব—আনুপূর্বিক** ॥ যাহা দেখিয়াছিলাম, সমস্তই আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলাম। **নিশা—নৈশ** ॥ আহত পথিকের আর্তনাদে নৈশ আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

উদার—উদারতা, ঔদার্য॥ ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় উদারতা ছিল না। ঔদার্যের সাহায্যে শত্রুর হৃদয়ও জয় করা যায়। **দীন—দীনতা, দৈন্য**॥ 'এই দীনতা ক্ষমা করো, প্রভু।'—রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন কর্মেই হৃদয়ের দৈন্য প্রকাশ পাইত না। **ঋষি—আর্ষ**॥ ক্ষেত্রবিশেষে ঋষিরাও আর্ষ প্রয়োগের আশ্রয় নিতেন। **উৎকর্ষ—উৎকৃষ্ট**॥ শান্তিপুরের তাঁতের কাপড় সত্যই উৎকৃষ্ট। **মোহ—মুগ্ধ, মূঢ়, মোহিত**॥ আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলাম। যে স্বদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে মূঢ়। তাহার গান শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়া গেল। **শরৎ—শারদ**॥ 'শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে তারা অগণ্য জ্বলে।'—রবীন্দ্রনাথ। **মেঠো—মাঠ**॥ 'অবারিত মাঠ গগন-ললাট চুমে তব পদধূলি।'—রবীন্দ্রনাথ। **মন—মানস, মানসিক**॥ 'মানস-কুসুম তুলি অঞ্চলে গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে?' —রবীন্দ্রনাথ। তিনি বর্তমানে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। **পরস্পর—পারস্পরিক**॥ মানুষ পারস্পরিক সদিচ্ছার বলে শান্তিতে বাঁচিতে পারে। **শিথিল—শিথিলতা, শৈথিল্য**॥ কর্মে শিথিলতা [শৈথিল্য] নিন্দনীয়। **লঘু—লঘুতা, লঘুত্ব, লাঘব, লঘিমা**॥ বস্তুর লঘুতা [লঘুত্ব] আপেক্ষিক। আমার দুঃখ কে লাঘব করিবে? দেহের লঘিমা যোগীদেরই সাধ্য। **সম—সমতা, সাম্য**॥ সম্পদের সমতাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। সাম্যই শান্তি। **বিষম—বিষমতা, বৈষম্য**॥ সম্পদের বিষমতাই [বৈষম্যই] সামাজিক অশান্তির মূল। **হৃদয়বান্—হৃদয়বত্তা**॥ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়বত্তা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। **সুষ্ঠু—সৌষ্ঠব**॥ অলংকারটির গঠন-সৌষ্ঠব সত্যই প্রশংসনীয়।

॥ অনুসরণী ॥

১. বিশেষ্য পদকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে পরিণত করিয়া পরিবর্তিত শব্দগুলির দ্বারা বাক্য রচনা কর: নিরস্ত, ক্ষীণ, উদ্যোগ, ভাত, মহৎ, গাঁ, বিচিত্র; উ. মা. '৬২। বস্তু, ঝগড়া, সন্ধ্যা, চন্দ্র, কুলীন, বোকা, মহৎ, গম্ভীর; মা. '৫৭। ফেনল, শ্রদ্ধা, স্নেহ, সিন্ধু, গাঁ, রস, অস্ত, সমাস, বিধি, ঋষি; মা. '৬২। উৎকর্ষ, মোহ, বিশুদ্ধ, বিশেষ, ব্যাপক, শরৎ, মেঠো, দাঁত; মা. '৬৫।

*২. বিশেষ্য হইতে বিশেষণে পরিণত কর: অধ্যয়ন, অন্তর্ধান, ধ্বংস, অপনয়ন, বস্তু, শয়ন, প্রশ্ন, বায়ু। মা. '৬৩

*৩. বিশেষণে পরিণত করিয়া বাক্য রচনা কর: কল্পনা, বায়ু, মাধুর্য, মন, বস্তু, মূল্য, পরস্পর। মা. '৬৪

*৪. নিম্নলিখিত বিশেষণ পদগুলির বিশেষ্য পদ রচনা করিয়া স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর: শিথিল, লঘু, মহাত্মা, সুরভি, সম, বিরক্ত, হৃদয়বান্। ক. প্রা. '৬৪

*৫. নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে বিশেষণ পদ গঠন করিয়া স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর: বধ, বন, মল, সন্ধ্যা, বিধি, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, সর্বজন। ক. প্রা. '৬৬

*৬. নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর: সম্পন্ন, বিশ্রাম, বসন্ত, আসন, গেঁয়ো বুড়ো, প্রীতি, প্রশ্ন। উ. মা. '৬৬

*৭। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে ও বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর : পরিত্যাগ, স্নেহ, প্রত্যর্পিত, মোচন, বিবেচনা, বিশাল। মা. '৭০

৮. পদান্তর করিয়া বাক্য রচনা কর : [পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক] বেতাল, বিজ্ঞ, গুণগ্রাহী, অভিপ্রায়, স্থির, নিবেদন, প্রত্যহ, আদেশ, পরীক্ষা, রাজকীয়, বৈরাগী, আহ্বান, প্রবেশ, পরিত্যাগ, প্রস্থান, দীর্ঘ পাঞ্চভৌতিক, চরিতার্থ, প্রতীক্ষা, পুরস্কার, বৃদ্ধ, কৌতূহল, ইতিহাস, মানুষ, আরম্ভ, দরিদ্র, জ্যোঠা, ফুল, পণ্ডিত, উৎকৃষ্ট, শরীর, ঈশ্বর, বাবু, জীবন, আনুপূর্বিক, অন্বেষণ, মন্দ, অন্তর্ধান, অপচয়, ভূত, আবিষ্কার, কম্পন, সম্প্রতি, হৃদয়, অবতরণ, বিপরীত, গৃহস্থ, উদাহরণ, সংগ্রহ, বিধান, তাৎপর্য, উচিত, অণু, পরমাণু, বায়ু, গ্রাম, প্রহার, আকৃষ্ট, পেষণ, জীবন, পিশাচ, গরীব, পথ, ঠাকুর, জাগরণ, সূচনা, অবসান, অনুবাদ, অরণ্য, উপাদেয়, সৌসাদৃশ্য, অনুরূপ, রোগ, হিতৈষী, স্পর্শ, উদ্‌গার, পৃথিবী, উত্তীর্ণ, গঙ্গা, স্বর্ণ, মেঘ, উপসর্গ, হরণ, ভূগোল, অনুকূল, তত্ত্ব, বহিরঙ্গীন, পাথর, সিঁদুর, ঋষি, নীল, অতিথি, সাগর, ব্যাখ্যা, হাজির, পরিপক্ব, আহরণ, অনুরোধ, মাছ, চাষা, মাংস, শিশু, দুধ, পুরোহিত, পুরুষ, দক্ষিণ, একতান, মৃদু, হাওয়া, ক্লেশ, ঊর্মি, চক্ষু, নিপাত, দোষ, ভগ্ন, আকাশ, মাটি, সভা, দক্ষ, মহান্, সাহায্য, দয়া, বন্দী, ন্যায়, বর্ষ।

● কারক ●

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের নামপদের সম্বন্ধকে বলা হয় কারক।

কারক বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও অন্যান্য বিশেষ্য-স্থানীয় পদের সম্বন্ধ নির্দেশ করে। যেমন : প্রয়াগে সম্রাট হর্ষবর্ধন স্বহস্তে রাজকোষ থেকে দীন-দুঃখীদের ধনরত্ন দান করতেন।—এই বাক্যটিতে স্পষ্টতঃই 'দান করতেন'—পদটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ। এখন এই ক্রিয়াপদটিকে ধরে যদি প্রশ্ন করা হয় : ১. 'কে দান করতেন ?'…'সম্রাট হর্ষবর্ধন'। ২. 'কি দান করতেন ?'…'ধনরত্ন'। ৩. 'কিসের দ্বারা দান করতেন ?' 'স্বহস্তে'। ৪. 'কাকে দান করতেন ?'…'দীন-দুঃখীদের'। ৫. 'কোথা থেকে দান করতেন ?'…'রাজকোষ থেকে'। ৬. 'কোথায় দান করতেন ?'…'প্রয়াগে'।—এই উত্তরগুলি পাওয়া যাবে। উত্তরগুলিতে : ১. সম্রাট হর্ষবর্ধন—কর্তৃকারক, ২. ধনরত্ন—কর্মকারক, ৩. স্বহস্তে—করণকারক, ৪. দীন-দুঃখীদের—সম্প্রদানকারক, ৫. রাজকোষ থেকে—অপাদান কারক, এবং ৬. প্রয়াগে—অধিকরণ কারক হয়েছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক : 'ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে নাকি ?' এতে 'ডুবে যাবে'—এই সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে 'টাকাটা'; 'ব্রাহ্মণ' নয়। কারণ সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে 'টাকাটা'র সম্বন্ধ আছে, 'ব্রাহ্মণের' সম্বন্ধ নেই। কাজেই, 'ব্রাহ্মণের' পদটিতে কারক হয়নি। তার সঙ্গে 'টাকার' সম্বন্ধ আছে। তাই 'ব্রাহ্মণের' সম্বন্ধ পদ।

অতএব, **কারক ছয় প্রকার**: কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

বি. দ্র. : সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে কারক ছয় প্রকার। কিন্তু মহাত্মা রামমোহন থেকে আচার্য সুনীতিকুমার পর্যন্ত কোন বৈয়াকরণই বাংলায় সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

● বিভক্তি ●

শব্দ শব্দই। যখন তার সঙ্গে কোন অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা অন্য শব্দ যুক্ত হয়, তখন তা বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। এবং তখনই শব্দটি পদে রূপান্তরিত হয়। কারকের প্রদত্ত দৃষ্টান্তটি দেখ : সম্রাট হর্ষবর্ধন + ০ = সম্রাট হর্ষবর্ধন, ধনরত্ন + ০ = ধনরত্ন, স্বহস্ত + এ = স্বহস্তে, দীনদুঃখী + দের = দীনদুঃখীদের, রাজকোষ + থেকে = রাজকোষ থেকে, প্রয়াগ + এ = প্রয়াগে।

উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা অন্য শব্দ বাক্যের পদগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একদিকে যেমন বাক্যের অর্থ-শৃঙ্খলা এনেছে, অন্যদিকে তেমনি ক্রিয়াপদের সঙ্গে

বাক্যস্থিত অন্যান্য পদের সম্পর্কও জানিয়ে দিচ্ছে। এই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বা অতিরিক্ত শব্দকে বলা হয় বিভক্তি [Case-termination]।

যে সকল চিহ্নের [বর্ণ, বর্ণগুচ্ছ বা শব্দের] দ্বারা ক্রিয়ার সঙ্গে পদের কিংবা পদের সঙ্গে পদের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, তাদের বলা হয় বিভক্তি। ক্রিয়ার সঙ্গে পদের সম্বন্ধ বোঝাবার জন্যে ছ' প্রকার চিহ্ন বা বিভক্তি এবং সম্বন্ধ পদের এক প্রকার চিহ্ন বা বিভক্তি আছে। অতএব **বিভক্তি সাত প্রকার**।

বিভিন্ন কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ও তার চিহ্ন :

কারক ও সম্বন্ধ পদ	**বিভক্তি-চিহ্ন**
কর্তা	শূন্য বিভক্তি [কোন চিহ্নই থাকে না]
কর্ম	কে, রে, এরে
করণ	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, সাহায্যে
সম্প্রদান	কে, রে, এরে [দ্বিতীয়ার অনুরূপ]
অপাদান	হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা
সম্বন্ধ পদ	র, এর, দের, [বহুবচনে]
অধিকরণ	এ, তে, এতে, য়

কর্তায় কোন বিভক্তির চিহ্ন লাগে না। কর্মে কে, রে, এরে এবং সম্বন্ধ পদে র, এর, দের—এই নির্দিষ্ট বিভক্তি-চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। করণ কারকে দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, সাহায্যে ইত্যাদি এবং অপাদান কারকে হইতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা ইত্যাদি শব্দই বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রদান কারকে নির্দিষ্ট বিভক্তি-চিহ্ন [কে, রে] ছাড়াও স্থান-বিশেষে জন্য, নিমিত্ত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগিয়া, উদ্দেশে ইত্যাদি শব্দ এবং অধিকরণ কারকে নির্দিষ্ট বিভক্তির চিহ্ন [এ, তে, এতে, য়] ছাড়াও স্থান-বিশেষে কাছে, নিকটে, পাশে, পানে, উপরে, মাঝে, মধ্যে, ভিতরে, দিকে ইত্যাদি শব্দ বিভক্তি-চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্য করবার বিষয়, বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ দিয়ে গঠিত বিভক্তি-চিহ্নগুলির [কে, রে, এ, তে, এতে, য়] নিজস্ব কোন অর্থ নাই; অথচ বাক্যস্থিত শব্দগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ-শৃঙ্খলা আনে। আবার, অন্য শব্দ [হইতে, থেকে, চেয়ে, বিনা, তরে ইত্যাদি] বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হলেও তাদের নিজস্ব একটি অর্থ আছে এবং সেই অর্থের সাহায্যে ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যস্থিত অন্যান্য পদের বা পদের সঙ্গে পদের সম্বন্ধ দেখিয়ে অর্থ-শৃঙ্খলা এনে থাকে। এরাও বিভক্তি-চিহ্ন।

উপসর্গ [Preposition] যেমন ধাতুর পূর্বে বসে অর্থ-বৈচিত্র্য আনে, তেমনি কিছু সার্থক শব্দ নামপদের [অর্থাৎ, বিশেষ্য ও সর্বনামের] অন্তে বা পরে বসে বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করে। সেজন্যে তাদের **অনুসর্গ** বা **পরসর্গ** [Post-position]

বলা হয়। কাজেই, বিভক্তির চিহ্নগুলি মূলতঃ দু প্রকার : **মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন** ও **অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্ন**।

মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন : যে সব বিভক্তি-চিহ্ন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ থেকে বিযুক্ত হলে অর্থহীন হয়ে পড়ে, তাদের **মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন** বলা হয়। যেমন : কর্ম ও সম্প্রদান কারকের 'কে', 'রে' ; সম্বন্ধ পদের 'র', 'এর', 'দের' এবং অধিকরণ কারকের 'এ', 'তে', 'এতে', 'য়'।*

অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্ন : যে বিভক্তি-চিহ্ন বিশেষ্য বা সর্বনাম থেকে বিযুক্ত হলেও অর্থযুক্ত থাকে, তাদের **অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্ন** বলা হয়। যেমন : করণ কারকের—দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, করে, করিয়া, সাহায্যে, কর্তৃক ইত্যাদি শব্দ ; সম্প্রদান কারকের—জন্য, নিমিত্ত, হেতু, অর্থে, তরে, লাগিয়া, উদ্দেশে ইত্যাদি শব্দ ; অপাদান কারকের—হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, নিকট হইতে, কাছ থেকে ইত্যাদি শব্দ এবং অধিকরণ কারকের—কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাঝে, পাশে, ভিতরে, উপরে, পানে, দিকে ইত্যাদি শব্দ। এই শব্দগুলিকে বলা হয় **অনুসর্গ**, **পরসর্গ** বা **কর্মপ্রবচনীয়**।

● কর্তৃকারক ●

যে বিশেষ্য বা বিশেষ্য-স্থানীয় পদ বাক্যের ক্রিয়া-সম্পাদন করে, তাকে বলে কর্তৃকারক। বাক্যের ক্রিয়া-সম্পাদন ব্যাপারে কর্তা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। যেমন : 'বীরবর', সেই ক্রন্দন শব্দ লক্ষ্য করিয়া, এক প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল। এখানে 'বীরবর' কর্তৃকারক।

● কর্মকারক ●

কর্তা যা করে বা যা সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলা হয়। কর্মকেই অবলম্বন করে বাক্যের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যেমন : আমি প্রাণাধিক প্রিয় 'পুত্রকে' স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। এখানে 'পুত্রকে' কর্মকারক।

● করণ কারক ●

কর্তা যে পদের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে বলা হয় করণ কারক। যেমন : এক্ষণে আর কি নিমিত্তে, দাসত্ব-'শৃঙ্খলে' বদ্ধ থাকি। এখানে 'শৃঙ্খলে' করণ কারক।

● সম্প্রদান কারক ●

স্বত্ব ত্যাগ করে কাউকে কিছু দান করা বোঝালে সম্প্রদান কারক হয়। সম্প্রদান অর্থাৎ 'স্বত্ব ত্যাগ করে দান'। যাকে দান করা হয়, তাতে সম্প্রদান কারক হয়। কিন্তু যা দান করা হয়, তাতে কর্মকারক হয়। যেমন : এ মেয়ে 'আমাকে' দিলে ? এখানে 'আমাকে' সম্প্রদান কারক ; কিন্তু 'মেয়ে' কর্মকারক।

---

* **তির্যক্ বিভক্তি :** 'এ' বিভক্তি বিশেষভাবে অধিকরণ কারকের চিহ্ন হলেও অন্য সব কারকের কাজ চালিয়ে নিতে পারে। এই বিভক্তি যে কোন পদকে যেন বক্রভাবে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত করে। সেইজন্যে একে তির্যক্ বিভক্তি বলা হয়।

স্মরণীয় : দান ফেরত নেওয়া বোঝালে কিংবা বেতন বা পারিশ্রমিক দেওয়া বোঝালে সম্প্রদান কারক না হয়ে হবে কর্মকারক। যেমন : তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে 'বীরবরকে' সহস্র স্বর্ণ দিবে। এখানে বীরবরকে সহস্র স্বর্ণ দান করা হয়নি, ওটা বেতন দান। কাজেই, 'বীরবরকে' কর্মকারক।

● অপাদান কারক ●

যা থেকে কোন কিছু উৎপন্ন, নির্গত, পতিত বা বিশ্লিষ্ট হয়, তাই অপাদান কারক। অপাদান কারকে কোন কিছু থেকে গতি বা বিচ্ছেদ বোঝায়। সেই গতির উৎস বা বিচ্ছেদের সীমা [limit of separation]-ই অপাদান কারক। যেমন : কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দ্বারের 'অন্তরাল হইতে' জবাব আসিল। এখানে 'অন্তরাল হইতে' অপাদান কারক।

● অধিকরণ কারক ●

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলা হয়। যেমন : 'গ্রামের মধ্যে' জীর্ণ শীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল। এখানে 'গ্রামের মধ্যে' অধিকরণ কারক।

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবার জন্যে স্থান, কাল এবং বিষয়ের প্রয়োজন। তার সঙ্গে সংগতি রেখে অধিকরণও তিন রকমের : স্থানাধিকরণ, কালাধিকরণ ও বিষয়াধিকরণ। স্থানাধিকরণ : ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর 'সদরে' আসিয়া উপস্থিত হইল। কালাধিকরণ : 'সন্ধ্যার পূর্বে' আর গাড়ি নাই। বিষয়াধিকরণ : গিরিবালার রোগের সময় 'চিকিৎসাশাস্ত্রে' সে ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিল।

● কারক-নির্ধারণের সহজতম সূত্র ●

নিম্ন-প্রদত্ত ছকটির অনুশীলনের ফলে কারক-নির্ধারণ অত্যন্ত সহজ হবে :

বিদ্যাসাগর মহাশয় কার্মাটাডে স্বহস্তে বাক্স থেকে সাঁওতালদের টাকাকড়ি দিতেন।

কারকের নাম	ক্রিয়াকে প্রশ্ন করো	উত্তর পাবে কোন্ কারক হয়েছে
কর্তা	কে বা কি	বিদ্যাসাগর মহাশয়=কর্তৃকারক
কর্ম	কাকে বা কি	টাকাকড়ি=কর্মকারক
করণ	কিসে	স্বহস্তে=করণ কারক
সম্প্রদান	কাকে	সাঁওতালদের=সম্প্রদান কারক
অপাদান	কোথা থেকে	বাক্স থেকে=অপাদান কারক
অধিকরণ	কোথায়, কখন বা কি বিষয়ে	কার্মাটাডে=অধিকরণ কারক

● 'এ' বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ: 'গ্রামে লোকে একমনে পূজয়ে দেবতাগণে খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।' লোকে=কর্তা, ছাগে=কর্ম, খড়্গে=করণ, দেবতাগণে, লোকহিতে=সম্প্রদান, গ্রামে=অধিকরণ।

● 'কে' বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগ: 'ঈশ্বরকে' ডাকো। [কর্ম]। 'দরিদ্রকে' ধন দাও। [সম্প্রদান]। 'জলকে' চল। [অধিকরণ]। 'আজকে' নগদ 'কালকে' ধার। [অধিকরণ]।

॥ অনুসরণী ॥

১. কারক কাহাকে বলে? বাংলায় কারক কয় প্রকার ও কি কি? দৃষ্টান্ত দাও।

২. বিভক্তি কাহাকে বলে? বিভিন্ন কারকের বিভক্তি-চিহ্নগুলির দৃষ্টান্ত দাও। মা. '৬৬

৩. মৌলিক বিভক্তি-চিহ্ন ও অনুসর্গ বিভক্তি-চিহ্ন কাহাকে বলে? দৃষ্টান্ত দাও।

৪. অনুসর্গ কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ কারকে অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়? উদাহরণ-যোগে বুঝাইয়া দাও।

৫. এমন একটি বাক্য রচনা কর, যাহাতে সমস্ত কারক প্রয়োগ করা হইয়াছে। রচিত বাক্যে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হইয়াছে, দেখাইয়া দাও। উ. মা. '৬২

৬. অধিকরণ কারক কাহাকে বলে? অধিকরণ কারকের মধ্যে প্রধান তিন প্রকারের উদাহরণ দাও। মা. '৬১, '৬৩

৭. বাংলায় কোন্ কোন্ কারকে 'এ' বিভক্তি হয় লিখ এবং একটি করিয়া উদাহরণ দাও। মা. '৬৩

৮. করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারক কাহাকে বলে? উদাহরণ সহকারে বুঝাইয়া দাও। কর্তৃকারক ও কর্মকারকে বাংলায় অনেক সময়ে বিভক্তির একরূপ দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দাও। কে-বিভক্তি যোগে বাংলায় কোন্ কোন্ কারক নিষ্পন্ন হয়। উ. মা. '৬৩

৯. 'গ্রামে লোকে একমনে পূজয়ে দেবতাগণে খড়্গে ছাগে কাটে লোকহিতে।'—'এ' বিভক্তির ব্যাপক প্রয়োগে গঠিত পদসমূহের পরিচয় দাও। অপাদান কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া একটি বাক্য রচনা কর। [এ 'মেঘে' বৃষ্টি হবে না]

১০. একটি করিয়া বাক্য রচনা করিয়া নিম্নলিখিত কারকসমূহে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার দেখাইয়া দাও: কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক। উ. মা. '৬০

১১. সংজ্ঞা লিখ ও উদাহরণ দাও: অপাদান কারক, মা. '৬১; অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়, মা. '৬২, '৬৪; উ. মা. '৬০, '৬১, '৬৯ [কম্পার্ট,]; বিভক্তিশূন্য অধিকরণে কারকের পদ, উ. মা. '৬২; ক. প্রা. '৬২, '৬৩ [সে আজ 'বাড়ি' নেই]; অধিকরণ কারক, ব. প্র. '৬১; বিষয়াধিকরণ, ক. প্রা. '৬২

১২. চিহ্নিত পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর: [পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক]

'এক্ষণে' আর কি নিমিত্তে দাসত্ব-'শৃঙ্খলে' বদ্ধ থাকি। 'ঘড়ি' খুলিয়া দেখিলাম, একটা বাজিয়া গিয়াছে। "'উভয়ে' ধূমপান করিতে করিতে কথাবার্তা আরম্ভ হইতে লাগিল। তাহা 'ঔষধে' সিক্ত করিয়া গিরির দেহের স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিল। সেকালে ও একালে 'অনেকে' ভূত দেখিয়াছেন। 'সকলেই' বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল। আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের 'চোখে' দেখে নিই। দিদি, টাকাটা তবে 'সিন্দুক থেকে' বার করে আনো। পাশ্চাত্য জগৎ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় 'খোলস' ছুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে। বৈরাগ্য 'সাধনে' মুক্তি সে আমার নয়। কোনটি 'পোকায়' খায় কোনটিকে 'পাখীতে' ঠোক্রায়। আপনার বাবু রোজ রোজ ঘোড়ার 'দানাতে' টিফিন করেন। 'লোকে' বলিত, মই আসছে—মই আসছে। মিষ্টিগুলো 'কিসে' খেয়ে দিয়েছে। 'তোহে' বিসরি মন 'তাহে' সমর্পিলু। 'প্রাণে' আর নাহি সয় ননদের জ্বালা। ভুলিয়াছে 'সবে' দাসত্ব-শৃঙ্খল। 'পুচ্ছটি' তোর উচ্চে তুলে নাচা। সবুজ 'নেশায়' ভোর করছিস ধরা। ভরিয়া 'সানুদেশ' স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান। আনন্দে 'লোচনে' বহে জল। 'চণ্ডালে' বসাও আনি রাজার আলয়ে।

পরস্পর-অর্থ-সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভের নাম **সমাস**। যেমন: বীণা পাণিতে যার=বীণাপাণি, চরণ পদ্মের মতো=চরণপদ্ম, গাছে পাকা=গাছ-পাকা। প্রথম দৃষ্টান্তে 'বীণা' ও 'পাণি'র মধ্যে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'চরণ' ও 'পদ্মে'র মধ্যে এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'গাছ' ও 'পাকা'র মধ্যে একটি করে অর্থ-সম্বন্ধ আছে। প্রথম দৃষ্টান্তে 'বীণাপাণি' অর্থাৎ সরস্বতী, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'পদ্মের মতো সুন্দর পা' এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'গাছে পাকা' [ফল] বোঝাচ্ছে। কাজেই, দৃষ্টান্তগুলিতে সমাস সম্ভব হয়েছে।

যে সব পদ মিলিত হয়ে সমাস হয়, তাদের বলা হয় **সমস্যমান পদ**। 'বীণা-পাণি' পদে 'বীণা' ও 'পাণি' পদগুলি এবং 'চরণপদ্ম' পদে 'চরণ' ও 'পদ্ম' পদগুলি কিংবা 'গাছ-পাকা' পদে 'গাছ' ও 'পাকা' পদগুলি সমস্যমান পদ।

সমস্যমান পদগুলি মিলিত হয়ে যে একপদে সংহতি লাভ করে, তাকে বলা হয় **সমস্ত পদ** বা **সমাসবদ্ধ পদ**। 'বীণাপাণি' ও 'চরণপদ্ম'—সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষ করবার জন্যে যে বাক্যের প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় **সমাস-বাক্য** বা **ব্যাস-বাক্য** বা **বিগ্রহ-বাক্য**। 'বীণা পাণিতে যার' কিংবা 'চরণ পদ্মের মতো'—এই বাক্যগুলি সমাস-বাক্য বা ব্যাস-বাক্য বা বিগ্রহ-বাক্য।

সমস্যমান পদগুলির প্রথম পদটিকে **'পূর্বপদ'** এবং পরবর্তী পদটিকে [বা পদগুলিকে] **উত্তরপদ** বা **পরপদ** বলা হয়। সমস্ত পদে কখনও পূর্বপদের প্রাধান্য বুঝায়, কখনও পরপদের প্রাধান্য বুঝায়, আবার কখনও বা পূর্বপদ ও পরপদের কোনটিকে না বুঝিয়ে তৃতীয় পদের প্রাধান্য বোঝায়। যেমন: উড়ো যে জাহাজ=উড়োজাহাজ; সমস্ত পদটিতে 'জাহাজ'—এই পরপদেরই প্রাধান্য। 'চরণ-কমল'—সমস্ত পদটিতে 'চরণ' —এই পূর্বপদটিরই প্রাধান্য। 'হরগৌরী' পদটিতে 'হর' এবং 'গৌরী'—এই পূর্বপদ ও পরপদ—উভয় পদেরই প্রাধান্য। আবার, 'বীণাপাণি' পদটিতে 'বীণা' বা 'পাণি' [হাত]—কোনটিকে না বুঝিয়ে 'সরস্বতী'—তৃতীয় পদেরই প্রাধান্য।

● সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য:

পরস্পর-সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে **সন্ধি** বলা হয়। কিন্তু পরস্পর-অর্থ-সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদের একপদে সংহতি লাভ করার নাম **সমাস**। যেমন: প্রতি+এক=প্রত্যেক [সন্ধি]; শূল পাণিতে যার=শূলপাণি [সমাস]।

১. সন্ধিতে দুটি পরস্পর-সন্নিহিত বর্ণ মিলিত হয়ে একবর্ণে পরিণত হয়। সমাসে একাধিক পদ একপদে পরিণত হয়।

২. সন্ধিতে দুটি বর্ণের মিলনের ফলে দুটি পদের মিলন হয়। পদের মিলন সন্ধির লক্ষ্য নয়। তা সমাসের কাজ। সন্ধির কাজ হল দুটি সন্নিহিত বর্ণের মিলন এবং বর্ণের এই মিলনের ভিত্তি হল **উচ্চারণ**। সমাসে দুটি বা তার বেশী পদের মিলন হয়ে থাকে এবং পদের এই মিলনের ভিত্তি হল **অর্থ**।

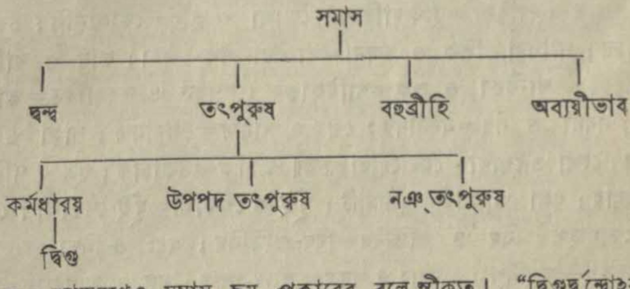
৩. সন্ধিতে বিভক্তির লোপ হয় না। সমাসে অলুক্ সমাস ছাড়া প্রতিটি পদের বিভক্তির লোপ হয়।

৪. সন্ধিতে শব্দের বাহ্যরূপ বদ্লায়, কিন্তু অর্থের পরিবর্তন হয় না। আর, সমাসে অর্থের পরিবর্তন হয়ে একার্থবোধক পদের উৎপত্তি হয়।

● সমাসের প্রকার-ভেদ ঃ

সমাস প্রধানতঃ **ছয় প্রকার ঃ দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, বহুব্রীহি** এবং **অব্যয়ীভাব**। তাছাড়া, আরো দু' প্রকার সমাস আছে—**সুপ্‌সুপা** ও **নিত্যসমাস**।

অবশ্য পাণিনির মতে, সমাস প্রধানতঃ চার প্রকার :—**দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি** ও **অব্যয়ীভাব**। কর্মধারয় সমাস তৎপুরুষ সমাসের এবং দ্বিগু সমাস কর্মধারয় সমাসেরই প্রকার-ভেদ মাত্র।



সংস্কৃত ব্যাকরণেও সমাস ছয় প্রকারের বলে স্বীকৃত। "দ্বিগুর্দ্বন্দ্বোঽব্যয়ীভাবঃ কর্মধারয় এব চ। পঞ্চমস্তু বহুব্রীহিঃ ষষ্ঠস্তৎপুরুষঃ স্মৃতঃ॥"

১. দ্বন্দ্ব সমাস

'দ্বন্দ্ব' কথাটির দুটি অর্থ ঃ সংঘাত ও মিলন। দ্বন্দ্ব সমাস কথাটিতে দ্বিতীয় অর্থ ['মিলন']-টিই গৃহীত হয়। দ্বন্দ্ব সমাস অর্থাৎ মিলনের সমাস।

যে সমাসে দুই বা তার অধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলা হয়। সমস্যমান পদগুলিকে সংযোজক অব্যয় যুক্ত করে। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পর-পদ—উভয় পদেরই প্রাধান্য। যেমন ঃ

সুখ ও সম্ভোগ=সুখ-সম্ভোগ ; কথা ও বার্তা=কথাবার্তা ; ঔষধ ও পথ্য =ঔষধপথ্য ; হাত ও পা=হাত-পা ; আচার ও ব্যবহার=আচার-ব্যবহার ; শীত ও উষ্ণ=শীতোষ্ণ ; প্রসার ও প্রতিপত্তি=প্রসার-প্রতিপত্তি ; সভা ও সমিতি=সভা-সমিতি ; ছেলে ও বুড়ো=ছেলে-বুড়ো ; মতি ও গতি=মতিগতি ; দল ও বল =দলবল ; বিদ্যা ও সুন্দর=বিদ্যাসুন্দর ; ইতর ও ভদ্র=ইতর-ভদ্র ; দেব ও দ্বিজ =দেব-দ্বিজ ; ভক্তি ও শ্রদ্ধা=ভক্তি-শ্রদ্ধা ; রস ও কষ=রসকষ ; ঘষা ও মাজা= ঘষামাজা ; মা ও বাপ=মা-বাপ ; আদর ও যত্ন=আদর-যত্ন ; খাতা ও পত্তর=খাতা-পত্তর ; বাদ ও প্রতিবাদ=বাদ-প্রতিবাদ ; বিধি ও বিধান=বিধিবিধান ; রূপ ও গুণ =রূপগুণ ; জোয়ার ও ভাটা=জোয়ার-ভাটা ; আসা ও যাওয়া=আসা-যাওয়া ; ডাল ও পালা=ডালপালা ; কড়ি, বরগা ও দেয়াল=কড়ি-বরগা-দেয়াল ; লতা ও পাতা=লতাপাতা ; পোশাক ও পরিচ্ছদ=পোশাক-পরিচ্ছদ ; রঙ ও তুলি =রঙতুলি ; কল ও কারখানা=কলকারখানা ; দোয়াত ও কলম=দোয়াত-কলম ; বাজনা ও বাদ্যি=বাজনাবাদ্যি ; দানা ও পানি=দানাপানি ; পেষণ ও পীড়ন= পেষণ-পীড়ন ; পাওয়া ও না-পাওয়া=পাওয়া-না-পাওয়া ; শুক ও সারী=শুক-সারী ; যুগ ও যুগান্তর=যুগ-যুগান্তর ; শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন=শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ; অহঃ ও অহঃ =অহরহ ; স্বামী ও পুত্ত র=স্বামী-পুত্তুর ; বিলি ও বন্দোবস্ত=বিলি-বন্দোবস্ত ; সুত, মিত ও রমণী=সুত-মিত-রমণী ; আদি ও অনাদি=আদি-অনাদি ; গাল ও গল্প =গালগল্প ; দুঃখ ও দারিদ্র্য=দুঃখ-দারিদ্র্য ; ঝোলা ও ঝুলি=ঝোলাঝুলি ; চর ও অচর=চরাচর ; পাপিয়া, পিক ও চন্দনা=পাপিয়া-পিক-চন্দনা ; শ্যাম ও রাধিকা =শ্যাম-রাধিকা ; শারিকা ও শুক=শারিকাশুক ; আয়ত ও তরলায়িত=আয়ত-তরলায়িত ; নবনী ও সর=নবনীসর ; প্রেম ও আনন্দ=প্রেমানন্দ ; সাড়া ও শব্দ =সাড়াশব্দ ; হেথা ও হোথা=হেথাহোথা ; চকা ও চকি=চকাচকি ; পুত্র ও পরিবার =পুত্র-পরিবার ; ধুলা ও মাটি=ধুলামাটি ; যুঁই ও শেফালী=যুঁই-শেফালী ; ভোগ ও সুখ=ভোগসুখ ; বিম্ব ও প্রতিবিম্ব=বিম্ব-প্রতিবিম্ব ; অহঃ ও নিশা=অহর্নিশি [অশুদ্ধ, শুদ্ধরূপ—অহর্নিশ] ; কলুষ ও পরুষ=কলুষ-পরুষ ; বস্ত্র ও অলংকার=বস্ত্র-অলংকার।

● **দ্বন্দ্ব সমাসের কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যবহার :**

ক. দ্বন্দ্ব সমাসের পরপদে রাত্রি ও নিশা শব্দের অন্ত্য স্বর লুপ্ত হয়। যেমন : অহঃ ও রাত্রি=**অহোরাত্র**, দিবা ও রাত্রি=**দিবারাত্র**, অহঃ ও নিশা=**অহর্নিশ**। কিন্তু, দিবা ও নিশি=**দিবানিশি**। এবং বাংলায়—দিন ও রাত=দিনরাত, নিশি ও দিন=নিশিদিন, রাত ও দিন=রাতদিন [রাদ্দিন]।

খ. গোত্র-সম্বন্ধ ও বিদ্যা-সম্বন্ধ হলে এবং ঋ-কারান্ত শব্দ পরে থাকলে পূর্ববর্তী ঋ-কারান্ত শব্দ অ-কারান্ত হয়। যেমন : মাতৃ ও পিতৃ=মাতাপিতা। সংস্কৃতে **মাতৃপিতৃহীন**=যার মাতার পিতা অর্থাৎ মাতামহ নেই। **পিতৃমাতৃহীন**=যার

পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী নেই। **মাতাপিতৃহীন**=যার মাতা ও পিতা নাই। সংস্কৃতে পিতামাতা অশুদ্ধ। বাংলায় পিতামাতা, মাতাপিতা—দুইই প্রচলিত।

গ. সংস্কৃতে জায়া ও পতি=দম্পতি, জম্পতী, জায়াপতি। কিন্তু বাংলায় হয় শুধু দম্পতী বা দম্পতি।

ঘ. কুশ ও লব সংস্কৃতে কুশীলব। বাংলায়ও কুশীলব [নট] প্রচলিত।

ঙ. অলুক্ দ্বন্দ্ব: অ [অর্থাৎ না] লুক্ [অর্থাৎ লোপ]—কথাটির অর্থ 'যাতে বিভক্তির লোপ হয় না'।

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে **অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস** বলে। যেমন:

কোলে ও পিঠে=কোলেপিঠে; ধীরে ও সুস্থে=ধীরেসুস্থে; দিনে ও রাতে =দিনেরাতে; ঘরে ও বাইরে=ঘরে-বাইরে; বনে ও জঙ্গলে=বনেজঙ্গলে। তেমনি বুকেপিঠে, বনেবাদাড়ে, হাটেবাজারে, দুধে-ভাতে, জপেতপে, দুঃখেসুখে, উত্থানে-পতনে, হাতে-পায়ে, তেলে-বেগুনে, দেশে-বিদেশে, বনে-উপবনে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে।

২. তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের **কারক-বোধক** বা **সম্বন্ধ-বোধক** বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলা হয়। তৎপুরুষ সমাসে পরপদেরই প্রাধান্য। যেমন: প্রভুকে ভক্তি=প্রভুভক্তি; করের দ্বারা আঘাত=করাঘাত। 'প্রভুকে' এবং 'করের দ্বারা'—এরা পূর্বপদ এবং কারকবোধক বিভক্তিযুক্ত। প্রথমটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে তৃতীয়া বিভক্তি; কিন্তু 'প্রভুভক্তি' ও 'করাঘাত'—দুটি সমস্তপদেই বিভক্তি লুপ্ত হয়েছে এবং 'ভক্তি' ও 'আঘাত'—এই পরপদ দুটির অর্থের প্রাধান্য প্রতীয়মান। তৎপুরুষ সমাসে প্রথমা বিভক্তি ছাড়া সব বিভক্তিই লোপ পায়। বিভক্তি-অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ হয়।

তৎপুরুষ সমাসের বিবিধ রূপ:

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে।

১. গত, প্রাপ্ত, আপন্ন, আশ্রিত, আরূঢ়, অতীত, সংক্রান্ত প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হয়। যেমন: কর্মকে প্রাপ্তি=কর্মপ্রাপ্তি; বলিকে দান=বলিদান; দেবকে সেবা=দেবসেবা; প্রাণকে ত্যাগ=প্রাণত্যাগ; বিস্ময়কে আপন্ন=বিস্ময়াপন্ন। তেমনি: কালহরণ, পুত্রহত্যা, আত্মহত্যা, হস্তধারণ, ভাবাপন্ন, আরোগ্যলাভ, আত্মসম্বরণ, সমুদ্রলঙ্ঘন, দেহরক্ষা, ধূমপান, জলগ্রহণ, বিষপান, জন্মলাভ, শিল্পলাভ, মাকুঠেলা, কণ্ঠরুদ্ধ, প্রীতিদান, প্রীতিভিক্ষা, ধর্মরক্ষা, নিদ্রাগত, আত্মসমর্পণ।

২. ব্যাপ্তি বোঝালে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সঙ্গে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস

হয়। যেমন : দীর্ঘ ব্যাপ্ত করে কাল=দীর্ঘকাল ; চির ব্যাপ্ত করে রুগ্ণ=চিররুগ্ণ ; চির ব্যাপ্ত করে কাল=চিরকাল। তেমনি : চিরজীবী, চিরযুবা, চিরদুঃখ, চিরবিন্ন, নিত্যগুণগান, চিরনির্বাসিত, চিরদিন, যুগান্তসঞ্চিত।

৩. পূর্বপদটি বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ হলে পরবর্তী কৃদন্ত পদের সঙ্গে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : অর্ধভাবে সমাপ্ত=অর্ধসমাপ্ত ; অর্ধরূপে সিদ্ধ =অর্ধসিদ্ধ ; আধ ভাবে মরা=আধমরা। তেমনি : অর্ধস্ফুট, আধফোটা।

তৃতীয়া তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : যুক্তির দ্বারা সঙ্গত=যুক্তিসঙ্গত ; নৃপের দ্বারা নির্দিষ্ট=নৃপনির্দিষ্ট ; সর্বালঙ্কারের দ্বারা ভূষিতা=সর্বালঙ্কারভূষিতা ; উচ্চৈঃ [তৃতীয়া] স্বর=উচ্চৈঃস্বর ; কৌতুকের দ্বারা আবিষ্ট =কৌতুকাবিষ্ট। তেমনি : অশ্রুপূর্ণ, শাস্ত্রবিহিত, বজ্রাঘাত, রোষকষায়িত, আনন্দপূর্ণ, ব্যাধিগ্রস্ত, জমিদারীভুক্ত, বিস্ময়-বিস্ফারিত, বার্ধক্যরেখাঙ্কিত, অজ্ঞানকৃত, স্পন্দহীন, বায়ুপূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত, সর্ববাদিসম্মত, বিস্ময়বিমুগ্ধ, নবপ্রত্যয়সমৃদ্ধ, অর্থপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ, কন্যাভারগ্রস্ত, লক্ষণশূন্যা, শিক্ষাশূন্য, বিস্ময়াবিষ্ট, ব্যাকরণহীন, রচনাহীন, শ্রেণীবদ্ধ, শেওড়া-বেড়া, আড়ম্বরশূন্যতা, তাঁতবোনা, নিয়তিকৃত, নিয়মরহিতা, রেখায়-বাঁধা, রঙে-বাঁধা, ছন্দে-বাঁধা, সুরে-বাঁধা, সন্তানহীন, মায়াহীন, রসহীন, রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্টা, পুত্রশোকাতুরা, মেঘাচ্ছন্ন, নিদ্রাকাতর, বস্ত্রাবৃত, রোগগ্রস্ত, জ্বরকাতর, বিষমাখা, নিরাশামলিন, স্নেহার্দ্র, বেদনাভারাতুর, ক্লান্তিহীন, ঋণজর্জর, অন্নহীন, পাপপূর্ণ, গুণহীন, খড়্গাঘাত, শোণিতার্দ্র, অস্ত্রাঘাত, জলভরা, তোড়া-বাঁধা, কোমল-মলয়-সমীর-সেবিত, অন্তহীন, নিদাঘ-দগ্ধ, অগ্নিদাহ, রক্তাক্ত, পদাঘাত, ধর্মহীন, কর্মহীন, শঙ্কাকুল, জয়দৃপ্ত, পাণ্ডুচন্দ্রলেখা, কণ্টকপূর্ণ, ভারাক্রান্ত, শোকাতুর, ভাগ্যহীন, স্নেহবিগলিত, দ্যূতবদ্ধ, ছললব্ধ, পাপস্ফীত, পদাহত, বহ্নিশিখাদগ্ধ, রাহুগ্রস্ত।

চতুর্থী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের চতুর্থী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে। উদ্দেশ্য বোঝাতে বা নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং সেরূপ ক্ষেত্রেও চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : বাসের নিমিত্ত স্থান=বাসস্থান ; সভার নিমিত্ত ভবন=সভাভবন ; রোগের নিমিত্ত শয্যা=রোগশয্যা ; কার্যের নিমিত্ত আলয়=কার্যালয় ; দেবকে দত্ত =দেবদত্ত। তেমনি : বিদ্যালয়, আপিসঘর, পাকশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, পাঠশালা, বাণিজ্যাগার, গ্রাসপিণ্ড, ক্লাসরুম, রসভাণ্ডার, ফুটপাত [ফুটের (পায়ের) নিমিত্ত পাত (পথ)], চিত্রশালা, পুত্রেষ্টি, হিতাকাঙ্ক্ষা, সূতিকা-গৃহ, রান্নাবাড়ি, রান্নাশাল, মৃত্যু-প্রতীক্ষা, পুত্রশোক, দানসামগ্রী, গোশালা, পিণ্ডপাত্র, রঙ্গভূমি, বাদ্যযন্ত্র, চিত্রপট, খেয়াঘাট, বন্দিশাল, উপহার-পাত্র, যজ্ঞাগার, অস্তাচল, দরবারকক্ষ, সমর-ক্ষেত্র, পথশ্রান্ত, উন্মাদাগার, রঙ্গমঞ্চ, তপোবন, উদয়-শিখর, দেব-উপাসনা, ভৈরব-মন্দির, অগ্নি-গৃহ।

পঞ্চমী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন :

প্রাণের চেয়ে অধিক=প্রাণাধিক ; জীবিতের চেয়ে অধিক=জীবিতাধিক ; প্রার্থনার চেয়ে অধিক=প্রার্থনাধিক। তেমনি : প্রাণাধিকা, রোগমুক্ত, তদুৎপন্ন, কলিকাতা-প্রত্যাগত, আগাগোড়া, ইহবিমুখ, ক্রমাগত, শমন-ভয়, বামেতর [বাম থেকে ইতর], ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত, লোকলজ্জাভয়, পুণ্যভীত, পুত্রাধিক।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : শাপমুক্ত, আদ্যন্ত, জন্মান্ধ, কারামুক্ত, বন্ধনমুক্তি, সমাজচ্যুত আকাশ-বাণী, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ঋণমুক্তি, দেবোত্তর, অষ্টোত্তর, যুদ্ধোত্তর, পাঠশালা-পলায়ন, তদ্ভিন্ন, তদ্ভব, কর্মবিরতি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : রাজার পুত=রাজপুত ; রাজার দ্বার=রাজদ্বার ; রাজার সমীপ=রাজসমীপ ; দ্বারের দেশ=দ্বারদেশ ; বীরদের বর [শ্রেষ্ঠ]=বীরবর ; নরদের পতি=নরপতি ; স্ব-র ছন্দ =স্বচ্ছন্দ। তেমনি : দিনপাত, অর্থব্যয়, কোষাধ্যক্ষ, তথ্যানুসন্ধান, রাজলক্ষ্মী, প্রাণাত্যয়, প্রাণান্ত, অর্ধযোজনান্ত, ভবনাভিমুখ, নিদ্রাভঙ্গ, স্বামিকার্য, রাজকার্য, স্বামী-বাক্য, শ্রবণগোচর, কার্যহানি, প্রাণবিনাশ, চিত্তসন্তোষ, আত্মশিরশ্ছেদন, গাত্রোত্থান, ভক্তিযোগ, রাত্রিবৃত্তান্তকীর্তন, অর্ধরাজ্যেশ্বর, আত্মধর্ম-প্রতিপালন, রাজ্যাধিকার, বৃক্ষতল, অন্নদায়, চিকিৎসাকার্য, স্বেচ্ছা, জনসমাজস্বরূপ, প্রাণদণ্ড, বাঙালী-পরিচ্ছদ, পরোপকার, স্বদেশ, ভ্রাতুষ্পুত্র, মর্মানুবাদ, স্বাক্ষর, অপরাহ্ণ, দিবালোক, পরদুঃখ, দীপশিখা, রাজপথ, জীবধাত্রী, দয়াবশ, ভূগর্ভমধ্য, যুগান্ত, কম্পনতরঙ্গ, হিমালয়, গৃহদ্বার, গতিবিধি, গড়-বেগ, মানসপুত্র, মর্মোদ্ভেদ, দেশোদ্ধার, অশ্রুপাত, লক্ষ্মীশ্রী, পদস্খলন, কলঙ্ককাহিনী, পিতৃ-বিয়োগ, কাব্যকলা, দূরান্ত, জীবনাদর্শ, রাজরোষ, স্বাধীনতা, জগন্নাথ, নামাবলী, কালিদাস, বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, মেষ-শাবক [মেষীর শাবক]।

অতিরিক্ত বাংলা দৃষ্টান্ত : কতকগুলি ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পূর্বপদ হলে সমস্তপদে ঈ-কার ই-কার হয়। যেমন : কালীর দাস=কালিদাস, দেবীর দাস=দেবিদাস, ষষ্ঠীর দাস=ষষ্ঠিদাস ইত্যাদি। কিন্তু চণ্ডীর দাস=চণ্ডিদাস ও চণ্ডীদাস দুইই হয়।

স্মরণীয় : রাজপথ, রাজহংস, রাজমিস্ত্রী, রাজরোগ—সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদগুলির **পরনিপাত** হয়। যেমন : মিস্ত্রীদের রাজা=রাজমিস্ত্রী।

সপ্তমী তৎপুরুষ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের সপ্তমী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : কার্যে দক্ষ=কার্যদক্ষ ; সর্বাঙ্গে সুন্দরী=সর্বাঙ্গসুন্দরী ; পূর্বে কৃত=পূর্বকৃত, জগতে বিখ্যাত=জগদ্বিখ্যাত ; গঙ্গায় স্নান=গঙ্গাস্নান। তেমনি : তীর্থযাত্রা, পরলোকগত, অনন্যপর [অনন্যে পর (নিষ্ঠ)], অন্তর্নিহিত, হ্লাদৈকময়ী [হ্লাদে একময়ী], নবরসরুচিরা, রাত্রিজাগরণ, অকালমৃত্যু, আহার-লোলুপ, মহিষারূঢ়, সিংহাসনারূঢ়, ভূলুণ্ঠিতা।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : ভূতপূর্ব, জলমগ্ন, শিল্পপটু, বিশ্ববিখ্যাত, সংখ্যাগরিষ্ঠ, গৃহাগত, অকালবোধন, গাছপাকা, বস্তাপচা, তালকানা, অকালবার্ধক্য, কর্মকুশল, অধ্যয়নরত, সত্যাগ্রহ, তালিকাভুক্ত, অদৃষ্টপূর্ব।

স্মরণীয় : পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব ; পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব ; পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্ব ; পূর্বে আস্বাদিত = আস্বাদিতপূর্ব—সমস্ত পদগুলিতে পূর্বপদগুলির **পরনিপাত** হয়।

তৎপুরুষ সমাসের অতিরিক্ত প্রকার-ভেদ : তৎপুরুষ সমাস আরও কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন—**উপপদ তৎপুরুষ, অলুক্ তৎপুরুষ, নঞ্ তৎপুরুষ** ইত্যাদি।

●**উপপদ তৎপুরুষ :** সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদকে উপপদ বলা হয়। অর্থাৎ, যে সব পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎপ্রত্যয় হয়, তাদের উপপদ বলা হয়। যেমন : গৃহস্থ, জলচর, খেচর, উদ্ভিদ্, জলজ—এই সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদগুলির পূর্বপদ—যথাক্রমে—গৃহ, জল, খ, উৎ, জল—এগুলি উপপদ।

উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় **উপপদ তৎপুরুষ সমাস**। যেমন : গুণ গ্রহণ করেন যিনি = গুণগ্রাহী ; দক্ষিণ দেশে নিবাস করেন যিনি = দক্ষিণ-দেশনিবাসী ; অস্ত্র ধারণ করেন যিনি = অস্ত্রধারী ; নৃদের পালন করেন যিনি = নৃপ ; শ্মশানে বাস করেন যিনি [স্ত্রী] = শ্মশানবাসিনী। তেমনি : হৃদয়বিদারণ, কূপজ [কূপে জন্মে যে], অনুগামিনী [অনুতে গমন করে যে (স্ত্রী)], আত্মঘাতী, প্রাণ-কাড়িয়া-নেওয়া, হত্যাকারী, পদস্থ, প্রাণদাতা, পারদর্শী [পার দেখেছেন যিনি], নিম্নস্থ, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, গৃহস্থ, কার্যকরী, অবশ্যম্ভাবী, অপরিণামদর্শী, বংশধর, হাস্যকর, দ্রুতগামী, মন্দগামী, হিন্দুধর্মপ্রচারিণী, ধূমপাননিবারণী, দুর্নীতিদলনী, হাত-ছাড়া, মণ্ডপ, কণ্ঠভরা, মা-বাপমরা, কুশীদজীবী, শশধর, বহুকাল-ধরে-চলে-আসা, সুদূরপ্রসারী, বুদ্ধিজীবী, দীর্ঘকালব্যাপী, দিশাহারা, ভুবনমোহিনী, ধর্মপ্রচারক, কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, অধীনস্থ [অশুদ্ধ], বসুজ, হিতৈষী [হিত ইচ্ছা করেন যিনি], ঘোমটাপরা, ছায়াকরা, মনোহর, পাল-তোলা, হাঁ-করা, চিত্রকর, বিশ্বজোড়া, জগৎজোড়া, ছাঁদাবাঁধা, আকাশজোড়া, পতঙ্গ [পতম্ (লাফিয়ে লাফিয়ে) গমন করে যে], জগতারণ, বিষধর, পুঁথি-পোড়ো, গোপ, ছন্নছাড়া [ছন্দ ছেড়েছে যে], অনুজ, অরিন্দম, বনবাসী, আত্মজ, বসুধা, দণ্ডধর, দৈত্যকুলদল, পঙ্কজ, অসূর্যম্পশ্যা, পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী, অগ্নিঢালা, অন্তর্যামী, অগ্নিহোত্র।

●**অলুক্ তৎপুরুষ :** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে **অলুক্ সমাস** বলে। যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে **অলুক্ তৎপুরুষ সমাস** বলা হয়। সব তৎপুরুষ সমাসেই অলুক্ তৎপুরুষ হয়ে থাকে। যেমন : রেখার দ্বারা বাঁধা = রেখায়-বাঁধা ; রঙের দ্বারা বাঁধা = রঙে-বাঁধা ; ভ্রাতুঃ [ভ্রাতার] পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র ; যুধি [যুদ্ধে] স্থির = যুধিষ্ঠির। তেমনি : ছন্দে-বাঁধা, সুরে-বাঁধা, উচ্চৈঃস্বর, পরিতাপদহনে-জর্জর।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : হাতে-কাটা, হাতে-তৈরী, তেলেভাজা, পরস্মৈপদ, খেলার মাঠ, পড়ার ঘর, সারাৎসার, পরাৎপর, বাচস্পতি, অনুরোধের আসর, সরসিজ, মনসিজ, খেচর, ঘরেপাতা, অন্তেবাসী, দিনেডাকাতি, সবার-পরশে-পবিত্র-করা।

●**নঞ্ তৎপুরুষ :** যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক

অব্যয়, তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। সংস্কৃত 'নঞ্' অব্যয়ের বাংলা রূপ —অ, অন্, অনা, আ, গর্, ন, না, নি, বি ও বে। নয় ন্যায়=অন্যায়; নয় গণ্য =অগণ্য; ন কাতর=অকাতর; নয় প্রসন্ন=অপ্রসন্ন; নয় বশ=অবশ, নয় জ্ঞান =অজ্ঞান। তেমনি: অসাধ্য, নাতিশীতোষ্ণ, অসম্ভব, অপরিজ্ঞাত, অনতিকাল, অদৃষ্ট, অভাবনীয়, অভেদ, অসাধারণ, অনভিজ্ঞ, অগোচর, অজ্ঞাত, অনন্য, অতল, বেরসিক অনাসৃষ্টি, অনিন্দ্য, অবিশ্রান্ত, অযাচিত, অপার্থিব, অপর্যাপ্ত, অপরিমিত, অপর, অকাল, অস্বাভাবিক, নিরাশা, নীরব, অস্ফুট, অবুঝ, অশান্ত, অবাধ, অজানা, অফুরান, অমর, অম্লান, অক্ষয়, অবিদিত, অস্থির, অপ্রীতি, অন্যায়, অব্যক্ত।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত: নাতিদূর, নাতিদীর্ঘ, অশুভ, অকল্যাণ, অসভ্য, অভদ্র, অনাবাদী, অনন্ত, অসীম, অনাঘ্রাত, অনাস্বাদিত, অনাসৃষ্টি, নির্জন, গরহাজির, বেমানান, অনশন, অনেক, অনির্বচনীয়, অখ্যাত, অপবিত্র, অবিরাম, অনভিজ্ঞ।

৩. কর্মধারয় সমাস:

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ যথাক্রমে বিশেষণে ও বিশেষ্যে বা বিশেষ্যে ও বিশেষ্যে বা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় এবং পরপদের অর্থ-প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলা হয়। কর্মধারয় সমাসে তৎপুরুষ সমাসের মতো পরপদেরই প্রাধান্য। যেমন: রক্ত যে পদ্ম=রক্তপদ্ম; যিনি রাজা তিনিই বাহাদুর=রাজাবাহাদুর; লাল ও নীল=লাল-নীল। প্রথম দৃষ্টান্তে— পূর্বপদ বিশেষণ [রক্ত] ও পরপদ বিশেষ্য [পদ্ম], দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে—পূর্বপদ বিশেষ্য [রাজা] ও পরপদ বিশেষ্য [বাহাদুর] এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তে পূর্বপদ বিশেষণ [লাল] ও পরপদ বিশেষণ [নীল]।

বিশেষণ ও বিশেষ্যে কর্মধারয়: মহান্ যে রাজা=মহারাজ; সর্ব যে অলঙ্কার=সর্বালঙ্কার; সর্ব যে অঙ্গ=সর্বাঙ্গ; অন্যায় যে আচরণ=অন্যায়াচরণ। তেমনি: পূর্বদিক, কৃষ্ণবর্ণ, ভগ্নজীবন, ক্ষিপ্রহস্ত, শিষ্টাচার, পরমাত্মীয়, উচ্চহাস্য, সজ্জন, মহাপ্রলয়, সত্যযুগ, পরমায়ু, কাঁচকলা [কাঁচা যে কলা], দুর্নীতি, মহাপাপী, পুলকিত-চিত্ত, সুখ্যাতি, ম্লানমুখ, বড়োমানুষ, বিবর্ণ-মুখ, বীরপুরুষ, একাগ্রচিত্ত, রুদ্ধকণ্ঠ, নবজন্ম, পাশ্চাত্য-জগৎ, পরবর্তীকাল, নবপ্রত্যয়, পরমহংস, শ্যাম-শোভা, মহাসভা, ক্রীতদাস, দুরবস্থা, মহোৎসব, পরলোক, পূর্বজন্ম, মৃদুগুঞ্জন, ঘনবন, নব-বিস্ময়, সুবাতাস, মূলকথা, সংগত-সুযোগ, অমৃতলোক, রক্তচক্ষু, শুভদৃষ্টি, পূর্ণপাত্র, অনিন্দ্যসুন্দর, মহাশিল্প, প্রিয়পাত্র, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ, মিষ্টান্ন, দীর্ঘনিশ্বাস, লোলুপরসনা, বাঁকামুখ, ছিটেগুলি, অবনতমুখ, সুকোমল, গোপনলোক, নীলাঞ্জন, মলয়ানিল, কলকণ্ঠ, নীলাকাশ, হতাশ, দুর্দিন, দীর্ঘশ্বাস, মহামিশ্র, বাড়বাগ্নি, কোমলমলয়সমীর, ছিন্নকণ্ঠ, আর্তকণ্ঠ, মহাবিপ্লব, মহাদায়িত্ব মহাতীর্থ, একেশ্বর, মহাশক্র, হিতকথা, মহারণ্য, মহারাজ্য, কাপুরুষ, [কু (কা) যে পুরুষ], মহারথী, [অশুদ্ধ, শুদ্ধরূপ—মহারথ], উন্মত্ততরঙ্গ, মহাকাল, নববস্ত্র, নবরক্তাম্বর, শ্বেতপদ্ম।

বিশেষ্য ও বিশেষ্যে কর্মধারয় : যা স্বর্গ, তাই লোক=স্বর্গলোক ; যিনি ভিখারী, তিনিই সাহেব=ভিখারী-সাহেব ; যা ঘর্ম, তাই জল=ঘর্মজল ; যিনি ডাক্তার, তিনিই বাবু=ডাক্তারবাবু। তেমনি : সূর্যদেব, বাস্তভিটা, ঠাকুরমশাই, রসিদপত্তর, আম্রফল, তীরভূমি, স্বর্গলোক, পুত্রসন্তান, ভূ-সম্পত্তি, পিটেপুলি, পল্লীগ্রাম, লোকজন, সহায়-সুহৃদ, পিতৃদেব, কালান্তক, প্রকৃতিদেবী।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : রাজর্ষি, খোকাবাবু, রাজ-সন্ন্যাসী, সম্রাট-কবি, ভারতভূমি, নৃপশিশু, বউঠাকুরাণী, পণ্ডিতমহাশয়, মাতাঠাকুরাণী।

বিশেষণ ও বিশেষণে কর্মধারয় : পূর্বে সুপ্ত, পরে উত্থিত=সুপ্তোত্থিত ; যা অন্যায়, তাই অধর্ম=অন্যায়-অধর্ম ; যিনি গণ্য, তিনিই মান্য=গণ্যমান্য ; তেমনি : সুবিখ্যাত, সুদূর, নবাগত, প্রায়ান্ধকার, সুদুর্গম, নবশ্যাম, স্নিগ্ধশান্ত।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : মৃদুমন্দ, চালাকচতুর, কাঁচামিঠে, লালনীল, ভীষণসুন্দর, দীনদুঃখী, পণ্ডিতমূর্খ, কঠোর-কোমল, কান্তকোমল, শান্তশিষ্ট, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, জীবন্মৃত।

●কর্মধারয় সমাস সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত-বিধি :

১. প্র, পূর্ব, মধ্য, অপর, সায়ম্ প্রভৃতি শব্দের পর 'অহন্' শব্দের 'অহ্ন' আদেশ হয়। যেমন : পূর্ব যে অহ=পূর্বাহ্ণ ; প্র [পূর্ব] যে অহ=প্রাহ্ণ। তেমনি—মধ্যাহ্ন, পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন।

২. স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'কু' স্থানে 'কৎ' [কদ্] আদেশ হয়। যেমন : কু যে আচার=কদাচার ; কু যে আকার=কদাকার ; কু যে অর্থ=কদর্থ ; কু যে অভ্যাস=কদভ্যাস। তেমনি : কদক্ষর, কদুক্তি, কদুত্তর, কদর্য, কদন্ন, কদুষ্ণ [কবোষ্ণ]।

৩. পূর্বপদ 'মহৎ' স্থানে 'মহা' এবং পরপদ 'সখি' স্থানে 'সখ', 'রাজন্' স্থানে 'রাজ' ও 'রাত্রি' স্থানে 'রাত্র' আদেশ হয়। যেমন : মহৎ যে জন=মহাজন, মহৎ যে রাজা=মহারাজ [বাংলায় 'মহারাজা' শব্দও প্রচলিত। যেমন : বর্ধমানের মহারাজা, ত্রিপুরার মহারাজা।] প্রিয় যে সখা=প্রিয়সখ ; পূর্ব যে রাত্রি=পূর্বরাত্র। তেমনি : মহাপুরুষ, মহামানব, মহাসভা [মহতী যে সভা], অর্ধরাত্র, দীর্ঘরাত্র।

কর্মধারয় সমাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের : ১. সাধারণ কর্মধারয়, ২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও ৩. উপমামূলক কর্মধারয়।

১. সাধারণ র্মকধারয় : বিশেষণ-বিশেষ্যে বা বিশেষ্য-বিশেষ্যে বা বিশেষণ-বিশেষণে যে কর্মধারয় সমাস হয়, তাকে **সাধারণ কর্মধারয় সমাস** বলে। [পূর্বে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।]

২. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাস-বাক্যের ব্যাখ্যানমূলক পদের লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** বলা হয়। যেমন : সিংহ 'চিহ্নিত' আসন=সিংহাসন ; ছায়া 'প্রধান' তরু=ছায়াতরু ; তেল 'মাখবার' ধুতি=তেলধুতি ; ঘি 'মেশানো' ভাত=ঘি-ভাত ; জল 'মিশ্রিত' সাগু

=জলসাগু ; পল [মাংস] 'মিশ্রিত' অন্ন=পলান্ন ; সিঁদুর 'রাখবার' কৌটো=সিঁদুর-কৌটো ; হাতে 'পরবার' ঘড়ি=হাতঘড়ি ; পঞ্চ 'অধিক' দশ=পঞ্চদশ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে সমস্যমান ব্যাখ্যানমূলক পদের [যথা : 'চিহ্নিত', "প্রধান', 'মিশ্রিত', 'রাখবার', 'পরবার', 'অধিক' ইত্যাদি] আবির্ভাব ঘটেছে ; কিন্তু সমস্ত পদগুলিতে ব্যাখ্যানমূলক পদগুলি লুপ্ত হয়েছে। তাই এদের মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলা হয়।

৩. **উপমামূলক কর্মধারয় :** যে কর্মধারয় সমাসে দুটি অসম জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বা উপমার মাধ্যমে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাকে **উপমামূলক কর্মধারয়** বলা হয়। উপমার চারটি অঙ্গ : ক. **উপমান**, খ. **উপমেয়**, গ. **সাধারণ ধর্ম** ও ঘ. **তুলনাবাচক শব্দ**।

ক. **উপমান**—যার সঙ্গে তুলনা করা হয় বা সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাকে **উপমান** বলা হয়। খ. **উপমেয়**—যাকে তুলনা করা হয় বা যার সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়, তাকে **উপমেয়** বলা হয়। গ. **সাধারণ ধর্ম**—দুটি অসম জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা-কালে কোন বিশেষ একটি বিষয়ে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়। সেই বিশেষ সাদৃশ্যকে **সাধারণ ধর্ম** বলা হয়। 'চাঁদের মতো সুন্দর মুখ' দৃষ্টান্তটিতে 'চাঁদ' [উপমান] ও 'মুখে'র [উপমেয়] মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে। উভয় বস্তুর মধ্যে সেই মিল হলো 'সুন্দর'। 'সুন্দর' সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ। ঘ. **তুলনাবাচক শব্দ**—এই ধরনের উপমা বা তুলনার মধ্যে উপমা বা তুলনাটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্যে একটি অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। উল্লিখিত দৃষ্টান্তের 'মতো' শব্দটি তুলনাবাচক শব্দ। ন্যায়, মতো, মতন, সদৃশ ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে উপমামূলক কর্মধারয় তিন প্রকারের : **উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়।**

১. **উপমান কর্মধারয় :** উপমান পদের সঙ্গে সাধারণ ধর্মবাচক শব্দের যে সমাস হয়, তাকে বলা হয় **উপমান কর্মধারয়**। যেমন : কুসুমের মতো কোমল=কুসুম-কোমল ; এখানে 'কুসুম' এই উপমানের সঙ্গে অজ্ঞাত কোন বস্তুর তুলনা করা হয়েছে। 'কুসুম' ও 'অজ্ঞাত' বস্তুটির সাধারণ ধর্ম হলো 'কোমলতা'। কাজেই, 'কোমল' হলো সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ এবং ব্যাসবাক্যে তার উল্লেখ আছে। সমস্তবাক্যেও উপমান এবং সাধারণ ধর্মবাচক শব্দ উপস্থিত। কাজেই, এটি উপমান কর্মধারয়। তেমনি—ঘনের [মেঘের] মতো শ্যাম=ঘনশ্যাম ; শশের মতো ব্যস্ত =শশব্যস্ত ; তুষারের মতো ধবল=তুষারধবল ; বিষের মতো তিক্ত=বিষতিক্ত।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত : জলদ-গম্ভীর, বকধার্মিক, মসীকৃষ্ণ, ইস্পাত-কঠিন, কাজলকালো, বিড়াল-তপস্বী, তুষারশুভ্র, হিমশীতল, তুষার-শীতল, শিশির-স্নিগ্ধ, জ্যোৎস্না-ধবল, মেঘ-মেদুর, লৌহ-কঠিন, দূর্বাদলশ্যাম, বজ্রগম্ভীর, শঙ্খ-ধবল, নবনীত-কোমল, নিমতিতা, মিশ্‌কালো।

২. **উপমিত কর্মধারয় :** উপমান পদের সঙ্গে উপমেয় পদের সমাসকে

স্মরণীয় : ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ পূর্বপদ থাকলে সমাসবদ্ধ পদটিতে ঈ-কার ই-কার হয়। আবার 'দাস' শব্দ যোগেও 'কালী', 'দেবী' ও 'ষষ্ঠী' শব্দের দীর্ঘ-ঈ হ্রস্ব-ই হয়। যেমন : কালিদাস [কিন্তু কালীপদ, কালীচরণ]; দেবিদাস [কিন্তু দেবীচরণ, দেবীপদ, দেবীপ্রসাদ]; ষষ্ঠিদাস [কিন্তু ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীকান্ত]। কেবলমাত্র 'চণ্ডীদাস' ও 'চণ্ডিদাস' উভয় রূপেই প্রচলিত।

২. **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে উভয় পদই বিশেষ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি পদ [অধিকরণ] সপ্তমী-বিভক্তিযুক্ত, তাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন : চন্দ্র শেখরে যার=চন্দ্রশেখর। এখানে পূর্বপদ 'চন্দ্র', পরপদ 'শেখরে'—উভয় পদই বিশেষ্য ; কিন্তু পরপদ 'এ'—এই সপ্তমী বিভক্তির চিহ্নযুক্ত এবং সমস্তপদ 'চন্দ্রশেখর' শিবকে বোঝাচ্ছে। কাজেই, দৃষ্টান্তটি **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের**। তেমনি—খড়্গ হস্তে যার=খড়্গহস্ত ; শূল পাণিতে যার=শূলপাণি ; বীণা পাণিতে যার=বীণাপাণি ; নীল কণ্ঠে যাঁর =নীলকণ্ঠ।

তেমনি : দয়াশীল, অন্যমনস্ক, নিম্নপ্রবণ, শৈত্যপ্রবণ, খাতাবগলে, স্মৃতিরত্ন, জ্ঞানগর্ভ, গলবস্ত্র, নিদাঘ, ফেনশীর্ষ, শূলপাণি, শশাঙ্ক, ক্ষণজন্মা, পাপবুদ্ধি, বজ্রপাণি।

৩. **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা পরস্পর ক্রিয়া-বিনিময় বোঝাতে যে বহুব্রীহি সমাসে একই পদ দ্বিত্ব হয়ে পূর্বপদ ও পরপদরূপে বসে, তাকে **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন : লাঠিতে লা ঠিতে যে যুদ্ধ=লাঠালাঠি। এখানে পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝাতে একই শব্দ 'লাঠি' পূর্বপদ ও পরপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই, দৃষ্টান্তটি **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের**। যেমন : কানে কানে যে কথা=কানাকানি, হাতে হাতে যে যুদ্ধ=হাতাহাতি ; কোলে কোলে যে মিল=কোলাকুলি।

৪. **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যানমূলক মধ্যবর্তী পদটির লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। এর অন্য নাম **উপমান-পূর্বপদ বহুব্রীহি** বা **উপমাত্মক বহুব্রীহি**। যেমন : মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যার=মৃগনয়না। এখানে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যানমূলক মধ্যবর্তী 'ন্যায়' পদটি লুপ্ত হয়েছে। এবং মৃগ বা নয়নের অর্থ প্রধান না হয়ে যে সেই নয়নের অধিকারী, সে প্রধান হয়েছে। কাজেই, দৃষ্টান্তটি **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের**। আবার, মৃগের নয়নের সঙ্গে কারও নয়নের তুলনা বা উপমা করা হয়েছে। কাজেই, এটি **উপমান-পূর্বপদ বহুব্রীহি** বা **উপমাত্মক বহুব্রীহি সমাসেরও** দৃষ্টান্ত। স্বর্ণের আভার ন্যায় আভা যার=স্বর্ণাভ এণ'র অক্ষির ন্যায় অক্ষি যার=এণাক্ষী ; মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যার =মীনাক্ষী। তেমনি : বিক্রমাদিত্য, মেঘনাদ, অশ্রুমুখী, ইন্দুমুখী।

৫. **অলুক্ বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে **অলুক্ বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন : গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে

=গায়েহলুদ। এখনে 'গায়ে' শব্দের সপ্তমী বিভক্তি সমস্তপদে লুপ্ত হয় নি। কাজেই, এটি **অলুক্ বহুব্রীহি সমাসের** দৃষ্টান্ত। কারও কারও মতে, এটা **অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহিও**। যেমন: হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=হাতেখড়ি; মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=মুখেভাত; হরির উদ্দেশে লুট দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে=হরির লুঠ।

৬. **নঞর্থক বহুব্রীহি:** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়, তাকে **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। যেমন: নেই ভুল যাতে=নির্ভুল। এখানে পূর্বপদ নঞর্থক বা নিষেধার্থক অব্যয়। এবং সেই অব্যয়ের অর্থ বা পরপদের অর্থ প্রধান না হয়ে তৃতীয় একটি পদের অর্থ [নির্ভুল বস্তু] প্রধানরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। কাজেই, দৃষ্টান্তটি **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাসের**। যেমন—নেই পরোয়া যার=বেপরোয়া; নেই ইমান যার=বেইমান; নেই জল যাতে=নির্জলা। তেমনি: অনর্থ, অদৃষ্ট, নিরুপায়, অসীম, নির্জল, অতল, অমর, নিঃস্ব, নিষ্ফল, নির্জীব, নিঃশব্দ, নির্বংশ, অনাদিক, নির্মল, অবাধ, নির্গুণ, নিরস্ত্র, নিষ্কর, অশোক, নির্ভীক, অরাজক, অনিমেষ, নির্বাক, অনন্ত, নির্বিষ, অনাথিনী।

সহার্থক বহুব্রীহি: সহার্থক পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন: সস্ত্রীক [স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান], সপত্নীক, সপুত্র, সতীর্থ, সধবা, সবান্ধব, সশিষ্য, সপরিবার, সযত্ন, সাদর, সপ্রীতি, সবিনয়, সত্বর, সপরিবার, সাষ্টাঙ্গ, সহোদর, সদলবল, সফল, সবিনয়, সসম্ভ্রম, সার্থক, সপ্রমাণ, সতৃষ্ণ, সমানা, সজল, সাদ্বদেশ, সচকিত, সশঙ্ক, সাক্ষর, সক্ষম।*

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে বলা হয় **অব্যয়ীভাব সমাস**। অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ অর্থাৎ অব্যয় পদেরই অর্থের প্রাধান্য। যেমন: ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ। এখানে পূর্বপদ [দুর্] অব্যয় এবং তার অর্থ [অভাব]-ই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। কাজেই, দৃষ্টান্তটি **অব্যয়ীভাব সমাসের**। অভাব, সামীপ্য, ব্যাপ্তি [বীপ্সা, পুনঃপুনঃ], অনতিক্রম, পর্যন্ত [সীমা], সাদৃশ্য, যোগ্যতা, পশ্চাৎ, বৈপরীত্য, ক্ষুদ্রতা, সাকল্য ইত্যাদির অর্থে **অব্যয়ীভাব সমাস** হয়। যেমন: **অভাব**—ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ; ভাতের অভাব=হা-ভাত; ঘরের অভাব=হা-ঘর। তেমনি: নির্বিঘ্ন, বিশৃঙ্খল, অব্যবস্থা, বেকায়দা। **সামীপ্য**—কূলের সমীপে=উপকূল; নগরীর সমীপে=উপনগরী; কণ্ঠের সমীপে=উপকণ্ঠ; অক্ষির সমীপে=সমক্ষ। **ব্যাপ্তি** [অবধি, বীপ্সা, পুনঃপুনঃ]—জন্ম থেকে=আজন্ম; শৈশব থেকে=আশৈশব, বাল্য থেকে=আবাল্য; কৈশোর থেকে=আকৈশোর। **বীপ্সা**—দিন দিন=

---

* উত্তরপদ বিশেষণ হলে সহার্থক বহুব্রীহি হবে না। সেরূপ শব্দের প্রয়োগ প্রচুর; কিন্তু অশুদ্ধ। যেমন: সশঙ্কিত, সচকিত, সকাতর, সলজ্জিত, অকৃতজ্ঞ, সঠিক, সানন্দিত ইত্যাদি।

প্রতিদিন ; অহ অহ=প্রত্যহ ; জন জন=প্রতিজন। বছর বছর=ফি-বছর। **অনতিক্রম**—শক্তিকে অতিক্রম না করে=যথাশক্তি ; উচিতকে অতিক্রম না করে= যথোচিত ; অর্থকে অতিক্রম না করে=যথার্থ ; রীতিকে অতিক্রম না করে= যথারীতি ; ইষ্টকে অতিক্রম না করে=যথেষ্ট। **পর্যন্ত**—সমুদ্র পর্যন্ত=আসমুদ্র ; সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত=আসমুদ্রহিমাচল ; জীবন পর্যন্ত=আজীবন ; কণ্ঠ পর্যন্ত =আকণ্ঠ ; পাদ পর্যন্ত=আপাদ [পাদ থেকে মস্তক পর্যন্ত=আপাদমস্তক] ; মূল পর্যন্ত=আমূল ; কর্ণ পর্যন্ত=আকর্ণ। **সাদৃশ্য**—বনের সদৃশ=উপবন ; কথনের সদৃশ=উপকথন ; মূর্তির সদৃশ=প্রতিমূর্তি ; রূপের সদৃশ=অনুরূপ ; ধ্বনির সদৃশ= প্রতিধ্বনি ; লিপির সদৃশ=প্রতিলিপি ; দ্বীপের সদৃশ=উপদ্বীপ। **যোগ্যতা**— রূপের যোগ্য=অনুরূপ ; কূলের যোগ্য=অনুকূল ; প্রেরণার যোগ্য=অনুপ্রেরণা। **পশ্চাৎ**—গমনের পশ্চাৎ=অনুগমন। তেমনি—অনুসন্ধান, অনুসার, অনুবাদ, অনুকূল, অনুক্রম, অনুরাগ, অনুকরণ। **বৈপরীত্য**—কূলের বিপরীত=প্রতিকূল ; ক্রিয়ার বিপরীত=প্রতিক্রিয়া ; অর্পণের বিপরীত=প্রত্যর্পণ ; শোধের বিপরীত= প্রতিশোধ। **ক্ষুদ্রতা**—ক্ষুদ্র গ্রহ=উপগ্রহ ; ক্ষুদ্র অঙ্গ=প্রত্যঙ্গ। **সাকল্য**—বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা=আবালবৃদ্ধবনিতা ; পামর, জনসাধারণ সকলেই=আপামর-জনসাধারণ।

সমাসান্ত প্রত্যয় : সমাস সংঘটিত হবার পর সমস্তপদে সমাসেরই অঙ্গ হিসেবে যে প্রত্যয় অর্থের কোনরূপ রূপান্তর সাধন না করে তদ্ধিতের মতো যুক্ত হয়, তাকে **সমাসান্ত প্রত্যয়** বলে। যেমন : পথের রাজা=রাজপথ [অ] ; এক রোখ যার= একরোখা [আ] ; সুগন্ধি [ই] ; শত অব্দের সমাহার=শতাব্দী [ঈ] ; ঘরের অভাব যার=হা-ঘরে [এ] ; ঘরের দিকে মুখ যার=ঘরমুখো [ও] ; বিপত্নীক [ক]।

৭. নিত্য সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির দ্বারা ব্যাসবাক্য হয় না, ব্যাসবাক্য গঠনের জন্যে অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাকে **নিত্য সমাস** বলে। যেমন : অন্য ভাষা= ভাষান্তর ; অন্য যুগ=যুগান্তর ; অন্য ভাব=ভাবান্তর ; অন্য মত=মতান্তর ; অন্য মনু=মন্বন্তর ; অন্য গতি=গত্যন্তর। তেমনি : উপায়ান্তর, গ্রামান্তর, দেশান্তর, দিগন্তর, মাসান্তর, ধর্মান্তর, দিনান্তর, দৃষ্টান্তর, লোকান্তর, জন্মান্তর, পাঠান্তর, প্রকারান্তর ; কেবল জল=জলমাত্র ; কেবল দর্শন=দর্শনমাত্র ; কেবল দেখা= দেখামাত্র ; কেবল নাম=নামমাত্র ইত্যাদি।

॥ অনুসরণী ॥

*১. সমাস প্রধানতঃ কয় প্রকার ? তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক সমাসের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

*২. সমাস কাহাকে বলে ? সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

উ. মা. '৬০, '৬২, '৬৬ ; মা. '৬৩।

*৩. নিম্নলিখিত সমাসগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাও :

ক. কর্মধারয় ও বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৪ ; খ. সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, উ. মা. '৬০ ; গ. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ও মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি, উ. মা. '৬১ ; ঘ. নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞ্ বহুব্রীহি ;

৩. অলুক তৎপুরুষ ও অলুক্ বহুব্রীহি; বহুব্রীহি সমাস ও কর্মধারয়, উ. মা. '৬৫ ; মা. '৬৫ ; রূপক সমাস ও উপমিত সমাস, উ. মা. '৬৪, '৬৫ '৬৬ ; কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস, মা. '৬৬।

*৪. দৃষ্টান্তসহ নিম্নলিখিত সমাসগুলির সংজ্ঞা লিখ :

কর্মধারয় সমাস, উ. মা. '৭০ ; উপমান কর্মধারয়, মা. '৬৩ ; উপমিত কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়, মা. '৫৩, '৬১ ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯ ; ক. প্রা. '৬১ ; উপমান-পূর্বপদ বহুব্রীহি, অলুক্ সমাস, উ. মা. '৬৪, মা. ৬৪, '৫৮ ; ক. প্রা. '৬২ ; অলুক্ দ্বন্দ্ব, অলুক্ তৎপুরুষ, অলুক্ বহুব্রীহি, নিত্য সমাস, উ. মা. '৬৩; ব্যতিহার বহুব্রীহি, উ. মা. ৬১, '৬৩ ; ক. প্রা. '৬১ ; অব্যয়ীভাব সমাস, উ. মা. '৬৪, '৬৮ ; মা. '৬২ ; ক. প্রা. '৬২ ; নঞর্থক বহুব্রীহি, উ. মা. '৬৩, ৬৪ ; উপপদ তৎপুরুষ, উ. মা. '৬১, '৬৩ ; বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব, উ. মা. '৬৩, '৬৮ ; দ্বিগু, মা. '৫৩ ; মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ক. প্রা. '৬১ ; সমাসান্ত প্রত্যয়, উ. মা. '৬৩ ; ক. প্রা. '৬২, '৬৩ ; বিগ্রহ বাক্য, মা. '৬৫ ; বহুব্রীহি সমাস, উ. মা. '৬৯।

*৫. কর্মধারয় সমাস কাহাকে বলে ? উপমান কর্মধারয়, উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয়ের প্রভেদ উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। মা, '৫৬ ; ক. প্রা. '৬২।

৬. দৃষ্টান্তসহ তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দাও।

*৭. নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : তুষারধবল, যথাশক্তি, পুরুষসিংহ, স্বাধীনতা-দিবস, চিরসুখ, ন্যূনাধিক, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, হাসাহাসি, রাজপথ ; উ. মা. '৬০। দাকাটা, তেলেভাজা, রান্নাঘর, গোলাভরা, সুধী, হতভাগা, মতিচ্ছন্ন, নদীমাতৃক, সুপ্তোত্থিত ; উ. মা. '৬৪। প্রোষিতভর্তৃকা, বিপত্নীক, বীণাপাণি, যথাশক্তি, তেলেভাজা ; উ. মা. '৬৭। কদাচার, বেআদব, গরমিল, আবাল্য, শতাব্দী, সুধী, আদ্যন্ত, গায়ে-হলুদ, গোঁজামিল, পঞ্চবটী ; ক. প্রা. '৬১। শ্রীভ্রষ্ট, শ্রীযুক্ত, শ্রীধর, সপ্তাহ, জলদ-গম্ভীর, হিংসা-বিষ, নরসিংহ; ক. প্রা. '৬৫ ; ভিক্ষালব্ধ, একতারা, মহোৎসব, হৃৎপদ্ম, আত্মসমাহিত, অভিলষিত-দর্শন, স্মরণস্তম্ভ ; ক. প্রা. '৬৭। অষ্টাদশ, আঁখিপাখি, অহোরাত্র, পুরুষসিংহ, নির্খোঁজ, আসমুদ্র, তেমাথা ; উ. মা. '৬৯। লাভালাভ, আগাগোড়া, রথারূঢ়, বর্ণচোরা, ঘি-ভাত, ঢেঁকিছাঁটা, পঞ্চভূত, উকিল-ব্যারিষ্টার, মাথাপিছু, রান্নাঘর, বীরপূজা, হৃৎপদ্ম, ; উ. মা. '৭০। ঘরজামাই, অগ্নিভয়, সপ্তাহ, ভূতপূর্ব, কেলেঙ্কলে, আটচালা, মাথাপিছু, নরসিংহ, মিশকালো, নামঞ্জুর ; উ. মা. [কম্পার্ট.] '৭০।

প্রত্যহ, স্বর্ণমুদ্রা, নৃপ, বিষাদসাগর, বিস্ময়াবিষ্ট, চরিতার্থ, কুজ, কৃতাঞ্জলি, সুপ্তোত্থিত, উচ্চৈঃস্বরে, বিক্রমাদিত্য, চরণারবিন্দ, সর্দিজ্বর, অন্যমনস্ক, প্রাণাধিকা, পদস্থ, যথেষ্ট, পারদর্শী, রাজপথ, মৃদঙ্গার, কালস্রোত, সন্ধ্যাহ্নিক, কণ্ঠভরা, হতবুদ্ধি, আকণ্ঠ, আগাগোড়া, বহুমুখী, দিশাহারা, রূপরজ্জু, স্বর্ণশোণিত-প্লাবন, চণ্ডীমণ্ডপ, রসপরতন্ত্রতা, ছানাবড়া, সিংহবাহিনী, অপরাহ্ণ, বিধবা, শাসন-ভয়, শিকলদেবী, চিরযুবক, চিরজীবী, ছন্নছাড়া, অনুজ, পঙ্কজ-কানন, অরিন্দম, বনবাসী, বসুধা, শূলপাণি, মহিষারূঢ়, অগ্নিদাহ, ধৃতরাষ্ট্র, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত, পাণ্ডুচন্দ্রলেখা, সুহৃদ্, প্রীতিমন্ত্রবলে, বিষাতঙ্ক, লোকলজ্জাভয়, নিদ্রাগত, সুবর্ণ।

৮. স্থূলাক্ষর শব্দগুলির সমাস নির্ণয় কর : যদি এই **হৃদয়বিদারণ** অমঙ্গল ঘটনার নিবারণের কোনও উপায় থাকে, বলুন। রাজাও **কৌতুকাবিষ্ট** হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। এক্ষণে আর কি নিমিত্তে **দাসত্ব-শৃঙ্খলে** বদ্ধ থাকি। **পক্ষান্তরে** কতকগুলি **কটুভাষী** আছেন। যেই অধিক পরিমাণে খায় সেই **অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্‌ণ**। **চিকিৎসা-শাস্ত্রেও** তিনি একজন **পারদর্শী** ব্যক্তি। **জগদ্‌যন্ত্র** তখন **নিশ্চল** হইবে। আদিম শিল্পীর সামনে শুধু তো **বিশ্বজোড়া** এই **রসভাণ্ডার** খোলা ছিল। বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবি **কালিদাসকেও** নিয়মিত হাজরে লিখতে হত। এই নিয়ে **নিয়তিকৃত, নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা, নবরসরুচিরা** যিনি, তাঁর সঙ্গে **শুভদৃষ্টি** করতে হয় **সহজে**। **একাদশী বিস্ময়াপন্ন** হইয়া চাহিল। শ্যামাদাসবাবু **গলবস্ত্র** হইয়া প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন—কি নাই, কি চাই। শ্রাবণের **মেঘাচ্ছন্ন** অন্ধকার রাত্রি। শূলী শম্ভুনিভ **কুম্ভকর্ণ**। **ত্রিদিবে** পাতালে মর্ত্যে, **মরামর** জীব প্রমাদ গণিলা আতঙ্কে। নাহি কাজ **সিংহাসনকণ্টকশয়নে**। **প্রীতিমন্ত্রবলে** শান্ত করো, বন্দী করো **নিন্দাসর্পদলে**।

● শব্দের প্রকারভেদ

গঠনানুসারে এবং অর্থানুসারে শব্দসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। গঠনানুসারে শব্দকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়ঃ **১. মৌলিক শব্দ ও ২. সাধিত শব্দ।**

১. মৌলিক [বা স্বয়ংসিদ্ধ] শব্দঃ যে সার্থক শব্দকে বিশ্লেষ করা যায় না, তাকে মৌলিক [বা স্বয়ংসিদ্ধ] শব্দ বলা হয়। যেমন—ফল, ফুল, জল, বাবা, মা, ভাই, হাত, পা. কান, নাক ইত্যাদি।

২. সাধিত শব্দঃ যে সার্থক শব্দকে বিশ্লেষ করা যায় এবং বিশ্লিষ্ট একাধিক শব্দের অর্থের সাহায্যে পূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট হয়, তাকে সাধিত শব্দ বলা হয়। সাধিত শব্দ আবার দু' প্রকার: ব্যুৎপন্ন বা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ ও সমস্ত বা সমাসবদ্ধ শব্দ। ব্যুৎপন্ন বা প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ: পঠনীয়, দ্রষ্টব্য, বক্তব্য, সহিষ্ণুতা, দুর্গমতা ইত্যাদি। লক্ষণীয়: দৃষ্টান্তগুলিতে যথাক্রমে পঠ্, দৃশ্, ব্রূ বা বচ্, সহ্, গম্ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পদগুলি নিষ্পন্ন। সমস্ত বা সমাসবদ্ধ শব্দ: নরনারী, ঘরবাড়ী, খেলাধুলা, বনবাস ইত্যাদি। লক্ষণীয়: দৃষ্টান্তগুলিতে একাধিক শব্দযোগে সমাস সংঘটিত হয়েছে।

অর্থানুসারে শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: **১. যৌগিক শব্দ, ২. রূঢ়ি শব্দ ও ৩. যোগরূঢ় শব্দ।**

১. যৌগিক শব্দঃ প্রকৃতি-প্রত্যয় থেকে যে শব্দের অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাকে যৌগিক শব্দ বা যৌগিক প্রাতিপদিক [বিভক্তিহীন সার্থক শব্দ] বলে। যেমন—পাচক=পাচ্+অক [যে পাক করে]; পাঠক=পঠ্+অক [যে পাঠ করে]; চরণ=চর্+অন [যার সাহায্যে চলা যায়]; পক্ষী=পক্ষ+ইন্ [যার পক্ষ বা ডানা আছে]; মিতালি=মিতা+আলি [বন্ধুর ভাব] ইত্যাদি।

২. রূঢ়ি শব্দ বা রূঢ়ি প্রাতিপদিকঃ প্রকৃতি-প্রত্যয় থেকে যে অর্থ বুঝায়, তা না বুঝিয়ে শব্দ অন্য কোন বিশেষ ব্যবহারিক অর্থ বোঝালে তাকে রূঢ়ি শব্দ বা রূঢ়ি প্রাতিপদিক বলে। যেমন=জেঠামি [=জেঠা+আমি]=জ্যেষ্ঠের মত আচরণ। কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'পাকামি'। সন্দেশ [=সম্-দিশ্+অল্]=সমস্ত দেশ থেকে যা আসে; অর্থাৎ খবর। কিন্তু বিশেষ ব্যবহারিক অর্থ 'মিষ্টান্ন'। তেমনি—হরিণ [=হৃ+ইন্]=যে হরণ করে, প্রচলিত অর্থ 'পশুবিশেষ'; রাখাল [যে রাখে বা রক্ষা করে]=প্রচলিত অর্থে 'যে গোরু-মহিষ চরায়'।

৩. যোগরূঢ়ঃ প্রকৃতি-প্রত্যয় অনুসারে কোন শব্দের যে সব অর্থ হয়, তার মধ্যে যদি একটি মাত্র বিশেষ বস্তুকে বুঝায়, তবে তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন: পঙ্কজ=[পঙ্ক-জন্+ড] যা পাঁকে জন্মায়; পাঁকে যে সব বস্তু জন্মায়, তাদের মধ্যে

পঙ্কে জাত 'পদ্ম'কেই বোঝানো হয়। পীতাম্বর=পীত-বসন-পরা সবাইকে না বুঝিয়ে শুধুমাত্র পীতবস্ত্র-পরিহিত 'শ্রীকৃষ্ণ'কে বোঝায়। তেমনি—জলধর [মেঘ], সরোজ [পদ্ম], অন্ন [ভাত], উদ্ভিদ্ [বৃক্ষ], জলদ [মেঘ], সুহৃৎ [বন্ধু]।

অর্থাৎ, শব্দার্থ নদীর মতো। মাঝে মাঝে তারা খাত বদল করে। কখনও তা নিম্নখাত ছেড়ে উচ্চখাতে প্রবাহিত হয়, কখনও উচ্চখাত ছেড়ে নিম্নখাতে প্রবাহিত হয়। শব্দার্থের কখনও ঘটে উন্নতি; কখনও ঘটে অবনতি।

শব্দার্থের উৎকর্ষ: শব্দ যখন তার মূল অর্থ বর্জন করে উন্নততর অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন হয় শব্দার্থের উৎকর্ষ। অর্থাৎ শব্দ তখন নিম্নমানের অর্থ পরিত্যাগ করে উচ্চমানের অর্থ গ্রহণ করে। যেমন: 'মন্দির' শব্দটি। প্রাচীন অর্থ—'গৃহ'; "যব গোধূলি সময় বেলি। ধনি 'মন্দির' বাহির ভেলি॥" আধুনিক অর্থ—'দেবালয়'; "দেবতা-'মন্দির' মাঝে ভকত-প্রবীণ জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।" তেমনি—'সম্ভ্রান্ত': প্রাচীন অর্থ—সম্পূর্ণ ভুল [সম্+ভ্রান্ত]; আধুনিক অর্থ—'উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন'।

শব্দার্থের অপকর্ষ: আবার, শব্দ যখন তার মূল অর্থ বর্জন করে নিম্নতর অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন হয় শব্দার্থের অপকর্ষ। যেমন: 'মহাজন' শব্দটি। প্রাচীন অর্থ—'মহাপুরুষ'; 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়' [উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা]। আধুনিক অর্থ—'যে টাকা ধার দেয়' অর্থাৎ 'উত্তমর্ণ'; "জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে 'মহাজন' কয়।" তেমনি—'ইতর'; প্রাচীন অর্থ—'অন্য', আধুনিক অর্থ—'নীচ'।

॥ অনুসন্ধানী ॥

*১. শব্দ, পদ ও বিভক্তি কাহাকে বলে এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি?
উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬০, '৬১

*২. পদ, প্রকৃতি ও শব্দ কাহাকে বলে? পদ ও শব্দে পার্থক্য কি? মা. [কম্পার্ট.] '৬৬

*৩. উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও: যোগরূঢ় শব্দ, উ. মা. '৬৩; [কম্পার্ট.] '৬৯; মা. '৬৪; প্রকৃতি উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২; রূঢ় শব্দ; সাধিত শব্দ; শব্দার্থের উৎকর্ষ ও শব্দার্থের অপকর্ষ।

৪. প্রাতিপদিক কাহাকে বলে? নাম-প্রাতিপদিক ও ক্রিয়া-প্রাতিপদিক কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাও।

৫. দৃষ্টান্ত সহযোগে নাম-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতির পার্থক্য নির্দেশ কর।

৬. প্রকৃতি, প্রত্যয় ও উপসর্গ কাহাকে বলে? উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬২
[উপসর্গ কাহাকে বলে?—'উপসর্গ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য]

৭. শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি? দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও।

৮. গঠনানুসারে শব্দকে কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়? তাহারা কি কি? দৃষ্টান্ত দাও।

৯. অর্থানুসারে শব্দকে কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়? তাহারা কি কি? দৃষ্টান্ত দাও।

*১০. দৃষ্টান্তসহ সংজ্ঞা লিখ: সাধিত শব্দ, যৌগিক শব্দ, রূঢ় শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।

১১. দৃষ্টান্ত সহযোগে পার্থক্য দেখাও: রূঢ় শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ, শব্দার্থের উৎকর্ষ ও উপকর্ষ।

প্রত্যয় : শব্দ বা ধাতুর উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে প্রাতিপদিক [বিভক্তি-হীন সার্থক শব্দ] গঠন করে, তাকে বলা হয় প্রত্যয়। যেমন : য, আ, ই, ইন্, অল্, অন্ত, অন, ষ্ণ, ষ্ণিক, আই, আলি ইত্যাদি।

প্রত্যয় দু' রকমের : কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয়।

● সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয় : ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রাতিপদিক গঠন করে, তাদের বলা হয় কৃৎ-প্রত্যয়। যেমন : অঙ্, অক্, ক, ড, ণক, আলু, তৃচ্, তব্য, ক্ত, অনট্, ইত্যাদি।

অঙ্ : [পুংলিঙ্গে অ, স্ত্রীলিঙ্গে আ] পূজ্ + অঙ্ = পূজা, ভিক্ষ্ + অঙ্ = ভিক্ষা, চিন্ত্ + অঙ্ = চিন্তা। তেমনি : শিক্ষা, দীক্ষা, হিংসা, প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞা, আজ্ঞা, প্রতিভা, আভা, ক্ষমা, শোভা, পরীক্ষা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : রাজা আজ্ঞা করিলেন, অবিলম্বে উহারে লইয়া আইস। [বীরবর কাহিনী]। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]

অচ্ [অ] : ধৃ + অচ্ = ধর, চর্ + অচ্ = চর, বৃষ্ + অচ্ = বর্ষ, কৃ + অচ্ = কর, হৃ + অচ্ = হর। তেমনি : গ্রহ, সূর্য, দেব, নর, ভূধর, দিবাকর, নিশাচর, মনোহর ইত্যাদি। আবার, ভী + অচ্ = ভয়, জি + অচ্ = জয়, হৃষ্ + অচ্ = হর্ষ, স্পৃশ্ + অচ্ = স্পর্শ। তেমনি : রোষ, ক্ষয়, লয়, ভেদ, ক্রোধ, বোধ, রোধ, অনুরোধ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : জয়! **জয়** চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ [গান্ধারীর আবেদন]। মূর্ছার মন্তর ভরিছে **চরাচর** [যক্ষের নিবেদন]। চণ্ডীর হয়্যাছে **ক্রোধ** [শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন]।

—ক [অ] : নৃ-পা + ক = নৃপ, মধু-পা + ক = মধুপ, জল-দা + ক = জলদ। তেমনি : দ্বিজ, মধ্যস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, গৃহস্থ, নিষ্ঠা, ভূমিষ্ঠ, পাদপ, গোপ, বরদ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : গোপললনা নায়কহীনা, শোকশায়কে শায়িতা দীনা [বৃন্দাবন অন্ধকার]। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক ইংরাজী অভিধান **মুখস্থ** করিত [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]।

—ড [অ] : সহ-জন্ + ড = সহজ, পঙ্ক-জন্ + ড = পঙ্কজ, পুৎ-ত্রৈ + ড = পুত্র। তেমনি : সরোজ, অগ্রজ, অনুজ, আত্মজ, দ্বিজ, বনজ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : লঙ্কার **পঙ্কজ**-রবি গেলা অস্তাচলে [মেঘনাদবধ]। উত্তিরলা রথী রাবণ-**অনুজ**, লক্ষ্যি রাবণ-**আত্মজে** [মেঘনাদবধ]। শ্যামাদাসবাবুর বংশধর শিশু-**পুত্র** ও পত্নী রাখিয়া মারা গিয়াছে [অগ্রদানী]।

–ণক [অক] : গৈ + ণক = গায়ক, দৃশ্ + ণক = দর্শক, লিখ্ + ণক = লেখক, কৃষ্ + ণক = কৃষক। তেমনি : ঘাতক, শিক্ষক, পাঠক, সেবক, পাচক, অভিভাবক, সম্পাদক, আশীর্বাদক ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এতাদৃশ প্রভুভক্ত **সেবকের** সর্বনাশ হইল। [বীরবর উপাখ্যান]। কেহ কেবল **আশীর্বাদক** [মনুষ্য-ফল]। উইলিয়ম কেরী ইহার প্রথম **শিক্ষক**দিগের মধ্যে একজন [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]।

–আলু : দয়্ + আলু = দয়ালু, নি-দ্রা + আলু = নিদ্রালু। তেমনি : কৃপালু, ভাবালু, স্বপ্নালু, তন্দ্রালু ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : তোমরা আমাদের সেই বীর, **দয়ালু**, প্রজাবৎসল সম্রাট শাজাহানকে চাও [ঔরঙ্গজীব ও জাহানারা] ?

–ক্ত [ত] : গম্ + ক্ত = গত, কৃ + ক্ত = কৃত, খ্যা + ক্ত = খ্যাত, ম্লৈ + ক্ত = ম্লান, মৃ + ক্ত = মৃত, লভ্ + ক্ত = লব্ধ, দৃশ্ + ক্ত = দৃষ্ট। তেমনি : নষ্ট, নীত, গীত, লুব্ধ, ক্রীত, ভীত, ধৃত, নত, শ্রুত, জাত, স্নাত, হত, অন্ন [অদ্ + ক্ত], ত্যক্ত, স্নিগ্ধ, উপস্থিত ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : রাজার অন্তঃকরণে অতিশয় নির্বেদ **উপস্থিত** হইল। [বীরবর কাহিনী]। গাছের তলদেশের প্রতি আমি কিয়ৎক্ষণ **লুব্ধ** নেত্রে চাহিয়া রহিলাম [ভিখারী-সাহেব]। বাড়তি পাতাটিতে **অন্ন** ব্যঞ্জন মাছ **স্তূপীকৃত** হইয়া আছে [অগ্রদানী]। নারিকেলের জলে উদর **স্নিগ্ধ** হয় [মনুষ্য-ফল]।

তব্য : গম্ + তব্য = গন্তব্য, দা + তব্য = দাতব্য, কৃ + তব্য = কর্তব্য। তেমনি : দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, স্মর্তব্য, বক্তব্য, জ্ঞাতব্য ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ভারতে **দ্রষ্টব্য** স্থানের অভাব নেই। চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ে, মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া **কর্তব্য** সারিয়া আসে [অগ্রদানী]। তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অবস্থাও একটা **জ্ঞাতব্য** বিষয় ছিল [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]।

–অনীয় : কৃ + অনীয় = করণীয়, বৃ + অনীয় = বরণীয়, স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়। তেমনি : পানীয়, পূজনীয়, গ্রহণীয়, পালনীয়, রমণীয়, নমনীয়, অনির্বচনীয় ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সে সাবধানতা অবশ্য **গ্রহণীয়** [ভিখারী সাহেব]। যদি রাজি হয়, তবে এ একটা অভিনব **দর্শনীয়** পদার্থ হইবে [ভিখারী সাহেব]।

–ঘঞ্ [অ] : ভুজ্ + ঘঞ্ = ভোজ, বস্ + ঘঞ্ = বাস, অদ্ + ঘঞ্ = ঘাস, পচ্ + ঘঞ্ = পাক, হৃ + ঘঞ্ = হার। তেমনি : শোক, প্রসাদ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ, পাঠ, ভোগ, তাপ, আবিষ্কার ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর একটা **প্রসাদ** পাবে [অগ্রদানী]।

এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে **বাস** করিতেছে [একাদশী বৈরাগী]। সেকালে ও একালে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ও ভূতের **আবিষ্কার** করিয়াছেন [উত্তাপের অপচয়]।

—অনট্ [অন]: গম্ + অনট্ = গমন, দা + অনট্ = দান। তেমনি: দর্শন, ভবন, গ্রহণ, স্মরণ, শ্রবণ, নয়ন, শয়ন, রোদন, ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্তে বৈজ্ঞানিককে **স্মরণ** করাইয়া দেয়, তুমি বড়ো নির্বোধ [উত্তাপের অপচয়]। কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত **বন্ধন হরণ** করিয়া লইলেন [বাহিরে যাত্রা]।

—ণিন্ [ইন্]: মন্ত্র্ + ইন্ = মন্ত্রী, বন্দ্ + ইন্ = বন্দী, ভূ + ইন্ = ভাবী। তেমনি: স্থায়ী, পায়ী, বাদী, জয়ী, গামী ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: রসের সঙ্গে কাজের **বন্দীর** পরিচয় পরিণয় ঘটাবার কি আশা নেই [শিল্পের অধিকার]? সুখী নহি, তাত, অন্ধ, আমি **জয়ী** [গান্ধারীর আবেদন]।

—শানচ্ [মান]: বৃধ্ + শানচ্ = বর্ধমান, মৃ + শানচ্ = ম্রিয়মাণ, বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান। তেমনি: শয়ান, আসীন, বিদ্যমান, ধাবমান, উদীয়মান, বিরাজমান, আবহমান ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: এমন কোনও জ্ঞান দেশে **বিদ্যমান** ছিল না [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ **ধাবমান** হইয়া, তাহাকে, বৃক্ষ হইতে অবতারণপূর্বক, স্কন্ধে করিয়া, সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে চলিলেন [বীরবর কাহিনী]। গাড়োয়ান বেচারার মুখখানি **ম্রিয়মাণ** [ভিখারী সাহেব]।

—ক্তিন্ [তি]: গম্ + ক্তিন্ = গতি, ভী + ক্তিন্ = ভীতি, ভজ্ + ক্তিন্ = ভক্তি। তেমনি: শান্তি, শ্রান্তি, শক্তি, উক্তি [= বচ্ + ক্তিন্], বুদ্ধি, নীতি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: সে সকল সর্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধো**গতির** কারণ হয় [বীরবর উপাখ্যান]। নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের **বুদ্ধি** [মনুষ্যফল]। এখন ভারি **বিরক্তি** বোধ হইতে লাগিল [ভিখারী সাহেব]। কিন্তু কেহ ভূতের **সৃষ্টি** করিয়াছেন, তাহা শুনি নাই [উত্তাপের অপচয়]।

—তৃচ্ [তা]: দা + তৃচ্ = দাতা, নী + তৃচ্ = নেতা, ধৃ + তৃচ্ = ধাতা, কৃ + তৃচ্ = কর্তা। তেমনি: হর্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা, বক্তা, হন্তা, যোদ্ধা, ক্রেতা, বিজেতা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: হেনরি যে আমার প্রাণাধিকা কন্যার **জীবন-দাতা**! উহার ফাঁসি হইবে [ভিখারী সাহেব]? এত বড় ভুল কেবল সেই মানুষই করে যে নিজের দোষে নিজে বঞ্চিত হয়ে **বিধাতাকে** দেয় গঞ্জনা [শিল্পের অধিকার]। সৃষ্টি যা, **সৃষ্টিকর্তার** কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলো না [শিল্পের অধিকার]।

—ক্বিপ্: গম্ + ক্বিপ্ = জগৎ, বি-দ্যুৎ + ক্বিপ্ = বিদ্যুৎ, সভা-সদ্ + ক্বিপ্ =

সভাসদ্, উৎ-ভিদ্+ক্বিপ্=উদ্ভিদ্। তেমনি : বিপদ্, তৃষ্ণা, সম্রাট্, পথিকৃৎ, ইন্দ্রজিৎ, শত্রুজিৎ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : শেষ পর্যন্ত জগতে বর্তমান সমস্ত তাপ একাকার উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে [উত্তাপের অপচয়]। রসের **তৃষ্ণা** শিল্পের ইচ্ছা যার জাগবে, সে তো কোনো আয়োজনের অপেক্ষা করবে না [শিল্পের অধিকার]।

● বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

—**অন্ত** : চল্+অন্ত=চলন্ত, ফুট্+অন্ত=ফুটন্ত, বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত। তেমনি : ফলন্ত, পড়ন্ত, ঝুলন্ত, ডুবন্ত, ঘুমন্ত, জলন্ত ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **জলন্ত** অঙ্গারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন আগুন জলিতেছে [অগ্রদানী]। মনে কর, এক সের **ফুটন্ত** জল আছে [উত্তাপের অপচয়]।

—**অন** : নড়্+অন=নড়ন, বাঁচ্+অন=বাঁচন, বাঁধ্+অন=বাঁধন। তেমনি : কাঁদন, ধরন, গড়ন, চলন, বলন, সাধন, কাঁপন ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : রচে না কোলে **ঝুলন**-দোলে মিলন-প্রেমানন্দহার [বৃন্দাবন অন্ধকার]। সহসা হেরিনু দূরে একধারে **দোলন**-চাঁপার-সনে [বাংলার ফুল]। **পরনে** গরদের কাপড় [একাদশী বৈরাগী]।

—**অনা**,-**না** : লাঞ্ছ্+অনা=লাঞ্ছনা, গঞ্জ্+অনা=গঞ্জনা, বাজ্+না=বাজনা, কাঁদ্+না=কান্না। তেমনি : ঝুলনা, ঝরনা, রান্না, খেলনা, ঢাকনা, দোলনা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **ছলনায়** ভুলে চেয়ে থাকি শুধু শুনে সে করুণ কথা [বাংলার ফুল]। হঁ, ঠাকুর, কি **রান্না** হয়েছে আজ [অগ্রদানী]? কাজের জগতের মধ্যেই রস ঝরছে—আনন্দের **ঝরনা** [শিল্পের অধিকার]। **বাজনা**-বাদ্যি সে মোটেই সয়না [শিল্পের অধিকার]। ইন্দ্রনীল মণির **ঢাকনা** দিয়ে ঢাকা এই প্রকাণ্ড রসের পেয়ালা [শিল্পের অধিকার]।

—**নি**, -**অনি**, -**উনি** : ছাঁক্+নি=ছাঁকনি, চাট্+নি=চাটনি, নাচ্+অনি [উনি]=নাচনি [নাচুনি], কাঁদ+অনি [উনি]=কাঁদনি [কাঁদুনি]। তেমনি : গাঁথুনি, চালুনি, কাঁপুনি, বকুনি, রাঁধুনি, চাহনি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : একখানা করে লুচি এই **চালুনের** [চালুনি] মতো [অগ্রদানী]।

—**আনি** : পার্+আনি=পারানি, রাঙ্+আনি=রাঙানি, ভাঙ্+আনি=ভাঙানি। তেমনি : ঝলকানি, শাসানি, জালানি, হাঁপানি, ঝলসানি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : লম্বা ছুটি পাওয়া গেলো—রসের পেয়ালাটার **তলানি** পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার [শিল্পের অধিকার]।

—**আ** : বাঁচ্+আ=বাঁচা, রাঁধ্+আ=রাঁধা, কাঁদ্+আ=কাঁদা, সাধ্+আ=সাধা, য+আ=যাওয়া [য়-শ্রুতি]। তেমনি : হাসা, নাচা, ভরা, মরা, ঝরা, খেলা, শোনা, দেখা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : তাঁত-**বোনা** মাকু-**ঠেলার** কাজ ছাড়লে কবীরের পেট **চলা** দায় হত [শিল্পের অধিকার]। **ঢাকা** খোলার বাধা কি [শিল্পের অধিকার] ?

—আনো : জাল্ + আনো = জ্বালানো, বাঁধ্ + আনো = বাঁধানো, শান্ + আনো = শানানো। তেমনি : হাসানো, বাড়ানো, কমানো, হারানো, বাঁচানো ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : একটা আগড় দিয়া কোনোরূপে **আগলানো** আছে [অগ্রদানী]। একটি আলো থেকে **জ্বালানো** হাজার প্রদীপ [শিল্পের অধিকার]।

—আই : বাছ্ + আই = বাছাই, যাচ্ + আই = যাচাই, বাঁধ্ + আই = বাঁধাই। তেমনি : ঝাড়াই, খোদাই, ঢালাই, লড়াই, ছাঁটাই ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এমনকি বিধাতার নির্মিতির ছাঁচে **ঢালাই** হয়ে যা বার হল তা আসলে নকল বই আর তো কিছুই হলনা [শিল্পের অধিকার]।

● সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়

তদ্ধিত-প্রত্যয় : শব্দ বা নাম-প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন নতুন প্রাতিপদিক গঠিত হয়, তাকে তদ্ধিত-প্রত্যয় বলা হয়। যেমন : ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণিক, আলি, আই ইত্যাদি।

—ষ্ণ [অ] : ১. অপত্য অর্থে : কুরু + ষ্ণ = কৌরব, পাণ্ডু + ষ্ণ = পাণ্ডব। তেমনি : রাঘব, পার্থ, মানব, সৌমিত্র, পৌত্র ইত্যাদি।

২. সম্বন্ধ অর্থে : পৃথিবী + ষ্ণ = পার্থিব, হেম + ষ্ণ = হৈম। তেমনি : বাস্তব, প্রাকৃত, সৌর, চান্দ্র, দৈব ইত্যাদি।

৩. উপাসক অর্থে : শিব + ষ্ণ = শৈব, বিষ্ণু + ষ্ণ = বৈষ্ণব। তেমনি : শাক্ত, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, সারস্বত, সৌগত ইত্যাদি।

৪. জাত অর্থে : পঞ্চাল + ষ্ণ = পাঞ্চাল, নিশা + ষ্ণ = নৈশ। তেমনি : শারদ, ভৌম, মাধব, মানস ইত্যাদি।

৫. নৈপুণ্য অর্থে : ব্যাকরণ + ষ্ণ = বৈয়াকরণ; স্মৃতি + ষ্ণ = স্মার্ত।

৬. ভাব অর্থে : শিশু + ষ্ণ = শৈশব, মুনি + ষ্ণ = মৌন। তেমনি : কৈশোর, যৌবন, পৌরুষ, কৌতূহল, ঐশ্বর্য ইত্যাদি।

৮. বিকার অর্থে : তিল + ষ্ণ = তৈল, পয়ঃ + ষ্ণ = পায়স।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ছিনু সুখে, যবে একত্রে আছিনু বদ্ধ **পাণ্ডবে কৌরবে** [গান্ধারীর আবেদন]। ক্ষুদ্র জনে বলভাগ করে লয়ে **বান্ধবের** সনে রহে বলী [ঐ]। আর একজন **পারিষদ্** বলিল, গঙ্গা গঙ্গা বলে বসে পড় চক্রবর্তী [অগ্রদানী]। ছবি দেখিয়া এবং ছবির নিম্নস্থ বিবরণ পড়িয়া সে **মৌন** হইয়া রহিল [ভিখারী সাহেব]।

—ষ্ণ্য [য] **:** দরিদ্র + ষ্ণ্য = দারিদ্র্য, ঈশ্বর + ষ্ণ্য = ঐশ্বর্য, গম্ভীর + ষ্ণ্য = গাম্ভীর্য। তেমনি : ঔৎসুক্য, আতিথ্য, গৌরব, বাহুল্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চাঞ্চল্য, প্রাবল্য ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: **দারিদ্র্যের** শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে **জীর্ণ** করিতে পারে নাই [অগ্রদানী]। স্বর্গের **ঐশ্বর্য** আছে, রসাতলের **গাম্ভীর্য** আছে [শিল্পের অধিকার] বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল [বাহিরে যাত্রা]। আমি মনে করিলাম, হেনরি **আতিথ্যের** উল্লেখ করিতেছে [ভিখারী সাহেব]।

—ষ্ণিক [ইক]: অহন্ + ষ্ণিক = আহ্নিক, বিজ্ঞান + ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক। তেমনি: স্বাভাবিক, আধুনিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, পৌরাণিক, পারিশ্রমিক, দার্শনিক, রাসায়নিক ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: চাকরের কাছে শুনিয়া সে **আহ্নিক** ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে [একাদশী বৈরাগী]। যাঁহাদের নাম **বৈজ্ঞানিক**, তাঁহারা সম্প্রতি প্রশ্ন তুলিয়াছেন [উত্তাপের অপচয়]। ইহাকে তাপের **স্বাভাবিক** প্রবৃত্তি বা প্রবণতা বলিলেও চলে [ঐ]।

—ষ্ণেয় [এয়]: বিমাতা + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়, গঙ্গা + ষ্ণেয় = গাঙ্গেয়। তেমনি: কৌন্তেয়, ভাগিনেয়, পৌরুষেয়, আগ্নেয়, আতিথেয় ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: তাহার একমাত্র **বৈমাত্রেয়** ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে [একাদশী বৈরাগী]।

—ষ্ণীয় [ঈয়]: বাষ্প + ঈয় = বাষ্পীয়, স্ব + ঈয় = স্বীয়, দেশ + ঈয় = দেশীয়। তেমনি: সম্বন্ধীয়, জাতীয়, বংশীয়, বঙ্গীয়, ভারতীয়, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: মনে কর বর্তমান কালের স্টীম এঞ্জিন বা **বাষ্পীয়** যন্ত্র [উত্তাপের অপচয়]। **স্বীয়** অভিপ্রায় আপনকার গোচর করিতে চায় [বীরবর কাহিনী]।

—বতুপ্, মতুপ্ [বান্, মান্]: মূল্য + বতুপ্ = মূল্যবান্, জ্ঞান + তুপ্ = জ্ঞানবান। তেমনি: ধীমান্, বুদ্ধিমান্, আয়ুষ্মান্, শ্রীমান্, বিদ্যাবান্ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: লোকটার পরিচ্ছদ একটু **মূল্যবান্**, কিন্তু খুব পুরাতন সিল্ক হ্যাট [ভিখারী সাহেব]। বৃথা এ সাধনা, **ধীমান্** [মেঘনাদবধ]।

—ময়ট্ [ময়]: গুণ + ময় = গুণময়, কৃপা + ময় = কৃপাময়। তেমনি: জ্যোতির্ময়, শিলাময়, মৃন্ময়, হিরণ্ময়, অগ্নিময়, মণিময় ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর **অগ্নিময়** গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে [ঔরংজীব ও জাহানারা]। কেমন **জ্যোতির্ময়** রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে [মনুষ্য-ফল]।

—বিন্ [বী]: মনঃ + বিন্ = মনস্বী, তেজঃ + বিন্ = তেজস্বী, মেধা + বিন্ = মেধাবী। তেমনি: মায়াবী, যশস্বী, তপস্বী, ওজস্বিনী [স্ত্রী], স্রোতস্বিনী [স্ত্রী]।

বিশিষ্ট প্রয়োগ: লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় প্রতিভাশালী ও **মনস্বী** গভর্নর-জেনারেল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]।

—**তা** : প্রবল+তা=প্রবলতা, অচল+তা=অচলতা, অজ্ঞ+তা=অজ্ঞতা। তেমনি : স্নিগ্ধতা, শূন্যতা, মানবতা, জটিলতা, পরিপূর্ণতা, মমতা, বিশ্বাসঘাতকতা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : রাজা, এইরূপে, বীরবরের সপরিবারে প্রভুভক্তির **প্রবলতা** ও **অচলতা** দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি চমকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন [বীরবর কাহিনী]। অনেক সময়ে **অজ্ঞতা**বশতঃ উৎকোচজীবী নিম্নতম কর্মচারীদের আশ্রয় লইতেন [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]।

—**ত্ব** : তৎ+ত্ব=তত্ত্ব, মহৎ+ত্ব=মহত্ত্ব, মনুষ্য+ত্ব=মনুষ্যত্ব। তেমনি : সত্ত্ব, স্বত্ব, রাজত্ব, কৃতিত্ব, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, দেবত্ব, পশুত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্ব, প্রভুত্ব, কবিত্ব ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : শুধু শিল্পের ইতিহাস **তত্ত্ব** প্রবন্ধ কিংবা পোস্টার ও পোস্টেজ দেবার কাজে আসে [শিল্পের অধিকার]। এ ব্যক্তি যেন······সমস্ত **মনুষ্যত্বকে** নিঙ্‌ড়াইয়া বিসর্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে [একাদশী বৈরাগী]।

—**ইন্** [ঈ] : জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানী, বৈরাগ+ইন্=বৈরাগী, কৌতূহল+ইন্=কৌতূহলী। তেমনি : গুণী, ফণী, সুখী, মানী, বুদ্ধিজীবী, অপরাধী, বহুমুখী ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : **জ্ঞানী** লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া অপূর্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। [একাদশী বৈরাগী]। বাংলার **বুদ্ধিজীবীরাও** এ-সম্বন্ধে যে চেতনার পরিচয় দিচ্ছেন, তা ক্ষীণ [বাংলার নব জাগরণের সূচনা]।

—**ঈন** : নব+ঈন=নবীন, প্রাচ্+ঈন=প্রাচীন, কাল+ঈন=কালীন। তেমনি : সার্বজনীন, সম্মুখীন, আভ্যন্তরীণ, কুলীন, সর্বাঙ্গীণ, শালীন ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ওরে **নবীন**, ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা [সবুজের অভিযান]। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে **কুলীন** ব্রাহ্মণেরা [মনুষ্য-ফল]।

—**ইমন্** [ইম] : মহৎ+ইমন্=মহিমা [+আ]। তেমনি : চন্দ্রিমা, লঘিমা, গরিমা, নীলিমা, রক্তিমা, কালিমা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ক্ষত্রিয়**মহিমা**সূর্য উঠে আর নামে [গান্ধারীর আবেদন]।

—**ইল** : পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল, কুট+ইল=কুটিল, সর্প+ইল=সর্পিল। তেমনি : শঙ্কিল, জটিল, ফেনিল, পিচ্ছিল ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : যায় কি সে কভু, প্রভু, **পঙ্কিল** সলিলে [মেঘনাদবধ]। তেওয়ারি অপ্রসন্ন **কুটিল** দৃষ্টিতে ভিখারী সাহেবের পানে চাহিয়া রহিল [ভিখারী সাহেব]।

—**ইত** : ঘর্ঘর+ইত=ঘর্ঘরিত, অপমান+ইত=অপমানিত। তেমনি : পালিত, ক্ষুধিত, পল্লবিত, মর্মরিত, লজ্জিত ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : তার রথচক্রধ্বনি দূর রুদ্রলোক হতে **বজ্রঘর্ঘরিত** ওই শুনা যায় [গান্ধারীর আবেদন]। **অপমানিতের** করে ক্ষমতার অস্ত্র দেওয়া মরিবার তরে [গান্ধারীর আবেদন]।

—তন : সনা+তন=সনাতন, পুরা+তন=পুরাতন, চিরম্+তন=চিরন্তন। তেমনি : নূতন, সায়ন্তন, অদ্যতন, পূর্বতন, প্রাক্তন, অধুনাতন, অধস্তন ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব **সনাতন** হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল [একাদশী বৈরাগী]। লোকটার পরিচ্ছদ একটু মূল্যবান, কিন্তু **পুরাতন** সিল্ক হ্যাট [ভিখারী সাহেব]।

—ম : আদি+ম=আদিম, মধ্য+ম=মধ্যম, অধঃ+ম=অধম। তেমনি : পরম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : রসকে পাওয়ার জন্যে আয়োজনের এতটুকু অভাব যে আছে তা খুব একেবারে **আদিম** অবস্থাতে। বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে **পরম** পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন [বীরবর কাহিনী]।

—চিৎ : কদা+চিৎ=কদাচিৎ, ক+চিৎ=কচিৎ, কিম্+চিৎ=কিঞ্চিৎ। তেমনি : কথঞ্চিৎ, কশ্চিৎ ইত্যাদি।

—সাৎ : ধূলি+সাৎ=ধূলিসাৎ, ভূমি+সাৎ=ভূমিসাৎ। তেমনি : ভস্মসাৎ, আত্মসাৎ, উদরসাৎ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : তবে ত এই সুবিপুল সুখময় জনসমাজস্বরূপ অট্টালিকা দুইদিনে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া **ধূলিসাৎ** হইয়া যায় [ভিখারী সাহেব]। নহিলে শৃগালেরা কোনমতে **উদরসাৎ** করিবে [মনুষ্য-ফল]।

—চ্বি : ঘন+চ্বি+ভূত=ঘনীভূত, রাশি+চ্বি+কৃত=রাশীকৃত। তেমনি : স্তূপীকৃত, অঙ্গীভূত, বাষ্পীভূত, ভস্মীভূত, দূরীভূত, মন্দীভূত, স্বীকৃত, সমীকরণ ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের **অঙ্গীভূত** করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই [একাদশী বৈরাগী]। বাড়তি পাতাটিতে অন্নব্যঞ্জন মাছ **স্তূপীকৃত** হইয়া আছে [অগ্রদানী]।

স্বার্থিক প্রত্যয় : দেব+তা=দেবতা।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : তাহার ভাগ্যদেবতা তাহার হারানো মানিক [অগ্রদানী]!

● বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় :

—আ : একতার+আ=একতারা, বাস+আ=বাসা, চাঁদ+আ=চাঁদা। তেমনি : পাতা, চাষা, হাতা, পশ্চিমা, দক্ষিণা, চীনা, ভয়সা [< মহিষ+আ] ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : কাগজ আর কলম, কিংবা তাও নয়—**একতারা** কি বাঁশী [শিল্পের অধিকার]। আমার কাছে আবার **চাঁদা** কেন [একাদশী বৈরাগী]। কিন্তু **পাতা** অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি [অগ্রদানী]।

—ই, ঈ : ভার+ই=ভারি, চৈত+ঈ=চৈতী, তাঁত+ঈ [ই]=তাঁতী,

[তাঁতি]। তেমনি : বেশী, খুশী, বেনারসী, বিদেশী, দেশী, রেশমী, বিলাতী, কাশ্মীরী ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ফুরফুর করিয়া প্রাণ কাড়িয়া-নেওয়া **চৈতী** হাওয়া বহিতেছে [ভিখারী সাহেব]। তাহা হইলে আপনি **ভারি** বিপদে পড়িয়াছেন [ভিখারী সাহেব]।

—আই : ঢাকা + আই = ঢাকাই, মোগল + আই = মোগলাই, কান [<কৃষ্ণ] + আই = কানাই। তেমনি : বলাই, নিমাই, নিতাই, মিঠাই, খাড়াই, বোঝাই, চোরাই, কামাই ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : সেজন্যে সেকালে কাজেরও **কামাই** হয়নি [শিল্পের অধিকার]। দিল্লীর বাদশার **মেঠাই**ওয়ালার ফতুর হবার যোগাড় হল [শিল্পের অধিকার]। সে সতৃষ্ণ নয়নে **কড়াইয়ের** পাকের দিকে চাহিয়া রহিল [অগ্রদানী]।

—মি, আমি, আমো : পাকা + মি = পাকামি, ভণ্ড + আমি = ভণ্ডামি, পাগল + আমো = পাগলামো। তেমনি : জ্যাঠামি, জ্যাঠামো, বাঁদরামি, বাঁদরামো, দুষ্টুমি, পাগলামি, পাকামি, পাকামো, গোঁড়ামি, গুণ্ডামি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এ সব কি **বাঁদরামি** হচ্ছে [একাদশী বৈরাগী] ? **পাগলামি**, তুই আয়রে দুয়ার ভেদ [সবুজের অভিযান]।

—আর : কাম + আর = কামার, চাম + আর = চামার, ভাঁড় + আর = ভাঁড়ার। তেমনি : মাঝার, কুমার ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : লোভী **চামারের** ছেলে চাষাও যে হয়েছে, সেটুকুও ভাগ্যি মেনো [অগ্রদানী]।

—আরি, আরী : ভিখ্ + আরী = ভিখারী, কাঁসা + আরি = কাঁসারি। তেমনি : শাখারী, পূজারী, ঝিয়ারী, দিশারী, মাঝারি, কাটারি, ভুখারি, রকমারি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : আমরা কি **ভিখারী** যে দু' কোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেছি [একাদশী বৈরাগী]। এই শহরের মধ্যেই এখনো তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায়—**কাঁসারিপাড়া** পোটোতলা কুমরটুলি বাক্সপটি ইত্যাদি [শিল্পের অধিকার]।

—আরু : বোমারু, দিশারু, শশারু, সজারু, গোরু ইত্যাদি।

—আল, আলো : গো + আল = গোয়াল, লাঠি + আল = লাঠিয়াল, আঠা + আলো = আঠালো। তেমনি : কবিয়াল, আড়াল, দাঁতাল, পাঁকাল, রসাল, বাচাল, বঙ্গাল, চাঁড়াল, জোরালো, জমকালো, তেজালো, রসালো ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ফুলের পরিমল, ভিজে মাটির সৌরভ বাতাসকে **মাতাল** করে ছেড়ে দিল [শিল্পের অধিকার]।

—আলি, আলী : সোনা + আলী = সোনালী, রূপা + আলী = রূপালী। তেমনি : ঠাকুরালি, মিতালি, পুবালি, চৈতালী, দীপালী, ঘটকালি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : জীবজগৎটাকে **সোনালী রূপালী** মাছের মতো একটা আশ্চর্য গোলকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই তাঁর শিল্প-ইচ্ছার শেষ হয়ে গেলো [শিল্পের অধিকার]।

—ইয়া, এ : শহর+ইয়া=শহরিয়া>শহুরে, সেকাল+ইয়া=সেকালিয়া> সেকেলে। তেমনি : মুটিয়া>মুটে, মাটিয়া>মেটে, নাইয়া>নেয়ে, জালিয়া>জেলে, বালিয়া>বেলে ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : যাহাদিগকে চালাঘরে বসিয়া, **মুঙ্গেরে** পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাহাদের কি যন্ত্রণা [মনুষ্য-ফল]!

—উয়া, ও : ভাত+উয়া=ভাতুয়া>ভেতো, বাত+উয়া=বাতুয়া>বেতো। তেমনি : জলো, খড়ো, এখো, বেনো, গুঁফো, ঝড়ো, মেঠো, কেঠো, পটো ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ঝুনোর বেলায় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য [মনুষ্য-ফল]। এখনো তেমন সব পাড়া খুঁজলে পাওয়া যায় কাঁসারিপাড়া **পোটোতলা** কুমরটুলি বাহ্মপটি ইত্যাদি [শিল্পের অধিকার]।

—উ, উক : দুষ্ট+উ=দুষ্টু, কান [<কৃষ্ণ]+উ=কানু, পেট+উক=পেটুক। তেমনি : ভাবুক, লাজুক, মিশুক, চুমুক, চুমু, নীচু, আগু, পিছু, উঁচু, সাঁতারু ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : মাছগুলো বেশ **তেলুক তেলুক** ঠেকছে [অগ্রদানী]! আচ্ছা **পেটুক** ঠাকুর যা হোক [অগ্রদানী]!

—ক, কা, কি : গোল+ক=গোলক, দম+কা=দমকা, মুড়+কি=মুড়কি। তেমনি : তিলক, পলক, ঝলক, মোড়ক, ঢোলক, বোঁটকা, ঝটকা, হুমকি, ইয়ারকি, ফুলকি, চুটকি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : নতুন নতুন আলোর **ফুলকি** দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চললো [শিল্পের অধিকার]। জীবজগৎটাকে সোনালী রূপালী মাছের মতো একটা আশ্চর্য **গোলকের** মধ্যে ছেড়ে দেওয়াতেই তাঁর শিল্প-ইচ্ছার শেষ হয়ে গেলো [শিল্পের অধিকার]।

—ল, লা : শীত+ল=শীতল ; এক+লা=একলা। তেমনি : হিমল, হাতল, দীঘল, আদল, পাতলা, আধলা, মেঘলা, জটলা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ঘাটে **একলা** বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি [বাহিরে যাত্রা]। যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ-বরফ দিও—বড় **শীতল** হইবে [মনুষ্য-ফল]।

—পনা : গুণ+পনা=গুণপনা, গৃহিণী+পনা=গৃহিণীপনা। তেমনি : দুরন্তপনা, বীরপনা, বেহায়াপনা, হ্যাংলাপনা, ছ্যাঁচড়াপনা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসেনা [মনুষ্য-ফল]। দু'টা পয়সা হকের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি **ছ্যাঁচড়াপনাই** না করতে হয় [একাদশী বৈরাগী]?

—**পানা, পারা**ঃ চাঁদ+পানা=চাঁদপানা, কালো+পানা=কালোপানা, পাগল+পারা=পাগলপারা। তেমনি : লম্বাপানা, হাঁড়িপানা, যোগিনীপারা ইত্যাদি।

—**তা, তি**ঃ নুন+তা=নোনতা, চাক+তি=চাকতি। তেমনি : রাঙতা, নামতা, পান্তা, ভাঙ্‌তি, বর্ষাতি, বাড়তি ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ নইলে **নোন্তা** ঝাল লেগে খারাপ লাগবে খেতে [অগ্রদানী]।

—**বন্ত, মন্ত**ঃ গুণ+বন্ত=গুণবন্ত, শ্রী+মন্ত=শ্রীমন্ত। তেমনি : লক্ষ্মীমন্ত, ভাগ্যবন্ত, পয়মন্ত।

● **বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয়**ঃ

—**ওয়ান**ঃ কোচ+ওয়ান=কোচোয়ান, গাড়ী+ওয়ান=গাড়োয়ান। তেমনি : দারোয়ান, পালোয়ান ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ **গাড়োয়ান** বেচারার মুখখানি ম্রিয়মাণ [ভিখারী সাহেব]।

—**আনা, আনি**ঃ তল+আনি=তলানি, বাবু+আনি=বাবুয়ানি, বিবি+আনা=বিবিয়ানা। তেমনি : আমানি, হিঁদুয়ানি, কাতরানি, নাকানি, চোবানি, মালিকানা, মুন্‌শিয়ানা, সাহেবিয়ানা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ লম্বা ছুটি পাওয়া গেল—রসের পেয়ালাটার **তলানি** পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবার [শিল্পের অধিকার]।

—**ওয়ালা**ঃ কাবুলি+ওয়ালা=কাবুলিওয়ালা, রিকশা+ওয়ালা=রিকশা-ওয়ালা। তেমনি : ফলওয়ালা, ফেরিওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, বাঁশীওয়ালা, উপরওয়ালা, দইওয়ালা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ দিল্লীর বাদশার **মেঠাইওয়ালাও** ফতুর হবার যোগাড় হল [শিল্পের অধিকার]।

—**বাজ, বাজি**ঃ চাল+বাজ=চালবাজ, গলা+বাজি=গলাবাজি। তেমনি : মামলাবাজ, বক্তৃতাবাজ, মতলববাজ, ধাপ্পাবাজি, ফাঁকিবাজি ইত্যাদি।

—**খানা**ঃ ডাক্তার+খানা=ডাক্তারখানা, চিড়িয়া+খানা=চিড়িয়াখানা। তেমনি : বৈঠকখানা, ছাপাখানা, জেলখানা, কারখানা, কবরখানা, মুদিখানা ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ অনাবশ্যক রঙ-তুলির **কলকারখানা**, দোয়াত-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না [শিল্পের অধিকার]।

—**খোর**ঃ সুদ+খোর=সুদখোর, গাঁজা+খোর=গাঁজাখোর। তেমনি : সিদ্ধিখোর, গুলিখোর, চশমখোর, মুনাফাখোর, ঘুষখোর, আফিমখোর ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগঃ যে **গাঁজাখোরের** গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে **সিদ্ধিখোরের** সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয় [মনুষ্য-ফল]।

—**গর**ঃ কারি+গর=কারিগর, সওদা+গর=সওদাগর। তেমনি : বাজিকর, হালুইকর ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : এদেশে প্রায় সব তীর্থস্থানগুলোর লাগাও রকম-রকম **কারিগরের** এক-একটি পাড়া আছে [শিল্পের অধিকার]।

—দান, দানি : আতর+দান=আতরদান, পিক+দানি=পিকদানি। তেমনি : বাতিদান, কলমদান, ফুলদানি, ধূপদানি, ছাইদানি ইত্যাদি।

—গিরি : বাবু+গিরি=বাবুগিরি, কেরানী+গিরি=কেরানীগিরি। তেমনি : গোয়েন্দাগিরি, দারোগাগিরি ইত্যাদি।

—দার, দারি : দোকান+দার=দোকানদার, ব্যবসা+দারি=ব্যবসাদারি। তেমনি : চৌকিদার, দাবীদার, খরিদদার, মজুতদারি, ফৌজদারি, হাবিলদার, পাওনাদার, হুকুমদার, অংশীদার, পোদ্দার [পোত+দার], মজাদার, ইজারাদার, দখলদার, বাজনদার ইত্যাদি।

বিশিষ্ট প্রয়োগ : ইহার প্রধান কাজ, নিজের **জমিদারীভুক্ত** দীন-দুঃখী প্রজাদের রোগ হইলে চিকিৎসা করিয়া বেড়ানো [ভিখারী সাহেব]।

—নবিশ : শিক্ষা+নবিশ=শিক্ষানবিশ, হিসাব+নবিশ—হিসাবনবিশ। তেমনি : নকলনবিশ, পত্রনবিশ, জমানবিশ ইত্যাদি।

—সই : মাপ+সই=মাপসই, টেক+সই=টেকসই। তেমনি : মানানসই, প্রমাণসই, দশাসই, গলাসই ইত্যাদি।

—ন্দাজ : তীর+ন্দাজ=তীরন্দাজ, গোলা+ন্দাজ=গোলন্দাজ। তেমনি : বরকন্দাজ।

॥ অনুসরণী ॥

১. প্রত্যয় কাহাকে বলে ? প্রত্যয় কয় প্রকার ও কি কি ? দুইটি করিয়া উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২. কৃৎ-প্রত্যয় কাহাকে বলে ? দুইটি সংস্কৃত ও দুইটি বাংলা কৃদন্ত শব্দ দ্বারা মোট চারিটি বাক্য রচনা কর। মা. '৬২

৩. কৃৎ বা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া তদনুযায়ী যে-কোন চারিটি বাংলা কৃদন্ত বা সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ গঠিত কর। উ. মা. '৬৯

৪. তদ্ধিত ও কৃৎ-প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। খাঁটি বাংলা ও সংস্কৃত উভয়বিধ কৃৎ ও তদ্ধিতের উদাহরণ দাও। মা. '৫৫, '৫৮ ; উ. মা. '৬০, '৬২, '৬৭

৫. নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ নির্দেশ কর : ইমন্ ত্ব, মৎ, গিরি, ওয়ালা, আনি, উয়া, অন্ত, আ ; উ. মা. '৬৪। ক্তি, তৃচ্, ইত, ইন্, উয়া, অন্ত, আলি, পনা ; উ. মা. '৬৬। ইল, ঈয়স্, তন্, ইমন্, গিরি, দান, বিন্, তা ; উ. মা. '৬৭। খোর, দার, বাজ, ইমন্, পনা, খানা, গিরি ; উ. মা. '৬৯ [কম্পার্ট.]।

৬. নিম্নলিখিত পদগুলিতে কি কি প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে, বিশ্লেষ করিয়া দেখাও : বর্ধমান, গুণগ্রাহী, বিপ্রদাস, বৈষ্ণব, দুঃখী, আহ্বান, পুত্র, ঔদার্য, গাড়োয়ান, মূল্যবান, পুরাতন, আদিম, বাস্তবিক, দণ্ডনীয়, তৃষ্ণা, জগৎ, পাগলামি, বর্তমান, স্বর্ণ, বিদ্যুৎ, উৎপন্ন, দাতা, জীর্ণ, সনাতন, রক্ত, জিজ্ঞাসা, বাঞ্ছনীয়, সাহিত্যিক, দারিদ্র্য, গৃহিণীপনা, মাদকতা, পরিত্যাগ, হরণ, জাতীয়, তৎকালীন, বিদ্যমান, আসীন, উপসর্গ, বাদশাহি, কাঁসারি, সোনালী, ফুলকি, ঝরণা, গোলক, লোভী, দেবতা, সৌর, জাহ্নবী, নবীন, পোড়ো, ধীমান্, সৌমিত্রি, রাবণি, অনুজ, দণ্ডী, আরূঢ়, মাস্তার, ফলক, মূঢ়, দানব, মানব, অন্তিম, পাণ্ডব, কৌরব, পিতামহ, নারায়ণ, শুদ্ধসত্ত্ব, গৌরব।

৭. কারণ দেখাইয়া অশুদ্ধি সংশোধন কর : ভৌগলিক, মহত্ব, মৃয়মাণ, অপকর্ষতা ; উ. মা. '৬১। লক্ষ্মণীয়, সত্ত্বা, ভৌগলিক, ঐকামত, নিশ্চয়তা, বৈশিষ্ট ; উ. মা. '৬৪।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ উপসর্গ

'উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে, নতুন শব্দ তৈরী করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।'
—রবীন্দ্রনাথ

'উপসর্গ' কথাটির মূল অর্থ 'উপসৃষ্টি'। উপসর্গের সাহায্যে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যে সব অব্যয় শব্দ ধাতুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐ ধাতুর নানা অর্থের সৃষ্টি করে, তাদের বলা হয় **উপসর্গ**।

সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গ আছে : প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। পাণিনির মতে, উপসর্গ কুড়ি নয়, বাইশ। অতিরিক্ত দুটি হলো : নিস্ ও দুস্। তাছাড়া, আরো কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয় উপসর্গ-রূপে ব্যবহৃত হয়। তারা হলো : অন্তঃ, আবিঃ, পুরঃ, তিরস্, পূর্ব, প্রাদুঃ, বহিঃ, সাক্ষাৎ, অলম্।

বাংলারও নিজস্ব কতকগুলি উপসর্গ আছে। সেগুলি হলো : অ, অনা, আ, দর, নি, পাতি, বে, বি, ভর, ভরা, রাম, স, হা। আর আছে কতকগুলি বিদেশী উপসর্গ। যেমন : ফি, হর, গর, হেড্, না, ব, বে, বদ্, ফুল, হাফ, সব, নিম্, বর, কার, খাস, খোস ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যোগে কিভাবে একই ধাতু থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ গঠিত হয় এবং তাদের অর্থান্তর ঘটে, তার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো :

● সংস্কৃত **√হৃ** [মূল অর্থ—হরণ করা] ধাতু : √হৃ+ঘঞ্=হার [মালা, ভাগ]।

আ-হৃ+ঘঞ্=**আহার** [ভোজন]; **বি**-হৃ+ঘঞ্=**বিহার** [ভ্রমণ]; **প্র**-হৃ+ঘঞ্=**প্রহার** [আঘাত]; **বি-অব**-হৃ+ঘঞ্=**ব্যবহার** [আচরণ]; **অব**-হৃ+ঘঞ্=**অবহার** [বাট্টা]; **অপ-বি-অব**-হৃ+ঘঞ্=**অপব্যবহার** [ভুল প্রয়োগ]; **সম্**-হৃ+ঘঞ্=**সংহার** [হত্যা]; **সম্-আ**-হৃ+ঘঞ্=**সমাহার** [সমষ্টি]; **পরি**-হৃ+ঘঞ্=**পরিহার** [পরিত্যাগ]; **প্রতি**-হৃ+ঘঞ্=**প্রতিহার** [দৌবারিক]; **বি-অতি**-হৃ+ঘঞ্=**ব্যতিহার** [বিনিময়]; **নি**-হৃ+ঘঞ্=**নিহার, নীহার** [বরফ]; **অধি**-হৃ+ঘঞ্=**অধিহার** [অতিরিক্ত মূল্য]; **উৎ**-হৃ+ঘঞ্=**উদ্ধার** [মুক্তি]; **উপ**-হৃ+ঘঞ্=**উপহার** [উপঢৌকন]; **উপ-সম্**-হৃ+ঘঞ্=**উপসংহার** [পরিসমাপ্তি]।

১. সংস্কৃত উপসর্গ :

প্র—প্রশংসা, প্রগাঢ়, প্রগতি, প্রভূত, প্রহার, প্রকাশ, প্রচ্ছদ, প্রণাম, প্রণতি। **পরা**—পরাক্রম, পরাজয়, পরাভব, পরামর্শ। **অপ**—অপমান, অপচয়, অপবাদ, অপযশ, অপহরণ, অপকার, অপকর্ষ, অপরাধ। **সম্**—সম্ভাষণ, সম্মুখ, সম্মান, সম্ভার, সম্মিলন, সংবাদ, সঞ্চয়, সংকলন, সংকট, সংকীর্ণ, সংগীত, সংস্কার, সংস্কৃতি, সম্পাদন।

নি—নিগ্রহ, নিকৃষ্ট, নিবৃত্তি, নিবাস, নিগম, নিবারণ, নিয়োগ, নিদর্শন, নিপাত। **অব**—অবতরণ, অবরোহণ, অবহেলা, অবজ্ঞা, অবসর, অবকাশ, অবগুণ্ঠন, অবদান, অবনত, অবগাহন। **অনু**—অনুজ, অনুতাপ, অনুমান, অনুচর, অনুশোচনা, অনুমোদন, অন্বেষণ, অনুরোধ, অনুগ্রহ, অনুবাদ। **নির্**—নির্ণয়, নির্দোষ, নির্গমন, নির্জন, নির্মল, নির্ভয়, নির্ভর, নিরপরাধ, নিরন্তর। **দুর্**—দুর্গতি, দুর্জয়, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, দুর্লভ, দুর্জন, দুরাশা, দুর্ভিক্ষ, দুর্ঘটনা, দুরারোগ্য। **বি**—বিরাগ, বিজয়, বিচার, বিষাদ, বিসর্জন, বিজন, বিনয়, বিষম, বিখ্যাত, বিতৃষ্ণা। **অধি**—অধিবেশন, অধিকার, অধ্যয়ন, অধ্যবসায়, অধিপতি, অধিষ্ঠান, অধিনায়ক। **সু**—সুদর্শন, সুন্দর, সুশ্রী, সুনীতি, সুবাস, সুদিন, সুজলা, সুফলা, সুনাম, সুস্থ, স্বস্তি [=সু+অস্তি], সুদূর, সুহৃদ্। **উৎ**—উৎসর্গ, উৎপত্তি, উত্তপ্ত, উৎসাহ, উচ্ছল, উচ্ছ্বাস, উত্থান, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকর্ষ, উজ্জ্বল, উচ্চারণ। **পরি**—পরিতাপ, পরিষ্কার, পরিত্যাগ, পরিহার, পরীক্ষা, পরিশ্রম, পরিণয়, পরিণাম, পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ। **প্রতি**—প্রতিমূর্তি, প্রতিকূল, প্রতিকার, প্রতিনিধি, প্রতিকৃতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞা, প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল, প্রতিহিংসা। **অভি**—অভিধান, অভিনয়, অভীষ্ট, অভিযান, অভ্যুদয়, অভ্যুত্থান, অভিযোগ, অভিসার, অভিশাপ, অভিনব। **অতি**—অত্যন্ত, অত্যুক্তি, অতিশয়, অতিক্রম, অত্যধিক, অতীব, অত্যল্প, অত্যাবশ্যক, অত্যাচার, অতিরিক্ত, অতিবৃষ্টি। **অপি**—অপিনিহিতি, অপিধান। **উপ**—উপহার, উপকার, উপচার, উপবাস, উপহাস, উপবন, উপকূল, উপকথা, উপদেশ, উপনিষদ্। **আ**—আহার, আহরণ, আচরণ, আক্রমণ, আগমন, আবেশ, আদেশ, আরম্ভ, আদান, আভাস। **নিস্**—নিস্তার, নিষ্কৃতি, নিষ্কাশন, নিস্তেজ, নিস্তাপ, নিষ্পাপ, নিষ্ফল, নিষ্কলুষ, নিশ্চল, নিঃশ্বাস। **দুস্**—দুস্তর, দুষ্কর, দুষ্কৃতি, দুঃসাধ্য, দুঃসহ, দুঃশাসন, দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা, দুঃসময়।

২. উপসর্গরূপে সংস্কৃত অব্যয় :

অন্তঃ—অন্তঃপুর, অন্তঃকরণ, অন্তঃসার, অন্তঃস্থ, অন্তরঙ্গ, অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত, অন্তর্গত, অন্তর্ধান, অন্তর্বর্তী। **আবিঃ**—আবির্ভাব, আবিষ্কার। **পুরঃ**—পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোধা। **তিরস্**—তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান। **পূর্ব**—পূর্বরাগ, পূর্ববর্তী, পূর্বতন, পূর্বাহ্ণ, পূর্বাভাস, পূর্বাশা, পূর্বজ্ঞান, পূর্বাচল। **প্রাদুঃ**—প্রাদুর্ভাব। **বহিঃ**—বহিঃস্থ, বহির্গমন, বহিরাগত, বহির্দ্বার, বহির্ভূত, বহিষ্কার, বহিরঙ্গ। **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শন। **অলম্**—অলংকার, অলংকরণ।

৩. বাংলা উপসর্গ :

অ—অফুরন্ত, অদেখা, অবোলা, অকাজ, অনড়, অচিন, অপয়া, অনামী। **অনা**—অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি। **আ**—আদেখ্‌লা, আলুনি, আভাঙা, আকাট, আঘাটা, আকাল, আগাছা, আকাঁড়া। **দর**—দরকাঁচা, দরসিদ্ধ, দরপাকা। **নি**—নিলাজ, নিখরচা, নির্জলা, নির্ভেজাল, নিভাঁজ, নিটোল, নিখুঁত। **পাতি**—পাতিলেবু, পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতকুয়া। **বে**—বেহায়া, বে-হেড, বেসরম, বেহাত, বেঢপ, বেসুরো।

বি—বিভুঁই, বিদেশ, বিজোড়, বিকল। **ভর**—ভরদিন, ভরসন্ধ্যা, ভরদুপুর, ভরপেট। **ভরা**—ভরাঘট, ভরাগাঙ, ভরাডুবি, ভরাযৌবন, ভরানদী। **রাম**—রামদা, রামছাগল, রামগরুড়। **স**—সপাট, সজোর, সলাজ, সটান, সঠিক, সখেদ, সবুট। **হা**—হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ, হা-হুতাশ।

৪. বিদেশী উপসর্গ ঃ

ফি—ফিদিন, ফিবছর, ফিসন, ফিবার। **হর**—হরবোলা, হররোজ, হরদিন। **গর**—গরমিল, গরহজম, গররাজি, গরহাজির। **হেড্**—হেড্‌মিস্ত্রী, হেড্-পণ্ডিত, হেড্-অফিস। **না**—নাচার, নাবালক, নামঞ্জুর, নারাজ, নাছোড়বান্দা, নাকাল। **ব**—বকলম, বনাম, বমাল। **বে**—বেবন্দোবস্ত, বেয়াদপি, বে-টাইম, বেরসিক, বেআইনী, বেইজ্জত, বেপরোয়া, বেনামী, বেতার, বেহুঁশ। **বদ্**—বদ্‌মাইস, বদ্‌রাগী, বজ্জাত, বদ্‌মেজাজী, বদ্‌নাম। **ফুল**—ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলপ্যাণ্ট, ফুল-টাইম। **হাফ্**—হাফ্-টিকিট, হাফ্-হাতা, হাফ্-টাইম। **সব্**—সব্-ডেপুটি, সব্-জজ্, সব্-রেজিস্টার, সব্-অফিস। **নিম্**—নিমরাজী, নিমখুন। **বর**—বরখাস্ত, বরবাদ, বরদাস্ত। **কার**—কারবার, কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারদানি। **খাস**—খাসমহল, খাসকামরা। **খোস**—খোসগল্প, খোসমেজাজ, খোসগন্ধ, খোসবাবু।

॥ অনুসরণী ॥

১. উপসর্গ কাহাকে বলে? সংস্কৃত উপসর্গ কয়টি ও কি কি? সংস্কৃত উপসর্গ ও বিদেশী উপসর্গ—প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া উদাহরণ দাও।

*২. উদাহরণসহ পার্থক্য নির্দেশ কর: উপসর্গ ও অনুসর্গ। উ. মা. '৭০

*৩. বাংলা উপসর্গ সম্বন্ধে যাহা জান, উদাহরণসহ লিখ। মা. '৫৩; উ. মা. '৬৯

*৪. উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয়, চারিটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাইয়া দাও। উ. মা. '৬৪, '৬৬

*৫. নিম্নলিখিত যে-কোন চারিটি উপসর্গ প্রয়োগ করিয়া চারিটি পৃথক্ শব্দ গঠন কর ঃ প্র, অতি, পরা, নির্, দুর্, বি, অধি, উপ। মা. '৭২

*৬. উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর ঃ নিন্দনীয় অর্থে উপসর্গ। মা. '৫৬

[**সংকেত ঃ** সংস্কৃত—উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল; বাংলা—অপয়া, অকেজো, অপদার্থ, ভরাযৌবন, ভরানদী; বিদেশী—বদ্‌নাম, বজ্জাত, বদ্‌রাগী।]

৭. ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর বা প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর ঃ [পাঠ্যগ্রন্থভিত্তিক] বিজ্ঞাপন, পরীক্ষা, আহ্বান, অধ্যবসায়, অভিপ্রেত, অন্তর্হিতা, আবির্ভূতা, প্রতীক্ষা, পুরস্কার, পরিচয়, উল্লিখিত, অন্বেষণ, উত্থাপন, অনুবাদ, অব্যাহতি, অপচিত, বিপর্যস্ত, প্রসার, প্রতিপত্তি, অভিভূত, পরিত্যক্ত, পরামর্শ, পরিষ্কার, অপরিচিত, অনুসন্ধান, অনুতপ্তা, আবিষ্কৃত, অভিব্যক্তি, অবসান, সম্প্রদায়, উপাদেয়, প্রতিহত, আহরণ, প্ররোচনা, নিষ্প্রয়োজন, ব্যাকরণ, পর্যবসিত, আবিষ্ট, প্রণীত, অবকাশ, উপসর্গ, অপরাধ, বিস্ময়, অধিকার, নিশ্চয়, প্রয়োগ, আকর্ষণ, আবিষ্কার, আক্রমণ, আরম্ভ, অনুষ্ঠান, উজ্জ্বল, বিশ্বাস, আচ্ছন্ন, পুরোহিত, পরিণাম, অভিনয়, বিষাদ, অভিযান, নিবেদন, অবসান, উৎসব, নিরাপদ, পরিচয়, সংসার, অনুমান, প্রণাম, বিদায়, অনুজ, অপমান, বিধাতা, আরূঢ়, আক্রমণ, বিশ্বাস, প্রশংসা, পরাভব, নির্বাসিত, তপোবন, উপবাস।

শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ

একই শব্দ যখন একসঙ্গে দু'বার উচ্চারিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে, তখন তাকে শব্দদ্বৈত বলা হয়। যেমন :

১. একই শব্দের দু'বার প্রয়োগের দ্বারা গঠিত শব্দদ্বৈত : আম্র দেখিতে **রাঙ্গা রাঙ্গা** [মনুষ্য-ফল]। নারিকেলও **কাঁদি কাঁদি** ফলে বটে [মনুষ্য-ফল]। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—**বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা**, গাছ আলো করিয়া থাকে [মনুষ্য-ফল]। পাতার মধ্য হইতে যে **অল্প অল্প** রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর [মনুষ্য-ফল]। কত **রকম রকম** নৌকার কত গতিভঙ্গি [বাহিরে যাত্রা]। সেখান থেকে **পাকা-পাকা** কারিগর বেরিয়ে আসছে [শিল্পের অধিকার]। শ্যামাদাসবাবু **হাঁ-হাঁ** করিয়া উঠিলেন [অগ্রদানী]। **মরি মরি ষাট্ ষাট্** কেঁদেছিল রেতে [পৌষ পার্বণ]। **গুঁড়ি গুঁড়ি** বৃষ্টি পড়ে [শ্রাবণে]। এই বাংলার **তৃণে তৃণে** ফুল, **কূলে কূলে** মধুমতী [বাংলার ফুল]। জাগিবে কি পদতলে এইমতো **পুঞ্জ পুঞ্জ** প্রাণ সমস্ত নিখিলময় [যদি ফিরে আসি]? **লক্ষ লক্ষ** তৃণ একত্রে মিলিয়া থাকে **বক্ষে বক্ষে** লীন [গান্ধারীর আবেদন]।

২. একটি প্রকৃত ও একটি বিকৃত শব্দ যোগে গঠিত শব্দদ্বৈত : ভিজা হাওয়া এপারের **ডালপালা**গুলার মধ্যে যা খুশি তাই করিয়া বেড়ায় [বাহিরে যাত্রা]। একে লাভ করতে হলে নিশ্চয়ই **জোড়জোড়** দরকার [শিল্পের অধিকার]। কিছু **লেখা-টেখা** আছে নাকি [একাদশী বৈরাগী]? আজ্ঞে না, **মিষ্টি-টিষ্টি** আবার আছে তো [অগ্রদানী]। **জল-টল** মুখে দেবে বাপু [অগ্রদানী]। **আকুলি বিকুলি** কত চুকুলির লাগি [পৌষ পার্বণ]। কর্তাদের **গালগল্প** গুড়ুক টানিয়া [পৌষ পার্বণ]।

৩. বিপরীতার্থক যুগ্ম-শব্দের দ্বারা গঠিত শব্দদ্বৈত : এই **যেমন-তেমন** একটা ঘোড়া হলেই তারা খুসি [শিল্পের অধিকার]। কিন্তু কস্তুরীর ব্যবসা করতে গিয়ে **দানা-পানির** উপায় ছাড়লে জীবনটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন কি করা যাবে [শিল্পের অধিকার]?

৪. সমার্থক যুগ্ম শব্দের দ্বারা গঠিত শব্দদ্বৈত : উভয়ে ধূমপান করিতে করিতে **কথাবার্তা** আরম্ভ হইতে লাগিল [ভিখারী সাহেব]। সেই **বাড়িঘর** নিশ্চয়ই এখনো আছে [বাহিরে যাত্রা]। অনাবশ্যক রঙ তুলির কল-কারখানা, দোয়াত-কলম, **বাজনা-বাদ্যি** সে মোটেই সয় না [শিল্পের অধিকার]। **কাগজ-পত্র** কিছু নেই, সব পুড়ে গেছে [একাদশী বৈরাগী]। পথে **লোক-জন** নাই [শ্রাবণে]।

৫. বিভিন্নার্থক যুগ্ম শব্দের দ্বারা গঠিত শব্দদ্বৈত: অনাবশ্যক **রঙতুলির কল-কারখানা, দোয়াত-কলম**, বাজনা-বাদ্য সে মোটেই সয় না [শিল্পের অধিকার]। **রশিদ-পত্তর** নেই বলে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে নাকি [একাদশী বৈরাগী]?

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা অনুকারাত্মক শব্দ:

বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দ আছে, যাদের কোন অর্থ নেই—তারা কতকগুলি প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ শব্দমাত্র। কিন্তু সেই ধ্বনি-সংকেতের দ্বারা তারা বিশেষ বিশেষ অর্থ দ্যোতিত করে। সেই শব্দগুলিকে ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দ বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল অনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমতো সৈন্য নহে, সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলা ভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ ঠিক মতো সৈন্যশ্রেণীতে ভর্তি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা না থাকিলে বাংলা ভাষার বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।' যেমন:

৬. ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দযোগে শব্দদ্বৈত: মাছি **ভন্‌ভন্‌** করিতে আরম্ভ করিল [মনুষ্য-ফল]। তাহাদের গাত্র বহিয়া **টস্‌টস্‌** করিয়া ঘর্মজল মাটিতে পড়িতেছে [ভিখারী সাহেব]। **ফুরফুর** করিয়া প্রাণ-কাড়িয়া-লওয়া চৈতী হওয়া বহিতেছে [ভিখারী সাহেব]। **হু হু** করিয়া টেম্পারেচার নামিতেছে [ভিখারী সাহেব]। আমার বন্ধু **হা হা** করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন [ভিখারী সাহেব]। অতএব অফিস-আদালত ছেড়ে সকলে রূপ ও রসের রাজত্বের দিকে সন্ন্যাস নিয়ে **চট্‌পট্‌** চোরকে ছাড়ার কুপরামর্শ তো কাউকে দেওয়া যায় না [শিল্পের অধিকার]। যুবক-মহলে একেবারে **হৈ হৈ** পড়িয়া গেল [একাদশী বৈরাগী]। চোখ যেন তাহার **জ্বলজ্বল** করিয়া উঠিল [অগ্রদানী]। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর সম্মুখে **ঝলমল** করিতেছে [অগ্রদানী]। সকালবেলাতেই **ঠুকঠুক** করিয়া গিয়া হাজির হয় [অগ্রদানী]। তীরে নারিকেল-মূলে **থল্‌থল্‌** করে জল [শ্রাবণে]। কোলে লুটিতেছে জল **টল্‌ মল্‌ থল্‌ থল্‌** বুকে বায়ু **থরথর** নাচে [শ্রাবণে]। শুনি' **খল খল খল** অট্টহাসির [অভিশাপ]। হেরিনু গবাক্ষে তার বস্ত্র আকর্ষিয়া **খলখল** হাসিতেছে সভা-মাঝখানে গান্ধারীর পুত্র-পিশাচেরা [গান্ধারীর আবেদন]।

ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারাত্মক শব্দের একবার প্রয়োগ: একটা সুদীর্ঘ **আঃ** শব্দ উচ্চারণপূর্বক তাকিয়া হেলান দিলাম [ভিখারী সাহেব]। চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা **ঝনাৎ** করিয়া নীচে পড়িয়া গেল [একাদশী বৈরাগী]। সেই গরম ঝোলই খানিকটা **সড়াৎ** করিয়া টানিয়া খাইয়া চক্রবর্তী বলিল, হুঁ, বাঃ, ঝোলটা বেশ হয়েছে [অগ্রদানী]। কলিকার আগুনে **ফুঁ** দিতে

দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল [অগ্রদানী]। হায় হায় হা রমণী, হায় রে, অনাথা [গান্ধারীর আবেদন]।

॥ অনুসরণী ॥

১. উদাহরণ সহকারে পরিভাষাগুলি ব্যাখ্যা কর : ধ্বন্যাত্মক শব্দ, উ. মা. '৬১ ; শব্দদ্বৈত, উ. মা. '৬২, '৭০ ; অনুকারাত্মক শব্দ।

২. শব্দদ্বৈত কাহাকে বলে? শব্দদ্বৈত কি কি প্রকারে গঠিত হয়? বিভিন্ন প্রকারের শব্দদ্বৈতের দৃষ্টান্ত দাও।

৩. অনুকার-ধ্বনি-বিশিষ্ট শব্দদ্বৈত কাহাকে বলে? উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও।

৪. অর্থ-নির্দেশ-পূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর : টস্‌টস্‌, হা হা, হু হু, হৈ হৈ, জ্বল জ্বল, ঝলমল, টলমল, থল্‌-থল্‌, থল-থল, সড়াৎ, ঝনাৎ।

৫. অর্থ-পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর : থরথর, থলথল, জ্বলজ্বল, ঝলমল, কলকল, খলখল, ঠুক ঠুক, হা হা, হৈ হৈ, হু হু।

৬. দৃষ্টান্ত দাও : অনুকারাত্মক শব্দদ্বৈত, বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ, সমার্থক যুগ্মশব্দ, বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ।

৭. শব্দদ্বৈত বা একই শব্দের দুইবার উচ্চারণ কিরূপে উহার অর্থের পরিবর্তন ঘটায় দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া দাও। মা. '৬৬

পরস্পর-সম্পর্ক-যুক্ত একাধিক পদ একত্র মিলিত হয়ে যদি একটি সম্পূর্ণ ও সঙ্গত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে **বাক্য** [Sentence] বলা হয়।

গঠন-ভিত্তিতে বাক্য তিন প্রকার: সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্য।

১. **সরল বাক্য** [Simple Sentence]: যে বাক্যে একটিমাত্র ক্রিয়া নির্দেশিত হয় অর্থাৎ একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলা হয়। যেমন: লোকটা চুরুট বাহির করিল [ভিখারী সাহেব]।

২. **মিশ্র বা জটিল বাক্য** [Complex Sentence]: যে বাক্যে থাকে একটি প্রধান [বা স্ব-নির্ভর] বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক অপ্রধান [বা পর-নির্ভর] বাক্যাংশ, তাকে বলা হয় মিশ্র বা জটিল বাক্য। যেমন: কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল [মনুষ্য-ফল]।

৩. **যৌগিক বাক্য** [Compound Sentence]: দুটি বা তার বেশী সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় যোগে সংযুক্ত হলে সমগ্র বাক্যটিকে বলা হয় যৌগিক বাক্য। যেমন: নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায় [বাহিরে যাত্রা]।

অর্থের ভিত্তিতে বাক্য অনেক প্রকার হয়ে থাকে: নির্দেশাত্মক বাক্য, প্রশ্নাত্মক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, বিস্ময়বোধক বাক্য, ইচ্ছাবোধক বাক্য ইত্যাদি।

১ **নির্দেশাত্মক বাক্য** [Indicative Sentence]: যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাবের বিবৃতি থাকে, তাকে বলা হয় নির্দেশাত্মক বাক্য। নির্দেশাত্মক বাক্য আবার দু' প্রকারের: অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক বাক্য। যে বাক্যে ঘটনা বা ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় **অস্ত্যর্থক বাক্য**। যেমন: তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি [মনুষ্য-ফল]। আর, যে বাক্যে ঘটনা বা ভাব অস্বীকৃত হয়, তাকে বলা হয় **নঞর্থক বাক্য**। যেমন: সকলে আম্র খাইতে জানে না [মনুষ্য-ফল]।

২. **প্রশ্নাত্মক বাক্য** [Interrogative Sentence]: যে বাক্যে কোন ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাকে প্রশ্নাত্মক বাক্য বলা হয়। যেমন: গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে [মনুষ্য-ফল]?

৩. **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য** [Imperative Sentence]: যে বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা বা নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলা হয়। যেমন: অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর [বীরবর কাহিনী]।

৪. **বিস্ময়বোধক বাক্য** [Interjective Sentence] যে বাক্যে মনের দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়বোধক বাক্য বলা হয়। যেমন: উঃ কি দৃষ্টি! [অগ্রদানী]।

৫. **ইচ্ছাবোধক বাক্য** [Optative Sentence] : যে বাক্যে মনের কোন শুভ বা অশুভ ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাকে বলে ইচ্ছাবোধক বাক্য। যেমন: খোকা যাক, বলে আসুক বাবুকে, অন্য লোক দেখুক ওঁরা [অগ্রদানী]। অন্যায় পীড়ন গভীর কল্যাণ-সিন্ধু করুক মন্থন [গান্ধারীর আবেদন]।

গঠন-ভিত্তিক বাক্য-পরিবর্তন

● **সরল বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্য:** ১. তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, আমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। [বীরবর কাহিনী] > তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত যে পুত্র আমার প্রাণাধিক ও প্রিয়, তাহাকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। ২. আমাদের দেশের এক্ষণকার বড় মানুষদিগের মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁঠাল বলিয়া বোধ হয়। [মনুষ্য-ফল]> যে সব মানুষ আমাদের দেশের এক্ষণকার মানুষদিগের মধ্যে বড়, তাহাদের মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। ৩. পাকিলেও টক যায় না। [মনুষ্য-ফল>যদি পাকেও, তবু টক যায় না। ৪. আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক। [বীরবর কাহিনী] > যদি আমি প্রস্থান করি, তবে অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক। ৫. সেই বিপদের সময়েও তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। [ভিখারী সাহেব] > সেই বিপদের সময়েও তাহার যেরূপ ভাব দেখিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইলাম। ৬. তাঁতবোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা দায় হত। [শিল্পের অধিকার] > যদি তাঁতবোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়ত, তবে কবীরের পেট চলা দায় হত।

● **মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্য :** ১. যদি আমার মেয়ে মরিয়া যায় তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিশে দিব [ভিখারী সাহেব] > আমার মেয়ে মরিয়া গেলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিশে দিব। ২. যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা। [মনুষ্য ফল] > ফুল ফুটিলে দেখিতে শুনিতে বড় শোভা। ৩. যে তাপ গরম জিনিস হইতে ঠাণ্ডা জিনিসে যায়, তাহা আর ফিরে না। [উত্তাপের অপচয়] > গরম জিনিস হইতে ঠাণ্ডা জিনিসে যাওয়া তাপ আর ফিরে না। ৪. কাজের মধ্যে যদি ধরা না দিই তো সংসার চলে না। [শিল্পের অধিকার] > কাজের মধ্যে [আমি] ধরা না দিলে সংসার চলে না। ৫. তোমার কল্যাণে যদি মনস্কামনা আমার পূর্ণ হয় চক্রবর্তী, তবে দশবিঘে জমি আমি তোমাকে দেব। [অগ্রদানী] > চক্রবর্তী, তোমার কল্যাণে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলে দশ বিঘে জমি আমি তোমাকে দেব।

● **সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য:** ১. ত্বরায়, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দাও। [বীরবর কাহিনী] > ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান কর এবং আমায় সংবাদ দাও। ২. আমি প্রস্থান করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই রাজার

প্রাণাত্যয় ঘটিবেক। [বীরবর কাহিনী] > আমি প্রস্থান করিব এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবেক। ৩. সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল। [একাদশী বৈরাগী]> অপূর্ব শহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়াছিল, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়াছিল এবং সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল। ৪. সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। [একাদশী বৈরাগী] > সকলে উপবেশন করিল এবং একাদশী নিজেও বসিল। ৫. খাবার হলে খবর দেবে চাকররা। [অগ্রদানী] > খাবার হবে এবং চাকররা খবর দেবে।

● **যৌগিক বাক্য থেকে সরল বাক্য:** ১. আমি মাঝে মাঝে পাগল হইয়া যাই, আবার ভাল হই। [ভিখারী সাহেব]> আমি মাঝে মাঝে পাগল হইয়া আবার ভাল হই। ২. পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিছুদিন ইহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামক গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেন। [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]>পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার শিক্ষকতা করিবার সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামক গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেন। ৩. হেনরি লোকটা এদিকে ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভারি খামখেয়ালি করে। [ভিখারী সাহেব] > হেনরি লোকটা এদিকে ভাল হইলেও মাঝে মাঝে ভারি খামখেয়ালি করে। ৪. সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার-সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। [বাহিরে যাত্রা] > সেই পিছনে আমার বাধা থাকিলেও গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। ৫. আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। [বাহিরে যাত্রা]> আমরা বাহিরে আসিলেও স্বাধীনতা পাই নাই।

● **মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য:** ১. যদি তুমি স্বচ্ছন্দ মনে পুত্র প্রদান কর, তবেই আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া, রাজকার্য নিষ্পন্ন করি [বীরবর কাহিনী]> তুমি স্বচ্ছন্দ মনে পুত্র প্রদান কর, আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিই এবং রাজকার্য নিষ্পন্ন করি। ২. যতদিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না। [মনুষ্য-ফল]> টাকা ফিরাইয়া দেন না এবং অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না। ১. যখন যে ঔষধ দেওয়া হইত, হেনরি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। [ভিখারী সাহেব] > ঔষধ দেওয়া হইত এবং হেনরি সাবধানতার সহিত সমস্ত দেখিত। ৪. অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনই শাস্তি করিয়া দিল যে পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল। [একাদশী বৈরাগী] > অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইল এবং পাঁচকড়িকে খুব শাস্তি করিয়া দিল; কিন্তু পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল। ৫. যে শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে। [অগ্রদানী] > শিকাটাতে মিষ্টিগুলি ঝুলানো ছিল এবং সেটা কিসে কাটিয়া ফেলিয়াছে।

● **যৌগিক বাক্য থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্যঃ** ১. নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এ পারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায়। [বাহিরে যাত্রা] > যখন নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, তখন ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায়। ২. তখন তাপ থাকিবে বটে, কিন্তু সেই তাপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না। [উত্তাপের অপচয়] > যদিও তখন তাপ থাকিবে, তবু সেই তাপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না। ৩. গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। [মনুষ্য-ফল]>যদিও গৃহিণীপনা রসাল, তবু তাহাতে দাঁত বসে না। ৪. তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখশিশের প্রলোভন দেখাইয়া স্টেশনেও পৌঁছিলাম, আর ট্রেনখানিও ছাড়িয়া দিল। [ভিখারী সাহেব]>তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখশিশের প্রলোভন দেখাইয়া যেই স্টেশনে পৌঁছিলাম, অমনি ট্রেনখানি ছাড়িয়া দিল। ৫. কেবল দুই-একজন বৈজ্ঞানিক তাপের এই অপচয় দেখিয়া বিহ্বল হন ও সেই সঙ্গে জগতের পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হন। [উত্তাপের অপচয়]>কেবল যখন দুই একজন বৈজ্ঞানিক তাপের এই অপচয় দেখিয়া বিহ্বল হন, তখন জগতের পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হন।

অর্থ-ভিত্তিক বাক্য-পরিবর্তন

● **অস্ত্যর্থক বাক্য থেকে নঞর্থক বাক্যঃ** ১. সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি। [বীরবর কাহিনী] > সর্বথা আমি অতি সৎকর্ম করি নাই। ২. সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভালো। [মনুষ্য-ফল] > সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করা মন্দ নয়। ৩. বিশ্ব-ঘটিকার পেণ্ডুলম তখন স্পন্দহীন হইবে। [উত্তাপের অপচয়] > বিশ্ব-ঘটিকার পেণ্ডুলম তখন স্পন্দিত হইবে না। ৪. এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছুকাল বিলম্বিত হইতে পারিবে। [উত্তাপের অপচয়] > এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সেদিন কিছুকাল ত্বরান্বিত হইতে পারিবে না। ৫. ব্রাহ্মণ পাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায় সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিল। [একাদশী বৈরাগী] > ব্রাহ্মণ পাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায় সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির না করিয়া ছাড়িল না।

● **নঞর্থক বাক্য থেকে অস্ত্যর্থক বাক্যঃ** ১. শুভকর্মে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। [বীরবর কাহিনী] > শুভকর্মে বিলম্ব না করা কর্তব্য। ২. সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। [মনুষ্য-ফল]>সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাওয়া অনুচিত। ৩. আমার কিছু অপরাধ নাই। [ভিখারী সাহেব]>আমি নিরপরাধ। ৪. বয়স ষষ্টি বৎসরের কম হইবে না। [ভিখারী সাহেব]>বয়স ষষ্টি বৎসরের বেশী হইবে। ৫. আমার স্ত্রীর কথা সে গ্রাহ্য করিত না। [ভিখারী সাহেব>আমার স্ত্রীর কথা সে অগ্রাহ্য করিত। ৬. চাকাগুলি আর নড়িবে না। [উত্তাপের অপচয়]> চাকাগুলি অনড় থাকিবে।

অস্ত্যর্থক বাক্য থেকে প্রশ্নবোধক বাক্যঃ ১. কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল। [মনুষ্য-ফল] > কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে

ভোজন করানই কি ভাল নয়? ২. জগদ্‌বিখ্যাত জুল সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। [উত্তাপের অপচয়]>জগদ্‌বিখ্যাত জুল সাহেব কি তাহা দেখান নাই? ৩. কবীর এর চেয়ে কমে চলে গেলেন। [শিল্পের অধিকার]>কবীর কি এর চেয়ে কমে চলে গেলেন না? ৪. তাঁত-বোনা মাকু-ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা দায় হত? [শিল্পের অধিকার] > তাঁত-বোনা মাকু ঠেলার কাজ ছাড়লে কবীরের পেট চলা কি দায় হত না? ৫. দেশের মধ্যে অপূর্ব একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল। [একাদশী বৈরাগী] > দেশের মধ্যে অপূর্ব কি একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল না?

প্রশ্নবোধক বাক্য থেকে অস্ত্যর্থক বাক্য: ১. আর কি নিমিত্তে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি? [বীরবর কাহিনী] > আর আমার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকা নিরর্থক। ২. খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখি কি গান গায় না? [শিল্পের অধিকার]> খাঁচার মধ্যে থেকেই পাখি গান গায়। ৩. আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না? [শিল্পের অধিকার] > আমার কাছ থেকে তোমার দিকেও কিছু যাবে। ৪. সে দু'টাকা এখনও শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেছিস কোন লজ্জায় শুনি? [একা দশী বৈরাগী]>সে দু'টাকা এখনও শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে আসায় তোর লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। ৫. পতিত করে আর কে কি করবে তোমার? [অগ্রদানী]>পতিত করে আর কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।

● **অস্ত্যর্থক বাক্য থেকে অনুজ্ঞাবাচক শব্দ:** ১. কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করান ভাল। [মনুষ্য-ফল] > কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করাও। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল। [মনুষ্য-ফল] > সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী কর। ৩. তারপরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার। [মনুষ্য-ফল] > তারপর ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাও। ৪. পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক এই নিয়মটা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনার মস্তিষ্কের এক কোণে পুরিয়া রাখিবেন। [উত্তাপের অপচয়] > পাঠক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক এই নিয়মটা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনার মস্তিষ্কের এককোণে পুরিয়া রাখুন। ৫. তুমি একাদশীর বোনের ছোঁওয়া জল খাইবে? [একাদশী বৈরাগী] > তুমি খাও একাদশীর বোনের ছোঁওয়া জল?

● **নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে ইচ্ছাবোধক বাক্য:** ১. তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। [মনুষ্য-ফল]>তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হউক। ২. শক্তির এই অপচয় দেখিলে···দূরদর্শী লোকে ব্যাকুল হয়। [উত্তাপের অপচয়]>শক্তির এই অপচয় দেখিয়া··· দূরদর্শী লোকে ব্যাকুল হউক। ৩. তার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। [অগ্রদানী] > তার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খাউক। ৪. তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নিশিখার মতো জলিতেছে। [অগ্রদানী] > তাহার তৃপ্তি না হউক, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্ধমান বহ্নিশিখার মতো জলুক। ৫. সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে। [সবুজের অভিযান] > সংঘাতে তোর উঠুক ওরা রেগে।

● **বিস্ময়বোধক বাক্য থেকে নির্দেশাত্মক বাক্য ঃ** তাহাদের কি যন্ত্রণা ! [মনুষ্য-ফল]>তাহাদের বড় যন্ত্রণা। ২. বাঙ্গালীর বেশ তাহার অঙ্গে এত মানায় ! [ভিখারী সাহেব] >বাঙ্গালীর বেশ তাহার অঙ্গে খুব মানায়। ৩. কুলীগুলা তাহার এমন বশীভূত হইয়াছে ! [ভিখারী সাহেব]>কুলীগুলা তাহার খুব বশীভূত হইয়াছে। ৪. বেচারা কত কষ্টই পাইয়াছে ! [ভিখারী সাহেব]>বেচারা খুব কষ্ট পাইয়াছে। ৫. সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত ! [বাহিরে যাত্রা]>সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর অনেক তফাত।

● **নির্দেশাত্মক বাক্য থেকে বিস্ময়বোধক বাক্য ঃ** ১. সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদন করিল। [বীরবর কাহিনী] > কী বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদ করিল ! ২. সুসংবাদ বটে। [ভিখারী সাহেব]>কী সুসংবাদ! ৩. এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য, আজ ধর্মের নামে চলে যাচ্ছে। [ঔরংজীব ও জাহানারা] >কত বড় পাপ, কত বড় শাঠ্য ; আজ ধর্মের নামে চলে যাচ্ছে ! ৪. সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। [ঔরংজীব ও জাহানারা] > সে আমার কী পরম সৌভাগ্য ! ৫. দেখে না যে বান ডেকেছে জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ। [সবুজের অভিযান] > দেখে না কী বান ডেকেছে জোয়ার-জলে উঠছে কী প্রবল ঢেউ !

‖ **অনুসরণী** ‖

১. বাক্য কাহাকে বলে ? গঠনের ভিত্তিতে বাক্য কয় প্রকার ও কি কি ?

২. অর্থের ভিত্তিতে বাক্য কয় প্রকার ও কি কি ?

৩. সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য কাহাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৪. অর্থ পরিবর্তন না করিয়া নির্দেশ-অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর ঃ

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া বীরবর অকাতরে, পুত্রের মস্তক ছেদন করিল [যৌগিক বাক্য]। যতদিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, ততদিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না [সরল বাক্য]। ঝুনা হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায় [জটিল বাক্য]। সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক [সরল বাক্য]। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল [জটিল বাক্য]। প্রতি আমার একটি ইংরাজ বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন [জটিল বাক্য]। আমি অতি দরিদ্র, খাইতে পাই না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই [সরল বাক্য]। সহজ মানুষ বিষণ্ণ হইলে প্রফুল্লতা লাভ করিতে কিছু সময় লাগে [জটিল বাক্য]। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে [সরল বাক্য]। আমাদের যাহা অসাধ্য, ঐ ভূতের তাহা সাধ্য [যৌগিক বাক্য]। বিক্রমাদিত্যের দরবারে কবি কালিদাসকেও নিয়মিত হাজরে লেখাতে হত, কিন্তু এতে করে মেঘরাজ্যের তপোবনে তাঁর বিচরণের কোনো বাধাই তো হয়নি [সরল বাক্য]। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে [যৌগিক বাক্য]। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায় [সরল বাক্য]।

আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না [অস্ত্যর্থক বাক্য]। আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না [প্রশ্নাত্মক বাক্য]। চুরুট খাইবে [অনুজ্ঞাবাচক বাক্য] ? ঐ জীবন্ত ভূতকে কি বিছানায় বসিতে দিতে পারি [নঞর্থক বাক্য] ? বাবু, আমার একটি হাভানা তোমাকে খাইয়া দেখিতে হইবে [অনুজ্ঞাবাচক বাক্য]। তুমি চিকিৎসার কি জান [নঞর্থক বাক্য] ? তাহা হইলে আপনি ভারি বিপদে পড়িয়াছেন [বিস্ময়বোধক বাক্য]। সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে [নঞর্থক বাক্য] ? একটা উদাহরণ লও [ইচ্ছাবোধক বাক্য]। মানুষ কি সেই অপচয়ের নিবারণে চেষ্টা করে [নির্দেশাত্মক বাক্য] ? ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর [প্রশ্নাত্মক বাক্য]। আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না [ইচ্ছাবোধক বাক্য] ? তুমি বাছা কেঁদো না [প্রশ্নাত্মক বাক্য]। ব্যাটার ভাল হবে [নির্দেশাত্মক বাক্যে] ? ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনও বিপুল [বিস্ময়বোধক বাক্য]।

বাক্যের ক্রিয়ার কর্তা কর্ম ইত্যাদির যে-কোন একটিকে প্রধানরূপে বোঝাবার শক্তিকে বাচ্য বলা হয়।

বাচ্য চার প্রকার : কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

১. **কর্তৃবাচ্য** [Active Voice] : ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যে কর্তার প্রাধান্য সূচিত হলে যে বাচ্য হয়, তাকে কর্তৃবাচ্য বলা হয়। যেমন : কড়ি-বরগা দেয়ালের জালের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। [বাহিরে যাত্রা]

২. **কর্মবাচ্য** [Passive Voice] : ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যে কর্মের প্রাধান্য সূচিত হলে যে বাচ্য হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলা হয়। যেমন : দিন দিন কিন্তু হেনরির পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। [ভিখারী সাহেব]

৩. **ভাববাচ্য** [Neuter Voice] : ক্রিয়ার দ্বারা, বাক্যের কর্তা বা কর্মের কারও প্রাধান্য সূচিত না হয়ে যেখানে ক্রিয়ার প্রাধান্য সূচিত হয়, সেখানে যে বাচ্য হয়, তার নাম ভাববাচ্য। যেমন : বাবু, তবে আমার যাওয়া হইল না। [ভিখারী সাহেব]

৪. **কর্মকর্তৃবাচ্য** [Quasi-Passive Voice] : যে বাচ্যে কর্মেরই প্রাধান্য অথচ কর্তা উহ্য এবং মনে হয়, কর্ম কর্তৃনিরপেক্ষভাবে যেন স্বয়ং কাজ করছে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হয়। যেমন : কেবল গিরিবালা কাছে আসিলেই যেন তাহার মনের অন্ধকার দুর হয়, মুখে হাসি ফুটে। [ভিখারী সাহেব]

বাচ্য-পরিবর্তন

● কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য :

বাক্যকে কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে কর্তৃবাচ্যের কর্ম কর্তায় রূপান্তরিত হয়, কর্তার [কর্তৃবাচ্যের] সঙ্গে 'দ্বারা' বা 'কর্তৃক' উপসর্গ যুক্ত হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়।

১. তবে তিনি রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন। [বীরবর কাহিনী] > তবে তাঁহার কর্তৃক রাজার সমস্ত অমঙ্গল সম্পূর্ণ নিবারিত হইতে পারে। ২. সুতরাং আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। [বীরবর কাহিনী] > সুতরাং আমা কর্তৃক রাজার অধিকার পরিত্যক্ত হইবে। ৩. সেকালে ও একালে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ও ভূতের আবিষ্কার করিয়াছেন। [উত্তাপের অপচয়] > সেকালে ও একালে অনেকের কর্তৃক ভূত দৃষ্ট হইয়াছে ও আবিষ্কৃত

হইয়াছে। ৪. আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কারই দিলাম। [ভিখারী সাহেব]> আমার কর্তৃক সে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কারই প্রদত্ত হইল। ৫. বুড়ো মানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলে টাকা দেবে? [একাদশী বৈরাগী]> বুড়ো মানুষ কর্তৃক টাকা দত্ত হবে না ত কি ছোট ছেলে কর্তৃক টাকা দত্ত হবে?

● কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য:

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে বাক্যকে রূপান্তরিত করতে হলে ক্রিয়া কর্তৃপদের ভূমিকা গ্রহণ করে ও তাতে প্রথমা বিভক্তি হয়, কর্তায় [কর্তৃবাচ্যের] 'র' বা 'এর' যুক্ত হয় এবং 'হওয়া' ক্রিয়ার নতুন আবির্ভাব ঘটে ও তা ভাববাচ্যের কর্তার অনুগামী হয়।

১. শৃগালে খায়। [মনুষ্য-ফল]> শৃগালের খাওয়া হয়। ২. যে খায়, সেই মরে। [মনুষ্য-ফল]> যাহার খাওয়া হয়, তাহারই মরণ হয়। ৩. এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। [মনুষ্য-ফল]> এই কুমড়াগুলির বিলাত হইতে আসা হইয়াছে। ৪. ইহারা যাত্রা মহোৎসবাদিতে আপনাদের পদগৌরবের চিহ্নস্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া এবং জরীর জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন। [ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয়]> ইহাদের যাত্রা মহোৎসবাদিতে আপনাদের পদগৌরবের চিহ্নস্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া এবং জরীর জুতা পায়ে দিয়া আসা হইত। ৫. লোকটা পা ছড়াইয়া বসিল। [ভিখারী সাহেব]> লোকটার পা ছড়াইয়া বসা হইল।

● ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য:

বাক্যকে ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে সম্বন্ধ পদের স্থানে কর্তৃকারক করতে হয়, 'হওয়া' ক্রিয়া লুপ্ত হয় এবং কর্তৃরূপী ক্রিয়া কর্তার অনুগামী ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

১. অচিরাৎ অলক্ষীর প্রবেশ হইবেক। [বীরবর কাহিনী]> অচিরাৎ অলক্ষী প্রবেশ করিবেন। ২. বাবু! তবে আমার যাওয়া হইল না। [ভিখারী সাহেব] > বাবু! তবে আমি গেলাম না। ৩. আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। [অগ্রদানী]> আর চক্রবর্তী উত্তর দিত না। ৪. থাক বৈরাগী, তোমায় কিছু দিতে হবে না। [একাদশী বৈরাগী]> থাক বৈরাগী, তুমি কিছু দিও না। ৫. তাহাদের সাথে হবে দেখা? [যদি ফিরে আসি]> তাহাদের দেখিব?

॥ **অনুসরণী** ॥

১. বাংলায় বাচ্য কয় প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

২. কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচনা করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত কর এবং সেই বাক্যদ্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের প্রয়োগরীতি উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও। উ. মা. '৬২

৩. উদাহরণ সহযোগে বাংলা কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯

৪. কর্মকর্তৃবাচ্য কাহাকে বলে ? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর। উ. মা. '৬৯

৫. তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও : ভাববাচ্য।

৬. নির্দেশ অনুযায়ী বাচ্য পরিবর্তন কর :

আমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি [কর্মবাচ্য]। আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি, হেনরি [কর্মবাচ্য] ? থাক আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশ করিব না [কর্মবাচ্য]। তাহার সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্বিক বলিলাম [ভাববাচ্য]। পুলিশ-কমিশনার আমার কাছে হেনরির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন [কর্মবাচ্য]। নিম্নে তাহার মর্মানুবাদ প্রদত্ত হইল [কর্তৃবাচ্য]। ছিলাম খঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে [ভাববাচ্য]। গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন [কর্মবাচ্য]। তারপরে সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর একদিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই [ভাববাচ্য]। কাঠ তেল চর্বি পোড়াইয়া আলো জ্বালি [ভাববাচ্য]। গরীবের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার করব তবে ছাড়ব [ভাববাচ্য]। তথাপি এ কাদম্বী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্রের ছোট বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই [কর্মবাচ্য]। ছাঁদা একটা করে তো দেওয়া হবে [কর্তৃবাচ্য]। আবার কাল সকালে বাবু নেমন্তন্ন করেছে বাবাকে মিষ্টি খাওয়াবে [ভাববাচ্য]। আমার দেখা হয়েছে [কর্তৃবাচ্য]। চক্রবর্তীর লোলুপতা অকস্মাৎ যেন সাপের মতো বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উগ্‌রার কারণ [কর্মবাচ্য]। সব মানুষই এতে বাঁধা [কর্তৃবাচ্য]।

উক্তি [Narration]: বক্তার বাক্যটিকে অবিকৃতভাবে উদ্ধৃত করে বা অন্য কোন বক্তার নিজের কথায় রূপান্তরিত করে বলাকে ব্যাকরণে উক্তি বলা হয়।

উক্তি দু'প্রকারের: প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

১. **প্রত্যক্ষ উক্তি** [Direct Narration]: বক্তা যদি অন্য কোন বক্তার উক্তি অপরিবর্তিতভাবে হুবহু শ্রোতার কাছে উপস্থাপিত করেন, তবে তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলা হয়। যেমন: হেনরি মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'দেখ, মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। আমি উহাকে হত্যা করিব।'

২. **পরোক্ষ উক্তি** [Indirect Narration]: বক্তা যদি অন্য কোন বক্তার উক্তিকে নিজের মতো করে অর্থাৎ নিজের উক্তিতে প্রকাশ করে, তবে তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যেমন: হেনরি মহা উত্তেজিত হইয়া ডাকিয়া বলিল যে, সে [ডাক্তার] মেয়েকে মারিয়া ফেলিল। সে তাহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিল।

প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করার নিয়ম:

১. প্রত্যক্ষ উক্তির উদ্ধৃতি-চিহ্ন বা ড্যাস-চিহ্ন তুলে দিয়ে পরোক্ষ উক্তিতে তার জায়গায় 'যে'—এই সংযোজক অব্যয় বসাতে হয়। ২. প্রত্যক্ষ উক্তিতে যে পুরুষের ক্রিয়া থাকে, পরোক্ষ উক্তিতে তা উক্তিটির ভাব-অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ৩. সাধারণত উত্তম ও মধ্যম পুরুষের স্থানে প্রথম পুরুষ হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ভাব-প্রকাশের সহায়ক নতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৪. ইংরেজীতে যেমন প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান ক্রিয়াটির কাল-অনুযায়ী পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়ার কাল পরিবর্তিত হয়, বাংলায় সব সময় তেমন হয় না। ৫. প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম পদ পরোক্ষ উক্তিতে ভাব-অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ৬. প্রত্যক্ষ উক্তির সম্বোধন পদ পরোক্ষ উক্তিতে কর্ম-কারকে রূপান্তরিত হয়। ৭. প্রত্যক্ষ উক্তির অনুজ্ঞা-বাচক ক্রিয়া পরোক্ষ উক্তিতে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত হয়। ৮. প্রত্যক্ষ উক্তি বিস্ময়বোধক বাক্য হলে তা পরোক্ষ উক্তিতে ভাবানুযায়ী নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত হয়। ৯. প্রত্যক্ষ উক্তির মূল ক্রিয়া সাধু বা চলিত যে ভাষায় থাকবে, পরোক্ষ উক্তির সম্পূর্ণ বাক্যই সেই ভাষায় পরিবর্তিত হবে। ১০. প্রত্যক্ষ উক্তির—অদ্য, এখন, এখানে, আগামীকল্য, গতকল্য, ইতিমধ্যে, আসা ইত্যাদি শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে যথাক্রমে সেইদিন, তখন, সেখানে, পরদিন, পূর্বদিন, তৎপূর্বে, যাওয়া ইত্যাদি শব্দে রূপান্তরিত হয়।

উক্তি-পরিবর্তন

● **প্রত্যক্ষ উক্তি:** রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তোমার পরিবার কত? সে কহিল, মহারাজ! একজন স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর স্বয়ং এই চারি; এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই। [বীরবল কাহিনী]

পরোক্ষ উক্তি: রাজা তাহাকে তাহার পরিবার কত জিজ্ঞাসা করিলেন। সে মহারাজকে সম্বোধন করিয়া নম্রভাবে বলিল যে, এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আর তাহাকে লইয়া চারিজনে তাহার পরিবার। তদ্ব্যতিরিক্ত আর তাহার পরিবার ছিল না।

● **প্রত্যক্ষ উক্তি :** তিনি বসুজ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"নবীন! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?"

পরোক্ষ উক্তি : তিনি বসুজ মহাশয় নবীনকে ডাকিয়া সে তাঁহার ঘোড়ার দানাতে টিফিন করে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন।

● **প্রত্যক্ষ উক্তি :** আমি হেনরিকে বলিলাম, "দেখ, তুমি যখন এতই জান, তবে এখনও যদি কিছু প্রতিকার থাকে ত কর।"

আমার স্ত্রী বলিলেন, "হেনরি, এ মেয়েকে তুমি যদি বাঁচাইতে পার, তবে এ মেয়ে তোমাকে দিলাম।"

পরোক্ষ উক্তি : লেখক হেনরিকে ডাকিয়া বলিলেন যে, সে যখন এতই জানে, তবে এখনও যদি কিছু প্রতিকার থাকে, তবে তাহা সে করিতে পারে। লেখকের স্ত্রী হেনরিকে সাগ্রহে বলিলেন যে, সেই মেয়েকে সে যদি বাঁচাইতে পারে, তবে সেই মেয়েকে তিনি তাহাকে দিয়া দিলেন।

● **প্রত্যক্ষ উক্তি :** অনাথ কহিল, এই চার আনার জন্য আমরা এতো দূরে এসেছি? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে?

পরোক্ষ উক্তি : অনাথ সেই চার আনার জন্য তাহারা তদ্দূর গিয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাও আবার আর একদিন গিয়া লইয়া যাইতে হইবে শুনিয়া সে বিস্মিত হইল।

● **প্রত্যক্ষ উক্তি :** শ্যামাদাসবাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, কাল সকালে একবার আসবে তো! কেমন, এখানে এসেই জল খাবে!

যে আজ্ঞা, তা আসব।

পরোক্ষ উক্তি : শ্যামাদাসবাবু চক্রবর্তীকে ডাকিয়া পরদিন সকালে তাহাকে একবার যাইবার জন্য বলিলেন। তিনি তাহাকে সেখানে গিয়া জল খাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। চক্রবর্তী বিনীতভাবে জানাইল যে, সে যাইবে।

॥ **অনুসরণী** ॥

১. উক্তি কাহাকে বলে? কয় প্রকার ও কি কি?

২. প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি কাহাকে বলে? দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিণত করিবার নিয়মগুলি লিখ।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তি থেকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত কর :

ক. এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ। পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য অধিক হইল। বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, আমার বোধে, রাজার ঔদার্য অধিক। খ. জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার আর কেহ আছে?" সে বলিল, "আমার মা বাপ কেহই নাই, আমি একটি অনাথ বালক।" গ. মরিসনকে বলিলাম, "হেনরি যদি প্রকৃতই অপরাধী হয় তাহা হইলে সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি স্বয়ং আয়োজন করিয়া উহাকে ধরাইয়া দিতে একান্ত অক্ষম।"

ঘ. গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, কোত্থেকে আসছেন?

অপূর্ব কহিল, কালীদহ থেকে।

মশায় আপনারা?

আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল, কহিল, বসতে আজ্ঞা হোক।

ঙ. চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল, হুঁ, বেশ করে পাতা পরিষ্কার কর হে। নইলে নোন্তা ঝোল লেগে খারাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি না, মাছসুদ্ধ পড়ে আছে।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

ব্যাকরণ ঃ পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক

"ব্যাকরণ একটি সং
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ
বিশেষরূপে এবং
করা।"

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ বঙ্গাব্দের = বঙ্গ + অব্দের। অশ্বারোহী = অশ্ব + আরোহী। অস্তাচলগমনোদ্যোগী = অস্ত + অচল গমন + উৎ + যোগী। সঞ্চালন = সম্ + চালন। নিরাশ্রয়ে = নিঃ + আশ্রয়ে। যৎপরোনাস্তি = যৎপরঃ + ন + অস্তি। সূর্যাস্ত = সূর্য + অস্ত। নিশারম্ভেই = নিশা + আরম্ভেই। দিগন্ত = দিক্ + অন্ত। সংস্থিত = সম্ + স্থিত। বিদ্যুদ্দীপ্তি = বিদ্যুৎ + দীপ্তি। ঘোটকারূঢ় = ঘোটক + আরূঢ়। যথেচ্ছ = যথা + ইচ্ছা। কিয়দ্দূর = কিয়ৎ + দূর। ধবলাকার = ধবল + আকার। সোপানাবলীর = সোপান + আবলীর। তড়িতালোকে = তড়িৎ + আলোকে। [তড়িতালোকে অশুদ্ধ, শুদ্ধরূপ—'তড়িদালোকে'; সূত্র ঃ স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ-স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।] বহির্দিক = বহিঃ + দিক। কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ। কৌতূহলাবিষ্ট = কৌতূহল + আবিষ্ট। মস্তকোপরি = মস্তক + উপরি। দেবালয় = দেব + আলয়। ভূয়োভূয়ঃ = ভূয়ঃ + ভূয়ঃ। করাঘাত = কর + আঘাত। দ্বারোন্মোচন = দ্বার + উন্মোচন। পদাঘাতে = পদ + আঘাতে। তথাপি = তথা + অপি। মন্দিরাভ্যন্তরে = মন্দির + অভি + অন্তরে। তন্মুহূর্তে = তৎ + মুহূর্তে। নির্ভীক = নিঃ + ভীক। গাত্রোত্থান = গাত্র + উৎ + স্থান। অলঙ্কার = অলম্ + কার। নিষ্প্রয়োজন = নিঃ + প্রয়োজন। রোধার্থ = রোধ + অর্থ। ভগ্নার্গলের = ভগ্ন + অর্গলের। পুনর্বার = পুনঃ + বার। কুশাঙ্কুরও = কুশ + অঙ্কুরও। সায়াহ্ন = সায় + অহ্ন। শৈলেশ্বর = শৈল + ঈশ্বর। কথানুসারে = কথা + অনুসারে। দ্বারোদ্ঘাটন = দ্বার + উৎ + ঘাটন। পর্যবেক্ষণে = পরি + অব + ঈক্ষণে। পশ্চাদ্ভাগে = পশ্চাৎ + ভাগে। সাবগুণ্ঠনে = স + অবগুণ্ঠনে। পরন্তু = পরম্ + তু। অনাবৃত = ন + আবৃত। পরিচ্ছদ = পরি + ছদ। তদুপরি = তৎ + উপরি। রত্নাভরণ = রত্ন + আভরণ। হীনার্ঘতায় = হীন + অর্ঘতায়। সচরাচর = সচর + অচর। অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা। বয়োজ্যেষ্ঠা = বয়ঃ + জ্যেষ্ঠা। কথোপকথন = কথা + উপকথন। তদুভয় = তৎ + উভয়। এতদ্দেশীয় = এতৎ + দেশীয়। শরীরোপরি = শরীর + উপরি। কিঞ্চিন্মাত্র = কিম্ + চিৎ + মাত্র। বক্ষোবিশালতা = বক্ষঃ + বিশালতা। সর্বাঙ্গের = সর্ব + অঙ্গের। প্রচুরায়ত = প্রচুর + আয়ত। তদধিক = তৎ + অধিক। মনোজ্ঞ = মনঃ + জ্ঞ। নবপত্রাবলী = নবপত্র + আবলী। বর্ণোপরি = বর্ণ + উপরি। তদুপরি = তৎ + উপরি। পরস্পর = পর + পর। সন্দর্শনে = সম্ + দর্শনে।

সমাস ॥ দেবমন্দির—দেবের উদ্দেশে মন্দির—চতুর্থীতৎ। বঙ্গাব্দের—বঙ্গ প্রচলিত অব্দ—মধ্যপ-কর্মধা, তার। নিদাঘশেষে—নিদাঘের শেষ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। অশ্বারোহী—অশ্বে আরোহী—সপ্তমীতৎ। দিনমণি—দিনের মণি—ষষ্ঠীতৎ। অস্তাচলগমনোদ্যোগী—অস্তের নিমিত্ত অচল—চতুর্থীতৎ, তাতে গমন—সপ্তমীতৎ, তাতে উদ্যোগী—সপ্তমীতৎ। কালধর্মে—কালের ধর্ম—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। প্রদোষকালে—প্রদোষ যে কাল—কর্মধা, তাতে। নিরাশ্রয়ে—নেই আশ্রয় যেখানে—নঞ্-বহুব্রী, সেখানে। সূর্যাস্ত—সূর্যের অস্ত

—ষষ্ঠীতৎ। নীলনীরদমালায়—নীর দান করে যে—উপপদতৎ, নীল যে নীরদ—কর্মধা, তার মালা—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। নিশারম্ভেই—নিশার আরম্ভ—ষষ্ঠীতৎ, তাতেই। দিগন্ত-সংস্থিত—দিকের অন্ত—ষষ্ঠীতৎ, তাতে সংস্থিত—সপ্তমীতৎ। অশ্বচালনা—অশ্বকে চালনা—দ্বিতীয়াতৎ। বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত—বিদ্যুতের দীপ্তি—ষষ্ঠীতৎ, তার দ্বারা প্রদর্শিত—তৃতীয়াতৎ। মহারবে—মহা যে রব—কর্মধা, তাতে। বৃষ্টি-ধারা—বৃষ্টির ধারা—ষষ্ঠীতৎ। ঘোটকারূঢ়—ঘোটকে আরূঢ়—সপ্তমীতৎ। গন্তব্যপথের—যা গন্তব্য, তাই পথ—কর্মধা, তার। অশ্ব-বল্গা—অশ্বের বল্গা—ষষ্ঠীতৎ। যথেচ্ছ—ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব। দ্রব্যসংঘাতে—দ্রব্যের দ্বারা সংঘাত—তৃতীয়াতৎ, তাতে। পদস্খলন—পদের স্খলন—ষষ্ঠীতৎ। ধবলাকার—ধবল আকার যার—ষষ্ঠীতৎ। চকিত-মাত্র—কেবল চকিত—নিত্যসমাস। ভূতলে—ভূ-র তল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। অবতরণ-মাত্র—কেবল অবতরণ—নিত্যসমাস। প্রস্তরনির্মিত—প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত—তৃতীয়া-তৎ। সোপানাবলীর—সোপানের আবলী—ষষ্ঠীতৎ, তার। আশ্রয়-স্থান—আশ্রয়ের নিমিত্ত স্থান—চতুর্থীতৎ। সোপানমার্গে—যা সোপান, তাই মার্গ—কর্মধা, তাতে। পদক্ষেপ—পদের ক্ষেপ—ষষ্ঠীতৎ। তড়িদালোকে—তড়িতের আলোক—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সম্মুখস্থ—সম্মুখে থাকে যা—উপপদতৎ। হস্তমার্জনে—হস্তের দ্বারা মার্জন—তৃতীয়াতৎ, তাতে। জনহীন—জনের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। প্রান্তরস্থিত—প্রান্তরে স্থিত—সপ্তমীতৎ। কৌতূহলাবিষ্ট—কৌতূহলের দ্বারা আবিষ্ট—তৃতীয়াতৎ। মস্তকোপরি—মস্তকের উপর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। ধারাপাত—ধারার পাত—ষষ্ঠীতৎ। দেবালয়মধ্যবাসী—দেবের নিমিত্ত আলয়—চতুর্থীতৎ, তার মধ্য—ষষ্ঠীতৎ, তাতে বাস করে যে—উপ-পদতৎ। বলদর্পিত—বলের দ্বারা দর্পিত—তৃতীয়াতৎ। করাঘাত—করের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ। দ্বারোন্মোচন—দ্বারের উন্মোচন—ষষ্ঠীতৎ। পদাঘাতে—পদের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ, তাতে। অমর্যাদা—নয় মর্যাদা—নঞ্‌তৎ। কর-প্রহার—করের দ্বারা প্রহার—তৃতীয়াতৎ। অর্গলচ্যুত—অর্গল থেকে চ্যুত—পঞ্চমীতৎ। মন্দিরাভ্যন্তরে—মন্দিরের অভ্যন্তর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। চীৎকারধ্বনি - চীৎকারের ধ্বনি—ষষ্ঠীতৎ। ঝটিকাবেগ—ঝটিকার বেগ—ষষ্ঠীতৎ। ভক্তিভাবে—ভক্তিপূর্ণ ভাব—কর্মধা, তাতে। মন্দিরমধ্যস্থ—মন্দিরের মধ্য—ষষ্ঠীতৎ, তাতে থাকে যে—উপপদতৎ। দেবমূর্তিকে—দেবের মূর্তি—ষষ্ঠীতৎ, তাকে। অলঙ্কারঝঙ্কার—অলঙ্কারের ঝঙ্কার—ষষ্ঠীতৎ। বাক্যব্যয়—বাক্যের ব্যয়—ষষ্ঠীতৎ। নিষ্প্রয়োজন—নেই প্রয়োজন—নঞ্‌তৎ। ভগ্নার্গলের—ভগ্ন যে অর্গল—কর্মধা, তার। আত্মশরীর—আত্মর শরীর—ষষ্ঠীতৎ। সশস্ত্র—শস্ত্রের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। অসিচর্ম—অসি ও চর্ম—দ্বন্দ্ব। কুশাঙ্কুর—কুশের অঙ্কুর—ষষ্ঠীতৎ। বামাস্বরে—বামার স্বর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সবিস্ময়ে—বিস্ময়ের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। আত্মপরিচয়—আত্মর পরিচয়—ষষ্ঠীতৎ। অবলাজাতির—নেই বল যার [স্ত্রী] —নঞ্‌-বহুব্রী, অবলা যে জাতি—কর্মধা, তার। অর্ধমূর্ছিতা—অর্ধরূপে মূর্ছিতা—দ্বিতীয়াতৎ। সায়াহ্নকালে—সায়াহ্ন যে কাল—কর্মধা, তাতে। শৈলেশ্বর—শৈলের ঈশ্বর—ষষ্ঠীতৎ। শিবপূজার—শিবের উদ্দেশে পূজা—চতুর্থীতৎ। মহাশয়—মহা

আশয় [অভিপ্রায়] যার—বহুব্রী। কথানুসারে—সারের [সরণের] অনু [পশ্চাৎ] —অব্যয়ীভাব, কথার অনুসার—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। দেবালয়-রক্ষক—দেবের উদ্দেশে আলয়—চতুর্থীতৎ, তার রক্ষক—ষষ্ঠীতৎ। নিদ্রাভঙ্গ—নিদ্রাকে ভঙ্গ—দ্বিতীয়াতৎ। ভয়প্রযুক্ত—ভয়ের দ্বারা প্রযুক্ত—তৃতীয়াতৎ। দ্বারোদ্ঘাটন—দ্বারের উদ্ঘাটন —ষষ্ঠীতৎ। দস্যুলক্ষণ—দস্যুর লক্ষণ—ষষ্ঠীতৎ। তৎস্বীকৃত—তার দ্বারা স্বীকৃত—তৃতীয়াতৎ। কষ্টসাধ্য—কষ্টের দ্বারা সাধ্য—তৃতীয়াতৎ। শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত—শ্বেত যে প্রস্তর—কর্মধা, তার দ্বারা নির্মিত—তৃতীয়াতৎ। সাবগুণ্ঠনে—অবগুণ্ঠনের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। নম্রমুখী—নম্র মুখ যার [স্ত্রী]—বহুব্রী। অনাবৃত—নয় আবৃত —নঞ্‌তৎ। হীরকমণ্ডিত—হীরকের দ্বারা মণ্ডিত—তৃতীয়াতৎ। কারুকার্যখচিত—কারুর কার্য—ষষ্ঠীতৎ, তার দ্বারা খচিত—তৃতীয়াতৎ। রত্নাভরণ—রত্ননির্মিত আভরণ —মধ্যম-কর্মধা। হীনবংশসম্ভূতা—হীন যে বংশ—কর্মধা, তা থেকে সম্ভূত [স্ত্রী]—পঞ্চমীতৎ। হীনার্যতায়—হীন যে আর্যতা—কর্মধা, তাতে। সহচারিণী—সহ [সঙ্গে] চারণ করে যে [স্ত্রী]—উপপদতৎ। সচরাচর—নয় চর—নঞ্‌তৎ, চর ও অচর—দ্বন্দ্ব, চরাচরের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। বয়ঃক্রম—বয়সের ক্রম—ষষ্ঠীতৎ। পঞ্চত্রিংশৎ —পঞ্চ অধিক ত্রিংশৎ—মধ্যপ-কর্মধা। বয়োজ্যেষ্ঠারই—বয়সে জ্যেষ্ঠা—সপ্তমীতৎ, তারই। কথোপকথন—কথনের সদৃশ—অব্যয়ীভাব, কথা ও উপকথন—দ্বন্দ্ব। বেশ-ধারিণী—বেশ ধারণ করে যে [স্ত্রী]—উপপদতৎ। দীপরশ্মিসমূহ দীপের রশ্মি—ষষ্ঠীতৎ, তার সমূহ—ষষ্ঠীতৎ। পঞ্চবিংশতি—পঞ্চ অধিক বিংশতি—মধ্যপ-কর্মধা। অসৌষ্ঠবের—নয় সৌষ্ঠব—নঞ্‌তৎ, তার। বক্ষোবিশালতা—বক্ষের বিশালতা—ষষ্ঠীতৎ। সর্বাঙ্গের—সর্ব অঙ্গ—কর্মধা, তার। প্রচুরায়ত—প্রচুর আয়ত যার—বহুব্রী। শ্রীসম্পাদক—শ্রী সম্পাদন করে যা—উপপদতৎ। প্রাবৃট্‌সম্ভূত—প্রাবৃট্‌ থেকে সম্ভূত —পঞ্চমীতৎ। নবদূর্বাদলতুল্য—নব যে দূর্বা—কর্মধা, তার দল—ষষ্ঠীতৎ, তার তুল্য—ষষ্ঠীতৎ। কটিবন্ধে—কটির বন্ধ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। কোষসম্বদ্ধ—কোষের দ্বারা সম্বদ্ধ —তৃতীয়াতৎ। রত্নহার—রত্ন-নির্মিত হার—মধ্যপ-কর্মধা। অভদ্রতা—নয় ভদ্রতা—নঞ্‌তৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ মন্দির—মন্দ্‌+ইর [অধিকরণবা]। নিদাঘ—নি-দহ্‌+ঘঞ্‌। আরোহী—আরোহ [আ-রুহ্‌+ঘঞ্‌]+ইন্‌। একাকী—এক+আকিন্‌। উদ্যোগী—উদ্যোগ [উৎ-যুজ্‌+ঘঞ্‌]+ইন্‌। সঞ্চালন—সম্‌-চল্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। প্রকাণ্ড—প্র-কম্‌+ণিচ্‌+ড [কর্মবা]। বৃষ্টি—বৃষ্‌+ক্তি। আরম্ভ আ-রভ্‌+ঘঞ্‌। আশ্রয়—আ-শ্রি+ঘঞ্‌। পীড়িত—পীড়্‌+ক্ত [কর্মবা]। সূর্য—সৃ+ণ্যৎ [কর্তৃবা]। অস্ত—অস্‌+ক্ত [অধিকরণবা]। নৈশ—নিশা+ষ্ণ। নীরদ—নীর-দা+ক। আবৃত আ-বৃ+ক্ত [কর্মবা]। ঘোরতর—ঘোর+তর। সংস্থিত—সম্‌-স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। চালনা—চল্‌+ণিচ্‌+অনট্‌+আ। কঠিন—কঠ+ইন [কর্তৃবা]। বোধ—বুধ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। বিদ্যুৎ—বি-দ্যুৎ+ক্বিপ্‌ [কর্তৃবা]। দীপ্তি—দীপ্‌+ক্তি [ভাববা]। প্রদর্শিত—প্র-দৃশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত [কর্মবা]। নৈদাঘ—নিদাঘ+ষ্ণ। প্রধাবিত—প্র-ধাব্‌

+ক্ত [কর্তৃবা]। আরূঢ়—আ-রুহ্‌ + ক্ত [কর্তৃবা]। ব্যক্তি—বি-অন্‌জ্‌ + ক্তি। গন্তব্য—গম্‌ + তব্য। স্থিরতা—স্থির + তা। শ্লথ—শ্লথ্‌ + ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। চরণ—চর্‌ + অনট্‌ [করণবা]। দ্রব্য—দ্রু + ণ্যৎ [কর্মবা]। সংঘাত—সম্‌-হন্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। স্খলন—স্খল্‌ + অনট্‌ [ভাববা]। প্রকাশ—প্র-কাশ্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। আকার—আ-কৃ + ঘঞ্‌ [কর্মবা]। বিবেচনায়—বি-বিচ্‌ + অনট্‌ [ভাববা] + আ। অবতরণ—অব-তৃ + অনট্‌ [ভাববা]। প্রস্তর—প্র-স্তৃ + ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। নির্মিত—নিঃ-মা + ক্ত [কর্মবা]। সোপান—সহ-উপ-অন্‌ + ঘঞ্‌ [করণবা]। সংস্রব—সম্‌-স্রু + ঘঞ্‌ [ভাববা]। চরণ—চর্‌ + অনট্‌ [করণবা]। স্খলিত—স্খল্‌ + ক্ত [কর্মবা]। আশ্রয়—আ-শ্রি + ঘঞ্‌ [ভাববা]। পদক্ষেপ—পদ-ক্ষিপ্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। অচিরাৎ—অচির-অৎ + ক্বিপ্‌। কৌশল—কুশল + ষ্ণ। উপস্থিত—উপ-স্থা + ক্ত [কর্তৃবা]। রুদ্ধ—রুধ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। আবদ্ধ—আ-বন্ধ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। পথিক—পথিন্‌ + ক। বিস্মিত—বি-স্মি + ক্ত [কর্তৃবা]। কৌতূহল—কুতূহল + ষ্ণ। আবিষ্ট—আ-বিশ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। দর্পিত—দৃপ্‌ + ক্ত [কর্তৃবা]। উন্মোচন—উৎ-মুচ্‌ + অনট্‌ [ভাববা]। মুক্ত—মুচ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। অমর্যাদা—নঞ্‌-পরি-আ + দা + ঘঞ্‌ [ভাববা] + আ। আশঙ্কা—আ-শন্‌ক্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা] + আ। দারুণ—দৃ + ণিচ্‌ + উন [কর্তৃবা]। প্রহার—প্র-হৃ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। অর্গল—অর্জ্‌ + অল্‌ [করণবা]। চ্যুত—চ্যু + ক্ত [কর্মবা]। প্রবেশ—প্র-বিশ্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। প্রবাহিত—প্র-বহ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। ক্ষীণ—ক্ষি + ক্ত [কর্তৃবা]। প্রদীপ—প্র-দীপ্‌ + ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। মনুষ্য—মনু + ষ্ণ্য। মূর্তি—মূর্ছ্‌ + ক্তি [কর্তৃবা]। প্রবেষ্টা—প্র-বিশ্‌ + তৃচ্‌। অবস্থা—অব-স্থা + ক। নির্ভীক—নিঃ-ভী + ক। হাস্য—হস্‌ + ণ্যৎ [ভাববা]। প্রথমতঃ—প্রথম + তস্‌। মধ্যস্থ—মধ্য-স্থা + ক। অদৃশ্য—নঞ্‌-দৃশ্‌ + ণ্যৎ। উদ্দেশ—উৎ-দিশ্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। প্রণাম—প্র-নম্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। উত্থান—উৎ-স্থা + অনট্‌ [কর্তৃবা]। নিষ্প্রয়োজন—নিঃ-প্র-যুজ্‌ + অনট। রোধ—রুধ্‌ + ঘঞ্‌। যোজিত—যুজ্‌ + ণিচ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। ভগ্ন—ভন্‌জ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। পরিবর্ত—পরি-বৃৎ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। নিবিষ্ট—নি-বিশ্‌ + ক্ত [কর্তৃবা]। শ্রবণ—শ্রু + অনট্‌ [ভাববা]। বিশ্রাম—বি-শ্রম্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। বিঘ্ন—বি-হন্‌ + টক্‌। নিদ্রা—নি-দ্রা + ঘঞ্‌ [ভাববা] + আ। প্রশ্ন—প্রচ্ছ্‌ + ন [ভাববা]। বিস্ময়—বি-স্মি + ঘঞ্‌ [ভাববা]। ভীত—ভী + ক্ত [কর্তৃবা]। পরিচয়—পরি-চি + অল্‌ [ভাববা]। সাহস—সহস্‌ + ষ্ণ। সহচরী—সহ-চর্‌ + ঘঞ্‌ + ঈ [স্ত্রী]। অর্ধমূর্ছিতা—অর্ধ-মূর্ছ্‌ + ক্ত + আ [স্ত্রী]। নিবারণ—নি-বৃ + ণিচ্‌ + অনট্‌ [ভাববা]। যুবক—যুবা + ক। সংগ্রহ—সম্‌-গ্রহ্‌ + ঘঞ্‌ [ভাববা]। নিকটবর্তী—নিকট-বৃৎ + ঘঞ্‌ + ইন্‌। রক্ষক—রক্ষ্‌ + অক। ভৃত্য—ভৃ + ণ্যৎ। বসতি—বস + অতি। জ্যোৎস্না—জ্যোতিস্‌ + ন + আ। আলোক—আ-লোক্‌ + ঘঞ্‌। ভয়—ভী + অল্‌। প্রযুক্ত—প্র-যুজ্‌ + ক্ত। উদ্ঘাটন—উৎ-ঘট্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌ [ভাববা]। অন্তরাল—অন্তরা + ল। পর্যবেক্ষণ—পরি-অব-ঈক্ষ্‌ + অনট্‌ [ভাববা]। দৃষ্ট—দৃশ্‌ + ক্ত [কর্মবা]। স্বীকৃত—স্ব-অভূততদ্ভাবে চ্বি + কৃ + ক্ত [কর্মবা]।

সম্বরণ —সম্-বৃ+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। নবীনা—নব+ঈন+আ [স্ত্রী]। অবগুণ্ঠন —অব-গুণ্ঠ্+অনট্ [ভাববা]। নম্র—নম্+র। অনাবৃত—নঞ্-আ-বৃ+ক্ত [কর্মবা]। প্রকোষ্ঠ—প্র-কুষ্+থ। মণ্ডিত—মণ্ড্+ক্ত [কর্মবা]। খচিত—খচ্+ক্ত [কর্মবা]। পরিচ্ছদ—পরি-ছদ্+ঘঞ্। পারিপাট্য—পরিপাটি+ষ্ণ্য। হীন—হা+ক্ত [কর্মবা]। সম্ভূতা—সম্-ভূ+ক্ত+আ [স্ত্রী]। অপেক্ষা—অপ-ঈক্ষ্+ঘঞ্+আ। সম্পন্না—সম্-পদ্+ক্ত+আ [স্ত্রী]। বয়ঃক্রম—বয়ঃ-ক্রম্+ঘঞ্। বর্ষ—বৃষ্+ঘঞ্। সহজ—সহ-জন্+ড। উপলব্ধি—উপ-লভ্+ক্তি [ভাববা]। উপকথন—উপ-কথ্+অনট্ [ভাববা]। দেশীয়—দেশ+ঈয়। হিন্দুস্থানী—হিন্দুস্থান+ঈ। উপযুক্ত—উপ-যুজ্+ক্ত। স্থাপন—স্থা+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। বৎসর—বস্-স্থ+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। দীর্ঘ —দ্রাঘ্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। দৈর্ঘ্য—দীর্ঘ+ষ্ণ্য। অসৌষ্ঠব—অসুষ্ঠু+ষ্ণ। কারণ—করণ+ষ্ণ। বিশালতা—বিশাল+তা। অলৌকিক—অলোক+ষ্ণিক। শ্রীসম্পাদক—শ্রী-সম্-পদ্+ণিচ্+অক [কর্তৃবা]। মনোজ্ঞ—মনস্-জ্ঞা+ক [কর্তৃবা]। প্রসৃত —প্র-সৃ+ক্ত [কর্মবা]। সম্বদ্ধ—সম্-বন্ধ্+ক্ত [কর্মবা]। উষ্ণীষ—উষ্ণ-ঈষ্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। সন্দর্শন—সম্-দৃশ্+অনট্ [ভাববা]। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+ঘঞ্+আ। অভদ্রতা—অভদ্র+তা।

কারক ও বিভক্তি ॥ দিনমণি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। দ্রুতবেগে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। কালধর্মে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। নীলনীরদমালায়—করণে 'য়' বিভক্তি। অশ্বচালনা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। গন্তব্যপথের—সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। দ্রব্যসংঘাতে —হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। পদার্থ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। কৌশলে—করণে 'এ' বিভক্তি। অর্গল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। প্রবল বেগে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। পদাঘাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। দেবমূর্তিকে—সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তি। সবিস্ময়ে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। পরিচয়ে—করণে 'এ' বিভক্তি। পর্যবেক্ষণে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিঃসন্দেহ—ক্রিয়াবিশেষণে শূন্যবিভক্তি। হীনার্থতায়—হেত্বর্থে 'য়' বিভক্তি। গঠনগুণে —হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ দেব [বি]—দৈব [বিণ]। নিদাঘ [বি]—নৈদাঘ [বিণ]। অশ্বারোহী [বিণ]—অশ্বারোহণ [বি]। অস্তাচলগমনোদ্যোগী [বিণ]—অস্তাচলগমনোদ্যোগ [বি]। সঞ্চালন [বি]—সঞ্চালিত [বিণ]। সম্মুখ [বি]—সম্মুখীন [বিণ]। প্রবল [বিণ]—প্রাবল্য, প্রবলতা [বি]। আরম্ভ [বি]—আরব্ধ [বিণ]। নিরাশ্রয় [বি]—নিরাশ্রিত [বিণ]। পীড়িত [বিণ]—পীড়া [বি]। নৈশ [বিণ] —নিশা [বি]। নীল [বিণ]—নীলিমা [বি]। আবৃত [বিণ]—আবরণ [বি]। সংস্থিত [বিণ]—সংস্থান [বি]। চালনা [বি]—চালিত [বিণ]। কঠিন [বিণ] —কাঠিন্য, কঠিনতা [বি]। বোধ [বি]—বুদ্ধ [বিণ]। প্রদর্শিত [বিণ]—প্রদর্শন [বি]। নৈদাঘ [বিণ]—নিদাঘ [বি]। প্রধাবিত [বিণ]—প্রধাবন [বি]। ঘোটকারূঢ় [বিণ]—ঘোটকারোহণ [বি]। গন্তব্য [বিণ]—গমন [বি]। স্থিরতা [বি]—স্থির [বিণ]। সংঘাত [বি]—সংহত [বিণ]। স্খলন [বি]—স্খলিত

[বিণ]। প্রকাশ [বি]—প্রকাশিত [বিণ]। বিবেচনা [বি]—বিবেচিত [বিণ]। অবতরণ [বি]—অবতীর্ণ [বিণ]। নির্মিত [বিণ]—নির্মাণ [বি]। সংস্রব [বি] —সংস্কৃত [বিণ]। আশ্রয় [বি]—আশ্রিত [বিণ]। স্থান [বি]—স্থানীয়, স্থানিক [বিণ]। আলোক [বি]—আলোকিত [বিণ]। মার্জন [বি]—মার্জিত [বিণ]। রুদ্ধ [বিণ]—রোধ [বি]। সময় [বি]—সাময়িক [বিণ]। অর্গল [বি]—অর্গলিত [বিণ]। বিস্মিত [বিণ]—বিস্ময় [বি]। কৌতূহলাবিষ্ট [বিণ]—কৌতূহলাবেশ [বি]। কৌতূহল [বি]—কৌতূহলী [বিণ]। দর্পিত [বিণ]—দর্প [বি]। করাঘাত [বি]—করাহত [বিণ]। দ্বার [বি]—দৌবারিক [বিণ]। উন্মোচন [বি]—উন্মোচিত [বিণ]। ইচ্ছা [বি]—ঐচ্ছিক [বিণ]। .আশঙ্কা [বি]—আশঙ্কিত [বিণ]। প্রহার [বি]—প্রহৃত [বিণ]। চ্যুত [বিণ]—চ্যুতি [বি]। প্রবেশ [বি]—প্রবিষ্ট [বিণ]। নির্ভীক [বিণ]—নির্ভীকতা [বি]। পুরুষ [বিণ]—পৌরুষ [বি]। প্রণাম [বি]—প্রণত [বিণ]। উত্থান [বি]—উত্থিত [বিণ]। উত্তর [বি]—উত্তীর্ণ [বিণ]। অলঙ্কার [বি]—অলঙ্কৃত [বিণ]। ঝঙ্কার [বি]—ঝঙ্কৃত [বিণ]। বৃথা [বি]—ব্যর্থ [বিণ]। যোজিত [বিণ]—যোজন [বি]। পরিবর্ত [বি]—পরিবর্তিত [বিণ]। শ্রবণ [বি]—শ্রুত [বিণ]। বিশ্রাম [বি]—বিশ্রান্ত [বিণ]। বিঘ্ন [বি]—বিঘ্নিত [বিণ]। নিদ্রা [বি]—নিদ্রিত [বিণ]। প্রশ্ন [বি]—পৃষ্ট [বিণ]। বিস্ময় [বি]—বিস্মিত [বিণ]। পরিচয় [বি]—পরিচিত [বিণ]। ভীত [বিণ]—ভয় [বি । আশঙ্কা [বি]—আশঙ্কিত [বিণ]। সাহস [বি]—সাহসী, সাহসিক [বিণ]। সায়াহ্ন [বি]—সায়াহ্নিক [বিণ]। কাল [বি]—কালিক [বিণ]। ঈশ্বর [বিণ]—ঐশ্বর্য [বি]। ঝড় [বি]—ঝড়ো [বিণ]। মঙ্গল [বি]—মাঙ্গলিক [বিণ]। নিবারণ [বি]—নিবারিত [বিণ]। সংগ্রহ [বি]—সংগৃহীত [বিণ]। গ্রাম [বি]—গ্রাম্য, গ্রামীণ [বিণ]। অগ্নি [বি]—আগ্নেয় [বিণ]। অনুসার [বি]—অনুসৃত [বিণ]। রক্ষক [বিণ]—রক্ষণ [বি]। ভয়প্রযুক্ত [বিণ]—ভয়প্রয়োগ [বি]। দ্বারোদ্ঘাটন [বি]—দ্বারোদ্ঘাটিত [বিণ]। দৃষ্ট [বিণ]—দর্শন, দৃষ্টি [বি]। প্রদীপ [বি] —প্রদীপ্ত [বিণ]। নির্মিত [বিণ]—নির্মাণ [বি]। মূর্তি [বি]—মূর্ত [বিণ]। স্থাপিত [বিণ]—স্থাপন [বি]। পশ্চাৎ [বি]—পাশ্চাত্য [বিণ]। অবগুণ্ঠন [বি] —অবগুণ্ঠিত [বিণ]। আবৃত [বিণ]—আবরণ [বি]। মণ্ডিত [বিণ]—মণ্ডন [বি]। পরিচ্ছদ [বি]—পরিচ্ছন্ন [বিণ]। পারিপাট্য [বি]—পরিপাটি [বিণ]। নিঃসন্দেহ [বি]—নিঃসন্দিগ্ধ [বিণ]। বর্ষ [বি]—বার্ষিক, বর্ষীয় [বিণ]। যুবা [বিণ]—যৌবন [বি]। উপলব্ধি [বি]—উপলব্ধ [বিণ]। সহিত [বিণ]—সাহিত্য [বি]। সমূহ [বি]—সামূহিক [বিণ]। প্রপতিত [বিণ]—প্রপতন [বি]। অধিক [বিণ]—আধিক্য [বি]। শরীর [বি]—শারীরিক [বিণ]। দীর্ঘ [বিণ]—দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য [বি]। শ্রীসম্পাদক [বিণ]—শ্রীসম্পাদন [বি]। সম্ভূত [বিণ]—সম্ভব [বি]। মনোজ্ঞ [বিণ]—মনোজ্ঞতা [বি]। কান্তি [বি]—কান্ত [বিণ]

বসন্ত [বি]—বাসন্ত, বাসন্তিক [বিণ]। প্রসূত [বিণ]—প্রসব [বি]। জাতি [বি]—জাতীয় [বিণ]। শোভা [বি]—শোভিত [বিণ]। পরস্পর [বি]—পারস্পরিক [বিণ]। পরিচয় বি]—পরিচিত [বিণ]। ব্যগ্র [বিণ]—ব্যগ্রতা [বি]। জিজ্ঞাসা [বি]—জিজ্ঞাসিত, জিজ্ঞাসু [বিণ]। অভদ্রতা [বি]—অভদ্র [বিণ]। স্বীকার [বি]—স্বীকৃত [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ শেষ—শুরু। পুরুষ—নারী। গমন—আগমন। অস্তাচল—উদয়াচল। দ্রুত—ধীর। সূর্যাস্ত—সূর্যোদয়। আবৃত—অনাবৃত। অন্ধকার—আলোক। কঠিন—সহজ। স্থিরতা—অস্থিরতা। অবতরণ—আরোহণ। ক্ষুদ্র—বৃহৎ। রুদ্ধ—মুক্ত। ভিতর—বাহির। আবদ্ধ—উন্মুক্ত। উন্মোচন—আবরণ। প্রবেশ—প্রস্থান। নির্ভীক—ভীরু। উত্থান—পতন। সশস্ত্র—নিরস্ত্র। বিঘ্ন—নির্বিঘ্ন। প্রশ্ন—উত্তর। সাহস—ভয়। নিবারণ—অবারণ। ভৃত্য—প্রভু। নিকটে—দূরে। প্রযুক্ত—বিযুক্ত। স্বীকৃত—অস্বীকৃত। সম্বরণ—অসম্বরণ। পশ্চাৎ—সম্মুখ। নবীনা—প্রবীণা। নম্রমুখী—ঊর্ধ্বমুখী। হীনবংশসম্ভূতা—উচ্চবংশসম্ভূতা। দ্বিতীয়—অদ্বিতীয়। হীনার্ঘতা—মহার্ঘতা। বয়োজ্যেষ্ঠা—বয়োকনিষ্ঠা। উপযুক্ত—অনুপযুক্ত। প্রপতিত—সমুত্থিত। অধিক—অনধিক। ইচ্ছুক—অনিচ্ছুক।

লিঙ্গান্তর ॥ দেব—দেবী। আরোহী—আরোহিণী। পুরুষ—স্ত্রী। একাকী—একাকিনী। অশ্ব—অশ্বা। পীড়িত—পীড়িতা। ঘোটক—ঘোটকী। দেবালয়মধ্যবাসী—দেবালয়মধ্যবাসিনী। মনুষ্য—মনুষী। রাজপুত—রাজপুতানী। বামা—পুরুষ। সুন্দরী—সুন্দর। রমণী—পুরুষ। যুবক—যুবতী। ঈশ্বর—ঈশ্বরী। রক্ষক—রক্ষিকা। ভৃত্য—দাসী। নবীনা—নবীন। হীনবংশসম্ভূতা—হীনবংশসম্ভূত। সহচারিণী—সহচারী। বেশধারিণী—বেশধারী। শ্রীসম্পাদক—শ্রীসম্পাদিকা।

বাচ্যান্তর ॥ ১. দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন [কর্তৃবাচ্য]।>দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী কর্তৃক দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালিত হইতে লাগিল [কর্মবাচ্য]। ২. ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল [কর্মবাচ্য]।>ক্রমে নৈশ গগনকে নীলনীরদমালা আবৃত করিতে লাগিল [কর্তৃবাচ্য]। ৩. পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন [কর্তৃবাচ্য]।>পথিক কর্তৃক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিতমাত্র দৃষ্ট হইল [কর্মবাচ্য]। ৪. অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন [কর্তৃবাচ্য]।>অশ্বের ছাড়া হইল [ভাববাচ্য]। ৫. প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না [কর্তৃবাচ্য]।>প্রবেষ্টা কর্তৃক তাহার কিছুই দৃষ্ট হইল না [কর্মবাচ্য]।

চলিত ভাষায় রূপান্তর ॥ ১. ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।>বাংলা ৯৯৭ সনের গরমের সময়ের শেষে একদিন এক ঘোড়সওয়ার বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের রাস্তায় একা যাচ্ছিলেন। ২. দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া

অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।>সূর্য ডুবতে যাচ্ছে দেখে ঘোড়সওয়ার খুব জোরে ঘোড়া ছোটাতে লাগলেন। ৩. অশ্ব-বল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল।>ঘোড়ার লাগাম ঢিলে দেওয়ায় ঘোড়া ইচ্ছেমতো যেতে লাগলো। ৪. দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দিরমধ্যে অস্ফুট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষাণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল।>দোর খুলে যাওয়ামাত্র জোয়ান লোকটি যেই মন্দিরের ভেতরে ঢুকলেন, অমনি মন্দিরের ভেতরে অস্পষ্ট চেঁচানির আওয়াজ তাঁর কানে ঢুকলো আর সেই সময়ে খোলা দোর দিয়ে ঝড়ের ঝটকায় ওখানে যে টিমটিমে পিদিম জ্বলছিল, তা নিবে গেল। ৫. অর্ধরাত্রে ঝটিকা বৃষ্টি নিবারণ হইলে, যুবক কহিলেন, "আপনারা এইখানে কিছুকাল কোনরূপে সাহসে ভর করিয়া থাকুন। আমি একটা প্রদীপ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী গ্রামে যাই।>মাঝরাত্তিরে ঝড়জল থামলে জোয়ান লোকটি বললেন, 'আপনারা এখানে কিছু সময় কোনরকমে সাহসে ভর করে থাকুন। আমি একটা পিদিম জোগাড় করতে কাছের গাঁয়ে যাই।' ৬. মন্দিররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল।>মন্দিরের রক্ষক ভয়ে দরজা না খুলে আগে আড়াল থেকে কে এসেছে দেখতে লাগলো। ৭. তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে।>তখন তাঁর গায়ের ওপর পিদিমের আলো পড়লে মেয়েরা দেখলেন, পথিকের বয়স পঁচিশ বছরের কিছু বেশী হবে।

বাক্যান্তর ॥ দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন [সরল বাক্য]।>অশ্বারোহী যখন দেখিলেন, দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী হইলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগলেন [জটিল বাক্য]। ২. নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল [জটিল বাক্য]।>নিশারম্ভেই দিগন্তসংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল [সরল বাক্য]। ৩. চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্রাম করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব [যৌগিক বাক্য]।>চিন্তা না করিয়া আপনারা বিশ্রাম করিলে, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব [সরল বাক্য]।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **প্রদোষকালে** [সন্ধ্যাকালে]—পথিকেরা আমাদের নিষেধ না মানিয়া প্রদোষকালেই যাত্রা করিল। **যৎপরোনাস্তি** [যারপরনাই, অত্যন্ত]—সমস্ত শ্রবণ করিয়া পিতা পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। **নিশারম্ভেই** [রাত্রির সূচনায়]—আদেশ আসিবামাত্র যাত্রীদলকে নিশারম্ভেই যাত্রা করিতে হইল। **কৌতূহলাবিষ্ট** [কৌতূহলী]—আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া যাদুকরের আশ্চর্য খেলাগুলি দেখিতে লাগিলাম। **নিষ্প্রয়োজন** [অনাবশ্যক]—এখন তোমার শহরে আসা নিষ্প্রয়োজন। **কুশাঙ্কুর** [কুশের কাঁটা]—সৎপথে সাহসের

সঙ্গে চলিলে পায়ে একটি কুশাঙ্কুরও বিঁধিবেনা। **অপেক্ষাকৃত** [তুলনামূলকভাবে] —মহিমের পোশাকটি ছিল অপেক্ষাকৃত কম দামী। **বয়ঃক্রম** [বয়স]—বালকটির বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর হইবে। **এতাদৃশ** [এরূপ]—মন্দিরটি এতাদৃশ বৃহৎ যে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা॥ **যৎপরোনাস্তি** পদে 'ও'-কার হয়েছে কেন? যৎপরঃ+নাস্তি ; পদান্তের বিসর্গ পরবর্তী 'ন' ['ত'-বর্গের পঞ্চম বর্ণ]-এর অবস্থানের জন্যে 'ও'-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

তড়িতালোক শব্দটি কি শুদ্ধ? যদি অশুদ্ধ হয়, কেন অশুদ্ধ? শুদ্ধরূপ কি? তড়িৎ+আলোক ; তড়িতালোক অশুদ্ধ। স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। শুদ্ধরূপ—তড়িদালোক।

দ্বারোন্মোচন পদে 'র'-এর 'ও'-কার কেন হয়েছে? দ্বার+উন্মোচন ; 'অ'-কার বা 'আ'-কারের পর 'উ' বা 'ঊ'-কার থাকলে উভয়ের মিলিত-ফল হলো 'ও'-কার। 'দ্বার'-এর 'অ'-কার এবং 'উন্মোচন'-এর 'উ'-কার সম্মিলিত হয়ে 'ও'-কার হয়েছে।

নিষ্প্রয়োজন শব্দে 'ষ্' হওয়ার কারণ কি? নিঃ+প্রয়োজন ; ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকলে অ-আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের স্থানে 'ষ্' হয়। 'নিঃ'—এই পদের 'ই'-কারের পরবর্তী বিসর্গের স্থানে 'ষ্' হয়েছে।

□বাঙ্গালা ভাষা□

সন্ধি-বিচ্ছেদ॥ গবেষণা=গো+এষণা। কিম্ভূতকিমাকার=কিম্+ভূত+কিম্+আকার। তত্ত্ব=তৎ+ত্ব। ব্যবহার—বি+অবহার। সংস্কৃত=সম্+কৃত। উন্নতি=উৎ+নতি। রকমারি=রকম+আরি। গতাগতি=গত+অগতি। পর্যন্ত=পরি+অন্ত। পতঞ্জলি=পতৎ+অঞ্জলি [নিপাতনে]। আবির্ভাব=আবিঃ+ভাব। সংগীত=সম্+গীত।

সমাস॥ রামকৃষ্ণ—যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ—কর্মধা। লোকহিতায়—লোকের হিত—ষষ্ঠীতৎ, সেই নিমিত্ত। শিল্পনৈপুণ্য—শিল্পে নৈপুণ্য—সপ্তমীতৎ। দর্শন-বিজ্ঞান—দর্শন ও বিজ্ঞান—দ্বন্দ্ব। তত্ত্ববিচার—তত্ত্বের বিচার—ষষ্ঠীতৎ। তৈরি-ভাষা—তৈরি যে ভাষা—কর্মধা। গদাই-লস্করী—গদাই নামক লস্কর—মধ্যপ-কর্মধা। তার মতো—নিত্যসমাস। বৈদ্যনাথ—বৈদ্যদের নাথ—ষষ্ঠীতৎ। ঘরে কথা-কওয়া—ঘরে কথা কওয়া হয় যাতে—উপপদতৎ। ভিত্তিস্বরূপ—স্ব-র রূপ—ষষ্ঠীতৎ, ভিত্তির স্বরূপ—ষষ্ঠীতৎ। হীরে-মোতির—হীরে ও মোতি—দ্বন্দ্ব, তার। সাজ-পরানো-সাজ পরানো হয়েছে যাকে—উপপদতৎ। মীমাংসা-ভাষ্য—মীমাংসা বিষয়ক ভাষ্য—মধ্যপ-কর্মধা। মহাভাষ্য—মহা যে ভাষ্য—কর্মধা। অর্বাচীনকালের—নয় প্রাচীন—নঞ্-তৎ, অর্বাচীন যে কাল—কর্মধা, তার। জ্যান্ত-কথা—জ্যান্ত যে কথা—কর্মধা।

মরা-ভাষা—মরা যে ভাষা—কর্মধা। চিন্তাশক্তির—চিন্তার শক্তি—ষষ্ঠীতৎ, তার। ফুল-চন্দন—ফুল ও চন্দন—দ্বন্দ্ব। ব্রহ্মরাক্ষসী—ব্রহ্মই রাক্ষসী—কর্মধা। লতাপাতা—লতা ও পাতা—দ্বন্দ্ব। চিত্র-বিচিত্র—চিত্র ও বিচিত্র—দ্বন্দ্ব। আঁকাবাঁকা—আঁকা ও বাঁকা—দ্বন্দ্ব। ডামাডোল—ডামা ও ডোল—দ্বন্দ্ব। ভাবহীন—ভাবের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। প্রাণহীন—প্রাণের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। প্রাণপূর্ণ—প্রাণের দ্বারা পূর্ণ—তৃতীয়াতৎ। গহনা-পরা—গহনা পরেছে যে—উপপদতৎ। মেয়ে-মাত্রই—কেবলই মেয়ে—নিত্যসমাস। প্রাণস্পন্দনে—প্রাণের স্পন্দন—ষষ্ঠীতৎ, তাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ প্রাচীন—প্রাচ্ + ঈন। সংস্কৃত—সম্-কৃ + ক্ত [কর্মবা]। বিদ্যা—বিদ্ + ণ্যৎ + আ। বিদ্বান—বিদ্ + বস্ [কর্তৃবা]। সমুদ্র—সম্-উন্দ্ + র [কর্তৃবা]। বুদ্ধ—বুধ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। চৈতন্য—চেতন + ষ্ণ্য। শিক্ষা—শিক্ষ্ + অঙ্ + আ। পাণ্ডিত্য—পণ্ডিত + ষ্ণ্য। অবশ্য—নঞ্-বশ্ + ণ্যৎ। উৎকৃষ্ট—উৎ-কৃষ্ + ক্ত [কর্মবা]। অপ্রাকৃত—অপ্রকৃত + ষ্ণ। কল্পিত—কৃপ্ + ণিচ্ + ক্ত [কর্মধা]। চলিত—চল্ + ইত। শিল্পনৈপুণ্য—শিল্পনিপুণ + ষ্ণ্য। স্বাভাবিক—স্বভাব + ষ্ণিক। গবেষণা—গো-ইষ্ + অনট্ [ভাববা] + আ। উপস্থিত—উপ-স্থা + ক্ত [কর্তৃবা]। দর্শন—দৃশ্ + অনট্ [করণবা]। বিজ্ঞান—বি-জ্ঞা + অনট্ [ভাববা]। তত্ত্ব—তৎ + ত্ব। বিচার—বি-চর্ + ঘঞ্ [ভাববা]। প্রকাশ—প্র-কাশ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। ক্রোধ—ক্রুধ্ + অল্ [ভাববা]। উপযুক্ত—উপ-যুজ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। ভঙ্গি—ভন্জ্ + ই। ব্যবহার—বি-অব-হৃ + ঘঞ্ [ভাববা]। উন্নতি—উৎ-নম্ + ক্তি [ভাববা]। উপায়—উপ-ই + ঘঞ্। লক্ষণ—লক্ষ্ + অনট্। স্থান—স্থা + অনট্। রকমারি—রকম + আরি। গ্রহণ—গ্রহ্ + অনট্। প্রাকৃতিক—প্রকৃতি + ষ্ণিক। বলবান্—বল + বতুপ্। প্রকৃতি—প্র-কৃ + ক্তি [ভাববা]। সুবিধা—সু + বিধা। পশ্চিমী—পশ্চিম + ঈ। বুদ্ধিমান্—বুদ্ধি + মতুপ্। গ্রাম্য—গ্রাম + ষ্ণ্য। ঈর্ষা—ঈর্ষ্ + অঙ্ [ভাববা] + আ। ভাসান—ভাস্ + আন। প্রাধান্য—প্রধান + ষ্ণ্য। ভাব—ভূ + ঘঞ্ [ভাববা]। বাহক—বহ্ বা বাহি + অক [কর্তৃবা]। প্রধান—প্র-ধা + অনট্। পরানো—পরা + আনো। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মণ্ + ষ্ণ। মীমাংসা—মান্ + সন্ + ঘঞ্ [ভাববা] + আ। ভাষ্য—ভাষ্ + ণ্যৎ [ভাববা]। আচার্য—আ-চর্ + ণ্যৎ [কর্তৃবা]। মানুষ—মনু [+ষ] + ষ্ণ। মরণ—মৃ + অনট্ [ভাববা]। নূতন—নূ [<নব] + তন। চিন্তা—চিন্ত্ + অঙ্ [ভাববা] + আ। ক্ষয়—ক্ষি + অচ্ [ভাববা]। রাশীকৃত—রাশি + অভূততদ্ভাবে চ্বি + কৃ + ক্ত [কর্মবা]। চেষ্টা—চেষ্ট্ + অঙ্ [ভাববা] + আ। বিশেষণ—বি-শিষ্ + অনট্ [ভাববা]। প্যাচওয়া—প্যাচ + ওয়া। উৎসন্ন—উৎ-সদ্ + ক্ত [কর্তৃবা]। আরম্ভ—আ-রভ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। উদয়—উৎ-ই + ঘঞ্ [ভাববা]। রাক্ষসী—রক্ষস্ + ষ্ণ + ঈ [স্ত্রী]। কান্না—কাঁদ্ + না। আবির্ভাব—আবিঃ-ভূ + ঘঞ্ [ভাববা]। সংগীত—সম্-গী + ক্ত [কর্মবা]। জাতীয়—জাতি + ঈয়। ভাবময়—

ভাব+ময়ট্। মূর্তি—মূর্ছ্+ক্তি [ভাববা]। ভক্তি—ভজ্+ক্তি [ভাববা]। স্পন্দন—স্পন্দ্+অনট্ [ভাববা]।

কারক বিভক্তি ॥ সংস্কৃতয়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। লোকহিতায়—নিমিত্তে চতুর্থী [সং]। সকলেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। স্বাভাবিক ভাষা—কর্মে শূন্য-বিভক্তি। দশজনে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। চোটে—করণে 'এ' বিভক্তি। কোন্‌টি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। হাওয়া—কর্মে শূন্যবিভক্তি। লোকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। সংস্কৃতর—কর্মপ্রবচনীয় যোগে 'র'। এথায়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। যাতে করণে 'তে' বিভক্তি। বাঁদর—কর্মে শূন্যবিভক্তি। আওয়াজে—করণে 'এ' বিভক্তি। প্রাণস্পন্দনে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ দেশ [বি]—দেশীয় [বিণ]। সমুদ্র [বি]—সামুদ্রিক [বিণ]। বুদ্ধ [বি]—বৌদ্ধ [বিণ]। চৈতন্য [বিণ]—চেতন [বি]। শিক্ষা [বি]—শিক্ষিত [বিণ]। পাণ্ডিত্য [বি]—পণ্ডিত [বিণ]। উৎকৃষ্ট [বিণ]—উৎকর্ষ [বি]। অপ্রাকৃত [বিণ]—অপ্রকৃত [বি]। কল্পিত [বিণ]—কল্পনা [বি]। শিল্পনৈপুণ্য [বি]—শিল্পনিপুণ [বিণ]। স্বাভাবিক [বিণ]—স্বভাব, স্বাভাবিকতা [বি]। অস্বাভাবিক [বিণ]—অস্বাভাবিকতা [বি]। গবেষণা [বি]—গবেষক [বিণ]। উপস্থিত [বিণ]—উপস্থিতি [বি]। দর্শন [বি]—দার্শনিক [বিণ]। বিজ্ঞান [বি]—বৈজ্ঞানিক [বিণ]। মন [বি]—মানস, মানসিক [বিণ]। তত্ত্ব [বি]—তাত্ত্বিক [বিণ]। বিচার [বি]—বিচার্য [বিণ]। প্রকাশ [বি]—প্রকাশিত [বিণ]। ক্রোধ [বি]—ক্রুদ্ধ [বিণ]। দুঃখ [বি]—দুঃখী, দুঃখিত [বিণ]। উপযুক্ত [বিণ]—উপযুক্ততা, উপযুক্ত [বি]। ভাব [বি]—ভাবুক, ভাবালু [বিণ]। ব্যবহার [বি]—ব্যবহৃত, ব্যবহার্য [বিণ]। পাথর [বি]—পাথুরে [বিণ]। উন্নতি [বি]—উন্নত [বিণ]। প্রধান [বিণ]—প্রাধান্য [বি]। লক্ষণ [বি]—লাক্ষণিক [বিণ]। গ্রহণ [বি]—গৃহীত [বিণ]। প্রাকৃতিক [বিণ]—প্রকৃতি [বি]। নিয়ম [বি]—নিয়মিত [বিণ]। বলবান [বিণ]—বলবত্তা [বি]। হাওয়া [বি]—হাওয়াই [বিণ]। ভেদ [বি]—ভিন্ন [বিণ]। বুদ্ধিমান্ [বিণ]—বুদ্ধিমত্তা [বি]। গ্রাম্য [বিণ]—গ্রাম্যতা [বি]। ঈর্ষা [বি]—ঈর্ষী, ঈর্ষালু, ঈর্ষান্বিত [বিণ]। কল্যাণ [বি]—কল্যাণীয় [বিণ]। বাহক [বিণ]—বাহন [বি]। মীমাংসা [বি]—মীমাংসিত [বিণ]। মানুষ [বি]—মানুষিক [বিণ]। মরণ [বি]—মৃত [বিণ]। নূতন [বিণ]—নূতনত্ব [বি]। ক্ষয় [বি]—ক্ষীণ [বিণ]। ফুল [বি]—ফুলেল [বিণ]। বিশেষণ [বি]—বিশেষিত [বিণ]। বাহাদুর [বিণ]—বাহাদুরি [বি]। উৎসন্ন [বিণ]—উৎসাদন [বি]। আরম্ভ [বি]—আরব্ধ [বিণ]। চিহ্ন [বি]—চিহ্নিত [বিণ]। উদয় [বি]—উদিত [বিণ]। শিল্প [বি]—শিল্পিত, শৈল্পিক [বিণ]। বিচিত্র [বিণ]—বৈচিত্র্য [বি]। ঝগড়া [বি]—ঝগড়াটে [বিণ]। ভরত [বি]—ভারত [বি]। ঋষি [বি]—আর্ষ [বিণ]। গান [বি]—গীত [বিণ]। ওস্তাদ

[বিণ]—ওস্তাদী [বি]। দাঁত [বি]—দেঁতো, দাঁতাল [বিণ]। নাক [বি] —নাকী [বিণ]। আবির্ভাব [বি]—আবির্ভূত [বিণ]। ক্রম [বি]—ক্রমিক [বিণ]। জাতীয় [বিণ]—জাতি, জাতীয়তা [বি]। জীবন [বি]—জৈবনিক [বিণ]। বল [বি]—বলী, বলীয়ান্, বলবান [বিণ]। মূর্তি [বি]—মূর্ত [বিণ]। ভক্তি [বি]—ভক্ত [বিণ]। স্পন্দন [বি]—স্পন্দিত [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ প্রাচীন—অর্বাচীন, আধুনিক। বিদ্বান্—মূর্খ। সাধারণ—অসাধারণ। পাণ্ডিত্য—মূর্খতা। উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট। অপ্রাকৃত—প্রাকৃত। স্বাভাবিক—অস্বাভাবিক। উপস্থিত—অনুপস্থিত। নকল—আসল। উন্নতি—অবনতি। প্রধান—অপ্রধান। বলবান্—বলহীন। পূর্ব—পশ্চিম। ভেদ—অভেদ। বেশি—কম। নিকট—দূর। অল্প—অধিক, বহুল। দেশ—বিদেশ। গ্রাম্য—শহুরে। জল—স্থল। কল্যাণ—অকল্যাণ। মরণ—জীবন। আরম্ভ—সমাপ্তি। উদয়—অস্ত। কান্না—হাসি। আবির্ভাব—তিরোভাব। জাতীয়—বিজাতীয়। দেবতা—দানব।

লিঙ্গান্তর ॥ বিদ্বান্—বিদুষী। বলবান্—বলবতী। বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমতী। বাহক—বাহিকা। প্রধান—প্রধানা। বাঁদর—বাঁদরী। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী। শবর—শবরী। স্বামী—স্ত্রী। আচার্য—আচার্যা, আচার্যানী। শংকর—শংকরী। মানুষ—মানুষী। ব্রহ্মরাক্ষসী—ব্রহ্মরাক্ষস। মুসলমান—মুসলমানী। মেয়ে—ছেলে। দেবী—দেব।

বাচ্যান্তর ॥ তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন [কর্তৃবাচ্য]।>তাঁদের সকলের কর্তৃকই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণ শিক্ষিত হয়েছেন [কর্মবাচ্য]।

সাধু ভাষায় রূপান্তর ॥ ১. বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।>বুদ্ধ হইতে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁহারা 'লোকহিতায়' আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। ২. ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।>ভাষাকে করিতে হইবে—যেমন পরিষ্কৃত ইস্পাত, মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া যাহা ইচ্ছা কর—পুনরায় যেমন ছিল তেমনই, এক আঘাতে প্রস্তর কাটিয়া যায়, দন্ত পতিত হয় না।

বাক্যান্তর ॥ ১. বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন [জটিল বাক্য]।> 'লোকহিতায়' আগত বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন [সরল বাক্য]। ২. যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর [জটিল বাক্য]।>ঘরের কথা-কওয়া ভাষাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর [সরল বাক্য]। ৩. যত

মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু' একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয় [জটিল বাক্য]।>মরণ নিকট হলে নূতন চিন্তাশক্তির ক্ষয় হয়ে দু'একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয় [সরল বাক্য]।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **লোকহিতায়** [সাধারণের মঙ্গলের জন্যে]—লোকহিতায় যুগে যুগে মহামানবগণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। **কিম্ভূতকিমাকার** [বিকট]—সে তার আনাড়ি হাতে একটা কিম্ভূতকিমাকার ছবি এঁকেছে ; যার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। **গদাই-লস্করি** [ঢিমে]—তাড়াতাড়ি না করে যদি গদাই-লস্করি চালে চলো, তাহলে জীবনেও কাজটা শেষ করতে পারবে না। **চিত্রবিচিত্র** [বিবিধ ছবিযুক্ত] —মন্দিরের দেয়ালের গায়ে কত লতাপাতা, চিত্রবিচিত্র! **ডামাডোল** [বিশৃঙ্খল অবস্থা]—যুদ্ধের ডামাডোলে সে বেশ মোটা টাকা রোজগার করে নিয়েছে।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ 'সংস্কৃতয়' এবং 'সংস্কৃতর' পদ দুটিতে 'য়' এবং 'র' বিভক্তি যোগের যুক্তি কি ? স্বরান্ত শব্দের শেষে 'য়' এবং 'র' বিভক্তি যুক্ত হওয়াই সমীচীন। সেদিক থেকে [সংস্কৃত + য় =] 'সংস্কৃতয়' এবং [সংস্কৃত + র =] 'সংস্কৃতর' পদ দুটি শুদ্ধ। কিন্তু অধুনা এই রীতি বিলুপ্তপ্রায়। আধুনিক রীতিতে পদ দুটি হবে 'সংস্কৃতে' এবং 'সংস্কৃতের'।

'রাশীকৃত' শব্দে 'ঈ'-কার হওয়ার কারণ কি ? 'রাশি' শব্দটিতে তালব্য-শ-য়ে ই-কার হয়। কিন্তু পরে 'কৃত' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় 'রাশি' শব্দটির সঙ্গে 'অভূততদ্ভাবে চ্বি' [ঈ]-প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। তার ফলে 'রাশীকৃত' শব্দে 'ঈ'-কার হয়েছে।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন্ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত : তয়ের, ইস্পাত, লস্করি, নকল, দাঁত, মোতি, রাজা, রেল। তয়ের—বিদেশী : ফার্সী শব্দ। ইস্পাত—বিদেশী : পর্তুগীজ শব্দ। লস্করি—বিদেশী : ফার্সী শব্দ। নকল—বিদেশী : আরবী শব্দ। দাঁত—তদ্ভব শব্দ [<দন্ত]। মোতি—তদ্ভব শব্দ [<মৌক্তিক]। রাজা—তৎসম শব্দ [রাজন্]। রেল—বিদেশী : ইংরেজী শব্দ : Rail।

□বই পড়া□

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ নিরর্থক = নিঃ + অর্থক। নির্মমও = নিঃ + মমও। উদ্বাহু = উৎ + বাহু। দুরাশা = দুঃ + আশা। উদ্ধারের = উৎ + হারের। সদুপায় = সৎ + উপায়। সন্দেহ = সম্ + দেহ। উত্তরাধিকারী = উৎ + তর + অধিকারী। সংস্পর্শে = সম্ + স্পর্শে। ব্যাধিই = বি + আধিই। সংক্রামক = সম্ + ক্রামক। প্রত্যক্ষ = প্রতি + অক্ষ। সাপেক্ষ = স + অপ + ঈক্ষ। সমৃদ্ধ = সম্ + ঋদ্ধ। ন্যস্ত = নি + অস্ত। অপরাপর = অপর + অপর। ভগ্নাংশ = ভগ্ন + অংশ। সোল্লাসে = স + উৎ + লাসে। উপায়ান্তর = উপায় + অন্তর। নিশ্চিন্ত = নিঃ + চিন্ত। মনোরাজ্যেও = মনঃ + রাজ্যেও।

উদ্রেক=উৎ+রেক। যথার্থ=যথা+অর্থ। উদ্বোধিত=উৎ+বোধিত। অন্তর্নিহিত =অন্তঃ+নিহিত। প্রচ্ছন্ন=প্র+ছন্ন। অভ্যস্ত=অভি+অস্ত। স্বেচ্ছায়=স্ব+ইচ্ছায়। নিষ্কর্মার=নিঃ+কর্মার। সন্তোষ=সম্+তোষ। সম্পূর্ণ=সম্+পূর্ণ। মনস্তুষ্টি=মনঃ+তুষ্টি। নিরানন্দ=নিঃ+আনন্দ। নির্জীব=নিঃ+জীব। কাব্যামৃতে =কাব্য+অমৃতে।

সমাস ॥ বইপড়া—বইকে পড়া—দ্বিতীয়াতৎ। সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সপ্তমীতৎ। কুপরামর্শ—কু যে পরামর্শ—কর্মধা। জীবনধারণ—জীবনকে ধারণ—দ্বিতীয়াতৎ। নিরর্থক—নেই অর্থ যার—নঞ্-বহুব্রী। নির্মমও—নেই মমতা যাতে—নঞ্-বহুব্রী, তাও। ফললাভ—ফলকে লাভ—দ্বিতীয়াতৎ। দুরাশা—দুঃ [দুঃখ-জনক] যে আশা—কর্মধা। সদুপায়—সৎ যে উপায়—কর্মধা। সাহিত্যচর্চা—সাহিত্যের চর্চা—ষষ্ঠীতৎ। সর্বপ্রধান—সর্বের মধ্যে প্রধান—সপ্তমীতৎ। বাজার-দর—বাজারের দর—ষষ্ঠীতৎ। প্রতিজনেই—জনে জনেই—অব্যয়ীভাব। উত্তরাধিকারী—উত্তর [পরবর্তী] যে অধিকারী—কর্মধা। কাব্যগ্রন্থও—কাব্য-বিষয়ক গ্রন্থ—মধ্যপ-কর্মধা, তাও। মহাভ্রান্তি—মহা যে ভ্রান্তি—কর্মধা। প্রত্যক্ষ—অক্ষির গোচর—অব্যয়ীভাব। জ্ঞানসাপেক্ষ—অপেক্ষার সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী, জ্ঞানের সাপেক্ষ—ষষ্ঠীতৎ। সবল—বলের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। সবল, সরাগ—বহুব্রী। দর্শন-বিজ্ঞান—দর্শন ও বিজ্ঞান—দ্বন্দ্ব। ধর্ম-নীতি—ধর্ম-বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। অনুরাগ-বিরাগ—দ্বন্দ্ব। আশা-নৈরাশ্য—দ্বন্দ্ব। অপরাপর—নয় পর—নঞ্‌তৎ, অপর ও অপর—দ্বন্দ্ব। ভগ্নাংশ—ভগ্ন যে অংশ—কর্মধা। মনগঙ্গার—মন-রূপ গঙ্গা—রূপক-কর্মধা; তার। সোল্লাসে—উল্লাসের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী; তাতে। সবেগে—বেগের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। উপায়ান্তর—অন্য উপায়—নিত্যসমাস। জাদুঘর—জাদু [পুরাকীর্তি] শোভিত ঘর—মধ্যপ-কর্মধা। লোকমত—লোকের মত—ষষ্ঠীতৎ। সমরেখায়—সম যে রেখা—কর্মধা, তাতে। স্বশিক্ষিত—স্ব-র দ্বারা শিক্ষিত—তৃতীয়াতৎ। দাতাকর্ণ—দাতা যে কর্ণ—কর্মধা। দ্বারস্থ—দ্বারে থাকে যে—উপপদতৎ। নিশ্চিন্ত—নেই চিন্তা যার—নঞ্-বহুব্রী। অমূলক—নেই মূল যার—নঞ্-বহুব্রী। মনোরাজ্যেও—মন-রূপ রাজ্য—রূপক-কর্মধা, তাতেও। শিক্ষাদান—শিক্ষাকে দান—দ্বিতীয়াতৎ। বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির বৃত্তি—ষষ্ঠীতৎ। জ্ঞান-পিপাসা—জ্ঞানের নিমিত্ত পিপাসা—চতুর্থীতৎ। অন্তর্নিহিত—অন্তরে নিহিত—সপ্তমীতৎ। উত্তরসাধক—উত্তর [পরবর্তী] যে সাধক—কর্মধা। শিক্ষিত-সম্প্রদায়—শিক্ষিতদের সম্প্রদায়—ষষ্ঠীতৎ। উদরপূর্তির—উদরের পূর্তি—ষষ্ঠীতৎ, তার। নিষ্কর্মার—নেই কর্ম যার—নঞ্-বহুব্রী, তার। স্বেচ্ছায়—স্ব-র ইচ্ছা—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। মনস্তুষ্টি—মনের তুষ্টি—ষষ্ঠীতৎ। দেহরক্ষা—দেহের রক্ষা—ষষ্ঠীতৎ। আত্মরক্ষা—আত্ম-র রক্ষা—ষষ্ঠীতৎ। অকর্তব্য—নয় কর্তব্য—নঞ্‌তৎ। দুর্বল—দুঃ [মন্দ] বল যার—বহুব্রী। নিরানন্দ—নেই আনন্দ যার—নঞ্-বহুব্রী। নির্জীব—নেই জীব [জীবন] যার—নঞ্-বহুব্রী। মনপ্রাণ—মন ও প্রাণ—দ্বন্দ্ব। সজীব—জীবের [জীবনের] সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। সতেজ—তেজের সঙ্গে বর্তমান

—বহুব্রী। সরাগ—রাগের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। জীবনীশক্তি—জীবন-দায়িনী শক্তি—মধ্যপ-কর্মধা। অনুসারে—সারের পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব, তাতে। অর্থনীতি—অর্থ-বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। ধর্মনীতি—ধর্ম-বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। নিঃসন্দেহ—নেই সন্দেহ যার—নঞ্-বহুব্রী। সপক্ষে—পক্ষের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। বাক্যব্যয়—বাক্যের ব্যয়—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব-প্রশস্য>শ্র+ইষ্ঠ। পরামর্শ—পরা-মৃশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রথমতঃ—প্রথম+তস্। গ্রাহ্য—গ্রহ্+ণ্যৎ [কর্মবা]। রোগ—রুজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। শোক—শুচ+ঘঞ্ [ভাববা]। দারিদ্র্য—দরিদ্র+ষ্ণ্য। জীবন—জীব্+অনট্ [ভাববা]। ধারণ—ধৃ+অনট্ [ভাববা]। প্রধান—প্র-ধা+অনট্। সমস্যা—সম্-অস্+ণ্যৎ [কর্মবা]+আ। প্রস্তাব—প্র-স্তু+ঘঞ্ [ভাববা]। সাহিত্য—সহিত+ষ্ণ্য। উপভোগ—উপ-ভুজ্+ঘঞ [ভাববা]। প্রস্তুত—প্র-স্তু+ক্ত [কর্তৃবা]। শিক্ষা—শিক্ষ্+অচ্+আ। উদ্ধার—উৎ-হৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। সদুপায়—সৎ-উপ-ই+ঘঞ্। মাহাত্ম্য—মহাত্মা+ষ্ণ্য। বিশ্বাস—বি-শ্বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। সন্দেহ—সম্-দিহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। শিষ্য—শাস্+ণ্যৎ [কর্মবা]। মানুষ—মনু [+ষ]+ষ্ণ। বিশিষ্ট—বি-শিষ্+ক্ত। অভিজাত—অভি-জন্+ক্ত। সভ্যতা—সভ্য+তা। অধিকারী—অধিকার+ইন্। সংস্পর্শ—সম্-স্পৃশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আত্মসাৎ—আত্মন্+সাৎ। স্পষ্ট—স্পশ্+ক্ত [কর্মবা]। ব্যাধি—বি-আ-ধা+ই [করণবা]। সংক্রামক—সম্-ক্রম্+অক [কর্তৃবা]। স্বাস্থ্য—সুস্থ+ষ্ণ্য। সার্থকতা—সার্থক+তা। সমাজ—সম্-অজ্+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। লোলুপ্—লুপ্+যঙ্লুক+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। দৃষ্টি—দৃশ্+ক্তি [ভাববা]। সন্দিহান্—সম্-দিহ্+আন্ [কর্তৃবা]। আবৃত্তি—আ-বৃত্+ক্তি [ভাববা]। পেশাদার—পেশা+দার। ভ্রান্তি—ভ্রম্+ক্তি [ভাববা]। ভাণ্ডার—ভাণ্ড+আর। ভবানী—ভব+আনী। সৃষ্টি—সৃজ্+ক্তি। সাপেক্ষ—সহ-অপ-ঈক্ষ্+ঘঞ্। সমৃদ্ধ—সম্-ঋধ্+ক্ত [কর্মবা]। ন্যস্ত—নি-অস্+ক্ত [কর্মবা]। দর্শন—দৃশ্+অনট্। বিজ্ঞান—বি-জ্ঞা+অনট্। ধর্ম—ধৃ+ম [কর্মবা]। নীতি—নী+ক্তি [ভাববা]। অনুরাগ—অনু-রন্জ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিরাগ—বি-রন্জ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আশা—আ-অশ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। নৈরাশ্য—নিরাশ+ষ্ণ্য। সমবায়—সম্-অব-ই+ঘঞ্ [ভাববা]। জন্ম—জন্+মন্ [ভাববা]। শাস্ত্র—শাস্+ত্র [করণবা]। সাক্ষাৎ—সহ-অক্ষি-অৎ+ক্বিপ্ [কর্তৃবা]। গঙ্গা—গম্+গ [কর্তৃবা]+আ। স্রোত—স্রু+ত [কর্তৃবা]। আবহমান—আ-বহ্+শানচ্ [কর্তৃবা]। উল্লাস—উৎ-লস্+ঘঞ্ [ভাববা]। অবগাহন—অব-গাহ্+অনট্ [ভাববা]। মুক্ত—মুচ্+ক্ত [কর্মবা]। মন্দির—মন্দ্+ইর [অধিকরণবা]। কারখানা—কার+খানা। চিড়িয়াখানা—চিড়িয়া+খানা। প্রতিষ্ঠা—প্রতি-স্থা+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। উপকার—উপ-কৃ+ঘঞ্। রসিকতা—রসিক+তা। অদ্ভুত—অৎ-ভূ+উত। সম্পূর্ণ—সম্-পূর্+ক্ত। বাধ্য—বাধ্+ণ্যৎ [কর্মবা]। বক্তব্য—বচ্+তব্য [কর্মবা]।

নিবেদন—নি-বিদ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। বিচার—বি-চর্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। গ্রাহ্য—গ্রহ্‌+ণ্যৎ [কর্মবা]। বিশ্বাস—বি-শ্বস্‌+ঘঞ্‌। [ভাববা]। দ্বারস্থ—দ্বার-স্থা+ক। আরাম—আ-রম্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। অমূলক—নঞ্‌-মূল+ক। গ্রহণ—গ্রহ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। গ্রহীতা—গ্রহ্‌+তৃচ্‌। ঐশ্বর্য—ঈশ্বর+ষ্ণ্য। সন্ধান—সম-ধা+অনট্‌। কৌতূহল—কুতূহল+ষ্ণ। উদ্রেক—উৎ-রিচ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। জাগ্রত—অশুদ্ধ, শুদ্ধরূপ—জাগ্রৎ—জাগৃ+শতৃ। পিপাসা—পা+সন্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]+আ। জলন্ত—জ্বল্‌+অন্ত। উদ্বোধিত—উৎ-বুধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত [কর্মবা] অন্তর্নিহিত—অন্তঃ-নি-ধা+ক্ত [কর্তৃবা]। প্রচ্ছন্ন—প্র-ছদ্‌+ক্ত [কর্মবা]। শক্তি—শক্‌+ক্তি [ভাববা]। মুক্ত—মুচ্‌+ক্ত [কর্মবা]। ব্যক্ত—বি-অন্‌জ্‌+ক্ত [কর্মবা]। সাধনা—সাধ্‌+অনট্‌ [ভাববা]+আ। সাধক—সাধ্‌+অক। সম্প্রদায়—সম্‌-প্র-দা+ঘঞ্‌ [কর্মবা]। স্পর্শ—স্পৃশ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। সাক্ষাৎ—সহ-অক্ষি-অৎ+ক্বিপ্‌। পূর্তি—পূর্‌+ক্তি। অভ্যস্ত—অভি-অস্‌+ক্ত [কর্তৃবা]। অস্বীকার—নঞ্‌-স্ব-অভূততদ্ভাবে চ্বি+কৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। সন্তোষ—সম্‌ তুষ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। মনস্তুষ্টি—মনঃ-তুষ্‌+ক্তি। কর্তব্য—কৃ+তব্য। নিরানন্দ—নিঃ-আ-নন্দ্‌+ঘঞ্‌। অনুসার—অনু-সৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। কাব্য—কবি+ষ্ণ্য। অমৃত—নঞ্‌-মৃ+ক্ত [কর্তৃবা]। নিঃসন্দেহ—নিঃ-সম্‌-দিহ্‌+ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]।

কারক-বিভক্তি ॥ বই—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পরামর্শ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। অনেকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। সকলেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। লোকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। হাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। প্রতিজনেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। জজে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। সমবায়ে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। মনগঙ্গার—অপাদানে 'র' বিভক্তি। সোল্লাসে, সবেগে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। মানুষে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। অনেকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। লোকমাত্রেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। সুদে, আরামে—কারণে 'এ' বিভক্তি। শক্তির বলে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিজে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। দায়ে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। উদরপূর্তিতে—করণে 'তে' বিভক্তি। স্পর্শেই—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ রোগ [বি]—রুগ্‌ণ [বিণ]। দুঃখ [বি]—দুঃখী, দুঃখিত [বিণ]। দারিদ্র্য [বি]—দরিদ্র [বিণ]। জীবন [বি]—জৈবনিক [বিণ]। প্রধান [বিণ]—প্রাধান্য [বি]। সুন্দর [বিণ]—সৌন্দর্য [বি]। মহৎ [বিণ]—মহত্ত্ব [বি]। প্রস্তাব [বি]—প্রস্তাবিত [বিণ]। নিরর্থক [বিণ]—নিরর্থকতা [বি]। নির্মম [বিণ]—নির্মমতা [বি]। সাহিত্য [বি]—সাহিত্যিক [বিণ]। রস [বি]—রসিক, রসালো [বিণ]। উপভোগ [বি]—উপভোগ্য [বিণ]। প্রস্তুত [বিণ]—প্রস্তুতি [বি]। বিশ্বাস [বি]—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী [বিণ]। ত্যাগ [বি]—ত্যক্ত, ত্যাগী [বিণ]। উদ্ধার [বি]—উদ্ধৃত [বিণ]। মাহাত্ম্য [বি]—মহাত্মা [বিণ]। বিষয় [বি]—বৈষয়িক, বিষয়ী [বিণ]। সন্দেহ [বি]—সন্দিগ্ধ [বিণ]। ফল [বি]—ফলিত, ফলবান [বিণ]। সার্থকতা [বি]—সার্থক [বিণ]। বড়ো-

মান্থষ [বিণ]—বড়োমান্থষি [বি]। বিশিষ্ট [বিণ]—বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা [বি]। অভিজাত [বিণ]—আভিজাত্য [বি]। উত্তরাধিকারী [বিণ]—উত্তরাধিকার [বি]। সংস্পর্শ [বি]—সংস্পৃষ্ট [বিণ]। গুণ [বি]—গুণী, গুণবান্ [বিণ]। দোষ [বি] —দুষ্ট, দূষিত [বিণ]। সংক্রামক [বিণ]—সংক্রম, সংক্রমণ [বি]। স্বাস্থ্য [বি] —সুস্থ [বিণ]। লোলুপ [বিণ]—লোলুপতা [বি]। মহাভ্রান্তি [বি]—মহাভ্রান্ত [বিণ]। ভাণ্ডার [বি]—ভাণ্ডারী [বিণ]। শূন্য [বিণ]—শূন্যতা [বি]। জাতি [বি]—জাতীয় [বিণ]। মন [বি]—মানস, মানসিক [বিণ]। সবল [বিণ]—সবলতা [বি]। সমৃদ্ধ [বিণ]—সমৃদ্ধি [বি]। মান্থষ [বি]—মান্থষিক [বিণ]। দর্শন [বি]—দার্শনিক [বিণ]। বিজ্ঞান [বি]—বৈজ্ঞানিক [বিণ]। ধর্ম [বি]—ধর্মীয়, ধার্মিক [বিণ]। নীতি [বি]—নৈতিক [বিণ]। অনুরাগ [বি]—অনুরক্ত [বিণ]। বিরাগ [বি]—বিরক্ত [বিণ]। সমবায় [বি]—সমবায়িক, সমবায়ী [বিণ]। জন্ম [বি]—জাত [বিণ]। শাস্ত্র [বি]—শাস্ত্রীয় [বিণ]। গঙ্গা [বি] —গাঙ্গেয় [বিণ]। আবহমান [বিণ]—আবহমানতা [বি]। অবগাহন [বি] —অবগাঢ় [বিণ]। প্রতিষ্ঠা [বি]—প্রতিষ্ঠিত [বিণ]। উপকার [বি]—উপকারী, উপকৃত [বিণ]। কম [বিণ]—কমতি [বি]। সম্পূর্ণ [বিণ]—সম্পূর্ণতা [বি]। সচেতন [বিণ]—সচেতনতা [বি]। বাধ্য [বিণ]—বাধ্যতা [বি]। নিবেদন [বি]—নিবেদিত [বিণ]। সত্য [বি]—সত্যবাদী [বিণ]। মিথ্যা [বি] —মিথ্যুক, মিথ্যাবাদী [বিণ]। বিচার [বি]—বিচার্য [বিণ]। বিশ্বাস [বি] —বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত [বিণ]। বিদ্যা [বি]—বিদ্যাবান্, বিদ্বান [বিণ]। অর্জন [বি]—অর্জিত [বিণ]। সক্ষম [বিণ]—সক্ষমতা [বি]। পথ [বি]—পাথেয় [বিণ]। সন্ধান [বি]—সন্ধানী [বিণ]। কৌতূহল [বি]—কৌতূহলী [বিণ]। উদ্রেক [বি]—উদ্রিক্ত [বিণ]। জাগ্রত [অশুদ্ধ, শুদ্ধরূপ—জাগ্রৎ] [বিণ]—জাগৃতি, জাগরণ [বি]। জ্ঞানপিপাসা [বি]—জ্ঞানপিপাসু [বিণ]। যথার্থ [বিণ]—যাথার্থ্য, যথার্থতা [বি]। গুরু [বিণ]—গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা [বি]। আত্মা [বি]—আত্মিক [বিণ]। উদ্বোধিত [বিণ]—উদ্বোধন [বি]। প্রচ্ছন্ন [বিণ]—প্রচ্ছন্নতা, প্রচ্ছদ [বি]। মুক্ত [বিণ]—মুক্তি [বি]। ব্যক্ত [বিণ]—ব্যক্তি [বি]। সাধনা [বি]—সাধিত, সাধক [বিণ]। স্পর্শ [বি]—স্পৃষ্ট [বিণ]। অভ্যস্ত [বিণ]—অভ্যাস [বি]। অস্বীকার [বি]—অস্বীকৃত [বিণ]। সন্তোষ [বি]—সন্তুষ্ট [বিণ]। সম্পূর্ণ [বিণ]—সম্পূর্ণতা [বি]। দেহ [বি]—দৈহিক [বিণ]। উদর [বি]—ঔদরিক [বিণ]। অবশ্য [বি]—আবশ্যিক [বিণ]। মানব [বি]—মানবিক [বিণ]। ইতিহাস [বি]—ঐতিহাসিক [বিণ]। সম্পর্ক [বি]—সম্পর্কিত [বিণ]। দুর্বল [বিণ]—দুর্বলতা, দৌর্বল্য [বি]। স্ফূর্তি [বি]—স্ফূর্ত [বিণ]। আনন্দ [বি]—আনন্দিত [বিণ]। বঞ্চিত [বিণ]—বঞ্চনা [বি]। অর্থ [বি]—আর্থিক [বিণ]। হ্রাস [বি]—হ্রস্ব [বিণ]। অনুসার [বি]—অনুসারী [বিণ]। জাতীয় [বিণ]—জাতীয়তা [বি]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ গ্রাহ্য—অগ্রাহ্য। শৌখিন—পেশাদার। মন—দেহ। দুঃখ—সুখ। প্রধান—অপ্রধান। সুন্দর—কুৎসিত। মহৎ—নীচ। নিরর্থক—সার্থক। আশা—দুরাশা। ত্যাগ—গ্রহণ। সদুপায়—অসদুপায়। সমুখে—পিছনে। গুরু—শিষ্য। সমান—অসমান। উলটো—সোজা। গুন—দোষ। অর্থ—অনর্থ। সুফল—কুফল। সুসার—অসার। প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ। সত্য—মিথ্যা, অসত্য। শূন্য—পূর্ণ। সৃষ্টি—ধ্বংস। সাপেক্ষ—নিরপেক্ষ। সবল—দুর্বল। সচল—অচল। অনুরাগ—বিরাগ। জন্ম—মৃত্যু। উপকার—অপকার। সম—বিষম, অসম। দাতা—গ্রহীতা। সার্থকতা—ব্যর্থতা। জাগ্রত [অশুদ্ধ]—নিদ্রিত, সুপ্ত। জ্বলন্ত—নিভন্ত। মুক্ত—বন্দী। ব্যক্ত—অব্যক্ত। বাধ্য—অবাধ্য। স্বেচ্ছা—অনিচ্ছা। দুর্বল—সবল। নিরানন্দ—সানন্দ। নির্জীব—সজীব। সপক্ষে—বিপক্ষে।

লিঙ্গান্তর ॥ প্রধান—প্রধানা। সুন্দর—সুন্দরী। মহৎ—মহীয়সী। গুরু—গুর্বী, গুরুপত্নী। শিষ্য—শিষ্যা। ভবানী—ভব। সুশিক্ষিত—সুশিক্ষিতা। দাতা—দাত্রী। গ্রহীতা—গ্রহীত্রী। শিক্ষক—শিক্ষিকা। ছাত্র—ছাত্রী। উত্তরসাধক—উত্তরসাধিকা। ছেলে—মেয়ে। মানুষ—মানুষী। মানব—মানবী।

বাচ্যান্তর ॥ ১. শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে [কর্তৃবাচ্য]।>শিক্ষার দ্বারা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূরীভূত হবে [কর্মবাচ্য]। ২. তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোন সদুপায় আমরা চোখের সামনে দেখতে পাইনে [কর্তৃবাচ্য]।>তাহলেও আমাদের কর্তৃক তা ত্যক্ত হতে পারে না, কেননা আমাদের উদ্ধারের অন্য কোন সদুপায় আমাদের কর্তৃক চোখের সামনে দৃষ্ট হয় না [কর্মবাচ্য]। ৩. সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে [কর্তৃবাচ্য]।>সেইজন্য আমাদের কর্তৃক যত বেশি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে, দেশ তত বেশি উপকৃত হবে [কর্মবাচ্য]। ৪. আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন [কর্তৃবাচ্য]।>আমার বক্তব্য আমার কর্তৃক আপনাদের কাছে নিবেদিত হচ্ছে, তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনাদের কর্তৃক কৃত হবে [কর্মবাচ্য]। ৫. যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন [কর্তৃবাচ্য]।>যিনি যথার্থ গুরু তাঁর কর্তৃক শিষ্যের আত্মা উদ্বোধিত হয় এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তি মুক্ত এবং ব্যক্ত হয় [কর্মবাচ্য]।

সাধুভাষায় রূপান্তর ॥ ১. ডেমোক্রাসির গুরুরা চেয়েছিলেন সকলকে সমান করতে, কিন্তু তাঁদের শিষ্যরা তাঁদের কথা উলটো বুঝে প্রতিজনেই হতে চায় বড়ো মানুষ।>গণতন্ত্রের গুরুবৃন্দ চাহিয়াছিলেন সকলকে সমান করিতে, কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যবর্গ তাঁহাদের কথা বিপরীত বুঝিয়া প্রতিজনেই হইতে চায় বৃহৎ মানুষ। ২. নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে,

সে তো জানা কথা।>প্রমাণ উদ্ধৃতহীনা করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিলে মামলা যে দাঁড়াইয়া হারিতে হইবে, সে তো জানা কথা। ৩. সেইজন্য আমরা যত বেশি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।>সেইজন্য আমরা যত অধিক গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা করিব, দেশের তত অধিক উপকার হইবে। ৪. একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন।>এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে চমৎকৃত হইয়া উঠিবেন, কেহ কেহ আবার হাস্য করিয়াও উঠিবেন। ৫. একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না; কিন্তু একথা আমরা সকলে মানি নে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।>একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করিলে মনুষ্যের দেহ জীবিত থাকে না; কিন্তু একথা আমরা বিশ্বাস করি না যে, মনের দাবি রক্ষা না করিলে মনুষ্যের আত্মা জীবিত থাকে না।

বাক্যান্তর ॥ ১. বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে [সরল বাক্য]।>যদিও বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ, তবু আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাইনে [জটিল বাক্য]। ২. সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তাহলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন [জটিল বাক্য]।>সে বিচারে আমার কথা না টিকলে তা রসিকতা হিসেবেই গ্রাহ্য করবেন [সরল বাক্য]। ৩. আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বই স্পর্শ করেন না [সরল বাক্য]।> আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর যদি বাধ্য না হন, তবে বই স্পর্শ করেন না [জটিল বাক্য]। ৪. যার আনন্দ নেই সে নির্জীব, একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য [জটিল বাক্য]। >নিরানন্দ ব্যক্তির নির্জীবতা এবং নির্জীব ব্যক্তির নিরানন্দতা—দুইই সমান সত্য [সরল বাক্য]।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **নিরর্থক** [অর্থহীন]—পরোপকার ভিন্ন ঐশ্বর্য নিরর্থক। **উদ্‌বাহু** [অতি উল্লসিত]—রাজনৈতিক স্বাধীনতায় উদ্‌বাহু হয়ে নৃত্য করলে চলবে না, সেই সঙ্গে চাই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাও। **আত্মসাৎ** [হস্তগত]—যারা দেশসেবার নামে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করে, তারা দেশের শত্রু, দেশের মানুষের শত্রু। **উপায়ান্তর** [অন্য উপায়]—উপায়ান্তর না থাকলে আমাকেই দিল্লী যেতে হবে। **গ্রহণসাপেক্ষ** [গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল]—শিক্ষকের শিক্ষাদান ছাত্রদের গ্রহণসাপেক্ষ। **উত্তরসাধক** [পরবর্তী সাধক]—স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ উত্তর-সাধক। **সাক্ষাৎভাবে** [প্রত্যক্ষভাবে]—সে ঘটনাটির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না থাকিলেও পরোক্ষভাবে যুক্ত। **উদরপূর্তি**—[ক্ষুন্নিবৃত্তি]—কেবল উদরপূর্তিই মানব-জীবনের লক্ষ্য নয়, মানসিক উন্নতিও কাম্য। **অকর্তব্য** [অনুচিত]—অহিংসা কাম্য হলেও হিংসার কাছে আত্মসমর্পণ অকর্তব্য। **বাক্যব্যয়** [বাগ্‌বিস্তার]—স্বাধীনতা-

লাভের বত্রিশ বছর পরেও যদি দেশের মানুষের দু'বেলা পেট ভরে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে দিতে না পারি, তাহলে এত বাক্যব্যয় নিরর্থক।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা॥ 'বেশি' শব্দটির বানানে 'ই'-কারের ব্যবহার কি যুক্তিসিদ্ধ? 'বেশ' শব্দটি মূলতঃ ফার্সী শব্দ। তার সঙ্গে 'ই' প্রত্যয় বা 'ঈ' প্রত্যয়—দুইই যোগ করা চলে। তাই 'বেশ'+ই=বেশি এবং 'বেশ'+ঈ=বেশী—উভয় বানানই শুদ্ধ।

'দারিদ্র্য' শব্দটিকে 'দারিদ্র' লিখলে কি কোন ভুল হয়? মূল শব্দটি হলো 'দরিদ্র'। এর সঙ্গে 'ভাব অর্থে' 'ষ্ণ্য' এবং 'ষ্ণ' প্রত্যয় যোগ করা চলে। তাতে শব্দ দুটি দাঁড়ায় 'দরিদ্র'+ষ্ণ্য=দারিদ্র্য এবং 'দরিদ্র'+ষ্ণ=দারিদ্র। কাজেই, উভয় শব্দই শুদ্ধ।

সে জাতির ধনের '**ভাঁড়েও ভবানী**'।—এই বাক্যের 'ভাঁড়ে ভবানী'র প্রকৃত অর্থ কি? স্বরচিত বাক্যে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার কর।

'ভাঁড়ে ভবানী' বা 'ভাঁড়ে মা ভবানী'—কথাটির অর্থ ভাণ্ডারে মা ভবানী বা মা দুর্গার আশ্রয়; অর্থাৎ ভাণ্ডার শূন্য। স্বরচিত বাক্য—আমার কাছে এখন কিছু চেয়োনা; কারণ, আমার এখন ভাঁড়ে ভবানী।

এমনকি এক্ষেত্রে '**দাতাকর্ণের**'ও অভাব নেই।—এই বাক্যে 'দাতাকর্ণ' কথাটির তাৎপর্য কি? স্বরচিত বাক্যে 'দাতাকর্ণ' শব্দটি প্রয়োগ কর।

মহাভারতের কর্ণের অকাতর দান-স্বভাব সর্ববিদিত। তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণের জন্যে অঙ্গের কবচ-কুণ্ডল, এমনকি নিজপুত্রের প্রাণ দান করেছিলেন। বাংলায় তাই নির্বিচার দানকর্তাকে ব্যঙ্গার্থে 'দাতাকর্ণ' বলা হয়। স্বরচিত বাক্য—বিচার-বিবেচনা করে দান করুন; নইলে দাতাকর্ণের মতো দান করে চললে দুদিনেই পথে বসতে হবে।

বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন্ শ্রেণীতে পড়ে?—শখ, ডেমোক্রাসি, বাজার, হাজার, পেশাদার, ভাঁড়, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, নোট, উলটো, বই, নগদ, সাহিত্য। শখ—বিদেশী শব্দ: আরবী। ডেমোক্রাসি—বিদেশী শব্দ: ইংরেজি। বাজার—বিদেশী শব্দ: ফার্সী। হাজার—বিদেশী শব্দ: ফার্সী। পেশাদার—বিদেশী শব্দ: ফার্সী। ভাঁড়—তদ্ভব শব্দ: ভণ্ড [সং]>ভাঁড়। লাইব্রেরী, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, নোট—বিদেশী শব্দ: ইংরেজি। উলটো—দেশী শব্দ। বই—বিদেশী শব্দ: আরবী। নগদ—বিদেশী শব্দ: আরবী। সাহিত্য—তৎসম শব্দ।

□ বীরবর কাহিনী □

সন্ধি-বিচ্ছেদ॥ স্বীয়=স্ব+ঈয়। তদীয়=তৎ+ঈয়। স্বচ্ছন্দে=স্ব+ছন্দে। প্রত্যহ=প্রতি+অহ। এতদ্ব্যতিরিক্ত=এতৎ+বি+অতিরিক্ত। তথাপি=তথা+অপি। এবংবিধ=এবম্+বিধ; ব্যর্থ=বি+অর্থ। পরীক্ষা=পরি+ঈক্ষা। কোষাধ্যক্ষ=কোষ+অধি+অক্ষ। প্রাপ্য=প্র+আপ্য। নির্ধারিত=নিঃ

+ধাবিত। নির্দিষ্ট = নিঃ + দিষ্ট। পুনর্বার = পুনঃ + বার। সন্ন্যাসী = সম্ + ন্যাসী। পর্যাপ্ত = পরি + আপ্ত। যৎকিঞ্চিৎ = যৎ + কিম্ + চিৎ। সায়ংকালে = সায়ম্ + কালে। তথ্যানুসন্ধান = তথ্য + অনুসন্ধান। পরাঙ্মুখ = পরাক্ + মুখ। সাতিশয় = স + অতিশয়। সন্তুষ্ট = সম্ + তুষ্ট। প্রত্যক্ষ = প্রতি + অক্ষ। ভয়ঙ্কর = ভয়ম্ + কর। সর্বালঙ্কারভূষিতা = সর্ব + অলম্ + কারভূষিতা। সর্বাঙ্গসুন্দরী = সব + অঙ্গ + সুন্দরী। করাঘাত = কর + আঘাত। উচ্চৈঃস্বরে = উচ্চৈঃ + স্বরে। বিস্ময়াবিষ্ট = বিস্ময় + আবিষ্ট। সম্মুখ = সম্ + মুখ। অপেক্ষায় = অপ + ঈক্ষায়। বারংবার = বারম্ + বার। অন্যায়াচরণ = অন্যায় + আচরণ। প্রাণাত্যয় = প্রাণ + অতি + অয়। এবম্ভূত = এবম্ + ভূত। অসম্ভাবিত = অসম্ + ভাবিত। সন্দেহ = সম্ + দেহ। প্রাণান্ত = প্রাণ + অন্ত। পর্যন্ত = পরি + অন্ত। অর্ধযোজনান্তে = অর্ধযোজন + অন্তে। ভবনাভিমুখে = ভবন + অভিমুখে। কৌতুকাবিষ্ট = কৌতুক + আবিষ্ট। পরমাদ্ভুত = পরম + অদ্ভুত। চরিতার্থতা = চরিত + অর্থতা। তদ্রূপ = তৎ + রূপ। সম্ভোগের = সম্ + ভোগের। নিরন্তর = নিঃ + অন্তর। অধোগতি = অধঃ + গতি। নিস্তার = নিঃ + তার। সম্ভাবনা = সম্ + ভাবনা। ইত্যাকার = ইতি + আকার। কথোপকথন = কথা + উপকথন। মন্দিরাভিমুখে = মন্দির + অভিমুখে। যৎপরোনাস্তি = যৎপরঃ + ন + অস্তি। সাষ্টাঙ্গ = স + অষ্ট + অঙ্গ। কৃতাঞ্জলি = কৃত + অঞ্জলি। জগদীশ্বরী = জগৎ + ঈশ্বরী। মস্তকচ্ছেদন = মস্তক + ছেদন। জীবিতাধিক = জীবিত + অধিক। সহোদরের = সহ + উদরের। শিরশ্ছেদন = শিরঃ + ছেদন। নিরতিশয় = নিঃ + অতিশয়। নির্বেদ = নিঃ + বেদ। নির্বিবেক = নিঃ + বিবেক। অধ্যবসায় = অধি + অবসায়। সর্বতোভাবে = সর্বতঃ + ভাবে। প্রায়শ্চিত্ত = প্রায়ঃ + চিত্ত। আবির্ভূতা = আবিঃ + ভূতা। সদ্বিবেচনা = সৎ + বিবেচনা। তথাস্তু = তথা + অস্তু। সুপ্তোত্থিতের = সুপ্ত + উৎ + স্থিতের। গাত্রোত্থান = গাত্র + উৎ + স্থান। যথার্থ = যথা + অর্থ। পুনর্জীবিত = পুনঃ + জীবিত। চরণারবিন্দে = চরণ + অরবিন্দে। প্রার্থনাধিক = প্রার্থনা + অধিক। অন্তর্হিতা = অন্তঃ + হিতা। ভবন = ভো + অন। অর্ধরাজ্যেশ্বর = অর্ধরাজ্য + ঈশ্বর। পূর্বাপর = পূর্ব + অপর। বিক্রমাদিত্য = বিক্রম + আদিত্য। রাজ্যাধিকার = রাজ্য + অধিকার।

সমাস ॥ মহারাজ—মহান্ যে রাজা—কর্মধা। গুণগ্রাহী—গুণ গ্রহণ করেন যিনি—উপপদতৎ। দয়াশীল—দয়া শীলে যার—বহুব্রী। দক্ষিণদেশনিবাসী—দক্ষিণ যে দেশ—কর্মধা; সেখানে বাস করেন যিনি—উপপদতৎ। রাজপুত—রাজার পুত—ষষ্ঠীতৎ। কর্মপ্রাপ্তির—কর্মকে প্রাপ্তি—দ্বিতীয়াতৎ; তার। রাজদ্বারে—রাজার দ্বার—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। রাজসমীপে—রাজার সমীপ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। অস্ত্রধারী—অস্ত্র ধারণ করেন যিনি—উপপদতৎ। দ্বারদেশে—দ্বারের দেশ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। বীরবর—বীরদের বর [শ্রেষ্ঠ] ষষ্ঠীতৎ। নরপতিগোচরে—নরদের পতি—ষষ্ঠীতৎ; তাঁর গোচর—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। কার্যদক্ষ—কার্যে দক্ষ—সপ্তমীতৎ। স্বচ্ছন্দে—স্ব-র ছন্দ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। দিনপাত—দিনের পাত—ষষ্ঠীতৎ। প্রত্যহ—অহ অহ—অব্যয়ীভাব। স্বর্ণমুদ্রার—স্বর্ণ-নির্মিত মুদ্রা—মধ্যপ-কর্মধা; তার। যুক্তিসঙ্গত—যুক্তির দ্বারা সঙ্গত—

তৃতীয়াতৎ। অর্থব্যয়—অর্থের ব্যয়—ষষ্ঠীতৎ। কোষাধ্যক্ষকে—কোষের অধ্যক্ষ—ষষ্ঠীতৎ; তাকে। নৃপনির্দিষ্ট—নৃদের পালন করেন যিনি—উপপদতৎ; তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট—তৃতীয়াতৎ। বাসস্থানে—বাসের নিমিত্ত স্থান—চতুর্থীতৎ; তাতে। নানাবিধ—নানা বিধা যার—বহুব্রী। অনাথ—নাই নাথ যার—নঞ্‌-বহুব্রী। প্রতিদিন—দিন দিন—অব্যয়ীভাব। সায়ংকালে—সায়ম্ যে কাল—কর্মধা; তাতে। প্রভুভক্তির—প্রভুকে ভক্তি—দ্বিতীয়াতৎ, তার। দুঃসাধ্য—দুঃ [দুঃখে] সাধ্য যা—বহুব্রী। স্ত্রীলোকের—স্ত্রী যে লোক—কর্মধা; তার। ক্রন্দনধ্বনি—ক্রন্দনের ধ্বনি—ষষ্ঠীতৎ। তথ্যানুসন্ধান—সন্ধানের পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব; তথ্যের অনুসন্ধান—ষষ্ঠীতৎ। সর্বালঙ্কার-ভূষিতা—সর্ব যে অলংকার—কর্মধা; তার দ্বারা ভূষিতা—তৃতীয়াতৎ। সর্বাঙ্গসুন্দরী—সর্ব যে অঙ্গ—কর্মধা, তাতে সুন্দরী—সপ্তমীতৎ। করাঘাত—করের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ। উচ্চৈঃস্বরে—উচ্চৈঃ স্বরে—তৃতীয়াতৎ। বিস্ময়াবিষ্ট—বিস্ময়ের দ্বারা আবিষ্ট—তৃতীয়াতৎ। শ্মশানবাসিনী—শ্মশানে বাস করেন যিনি [স্ত্রী]—উপপদতৎ। রাজলক্ষ্মী—রাজার লক্ষ্মী—ষষ্ঠীতৎ। অন্যায়াচরণ—নয় ন্যায়—নঞ্‌তৎ; এমন যে আচরণ—কর্মধা। প্রাণাত্যয়—প্রাণের অত্যয় [বিপদ]—ষষ্ঠীতৎ। বিষাদসাগরে—বিষাদ-রূপ সাগর—রূপক-কর্মধা; তাতে। হৃদয়বিদারণ—হৃদয়কে বিদারণ করে যা—উপপদতৎ। প্রাণান্ত—প্রাণের অন্ত—ষষ্ঠীতৎ। পূর্বদিকে—পূর্ব যে দিক—কর্মধা, তাতে। অর্ধযোজনান্তে—যোজনের অর্ধ—ষষ্ঠীতৎ; তার অন্ত—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। বলিদান—বলিকে দান—দ্বিতীয়াতৎ। ভবনাভিমুখে—ভবনের অভিমুখ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। কৌতুকাবিষ্ট—কৌতুকের দ্বারা আবিষ্ট—তৃতীয়াতৎ। নিদ্রাভঙ্গ—নিদ্রার ভঙ্গ—ষষ্ঠীতৎ। স্বামিকার্য—স্বামীর কার্য—ষষ্ঠীতৎ। ক্ষণবিনশ্বর—বিশেষ [ভাবে] নশ্বর—কর্মধা; ক্ষণ ব্যাপ্ত করে নশ্বর—দ্বিতীয়াতৎ। দেবসেবায়—দেবকে সেবা—দ্বিতীয়াতৎ, তাতে। প্রাণত্যাগের—প্রাণকে ত্যাগ—দ্বিতীয়াতৎ; তার। সত্বর—ত্বরার সহিত বর্তমান—বহুব্রী। পরমাদ্ভুত—পরম যা অদ্ভুত—কর্মধা। বিস্ময়াপন্ন—বিস্ময়কে আপন্ন—দ্বিতীয়াতৎ। অশ্রুপূর্ণ—অশ্রুর দ্বারা পূর্ণ—তৃতীয়াতৎ। সহধর্মিণীকে—সমান ধর্ম যার [স্ত্রী]—বহুব্রী; তাকে। রাজকার্য—রাজার কার্য—ষষ্ঠীতৎ। স্বামিবাক্য—স্বামীর বাক্য—ষষ্ঠীতৎ। শ্রবণগোচর—শ্রবণের গোচর—ষষ্ঠীতৎ। কূপজ—কূপে জন্মে যে—উপপদতৎ। চরিতার্থতা-লাভ—চরিতার্থতাকে লাভ—দ্বিতীয়াতৎ। শাস্ত্রবিহিত—শাস্ত্রের দ্বারা বিহিত—তৃতীয়াতৎ। সুখ-সম্ভোগের—সুখ ও সম্ভোগ—দ্বন্দ্ব; তার। চিত্তরঞ্জন—চিত্তকে রঞ্জন—দ্বিতীয়াতৎ। স্বর্গালোক—যা স্বর্গ, তাই লোক—কর্মধা। কালহরণ—কালকে হরণ—দ্বিতীয়াতৎ। কার্যহানি—কার্যের হানি ষষ্ঠীতৎ। কথোপকথনের—কথনের সদৃশ—অব্যয়ীভাব; কথা ও উপকথন—দ্বন্দ্ব; তার। সপরিবারে—পরিবারের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। অগণ্য—নয় গণ্য—নঞ্‌তৎ। যথাবিধি—বিধিকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব। সাষ্টাঙ্গে—অষ্ট অঙ্গের সমাহার—দ্বিগু; অষ্টাঙ্গের সহিত বর্তমান—বহুব্রী; তাতে। কৃতাঞ্জলি—কৃত অঞ্জলি যার দ্বারা—বহুব্রী। প্রাণাধিক—প্রাণের চেয়ে অধিক—পঞ্চমীতৎ। অকাতরে—নয় কাতর—

নঞ্‌তৎ ; তাতে। মস্তকচ্ছেদ—মস্তককে [মস্তকের] ছেদ—দ্বিতীয়াতৎ [ষষ্ঠীতৎ]। জীবিতাধিক—জীবিতের চেয়ে অধিক—পঞ্চমীতৎ। সহোদর—সমান উদর যার—বহুব্রী। প্রাণবিনাশ—প্রাণের বিনাশ—ষষ্ঠীতৎ। বিকলচিত্তা—বিকল চিত্ত যার [স্ত্রী]—বহুব্রী। অনুগামিনী—অনু [পশ্চাৎ] গমন করে যে [স্ত্রী]—উপপদতৎ। শিরশ্ছেদন—শিরকে [শিরের] ছেদন—দ্বিতীয়াতৎ। নির্বিবেক—নেই বিবেক যার—নঞ্‌-বহুব্রী। পুত্রহত্যা—পুত্রকে হত্যা—দ্বিতীয়াতৎ [ষষ্ঠীতৎ]। আত্মঘাতী—আত্মকে [নিজেকে] হত্যা করে যে—উপপদতৎ। আত্মহত্যারূপ—আত্মকে হত্যা—দ্বিতীয়াতৎ ; তার রূপ—ষষ্ঠীতৎ। চিত্তসন্তোষ—চিত্তের সন্তোষ—ষষ্ঠীতৎ। আত্মশিরশ্ছেদন—আত্ম-র [নিজের] শির—ষষ্ঠীতৎ; তাকে ছেদন—দ্বিতীয়াতৎ। হস্তধারণ—হস্তকে ধারণ—দ্বিতীয়াতৎ। সুপ্তোত্থিতের—পূর্বে সুপ্ত, পরে উত্থিত—কর্মধা ; তার। গাত্রোত্থান—গাত্রের উত্থান—ষষ্ঠীতৎ। যথার্থ—অর্থকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব। অপরিসীম—নেই পরিসীমা যার—নঞ্‌-বহুব্রী। ভক্তিযোগ—ভক্তির যোগ—ষষ্ঠীতৎ। চরণারবিন্দে—চরণ-রূপ অরবিন্দ—রূপক-কর্মধা, তাতে। প্রার্থনাধিক—প্রার্থনার চেয়ে অধিক—পঞ্চমীতৎ। চরিতার্থ—চরিত [সফল] অর্থ [উদ্দেশ্য] যার—বহুব্রী। সভাভবনে—সভার নিমিত্ত ভবন—চতুর্থীতৎ ; তাতে। সিংহাসনে—সিংহ চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা, তাতে। রাত্রিবৃত্তান্ত-কীর্তন—রাত্রির বৃত্তান্ত—ষষ্ঠীতৎ ; তার কীর্তন—ষষ্ঠীতৎ। অর্ধরাজ্যেশ্বর—রাজ্যের অর্ধ—ষষ্ঠীতৎ ; তার ঈশ্বর—ষষ্ঠীতৎ। পূর্বাপর—পূর্ব ও অপর—দ্বন্দ্ব। বিক্রমাদিত্য—আদিত্যের [সূর্যের] ন্যায় বিক্রম যার—উপমাত্মক বহুব্রী। আত্মধর্ম-প্রতিপালন—আত্ম-র [নিজের] ধর্ম—ষষ্ঠীতৎ ; তার প্রতিপালন—ষষ্ঠীতৎ। রাজ্যাধিকার—রাজ্যের অধিকার—ষষ্ঠীতৎ। পূর্বকৃত—পূর্বে কৃত—সপ্তমীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ বর্ধমান—বৃধ্‌+শানচ্‌। বিজ্ঞ—বি-জ্ঞা+ক। গুণগ্রাহী—গুণ-গ্রহ্‌+ইন্‌। পরম—পর+ম। ধার্মিক—ধর্ম+ষ্ণিক। নিবাসী—নি-বস্‌+ইন্‌। কর্মপ্রাপ্তি—কর্ম-প্র-আপ্‌+ক্তি [ভাববা]। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। তদীয়—তৎ+ঈয়। দ্বারবান—দ্বার+ওয়ান। প্রমুখাৎ—প্রমুখ+আৎ। অবগত—অব-গম্‌+ক্ত [কর্মবা]। বিজ্ঞাপন—বি-জ্ঞা+ণিচ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। অস্ত্রধারী—অস্ত্র-ধৃ+ইন। প্রার্থনা—প্র-অর্থ্‌+অনট্‌ [ভাববা]+আ। দণ্ডায়মান—দণ্ড+ক্যঙ্‌+শানচ্‌। গোচর—গো-চর্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। দ্বারী—দ্বৃ+ণিচ্‌+ইন্‌। আকার—আ-কৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। প্রকার—প্র-কৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। দর্শন—দৃশ্‌+অনট্‌। বিলক্ষণ—বি-লক্ষ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। স্থির—স্থা+ইর্‌ [কর্তৃবা]। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]+আ। নিবেদন—নি-বিদ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। আদেশ—আ-দিশ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। পরিবার—পরি-বৃ+ঘঞ্‌ [করণবাচ্য]। বিবেচনা—বি-বিচ্‌+অনট্‌ [ভাববা]+আ। ভৃত্য—ভৃ+ক্যপ্‌। সঙ্গত—সম্‌-গম্‌+ক্ত [কর্তৃবা]। পরীক্ষা—পরি-ঈক্ষ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]+আ। আজ্ঞা—আ-জ্ঞা+ক+আ। রাজকীয়—রাজন্‌+ক+ঈয়। শ্রবণ—শ্রু+অনট্‌ [ভাববা]। পরিতোষ—পরি-তুষ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। প্রদান—প্র-দা+অনট্‌ [ভাববা]। প্রাপ্য

—প্র-আপ্+ণ্যৎ। নির্ধারিত—নি-ধৃ+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]। গ্রহণ—গ্রহ্+অনট্ [ভাববা]। পূর্বক—পূর্ব+ক। নির্দিষ্ট—নিঃ-দিশ্+ক্ত [কর্মবা]। প্রথমতঃ—প্রথম+তস্। বিভক্ত—বি-ভজ্+ক্ত [কর্মবা]। বিপ্রসাৎ—বিপ্র+সাৎ। অবশিষ্ট—অব-শাস্+ক্ত [কর্মবা]। বৈষ্ণব—বিষ্ণু+ষ্ণ। বৈরাগী—বৈরাগ+ইন্। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাস+ইন্। সামগ্রী—সমগ্র+ষ্ণ+ঈ। আয়োজন—আ-যুজ্+অনট্ [ভাববা]। দুঃখী—দুঃখ+ইন্। পর্যাপ্ত—পরি-আপ্+ক্ত [কর্তৃবা]। দুহিতা—দুহ্+তৃচ্+আ। আহার—আ-হৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। সম্পন্ন—সম্-পদ্+ক্ত [কর্মবা]। নিশীথ—নি-শী+থ [অধিকরণবা]। ক্রন্দন—ক্রন্দ্+অনট্ [ভাববা]। আহ্বান—আ-হ্বে+অনট্ [ভাববা]। সম্মুখবর্তী—সম্মুখ-বৃৎ+ইন্। আজ্ঞা—আ-জ্ঞা+ক+আ। দক্ষিণ—দক্ষ্+ইন্ [কর্তৃবা]। অনুসন্ধান—অনু-সম্-ধা+অনট্ [ভাববা]। সংবাদ—সম্-বদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রস্থান—প্র-স্থা+অনট্ [ভাববা]। প্রতিপালন—প্রতি-পা+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। সন্তুষ্ট—সম্-তুষ্+ক্ত [কর্মবা]। গুপ্ত—গুপ্+ক্ত [কর্তৃবা]। লক্ষ্য—লক্ষ্+ণ্যৎ। প্রসিদ্ধ—প্র-সিধ্+ক্ত [কর্তৃবা]। অলঙ্কার—অলম্-কৃ+ঘঞ্। রোদন—রুদ্+অনট্ [ভাববা]। আবিষ্ট—আ-বিশ্+ক্ত [কর্মবা]। বিলাপ—বি-লপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পরিতাপ—পরি-তপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। উত্তর—উৎ-তৄ+ঘঞ্ [ভাববা]। ব্যগ্রতা—ব্যগ্র+তা। প্রদর্শন—প্র-দৃশ্+অনট্ [ভাববা]। আচরণ—আ-চর্+অনট্ [ভাববা]। প্রযুক্ত—প্র-যুজ্+ক্ত [কর্মবা]। প্রবেশ—প্র-বিশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। অধিকার—অধি-কৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। পরিত্যাগ—পরি-ত্যজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রাণাত্যয়—প্রাণ-অতি-ই+ঘঞ্ [ভাববা]। দুঃখিত—দুঃখ+ইতচ্। প্রভু—প্র-ভূ+উ [কর্তৃবা]। অসম্ভাবিত—নঞ্-সম্-ভূ+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]। বিষাদ—বি-সদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সাগর—সগর+ষ্ণ। মগ্ন—মস্জ্+ক্ত [কর্তৃবা]। সন্দেহ—সম্-দিহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিদারণ—বি-দৄ+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। ঘটনা—ঘট্+অনট্ [ভাববা]+আ। নিবারণ—নি-বৃ+ণিচ্+অনট্। স্বীকার—স্ব+অভূততদ্ভাবে—চ্বি-কৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রস্তুত—প্র-স্তু+ক্ত [কর্তৃবা]। প্রসন্ন—প্র-সদ্+ক্ত [কর্তৃবা]। ধাবমান—ধাব্+শানচ্। জাগরিত—জাগৃ+ক্ত [কর্তৃবা]। জ্ঞাত—জ্ঞা+ক্ত [কর্তৃবা]। পুত্র—পুৎ-ত্রৈ+ড। দীর্ঘ—দ্রাঘ্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। বিনশ্বর—বি-নশ্+বর। পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূত+ষ্ণিক্। নিয়োজিত—নি-যুজ্+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]। কর্তব্য—কৃ+তব্য। সম্পাদন—সম্-পদ্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। অদ্ভুত—অৎ-ভূ+উত। বিস্ময়—বি-স্মি+অল্ [ভাববা]। আপন্ন—আ-পদ্+ক্ত [কর্মবা]। প্রদান—প্র-দা+অনট্ [ভাববা]। রাজকার্য—রাজ-কৃ+ণ্যৎ। নিষ্পন্ন—নিঃ-পদ্+ক্ত [কর্মবা]। কুষ্ঠী—কুষ্ঠ+ইন্। শাস্ত্র—শাস্+ত্র। বিহিত—বি-ধা+ক্ত। ধ্যান—ধ্যৈ+অনট্ [ভাববা]। প্রদর্শন—প্র-দৃশ্+অনট্। পারলৌকিক—পরলোক+ষ্ণিক। ধর্ম—ধৃ+ম [কর্তৃবা]। কর্ম—কৃ+ম [কর্তৃবা]। অনুষ্ঠান—অনু-স্থা+অনট্ [কর্মবা]। অবধারিত—অব-ধৃ+ণিচ্+ক্ত। কারণ—কৃ+ণিচ্+অনট্। পৌত্র—

পুত্র+ষ্ণ। প্রয়োজন—প্র-যুজ্+অনট্ [ভাববা]। রঞ্জন—রঞ্জ্+অনট্ [ভাববা]। শুশ্রূষা—শ্রু+সন্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। নিস্তার—নিঃ-তৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। ব্যক্তি—বি-অন্জ্+ক্তি। সম্পাদন—সম্-পদ্+ণিচ্+অনট্। সার্থক—স+অর্থ+ক। সম্ভোগ—সম্-ভুজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সংশয়—সম্-শী+অল্ [ভাববা]। সম্ভাবনা—সম্-ভূ+ণিচ্ অনট্ [ভাববা]+আ। মন্দির—মন্দ্+ইর [অধিকরণবা]। প্রবলতা—প্রবল+তা। অচলতা—অচল+তা। চমৎকৃত—চমৎ-কৃ+ক্ত [কর্মবা]। আহ্লাদিত—আ-হ্লাদ্+ক্ত [কর্মবা]। নৈবেদ্য—নিবেদ+ষ্ণ্য। উপচার—উপ-চর্+ঘঞ্ [ভাববা]। পূজা—পূজ্+অঙ্+আ। প্রণিপাত—প্র-নি-পত্+ঘঞ্ [ভাববা]। ছেদন—ছিদ্+অনট্ [ভাববা]। জীবিত—জীব্+ক্ত [ভাববা]। বিনাশ—বি-নশ্+ঘঞ্ [কর্মবা]। প্রহার—প্র-হৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। ত্যাগ—ত্যজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। দাসত্ব—দাস+ত্ব। বদ্ধ—বন্ধ্+ক্ত। জীবন—জীব্+অনট্ [ভাববা]। ধারণ—ধৃ+অনট্ [ভাববা]। নির্বেদ—নিঃ-বিদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সেবক—সেব্+অক। সর্বনাশ—সর্ব-নশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রবৃত্ত—প্র-বৃত্+ক্ত [কর্তৃবা]। নিবৃত্ত—নি-বৃত্+ক্ত [কর্মবা]। ঘোরতর—ঘোর+তর। উপক্রম—উপ-ক্রম্+ঘঞ্ [ভাববা]। অধ্যবসায়—অধি-অব-সো+ঘঞ্ [ভাববা]। বিরত—বি-রম্+ক্ত [কর্মবা]। উদ্যত—উৎ-যম্+ক্ত [কর্তৃবা]। আবির্ভূতা—আবিঃ-ভূ+ক্ত [কর্তৃবা]+আ [স্ত্রী]। ব্যবসায়—বি-অব-সো+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রীত—প্রী+ক্ত [কর্মবা]। অভিপ্রেত—অভি-প্র+ই+ক্ত [কর্মবা]। গুরুতর—গুরু+তর। প্রার্থয়িতব্য—প্র-অর্থ্+তব্য। সুপ্ত—স্বপ্+ক্ত [কর্তৃবা]। উত্থিত—উৎ-স্থা+ক্ত [কর্মবা]। উত্থান—উৎ-স্থা+অনট্ [ভাববা]। স্তব—স্তু+ঘঞ্ [ভাববা]। অন্তর্হিত—অন্তঃ-ধা+ক্ত+আ। প্রভাত—প্র-ভা+ক্ত [কর্মবা]। আসীন—আস্+শানচ্ [কর্তৃবা]। কীর্তন—কীর্ত্+অনট্ [ভাববা]। পরায়ণ—পর+আয়ন। সমাপ্ত—সম্-আপ্+ক্ত [কর্মবা]। ঔদার্য—উদার+ষ্ণ্য। প্রতিজ্ঞা—প্রতি-জ্ঞা+ক+আ। অনুসার—অনু-সৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। লম্বমান—লম্ব্+শানচ্। অবতারণ—অব-তৃ+ণিচ্+অনট্। আশ্রম—আ-শ্রম্+ঘঞ্।

কারক ও **বিভক্তি ॥** একদিন—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। বাসনায়—নিমিত্তে 'য়' বিভক্তি। প্রমুখাৎ—অপাদানে 'আৎ' [সংস্কৃত] বিভক্তি। কর্মের—কর্মে 'এর' বিভক্তি। দ্বারদেশে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। আপনকার—সম্বন্ধে 'কার' বিভক্তি। অবিলম্বে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। দর্শনে—করণে 'এ' বিভক্তি। স্বচ্ছন্দে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। স্বর্ণমুদ্রার—কর্মে 'র' বিভক্তি। আমার—ভাববাচ্যের কর্তায় 'র' বিভক্তি। ভৃত্যের—কর্মপ্রবচনীয়-যোগে 'এর' বিভক্তি। বীরবরকে—কর্মে 'কে' বিভক্তি। তথায়—অধিকরণে 'য়' বিভক্তি। সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে—সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তি। স্ত্রীলোকের—কর্তৃ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। প্রতিপালনে—বিষয়াধিকরণে 'এ' বিভক্তি। ক্রন্দন-শব্দ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। উচ্চৈঃস্বরে—ক্রিয়া-বিশেষণে 'এ' বিভক্তি। অধিকার—কর্মে শূন্যবিভক্তি। দুঃখে—অধিকরণে 'এ' বিভক্তি।

স্বহস্তে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। বাক্য—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সর্বতোভাবে—ক্রিয়া-বিশেষণে ‘এ’ বিভক্তি। পৌত্রে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। সাধনে—নিমিত্তে ‘এ’ বিভক্তি। বিলম্বে—হেত্বর্থে ‘এ’ বিভক্তি। উপচারে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। অকাতরে—ক্রিয়াবিশেষণে ‘এ’ বিভক্তি। শোকে—হেত্বর্থে ‘এ’ বিভক্তি। প্রভু-কার্য—কর্মে শূন্যবিভক্তি। শৃঙ্খলে—করণে ‘এ’ বিভক্তি। ভোগে—অধিকরণে ‘এ’ বিভক্তি। চারিজনেই—কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি। গদ্গদ বাক্যে—করণে ‘এ’ বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ বেতাল [বি]—বৈতালিক [বিণ]। বিজ্ঞ [বিণ]—বিজ্ঞতা [বি]। গুণগ্রাহী [বিণ]—গুণগ্রাহিতা [বি]। দয়াশীল [বিণ]—দয়াশীলতা [বি]। ধার্মিক [বিণ]—ধার্মিকতা [বি]। বিজ্ঞাপন [বি]—বিজ্ঞাপিত [বিণ]। প্রার্থনা [বি]—প্রার্থিত [বিণ]। অভিপ্রায় [বি]—অভিপ্রেত [বিণ]। বিলক্ষণ [বিণ]—বৈলক্ষণ্য [বি]। কার্যদক্ষ [বিণ]—কার্যদক্ষতা [বি]। স্থির [বিণ]—স্থৈর্য [বি]। স্বচ্ছন্দ [বিণ]—স্বাচ্ছন্দ্য [বি]। নিবেদন [বি]—নিবেদিত [বিণ]। প্রত্যহ [বি]—প্রাত্যহিক [বিণ]। আদেশ [বি]—আদিষ্ট [বিণ]। পরিবার [বি]—পারিবারিক [বিণ]। অধিক [বিণ]—আধিক্য [বি]। ব্যর্থ [বিণ]—ব্যর্থতা [বি]। অবশ্য [বি]—আবশ্যিক [বিণ]। পরীক্ষা [বি]—পরীক্ষিত [বিণ]। উচিত [বিণ]—ঔচিত্য [বি]। রাজকীয় [বিণ]—রাজা [বি]। পরিতোষ [বি]—পরিতুষ্ট [বিণ]। নির্ধারিত [বিণ]—নির্ধারণ [বি]। বিভক্ত [বিণ]—বিভক্তি, বিভাগ [বি]। অবশিষ্ট [বিণ]—অবশেষ [বি]। বৈরাগী [বিণ]—বৈরাগ্য [বি]। সন্ন্যাসী [বিণ]—সন্ন্যাস [বি]। পর্যাপ্ত [বি]—পর্যাপ্তি [বিণ]। প্রহর [বি]—প্রাহরিক [বিণ]। আদেশ [বি]—আদিষ্ট [বিণ]। দুঃসাধ্য [বিণ]—দুঃসাধ্যতা [বি]। সম্পন্ন [বিণ]—সম্পদ [বি]। আহ্বান [বিণ]—আহূত [বিণ]। প্রতিপালন [বি]—প্রতিপালিত [বিণ]। সন্তুষ্ট [বিণ]—সন্তোষ [বি]। প্রসিদ্ধ [বিণ]—প্রসিদ্ধি [বি]। অতিশয় [বিণ]—আতিশয্য [বি]। বিস্ময়াবিষ্ট [বিণ]—বিস্ময়াবেশ [বি]। ব্যগ্রতা [বি]—ব্যগ্র [বিণ]। জিজ্ঞাসা [বি]—জিজ্ঞাসিত, জিজ্ঞাসু [বিণ]। প্রযুক্ত [বিণ]—প্রয়োগ [বি]। আবাস [বি]—আবাসিক [বিণ]। প্রবেশ [বি]—প্রবিষ্ট [বিণ]। পরিত্যাগ [বি]—পরিত্যক্ত [বিণ]। প্রস্থান [বি]—প্রস্থিত [বিণ]। সন্দেহ [বি]—সন্দিগ্ধ [বিণ]। বিদারণ [বি]—বিদীর্ণ [বিণ]। নিবারণ [বি]—নিবারিত [বিণ]। স্বীকার [বি]—স্বীকৃত [বিণ]। প্রস্তুত [বিণ]—প্রস্তুতি [বিণ]। প্রসন্ন [বিণ]—প্রসন্নতা, প্রসাদ [বি]। সম্পূর্ণ [বিণ]—সম্পূর্ণতা [বি]। ধাবমান [বিণ]—ধাবমানতা [বি]। আবিষ্ট [বিণ]—আবেশ [বি]। দীর্ঘ [বিণ]—দৈর্ঘ্য, দীর্ঘতা, দ্রাঘিমা [বি]। ক্ষণবিনশ্বর [বিণ] ক্ষণবিনশ্বরতা [বি]। পাঞ্চভৌতিক [বিণ]—পঞ্চভূত [বি]। দেহ [বি]—দৈহিক [বিণ]। বিলম্ব [বি]—বিলম্বিত [বিণ]। সম্পাদন [বি]—সম্পাদিত [বিণ]। প্রদান [বি]—প্রদত্ত

[বিণ]। বধির [বিণ]—বধিরতা [বি]—পঙ্গু [বিণ]—পঙ্গুত্ব [বি]। অন্ধ [বিণ]—অন্ধত্ব, অন্ধতা [বি]। বিহিত [বিণ]—বিধি [বি]। ধ্যান [বি]—ধ্যানী, ধ্যেয় [বিণ]। প্রদর্শন [বি]—প্রদর্শিত [বিণ]। পারলৌকিক [বিণ]—পরলোক [বি]। অনুষ্ঠান [বি]—অনুষ্ঠিত, আনুষ্ঠানিক, অনুষ্ঠেয় [বিণ]। বিফল [বিণ]—বিফলতা [বি]। অবধারিত [বিণ]—অবধারণ [বি]। প্রয়োজন [বি]—প্রয়োজনীয় [বিণ]। শুশ্রূষা [বি]—শুশ্রূষু [বিণ]। সমর্থ [বিণ]—সামর্থ্য [বি]। সার্থক [বিণ]—সার্থকতা [বিণ]। প্রবলতা [বি]—প্রবল [বিণ]। অচলতা [বি]—অচল [বিণ]। চমৎকৃত [বিণ]—চমৎকার [বি]। আহ্লাদিত [বিণ]—আহ্লাদ [বি]। প্রহার [বি]—প্রহৃত [বিণ]। দাসত্ব [বি]—দাস [বিণ]। শৃঙ্খল [বি]—শৃঙ্খলিত [বিণ]। জীবন [বি]—জীবিত, জৈবনিক [বিণ]। বিষম [বিণ]—বৈষম্য [বি]। প্রবৃত্ত [বিণ]—প্রবৃত্তি [বি]। স্বার্থপর [বিণ]—স্বার্থপরতা [বি]। নিবৃত্ত [বিণ]—নিবৃত্তি [বি]। বিরত [বিণ]—বিরতি [বি]। সাহস [বি]—সাহসী, সাহসিক [বিণ]। প্রীত [বিণ]—প্রীতি [বি]। অভিপ্রেত [বিণ]—অভিপ্রায় [বি]। আনয়ন [বি]—আনীত [বিণ]। উত্থিত [বিণ]—উত্থান [বি]। যথার্থ [বিণ]—যথার্থতা, যাথার্থ্য [বি]। হর্ষ [বি]—হৃষ্ট [বিণ]। চরিতার্থ [বিণ]—চরিতার্থতা [বি]। অন্তর্হিতা [বিণ]—অন্তর্ধান [বি]। আসীন [বিণ]—আসন [বি]। সাক্ষী [বিণ]—সাক্ষ্য [বি]। সমাপ্ত [বিণ]—সমাপ্তি [বি]। ঔদার্য [বি]—উদার [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ। বিজ্ঞ—অজ্ঞ। দয়াশীল—নির্দয়। স্থির—অস্থির। অল্প—অধিক। ব্যর্থ—সার্থক। গুণ—দোষ। গমন—আগমন। সন্ন্যাসী—গৃহী। দুঃখী—সুখী। শক্তি—দুর্বলতা। ত্বরায়—বিলম্বে। সন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট। গুপ্ত—প্রকাশ্য। প্রবেশ—প্রস্থান। স্বীকার—অস্বীকার। পশ্চাৎ—অগ্র। উত্তম—অধম। শুভ—অশুভ। মূক—বাচাল। জন্ম—মৃত্যু। অনন্ত—সান্ত। প্রভু—ভৃত্য। অচল—সচল। বিষম—সম। মরণ—জীবন। প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ। প্রবৃত্ত—নিবৃত্ত। স্বার্থপর—নিঃস্বার্থপর। নির্বিবেক—বিবেকবান্। বিরত—রত। উচিত—অনুচিত। অসৎ—সৎ। প্রসন্ন—বিষণ্ণ। গুরুতর—লঘুতর। অন্তর্হিতা—আবির্ভূতা। সমাপ্ত—আরব্ধ। জিজ্ঞাসা—উত্তর।

লিঙ্গান্তর। রাজা—রানী। মহারাজ—মহারানী। স্ত্রী—স্বামী। পুত্র—কন্যা। বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী। বৈরাগী—বৈরাগিণী। সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসিনী। দীন—দীনা। দুঃখী—দুঃখিনী। অনাথ—অনাথা, অনাথিনী। স্ত্রীলোক—পুরুষ। সর্বাঙ্গসুন্দরী—সর্বাঙ্গসুন্দর। শ্মশানবাসিনী—শ্মশানবাসী। দুঃখিত—দুঃখিতা। দেবী—দেব। পত্নী—পতি। বিকলচিত্তা—বিকলচিত্ত। অনুগামিনী—অনুগামী। সেবক—সেবিকা, সেবকা।

বাচ্যান্তর। ১. অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবেক। [ভাববাচ্য]>অচিরাৎ অলক্ষ্মী প্রবেশ করিবেন। [কর্তৃবাচ্য]। ২. সুতরাং আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। [কর্তৃবাচ্য]>সুতরাং আমার কর্তৃক রাজার অধিকার পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। [কর্মবাচ্য]। ৩. তবে তিনি রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন। [কর্তৃবাচ্য]>তবে তাহার কর্তৃক রাজার সমস্ত অমঙ্গল সম্পূর্ণ নিবারিত হইতে পারে। [কর্মবাচ্য]। ৪. আমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিতেছি। [কর্তৃবাচ্য]>আমার কর্তৃক প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র স্বহস্তে বলিদত্ত হইতেছে [কর্মবাচ্য]।

চলিত ভাষার রূপান্তর। ১. মহারাজ! প্রত্যহ সহস্র···চলিতে পারে।> মহারাজ! রোজ হাজার মোহরের হুকুম হলে আমার চলতে পারে। ২. অনন্তর, কোষাধ্যক্ষকে··সহস্র স্বর্ণ দিবে।>পরে খাজাঞ্চিকে ডেকে রাজা হুকুম দিলেন, তুমি রোজ সকালে বীরবরকে হাজার মোহর দেবে। ৩. বীরবর, রাজকীয় আজ্ঞা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।>বীরবর রাজার হুকুম শুনে খুব খুশী হয়ে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। ৪. একদিন নিশীথ সময়ে··তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। >একদিন রাতের বেলা হঠাৎ মেয়েমানুষের কান্নার শব্দ শুনে রাজা বীরবরকে ডাকলে, সে তখনই সামনে এসে বললো, মহারাজ! কি হুকুম হয়? রাজা বললেন, দক্ষিণ দিকে মেয়েমানুষের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে; শীগ্‌গীর এর খোঁজ করে আমাকে খবর দাও। বীরবর, যে হুকুম মহারাজ বলে, তখনই চলে গেল।

বাক্যান্তর। ১. এই বলিয়া, খড়্গ লইয়া বীরবর অকাতরে, পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। [সরল বাক্য]—বীরবর এই বলিল, খড়্গ লইল এবং অকাতরে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। [যৌগিক বাক্য]। ২. যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন। [জটিল বাক্য]—কেহ ঐ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া, রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন। [সরল বাক্য]।

সার্থক বাক্য-রচনা। **গোচর**—চরেরা সমস্ত ঘটনা রাজার কর্ণগোচর করে। **সায়ংকালে**—সেদিন সায়ংকালে দক্ষিণ দিক হইতে মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছিল। **পরাঙ্মুখ**—আমি তাহাকে কখনও কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হইতে দেখি নাই। **বিস্ময়াবিষ্ট**—সেই আশ্চর্য দৃশ্য আমরা সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলাম। **অচিরাৎ**—আকাশে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইও না; অচিরাৎ এই মেঘ কাটিয়া গিয়া সূর্য উঠিবে। **ত্বরায়**—বিলম্ব করিও না; ত্বরায় সেখানে গমন কর। **তদীয়**—আমরা সকলেই তৎক্ষণাৎ তদীয় বাসভবনে গমন করিলাম। **উচ্চৈঃস্বরে**—সেদিন মধ্যরাতে একটি ক্ষুধার্ত বালক রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল। **প্রাণাত্যয়**—যাহারা রাজার আদেশ মানিবে না, তাহাদের অবশ্যই প্রাণাত্যয় ঘটিবে। **জীবিতাধিক**—আপন পুত্র কাহার না জীবিতাধিক? **কৌতুকাবিষ্ট**—পথচারীরা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া বাজিকরের খেলা

দেখিতে লাগিল। **শাস্ত্রবিহিত**—আমরা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়াছি; কাহারও স্বার্থের কথা চিন্তা করি নাই। **পাঞ্চভৌতিক**—মৃত্যুর পরে আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। **এতাদৃশ**—আজ তোমাকে এতাদৃশ চিন্তিত দেখাইতেছে কেন? কোন অঘটন ঘটিয়াছে কি? **অধোগতি**—তাহার মতো মানুষের এইরূপ অধোগতি হইবে, কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? **যৎপরোনাস্তি**—তাহার দুষ্কর্মের জন্য আমরা সকলেই তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলাম। **সুপ্তোত্থিত**—সে আমাদের ডাকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। **গাত্রোত্থান**—এসো, এবার গাত্রোত্থান করা যাক। **কৃতাঞ্জলি**—প্রজারা রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা॥ ১. তখন পুত্র কহিল, মাতঃ! প্রথমতঃ আপনার, আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ স্বামিকার্য, তৃতীয়তঃ অবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক।—'অবিনশ্বর' ও 'পাঞ্চভৌতিক' এই দুইটি পদের প্রকৃতি-প্রত্যয় লিখ।—'নিয়োজিত' পদটির প্রকৃতি-প্রত্যয় দাও। 'নিযুক্ত' ও 'নিয়োজিত' দুইটি পদের পার্থক্য দেখাও। 'স্বামিকার্য' পদটির বানান হ্রস্ব-ই-কার কেন?

অবিনশ্বর—নঞ্-বি-নশ্+বর। পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূত+ষ্ণিক। নিয়োজিত—নি-যুজ্+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]; কিন্তু নিযুক্ত—নি-যুজ্+ক্ত [কর্মবা]। লক্ষণীয়, 'নিয়োজিত' পদে প্রেরণার্থে 'ণিচ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। 'স্বামিকার্য'—স্বামীর [স্বামিন্] কার্য—ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদের অন্তিম 'ন্' লুপ্ত হয়। 'স্বামিকার্য' পদে 'স্বামিন্' এই পূর্ব পদের অন্তিম 'ন্' লুপ্ত হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী হ্রস্ব-ই-কার অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

২. 'আপনকার' পদটিতে কি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে? সেই বিভক্তি যোগে এমন একটি পদ রচনা কর, যা বর্তমানে প্রচলিত। আপনকার—আপন+'কার' [সম্বন্ধে]। এখান+কার='এখানকার' পদটি বর্তমানে প্রচলিত।

৩. 'জাগরিত' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর। 'জাগরিত'—'জাগৃ-ধাতু+ক্ত [কর্মবা]।

৪. 'আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না।'—'প্রবৃত্ত' পদটির প্রকৃতি-প্রত্যয় লিখ। 'বিষম' ও 'প্রবৃত্ত' পদ দুইটির বিপরীতার্থক পদ লিখ।

প্রবৃত্ত—প্র-বৃত্+ক্ত [কর্তৃবা]। বিপরীতার্থক পদ: বিষম—সম, প্রবৃত্ত—নিবৃত্ত।

৫. 'রাজার ঔদার্য অধিক।'—'রাজা', 'ঔদার্য' ও 'অধিক'—পদ তিনটির মধ্যে বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর।

রাজা [বি]—রাজকীয় [বিণ]।
ঔদার্য [বি]—উদার [বিণ]।
অধিক [বিণ]—আধিক্য [বি]।

▭ ভিখারী সাহেব ▭

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ প্রতীক্ষায়=প্রতি+ঈক্ষায়। পুরস্কারই=পুরঃ+কারই। স্বচ্ছায় =স্ব+ছায়। হরিদ্বর্ণ=হরিৎ+বর্ণ। উচ্চারণ=উৎ+চারণ। দীর্ঘাকৃতি=দীর্ঘ+আকৃতি। পরিচ্ছদ=পরি+ছদ। বস্ত্রাদি=বস্ত্র+আদি। তদবস্থা=তৎ+অবস্থা। ব্যগ্র=বি+অগ্র। পরিষ্কার=পরি+কার। ইত্যবসরে=ইতি+অবসরে। প্রায়শ্চিত্ত =প্রায়ঃ+চিত্ত। পদার্থ=পদ+অর্থ। সংস্থান=সম্+স্থান। অত্যন্ত=অতি+অন্ত। তেজোদৃপ্ত=তেজঃ+দৃপ্ত। নিরস্ত—নিঃ+অস্ত। অত্যাচারের=অতি+আচারের। উত্তরোত্তর=উত্তর+উত্তর। সঙ্কটাপন্ন=সঙ্কট+আপন্ন। প্রত্যহ=প্রতি+অহ। বজ্রাঘাত=বজ্র+আঘাত। পশ্চাদ্বর্তী=পশ্চাৎ+বর্তী। সপ্তাহের=সপ্ত+অহের। অন্যমনস্ক=অন্যমনঃ+ক। তথাপি=তথা+অপি। স্বেচ্ছায়=স্ব+ইচ্ছায়। উল্লিখিত=উৎ+লিখিত। সমাদর=সম+আদর। শিষ্টাচার=শিষ্ট+আচার। আইনানুসারে=আইন+অনুসারে। পরমাত্মীয়ের—পরম+আত্মীয়ের। প্রাণাধিকা—প্রাণ+অধিকা। উত্তেজিত=উৎ+তেজিত। নিরাশ=নিঃ+আশ। ভাবাপন্ন=ভাব+আপন্ন। হতাশ=হত+আশ। পরোপকার=পর+উপকার। চিন্তান্বিত=চিন্তা+আন্বিত। কার্যালয়=কার্য+আলয়। মর্মানুবাদ=মর্ম+অনুবাদ মহাশয়=মহা+আশয়। ভ্রাতুষ্পুত্র=ভ্রাতুঃ+পুত্র। উন্মাদ=উৎ+মাদ। ব্যাধিতে =বি+আধিতে। নির্বাচিত=নিঃ+বাচিত। অন্বেষণ=অনু+এষণ। রোগমুক্তাবস্থায়=রোগমুক্ত+অবস্থায়। অন্তর্ধান=অন্তঃ+ধান। উল্লেখ=উৎ+লেখ। প্রত্যর্পণ=প্রতি+অর্পণ। ব্যবহারে=বি+অবহারে। নীরব=নীঃ+রব। অন্তর্হিত অন্তঃ+হিত। উত্থাপন=উৎ+স্থাপন। অপরাহ্নে=অপর+অহ্নে। ইতস্ততঃ=ইতঃ+ততঃ। যথেষ্ট=যথা+ইষ্ট। দিবালোক=দিবা+আলোক। স্বচ্ছ=স্ব+অচ্ছ। বার্ধক্যরেখাঙ্কিত=বার্ধক্যরেখা+অঙ্কিত। সঙ্কুচিত=সম্+কুচিত। আশ্চর্য =আ+চর্য। অপেক্ষা=অপ+ঈক্ষা। সম্ভ্রান্ত=সম্+ভ্রান্ত। বিদ্যালয়ে=বিদ্যা+আলয়ে। সচ্চরিত্র=সৎ+চরিত্র। বঙ্গীয়=বঙ্গ+ঈয়।

সমাস ॥ ভিখারী সাহেব—যিনি ভিখারী, তিনিই সাহেব—কর্মধা। দীর্ঘকালটা—দীর্ঘ ব্যাপ্ত হয়ে কালটা—দ্বিতীয়াতৎ। ঘর্মজল—যা ঘর্ম, তাই জল—কর্মধা। স্বচ্ছায়—স্ব ছায়া যার—বহুব্রী। প্রাণ-কাড়িয়া-নেওয়া—প্রাণ কাড়িয়া নেয় যা—উপপদতৎ। বৃক্ষতলে—বৃক্ষের তল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সুকোমল—সু কোমল—কর্মধা। হরিদ্বর্ণ—হরিৎ বর্ণ যার—বহুব্রী। দীর্ঘাকৃতি—দীর্ঘ আকৃতি যার—বহুব্রী। কৃষ্ণবর্ণ—কৃষ্ণ যে বর্ণ—কর্মধা। ভগ্ন-জীবন—ভগ্ন যে জীবন—কর্মধা। অপ্রসন্ন—নয় প্রসন্ন—নঞ্ তৎ। কথাবার্তা—কথা ও বার্তা—দ্বন্দ্ব। অনাথ—নেই নাথ যার—নঞ্-বহুব্রী। অন্নদায়ে—অন্নের দায়—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সর্দিজ্বরের—সর্দিজনিত জ্বর—মধ্যপ-কর্মধা, তার। ঔষধ-পথ্যাদি—ঔষধ ও পথ্য—দ্বন্দ্ব; তার আদি—ষষ্ঠীতৎ। তিলমাত্র—কেবল তিল—নিত্য সমাস। অনর্থপাত—নেই অর্থ যাতে—নঞ্-বহুব্রী,

তার পাত—ষষ্ঠীতৎ। রোগশয্যা—রোগের নিমিত্ত শয্যা—চতুর্থীতৎ। ডাক্তারবাবু—যিনি ডাক্তার, তিনিই বাবু—কর্মধা। হাত-পা—হাত ও পা—দ্বন্দ্ব। অবশ—নয় বশ—নঞ তৎ। চিকিৎসাকার্যে—চিকিৎসার কার্য—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বজ্রাঘাত—বজ্রের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ। হত্যাকারী—হত্যা করে যে—উপপদতৎ। ক্ষিপ্রহস্তে—ক্ষিপ্র যে হস্ত—কর্মধা, তাতে। রোষকষায়িত—রোষের দ্বারা কষায়িত—তৃতীয়াতৎ। আনন্দপূর্ণ—আনন্দের দ্বারা পূর্ণ—তৃতীয়াৎ। অন্যমনস্ক—অন্যদিকে মন যার—বহুব্রী। স্বেচ্ছায়—স্ব-র ইচ্ছা—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। শিষ্টাচার—শিষ্ট যে আচার—কর্মধা। পরমাত্মীয়ের—পরম যে আত্মীয়—কর্মধা, তার। প্রাণাধিকা—প্রাণ থেকে অধিক—পঞ্চমীতৎ [স্ত্রী]। পদস্থ—পদে থাকেন যিনি—উপপদতৎ। ভাবাপন্ন—ভাবকে আপন্ন—দ্বিতীয়াতৎ। জনসমাজস্বরূপ—জনের সমাজ—ষষ্ঠীততৎ, তার স্বরূপ—ষষ্ঠীতৎ। অনুসারে—সারের পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব। প্রাণদাতার—প্রাণ দান করেন যিনি—উপপদতৎ, তাঁর। প্রাণদণ্ডে—প্রাণের দণ্ড—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বাঙ্গালী-পরিচ্ছদ—বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ—ষষ্ঠীতৎ। হতাশ—হত আশা যার—বহুব্রী। হাত-কড়ি—হাতে পরাবার কড়ি—মধ্যপ-কর্মধা। অন্যায়-অধর্ম—যা অন্যায়, তাই অধর্ম—কর্মধা। পরোপকার—পরের উপকার—ষষ্ঠীতৎ। উচ্চহাস্য—উচ্চ যে হাস্য—কর্মধা। সজ্জন—সৎ যে জন—কর্মধা। স্বদেশবাসীকে—স্ব-র দেশ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে—বাস করে যে—উপপদতৎ, তাকে। ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতার পুত্র—ষষ্ঠীতৎ। পারদর্শী—পার দেখেছেন যিনি—উপপদতৎ। কার্যালয়—কার্যের নিমিত্ত আলয়—চতুর্থীতৎ। মর্মানুবাদ—বাদের পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব; মর্মের অনুবাদ—ষষ্ঠীতৎ। ব্যাধিগ্রস্ত—ব্যাধির দ্বারা গ্রস্ত—তৃতীয়াতৎ। জমিদারীভুক্ত—জমিদারীর দ্বারা ভুক্ত—তৃতীয়াতৎ। গণ্যমান্য—যিনি গণ্য, তিনিই মান্য—কর্মধা। চিকিৎসাশাস্ত্রে—চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্র—মধ্যপ-কর্মধা, তাতে। রোগমুক্তাবস্থায়—রোগ থেকে মুক্ত—পঞ্চমীতৎ; রোগমুক্ত যে অবস্থা—কর্মধা, তাতে। স্বাক্ষর—স্ব-র অক্ষর—ষষ্ঠীতৎ। প্রত্যর্পণ—অর্পণের বিপরীত—অব্যয়ীভাব। আচার-ব্যবহারে—আচার ও ব্যবহার—দ্বন্দ্ব, তাতে। কথাবার্তায়—কথা ও বার্তা—দ্বন্দ্ব, তাতে। প্রতিমূর্তি—মূর্তির সদৃশ—অব্যয়ীভাব। নিম্নস্থ—নিম্নে থাকে যে—উপপদতৎ। অপরাহ্ণে—অহনের অপর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বিস্ময়-বিস্ফারিত—বিস্ময়ের দ্বারা বিস্ফারিত—তৃতীয়াতৎ। দিবালোক—দিবার আলোক—ষষ্ঠীতৎ। মৃদুস্বরে—মৃদু যে স্বর—কর্মধা, তাতে। বার্ধক্যরেখাঙ্কিত—বার্ধক্য-জনিত রেখা—মধ্যপ-কর্মধা; তার দ্বারা অঙ্কিত—তৃতীয়াতৎ। আরোগ্যলাভ—আরোগ্যকে লাভ—দ্বিতীয়াতৎ। অজ্ঞানকৃত—নয় জ্ঞান—নঞ্‌তৎ; তার দ্বারা কৃত—তৃতীয়াতৎ। পরদুঃখকাতরতা—পরের দুঃখ—ষষ্ঠীতৎ; তার জনিত কাতরতা—মধ্যপ-কর্মধা। যথেষ্ট—ইষ্টকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব। বিদ্যালয়ে—বিদ্যার নিমিত্ত আলয়—চতুর্থীতৎ। আত্মসম্বরণ—আত্মকে সম্বরণ—দ্বিতীয়াতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ ভিখারী—ভিখ্‌+আরী। প্রলোভন—প্র-লুভ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। প্রতীক্ষা—প্রতি-ঈক্ষ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]+আ। গাড়োয়ান—গাড়ী+

ওয়ান। ম্রিয়মাণ—মৃ+শানচ্। অপরাধ—অপ্-রাধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রতিশ্রুতি—প্রতি-শ্রু+ক্ত [কর্তৃবা]। পুরস্কার—পুরঃ+কৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। চৈতী—চৈত+ঈ। লুব্ধ—লুভ্+ক্ত [কর্তৃবা]। উচ্চারণ—উৎ-চর্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। বৃদ্ধ—বৃধ্+ক্ত [কর্তৃবা]। পরিচ্ছদ—পরি-ছদ্+ঘঞ্। মূল্যবান—মূল্য+বতুপ্। পুরাতন—পুরা+তন। আদিম—আদি+ম। অবস্থা—অব-স্থা+ক। বস্ত্র—বস্+ত্র [করণবা]। অনুষ্ঠান—অনু-স্থা+অনট্ [ভাববা]। ত্রুটি—ত্রুট্+ই [কর্মবাচ্য]। কৌতূহল—কুতূহল+ষ্ণ। ভগ্ন—ভন্‌জ্+ক্ত [কর্মবা]। শ্রবণ—শ্রু+অনট্ [ভাববা]। নিদ্রা—নি-দ্রা+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। যাপন—যা+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। আপদ—আ-পদ্+ঘঞ্। ব্রাহ্ম—ব্রহ্ম+ষ্ণ। মানুষ-মনু [+ষ]+ষ্ণ। স্পর্শ—স্পৃশ্+ঘঞ। দোষ—দুষ্+ঘঞ্। জীবন্ত—জীব্+অন্ত। গর্বিত—গর্ব+ইতচ্। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। পরিষ্কার—পরি-কৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। উৎকৃষ্ট—উৎ-কৃষ্+ক্ত [কর্মবা]। জাতীয়—জাতি+ঈয়। বিস্মিত—বি-স্মি+ক্ত [কর্তৃবা]। অবসর—অব-সৃ+ঘঞ্। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। সেবন—সেব্+অনট্ [ভাববা]। আরম্ভ—আ-রভ্+ঘঞ্ [ভাববা]। কুটিল—কুট+ইল। দৃষ্টি—দৃশ্+ক্তি [ভাববা]। বালক—বাল+ক। পরিবার—পরি-বৃ+ঘঞ্ [করণবা]। দর্শনীয়—দৃশ্+অনীয়। প্রস্তাব—প্র-স্তু+ঘঞ্। উৎসাহ—উৎ-সহ্+ঘঞ। সম্মতি—সম্-মন্+ক্তি। জগৎ—গম্+ক্বিপ্। সমাচার—সম্-আ-চর্+ঘঞ্। অন্ন—অদ্+ক্ত [কর্মবা]। গম্ভীর—গম্+ঈর [অধিকরণবা]। অদ্ভুত—অৎ-ভূ+উত। আশ্রয়—আ-শ্রি+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। সংস্থান—সম্-স্থা+অনট্। অদ্ভুতত্ব—অদ্ভুত+ত্ব। সংগ্রহ—সম্-গ্রহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। দিব্য—দিব্+যৎ। আমোদ—আ-মুদ্+ঘঞ্। সংক্ষিপ্ত—সম্-ক্ষিপ্+ক্ত। প্রকাশিত—প্র-কাশ্+ক্ত। বাস্তবিক—বস্তু+ষ্ণিক। দৃপ্ত—দৃপ্+ক্ত। মূর্তি—মূর্ছ্+ক্তি। চলনসই—চলন+সই। গ্রাহ্য—গ্রহ্+ণ্যৎ। অত্যাচার—অতি-আ-চর্+ঘঞ। উপবাস—উপ-বস্+ঘঞ্। বিকার—বি-কৃ+ঘঞ্। আপন্ন—আ-পদ্+ক্ত। রাত্রি—রা+ত্রি। ঔষধ—ওষধি+ষ্ণ। পথ্য—পথ+ষ্ণ্য। পরিবর্তন—পরি-বৃত্+অনট্। নূতন—নূ [>নব]+তন। সাবধানতা—সাবধান+তা। ব্যক্তি—বি-অন্‌জ্+ক্তি। বিরক্ত—বি-রন্‌জ্+ক্ত। খামখেয়ালি—খামখেয়াল+ই। রোগী—রোগ+ইন্। চিকিৎসা—কিত্+সন্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। ত্যাগ—ত্যজ্+ঘঞ্। অদৃষ্ট—নঞ্-দৃশ্+ক্ত। নিশ্চিত—নিঃ-চি+ক্ত। মৃত্যু—মৃ+ত্যু। ক্ষিপ্র—ক্ষিপ্+র। ইচ্ছা—ইষ+ঘঞ্+আ। রোষ—রুষ্+ঘঞ্। কষায়িত—কষায়+ইতচ্। মার্জনা—মার্জ্+অনট্+আ। উৎকৃষ্ট—উৎ-কৃষ্+ক্ত [কর্তৃবা]। কার্য—কৃ+ণ্যৎ। ব্যবসায়—বি-অব-সো+ঘঞ্। লিপ্ত—লিপ্+ক্ত। প্রতিকার—প্রতি-কৃ+ঘঞ্। আনন্দ—আ-নন্দ্+ঘঞ্। আরোগ্য—নঞ্-রোগ+ষ্ণ্য। লক্ষিত—লক্ষ্+ক্ত। অন্যমনস্ক—অন্যমনঃ+ক। শাস্ত্র—শাস্+ত্র [করণবা]। পাণ্ডিত্য—পণ্ডিত+ষ্ণ্য। পরিচয়—পরি-চি+ঘঞ্। প্রশ্ন—প্রচ্ছ

+ন। আবশ্যক—অবশ্যম্+ক। প্রফুল্ল—প্র-ফুল্ল্+ক্ত। দারোয়ান—দার [দ্বার] +ওয়ান। উল্লিখিত—উৎ-লিখ্+ক্ত। বিপদ—বি-পদ্+ক্বিপ্। গুরুতর—গুরু+তর। আবদ্ধ—আ-বন্ধ্+ক্ত। শঙ্কিত—শঙ্কা+ইতচ্। দণ্ডনীয়—দণ্ড্+অনীয়। অপরাধ—অপ-রাধ্+ঘঞ্। অপরাধী—অপরাধ+ইন্। চিন্তিত—চিন্ত্+ক্ত। কলঙ্কিত—কলঙ্ক+ইতচ্। জীবিকা—জীব্+ক+আ। নির্বাহ—নিঃ-বহ্ঘঞ্। আত্মীয়—আত্মন্+ঈয়। উপমা—উপ-মা+ঘঞ্। সহজ—সহ-জন্+ড। প্রমাণ—প্র-মা+অনট্ [করণবা]। উত্তেজিত—উৎ-তিজ্+ক্ত। ন্যায্য—ন্যায়+ষ্ণ্য। ধূলিসাৎ—ধূলি+সাৎ। সহায়তা—সহায়+তা। উপযুক্ত—উপ-যুজ +ক্ত। সন্দেহ—সম্-দিহ্+ঘঞ্। প্রকাশ—প্র-কাশ্+ঘঞ্। আনুপূর্বিক—অনুপূর্ব+ষ্ণিক। মৌন—মুনি+ষ্ণ। বাহাদুরী—বাহাদুর+ঈ। প্রতিকৃতি—প্রতি-কৃ+ক্তি। দুহিতা—দুহ্+তৃচ্। ধর্ম—ধৃ+ম [করণবা]। বক্তৃতা—বক্তৃ+তা। অনুবাদ—অনু-বদ্+ঘঞ্। প্রদত্ত—প্র-দা+ক্ত। মুদ্রিত—মুদ্রা+ইতচ্। স্বীকার—স্ব-অভূততদ্ভাবে চ্বি+কৃ+ঘঞ্। আক্রান্ত—আ-ক্রম্+ক্ত। পাগলামি—পাগল+আমি। অন্বেষণ—অনু-ইষ্+অনট্ [ভাববা]। ভারত—ভরত+ষ্ণ। বর্ষ—বৃষ্+ঘঞ্। পরিত্যাগ—পরি-ত্যজ্+ঘঞ্। অন্তর্ধান—অন্তঃ-ধা+অনট্। অনুসন্ধান—অনু-সম্-ধা+অনট্ [ভাববা]। স্থিরতা—স্থির+তা। অনুরক্তি—অনু-রন্জ্+ক্তি। অনুগ্রহ—অনু-গ্রহ্+ঘঞ্। অর্পণ—অর্পি+অনট্। ব্যবহার—বি-অব-হৃ+ঘঞ্। সন্দিহান—সম্-দিহ্+আন [কর্তৃবা]। বিদায়—বি-দা+ঘঞ্ [ভাববা]। উত্থাপন—উৎ-স্থা+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। বার্ধক্য—বৃদ্ধ+ষ্ণ্য। অবগত—অব-গম্+ক্ত। পরিচয়—পরি-চি+ঘঞ্। আতিথ্য—অতিথি+ষ্ণ্য। বিস্মৃত—বি-স্মৃ+ক্ত। মূল্য—মূল+ষ্ণ্য। সামান্য—সমান+ষ্ণ্য। অন্তর্হিত—অন্তঃ-ধা+ক্ত। আগ্রহ—আ-গ্রহ্+ঘঞ্। প্রশমিত—প্র-শম্+ণিচ্+ক্ত। সম্বরণ—সম্-বৃ+অনট্। বিদ্যা—বিদ্+যৎ [করণবা]+আ।

কারক ও বিভক্তি ॥ গাড়োয়ানকে—কর্মে 'কে' বিভক্তি। ঘড়ি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। ট্রেনের—নিমিত্তে 'এর' বিভক্তি। তাহাকে—সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তি। লুব্ধনেত্রে—করণে 'এ' বিভক্তি। তাকিয়া—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। আমাকে—সম্প্রদানে 'কে' বিভক্তি। দৃষ্টিতে—করণে 'তে' বিভক্তি। উভয়ে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। উৎসাহের [সহিত]—কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'এর' বিভক্তি। অন্নদায়ে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। সময়—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। আমার [যাওয়া]—ভাববাচ্যের কর্তায় 'র' বিভক্তি। কাজের—সম্বন্ধ-বিশেষণে 'এর' বিভক্তি। কুলী—কর্মে শূন্যবিভক্তি। বাপ-মায়ে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। পুলিশে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। ক্ষিপ্রহস্তে—করণে 'এ' বিভক্তি। ঔষধে—করণে 'এ' বিভক্তি। আহ্লাদে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। চিকিৎসাগুণে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। স্বেচ্ছায়—ক্রিয়াবিশেষণে 'য়' বিভক্তি। নরশোণিতে—কারণে 'এ' বিভক্তি। বিরক্তভাবে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। ব্যাধিতে—করণে 'তে' বিভক্তি। মেলেই—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ সন্ধ্যা [বি]—সান্ধ্য [বিণ]। প্রতীক্ষা [বি]—প্রতীক্ষিত [বিণ]। প্রতিশ্রুতি [বি]—প্রতিশ্রুত [বিণ]। পুরস্কার [বি] পুরস্কৃত—[বিণ]। অপরাধ [বি]—অপরাধী [বিণ]। নিকট [বিণ]—নৈকট্য [বি]। লুব্ধ [বিণ] —লোভ, লুব্ধতা [বি]। সুকোমল [বিণ]—সুকোমলতা [বি]। সুদীর্ঘ [বিণ]—সুদীর্ঘতা [বি]। বৃদ্ধ [বিণ]—বার্ধক্য [বি]। পরিচ্ছদ [বি]—পরিচ্ছন্ন [বিণ]। অনুষ্ঠান [বি]—অনুষ্ঠিত, অনুষ্ঠেয় [বিণ]। কৌতূহল [বি]—কৌতূহলী [বিণ]। আদিম [বিণ]—আদিমতা [বি]। ইতিহাস [বি]—ঐতিহাসিক [বিণ]। শ্রবণ [বি]—শ্রুত [বিণ]। ব্যগ্র [বিণ]।—ব্যগ্রতা [বি]। নিদ্রা [বি]—নিদ্রালু, নিদ্রিত [বিণ]। যাপন [বি]—যাপিত [বিণ]। মানুষ [বি]—মানুষিক [বিণ]। ভূত [বি]—ভৌতিক [বিণ]। লোক [বি]—লৌকিক [বিণ]। পরিষ্কার [বি]—পরিষ্কৃত [বিণ]। জিজ্ঞাসা [বি]—জিজ্ঞাসু, জিজ্ঞাসিত [বিণ]। আরম্ভ [বি]—আরব্ধ [বিণ]। দরিদ্র [বিণ]—দারিদ্র্য, দরিদ্রতা [বি]। পরিবার [বি]—পারিবারিক [বিণ]। ভাত [বি]—ভেতো [বিণ]। অভিনব [বিণ] —অভিনবত্ব [বি]। দর্শনীয় [বিণ]—দর্শনীয়তা [বি]। প্রস্তাব [বি]—প্রস্তাবিত [বিণ]। উৎসাহ [বি]—উৎসাহী, উৎসাহিত [বিণ]। ঘৃণা [বি]—ঘৃণ্য, ঘৃণিত [বিণ]। আশ্রয় [বি]—আশ্রিত [বিণ]। গম্ভীর [বিণ]—গম্ভীরতা, গাম্ভীর্য [বি]। সংগ্রহ [বি]—সংগৃহীত [বিণ]। সপ্তাহ [বি]—সাপ্তাহিক [বিণ]। কাজ [বি]—কেজো [বিণ]। স্থান [বি]—স্থানীয়, স্থানিক [বিণ]। অঙ্গ [বি]—আঙ্গিক [বিণ]। সম্প্রতি [বি]—সাম্প্রতিক [বিণ]। আমোদ [বি]—আমোদিত, আমুদে [বিণ]। সংক্ষিপ্ত [বিণ]—সংক্ষেপ [বি]। পক্ষপাতী [বিণ]—পক্ষপাত, পক্ষপাতিত্ব [বি]। পরিবর্তন [বি]—পরিবর্তিত, পরিবর্তনীয় [বিণ]। মূর্তি [বি]—মূর্ত, মূর্তিমান্ [বিণ]। জ্যেঠা [বিণ]—জ্যেঠামি [বি]। অত্যাচার [বি]—অত্যাচারী, অত্যাচারিত [বিণ]। ফুল [বি]—ফুলেল [বিণ]। উপবাস [বি]—উপবাসী [বিণ]। প্রত্যহ [বি]—প্রাত্যহিক [বিণ]। খেয়াল [বি]—খেয়ালী [বিণ]। চিকিৎসা [বি]—চিকিৎসক, চিকিৎসিত, চিকিৎস্য [বিণ]। ক্রম [বি]—ক্রমিক [বিণ]। লক্ষণ [বি]—লাক্ষণিক [বিণ]। নূতন [বিণ] —নূতনত্ব [বি]। প্রস্তুত [বিণ]—প্রস্তুতি [বি]। সাবধানতা [বি]—সাবধান [বিণ]। প্রশ্ন [বি]—পৃষ্ট [বিণ]। ত্যাগ [বি]—ত্যক্ত, ত্যাগী [বিণ]। নিশ্চিত [বিণ]—নিশ্চয় [বি]। হিম [বি]—হিমেল [বিণ]। পণ্ডিত [বিণ]—পাণ্ডিত্য [বি]। মৃত্যু [বি]—মৃত [বিণ]। আশঙ্কা [বি]—আশঙ্কিত [বিণ]। ক্ষিপ্র [বিণ]—ক্ষিপ্রতা [বি]। পাগল [বিণ]—পাগলামি [বি]। উৎকৃষ্ট [বিণ]—উৎকর্ষ [বি]। শীতল [বিণ]—শীতলতা [বি]। ক্ষিপ্ত [বিণ]—ক্ষেপণ, ক্ষিপ্ততা [বি]। লিপ্ত [বিণ] —লেপন [বি]। সন্দেহ [বি]—সন্দিগ্ধ [বিণ]। প্রতিকার [বি]—প্রতিকারক [বিণ]। বিপদ [বি]—বিপন্ন [বিণ]। ভাব [বি]—ভাবুক [বিণ]। বিস্মিত [বিণ]—বিস্ময় [বি]। ঈশ্বর [বি]—ঐশ্বরিক [বিণ]। সাক্ষী [বিণ]—সাক্ষ্য

[বি]। কোণ [বি]—কৌণিক [বিণ]। সিক্ত [বিণ]—সিক্ততা, সেচ [বি]। শরীর [বি]—শারীরিক [বিণ]। উত্তাপ [বি]—উত্তপ্ত [বিণ]। পূর্ণ [বিণ]—পূর্ণতা [বি]। কৃপা [বি]—কৃপালু, কৃপাময় [বিণ]। সর্দারি [বি]—সর্দার [বিণ]। অন্যমনস্ক [বিণ]—অন্যমনস্কতা [বি]। বাবু [বিণ]—বাবুয়ানি, বাবুগিরি [বি]। জীবন [বি]—জৈবনিক [বিণ]। অসাধারণ [বিণ]—অসাধারণত্ব [বি]। পরিচয় [বি]—পরিচিত [বিণ]। মুখ [বি]—মৌখিক, মুখর [বিণ]। প্রফুল্ল [বিণ]—প্রফুল্লতা [বি]। চঞ্চল [বিণ]—চঞ্চলতা [বি]। সময় [বি]—সাময়িক [বিণ]। আবশ্যক [বিণ]—আবশ্যকতা [বি]। বিলম্ব [বি]—বিলম্বিত [বিণ]। উল্লিখিত [বিণ]—উল্লেখ [বি]। সমাদর [বি]—সমাদৃত [বিণ]। বিপদ [বি]—বিপন্ন [বিণ]। অতিশয় [বিণ]—আতিশয্য [বি]। শঙ্কিত [বিণ]—শঙ্কা [বি]। আবদ্ধ [বিণ]—আবদ্ধতা [বি]। দণ্ডনীয় [বিণ]—দণ্ড [বি]। চিন্তিত [বিণ]—চিন্তা [বি]। কলঙ্কিত [বিণ]—কলঙ্ক [বি]। বন্ধু [বিণ]—বন্ধুত্ব [বি]। সুবিপুল [বিণ]—সুবিপুলতা [বি]। সুখময় [বি]—সুখময়তা [বি]। ধর্ম [বি]—ধর্মীয়, ধার্মিক [বিণ]। নীতি [বি]—নৈতিক [বিণ]। অনুসার [বি]—অনুসারী [বিণ]। অক্ষম [বিণ]—অক্ষমতা [বি]। রক্ষা [বি]—রক্ষিত [বিণ]। রোগ [বি]—রুগ্ণ [বিণ]। আনুপূর্বিক [বিণ]—আনুপূর্বিকতা [বি]। মৌন [বি]—মৌনী [বিণ]। সংবাদ [বি]—সাংবাদিক [বিণ]। অনুরোধ [বি]—অনুরুদ্ধ [বিণ]। বাধ্য [বিণ]—বাধ্যতা [বি]। হতাশ [বিণ]—হতাশা [বি]। পরোপকার [বি]—পরোপকারী [বিণ]। পিশাচ [বি]—পৈশাচিক [বিণ]। সাধু [বিণ]—সাধুতা, সাধুত্ব [বি]। উন্মাদ [বিণ]—উন্মাদনা [বি]। মুগ্ধ [বিণ]—মুগ্ধতা [বি]। অনুবাদ [বি]—অনূদিত [বিণ]। প্রদত্ত [বিণ]—প্রদান [বি]। প্রেরিত [বিণ]—প্রেরণ [বি]। মুদ্রিত [বিণ]—মুদ্রণ [বি]। স্বীকার [বি]—স্বীকৃত [বিণ]। আক্রান্ত [বিণ]—আক্রমণ [বি]। পারদর্শী [বিণ]—পারদর্শিতা [বি]। অন্বেষণ [বি]—অন্বিষ্ট [বিণ]। প্রধান [বিণ]—প্রাধান্য [বি]। দীন [বিণ]—দৈন্য, দীনতা [বি]। শীত [বিণ]—শৈত্য [বি]। ঋতু [বি]—আর্তব [বিণ]। পরিত্যাগ [বি]—পরিত্যক্ত [বিণ]। অন্তর্ধান [বি]—অন্তর্হিত [বিণ]। বিফল [বিণ]—বিফলতা [বি]। অনুসন্ধান [বি]—অনুসন্ধানী [বিণ]। অনুরক্তি [বি]—অনুরক্ত [বিণ]। অনুগ্রহ [বি]—অনুগৃহীত [বিণ]। প্রত্যর্পণ [বি]—প্রত্যর্পিত [বিণ]। বিষয় [বি]—বৈষয়িক [বিণ] প্রসঙ্গ [বি]—প্রাসঙ্গিক [বিণ]। উত্থাপন [বি]—উত্থাপিত [বিণ]। স্বচ্ছ [বিণ]—স্বচ্ছতা [বি]। সুন্দর [বিণ]—সৌন্দর্য [বি]। অবগত [বিণ]—অবগতি [বি]। সঙ্কুচিত [বিণ]—সঙ্কোচ [বি]। জাতিচ্যুতি [বি]—জাতিচ্যুত [বিণ]। বিবাহ [বি]—বিবাহিত [বিণ]। প্রশমিত [বিণ]—প্রশমন [বি]। সম্মতি [বি]—সম্মত [বিণ]। মূর্খ [বিণ]—মূর্খতা [বি]। মন্দ [বিণ]—মান্দ্য [বি]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ সন্ধ্যা—সকাল। মিথ্যা—সত্য। পুরস্কার—তিরস্কার। হাসি—কান্না। সুকোমল—সুকঠিন। দীর্ঘাকৃতি—খর্বাকৃতি। মূল্যবান—মূল্যহীন। পুরাতন—নূতন। কুটিল—সরল। অপ্রসন্ন—সুপ্রসন্ন। আরম্ভ—সমাপ্তি। দরিদ্র—ধনী। স্ত্রী—স্বামী। পুত্র—পিতা। সম্মতি—অসম্মতি। জিজ্ঞাসা—উত্তর। বাহিরের—ভিতরের। বন্ধু—শত্রু। নিম্নে—উর্ধ্বে। গ্রাহ্য—অগ্রাহ্য। বিরক্ত—অনুরক্ত। বিরক্তি—অনুরক্তি। ত্যাগ—গ্রহণ। পণ্ডিত—মূর্খ। উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট। পশ্চাদ্‌বর্তী—সম্মুখবর্তী। লিপ্ত—নির্লিপ্ত। উত্তাপ—শৈত্য। নিয়মিত—অনিয়মিত। ম্লান—অম্লান। ভূত—ভবিষ্যৎ। চঞ্চল—ধীর। বিষণ্ণ—প্রসন্ন। আবদ্ধ—মুক্ত। অপরাধী—নিরপরাধ। সুখময়—দুঃখময়। অক্ষম—সক্ষম। মৌন—মুখর। হতাশ—আশান্বিত। জীবন—মৃত্যু। পাপ—পুণ্য। উপকার—অপকার। ধর্ম—অধর্ম। সাধু—অসাধু। অবাক্—সবাক্। প্রধান—অপ্রধান। বিফল—সুফল। স্থিরতা—অস্থিরতা। অনুগ্রহ—নিগ্রহ। প্রত্যর্পণ—প্রতিগ্রহণ। অপরাহ্ণ—পূর্বাহ্ণ। স্বচ্ছ—অস্বচ্ছ। সুন্দর—কুৎসিত। সম্পূর্ণ—অসম্পূর্ণ। প্রকৃত—বিকৃত। সঙ্কুচিত—স্ফীত। আনন্দিত—দুঃখিত। সচ্চরিত্র অসচ্চরিত্র। শিক্ষিত—অশিক্ষিত। স্মরণ—বিস্মরণ।

লিঙ্গান্তর ॥ ভিখারী—ভিখারিনী। সাহেব—মেম। চাকর—ঝি। বাবু—গিন্নী। ভূত—পেত্নী। মহাশয়—মহাশয়া। অনাথ—অনাথা। বালক—বালিকা। পুত্র—কন্যা। সর্দার—সর্দারনী। গৃহিণী—কর্তা। স্ত্রী—স্বামী। ছাত্রী—ছাত্র। মেয়ে—ছেলে। পাগল—পাগলী, পাগলিনী। ঈশ্বর—ঈশ্বরী। প্রাণাধিকা—প্রাণাধিক। দুহিতা—পুত্র। সাধু—সাধ্বী। পিশাচ—পিশাচী। ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতুষ্পুত্রী। পারদর্শী—পারদর্শিনী। সুন্দর—সুন্দরী।

বাক্যান্তর ॥ ১. আমি তাহাকে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কারই দিলাম। [কর্তৃবাচ্য] > আমার কর্তৃক সে প্রতিশ্রুত দ্বিগুণ পুরস্কারই প্রদত্ত হইল। [কর্মবাচ্য]। ২. আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি, হেনরি? তুমিই বরং আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচাইয়াছ। [কর্তৃবাচ্য] > আমা কর্তৃক আর তুমি কি উপকৃত হইয়াছ, হেনরি? তোমা কর্তৃক বরং আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে। [কর্মবাচ্য]। ৩. থাক আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশ করিব না। [কর্তৃবাচ্য] > থাকিতে দাও আর ঘরের কথা বেশী প্রকাশিত হইবে না। [কর্মবাচ্য]।

চলিত ভাষায় রূপান্তর ॥ ১. বৃক্ষতলে সুকোমল হরিদ্বর্ণ শষ্পরাজির উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া, তাহার উপর শতরঞ্চ বিছাইয়া, একটি তাকিয়া রাখিয়া হরি তেওয়ারি আমার বিছানা করিয়া দিল। > গাছের নীচে খুব নরম সবুজ রঙের ঘাসের ওপর একটা কম্বল বিছিয়ে, তার ওপর শতরঞ্চ বিছিয়ে, একটা তাকিয়া রেখে, হরি তেওয়ারি আমার বিছানা করে দিল। ২. অদ্য প্রাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। > আজ সকালে তাঁর ভাইপো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ৩. গত বৎসর শীত-ঋতুতে ইনি রোগমুক্তাবস্থায়

বন্ধুগণের সহিত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে যান। > গত বছর শীতকালে ইনি সুস্থ অবস্থায় বন্ধুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে বেড়াতে যান।

বাক্যান্তর ॥ ১. তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখশিশের প্রলোভন দেখাইয়া স্টেশনেও পৌঁছিলাম, আর ট্রেনখানিও ছাড়িয়া দিল। [যৌগিক বাক্য] —তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়োয়ানকে ডবল বখশিশের প্রলোভন দেখাইয়া স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র ট্রেনখানি ছাড়িয়া দিল। [সরল বাক্য]। তাড়াতাড়ি করিয়া, গাড়োয়ানকে ডবল বখশিশের প্রলোভন দেখাইয়া যেইমাত্র স্টেশনে পৌঁছিলাম, অমনি ট্রেনখানি ছাড়িয়া দিল। [মিশ্র বা জটিল বাক্য]। ২. আমি অতি দরিদ্র, খাইতে পাই না, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই। [যৌগিক বাক্য]—আমি অত্যন্ত দারিদ্র্যবশতঃ খাইতে না পাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই। [সরল বাক্য]। ৩. যদি আমার মেয়ে মরিয়া যায় তাহা হইলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিশে দিব। [মিশ্র বা যৌগিক বাক্য]—আমার মেয়ে মরিয়া গেলে তোমাকে তাহার হত্যাকারী বলিয়া পুলিশে দিব। [সরল বাক্য]।

সার্থক বাক্যরচনা ॥ **গাত্র**—তাহার কথা শুনিয়া কাহার না গাত্রদাহ হয়? **ঘর্মজল**—সেই দারুণ শীতে তাহাদের গাত্র হইতে ঘর্মজল নির্গত হইতে লাগিল। **হরিদ্বর্ণ**—হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া তাহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। **ইত্যবসরে**—আমি স্টেশনে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; ইত্যবসরে লোকটা আমার সুটকেস লইয়া চম্পট দিয়াছে। **আইনানুসারে**—যে চুক্তিভঙ্গ করিবে, সে আইনানুসারে দণ্ডনীয়। **যৎসামান্য**—যৎসামান্যই আয়োজন করিতে পারিয়াছি, গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। **সম্ভ্রান্তবংশীয়**—লোকটিকে দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়াই বোধ হয়। **লুব্ধনেত্রে**—ক্ষুধার্ত লোকটি সুসজ্জিত খাদ্যদ্রব্যের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল। **দীর্ঘাকৃতি**—ভিড়ের মধ্যে সেই দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তিকে আমাদের চিনিতে একটুও বিলম্ব হয় নাই। **তেজোদৃপ্ত**—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তেজোদৃপ্ত মূর্তি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। **উত্তরোত্তর**—রাত্রি বাড়িতে না বাড়িতেই রোগীর জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। **সঙ্কটাপন্ন**—দূর বিদেশে আমি আমার বন্ধুকে সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া আসিতে পারিলাম না। **রোষকষায়িত**—আমার উত্তর শুনিয়া লোকটি ক্ষণকাল আমার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। **ক্ষিপ্রহস্তে**—তিনি ক্ষিপ্রহস্তে শত্রুর উদ্যত অস্ত্র প্রতিহত করিলেন। **পরমাত্মীয়**—'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।' **প্রাণাধিকা**—প্রাণাধিকা কন্যার জন্য মা মেনকার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'ম্রিয়মাণ' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর। 'মুমূর্ষু' শব্দটির সঙ্গে তার প্রকৃতি-প্রত্যয়গত এবং অর্থগত পার্থক্য কি?

ম্রিয়মাণ—'মৃ' ধাতু+শানচ্ [কর্তৃবা]।

মুমূর্ষু—'মৃ' ধাতু+সন্+উ [কর্তৃবা]।

অর্থগত পার্থক্য : ম্রিয়মাণ—যে মরছে। মুমূর্ষু—যে মরতে ইচ্ছুক।

২. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : মূল্যবান, উৎকৃষ্ট, অনাথ, লিপ্ত, অপরাধী, মৌন, গ্রহণীয়।

মূল্যবান—মূল্যহীন। উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট। অনাথ—সনাথ। লিপ্ত—নির্লিপ্ত। অপরাধী—নিরপরাধ। মৌন—মুখর। গ্রহণীয়—বর্জনীয়।

৩. প্রদত্ত শব্দগুলির কোন্‌টি বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত : কলিয়ারী, জানালা, চুরুট, ভিখারী [উ. মা. '৭৮], গাড়োয়ান, চাকর, গাড়ি, কুলী, দস্তখৎ, ডাক্তার, বন্ধু, বাবু, লেফাফা, ছবি, সাবধানতা, যুবক, পাগল।

কলিয়ারী—বিদেশী শব্দ : ইংরেজি। জানালা—বিদেশী শব্দ : পর্তুগীজ। চুরুট—বিদেশী শব্দ : তামিল। ভিখারী—তদ্ভব শব্দ : ভিখ্<ভিক্ষা [সং]+আরী। গাড়োয়ান—বিদেশী শব্দ : হিন্দী। চাকর—বিদেশী শব্দ : ফারসী। গাড়ি—তদ্ভব শব্দ<গন্ত্রী [সং]। কুলী—বিদেশী শব্দ : ইংরেজি। দস্তখৎ—বিদেশী শব্দ : ফারসী। ডাক্তার—বিদেশী শব্দ : ইংরেজি। বন্ধু—তৎসম শব্দ। বাবু—বিদেশী শব্দ : ফারসী। লেফাফা—বিদেশী শব্দ : ফারসী। ছবি—তৎসম শব্দ ['ছো' ধাতু+ই]। সাবধানতা—তৎসম শব্দ। যুবক—তৎসম শব্দ। পাগল—তৎসম শব্দ।

□ একাদশী বৈরাগী □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ সন্ধ্যাহ্নিক=সন্ধ্যা+আহ্নিক। প্রত্যাগত=প্রতি+আগত। মর্মোদ্ভেদ=মর্ম+উৎ+ভেদ। ব্যবস্থাই=বি+অবস্থাই। তত্ত্বের=তৎ+ত্বের। নির্বিশেষে=নিঃ+বিশেষে। পুনরুদ্ধার=পুনঃ+উৎ+হার। দেশোদ্ধার=দেশ+উৎ+হার। ইত্যাদির=ইতি+আদির। দুর্নীতি=দুঃ+নীতি। সন্ত্রস্ত=সম্+ত্রস্ত। আচ্ছন্ন=আ+ছন্ন। উন্নতির=উৎ+নতির। গর্হিত=গর্+হিত। উদ্বাস্তু=উৎ+বাস্তু। নির্বাসিত=নিঃ+বাসিত। তদবধি=তৎ+অবধি। কদাচার=কৎ [<কু]+আচার। অর্ধেক=অর্ধ+এক। মঙ্গলার্থ=মঙ্গল+অর্থ। নিরতিশয়=নিঃ+অতিশয়। আশীর্বাদ=আশীঃ+বাদ। পরিষ্কার=পরি+কার। পরিচ্ছন্ন=পরি+ছন্ন। বিস্ময়াপন্ন=বিস্ময়+আপন্ন। নির্ভর=নিঃ+ভর। বাগবিতণ্ডা=বাক্+বিতণ্ডা। নিরীক্ষণ=নিঃ+ঈক্ষণ। সর্বাঙ্গে=সর্ব+অঙ্গে। নির্মল=নিঃ+মল। তথাপি=তথা+অপি। নিষ্ঠুর=নিঃ+ঠুর। একান্ত=এক+অন্ত। দুর্ভাগিনী=দুঃ+ভাগিনী। প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়ঃ+চিত্ত। নিরুপায়=নিঃ+উপায়। তিলার্ধ=তিল+অর্ধ। নীরব=নিঃ+রব। অত্যন্ত=অতি+অন্ত। ভেদাভেদ=ভেদ+অভেদ। যথার্থই=যথা+অর্থই। আশ্চর্য=আ+চর্য। শ্রাদ্ধাধিকারী=শ্রাদ্ধ+অধিকারী। উদ্দেশ=উৎ+দেশ। অন্তর্যামী=অন্তঃ+যামী। ব্যঙ্গোক্তিতে=ব্যঙ্গ+উক্তিতে। নির্বাহ=নিঃ+বাহ।

সমাস॥ ব্রাহ্মণ-প্রধান—ব্রাহ্মণ প্রধান যেখানে—বহুব্রী। প্রসার-প্রতিপত্তির—প্রসার ও প্রতিপত্তি—দ্বন্দ্ব, তার। সমবয়সীরা—সম বয়স যাদের—বহুব্রী, তারা। কলিকাতা-প্রত্যাগত—কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত—পঞ্চমীতৎ। সভা-সমিতিতে—সভা ও সমিতি—দ্বন্দ্ব, তাতে। মর্মোচ্ছেদ—মর্মের উচ্ছেদ—ষষ্ঠীতৎ। হিন্দুধর্মের—হিন্দুদের ধর্ম—ষষ্ঠীতৎ, তার। বিজ্ঞানসম্মত—বিজ্ঞানের দ্বারা সম্মত—তৃতীয়াতৎ। দেহরক্ষা-ব্যাপারে—দেহকে রক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ, তার ব্যাপার—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সন্ধ্যাহ্নিকের—সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক—মধ্যপ-কর্মধা, তার। কাঁচকলা—কাঁচা যে কলা—কর্মধা। প্রতিক্রিয়া—ক্রিয়ার বিপরীত—অব্যয়ীভাব। বহুবিধ—বহু বিধা যার—বহুব্রী। অপরিজ্ঞাত—নয় পরিজ্ঞাত—নঞ্‌তৎ। ছেলে-বুড়ো-নির্বিশেষে—ছেলে ও বুড়ো—দ্বন্দ্ব, তাদের নির্বিশেষ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। অনতিকাল—অতি যে কাল—কর্মধা, নয় অতিকাল—নঞ্‌তৎ। গঙ্গাস্নানের—গঙ্গায় স্নান—সপ্তমীতৎ, তার। দেশোদ্ধার—দেশের উদ্ধার—ষষ্ঠীতৎ। যুবক-মহলে—যুবকদের মহল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। মতিগতি—মতি ও গতি—দ্বন্দ্ব। হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী—হিন্দুদের ধর্ম—ষষ্ঠীতৎ, তা প্রচার করে যে [স্ত্রী]—উপপদতৎ। ধূমপান-নিবারণী—ধূমকে পান—দ্বিতীয়াতৎ, তা নিবারণ করে যে [স্ত্রী]—উপপদতৎ। দুর্নীতি-দলনী—দুঃ [মন্দ] যে নীতি—কর্মধা, তাকে দলন করে যে [স্ত্রী]—উপপদতৎ। সদলবলে—দল ও বল—দ্বন্দ্ব, দলবলের সহিত বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। বিদ্যাসুন্দরের—বিদ্যা ও সুন্দর—দ্বন্দ্ব, তার। শশিভূষণের—শশী ভূষণ যার—বহুব্রী, তার। ধর্মপ্রচারের—ধর্মের প্রচার—ষষ্ঠীতৎ, তার। ইতর-ভদ্র—ইতর ও ভদ্র—দ্বন্দ্ব। গৃহস্থের—গৃহে থাকে যে—উপপদতৎ, তার। খাতা-বগলে—খাতা বগলে যার—বহুব্রী। কদাচার—কু যে আচার—কর্মধা। অঙ্কপাত—অঙ্কের পাত—ষষ্ঠীতৎ। মহাপাপী—মহা যে পাপী—কর্মধা। বাস্তুভিটা—যা বাস্তু, তাই ভিটা—কর্মধা। স্মৃতিরত্নের—স্মৃতিতে রত্ন যে—বহুব্রী। সাধু-ব্যক্তি—সাধু যে ব্যক্তি—কর্মধা। সফলকাম—ফলের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। সফল কাম যার—বহুব্রী। ঠাকুরমশাই—যিনি ঠাকুর, তিনিই মশাই—কর্মধা। সাতপুরুষের—সাত পুরুষের সমাহার—দ্বিগু, তার। পুলকিত-চিত্তে—পুলকিত যে চিত্ত—কর্মধা, তাতে। দেব-দ্বিজে—দ্বি [দু'বার] জন্ম যার—বহুব্রী, দেব ও দ্বিজ—দ্বন্দ্ব, তাতে। ভক্তি-শ্রদ্ধার—ভক্তি ও শ্রদ্ধা—দ্বন্দ্ব, তার। সুখ্যাতি—সু এমন খ্যাতি—কর্মধা। আশীর্বাদ—আশীঃ [আশিস্] পূর্ণ বাদ—মধ্যপ-কর্মধা। করযোড়ে—যোড়া এমন কর—কর্মধা, তাতে। সবিনয়ে—বিনয়ের সহিত বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। অদৃষ্ট—নয় দৃষ্ট যা—নঞ্‌-বহুব্রী। হাতছাড়া—হাত ছেড়েছে যা—উপপদ। মরণকালে—মরণের কাল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। লক্ষ্মীশ্রী—লক্ষ্মীর শ্রী—ষষ্ঠীতৎ। চণ্ডীমণ্ডপ—মণ্ড পান করা হয় যেখানে—উপপদতৎ; চণ্ডীর নিমিত্ত মণ্ডপ—চতুর্থীতৎ। কণ্ঠভরা—কণ্ঠ ভরেছে যে—উপপদতৎ। লেশমাত্র—কেবল লেশ—নিত্য সমাস। রসকষ—রস ও কষ—দ্বন্দ্ব। হাত-বাক্স—হাতের কাছে রাখবার বাক্স—মধ্যপ-কর্মধা। ম্লান-মুখে—ম্লান যে মুখ—কর্মধা, তাতে। সসম্ভ্রমে—ভ্রমের সহিত বর্তমান—বহুব্রীহি; সম্ভ্রমের সহিত বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। ঘষা ও মাজা—দ্বন্দ্ব। আগাগোড়া—আগা থেকে

গোড়া—পঞ্চমীতৎ। বুড়োমানুষ—বুড়ো যে মানুষ—কর্মধা। অভাবনীয়—নয় ভাবনীয়—নঞ্‌তৎ। হতবুদ্ধি—হত বুদ্ধি যার—বহুব্রী। মা-বাপ-মরা—মা ও বাপ—দ্বন্দ্ব; মা-বাপ মরেছে যার—উপপদতৎ। কোলে-পিঠে—কোলে ও পিঠে—অলুক্-দ্বন্দ্ব। আদর-যত্নে—আদর ও যত্ন—দ্বন্দ্ব, তাতে। পদস্খলনে—পদের স্খলন—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। অনুশাসনের—শাসনের পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব, তার। নিরুপায়—নেই উপায় যার—নঞ্‌-বহুব্রী। কলঙ্ক-কাহিনী—কলঙ্কের কাহিনী—ষষ্ঠীতৎ। বিবর্ণমুখে—বিবর্ণ যে মুখ—কর্মধা, তাতে। বিধবা—বিগত ধব [স্বামী] যার [স্ত্রী]—বহুব্রী। অসীম—নেই সীমা যার—নঞ্‌-বহুব্রী। কাণ্ডজ্ঞান—কাণ্ডের জ্ঞান—ষষ্ঠীতৎ। ভেদাভেদজ্ঞান-বিবর্জিত—নয় ভেদ—নঞ্‌তৎ, ভেদ ও অভেদ—দ্বন্দ্ব; তার বিষয়ক জ্ঞান—মধ্যপ-কর্মধা, তার দ্বারা বিবর্জিত—তৃতীয়াতৎ। নিরপেক্ষ—নেই অপেক্ষা যার—নঞ্‌-বহুব্রী। বীরপুরুষ—বীর যে পুরুষ—কর্মধা। কুসীদজীবী—কুসীদে জীবিত থাকে যে—উপপদতৎ। পিতৃবিয়োগ—পিতার বিয়োগ—ষষ্ঠীতৎ। আকণ্ঠ—কণ্ঠ পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। শশধর—শশ ধারণ করে যে—উপপদতৎ। শ্রাদ্ধাধিকারী—শ্রাদ্ধের অধিকারী—ষষ্ঠীতৎ। হাতচিঠা—হাতে দেবার চিঠা—মধ্যপ-কর্মধা। তীর্থযাত্রা—তীর্থে যাত্রা—সপ্তমীতৎ। একাগ্রচিত্তে—একদিকে অগ্র—সপ্তমীতৎ; একাগ্র যে চিত্ত—কর্মধা, তাতে। রসিদ-পত্তর—যা রসিদ, তাই পত্তর—কর্মধা। খাতা-পত্তরের—খাতা ও পত্তর—দ্বন্দ্ব, তার। ঘোষালমশাই—যিনি ঘোষাল, তিনি মশাই—কর্মধা। রুষ্টকণ্ঠে—রুষ্ট যে কণ্ঠ—কর্মধা, তাতে। ব্যঙ্গোক্তিতে—ব্যঙ্গ-পূর্ণ উক্তি—কর্মধা, তাতে। সবিনয়—বিনয়ের সহিত বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। ব্রাহ্মণ-সন্তান—ব্রাহ্মণের সন্তান—ষষ্ঠীতৎ, তার। জল-গ্রহণ—জলকে গ্রহণ—দ্বিতীয়াতৎ। হতবুদ্ধি—হত বুদ্ধি যার—বহুব্রী। ধীরে-সুস্থে—ধীরে ও সুস্থে—অলুক্-দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ একাদশী—একাদশ+ঈ। বৈরাগী—বৈরাগ+ইন্। ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মন্‌+ষ্ণ। প্রধান—প্র-ধা+অনট্। প্রসার—প্র-স্ব+ঘঞ্‌ [ভাব]। প্রতিপত্তি—প্রতি-পদ্‌+ক্ত [ভাববা]। জীর্ণ—জৄ+ক্ত [কর্মধা]। শীর্ণ—শৄ+ক্ত [কর্মধা]। আহ্নিক—অহন্+ষ্ণিক। প্রত্যাগত—প্রতি-আ-গম্+ক্ত [কর্তৃবা]। সংস্থান—সম্-স্থা+অনট্। বিস্ময়—বি-স্মি+ঘঞ্‌ [ভাববা]। বক্তৃতা—বক্তৃ+তা। সনাতন—সনা+তন। নিগূঢ়—নি-গুহ্‌+ক্ত [কর্মবা]। রহস্য—রহস্+ষ্য। বৈদ্যুতিক—বিদ্যুৎ+ষ্ণিক। উপকারিতা—উপ-কৃ+ণিচ্‌+ক্ত+আ। রাসায়নিক—রসায়ন+ষ্ণিক। অপরিজ্ঞাত—নঞ্‌-পরি-জ্ঞা+ক্ত। ব্যাখ্যা—বি-আ-খ্যা+ঘঞ্‌+আ। অভিভূত—অভি-ভূ+ক্ত [কর্মবা]। আরম্ভ—আ-রভ্‌+ঘঞ্‌। পূর্ণিমা—পূর্ণি+মা+ঘঞ্‌+আ। পুনরুদ্ধার—পুনঃ-উৎ-হৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। সন্তান—সম্-তন্+অনট্। প্রচারিণী—প্র-চর্+ণিচ্‌+অনট্+ঈ। নিবারণী—নি-বৃ+ণিচ্‌+অনট্+ঈ। সন্ত্রস্ত—সম্-ত্রস্+ক্ত। প্রহার—প্র-হৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। শাসিত—শাস্+ক্ত [কর্মধা]। রক্ত—রঞ্জ্‌+ক্ত। জলন্ত—জ্বল্+অন্ত। আচ্ছন্ন—আ-ছদ্+ক্ত [কর্মবা]। মানসিক—মনঃ+ষ্ণিক। উপন্যাস—উপ-নি-অস্+ঘঞ্‌। লাঞ্ছিত—লান্ছ্‌+ক্ত। বিলম্ব—

বি-লম্ব্‌+ঘঞ্‌। উৎসাহ—উৎ-সহ্‌+ঘঞ্‌। প্রশস্ত—প্র-শন্‌স্‌+ক্ত [কর্মবা]। পরিত্যক্ত—পরি-ত্যজ্‌+ক্ত [কর্মবা]। আকৃষ্ট—আ-কৃষ্‌+ক্ত [কর্মবা]। সামাজিক—সমাজ+ষ্ণিক। অপরাধ—অপ-রাধ+ঘঞ্‌। নির্বাসিত—নিঃ-বস্‌+ণিচ্‌+ক্ত। সু-প্রসিদ্ধ—সু-প্র-সিধ্‌+ক্ত। জমিদার—জমি+দার। উপযাচক—উপ-যাচ্‌+অক। পরামর্শ—পরা-মৃশ্‌+ঘঞ্‌। অঙ্গীভূত—অঙ্গ-অভূততদ্ভাবে চ্বি+ভূ+ক্ত। অনুমতি—অনু-মন্‌+ক্তি। পুলকিত—পুলক+ইতচ্‌। দ্বিজ—দ্বি-জন্‌+ড। শ্রদ্ধা—শ্রৎ-ধা+ঘঞ্‌+আ। সুখ্যাতি—সু-খ্যা+ক্তি। আশীর্বাদ—আশীঃ-বদ্‌+ঘঞ্‌। নিবেদন—নি-বিদ্‌+অনট্‌। বিস্মৃত—বি-স্মৃ+ক্ত। পরিষ্কার—পরি-কৃ+ঘঞ্‌। পরিচ্ছন্ন—পরি-ছদ্‌+ক্ত [কর্মবা]। বিতৃষ্ণা—বি-তৃষ্‌+ন [ভাববা]+আ। নিঃসন্দেহ—নিঃ-সম্‌-দিহ্‌+ঘঞ্‌। পরিশোধ—পরি-শুধ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। শুষ্ক—শুষ্‌+ক্ত [কর্মবা]। পেষণ—পিষ্‌+অনট্‌। মনুষ্যত্ব—মনুষ্য+ত্ব। ম্লান—ম্লৈ+ক্ত [কর্মবা]। আপন্ন—আ-পদ্‌+ক্ত [কর্মবা]। উপবেশন—উপ-বিশ্‌+অনট্‌। অপরিচিত—নঞ্‌-পরি-চি+ক্ত। প্রয়োজন—প্র-যুজ্‌+অনট্‌। সামান্য—সমান+ষ্ণ্য। ভূমিকা—ভূমি+ক+আ। সম্বোধন—সম্‌-বুধ্‌+অনট্‌। স্থির—স্থা+ইর [কর্তৃবা]। সংকল্প—সম্‌-কৢপ্‌+ঘঞ্‌। অভিমান—অভি-মা+অনট্‌। বেয়াদপি—বে-আদপ+ই। আবশ্যক—অবশ্যম্‌+ক। প্রস্থান—প্র-স্থা+অনট্‌। নিক্ষেপ—নি-ক্ষিপ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। গম্ভীর—গম+ঈর [অধিকরণবা]। নিরীক্ষণ—নিঃ-ঈক্ষ্‌+অনট্‌। নিঃশ্বাস—নিঃ-শ্বস্‌+ঘঞ্‌। অভাবনীয়—নঞ্‌-ভূ+অনীয়। বিদেশী—বিদেশ+ঈ। লাঞ্ছনা—লাঞ্ছ্‌+অনট্‌+আ। নির্মল—নিঃ-মল্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। আনন্দ—আ-নন্দ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উপভোগ—উপ-ভুজ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উৎসাহিত—উৎ-সহ্‌+ক্ত [কর্মবা]। পুরাতন—পুরা+তন। বৈষ্ণব—বিষ্ণু+ষ্ণ। বৈমাত্রেয়—বিমাতা+ষ্ণেয়। প্রলোভন—প্র-লুভ্‌+অনট্‌। অনুসন্ধান—অনু-সম্‌+অনট্‌। বিবাহ—বি-বহ্‌+ঘঞ্‌। বৃদ্ধ—বৃধ্‌+ক্ত। অনুশাসন—অনু-শাস্‌+অনট্‌। অনুতপ্তা—অনু-তপ্‌+ক্ত+আ। নিরুপায়—নিঃ-উপ-ই+ঘঞ্‌। মাধুর্য—মধুর+ষ্ণ্য। যৌবন্‌—যুবন্‌+ষ্ণ। অনুভব—অনু-ভূ+ঘঞ্‌। ভিখারী—ভিখ্‌+আরী। পিপাসা—পা-সন্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]+আ। স্মরণ—স্মৃ+অনট্‌ [ভাববা]। পরম—পর+ম। বাঁদরামি—বাঁদর+আমি। বিবর্জিত—বি-বর্জ্‌+ক্ত [কর্মবা]। নিষ্ঠুর—নি-স্থা+উর [কর্তৃবা]। অনর্থক—নঞ্‌-অর্থ+ক। আহ্বান—আ-হ্বে+অনট্‌। উদ্যত—উৎ-যম্‌+ক্ত [কর্তৃবা]। নিষেধ—নি-সিধ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা] প্রস্তাব—প্র-স্তু+ঘঞ্‌ [ভাববা]। সংবরণ—সম্‌-বৃ+অনট্‌ [ভাববা]। নিশ্বাস—নি-শ্বস্‌+ঘঞ্‌। মোচন—মুচ্‌+অনট্‌। কুসীদজীবী—কুসীদ-জীব্‌+ইন্‌। প্রতিবাদ—প্রতি-বদ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। ক্ষোভ—ক্ষুভ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। বাস্তবিক—বাস্তব+ষ্ণিক। জননী—জন্‌+ণিচ্‌+অনট্‌+ঈ। কৌতূহলী—কুতূহল+ঘঞ্‌+ইন্‌। প্রশ্ন—প্রচ্ছ্‌+ন। অধিকারী—অধি-কৃ+ঘঞ্‌+ইন্‌। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্‌+ঘঞ্‌+আ। তীর্থ—তৄ+থ [কর্মবা]। হাস্য—হস্‌+যৎ। উদ্দেশ—উৎ-দিশ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। রৌদ্র—রুদ্র+ষ্ণ। ভয়ানক—ভী+আনক। অন্তর্যামী—অন্তঃ-যম্‌+

ণিচ্+ইন্ [কর্তৃবা]। ব্যঙ্গোক্তি—ব্যঙ্গ-বচ্+ক্তি [ভাববা]। নির্বাহ—নিঃ-বহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিপ্লব—বি-প্লু+ঘঞ্ [ভাববা]। আহ্বান—আ-হ্বে+অনট্ [ভাববা]। অনুসরণ—অনু-সৃ+অনট্। অপমান—অপ-মা+অনট্। আশ্চর্য—আ-[শ্]-চর্+যৎ। অপেক্ষা—অপ-ঈক্ষ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়ঃ [স্] চিত্+ক্ত। সুস্থ—সু-স্থা+ক। প্রস্থান—প্র-স্থা+অনট্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ ছেলে-বুড়ো-নির্বিশেষে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। ঘটায়—বিষয়াধিকরণে 'য়' বিভক্তি। সদলবলে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। [বাপের] বাড়ি—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। ঝোঁকে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। ফুলে ফলে—করণে 'এ' বিভক্তি। বঙ্কিমের—কর্তৃ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। অবিলম্বে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। সাধনায়—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। পেষণে—করণে 'এ' বিভক্তি। কোত্থেকে—অপাদানে 'থেকে' বিভক্তি। সসম্ভ্রমে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। মুখে [পোকা পড়ুক]—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। ছেলেতে—কর্তায় 'তে' বিভক্তি। চোখে—করণে 'এ' বিভক্তি। চোখে কানে—করণে 'এ' বিভক্তি। কলহে-বিবাদে—হেত্বর্থে 'এ' বিভক্তি। [তোমার] হাতে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। চোখে—করণে 'এ' বিভক্তি। কনুয়ের—করণে 'এর' বিভক্তি। নিঃশব্দে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। ইঙ্গিতে—করণে 'এ' বিভক্তি। সকলে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। বাড়ি—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। খাতা—কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। ব্যঙ্গোক্তিতে—করণে 'তে' বিভক্তি। তেষ্টার [জল]—নিমিত্তে 'র' বিভক্তি। সকলেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ গ্রাম [বি]—গ্রাম্য, গ্রামীণ [বিণ]। স্থান [বি]—স্থানীয়, স্থানিক [বিণ]। প্রসার [বি]—প্রসারিত [বিণ]। প্রচার [বি]—প্রচারিত [বিণ]। বৈদ্যুতিক [বিণ]—বিদ্যুৎ [বি]। উপযোগিতা [বি]—উপযোগী [বিণ]। উপকারিতা [বি]—উপকারী [বিণ]। রাসায়নিক [বিণ]—রসায়ন [বি]। পুনরুদ্ধার [বি]—পুনরুদ্ধৃত [বিণ]। বস্তু [বি]—বাস্তব, বাস্তবিক [বিণ]। সন্ত্রস্ত [বিণ]—সন্ত্রাস [বি]। প্রহার [বি]—প্রহৃত [বিণ]। শাসিত। [বিণ]—শাসন [বি]। মানসিক [বিণ]—মন, মানসিকতা [বি]। উন্নতি [বি]—উন্নত [বিণ]। উপন্যাস [বি]—ঔপন্যাসিক [বিণ]। লাঞ্ছিত [বিণ]—লাঞ্ছনা [বি]। অবশেষ [বি]—অবশিষ্ট [বিণ]। বিলম্ব [বি]—বিলম্বিত [বিণ]। উৎসাহ [বি]—উৎসাহী, উৎসাহিত [বিণ]। ভয়াবহ [বিণ]—ভয়াবহতা [বি]। সংগ্রহ [বি]—সংগৃহীত [বিণ]। প্রশস্ত [বিণ]—প্রশস্ততা, প্রশস্তি [বি]। পরিত্যক্ত [বিণ]—পরিত্যাগ [বি]। আকৃষ্ট [বিণ]—আকর্ষণ [বি]। সামাজিক [বিণ]—সমাজ, সামাজিকতা [বি]। নির্বাসিত [বিণ]—নির্বাসন [বি]। অব্যবহার [বি]—অব্যবহৃত [বিণ]। লুপ্ত [বিণ]—লুপ্তি [বি]। সুপ্রসিদ্ধ [বিণ]—সুপ্রসিদ্ধি [বি]। অভিপ্রায় [বি]—অভিপ্রেত [বিণ]। প্রস্তাব [বি]—প্রস্তাবিত [বিণ]। নিবেদন [বি]—নিবেদিত [বিণ]। বিস্মৃত [বিণ]—বিস্মৃতি [বি]। পরিষ্কার [বি]—পরিষ্কৃত [বিণ]।

পরিচ্ছন্ন [বিণ]—পরিচ্ছন্নতা [বি]। উপকার [বি]—উপকারী [বিণ]। নিঃসন্দেহ [বি]—নিঃসন্দিগ্ধ [বিণ]। শীর্ণ [বিণ]—শীর্ণতা [বি]। শুষ্ক [বিণ] —শুষ্কতা [বি]। রস [বি]—রসিক [বিণ]। পেষণ [বি]—পিষ্ট [বিণ]। বিসর্জন [বি]—বিসর্জিত [বিণ]। প্রণাম [বি]—প্রণত [বিণ]। উপবেশন [বি]—উপবিষ্ট [বিণ]। সম্বোধন [বি]—সম্বোধিত [বিণ]। জীবন [বি]—জৈবনিক [বিণ]। নির্ভর [বিণ]—নির্ভরতা [বি]। স্থির [বিণ]—স্থিরতা, স্থৈর্য [বি]। মুখ [বি]—মৌখিক [বিণ]। তীক্ষ্ণ [বিণ]—তীক্ষ্ণতা [বি]। গম্ভীর [বিণ]—গাম্ভীর্য [বি]। নিরীক্ষণ [বি]—নিরীক্ষিত [বিণ]। পিশাচ [বি]—পৈশাচিক [বিণ]। কুটুম্ব [বিণ]—কুটুম্বিতা [বি]। অভাবনীয় [বিণ]—অভাবনীয়তা [বি]। হতবুদ্ধি [বিণ]—হতবুদ্ধিতা [বি]। বিদেশী [বি]—বৈদেশিক [বিণ]। গরীব [বিণ]—গরীবি, গরিবানি [বি]। রক্ত [বি]-রক্তিম [বিণ]। নির্মল [বিণ]—নির্মলতা [বি]। কুল [বি]—কৌলিক [বিণ]। বিস্মিত [বিণ] —বিস্ময় [বি]। অতিশয় [বিণ]—আতিশয্য [বি]। বৃদ্ধ [বিণ]—বার্ধক্য [বি]। নিদ্রা [বি]—নিদ্রালু, নিদ্রিত [বিণ]। কলঙ্ক [বি]—কলঙ্কিত [বিণ]। গভীর [বিণ]—গভীরতা [বি]। নীরব [বিণ]—নীরবতা [বি]। আলোড়িত [বিণ]—আলোড়ন [বি]। অনুভব [বি]—অনুভূত [বিণ]। পথ [বি]—পাথেয় [বিণ]। স্মরণ [বি]—স্মরণীয় [বিণ]। বিধবা [বি]—বৈধব্য [বিণ]। আহ্বান [বি]—আহূত [বিণ]। অর্থ [বি]—আর্থিক [বিণ]। সূক্ষ্ম [বিণ]—সূক্ষ্মতা [বি]। ঠাকুর [বিণ]—ঠাকুরালি [বি]। নির্বাহ [বি] —নির্বাহিত [বিণ]। অপমান [বি]—অপমানিত [বিণ]। বিপ্লব [বি]— বৈপ্লবিক [বিণ]। অনুসরণ [বি]—অনুসৃত [বিণ]। যোগ [বি]—যৌগিক, যুক্ত [বিণ]। প্রস্থান [বি]—প্রস্থিত [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ প্রধান—অপ্রধান। জ্ঞানী—অজ্ঞান। দেশ—বিদেশ। উপযোগিতা—অনুপযোগিতা। উপকারিতা—অপকারিতা। আরম্ভ—সমাপ্তি। স্ত্রী —স্বামী, পুরুষ। জলন্ত—নিভন্ত। উন্নতি—অবনতি। ইতর—ভদ্র। গৃহস্থ—সন্ন্যাসী। প্রশস্ত—অপ্রশস্ত। আকৃষ্ট—বিকৃষ্ট। গর্হিত হিতকর। অব্যবহার—ব্যবহার। অগোচর—গোচর। সফলকাম—বিফলকাম। আশীর্বাদ—অভিশাপ। পরিষ্কার— অপরিষ্কার। পরিচ্ছন্ন—অপরিচ্ছন্ন। বিতৃষ্ণা—তৃষ্ণা। বিসর্জন—আবাহন। মহাজন —খাতক। গ্রহণ—বর্জন। জীবন—মরণ। সহ্য—অসহ্য। জমা—খরচ। আবশ্যক —অনাবশ্যক। অনাথ—সনাথ। পুরাতন—নূতন। নীরব—সরব। অবাক্—সবাক্। বিধবা—সধবা। অসীম—সসীম। অপমান—সম্মান। ক্ষুদ্র—বৃহৎ। সূক্ষ্ম—স্থূল। উত্তপ্ত—শীতল। প্রকাশ্য—অপ্রকাশ্য।

লিঙ্গান্তর ॥ ছেলে—মেয়ে। যুবক—যুবতী। বুড়ো—বুড়ী। মালী—মালিনী। সুন্দর—সুন্দরী। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী। বৈরাগী—বৈরাগিণী। ধোপা—ধোপানী। নাপিত —নাপিতানী। মহাশয়—মহাশয়া। জমিদার—জমিদারনী। ব্যাটা—বেটী। রসিক

—রসিকা। মহাপাপী—মহাপাপীয়সী। সাধু—সাধ্বী। কর্তা—গিন্নী। সঙ্গী—সঙ্গিনী। অনাথ—অনাথা। পিশাচ—পিশাচী। ভগিনী—ভ্রাতা। দুর্ভাগিনী [অশুদ্ধ; শুদ্ধরূপ—দুর্ভাগা]—দুর্ভাগ্য। ভিখারী—ভিখারিনী। বাপ—মা। ভূত—পেত্নী। ঠাকুর—ঠাকুরানী।

বাচ্যান্তর॥ ১. বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলেতে টাকা দেবে? [কর্তৃবাচ্য]> বুড়োমানুষ কর্তৃক টাকা দত্ত হবে না ত কি ছোট ছেলে কর্তৃক টাকা দত্ত হবে? [কর্মবাচ্য]। ২. আমরা সব জানি। [কর্তৃবাচ্য]>আমাদের কর্তৃক সব জ্ঞাত [কর্মবাচ্য]। ৩. তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্রেয় ছোট বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারে নাই। [কর্তৃবাচ্য]>তথাপি একাদশী কর্তৃক এই বৈমাত্রেয় ছোট বোনটি কিছুতেই পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই।

বাক্যান্তর॥ স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত পোড়া ভিটার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। [সরল বাক্য]—স্কুলের অদূরে যে পোড়ো ভিটাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল, তার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। [মিশ্র বা জটিল বাক্য]। ২. ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে…বিবাহ দিয়াছিল। [যৌগিক বাক্য]> ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। [সরল বাক্য]। ৩. গৌরীকে ছোট-জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতে মনে হয় না। [সরল বাক্য]।>মনে হয় না, গৌরী ছোট জাতের মেয়ে। [মিশ্র বা জটিল বাক্য]।

চলিত ভাষায় রূপান্তর॥ ১. ব্রাহ্মণ-পাড়ার অবিনাশের কানে…তবে ছাড়িয়া দিল। >বামুনপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায় সে তার নাক দিয়ে রক্ত বের করে তবে ছেড়ে দিল। ২. বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া…বলিয়া দিয়াছিল। >বিশেষ করে এতটা রাস্তা হেঁটে এসে অপূর্বর খুব তেষ্টা পাওয়ায় একটু আগে চাকরটাকে সে জল আনতে বলে দিয়েছিল।

সাধু ভাষায় রূপান্তর॥ ১. তুই চারটে পয়সা ধার করে……পারলি নে? >তুই চারিটা পয়সা ঋণ করিয়া আনিতে পারিলি, আর দুইটা এইভাবে ঋণ করিয়া আনিতে পারিলি না? ২. আর নেই কর্তা; ধাড়ার পোর……দিয়ে যাবে। >আর নাই কর্তা; ধাড়ার পুত্রের কত হস্তে-পদে পতিত হইয়া পয়সা চারিটি ঋণ করিয়া আনিয়াছি, অবশিষ্ট দুইটা পয়সা আগামী হট্টদিবসে দিয়া যাইব।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ **প্রসার-প্রতিপত্তি**—পাড়ায় রায়বাবুর প্রসার-প্রতিপত্তির কথা আমরা জানি। **বিজ্ঞান-সম্মত**—এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান-সম্মত জীবন-যাপনই কর্তব্য। **সদলবলে**—তিনি সহসা কোথা হইতে সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। **টাকার-কুমীর**—তুমি তো টাকার-কুমীর; কটা পয়সার জন্যে এত দরকষাকষি করছো? **হাঁড়ির-হাল**—বুড়োবয়সে মায়ের হয়েছে হাঁড়ির-হাল; কোন ছেলেই তাঁকে এখন দেখেন না। **ভূতের-বেগার**—একটা

পয়সার দেখা নেই; সারাটা দিন আমাকে পাড়ায় ভূতের-বেগার খেটে মরতে হয়। **সন্ধ্যাহ্নিক**—আমরা যখন তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হই, তখন তিনি সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়াছিলেন। **কলিকাতা-প্রত্যাগত**—কলিকাতা-প্রত্যাগত ছেলেটিকে দেখিবার জন্য গ্রামবাসীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। **সদ্য-সদ্যই**—অতীনকে শাস্তিদানের ফল সদ্য-সদ্যই ফলিল। **ইতর-ভদ্র**—গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলের সঙ্গেই রতনের সমান প্রীতির সম্পর্ক। **অঙ্কপাত**—মাটিতে অঙ্কপাত করিয়া সন্ন্যাসী তাহার ভাগ্যবিচার করিতে লাগিলেন। **অঙ্গীভুত**—শিক্ষার উন্নয়নও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। **সফলকাম**—সে তিন-তিনবার চেষ্টা করিয়াও পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারে নাই। **লক্ষ্মীশ্রী**—গ্রামের লক্ষ্মীশ্রী বলিতে যাহা ছিল, তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। **তেজারতি**—বংশানুক্রমে তেজারতির কারবার করিয়া তাহারা ধনী হইয়া উঠিয়াছে। **ইন্ধন**—রামবাবুর ক্রোধের আগুনে তাঁহার নায়েব মশাই ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। **মহাজন**—'জনগণে যারা জোঁক-সম শুষে তারে মহাজন কয়।' **বিস্ময়াপন্ন**—মহাশয়ের মন্তব্য শুনিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। **হক্কের**—হক্কের পাওনার টাকা চাইতে এসেছো, অত লজ্জা কিসের? **ছ্যাঁচড়াপনা**—ছ্যাঁচড়াপনায় নবীনের জুড়ি কোথাও নেই। **বৈমাত্রেয়**—লক্ষ্মণ ছিলেন রামের বৈমাত্রেয় ভাই। **পদস্খলন**—চারিদিকের প্রলোভনে সাধু মানুষেরও পদস্খলনের সম্ভাবনা। **বিবর্ণমুখে**—সে একধারে সারাক্ষণ বিবর্ণমুখে বসিয়াছিল। **কুসীদজীবী**—গ্রামের কুসীদজীবীরা দীর্ঘকাল গ্রামীণ সমাজকে শোষণ করে এসেছে। **হতবুদ্ধি**—তাহার অদ্ভুত আচরণে আমরা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'শশিভূষণ' শব্দে হ্রস্ব-ই-কার এবং 'অঙ্গীভূত' শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার কেন হয়েছে?

শশী [= শশ + ইন্] শব্দটি 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় দীর্ঘ ঈ-কার হয়েছে। কিন্তু 'ভূষণ' যুক্ত হওয়ায়—শশী ভূষণ যার [বহুব্রীহি সমাস] পূর্বপদ 'শশী'-র দীর্ঘ ঈ-কার হ্রস্ব ই-কারে পরিণত হয়েছে।

অঙ্গীভূত—অঙ্গ + অভূততদ্ভাবে চ্বি + ভূত + ক্ত। 'অঙ্গের' শব্দের সঙ্গে চ্বি প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় দীর্ঘ ঈ-কার হয়েছে।

২. 'মহাশয়' পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর। 'মহাশয়' ও 'মহদাশয়' পদ দুটির পার্থক্য দেখাও।

মহাশয়—মহান্ [মহা] আশয় [অভিপ্রায়] যার—বহুব্রীহি সমাস।

কিন্তু মহদাশয়—মহতের আশয়—ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস।

৩. 'সুদ ত হয়েছে কুল্লে সাতটাকা দু' আনা।'—'কুল্লে' শব্দটির উৎস কি?

কুল্লে—কুল্ [আরবী শব্দ]—সাকুল্যে।

৪. কোন্ শ্রেণীর শব্দ নির্ণয় কর: গোমস্তা, রসিদ, তেষ্টা, রোদ্দুর, বৈমাত্রেয়, সুদ।

গোমস্তা—বিদেশী শব্দ [ফারসী]।

রসিদ—বিদেশী শব্দ [ফারসী]।

তেষ্টা—অর্ধ-তৎসম শব্দ<তৃষ্ণা [সংস্কৃত]।
রোদ্দুর—অর্ধ-তৎসম শব্দ<রৌদ্র [সংস্কৃত]।
বৈমাত্রেয়—তৎসম শব্দ।
সুদ—বিদেশী শব্দ [ফারসী]।
৫. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: শান্ত, অপমান, স্থির, প্রস্থান।
শান্ত—অশান্ত, চঞ্চল।
অপমান—সম্মান।
স্থির—অস্থির।
প্রস্থান—প্রবেশ।

□ ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ অভ্যুদয়=অভি+উদয়। উদাসীন=উৎ+আসীন। পুনর্গ্রহণের =পুনঃ+গ্রহণের। সমুপস্থিত=সম্+উপস্থিত। হিতৈষী=হিত+এষী। উন্নতি =উৎ+নতি। একান্ত=এক+অন্ত। এতদর্থে=এতৎ+অর্থে। দুর্বল=দুঃ+বল। অতীব=অতি+ইব। শতাব্দীর=শত+অব্দীর। প্রারম্ভে=প্র+আরম্ভে। তন্মধ্যে= তৎ+মধ্যে। সংগ্রহ=সম্+গ্রহ। তদ্দ্বারা=তৎ+দ্বারা। উল্লেখ=উৎ+লেখ। নিষ্প্রয়োজন=নিঃ+প্রয়োজন। যথেষ্ট=যথা+ইষ্ট। খ্রীস্টাব্দে=খ্রীস্ট+অব্দে। অপরাপর=অপর+অপর। ব্যাকরণ=বি+আকরণ। পর্যবসিত=পরি+অবসিত। সমুন্নত=সম্+উৎ+নত। বেদান্ত=বেদ+অন্ত। দুরবস্থা=দুঃ+অবস্থা। সমাবেশ= সম+আবেশ। বাণিজ্যাগার=বাণিজ্য+আগার। অধীন=অধি+ইন। বিদ্রোহাগ্নি= বিদ্রোহ+অগ্নি। পূর্বোক্ত=পূর্ব+উক্ত। তদনুসারে=তৎ+অনুসারে। পীতাম্বর= পীত+অম্বর। খ্রীস্টধর্মাবলম্বীগণের=খ্রীস্টধর্ম+অবলম্বীগণের। মনোযোগ=মনঃ+ যোগ। উত্তীর্ণ=উৎ+তীর্ণ। পদার্পণ=পদ+অর্পণ। সম্পূর্ণ=সম্+পূর্ণ। সম্পন্ন=সম্ +পন্ন। সঙ্কল্প=সম্+কল্প। নবাগত=নব+আগত। বিদ্যালঙ্কার=বিদ্যা+অলম্+ কার। রাজাবলী=রাজা+আবলী। পরীক্ষা=পরি+ঈক্ষা। অধিকাংশের=অধিক +অংশের। দুর্বোধ=দুঃ+বোধ। বিস্ময়াবিষ্ট=বিস্ময়+আবিষ্ট। পরোক্ষ=পরঃ+অক্ষ। সম্ভ্রান্ত=সম্+ভ্রান্ত। যাবতীয়=যাবৎ+ঈয়। মহোৎসবাদিতে=মহা+উৎসব+ আদিতে। বিদ্যালয়ে=বিদ্যা+আলয়ে। মহাশয়ের=মহা+আশয়ের। তিরস্কার= তিরঃ+কার।

সমাস ॥ রাজপুরুষদিগের—রাজার পুরুষ—ষষ্ঠীতৎ, তাদিগের। শিক্ষা-বিস্তারের —শিক্ষার বিস্তার—ষষ্ঠীতৎ, তার। মহাসভার—মহতী যে সভা—কর্মধা, তার। ভারত-হিতৈষী—হিত এষণা করেন যিনি—উপপদতৎ; ভারতের হিতৈষী—ষষ্ঠীতৎ। ধর্মপ্রচার —ধর্মের প্রচার—ষষ্ঠীতৎ। উন্নতি-বিধান—উন্নতির বিধান—ষষ্ঠীতৎ। ক্রীতদাস-প্রথা-নিবারণকারী—ক্রীত যে দাস—কর্মধা; তাঁর প্রথা—ষষ্ঠীতৎ; তা নিবারণ করেন

যিনি—উপপদতৎ। সুবিখ্যাত—সু বিখ্যাত—কর্মধা। স্বদেশ-বিদেশে—স্ব-র দেশ—ষষ্ঠীতৎ, স্বদেশ ও বিদেশ—দ্বন্দ্ব, তাতে। নিষ্প্রয়োজন—নেই প্রয়োজন—নঞ্‌তৎ। যথেষ্ট—ইষ্টকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব। পাঠশালা—পাঠের নিমিত্ত শালা—চতুর্থীতৎ। জ্ঞানগর্ভ—জ্ঞান গর্ভে যার—বহুব্রী। দুরবস্থা—দুঃ যে অবস্থা—কর্মধা। বাণিজ্যাগার—বাণিজ্যের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ। মধ্যবিত্ত—মধ্য বিত্ত যার—বহুব্রী। গৃহস্থদিগের—গৃহে থাকে যে—উপপদতৎ, তাদিগের। ধর্ম-প্রচারক—ধর্ম প্রচার করেন যিনি—উপপদতৎ। বিদ্রোহাগ্নি—বিদ্রোহ-রূপ অগ্নি—রূপক-কর্মধা। কার্যক্ষেত্র—কার্যের ক্ষেত্র—ষষ্ঠীতৎ। অনুমতিপত্র—অনুমতিসূচক পত্র—মধ্যপ-কর্মধা। অনভিজ্ঞ—নয় অভিজ্ঞ—নঞ্‌তৎ। উৎকোচজীবী—উৎকোচে বাঁচে যে—উপপদতৎ। নবাগত—নব আগত—কর্মধা। বিদ্যালঙ্কার—বিদ্যা অলঙ্কার যাঁর—বহুব্রী। দুর্বোধ—দুঃ [দুঃসাধ্য] বোধ যার—বহুব্রী। বিস্ময়াবিষ্ট—বিস্ময়ের দ্বারা আবিষ্ট—তৃতীয়াতৎ। চির-স্মরণীয়—চির ব্যাপ্ত করে স্মরণীয়—দ্বিতীয়াতৎ। উৎপত্তি-স্থান—উৎপত্তির স্থান—ষষ্ঠীতৎ। ব্যাকরণহীন—ব্যাকরণ দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। মহোৎসবাদিতে—মহা যে উৎসব—কর্মধা, তার আদি—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। পদগৌরব—পদের গৌরব—ষষ্ঠীতৎ। চিহ্নস্বরূপ—স্ব-র রূপ—ষষ্ঠীতৎ; চিহ্নের স্বরূপ—ষষ্ঠীতৎ। বাক্য-রচনা-প্রণালী—বাক্যের রচনা—ষষ্ঠীতৎ; তার প্রণালী—ষষ্ঠীতৎ। মনোযোগ—মনের যোগ—ষষ্ঠীতৎ। কণ্ঠস্থ—কণ্ঠে থাকে যা—উপপদতৎ। মুখস্থ—মুখে থাকে যা—উপপদতৎ। বিদ্যালয়ে—বিদ্যার নিমিত্ত আলয়—চতুর্থীতৎ, তাতে। বাক্য-রচনাহীন—বাক্যের রচনা—ষষ্ঠীতৎ; তার দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। ইংরাজীশিক্ষিত—ইংরাজীতে শিক্ষিত—সপ্তমীতৎ। পরলোকগত—পর যে লোক—কর্মধা; তাতে গত—সপ্তমীতৎ। মহাশয়ের—মহান্ আশয় যাঁর—বহুব্রী, তাঁর। অধীনস্থ [অশুদ্ধ; শুদ্ধরূপ—'অধীন'।]—অধীনে থাকে যে—উপপদতৎ। প্রতিদিন—দিন দিন—অব্যয়ীভাব। কর্ণগোচর—কর্ণের গোচর—ষষ্ঠীতৎ। বসুজ—বসু থেকে জন্মেছেন যিনি—উপপদতৎ। কথাবার্তা—কথা ও বার্তা—দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ শিক্ষা—শিক্ষ্‌+অঙ্‌ [ভাববা]। আ। অভ্যুদয়—অভি-উৎ-ই+ঘঞ্‌ [ভাববা]। এদেশীয়—এদেশ+ঈয়। বিস্তার—বি-স্তৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উদাসীন—উৎ-আস্‌+শতৃ। পুনর্গ্রহণ—পুনঃ-গ্রহ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। উপস্থিত—উপ-স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। সমুপস্থিত—সম্-উপ-স্থা+ক্ত [কর্তৃবা]। হিতৈষী—হিত-ইষ্‌+ইন্‌। প্রচার—প্র-চর্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উন্নতি—উৎ-নম্‌+ক্তি [ভাববা]। বিধান—বি-ধা+অনট্‌। কর্তব্য—কৃ+তব্য। প্রস্তাব—প্র-স্তু+ঘঞ্‌ [ভাববা]। অর্পণ—অর্পি+অনট্‌ [ভাববা]। প্রথা—প্রথ্‌+ঘঞ্‌+আ। নিবারণ—নি-বারি+অনট্‌ [ভাববা]। সুবিখ্যাত—সু-বি-খ্যা+ক্ত [কর্তৃবা]। সহায়তা—সহায়+তা। প্রতিশ্রুত—প্রতি-শ্রু+ক্ত [কর্মবা]। প্ররোচনা—প্র-রুচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ [ভাববা]+আ। পরিত্যাগ—পরি-ত্যজ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। হরণ—হৃ+অনট্‌ [ভাববা]। প্রয়াস—প্র-যস্‌+ঘঞ্‌। অবস্থা—অব-স্থা+ক। শোচনীয়—শুচ্‌+অনীয়। সংগ্রহ—

সম্-গ্রহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। নিযুক্ত—নি-যুজ্+ক্ত [কর্মবা]। জ্ঞাতব্য—জ্ঞা+তব্য। বিবরণ—বি-বৃ+অনট্ [ভাববা]। উল্লেখ—উৎ-লিখ্+ঘঞ্ [ভাববা]। নিষ্প্রয়োজন—নিঃ-প্র-যুজ্+অনট্ [ভাববা]। যথেষ্ট—যথা-ইষ্+ক্ত। সংখ্যা—সম্-খ্যা+ঘঞ্+আ। গণনা—গণ্+অনট্+আ। সংস্কৃত—সম্-কৃ+ক্ত [কর্মবা]। ব্যাকরণ—বি-আ-কৃ+অনট্ [ভাববা]। পর্যবসিত—পরি-অব-সো+ক্ত [কর্মবা]। জগৎ—গম্+ক্বিপ্। মানব—মনু+ষ্ণ। বিদ্যমান—বিদ্+শানচ্। সমাবেশ—সম্-আ-বিশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আকৃষ্ট—আ-কৃষ্+ক্ত [কর্মবা]। বৎসর—বস-স্+ঘঞ্। সুপ্রতিষ্ঠিত—সু-প্রতি-স্থা+ক্ত [কর্মবা]। স্থাপিত—স্থা-ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]। স্বীয়—স্ব+ঈয়। সন্তান—সম্-তন্+ঘঞ্। আকাঙ্ক্ষা—আ-কাঙ্ক্ষ্+ঘঞ্ [ভাববা] +আ। প্রচারক—প্র-চর্+অক। বিদ্রোহ—বি-দ্রুহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। অনুমতি—অনু-মন্+ক্তি [ভাববা]। দীক্ষিত—দীক্ষ্+ক্ত [কর্মবা]। জাতীয়—জাতি+ঈয়। আবশ্যক—অবশ্যম্+ক। অবলম্বী—অব-লম্ব্+ইন্। অনুবাদ—অনু-বদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। ব্যাপ্ত—বি-আপ্+ক্ত [কর্মবা]। অনুষ্ঠান—অনু-স্থা+অনট্। পুরাতন—পুরা+তন। উত্তীর্ণ—উৎ-তৃ+ক্ত [কর্মবা]। সংক্রান্ত—সম্-ক্রম্+ক্ত [কর্তৃবা]। গুরুতর—গুরু+তর। চরিত্র—চর্+ইত্র [করণবা]। অনভিজ্ঞ—নঞ্-অভি+জ্ঞা+ক। সম্পন্ন—সম্-পদ্+ক্ত [কর্মবা]। উৎকোচজীবী—উৎকোচ-[উৎ-কুচ্+ঘঞ্]+জীব্+ইন্। আশ্রয়—আ-শ্রি+ঘঞ [ভাববা]। প্রমাদ—প্র-মদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সঙ্কল্প—সম্-কৢপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রেরণ—প্র-ঈর্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। প্রণয়—প্র-নী+অনট্ [ভাববা]। দুর্বোধ—দুঃ-বুধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রভেদ—প্র-ভিদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিস্ময়াবিষ্ট—[বি-স্মি+ঘঞ্]+আ-বিশ্+ক্ত [কর্মবা] চিরস্মরণীয়—চির-স্মৃ+অনীয়। সুপ্রসিদ্ধ—সু-প্র-সিধ্+ক্ত [কর্মবা]। মুদ্রিত—মুদ্রা+ইতচ্। পণ্ডিত—পণ্ডা+ইতচ্। উৎপত্তি—উৎ-পদ্+ক্তি [ভাববা]। নির্দেশ—নিঃ-দিশ্+ঘঞ্। যাবতীয়—যাবৎ+ঈয়। তৎকালীন—তৎকাল+ঈন্। প্রতিপত্তি—প্রতি-পদ্+ক্তি। মহোৎসব—মহা-উৎ-সু+ঘঞ্। গৌরব—গুরু+ষ্ণ। আশ্রিত—আ-শ্রি+ক্তি [কর্মবা]। ঘোষান—ঘোষ্ [ঘুষ]+আন। প্রণীত—প্র-ণী+ক্ত [কর্মবা]। প্রভু—প্র-ভূ+উ [কর্তৃবা]। তিরস্কার—তিরঃ-কৃ+ঘঞ্। আশ্চর্য—আ [+শ]-চর্+ণ্যৎ। সায়াহ্নিক—সায়াহ্ন+ষ্ণিক। আমোদ—আ-মুদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রমোদ—প্র-মুদ্+ঘঞ্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ প্ররোচনাতে—করণে 'তে' বিভক্তি। প্রস্তাবে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। প্রযত্নে—করণে 'এ' বিভক্তি। অনেকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। দানাতে—করণে 'তে' বিভক্তি। বেতনে—করণে 'এ' বিভক্তি। ভাবে, আকারে, ইঙ্গিতে—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ অভ্যুদয় [বি]—অভ্যুদিত [বিণ] বিস্তার [বি]—বিস্তৃত [বিণ]। উদাসীন [বিণ]—উদাসীনতা [বি]। পুনর্গ্রহণ [বি]—পুনর্গৃহীত [বিণ]। হিতৈষী [বিণ]—হিতৈষা [বি]। পুরুষ [বিণ]—পৌরুষ [বি]।

ধর্ম [বি]—ধর্মীয় [বিণ]। উন্নতি [বি]—উন্নত [বিণ]। বিধান [বি]—বিহিত—[বিণ]। রচনা [বি]—রচিত [বিণ]। অর্পণ [বি]—অর্পিত [বিণ]। প্রতিশ্রুত [বিণ]—প্রতিশ্রুতি [বি]। পরিত্যাগ [বি]—পরিত্যক্ত [বিণ]। সংগ্রহ [বি]—সংগৃহীত [বিণ]। স্বতন্ত্র [বিণ]—স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা [বি]। পরিণত [বিণ]—পরিণতি [বি]। পর্যবসিত [বিণ]—পর্যাবসান [বি]। হৃদয় [বি]—হৃদ্য [বিণ]। সমুন্নত [বিণ]—সমুন্নতি [বি]। বেদ [বি]—বৈদিক [বিণ]। বেদান্ত [বি]—বৈদান্তিক [বিণ]। পুরাণ [বি]—পৌরাণিক [বিণ]। ইতিহাস [বি]—ঐতিহাসিক [বিণ]। পণ্ডিত [বিণ]—পাণ্ডিত্য [বি]। সমাবেশ [বি]—সমাবিষ্ট [বিণ]। আকৃষ্ট [বিণ]—আকর্ষণ [বি]। স্থাপিত [বিণ]—স্থাপন [বি]। আকাঙ্ক্ষা [বি]—আকাঙ্ক্ষিত [বিণ]। বর্ধিত [বিণ]—বৃদ্ধি [বি]। বিস্তার [বি]—বিস্তৃত [বিণ]। অনুশীলন [বি]—অনুশীলিত [বিণ]। ব্যাপ্ত [বিণ]—ব্যাপ্তি [বি]। অনুষ্ঠিত [বিণ]—অনুষ্ঠান [বি]। উত্তীর্ণ [বিণ]—উত্তরণ [বি]। আশ্রয় [বি]—আশ্রিত [বিণ]। প্রেরণ [বি]—প্রেরিত [বিণ]। প্রবৃত্ত [বিণ]—প্রবৃত্তি [বি]। প্রণয়ন [বি]—প্রণীত [বিণ]। বহুল [বিণ]—বহুলতা, বাহুল্য [বি]। আবিষ্ট [বিণ]—আবেশ [বি]। চিরস্মরণীয় [বিণ]—চিরস্মরণীয়তা [বি]। মুদ্রিত [বিণ]—মুদ্রণ [বি]। প্রকাশিত [বিণ]—প্রকাশ [বি]। সম্রান্ত [বিণ]—সম্ভ্রম [বি]। প্রসিদ্ধ [বিণ]—প্রসিদ্ধি [বি]। বিস্মিত [বিণ]—বিস্ময় [বি]। জিজ্ঞাসা [বি]—জিজ্ঞাসু, জিজ্ঞাসিত [বিণ]। তৎকালীন [বিণ]—তৎকাল [বি]। প্রচলিত [বিণ]—প্রচলন [বি]। উল্লেখ [বি]—উল্লেখিত [বিণ]। ব্যাকরণ [বি]—বৈয়াকরণ [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ উদয়—অস্ত। শিক্ষাবিস্তার—শিক্ষাসংকোচ। উপস্থিত—অনুপস্থিত। হিতৈষী—বিদ্বেষী। উন্নতি—অবনতি। অর্পণ—গ্রহণ। স্বদেশ—বিদেশ। দুর্বল—প্রবল। প্রারম্ভ—সমাপ্তি। তথ্য—তত্ত্ব। পণ্ডিত—মূর্খ। আকৃষ্ট—বিকৃষ্ট। অজ্ঞতা—বিজ্ঞতা। নিম্নতম—উর্ধ্বতম। প্রভেদ—অভেদ। জীবিত—মৃত। পরোক্ষ—প্রত্যক্ষ। প্রবৃত্তি—নিবৃত্তি। খ্যাতি—অখ্যাতি। সুশিক্ষিত—অশিক্ষিত। প্রাচীন—নবীন। প্রভু—ভৃত্য। তিরস্কার—পুরস্কার। সুবিধা—অসুবিধা। দুষ্ট—শিষ্ট। সদয়—নির্দয়।

লিঙ্গান্তর ॥ উদাসীন—উদাসীনা। হিতৈষী—হিতৈষিণী। প্রবাসী—প্রবাসিনী। পুস্তিকা—পুস্তক। ক্রীতদাস—ক্রীতদাসী। সভাপতি—সভানেত্রী। আকৃষ্ট—আকৃষ্টা। দেশীয়—দেশীয়া। উত্তীর্ণ—উত্তীর্ণা। প্রতিভাশালী—প্রতিভাশালিনী। মনস্বী—মনস্বিনী। মহাশয়—মহাশয়া। সাহেব—মেম। বহুজ—বহুজা।

বাচ্যান্তর ॥ ১. এতদর্থে তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা···অর্পণ করেন [কর্তৃবাচ্য] >এতদর্থে তাঁহার কর্তৃক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হইয়া বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভ্যগণের হস্তে অর্পিত হয়। [কর্মবাচ্য] ২. বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে গভর্নমেণ্ট··· নিযুক্ত করেন। [কর্তৃবাচ্য]>বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ডাক্তার

ফ্রান্সিস বুকানান হামিল্টন নামক একজন কর্মচারী কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত হন। [কর্মবাচ্য] ৩. এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,··· প্রণয়ন করেন [কর্তৃবাচ্য]>এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক কতকগুলি গ্রন্থ প্রণীত হয়। [কর্মবাচ্য]

চলিত ভাষায় রূপান্তর॥ ১. তখনকার বাঙ্গালা ও বর্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে, পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।>তখনকার বাংলা ও এখানকার বাংলায় এত ফারাক যে, পড়লে অবাক হতে হয়। বেতাল পঞ্চবিংশতিকে বর্তমান সুললিত বঙ্গভাষার উৎপত্তি-স্থান বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।>বেতাল পঞ্চবিংশতিকে এখনকার সুমিষ্ট বাংলা ভাষার উৎপত্তি-স্থান বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

বাক্যান্তর॥ ১. কলেজ স্থাপন করিলেই পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হইল। [সরল বাক্য]>কলেজ স্থাপন করা হইল এবং পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হইল। [যৌগিক বাক্য]>যখন কলেজ স্থাপন করা হইল, তখন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হইল। [মিশ্র বা জটিল বাক্য]। ২. হামিল্টন অনেক জিলা পরিদর্শন করিয়া এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। [সরল বাক্য]>হামিল্টন অনেক জিলা পরিদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। [যৌগিক বাক্য]।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ **হিতৈষী**—বস্তুতঃ স্যার আশুতোষের মতো দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি এদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। **নিষ্প্রয়োজন**—দেশের উন্নতির জন্যে তাঁর অবদান কতখানি, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। **প্ররোচনা**—ভণ্ড ব্যক্তির প্ররোচনায় প্রতারিত হবার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। **পর্যবসিত**—আমাদের সমস্ত প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। **তৎকালীন**—মহাত্মা রামমোহন যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তৎকালীন ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য আছে। **সায়াহ্নিক**—সেদিনের সায়াহ্নিক বৈঠকে স্থির হলো যে, আমরা গ্রামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করবো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা॥ ১. 'হিতৈষী' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ করে তার প্রতিশব্দ লিখ।

হিতৈষী=হিত+এষী। প্রতিশব্দ—হিতকামী।

২. 'মনস্বী' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর।

মনস্বী—মনস্+বিন্।

৩. 'দুর্বোধ' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ করে অর্থ লিখ। 'দুর্বোধ' ও 'দুর্বোধ্য'—এ দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ?

দুর্বোধ=দুঃ+বোধ। দুর্বোধ—যা বোঝা শক্ত। কিন্তু দুর্বোধ্য—যা বুঝতে পারা শক্ত।

৪. 'সম্ভ্রান্ত' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ। বর্তমানে শব্দটির প্রচলিত অর্থ কি ? ইহাতে শব্দার্থের উন্নতি বা অবনতি ঘটেছে লিখ।

সম্ভ্রান্ত—সম্—ভ্রম্+ক্ত [কর্তৃবাচ্য]। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে সম্যক্‌রূপে ভ্রান্ত; অর্থাৎ, যে সব দিক দিয়ে ভ্রান্ত।

বর্তমান প্রচলিত অর্থ—অভিজাত মর্যাদাসম্পন্ন।

শব্দার্থের উন্নতি ঘটেছে।

৫. 'সায়াহ্নিক' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত প্রতিশব্দ লিখ। সায়ম্-অহন্+ষ্ণিক। প্রতিশব্দ—সন্ধ্যাকালীন।

□বাহিরে যাত্রা□

সন্ধি-বিচ্ছেদ॥ কিয়দংশ=কিয়ৎ+অংশ। প্রত্যহ=প্রতি+অহ। বনান্ধকারের=বন+অন্ধকারের। সূর্যাস্ত=সূর্য+অস্ত। স্বর্ণ=সু+ঋণ। দিগন্ত=দিক্+অন্ত। অভ্যাসের=অভি+আসের। সংকুচিত=সম্+কুচিত। মনোহর=মনঃ+হর। মধ্যাহ্নের=মধ্য+অহ্নের। অত্যন্ত=অতি+অন্ত। স্বাধীনতা=স্ব+অধীনতা। আচ্ছাদন=আ+ছাদন। পরিচ্ছদের=পরি+ছদের। হতাশ=হত+আশ। সংশোধন=সম্+শোধন। গঙ্গা=গম্+গা। পর্যন্ত=পরি+অন্ত। পদার্পণ—পদ+অর্পণ। নিশ্চয়=নিঃ+চয়।

সমাস॥ তীরভূমি—যা তীর, তাই ভূমি—কর্মধা। পূর্বজন্মের—পূর্ব যে জন্ম—কর্মধা, তার। পেয়ারাবনের—পেয়ারা পূর্ণ বন—মধ্যপ-কর্মধা, তার। সোনালি-পাড়-দেওয়া—সোনালি এমন পাড়—কর্মধা, তা দেওয়া হয়েছে যাতে—উপপদতৎ। জোয়ার-ভাঁটার—জোয়ার ও ভাঁটা—দ্বন্দ্ব, তার। আসা-যাওয়া—আসা ও যাওয়া—দ্বন্দ্ব। গতিভঙ্গি—গতির ভঙ্গি—ষষ্ঠীতৎ। শ্রেণীবদ্ধ—শ্রেণী দ্বারা বদ্ধ—তৃতীয়াতৎ। বনান্ধকারের=বনের অন্ধকার—ষষ্ঠীতৎ, তার। বিদার্ণবক্ষ—বিদীর্ণ বক্ষ যার—বহুব্রী। সূর্যাস্তকালের—সূর্যের অস্ত; তার কাল—ষষ্ঠীতৎ, তার। স্বর্ণশোণিত-প্লাবন—স্বর্ণ-রূপ শোণিত—রূপক-কর্মধা, তার প্লাবন—ষষ্ঠীতৎ। সশব্দ—শব্দের সহিত বর্তমান—ষষ্ঠীতৎ। দিগন্ত—দিকের অন্ত—ষষ্ঠীতৎ। তটরেখা—তটের রেখা—ষষ্ঠীতৎ। ডাল-পালাগুলার—ডাল ও পালা—দ্বন্দ্ব; তার গুলা—ষষ্ঠীতৎ, তার। কড়ি-বরগা-দেয়ালের—কড়ি, বরগা ও দেয়াল—দ্বন্দ্ব, তার। জন্মলাভ—জন্মকে লাভ—দ্বিতীয়াতৎ। এখো-গুড়—এখো যে গুড়—কর্মধা। স্বর্গলোক—স্বর্গ যে লোক—কর্মধা। রসবোধের—রসের বোধ—ষষ্ঠীতৎ, তার। ঘাট-বাঁধানো—ঘাট বাঁধানো যাতে—বহুব্রী। পুকুর-ঘাটের——পুকুরের ঘাট—ষষ্ঠীতৎ, তার। ঘোমটা-পরা—ঘোমটা পরেছে যে—উপপদতৎ। ছায়া-করা—ছায়া করে যে—উপপদতৎ। মনোহর—মন হরণ করে যে—উপপদতৎ। গঙ্গাতীরের—গঙ্গার তীর—ষষ্ঠীতৎ, তার। লতাপাতা-আঁকা—লতা ও পাতা—দ্বন্দ্ব; তা আঁকা যাতে—বহুব্রী। মধ্যাহ্নের—অহনের মধ্য—ষষ্ঠীতৎ, তার। মৃদুগুঞ্জনে—মৃদু যে গুঞ্জন—কর্মধা, তাতে। যক্ষপুরীর—যক্ষের পুরী—ষষ্ঠীতৎ, তার। চণ্ডীমণ্ডপ—মণ্ড পান করা হয় যেখানে—উপপদতৎ; চণ্ডীর নিমিত্ত মণ্ডপ—চতুর্থীতৎ। রাস্তাঘাট,

খেলাধুলা,হাটমাঠ—দ্বন্দ্ব সমাস। জীবনযাত্রার—জীবনের যাত্রা—ষষ্ঠীতৎ, তার। স্বাধীনতা—স্ব-র অধীনতা—ষষ্ঠীতৎ। অগোচরে—নয় গোচর—নঞ্‌তৎ, তাতে। ঘনবনের—ঘন যে বন—কর্মধা, তার। শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া—শেওড়া-নির্মিত বেড়া—তৃতীয়াতৎ, তা·দেওয়া হয়েছে যাতে—উপপদতৎ। পানাপুকুরের—পানাপূর্ণ পুকুর—মধ্যপ-কর্মধা, তার। পোশাক-পরিচ্ছদের—পোশাক ও পরিচ্ছদ—দ্বন্দ্ব, তার। পাল-তোলা—পাল তুলেছে যা—উপপদতৎ। পদার্পণ—পদের অর্পণ—ষষ্ঠীতৎ। নব-বিস্ময়ের—নব যে বিস্ময়—কর্মধা, তার। জোড়াসাঁকোর—জোড়া সাঁকো যেখানে—বহুব্রী, তার। হাঁ-করা—হাঁ করেছে যা—উপপদতৎ; মুখবিবরের—মুখের বিবর—ষষ্ঠীতৎ, তার। গ্রাসপিণ্ডের—গ্রাসের নিমিত্ত পিণ্ড—চতুর্থীতৎ, তার।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ যাত্রা—যা+ত্র [ভাববা]+আ। পরিবার—পরি-বৃ+ঘঞ্‌ [করণবা]। আশ্রয়—আ-শ্রি+ঘঞ্‌ [ভাববা]। গঙ্গা—গম্‌+গ [কর্তৃবা]+আ। পরিচয়—পরি-চি+ঘঞ্‌ [ভাববা]। অন্তরাল—অন্তর-লা+ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। প্রভাত—প্র-ভা+ক্ত [কর্তৃবা]। সোনালি—সোনা+লি। নূতন—নূ [<নব]+তন। আগ্রহ—আ-গ্রহ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। নৌকো—নৌ+ক+আ। গতি—গম্‌+ক্তি [ভাববা]। ভঙ্গি—ভন্‌জ্‌+ই [ভাববা]। বদ্ধ—বন্ধ্‌+ক্ত [কর্মবা]। বিদীর্ণ—বি-দৄ+ক্ত [কর্মবা]। শোণিত—শোণ+ইতচ। প্লাবন—প্লু+ণিচ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। বৃষ্টি—বৃষ্‌+ক্তি। বিদায়—বি-দা+ঘঞ্‌ [ভাববা]। গ্রহণ—গ্রহ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। জগৎ—গম্‌+ক্বিপ্‌। পৃথিবী—পৃথু+ঈ। অভ্যাস—অভি-আস্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। তুচ্ছতা—তুচ্ছ+তা। আবরণ—আ-বৃ+অনট্‌। এখো—আখ+ও। নিশ্চয়—নিঃ-চি+ঘঞ্‌ [ভাববা]। স্বর্গ—সু-ঋজ্‌+ঘঞ্‌ [কর্মবা]। ইন্দ্র—ইন্দ্‌+র [কর্তৃবা]। অমৃত—নঞ্‌-মৃ+ক্ত [কর্তৃবা]। স্বাদ—স্বদ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। পার্থক্য—পৃথক্‌+ষ্ণ্য। সংকুচিত—সম্‌-কুচ্‌+ক্ত [কর্তৃবা]। সৌন্দর্য—সুন্দর+ষ্ণ্য। মনোহর—মনঃ-হৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উদার—উৎ-আ-ঋ+ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। নিভৃত—নি-ভৃ+ক্ত। অবকাশ—অব-কাশ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। ব্যক্ত—বি-অন্‌জ্‌+ক্ত [কর্তৃবা]। কল্পনা—কৢপ্‌+অনট্‌+আ। ঔৎসুক্য—উৎসুক+ষ্ণ্য। মণ্ডপ—মণ্ড-পা+ক। নিষেধ—নি-সিধ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। স্বাধীনতা—স্বাধীন+তা। অভিভাবক—অভি-ভূ+অক। কৌতূহল—কুতূহল+ষ্ণ। আনন্দ—আ-নন্দ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। দাঁতন—দাঁত+অন। অগ্রবর্তী—অগ্র-বৃৎ+ঈ। ভর্ৎসনা—ভর্ৎস্‌+অনট্‌+আ। আচ্ছাদন—আ-ছদ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। অপরাধ—অপ-রাধ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। পরিচ্ছদ—পরি-ছদ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। উপসর্গ—উপ-সৃজ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। ত্রুটি—ত্রুট্‌+ই [কর্মবা]। সংশোধন—সম্‌-শুধ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। ভবিষ্যৎ—ভূ+স্যতৃ। উপায়—উপ-ই+ঘঞ্‌ [ভাববা]। বন্ধন—বন্ধ্‌+অনট্‌ [ভাববা]। সওয়ারি—সওয়ার+ই। পুষ্পিত—পুষ্প+ইতচ্‌। স্নান—স্না+অনট্‌ [ভাববা]। বিস্ময়—বি-স্মি+ঘঞ্‌ [ভাববা]। প্রাত্যহিক—প্রত্যহ+ষ্ণিক। প্রবেশ—প্র-বিশ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি॥ তাড়নায়—নিমিত্তে 'য়' বিভক্তি। পরিচয়ে—করণে 'এ' বিভক্তি। জোয়ার-ভাঁটার—কর্তৃ-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। ধারায়—করণে 'য়' বিভক্তি। জলে—করণে 'এ' বিভক্তি। লুচি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। মৃদুগুঞ্জনে—করণে 'এ' বিভক্তি। দুইজনে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। আবেগ—কর্মে শূন্য বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন॥ যাত্রা [বি]—যাত্রী, যাত্রিক [বিণ]। তাড়না [বি]—তাড়িত [বিণ]। পরিবার [বি]—পারিবারিক [বিণ]। আশ্রয় [বি]—আশ্রিত [বিণ]। পরিচয় [বি]—পরিচিত [বিণ]। দিন [বি]—দৈনিক [বিণ]। প্রত্যহ [বি]—প্রাত্যহিক [বিণ]। নূতন [বিণ]—নূতনত্ব [বি]। অপূর্ব [বিণ]—অপূর্বতা [বি]। মুখ [বি]—মুখর, মৌখিক [বিণ]। গঙ্গা [বি]—গাঙ্গেয় [বিণ]। অপসারণ [বি]—অপসারিত [বিণ]। স্বর্ণ [বি]—স্বর্ণিল [বিণ]। প্লাবন [বি]—প্লাবিত [বিণ]। মেঘ [বি]—মেঘলা [বিণ]। গ্রহণ [বি]—গৃহীত [বিণ]। পৃথিবী [বি]—পার্থিব [বিণ]। অভ্যাস [বি]—অভ্যস্ত [বিণ]। আবরণ [বি]—আবৃত [বিণ]। নিশ্চয় [বি]—নিশ্চিত [বিণ]। স্বাদ [বি]—স্বাদু [বিণ]। ঘন [বিণ]—ঘনত্ব [বি]। রচনা [বি]—রচিত [বিণ]। সংকুচিত [বিণ]—সংকোচ [বি]। উদার [বিণ]—ঔদার্য [বি]। মধ্যাহ্ন [বি]—মধ্যাহ্নিক [বিণ]। গভীর [বিণ]—গভীরতা [বি]। কল্পনা [বি]—কাল্পনিক [বিণ]। ঔৎসুক্য [বি]—উৎসুক [বিণ]। নিষেধ [বি]—নিষিদ্ধ [বিণ]। স্বাধীনতা [বি]—স্বাধীন [বিণ]। অভিভাবক [বিণ]—অভিভাবকত্ব [বি]। গ্রাম [বি]—গ্রামীণ, গ্রাম্য [বিণ]। ভর্ৎসনা [বি]—ভর্ৎসিত [বিণ]। ভদ্র [বিণ]—ভদ্রতা [বি]। আচ্ছাদন [বি]—আচ্ছাদিত [বিণ]। অপরাধ [বি]—অপরাধী [বিণ]। পরিচ্ছদ [বি]—পরিচ্ছন্ন [বিণ]। উপসর্গ [বি]—উপসৃষ্ট [বিণ]। হতাশ [বিণ]—হতাশা [বি] সংশোধন [বি]—সংশোধিত [বিণ]। হরণ [বি]—হৃত [বিণ]। ভূগোল [বি]—ভৌগোলিক [বিণ]। পরিচিত [বিণ]—পরিচয় [বি]। পদার্পণ [বি]—পদার্পিত [বিণ]। বিস্ময় [বি]—বিস্মিত [বিণ]। আনন্দ [বি]—আনন্দিত [বিণ]। প্রাত্যহিক [বিণ]—প্রাত্যহিকতা [বি]। প্রবেশ [বি]—প্রবিষ্ট [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ॥ বাহির—ভিতর। বৃহৎ—ক্ষুদ্র। পূর্বজন্ম—পরজন্ম। সামনে—পিছনে। দিন—রাত। প্রভাত—সন্ধ্যা। নূতন—পুরাতন। জোয়ার—ভাঁটা। আসা—যাওয়া। পূর্ব—পশ্চিম। সূর্যাস্ত—সূর্যোদয়। সশব্দ—নিঃশব্দ। জন্ম—মৃত্যু। সংকুচিত—বিস্তৃত। পশ্চাৎ—সম্মুখ। স্বাধীনতা—পরাধীনতা। অগ্রবর্তী—পশ্চাদ্বর্তী। বন্ধন—মুক্তি। প্রবেশ—প্রস্থান।

লিঙ্গান্তর॥ চাকর—ঝি। নদী—নদ। বউ—বর। অভিভাবক—অভিভাবিকা।

বাচ্যান্তর॥ ১. তার পরে সেই বাগানের পুষ্পিত…পদার্পণ করি নাই। [কর্তৃবাচ্য]>তার পরে [আমার কর্তৃক] সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের

ঘাটে আর একদিনের জন্যও পদার্পিত হয় নাই। [কর্মবাচ্য] ২. আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল [কর্তৃবাচ্য]>আমার দিনগুলি নর্মাল স্কুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মতো প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। [কর্মবাচ্য]

বাক্যান্তর ॥ সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। [যৌগিক বাক্য]>সেই পিছনে আমার বাধা রহিলেও গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। [সরল বাক্য] >যদিও সেই পিছনে আমার বাধা রহিল, তবু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। [মিশ্র বা জটিল বাক্য]।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **মৃদুগুঞ্জনে**—সকলের মৃদুগুঞ্জনে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠলো। **উপসর্গ**—রোগের চিকিৎসা না করে রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করে কি লাভ? **প্রাত্যহিক**—প্রাত্যহিক অভ্যেসমতো সেদিন বিকেলে আমরা গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ।'—বাক্যটির শুদ্ধতা বিচার কর।

সমাপিকা ক্রিয়াযোগে বাক্যটির রূপ দাঁড়ায়: সেখানে আমাদের যাওয়া [ছিল] নিষেধ। কিন্তু তা অশুদ্ধ। বাক্যটির রূপ হওয়া উচিত: সেখানে আমাদের যাওয়া [ছিল] নিষিদ্ধ। কাজেই, 'নিষেধ'—এই বিশেষ্য পদের বিশেষণ রূপ 'নিষিদ্ধ' —শব্দটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

২. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: পূর্বজন্ম, তফাত, পশ্চাতে, সূর্যাস্ত, প্রবেশ, ভবিষ্যৎ বাহির, অমৃত।

পূর্বজন্ম—পরজন্ম, তফাত—মিল, পশ্চাতে—সম্মুখে, সূর্যাস্ত—সূর্যোদয়, প্রবেশ—প্রস্থান, ভবিষ্যৎ—অতীত, বাহির—ভিতর, অমৃত—গরল।

৩. স্নানের ঘাটে আর একদিনও পদার্পণ করি নাই।'—'স্নানের' পদটির 'এর' বিভক্তির পরিচয় দাও।

স্নানের ঘাট—স্নানের নিমিত্ত ঘাট। অর্থাৎ, নিমিত্ত সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি।

৪. 'প্রাত্যহিক' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে তার একটি সমার্থক শব্দ লিখ।

প্রাত্যহিক—প্রত্যহ+ষ্ণিক। প্রাত্যহিক—দৈনন্দিন [সমার্থক শব্দ]

৫. বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের কোন শ্রেণীর শব্দ লিখ: লেফাফা, খুশি, তফাত, বস্তি, আবরু, খাঁচা, সওয়ারি। লেফাফা—বিদেশী শব্দ [ফারসী]। খুশি—বিদেশী শব্দ [ফারসী]। তফাত—বিদেশী শব্দ [আরবী]। বস্তি—তদ্ভব শব্দ<বসতি [সংস্কৃত]। আবরু—বিদেশী শব্দ [ফারসী]। খাঁচা—দেশী শব্দ। সওয়ারি—বিদেশী শব্দ [ফারসী]।

☐ প্রার্থনা ☐

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ প্রার্থনা=প্র+অর্থনা। সমর্পিলু=সম্+অর্পিলুঁ। নিরাশা=নিঃ+আশা। চতুরানন=চতুর+আনন। সমাওত=সম্+আওত।

সমাস ॥ বারিবিন্দু—বারির বিন্দু—ষষ্ঠীতৎ। সুত-মিত-রমণী-সমাজে—সুত, মিত ও রমণী—দ্বন্দ্ব; তাদের সমাজ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। নিরাশা—নেই আশা—নঞ্‌তৎ। জগতারণ—জগৎকে তারণ করেন যিনি—উপপদতৎ। দীন-দয়াময়—দীনের প্রতি দয়াময়—দ্বিতীয়াতৎ। রসরঙ্গে—রসের রঙ্গ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। চতুরানন—চতুর আনন যার—বহুব্রী। সমানা—মানের সহিত বর্তমান—বহুব্রী [আ]। বিদ্যাপতি—বিদ্যার পতি [শ্রেষ্ঠ]—ষষ্ঠীতৎ। শমন-ভয়—শমন থেকে ভয়—পঞ্চমীতৎ। আদি-অনাদিক—নাই আদি যার—নঞ্‌-বহুব্রী; আদি ও অনাদি—দ্বন্দ্ব, তার [ক]। ভব-তরণ-ভার—ভবের তরণ—ষষ্ঠীতৎ; তার ভার—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ প্রার্থনা—প্র-অর্থ+অনট্ [ভাববা]+আ। তাতল—তাত [<তপ্ত]+ল। সৈকত—সিকতা+ষ্ণ। সুত—সু+ক্ত [কর্মবা]। রমণী—রম্+অনট্ [ভাববা]+ঈ [স্ত্রী]। সমাজ—সম্-অজ্+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। মাধব—মধু+ষ্ণ। পরিণাম—পরি-নম্+ঘঞ্ [ভাববা]। জগতারণ—জগ [<জগৎ] তৃ+ণিচ্+অনট্ [কর্তৃবা]। দীন—দী+ক্ত [কর্তৃবা]। দয়াময়—দয়া+ময়ট্। জরা—জৄ+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। নিধুবন—নি-ধুবন। অবসানা—অব-সো+অনট্ [ভাববা]+আ। সাগর—সগর+ষ্ণ। লহরী—ল-হৃ+ঈ [কর্তৃবা]। শমন—শম্+ণিচ্+অনট্ [কর্তৃবা]। ভয়—ভী+অল্ [ভাববা]। গতি—গম্+ক্তি [ভাববা]। ভব—ভূ+ঘঞ্।

কারক ও বিভক্তি ॥ তোহে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। তোহে [জনমি]—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। তুয়া—'বিনু' শব্দযোগে করণকারকে 'য়া' বিভক্তি। অনাদিক—সম্বন্ধে 'ক' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ রমণী [বি]—রমণীয় [বিণ]। সমাজ [বি]—সামাজিক [বিণ]। মন [বি]—মানসিক [বিণ]। কাজ [বি]—কেজো [বিণ]। পরিণাম [বি]—পরিণত [বিণ]। নিরাশা [বি]—নিরাশ [বিণ]। দীন [বিণ]—দৈন্য [বি]। বিশোয়াসা [বি]—বিশোয়াসী [বিণ]। শিশু [বিণ]—শৈশব [বি]। রস [বি]—রসিক [বিণ]। আদি [বি]—আদিম [বিণ]। অবসান [বি]—অবসিত [বিণ]। সাগর [বি]—সাগরিক [বিণ]। ভয় [বি]—ভীত [বিণ]। গতি [বি]—গত [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ তাতল—শীতল। মিত্র—শত্রু। রমণী—পুরুষ। নিরাশা—আশা। দয়াময়—নির্দয়। জনম—মরণ। আদি—অন্ত।

লিঙ্গান্তর ॥ সুত—সুতা। মিত—মিতা। রমণী—পুরুষ। দীন—দীনা। দয়াময়—দয়াময়ী। চতুরানন—চতুরাননা।

আধুনিক বাংলা গদ্যরূপ ॥ তাতল—তপ্ত। সুত—পুত্র। মিত—মিত্র। তোহে—তোমাকে। বিসরি—বিস্মৃত হয়ে। তাহে—তাকে সমর্পিলুঁ—সমর্পণ করলাম। অব—এখন। মঝু—আমি। হাম—আমার। তুহুঁ—তুই [তুমি]। অতয়ে—অতএব। তোহারি—তোমারই। বিশোয়াসা—বিশ্বাস। জনম—জন্ম। হাম—আমি। নিঁদে—নিদ্রায়। গোঙায়লু—কাটালাম। গেলা—গেল। মাতলুঁ—মত্ত হলাম। তোহে—তোকে। ভজব—ভজনা করবো। মরি—মরে। যাওত—যায়। ন—নেই। তুয়া—তোমার। অবসানা—অবসান। তোহে—তোমাতে। জনমি—জন্মে। পুন—পুনরায়। তোহে—তোমাতে। সমাওত—সমাগত। সমানা—সমান। ভনয়ে—ভনে [বলে]। তুয়া—তোমার। বিনু—বিনা। নাহি—নেই। আরা—আর। অনাদিক—অনাদির। কহায়সি—বলা হয়। তোহারা—তোমার।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'তাতল' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে একই প্রত্যয়যোগে ভিন্ন শব্দ গঠন কর।

তাতল—তাত [<তপ্ত]+ল। ভিন্ন শব্দ—শীত+ল=শীতল।

২. 'জগতারণ' শব্দটির শুদ্ধতা বিচার কর।

'জগতারণ' শব্দটি ব্যাকরণের দিক থেকে অশুদ্ধ। কারণ জগৎ+তারণ=জগত্তারণ। কাজেই, 'জগত্তারণ'ই হলো শুদ্ধরূপ।

□ সবুজের অভিযান □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ নবীন=নব+ঈন। দুরন্ত=দুঃ+অন্ত। জীবন্ত=জীব্+অন্ত। শয়ন=শে+অন। পাগলামি=পাগল+আমি।

সমাস ॥ অবুঝ—নয় বুঝ—নঞ্‌তৎ। আধমরাদের—আধ [ভাবে] মরা—দ্বিতীয়াতৎ; তাদের। দুরন্ত—দুঃ [দুঃসাধ্য] অন্ত যার—বহুব্রী। চক্ষু-কর্ণ—চক্ষু ও কর্ণ—দ্বন্দ্ব। চিত্রপটে—চিত্রের নিমিত্ত পট—চতুর্থীতৎ, তাতে। বন্ধ-করা—বন্ধ করা হয়েছে যা—উপপদতৎ, তা। জোয়ার-জলে—জোয়ারের জল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। অশান্ত—নয় শান্ত—নঞ্‌তৎ। শিকল-দেবীর—শিকল-রূপা দেবী—রূপক-কর্মধা, তার। পূজাবেদী—পূজার নিমিত্ত বেদী—চতুর্থীতৎ। চিরকাল—চির ব্যাপ্ত করে কাল—দ্বিতীয়াতৎ। বিজয়-কেতন—বিজয়-সূচক কেতন—মধ্যপ-কর্মধা। অট্টহাস্যে—অট্ট যে হাস্য—কর্মধা, তাতে। ভোলানাথের—ভোলার নাথ যিনি—বহুব্রী, তাঁর। ঝোলাঝুলি—ঝোলা ও ঝুলি—দ্বন্দ্ব। বাঁধা-পথের—বাঁধা যে পথ—কর্মধা, তার। অবাধ-পানে—নেই বাধা যাতে—নঞ্‌-বহুব্রী; তার পানে—ষষ্ঠীতৎ। অজানাদের—নয় জানা—নঞ্‌তৎ, তাদের। পুঁথি-পোড়োর—পুঁথি পড়ে যে—উপপদতৎ, তার। বিধিবিধান

—বিধি ও বিধান—দ্বন্দ্ব। চিরযুবা—চির ব্যাপ্তি করে যুবা—দ্বিতীয়াতৎ। চিরজীবী চির ব্যাপ্ত করে জীবী—দ্বিতীয়াতৎ। অফুরান—নয় ফুরান—নঞ্‌তৎ। আকুল-করা—আকুল করে যা—উপপদতৎ। বকুল-মাল্যগাছা—বকুলের মাল্য—ষষ্ঠীতৎ; তার গাছা—ষষ্ঠীতৎ। অমর—নয় মর—নঞ্‌তৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ অভিযান—অভি-যা+অনট্ [ভাববা]। নবীন—নব+ঈন। রক্ত—রন্‌জ্‌+ক্ত [কর্মবা]। মাতাল—মাত [<মত্ত]+আল। পরম—পর+ম। জীবন্ত—জীব্‌+অন্ত। চরণ—চর্‌+অনট্ [করণবা]। আসন—আস্‌+অনট্ [অধিকরণবা]। বিষম—বি-সম্‌+ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। সংঘাত—সম্‌-হন্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। শয়ন—শী+অনট্ [অধিকরণবা]। সুযোগ—সু-যুজ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। প্রচণ্ড—প্র-চণ্ড্‌+ঘঞ্‌ [কর্তৃবা]। পাগলামি—পাগল+আমি। মাতন—মাত্‌ [<মত্ত]+অনট্ [ভাববা]। বিজয়—বি-জি+ঘঞ্‌ [ভাববা]। অট্টহাস্য—অট্ট-হস্‌+ণ্যৎ। আকাশ—আ-কাশ্‌+ঘঞ্‌ [অধিকরণবা]। প্রমত্ত—প্র-মদ্‌+ক্ত। [কর্তৃবা]। বিবাগী—বি-বাগ [দিক]+ইন্‌। দেশ—দিশ্‌+অল্‌ [অধিকরণবা]। আপদ—আ-পদ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। আঘাত—আ-হন্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। পোড়ো<পড়ুয়া—পড়্‌+উয়া। বিধি—বি-ধা+ই। বিধান—বি-ধা+অনট্। প্রমুক্ত—প্র-মুচ্‌+ক্ত [কর্মবা]। চিরজীবী—চির-জীব্‌+ইন্‌। জীর্ণ—জৄ+ক্ত [কর্মবা]। জরা—জৄ+ঘঞ্‌ [ভাববা]+আ। ধরা—ধৃ+ঘঞ্‌+আ। আকুল্‌—আ-কুল+ঘঞ্‌ [ভাববা]। অমর—নঞ্‌-মৃ+ঘঞ্‌ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি॥ আধমরাদের—কর্মে বহুবচনে 'দের' বিভক্তি। তোরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। আজকে—অধিকরণে 'কে' বিভক্তি। পুচ্ছটি—কর্মে শূন্যবিভক্তি। হাওয়ায়—করণে 'য়' বিভক্তি। সংঘাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। অট্টহাস্যে—করণে 'এ' বিভক্তি। নেশায়—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন॥ অভিযান [বি]—অভিযাত্রী [বিণ]। নবীন [বিণ]—নবীনতা [বি]। মদ [বি]—মত্ত [বিণ]। মাতাল [বিণ]—মাতলামি [বি]। তর্ক [বি]—তার্কিক [বিণ]। দুরন্ত [বিণ]—দুরন্তপনা [বি]। মূঢ় [বিণ]—মূঢ়তা [বি]। প্রবীণ [বিণ]—প্রবীণতা [বি]। পাকা [বিণ]—পাকামি [বি]। বান [বি]—বেনো [বিণ]। প্রবল [বিণ]—প্রবলতা [বি]। অচল [বিণ]—অচলতা [বি]। উচ্চ [বিণ]—উচ্চতা [বি]। অশান্ত [বিণ]—অশান্তি [বি]। বিষম [বি]—বৈষম্য [বিণ]। সংঘাত [বি]—সংহত [বিণ]। শয়ন [বি]—শয়ান, শায়িত [বিণ]। প্রচণ্ড [বিণ]—প্রচণ্ডতা [বি]। চিরকাল [বি]—চিরকালীন [বিণ]। পাগলামি [বি]—পাগল [বিণ]। মাতন [বি]—মত্ত, মাতাল [বিণ]। প্রমত্ত [বিণ]—প্রমাদ [বি]। আপদ [বি]—আপন্ন [বিণ]। আঘাত [বি]—আহত [বিণ]। প্রমুক্ত [বিণ]—প্রমুক্তি [বি]। যুবা [বিণ]—যৌবন [বি]। জীর্ণ [বিণ]—জীর্ণতা [বি]। নেশা [বি]—নেশাখোর [বিণ]। অমর [বিণ]—অমরতা, অমরত্ব [বি]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ নবীন—প্রবীণ। আলো—অন্ধকার। উচ্চ—নিম্ন, নীচ। দুরন্ত—শান্ত। মৃদু—দ্রুত। কাঁচা—পাকা। বাহির—ভিতর। জোয়ার—ভাঁটা। অচল—সচল। অশান্ত—শান্ত। বিষম—সম। মিথ্যা—সত্য। চিরকাল—ক্ষণকাল। বিজয়—পরাজয়। অট্টহাস্য—মৃদুহাস্য। অজানা—জানা। চিরজীবী—ক্ষণজীবী। অমর—মর।

লিঙ্গান্তর ॥ নবীন—নবীনা। প্রবীণ—প্রবীণা। দেবী—দেব। বিবাগী—বিবাগিনী।

গদ্যরূপ ॥ বাহিরপানে—বাহিরের দিকে। হেথায়—এখানে।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: নবীন, কাঁচা, আলো, অচল, অশান্ত, মিথ্যা।

বিপরীতার্থক শব্দ: নবীন—প্রবীণ, কাঁচা—পাকা, আলো—অন্ধকার, অচল—সচল, অশান্ত—শান্ত, মিথ্যা—সত্য।

২. বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন্ শ্রেণীর শব্দ লিখ: সবুজ, সাঁচা, শিকল, বিবাগী, অফুরান, দেদার।

সবুজ—বিদেশী শব্দ [ফরাসী]। সাঁচা—বিদেশী শব্দ [হিন্দী]। শিকল—তদ্ভব শব্দ<শৃঙ্খল [সংস্কৃত]। বিবাগী—দেশী শব্দ। অফুরান—দেশী শব্দ। দেদার—বিদেশী শব্দ [ফারসী]।

৩. 'তাই জেনে ভাই বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।'

—'পরাণ' ও 'পোড়ো' শব্দ দুটিতে ধ্বনি-পরিবর্তনের কোন্ নিয়ম প্রযুক্ত হয়েছে? পরাণ<প্রাণ=প্‌+র্‌+আ+ণ্‌+অ। কিন্তু পরাণ=প্‌+অ+র্‌+আ+ণ্‌+অ। কাজেই, 'অ'—এই স্বরধ্বনির সাহায্যে 'প্র'—এই সংযুক্ত বর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়েছে। এখানে **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ** প্রযুক্ত হয়েছে। 'পোড়ো'<পড়ুয়া=প্‌+অ+ড়্‌+উ+য়্‌+আ। কাজেই, উয়া>ও হয়েছে। এটি অভিশ্রুতির দৃষ্টান্ত।

□ যক্ষের নিবেদন □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ বৃষ্টি=বষ্‌+তি। সানুদেশ=স+অনুদেশ। চরাচর=চর+অচর। ভারাতুর=ভার+আতুর। নীলাঞ্জন=নীল+অঞ্জন। বিচ্ছেদ=বি+ছেদ। নিষ্ঠুর=নিঃ+ঠুর। যক্ষেশ=যক্ষ+ঈশ। দুর্ভর=দুঃ+ভর। দুস্তর=দুঃ+তর। সংবাদ=সম্‌+বাদ। নির্মল=নিঃ+মল। নিরাপদ=নিঃ+আপদ। সুদুর্গম=সুদুঃ+গম। নির্ঝর=নিঃ+ঝর। মনোহর—মনঃ+হর।

সমাস ॥ নভতল—নভের তল—ষষ্ঠীতৎ। মন্দ্র-মন্থর—মন্থর মন্দ্র যার—বহুব্রী। গোপনলোক—গোপন যে লোক—কর্মধা। সানুদেশ—দেশের পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব;

অস্থদেশের সহিত বর্তমান—বহুব্রী। যক্ষ-কান্তার—যক্ষের কান্তা—ষষ্ঠীতৎ, তার। চরাচর—নয় চর—নঞ্‌তৎ; চর ও অচর—দ্বন্দ্ব। বেদনাভারাতুর—বেদনার ভার—ষষ্ঠীতৎ; তার দ্বারা আতুর—তৃতীয়াতৎ। নীলাঞ্জন—নীল যে অঞ্জন—কর্মধা। যক্ষেশ—যক্ষের ঈশ—ষষ্ঠীতৎ। কৃপালেশ—কৃপার লেশ—ষষ্ঠীতৎ। বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের—বিচ্ছেদ-রূপ গ্রীষ্ম—রূপক-কর্মধা; তার। দূর-সুদুর্গম—দুঃসাধ্য গমন যেখানে—বহুব্রী; সু দুর্গম—কর্মধা; দূর ও সুদুর্গম—দ্বন্দ্ব। মনোহর—মন হরণ করে যে—উপপদতৎ। খঞ্জন-নয়না—খঞ্জনের নয়নের মতো নয়ন যার—উপমাত্মক বহুব্রী। বর্ষামঙ্গল—বর্ষার মঙ্গল—ষষ্ঠীতৎ। বলাকা-কলরব—বলাকার কলরব—ষষ্ঠীতৎ। বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ—বিদ্যুৎ-রূপ বিচ্ছেদ—রূপক-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ নিবেদন—নি-বিদ্+অনট্ [ভাববা]। বিহ্বল—বি-হ্বল্+ঘঞ্ [ভাববা]। উদয়—উৎ-ই+ঘঞ্ [ভাববা]। সন্ধ্যা—সম্+ধৈ+ঘঞ [ভাববা]+আ। তন্দ্রা—তন্দ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। মন্দ্র—মন্দ্+র [করণবা]। মন্থর—মন্থ্+অর। বচন—বচ্+অনট্ [ভাববা]। সূর্য—সৃ+ণ্যৎ [কর্মবা]। রক্তিম রক্ত+ইমন্। নয়ন—নী+অনট্ [করণবা]। বৃষ্টি—বৃষ্+ক্তি [ভাববা]। হর্ষ হৃষ্+ঘঞ্ [ভাববা]। নিবাস—নি-বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। গোপন—গুপ্+অনট্ [ভাববা]। হৃষ্ট—হৃষ্+ক্ত [কর্তৃবা]। গ্রীষ্ম—গ্রস্+ম [কর্তৃবা]। স্নিগ্ধ—স্নিহ্+ক্ত [কর্তৃবা]। গম্ভীর—গম্+ঈর। অবসান—অব-সো+অনট্ [ভাববা]। শৈল—শিলা+ষ্ণ। মূর্ছা—মূর্ছ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। আকুল—আ-কুল্+ঘঞ্ [ভাববা]। শ্বাস—শ্বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। বেদনা—বিদ্+অনট্ [ভাববা]+আ। আতুর—আ-তুর্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। মৌন—মুনি+ষ্ণ [ভাববা]। উৎসব—উৎ-সূ+ঘঞ্ [ভাববা]। ভুবন—ভূ+অনট্ [কর্তৃবা]। বিচ্ছেদ—বি-ছিদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। ইন্দ্র—ইন্দ্+র [কর্তৃবা]। দক্ষিণ—দক্ষ্+ইন। পূজ্য—পূজ্+ণ্যৎ। বন্ধু—বন্ধ্+উ [কর্তৃবা]। দৈব—দেব+ষ্ণ। নিষ্ঠুর—নি-স্থা+উর [কর্তৃবা]। আজ্ঞা—আ-জ্ঞা+ক+আ। লজ্ঘন—লজ্ঘ্+অনট্ [ভাববা]। শান্তি—শাম্+ক্তি [ভাববা]। অপরাধ—অপ-রাধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। মিথ্যা—মিথ্+যৎ [কর্মবা]+আ। ক্লেশ—ক্লিশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। দুর্ভর—দুঃ-ভৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। মলিন—মল্+ইন। দুস্তর—দুঃ-তৄ+ঘঞ্ [ভাববা]। সংবাদ—সম্-বদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিলম্ব—বি-লম্ব্+ঘঞ্ [ভাববা]। বন্ধন—বন্ধ্+অনট্। নিরাপদ—নিঃ-আ-পদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সুদুর্গম—সু-দুঃ-গম্+খল্। নির্ঝর—নিঃ-ঝৄ+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। নগরী—নগ+র+ঈ। মনোহর—মনঃ-হৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। সৌধ—সুধা+ষ্ণ। বর্ষা—বৃষ্+ঘঞ্+আ। সৌরভ—সুরভি+ষ্ণ। তৃষ্ণা—তৃষ্+ক্বিপ্ [ভাববা]+আ। অবসান—অব-সো+অনট্ [ভাববা]। বিনিঃশেষ—বি-নিঃ-শিষ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রবাস—প্র-বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিদ্যুৎ—বি-দ্যুৎ+ক্বিপ্ [কর্তৃবা]। জীবন—জীব্+অনট্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ গোপনলোক—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। চেষ্টায়—করণে

—'য়' বিভক্তি। সানুদেশ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। পাশ—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। নিখিল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। শ্বাস—করণে শূন্যবিভক্তি। দিনেরে—সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি। ফুল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। একে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। আশাতে—করণে 'তে' বিভক্তি। তাপেতে—করণে 'তে' বিভক্তি। তায়—কর্মে 'য়' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ নিবেদন [বি]—নিবেদিত [বিণ]। পিঙ্গল [বিণ]—পিঙ্গলতা [বি]। বিহ্বল [বিণ]—বিহ্বলতা [বি]। ব্যথিত [বিণ]—ব্যথা [বি]। মেঘ [বি]—মেঘলা [বিণ]। উদয় [বি]—উদিত [বিণ]। সন্ধ্যা [বি]—সান্ধ্য [বিণ]। তন্দ্রা [বি]—তন্দ্রালু [বিণ]। মন্ত্র [বি]—মন্ত্রিত [বিণ]। বচন [বি]—বাচনিক [বিণ]। সূর্য [বি]—সৌর [বিণ]। রক্তিম [বিণ]—রক্তিমা [বি]। ঘুম [বি]—ঘুমন্ত [বিণ]। চুম্বন [বি]—চুম্বিত [বিণ]। অঙ্গ [বি]—আঙ্গিক [বিণ]। হর্ষ [বি]—হৃষ্ট [বিণ]। নিবাস [বি]—নিবাসী [বিণ]। পল্লব [বি]—পল্লবিত [বিণ]। কুসুম [বি]—কুসুমিত [বিণ]। স্নিগ্ধ [বিণ]—স্নিগ্ধতা [বি]। গম্ভীর [বিণ]—গাম্ভীর্য [বি]। অবসান [বি]—অবসিত [বিণ]। মূর্ছা [বি]—মূর্ছিত [বিণ]। আকুল [বিণ]—আকুলতা [বি]। মৌন [বি]—মৌনী [বিণ]। মন [বি]—মানসিক [বিণ]। বিচ্ছেদ [বি]—বিচ্ছিন্ন [বিণ]। দক্ষিণ [বিণ]—দাক্ষিণ্য [বি]। ফুল [বি]—ফুলেল [বিণ]। নিষ্ঠুর [বিণ]—নিষ্ঠুরতা [বি]। লজ্জন [বি]—লজ্জিত [বিণ]। অপরাধ [বি]—অপরাধী [বিণ]। মিথ্যা [বি]—মিথ্যুক [বিণ]। ক্লেশ [বি]—ক্লিষ্ট [বিণ]। মলিন [বিণ]—মলিনতা, মালিন্য [বি]। মুখ [বি]—মুখর, মৌখিক [বিণ]। সখা [বিণ]—সখ্য [বি]। সংবাদ [বি]—সাংবাদিক [বিণ]। বিলম্ব [বি]—বিলম্বিত [বিণ]। সময় [বি]—সাময়িক [বিণ]। নির্মল [বিণ]—নির্মলতা [বি]। নিরাপদ [বিণ]—নিরাপত্তা [বিণ]। দূর [বিণ]—দূরত্ব [বি]। সুদুর্গম [বিণ]—সুদুর্গমতা [বি]। নিকট [বিণ]—নৈকট্য [বি]। সুন্দর [বিণ]—সৌন্দর্য [বি]। চঞ্চল [বি]—চঞ্চলতা [বি]। মঙ্গল [বি]—মাঙ্গলিক [বিণ]। পুষ্প [বি]—পুষ্পিত [বিণ]। তৃষ্ণা [বি]—তৃষ্ণার্ত [বিণ]। প্রবাস [বি]—প্রবাসী [বিণ]। বিদ্যুৎ [বি]—বৈদ্যুত [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ উদয়—অস্ত। আজ—কাল। মন্থর—দ্রুত। হর্ষ—ক্রন্দন। গোপন—প্রকাশ্য। স্নিগ্ধ—রুক্ষ। অবসান—সূচনা। শ্বাস—নিশ্বাস। মৌন—মুখরতা। রাত্রি—দিন। গুণ—দোষ। দান—গ্রহণ। বিচ্ছেদ—মিলন। দক্ষিণ—বাম। দেব—দানব। বন্ধু—শত্রু। নিষ্ঠুর—দয়ালু। বিচার—অবিচার। মিথ্যা—সত্য। অবলা—সবলা। মলিন—নির্মল। দুঃখ—সুখ। কল্যাণ—অকল্যাণ। বন্ধন—মুক্তি। শুভ—অশুভ। নিকট—দূর। চঞ্চল—শান্ত। সদয়—নির্দয়।

লিঙ্গান্তর ॥ যক্ষ—যক্ষী। কান্তা—কান্ত। প্রিয়া—প্রিয়। নগরী—নগর।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ মুরতি—মূর্তি। ধরি—ধরে। কও—বলো। বিথারি'—

বিস্তৃত করে। দাঁড়ায়ে—দাঁড়িয়ে। মন্তর—মন্ত্র। ভরিছে—ভরছে বা পূর্ণ করছে। ছায়—ছেয়ে ফেলে। কাঁপিছে—কাঁপছে। দিনেরে—দিনকে। লও—নাও। মোর—আমরা। নাহিক—নেই। ভুঞ্জান—ভোগ করান বা ভোগান। না ছিল—ছিল না। সেথা—সেখানে। তরাও—পার করাও। কহিয়ো—বলো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :

'লও মোর পূজার ফুল।'—'পূজার'।

'আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে'। 'আজ্ঞার' এবং 'একে'।

পূজার—নিমিত্ত-সম্বন্ধে 'র' বিভক্তি।

আজ্ঞার—কর্মে 'র' বিভক্তি।

একে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি।

২. ধ্বনি-পরিবর্তনের কোন্ বিধি প্রযুক্ত হয়েছে লিখ : মুরতি, মন্তর।

মুরতি<মূর্তি

মূর্তি=ম্+উ+র্+ত্+ই

=ম্+উ+র্+অ+ত্+ই

=মুরতি।

কাজেই, এটি **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষের** দৃষ্টান্ত।

মন্তর<মন্ত্র

মন্ত্র=ম্+অ+ন্+ত্+র্+অ

=ম্+অ+ন্+ত্+অ+র্+অ

মন্তর।

এটিও **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষের** দৃষ্টান্ত।

৩. বিশেষ্য রূপ লিখ : বিহ্বল, রক্তিম, নিষ্ঠুর, মলিন, চঞ্চল।

বিহ্বল—বিহ্বলতা, রক্তিম—রক্তিমা, নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুরতা, মলিন—মলিনতা, চঞ্চল—চঞ্চলতা।

□ বৃন্দাবন অন্ধকার □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ মলয়ানিল=মলয়+অনিল। হতাশ=হত+আশ। প্রেমানন্দ—প্রেম+আনন্দ।

সমাস ॥ নন্দপুরচন্দ্র—নন্দের পুর—ষষ্ঠীতৎ; তার চন্দ্র—ষষ্ঠীতৎ। মলয়ানিল—মলয় যে অনিল—কর্মধা। ফুলগন্ধভার—ফুলের গন্ধ—ষষ্ঠীতৎ; তার ভার—ষষ্ঠীতৎ। সন্ধ্যাদীপ—সন্ধ্যাকালীন দীপ—মধ্যপ-কর্মধা। কুন্দনীপ—কুন্দ ও নীপ—দ্বন্দ্ব। কলকণ্ঠ-সুধা—কল যে কণ্ঠ—কর্মধা। তার সুধা—ষষ্ঠীতৎ। পাপিয়া-পিক-চন্দনার—পাপিয়া, পিক ও চন্দনা—দ্বন্দ্ব, তার। শ্যাম-রাধিকা—শ্যাম ও রাধিকা—দ্বন্দ্ব। শারিকাশুক—শারিকা ও শুক—দ্বন্দ্ব। আয়ত-তরলায়িত—আয়ত ও তরলায়িত—দ্বন্দ্ব। চরণসুধাস্যন্দ

সুধার স্পন্দ—ষষ্ঠীতৎ। চরণের সুধাস্পন্দ—ষষ্ঠীতৎ। তমালশাখা—তমালের শাখা—ষষ্ঠীতৎ। কমলকলি—কমলের কলি—ষষ্ঠীতৎ। নবনীসর—নবনী ও সর—দ্বন্দ্ব। দধিমন্থ—দধির মন্থ—ষষ্ঠীতৎ। চন্দ্রহার—চন্দ্রের মতো হার—উপমিত কর্মধা। যমুনাজলে—যমুনার জল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। শ্যামচন্দ্রমার—শ্যামরূপ চন্দ্রমা—রূপ-কর্মধা। বেতসীবন—বেতসীর বন—ষষ্ঠীতৎ। হতাশ—হত আশা যার—বহুব্রী। ঝুলনদোলে—ঝুলনের দোল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। মিলন-প্রেমানন্দ-হার—প্রেম ও আনন্দ। দ্বন্দ্ব। মিলনজনিত প্রেমানন্দ—মধ্যপ-কর্মধা; তার রূপ হার—রূপক-কর্মধা। শোকবিবশ—শোকের দ্বারা বিবশ—তৃতীয়াতৎ। দিবসশেষে—দিবসের শেষ—ষষ্ঠীতৎ তাতে। গোপললনা—গো-কে পালন করে যে—উপপদতৎ; গোপজাতীয়া ললনা—মধ্যপ-কর্মধা। নায়কহীনা—নায়কের দ্বারা হীনা—তৃতীয়াতৎ। শোক-শায়কে—শোকরূপ শায়ক—রূপক-কর্মধা, তাতে। নয়ননীরে—নয়নের নীর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। ব্যথাপাথার—ব্যথারূপ পাথার—রূপক-কর্মধা। ভানুনন্দনার—ভানুর নন্দনা—ষষ্ঠীতৎ, তার। চিৎকুমুদী—চিৎ-রূপ কুমুদী—রূপক-কর্মধা। মৃৎপিণ্ড—মৃৎ-এর [মৃত্তিকার] পিণ্ড—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ রাধিকা—রাধ্+ইক+আ। পরাগ—পরা-গম্+ঘঞ [কর্তৃবা]। হরিণী—হৃ+ইন [কর্তৃবা]+ঈ। লেহেন—লিহ্+অনট্। চরণ—চর্+অনট্ [করণবা]। স্পন্দ—স্পন্দ্+ঘঞ্ [ভাববা]। শিখী—শিখা+ইন্। ফেনিল—ফেণ+ইল। তটিনী—তট্+ইন্ [কর্তৃবা]+ঈ। পাটনী—পাটন+ঈ। তরণী—তৃ+অনট্+ঈ। ঝুলন—ঝুল্+অনট্ [ভাববা]। মিলন—মিল্+অনট [ভাববা]। আনন্দ—আ-নন্দ্+ঘঞ্ [ভাববা]। হার—হৃ+ঘঞ্। শোক—শুচ্-ঘঞ্ [ভাববা]। বন্দনা—বন্দ্+অনট্ [ভাববা]+আ। গোপ—গো+ক। ললনা—লল্+অনট্ [কর্তৃবা]+আ। নায়ক—নী+অক [কর্তৃবা]। হীনা—হা+ক্ত [কর্মধা]। শায়ক—শো+অক [কর্তৃবা]। শায়িতা—শী+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]+আ। দীনা—দী+ক্ত [কর্মবা]+আ। নয়ন—নী+অনট্ [করণবা]। নন্দনা—নন্দ্+অনট্ [ভাববা]+আ। হৃৎস্পন্দ—হৃৎ-স্পন্দ্+ঘঞ্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি॥ তৃণ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। চন্দ্রহার—কর্মে শূন্যবিভক্তি। আজিকে—অধিকরণে 'কে' বিভক্তি। ঝুলনদোলে—করণে 'এ' বিভক্তি। নয়ননীরে—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন॥ ফুল [বি]—ফুলেল [বিণ]। লেহন [বি]—লেহ্য, লেহনীয় [বিণ]। ফেণিল [বিণ]—ফেণিলতা [বি]। বন্ধ [বি]—বদ্ধ [বিণ]। মিলন [বি]—মিলিত [বিণ]। দীনা [বিণ]—দৈন্য [বি]। গীত [বিণ]—গীতি [বি]।

বিপরীতার্থক শব্দ॥ অন্ধকার—আলো। সুধা—গরল। দ্বন্দ্ব—মিলন। মিলন—বিরহ।

লিঙ্গান্তর॥ হরিণী—হরিণ। শিখী—শিখিনী। গোপ—গোপী, গোপিনী।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ লয়ে—নিয়ে। মাখি—মেখে। লুটে—লুটায়। নাহি—নেই। গাহি—গেয়ে। বাঁধি—বেঁধে। আজিকে—আজ। হেরি—দেখে। ঝলসি—ঝলসে। দহে—দগ্ধ হয়। মুরছি—মূর্ছিত হয়ে। মুদি—মুদিত হয়ে। রুধি—রোধ করে।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'হরিণী' ও 'শিখী'—শব্দ দুটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লিখ। শব্দ দুটির প্রচলিত অর্থ কি ?

হরিণী—হৃ-ধাতু+ইন+ঈ [স্ত্রী]।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—অপহরণকারিণী।

শিখী—শিখা+ইন্।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শিখা আছে যার।

প্রচলিত অর্থ—

হরিণী—মৃগী—প্রাণীবিশেষ। শিখী—ময়ূর।

২. 'মুরছি'—এই ক্রিয়াপদটির বিষয়ে ব্যাকরণগত টীকা লিখ।

'মুরছি' < 'মূর্ছি'

মূর্ছি—ম্+ঊ+র্+ছ্+ই

—ম্+উ+র্+অ+ছ্+ই—মুরছি।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

গদ্যরূপ ॥ মুরছি—মূর্ছিত হয়ে।

□ যদি ফিরে আসি □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ বৃষ্টি=বৃষ্+তি। ছন্দোময়ী=ছন্দঃ+ময়ী। নীলাকাশ=নীল+আকাশ। সম্ভাষিবে=সম্+ভাষিবে। হতাশা=হত+আশা। দুর্দিনে=দুঃ+দিনে।

সমাস ॥ অম্লান—নয় ম্লান—নঞ্তৎ। বৃষ্টি-ধরা—বৃষ্টি ধরে যখন—উপপদতৎ। ছিন্নমেঘ—ছিন্ন মেঘ যখন—বহুব্রী। উর্মি-ছন্দোময়ী—উর্মির দ্বারা ছন্দোময়ী—তৃতীয়াতৎ। ফেনশীর্ষ—শীর্ষে ফেন যার—বহুব্রী। নগণ্য—নয় গণ্য—নঞ্তৎ। নীলাকাশ—নীল যে আকাশ—কর্মধা। পদতলে—পদের তল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। খেয়াঘাটে—খেয়ার নিমিত্ত ঘাট—চতুর্থীতৎ, তাতে। অর্ধস্ফুট—অর্ধরূপে স্ফুট—দ্বিতীয়াতৎ। দীর্ঘশ্বাস—দীর্ঘ যে শ্বাস—কর্মধা। হতাশা—হত যে আশা—কর্মধা। সুধাসিক্ত—সুধার দ্বারা সিক্ত—তৃতীয়াতৎ। দুর্দিনে—দুঃ দিন—কর্মধা, তাতে। নির্ভয়—নেই ভয় যার—বহুব্রী। ক্লান্তিহীন—ক্লান্তির দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। অক্ষয়—নয় ক্ষয়—নঞ্তৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ শুভ্র—শুভ্‌+র [কর্তৃবা]। শরৎ—শৃ+অদ্‌। অম্লান—নঞ্‌-ম্লৈ+ক্ত [কর্তৃবা]। প্রভাত—প্র-ভা+ক্ত। নিদাঘ—নি-দহ্‌+ঘঞ্‌। শুষ্ক—শুষ্‌+ক্ত [কর্মবা]। শ্রাবণ—শ্রাবণী+ষ্ণ। ছিন্ন—ছিদ্‌+ক্ত [কর্মবা]। নূতন—নূ [<নব]+তন। জন্ম—জন্‌+মন্‌ [ভাববা]। ছন্দোময়ী—ছন্দঃ+ময়ট্‌+ঈ; সাগর—সগর+ষ্ণ। ডুবারী—ডুব্‌+আরী। নগণ্য—নঞ্‌-গণ্‌+ণ্যৎ। নিখিলময়—নিখিল+ময়ট্‌। বিদায়—বি-দা+ঘঞ্‌ [ভাববা]। বেদনা—বিদ্‌+অনট্‌ [ভাববা] +আ। পরিচয়—পরি-চি+অল্‌ [ভাববা]। ক্লান্তি—ক্লম্‌+ক্তি [ভাববা]। ভ্রান্তি—ভ্রম্‌+ক্তি [ভাববা]। স্খলন—স্খল্‌+অনট্‌। পতন—পত্‌+অনট্‌। পাথেয়—পথ+ঞেয়। আনন্দ—আ-নন্দ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। অক্ষয়—নঞ্‌-ক্ষি+ঘঞ্‌ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ কাহারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। যাদের—কর্মে বহুবচনে 'দের' বিভক্তি। কোথা—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। তাহাদের [সাথে]—কর্মপ্রবচনীয়-যোগে 'এর' বিভক্তি। আমারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। সর্বজনে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। সুখে-দুঃখে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। সকলেরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। দুইজনে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। ক্ষমায়—করণে 'য়' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ শুভ্র [বিণ]—শুভ্রতা [বি]। শরৎ [বি]—শারদ [বিণ]। শুষ্ক [বিণ]—শুষ্কতা [বি]। রুক্ষ [বিণ]—রুক্ষতা [বি]। জন্ম [বি]—জাত [বিণ]। ঊর্মি [বি]—ঊর্মিল [বিণ]। জীর্ণ [বিণ]—জীর্ণতা [বি]। বৃদ্ধ [বিণ]—বার্ধক্য [বি]। মন [বি]—মানসিক [বিণ]। মুকুল [বি]—মুকুলিত [বিণ]। সন্ধ্যা [বি]—সান্ধ্য [বিণ]। হতাশা [বি]—হতাশ [বিণ]। পরিচয় [বি]—পরিচিত [বিণ]। আনন্দ [বি]—আনন্দিত [বিণ]। চক্ষু [বি]—চাক্ষুষ [বিণ]। প্রেম [বি]—প্রেমিক [বিণ]। পৃথিবী [বি]—পার্থিব [বিণ]। ভ্রান্তি [বি]—ভ্রান্ত [বিণ]। স্খলন [বি]—স্খলিত [বিণ]। পতন [বি]—পতিত [বিণ]। ক্ষমা [বি]—ক্ষমাশীল, ক্ষমাময় [বিণ]। পথ [বি]—পথিক [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ প্রভাত—সন্ধ্যা। রাত—দিন। শুষ্ক—গরম। নূতন—পুরাতন। জীবন—মরণ। জন্ম—মৃত্যু। শীর্ষ—ভূমি। ভালো—মন্দ। পরিচয়—অপরিচয়। সুখ—দুঃখ। সুধা—গরল। আনন্দ—বিষাদ। পতন—উত্থান।

লিঙ্গান্তর ॥ বৃদ্ধ—বৃদ্ধা। নগরী—নগর। দীনা—দীন। নটী—নট। প্রিয়া—প্রিয়।

গদ্যরূপ ॥ কারেও—কাকেও। লব—নেবো। সম্ভাষিবে—সম্ভাষণ করবে। মোর—আমার। পরে—ওপরে। নাকো—না। পুনঃ—আবার। শুধাবে—জিজ্ঞাসা করবে। আমারে—আমাকে। বিলায়ে—বিলিয়ে। সকলেরে—সকলকে।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'কিম্বা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ প্রান্তে কোনো'—'বৃষ্টি-ধরা' এবং 'ছিন্নমেঘ' পদ দুটির সমাস নির্ণয় কর। ছিন্নমেঘ পদটির অন্য সমাস করা গেলে তার কি অর্থ হয়?

বৃষ্টি-ধরা—বৃষ্টি ধরেছে যখন—উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

ছিন্নমেঘ—ছিন্ন মেঘ যখন—বহুব্রীহি সমাস।

অন্য সমাস : ছিন্নমেঘ—ছিন্ন যে মেঘ—কর্মধারয় সমাস।

বহুব্রীহি সমাসে ছিন্নমেঘ রাতের অর্থ প্রধান; কিন্তু কর্মধারয় সমাসে পরপদ অর্থাৎ মেঘের অর্থ প্রধান।

২. 'আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে'—বাক্যাংশে 'আনন্দ' ও 'সর্বজনে' এবং 'ভালোবেসে সব কিছু'—বাক্যাংশে 'কিছু'—এই পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।

আনন্দ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। সর্বজনে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। কিছু—কর্মে শূন্যবিভক্তি।

□ ভাদ্রের দিনের ভাবনা □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ বৃষ্টি = বৃষ্ + তি। সংসার = সম্ + সার।

সমাস ॥ ঋণজর্জর—ঋণের দ্বারা জর্জর—তৃতীয়াতৎ। বৃষ্টিশেষের—বৃষ্টির শেষ—ষষ্ঠীতৎ, তার। ছন্নছাড়ার—ছন্ন [<ছন্দ] ছেড়েছে যে—উপপদতৎ, তার। ব্যক্তি-বাঁধনে—ব্যক্তির বাঁধন—ষষ্ঠীতৎ, তাতে।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ জর্জর—জর্জ্ + অর [কর্তৃবা]। জীর্ণ—জৄ + ক্ত [কর্মবা]। জীবন—জীব + অনট্। শরৎ—শৄ + অদ্। সুখী—সুখ + ইন্। শ্রাবণ—শ্রাবণী + ষ্ণ। ছিন্ন—ছিদ্ + ক্ত। সংসার—সম্-সৃ + ঘঞ্। শ্যামল—শ্যাম + ল। অদ্ভুত—অৎ-ভূ + ক্ত। মলিন—মল + ইন। গোপন—গুপ্ + অনট্। ব্যক্তি—বি-অন্জ্ + ক্তি। বাঁধন—বাঁধ্ + অনট্। বন্দী—বন্দ + ইন্।

কারক ও বিভক্তি ॥ কিসে—করণে 'এ' বিভক্তি। ব্যক্তি-বাঁধনে—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ ঋণজর্জর [বিণ]—ঋণজর্জরতা [বি]। জীর্ণ [বিণ]—জীর্ণতা [বি]। জীবন [বি]—জৈবনিক [বিণ]। শরৎ [বি]—শারদ [বিণ]। কালো [বিণ]—কালিমা [বি]। নীল [বিণ]—নীলিমা [বি]। ছিন্ন [বিণ]—ছিন্নতা, ছেদ [বি]। সংসার [বি]—সাংসারিক [বিণ]। সজল [বিণ]—সজলতা [বি]। শ্যামল [বিণ]—শ্যামলতা [বি]। অমল [বিণ]—অমলতা [বি]। নেশা [বি]—নেশাতুর [বিণ]। মলিন [বিণ]—মলিনতা, মালিন্য [বি]। দিন [বি]—দৈনিক [বিণ]। শরৎ [বি]—শারদ [বিণ]। গোপন [বি]—গুপ্ত, গোপনীয় [বিণ]। ব্যক্তি [বি]—ব্যক্ত [বিণ]। বন্দী [বিণ]—বন্দিত্ব [বি]। জীর্ণ [বিণ]—জীর্ণতা [বি]। সোনা [বি]—সোনালি [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ ভাবনা—নির্ভাবনা। সুখী—দুঃখী। সজল—নির্জলা। অমল—মলিন। জীবন—মরণ। গোপন—প্রকাশ্য। বন্দী—মুক্ত।

লিঙ্গান্তর ॥ মলিন—মলিনা। বন্দী—বন্দিনী।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'ছিন্ন মেঘের ছন্নছাড়ার দল'—বাক্যাংশে 'ছন্নছাড়া' পদটির সমাস নির্ণয় কর।

ছন্নছাড়া—ছন্ন [< ছন্দ] ছেড়েছে যে—উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

২. 'সজলে উজলে শ্যামলে অমলে মেশা'—'উজল' শব্দটির মৌল রূপ কি?

উজল < উজ্জ্বল।

□ শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ নয়ন = নে + অন। রুদ্রাক্ষ = রুদ্র + অক্ষ। জগন্নাথ = জগৎ + নাথ।

সমাস ॥ পিতৃদর্শন—পিতাকে দর্শন—দ্বিতীয়াতৎ। অনিমিখ—নেই নিমিখ যাতে—নঞ্-বহুব্রী। নয়নযুগল—নয়নের যুগল—ষষ্ঠীতৎ। শিবপূজা—শিবের পূজা—ষষ্ঠীতৎ। প্রতিদিন—দিন দিন—অব্যয়ীভাব। বামদন্ত—বাম যে দন্ত—কর্মধা। শ্রুতিযুগ—শ্রুতির যুগ [যুগল]—ষষ্ঠীতৎ। কণ্ঠতলে—কণ্ঠের তল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বন্দিশালে—বন্দীদের নিমিত্ত শাল [শালা]—চতুর্থীতৎ, তাতে। রুদ্রাক্ষ—রুদ্রের অক্ষ—ষষ্ঠীতৎ। মহামিশ্র—মহা যে মিশ্র—কর্মধা। জগন্নাথ—জগতের নাথ—ষষ্ঠীতৎ। কবিচন্দ্র—কবিদের চন্দ্র—ষষ্ঠীতৎ। হৃদয়নন্দন—হৃদয়ের নন্দন—ষষ্ঠীতৎ। অনুজ—অনুতে [পরে] জন্মে যে—উপপদতৎ। শ্রীকবিকঙ্কণ—কবিদের কঙ্কণ—ষষ্ঠীতৎ; শ্রীযুক্ত কবিকঙ্কণ—মধ্যপ-কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ শ্রীমন্ত—শ্রী + মন্ত। দর্শন—দৃশ্ + অনট্ [ভাববা]। ব্যথা—ব্যথ্ + ঘঞ্ [ভাববা] + আ। পরিসঙ্গ—পরি [< প্র]-সন্জ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। বন্দী—বন্দ্ + ইন্। আনন্দ—আ-নন্দ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। লোচন—লোচ্ + অনট্। অনুমান—অনু-মা + ঘঞ্ [ভাববা]। পরিতাপ—পরি-তপ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। জননী—জন্ + ণিচ্ + অনট্ + ঈ। জনক—জন্ + ণিচ্ + অক। দীর্ঘ—দ্রাঘ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। শাখী—শাখা + ইন্। প্রণাম—প্র-নম্ + ঘঞ্ [ভাববা]। নিন্দিত—নিন্দ্ + ক্ত [কর্মধা]। কোকিল—কোক + ইল। পরম—পর + ম। চঞ্চল—চল্ + যঙ্‌লুক + ঘঞ্ [কর্তৃবা]। কুটিল—কুট + ইল। ব্যক্ত—বি-অন্জ্ + ক্ত [কর্মধা]। ক্রোধ—ক্রুধ্ + ঘঞ্ [ভাববা]। দক্ষিণ—দক্ষ্ + ইন। বিদায়—বি-দা + ঘঞ্ [ভাববা]। বিলম্ব—বি-লম্ব্ + ঘঞ্ [ভাববা]। অনুজ—অনু-জন্ + ড। আদেশ—আ-দিশ্ + ঘঞ্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ কথা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। আনন্দে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। লোচনে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। কাম, পরিতাপ—কর্তায় শূন্যবিভক্তি। জালে—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ দর্শন [বি]—দর্শনীয়, দৃষ্ট [বিণ]। দুঃখ [বি]—দুঃখিত [বিণ]। ব্যথা [বি]—ব্যথিত [বিণ]। বন্দী [বিণ]—বন্দিত্ব [বি]। অঙ্গ [বি]—আঙ্গিক [বিণ]। আনন্দ [বি]—আনন্দিত [বিণ]। জল [বি]—জলীয় [বিণ]। মন [বি]—মানসিক [বিণ]। দীর্ঘ [বিণ]—দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য, দ্রাঘিমা [বি]। হৃদয় [বি]—হৃদ্য [বিণ]। প্রণাম [বি]—প্রণত [বিণ]। চঞ্চল [বিণ]—চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য

[বি]। কুটিল [বিণ]—কুটিলতা [বি]। ব্যক্ত [বিণ]—ব্যক্তি [বি]। ক্রোধ [বি]—ক্রুদ্ধ [বিণ]। দক্ষিণ [বিণ]—দাক্ষিণ্য [বি]। বিলম্ব [বি]—বিলম্বিত [বিণ]। নন্দন [বি]—নান্দনিক [বিণ]। আদেশ [বি]—আদিষ্ট [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ দুঃখ—সুখ। বন্দী—মুক্ত। আনন্দ—বিষাদ। জল—স্থল। বাম—দক্ষিণ। দীর্ঘ—খর্ব। চঞ্চল—শান্ত। বিলম্ব—দ্রুত। অনুজ—অগ্রজ।

লিঙ্গান্তর ॥ শ্রীমন্ত—শ্রীমতী। মা—বাপ। বন্দী—বন্দিনী। সাধু—সাধ্বী। জননী—জনক। কোকিল—কোকিলা। কুটিল—কুটিলা। চণ্ডী—চণ্ড।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ সঁউরিয়া—স্মরণ করে। তেজে—ত্যাগ করে। অনিমিখ—অনিমেষ। তেজি—ত্যাগ করে। নেহালে—দেখে। ঠান—স্থান। হেন—এরূপ। মোর—আমার। পুরিল—পূর্ণ করলো। গোর—গৌর। বিকচ—বিকশিত। আঁখি—চোখ। আছয়ে—আছে। চিন—চিহ্ন। উজল—উজ্জ্বল। ভালে—কপালে। হয়্যাছে—হয়েছে। সদাই—সর্বদাই। বিরচিল—রচনা করলো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'সঁউরিয়া মায়ের কথা'—বাক্যাংশে 'সঁউরিয়া' এবং 'তেজি অন্য পরিসঙ্গ'—বাক্যাংশে 'তেজি' ও 'পরিসঙ্গ' পদগুলির গদ্যরূপ লিখ।

সঁউরিয়া—স্মরিয়া—স্মরণ করে।

তেজি—ত্যজি—ত্যাগ করে।

পরিসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

২. 'শিবপূজা' পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর। পদটির অন্য সমাস করা যায় কি?

শিবপূজা—শিবের পূজা—ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

শিবপূজা—শিবকে পূজা—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

শিবপূজা—শিবের উদ্দেশে পূজা—চতুর্থী তৎপুরুষ।

□ অভিসার □

সমাস ॥ মন্দির-বাহির—মন্দিরের বাহির—ষষ্ঠীতৎ। মানস-সুরধুনি—মানস-রূপ সুরধুনি—রূপক-কর্মধা। লোচন-তার—লোচনের তার [<তারা]—ষষ্ঠীতৎ। গোবিন্দদাস—গোবিন্দের দাস—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ অভিসার—অভি-সৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। মন্দির—মন্দ্+ইর [অধিকরণবা]। কঠিন—কঠ্+ইন [কর্তৃবা]। শঙ্কিল—শঙ্কা+ইল। পঙ্কিল—পঙ্ক+ইল। দূরতর—দূর+তর। হরি—হৃ+ই [কর্তৃবা]। নিপাত—নি-পত্+ঘঞ্ [ভাববা]। শ্রবণ—শ্রু+অনট্ [করণবা]। যাত—যা+ক্ত [কর্তৃবা]। দামিনী—দাম+ইন্+ঈ। দহন—দহ্+অনট্ [ভাববা]। লোচন—লোচ্+অনট্ [করণবা]। দেহ—দিহ্+ঘঞ্ [কর্মবা]। বিচার—বি-চর্+ঘঞ্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ বাট—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। কৈছে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। পার—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। শ্রবণে—করণে 'এ' বিভক্তি। গেহ,

দেহ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। প্রেমক—সম্বন্ধে 'ক' বিভক্তি। যতনে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ অভিসার [বি]—অভিসারী [বিণ]। কঠিন [বিণ] —কঠিনতা, কাঠিন্য [বি]। শঙ্কিল [বিণ]—শঙ্কিলতা [বি]। পঙ্কিল [বিণ] —পঙ্কিলতা [বি]। নীল [বিণ]—নীলমা [বি]। নিপাত [বি]—নিপাতিত [বিণ]। শ্রবণ [বি]—শ্রাব্য, শ্রুত [বিণ]। দহন [বি]—দগ্ধ [বিণ]। প্রেম [বি] —প্রেমিক [বিণ]। দেহ [বি]—দৈহিক [বিণ]। বিচার [বি]—বিচার্য [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ বাহির—ভিতর, অন্তর। কঠিন—কোমল। শঙ্কিল—শঙ্কাহীন। দূরতর—নিকটতর।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ কবাট—কপাট। চলইতে—চলতে। বাট [< বর্ত্ম]—পথ। তহিঁ—তাতে ; তার ওপর। বাদর—বাদল। বারই—বারিত [নিবারিত] করে। কৈছে—কেমন ক'রে। রহ—রয়েছেন। বজর—বজ্র। শুনাইতে—শুনতে। মরম—মর্ম। জরি—জরে'। যাত—যায়। দিশ—দিক। বিথার—বিস্তার। হেরইতে [<হেরিতে]—দেখতে। উচকই—উচ্চকিত হয়। লোচন-তার—লোচন-তারা। ইথে—এতে। তেজবি—ত্যাগ করবি। গেহ—গৃহ। প্রেমক—প্রেমের। লাগি—জন্যে। উপেখবি—উপেক্ষা করবি। কহে—বলে। ইথে—এতে। ছুটল—ছুটলো। কিয়ে—কি। যতনে—যত্নে। নিবার—নিবারণ।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ **শঙ্কিল**—সেই দুর্যোগের রাতে শঙ্কিল পথে কোন যাত্রী ছিল না। **পঙ্কিল**—সেই দুর্গম, পঙ্কিল পথে যাত্রী ছিল শুধু মাত্র একজন। **দূরতর**—'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপের মতন।'

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কোন্ কোন্ নিয়মে ধ্বনি-পরিবর্তন সাধিত হয়েছে লিখ : কবাট, বাদর, বজর, মরম, বিথার, যতন।

কবাট < কপাট—**ঘোষীভবন**।

বাদর < বাদল—**রকারীভবন**।

বজর < বজ্র = ব্ + অ + জ্ + র্ + অ

= ব + অ + জ্ + [অ] + র্ + অ = বজর।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

মরম < মর্ম = ম্ + অ + র্ + ম্ + অ

= ম্ + অ + র্ + [অ] + ম্ + অ = মরম।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

বিথার < বিস্তার—**বর্ণলোপ [স্]**

এবং মহাপ্রাণিতকরণ।

যতন < যত্ন = য + অ + ত্ + ন্ + অ

= য্ + অ + ত্ + [অ] + ন্ + অ = যতন।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ সম্মুখে=সম্+মুখে। অরিন্দম=অরিম্+দম। সহোদর=সহ+উদর। তস্করে=তৎ+করে। অস্ত্রাগারে=অস্ত্র+আগারে। রামানুজে=রাম+অনুজে। রক্ষোরথি=রক্ষঃ+রথি। স্বচ্ছ=সু+অচ্ছ। সরোবরে=সরঃ+বরে। মৃগেন্দ্র=মৃগ+ইন্দ্র। সম্ভাষে=সম্+ভাষে। সম্বোধে=সম্+বোধে। সংগ্রামে=সম্+গ্রামে। দুর্বল=দুঃ+বল। যজ্ঞাগারে=যজ্ঞ+আগারে। নরাধমে=নর+অধমে। পদার্পণ=পদ+অর্পণ। দুরাচার=দুঃ+আচার। রক্ষোমণি=রক্ষঃ+মণি। পদাশ্রয়ে=পদ+আশ্রয়ে। রক্ষার্থে=রক্ষা+অর্থে। জীমূতেন্দ্র=জীমূত+ইন্দ্র। বীরেন্দ্র=বীর+ইন্দ্র। রাক্ষসরাজানুজ=রাক্ষসরাজ+অনুজ। জলাঞ্জলি=জল+অঞ্জলি। তথাপি=তথা+অপি। নির্গুণ=নিঃ+গুণ। রক্ষোবর=রক্ষঃ+বর। দুর্মতি=দুঃ+মতি। তারকারি=তারক+অরি। মহেষ্বাস=মহা+ইষ্বাস। নিরস্ত্র=নিঃ+অস্ত্র। সঞ্চালনে=সম্+চালনে। মহিষারূঢ়=মহিষ+আরূঢ়। চতুর্ভুজে=চতুঃ+ভুজে। নিষ্ফল=নিঃ+ফল। কিম্বা=কিম্+বা। নিষ্কোষিলা=নিঃ+কোষিলা। নয়ন=নে+অন। খড়্গাঘাতে=খড়্গ+আঘাতে। শোণিতার্দ্র=শোণিত+আর্দ্র। মরামর=মর+অমর। সিংহাসনে=সিংহ+আসনে। লঙ্কেশ=লঙ্কা+ঈশ। বামেতর=বাম+ইতর। রাক্ষসেন্দ্রাণী=রাক্ষস+ইন্দ্রাণী। মন্দোদরী=মন্দ+উদরী। অসুরারি=অসুর+অরি। অস্ত্রাঘাতে=অস্ত্র+আঘাতে। রক্ষোনাথ=রক্ষঃ+নাথ। নরাধম=নর+অধম। বাড়বাগ্নি=বাড়ব+অগ্নি। দাবাগ্নি=দাব+অগ্নি। চিরানন্দ=চির+আনন্দ। অস্তাচলে=অস্ত+অচলে। পাবক=পৌ+অক। ত্বিষাম্পতি=ত্বিষাম্+পতি।

সমাস ॥ মেঘনাদ—মেঘের নাদের মতো নাদ যার—মধ্যপ-বহুব্রী। সচকিতে—চকিতের সহিত বর্তমান—বহুব্রী, তাতে। বীরবর—বীরদের বর—ষষ্ঠীতৎ। ধূমকেতুসম—ধূম কেতু যার—বহুব্রী, তার সম—ষষ্ঠীতৎ। অরিন্দম—অরিকে দমন করে যে—উপপদতৎ। রক্ষোপুরে—রক্ষের পুর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সহোদর—সহ উদর যার—বহুব্রী। রক্ষঃশ্রেষ্ঠ—রক্ষঃদের শ্রেষ্ঠ—ষষ্ঠীতৎ। কুম্ভকর্ণ—কুম্ভের মতো কর্ণ যার—বহুব্রী। ভ্রাতৃপুত্র—ভ্রাতার পুত্র—ষষ্ঠীতৎ। বাসববিজয়ী—বাসবকে বিজয় করেছে যে—উপপদতৎ। নিজগৃহপথ—নিজের গৃহ—ষষ্ঠীতৎ, তার পথ—ষষ্ঠীতৎ। গুরুজন—গুরু যে জন—কর্মধা। পিতৃতুল্য—পিতার তুল্য—ষষ্ঠীতৎ। অস্ত্রাগারে—অস্ত্রের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ, তাতে। রামানুজে—অনুতে জন্মে যে—উপপদতৎ, রামের অনুজ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। শমন-ভবনে—শমনের ভবন—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। রাঘবদাস রাঘবের দাস—ষষ্ঠীতৎ। ভূতলে—ভূ-র তল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। রক্ষোরথি—রক্ষঃদের রথী—ষষ্ঠীতৎ। মহাকুলে—মহা যে কুল—কর্মধা, তাতে। সরোবরে—সরঃদের বর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। রাজহংস—হংসদের রাজা—ষষ্ঠীতৎ। পঙ্কজ-কাননে—পঙ্কে জন্মে যা—উপপদতৎ, তার কানন—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। মৃগেন্দ্র—মৃগদের [পশুদের] ইন্দ্র—

ষষ্ঠীতৎ। বীর-কেশরী—বীর যে কেশরী—কর্মধা। মিত্রভাবে—মিত্রের ভাব—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। অবিদিত—নয় বিদিত—নঞ্‌তৎ। অস্ত্রহীন—অস্ত্রের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। মহারথীপ্রথা—মহান্ যে রথী—কর্মধা, তার প্রথা—ষষ্ঠীতৎ। লঙ্কাপুরে—লঙ্কার পুর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। কুমতি—কু মতি যার—ষষ্ঠীতৎ। দেব-দৈত্য-নর-রণে—দেব, দৈত্য ও নর—দ্বন্দ্ব, তাদের রণ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। স্বচক্ষে—স্ব-র চক্ষ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। রক্ষঃশ্রেষ্ঠ—রক্ষঃদের শ্রেষ্ঠ—ষষ্ঠীতৎ। দুর্বল—দুঃ বল যার—বহুব্রী। যজ্ঞাগারে—যজ্ঞের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ, তাতে। নরাধমে—নরদের অধম—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। জন্মপুরে—জন্মের পুর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। পদার্পণ—পদের অর্পণ—ষষ্ঠীতৎ। বনবাসী—বনে বাস করে যে—উপপদতৎ। নন্দন-কাননে—নন্দনের কানন—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। দুরাচার—দুঃ আচার যার—বহুব্রী। কীটবাস—কীটের বাস—ষষ্ঠীতৎ। রক্ষোমণি—রক্ষঃদের মণি—ষষ্ঠীতৎ। মহামন্ত্রবলে—মহা যে মন্ত্র—কর্মধা, তার বল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। নম্রশিরঃ—নম্র শিরঃ যার—বহুব্রী। মলিনবদন—মলিন বদন যার—বহুব্রী। রাবণ-অনুজ—অনুতে জন্মে যে—উপপদতৎ, রাবণের অনুজ——ষষ্ঠীতৎ। রাবণ-আত্মজ—আত্ম থেকে জন্মে যে—উপপদতৎ, রাবণের আত্মজ—ষষ্ঠীতৎ। কর্ম-দোষে—কর্মের দোষ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। কনকলঙ্কা—কনক-নির্মিত লঙ্কা—মধ্যপ-কর্মধা। দেবকুল—দেবের কুল—ষষ্ঠীতৎ। পাপপূর্ণ—পাপের দ্বারা পূর্ণ—তৃতীয়াতৎ। লঙ্কাপুরী—যা লঙ্কা, তাই পুরী—কর্মধা। বসুধা—বসু [রত্ন]-কে ধারণ করে যে—উপপদতৎ। পদাশ্রয়ে—পদের আশ্রয়—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। পরদোষে—পরের দোষ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বাসবত্রাস—বাসবের ত্রাস—ষষ্ঠীতৎ। জীমূতেন্দ্র—জীমূতের ইন্দ্র—ষষ্ঠীতৎ। বীরেন্দ্র—বীর যে ইন্দ্র—কর্মধা। ধর্মপথগামী—ধর্মের পথ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে গমন করে যে—উপপদতৎ। রাক্ষসরাজানুজ—অনুতে জন্মে যে—উপপদতৎ, রাক্ষসদের রাজা—ষষ্ঠীতৎ, তার অনুজ—ষষ্ঠীতৎ। জলাঞ্জলি—জলের অঞ্জলি—ষষ্ঠীতৎ। পরজন—পর যে জন—কর্মধা। গুণহীন—গুণের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। স্বজন—স্ব-র জন—ষষ্ঠীতৎ। নির্গুণ—নেই গুণ যার—নঞ্‌-বহুব্রী। দুর্মতি—দুঃ মতি যার—বহুব্রী। ইন্দ্রজিতে—ইন্দ্রকে জয় করে যে—উপপদতৎ, তাতে। তারকারি—তারকের আর—ষষ্ঠীতৎ। মহেষাস—মহান্ ইষাস যার—বহুব্রী। শরজালে—শরের জাল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। রুধির-ধারা—রুধিরের ধারা—ষষ্ঠীতৎ। ভূধর-শরীরে—ভূ-কে ধারণ করে যে—উপপদতৎ, তার শরীর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। জলস্রোতঃ—জলের স্রোতঃ—ষষ্ঠীতৎ। উপহারপাত্র—উপহারের নিমিত্ত পাত্র—চতুর্থীতৎ। যজ্ঞাগারে—যজ্ঞের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ, তাতে। নিরস্ত্র—নেই অস্ত্র যার—নঞ্‌-বহুব্রী। অস্ত্রবলে—অস্ত্রের বল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। রথচূড়—রথের চূড়া—ষষ্ঠীতৎ। রথচক্র—ষষ্ঠীতৎ। বাহু-প্রসারণে—বাহুর প্রসারণ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। করপদ্ম—কর পদ্মের ন্যায়—উপমিত-কর্মধা। মহিষারূঢ়—মহিষে আরূঢ়—সপ্তমীতৎ। দণ্ডধরে—দণ্ড ধরে যে—উপপদতৎ। শূলহস্তে—শূল-ধৃত হস্ত—মধ্যপ-কর্মধা, তাতে। শূলপাণি—শূল পাণিতে যার—বহুব্রী। চতুর্ভুজে—চার ভুজের সমাহার—দ্বিগু, তাতে। চতুর্ভুজ—চার ভুজ যাঁর—বহুব্রী।

দেবকুলরথীবৃন্দে—দেবের কুল—ষষ্ঠীতৎ, তাদের রথী—ষষ্ঠীতৎ, তার বৃন্দ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। নিষ্ফল—নেই ফল যাতে—নঞ্-বহুব্রী। কলাধর—কলা [চাঁদের ষোল কলা] ধারণ করে যে—উপপদতৎ। রাহুগ্রাসে—রাহুর গ্রাস—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। মহাতেজাঃ—মহা তেজঃ যার—বহুব্রী। ফলক-আলোকে—ফলকের আলোক—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। খড়্গাঘাতে—খড়্গের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ, অথবা, খড়্গের আঘাত—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। শোণিতার্দ্র—শোণিতের দ্বারা আর্দ্র—তৃতীয়াতৎ। ত্রিদিব—ত্রি দিবের [স্বর্গের] সমাহার—দ্বিগু। মরামর—নয় মর—নঞ্তৎ, মর ও অমর—দ্বন্দ্ব। সিংহাসনে—সিংহ-চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা। কর্বুরপতি—কর্বুরদের পতি—ষষ্ঠীতৎ। কনক-মুকুট—কনক-নির্মিত মুকুট—মধ্যপ-কর্মধা। রিপুরথী—রিপু পক্ষীয় রথী—মধ্যপ-কর্মধা। সশঙ্ক—শঙ্কার সহিত বর্তমান—বহুব্রী। লঙ্কেশ—লঙ্কার ঈশ—ষষ্ঠীতৎ। বামেতর—বাম থেকে ইতর—পঞ্চমীতৎ। আত্মবিস্মৃতিতে—আত্মের বিস্মৃতি—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। সিন্দূর-বিন্দু—সিন্দূরের বিন্দু—ষষ্ঠীতৎ। রাক্ষসেন্দ্রাণী—রাক্ষসদের ইন্দ্রাণী—ষষ্ঠীতৎ। মন্দোদরী—মন্দ উদর যার [স্ত্রী]—বহুব্রী। মাতৃকোলে—মাতার কোল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। শিশুকুল—শিশুদের কুল—ষষ্ঠীতৎ। ব্রজকুল-শিশু—ব্রজের কুল—ষষ্ঠীতৎ, তার শিশু—ষষ্ঠীতৎ। শ্যামমণি—শ্যাম-রূপ মণি—রূপক-কর্মধা। অসুরারি-রিপু—নয় সুর—নঞ্তৎ, তাদের অরি—ষষ্ঠীতৎ, তাদের রিপু—ষষ্ঠীতৎ। রাক্ষসকুল-ভরসা—রাক্ষসদের কুল—ষষ্ঠীতৎ, তার ভরসা—ষষ্ঠীতৎ। বীরকুলগ্লানি—বীরের কুল—ষষ্ঠীতৎ, তার গ্লানি—ষষ্ঠীতৎ। সুমিত্রানন্দন—সুমিত্রার নন্দন—ষষ্ঠীতৎ। রাবণ-নন্দন—রাবণের নন্দন। অস্ত্রাঘাতে—অস্ত্রের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ, তাতে। চিরদুঃখ—চির ব্যাপ্ত করে দুঃখ—দ্বিতীয়াতৎ। দৈত্যকুলদল—দৈত্যের কুল—ষষ্ঠীতৎ, তাকে দলন করে যে—উপপদতৎ। নরাধম—নরের অধম—ষষ্ঠীতৎ। রাজরোষ—রাজার রোষ—ষষ্ঠীতৎ। বাড়বাগ্নিরাশিসম—বাড়ব যে অগ্নি—কর্মধা, তার রাশি—ষষ্ঠীতৎ, তার সম—ষষ্ঠীতৎ। দাবাগ্নি—দাবের [বনের] অগ্নি—ষষ্ঠীতৎ। কুমতি—কু মতি যার—বহুব্রী। সুমতি—সু মতি যার—বহুব্রী। মাতৃপিতৃপাদপদ্ম—মাতা ও পিতা—দ্বন্দ্ব, তাঁদের পাদ—ষষ্ঠীতৎ, তার রূপ পদ্ম—রূপক-কর্মধা। চিরানন্দ—চির ব্যাপ্ত ক'রে আনন্দ যার—বহুব্রী। অশ্রুধারা—অশ্রুর ধারা—ষষ্ঠীতৎ। পঙ্কজ-রবি—পঙ্কে জন্মে যে—উপপদতৎ; পঙ্কজ-রূপ রবি—রূপক-কর্মধা। অস্তাচল—অস্তের নিমিত্ত অচল—চতুর্থীতৎ, তাতে। ত্বিষাম্পতি—ত্বিষার পতি—ষষ্ঠীতৎ। শান্তরশ্মি—শান্ত রশ্মি যার—বহুব্রী। মহাবল—মহা বল যার—বহুব্রী।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ বধ—হন্+ঘঞ [ভাববা]। বীরবর—বীর+বর। ভীমতম—ভীম+তম। বিভীষণ—বি-ভী+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। অরিন্দম অরিম্-দম্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। বিষাদ—বি-সদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। উচিত—বচ্+ইত [কর্মবা]। নিকষা—নি-কষ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। জননী—জন্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]+ঈ। শূলী—শূল+ঈ। পুত্র—পুৎ-ত্রৈ+ক। বাসব—বসু+ষ্ণ। বিজয়ী—বি-জি+ঘঞ্ [ভাববা]+ইন্। তস্কর—তৎ-কৃ+ঘঞ্। অনুজ—অনু-

জন্+ড। শমন—শম্+অনট্। ভবন—ভূ+অনট্। আহব—আ-হু+ঘঞ [অধিকরণবা]। সাধনা—সাধ্+অনট্+আ। ধীমান্—ধী+মতুপ্। রাঘব—রঘু+ষ্ণ। অনুরোধ—অনু-রুধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। রাবণি—রাবণ+ষ্ণি। রাম—রম্+ঘঞ্ [ভাববা]। পঙ্কজ—পঙ্ক-জন্+ড। প্রভু—প্র-ভূ+উ [কর্তৃবা]। পঙ্কিল—পঙ্ক+ইল। কেশরী—কেশর+ইন্। অজ্ঞ—নঞ্-জ্ঞা+ক। বিজ্ঞতম—বিজ্ঞ+তম। অবিদিত—নঞ্-বিদ্+ক্ত [কর্তৃবা]। চরণ—চর্+অনট্ [করণবা]। যোধ—যুধ্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। সংগ্রাম—সম্-গ্রাম্+ঘঞ্। প্রথা—প্রথ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। সৌমিত্রি—সুমিত্রা+ষ্ণি। দৈত্য—দিতি+ষ্ণ্য। পরাক্রম—পরা-ক্রম্+ঘঞ্ [ভাববা]। মানব—মনু+ষ্ণ। যজ্ঞ—যজ্+ন। দন্তী—দন্ত+ইন্। পদার্পণ—পদ-অর্পি+অনট্ [ভাববা]। বনবাসী—বন-বস্+ইন্ [কর্তৃবা]। নন্দন—নন্দ্+অনট্। প্রফুল্ল—প্র-ফুল্ল্+ক্ত [কর্তৃবা]। অপমান—অপ-মান্+ঘঞ্ [ভাববা]। মহামন্ত্র—মহা-মন্ত্র্+ঘঞ্ [ভাববা]। ফণী—ফণা+ইন্ [কর্তৃবা]। মলিন—মল+ইন [কর্তৃবা]। বদন—বদ্+অনট্ [করণবা]। রাবণ—রু+ণিচ্+অনট্ [কর্তৃবা]। আত্মজ—আত্মন্-জন্+ড। দোষী—দোষ+ইন্। দোষ—দুষ্ ঘঞ্ [ভাববা]। বিরত—বি-রম্+ক্ত [কর্তৃবা]। প্রলয়—প্র-লী+ঘঞ্ [ভাববা]। আশ্রয়ী—আশ্রয়+ইন্। ত্রাস—ত্রস্+ঘঞ্। নিশীথ—নি-শী+থ [অধিকরণবা]। বলী—বল+ইন্। গামী—গম্+ইন্ [কর্তৃবা]। বিখ্যাত—বি-খ্যা+ক্ত [কর্মবা]। জগৎ—গম্+ক্বিপ্ [কর্তৃবা]। ধর্ম—ধৃ+ম [কর্তৃবা]। জ্ঞাতিত্ব—জ্ঞাতি+ত্ব। ভ্রাতৃত্ব—ভ্রাতৃ+ত্ব। শাস্ত্র—শাস্+ত্র [করণবা]। গুণবান্—গুণ+বতুপ্। শ্রেয়ঃ—প্রশস্য [<শ্র]+ঈয়স্। সহবাস—সহ-বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। বর্বরতা—বর্বর+তা। চেতন—চিত্+অনট্ [ভাববা]। খরতর—খর+তর। ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্র-জি+ক্বিপ্ [কর্তৃবা]। বস্ত্র—বস্+ত্র [করণবা]। মেদিনী—মেদ+ইন+ঈ। উপহার—উপ-হৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। পাত্র—পা+ত্র। কোপ—কুপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। রথী—রথ+ইন্। ভগ্ন—ভন্জ্+ক্ত [কর্মবা]। ছিন্ন—ছিদ্+ক্ত [কর্মবা]। ভিন্ন—ভিদ্+ক্ত [কর্মবা]। মায়াময়ী—মায়া+ময়ট্+ঈ [স্ত্রী]। প্রসরণ—প্র-সৃ+অনট্ [ভাববা]। সুপ্ত—স্বপ্+ক্ত [কর্তৃবা]। সঞ্চালন—সম্-চল্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। ভীম—ভী+ম। নাদ—নদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রহারক—প্র-হৃ+অক [কর্তৃবা]। ভীষণ—ভী+ণিচ্+অনট্। মহিষ—মহ্+ইষ্ [করণবা]। আরূঢ়—আ-রুহ্+ক্ত [কর্তৃবা]। নিশ্বাস—নি-শ্বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। সিংহ—হিন্স্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। মাঝার—মাঝ+আর। ফলক—ফল+ক। আলোক—আ-লোক্+ঘঞ্ [ভাববা]। নয়ন—নী+অনট্ [করণবা]। আঘাত—আ-হন্+ঘঞ্ [ভাববা]। শোণিত—শোণ+ইত। আর্দ্র—অর্দ্+র [কর্তৃবা]। সিন্ধু—স্যন্দ্+উ। ভৈরব—ভীরু+ষ্ণ। আরাব—আ-রু+ঘঞ্ [ভাববা]। সহসা—সহ-সো+আ [কর্তৃবা]। পাতাল—পত্+আল [অধিকরণবা]। মর্ত্য—মৃ+ণ্যৎ। জীব—জীব্+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। প্রমাদ—প্র-মদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আতঙ্ক—আ-তন্ক্+ঘঞ্

[ভাববা]। হৈম—হেম+ষ্ণ। শঙ্কর—শম্-কৃ+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। প্রমীলা—প্র-মীল্+ঘঞ +আ। আত্মবিস্মৃতি—আত্মন্-বি-স্মৃ+ক্তি [ভাববা]। সিন্দুর—স্যন্দ্+উর। নিদ্রা—নি-দ্রা+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। আর্তনাদ—আর্ত-নদ্+ঘঞ্। অন্যায়—নঞ্-নি-ই+ঘঞ্ [ভাববা]। সমর—সম্-ঋ+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। রাক্ষস—রক্ষস্+ষ্ণ। পুরুষ—পৄ+উষ [কর্তৃবা]। বচন—বচ্+অনট্ [ভাববা]। পামর—পামন্-রা+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। ইন্দ্র—ইন্দ্+র [কর্তৃবা]। বিধাতা—বি-ধা+তৃচ্ [কর্তৃবা]। বাড়ব—বড়বা+ষ্ণ। মূঢ়—মুহ্+ক্ত [কর্তৃবা]। দানব—দনু+ষ্ণ। মানব—মনু+ষ্ণ। সাধ্য—সাধ্+ণ্যৎ। অন্তিম—অন্ত+ইমন্। চিরানন্দ—চির-আ-নন্দ্+ঘঞ্। নির্বাণ—নিঃ-বা+ক্ত [কর্মবাচ্য]। পাবক—পূ+অক [কর্তৃবা]। শান্ত—শম্+ক্ত [কর্তৃবা]।

কারক ও বিভক্তি॥ সচকিতে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। বিভীষণে—কর্মে—'এ' বিভক্তি। নিজগৃহপথ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। তস্করে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। চণ্ডালে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। তোমা—কর্মে শূন্যবিভক্তি। রামানুজে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। আহবে—করণে 'এ' বিভক্তি। কাতরে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। মুখে—করণে 'এ' বিভক্তি। দাসেরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। বিধুরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। শৃগালে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। যোধে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। দেববলে—করণে 'এ' বিভক্তি। সমরে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। স্বচক্ষে—করণে 'এ' বিভক্তি। মানবে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। দাসে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। নরাধমে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। মহামন্ত্রবলে—করণে 'এ' বিভক্তি। রাবণ-আত্মজে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। মোরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। কর্ম-দোষে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। পাপে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। সকলে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সহবাসে—করণে 'এ' বিভক্তি। শরে—করণে 'এ' বিভক্তি। ইন্দ্রজিতে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। শরজালে—করণে 'এ' বিভক্তি। তারকে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। ভূধর-শরীরে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। হাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। প্রসরণে—করণে 'এ' বিভক্তি। সবে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। মশকবৃন্দে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সঞ্চালনে—করণে 'এ' বিভক্তি। প্রহারকে কর্মে 'এ' বিভক্তি। মায়ায়—করণে 'য়' বিভক্তি। দণ্ডধরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সভয়ে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। দেবীকুলরথীবৃন্দে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। ফলক-আলোকে—করণে 'এ' বিভক্তি। খড়্গাঘাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। আরাবে—করণে 'এ' বিভক্তি। আতঙ্কে—করণে 'এ' বিভক্তি। শঙ্করে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। বচনে—করণে 'এ' বিভক্তি। শূরে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। শমনে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। ইন্দ্রে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। দাসে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। তোরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। মহীরে—কর্মে 'রে' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন॥ বিভীষণ [বিণ]—বিভীষিকা [বি]। বিষাদ [বি]—বিষণ্ণ [বিণ]। উচিত [বিণ]—ঔচিত্য [বি]। নিকষা [বি]—নৈকষেয় [বিণ]। কলঙ্ক [বি]—কলঙ্কিত [বিণ]। সাধনা [বি]—সাধিত [বিণ]। বিপক্ষ [বি]

—বিপক্ষীয় [বিণ]। অনুরোধ [বি]—অনুরুদ্ধ [বিণ]। কাতর [বিণ]—কাতরতা, কাতরিমা [বি]। বিধি [বি]—বিহিত, বৈধ [বিণ]। স্বচ্ছ [বিণ]—স্বচ্ছতা [বি]। প্রভু [বিণ]—প্রভুত্ব [বি]। পঙ্কিল [বিণ]—পঙ্কিলতা [বি]। অজ্ঞ [বিণ]—অজ্ঞতা [বি]। শূর [বিণ]—শৌর্য [বি]। শিশু [বিণ]—শৈশব [বি]। সমর [বি]—সামরিক [বিণ]। পরাক্রম [বি]—পরাক্রান্ত [বিণ]। দাস [বিণ]—দাসত্ব, দাস্য [বি]। দুর্বল [বিণ]—দুর্বলতা [বি]। মানব [বি]—মানবিক [বিণ]। প্রগল্‌ভ [বিণ]—প্রগল্‌ভতা [বি]। দম্ভী [বিণ]—দম্ভ [বি]। বনবাসী [বিণ]—বনবাস [বি]। প্রফুল্ল [বিণ]—প্রফুল্লতা [বি]। অপমান [বি]—অপমানিত [বিণ]। বিরত [বিণ]—বিরতি, বিরাম [বি]। দোষ [বি]—দুষ্ট, দূষিত [বিণ]। গম্ভীর [বিণ]—গাম্ভীর্য [বি]। জগৎ [বি]—জাগতিক [বিণ]। জ্ঞাতিত্ব [বি]—জ্ঞাতি [বিণ]। জাতি [বি]—জাতীয় [বিণ]। শাস্ত্র [বি]—শাস্ত্রীয় [বিণ]। বর্বরতা [বি]—বর্বর [বিণ]। নীচ [বিণ]—নীচতা [বি]। অধীর [বিণ]—অধীরতা [বি]। ব্যথা [বি]—ব্যথিত [বিণ]। উপহার [বি]—উপহৃত [বিণ]। কোপ [বি]—কুপিত [বিণ]। ভগ্ন [বিণ]—ভঙ্গ [বি]। ছিন্ন [বিণ]—ছিন্নতা, ছেদ [বিণ]। প্রসরণ [বি]—প্রসারিত [বিণ]। সুপ্ত [বিণ]—সুপ্তি [বি]। সঞ্চালন [বি]—সঞ্চালিত [বিণ]। মায়া [বি]—মায়াবী [বিণ]। ভীষণ [বিণ]—ভীষণতা [বি]। আরূঢ় [বিণ]—আরোহণ [বি]। বিমান [বি]—বৈমানিক [বিণ]। আলোক [বি]—আলোকিত [বিণ]। আঘাত [বি]—আহত [বিণ]। আর্দ্র [বিণ]—আর্দ্রতা [বি]। জীব [বি]—জৈবিক [বিণ]। প্রমাদ [বি]—প্রমত্ত [বিণ]। আতঙ্ক [বি]—আতঙ্কিত [বিণ]। হৈম [বিণ]—হেম [বি]। আত্মবিস্মৃতি [বি]—আত্মবিস্মৃত [বিণ]। সুন্দর [বিণ]—সৌন্দর্য [বি]। নিদ্রা [বি]—নিদ্রিত, নিদ্রালু [বিণ]। কুল [বি]—কৌলিক [বিণ]। পরুষ [বিণ]—পরুষতা, পরুষত্ব, পারুষ্য [বি]। বীর [বিণ]—বীরত্ব, বীর্য [বি]। বচন [বি]—বাচনিক [বিণ]। নন্দন [বি]—নান্দনিক [বিণ]। অস্ত্রাঘাত [বি]—অস্ত্রাহত [বিণ]। চিরদুঃখ [বি]—চিরদুঃখী [বিণ]। মন [বি]—মানসিক [বিণ]। দল [বি]—দলীয় [বিণ]। সংগ্রাম [বি]—সংগ্রামী [বিণ]। পাপ [বি]—পাপী [বিণ]। তাপ [বি]—তাপিত, তপ্ত [বিণ]। দেশ [বি]—দেশীয় [বিণ]। রোষ [বি]—রুষ্ট [বিণ]। তেজ [বি]—তেজী, তেজস্বী [বিণ]। সদৃশ [বিণ]—সাদৃশ্য, সদৃশতা [বি]। মূঢ় [বিণ]—মূঢ়তা [বি]। দানব [বি]—দানবীয়, দানবিক [বিণ]। মানব [বি]—মানবীয়, মানবিক [বিণ]। দেব [বি]—দৈব [বিণ]। সাধ্য [বিণ]—সাধ [বি]। জগৎ [বি]—জাগতিক [বিণ]। অধীর [বিণ]—অধীরতা, অধৈর্য [বি]। ধীর [বিণ]—ধৈর্য [বি]। আনন্দ [বি]—আনন্দিত [বিণ]। শান্ত [বিণ]—শান্তি [বি]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ সম্মুখে—পশ্চাতে। বিষাদ—আনন্দ। উচিত—অনুচিত।

রাজা—প্রজা। দাস—প্রভু। জনম—মরণ। অধম—উত্তম। স্বচ্ছ—অস্বচ্ছ। অজ্ঞ—বিজ্ঞ। অবিদিত—সুবিদিত। ক্ষুদ্রমতি—মহামতি। অস্ত্রহীন—অস্ত্রবান। শিশু—বৃদ্ধ। কুমতি—সুমতি। দুর্বল—সবল। মানব—দানব। নরাধম—নরোত্তম। বনবাসী—গৃহবাসী। অপমান—সম্মান। নম্রশিরঃ—উদ্ধতশিরঃ। মলিন—অমলিন। বিরত—রত। ধর্ম—অধর্ম। বিখ্যাত—কুখ্যাত। গুণবান্—গুণহীন। পরজন—স্বজন। নির্গুণ—সগুণ। নীচ—উচ্চ। দুর্মতি—সুমতি। নিরস্ত্র—অস্ত্রবান। ভিন্ন—অভিন্ন। প্রহারক—প্রহৃত। মর্ত্য—স্বর্গ। মর—অমর। জীব—জড়। বাম—দক্ষিণ। অন্যায়—ন্যায়। পরুষ—কোমল। সংগ্রাম—শান্তি। সদৃশ—বিসদৃশ। অস্তাচল—উদয়াচল।

লিঙ্গান্তর ॥ জননী—জনক। সহোদর—সহোদরা। ভ্রাতৃপুত্র—ভ্রাতৃকন্যা। বিজয়ী—বিজয়িনী। চণ্ডাল—চণ্ডালী, চণ্ডালিনী [বাংলায়]। অনুজ—অনুজা। দাস—দাসী। শৃগাল—শৃগালী। দেব—দেবী। নর—নারী। মানব— মানবী। প্রগল্‌ভ—প্রগল্‌ভা। বনবাসী—বনবাসিনী। ফণী—ফণিনী। মলিন—মলিনা। আত্মজ—আত্মজা। ধর্মপথগামী—ধর্মপথগামিনী। গুণবান—গুণবতী। গুণহীন—গুণহীনা। আরূঢ়—আরূঢ়া। ভীম—ভীমা। চতুর্ভুজ—চতুর্ভুজা। সিংহ—সিংহী। ভৈরব—ভৈরবী। শঙ্কর—শঙ্করী। সুন্দর—সুন্দরী। রাক্ষসেন্দ্রাণী—রাক্ষসেন্দ্র। ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী। মূঢ়—মূঢ়া। কলঙ্কী—কলঙ্কিনী।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ দেখিল—দেখলো। কহিলা—বললো। জানিনু—জানলাম। কেমনে—কেমন করে। পশিল—প্রবেশ করলো। তব—তোমার। আনি—এনে। গঞ্জি—গঞ্জনা দিই। ভঞ্জিব—ভঞ্জন করবো। উত্তরিলা—উত্তর দিল। রক্ষিতে—রক্ষা করতে, রাখতে। কাতরে—কাতরভাবে। ইচ্ছি—ইচ্ছা করি। মরিবারে—মরবার জন্যে, মরতে। দাসেরে—দাসকে। স্থাপিলা—স্থাপন করলেন। পড়ি—পড়ে। কেমনে—কেমন করে। জনম—জন্ম। কে বা—কে। কভু—কখনো। সম্ভাষে—সম্ভাষণ করে। নহে—নয়। নহিলে—নাহলে, নইলে। যোধে—যোদ্ধাকে। সম্বোধে—সম্বোধন করে। কহ—বলো। নাহি—নেই। শুনি—শুনে। না হাসিবে—হাসবে না। ছাড়হ—ছাড়ো। বিমুখে—বিমুখ করে। মোরে—আমাকে। ডরিবে—ভয় করবে। হেন—এরূপ, এই। প্রগল্‌ভে—প্রগল্‌ভভাবে। দাসে—দাসকে। শাস্তি—শাসন করি। নরাধমে—নরাধমকে। ভ্রমে—ভ্রমণ করে। সহিব—সইবো। কেমনে—কেমন করে। সহিছ—সইছ, সহ্য করছ। যথা—যেমন। লক্ষি—লক্ষ্য করে। রাবণ-আত্মজে—রাবণ-আত্মজকে। নহি—নই। ভৎর্স—ভর্ৎসনা কর। মজাইলা—মজালো। মজিলা—মজলো। এবে—এখন। যেমতি—যেমন। তেঁই—তাই। রুষিলা—রুষ্ট হলো। মন্দ্রে—মন্দ্র করে। কোপি—কুপিত হয়ে। গঞ্জি—গঞ্জনা দিই। হেথায়—এখানে। যতনে—যত্নে। হুঙ্কারে—হুঙ্কার দিয়ে। টঙ্কারিলা—টঙ্কার দিল। সন্ধানি—সন্ধান করে। বিন্ধিলা—বিদ্ধ করলো। বিধেন—বিদ্ধ করেন। বরিষার—বর্ষার। তিতিয়া—ভিজে। সাপটি—সাপ্‌টে। নিক্ষেপিলা—নিক্ষেপ করলো। হানিলা—আঘাত করলো। পাইলা—পেল। ফেলাইয়া—ফেলিয়ে। সবে—সবকে। ধাইলা—ধাবিত হলো। গর্জি—গর্জন

করে। প্রহারকে—প্রহারককে। হেরি—দেখে। হেরিলা—দেখলো। চৌদিকে—চারদিকে। দাঁড়াইলা—দাঁড়ালো। মাঝারে—মধ্যে, মাঝখানে। ত্যজি—ত্যাগ করে। নিকোষিলা—নিকোষিত করলো। ঝলসিলা—ঝল্‌সালো। পড়িল—পড়লো। থরথরি—থরথর করে। কাঁপিলা—কাঁপলো। গর্জিলা—গর্জন করলো। উথলি—উথ্‌লে। পূরিল—পূর্ণ করলো। গণিলা—গণনা [আশঙ্কা] করলো। যথায়—যেখানে। খসি—খসে। যবে—যখন। পাড়ে—পাতিত করে। স্মরিলা—স্মরণ করলো। মুছিলা—মুছলো; মূর্ছিলা—মূর্ছিত হলো। আঁধারে—আঁধার করে। গেলা—গেল। পড়ি—পতিত হয়ে। কহিলা—বললো। শূরে—শূরকে। তোরে—তোকে। ডরি—ভয় করি। শমনে—শমনকে। মরিনু—মরলাম। ইন্দ্রে—ইন্দ্রকে। দমিনু—দমন করলাম। দাসে—দাসকে। কহিব—বলবো। রক্ষিবে—রক্ষা করবে। পশিবে—প্রবেশ করবে। দগ্ধিবে—দগ্ধ করবে। পশিস—প্রবেশ করিস। নারিবে—পারবে না। আবরিতে—আবৃত করতে। হেন—এমন। ত্রাণিবে—ত্রাণ করবে। রুষিলে—রুষ্ট হলে। কে বা—কে। ভঞ্জিবে—ভঞ্জন করবে। এতেক—এতখানি বা এই কথা। স্মরিলা—স্মরণ করলো। হইলা—হলো। লোহ—লোহিত, রক্ত। সহ—সঙ্গে। মিশি—মিশে। বহি—বয়ে। আর্দ্রিলা—আর্দ্র করলো। মহীরে—মহীকে। গেলা—গেল। রহিলা—রইলো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥

১. লোহসহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

ক. 'আর্দ্রিল' ক্রিয়াপদটি কিভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে?

খ. পঙ্কজ-রবি, ত্বিষাম্পতি ও মহাবল,—এই তিনটি পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম দাও।

গ. 'মহাবল' পদটি অপর কোন সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায় কিনা এবং তাতে অর্থের কি পরিবর্তন হয়?

উ. মা. '৭৮

ক. **আর্দ্রিল**—আর্দ্র [বিশেষণ]+ইল—**নামধাতু।**

খ. **পঙ্কজ-রবি**—পঙ্কে জন্মে যা—উপপদ তৎপুরুষ সমাস, পঙ্কজ-রূপ রবি—রূপক কর্মধারয় সমাস।

ত্বিষাম্পতি—ত্বিষার [দিনের] পতি—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

মহাবল—মহা বল যার—বহুব্রীহি সমাস।

গ. **মহাবল**—মহৎ যে বল—কর্মধারয় সমাস। বহুব্রীহি সমাসে মহাবলধারী ব্যক্তির প্রাধান্য, কিন্তু কর্মধারয় সমাসে বলের প্রাধান্য।

দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল।

ক. 'ভীমপুচ্ছে' এবং 'আত্মশিরে',—এই দুটি পদের কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর।
খ. দুঃসহ এবং গতিহীন,—এই দুটি পদের বিপরীতার্থবোধক শব্দ গঠন কর।
গ. 'দীপ্ত'—পদ হতে বিশেষ্য পদ গঠন কর। উ. মা. '৭৮

ক. **ভীমপুচ্ছে**—[ভীম পুচ্ছের দ্বারা] করণকারকে 'এ' বিভক্তি।
আত্মশিরে—[আত্মশিরকে] কর্মকারকে 'এ' বিভক্তি।
খ. **দুঃসহ**—সুসহ [বিপরীতার্থবোধক শব্দ]।
গতিহীন—গতিবান, গতিশীল [বিপরীতার্থবোধক শব্দ]।
গ. **দীপ্ত**—[বিশেষণ পদ]—দীপ্তি [বিশেষ্য পদ]।

৩. 'নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?'
—'তস্করে' ও 'চণ্ডালে' পদ দুটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।
তস্করে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। চণ্ডালে—কর্মে 'এ' বিভক্তি।

৪. হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!'—'ইচ্ছি'—এই ক্রিয়াপদটির বৈশিষ্ট্য কি ?
ইচ্ছি—ইচ্ছা [বিশেষ্য পদ]+'ই' প্রত্যয় [সাধারণ বর্তমান কাল, উত্তম পুরুষ]—নামধাতু।

৫. 'নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি'—'মন্দ্রে' ও 'কোপি'—এই পদ দুটির বৈশিষ্ট্য কি ?
মন্দ্রে—মন্দ্র [বিশেষ্য]+'এ' প্রত্যয় [সাধারণ বর্তমান, প্রথম পুরুষ]—নামধাতু।
কোপি—কোপ [বিশেষ্য]+'ই' প্রত্যয় [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়]—নামধাতু ; গদ্যে—কুপিত হয়ে।

৬. 'সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেম্বাস শরজালে বিধেন তারকে !'

ক. 'অরিন্দম', 'ইন্দ্রজিৎ', ও 'মহেম্বাস'—পদগুলির সমাস ব্যাখ্যা কর।
খ. 'শরে', 'ইন্দ্রজিতে', 'শরজালে', 'তারকে'—পদগুলির কারক ও বিভক্তি বিশ্লেষণ কর।
গ. 'সন্ধানি'—পদটির বৈশিষ্ট্য কি ?

ক. অরিন্দম—অরিকে দমন করে যে—উপপদ তৎপুরুষ সমাস।
ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রকে জয় করে যে—উপপদ তৎপুরুষ সমাস।
মহেষ্বাস—মহান্ ইষ্বাস যার—বহুব্রীহি সমাস।

খ. শরে—করণে 'এ' বিভক্তি। ইন্দ্রজিতে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। শরজালে—করণে 'এ' বিভক্তি। 'তারকে'—কর্মে 'এ' বিভক্তি।

গ. সন্ধানী—সন্ধান [বিশেষ্য]+'ই' [অসমাপিকা ক্রিয়া-প্রত্যয়]—নামধাতু।

৭. 'বহিল, তিতিয়া বস্ত্র তিতিয়া মেদিনী!'—পঙ্‌ক্তিতে 'তিতিয়া' এবং 'দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে'—পঙ্‌ক্তিতে 'দগ্ধিবে' ক্রিয়াপদ দুটির বৈশিষ্ট্য লিখ। 'দাবাগ্নি'—পদটির সমাস লিখ।
তিতিয়া—তিত্+ইয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া। কেবলমাত্র কাব্যে ব্যবহৃত হয়। গদ্যে: ভিজিয়া—ভিজে।
দগ্ধিবে—দগ্ধ [বিশেষণ]+'ইবে' প্রত্যয় [সাধারণ ভবিষ্যৎকাল, প্রথম পুরুষ]—নামধাতু।
দাবাগ্নি—দাবের [বনের] অগ্নি—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

□ শ্রাবণে □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ বৃষ্টি=বৃষ্+তি। দুর্যোগের=দুঃ+যোগের।

সমাস ॥ জল-ভরা—জল দিয়ে ভরা—তৃতীয়াতৎ, অথবা, জলে ভরেছে যা—উপপদতৎ। সাড়া-শব্দ—সাড়া ও শব্দ—দ্বন্দ্ব। লোক-জন—যে লোক সেই জন—কর্মধা। হেথা-হোথা—হেথা ও হোথা—দ্বন্দ্ব। ফটিক-জল—ফটিকের ন্যায় জল—উপমিত-কর্মধা। কদম্ব-কেতকী-বাসে—কদম্ব ও কেতকী—দ্বন্দ্ব, তার বাস—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বৃষ্টি-ভরে—বৃষ্টির ভর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। বায়ুভরে—বায়ুর ভর—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। আধফোটা—আধ [ভাবে] ফোটা—দ্বিতীয়াতৎ। নারিকেল-মূলে—নারিকেলের মূল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। দাম-ঝাঁকে—দামের ঝাঁক—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। চকাচকী—চকা ও চকী—দ্বন্দ্ব। তরুতল—তরুর তল—ষষ্ঠীতৎ। নবশ্যাম—নব যে শ্যাম—কর্মধা। পুত্র-পরিবার—পুত্র ও পরিবার—দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ শ্রাবণা—শ্রাবণী+ষ্ণ। আকাশ—আ-কাশ্+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। জীবন—জীব্+অনট্ [ভাববা]। অবকাশ—অব-কাশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। চাতক—চত্+অক [কর্তৃবা]। ঘাস—অদ্+ঘঞ্ [কর্মবা]। বৃষ্টি—বৃষ্+ক্তি। মরালী—মৃ+আল+ঈ। গ্রীবা—গৄ+ব [করণবা]+আ। কুম্ভ—ক-উন্ভ্+ঘঞ্ [ভাববা]। মুমূর্ষু—মৃ+সন্+ঘঞ্ [ভাববা]+উ। হাসি—হাস্+ই। প্রলয়—প্র-লী+ঘঞ্ [ভাববা]। গৃহী—গৃহ+ইন্। পুত্র—পুৎ-ত্রৈ+ক। পরিবার—পরি-বৃ+ঘঞ্ [করণবা]। দুর্যোগ—দুঃ-যুজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। তন্দ্রা—তন্দ্র্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। নিদ্রা—নি-দ্রা+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। অস্ফুট—নঞ্-স্ফুট্+ঘঞ্ [ভাববা]। ভাব—ভূ+ঘঞ্ [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি। ঘামা ঘাসে—করণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন॥ দিন [বি]—দৈনিক [বিণ]। মেঘ [বি]—মেঘলা [বিণ]। আকাশ [বি]—আকাশী [বিণ]। লতা [বি]—লতানে [বিণ]। ফুল [বি]—ফুলেল [বিণ]। মাটি [বি]—মেটে [বিণ]। জল [বি]—জলীয় [বিণ]। শূন্য [বিণ]—শূন্যতা [বি]। মুমূর্ষু [বিণ]—মুমূর্ষা [বি]। পরিবার [বি]—পারিবারিক [বিণ]। তন্দ্রা [বি]—তন্দ্রালু [বিণ]। নিদ্রা [বি]—নিদ্রিত, নিদ্রালু [বিণ]। দেহ [বি]—দৈহিক [বিণ]। মন [বি]—মানসিক [বিণ]। ভাব [বি]—ভাবুক, ভাবালু [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ॥ দিন—রাত্রি। জল—স্থল। গ্রাম—শহর। হাসি—কান্না। সম—বিষম। অন্ধকার—আলো। গৃহী—বনবাসী। দেহ—মন। ভাব—অভাব।

লিঙ্গান্তর॥ চাতক—চাতকী। ডাহুক—ডাহুকী। মরাল—মরালী। চকা—চকী। বধূ—বর। গাভী—বলদ। চাষী—চাষী-বৌ। গৃহী—গৃহিণী।

আধুনিক গদ্যরূপ॥ লুটি—লুটে। ভিজিছে—ভিজ্‌ছে। হেথা-হোথা—এখানে-ওখানে। দাঁড়ায়েছে—দাঁড়িয়েছে। ডাকিছে—ডাকছে। ছাড়ি—ছেড়ে। উঠিছে—উঠছে। কাঁপিছে—কাঁপছে। ভাসিছে—ভাসছে। লুকাইছে—লুকোচ্ছে। কভু—কখনো। লয়ে—নিয়ে। ভিজিছে—ভিজ্‌ছে। মাথে—মাথায়। সম—মতো। চমকিছে—চম্‌কাচ্ছে। হতেছে—হচ্ছে। কয়—বলে। নাহি—না।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা॥ ১. 'আধ-ফোটা কুমুদ কমল।'—'আধ-ফোটা' কি সমাস?

আধ-ফোটা—আধ-রূপে ফোটা—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

২. 'মুমূর্ষুর হাসি সম চমকিছে বিজলীর হাসি।'—'মুমূর্ষু' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? 'ম্রিয়মাণ' শব্দটির সঙ্গে তার পার্থক্য কি?

মুমূর্ষু—মৃ-ধাতু+ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয়+উ [কর্তৃবাচ্য]।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—মরতে ইচ্ছুক। বর্তমান অর্থ—মৃত্যুমুখী।

ম্রিয়মাণ - মৃ ধাতু+শানচ্ [কর্তৃবাচ্য]।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যে মরছে। বর্তমান অর্থ—বিষণ্ণ।

□ কেমনে আনিবে বন্ধু □

সন্ধি-বিচ্ছেদ। চিরন্তন=চিরম্+তন্। হিমানী=হিম+আনি।

সমাস॥ ক্ষুব্ধকণ্ঠে—ক্ষুব্ধ যে কণ্ঠ—কর্মধা, তাতে। হিমহ্রদে—হিমময় হ্রদ—মধ্যপ-কর্মধা, তাতে। দূর্বাদল—দূর্বার দল—ষষ্ঠীতৎ। অশোক—নেই শোক যার—নঞ্-বহুব্রী। রক্তস্মৃতি—রক্তময় স্মৃতি—মধ্যপ-কর্মধা। ক্ষীণবৃন্ত—ক্ষীণ যে বৃন্ত—কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয়। বন্ধু—বন্ধ্+উ [কর্তৃবা]। বসন্ত—বস্+অন্ত [অধিকরণবা]। নূতন—নূ [<নব]+তন। জীবন—জীব্+অনট্ [ভাববা]। শরৎ—শৄ+অদ্। হেমন্ত—হন্+মন্ত [কর্তৃবা]। আগমন—আ-গম্+অনট্ [ভাববা]। মুগ্ধ—মুহ্+ক্ত [কর্তৃবা]। ক্ষুব্ধ—ক্ষুভ্+ক্ত [কর্তৃবা]। ক্ষীণ—ক্ষি+ক্ত [কর্তৃবা]। বিদায়—বি-দা+ঘঞ্ [ভাববা]। পূর্ণ—পূর্+ক্ত [কর্মবা]। আকাশ—আ-কাশ্+ঘঞ্ [অধিকরণবা]। নীলিমা—নীল+ইমন্+আ। নিলীন—নি-লী+ক্ত

[কর্মবা]। বিলুপ্ত—বি-লুপ্‌+ক্ত [কর্মবা]। মণ্ডন—মণ্ড্‌+অনট্‌। স্নিগ্ধ—স্নিহ্‌+ক্ত [কর্মধা]। পাণ্ডুর—পাণ্ডু+র। মলিন—মল+ইন। অশোক—নঞ্‌-শুচ্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। রক্ত—রন্‌জ্‌+ক্ত। স্মৃতি—স্মৃ+ক্তি [ভাববা]। বিলীন—বি-লী+ক্ত [কর্মবা]। ফুল্ল—ফুল্ল্‌+ঘঞ্‌ [ভাববা]। যোগী—যোগ+ইন্‌। হীন—হা+ক্ত [কর্মবা]। মধুপ—মধু-পা+ক। ভ্রান্ত—ভ্রম্‌+ক্ত। ক্ষিপ্র—ক্ষিপ্‌+র [কর্তৃবা]।

কারক ও বিভক্তি ॥ কেমনে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। ক্রুদ্ধকণ্ঠে—করণে 'এ' বিভক্তি। যোগীর [মতন]—কর্মপ্রবচনীয়যোগে 'র' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ বসন্ত [বি]—বাসন্তী, বাসন্তিক [বিণ]। নূতন [বিণ]—নূতনত্ব [বি]। জীবন [বি]—জৈবনিক [বিণ]। শরৎ [বি]—শারদীয় [বিণ]। দিন [বি]—দৈনিক [বিণ]। আগমন [বি]—আগত, আগামী [বিণ]। মুগ্ধ [বিণ]—মুগ্ধতা, মোহ [বি]। ক্রুদ্ধ [বিণ]—ক্রুদ্ধতা, ক্রোধ [বি]। ক্ষীণ [বিণ] —ক্ষীণতা [বি]। পূর্ণ [বিণ]—পূর্ণতা [বি]। চিরন্তন [বিণ]—চিরন্তনতা [বি]। ধূসর [বিণ]—ধূসরতা [বি]। নিলীন [বিণ]—নিলয় [বি]। বিলুপ্ত [বিণ]—বিলুপ্তি [বি]। মণ্ডন [বি]—মণ্ডিত [বিণ]। স্নিগ্ধ [বিণ]—স্নিগ্ধতা [বি]। পাণ্ডুর [বিণ]—পাণ্ডুরতা [বি]। মলিন [বিণ]—মলিনতা, মালিন্য [বি]। খণ্ডন [বি]—খণ্ডিত [বিণ]। মৃদু [বিণ]—মৃদুতা [বি]। বিলীন [বিণ]—বিলয় [বি]। শুভ্র [বিণ]—শুভ্রতা [বি]। যোগী [বিণ]—যোগ [বি]। পুষ্প [বি] —পুষ্পিত [বিণ]। হীন [বিণ]—হীনতা [বি]। ভ্রান্ত [বিণ]—ভ্রান্তি [বি]। ক্ষিপ্র [বিণ]—ক্ষিপ্রতা [বি]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ বন্ধু—শত্রু। নূতন—পুরাতন। জীবন—মরণ। দিন—রাত্রি। আগমন—গমন। মুগ্ধ—ক্রুদ্ধ। বিদায়—আগমন। চিরন্তন—ইদানীন্তন। স্নিগ্ধ—রুক্ষ। মলিন—অমলিন। মৃদু—কঠিন। ভ্রান্ত—অভ্রান্ত। ক্ষিপ্র—ধীর।

লিঙ্গান্তর ॥ মুগ্ধ—মুগ্ধা। শ্যাম—শ্যামা। যোগী—যোগিনী। হিমানী—হিম।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ কেমনে—কেমন করে। কহে—বলে। আজি—আজ। হেরিয়া—দেখে। কভু—কখনো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. প্রকৃতি-প্রত্যয় নিরূপণ কর : চিরন্তন, নীলিমা, মলিন।

চিরন্তন—চিরম্‌+তন। নীলিমা—নীল+ইমন্‌+আ। মলিন—মল+ইন।

২. 'কোকনদ'—শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ লিখ। 'মধুপ'—কোন্‌ সমাস ?

কোকনদ—পদ্ম। মধুপ—মধু পান করে যে—উপপদ তৎপুরুষ।

□ অভিশাপ □

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ সৃষ্টি = সৃষ্‌+তি। অগ্ন্যদ্গার = অগ্নি+উদ্গার। উল্লাসে = উৎ+লাসে।

সমাস ॥ অন্তহীন—অন্তের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। জগৎ-স্বামী—জগতের স্বামী—ষষ্ঠীতৎ। আলো-মুখ—আলোময় মুখ—মধ্যপ-কর্মধা। ছিন্নকণ্ঠে—ছিন্ন যে কণ্ঠ —কর্মধা, তাতে। আর্তকণ্ঠে—আর্ত যে কণ্ঠ—কর্মধা, তাতে। অগ্ন্যদ্গার-উল্লাসে—অগ্নির উদ্গার—ষষ্ঠীতৎ, তার জনিত উল্লাস—মধ্যপ-কর্মধা, তাতে। নিদাঘ-দগ্ধ—

নিদাঘের দ্বারা দগ্ধ—তৃতীয়াতৎ। বজ্র-মাঝে—বজ্রের মাঝ—ষষ্ঠীতৎ, তাতে। ব্যথা-ক্রন্দন-গীতি—ব্যথাজনিত ক্রন্দন—মধ্যপ-কর্মধা, তার গীতি—ষষ্ঠীতৎ।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ অভিশাপ—অভি-শপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বিধি—বি-ধা+কি। বিধান—বি-ধা+অনট্ [ভাববা]। শক্তিমান্—শক্তি+মতুপ্। চরণ—চর্+অনট্। মরণ—মৃ+অনট্। ভগবান—ভগ+বৎ। জগৎ—গম্+ক্বিপ্ [কর্তৃবা]। স্বামী—স্ব+মিন্। ছিন্ন—ছিদ্+ক্ত [কর্মবা]। ভীরু—ভী+রু। বিধাতা—বি-ধা+তৃচ্। আর্তনাদ—আর্ত-নদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সৃষ্টি—সৃজ্+ক্তি [ভাববা]। প্রভু—প্র-ভূ+উ। উদ্গার—উৎ-গৄ+ঘঞ্ [ভাববা]। উল্লাস—উৎ-লস্+ঘঞ্ [ভাববা]। নিদাঘ—নি-দহ্+ঘঞ্। দগ্ধ—দহ্+ক্ত [কর্মবা]। শুষ্ক—শুষ্+ক্ত [কর্মবা]। বজ্র—বজ্+র [কর্তৃবা]। স্রষ্টা—সৃজ্+তৃচ্ [কর্তৃবা]। ভীতি—ভী+ক্তি [ভাববা]। ব্যথা—ব্যথ্+ঘঞ্+আ। ক্রন্দন—ক্রন্দ্+অনট্ [ভাববা]। গীতি—গৈ+ক্তি [ভাববা]।

কারক ও বিভক্তি॥ উল্লাসে—করণে 'এ' বিভক্তি। মেঘে—করণে 'এ' বিভক্তি। লোকে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন॥ অভিশাপ [বি]—অভিশপ্ত [বিণ]। বিধি [বি]—বৈধ, [বিণ]। বিধান [বি]—বিহিত [বিণ]। শক্তিমান্ [বিণ]—শক্তিমত্তা [বি]। অন্তহীন [বিণ]—অন্তহীনতা [বি]। জগৎ [বি]—জাগতিক [বিণ]। স্বামী [বিণ]—স্বামিত্ব [বি]। কালো [বিণ]—কালিমা [বি]। ভীরু [বিণ]—ভীরুতা [বি]। মহান্ [বিণ]—মহত্ব [বি]। বিপুল [বিণ]—বিপুলতা [বি]। সৃষ্টি [বি]—সৃষ্ট [বিণ]। প্রভু [বিণ]—প্রভুত্ব [বি]। উদ্গার [বি]—উদ্গীর্ণ [বিণ]। উল্লাস [বি]—উল্লসিত [বিণ]। নিদাঘ [বি]—নিদগ্ধ [বিণ]। দগ্ধ [বিণ]—দাহ [বি]। শুষ্ক [বিণ]—শুষ্কতা [বি]। ভীতি [বি]—ভীত [বিণ]। ব্যথা [বি]—ব্যথিত [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ॥ অভিশাপ—আশীর্বাদ। শক্তিমান্—শক্তিহীন। ভগবান—ভক্ত। আদি—অন্ত। ভীরু—সাহসী। প্রভু—ভৃত্য। হাসি—কান্না। শুষ্ক—আর্দ্র।

আধুনিক গদ্যরূপ॥ মম—আমার। জাগিনু—জাগলাম। করি'—করে'। গুমরি'—গুমরে। মোর—আমার। আজি—আজ। শুনি'—শুনে'। অট্টহাসিনু—অট্টহাস্য করলাম। বজ্র-মাঝে—বজ্রের মধ্যে। জাগানু—জাগালাম। বাজিছে—বাজছে। ঝাপটি—ঝাপটে। মোরে—আমাকে।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা। 'ছিন্নকণ্ঠ' ও 'আর্তকণ্ঠ' পদ দুটির সমাস নির্ণয় কর। অন্য সমাস করা হলে অর্থের কি পার্থক্য হয়?

ছিন্নকণ্ঠ—ছিন্ন যে কণ্ঠ—কর্মধারয় সমাস। ছিন্ন কণ্ঠ যার—বহুব্রীহি সমাস।

আর্তকণ্ঠ—আর্ত যে কণ্ঠ—কর্মধারয় সমাস। আর্ত কণ্ঠ যার—বহুব্রীহি সমাস।

ঔরংজীব ও জাহানারা

সন্ধি-বিচ্ছেদ ॥ প্রাহ্ণ=প্র+অহ্ন। সিংহাসনারূঢ়=সিংহ+আসন+আরূঢ়। সৈন্যাধ্যক্ষগণ=সৈন্য+অধ্যক্ষগণ। যশোবন্ত=যশঃ+বন্ত। নির্ভর=নিঃ+ভর। কার্যাবলীর=কার্য+আবলীর। পরীক্ষা=পরি+ঈক্ষা। নির্ভীক=নিঃ+ভীক। যোধপুরাধিপতি=যোধপুর+অধিপতি। সম্রাট=সম্+রাট। পবিত্র=পূ+ইত্র। উচ্চারণ=উৎ+চারণ। জলোচ্ছ্বাস=জল+উৎ+শ্বাস। উন্মাদাগার=উৎ+মাদ+আগার। অসূর্যম্পশ্যরূপা=অসূর্যম্+পশ্যরূপা। নিঃসঙ্কোচে=নিঃ+সম্+কোচে। অত্যাচারে=অতি+আচারে। দুর্বিষহ=দুঃ+বিষহ। কুত্রাপি=কুত্র+অপি। দুর্নীতির=দুঃ+নীতির। নিষ্ফল=নিঃ+ফল। সম্ভ্রম=সম্+ভ্রম। পরস্বাপহারী=পরস্ব+অপহারী। তপোবনের=তপঃ+বনের। নির্বিরোধে=নিঃ+বিরোধে। পদাঘাত=পদ+আঘাত। স্বচ্ছন্দে=স্ব+ছন্দে। উচ্ছৃঙ্খল=উৎ+শৃঙ্খল।

সমাস ॥ দরবার-কক্ষ—দরবারের নিমিত্ত কক্ষ—চতুর্থীতৎ। সিংহাসনারূঢ়—সিংহ চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা; তাতে আরূঢ়—সপ্তমীতৎ। সৈন্যাধ্যক্ষগণ—সৈন্যদের অধ্যক্ষ—ষষ্ঠীতৎ; তাদের গণ—ষষ্ঠীতৎ। দেহরক্ষী—দেহকে রক্ষা করে যে—উপপদতৎ। মহারাজ—মহান্ যে রাজা—কর্মধা। নর্মদাযুদ্ধে—নর্মদায় সংঘটিত যুদ্ধ—মধ্যপ-কর্মধা, তাতে। অপ্রীতিভাজন—নয় প্রীতি—নঞ্‌তৎ; তার ভাজন—ষষ্ঠীতৎ। রাজভক্তি—রাজাকে ভক্তি—দ্বিতীয়াতৎ। কার্যাবলীর—কার্যের আবলী—ষষ্ঠীতৎ; তার। সাধ্যমত—সাধ্যকে অতিক্রম না করে—অব্যয়ীভাব। নির্ভীক—নেই ভয় যার—নঞ বহুব্রী। ভারতসম্রাট—ভারতের সম্রাট—ষষ্ঠীতৎ। যোধপুরাধিপতি—যোধপুরের অধিপতি—ষষ্ঠীতৎ। সমরক্ষেত্রে—মরের সহিত বর্তমান—ষষ্ঠীতৎ; সমরের নিমিত্ত ক্ষেত্র—চতুর্থীতৎ; তাতে। পথশ্রান্ত—পথের নিমিত্ত শ্রান্ত—চতুর্থীতৎ। হীনবল—হীন বল যার—বহুব্রী। রক্তবর্ণ—রক্ত বর্ণ যার—বহুব্রী। বন্য-শৃগাল—বন্য যে শৃগাল—কর্মধা। মহারাজদ্রোহিতা—মহান্ যে রাজা—কর্মধা; তার দ্রোহিতা—ষষ্ঠীতৎ। ভূমিকম্প—ভূমির কম্প—ষষ্ঠীতৎ। জলোচ্ছ্বাস—জলের উচ্ছ্বাস—ষষ্ঠীতৎ। অগ্নিদাহ—অগ্নির দ্বারা দাহ—তৃতীয়াতৎ। রাজসভা—রাজার সভা—ষষ্ঠীতৎ। উন্মাদাগার—উন্মাদের নিমিত্ত আগার—চতুর্থীতৎ। হর্ম্য-রাজি—হর্ম্যের রাজি—ষষ্ঠীতৎ। অসূর্যম্পশ্যরূপা—সূর্যকে যে দেখে—উপপদতৎ; নয় সূর্যম্পশ্য—নঞ্‌তৎ; তার রূপ [স্ত্রী]—ষষ্ঠীতৎ। অন্যায়-নীতি—নয় ন্যায়—নঞ্‌তৎ; তার নীতি—ষষ্ঠীতৎ। মহাবিপ্লব—মহা যে বিপ্লব—কর্মধা। রঙ্গমঞ্চ—রঙ্গের নিমিত্ত মঞ্চ—চতুর্থীতৎ। মেষশাবকগণ—মেষীর শাবক—ষষ্ঠীতৎ; তার গণ—ষষ্ঠীতৎ। অনিমেষ—নেই নিমেষ যাতে—নঞ্‌-বহুব্রী। স্বার্থসিদ্ধি—স্ব-র অর্থ—ষষ্ঠীতৎ; তার সিদ্ধি—ষষ্ঠীতৎ। দুর্নীতির—দুঃ যে নীতি—কর্মধা; তার। ধর্মনীতি—ধর্ম-বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। পিতৃদ্রোহী—পিতাকে দ্রোহ করে যে—উপপদতৎ। পরস্বাপহারী—পরের স্ব—ষষ্ঠীতৎ;

তা অপহরণ করে যে—উপপদতৎ। বিজয়-দুন্দুভি—বিজয়সূচক দুন্দুভি—মধ্যপ-কর্মধা। তপোবন—তপের নিমিত্ত বন—চতুর্থীতৎ। রক্তাক্ত—রক্তের দ্বারা আক্ত—তৃতীয়াতৎ। পদাঘাত—পদের দ্বারা আঘাত—তৃতীয়াতৎ। মহাদায়িত্ব—মহা যে দায়িত্ব—কর্মধা। অরাজক—নেই রাজা যার—বহুব্রী। ধর্মহীন—ধর্মের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। রাজমুকুট—রাজার মুকুট—ষষ্ঠীতৎ। বিশৃঙ্খল—শৃঙ্খলার অভাব—অব্যয়ীভাব। মহাতীর্থের—মহা যে তীর্থ—কর্মধা; তার। নির্বাক্—নেই বাক্ যার—নঞ্-বহুব্রী।

প্রকৃতি-প্রত্যয়॥ আরূঢ়—আ-রুহ্+ক্ত [কর্তৃবা]। বিরুদ্ধ—বি-রুধ্+ক্ত [কর্মবা]। সাহায্য—সহায়+ষ্ণ্য। প্রবৃত্তি—প্র-বৃত্+ক্তি [ভাববা]। অপ্রীতিভাজন নঞ্-প্রীতি [প্রী+ক্তি]-ভজ্+ণিচ্+অনট্। ভক্তি—ভজ্+ক্তি [ভাববা]। নিদর্শন—নি-দৃশ্+অনট্ [ভাববা]। আত্মীয়—আত্মন্+ঈয়। গণ্য—গণ্+ণ্যৎ। ভিখারী—ভিখ্+আরী। উদ্দেশ্য—উৎ-দিশ্+ণ্যৎ। জিজ্ঞাসা—জ্ঞা+সন্+ঘঞ্+আ। অপরাধ—অপ-রাধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। দয়ালু—দয়া+আলু। বন্দী—বন্দ্+ইন্। স্বত্ব—স্ব+ত্ব। বর্তমান—বৃৎ+শানচ্। ভবিষ্যৎ—ভূ+স্যতৃ। আচরণ—আ-চর্+অনট্ [ভাববা]। নির্ভর—নিঃ-ভৃ+ঘঞ্ [কর্মবা]। ভিন্ন—ভিদ্+ক্ত [কর্মবা]। কর্তব্য—কৃ+তব্য। বিদ্রোহ—বি-দ্রুহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। শাসন—শাস্+অনট্। পরীক্ষা—পরি-ঈক্ষ্+ঘঞ্+আ। স্পর্ধা—স্পর্ধ্+ঘঞ্+আ। নির্ভীক—নিঃ-ভী+ক। শত্রুতা—শত্রু+তা। ভয়—ভী+অল্। পরিচয়—পরি-চি+ঘঞ্ [ভাববা]। যুদ্ধ—যুধ্+ক্ত। জয়—জি+অল্। গৌরব—গুরু+ষ্ণ। অনুকম্পা—অনু-কম্প্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। শ্রান্ত—শ্রম্+ক্ত। আক্রমণ—আ-ক্রম্+অনট্ [ভাববা]। মিলিত—মিল্+ক্ত [কর্তৃবা]। নিশ্বাস—নি-শ্বস্+ঘঞ্। বিনিময়—বি-নি-মী+ঘঞ্ [ভাববা]। শাঠ্য—শঠ+ষ্ণ্য। প্রস্তুত—প্র-স্তু+ক্ত। ধৈর্য—ধীর+ষ্ণ্য। প্রকৃতি—প্র-কৃ+ক্তি [ভাববা]। অগ্নিময়—অগ্নি+ময়ট্। স্তব্ধ—স্তন্ভ্+ক্ত। ভৃত্য—ভৃ+ক্যপ্। আজ্ঞা—আ-জ্ঞা+ক+আ। প্রভু—প্র-ভূ+উ [কর্তৃবা]। অবগুণ্ঠিতা—অব-গুণ্ঠ্+ক্ত+আ। প্রবেশ—প্র-বিশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। মিথ্যা—মিথ্+ণ্যৎ+আ। উন্মুক্ত—উৎ-মুচ্+ক্ত [কর্মবা]। মহারাজ-দ্রোহিতা—মহারাজ-দ্রোহ্+ইতচ্+আ। অভিযুক্ত—অভি-যুজ্+ক্ত [কর্মবা]। পবিত্র—পূ+ইত্র। উচ্চারণ—উৎ-চর্+অনট্ [ভাববা]। ভূমিকম্প—ভূমি-কম্প্+ঘঞ্। জলোচ্ছ্বাস—জল-উৎ-শ্বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। অগ্নিদাহ—অগ্নি-দহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। মড়ক—মর+ক। নিরীহ—নিঃ+ঈহ। উন্মাদ—উৎ-মদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আচরণ—আ-চর্+অনট্ [ভাববা]। সহ্য—সহ্+ণ্যৎ। ব্যবহার—বি-অব-হৃ+ঘঞ্। নিঃসঙ্কোচ—নিঃ-সম্+কুচ্+ঘঞ্। অবস্থা—অব-স্থা+ক+আ। অত্যাচার—অতি-আ-চর্+ঘঞ্ [ভাববা]। নীতি—নী+ক্তি [ভাববা]। মহাবিপ্লব—মহা-বি-প্লু+ঘঞ্ [ভাববা]। দুর্বিষহ—দুঃ-বি-সহ্+ঘঞ্। অভিনীত—অভি-নী+ক্ত [কর্মবা]। ধর্ম—ধৃ+ম [কর্মবা]। প্লাবন—প্লু+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। মনুষ্যত্ব—মনুষ্য+ত্ব। সিদ্ধি—সিধ্+ক্তি [ভাববা]। জীবিত—জীব্+ক্ত

[কর্তৃবা]। অস্বীকৃত—নঞ্-স্ব-অভূততদ্ভাবে চি্+কৃ+ক্ত। ক্রন্দন—ক্রন্দ্+অনট্। নিবেদন—নি-বিদ্+অনট্ [ভাববা]। সঙ্কোচ—সম্-কুচ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বৎসল—বৎস+ল। পিতৃদ্রোহী—পিতৃ-দ্রুহ্+ইন। অপহারী—অপ-হৃ+ইন্। সূর্য—সৃ+ণ্যৎ [কর্তৃবা]। পুত্র—পুৎ-ত্রৈ+ক। সম্বন্ধ—সম্-বন্ধ্+ঘঞ্। বিজয়—বি-জি+ঘঞ্ [ভাববা]। শান্তি—শম্+ক্তি। নির্বিরোধ—নিঃ-বি-রুধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। স্নেহ—স্নিহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। ভক্তি—ভজ্+ক্তি [ভাববা]। নিক্ষেপ—নি-ক্ষিপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আঘাত—আ-হন+ঘঞ্। রুগ্ণ—রুজ্+ক্ত। দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণা+ত্য। প্রয়োজন—প্র-যুজ্+অনট্ [ভাববা]। দায়িত্ব—দায়ী+ত্ব। আপত্তি—আ-পদ্+ক্তি। বিশ্বাস—বি-শ্বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। সম্মতি—সম্-মন+ক্তি। অনুরোধ—অনু-রুধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পুরস্কার—পুরঃ-কৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। শাস্তি—শাস+ক্তি। অরাজক—নঞ্-রাজন+ক। জাগ্রত [অশুদ্ধ ; শুদ্ধরূপ—জাগ্রৎ]—জাগৃ+শতৃ। সৌভাগ্য—সুভগ্+ষ্ণ্য। অভিপ্রায়—অভি-প্র-ই+ঘঞ্ [ভাববা]। চমৎকার—চমৎ-কৃ+ঘঞ্। প্রশংসা—প্র-শনস+ঘঞ্+আ।

কারক ও বিভক্তি ॥ নিঃশ্বাসে—করণে 'এ' বিভক্তি। জিহ্বায়—করণে 'য়' বিভক্তি। ক্রোধে—নিমিত্তে 'এ' বিভক্তি। ভূমিকম্পে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিঃসঙ্কোচে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। অত্যাচারে—করণে 'এ' বিভক্তি। নেত্রে—করণে 'এ' বিভক্তি। চাবুকে—করণে 'এ' বিভক্তি। প্লাবনে—করণে 'এ' বিভক্তি। পাপে—করণে 'এ' বিভক্তি। ঔরংজীবের [ভয়]—অপাদানে 'এর' বিভক্তি। সুখে-স্বচ্ছন্দে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। বিস্ময়ে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি।

পদ-পরিবর্তন ॥ স্থান [বি]—স্থানীয় [বিণ]। আরূঢ় [বিণ]—আরোহণ [বি]। বিরুদ্ধ [বিণ]—বিরোধ [বি]। সাহায্য [বি]—সহায় [বিণ]। প্রবৃত্তি [বি]—প্রবৃত্ত [বিণ]। পক্ষ [বি]—পক্ষীয় [বিণ]। আত্মীয় [বিণ]—আত্মীয়তা [বি]। দয়া [বি]—দয়ালু [বিণ]। উদ্দেশ্য [বি]—উদ্দিষ্ট [বিণ]। জিজ্ঞাসা [বি]—জিজ্ঞাসু, জিজ্ঞাসিত [বিণ]। দয়ালু [বিণ]—দয়া [বি]। বন্দী [বিণ]—বন্দিত্ব [বি]। আচরণ [বি]—আচরিত, আচরণীয় [বিণ]। নির্ভর [বিণ]—নির্ভরতা [বি]। মুক্ত [বিণ]—মুক্তি [বি]। স্বতন্ত্র [বিণ]—স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা [বি]। বিদ্রোহ [বি]—বিদ্রোহী [বিণ]। শাসন [বি]—শাসিত [বিণ]। পরীক্ষা [বি]—পরীক্ষিত [বিণ]। স্পর্ধা [বি]—স্পর্ধিত [বিণ]। নির্ভীক [বিণ]—নির্ভীকতা [বি]। অধিপতি [বিণ]—আধিপত্য [বি]। শত্রুতা [বি]—শত্রু [বিণ]। পরিচয় [বি]—পরিচিত [বিণ]। যুদ্ধ [বি]—যোদ্ধা [বিণ]। পথশ্রান্ত [বিণ]—পথশ্রান্তি [বি]। আক্রমণ [বি]—আক্রান্ত [বিণ]। মিলিত [বিণ]—মিলন [বি]। শাঠ্য [বি]—শঠ [বিণ]। প্রস্তুত [বিণ]—প্রস্তুতি [বি]। ধৈর্য [বি]—ধীর [বিণ]। ধাতু [বি]—ধাতব [বিণ]। চক্ষু [বি]—চাক্ষুষ [বিণ]। সমান [বিণ]—সামান্য [বি]। তুচ্ছ [বিণ]—তুচ্ছতা, তাচ্ছিল্য, তাচ্ছল্য [বি]। স্তব্ধ [বিণ]—স্তব্ধতা [বি]। বন্ধ্য [বিণ]—বন্ধ্যতা [বি]।

প্রভু [বিণ]—প্রভুত্ব [বি]। ভারত [বি]—ভারতীয় [বিণ]। অবগুণ্ঠিতা [বিণ] —অবগুণ্ঠন [বি]। বীর [বিণ]—বীরত্ব, বীর্য [বি]। মানুষ [বি]—মানুষিক [বিণ]। মহারাজদ্রোহিতা [বি]—মহারাজদ্রোহী [বিণ]। অভিযুক্ত [বিণ]— অভিযোগ [বি]। ঈশ্বর [বিণ]—ঐশ্বর্য [বি]। ফকিরি [বি]—ফকির [বিণ]। ভণ্ড [বি]—ভণ্ডামি [বিণ]। পবিত্র [বিণ]—পবিত্রতা [বি]। উচ্চারণ [বি] —উচ্চারিত, উচ্চার্য [বিণ]। অগ্নিদাহ [বি]—অগ্নিদগ্ধ [বিণ]। মার্জনা [বি]— মার্জিত [বিণ]। ক্রোধ [বি]—ক্রুদ্ধ [বিণ]। ব্যবহার [বি]—ব্যবহৃত [বিণ]। সংকোচ [বি]—সঙ্কুচিত [বিণ]। অত্যাচার [বি]—অত্যাচারী, অত্যাচারিত [বিণ]। সাম্রাজ্য [বি]—সাম্রাজ্যিক [বিণ]। নিয়ম [বি]—নিয়মিত [বিণ]। নীতি [বিণ]—নৈতিক [বি]। মহাবিপ্লব [বি]—মহাবৈপ্লবিক [বিণ]। দুর্বিষহ [বিণ]—দুর্বিষহতা [বি]। অভিনীত [বিণ]—অভিনয় [বি]। ধর্ম [বি]— ধর্মীয়, ধার্মিক [বিণ]। প্লাবন [বি]—প্লাবিত [বিণ]। ন্যায় [বি]—ন্যায্য, নৈয়ায়িক [বিণ]। বিবেক [বি]—বিবেকবান [বিণ]। অস্বীকৃত [বিণ]— অস্বীকার [বি]। নিষ্ফল [বিণ]—নিষ্ফলতা [বি]। নিবেদন [বি]—নিবেদিত [বিণ]। লজ্জা [বি]—লজ্জিত [বিণ]। সম্ভ্রম [বি]—সম্ভ্রান্ত [বিণ]। বৃদ্ধ [বিণ]—বার্ধক্য [বি]। পিতৃদ্রোহী [বিণ]—পিতৃদ্রোহিতা [বি]। পরস্বাপহারী [বিণ]—পরস্বাপহরণ [বি]। লুণ্ঠ [বি]—লুণ্ঠিত [বিণ]। চন্দ্র [বি]—চান্দ্র [বিণ]। সূর্য [বি]—সৌর [বিণ]। স্নেহ [বি]—স্নিগ্ধ [বিণ]। পঙ্ক [বি] —পঙ্কিল [বিণ]। স্থবির [বিণ]—স্থবিরতা [বি]। অক্ষম [বিণ]—অক্ষমতা [বি]। স্বচ্ছন্দ [বিণ]—স্বাচ্ছন্দ্য [বি]। বিশ্বাস [বি]—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী [বিণ]। সম্মত [বিণ]—সম্মতি [বি]। ক্রম [বি]—ক্রমিক [বিণ]। পুরস্কার [বি] —পুরস্কৃত [বিণ]। অনুরোধ [বি]—অনুরুদ্ধ [বিণ]। বঞ্চিত [বিণ]—বঞ্চনা [বি]। অরাজক [বিণ]—অরাজকতা [বি]। ধর্মহীন [বিণ]—ধর্মহীনতা [বি]। নিস্তব্ধ [বিণ]—নিস্তব্ধতা [বি]। বিশৃঙ্খল [বিণ]—বিশৃঙ্খলতা [বি]। পীড়ন [বি]—পীড়িত [বিণ]। দণ্ড [বি]—দণ্ডিত [বিণ]। গ্রহণ [বি]— গৃহীত [বিণ]। উচ্ছৃঙ্খল [বিণ]—উচ্ছৃঙ্খলতা [বি]। অভিপ্রায় [বি]— অভিপ্রেত [বিণ]। চমৎকার [বি]—চমৎকৃত [বিণ]। প্রশংসা [বি]— প্রশংসিত [বিণ]। বিস্ময় [বি]—বিস্মিত [বিণ]। প্রতিজ্ঞা [বি]—প্রতিজ্ঞ [বিণ]।

বিপরীতার্থক শব্দ ॥ প্রাহ্ন—পরাহ্ন। যুদ্ধ—শান্তি। প্রবৃত্তি—নিবৃত্তি। অপ্রীতিভাজন—প্রীতিভাজন। অনাত্মীয়—আত্মীয়। জিজ্ঞাসা—উত্তর। দয়ালু— নির্দয়। বন্দী—মুক্ত। নির্ভীক—ভীরু। শত্রুতা—বন্ধুত্ব। জয়—পরাজয়। প্রভু— ভৃত্য। মিথ্যা—সত্য। প্রকাশ্য—গোপন। নিয়ম—অনিয়ম। পাপ—পুণ্য। স্বার্থ— নিঃস্বার্থ, পরার্থ। জীবিত—মৃত। নিষ্ফল—সফল। বীর—কাপুরুষ। উত্তম— অধম। রুগ্‌ণ—নীরোগ। শত্রু—মিত্র। সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য। প্রশংসা—নিন্দা।

লিঙ্গান্তর ॥ সিংহ—সিংহী। আত্মীয়—আত্মীয়া। মহারাজ—মহারানী।

ভিখারী—ভিখারিনী। বন্দী—বন্দিনী। সম্রাট—সম্রাজ্ঞী। বিদ্রোহী—বিদ্রোহিণী। বাদশাহ্—বেগম। কন্যা—পুত্র। ঈশ্বর—ঈশ্বরী। উন্মাদিনী—উন্মাদ। পিতা—মাতা। মহিলা—পুরুষ। ভগ্নী—[অশুদ্ধ ; শুদ্ধরূপ—ভগিনী]—ভ্রাতা। বৃদ্ধ—বৃদ্ধা।

সার্থক বাক্য-রচনা॥ **সিংহাসনারূঢ়**—প্রজারা গিয়ে সিংহাসনারূঢ় সম্রাটকে একে একে অভিবাদন জানালো। **অমাত্যবর্গ**—সম্রাটের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অমাত্যবর্গ যে যার আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হলেন। **গমনোদ্যত**—সম্রাটের আদেশে গমনোদ্যত অমাত্যগণ যে যার নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। **অনুকম্পাভরে**—মহাপুরুষেরা শত্রুকেও অনুকম্পাভরে ক্ষমা করেন। **সম্মতিক্রমে**—সম্রাটের সম্মতিক্রমে দূত প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করেছিল। **ইচ্ছাক্রমে**—পিতার ইচ্ছাক্রমে তাকে বিদেশযাত্রা স্থগিত রাখতে হলো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা॥ ১. চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে ?—'রাঙাচ্ছেন' ক্রিয়াপদটির সম্যক্ পরিচয় দাও।

রাঙাচ্ছেন = রাঙা [বিশেষণ পদ] + আ [নামধাতু প্রত্যয়] + ইতেছেন [ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়াপ্রত্যয়—সম্ভ্রমসূচক]।

২. 'তোমরা ঔরংজীবের ভয় করছ ?'—'ঔরংজীবের' পদটির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর।

'ভয়' শব্দযোগে 'ঔরংজীবের' পদটিতে অপাদানে 'এর' বিভক্তি।

৩. 'আস্পর্ধা' শব্দটির প্রারম্ভিক 'আ' ধ্বনির পরিচয় কি ?

'স্পর্ধা' শব্দটির আদি বর্ণ 'স্প' যুক্ত ব্যঞ্জন হওয়ায় উচ্চারণের সুবিধার জন্যে তার পূর্বে 'আ' এই স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে। এটি আদি-স্বরাগমের দৃষ্টান্ত।

▭ গান্ধারীর আবেদন ▭

সন্ধি-বিচ্ছেদ॥ দুর্যোধন = দুঃ + যোধন। দুরাশয় = দুঃ + আশয়। অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট। দুর্মতি = দুঃ + মতি। সঞ্জাত = সম্ + জাত। শশাঙ্ক = শশ + অঙ্ক। শঙ্কাকুল = শঙ্কা + আকুল। যশোবিম্ব = যশঃ + বিম্ব। উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল। মধ্যাহ্নের = মধ্য + অহ্নের। উদয় = উৎ + অয়। বনস্পতি = বন + পতি। ব্যবধান = বি + অবধান। নির্ভর = নিঃ + ভর। একেশ্বর = এক + ঈশ্ + বর। দুশ্চিন্তার = দুঃ + চিন্তার। অহর্নিশি = অহঃ + নিশি [শুদ্ধরূপ—অহর্নিশ]। দুর্বলতা = দুঃ + বলতা। সমুদ্ধত = সম্ + উৎ + হত। চরিতার্থ = চরিত + অর্থ। অহংকারী = অহম্ + কারী। সমুচ্চ = সম্ + উচ্চ। নিরুত্তরে = নিঃ + উত্তরে। নির্বাচন = নিঃ + বাচন। স্বেচ্ছায় = স্ব + ইচ্ছায়। অধীন = অধি + ইন। সিংহাসন = সিংহ + আসন। ভারাক্রান্ত = ভার + আক্রান্ত। কালানল = কাল + অনল। মহারণ্য = মহা + অরণ্য। অন্তর্যামী = অন্তঃ + যামী। জয়োৎসবে = জয় + উৎসবে। কালান্তক = কাল + অন্তক। সন্ধ্যার্চনা = সন্ধ্যা + অর্চনা। চতুষ্পথে = চতুঃ + পথে। প্রতীক্ষিয়া = প্রতি + ঈক্ষিয়া। শোকাতুর = শোক + আতুর। দুর্দিন = দুঃ + দিন। নির্বিষ = নিঃ + বিষ। ব্যর্থ = বি + অর্থ। নিরস্ত্র = নিঃ + অস্ত্র।

সাধ্বী=সাধু+ঈ। সমুদ্যত=সম্+উদ্যত। অহরহ=অহঃ+অহ। অত্যাচারে=অতি+আচারে। উচ্ছ্বসিয়া=উৎ+শ্বসিয়া। ধর্মাধর্ম=ধর্ম+অধর্ম। বারেক=বার+এক। নিষ্পাপেরে=নিঃ+পাপেরে। সমর্পিত=সম্+অর্পিত। নিরুপায়=নিঃ+উপায়। গবাক্ষে=গো+অক্ষে [নিপাতনে]। নিশ্চল=নিঃ+চল। উদ্ধার=উৎ+হার। পদাহত=পদ+আহত। নিষ্ফল=নিঃ+ফল। নির্বিচারে=নিঃ+বিচারে। নিরবধি=নিঃ+অবধি। নির্মমতা=নিঃ+মমতা। উন্মত্ত=উৎ+মত্ত। দুর্গতির=দুঃ+গতির। নীরবে=নিঃ+রবে। নির্বাক=নিঃ+বাক। নির্মম=নিঃ+মম। নিবৃ'তি=নিঃ+বৃতি। মহোৎসব=মহা+উৎসবে। সমাগত=সম্+আগত। যুগান্তরে=যুগ+অন্তরে। বজ্রানলশিখা=বজ্র+অনলশিখা। উন্মাদিনী=উৎ+মাদিনী। শঙ্করীর=শম্+করীর। দুর্ভাগ্যের=দুঃ+ভাগ্যের। মধ্যাহ্ন=মধ্য+অহ্ন। বীরাঙ্গনা=বীর+অঙ্গনা। দুর্দিন=দুঃ+দিন। দুর্যোগ=দুঃ+যোগ। উন্মোচন=উৎ+মোচন। নবরক্তাম্বর=নবরক্ত+অম্বর। পুরোহিতে=পুরঃ+হিতে। যুধিষ্ঠির=যুধি+স্থির। আশীর্বাদ=আশীঃ+বাদ। সঞ্চয়=সম্+চয়। নির্ভয়=নিঃ+ভয়। সংযোগ=সম্+যোগ। পুত্রাধিক=পুত্র+অধিক। জগন্ময়=জগৎ+ময়। কুলাঙ্গনা=কুল+অঙ্গনা। অরণ্য=অ+অন্য। সর্বৈশ্বর্যময়=সর্ব+ঐশ্বর্যময়।

সমাস॥ দুর্যোধন—দুঃ যোধন যার সঙ্গে—বহুব্রী। দুরাশয়—দুঃ [মন্দ] আশয় যার—বহুব্রী। ধৃতরাষ্ট্র—ধৃত রাষ্ট্র যার কর্তৃক—বহুব্রী। দুর্মতি—দুঃ মতি যার বহুব্রী। মহারাজ—মহৎ রাজা—কর্মধা। দীপ্তজ্বালা—দীপ্ত জ্বালা যাতে—বহুব্রী। অগ্নিঢালা—অগ্নি ঢালে যা—উপপদতৎ। জয়রস—জয়রূপ রস—রূপক-কর্মধা। ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত—ঈর্ষারূপ সিন্ধু—রূপক-কর্মধা; তার মন্থন—ষষ্ঠীতৎ; তা থেকে সঞ্জাত—পঞ্চমীতৎ। শশাঙ্ক—শশ অঙ্কে যার—বহুব্রী। কর্মহীন—কর্মের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। শঙ্কাকুল—শঙ্কার দ্বারা আকুল—তৃতীয়াতৎ। জয়দৃপ্ত—জয়ের দ্বারা দৃপ্ত—তৃতীয়াতৎ। ভোগসুখে—ভোগ ও সুখ—দ্বন্দ্ব; তাতে। নিশ্চিন্ত—নেই চিন্তা যার—নঞ্-বহুব্রী। অনন্ত—নেই অন্ত যার—বহুব্রী। জয়ধ্বনি—জয়সূচক ধ্বনি—মধ্যপ-কর্মধা। যশোবিম্ব-প্রতিবিম্ব—বিম্বের সদৃশ—অব্যয়ীভাব; বিম্ব ও প্রতিবিম্ব—দ্বন্দ্ব; যশের বিম্বপ্রতিবিম্ব—ষষ্ঠীতৎ। প্রতিধ্বনিরবে—ধ্বনির পশ্চাৎ—অব্যয়ীভাব; তার রব—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। সর্বতেজ—সর্ব তেজ—কর্মধা। পাণ্ডব-গৌরবতলে—পাণ্ডবের গৌরব—ষষ্ঠীতৎ; তার তল—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। স্নিগ্ধশান্তরূপে—যা স্নিগ্ধ, তাই শান্ত—কর্মধা; তার রূপ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। ভ্রাতৃদ্রোহ—ভ্রাতার দ্রোহ [শত্রুতা]—ষষ্ঠীতৎ। শশধর—শশকে ধারণ করে যে—উপপদতৎ। পূর্ব-উদয়-শিখরে—উদয়ের নিমিত্ত শিখর—কর্মধা; পূর্ব উদয় শিখর—কর্মধা। ভ্রাতৃসূর্যলোক—সূর্যের লোক—ষষ্ঠীতৎ; ভ্রাতারূপ সূর্যলোক—রূপক-কর্মধা। সুমহতী—প্রাদিতৎ। বনস্পতি—বনের পতি—ষষ্ঠীতৎ। সৌভ্রাত্র-বন্ধন—সৌভ্রাত্রের বন্ধন—ষষ্ঠীতৎ। পাণ্ডু-চন্দ্রলেখা—পাণ্ডুরূপ চন্দ্র—রূপক-কর্মধা; তার দ্বারা লেখা—তৃতীয়াতৎ। কুরুসূর্য—কুরুরূপ সূর্য—রূপক-কর্মধা। সহায়-সুহৃদ্রূপে—সু হৃৎ যার—বহুব্রী; যে সহায়, সেই সুহৃদ্—কর্মধা; তার রূপ

—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। নির্ভরবন্ধন—নির্ভর যে বন্ধন—কর্মধা। একেশ্বর—এক যে ঈশ্বর—কর্মধা। মহাশত্রু—মহৎ শত্রু—কর্মধা। চিরবিঘ্ন—চির ব্যাপ্ত করে বিঘ্ন—দ্বিতীয়াতৎ। অহর্নিশি [অশুদ্ধ]—অহঃ ও নিশা—দ্বন্দ্ব [শুদ্ধরূপ—অহর্নিশ]। যশঃশক্তি-গৌরবের—যশঃ, শক্তি ও গৌরব—দ্বন্দ্ব; তার। অংশ-অপহারী—অংশ অপহরণ করে যে—উপপদতৎ। চরিতার্থ—চরিত অর্থ যার—বহুব্রী। পাণ্ডবগৌরব-গিরি—পাণ্ডবের গৌরব—ষষ্ঠীতৎ; পাণ্ডবগৌরব-রূপ গিরি—রূপক-কর্মধা। আত্ম-সমর্পণ—আত্মকে সমর্পণ—দ্বিতীয়াতৎ। নিন্দাধ্বনি—নিন্দাপূর্ণ ধ্বনি—মধ্যপ-কর্মধা। কণ্ঠরুদ্ধ—কণ্ঠকে রুদ্ধ—দ্বিতীয়াতৎ। পাদপীঠতলে—পাদের পীঠ—ষষ্ঠীতৎ; তার তল—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। ক্রূরমনা—ক্রূর মন যার—বহুব্রী। আপামর—পামর পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব। বিষতিক্ত—বিষের ন্যায় তিক্ত—উপমান-কর্মধা। হৃদয়দুর্গে—হৃদয়রূপ দুর্গ—রূপক-কর্মধা; তাতে। প্রীতিমন্ত্রবলে—প্রীতি-রূপ মন্ত্র—রূপক-কর্মধা; তার বল—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। নিন্দাসর্পদলে—নিন্দারূপ সর্প—রূপক-কর্মধা; তার দল—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। অব্যক্ত—নয় ব্যক্ত—নঞ্‌তৎ। ভ্রূক্ষেপ—ভ্রূ-র ক্ষেপ—ষষ্ঠীতৎ। প্রীতিদান—প্রীতিকে দান—দ্বিতীয়াতৎ। স্বেচ্ছার—স্ব-র ইচ্ছা—ষষ্ঠীতৎ, তার। প্রীতিভিক্ষা—প্রীতিকে ভিক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ। পিতৃদেব—যিনি পিতা, তিনিই দেব—কর্মধা। সিংহাসন—সিংহ-চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা। কণ্টকতরু—কণ্টকময় তরু—মধ্যপ-কর্মধা। নিত্যগুণগান—গুণের গান—ষষ্ঠীতৎ; নিত্য ব্যাপ্ত করে গুণগান—দ্বিতীয়াতৎ। চিরনির্বাসিত—চির ব্যাপ্ত করে নির্বাসিত—দ্বিতীয়াতৎ। হীনবল—হীন বল যার—বহুব্রী। পিতৃস্নেহ-স্রোতে—পিতার স্নেহ—ষষ্ঠীতৎ; তার রূপ স্রোত—রূপক-কর্মধা; তাতে। নষ্টপ্রাণ—নষ্ট প্রাণ যার—বহুব্রী। গতিশক্তিহীন—গতির শক্তি—ষষ্ঠীতৎ; তার দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। প্রতিহস্ত—হস্তের সদৃশ—অব্যয়ীভাব। অবাধগতি—নয় বাধা—নঞতৎ, অবাধ গতি যার—বহুব্রী। হিতকথা—হিত যে কথা—কর্মধা। রাজকর্মডোর—রাজার কর্ম—ষষ্ঠীতৎ; তার রূপ ডোর—রূপক-কর্মধা। সিংহাসনকণ্টকশয়নে—সিংহ-চিহ্নিত আসন—মধ্যপ-কর্মধা; কণ্টকপূর্ণ শয়ন—মধ্যপ-কর্মধা; সিংহাসন-রূপ কণ্টকশয়ন—রূপক-কর্মধা। ভারাক্রান্ত—ভারের দ্বারা আক্রান্ত। সুকঠোর—সু কঠোর—প্রাদিতৎ। সুহৃদের—সু হৃৎ যার—বহুব্রী; তার। নিন্দাবাক্য—নিন্দাপূর্ণ বাক্য—মধ্যপ-কর্মধা। কালানল—কাল-রূপ অনল—রূপক-কর্মধা। কুরুবংশ-মহারণ্যতলে—কুরুর বংশ ষষ্ঠীতৎ; মহৎ অরণ্য—কর্মধা; কুরুবংশ-রূপ মহারণ্য—রূপক-কর্মধা; তার তল—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। মণিলোভে—মণির লোভ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। কালসর্প—কাল-রূপ সর্প—রূপক-কর্মধা। চিরদিন—চির ব্যাপ্ত করে দিন—দ্বিতীয়াতৎ। প্রলয়-তিমিরে—প্রলয়-রূপ তিমির—রূপক-কর্মধা। নিশাচর—নিশায় চরে যে—উপপদতৎ। অন্তর্যামী—অন্তরে গমন করেন যিনি—উপপদতৎ। জয়বাদ্য—জয়সূচক বাদ্য—মধ্যপ-কর্মধা। জয়ধ্বজা—জয়সূচক ধ্বজা—মধ্যপ-কর্মধা। জয়োৎসব—জয়সূচক উৎসব—মধ্যপ-কর্মধা। লোকলজ্জা-ভয়—লজ্জা ও ভয়—দ্বন্দ্ব; লোক থেকে লজ্জাভয়—পঞ্চমীতৎ। কুরুবংশরাজলক্ষ্মী—কুরুর বংশ—ষষ্ঠীতৎ; রাজার লক্ষ্মী—ষষ্ঠীতৎ; কুরুবংশের রাজলক্ষ্মী—ষষ্ঠীতৎ। কালান্তক—যা কাল তাই অন্তক—

কর্মধা। অগ্নিহোত্র—অগ্নিতে হোম করে যে—উপপদতৎ। দেব-উপাসনা—দেবকে উপাসনা—চতুর্থীতৎ। সন্ধ্যার্চনা—সন্ধ্যাকালীন অর্চনা—মধ্যপ-কর্মধা। চতুষ্পথে—চতুঃ পথের সমাহার—দ্বিগু। ভৈরবমন্দিরমাঝে—ভৈরবের নিমিত্ত মন্দির—চতুর্থীতৎ; তার মাঝ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। সন্ধ্যাভেরী—সন্ধ্যাকালীন ভেরী—মধ্যপ-কর্মধা। শোকাতুর—শোকের দ্বারা আতুর—তৃতীয়াতৎ। দীনবেশে—দীন যে বেশ—কর্মধা; তাতে। সজলনয়নে—জলের সহিত বর্তমান—বহুব্রী; সজল যে নয়ন—কর্মধা; তাতে। ভাগ্যহীন—ভাগ্যের দ্বারা হীন—তৃতীয়াতৎ। নির্বিষ—নেই বিষ যার—নঞ্-বহুব্রী। ফণা-আস্ফালন—ফণার আস্ফালন—ষষ্ঠীতৎ। দর্শন-প্রার্থিনী—দর্শন প্রার্থনা করেন যিনি—উপপদতৎ [স্ত্রী]। পুণ্যভীত—পুণ্য থেকে ভীত—পঞ্চমীতৎ। শ্রীচরণে—শ্রীযুক্ত চরণ—মধ্যপ-কর্মধা; তাতে। রাজমাতা—রাজার মাতা—ষষ্ঠীতৎ। কুরুকুল-পিতৃপিতামহ—কুরুর কুল—ষষ্ঠীতৎ; তার পিতা—ষষ্ঠীতৎ; তার পিতামহ—ষষ্ঠীতৎ। অহরহ—অহঃ অহঃ—অব্যয়ীভাব। কৌরবকল্যাণলক্ষ্মী—কৌরবের কল্যাণ—ষষ্ঠীতৎ, তার লক্ষ্মী—ষষ্ঠীতৎ। অশ্রুমুখী—অশ্রুময় মুখ যার—মধ্যপ-বহুব্রী [স্ত্রী]। স্নেহবিগলিত স্নেহের দ্বারা বিগলিত—তৃতীয়াতৎ। শাখাবন্ধে—শাখার বন্ধ—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। বাহুবৃন্ত—বাহু-রূপ বৃন্ত—রূপক-কর্মধা। দ্যূতবদ্ধ—দ্যূতের দ্বারা বদ্ধ—তৃতীয়াতৎ। রাজ্যধন—রাজ্যরূপ ধন—রূপক-কর্মধা। হতভাগ্য—হত ভাগ্য যার—বহুব্রী। অপমানক্ষত—অপমান-রূপ ক্ষত—রূপক-কর্মধা। সক্ষমে—ক্ষমতার সহিত বর্তমান—বহুব্রী; তাতে। দ্যূত-ছলনায়—দ্যূতের ছলনা—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। মূঢ়নারী—মূঢ়া যে নারী—কর্মধা। মহারাজ্য—মহৎ রাজ্য—কর্মধা। মধুমাখা—মধু মেখেছে যে—উপপদতৎ। বিষফল—বিষযুক্ত ফল—মধ্যপ-কর্মধা। ছললব্ধ—ছলের দ্বারা লব্ধ—তৃতীয়াতৎ। পাপস্ফীত—পাপের দ্বারা স্ফীত—তৃতীয়াতৎ। ধর্মরক্ষা-কাজ—ধর্মকে রক্ষা—দ্বিতীয়াতৎ; তার কাজ—ষষ্ঠীতৎ। দণ্ডনীতি—দণ্ড বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। ভেদনীতি—ভেদ-বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। কূটনীতি—কূট-বিষয়ক নীতি—মধ্যপ-কর্মধা। বিদ্বেষ-অনল—বিদ্বেষ-রূপ অনল—রূপক-কর্মধা। নিরুপায়—নেই উপায় যার—নঞ্-বহুব্রী। গৃহধর্ম-চারিণীর—গৃহের ধর্ম—ষষ্ঠীতৎ; তা চারণ করে যে—উপপদতৎ [স্ত্রী]; তাহার। কলুষ-পরুষ—কলুষ ও পরুষ—দ্বন্দ্ব। কাপুরুষ—কু [কা] যেপুরুষ—কর্মধা। অনাথিনী—নেই নাথ যার—বহুব্রী [স্ত্রী]। আর্তকণ্ঠ রবে—আর্ত যে কণ্ঠ—কর্মধা; তার রব—ষষ্ঠীতৎ; তাতে। প্রাসাদ-পাষাণভিত্তি—পাষাণ-নির্মিত ভিত্তি—মধ্যপ-কর্মধা; প্রাসাদের পাষাণ-ভিত্তি—ষষ্ঠীতৎ। পুত্রপিশাচেরা—পুত্র পিশাচের ন্যায়—উপমিত-কর্মধা। মহারথী [অশুদ্ধ, শুদ্ধরূপ—মহারথ]—মহা যে রথী—কর্মধা। কানাকানি—কানে কানে যে কথা—ব্যতিহার বহুব্রী। বিদ্যুৎ-সমান—মানের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী। বিদ্যুতের সমান—ষষ্ঠীতৎ। নিদ্রাগত—নিদ্রাকে গত—দ্বিতীয়াতৎ। পদাহত—পদের দ্বারা আহত—তৃতীয়াতৎ। পরিতাপদহনে-জর্জর—পরিতাপ-রূপ দহন—রূপক-কর্মধা; তার দ্বারা জর্জর—অলুক তৎপুরুষ। দণ্ডদাতা—দণ্ড দেন যিনি—উপপদতৎ। দণ্ডবেদনা—দণ্ডজনিত বেদনা—মধ্যপ-কর্মধা। নিরবধি—নেই অবধি যার—নঞ্-বহুব্রী।

মোহডোর—মোহরূপ ডোর—রূপক-কর্মধা। উন্মত্ততরঙ্গ-মাঝখানে—উন্মত্ত যে তরঙ্গ—কর্মধা ; তার মাঝখানে—ষষ্ঠীতৎ। বজ্রশূল—বজ্ররূপ শূল—রূপক-কর্মধা। সভয়ে—ভয়ের সঙ্গে বর্তমান—বহুব্রী ; তাতে। মহাকালে—মহৎ যে কাল—কর্মধা ; তাতে। রথচক্রধ্বনি—রথের চক্র—ষষ্ঠীতৎ। বজ্রঘর্ঘরিত—বজ্রের দ্বারা ঘর্ঘরিত—তৃতীয়াতৎ। রুদ্রলোক—রুদ্রের নিমিত্ত লোক—চতুর্থীতৎ। রক্তশতদলে—রক্ত যে শতদল—কর্মধা ; তাতে। নির্বাক—নেই বাক্ যার—বহুব্রী। ইন্দুমুখী—ইন্দুর ন্যায় মুখ যার—উপমান-বহুব্রী। মহোৎসব—মহৎ যে উৎসব—কর্মধা। নববস্ত্র-অলংকারে—নব যে বস্ত্র—কর্মধা ; নববস্ত্র ও অলংকার—দ্বন্দ্ব ; তাতে। শত্রুপরাভবশুভক্ষণ—শত্রুর পরাভব—ষষ্ঠীতৎ ; সেই হেতু শুভ—তৃতীয়াতৎ ; তেমন ক্ষণ—কর্মধা। সূচীমুখে—সূচীময় মুখ—মধ্যপ-কর্মধা। রত্নভূষণে—রত্নময় ভূষণ—মধ্যপ-কর্মধা ; তাতে। মণিমঞ্জীর—মণিময় মঞ্জীর মধ্যপ-কর্মধা। রত্ন-ললাটিকা—রত্নময় ললাটিকা—মধ্যপ-কর্মধা। বজ্রানলশিখা—বজ্রের অনল—ষষ্ঠীতৎ ; তার শিখা—ষষ্ঠীতৎ। মধ্যাহ্নগগনে—অহনের মধ্যে—একদেশী সমাস ; মধ্যাহ্ন-কালীন গগন—মধ্যপ-কর্মধা ; তাতে। ক্ষত্রিয়-মহিমা-সূর্য—মহিমা-রূপ সূর্য—রূপক-কর্মধা ; ক্ষত্রিয়ের মহিমাসূর্য—ষষ্ঠীতৎ। বিধবার—বিগত ধব যার—বহুব্রী [স্ত্রী] ; তার। নবরক্তাম্বর—রক্ত অম্বর—কর্মধা ; নব রক্তাম্বর—কর্মধা। অগ্নিগৃহে—অগ্নির নিমিত্তগৃহ—চতুর্থীতৎ ; তাতে। শুদ্ধসত্ত্ব—শুদ্ধ সত্ত্ব যার—বহুব্রী। বহ্নিশিখাদগ্ধ—বহ্নির শিখা—ষষ্ঠীতৎ ; তার দ্বারা দগ্ধ—তৃতীয়াতৎ। সুবর্ণের—সু বর্ণ যার—বহুব্রী ; তার। পুত্রাধিক—পুত্র থেকে অধিক—পঞ্চমীতৎ। কল্যাণ-সিন্ধু—কল্যাণ-রূপ সিন্ধু—রূপক-কর্মধা। ভূলুণ্ঠিতা—ভূ-তে লুণ্ঠিতা—সপ্তমীতৎ। স্বর্ণলতা—স্বর্ণময় লতা—মধ্যপ-কর্মধা। রাহুগ্রস্ত—রাহুর দ্বারা গ্রস্ত—তৃতীয়াতৎ। শ্বেতপদ্ম—শ্বেত যে পদ্ম—কর্মধা।

প্রকৃতি-প্রত্যয় ॥ গান্ধারী—গান্ধার+ঈ। আবেদন—আ-বেদি+অনট্ [ভাববা]। দুর্যোধন—দুঃ-যুধ্+অনট্ [কর্মবা]। ধৃতরাষ্ট্র—ধৃত-রাজ্+ষ্ট্রন্ [কর্তৃবা]। পাণ্ডব—পাণ্ডু+ষ্ণ। কৌরব—কুরু+ষ্ণ। দোহন—দুহ্ + অনট্ [ভাববা]। উজ্জ্বল—উৎ-জ্বল্+ঘঞ্ [ভাববা]। গৌরব—গুরু+ষ্ণ। স্নিগ্ধ—স্নিহ্+ক্ত [কর্তৃবা]। শান্ত—শম্+ক্ত [কর্মবা]। জড়ত্ব—জড়+ত্ব। পরাভব—পরা-ভূ+অল্ [ভাববা]। ভ্রাতৃদ্রোহ—ভ্রাতৃ-দ্রুহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পিতামহ—পিতৃ+ডামহ। দ্বেষ—দ্বিষ্+অল্ [ভাববা]। উদয়—উৎ-ই+ঘঞ্ [ভাববা]। সূর্য—সৃ+যৎ [কর্তৃবা]। সৌভ্রাত্র—সুভ্রাতৃ+ষ্ণ। বন্ধন—বন্ধ্+অনট্ [ভাববা]। মলিন—মল+ইন। কিরণ—কৄ+অনট্ [কর্মবা]। অস্ত—অস্+ক্ত। ধর্ম—ধৃ+ম [কর্তৃবা]। পরাজিত—পরা-জি+ক্ত [কর্মবা]। বিঘ্ন—বি-হন্+টক্ [কর্তৃবা]। ক্ষয়—ক্ষি+ঘঞ্ [ভাববা]। দুর্বলতা—দুর্বল+তা। স্থির—স্থা+ইর [কর্তৃবা]। শাসন—শাস্+অনট্ [ভাববা]। অস্ত্র—অস্+ত্র [কর্মবা]। যুদ্ধ—যুধ্+ক্ত [ভাববা]। ব্যাঘ্র—বি-আ-ঘ্রা+অ [কর্তৃবা]। মূঢ়—মুহ্+ক্ত। নিন্দা—নিন্দ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। পরিপূর্ণ—পরি-পূর্+ক্ত [কর্মবা]। মুখরা—মুখ+র+আ [স্ত্রী]। নগরী—নগ+র+ঈ [স্ত্রী]। রসনা—রস্+অনট্ [করণবা]+আ। পাপী—পাপ+ইন্।

নিরুত্তর—নিঃ-উৎ-তৃ+ঘঞ্। স্পর্শ—স্পৃশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। নির্বাসন—নিঃ-বস্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। গূঢ়—গুহ্+ক্ত [কর্মবা]। প্রসার—প্র-সৃ+ঘঞ্ [ভাববা]। তিক্ত—তিজ্+ক্ত [কর্তৃবা]। নৃত্য—নৃত্+য [ভাববা]। শ্রান্ত—শ্রম্+ক্ত। বৃদ্ধি—বৃধ্+ক্তি। গোপন—গুপ্+অনট্ [ভাববা]। দুর্গ—দুর্-গম্+অ [কর্মবা]। প্রীতি—প্রী+ক্তি [ভাববা]। মন্ত্র—মন্ত্র্+ঘঞ্ [ভাববা]। বন্দী—বন্দ্+ইন্। সর্প—সৃপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পালিত—পা+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]। নিষ্ঠুর—নি-স্থা+উর [কর্তৃবা]। নির্বাসিত—নিঃ-বস্+ণিচ্+ক্ত [কর্মবা]। শীর্ণ—শৄ+ক্ত [কর্তৃবা]। প্রতিহত—প্রতি-হন্+ক্ত [কর্মবা]। সঞ্জয়—সম্-জি+অল্ [ভাববা]। বিজ্ঞ—বি-জ্ঞা+অ [কর্তৃবা]। উপদেশ—উপ-দিশ্+ঘঞ্ [ভাববা]। ছিদ—ছিদ্+ক্ত [কর্মবা]। ভারাক্রান্ত—ভার-আ-ক্রম্+ক্ত [কর্মবা]। অপমান—অপ-মন্+ঘঞ্ [ভাববা]। শয়ন—শী+অন্ [ভাববা]। বিনিময়—বি-নি-মী+ঘঞ্ [ভাববা]। অভিমানী—অভি-মন্+ঘঞ্+ইন্। হ্রাস—হ্রস্+ঘঞ্ [ভাববা]। যোগ—যুজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। জ্ঞান—জ্ঞা+অনট্ [ভাববা]। স্নেহ—স্নিহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পুরাতন—পুরা+তন। দোষ—দুষ্+ঘঞ্ [ভাববা]। লোভ—লুভ্+ঘঞ্ [ভাববা]। অন্ধ—অন্ধ্+ণিচ্+অ। নিষেধ—নি-সিধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। সংকীর্ণ—সম্-কৄ+ক্ত [কর্মবা]। আসন্ন—আ-সদ্+ক্ত [কর্তৃবা]। বিপদ—বি-পদ্+ক্বিপ্ [ভাববা]। কণ্টকিত—কণ্টক+ইত। আলোক—আ-লোক্+ঘঞ্। অন্তর্যামী—অন্তর-যম্+ণিচ্+ইন্ [কর্তৃবা]। আকর্ষণ—আ-কৃষ্+অনট্ [ভাববা]। চকিত—চক্+ক্ত [কর্তৃবা]। চেতনা—চিত্+অনট্ [ভাববা]+আ। সংশয়—সম্-শী+ঘঞ্ [ভাববা]। আলিঙ্গন—আ-লিঙ্গ্+অনট্। বিধাতা—বি-ধা+তৃচ্ [কর্তৃবা]। বাদ্য—বদ্+ণিচ্+য [ভাববা]। উৎসব—উৎ-সূ+ঘঞ্ · [ভাববা]। ভীষ্ম—ভী+ম [অপাদানবা]। অন্তক—অম্+ক্ত [ভাববা]+ক। অগ্নিহোত্র—অগ্নি-হু+ত্র [ভাববা]। ত্যাগ—ত্যজ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পৌর—পুর+ষ্ণ। ভৈরব—ভীরু+ষ্ণ। মন্দির—মন্দ্+ইর [অধিকরণবা]। প্রভু প্র-ভূ+উ [কর্তৃবা]। দীন—দী+ক্ত [কর্তৃবা]। ভাগ্য—ভজ্+য [কর্মবা]। পরিচয়—পরি-চি+অল্ [ভাববা]। ঘনিষ্ঠ—ঘন+ইষ্ঠ। পরম—পর+ম। স্পর্ধা—স্পর্ধ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। ব্যর্থ—বি-অর্থ্+ঘঞ্। প্রার্থিনী—প্র-অর্থ+ইন+ঈ [স্ত্রী]। প্রতীক্ষা—প্রতি-ঈক্ষ্+ঘঞ্ [ভাববা]+আ। সাধ্বী—সাধু+ঈ। জননী—জন্+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]+ঈ। দৃষ্টি—দৃশ্+ক্তি। সমুদ্যত—সম্-উৎ-যম্+ক্ত [কর্তৃবা]। অনুনয়—অনু-নী+ঘঞ্ [ভাববা]। সংঘর্ষ—সম্-ঘৃষ্+ঘঞ্ [ভাববা]। ভীষণ—ভী+ণিচ্+অনট্ [ভাববা]। স্বর্গ—সু-ঋজ্+ঘঞ্ [কর্মবা]। জর্জরিতা—জৄ+যঙ্লুক্+ক্ত [কর্তৃবা]+আ [স্ত্রী]। জাগ্রত [অশুদ্ধ]—জাগৃ+শতৃ [কর্তৃবা]; [শুদ্ধরূপ—জাগ্রৎ]। দুগ্ধ—দুহ্+ক্ত [কর্মবা]। বর্ষ—বৃষ্+অ [ভাববা]। ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্+র [কর্তৃবা]। হৃত—হৃ+ক্ত [কর্মবা]।

ভরী—ভৃ+ঈ [করণবা]। সন্ধি—সম্-ধা+ই। বৃদ্ধ—বৃধ্+ক্ত [কর্তৃবা]। সহায়—সহ-ই+ঘঞ্ [কর্তৃবা]। বরণ—বৃ+অনট্ [ভাববা]। দীর্ঘ—দ্রাঘ্+ঘঞ্ [ভাববা]। প্রবৃত্তি—প্র-বৃৎ+ক্তি [ভাববা]। পৌরব—পুরু+ষ্ণ। আনন্দ—আ-নন্দ্+ঘঞ্ [ভাববা]। মোহ—মুহ্+ঘঞ্ [ভাববা]। লব্ধ—লভ্+ক্ত [কর্মবা]। বঞ্চিত—বঞ্চ্+ক্ত [কর্মবা]। বিধান—বি-ধা+অনট্ [ভাববা]। বিচার—বি-চর্+ঘঞ্ [ভাববা]। অপরাধী—অপ-রাধ্+ইন্। বিরোধী—বি-রুধ্+ঘঞ্ [ভাববা]। কৌশল—কুশল+ষ্ণ। বিদ্বেষ—বি-দ্বিষ্+ঘঞ্ [ভাববা]। বস্ত্র—বস্+ত্র [করণবা]। পৌরুষ—পুরুষ+ষ্ণ। ভারত—ভরত+ষ্ণ। নিঃশেষিত নিঃ-শিষ্+ক্ত [কর্মবা]। লুপ্ত—লুপ্+ক্ত [কর্তৃবা]। বিদ্যুৎ—বি-দ্যুৎ+ক্বিপ্ [কর্তৃবা]। অবনত—অব-নম্+ক্ত [কর্তৃবা]। পরিতাপ—পরি-তপ্+ঘঞ্ [ভাববা]। আঘাত—আ-হন্+ক্ত [ভাববা]। দণ্ডিত—দণ্ড্+ইত। সন্তান—সম্-তন্+ঘঞ্ [ভাববা]। নারায়ণ—নর+ষ্ণায়ণ। শাস্ত্র—শাস্+ত্র [করণবা]। ধৈর্য—ধীর+ষ্ণ [ভাব অর্থে]। সংশোধন—সম্-শুধ্+অনট্ [ভাববা]। দুঃসহ—দুঃ-সহ্+ঘঞ্। জড়ত্ব—জড়+ত্ব। আক্রমণ—আ-ক্রম্+অনট্ [ভাববা]। অবিরত—নঞ্-বি-রম্+ক্ত [কর্তৃবা]। রক্ত—রন্‌জ্+ক্ত। নিবৃত্তি—নির্-বৃ+ক্তি [ভাববা]। সমাগত—সম-আ-গম্+ক্ত [কর্তৃবা]। আত্মীয়—আত্মন্+ঈয়। অজেয়—নঞ্-জি-যৎ [কর্মবা]। বসুমতী—বসু+মতুপ্+ঈ [স্ত্রী]। মাণিক্য—মাণিক+ষ্ণ্য। রত্ন—রম্+ন [কর্তৃবা]। ললাটিকা—ললাট+ইক+আ। সৌভাগ্য—সুভগ+ষ্ণ্য। দুর্ভাগ্য—দুর্ভগ+ষ্ণ্য। মহিমা—মহৎ+ইমন্+আ। বিপ্লব—বি-প্লু+ঘঞ্ [ভাববা]। উপবাস—উপ-বস্+ঘঞ্ [ভাববা]। ব্রত—বৃ+অত [কর্মবা]। দেবতা—দেব+তা [স্বার্থিক]। পুরোহিত—পুরঃ-ধা+ক্ত। শুদ্ধসত্ত্ব—শুদ্ধ [শুধ্+ক্ত]-সৎ+ত্ব। আশীর্বাদ—আশিস্-বদ্+ঘঞ্ [ভাববা]। পৃথ্বী—পৃথু+ঈ। দৈন্য—দীন+ষ্ণ্য। সঞ্চয়—সম্-চি+ঘঞ্। সম্পদ—সম্-পদ্+ঘঞ্। জ্বলন্ত—জ্বল্+অন্ত। সংযোগ—সম্-যুজ্+ঘঞ্। দ্রৌপদী—দ্রুপদ্+ষ্ণ+ঈ [স্ত্রী]। অবধান—অব-ধা+অনট্ [ভাববা]। অবমান—অব-মান্+ঘঞ্ [ভাববা]। জগন্ময়—জগৎ+ময়ট্। কাপুরুষতা—কাপুরুষ+তা। অরণ্য—ঋ+অন্য। সার্থকতা—সার্থক+তা। আয়োজন—আ-যুজ্+অনট্ [ভাববা]। ব্যাধি—বি-আ-ধা+ই [করণবা]। শুশ্রূষা—শ্রু+সন্+ঘঞ্+আ। সৌরভ—সুরভি+ষ্ণ। গৌরব—গুরু+ষ্ণ।

কারক ও বিভক্তি॥ গান্ধারীর—কর্তৃসম্বন্ধে 'র' বিভক্তি। চরণে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। পাণ্ডবে কৌরবে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। কৌরবকক্ষ—কর্মে শূন্য-বিভক্তি। পাণ্ডুপুত্রগণে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। ধনে মানে তেজে—করণে 'এ' বিভক্তি। সৌভ্রাত্রবন্ধনে—করণে 'এ' বিভক্তি। ক্ষুদ্রজনে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। দ্যূতে—করণে 'এ' বিভক্তি। নখে দন্তে—করণে 'এ' বিভক্তি। ধনুঃশরে—করণে 'এ' বিভক্তি। ধিকারে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিন্দারে—কর্মে 'রে' বিভক্তি। দৃঢ়বলে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিরুত্তরে—ক্রিয়াবিশেষণে 'এ' বিভক্তি। জনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। হস্তে—করণে 'এ'

বিভক্তি। চিত্ততল—কর্মে শূন্যবিভক্তি। প্রীতিমন্ত্রবলে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিন্দাসর্পদলে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। বংশীরবে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিন্দায়—কর্তায় 'য়' বিভক্তি। রাজমর্যাদায়—কর্মে 'য়' বিভক্তি। মার্জারে, কুক্কুরে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। দ্বারের—অধিকরণ-সম্বন্ধে 'এর' বিভক্তি। প্রাচীরে—করণে 'এ' বিভক্তি। ভীষ্ম-পিতামহে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। বিজ্ঞবেশে—করণে 'এ' বিভক্তি। মণিলোভে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিজহস্তে—করণে 'এ' বিভক্তি। গৃধ্রগণে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। স্নেহে—করণে 'এ' বিভক্তি। বায়ুবলে—করণে 'এ' বিভক্তি। পিতৃস্নেহে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সবে—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। দীনবেশে—করণে 'এ' বিভক্তি। পদে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। শ্রীচরণে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি। দুর্যোধনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। সুখের—অভেদ-সম্বন্ধে 'এ' বিভক্তি। পুত্রে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। ন্যায়ধর্মে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। স্নেহমোহে—করণে 'এ' বিভক্তি। রাজ্যধনজনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। নয়নের জলে—করণে 'এ' বিভক্তি। গুরুষেই—কর্তায় 'এ' বিভক্তি। বিরোধে—অপাদানে 'এ বিভক্তি। কৌশলে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। গবাক্ষে—অপাদানে 'এ' বিভক্তি। ন্যায়ধর্মে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। আঘাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। দোষীজনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। ভূপে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। দুর্যোধনে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। রক্তশতদলে—করণে 'এ' বিভক্তি। ভুজবলে—করণে 'এ' বিভক্তি। রত্নভূষণে—করণে 'এ' বিভক্তি। উপহাসে—কর্মে 'এ' বিভক্তি। ঝঞ্চাবাতে—করণে 'এ' বিভক্তি। গর্ব-অহংকারে—করণে 'এ' বিভক্তি। পাপে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিজহস্তে—করণে 'এ' বিভক্তি। দুঃখে—কর্মে 'এ' বিভক্তি।

আধুনিক গদ্যরূপ ॥ প্রণমি—প্রণাম করি। তাত—পিতা। লভিয়াছি—লাভ করেছি। জিনি—জয় করে। চেয়েছিনু—চেয়েছিলাম। ছিনু—ছিলাম। যবে—যখন। আছিনু—ছিলাম। লয়ে—নিয়ে। বহে—বয়। জিনিয়া—জয় করে। তারে—তাকে। বাধি—বধ করে। তব—তোমার। ডরি—ভয় করি। তাহে—তাতে। মোর—আমার। মোরা—আমরা। সনে—সঙ্গে। তোরে—তোকে। তরে—জন্যে। ঘনায়ে—ঘনিয়ে। সবে—সইবে। কারে—কাকে। তাহারে—তাকে। তারে—তাকে। চাহি—চেয়ে। তোমারে—তোমাকে। দিনু—দিলাম। ফিরায়ে—ফিরিয়ে। প্রতীক্ষিছে—প্রতীক্ষা করছে। উচ্ছ্বসিয়া—উচ্ছ্বসিত হয়ে। আলিঙ্গিয়া—আলিঙ্গন করে। মাগিছে—চাইছে। লহো—নাও। ফিরানু—ফিরিয়ে দিলাম। বিসর্জিনু—বিসর্জন করলাম। ত্যজ—ত্যাগ করো। নিষ্পাপেরে—নিষ্পাপকে। দেহো—দাও। করিবারে—করবার জন্যে। শুধাই—জিজ্ঞাসা করি। সেথা—সেখানে। প্রবেশিয়া—প্রবেশ করে। ভেবেছিনু—ভেবেছিলাম। হেরিনু—দেখলাম। আকর্ষিয়া—আকর্ষণ করে। পত্নীরে—পত্নীকে। চূর্ণিয়া—চূর্ণিত হয়ে। করহ—করো। করিছ—করছো। দাগিবে—দাগা দিবে। সংহর—সংহরণ করো। সঁপেছে—সমর্পণ করেছে। চাপি—চেপে। সবে—সবাই। প্রণম—প্রণাম করো। দহিছে—দহন করছে। হেরি—দেখে। সঞ্চারিছে—সঞ্চার করছে। আনিছে—আনছে। স্মরি—স্মরণ

করে। ডরি—ভয় করি। কেমনে—কেমন করে। লভিয়াছি—লাভ করেছি। চিতে—চিত্তে। মাগিবারে—চাইবার জন্যে। উদিবে—উদিত হবে। লভো—লাভ করো।

সার্থক বাক্য-রচনা ॥ অভীষ্ট—জানি, আমার **অভীষ্ট** কোনদিন পূর্ণ হবে না। **সদ্য**—সে **সদ্য**-পাস-করা ডাক্তার ; তোমার রোগের সে কি বুঝবে ? **নিশ্চিন্ত চিত্তে**—তুমি **নিশ্চিন্তচিত্তে** বাড়ি ফিরিয়া যাও ; আমি ইহার প্রতিকার করিব। **চরিতার্থ**—হিমালয় দেখিয়া আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এতদিনে **চরিতার্থ** হইল। **পাদপীঠতলে**—ন্যায়ের **পাদপীঠতলে** সকলের একদিন নয় একদিন বিচার হইবে। **ক্রূরমনা**—গোবিন্দ ঘোষালের মতো **ক্রূরমনা** মানুষ আর নাই। **আসন্ন**—আমার পরীক্ষা **আসন্ন**। **অন্ধবেগে**—**অন্ধবেগে** কালবৈশাখীর ঝড় ছুটে এলো।

বিশেষ ব্যাকরণগত টীকা ॥ ১. 'উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি মলিন কৌরবকক্ষ।' 'পরকাশি' পদটির ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র কি ? 'উজ্জ্বল' ও 'মলিন' বিশেষণ দুটির বিশেষ্য রূপ লিখ।

পরকাশি < প্রকাশি=প্‌+র্‌+অ+ক্‌+আ+শ্‌+ই=প+অ+র্‌+অ+ক্‌+আ+শ্‌+ই=পরকাশি। স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ।

উজ্জ্বল [বিশেষণ] — উজ্জ্বলতা [বিশেষ্য]

মলিন [বিশেষণ] — মলিনতা [বিশেষ্য]

২. "আপামর জনে আমি কহাইব আজ, 'দুর্যোধন রাজা।"—'আপামর' পদটির ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ। 'জনে' পদটির কারক-বিভক্তি লিখ। 'কহাইব'—এই ক্রিয়াপদটির বৈশিষ্ট্য কি ?

আপামর—পামর পর্যন্ত—অব্যয়ীভাব সমাস। জন্যে—কর্মে 'এ' বিভক্তি।

কহাইব—কহ্‌ ধাতু+আ [ণিজন্ত]+ইব [ভবিষ্যৎ কাল]। ণিজন্ত ক্রিয়া।

৩. 'সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে, দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডব-ভ্রাতারে'। 'মার্জারে', 'কুক্কুরে' এবং পাণ্ডব ভ্রাতারে'—এই ব্যাপক 'এ' বিভক্তি পরিচয় দাও।

মার্জারে, কুক্কুরে, পাণ্ডবভ্রাতারে—সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি।

৪. 'মোরা শিশুকাল হতে হীনবল।' —'হীনবল' পদটির সমাস ব্যাখ্যা করে তার বিপরীতার্থক পদ লিখ।

হীনবল—হীন বল যার—বহুব্রীহি সমাস। বিপরীতার্থক শব্দ—মহাবল।

৫. প্রীতিমন্ত্রবলে শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে বংশীরবে হাস্যমুখে।' —'প্রীতিমন্ত্রবলে' ও 'নিন্দাসর্পদলে'—পদ দুটির কারক ও বিভক্তি লিখ। পদ দুটির সমাসের পরিচয় দাও।

প্রীতিমন্ত্রবলে—করণে 'এ' বিভক্তি। নিন্দাসর্পদলে—কর্মে 'এ' বিভক্তি।

প্রীতিমন্ত্রবলে—প্রীতিরূপ মন্ত্র—রূপক-কর্মধা ; তার বল—ষষ্ঠীতৎ, তাতে।

নিন্দাসর্পদলে—নিন্দারূপ সর্প—রূপক-কর্মধা ; তার দল—ষষ্ঠীতৎ তাতে।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

[পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী]

‘হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।’

—কবি শ্রীমধুস্থদন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের

পাঠ-সূচী

মান : ২০

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস :

- ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া নিম্নলিখিত লেখক ও বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে :

১. বিদ্যাপতি ও তাঁহার পদাবলী,
২. বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,
৩. কৃত্তিবাস ও তাঁহার রামায়ণ,
৪. শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যে প্রভাব,
৫. চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণবপদকর্তাগণ এবং তাঁহাদের পদাবলী,
৬. ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গল-কাব্যের বিভিন্ন শাখার প্রধান কবি ও তাঁহাদের কাব্য, এবং
৭. চৈতন্য-চরিত সাহিত্য।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

'জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্ব-মনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি।'
—রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তাবনা

কেবল সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধির জন্যেই নয়, যে বিশাল মানবগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে তার সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার আত্মিক পরিচয় লাভ করবার জন্যেও সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠ একান্ত আবশ্যিক। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং তার আচার-সংস্কৃতির নির্ভুল পরিচয় মুদ্রিত থাকে তার সাহিত্যে। তাছাড়া, নিজের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাস না জানলে স্বজাতির মানস-বিবর্তনও জানা যায় না। যে ভাষায় আজ আমরা কথা বলি কিংবা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধ রূপে আমরা বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হই, তার পেছনে রয়েছে কত যুগযুগান্তরের ইতিহাস, কত শতাব্দীর সাধনা, কত উত্থান-পতন ও কত ভাঙাগড়ার কাহিনী। তা না জানলে স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্যকে জানা হয় না এবং স্বদেশী ভাষা ও সাহিত্যকে না জানলে স্বদেশকে ও নিজেকে জানা হয় না।

সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস কেবল সাল-তারিখ-কণ্টকিত নীরব বিবৃতি মাত্র নয়। অনেকের ধারণা এবং ভুল ধারণা, সাহিত্যের ইতিহাস কেবল সাল-তারিখের পরিকীর্ণ স্তূপ মাত্র। কিন্তু আসলে, সাহিত্যের ইতিহাস তার চেয়ে কিছু বেশী—কিছু মহত্তর, উন্নততর। সাহিত্যের ইতিহাসে তথ্য থাকবেই এবং থাকা উচিতও; নতুন নতুন তথ্যের আবিষ্করণের ফলে সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মর্তব্য যে, সংগৃহীত তথ্যপঞ্জীর মধ্যে একটি জঙ্গম ধারাবাহিকতার সূত্র আবিষ্কারই বড়ো কথা; বলা বাহুল্য, সেই ধারাবাহিকতার মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাসের মৌল স্বরূপ, তার গতি-প্রকৃতি থাকবে প্রতিফলিত। তার মধ্যেই সমগ্র জাতির চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে বিধৃত। সেই জঙ্গম ধারাবাহিকতার সূত্র আবিষ্কারই সাহিত্যের ইতিহাসকারের কাজ। কাজেই, সাহিত্যের ইতিহাস জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার

সাহিত্যের ইতিহাসের স্বরূপ

প্রাণময় ধারারই প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে সমগ্র জাতির অন্তর্জীবনের নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ইতিহাসপাঠ তাই একান্তভাবে আবশ্যিক।

'বাঙালীর অন্তরের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অনেকদিন হইতে অগ্নিসঞ্চয় করিতেছে—তাহার চিন্তার ভিতরে চিন্তার সাহস আনিয়াছে, তাই কর্মের মধ্যে তাহার নির্ভীকতা স্বভাবতই প্রকাশ পায়। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নহে, তাহার চেয়ে দুঃসাধ্য সমাজক্ষেত্রেও বাঙালীই সকলের চেয়ে কঠোর অধ্যবসায়ে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছে।' বাঙালীর হৃদয়ে সঞ্চিত অগ্নি যুগে যুগে তার জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তেমনি, তার সাহিত্য সূচনালগ্ন থেকেই তার হৃদয়ে সঞ্চিত করে আসছে ভাবের অগ্নি, চিন্তার অগ্নি, প্রেমের অগ্নি। এককথায়, বাঙালী জাতির সার্বিক পরিচয় তার দ্যুতিময় সাহিত্যে সুমুদ্রিত। তার সেই সাহিত্য তার হৃদয়কেও নানাভাবে নানা ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালীর সাহিত্য আজ যে কোন বাঙালীর কাছে গর্বের বস্তু। কি সমসাময়িক কালপ্রভাবের প্রতিফলনে, কি তৎকালিক সমাজ-চিত্রের উপস্থাপনায়, কি বহু বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণে, কি বাঙালীর মনন-মানসিকতা ও গভীরতর ভাবসমৃদ্ধ অমৃতরস-সৃষ্টিতে—এক কথায়, তার জীবন-সংগ্রাম ও জীবন-জিজ্ঞাসার সকল শিল্পময় রূপ পরিবেশনে বাংলা সাহিত্য পালন করেছে এক অতি বিশ্বস্ত দায়িত্ব। 'বাঙালী একটি সত্য বস্তু পাইয়াছে, ইহা তাহার সাহিত্য।' সাহিত্যেই বাঙালীর সমাজ ও জীবনের সত্য-স্বরূপের প্রকাশ লক্ষণীয়। তার ধর্মজীবন, প্রেমজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সাহিত্যের মধ্যস্থতায়ই বাণীরূপ পেয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নেই। কিন্তু সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বহু মালমসলা—ঐতিহাসিক বহু মূল্যবান উপাদান তার সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার পক্ষে সেগুলি নিঃসন্দেহে অতি মূল্যবান সামগ্রী। তাইতো বাঙালীর ইতিহাস রচনায় বাঙালীর সাহিত্যই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপাদান-ভাণ্ডার। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, বাঙালীর ভাবজীবনের বিশ্বস্ত চিত্র বাঙালীর সাহিত্য ছাড়া কি উপায়েই বা এমন অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে রূপায়িত হতো? তাই তার ভাবজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের জন্যে বাংলা সাহিত্য ও তার ইতিহাস পাঠ ঐকান্তিক প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর সমাজ ও জীবন

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সংযোজিত করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। পাঠ-সূচীটি গভীরভাবে অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যাবে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট যুগের সঙ্গে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় সাধনের একটি পরিকল্পনা নিহিত হয়েছে এর পেছনে।

পাঠ-সূচী

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী প্রাগাধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সুবর্ণময় যুগ। এই যুগেই 'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া' শ্রীচৈতন্যের মতো অসামান্য দ্যুতিসম্পন্ন যুগ-পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁর দেবোপম চরিত্র-সুষমার জ্যোতিতে অভিষিক্ত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ বাংলা কাব্যকুঞ্জের স্বর্ণকণ্ঠ বিহঙ্গেরা। এই যুগেই মহাকবি কৃত্তিবাস রচনা করেন তাঁর সর্বজনপ্রিয় রামায়ণ-কাব্য। এই যুগেই বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতো ভক্ত-কবি-দার্শনিক অনবদ্য চৈতন্যচরিত কাব্য রচনা করেন এবং এই যুগেই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচনা করেছিলেন তাঁর উপন্যাসোপম চণ্ডীমঙ্গলকাব্য।

স্মরণীয় যে, ইতিপূর্বে বাংলায় মুসলমান-বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলার চিরাচরিত জীবনধারার সঙ্গে নবাগত শক্তির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে জাতির মর্মমূলে এক নতুন ভাব-চেতনার উন্মেষ হয়েছে। প্রবল বহিঃশক্তির কাছে অসহায় আত্ম-সমর্পণে যে দুঃখ, বেদনা ও অপমান জাতির মানসলোকে সঞ্চিত হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর ভাব-জীবনে আসে এক জোয়ারের উচ্ছ্বাস। তার ধর্মাচরণে, শিল্পে, সাহিত্যে এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় ঘটলো তার অনিবার্য প্রতিফলন। আর্য ও প্রাগার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা যেখানে উচ্চকোটির অহংকার, অভিমান ও উন্নাসিকতায় দীর্ঘকাল সমান্তরাল ছিল, সেখানে প্রবলতর বহিঃশক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে তা আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের তাগিদে পরস্পরের সন্নিহিত হলো। দুর্জয় বহিঃশত্রুর সার্থক প্রতিরোধের জন্যে জাতির ভাবলোকে সূচিত হয় শক্তির আরাধনা, শক্তির সাধনা। এই পর্বে রচিত বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি সেদিক থেকে একপ্রকার রূপক সাহিত্যই। প্রাগার্য সংস্কৃতির নিরুপায় স্বীকৃতি যেমন এই পর্বের সাহিত্যকর্মগুলির এক স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি শক্তির স্বপ্ন এবং তার সফলতার সহজতম সাধনা এই পর্বের সাহিত্যকর্মগুলির এক অন্তর্নিহিত লক্ষণ। কি মঙ্গলকাব্যে, কি অনুবাদ-সাহিত্যে, কি জীবনীকাব্যে, কি গীতি-কবিতায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সর্বশাখায় এই যুগল বৈশিষ্ট্যের ধারা সুমুদ্রিত। সেদিক্ থেকে বিচারে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য তার ইতিহাসের অনস্বীকার্য গান। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'ইতিহাসের গান অমিত্রাক্ষরে হয় না, এর চরণে চরণে মিল।' তাই পয়ার-ত্রিপদীর ছন্দোবন্ধনে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কাব্যকায়া নির্মিত। যেখানে অনিবার্যভাবে গদ্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, সেখানেও পদ্যের মিত্রাক্ষর চরণের বেড়ি স্বীকার করতে হয়েছে। তবু সেই সীমিত পরিধির মধ্যেই বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস-মুকুন্দরাম এবং বৃন্দাবনদাস-কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ কবিরা তাঁদের যে প্রতিভার অনবদ্য উপচার সাজিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এই পর্বের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেমন পুঁথিসর্বস্ব, তেমনি বহুবিষয়ে তুমুল বিতর্কিত।

এই পর্বের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখতে হবে যে, আদর্শ উত্তর-রচনায় সাহিত্যের ইতিহাসে কেবল ইতিহাসই সব নয়; তার সঙ্গে শিল্পসম্মত পরিবেশন-নৈপুণ্যের প্রশ্নটিও বিশেষভাবে জড়িত। তবে পরিবেশন-নৈপুণ্যের খাতিরে ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ যাতে কোথাও অবহেলিত না হয় বা যাতে কোথাও তথ্যের রূপান্তর না ঘটে, সেজন্যে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকল তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে এবং তথ্যসমূহের ভিত্তির ওপর সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নানা দিক্-দিগন্তের ওপর সুচিন্তিত, যুক্তিনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ মন্তব্যের আলোকে প্রসঙ্গটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারা চাই। সেজন্যে প্রয়োজন সমগ্র ইতিহাস-ধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, বিষয়টির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার এবং একটি অতি-পরিশীলিত প্রকাশ-ভঙ্গি। আয়তনের বিশালতার চেয়ে অন্তর্লীন গভীরতাই সব সময় পুরস্কৃত হয় বেশী। সেদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সূচনাতেই অবহিত থাকা উচিত। আসল কথা, প্রযত্নই হলো আদর্শ উত্তরের শ্রেষ্ঠগুণ; পরীক্ষকেরা উত্তরপত্রে তারই সন্ধান করে থাকেন। সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য তথ্যসজ্জা, তার বিশেষ গতি-প্রকৃতির ওপর আলোকপাত, যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্যের বলিষ্ঠ উচ্চারণ, এবং সর্বোপরি একটি পরিমিত, অথচ পরিশীলিত বাচনভঙ্গি সহযোগে সাহিত্যের ইতিহাসের আদর্শ উত্তর রচনা যে সম্ভব, ছাত্র-ছাত্রীদের তা শিক্ষা দেবার জন্যে 'প্রবন্ধ বিচিন্তা'য় করা হয়েছে একটি সুচিন্তিত আয়োজন। অধ্যায়-সজ্জায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষাই হলো মূল লক্ষ্য॥

আদর্শ উত্তর: তথ্য, যুক্তি, উপস্থাপনার বলিষ্ঠতা ও পরিশীলিত প্রকাশ-ভঙ্গি

পূর্বসূত্র

॥ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ॥

ভাষা বহতা নদীর মতো। সাহিত্য তার উপকূলে স্থাপিত সমৃদ্ধ জনপদ। জনপদ-প্রবাহিনী নদী যেমন জনপদের চরিত্র-গঠনের সহায়তা করে, অন্যদিকে জনপদের নির্ভুল পরিচয়ও তেমনি সেই নদীর জলে হয় প্রতিবিম্বিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি কথাটি অত্যন্ত সংগতভাবেই প্রযোজ্য। সাহিত্যের ইতিহাসে জাতির চরিত্র ও তার জীবনধারার স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবির সাক্ষাৎ মেলে। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান হৃদয়-হরণ রূপ বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। তার কক্ষে-কক্ষান্তরে নব নব রূপ, নব নব শোভা; বৈচিত্র্য-বিলসিত তার সেই সৌন্দর্য সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলা সাহিত্যের এই-যে সমৃদ্ধি, এর পেছনে আছে কত শত শতাব্দীর ইতিহাস, কত শত কবি-সাহিত্যিকের যুগ-যুগান্তরের সাধনা। বাঙালীর সৃষ্টিশীল জীবনচর্যা তার সাহিত্যের এই বিশাল ধারায় যুগিয়েছে এক প্রাচুর্যময় প্রাণ-প্রেরণা। বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস—জ্ঞানদাস—গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস—কাশীরাম দাস—বৃন্দাবন দাস—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, মুকুন্দরাম—ভারতচন্দ্র—রামপ্রসাদ, মধুসূদন—বঙ্কিমচন্দ্র—হেমচন্দ্র—বিহারীলাল প্রমুখ যুগন্ধর স্রষ্টার প্রতিভার অবদানে বাংলা সাহিত্য আজ ষড়ৈশ্বর্যময়। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে বিশ্ববিজয়ী মহিমা। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যও আজ অভিনব গতির ছন্দে চঞ্চল।

ভূমিকা

এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ, ঐশ্বর্যময়ী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎসভূমি কোথায়? আর্য-সভ্যতা ও সাহিত্য বাংলাদেশে সংক্রামিত হবার আগে এদেশে বাস করতো অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বা দক্ষিণী জাতির মানুষ। নৃতাত্ত্বিকগণের মতে, বর্তমান সাঁওতাল ও মুণ্ডা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদেরই অবিমিশ্র উত্তরপুরুষ। বর্তমান বাঙালী জাতির ধমনীতে তাদের রক্তধারার উপস্থিতি ঐতিহাসিক-ভাবে সত্য। তেমনি বাঙালী জাতি অতি স্বাভাবিক কারণেই লাভ করেছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। তাদের ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি—নিজস্ব ভাষা। কিন্তু বর্তমান বাংলা ভাষায় তাদের ব্যবহৃত কিছু-সংখ্যক শব্দ ছাড়া বাকিটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাঙালী পরিচয়ের মূল 'বঙ্গ' শব্দটি তাদেরই ভাষার অবদান। সাঁওতালী ও মুণ্ডারী ভাষায় 'বোঙ্গা' শব্দটি 'দেবতা' অর্থে আজও ব্যবহৃত হয়। 'বঙ্গ' শব্দটি 'বোঙ্গা' শব্দেরই বিবর্তিত

অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ : ভাষা

রূপ। সেদিক থেকে 'বঙ্গদেশ' শব্দটির অর্থ 'দেব-দেশ' বা 'দেবভূমি'। ওদিকে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলো উন্নততর আর্যজাতি। তারা সঙ্গে নিয়ে এলো তাদের সমৃদ্ধ বৈদিক সাহিত্য এবং উদাত্ত বৈদিক ভাষা বা ছন্দস্ ভাষা। আর্য ও প্রাগার্য জাতির মধ্যে প্রাথমিক সংঘাত-সংঘর্ষের পর স্থাপিত হলো আদান-প্রদানের সম্পর্ক। সেই আদান-প্রদানের স্বাক্ষর প্রথমেই মুদ্রিত হলো মুখের ভাষায়। ফলে, বৈদিক ভাষাকে তার স্বাভাবিক ধীরোদাত্ত উচ্চারণ-গাম্ভীর্য হারিয়ে আভিজাত্যের উচ্চাসন থেকে নেমে আসতে হলো মাটির কাছাকাছি। তার সংস্কার সাধন করে যে সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি হলো, তার নাম হলো সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত হলো সেদিনের অভিজাত সম্প্রদায়ের ভাষা।

আর্যজাতি : বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা

সংস্কৃত ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হলো। সে হলো ভাষার উন্নত রাজপথ। সে পথে মানহীন জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ভাষা জীবন্ত, জনপথেই তার সঞ্চরণ সমধিক। সেই পথেই ভাষা গণায়ত হয়, অগ্রগতির নিজস্ব পথ খুঁজে পায়। ভারতে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমাগ্রগতির ফলে সংস্কৃত ভাষা নানা আঞ্চলিক উপভাষা ও উচ্চারণ-রীতির সংস্পর্শে এসে লাভ করলো এক স্বাভাবিক রূপান্তর। প্রকৃতিপুঞ্জের, অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত সেই গণায়ত ভাষার নাম হলো 'প্রাকৃত ভাষা'। অঞ্চলভেদে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী, মাগধী ইত্যাদি প্রাকৃত ভাষার নানাপ্রকার ভেদ দেখা গেল। কালক্রমে, পূর্ব-ভারতে মগধকে কেন্দ্র করে যে প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হলো, তাকে বলা হলো 'মাগধী প্রাকৃত'। সেই মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত মাগধী অপভ্রংশের মধ্যে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির রূপ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। অপভ্রংশ স্তরের বাংলা ভাষার দুটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে :

প্রাকৃত : মারাঠী প্রাকৃত—অপভ্রংশ—বাংলা ভাষা

এক. ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সযুত্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা ॥

[কলার পাতায় গব্যঘৃত সহযোগে গরম ভাত; তার সঙ্গে মৌরলা মাছ আর নালচে শাক। পত্নী পরিবেশন করছেন আর যিনি খাচ্ছেন, তিনি পুণ্যবান্। পদটির মধ্যে প্রাচীন কালের সচ্ছল, সুখী বাঙালী পরিবারের চির-পরিচিত, ঘরোয়া চিত্রটি অতি বিশদভাবে ফুটে উঠেছে।]

দুই. সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা।
পাউষ আএ চেউ চলাএ ॥

[আমার প্রিয়তম দূর প্রবাসে। প্রাবৃষ্, অর্থাৎ বর্ষাকাল এলো। আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পদটিতে বৃষ্টিপ্রধান বাংলাদেশ এবং বাঙালী নায়িকার বিরহার্তির চিত্র স্পষ্ট।]

দৃষ্টান্ত দুটিতে লক্ষণীয় যে, বাংলা ভাষার কায়ার কাঠামোটি সবে নির্মিত হয়েছে মাত্র; কিন্তু তার পূর্ণ রূপ তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষার এই পর্বের আরও বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ইত্যাদি বিশিষ্ট সংকলন-গ্রন্থগুলিতে।

চর্যাপদ

ক্রমে অপভ্রংশের আবরণ ভেদ করে বাংলা ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটলো; সে হাজার বছর আগেকার কথা। বাংলা ভাষার সেই প্রথম প্রকাশলগ্নের স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে তার চর্যাপদগুলিতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এই চর্যাপদগুলি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হলেন এগুলির আবিষ্কর্তা। তিনি নেপালের রাজদরবার থেকে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে গ্রন্থখানি আবিষ্কার করে ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশ করলেন। এতদিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম দিগন্ত-রেখা চিহ্নিত হলো। চর্যাপদগুলিতে প্রায় নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার পরিচয় মুদ্রিত আছে। তখনো ভাষার অস্পষ্টতার জড়তা পুরোপুরি কেটে যায় নি। সেই আলো-আঁধারি কালের ভাষাকে চিহ্নিত করা হয় 'সন্ধ্যা ভাষা' নামে। এর ভাষা যেমন অস্পষ্ট, ভাবও তেমনি হেঁয়ালিপূর্ণ। কারণ চর্যাপদকারেরা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজ সাধনার গোষ্ঠীভুক্ত সাধক। তাঁরা এই পদগুলিতে তাঁদের সাধনমার্গের দুর্লভ ও গূঢ় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা অত্যন্ত সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বৌদ্ধতান্ত্রিক রীতিতে গৃহীত তাঁদের বিশিষ্ট নামগুলিও লক্ষণীয়। যেমন—লুইপাদ, ভুসুকপাদ, শবরীপাদ, কাহ্নপাদ, কুক্কুরীপাদ ইত্যাদি।

চর্যাপদ

চর্যাপদগুলিতে সাধনতত্ত্ব ছাড়া বাংলাদেশের তৎকালিক সমাজ-চিত্রও স্পষ্ট। নদীমাতৃক বাংলাদেশের খেয়া-পারাপারের দৃশ্য, নদী, সাঁকো, নৌকার নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা, শাশুড়ী-বহুড়ী-ননদী ইত্যাদির রূপক-চিত্র, সাধারণ মানুষের নানা আমোদ-প্রমোদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্য-গীত-নাটকাভিনয়, অভাব-অনটন, এমন-কি শুঁড়িখানায় মদ্যপানের চিত্রও চর্যাপদে অঙ্কিত হয়েছে। সাধন-মূল্য, সামাজিক মূল্য এবং ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও চর্যাপদগুলির সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য। নিম্নোক্ত পদাংশগুলি চর্যাপদগুলির কাব্যোৎকর্ষের পরিচয়বাহী :

চর্যাপদের কাব্য-মূল্যায়ন

এক.

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
[কায়া রূপ তরুবর, পাঁচ তার ডাল।
চঞ্চল চিত্ত-মাঝে পশে আসি কাল॥]

—মণীন্দ্রমোহন বসু অনুকথিত।

দুই.	উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পিচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জার মালী॥
[উঁচু উঁচু পর্বত। তাতে শবরী বালিকার বাস। তার পরিধান ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা।]

তিন.	সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
[সোনায় ভরে গেছে করুণা নৌকো; রূপো রাখবো ঠাঁই নেই।]

চার.	নানা তরুবর মোউলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী।
[কত তরু মুকুলিত হলো, গগনকে স্পর্শ করলো তাদের ডাল।]

চর্যাপদগুলি যদিও সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম-সংগীত, তবু ওদের গায়ে লেগে আছে হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাদেশের মাটির সুনিশ্চিত স্পর্শ। বাংলাদেশের সজল শ্যামল নয়নাভিরাম প্রকৃতি, নদ-নদী, গাছপালা, পশুপাখি, তার বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন জীবিকার মানুষ, তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবনাচরণ, খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ ও অর্থনৈতিক চিত্রের বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে এই পদগুলিতে। চর্যাপদ হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য সামাজিক দলিলও বটে। প্রাচীন বাংলার এবং প্রাচীনতম বাংলা ভাষার পরিচয় লাভের জন্যে চর্যাপদে রয়েছে বহু বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক উপকরণের ছড়াছড়ি।

চর্যাপদগুলি বাংলাদেশে মুসলমান-আক্রমণের পূর্বেই রচিত। কারণ, মুসলমান-আক্রমণের ফলে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রতিফলন চর্যাপদগুলিতে লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত।

কবি জয়দেব : অমর-কাব্য 'গীতগোবিন্দ'

'বিলাস-কলা-কুতূহলী', 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' কবি জয়দেবের অমর-কাব্য 'গীতগোবিন্দ মুসলমান আক্রমণের পূর্বেই রচিত।

'বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে, করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।' রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ-রচনায় বাঙালী কবিকুঞ্জের প্রথম স্বর্ণকণ্ঠ বিহঙ্গ—জয়দেব। বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুলি গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, মতান্তরে রামাদেবী বা রাধাদেবী। পত্নীর নাম পদ্মাবতী। 'ভক্তমাল' ও বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের মতে, পদ্মাবতী পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে নৃত্য করতেন এবং জয়দেব সম্ভবতঃ তাঁর নৃত্যগীতের তাল রক্ষা করতেন। বোধহয় সেইজন্যেই জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' বলে। কারো কারো মতে, পদ্মাবতী ছিলেন জগন্নাথ-মন্দিরের নৃত্যগীত-পটীয়সী দেবদাসী। সে-যা-ই হোক, জয়দেবের আত্যন্তিক জনপ্রিয়তার কারণে তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল নিজস্ব লোক বলে দাবি করে। এমন-কি, মিথিলা এবং উড়িষ্যারও দাবী আছে জয়দেবের ওপর।

জয়দেব

প্রমাণ—লোকশ্রুতি। কিন্তু জয়দেব যে বাঙালী ছিলেন এবং তাঁর বাসভূমি যে বীরভূম জেলার কেন্দুলি, তার একাধিক ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। জয়দেব গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্নের [জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, শরণ ও গোবর্ধন আচার্য] অন্যতম রত্ন ছিলেন, তা ইতিহাসস্বীকৃত। তাঁর সতীর্থ কবিদের কাব্যেও রয়েছে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হলেও তার ছন্দ অপভ্রংশ এবং ভাব বাংলা। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত ভাষাও বাংলা ভাষার খুব নিকট প্রতিবেশী। তার পদগুলির ভাষা, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের জন্যে অনেকের অনুমান, গীতগোবিন্দ সম্ভবতঃ প্রথমে রচিত হয়েছিল বাংলায়, পরে সংস্কৃতে অনূদিত হয়। কারণ, সংস্কৃত ছিল সে সময়ের আভিজাত্যের ভাষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। গীতগোবিন্দের একটি পদ বিচার করে দেখা যাক্ :

গীতগোবিন্দ

চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী ॥

[কৃষ্ণ পীতবস্ত্র-পরিহিত, তাঁর শ্যামবর্ণের শরীর চন্দনে অনুলিপ্ত; আর গলায় বনফুলের মালা। খেলায় মত্ত থাকায় তাঁর মণিময় কুণ্ডল দুলছে এবং তার ছটায় তাঁর মৃদুহাস্যময় গাল দুটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।]

সংস্কৃতের ঈষৎ আবরণ ছাড়া, এই ভাষা মূলতঃ বাংলাই। গীতগোবিন্দ বারোটি সর্গে বিভক্ত। রাধা, কৃষ্ণ ও সখীর নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এতে বর্ণিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণের সংগীতময় মিলন-লীলা। কাহিনী-গ্রন্থনার জন্যে মাঝে মাঝে বিবৃতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। কাব্য-বর্ণনার এই আঙ্গিককে উইলিয়ম জোন্স্ বলেছেন 'রাখালী নাটগীতি' [Pastoral Drama]। অনুমান করা যায়, নাটগীতি ছিল সেকালের একটি জনপ্রিয় কাব্য-মাধ্যম। আর, মধ্যস্থতায় পরিবেশিত হলেও গীতগোবিন্দ উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য হিসেবেই বিচার্য। তার পরিবেশনার দিক থেকেও গীতগোবিন্দ সম্পর্কে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। একদলের মতে, প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত সেকালের জনপ্রিয় আদিরসাত্মক কবিতার মতো গীতগোবিন্দও উত্তপ্ত দেহকামনামুখর। অপর দলের মতে, গীতগোবিন্দ ভক্তিরসেরই কোমল প্রস্রবণ। দ্বিতীয় মতের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ত্রিবিধ কারণ : এক. শ্রীচৈতন্যের গীতগোবিন্দের রসাস্বাদন, দুই. পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে গীতগোবিন্দের গীত হবার অধিকার এবং তিন. গীতগোবিন্দকে পরবর্তী বৈষ্ণব গোস্বামীদের ভক্তিরসাশ্রিত পবিত্র গ্রন্থরূপে স্বীকৃতিদান। এবং জয়দেবও তাঁর একটি পদে তাঁর গীতগোবিন্দ রচনার উদ্দেশ্য উন্মোচিত করেছেন : যদি কারো হরি স্মরণে মনকে সরস করবার বাসনা থাকে, যদি তাঁর বিলাসকলা জানবার কৌতূহল কারো হয়, তবে তিনি জয়দেব-বিরচিত এই মধুরকোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। অর্থাৎ, মর্ত্য-লোকের গানের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই স্বর্গলোকের সংগীতের শুরু।

মূল্যায়ন

রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদরচনায় উত্তর-সূরিদের ওপর জয়দেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সমকালীন ও উত্তরকালীন কবিরাও জয়দেবকে বৈষ্ণব ভাবধারার আদিকবিরূপে মেনে নিয়েছেন। এমনকি, কিশোর রবীন্দ্রনাথও গীতগোবিন্দের ছন্দ-ঝঙ্কারে ও স্বর-মূর্ছনায় যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে॥

উপসংহার

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : পঞ্চদশ শতাব্দী [১৪০০-১৪৯৯]

চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাচীনতম দিগন্ত। তার রচনাকাল আনুমানিক নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। রাধাকৃষ্ণ-পদলহরীর প্রথম কবি-বিহঙ্গ জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব এই কাল-পরিধির মধ্যেই। তিনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন এবং তাঁর অমর-কাব্য গীতগোবিন্দের রচনাকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ—এ তথ্য ইতিহাসস্বীকৃত। তারপর বাংলার কবিকণ্ঠ নীরব হয়ে যায় দীর্ঘ দু'শতাব্দী কাল। বাংলার সৃষ্টিশীল কবি-প্রতিভা দীর্ঘ দু'শতাব্দী কাল অনুর্বরতার অভিশাপে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল—এ কথা ভাবতেও বড়ো বিস্ময় লাগে। বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণে পর্যুদস্ত বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে সৃষ্টিশীল প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তা বলাবাহুল্য। 'কানু ছাড়া গীত নাহি'-র মতো প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ছিল মূলতঃ ধর্মীয় সংগীত। আর, বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য ছিল নির্বিচারে ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর দুর্বার আঘাত। কাজেই, ধর্মকথা বা ধর্মীয় সংগীত সেই প্রতিকূল পরিবেশে অতি স্বাভাবিক কারণেই শুব্ধ হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দু'শো বছরের কাল-পরিধিকে 'অন্ধকার যুগ' বা 'অনুর্বর যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের সূচনায় সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদে বিদেশী শক্তি এদেশের মানুষের সহযোগিতা প্রার্থী হলো এবং তার বিনিময়ে সহানুভূতি ও আনুকূল্যের পরিবেশ হলো উন্মুক্ত। দু'শো বছরের অবরুদ্ধ বাঙালী কবিকণ্ঠ নতুন প্রভাতে ধরলো নব নব সৃষ্টির সংগীত। বাংলা সাহিত্যের অনুর্বতার অভিশাপ ঘুচে গেল, আলো ফুটলো তার আদিগন্ত প্রান্তরে।

ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় দুর্ধর্ষ তুর্কী বাহিনী এক দুর্বার বন্যার মতো বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তখন গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল। লক্ষ্মণসেন আবাসিক রাজধানী নবদ্বীপ ত্যাগ করে গঙ্গাপথে পূর্ববঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। তুর্কীরা অরক্ষিত নবদ্বীপ বিনা প্রতিরোধে লুণ্ঠন করে এবং উত্তরবঙ্গে গৌড় লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়। যাই হোক, সমগ্র বাংলাদেশে তুর্কী-অধিকার সম্প্রসারিত হতে দীর্ঘ এক শতাব্দী কাল লেগেছিল। ফলে, বাংলার বুকের ওপর যে ধ্বংস, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের তাণ্ডব

তুর্কী-আক্রমণ ও তার পরিণাম

চলেছিল, তা নিঃসন্দেহে ছিল ভয়াবহ। বাংলার অর্থ, ধর্ম ও সংস্কৃতির সে ছিল বড়ো দুর্দিন। পরবর্তী শতাব্দীতেও প্রবল ও পরাক্রান্ত বিদেশী প্রভুত্ব ছিল অনুরূপভাবে ভয়াবহ।

তুর্কী-আক্রমণের পূর্বে বাংলার সংস্কৃতি-চর্চার প্রধান ক্ষেত্র ছিল রাজসভা, সামন্ত-সভা ও বৌদ্ধবিহারসমূহ। তুর্কীরা বঙ্গ-সংস্কৃতি-চর্চার সেই ত্রিবিধ ক্ষেত্রকেই নির্মমভাবে ধ্বংস করে। রাজসভা, সামন্তসভা গেল ভেঙে, বিধ্বস্ত হলো বৌদ্ধ-বিহারগুলি। কবি এবং বৌদ্ধভিক্ষুরা হলেন দেশত্যাগী, নিরুদ্দেশ। মূল্যবান পুঁথিপত্র ভস্মীভূত হলো। বাংলার কবিকণ্ঠ নীরব হয়ে গেল। বৌদ্ধভিক্ষুরা কিছু প্রাণপ্রিয় গ্রন্থসম্ভার-সহ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে উপনীত হলেন সন্নিহিত হিন্দু-রাজ্যগুলিতে। তাই সেই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্মগুলিকে আবিষ্কার করতে হয়েছে বাংলার বাইরে—নেপালে কিংবা ত্রিহুতে।

ধ্বংস-লীলা

সমগ্র বাংলায় মুসলমান প্রভুত্ব স্থাপিত হলো। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর অন্তিম পর্ব পর্যন্ত দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পারেনি প্রতিষ্ঠিত হতে। বাংলার শাসকেরা ছিল দিল্লীর অধীন। পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। চতুর্দশ শতকের অন্তিম দশকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সারা বাংলায় আধিপত্য বিস্তৃত করে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করায় বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী রাজত্বের সূচনা হয়। এই স্বাধীন সুলতানী রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ছিল হিন্দুদের সক্রিয় সহযোগিতা। ফলে, রাজ-দরবারে এবং উচ্চ রাজপদে এবার যোগ্য হিন্দুদের নিয়োগ হলো অবাধ এবং রীতিসিদ্ধ। দীর্ঘকাল পরে অশান্তি ও অরাজকতার অন্ধকার অপসারিত হয়ে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসে।

পরিবর্তিত পরিবেশ

এতদিন পরে সূচিত হলো বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস। এবং সে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই। বাংলা সাহিত্যে আবার এলো সৃষ্টির প্রেরণা। দ্বাদশ শতকের অন্তিম লগ্নে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যে সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, পঞ্চদশ শতকের সূচনায় তা আবার পুনঃস্থাপিত হলো। ধ্বংসলীলায় ক্লান্ত বিদেশী শক্তি এতদিন পরে এদেশের আত্মিক পরিচয় লাভের জন্যে হলো আগ্রহী। ফলে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রসারিত হলো রাজানুকূল্য ও রাজার পৃষ্ঠপোষকতা।

রাজানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা

অন্যদিকে, দীর্ঘ দু'শতাব্দীর লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও অপমানে এদেশের জনমানসে একটি প্রবল প্রতিরোধ-বাসনা গড়ে ওঠে। বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটলো তার অনিবার্য প্রতিফলন। পুরাণের যে কাহিনীগুলি শক্তিসমৃদ্ধ, 'বহুদিন পরে সেগুলিতে আবার নতুন করে সৃষ্টির স্পর্শ লাগলো। সেই সঙ্গে আবার একথাও অনুভূত হলো যে, জাতীয় ঐক্য ভিন্ন বিদেশী শক্তির প্রতিরোধের ব্যূহ সুদৃঢ় হতে পারেনা। তাই জাতীয় ঐক্যের তাগিদে সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হলো। ফলে, পৌরাণিক দেবদেবীদের

শক্তির সন্ধানে

সঙ্গে প্রাগার্য ব্রাত্য দেবদেবীদের মিলনের পথ সুগম হয়ে যায়। কৃষ্ণ এবং রামের শক্তিলীলার পাশাপাশি অন্ত্যজ শ্রেণীর চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শিব প্রভৃতি দেবদেবীকে আহ্বান করে তাদের সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডী, মনসা, শিব ইত্যাদির দেব-গরিমার সমন্বয় সাধন করা হলো এবং তাদের শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনায় মুখরিত হয়ে উঠলো বাংলা সাহিত্যের প্রান্তর।

ভারতে বৈদিক যুগের অবসানে পৌরাণিক দেবদেবীরা দল বেঁধে কবি-কল্পনার রথে চড়ে মানবলীলার প্রয়োজনে মর্ত্যে অবতরণ করেছিলেন। বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত এক বিপর্যয়কর রাষ্ট্রবিপ্লবের অবসানে আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হলো। বাংলার কুটিরে কুটিরে আবার পৌরাণিক দেবদেবীদের পদধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। কিন্তু বাংলায় এবার পরিলক্ষিত হলো তাঁদের প্রভূত রূপান্তর। এই রূপান্তরের মূলে ছিল বাংলার দেবদেবীদের স্বতন্ত্র

সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য

লৌকিক স্পর্শ, বাংলার জনজীবনের দুঃখ-বেদনার সংশ্লেষ এবং সর্বোপরি বাঙালী কবির সুদূরাভিসারী কল্পনা। বলাবাহুল্য, এই পর্বে যে সব দেবদেবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে ধর্মীয় আবরণ ছিল যেমন সূক্ষ্ম—ধর্মের সমুন্নত মহিমাও ছিল তেমনি অতি সামান্য। মানবিক তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার প্রাধান্যের অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে তাঁদের দৈবী মহিমা। তার পরিবর্তে মর্ত্যের প্রচুর ধূলি-ধূসরিমা লেগেছে তাঁদের গায়ে। মানুষের মতো আচরণে স্বর্গকে ভুলে তাঁরা মর্ত্যকেই মনে করেছেন তাঁদের বাসভূমিরূপে। পার্থিব নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন তাঁদের স্বর্গীয় দেবত্বকে।

এই পর্বের প্রধান কবি হলেন বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাস। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির প্রিয় প্রতিষ্ঠাভূমি বাঙালীর হৃদয়। বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস

শেষকথা

কৃষ্ণকথার নবীন পথিক। মহাকবি কৃত্তিবাস বাংলায় রামকথার অন্যতম পথিকৃৎ। জয়দেবের কাব্যের ভাষা যেমন সংস্কৃত, বিদ্যাপতির ভাষা তেমনি ব্রজবুলি ; বাংলা ভাষার সঙ্গে তাদের পার্থক্য অতি ক্ষীণ। বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা প্রাচীন বাংলা— চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে যার আত্মিক মিল॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলী

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

মহাকবি কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ কাব্য

মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য [পাঠ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়]

১.
বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলী

'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতি বাংলাদেশের, এমন-কি, বাংলা ভাষারও কবি নন; তবু তাঁর কাব্যসুষমা বাঙালীর হৃদয় হরণ করেছে। কাব্যরসপিপাসু বাঙালী পাঠকের হৃদয়ের সিংহাসনে সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে তাঁর অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা। এমন-কি, তাঁর স্বদেশ মিথিলার চেয়েও বাংলাদেশে অধিক জনপ্রিয় তিনি। শ্রীচৈতন্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই তাঁকে আত্মার আত্মীয়রূপে বরণ করে নিয়েছেন। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরলদৃষ্ট।

ভূমিকা

শতবর্ষ পূর্বেও কবিকুলচূড়ামণি বিদ্যাপতি বাঙালীর কাছে ছিলেন একান্তভাবে বাংলারই কবি। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় একটি নিবন্ধে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যযোগে প্রমাণিত করলেন যে, বিদ্যাপতি বাঙালী নন—সন্নিহিত রাজ্য মিথিলার কবি—মৈথিল কবি। মিথিলার মধুবনী পরগনার বিসফী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম। দীর্ঘজীবী এই কবি খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হয়ে পঞ্চদশ শতকের ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পিতা গণপতি। কৌলিক উপাধি 'ঠক্কুর' বা ঠাকুর। বাংলাদেশে তাই বিদ্যাপতি ঠাকুর নামে কবি বিদ্যাপতির পরিচয়। মিথিলার রাজ-দরবার ও তার রাজকার্যের সঙ্গে এই বংশের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। শুধু বিদ্যাপতির প্রপিতামহ ও পিতামহ [বীরেশ্বর ও জয়দত্ত] কৌলিক আচরণ—যজনযাজন ও সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চাকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। পিতা গণপতিও রাজসভা থেকে ছিলেন দূরে। কিন্তু বিত্ত-কৌলিন্যহীন বিদ্যাপতির আমন্ত্রণ এলো মিথিলার রাজসভা থেকে। তারপর থেকেই বিদ্যাপতির ভাগ্য মিথিলার রাজবংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে গেছে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে।

বিদ্যাপতির জীবন-কথা

সে সময়টা ছিল মিথিলার রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল। ইসলামের অর্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত পতাকার তলে বিহার-বাংলা-উড়িষ্যা নতি স্বীকার করেছে। এতদিন মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু সামন্ত-শক্তি। এবার সেই সামন্তরাজ নিহত

হলেন অসলান নামে এক মুসলমানের হাতে এবং তাঁর পুত্ররা হলেন দেশত্যাগী। বিদ্যাপতির শৈশব ও কৈশোর এই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তাঁর সামন্তরাজের পুত্রযুগল— বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ শক্তি সংগ্রহ করে অসলানকে পরাস্ত করে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এর কিছুকাল পরে কীর্তিসিংহ অধিষ্ঠিত হলেন মিথিলার সিংহাসনে। এই কীর্তিসিংহের কীর্তিকাহিনী অবলম্বনে অবহট্ট ভাষায় রচিত হয় বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' গ্রন্থ। কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর খুল্লতাত দেবসিংহ কিছু দিনের জন্যে রাজা হন। এর পর তাঁর পুত্র শিবসিংহ রাজা হয়ে মুসলমান-হস্তে নিহত হন অথবা নিরুদ্দিষ্ট হন। আবার শুরু হয় বিদ্যাপতির ভাগ্যবিপর্যয়। রুজি-রোজগারের প্রয়োজনে তাঁকে এই সময় 'লিখনাবলী' নামে একখানা পত্র-রচনার বই লিখতে হয়। যা-ই হোক, মিথিলার অবস্থা শান্ত হলো। সিংহাসনে বসলেন শিবসিংহের ভাই—পদ্মসিংহ। কবিও ফিরে এলেন তাঁর পুরাতন আশ্রয়ে। পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে এবার তিনি রচনা করলেন 'শৈবসর্বস্বসার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামে দুখানা বই। এই বংশের পরবর্তী রাজা নরসিংহ, বীরসিংহ এবং ভৈরবসিংহের নির্দেশেও তাঁকে একাধিক গ্রন্থ রচনা করতে হয়। এইভাবে কীর্তিসিংহ থেকে ভৈরবসিংহ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে তিনি মিথিলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা উত্থানপতনমূলক ঘটনার ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তারপর পঞ্চদশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকের কোন এক সময়ে পরিণত-বৃদ্ধ কবি বিদ্যাপতি পরলোকগমন করেন।

বিদ্যাপতি ও মিথিলার রাজ-পরিবার

বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা যেমন বহু, তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও তেমনি বিচিত্র। কিন্তু বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর যাতে মুদ্রিত, তা হলো তাঁর চিরদ্যুতিময় রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী। বাঙালী রসিক-চিত্ত তাঁর ভাবরসধারায় অবগাহন করে মুগ্ধ, পরিতৃপ্ত। কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে বিদ্যাপতির পরিচয় স্মার্ত কবি ও রাজকীয় কীর্তির কাহিনীকাররূপে। বস্তুতঃ, মিথিলা ও বঙ্গ—এই দুই জনপদে বিদ্যাপতির দ্বিবিধ পরিচয় : এক. স্মার্ত ও রাজকীয় কীর্তিকাহিনীর রূপকার-রূপে এবং দুই. রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদকার-রূপে।

কবি বিদ্যাপতির দ্বিবিধ পরিচয় :

বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশে। স্মৃতিশাস্ত্র-চর্চা ছিল তাঁর কুল-ব্যবসায়। তাছাড়া, মুসলমান-সাংস্কৃতিক প্রভাবে তখন মিথিলার হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে বিকৃতি ও বিনষ্টি প্রবেশ করেছিল, তার হাত থেকে সমাজকে বাঁচিয়ে তাকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বিপ্রকুলোদ্ভব বিদ্যাপতির সর্বপ্রধান লক্ষ্য। সেজন্য তাঁকে লিখতে হয়েছে কীর্তিলতা, ভূপরিক্রমা, কীর্তিপতাকা, পুরুষপরীক্ষা, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসার, দানবাক্যাবলী, লিখনাবলী, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনীর মতো কাব্য। এদের মধ্যে কোনটি রচিত হয় রাজা বা রানীর মনোরঞ্জনের

স্মার্ত ও রাজকীয় কীর্তিকাহিনীর রূপকার

জন্যে, কোনটি রচিত হয় মিথিলার হিন্দু-সমাজের অধঃপতন রোধ করে তার বনিয়াদ সুদৃঢ় করবার জন্যে।

কিন্তু বাঙালী পাঠকের কাছে বিদ্যাপতির পরিচয় তাঁর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনবদ্য পদাবলীর রূপদক্ষ শিল্পী হিসেবে। বাস্তবিকই, তাঁর এই রচনাগুলির পাশে তাঁর অন্যান্য রচনাগুলিকে অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হয়। যুগ যুগ ধরে বাঙালী পাঠক এবং শ্রোতা তাঁর অপরূপ দ্যুতিময় পদগুলির রসাস্বাদন করে এসেছে। তাদের রসস্নিগ্ধ অনুভূতির ক্ষেত্রেই বিদ্যাপতির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাভূমি। তাঁর ইতিহাস ও সমাজ-চেতনা এবং হিন্দু-নৈতিকতা মিথিলাবাসীদের যতই মনোহরণ করুক, বাঙালীর কাছে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় সার্বজনীন রসবিস্তারের কবি। যে পরিচয়ে জয়দেব কবিকুলপতি, 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতিও সেই পরিচয়ের ভূমিতেই স্বপ্রতিষ্ঠ।

রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদকার

প্রচলিত ধারণায়, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের মতো সম্ভোগবাদী, নাগরিক জীবনের কবি। তাঁর পদাবলীতে দেহ-বর্ণনার আতিশয্য, আদিরসের ছড়াছড়ি, প্রাকৃত প্রেমের উল্লাস; তার মধ্যে অপ্রাকৃত প্রেমের অমৃত স্পর্শ নেই। সত্য কথা, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের মতো রাজসভার কবি ছিলেন। রাজা এবং তাঁর রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্যে তাঁকে বহু পদ রচনা করতে হয়েছে। ভারতচন্দ্রের মতো তাঁর পদাবলীতে নাগরিক প্রেমের চাতুর্য এবং শব্দের জলুসময় চাকচিক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনার হিরণ্ময় পাত্রে তিনি শুধু রাধার রূপ-লাবণ্য পরিবেশনই করেননি, রসিক নাগরিকের মতো উপভোগও করেছেন। কিন্তু তাই তাঁকে দেহ-সর্বস্ব প্রেমের কলাবিলাসের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী বলে অনুমান করলে ভুল হবে। মনে রাখতে হবে, বিদ্যাপতি জয়দেবের সগোত্র কবি। মর্ত্যরসের হিরণ্ময় পাত্রে অমর্ত্যরসের পরিবেশনই তাঁর লক্ষ্য। এবং সেদিক দিয়ে বিদ্যাপতি সফল কলাবিদ্।

বিদ্যাপতির পদাবলীর পরিচয়

প্রথমেই লক্ষণীয় যে, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলীর অধিকাংশ পদেই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে; কিছুসংখ্যক পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। এই শ্রেণীর পদগুলিকেও কেবল যুগ-প্রবণতার প্রভাবে প্রভাবিত দেহসর্বস্ব প্রাকৃত প্রেমের কবিতা রূপে চিহ্নিত করা অনুচিত। কারণ, পদগুলির অন্তর্লীন অভিব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলারই দ্যোতনা করে। একই ফুলে শুধু প্রিয়জনেরই মালা গাঁথা হয় না, দেবতারও মালা গাঁথা হয়। তাই তো আমরা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' বিদ্যাপতি রাজসভায় যেমন নাগরিক কলা-বিলাস, ভোগ-চাতুর্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি ভাগ্য-বিপর্যয়ের শিকার হয়ে দুঃখ-বেদনার অভিজ্ঞতায়ও জীবন-পাত্র ভরে নিয়েছিলেন। একবার নাগরিক ভোগ-মদির জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে চিত্তশুদ্ধির জন্যে তিনি ভাগবতের অনুলিপিও করেছিলেন। আসলে, বিদ্যাপতির যাত্রা লৌকিক প্রেম থেকে অলৌকিক প্রেমে উত্তরণের যাত্রা, তাঁর সাধনা মানব-প্রেমকে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে রূপান্তরের সাধনা।

পার্থিব থেকে অপার্থিব প্রেমে উত্তরণ

রাধার ক্রমবিকাশ

তাঁর নির্মিত রাধা-চরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যেই পাওয়া যাবে তাঁর কবি-ধর্মের প্রকৃত পরিচয়। বিদ্যাপতির রাধা-চরিত্রে তিনটি সুস্পষ্ট পর্ব-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়ঃ এক. বয়ঃসন্ধি পর্ব, দুই. অভিসার-মিলন-সম্ভোগ-মান পর্ব এবং তিন. মাথুর বা বিরহ পর্ব। এই তিনটি পর্বের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিদ্যাপতির কবি-স্বভাবের নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যাবে।

বিদ্যাপতি তাঁর ভাবের রঙ্গমঞ্চের যবনিকা যখন প্রথম অপসারিত করেন, তখন রাধার যে মূর্তি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়, তা হলো তার বালিকা-মূর্তি। তখনো তার বালিকাসুলভ চাপল্য অন্তর্হিত হয়নি, যৌবনের প্রগাঢ় গাম্ভীর্য তখনো তার দেহে-মনে সঞ্চারিত হয়নি। তখন তার বয়ঃসন্ধি-কাল। কেবল নবযৌবনের মদির দক্ষিণ বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে সে তার নিজের মধ্যে এক নতুন আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করছে। যেন সে এক নতুন ছন্দে, এক নতুন সংগীতে, এক নতুন রঙে পবিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাপতির রাধিকার বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে বলেন, 'ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সংগীতধ্বনি।' সে অল্পে অল্পে মুকুলিত, ধীরে ধীরে বিকাশোন্মুখ। এইভাবে একদিন রাধা আবিষ্কার করে—'আওল যৌবন শৈশব গেল।' এই পর্বে বিদ্যাপতি রাধার মূর্তি নির্মাণে একই সঙ্গে চিত্ররীতি ও ভাস্কর্যরীতির প্রয়োগ-সাফল্য দেখিয়েছেন। দেহের নবাগত যৌবনের আলো-আঁধারিপূর্ণ রহস্যময় ইংগিত অপূর্ব বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে। বিদ্যাপতি এই পর্বে কেবল রূপদক্ষতার শিল্পীই নন, রূপমুগ্ধতার কলাবিদ্‌ও।

বয়ঃসন্ধি পর্ব

যৌবন সমাগত হলো। হৃদয়ের নবীন বাসনাগুলি ডানা মেলে সমগ্র আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যেতে চায়। সমস্ত দেহে তরঙ্গের হিল্লোল, 'তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব কলহাস্য করতালি, কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য।' বিদ্যাপতি এই পর্যায়ের রাধিকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, —তা অনুপম, শিল্পসুন্দর। যেখানে রাধিকার পদ-যুগল স্থাপিত হচ্ছে, সেখানেই ফুটে উঠছে পদ্ম ; যেখানে দেহের জ্যোতি, সেখানেই বিদ্যুতের স্ফুরণ। তারপর একদিন যমুনার জলে অথবা স্নান সেরে ফেরার সময় ক্ষণিকের জন্যে রাধার দেখা হয়ে যায় কৃষ্ণের সঙ্গে। সে তো ক্ষণিকের দেখা—'ভালো করি পেখন না ভেল।' 'তারপর কত আসা-যাওয়া, কত কথা কওয়া, কত ছলে কত ভাবপ্রকাশ, কত ভয়, কত ভাবনা।' রূপানুরাগের পর আসে অভিসারের পালা।

'যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দন্দ পসারি গেলি।'

আকাশে ঘনঘটা, পথে পথে বিঘ্ন এবং ভয়। কিন্তু 'নব অনুরাগিনী রাধা। কিছু

নাহি মানএ বাধা॥' সমস্ত বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ করে অভিসারিকা রাধা উপস্থিত হলো কৃষ্ণের সন্নিধানে। তারপর মধুর মিলনের পালা। সেই মিলন-পালায় কেবল নৃত্য, কেবল গীত; তার মধ্য দিয়ে প্রেমের দেবতার ঘোষিত হলো পরাজয়—'কিঙ্কিণী কিনিকিনি কঙ্কণ কনকন কলরব নূপুর বাজে। নিজ মদে মদন পরাভব মানল জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥'

অভিসার-মিলন-সম্ভোগ-মান পর্ব

শব্দের লালিত্য, ছন্দের সুষমা এবং অলংকারের দ্যুতিতে এইভাবে বিদ্যাপতির মিলনের পদগুলি শিল্পোৎকর্ষের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 'মধুর মধুর রসগান; মধুর বিদ্যাপতি ভান॥'

সেকালের প্রচলিত কাব্যমূল্যবোধের বিচারে, এখানেই কাব্যের সমাপ্তির কথা। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবও মিলনের পরই তাঁর কাব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি প্রচলিত কাব্যাদর্শের রীতি অতিক্রম করে তাঁর পদাবলীকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি মিলনের সম্ভোগ-উল্লাসের পর সংযোজিত করেছেন ভাবোল্লাসের পদ।

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারল নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল তবু হিয় জুড়ন না গেল॥'

এখানে ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার ওপরে চির-পুরাতন প্রেমের ঘটেছে চিরন্তন অতৃপ্তি, চির-নবীন প্রেমের ওপরে ঘটেছে চির-পুরাতন প্রেমের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তারপর মিলনের পালা সাঙ্গ করে কৃষ্ণ মথুরাপুর চলে গেলে বৃন্দাবন অন্ধকার করে নেমে এলো বিরহের দুঃসহ বেদনা। 'শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী। শূন ভেল দসদিস শূন ভেল সগরী॥' এক সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে বিদ্যাপতি অঙ্কন করেছেন রাধিকার এক বেদনা-বিধুর কৃষ্ণবিরহার্তা মূর্তি। 'সখি, হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥' বিরহের এমন শিল্পিত প্রকাশ মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। কৃষ্ণ-বিরহাতুরা রাধা আজ কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে হৃদয়ের আশ্চর্য রসসিদ্ধিতে প্রকৃত-পক্ষে হয়ে উঠেছে কৃষ্ণময়। 'অনুখন মাধব মাধব সোঙারিতে সুন্দরি ভেলি মধাঈ।' —সারাক্ষণ মাধবের কথা ভাবতে ভাবতে সুন্দরী [রাধা] নিজেই মাধব হয়ে গেল। দেহ-কামনাকে অতিক্রম করে দেহহীন প্রেমের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিদ্যাপতি তাঁর কাব্য-গুরু জয়দেবকে ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছেন 'অভিনব জয়দেব'।

বিরহ-পর্ব

এরপর রাধিকার হৃদয়ার্তির সঙ্গে পরিণত-বৃদ্ধ কবি বিদ্যাপতি নিজের হৃদয়ার্তি মিশিয়ে রচনা করেছেন তাঁর অশ্রু-বিধৌত প্রার্থনার পদগুলি:

'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমপলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥'

—'মাধব, তোমার কাছে আমার বহু মিনতি। তুলসী আর তিল দিয়ে আমার এ দেহ সমর্পণ করলাম—তোমার দয়া যেন আমাকে না ছাড়ে।' ভক্ত-হৃদয়ের এই

আত্মসমর্পণ এবং সুগভীর হৃদয়ার্তির কোন তুলনাই হয় না। একালের কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথও ওই সুরে বাঁধলেন তাঁর বীণার তার :

'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো।'

বিদ্যাপতির রূপানুরাগ, অভিসার, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ও প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলি লাভ করেছে অনবদ্য কাব্য-গৌরব। পরবর্তীকালের কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ রচনা করে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত হন। তিনিও তাঁর কাব্যগুরুকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এই সব কারণে যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যও বিদ্যাপতির পদাবলীর রস আস্বাদন করতেন। ফলে, বিদ্যাপতির পদাবলী কালক্রমে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

॥ ব্রজবুলি ভাষা ॥

কবিকুলপতি বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর ভাষা 'ব্রজবুলি'। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি মূলতঃ কোন্ ভাষায় তাঁর রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী রচনা করেছিলেন, বর্তমান প্রচলিত পদগুলি দেখে তা বলা কঠিন। তবে তাঁর পক্ষে মিথিলার মৈথিলী বা ঐ ভাষার কাছাকাছি কোন ভাষায় পদগুলি রচনা করে থাকাই সম্ভব। সেকালে বহু বাঙালী ছাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে মিথিলায় যেত। মিথিলা থেকে তাঁদেরই মধ্যস্থতায় বিদ্যাপতির রূপময় রসময় পদগুলি বঙ্গদেশে সম্প্রচারিত হয়। বাঙালী কীর্তনীয়ারা বাঙালী শ্রোতাদের কাছে বিদ্যাপতির পদাবলীর দুরূহ অংশগুলিকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্যে ইচ্ছেমতো সেগুলির পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। তাই মিথিলায় প্রাপ্ত মূল পদগুলির পাঠের সঙ্গে এদের পাঠ মেলে না। আর, মজার ব্যাপার, ঐ অমিল অংশগুলিতেই রয়েছে কাব্যোৎকর্ষের চরম স্বাক্ষর। সে যা-ই হোক, বাঙালী কীর্তনীয়ারা সেদিন বুঝতে পারেন নি যে, বিদ্যাপতি বাঙালী নন। কিন্তু একথা বোধ হয় তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর পদগুলির ভাষা বাংলা নয়। তাঁদের ধারণায়, বিদ্যাপতির পদগুলি সম্ভবতঃ ব্রজধাম বা মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষায় রচিত। তাই তাঁরা ঐ ভাষার নাম দিয়েছিলেন 'ব্রজবুলি'। অর্থাৎ, যে ভাষায় ব্রজধামে কথা বলা হয়। কিন্তু ব্রজধাম বা মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা, যা 'ব্রজভাষা' বা 'ব্রজভাখা' নামে পরিচিত, তা পশ্চিমা অপভ্রংশ [শৌরসেনী] থেকে জাত ; আর, বঙ্গদেশে প্রচলিত ব্রজবুলির ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বংশধর। কাজেই, ব্রজভাষা আর ব্রজবুলির ভাষা এক নয়—দু'য়ের মধ্যে সুদূর ব্যবধান।

উৎপত্তি :
ব্রজবুলি ভাষা
ব্রজের ভাষা নয়

স্মরণীয় যে, ব্রজবুলি কোন মৌলিক ভাষা নয় ; এবং বিদ্যাপতিও এ ভাষায় তাঁর মূল পদগুলি রচনাও করেন নি। ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা। এমন-কি, তা মৈথিলী ভাষা থেকেও পৃথক্। বিদ্যাপতি হয়তো মৈথিলী ভাষাতেই তাঁর পদগুলি রচনা করেছিলেন ; কিন্তু সেগুলি বাঙালীর হাতে পড়ে এবং বাংলা ভাষার সংস্পর্শে এসে রূপান্তরিত হয়ে যে কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হলো, তাই-ই প্রচারিত হয় 'ব্রজবুলি'

নামে। উপাদানের দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষা মৈথিলী, বাংলা এবং আংশিক হিন্দীর সংমিশ্রণে গঠিত; এর বনিয়াদ প্রাচীন বাংলা ভাষা ও ছন্দের কৃত্রিম খাত। এইভাবে যে ব্রজবুলি ভাষা গড়ে উঠলো, তা না-বাংলা, না-মৈথিলী; গ্রীয়ার্সন সাহেবের মতে, 'a kind of bastard language neither Bengali nor Maithili.' ডঃ সুকুমার সেনের মতে, বঙ্গদেশে নয়, মিথিলাতেই 'ব্রজবুলি'র সৃষ্টি হয়েছিল। ওখানে অবহট্‌ঠ ও মৈথিলীর সংমিশ্রণে এই কবি-ভাষার সৃষ্টি হয়। তা পরে বাংলা, আসাম ও উড়িষ্যায় আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রণে সেখানকার প্রচলিত ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি করে।

ব্রজবুলি ভাষার উপাদান

'ব্রজবুলি' শব্দটির প্রাচীনতম প্রয়োগ দেখা যায় ষোড়শ শতকের অসমীয়া সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে এর প্রয়োগ দেখা যায় ঈশ্বরগুপ্তের হাতে। লক্ষণীয় যে, একমাত্র রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ছাড়া এই ভাষায় অন্য কোন সাহিত্যই রচিত হয় নি। সে যাই হোক, এই কৃত্রিম ভাষার রূপসৌন্দর্য ও শ্রুতিমাধুর্য অনবদ্য; এর প্রকাশগত কোমলতাও মর্মস্পর্শী। মধুর, কোমল, কান্ত পদাবলী-সাহিত্যে কঠোরতার স্থান নেই। মানব-হৃদয়ের কোমলতম অনুভূতিগুলি এই ভাষার কোমলতম পাত্রে পরিবেশিত হয়ে অমৃতসমান হয়ে উঠেছে। ব্রজবুলি তাই লালিত্যময় ভাবের উপযুক্ত লালিত্যময় বাহন। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদগুলির ভাষার অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষায় গোবিন্দদাস কবিরাজ বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত হন। এমনকি, বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষার রূপকান্তি এবং শ্রুতিমাধুর্য কিশোর রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সেই মুগ্ধতার পরম-রমণীয় পরিণাম-ফল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, 'উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার নামে চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু-না-কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে।'

ব্রজবুলি ভাষার উত্তরাধিকার

প্রশ্ন ওঠে, যে-বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীর রস শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করেছেন এবং যাঁর পদাবলী বহু ভক্ত বৈষ্ণবের মহাভাব-সাধনার পরম সম্পদ, সেই কবিকুলপতি বিদ্যাপতির ধর্মবিশ্বাস কি ছিল? হীরকদ্যুতিময় রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ছাড়াও তিনি 'শৈবসর্বস্বসার' ও 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'র মতো গ্রন্থ লিখেছেন। তাছাড়া, বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত হরগৌরী-বিষয়ক বা শাক্তপদও পাওয়া গিয়েছে। মিথিলায় এই পদগুলি জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল যথেষ্ট। আসলে, বিদ্যাপতির জন্ম শৈব-বংশে। মিথিলার রাজবংশও ছিল প্রধানতঃ শৈব। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিব সিংহও ছিলেন শৈব। ঐ রাজবংশের একমাত্র ভৈরবসিংহই ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে, 'বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পরম ভক্ত শৈব ছিলেন।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, তিনি ছিলেন

বিদ্যাপতির ধর্ম-বিশ্বাস

গণেশ, সূর্য, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর পঞ্চোপাসক। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বিদ্যাপতির 'রাধা-কৃষ্ণ-পদাবলী'তে যে নিষ্ঠা ও ভাবাকুতির গভীরতা রয়েছে, তা কিন্তু অন্য কোথাও নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'—প্রার্থনার পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনের সর্বশেষ আশ্রয়রূপে মাধবের পদতলে হতাশ, বেদনার্ত কবির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এই কথাই প্রমাণিত করে যে, পঞ্চোপাসক কবি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ের যথার্থ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। তিনি বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবি ছিলেন না। কারণ, শ্রীচৈতন্যের পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম তার নিজস্ব মূর্তি পরিগ্রহ করেনি। তিনি ছিলেন বিষ্ণু বা রাধাকৃষ্ণ-ভাবনার অদ্বিতীয় কবিকুলপতি।

এই পরিচয়েই বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে এক অতি জনপ্রিয় কবি। এত জনপ্রিয় যে, বাঙালী সহজিয়ারা তাঁকে 'নব রসিকে'র চূড়ামণি বলে প্রচার করেছেন এবং রানী লছিমাদেবীকে তাঁর সাধন-সঙ্গিনী বানিয়ে দিয়েছেন। বাংলার ভাগীরথীতীরে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার এবং সাধনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার কাহিনীটিও সম্ভবতঃ সহজিয়াবাদীদেরই সৃষ্টি। এ সব অতি-জনপ্রিয়তারই মাশুল। বিদ্যাপতি তাঁর স্বদেশ মিথিলার চেয়ে বাংলাদেশেই সমধিক জনপ্রিয়। তাঁর পদাবলীর অনবদ্য কোমল সুষমা বাঙালীর হৃদয় হরণ করেছে। বাঙালী শ্রোতা ও কীর্তনীয়াদের মুখে মুখে তাঁর পদগুলি পরিবর্তিত হয়ে ধারণ করেছে নবতর রূপ। ফলে, পদগুলির শিল্পোৎকর্ষ অনবদ্য হলেও তাদের আদি অকৃত্রিম রূপগুলি আজ দুষ্প্রাপ্য। তবে বিদ্যাপতি যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার শ্রেষ্ঠ পদকার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাধিকা-চরিত্র নির্মাণেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। বয়ঃসন্ধির নবযৌবন থেকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্দা ক্রমশঃ চড়িয়ে রাধিকাকে তিনি 'বিরহের স্বর্গলোকে' স্থাপিত করেছেন। প্রেমকে তিনি শুধু দেহ থেকে দেহাতীতেই রূপান্তরিত করেন নি ; তাকে ঈশ্বরের অভিমুখীনও করেছেন। নব যুবতী রাধিকার প্রেম-চপলতাকে শুদ্ধ করে তার বিরহিণী-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইভাবে 'চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাস আসিয়া চির-পুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন॥'

উপসংহার

অনুসরণী-১

*১. বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ ভাষায় রচিত ? তাঁর জীবনী ও কবিপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [২০ পৃ., ১৫ পৃ. ও ১৭ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮

২. 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির জীবনী যা জান লেখ। তাঁর পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [১৫ পৃ.—১৭ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৩. বিদ্যাপতির রচিত পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। তাঁর রচিত পদাবলীর বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [১৭ পৃ.—২০ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৪. কবি বিদ্যাপতি মিথিলার ও মৈথিল ভাষার কবি হলেও বাংলায় তাঁর পদাবলীর এত সমাদরের কারণ কি? তাঁর কবিকৃতির পরিচয় দাও [১৬ পৃ.—১৭ পৃ. ২০ পৃ. ও ২২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৫. 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা বিচার কর। [১৬ পৃ.—১৭ পৃ. ও ২২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৬. বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধার চরিত্র যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে, তা বিশ্লেষণ করে বিদ্যাপতির কবি-প্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটন কর। [১৭ পৃ.—২০ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৭. বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ করে তাঁর যে শ্রেণীর পদগুলির দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। [১৬ পৃ.—২১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির স্থান নির্দেশ কর। [১৫ পৃ. ও ১৬ পৃ.—১৭ পৃ. ও ২১ পৃ. —২২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৯. 'ব্রজবুলি ভাষা কি? এই ভাষার উপাদান ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এর উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। বিদ্যাপতিকে কি এই ভাষার স্রষ্টা বলা যায়? [২০ পৃ.—২১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১০. বিদ্যাপতির সমকালীন পরিবেশ আলোচনা করে তাঁর পদাবলীর পরিচয় দাও। [১৫ পৃ.—১৭ পৃ দ্রষ্টব্য]

১১. বিদ্যাপতিকে নাগরিক রুচি ও সম্ভোগের কবি বলা যায় কি? তোমার অভিমতের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। [১৭ পৃ.—২০ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১২. বিদ্যাপতির ধর্মবিশ্বাস কি ছিল বলে তোমার মনে হয়? তোমার সে রকম মনে হওয়ার কারণ কি? [২১ পৃ.—২২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১৩. বাংলাদেশে বিদ্যাপতি কিভাবে গৃহীত হয়েছেন? বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব কতখানি? [১৭ পৃ.—২২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১৪. টীকা লিখ:

*ব্রজবুলি [উ. মা. '৭৮], কীর্তিসিংহ, বিদ্যাপতির ধর্মবিশ্বাস।

———

২.

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

"কালিন্দী-নদীর কূলে, গোকুলের মাঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তাহার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন।" —রামেন্দ্রসুন্দর

ভূমিকা

বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক বিতর্কিত কবি এবং তাঁর বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সর্বাধিক বিতর্কিত কাব্যগ্রন্থ। সেদিক থেকে ইংরেজি সাহিত্যের শেক্‌স্‌পীয়ার-সমস্যা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের চণ্ডীদাস-সমস্যার অনুরূপ নজির পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। চর্যাপদের পর এক সৃষ্টিবিহীন অন্ধকার। সেই অন্ধকারের শেষপ্রান্তে এক বিস্ময়কর আলোর শিখার মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবির্ভাব। এক প্রান্তে চর্যাপদ, অন্য প্রান্তে মধ্যযুগের সাহিত্য-সম্ভার; উভয়ের মধ্যে সংযোগ-সূত্র ছিল বিচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেই সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি রচনা করে দিল। ভাগবত-পুরাণ যদি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার গঙ্গোত্রী হয়, গীতগোবিন্দ যদি হয় আদিগঙ্গা হরিদ্বার, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিঃসন্দেহে প্রয়াগ-তীর্থ। এখানেই পৌরাণিক ধারার সঙ্গে লৌকিক ধারার ঘটেছে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম।

॥ চণ্ডীদাস-সমস্যা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আবিষ্কার ও চণ্ডীদাস-সমস্যার সূত্রপাত

বিংশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ছিল পদাবলীর এক এবং অদ্বিতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব। কিন্তু বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রামের এক গৃহস্থ-বাড়ির গোয়ালঘরের মাচান থেকে বড়ু চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত আদি-অন্ত্যভাগলুপ্ত একখানি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পুঁথি আবিষ্কৃত হয়ে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হলো বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। আবিষ্কর্তা পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। ইতিপূর্বে অবশ্য চণ্ডীদাস-প্রতিভার ওপর বীরভূমের নান্নুর এবং বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের দ্বৈত দাবি উত্থাপিত হয়ে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তা অমীমাংসিত ছিল। কিংবদন্তী-অনুসারে, চণ্ডীদাস ছিলেন বাসলী পূজারী এবং রামী

নান্নুর বনাম ছাতনা

রজকিনীর প্রেমিকপুরুষ। নান্নুরে চণ্ডীদাস-রামীর পূজিত বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এখনো বিদ্যমান। ছাতনায়ও রয়েছে তাঁদের পূজার ঐতিহ্য-মণ্ডিত বাসলী দেবীর মূর্তি ও মন্দির। উভয় গ্রামই চণ্ডীদাসের দাবিদার হলেও স্মরণীয় যে, বিশালাক্ষী ও বাসলী এক দেবী নন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিখানির আবিষ্কারের পর সেই প্রাক্তন বিতর্কটি চাপা পড়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব।

আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিখানির আদি, অন্ত্য এবং মধ্যভাগের কিছু অংশ খণ্ডিত ও লুপ্ত। ফলে, কাব্য-নাম ও কবি-পরিচিতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন কিংবদন্তী ও পূর্ব-ঐতিহ্যের অনুসরণে কাব্যখানির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কিন্তু পুঁথির মধ্যে ১০৮৯ সনে [বঙ্গাব্দ] লেখা একখানি চিরকুটে কাব্যনামের উল্লেখ আছে —'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব'; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। তারপর পুঁথি-

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পরিচয়

খানিতে তিন রকমের ভণিতা বর্তমান : এক. চণ্ডীদাস, দুই. বড়ু চণ্ডীদাস এবং তিন. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। আবার, কোথাও কোথাও ভণিতা বাসলীর বন্দনা-যুক্ত। কাজেই, কাব্য-রচয়িতা যে বড়ু চণ্ডীদাস এবং তিনি যে বাসলীর ভক্ত বা পূজারী ছিলেন, তাতে দ্বিমত নেই। কাব্যখানি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত : জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। এই তেরোটি খণ্ডের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের মর্ত্যপ্রেম-মাধুরী নাটগীতির আঙ্গিকে বর্ণিত।

এখন প্রশ্ন হলো, কে এই বড়ু চণ্ডীদাস? ইনি কি প্রচলিত রসমধুর পদাবলীর পদকর্তা, নাকি ভিন্ন ব্যক্তি? প্রাপ্ত পুঁথিখানির সূচনা-অংশ লুপ্ত হওয়ায় ভণিতায় উল্লিখিত নামটুকু ছাড়া কবির পরিচয়, কবির জন্মকাল, কাব্যটির রচনাকাল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। তবু লক্ষণীয়, মার্জিত রুচি ও পরিশীলিত সৌন্দর্য-বোধের বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অংশবিশেষ স্থূলরসাশ্রিত এবং গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান, কাব্যখানি কবির প্রথম জীবনের অপরিণত বয়সের রচনা এবং চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অমৃতমধুর পদাবলী তাঁর পরবর্তী জীবনের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। অর্থাৎ, তাঁর মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস এক এবং অভিন্ন। কিন্তু এই অনুমান প্রমাণসাপেক্ষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষ্য-অনুসারে, শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদাবলীর

চণ্ডীদাস-সমস্যার মীমাংসা-সূত্রের সন্ধানে

রসাস্বাদনে লাভ করতেন পরমানন্দ। দানলীলায় তিনি একাধিকবার অভিনয়ও করেছেন। আবার, দানখণ্ড হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি বিশিষ্ট খণ্ড। তাহলে কি শ্রীচৈতন্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস উপভোগ করতেন? ইতিহাস সে সম্পর্কেও নিরুত্তর। দিব্যভাববিলসিত শ্রীচৈতন্য গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট, নিম্নরুচির শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো কাব্যের রসাস্বাদন করে পরমানন্দ লাভ করতেন—এ অনুমান এ কালের বহু বিদগ্ধজনের পক্ষেও দুঃসহ। তবে আচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখ পণ্ডিতগণ পুঁথিখানির লিপি ও ভাষার বিচার করে মনে করেন, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে [আনুমানিক ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই] গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। এ কথা সুনিশ্চিত যে, চণ্ডীদাস একজন নন—একাধিক; এবং পদাবলী সাহিত্যের কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস -এঁরা এক ব্যক্তি নন। শ্রীচৈতন্য বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস আস্বাদন করুন আর না-ই করুন, কাব্যখানি যে প্রাক্-চৈতন্যযুগে রচিত, তাতে কোন সংশয় নেই। কালের প্রশ্নের মোটামুটি সমাধান হলেও স্থানের বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কারো মতে, তিনি ছিলেন বীরভূমের নান্নুরের মানুষ; কারো মতে, তিনি বাঁকুড়ার ছাতনার। কাব্য-ভণিতায় দেবী বাসলীকে বার-বার কবির প্রণাম নিবেদনে মনে হয়, তিনি ছিলেন বাসলীর ভক্ত-পূজারী [সেবাইত?]। এই বাসলী শব্দটি, কারো মতে বজ্রেশ্বরী এবং কারো মতে বাগীশ্বরী [সরস্বতী]-র বিবর্তিত রূপ। নান্নুরে বাসলী মন্দিরের বিদ্যমানতা চণ্ডীদাসের ওপর নান্নুরের দাবিকে জোরদার করেছে। ছাতনায় আছে বিশালাক্ষীর মন্দির। এবং বিশালাক্ষী [দুর্গা] ও বাসলী এক নন। তবু যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ পণ্ডিতরা মনে করেন, বড়ু চণ্ডীদাসের ওপর ছাতনার দাবি অনেক বেশী সংগত ও যুক্তিনিষ্ঠ। তবে কি নান্নুর এবং ছাতনার কোন এক স্থানে কবির জন্ম? এবং কোন কারণে তাঁকে জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল? বঙ্গদেশের কোন্ স্থানের পুণ্য-মৃত্তিকা এই কবিকে তাঁর জন্মক্ষণে প্রথম বরণ করে নিয়েছিল?—সে কি নান্নুর? না ছাতনা? কবে ইতিহাসের এই মৌন ভঙ্গ হবে, কে জানে?

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী ও গঠন-সৌষ্ঠব প্রচলিত পদাবলী-ধারণার সঙ্গে মেলে না। জয়দেব বা বিদ্যাপতি থেকে সুদূর দূরত্ব রক্ষিত হয়েছে। তেমনি দূরত্ব রক্ষিত হয়েছে পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ-ধারণার মহোন্নত দার্শনিক চেতনা থেকেও। কংস-পাপে ক্লিষ্ট পৃথিবীর ভূভার-হরণের জন্যে দেবগণের আকুল প্রার্থনায় ব্রহ্মার নির্দেশে নারায়ণ নররূপে জন্মগ্রহণ করলেন কংসেরই কারাগারে। 'হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে।' পিতা বসুদেব তাঁকে বৃন্দাবনের নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানেই তিনি যশোদার স্নেহে বর্ধিত হতে থাকেন। এদিকে, সাগর গোপের কন্যা রাধারূপে পদুমার গর্ভে জন্মলাভ করেন বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী—লক্ষ্মী।

জন্মখণ্ড

এর পর তাম্বূলখণ্ডে মূল কাহিনীর অবতারণা। রাধা এখনো অপ্রাপ্তবয়স্কা। সে ক্লীব 'আইহনের নারী'। তার মায়ের পিসী বড়াই তার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। রাধাকে দধি-সরের পসরা নিয়ে জাত-ব্যবসার প্রয়োজনে যেতে হয় মথুরার হাটে। একদিন নিখোঁজ রাধার সন্ধানে গিয়ে বড়াই গোচারণ-রত কৃষ্ণকে সালঙ্কারে শুনিয়ে দিয়ে এলো রাধার রূপের বর্ণনা। কিশোরী রাধার এখন 'এগার বরিষে তার বার নাহি পুরে।' রূপমুগ্ধ কৃষ্ণ রাধা-মিলনের জন্যে তার হাতে পাঠিয়ে দিল সাংকেতিক ফুল আর তাম্বূল। ক্রুদ্ধ রাধা তাতে পদাঘাত করে প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণের প্রস্তাব এবং বড়াইকে করে ভর্ৎসনা ও প্রহার।

তাম্বূলখণ্ড

ক্রুদ্ধা, অপমানিতা বড়াই কৃষ্ণের কাছে এর প্রতিবিধান দাবি করলে কৃষ্ণ মথুরার পথে 'দানী' সেজে রাধা এবং তার সখীদের কাছে 'দান' হিসেবে রাধার যৌবন দাবি করে। রাধার অভিযোগ, 'এহা পথে যদি কাহ্নাঞি লৈল মহাদান/দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান।' বহু বাদানুবাদের পর কৃষ্ণ জোর করে রাধার পসরার সমস্ত দধি-দুগ্ধ করলো বিনষ্ট এবং অসহায়া রাধার কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও তার সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে মিলিত হলো তার সঙ্গে।

দানখণ্ড

এবার নৌকাখণ্ড। এই খণ্ডে কৃষ্ণ সেজেছে যমুনার ঘাটের পারাপারের তরীর রসিক নেয়ে। দধি-দুগ্ধের পসরা নিয়ে রাধার মথুরায় যাবার কালে যমুনা-পারকরণের ছলে কৃষ্ণ মাঝনদীতে তরী ডুবিয়ে দিয়ে রাধার সঙ্গে জলবিহারে হলো মিলিত। এবার থেকে রাধার প্রতিরোধ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। কৃষ্ণের প্রতি তার সমস্ত প্রতিকূলতা ভেদ করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এক যৌবন-সচকিতা নারীর কৃষ্ণ-অনুরাগিণী মূর্তি।

নৌকাখণ্ড

ভারখণ্ডে কামার্ত কৃষ্ণের মিলন-প্রস্তাবে তাকে তাই সশর্ত সম্মতি জানাতে দেখি। শর্তটি হলো, কৃষ্ণকে ভারীর বেশে তার দধি দুগ্ধের ভার বয়ে দিতে হবে মথুরার হাটে। প্রত্যাবর্তনের পথে কৃষ্ণ রাধাকে তার প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকে। কিন্তু বাদানুবাদের মধ্যেই কাহিনী স্তব্ধ হয়ে গেছে। কারণ পুঁথির অংশবিশেষ এখানে লুপ্ত।

ভারখণ্ড

তারপর ছত্রখণ্ডে রৌদ্রতাপিতা রাধা সঙ্গদানের প্রতিশ্রুতিতে কৃষ্ণকে দিয়ে নিদারুণ রৌদ্রে তার মাথায় ছত্র ধারণ করিয়ে নিয়েছে। তার প্রতিদানে রাধার প্রতিশ্রুতি-রক্ষার পূর্বেই ভারখণ্ডের শেষাংশের মতো পুঁথিখানির এই অংশও লুপ্ত।

ছত্রখণ্ড

এর পর বৃন্দাবনখণ্ড। রাধা এখন বয়ঃপ্রাপ্তা,—প্রণয়-পটীয়সী। কৃষ্ণ তার সঙ্গে মিলন-কামনায় বৃন্দাবনে রচনা করে এক অনবদ্য পুষ্পকুঞ্জ। কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে রাধা এবার স্বয়ং শাশুড়ীর শাসনকে ফাঁকি দেবার কৌশল আবিষ্কার করে। এবং মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধের পসরা নিয়ে যাবার ছলে স্বেচ্ছায় বৃন্দাবনের পুষ্পকুঞ্জে কৃষ্ণের সঙ্গে হয় মিলিত।

বৃন্দাবনখণ্ড

এর পর কালিয়দমনখণ্ডে কালিয়দমন এবং যমুনাখণ্ডে যমুনার জল-বিলাস ও গোপীদের বস্ত্রহরণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তারপর হারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করলে ক্রুদ্ধা রাধা কৃষ্ণের সমস্ত কু-কীর্তির বিরুদ্ধে জননী যশোদার কাছে অভিযোগ জানায়। তাতে প্রতিশোধে ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষ্ণ রাধার প্রতি নিক্ষেপ করে দুঃসহ মদন-বাণ। রাধা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বড়াইর অনুরোধে কৃষ্ণ তার চেতনা ফিরিয়ে দিয়ে করে আত্মগোপন। এবার রাধা সম্পূর্ণ অন্য নারী। প্রেমার্ত রাধা পাগলিনীর মতো বড়াইর সঙ্গে কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে। কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়, ঘটে রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন।

কালিয়দমনখণ্ড
যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড,
বাণখণ্ড

এবার বংশীখণ্ড। এই খণ্ডে কৃষ্ণ নির্মাণ করেছে তার মোহন বাঁশী। তার অনবদ্য সুরে রাধার গার্হস্থ্য-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বাঁশীর সুরে ব্যাকুলিতা, কৃষ্ণ-পাগলিনী রাধা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণকে কোথাও সে পায় না খুঁজে। শেষে সে বড়াইর পরামর্শে চুরি করে কৃষ্ণের বাঁশী। কিন্তু পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে তাকে তা সে দেয় ফিরিয়ে।

বংশীখণ্ড

সর্বশেষ খণ্ডের নাম রাধা-বিরহ। এখন কৃষ্ণের সেই কামার্ত রূপ আর নেই; সে এখন রাধা-প্রেমে উদাসীন। পক্ষান্তরে, রাধা এখন কৃষ্ণ-পাগলিনী, কৃষ্ণের জন্যে সমর্পিত-প্রাণ। বড়াইর চেষ্টায় বহু অন্বেষণে সে দেখা পায় কৃষ্ণের। মিলন-তৃপ্তা রাধা কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই অবকাশে কৃষ্ণ রাধার মাথাটি মাটিতে নামিয়ে রেখে কংস-বিনাশের জন্যে প্রস্থান করে মথুরায়। যাবার প্রাক্কালে বড়াইকে রাধার জন্যে মিনতি করে বলে যায়: 'আর বচনেক বোলো সুণ ল বড়ায়ি ধরিঞা তোর করে। তাক রাখিহ যতনে আপন অন্তরে॥'

রাধা-বিরহ

এক সীমাহীন হাহাকারের মধ্যে কাব্যখানির পরিসমাপ্তি। কারণ পুঁথির সূচনা-অংশের মতো সমাপ্তি-অংশও লুপ্ত।

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ॥

স্বর্গীয় বসন্তরঞ্জন রায়ের আবিষ্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিখানির প্রারম্ভ-অংশ লুপ্ত। এই অংশে কবির আত্মপরিচয়ের সংযোজন ছিল সেকালের প্রচলিত কাব্য-প্রথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পুঁথিখানির প্রারম্ভ-অংশ লুপ্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির জীবন-কাহিনী অপরিজ্ঞাত। ফলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি-কাহিনী কিংবদন্তীর কুয়াশায় প্রোথিত এবং সেইহেতু তা অস্পষ্ট ও অনির্ভরযোগ্য।

ভূমিকা

কিংবদন্তী-অনুসারে, চণ্ডীদাস বীরভূমের নান্নুর অথবা বাঁকুড়ার ছাতনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বিচারে অনুমান করা যায়, বড়ু চণ্ডীদাস রাঢ় বাংলারই কবি ছিলেন। সেদিক থেকে তাঁকে বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলের কবিরূপে চিহ্নিত করা যুক্তিসিদ্ধ।

জন্মস্থান

কিন্তু তাঁর জন্মকাল? শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল এবং ভাষার বিচারে বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মকাল পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপিত হওয়াই সমীচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় চর্যাপদের ভাষার বিবর্তিত রূপের দেখা মেলে। [আহ্মি>আমি] [তুহ্মি>তুমি], [মোক>মোর], [তোহ্মি>তুই] ইত্যাদি সর্বনাম পদই তার প্রমাণ। অবশ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কামান, মজুরী, মজুরিয়া, খরমুজা, কুতোঘাট-এর মতো কতকগুলি ইসলামী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেগুলি ত্রয়োদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতক—এই দুশো বছরের ইসলামী প্রভুত্বের সুনিশ্চিত স্মৃতিচিহ্ন।

জন্মকাল

বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্মণ-বংশেই। বড়ু [বটুক = ব্রাহ্মণ-সন্তান] পদবীই তার প্রমাণ। লোকশ্রুতি-অনুসারে, তিনি ছিলেন বাসলী-পূজারী। সেই বাসলী-মন্দিরের সঙ্গে মিশে আছে রামী রজকিনীর নাম। এই রজকিনী রামীই নাকি তাঁর কাব্য-প্রেরণার উৎস। বলাবাহুল্য, এই প্রসঙ্গের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সম্ভবতঃ, প্রসঙ্গটি বৈষ্ণব সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু সংস্কৃত পুরাণ-সাহিত্য-অলঙ্কার ও দর্শনের ঐতিহ্যে যে তাঁর কবি-মানস লালিত হয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব-বিরচিত গীতগোবিন্দ পাঠের পূর্ব-সংস্কারও তাঁর ছিল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার লৌকিক কাহিনী-ধারার সঙ্গেও ছিল তাঁর গভীর পরিচয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য

অনেকের অনুমান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন এবং পদাবলী তাঁর পরিণত জীবনের ফসল। পদাবলী সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত কতকগুলি পদ পাওয়া গেছে। প্রমাণ-হিসেবে তাঁরা সেগুলি তুলে ধরেন; এবং সেগুলির কোন-কোনটির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন অংশের মিলও রয়েছে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ যেমন 'রাধা বিরহ' খণ্ডে প্রণয়-ব্যাকুলা রাধাকে ত্যাগ করে প্রকৃত যোগসাধকের মতো যোগধ্যান সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিও কি তেমনি ভোগ-সম্ভোগের পালাগান রচনা সাঙ্গ করে পরবর্তী জীবনে শ্রীকৃষ্ণের পরম সাধিকা শ্রীরাধিকার 'যোগিনীপারা' প্রতিমা-নির্মাণে মনঃসংযোগ করেছিলেন? কিন্তু এ-সবই অনুমান-নির্ভর। ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কৃত না-হওয়া পর্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের ইতিহাসসম্মত জীবন-কাহিনী রচনা সম্ভব নয়।

উপসংহার

॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম পুঁথি এবং কাব্যখানি বাংলায় রচিত প্রাচীনতম কাহিনী-কাব্য—বাংলায় রচিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-বিষয়ক কাব্য হিসেবেও প্রাচীনতম। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভাষা সংস্কৃত, বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি; কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীন বাংলা। সেদিক দিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস নিঃসন্দেহে নতুন পথের পথিকৃৎ।

ভূমিকা

বড়ু চণ্ডীদাসের মতো তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও বাংলা সাহিত্যের একটি বহু-বিতর্কিত বিষয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতির রাধামাধব-পদাবলীর

মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উৎসভূমিও শ্রীমদ্ভাগবত। অত্যাচারী কংসের বিনাশের জন্যে মর্ত্যের মানবরূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব—এ তো ভাগবতেরই কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের জন্মখণ্ডে ভাগবতেরই উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ রাধাকে বহু অংশে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে বিষ্ণুর অবতার—নররূপী নারায়ণ। এখানেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দার্শনিক-সূত্রে ভাগবতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কাহিনীর শেষাংশে কংস-বিনাশের জন্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় যাত্রা—তাও ভাগবতী ধারণার সঙ্গে অন্বিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপাদান: ভাগবত

সেই সঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধাকৃষ্ণভিত্তিক লোক-কাহিনীরই প্রাধান্য সমধিক। রাধাকৃষ্ণকাহিনী মূলতঃ একটি গ্রাম্য লোক-কাহিনী—নিষিদ্ধ পরকীয়া প্রেমের ভিত্তির ওপর যার প্রতিষ্ঠা। পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণলীলার সমান্তরাল একটি বিগর্হিত অবৈধ প্রেমের লোক-কথা সম্ভবতঃ বাংলাদেশের জনসমাজে প্রচলিত ছিল। নিষিদ্ধ প্রেম-কাহিনীর অনিবার্য আকর্ষণ সব সমাজেই বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সেইরকম এক নিষিদ্ধ কাহিনীরই সংগীত-রূপায়ণ। সূচনায় এবং সমাপ্তিতেই ভাগবতের কৃষ্ণলীলার অনুপ্রবেশ। কিন্তু মধ্যাংশের সমগ্র কাহিনীতেই লৌকিক কাহিনীরই প্রাধান্য। রাধা কিংবা কৃষ্ণ—কেউই তাদের দৈবী পরিচয় সম্পর্কে সচেতন নয়। পাঠককেও ভুলে যেতে হয় যে, তারা দেবতা। রাধা এবং কৃষ্ণের আচরণও নিম্নশ্রেণীর প্রাকৃত নরনারীর মতো দেহকামনা-মুখর এবং প্রতিশোধপরায়ণ। কেবল তাদের দেহমিলন সাধনের প্রৌঢ়া দূতী বড়াই মাঝেমধ্যে কৃষ্ণের ভগবৎ-সত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে; এবং তাও দেহকামনা-উৎসবের প্রয়োজনে। তাই অনুমিত হয়, কাব্যখানি রাধাকৃষ্ণের জবানিতে কোন স্থানীয় লৌকিক নিষিদ্ধ প্রেম-কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হয়। পরে সম্ভবতঃ সমাজের বিধি-নিষেধের মুখরক্ষার খাতিরে এর অংশবিশেষে রাধাকৃষ্ণের দৈবী পরিচয় আরোপিত হয়। কৃষ্ণ এক লম্পট গ্রাম্য যুবক এবং রাধা তার বয়োজ্যেষ্ঠা আত্মীয়-স্থানীয়া এক অসহায়া নারী। কাব্যের কোথাও ভক্তির স্পর্শমাত্রও নেই। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদাবলীর সমষ্টি। বিভিন্ন খণ্ডের পদগুলি আগে রচিত হয়েছিল, পরে সেগুলি সংস্কৃত শ্লোকের গ্রন্থনসূত্রে গ্রথিত হয়।

লৌকিক উপাদান

রচনা-কালের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের অনুজ এবং কাঠামোর দিক থেকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের কাছে ঋণী। যে রাখালী নাটগীতির [Pastoral drama] আঙ্গিকে গীতগোবিন্দ রচিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও রচিত সেই একই আঙ্গিকে। এমন-কি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানে স্থানে গীতগোবিন্দের কোন কোন অনুপম শ্লোকের ভাবানুবাদও চোখে পড়ে। কিন্তু অবশিষ্ট অংশ পুরাণ-বহির্ভূত বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। এদেশে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার সমান্তরাল গ্রামীণ কৃষ্ণকথা লোক-মানসে ছিল প্রচলিত। তাতে কৃষ্ণ তার

গীতগোবিন্দ ও লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ কাহিনী

মাতুলানীর রূপমুগ্ধ গ্রাম্য গোপ-বালক রূপে চিত্রিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী-ধারার প্রাধান্য আদ্যন্ত লক্ষণীয়। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস পৌরাণিক ও লৌকিক—এই দুই ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেই ব্যর্থতাই হয়েছে প্রকারান্তরে তাঁর সফলতার দ্যোতক। কারণ, তাঁর রাধা এবং কৃষ্ণ দ্যুতিময় দেব-দেবী না হয়ে মর্ত্যের ক্লেদ-মালিন্যময় যথার্থ মানব-মানবী হয়ে উঠেছে। আর, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য-পরিকল্পনাও মূলতঃ স্বর্গের হিরণ্ময় পাত্রে মর্ত্যের মানব-রস পরিবেশন।

বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যর্থতাই সাফল্যের দ্যোতক

আঙ্গিকের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাভঙ্গি জয়দেবের গীতগোবিন্দের মতো রাখালী নাটগীতির ধারানুসারী। তবে গীতগোবিন্দ আদ্যন্ত সংস্কৃতে রচিত, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন রচিত প্রাচীন বাংলায়। খণ্ডগুলির মাঝে মাঝে সংস্কৃত বিবৃতির সূত্রে সমগ্র কাহিনীটি বিধৃত। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই—এই তিনজন নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে এক নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাট্যধারা সমগ্র কাব্যটিতে প্রবাহিত। এই তিনটি প্রধান চরিত্র ছাড়া কাহিনী ও নাট্যরসের প্রয়োজনে কয়েকটি গৌণ চরিত্রেরও আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন—বসুদেব, যশোদা, বলদেব, রাধার সখীরা ইত্যাদি। নাটগীতিটির উক্তি-প্রত্যুক্তিময় পদগুলি গীত হতো; পদ-শীর্ষে 'চিত্রক', 'লগনী', 'দন্তক' ইত্যাদি রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখই তার প্রমাণ। সংগীতময় উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এইভাবে মূল নাট্যরসটি এক সফল পরিণতির দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের যৌথ স্রোতে প্রবাহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীধারায় পয়ারের প্রাধান্যই সমধিক; কিন্তু ত্রিপদীর গঠন-লাবণ্যও অনবদ্য:

আঙ্গিক-বিচার

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতি হো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে॥

[দিনের সূর্য আমাকে পুড়িয়ে মারে, রাতের চন্দ্রকিরণও দুঃখময়। প্রাণে এ সব কেমন করে সইবো? চোখেও ঘুম আসে না।]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শিল্পগৌরব তার চরিত্র-সৃষ্টির অনন্যতার মধ্যে প্রোজ্জ্বল। চরিত্র-গুলি—বিশেষতঃ, রাধা চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত এবং নাটকীয় গুণান্বিত। তাদের উপাদান-উপকরণ সুনিশ্চিতভাবে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত। চরিত্র-নির্মাণে ও তার ক্রম-বিকাশে কবি সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের অনুশাসন বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সেকালের বিচারে সত্যিই বিস্ময়কর।

চরিত্র-বিচার

যদিও কাব্যখানির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [বা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ], তবু এই কাব্যের প্রধান

আকর্ষণীয় চরিত্র কৃষ্ণ নয়—রাধা। রাধার প্রাধান্যই কাব্যখানির আদ্যন্ত প্রতিষ্ঠিত। এক সম্পূর্ণ বিপরীত কোটি থেকে ক্রম-পরিবর্তনের ধারা-পথে তাকে এনে অনুকূল কোটিতে স্থাপন করার মধ্যেই বড়ু চণ্ডীদাসের শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত। রাধা সাগর গোপের কন্যা—পদুমার গর্ভজাতা। সে ক্লীব 'আইহনের নারী'—অপ্রাপ্তবয়স্কা। অপূর্ব রূপবতী সে। রূপমুগ্ধ কৃষ্ণ রাধা-মিলনের জন্যে নানা ছল-চাতুরি ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু রাধা নিস্পৃহ—নিরাসক্ত। শেষে কামার্ত কৃষ্ণের লাম্পট্যের সঙ্গে বড়ায়ির প্রশ্রয় এবং চক্রান্ত যুক্ত হয়েছে। তখন অসহায় রাধার কণ্ঠে প্রবল আক্ষেপের স্বরে শোনা যায়ঃ 'কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী/আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।' [হে বিধাতা, নারী সৃষ্টি করে কী করেছো? হরিণ যে জগতের শত্রু—সে তো তার নিজের মাংসের জন্যেই।'] সেই প্রেমহীনা রাধা ধীরে ধীরে শুধু প্রেমময়ী নয়, প্রেমসর্বস্বা নারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সে যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তা মর্ত্য-জীবনে সে বিস্মৃত। কৃষ্ণ তাকে বারে বারে তার দৈবী পরিচয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে; এমন-কি, তা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে কখনো কখনো বল-প্রয়োগও করেছে। কিন্তু রাধা মর্ত্যে তার মানবী-সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে তার দেবীত্বে ফিরে যেতে পারেনি। তা পারলে বড়ু চণ্ডীদাসের শিল্পী-সত্তা স্বধর্মচ্যুত হতো—কাহিনী ও নাট্যরসেরও ঘটতো অপঘাত মৃত্যু। রাধার তাম্বুলখণ্ড ও দানখণ্ডের প্রবল প্রতিরোধ ধীরে ধীরে ক্ষয়িত হয়ে বংশীখণ্ডে তা একান্ত আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়েছে। সেখানে রাধার আর্তি অতি তীক্ষ্ণ মর্মস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত:

রাধা

কে না বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাশীর শবদেঁ মো আউলাইলো রান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পদে নিশিবোঁ আপনা॥

[কালিন্দী/যমুনা নদীর কূলে গোকুলের গোষ্ঠে কে বাঁশী বাজায়? আমার শরীর মন ব্যাকুল। বাঁশীর স্বরে এলোমেলো হয়ে যায় আমার রান্না। বড়াই সে কে, যে বাঁশী বাজায়? আমি তার পায়ে দাসীরূপে নিজেকে উৎসর্গ করবো।]

প্রেমহীনা রাধার হৃদয়ে প্রেমের সুতীব্র আর্তি সৃষ্টিতে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব বিস্ময়কর। রাধা আজ অ-প্রেম থেকে প্রেমের স্বর্গে উত্তীর্ণা। এখন তার মুখে শোনা যায়:

পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ
মেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাওঁ।
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।

আমি পাখি নই যে, তার কাছে উড়ে যাই। তার চেয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হোক, আমি তাতে প্রবেশ করে আত্মগোপন করি। ওগো বড়াই, বন পোড়ে—জগতের মানুষ জানে। আর, আমার মন পোড়ে যেন কুমোরের হাঁড়ি পোড়ানোর আগুন।]

তারপর রাধা-বিরহ খণ্ডে সেই আর্তি এক অসীম গভীরতা স্পর্শ করেছে। এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা হয়ে উঠেছে পদাবলীর রাধার নিকট-প্রতিবেশিনী। স্মরণীয়, এই চূড়ান্ত পর্যায়েও রাধা বৈকুণ্ঠের রাধা বা ভাগবতী রাধায় পরিণত হয়নি। হলে, কাব্য-মহিমা নিঃসন্দেহে ম্লান হয়ে যেত।

পদাবলীর মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা বহু যুগ-যুগান্তরের সাধনার ক্রম-বিবর্তিত পরিণাম-ফল। বৈষ্ণব-কবির মর্ত্যজীবনের মানবী প্রিয়াই, রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যমতে, শ্রীরাধিকার প্রেমছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুতঃ, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন গড়ে তোলা হয়, তখন দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরকীয়া প্রেমের মানব-রসের পদগুলি আহরণ করে তার ওপরে অপ্রাকৃত লীলা-রসের ইংগিত আরোপ করা হয়। তার ফলে, মানবী রাধা হয়ে ওঠে মহাভাব-স্বরূপিণী ভাগবতী রাধা। সেইজন্যেই শ্রীচৈতন্য-পূর্ব রাধার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী রাধার এত অমিল। জয়দেব বা বিদ্যাপতির রাধাও মূলতঃ মানবী। কিন্তু চৈতন্য-সংস্কার ও পরবর্তী বৈষ্ণব-সংস্কারের চন্দন-লেপনে তার আনুপূর্বিক রূপান্তর সাধিত হয়ে গেছে। সেদিক থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের রাধার মধ্যে শ্রীচৈতন্য যদি তাঁর মহাভাবের রাধাকে খুঁজে পেয়ে থাকেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও পদাবলীর রাধা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ দীপ্তিময়ী ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রাধার পাশে ম্লান এবং অসংগতিপূর্ণ। সে বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের চন্দন-লিপ্ত বিগ্রহ নয়, সে মর্ত্যমালিন্যযুক্ত সাধারণ প্রাকৃত মানুষ। বস্তুতঃ, কবির শৈল্পিক একাগ্রতা রাধাই আদায় করে নিয়েছে। কৃষ্ণ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে তার স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়েছে। কৃষ্ণ কাব্যের কোথাও বিস্মৃত হয়নি যে, সে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু। তার মানব-দেহ ধারণের মূল পরিকল্পনাই হলো অত্যাচারী কংসের বিনাশ। 'তাহার হাথে হৈবে কংসাসুরের বিনাশে।' কিন্তু সমগ্র কাব্যময় তার আচরণ, বাদানুবাদ, ছল-চাতুরি নিম্ন-শ্রেণীর, নিম্ন-রুচির মানবের সমতুল্য। তার মধ্যে ভাগবতী অধ্যাত্মবিশ্বাস ও মানবিক চেতনার সংগত সমীকরণ ঘটেনি, তার মধ্যে দেবতা ও মানুষের সুসংগতিও স্থাপিত হয়নি কোথাও। লম্পট, কামার্ত গোপ-বালকের আচরণ কোথাও তাই দৈবী সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি। দম্ভ এবং অমানুষী শক্তির প্রকাশই কি কৃষ্ণ? ভক্তের হৃদয় আকর্ষণের মাধুরী কি কৃষ্ণ নয়? তবে একথাও সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ এভাবে চিত্রিত না হলে তার বৈপরীত্যে রাধা-চরিত্রের এমন মনস্তাত্ত্বিক ও শিল্পসম্মত ক্রমবিকাশ হয়তো সম্ভব হতো না। শেষ পর্যায়ে প্রেমহীনা রাধা হয়ে উঠেছে কৃষ্ণপ্রেমসর্বস্বা—কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী। কিন্তু কৃষ্ণ? সে অন্তরে অন্তরে রাধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যোগ-সাধনায় নিজেকে

কৃষ্ণ

নির্জনে করেছে নিমগ্ন! এ কি তবে ভগবৎপ্রেমহীন মানবের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম অঙ্কুরিত করার সংকেতময় কাব্য সংগীত? সে যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের দম্ভ এবং লাম্পট্য তিরোহিত। কংস-বিনাশের জন্যে মথুরায় গমনোদ্যত হয়েছে সে। কিন্তু রাধার প্রতি মানবিক কামনার অবসানে তার মনে জাগরিত হয়েছে অপার করুণা। এবং সেই করুণার উদ্রেকেই কাব্যটির পরিসমাপ্তি।

বড়াই চরিত্র-নির্মাণে অবশ্যই কবির কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রেম-ঘটনার দূতী বা কুট্টনী চরিত্রের আদর্শে বড়াই চরিত্রটি নির্মিত। সে রাধার মায়ের পিসী; অর্থাৎ, মাতামহী। সে রাধাকৃষ্ণের মিলনের ঘটকালি করেছে। তার মুখে রাধার রূপ-বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ রাধার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সে-ই প্রেমের প্রথম দৌত্যকর্মে নিযুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রেমহীনা রাধার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার করেছে। কৃষ্ণ যে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ, সে পরিচয় বড়াইর জানা। রাধার প্রতি সে স্নেহশীলাও বটে। রাধা-কৃষ্ণের মিলন সংঘটনের পশ্চাতে

বড়াই

তার কোন কু-প্রবৃত্তি বা স্বার্থ-সিদ্ধির গোপন চক্রান্ত নেই। নিছক স্নেহবশেই সে এই প্রেম-নাটকে দূতীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব সেখানে নয়, তাঁর কৃতিত্ব বড়াইকে এক স্নেহশীলা ও পরিহাস-নিপুণা স্থূল-রুচির গ্রাম্য মাতামহীরূপে চিত্রণের সফলতায়। সম্ভবতঃ, সেইজন্যেই সে অসামাজিক প্রেমকেও প্রশ্রয় দিয়েছে। হয়তো তৎকালীন সমাজে তার বীজ নিহিত ছিল। অসামাজিক বা অপ্রাকৃত, যা-ই হোক না কেন, রাধাকৃষ্ণ-মিলন-সংঘটনে বড়াই তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে।

আধুনিক রুচির তৌলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোথাও কোথাও অশালীন রুচি ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু স্মরণীয় যে, কাব্যখানির রচনা-কাল মধ্যযুগের প্রভাতলগ্ন এবং সেকালের জনরুচি নিশ্চিতভাবে আধুনিক রুচিসম্মত ছিল না। আর, যে রুচি বিচারের তৌলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাহিত্য-মান বিচার করা হয়, তা দীর্ঘকালের কাব্য-পাঠের অর্জিত ফল। যুগ-যুগান্তরের উন্নত রুচির কাব্য-পাঠের সংস্কারে এবং বিশ শতকীয় পরিশীলিত সাহিত্য-রুচির বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্থানে

রুচি-বিচার

স্থানে নিঃসন্দেহে নিম্নরুচির কাব্যরূপে পরিগণিত হবে। কিন্তু তাতে অবিচার করা হবে কাব্যের প্রতি—কবির প্রতিও। বিশ শতকীয় পরিশীলিত রুচির তৌলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিচার অন্যায় এবং অনুচিত। কাব্যখানির অশালীন রুচি ও গ্রাম্যতা দোষের জন্যে দায়ী সেকালের যুগ-রুচি ও সমাজধর্ম; সেজন্যে কবি বা কাব্যকে দায়ী করা এক ধরনের ভ্রান্তিবিলাস মাত্র।

কাব্যখানির সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পরিণতির আলোকে রুচির প্রশ্নও ম্লান হয়ে যায়। রাধা-বিরহ খণ্ডে কাব্যখানির প্রকৃত উত্তরণ। সেখানে বিচ্ছেদ-বেদনা-বিহ্বলা রাধার বিরহার্তি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় রূপলাভ করেছে :

মুছিয়াঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিঁদুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।
কাহ্ন বিনা সবখন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।

উপসংহার

—'বড়াই, আমি সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলবো, হাতের বলয় ভেঙে চুরমার করবো। বিষাক্ত ধনুকের আঘাতে আহত হরিণীর মতো কৃষ্ণের বিরহে আমার প্রাণ সব সময় দগ্ধীভূত হচ্ছে।' মর্ত্যরসের সংগীত এখানেই বিরহের স্বর্গলোকে উপনীত হয়েছে; যেখানে পদাবলীর পরিচিত চণ্ডীদাসের হৃদয়-নিঙড়ানো প্রেম-বিহ্বল কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যায়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরও তাই বলেন, 'কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের মাঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তাহার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন।' বলা যায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ, পদাবলী সাহিত্যের সেখানে আরম্ভ॥'

অনুসরণী-২

*১. কবি বড়ু চণ্ডীদাস এবং তাঁর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্বন্ধে যা জান লিখ। [২৪ পৃ.—৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কর্তা কে? এই কাব্যখানির প্রাচীনতা বিচার কর। [২৪ পৃ.—২৬ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৩. চণ্ডীদাস-সমস্যার স্বরূপ কি? এই সমস্যার একটি যুক্তিনিষ্ঠ সমাধান-সূত্র নির্দেশ কর। [২১ পৃ.—২৬ পৃ দ্রষ্টব্য]

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থান নির্ণয় কর। [২৪ পৃ.—২৫ পৃ. এবং ২৯ পৃ.—৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাব্যমূল্য বা শিল্পমূল্য বিচার কর। [২৯ পৃ.—৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপাদান বিচার করে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য-সাফল্য বিচার কর। [২৮ পৃ.—৩৫ পৃ দ্রষ্টব্য]

৭. 'বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যর্থতাই সাফল্যের দ্যোতক।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে এই মন্তব্যটি কতখানি প্রযোজ্য আলোচনা কর। [২৯ পৃ.—৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শিল্প-গৌরব তার চরিত্র-সৃষ্টির অনন্যতার মধ্যে প্রোজ্জ্বল।'—মন্তব্যটির সত্যতা বিচার কর। [২৯ পৃ.—৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৯. রাধা-চরিত্র সৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশে বড়ু চণ্ডীদাস যে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন, তার পরিচয় দাও। [৩১ পৃ.—৩৩ পৃ দ্রষ্টব্য]

১০. কারো কারো মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অশ্লীল নিম্ন-রুচির কাব্য।—এ সম্বন্ধে তোমার মতামত ব্যক্ত কর। [৩৪ পৃ.—৩৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

———

৩.

মহাকবি কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ-কাব্য

'কৃত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।'
—কবি শ্রীমধুসূদন

॥ অনুবাদ-কাব্য ॥

তুর্কী-আক্রমণ বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এতাদন বর্ণাশ্রম-শাসিত হিন্দুসমাজ সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যজনিত এক অবক্ষয়ের পথে দ্রুত চলেছিল এগিয়ে। তুর্কী-আক্রমণের আঘাতে হিন্দু-সমাজের সেই আভিজাত্যের সৌধ পড়লো ভেঙে। পরাজিত, বিধ্বস্ত, হতমান হিন্দুসমাজ সেই যুগান্তরের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলো, পুনর্জাগরণ ও পুনরুত্থানের জন্যে এই খণ্ড, ছিন্ন, দুর্বল জাতির সর্বাগ্রে চাই মানসিক সংহতি, চাই ভাবমূলক ঐক্য। এতদিনে জাতির অন্তরাত্মায় জেগে উঠলো দ্বন্দ্বকাতর অভিজাত ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাত্মক মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনভিজাত লৌকিক সংস্কৃতি সসম্মানে গৃহীত হলো। তার পরিণাম-ফল হলো মঙ্গলকাব্য। কিন্তু শুধু একতরফাভাবে গ্রহণের মধ্যেই 'দিবে আর নিবে'র আদর্শ সফল হতে পারে না। তাই কিছু দিতে হয়। বর্ণ-হিন্দুসমাজ এবার তার পুরাণ-ভাগবতের সুবিপুল ঐতিহ্য অনভিজাত, গৌরবহীন, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো। রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদের পেছনে ছিল এই সামাজিক প্রয়োজনবোধ। কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুর রচনায় তার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভূমিকা

ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে যে নবজাগরণ এসেছিল, তার প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্য। তাই সেই নবজাগৃতিকে কেউ কেউ 'চৈতন্য-রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংঘটিত রেনেসাঁসের প্রাণপ্রেরণা এসেছিল বেদান্ত ও উপনিষদ থেকে। কিন্তু ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে যে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রাণ-প্রেরণা এসেছিল পুরাণ এবং ভাগবত থেকে। তাই তার উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের ভিত্তি যেখানে ছিল জ্ঞান, সেখানে ষোড়শ শতকের রেনেসাঁসের ভিত্তি ছিল ভক্তি। সেদিক থেকে জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস এবং মালাধর

রেনেসাঁসের পথ-নির্মাণ

বস্তুকে ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁসের, বলা যায়, অগ্রদূত—পথিকৃৎ। পুরাণ এবং ভাগবতের বাংলা অনুবাদের মধ্যস্থতায় তার পথ নির্মাণের সূত্রপাত।

অনুবাদ-কাব্য শাখা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ, লোক-প্রিয় কাব্য-ধারা। গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেমন রাধাকৃষ্ণলীলার মৌলিক কাব্য, অনুবাদ-কাব্যগুলি তেমনি পুরাণাশ্রয়ী অনুবাদ-কাব্য। বাংলাদেশে মধ্যযুগে যে বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে সংস্কৃত পুরাণগুলির অনুবাদের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। সংস্কৃতের জটিল জটাবন্ধনে পুরাণের সমৃদ্ধ কাহিনীগুলি ছিল বন্দী। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবিগণ সেই পৌরাণিক কাহিনীগুলিকে লোক-জীবনের অভিমুখীন করেছিলেন। সর্ব-ভারতীয় জাহ্নবী-ধারা যেমন ভাগীরথী-রূপে বাংলাদেশকে সজীব ও সরস করে তুলেছে, পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলিও তেমনি বঙ্গ-ভাষা-বাহিনী হয়ে বাংলাদেশকে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে রস-সিক্ত করে আসছে। কেবল আনন্দ-বিতরণই নয়, এরা তার সমাজ-গঠনেরও হয়েছে প্রধান সহায়ক।

অনুবাদ-কাব্য-সাহিত্যের ভাব-উৎস

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-সাহিত্য একান্তভাবে মূলানুগত নয়। মূল কাব্য-প্রেরণার উৎস হলেও এবং কাব্য-কাঠামো পূর্ব-নির্ধারিত হলেও বাঙালী কবিগণ তারই মধ্যে রেখেছেন স্বকীয়তার স্বাক্ষর। তাঁরা প্রয়োজনমতো কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন করেছেন। তাতে পুরাণগুলির সর্বভারতীয় জীবনাদর্শ খর্ব হলেও বাঙালীর জীবনাদর্শ লাভ করেছে পূর্ণ মর্যাদা। অনুবাদ-কাব্য-গুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতই প্রধান। তাছাড়া, কবি আলাওল হিন্দী 'পদুমাবৎ' কাব্যেরও বঙ্গানুবাদ করেন। তবে রামায়ণ-মহাভারতের মতো অন্য কোন অনুবাদ কাব্য এত লোকপ্রিয় হয়নি।

অনুবাদ-প্রকৃতি

এই পৌরাণিক কাব্যানুবাদের মূলে রয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি। বাংলাদেশে তুর্কী-বিজয় সমাপ্ত হলে বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমাজের নবতর প্রতিরোধের প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হলো। সেন-রাজবংশের রাজত্বকালে এই প্রতিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের প্লাবনকে রোধ করবার জন্যে। তুর্কী-আক্রমণে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যুলগ্ন ঘনিয়ে এলে হিন্দু-সমাজ তুর্কী-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সেই প্রতিরোধকে কাজে লাগাতে হলো বদ্ধপরিকর। এবার পৌরাণিক আদর্শের কঠিন শাসনে সমাজের সংহতি-সাধনের প্রয়াস সেই প্রতিরোধকে আরও শক্তিশালী করে তুললো। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ প্রয়াস, প্রকৃতপক্ষে, পরাজিত জাতির সাংস্কৃতিক প্রতিরোধেরই নামান্তর। অন্যদিকে, রাজনৈতিক বিজয় লাভ করে বিজয়ী মুসলমান শাসকগণ করতে লাগলো বাঙালীর হৃদয়-জয়ের চেষ্টা। তাঁরা এদেশকে, এদেশের মানুষকে ও তার সংস্কৃতিকে চাইলেন মনে-প্রাণে জানতে। তাই দেখা যায়, অনুবাদ-কাব্যের প্রায় সবগুলিই তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। তাছাড়া, আরও একটি কারণে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তুর্কী-আক্রমণের

সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

পটভূমিতে যখন সামাজিক উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক তাগিদে উচ্চশ্রেণীর মানুষ নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিল, তখন নিম্নশ্রেণীর হাতে উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃতি তুলে দেবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয় সমাজের মর্মে। সমাজের আভ্যন্তরীণ আদান-প্রদানের প্রয়োজনেই হিন্দু-পুরাণগুলির অনুবাদ তাই হয়ে পড়ে অনিবার্য।

শুধু বাংলাদেশে এবং বাংলা ভাষাতেই যে পৌরাণিক সাহিত্যের অনুবাদের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, তা নয়; সমগ্র ভারতে অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায়ও এই মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসী রামায়ণও এই মহোৎসবের স্মরণীয় পরিণাম-ফল। এই মহোৎসবের পশ্চাতে ছিল ইতিহাসের এক সুগভীর চক্রান্ত।

ভক্তিবাদের পথ-নির্মাণ

সেই চক্রান্তটি হলো, সারাদেশে ভক্তিবাদের এক আলোকিত পথ-নির্মাণ। এইভাবে বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই ভক্তিবাদের আলোকিত পথ নির্মিত হয়ে যায়। কাজেই, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তাগিদেই রামায়ণের অনুবাদ। কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণ সর্বভারতীয় সংস্কৃতিরই বাণী-বিগ্রহ। বাঙালী কবিগণ তাকে বাঙালীর ভাব-ধারায় এবং প্রাণ-চেতনায় অভিষিক্ত করে সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নিজস্ব সম্পত্তি করে নিয়েছেন।

কবি কৃত্তিবাসও সেই সর্বভারতীয় রামায়ণী-কথাকে সংস্কৃতের জটাবন্ধনমুক্ত করে বাঙালীর হৃদয়ের অভিমুখে প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে

কৃত্তিবাস বাংলায় রামায়ণী-কথার প্রথম ভগীরথ

রাম-সীতার সামান্য উল্লেখ মাত্র ছাড়া তাঁদের বিশদ মূর্তি কোথাও স্থাপিত হতে পারেনি। কৃত্তিবাসই তাঁর অমর লেখনীতে তাঁদের অনবদ্য মূর্তি রচনা করে, বাঙালীর হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার রসে নবরূপে সঞ্জীবিত করে সগৌরবে স্থাপন করলেন বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে। কৃত্তিবাস বাংলা সাহিত্যে রামায়ণী-কথার প্রথম ভগীরথ।

॥ মহাকবি কৃত্তিবাসের জীবন-কাহিনী ॥

মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠা বাঙালীর হৃদয়ের সিংহাসনে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালী পাঠক তাঁর কাব্যের রসাস্বাদন করে ধন্য হয়েছে; তাঁর কাব্য থেকে আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ রচনার প্রেরণা লাভ করে উপকৃত হয়েছে। কবিগুরু

ভূমিকা

বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি শুধু সংস্কৃতের জটাবন্ধন থেকে মুক্ত করেন নি; তিনি সংস্কৃত রামায়ণকে বাঙালীর আদর্শে, এমন-কি, বাঙালীর হৃদয়ের রসে অনুবাদ করেছেন। মহাকবি কৃত্তিবাসের কাছে বাঙালী জাতির তাই ঋণের অন্ত নেই।

বঙ্গদেশের উপান্তে তখন ছিল ব্রাহ্মণের অধিকার। অধীশ্বর ছিলেন বেদানুজ মহারাজ। ব্রাহ্মণ মহারাজার পাত্রও ছিলেন ব্রাহ্মণ। নাম—নরসিংহ ওঝা। সুখেই

পশ্চাৎপট

দিন কাটছিল নরসিং ওঝার। কিন্তু এমন সময় 'বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।' দেশত্যাগের জন্যে সকলেই উন্মুখ। কারণ, সেখানে জীবনের নিরাপত্তা নেই, নেই ধর্মাচরণের নিরাপত্তা; এমন-কি, ব্রাহ্মণের অধিকারও সেখানে বিপর্যস্ত।

নিরুপায় ব্রাহ্মণ নরসিংহ ওঝাও প্রস্তুত হলেন দেশত্যাগের জন্যে। ভিটামাটির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সে কথা স্মরণ করে বিপন্ন ব্রাহ্মণ একটি অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস রেখে সেখান থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করলেন। তারপর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁর কেটেছে বহুদিন। শেষে 'বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ওঝা আইল গঙ্গাতীরে।' গঙ্গাতীরে তিনি আপন মনে ভ্রমণ করতে লাগলেন। গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাস, নদীতীরের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর ব্যথিত হৃদয়ের ব্যথাভার দিল মুছিয়ে। দেশত্যাগের বেদনা, পথশ্রান্তি এবং ব্যাকুল উৎকণ্ঠা—সমস্তই গেল মুছে। তাঁর মনোহরণ করলো শান্ত, শীতল, মনোরম গঙ্গার তীরের অনির্বচনীয় শোভা।

নরসিংহ ওঝার দেশত্যাগ

দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্ত গেল। ঘনিয়ে এলো রাত্রি। ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরেই রাত্রি-যাপনের জন্যে তাঁর শয্যা রচনা করলেন। রাত্রি প্রভাত হতে তখনও বিলম্ব আছে। দূর থেকে কুকুরের ডাক শোনা যায়। ব্রাহ্মণ জেগে উঠে শুনলেন দৈববাণী। আর কোন সংশয় নয়, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়। ব্রাহ্মণ সেখানেই তাঁর ঘর বাঁধলেন। গ্রামের নাম ফুলিয়া। এখানে মালী জাতির বাস। চারদিকে বিবিধ ফুলের সমারোহ—বহুবিচিত্র পুষ্প-মালঞ্চ।

গ্রামরত্ন ফুলিয়া

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥

এই ফুলিয়া গ্রামেই সুখে-সম্পদে জীবন কাটতে লাগলো ব্রাহ্মণ নরসিংহ ওঝার। কবি-ধাত্রী গ্রামরত্ন এই ফুলিয়া। কালক্রমে, এখানেই এই নরসিংহ ওঝার বংশে এক পুণ্য দিবসে জন্মগ্রহণ করলেন বাংলার অমর-কবি কৃত্তিবাস।

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য [পূর্ণ ?] মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।

মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি, রবিবার—কবি কৃত্তিবাসের পবিত্র জন্মদিন। কিন্তু কত সাল ? তার উল্লেখ নেই। চারদিকে মধ্যযুগের নীরন্ধ্র অন্ধকার। তার মধ্যে এই প্রথম শোনা গেল বাংলার অতি-প্রিয় কবি-কণ্ঠ। সেই কণ্ঠস্বর বাঙালীর একান্ত আপন। বাঙালীর মর্মমূলে বাজে তার অনবদ্য সুর। 'মালিনী [মানিকী ?] নামেতে মাতা বাপ বনমালী।' তাঁদের কোলে জন্ম গ্রহণ করলেন সরস্বতীর বরপুত্র কবি কৃত্তিবাস। নবজাত কবি-শিশুকে পিতামহ মুরারি ওঝা উত্তম বস্ত্র দিয়ে নিলেন বরণ করে।

কৃত্তিবাসের জন্ম

'ওঝা' শব্দটি 'উপাধ্যায়' শব্দেরই বিবর্তিত রূপ। সম্ভবতঃ সেকালের শিক্ষকরাই এই পদবী প্রাপ্ত হতেন। সেদিক থেকে মনে হয়, শিক্ষকতাই ছিল এই পরিবারের পারিবারিক বৃত্তি। মূল পদবী ছিল মুখুটি, অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়, যাতে উপাধ্যায় পদবীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। পিতামহ মুরারি ওঝা ছিলেন সে অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তি। কৃত্তিবাসরা ছিলেন ছয় ভাই। 'পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।' পণ্ডিত ভাইদের মধ্যে একমাত্র কৃত্তিবাসই ছিলেন গুণবান্—প্রতিভাধর।

বংশ-পরিচিতি

স্নেহপ্রবণ পিতামহ ও পিতামাতার স্নেহে, ভাইদের ভালোবাসায়, গ্রামরত্ন ফুলিয়ার শোভা-সৌন্দর্যে এবং গঙ্গার স্নিগ্ধ-শীতল বাতাসে কৃত্তিবাস ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। গ্রামরত্ন ফুলিয়ার পুষ্প-মালঞ্চ এবং পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তরঙ্গ-বিস্তার তাঁর জীবনে মিথ্যা হয়নি। শৈশবেই ফুলিয়ার অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন নিজের হাতে তাঁর কবি-পুত্রের কবি-মানসকে গঠন করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ফুলিয়ার গ্রামীণ সমাজ, তার পারিবারিক সম্পর্ক, তার ধর্ম-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনা পরবর্তীকালে তাঁব কাব্য-রচনায় নিঃসন্দেহে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

শৈশব

দেখতে দেখতে এগারো পার হয়ে কৃত্তিবাস দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করলেন। সমাপ্ত হল গৃহ-শিক্ষা। এবার শুরু হবে তৎকালীন সামাজিক প্রথানুযায়ী গুরু-গৃহবাস। বড়গঙ্গার [অর্থাৎ পদ্মার] পরপারে বরেন্দ্রভূমি। তাইই কবি-কথিত 'উত্তর দেশ'। পদ্মা পার হয়ে সেই উত্তর দেশে গুরুগৃহে বিদ্যালাভের বাসনায় যাত্রা করলেন কবি কিশোর।

বাল্য-শিক্ষা

বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বরেন্দ্র উত্তর গেলাম বড়গঙ্গার পার॥

গুরুগৃহে প্রথামত বালক কৃত্তিবাসের বিদ্যাভ্যাস চলতে লাগলো। যেখানেই তিনি শিক্ষণীয় বিষয় যা পেয়েছেন, শিক্ষা করেছেন। এইভাবে নানা উপকরণে তাঁর কবি-মানস ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে উঠলো। তাঁর শরীরে হলো সরস্বতীর অধিষ্ঠান। মুখে মুখে স্ফুরিত হয় কত স্বরচিত শ্লোক। কবিগুরু বাল্মীকির রামায়ণের পাতায় পাতায় চলে তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর কিশোর প্রাণকে মুগ্ধ করে রামায়ণের অপরূপ সৌন্দর্য। ধীরে ধীরে নানা ছন্দ, নানা ভাষা, নানা বিদ্যার অধিকারী হলেন তিনি। কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হলেন ভারতী। ব্যাস-বশিষ্ঠ-চ্যবন-বাল্মীকির মতো তাঁর গুরুদেবের অগাধ পাণ্ডিত্য। মুগ্ধ-বিস্ময়ে কৃত্তিবাস গুরুদেবের মুখে শোনেন কাব্যের নানান্ ব্যাখ্যা। আনন্দে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কৃত্তিবাসের মুখ। সমাপ্ত হলো গুরু-গৃহবাস। গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন কৃত্তিবাস। ব্রহ্মার সদৃশ গুরু আশীর্বাদ রাখলেন তাঁর মাথায়। সেদিন মঙ্গলবার। গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জীবনের নতুন পথে যাত্রা করলেন কবি কৃত্তিবাস।

অথচ গৌড়েশ্বরের স্বীকৃতি ভিন্ন কবি-খ্যাতি নেই। কিন্তু এই গৌড়েশ্বরের নাম কি? কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে তারও উল্লেখ নেই। শুধু বর্ণিত আছে তাঁর শক্তিমত্তার কথা—গৌড়েশ্বর পঞ্চগৌড়ের রাজা এবং 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণীর হয় পূজা।'

মাঘ মাসের প্রাতঃকাল। রাজা গৌড়েশ্বরের সিংহ-দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন ব্রাহ্মণ-যুবক কৃত্তিবাস। স্বরচিত সাতটি শ্লোক রাজার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে সাগ্রহে রাজার আমন্ত্রণের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কখন ডাক আসবে? বেলা সাত ঘটিকা হলো। সিংহদ্বারে বেজে উঠলো রাজসভার

রাজসভায় কৃত্তিবাস

প্রাতঃকালীন অধিবেশনের সমাপ্তি-সূচক নহবৎ। এমন সময় স্বর্ণ লাঠি হাতে ছুটে এলো রাজার দূত :

কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ॥

রাজার ডাক এসেছে। সানন্দে এবং শঙ্কিত চিত্তে রাজসভার দিকে অগ্রসর হলেন কবি কৃত্তিবাস। একে একে নয়টি দ্বার পার হয়ে গেলেন কবি। দু'পাশে সোনা-রূপার কত ঘর—

নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন 'পরে।

চারদিকে পাত্র-মিত্র, পণ্ডিত এবং সভাসদ্। আঙিনায় পাতা রাঙা মাদুর, তার ওপরে পট্টবস্ত্রের পাছড়ি।

পাটের চাঁন্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসের খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥

রাজসভা নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ, শ্রী ও সৌন্দর্যে অপরূপ। রাজা হাতছানি দিয়ে কবিকে কাছে যেতে ইশারা করলেন। রাজার সন্নিধানে দাঁড়িয়ে কবির কণ্ঠ সহসা মুখর হয়ে উঠলো। রাজার চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে কবি আবৃত্তি করলেন একে একে সাতটি শ্লোক।

পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক সরে॥

নানা ছন্দে, নানা রসমধুর শ্লোক সভায় আবৃত্তি করলেন কৃত্তিবাস। রাজা গৌড়েশ্বর মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন কবির মুখের দিকে। সানন্দে মহারাজা গলার পুষ্পমাল্য কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে বরণ করে নিলেন রাজ-কবি রূপে। মন্ত্রী কেদার খাঁ মাথায় দিল চন্দনের ছড়া, পাটের পাছড়া দিলেন রাজা গৌড়েশ্বর। আর কি চাই? রাজা কবিকে আর কি দিবেন? 'রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।' পাত্র-মিত্র সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগলেন কবির। পঞ্চগৌড়ের রাজা গৌড়েশ্বরের সম্মানের অর্থ সমগ্র বাংলাদেশের সম্মান। কিন্তু কবির যে প্রার্থনা করবার মতো কিছুই নেই। তিনি আজ দুর্লভ কবি-খ্যাতি পেয়েছেন, পেয়েছেন রাজসম্মান। কৃত্তিবাসের কণ্ঠে শোনা গেল :

কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

কৃত্তিবাসের পার্থিব বিষয়ের প্রতি নিরাসক্তিতে এবং তাঁর কবিত্বে ও পাণ্ডিত্যে রাজা মুগ্ধ হলেন। সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে রামায়ণ রচনা করতে জানালেন সনির্বন্ধ অনুরোধ। রাজসম্মান মাথায় নিয়ে, কপালে চন্দনের টিপ এবং গলায় পাটের পাছড়া নিয়ে কবি

সিংহ-দ্বার পার হয়ে এলেন বাইরে। বাইরে তখন সমবেত জনতার কণ্ঠে উঠছে কবি কৃত্তিবাসের সোচ্চার জয়ধ্বনি।

চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।

রাজ-সংবর্ধনা ও প্রশংসা-মুখর জনতার জয়ধ্বনি নিয়ে কবি কৃত্তিবাস প্রত্যাবর্তন করলেন স্বগৃহে। তার ফল-পরিণামে রচিত হয় কৃত্তিবাসের অমর-কাব্য রামায়ণ।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রেরণা

কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনার প্রেরণার উৎস কি? কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীতে আছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কবি একস্থলে স্বীকার করেছেন 'বাপমায়ের আশীর্বাদ গুরু আজ্ঞা দান। বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥' আবার, অন্যত্র বলেছেন—'সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত। লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥ রঘুবংশের কীর্তি কেবা বর্ণিবারে পারে। কৃত্তিবাসে রচে গীত সরস্বতীর বরে।' কাজেই, কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রেরণার উৎস-ভূমিতে রয়েছে পিতামাতা ও গুরুর আশীর্বাদ, রাজানুরোধ, সরস্বতীর অনুগ্রহ, মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য এবং লোক-শিক্ষার মহৎ আদর্শ।

সাংস্কৃতিক ঐক্য

কিন্তু এহ বাহ্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার মূল প্রেরণা হলো সমাজের মানসিক ঐক্য বা সাংস্কৃতিক ঐক্যের এক প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা। রামায়ণ হিন্দু-সমাজের একটি প্রধান ভিত্তি। তুর্কী-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন সামাজিক ঐক্য-সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হলো, তখন পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়ার প্রশ্নটি খুব জরুরী হয়ে ওঠে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার পেছনে এই সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টির মনোভাব ছিল প্রচ্ছন্ন। তাঁর নিজস্ব রচনায় রয়েছে তার স্বীকৃতি—'লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত।' বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে লোক-মানসকে পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্ম শেখাবার জন্যেই এই আয়োজন।

কৃত্তিবাসের লোকপ্রিয়তা

কৃত্তিবাস বাংলার লোকপ্রিয় কবি। ধনিকের অট্টালিকা থেকে দরিদ্রের পর্ণ-কুটির পর্যন্ত তাঁর কাব্যের অবাধ প্রসার। তাঁর রচিত রামায়ণের বৈশিষ্ট্যই তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার দুয়ার খুলে দিয়েছে। পরিবেশ-রচনায়, চরিত্র-রূপায়ণে এবং ভক্তিরসের আশ্লেষে তাঁর রামায়ণ বাঙালীর হৃদয় হরণ করেছে। তাঁর হাতে বাল্মীকির রামায়ণের পরিবেশ, চরিত্র এবং কাব্য-রসেরও যেন বঙ্গানুবাদ ঘটেছে। তাকে বঙ্গানুবাদ না বলে হৃদয়ানুবাদই বলা ভালো। বাল্মীকির অযোধ্যাকে তিনি তাঁর কবিত্বের গুণে বাংলাদেশের ছায়া-শীতল কুটির-প্রাঙ্গণে স্থাপন করেছেন।

পরিবেশ

বাংলাদেশের মাটি, ফুল, ফল, দৈনন্দিন জীবনাচরণ ও সামাজিক রীতিনীতি দিয়ে তিনি যে অযোধ্যা গড়ে তুলেছেন, তা প্রকৃতপক্ষে বাঙালীর হৃদয়-অযোধ্যাই। পিতৃভক্তি-মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি-ভ্রাতৃপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি, প্রভুভক্তি, পতিভক্তি-

পত্নীপ্রেম—সমস্তই যেন বাংলাদেশের হৃদয় থেকে সংগৃহীত। বেশবাস, বিবাহ-প্রথা, এমনকি, খাদ্যতালিকা রচনায়ও কৃত্তিবাস সর্বত্র তাঁর বাঙালীয়ানার পরিচয় রেখেছেন সুমুদ্রিত, যা অনায়াসেই বাঙালীর হৃদয় হরণ করে। চরিত্র-রূপায়ণেও তিনি বাঙালীসুলভ কোমলতার আশ্রয় নিয়েছেন। বাল্মীকির সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাঁর লেখনীর স্পর্শে অপূর্ব কমনীয়তায় যেন নবজন্ম লাভ করেছে। বাল্মীকির রামচন্দ্র যেখানে 'শালপ্রাংশুঃ মহাভুজঃ', সেখানে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র 'তুলসী চন্দনেলিপ্ত বিগ্রহ'—'নব-জলধরশ্যাম'। তাঁর লেখনীতে মানুষ হয়েছে দেবতা। অযোধ্যার রাজ-পরিবার যেন আমাদেরই একান্নবর্তী পরিবার। ভরত ও লক্ষ্মণ আমাদেরই সহোদর ভ্রাতা, কৌশল্যা অশ্রুবিধুরা বাঙালী মা এবং সীতা বঙ্গের চিরন্তন বধূ। বিভীষণ-তরণীসেন রামভক্ত। এমন-কি, তাঁর রাবণও রামচন্দ্রকে বলেছে—'অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।' কাজেই, বাল্মীকির মহাকাব্যের মৌল রসও কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেশ-ধর্ম ও কাল-ধর্মের তাগিদে ভক্তি-রসে অনূদিত। তদুপরি, সংক্ষিপ্ততা ও প্রাঞ্জলতায় বাঙালীর হৃদয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা। তাই প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী কাল ধরে বাঙালী জাতি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুকুরে মুগ্ধ-বিস্ময়ে নিজের মুখই দেখেছে এবং এর অশ্রু-সংগমে স্নান করে লাভ করেছে অনাবিল পরিতৃপ্তি এবং সমুচ্চ নীতিবোধ থেকে পেয়েছে জীবন, পরিবার ও সমাজ-গঠনের সুমহান্ প্রেরণা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর জীবন-বেদ। এইভাবেই লোকপ্রিয়তার অম্লান কীর্তির মধ্যে কৃত্তিবাসের বসতি। তাই তো 'কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি'।

চরিত্র

ভক্তিরস

সংক্ষিপ্ততা ও প্রাঞ্জলতা

কবি কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী অসম্পূর্ণ হওয়ায় ঐতিহাসিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে তাঁর জীবনী সমস্যা-কণ্টকিত। প্রথমতঃ, তাঁর আত্মবিবরণীতে কবির জন্ম-সাল অনুপস্থিত; দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কাব্য-রচনাকালের অনুল্লেখ এবং তৃতীয়তঃ, যে গৌড়েশ্বরের দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন এবং কাব্য-রচনার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর নামেরও অনুল্লেখ। ফলে, কৃত্তিবাসের জীবন-বৃত্তান্ত কেবলমাত্র আনুমানিকতার ভিত্তির ওপরে স্থাপিত হয়েছে। তার ওপর, কৃত্তিবাস-বিরচিত মূল রামায়ণ গ্রন্থখানির এখনও অনাবিষ্কার, কৃত্তিবাস-নামাঙ্কিত বহু পুঁথির ছড়াছড়ি এবং বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে বহুবিচিত্র পাঠভেদ ও পাঠান্তর এই সমস্যাকে করে তুলেছে জটিল থেকে জটিলতর। এমন-কি, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী, যা তাঁর জীবনী-রচনার একমাত্র আকর-উপাদান, তা পাওয়া গেল মাত্র একখানি পুঁথিতে। সেই পুঁথিখানিও অনাবিষ্কৃত। ডঃ সুকুমার সেন আবার সেই আত্মবিবরণী সম্পর্কে তুলেছেন সত্যনিষ্ঠতা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্ন। এইরূপে বহু বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্কের ঝড়ের মধ্য থেকে তাঁর যে জীবন-কথা রচনা সম্ভব হয়েছে, আপাততঃ তাই-ই মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। পণ্ডিতেরা কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কাল নির্ণয়

কৃত্তিবাসের জীবন-কাহিনীর কয়েকটি সমস্যা

করতে গিয়ে প্রথমতঃ তাঁর সেই আত্মবিবরণীর একটি শ্লোকের ওপর নির্ভর করেছেন :

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য [পূর্ণ ?] মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

মাঘ মাসের সংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমী [সরস্বতী পূজা] এবং রবিবার—এই মাস, তারিখ, তিথি এবং বার মিলিয়ে কবির জন্ম-সাল নির্ণয় করতে পণ্ডিতেরা গলদ্‌ঘর্ম হয়েছেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে এবং পূর্ণ মাঘমাস ধরে যে হিসাব প্রস্তুত করেন, তাতে কৃত্তিবাসের জন্ম-সাল দাঁড়ায় ১৪৩২ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু নানা দিক দিয়ে এই সিদ্ধান্তটি সংশয়-পীড়িত। তারপর 'পুণ্য মাঘমাস' ধরে তিনি যে জন্ম-সাল নির্ণয় করেন, তাতে কৃত্তিবাসের জন্মবর্ষ দাঁড়ায় ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দ। এই সিদ্ধান্তটি সত্য হলে কৃত্তিবাস ১৪০৯-১০ খ্রীস্টাব্দে 'বড়গঙ্গার পার' গুরুগৃহে অধ্যয়ন করবার জন্যে যাত্রা করেন। ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহীর ভূস্বামী গণেশ গৌড়ের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালের অন্তিম-সীমা ১৪১৮ খ্রীস্টাব্দ। এবং কৃত্তিবাসও বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে প্রায় বিশ বছর বয়সে ১৪১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজসভায় রাজ-স্বীকৃতি লাভের জন্যে গমন করে থাকতে পারেন। তাহলে রাজসভার বর্ণনার সঙ্গে সভা-পণ্ডিতদের বর্ণনার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কৃত্তিবাসের জন্মবর্ষ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তটিই আপাততঃ স্বীকৃত। আবার, কারো অনুমান, কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে গৌড়েশ্বর বলে বর্ণিত রাজা রাজশাহীর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ভিন্ন অন্য কেউ নন। কিন্তু এই অনুমান আদৌ প্রমাণসিদ্ধ নয়।

সে যা-ই হোক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার সূত্রপাত সম্ভবতঃ ১৪১৮ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। রামায়ণ রচনার পর অবশিষ্ট জীবন তাঁর কিভাবে কেটেছিল এবং তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন—এ সম্পর্কেও ইতিহাস নিরুত্তর। তবে অনুমান করা যায়, গৌড়েশ্বরের রাজ-সমাদর এবং তাঁর জনপ্রিয় রামায়ণ রচনার খ্যাতি তাঁর পরবর্তী জীবনকে গৌরবময় করে তুলেছিল। তিনি সম্ভবতঃ হস্তলিখিত পুঁথি প্রচারের চেয়ে পাঁচালী-গায়কদের মতো তাঁর রচিত রামায়ণ-গান পরিবেশনে ছিলেন সমধিক পক্ষপাতী। তা থেকে অন্যান্য গায়কেরা নিজস্ব পুঁথি রচনা করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গানের আসর জমাতে থাকেন। সম্ভবতঃ সেই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর। অনেকের অনুমান, ১৪৭০-৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে পরলোক গমন করেন 'কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার ॥'

অনুসরণী-৩

*১. কৃত্তিবাস কে ছিলেন? বাংলাদেশে তাঁহার রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় কর। [৩৮ পৃ.—৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৭৮

২. রামায়ণ অনুবাদের পশ্চাতে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি জাগ্রত ছিল, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। [৩৬ পৃ.—৩৮ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৩. রামকথা অবলম্বন করে যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন, তাঁর জীবনী ও কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে যা জান লেখ। [৩৮ পৃ.—৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৪. কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ কর। [৪২ পৃ.—৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৫. বাংলা রামায়ণ কাব্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবি ও তাঁর কাব্যের পরিচয় প্রদান কর। [৩৮ পৃ. —৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৬৭

৬. কৃত্তিবাসের রামায়ণে কবির মৌলিকতা কতখানি প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৪২ পৃ.—৪৩ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৭. কৃত্তিবাসের জীবন-কাহিনীর ভিত্তি কি? সেই ভিত্তির ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ কর। [৩৮ পৃ.—৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৮. কৃত্তিবাসের জীবন-কাহিনী রচনার সমস্যাগুলি কি? সেই সমস্যাগুলির কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, বিবৃত কর। [৪৩ পৃ.— ৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৯. কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রেরণা কি? সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৪১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১০. মহাকবি কৃত্তিবাসের জীবনী রচনার ব্যাপারে কি কি সমস্যা আছে? সেই সমস্যাগুলির উত্তরণের উপায় কি? [৪৩ পৃ.—৪৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ষোড়শ শতাব্দী [১৫০০—১৫৯৯]

ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শতাব্দীতে হোসেন শাহের মতো প্রকৃত গুণগ্রাহী এবং বিদ্যোৎসাহী উদার-হৃদয় সুলতান গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীকে ঐশ্বর্যময় করেছে, তা হলো শ্রীচৈতন্যের মতো এক যুগোত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাব। হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রত্যক্ষ উৎসাহে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার যে অনুকূল পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়নি। হোসেন শাহের পুত্র এবং তাঁর আঞ্চলিক শাসনকর্তারাও উৎসাহের সঙ্গে বহন করেছেন হোসেন শাহের সেই সৃষ্টিমুখর ঐতিহ্যের ধারা। ফলে, অনুকূল পরিবেশের দাক্ষিণ্যে বাংলা সাহিত্যে এলো নব নব সৃষ্টির উচ্ছ্বাস। অন্যদিকে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে স্বর্ণপ্রসূ হয়ে উঠলো বাংলা সাহিত্যের প্রান্তর।

ভূমিকা

ষোড়শ শতকের এই দুই স্বনামধন্য ঐতিহানিক ব্যক্তির প্রেরণায় সৃষ্টির অভূতপূর্ব মহোল্লাসে সাড়া পড়ে যায় দিকে দিকে। দুজনের একজন রাজা, অন্যজন সন্ন্যাসী। অবশ্য দুজনের কেউই বাংলায় একটিও পদ রচনা করেন নি। কিন্তু তাঁদের প্রেরণায় বহু কবির সৃষ্টির উৎসমুখ খুলে গেছে, রচিত হয়েছে বহু ভাবসমৃদ্ধ কাব্য। সেজন্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা চিরকাল অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

সৈয়দ হোসেন খান ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করে হোসেন শাহ নাম গ্রহণ করেন। বহু হিন্দু কর্মচারী ও উপদেষ্টারা ছিলেন তাঁর এই ভাগ্যোন্নতির প্রধান কারিগর। হোসেন শাহ বিস্মৃত হননি তাঁদের অবদানের কথা। তাছাড়া, তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, শিল্পানুরাগী, সাহিত্য ও সংগীত-রসিক এবং হিন্দুদের প্রতি সমদর্শী। বাংলাদেশে মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহু-প্রশংসিত সুলতান। তাঁর রাজ-দরবারে প্রকৃত গুণীর ছিল যোগ্য সমাদর। তাঁর সেনাপতি [লস্কর] পরাগল খান চাটিগ্রামের [চট্টগ্রামের] শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে প্রভুর অনুসরণে সেখানে যে রাজদরবার সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানেও কবি, শিল্পী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ছিল উপযুক্ত সম্মানিত আসন। কবি পরমেশ্বর দাস তাঁর অনুরোধে রচনা করেন ভারত-কথা। পরাগল খানের পুত্র নসরত খানও [ছুটি খান বা ছোট খান] ছিলেন পিতার সমপদস্থ সেনাপতি। তিনিও পিতার ঐতিহ্যের অনুকরণে রাজদরবারে

গৌড় ও চাটিগ্রাম

শিল্প-সাহিত্য চর্চার সেই অনুকূল বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর অনুরোধেই রচিত হয়েছিল মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব। হোসেন শাহের পুত্র নসীরুদ্দীন নসরত শাহের নাম তাঁর শাসনকালে রচিত পদাবলীর কোন কোন পদে উল্লেখিত হলেও তিনি সম্ভবতঃ তাঁর পিতার মতো হিন্দু-সংস্কৃতির অতখানি অনুরাগী ছিলেন না। নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহের মাত্র কয়েক মাসের রাজত্বের পর তাঁর পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহ সিংহাসনে বসেন। এঁরা সবাই অল্পবিস্তর ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। হোসেন শাহের আমলই বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ।

আলোচ্য যুগে গৌড় ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক রাজধানী, কিন্তু তার সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বে সেন-আমলে নবদ্বীপ ছিল বাংলার রাজধানী। মুসলমান আমলে তার রাজনৈতিক গুরুত্ব লুপ্ত হয়, কিন্তু বৃদ্ধি পায় তার সাংস্কৃতিক গৌরব। সরকারী কর্মে হিন্দুদের নিয়োগ, রাজদরবারে হিন্দু-সমাদর ইত্যাদি ঘটনার মধ্যস্থতায় তৎকালীন উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিত হিন্দুদের আচার-আচরণের মধ্যে ঘটে কিঞ্চিৎ বিজাতীয় প্রভাবের অনুপ্রবেশ। তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-সমাজের বিধিবিধান ক্রমাগত কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। এই সামাজিক প্রতিরোধের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনে পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে নবদ্বীপ হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রধান উপনিবেশ। ফলে, নবদ্বীপ তার বিদ্যাচর্চার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে নব্যন্যায়ের পীঠস্থান রূপে খ্যাতিলাভ করে সমগ্র ভারতে। সমাজের উচ্চস্তরে যখন এইভাবে চলেছিল সামাজিক প্রতিরোধের কঠিন প্রয়াস, ঠিক তখনই সমাজের নিম্নস্তরে হয়েছিল এক ভয়াবহ ভাঙনের সূত্রপাত। সামাজিক বিধিবিধানের কঠোরতায় পতিত, নির্যাতিত, হতমান নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা

নবদ্বীপ

সামাজিক সম্মান, সমবিচার এবং আত্মিক স্বস্তির আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্যে ধাবিত হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর ধর্মীয় গোঁড়ামি, মধ্যশ্রেণীর অনৈতিক ব্যভিচার এবং নৈরাশ্যপীড়িত নিম্নশ্রেণীর দলে দলে ধর্ম ও সমাজত্যাগে সেদিন বাঙালী হিন্দু সমাজের নাভিশ্বাস উঠেছিল। ভাঙনের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে নবদ্বীপের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হলেন যুগ-নায়ক শ্রীচৈতন্য। প্রথম জীবনে তিনি অর্থহীন সামাজিক উন্নাসিকতা এবং পাণ্ডিত্যের অভিমানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি মানহীনকে দিলেন মান এবং আশাহীনকে দিলেন ভালোবাসা। আসন্ন সামাজিক ভাঙন হলো প্রতিরুদ্ধ। এক আশ্চর্য জাগরণের জোয়ারে প্লাবিত হলো বাঙালীর জীবন ও সমাজ। বলাবাহুল্য, ধর্ম সেদিনের সমাজের ছিল চালকশক্তি; কাজেই, শ্রীচৈতন্যের আনীত ভাবপ্লাবন ধর্ম-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করলেও ধর্ম-সংস্কারের মধ্যে নিঃশেষিত হয়নি। বৈষ্ণব ধর্মকে যুগধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তার মধ্যস্থতায় তিনি রূপদান করলেন এক বিপুল সামাজিক আন্দোলনকে। সেদিক থেকে শ্রীচৈতন্য এক বিপুল সামাজিক বিপ্লবের মহানায়ক।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন রবীন্দ্রনাথের নাম বহুবার উচ্চারিত

হয়, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তেমনি শ্রীচৈতন্য একটি বহু-উচ্চারিত নাম। তবে রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার বিপুল এবং শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতে কয়েকটি মাত্র শ্লোক রচনা করলেও বাংলায় কিছুই রচনা করেন নি। তবু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায় শ্রীচৈতন্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি বিস্ময়কর। তাঁকে কেন্দ্র করে সেকালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্, ভাবুক এবং শিল্পীরা সমবেত হয়েছেন। তাঁর পার্ষদ, ভক্ত এবং অনুরাগীরা তাঁর দিব্য জীবন নিয়ে রচনা করেছেন এক মহাজীবনের উজ্জ্বল আলেখ্য। তাঁর ভাব-জীবনের আলোকরশ্মি নিয়ে কবি-শিল্পীরা রচনা করেছেন কত ভাবসমৃদ্ধ পদাবলী। তাঁর জীবনকাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয়েছে কত নাটক, তাঁর চিন্তা-জগৎ থেকে স্ফুলিঙ্গ চয়ন করে রচিত হয়েছে কত দার্শনিক নিবন্ধ। পরবর্তীকালে বহু কবির কাব্য-কবিতায় তিনি ছিলেন প্রেরণার সমুজ্জ্বল উৎস। কি গীতিকবিতায়, কি কাহিনীকাব্যে, কি অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর সমুজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। এমন-কি, বাংলার লোককথায় এবং সুদূর পল্লীগীতিকায়ও শ্রীচৈতন্যের আলোকিত প্রভাব অনস্বীকার্য। এককথায়, 'চৈতন্য রেনেসাঁস' একদিকে যেমন বাঙালীর সমাজকে আলোকিত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে আলোয় ও গানে ভরে দিয়েছিল। বাঙালী জাতির মানসিক সমুন্নতি এবং তার কাব্য-সাহিত্যের ভাবোন্নতির মূল প্রেরণা শ্রীচৈতন্য। বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্য শ্রীচৈতন্যের কাছে নানাভাবে ঋণী ॥

শ্রীচৈতন্য ও বাংলা সাহিত্য.

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য

- মঙ্গল-কাব্য
  - মনসা-মঙ্গল
    - নারায়ণ দেব
    - বিজয় গুপ্ত
    - দ্বিজবংশী
    - কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ
    - বিপ্রদাস পিপিলাই
  - চণ্ডী-মঙ্গল
    - মাণিক দত্ত
    - দ্বিজমাধব
    - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী [কবিকঙ্কণ]
  - ধর্ম-মঙ্গল
    - ময়ূর ভট্ট [সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দী]
    - রূপরাম চক্রবর্তী
    - ঘনরাম চক্রবর্তী
- চৈতন্য-জীবনী
  - বৃন্দাবন দাস [চৈতন্য-ভাগবত]
  - লোচন দাস [চৈতন্য-মঙ্গল]
  - জয়ানন্দ [চৈতন্য-মঙ্গল]
  - কৃষ্ণদাস কবিরাজ [শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত]
  - গোবিন্দ দাস [কড়চা]
- বৈষ্ণব-পদাবলী
  - বড়ু চণ্ডীদাস [পঞ্চদশ শতাব্দী]
  - দ্বিজ চণ্ডীদাস
  - দীন চণ্ডীদাস
  - চণ্ডীদাস [পদাবলীর]
  - জ্ঞানদাস
  - গোবিন্দ দাস
  - বলরাম দাস

'বাংলার মঙ্গল-কাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর-এক দেবতার অভ্যুদয়।' —রবীন্দ্রনাথ

৪. মঙ্গল-কাব্য

মঙ্গল-কাব্য বাংলার গণ-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। বাঙালীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তার দৈনন্দিন জীবনাচরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। বাস্তবিকই, মঙ্গল-কাব্যগুলিতে তৎকালিক সমাজের যেরূপ নিখুঁত প্রতিফলন ঘটেছে, সে রকম আর কিছুতেই ঘটেনি। মঙ্গল-কাব্যগুলি তাই বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের প্রধানতম অবলম্বন। অন্যদিকে, বাংলা সাহিত্যের এই ধারায় দেখা গেছে যে, স্বর্গের দেবতা বাঙালীর প্রাণের আকুতির টানে মর্ত্যে অবতরণ করেছেন, মানুষের দুঃখ-সুখের অংশীদার হয়েছেন। মাটির মানুষের যাবতীয় নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও কপটতা—সমস্তই তাঁদের স্পর্শ করেছে। তাতে দেবত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে মনুষ্যত্বের গৌরব। তারপর মর্ত্যে মানব-লীলার অবসানে স্বর্গেই ফিরে গিয়েছেন স্বর্গের দেবতা।

ভূমিকা

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে লোকদেবতার প্রশস্তি-মুখর যে বিশেষ কাহিনী-কাব্যের ধারা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বাংলা সাহিত্যে তা 'মঙ্গল-কাব্য' নামে পরিচিত। মঙ্গল-কাব্যের নামকরণ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তবে সকল মতের সার-সংক্ষেপ হলো: যে কাব্যে মঙ্গলময় দেবতার প্রশস্তি রচিত হয়েছে, যা পাঠ করলে সকল অমঙ্গলের অবসান হয়ে পাঠকের মঙ্গল, শ্রোতার মঙ্গল, গৃহস্থের মঙ্গল; এমন-কি, গ্রন্থটি গৃহে রক্ষিত হলে গৃহেরও মঙ্গল এবং মঙ্গল-রাগে যে কাব্যের গান এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে পরবর্তী মঙ্গলবারে সমাপ্ত হতো, তাকেই বলা হয় 'মঙ্গল-কাব্য'। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পার্থিব কল্যাণের জন্যে আরাধ্য দেবতার বরাভয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কাজেই, মঙ্গল-কাব্য একদিকে যেমন মঙ্গলময় দেবতার প্রশস্তি-গান, অন্যদিকে তেমনি মানুষের মাঙ্গলিক শুভ-কামনার কাব্য।

'মঙ্গল-কাব্য' কাকে বলে?

মঙ্গল-কাব্যধারাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠতম কাব্য-শাখা। এর বিস্তৃতি যেমন সুদীর্ঘ, তার বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়কর। মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল, অভয়া-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, রায়-মঙ্গল, কৃষ্ণ-মঙ্গল ইত্যাদি নানা শাখা-প্রশাখায় মঙ্গল-কাব্যধারা প্রবাহিত। কিন্তু তাদের মধ্যে মনসা-মঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল ও ধর্ম-মঙ্গল শাখাই প্রধান। তবে মনসা-মঙ্গল কাব্য-শাখাই প্রাচীনতম। এবং মর্মস্পর্শী কাহিনীর আবেদনে ও প্রচার-বাহুল্যে মনসা-মঙ্গলই সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য।

মঙ্গল-কাব্যধারার বৈচিত্র্য

প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগের সীমারেখায় বাংলাদেশে ঘটেছিল এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্থান-পতন। আকস্মিক তুর্কী-আক্রমণে এবং তার সর্বব্যাপী প্রবল প্রতিক্রিয়ায়

সমাজের মেরুদণ্ড একেবারে পড়লো ভেঙে। ব্রাহ্মণ-সমর্থিত ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বের দিন অবসিত হলো। সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতিতে স্তম্ভিত, অসহায়, অভিভাবকত্বহীন মূঢ় জাতি আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করেছে দেবতার বরাভয়। এতকাল হিন্দু-সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের ওপর করেছে অকথ্য অত্যাচার। বাহিরের আঘাতে সমাজের সেই ভ্রান্তি-বিলাসের হলো অবসান। উচ্চশ্রেণীর বিপন্ন হিন্দুগণ সেদিন সমাজের চির-অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণীকে বাধ্য হলো স্বীকৃতি জানাতে। ফলে, উচ্চ ও নিম্ন, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি সংমিশ্রিত হলো বাংলাদেশে তুর্কী-আক্রমণের পটভূমিকায়। মঙ্গল-কাব্য আর্য ও অনার্য—এই দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক যোগফল। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, লৌকিক শিব, শীতলা ইত্যাদি অনার্য-পূজিত দেব-দেবীগণ ধীরে ধীরে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করলেন। তাঁদের প্রশস্তি-রচনায় ব্রাহ্মণকেও পর্যন্ত লেখনী ধারণ করতে হলো। এদিকে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বণিকশ্রেণী [বৈশ্য-সভ্যতা]। অধিকাংশ মঙ্গল-কাব্যগুলির কাহিনী তাই বণিকশ্রেণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। 'যখন মোগল-পাঠানের বন্যা দেশের উপর ভেঙে পড়ল তখন সংসারের যে বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেলে সেটা শক্তিরই রূপ।' শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা বিদায় গ্রহণ করলেন। এমন সময় জাতির শিয়রে শক্তিময়ী দেবী স্বপ্নে দেখা দিলেন। সেই দেবী এলেন কোথা থেকে? রবীন্দ্রনাথ বলেন—'যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে।' তাই দেখা যায়, 'সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর শক্তির অন্যায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা, পূজার দ্বারা শান্ত করবার আশাই এই সকল মঙ্গল-কাব্যের প্রেরণা।'

ইতিহাসের স্বাক্ষর

মঙ্গল-কাব্যগুলির গঠন-বিন্যাস প্রায় একই রকম। সেই গঠন-বিন্যাসের মধ্যে মঙ্গল-কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রতিফলিত। গঠন-কাঠামের দিক দিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি কাব্য চারখণ্ডে বিভক্ত: এক. বন্দনা॥ এই অংশে সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেব-দেবীর বন্দনা। দুই. গ্রন্থ-রচনার কারণ-বর্ণনা॥ কবির আত্মপরিচয় ও স্বপ্নাদেশ ইত্যাদি এই অংশের বর্ণিতব্য বিষয়। তিন. দেবখণ্ড॥ এই অংশে লৌকিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীর সমন্বয়-প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। চার. নরখণ্ড॥ এই অংশেই মূল লৌকিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সাধারণতঃ কোন অভিশপ্ত দেবশিশু কোনও অবহেলিত দেবতার পূজা-প্রচারের জন্যে মর্ত্যে আবির্ভূত হয়ে পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্য সফল করে স্বর্গে ফিরে গিয়েছেন। তা এই অংশের মূল বর্ণিতব্য বিষয় হলেও আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য বিষয়—যেমন, বারমাস্যা, চৌতিশা, নায়িকার সাজসজ্জা ও রন্ধন-পদ্ধতি ইত্যাদি এই অংশে বর্ণিত হয়ে থাকে। গঠন-বিন্যাস এইভাবে ধরা-বাঁধা হলেও সেই গতানুগতিকতার মধ্যেও বিভিন্ন কবি রেখেছেন স্বকীয়তা ও কাব্যোৎকর্ষের অম্লান স্বাক্ষর।

বৈশিষ্ট্য ও গঠন-বিন্যাস

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।'
—চৈতন্য ভাগবত

মনসা-মঙ্গল

॥ কাহিনী ॥

'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে'—জীবনানন্দ দাশ

মনসা-মঙ্গল কাহিনী বাংলাদেশের প্রাণের সম্পদ। সর্প-সংকুল বাংলাদেশের সঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাব্যের রয়েছে নাড়ীর সম্পর্ক। বস্তুতঃ, মনসা-মঙ্গল কাব্য পাঠ করে বাঙালী যত কেঁদেছে, অন্য কোনও কাব্য পাঠ করে কেউ এত কাঁদেনি। চম্পক ও গাঙুড় নদীর জল ভরে গেছে বাঙালীর কান্নাবারিতে। মনসা-মঙ্গল বাংলাদেশের অশ্রু-নির্ঝর। বাঙালীর চিরন্তন সংগ্রাম এবং তার হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে মনসা-মঙ্গল কাব্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠা। বহু শতাব্দীর অশ্রুসিক্ত এই কাব্যখানি বাঙালীর হৃদয় হরণ করেছে।

সূচনা

বিভিন্ন পুরাণে সর্প-দেবতার উল্লেখ থাকলেও বাংলার মনসার রূপ-কল্পনা অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-সংস্কৃতির মৌলিক সৃষ্টি। বৃক্ষ ও জীবজন্তুর পূজা প্রাচীন অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির মানবগোষ্ঠীর ছিল একটি স্বাভাবিক উপাসনা-রীতি। মনসা-পূজায় সর্প ও মনসাসিজ গাছের প্রাধান্যের মধ্যে সেই অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর পূজারীতির ঐতিহ্য আজও প্রবহমান। দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর সর্পদেবী মনসাম্মার সঙ্গে বাংলার অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মনসার যেমন আছে নিকট সাদৃশ্য, তেমনি তার প্রতীক দাক্ষিণ ভারতের চেম্মুড় বা চ্যাংমুড় বৃক্ষের সঙ্গেও বাংলার চ্যাংমুড়ী মনসার ধ্বনিগত ও রূপগত মিলও অমিল নয়। অবশ্য, পরে মনসাকে শিবকন্যা-রূপে চিত্রিত করে একটি পৌরাণিক তথা আর্যরূপ দানের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্যভাবের দ্বারা শোধন করে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল, তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারেনি; তাদের মধ্যে আজও আর্য-অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্য-ধারারই প্রবলতা অধিক।'

মনসার উৎপত্তির ইতিহাস

[কালান্তর : শক্তিপূজা]

শিবকন্যা মনসা—নাগলোকে সর্পকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কালিদহের পদ্মপত্রে তাঁর জন্ম। তাই মনসার আর এক নাম পদ্মা। কিন্তু শৈশবেই বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে

বিরোধের ফলে তাঁর এক চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। তাই মনসা—'চেঙমুড়ি কানী'। জরৎকারু মুনির পত্নী তিনি, আস্তীক তাঁর পুত্র। কিন্তু জন্ম-দুঃখিনী মনসার দেব-লোকে কোন প্রতিষ্ঠা নেই, প্রতিষ্ঠা নেই মানব-লোকেও। পিতার ঔদাসীন্য, বিমাতার সঙ্গে বিরোধ এবং স্বর্গ ও মর্ত্যে প্রতিষ্ঠা-হীনতা মনসাকে ক্রুর ও খল-স্বভাবা করে তুললো। অবশেষে দেব-লোকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করবার উদ্দেশ্যে তিনি মানব-লোকে তাঁর পূজা-প্রচারের জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। মনসার এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনীই মনসা-মঙ্গল কাব্যের বিষয়-বস্তু।

মনসার জন্ম-পরিচয় ও আত্ম প্রতিষ্ঠার বাসনা

'চাঁদ সদাগর: তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে।'—জীবনানন্দ দাশ। পরম শৈব চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর চম্পকনগরের সম্পন্ন ও প্রভাবশালী বণিক। তাঁর পূজা আদায় করতে পারলে সিদ্ধ হবে মনসার উদ্দেশ্য। মনসা পূজাপ্রাপ্তির আশায় চন্দ্রধরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কিন্তু পুরুষকারের দুর্ধর্ষ প্রতীক চন্দ্রধর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, তিনি শিবভক্ত; স্ত্রী-দেবতার পূজা তিনি জীবনেও করবেন না। চন্দ্রধরের সঙ্গে শুরু হলো মনসার তীব্র বিরোধ। পূজা আদায়ের মানসে মনসা চন্দ্রধরকে আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত করে তুললেন। কিন্তু দৃঢ়চেতা চন্দ্রধর কিছুতেই মনসাকে তাঁর আরাধ্য দেবতার আসন দিতে সম্মত হলেন না। মনসার সকল প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শন নিষ্ফল হলো। মহা-ক্রুদ্ধ মনসা এইবার চন্দ্রধরের সর্বনাশ-সাধনে উদ্যত হলেন। চন্দ্রধরের সাধের উদ্যান বিনষ্ট হলো, তাঁর মহাজ্ঞান অপহৃত হলো, সর্পাঘাতে বন্ধু ধন্বন্তরি, শঙ্কর গারুড়ি এবং একে একে ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটলো। এইভাবে তাঁর সর্বনাশ করে হিংস্র-স্বভাবা মনসার মনস্কামনা যদি পূর্ণ হয়, তবে তা পূর্ণ হোক! তবুও দৃঢ়মনা চন্দ্রধর নিজের আদর্শে জলাঞ্জলি দিতে পারবেন না, পরাভব স্বীকার করবেন না এক খ্যাতিহীনা, মানহীনা নারী-দেবতার কাছে। নিজের প্রতিজ্ঞায় তিনি থাকলেন অটল, অবিচল! সংঘাত ও সংঘর্ষ ক্রমে চরমে পৌঁছলো। একদিকে দেব-বিদ্রোহী চন্দ্রধর; অন্যদিকে খল-স্বভাবা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা, আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভে কৃতসংকল্পা মনসা। মনসার উচ্ছিষ্ট পুত্রদের মৃতদেহগুলি একে একে গাঙুড়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ, শোকোন্মত্ত চন্দ্রধর শূন্যে হিন্তালের লাঠি আস্ফালন করে বললেন:

মনসা ও চন্দ্রধরের বিরোধ

নাগের উচ্ছিষ্ট পুত্র দিনু ভাসাইয়া।
রক্ত মাংস খাও কানী নাগসৈন্য লৈয়া॥

শোক-সন্তপ্ত পুরীতে আর তাঁর মন টিকলো না। পুত্রশোকের বেদনা বিস্মৃত হবার জন্যে তিনি করলেন বাণিজ্য-যাত্রা। প্রতিহিংসা-পরায়ণা মনসাও এই সুযোগে প্রস্তুত হলেন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। বিদেশের পথে কালিদহে পণ্য-সম্ভারে সুসজ্জিত চন্দ্রধরের মধুকর-সপ্তডিঙা মনসার চক্রান্তে নিমজ্জিত হলো। কিন্তু চন্দ্রধরের মৃত্যু ঘটলে কে মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচার করবে? তাঁকে বাঁচাবার জন্যে মনসা

ঝটিকা-সংকুল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সন্তরণরত চন্দ্রধরের সম্মুখে একটি পদ্ম নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু চন্দ্রধরের মনে উদিত হলো মনসার অন্য নাম পদ্মা। তাই চন্দ্রধর পদ্মটি স্পর্শ না করে সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতায় ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে কূলে উঠলেন। এই ঘটনায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন চন্দ্রধর। শ্মশানভূমি থেকে একখানি জীর্ণ বস্ত্র কুড়িয়ে তিনি পরিধান করলেন এবং নিকটস্থ এক বন্ধুগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু বন্ধুগৃহে মনসা-পূজার আয়োজন দেখে অভুক্ত চন্দ্রধর বন্ধুগৃহ থেকে তীব্র ক্রোধে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

চাঁদের বাণিজ্য-যাত্রা : মধুকর-সপ্তডিঙার নিমজ্জন

দেব-নিগৃহীত চন্দ্রধর পথে অকথ্য দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে অবশেষে সর্বহারা বেশে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর সেই সর্বস্বান্ত রূপ দেখে সনকা হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন। ঘরে সুখ নাই, শান্তি নাই। সেই বিষণ্ণতার অন্ধকারের মধ্যে একদিন বেজে উঠলো মঙ্গল-শাঁখ। চমকে উঠলেন চন্দ্রধর। জন্মগ্রহণ করল অপূর্ব রূপ-গুণ-মণ্ডিত তাঁর সপ্তম পুত্র লখীন্দর। নবজাত পুত্রের মুখ দেখে চন্দ্রধর সকল দুঃখ বিস্মৃত হলেন। এই লখীন্দর হলো স্বর্গভ্রষ্ট অনিরুদ্ধ। দেখতে দেখতে লখীন্দর বড় হয়ে উঠলো। যথাসময়ে উজানী নগরের সায়বেনের পরমা রূপবতী কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখীন্দরের বিবাহ হলো। বেহুলা নৃত্য-পটীয়সী—'বেহুলা-নাচুনি।' এই বেহুলা হলো স্বর্গভ্রষ্টা উষা। একদিকে যখন চন্দ্রধরের দুঃখের সংসারে সুখের মুখ দেখা যাচ্ছে, ঠিক তখনই অন্যদিকে ঘনিয়ে আসছে সর্বনাশের কালো মেঘ। চরম প্রতিহিংসায় মেতে উঠলেন খল-স্বভাবা মনসা। চন্দ্রধর মনসার অনাগত আক্রোশ থেকে পুত্র ও পুত্রবধূকে রক্ষা করবার জন্যে সাতালী পর্বতের ওপরে নির্মাণ করলেন লোহার বাসর-ঘর। নির্মাতা স্বয়ং বিশ্বকর্মা। মনসার প্ররোচনায় বিশ্বকর্মা কিন্তু তাতে রেখে দিলেন এক অদৃশ্য ছিদ্র-পথ। সর্পের আক্রমণ থেকে পুত্রকে রক্ষা করবার জন্যে চন্দ্রধর অবলম্বন করলেন সম্ভাব্য সকল প্রকার সতর্কতা। বাসর-ঘরের বাইরে রইলো অসংখ্য নেউল এবং ময়ূর আর রইলেন হিন্তালের লাঠি-স্কন্ধে সদাজাগ্রত প্রহরী স্বয়ং চন্দ্রধর। বাসর-রাত্রিতে সেই সর্বনাশের ছিদ্রপথে মনসা-প্রেরিত কালনাগ লৌহ-বাসরে প্রবেশ করে বেহুলার তন্দ্রাচ্ছন্নতার সুযোগে লখীন্দরকে করলো দংশন। আর্তনাদ করে উঠলো লখীন্দর :

বিরোধের চূড়ান্ত : বেহুলা-লখীন্দর

জাগ অহে বেহুলা সায়বেনের ঝি।
তোরে পাইল কালনিদ্রা মোরে খাইল কি॥

বেহুলার হাহাকারে সমগ্র চম্পকনগরের ঘুম ভেঙে গেল। সারা চম্পকনগরে উঠলো ক্রন্দনের রোল। আবার শুরু হলো হৃদয়হীন দৈবশক্তির বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের আপসহীন সংগ্রাম। অগ্নি-পরিশুদ্ধা বেহুলা গাঙুড়ের জলে কলার মান্দাসে [ভেলায়] ভেসে চললো নিরুদ্দেশের পথে। কঠিন তার তপস্যা—স্বামীর মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার!

দিন যায়, মাস যায়। পথের নানা প্রলোভন জয় করে এবং মানুষের অমানুষিক

লোভ-লালসার কবল থেকে আত্মরক্ষা করে চললো ভাগ্যহতা বেহুলার দুঃখের অগ্নিপরীক্ষা। দেবতার রোষ এবং পথের অশেষ দুঃখের সকল আঘাত সহ্য করে মৃত স্বামীর কেবল অস্থিগুলিকে সম্বল করে মর্ত্যের মানবী বেহুলা মনসার সখী নেতার সাহায্যে প্রবেশ করলো দেব-লোকে। অবশেষে সফল হলো বেহুলার দুঃখের সাধনা। নৃত্য-পটীয়সী বেহুলার নৃত্য দেখতে চাইলেন স্বর্গের দেবতারা। ব্যথা, বেদনা ও শোকের পাষাণ-ভার বুকে নিয়ে নৃত্য করতে হবে বেহুলাকে? অবশেষে দেবতাদের আদেশে শুরু হলো তার মরণ নৃত্য। তার নৃত্যে তুষ্ট দেবতাদের অনুরোধে মনসা তার স্বামী লখীন্দর ও ছয় ভাসুরকে দান করলেন পুনর্জীবন। স্বামী, ছয় ভাসুর এবং চন্দ্রধরের নিমজ্জিত চৌদ্দখানি বাণিজ্য-তরী সঙ্গে নিয়ে বাংলার বিজয়িনী সতী-সাধ্বী কুলবধূ ফিরে এলো চম্পকনগরে। কিন্তু শ্বশুর চন্দ্রধরকে দিয়ে মনসার পূজা করাতে হবে।—স্বর্গের দেবতাদের কাছে সে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ চন্দ্রধর ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন :

যে হাতে পূজেছি আমি দেব শূলপাণি।
সে হাতে পূজিব পুনি চেঙমুড়ি কানী॥

অবশেষে বেহুলার সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং অশ্রুভরা মিনতিতে অটল চন্দ্রধরের হৃদয় টললো। চন্দ্রধর মনসার পূজা করতে সম্মত হলেন; কিন্তু কয়েকটি শর্তে। মনসার ঘটের ওপরে শোভিত থাকবে চন্দ্রধরের নামাঙ্কিত চন্দ্রাতপ। তিনি দক্ষিণ হস্তে শিবপূজা করেন; সে হাতে তিনি অন্য কোন দেবতার পূজা করতে অক্ষম। কাজেই, বাম হস্তে তিনি মনসাকে ফুল দেবেন; তাও সামনে দিয়ে নয়, পেছন দিক দিয়ে। মনসা তাতেই রাজী। চন্দ্রধরের অবজ্ঞাভরে নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য মনসা সানন্দে গ্রহণ করলেন। দেব-মানবের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের ঘটলো অবসান। সিদ্ধ হলো মনসার অভীষ্ট। পূজা-প্রচারের মাধ্যমে তিনি মানব-লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এদিকে, মর্ত্যে মানব-লীলার অবসানে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বর্গের শাপভ্রষ্ট উষা ও অনিরুদ্ধ।

বিরোধের অবসান

মনসা-মঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর। বহু শতাব্দী ধরে তার কাহিনী বাংলার ঘরে-ঘরে সমাদৃত হয়ে এসেছে। মনসা-মঙ্গল কাব্যের এই বিপুল জনপ্রিয়তার পশ্চাতে রয়েছে সর্প-সংকুল বাংলাদেশের মনোপ্রকৃতির সঙ্গে চন্দ্রধরের দুর্জয় পুরুষকারের অনমনীয় দৃঢ়তা, সতী-সাধ্বী বেহুলার কমনীয় একাগ্রতা এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণা মনসার নিষ্ঠুর ক্রূরতার সংমিশ্রণ। মনসা-মঙ্গল কাব্য সর্প-সংকুল বাংলার চিরন্তন অশ্রু-নির্ঝর, দুঃখ-জর্জর বাঙালীর ব্যথার মহাকাব্য॥

উপসংহার

॥ সমাজ-চিত্র ॥

অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের মতো মনসা-মঙ্গল কাব্যেও তৎকালীন সমাজের আলেখ্য প্রতিভাসিত। মনসা-মঙ্গলের কাব্যিক আবেদন মঙ্গল-কাব্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে

বেশী হলেও তাতে সামাজিক উপকরণের প্রাচুর্য উপেক্ষণীয় নয়। যে সমাজ-চিত্র তাতে প্রতিফলিত, বলাবাহুল্য, সেই সমাজ মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের সমাজ। তার ধর্ম-বিশ্বাস, প্রথানুগত্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আচার-সংস্কৃতির বিচ্ছিন্ন চিত্র-সম্ভারের মধ্যে তৎকালিক সমাজ-চিত্রটি অত্যন্ত সুলভ।

সূচনা

ধর্ম-বিশ্বাসের দিক থেকে সেকালে বাংলাদেশে শৈবধর্মের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। সমাজের নিম্নস্তরে মনসা পূজার প্রচলন শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে তা সমগ্র সমাজে প্রসার লাভ করতে থাকে। ঘরে ঘরে মেয়েরা করতো মনসার ব্রতপূজা। সর্প-সংকুল বাংলাদেশে মনসার ব্রতপূজার প্রচলন ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মনসার সঙ্গে সাধারণের ছিল ভয় ও ভক্তির সম্পর্ক। তবে অভিজাত-সমাজে মনসা কোনকালেই যে প্রীতির আসন লাভ করতে পারেনি, চাঁদ সদাগরের দৃষ্টান্তেই তা সমুজ্জ্বল।

তৎকালীন ধর্ম-বিশ্বাস

সেকালেও শুভ শঙ্খধ্বনির দ্বারা নবজাতককে বরণ করে নেওয়া হতো। সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত ছিল। বিবাহে পিতামাতার নির্বাচনই ছিল চূড়ান্ত। কেবল পাত্র-পাত্রীর রূপগুণই নয়, বংশ কৌলিন্যও বিবেচ্য বিষয় ছিল। বিবাহ-ব্যাপারে স্ত্রী আচারের ছিল প্রাধান্য। বরবধূর যাত্রাকালে সামান্য ঘটনাকে শুভ অথবা অশুভ-সংকেত বলে গণ্য করা হতো। গণমানসে এই সব অর্থহীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় জাতির বেদনাময় মূঢ়তার দিকটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেকালে নববিবাহিত বরবধূর বাসর-রাত্রি জাগরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা হতো না বলে মনে হয়। তাদের সম্ভবতঃ কলার ভেলায় নিরুদ্দেশ নদী-স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। তবে বাংলাদেশে তৎকালে সহমরণ-প্রথা যে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ মনসা-মঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট। লখীন্দরের মৃতদেহ বুকে নিয়ে বেহুলার নিরুদ্দেশ-যাত্রা সহমরণ প্রথারই নামান্তর। তাছাড়া, চন্দ্রধরের অন্য ছয় পুত্রবধূ সহমরণ অনুষ্ঠান করেন নি বলে সমাজের কাছ থেকে চন্দ্রধরকে কম গঞ্জনা শুনতে হয় নি। যারা সহমরণ অনুষ্ঠান করতো না, তাদের দুঃসহ জীবন যাপন করতে হতো। তাদের বৈধব্যের জন্যে দায়ী করা হতো তাদেরই। সেকালে আচার-সংস্কার এত বদ্ধমূল ছিল যে, যাত্রাকালে দিনক্ষণ বিচার করা হতো। নৌ-যাত্রাকালে পূজার্চনার প্রথা ছিল প্রচলিত। এইভাবে নানা সংস্কারের অন্ধকূপে নিপতিত হয়ে যখন সমগ্র সমাজের নাভিশ্বাস উঠেছে, মনসা-মঙ্গল কাব্য তুলে ধরেছে সেই সময়ের মর্মান্তিক চিত্র। আর, স্বামীর অস্থি-কংকাল সম্বল করে বেহুলার নিরুদ্দেশ-যাত্রা কি কৌলিন্য প্রথা-শাসিত তৎকালীন সমাজে অস্থি-চর্মসার মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে কিশোরী-কন্যার বিবাহ এবং তার অকূল সংসার-সমুদ্রে ভাসবার প্রচলিত প্রথার ইঙ্গিত বহন করে আনে না?

প্রথানুগত্য, সামাজিক-রীতিনীতি ও আচার-সংস্কার

সমাজে সে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বের অবসানে বৈশ্য-প্রভুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল। বণিকেরাই ছিলেন সমাজের অন্যতম অভিজাতশ্রেণী। তাঁরা সমুদ্রপথে দূর-দূরান্তের দেশগুলিতে বাণিজ্য-যাত্রা করতেন এবং প্রভূত সম্পদে তাঁদের মধুকর-সপ্তডিঙা সাজিয়ে স্বদেশে ফিরে আসতেন। সম্ভবতঃ, বাঙালীর বাণিজ্য-যাত্রা একাদশ-দ্বাদশ শতকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তুর্কী-আক্রমণের পর বাঙালী বণিকেরা আর বাণিজ্য যাত্রায় বিশেষ উৎসাহিত বোধ করেন নি। মনসা-মঙ্গল কাব্যে বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা অতীতের স্মৃতি-চারণা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে নারী-স্বাধীনতা তো দূরের কথা, নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বও স্বীকৃত ছিল না। সনকা মনসার পূজার আয়োজন করেছে ; কিন্তু চন্দ্রধর হিন্তালের লাঠির আঘাতে মনসার ঘট ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। নারীর স্বতন্ত্র বিশ্বাসকে সেদিনের সমাজ স্বীকার করে নিতে পারে নি। তাছাড়া, কোন দৈব-দুর্ঘটনায় স্বামীর অকাল-মৃত্যুর জন্য নারীকেই দায়ী করা হতো। নারী-জাতির সেই দুর্ভাগ্যের চিত্র মনসা-মঙ্গল কাব্যে অশ্রুর অক্ষরে চিরকালের জন্যে লিখিত হয়ে আছে।

সমাজের নারী

কাজেই, মনসা-মঙ্গল কাব্যে লাভ করা যায় এক জড়, ক্ষয়িষ্ণু, অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বেদনাময় চিত্র। সমাজের অগ্রসরণের সকল পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রধরের চরিত্রের যে আপসহীন দৃঢ়তা, তা পরিবর্তন-বিমুখতা এবং প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনড় অন্ধ-বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রতি-রোধেরই নামান্তর। এইভাবে মনসা-মঙ্গল কাব্যে আমরা যে বাংলার মুখ দেখি, তা নানা অন্ধবিশ্বাসে মূঢ়, ম্লান এবং অসহনীয় ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত।

উপসংহার

॥ কবি-পরিচিতি ॥

মনসা-মঙ্গল কাহিনীর উদ্ভব বাংলাদেশের গণ-মানস থেকেই। বহুকাল থেকে এই কাহিনীর ধারা জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে কবিরা সেই খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত কাহিনীর ধারাকে একটি সংহত কাহিনী-রূপ দান করেন। তাই দেখা যায়, কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কবির প্রতিভার স্পর্শে দীপ্তি, লাবণ্য ও অনন্যতা লাভ করলেও বর্ণিত ঘটনাবলীর অন্তরালে কাহিনীর মৌল কাঠামোটি অপরিবর্তিতই আছে। মনসা-মঙ্গলের অশ্রুনিষিক্ত কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনার প্রথম গৌরব কানা হরিদত্তের। কানা হরিদত্তের গ্রন্থের দু-একটি পৃষ্ঠা ছাড়া কোন সম্পূর্ণ পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় কবির পরিচিতি এবং তাঁর আবির্ভাব-কাল এখনও রহস্যাবৃত। কিন্তু মনসা-মঙ্গল কাব্যের আদি-সূরীরূপে তাঁকে উত্তরসূরীরা স্মরণ করেছেন। পরবর্তীকালের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁকে শুধু স্মরণ করেন নি, তাঁর কঠোর সমালোচনাও করেছেন :

কানা হরিদত্ত

প্রথমে রচিত গীত কানা হরিদত্ত।
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ॥

বলাবাহুল্য, এই সমালোচনা তীব্র তিরস্কারে পরিণত হয়েছে। হয়তো এই তিরস্কারের সবখানি হরিদত্তের প্রাপ্য নয়। মনসার সর্পসজ্জা-বর্ণনায় তাঁর নৈপুণ্য কবির ক্ষমতারই সাক্ষ্য বহন করে :

সিতলিয়া নাগে কৈল সীতার সিন্দূর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিণী।
বেতনাগ দিয়া কৈল কাঁকালি কাছুনি॥

কানা হরিদত্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের যে আদি শিল্পী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিজয়গুপ্ত মনসা-মঙ্গল কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর বিস্তৃত আত্মবিবরণীতে জানা যায় যে, তিনি পঞ্চদশ শতকের অন্তিম পর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মস্থান—বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রাম। 'পশ্চিমে ঘাঘর নদী, পূর্বে গণ্ডেশ্বর। মধ্যে ফুল্লশ্রীগ্রাম পণ্ডিত নগর॥' বরিশাল জেলার গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামের এক বৈদ্য-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিজয়গুপ্ত। পিতার নাম সনাতন, জননী রুক্মিণী দেবী। তিনি জন্মেছিলেন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই। তখন বাংলার শাসক-পদে অভিষিক্ত ছিলেন 'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।' তাতে মনে হয়, তাঁর

বিজয়গুপ্ত

এই 'পদ্মপুরাণ' রচিত হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৪৯৩ থেকে ১৫১৮খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই। তাঁর কাহিনী-বর্ণনা-চাতুর্য সত্যিই প্রশংসনীয়। ছন্দ-লালিত্যে, অলংকার-নৈপুণ্যে ও রূপসজ্জার চমৎকারিত্বে তাঁর কাব্যখানি উজ্জ্বল। তিনি যে অত্যন্ত বস্তু-সচেতন ও রসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কাব্যে রয়েছে তার অম্লান স্বাক্ষর। বাস্তব চিত্রের উপস্থাপনায় ও হাস্যরস-সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব সমধিক। তবে তাঁর কাব্যে কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্যের উচ্চারণই বেশী। তাঁর কাব্যের অংশবিশেষ প্রবাদ-বাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে। তাতে তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত :

বাও নাই বাতাস নাই লোহার ঘরে বাস।
কোন নাগিনী আসি প্রভুরে কৈল নাশ॥
এ নব যৌবন আমার গেল ছারখার।
কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর॥

বিজয়গুপ্তের করুণ রস-সৃষ্টির নৈপুণ্যে এই কাব্যাংশটি উজ্জ্বল। একদিকে তিনি যেমন বেহুলার মধ্যস্থতায় বাংলার করুণ বিষণ্ণ গৃহবধূর চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তেমনি চন্দ্রধরের মধ্যস্থতায় অঙ্কিত করেছেন বাংলার চিরন্তন সংগ্রামী চেতনাকে। চন্দ্রধর চরিত্রের পৌরুষ-দীপ্ত অনমনীয় মূর্তি রচনার প্রথম

কৃতিত্ব

কৃতিত্ব বিজয়গুপ্তের। 'যে হাতে পূজেছি আমি শিব শূলপাণি। সে হাতে কেমনে পূজি চ্যাংমুড়ী কানি॥'—এ উক্তি তাঁর স্পষ্ট পুরুষকারের মূর্ত প্রতীক উন্নতশির চন্দ্রধরের। স্বভাব-সৌন্দর্যের বর্ণনায় বিজয়গুপ্ত সিদ্ধহস্ত কবি। তবে সেই বর্ণনা কোথাও-কোথাও আধুনিক দৃষ্টিতে সুরুচি ও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে মধ্যযুগীয় এই কবির কাব্য-সৌন্দর্য সুনিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারায়ণ দেব মনসা-মঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। 'পদ্মপুরাণের' কবি নারায়ণদেব কেবল 'সুকবি' ছিলেন না; প্রাচীন বাংলা-কাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবিও। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোর গ্রামের অধিবাসী। অবশ্য, তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন রাঢ়ের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লোক। তাঁর জীবৎকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কারো মতে, তিনি বিজয়গুপ্তের অগ্রবর্তী; অর্থাৎ, পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জন্ম। কারো মতে, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে তাঁর আবির্ভাব। বর্তমান পণ্ডিতগণের মতে, তিনি ছিলেন বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক কালের কবি। সে যাই হোক, তাঁর রচিত কাব্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে সুদূর আসাম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অসমীয়া ভাষাতেও তাঁর কাব্যের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত মনসা-মঙ্গলকার কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ গ্রন্থ-সূচনায় তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

নারায়ণ দেব

সেদিক থেকে মনে হয়, নারায়ণ দেব হরিদত্তের পর প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর নিজের কাব্যেই আছে তার প্রমাণ :

'পদ্মাপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারায়ণ দেব তারে পাঁচালী রচিছে।'

জনমানসে মনসা-মঙ্গল কাব্যের যে বিচ্ছিন্ন কাহিনীর ধারা প্রচলিত ছিল, নারায়ণ দেব তাকে দান করেন প্রথম সংহত কাব্যিক রূপ। সেই কারণে তাঁর কাব্যে গতানুগতিকতার পরিবর্তে রয়েছে স্বতন্ত্র মৌলিকতার স্বাক্ষর। তাই তাঁর 'পদ্মাপুরাণে' 'নরখণ্ডে'র চেয়ে 'দেবখণ্ডে'র প্রাধান্যই সমধিক। তাহলেও মানুষের চেয়ে দেবতা কোথাও প্রাধান্য পায়নি।

নারায়ণ দেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর করুণ-রস সৃষ্টির অনবদ্য সুষমায় এবং চরিত্র-নির্মাণের অনুপম নৈপুণ্যে :

উঠ উঠ প্রাণপ্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥

উদ্ধৃত কাব্যাংশে উৎসারিত করুণ-রস বিচ্ছেদ-বেদনা-কাতরিমায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। একদিকে বেহুলার কোমল সৌন্দর্য, অন্যদিকে চন্দ্রধরের চারিত্রিক দার্ঢ্য তাঁর 'পদ্মাপুরাণ'কে দান করেছে মহাকাব্যিক সুষমা। নারায়ণ দেবের চন্দ্রধর আদিম মানব-সত্তার পৌরুষ-দৃপ্ত প্রতীক। কখনো সাতপুত্রের শোকবেদনার চেয়ে কলার ঝাড়ের বিয়োগযন্ত্রণা তার কাছে প্রবল, কখনো মনসার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বাসনায় সে ক্ষিপ্ত :

যদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া সুধিব আমি মরা পুত্রের ধার॥

কৃতিত্ব

তাঁর চন্দ্রধরের মতো দেব-বিদ্রোহী উগ্র পুরুষকার মূর্তি বাংলা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। সনকার শোকবিহ্বল মাতৃত্বেরও তুলনা নেই। বেহুলার কমনীয় লাবণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্ভাগ্য-বিজয়ের একাগ্রতা। নারায়ণ দেবের বেহুলাও ব্যক্তিত্বময়ী—

ব্যক্তিত্ব ও বিষণ্ণতার এক বিস্ময়কর সমাহার। তাঁর কাব্য সম্পর্কেও আছে রুচি-বিকারের অভিযোগ। অবশ্য, একালের রুচি-বিচারের তৌলে সেকালের রুচিকে নিম্নশ্রেণীর মনে হতে পারে। তাছাড়া, আত্যন্তিক জনপ্রিয়তার জন্যে বিভিন্ন গায়ক এবং লিপিকারদের কিছু নিজস্ব সংযোজনের ফলে তাঁর কাব্যে নিম্ন-রুচির অনুপ্রবেশও স্বাভাবিক। সেজন্যে রুচি-বিকারজনিত নিন্দাবাদের সবটুকু হয়তো নারায়ণ দেবের প্রাপ্য নয়।

জনশ্রুতি আছে, দ্বিজ বংশীদাসের মধুর কণ্ঠে স্খলিত 'বেহুলার ভাসান' শুনে দুর্ধর্ষ দস্যু কেনারামের হাতের উদ্যত খড়্গ হস্তচ্যুত হয়েছিল। দ্বিজ বংশীদাসের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁর কাব্যের হৃদয়স্পর্শী মাধুর্য। বেদনার রূপকার কবি মানব-বেদনার সুমধুর সংগীত রচনা করে অমর হয়ে আছেন। ময়মনসিংহ জেলার পাটোয়ারী গ্রাম কবির জন্মস্থান। তিনি বাংলা রামায়ণের প্রখ্যাত মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর স্বনামধন্য পিতা। কারো মতে, তিনি ষোড়শ শতকে—কারো মতে, তিনি সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেহুলার ভাসান গেয়ে দারিদ্র্য-জর্জর কবির হতো জীবিকার সংস্থান। তাঁর চন্দ্রধর শিবভক্ত নন—চণ্ডীভক্ত। সেই কারণে সে মনসার কাছে লাঞ্ছিত। কাহিনীশেষে চণ্ডী ও মনসার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিজ বংশী

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের মনসা-মঙ্গলকার। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের অধিবাসী। কায়স্থ কুলে তাঁর জন্ম। তাঁর আবির্ভাব-কাল সপ্তদশ শতক। মনসার আর এক নাম 'কেতকা'। তাই তিনি কাব্যে মনসাকে 'কেতুকা সুন্দরী' বলে প্রণাম নিবেদন করেছেন এবং স্বয়ং উপাধি গ্রহণ করেছেন 'কেতকাদাস'। তাঁর হাতে বেহুলা চরিত্রের দীপ্তি বৃদ্ধি পেলেও চন্দ্রধরের চরিত্র-মহিমা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে। করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্যের উচ্চারণ অধিক হওয়ায় কাব্য-সুষমা কোথাও-কোথাও ম্লান হয়ে পড়েছে। তাঁর কাব্য কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের প্রভাবেও কিঞ্চিৎ প্রভাবিত।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

বিপ্রদাস পিপিলাই নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক কালের পশ্চিমবঙ্গের কবি। তিনি চৈতন্য-পূর্ব মনসা-মঙ্গলকারদের মধ্যে অন্যতম। চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়্যা-বটগ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মুকুন্দপণ্ডিত। তাঁর আত্ম-পরিচয় থেকে জানা যায়, যখন 'নৃপতি হোসেন সাহা গৌড়ের প্রধান', সেই সময় ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর 'মনসা বিজয়' কাব্যখানি রচিত হয়। সৌন্দর্য-সৃষ্টির চেয়ে তথ্যনিষ্ঠতার জন্যে কাব্যখানি গুরুত্বপূর্ণ। এমন-কি, চরিত্র-সৃষ্টিতেও তিনি কোনরূপ অনন্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, তাঁর সৃষ্ট কি মনসা, কি চন্দ্রধর—কারো চরিত্রই শিল্পসুষমাময় রূপ পরিগ্রহ করেনি।

বিপ্রদাস পিপিলাই

পরবর্তীকালে মনসা-মঙ্গলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি হলেন জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র, বিষ্ণু পাল ও ষষ্ঠীবর দত্ত [গুণরাজ খাঁ]।

॥ কাহিনী ॥

দুটি স্বতন্ত্র আখ্যানের সমাহারে চণ্ডী-মঙ্গলের কাব্যকায়া নির্মিত। উপাখ্যান দুটি হ'লো : এক. 'আখেটিক খণ্ড'; অর্থাৎ, কালকেতু উপাখ্যান; এই খণ্ডে নিঃসম্বল ব্যাধপুত্র চণ্ডীর কৃপায় হয়েছে রাজ-রাজেশ্বর। দুই. 'বণিক খণ্ড'; অর্থাৎ, ধনপতিসদাগর উপাখ্যান, এইখণ্ডে দেবীর ছলনায় বণিক-শ্রেষ্ঠ ধনপতির ভাগ্য-বিপর্যয় এবং দেবীর করুণায় বিপন্মুক্তি। এই দ্বৈত-কাহিনীর ভিত্তিভূমির ওপর চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের বিশাল ইমারত স্থাপিত।

সূচনা

॥ কালকেতু উপাখ্যান ॥

দারিদ্র্য এবং নৈষ্কর্ম্যের জন্যে স্বামী ভোলানাথ শিবের সঙ্গে চণ্ডীর নিত্য কলহ। পদ্মার পরামর্শে সেই চণ্ডী হলেন মর্ত্যলোকের পূজা-প্রয়াসী। স্থির করলেন, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের মধ্যস্থতায় তিনি মর্ত্যের মানবলোকে নিজের পূজা প্রচার করবেন। তাই পিতার শিবপূজার জন্যে নীলাম্বর পুষ্প-চয়নে গিয়ে দেখলো, দেবীর ছলনায় নন্দনকানন পুষ্পশূন্য। পুষ্পের সন্ধানে সে চললো মর্ত্যলোকে। সেখানে বিচরণরত মৃগদল তার মনোহরণ করে। তাই পুষ্প-চয়নে ঘটে তার অহেতুক বিলম্ব। এদিকে, ছলনাময়ী দেবী নীলাম্বরের আহৃত একটি পুষ্পের মধ্যে কীটরূপে রইলেন সংগুপ্তা। ইন্দ্রের নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্যের মধ্যে থেকে কীট রূপিণী চণ্ডী দংশন করলেন শিবের মাথায়। যন্ত্রণা-কাতর শিব অভিশাপ দিলেন নীলাম্বরকে— তাকে মর্ত্যলোকে ব্যাধ-সন্তান-রূপে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাই হলো। নীলাম্বর ধর্মকেতু-ব্যাধের পুত্র কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করলো মর্ত্যলোকে। নীলাম্বর-পত্নী ছায়াও জন্মগ্রহণ করলো মর্ত্যে সঞ্জয়-ব্যাধের কন্যা ফুল্লরারূপে।

পূর্বাভাস

দিনে দিনে কালকেতু হয়ে উঠল মহাধনুর্ধর। যথাসময়ে ফুল্লরার সঙ্গে তার বিবাহ হলো। কালকেতু বনের পশু বধ করে এনে দেয় মাংস, ফুল্লরা তা দিয়ে সাজায় পসরা। তাতে এই দারিদ্র্য-জর্জর সংসারটির কায়ক্লেশে চলে যায়। ক্রমে কালকেতু বনের মধ্যে শুরু করলো মহামার। প্রাণভয়ে ভীত বিপন্ন পশু-সমাজ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলো বরাভয়। মায়াবলে দেবী কালকেতুর দৃষ্টির অন্তরালে তাদের সেদিন রাখলেন সংগুপ্ত। এবং স্বয়ং কালকেতুর মৃগয়া-যাত্রা-পথের ধারে এক অশুভ ইঙ্গিতের বার্তা বহন করে পড়ে রইলেন স্বর্ণ-গোধিকারূপে। সারাদিনের নিষ্ফল মৃগয়ার পরিশেষে ক্রুদ্ধ কালকেতু ব্যর্থ মনোরথে কুটিরে প্রত্যাবর্তনের সময় স্বর্ণ-গোধিকাটিকে দেখতে পেয়ে ধনুকের ছিলায় তাকে বেঁধে নিয়ে এলো ঘরে। তারপর ফুল্লরা চললো তণ্ডুলের সন্ধানে; আর, কালকেতু বাসি মাংসের পসরা নিয়ে চললো হাটের

দেবীর ছলনা

দিকে। তারা ফিরে এসে দেখলো, কোথায় স্বর্ণ-গোধিকা? এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী-নারী তাদের ভাঙা কুঁড়েঘরখানি আলো করে বসে আছে। তারপর ছলনাময়ী চণ্ডী এই নির্বোধ ব্যাধ-দম্পতিকে এক কৌতুকময় মহা-পরীক্ষায় ফেলেছেন। সরল-প্রাণ ব্যাধ দম্পতি সগৌরবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কালকেতু তার চরিত্রের সততায় জয় করলো দেবীর মন। দেবী তুষ্ট হয়ে স্বমূর্তি ধারণ করলেন এবং তাকে দিলেন একটি মূল্যবান অঙ্গুরীয় ও সাতঘড়া ধন। সেই সঙ্গে আদেশ করলেন :

পূজিবে মঙ্গলবারে পাতাইবে জাত।
গুজরাট নগরের তুমি হবে নাথ ॥

দেবী-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় কালকেতু ভাঙাতে গেল মুরারি শীল নামে এক ধূর্ত প্রবঞ্চকের কাছে। প্রতারণা করতে গিয়ে দেবীর দৈববাণীতে ভীত হয়ে দুঃশীল মুরারি শীল অঙ্গুরীয়ের ন্যায্যমূল্য দিল। তারপর কালকেতু দেবীর আদেশমতো বনভূমি পরিষ্কার করে পত্তন করলো গুজরাট রাজ্যের। দেশ-দেশান্তর থেকে সেখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে এলো বহুলোক। সেই সঙ্গে এলো শঠ-চূড়ামণি ভাঁড়ুদত্ত। রাজ্যে কোন অশান্তি ছিল না। এবার অশান্তি সৃষ্টি করলো দুষ্টমতি ভাঁড়ুদত্ত। সে হাটের দোকানীদের মূল্য না দিয়ে সুকৌশলে পণ্য সংগ্রহ করে। এইভাবে সে রাজ্যমধ্যে জাগিয়ে তুললো অশান্তির ঘোর দাবানল। দোকানীদের আবেদনে কালকেতু রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দিল ভাঁড়ুদত্তকে। অপমানিত ভাঁড়ু রাজ্য ত্যাগের প্রাক্কালে কালকেতুকে সমুচিত শিক্ষা দেবে বলে শাসিয়ে গেল : 'পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা।'

রাজ্য-স্থাপন ও রাজ্যমধ্যে অশান্তি

গুজরাট থেকে বিতাড়িত ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজ্যে গিয়ে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করতে লাগলো কালকেতুর বিরুদ্ধে। ভাঁড়ুর প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ করলেন গুজরাট আক্রমণ। কালকেতু পরাজিত হলো এবং ভাঁড়ুর শঠতায় সে হলো বন্দী। কারাগারে নির্যাতিত শৃঙ্খলিত কালকেতু দেবীর অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করলো। তারপর বীরের গৌরবে সে স্বরাজ্যে এলো ফিরে। পরম শান্তিতে দীর্ঘকাল সে করলো রাজ্যশাসন। মর্ত্যলোকে প্রচারিত হলো চণ্ডীর পূজা। তারপর শাপমোচনের পর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে স্বর্গের নীলাম্বর ও ছায়া ফিরে গেল স্বর্গলোকে ॥

পূজা-প্রচার ও স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন

॥ ধনপতি উপাখ্যান ॥

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের 'বণিক খণ্ড'র নায়ক ধনপতি সদাগর। সমাজের নিম্ন-শ্রেণীতে পূজা-প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে 'আখেটিক খণ্ড'। এবার দেবী সমাজের উচ্চ-শ্রেণীতে পূজা-প্রচারের উদ্দেশ্যে আশ্রয় করলেন বণিক-শ্রেণীকে। 'মেয়েলি ব্রতকথা ও রূপকথার ছাঁচে গড়া' ধনপতি-উপাখ্যান কালকেতু-উপাখ্যানের পাশে কাব্য-গৌরবে ম্লান এবং তাতে মনসা-মঙ্গলের চন্দ্রধর-উপাখ্যানের ঘটেছে সুস্পষ্ট ছায়া-বিস্তার।

সূচনা

উজানী নগরের সম্পদশালী সদাগর—ধনপতি। শিবভক্ত তিনি এবং কৃতদার। ঘরে পত্নী লহনা বর্তমান। কিন্তু লহনা নিঃসন্তানা। এদিকে, পায়রা উড়িয়ে খেলা করতে গিয়ে যুবক-ধনপতি উজানী নগরের সাধু লক্ষপতির অপূর্ব সুন্দরী কন্যা খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে ফিরে এলেন উজানী নগরে। এই খুল্লনা লহনার খুল্লতাত-কন্যা। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় হলো, সে স্বর্গের শাপভ্রষ্টা অপ্সরা রত্নমালা—দেবীর পূজা-প্রচারের জন্যে মর্ত্যে প্রেরিতা।

খুল্লনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহ

ধনপতি সদাগরের দিন কাটছিল শান্তিতেই। হঠাৎ একদিন রাজধানী থেকে ডাক পড়লো ধনপতির। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে লহনা দুর্বলা দাসীর প্ররোচনায় খুল্লনার ওপর শুরু করলো অকথ্য পীড়ন। দুর্বলার মন্ত্রণায় লহনা ধনপতির নামাঙ্কিত জাল চিঠি দেখিয়ে খুল্লনাকে ছাগল চরাতে, ঢেঁকিশালে বাস করতে, একবেলা আধপেটা খেতে এবং খুঞার বসন পরতে বাধ্য করলো। খুল্লনা এই ছল-চাতুরীর রহস্যভেদ করেও লহনার নির্যাতনের ভয়ে এই চিঠির নির্দেশ মেনে নিল।

দুর্বলার কুমন্ত্রণায় সপত্নী কলহ

শুরু হলো খুল্লনার দুঃখের দিন। সে ছাগল চরায়। মনের কষ্টে তার দিন কাটে। একদিন বনের মধ্যে তার 'সর্বশী' ছাগলটি গেল হারিয়ে। ছাগলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে সে একস্থানে দেখলো, জনপদবধূরা করেছে চণ্ডীর পূজার আয়োজন। এই জনপদবধূরা চণ্ডী-প্রেরিতা পঞ্চ-বিদ্যাধরী। তারা খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখিয়ে দিল। চণ্ডীর পূজা করে খুল্লনা তার হারানো ছাগল এবং তার পূর্ব-মর্যাদা ফিরে পেল।

খুল্লনার দুঃখ-রজনী

এদিকে, ধনপতি ফিরে এলেন উজানী নগরে। সমস্ত শুনে লহনাকে তার কৃতকার্যের জন্যে তিরস্কার করলেন। কিন্তু কুলবধূ বনে বনে ছাগল চরিয়েছে, তাই সমাজের বিরূপ সমালোচনায় খুল্লনাকে দিতে হলো অগ্নি-পরীক্ষা। সতীত্বের সেই ভীষণ পরীক্ষায় খুল্লনা সসম্মানে উত্তীর্ণ হলো। এদিকে, আবার ধনপতি বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ করলেন। সমুদ্র-যাত্রায় পতির কল্যাণ-কামনায় খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করতে বসলো। লহনা ধনপতিকে তা দেখালে পরম শৈব ধনপতি মহাক্রোধে মঙ্গলচণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করে করলেন বাণিজ্য-যাত্রা।

দুঃখের অবসান

চণ্ডীর রোষে সমুদ্রপথে উঠলো মহাঝড়। একে একে ধনপতির ছয়টি ডিঙা ডুবে গেল। রক্ষা পেল কেবলমাত্র মধুকর। তাতে প্রাণে বেঁচে তিনি সিংহলের পথে কালিদহে প্রবেশ করলেন। সেখানে চণ্ডীর মায়ায় তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক অতি অলৌকিক দৃশ্য। সমুদ্রবক্ষে ভাসমান শতদলে বসে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী একটি হস্তীকে গিলে আবার উদ্‌গিরণ করছে। সিংহলে উপস্থিত হয়ে তিনি সিংহলরাজকে প্রসঙ্গক্রমে জানালেন সেই অলৌকিক দৃশ্যের কথা। সিংহলরাজ বিশ্বাস করলেন না। ধনপতি শপথ

ধনপতির বাণিজ্য-যাত্রা

করলেন, সে-দৃশ্য দেখাতে না পারলে তিনি সিংহলরাজকে সমুদয় বাণিজ্য-পণ্য অর্পণ করবেন এবং গ্রহণ করবেন আজীবন কারাবাস। কালিদহের অভিমুখে তরণী ভাসলো। কিন্তু কোথায় সেই অলৌকিক দৃশ্য? প্রতিশ্রুতি-মতো ধনপতির পণ্য-সম্ভার সিংহল-রাজের করায়ত্ত হলো এবং ধনপতির ভাগ্যে জুটলো দুঃসহ বন্দী-জীবন।

এদিকে, খুল্লনার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, নাম তার শ্রীমন্ত। এই শ্রীমন্ত স্বর্গভ্রষ্ট মালাধর—চণ্ডীর বরপুত্র। বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়ে তার জন্ম-পরিচয় সম্পর্কে দনাই ওঝার কুশ্রী মন্তব্যে শ্রীমন্ত অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে। মাতার অনুমতি ও চণ্ডীর আশীর্বাদী অষ্টদূর্বা নিয়ে সে চললো তার নিরুদ্দিষ্ট পিতার অন্বেষণে। কালিদহে সেও প্রত্যক্ষ করলো সেই অলৌকিক কমলে-কামিনী দৃশ্য। পথের অভিজ্ঞতা সেও বর্ণনা করলো সিংহলরাজের কাছে। কিন্তু প্রত্যয় হলো না অবিশ্বাসীর। শ্রীমন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো, সে রাজাকে কমলে-কামিনী দৃশ্য দেখাতে না পারলে 'দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন।' রাজাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন 'শ্রীমন্ত সেই দৃশ্য দেখাতে পারলে তিনি অর্ধেক রাজ্যসহ কন্যার বিবাহ দেবেন শ্রীমন্তের সঙ্গে।' শ্রীমন্ত সেই দৃশ্য দেখাতে পারলো না। দক্ষিণ মশানে তার শিরশ্ছেদ অনিবার্য। কিন্তু শ্রীমন্তের ভক্তির আকর্ষণে চণ্ডী আবির্ভূত হয়ে খড়্গাঘাত থেকে তাকে রক্ষা করলেন এবং দর্শন দিলেন কমলে-কামিনী রূপে। দেবীর বরে বন্দিত্ব ঘুচলো শ্রীমন্তের, বন্দিত্ব ঘুচলো ধনপতির। রাজা প্রতিশ্রুতিমতো শ্রীমন্তের সঙ্গে দিলেন নিজকন্যা সুশীলার বিবাহ।

পিতার সন্ধানে

কারামুক্ত ধনপতি পুত্র, পুত্রবধূ এবং বাণিজ্য-ডিঙা নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। শ্রীমন্ত স্বদেশের রাজা বিক্রমকেশরীকেও দেখালো সেই কমলে-কামিনী দৃশ্য। তিনিও সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীমন্তের সঙ্গে নিজকন্যা রূপবতীর দিলেন বিবাহ। ধনপতিও এবার বুঝতে পারলেন, শিব ও চণ্ডী অভিন্ন। এবার তাঁর প্রাসাদে পাতা হলো মঙ্গলচণ্ডীর ঘট। চণ্ডীর পূজা সর্বত্র প্রচারিত হলো। মানব-লীলার অবসানে স্বর্গের রত্নমালা ও মালাধর ফিরে গেলেন স্বর্গে॥

উপসংহার

॥ সমাজ-চিত্র ॥

মনসা-মঙ্গল কাব্যে যেমন কাব্য-প্রাধান্য অধিক, চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে তেমনি সমাজ-প্রাধান্য সমধিক। ধর্ম-বিশ্বাস, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে উভয় কাব্যে প্রতিফলিত সমাজ-চিত্রের সাদৃশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ, উভয় কাব্যের প্রেক্ষাপটে যে সমাজ রয়েছে, তা, বলাবাহুল্য, মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ। তবে মনসা-মঙ্গলের সমাজ দু-এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী এবং চণ্ডী-মঙ্গলের সমাজ দু-এক শতাব্দীর পরবর্তী।

সূচনা

ত্রয়োদশ শতকের কাছাকাছি সময়ের যে রাজনৈতিক রাষ্ট্রবিপ্লব বাঙালীর সমাজে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে, তা সমাজের মর্মমূল ধরে প্রচণ্ড আবেগে

নাড়া দিয়েছিল, চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে রয়েছে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। মুকুন্দরামের আত্ম-পরিচয়ের কথা বাদ দিলেও বনের পশু-সমাজের ভাগ্যবিপর্যয়ের চিত্রের মধ্যস্থতায় তৎকালীন বাঙালী-সমাজের অসহায়তার রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। শক্তির দম্ভের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত জাতি সেদিন কাতরকণ্ঠে অভিযোগ করেছে ভাগ্য-দেবতার কাছে। তাছাড়া, গুজরাটে রাজ্য-পত্তনের কাহিনীর অন্তরালে ইতিহাসের উত্থান-পতন ও রাজ্য ভাঙাগড়ার কাহিনী যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বলাবাহুল্য।

রাজনৈতিক চিত্র

এইভাবে সমগ্র সমাজ সেদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ধর্মানুগত্যের দিকে, সামাজিক প্রথানুগত্যের দিকে বড় বেশী ঝুঁকে পড়েছিল। শৈব মতের সঙ্গে শাক্ত মতের সংঘাত এবং সংঘর্ষ মনসা-মঙ্গলের মতো কোথাও তীব্র হয়ে উঠেনি। সম্ভবতঃ, শৈব ও শাক্ত মতের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং ধনপতির শিব-চণ্ডীর অভিন্নতার উপলব্ধি উভয় মতের সমন্বয়-সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এটি একটি সামাজিক সুলক্ষণ। কিন্তু বাংলাদেশে ধীরে ধীরে শাক্ত মতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। আশ্বিন মাসে ঘরে ঘরে ছাগ-মেষ-মহিষ বলিদান দিয়ে শক্তি-আরাধনায় শাক্ত-প্রাধান্যেরই চিত্র পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, দেব-নির্ভরতা যে সমাজ-চরিত্রকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

ধর্ম-বিশ্বাস

চণ্ডী মঙ্গলের সমাজে একদিকে যেমন ছিল অসংযম ও অমিতাচার, অন্যদিকে তেমনি ছিল সামাজিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে একশ্রেণীর ধূর্ত, প্রবঞ্চক মানুষের অবাধ দৌরাত্ম্য। ধনপতির পায়রা উড়িয়ে খেলা, তাঁর এবং তাঁর পুত্র শ্রীমন্তের একাধিক বিবাহ সমাজের অসংযম ও অমিতাচারেরই সাক্ষ্য দেয়। অন্যদিকে, মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্তের নানা প্রতারণামূলক কার্যকলাপ সমাজের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা ও নৈতিক অধঃপতনের চিত্র উপস্থাপিত করে। সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তার প্রতিক্রিয়ায় পারিবারিক কলহ প্রায় লেগেই থাকতো। নারীজাতির অবরোধ-প্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোর। খুল্লনা বনে ছাগল চরিয়েছিল বলে সমাজপতিরা তার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করেছে। শেষে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে সেই কলঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। অপরাধ নির্ণয়ের এই নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি সমাজে তখন প্রচলিত ছিল। এমন-কি, গুরুমশাইরাও কোন কোন শিষ্য-জননীর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। সমাজের একদিকে চলতো পুরুষদের ভোগাতিচার, অন্যদিকে অকথ্য নারীনিগ্রহ। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীর অবরোধ-প্রথায় ছিল শৈথিল্য; তাইতো আমরা ফুল্লরাকে মাংসের পসরা নিয়ে পথে বাহির হতে দেখি। বিবাহ-অনুষ্ঠানে ছিল স্ত্রী-আচরণের প্রাধান্য। সামাজিক দৃষ্টিতে বৈশাখ ও মাঘ মাস ছিল পুণ্য মাস। এই দুই মাসে আমিষ ভক্ষণ, এমন-কি, শাক-তোলাও ছিল নিষিদ্ধ। শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নববস্ত্র পরিধানের রীতি বাংলাদেশে তৎকালেও ছিল প্রচলিত।

সামাজিক রীতিনীতি

বাংলাদেশে সামাজিক বিন্যাস ছিল বৃত্তি-অনুযায়ী। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিধারী শ্রেণী-সমূহের মধ্যে রাজা, বণিক-শ্রেণী, তালুকদার, নাবিক-শ্রেণী, দোকানদার-শ্রেণী, শিক্ষক ও ব্যাধ-শ্রেণী ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে প্রত্যক্ষ-বিনিময়েরই ছিল প্রাধান্য। তবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কড়ির প্রচলনও ছিল। রাজার আদেশে বণিক-সম্প্রদায়কে বাণিজ্য-যাত্রা করতে হতো। বণিক শ্রেণীই ছিল সমাজে সর্বাগ্রগণ্য। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল। বিলাস ও ভোগাতিচারের মধ্যে তাদের দিন কাটতো। কিন্তু সীমাহীন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল নিম্নশ্রেণী। তাদের প্রাত্যহিক গ্রাসাচ্ছাদনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। খুঞার বসন, পুরান খোসলা, সামান্য পিরাণ-দোপাটাও তাদের ভাগ্যে জুটতো না। আষাঢ় মাসের মধ্যেই তাদের সমস্ত সম্বল নিঃশেষিত হয়ে যেত। আর অন্যদিকে, উচ্চশ্রেণীর ঢেঁকিশালে ছিল ঢেঁকি, গোলাঘরে ধান এবং গোয়ালে পশুসম্পদের প্রাচুর্য। ধনী-পরিবারের গৃহবধূদের অঙ্গে থাকতো স্বর্ণালংকার, পরনে পট্টবস্ত্র। এই চিত্র তখনকার বাংলাদেশেরই অর্থনৈতিক চিত্র ॥

অর্থনৈতিক চিত্র

॥ কবি-পরিচিতি ॥

মানিক দত্ত চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের প্রবর্তক-কবি। এই কাব্য-শাখার কবি-শ্রেষ্ঠ মুকুন্দরাম তাঁকেই এই শাখার আদি-কবির মর্যাদা দান করেছেন :

মানিক দত্ত

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয় ॥

সুতরাং মানিক দত্ত চণ্ডী-মঙ্গলের গীতপথ-রচয়িতা। তাঁর আবির্ভাব কাল সম্ভবতঃ চৈতন্য-পূর্ব যুগ। মালদহ জেলার ফুলুয়া গ্রামে ছিল তাঁর নিবাস।

দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের প্রথম সার্থক শিল্পী। তিনি আকবরের রাজত্বকালে, সপ্তগ্রামে [মতান্তরে চট্টগ্রামে] এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার নাম পরাশর। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'সারদা মঙ্গল' বা 'সারদাচরিত' বা 'মঙ্গল-চণ্ডীর গীত'। তাঁর কাব্যে কল্পনা-বিলাসের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে স্বভাব-সৌন্দর্যের বর্ণনা। দরিদ্র ব্যাধ-সংসারের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে এবং সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

দ্বিজ মাধব

হুলি পেলি খেলি এয়ো আইল ব্যাধ ঘরে।
মৃগচর্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে ॥

ব্যাধ-রমণীগণের এই বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তবানুসারী। তাছাড়া, তাঁর কালকেতু-চরিত্র তার বীরত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেনি। অন্যান্য চরিত্র-নির্মাণেও তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ মাধব প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক স্বভাব-নিষ্ঠ কবি।

চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের কবি শ্রেষ্ঠ মুকুন্দরামের কবি-খ্যাতিতে পূর্বসূরী দ্বিজ মাধবের কাব্য-গৌরব ম্লান হয়ে গিয়েছে। দুঃখ-বেদনার অনুভূতির রসে সিক্ত করে মুকুন্দরাম যে অমর কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মণি। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়—'চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনার নাটকীয়তা-স্ফুরণে এবং সূক্ষ্ম সরল বাস্তব-দৃষ্টির আলোকে কাব্যটির অসাধারণ উৎকর্ষ দীপ্তি পাইয়াছে। আত্মকাহিনীতে, দরিদ্র গৃহস্থালির বর্ণনায়, দম্পতি-কলহে, সপত্নী-দ্বন্দ্বে, ভাঁড়ু দত্তের শঠতায়, বাঙ্গাল মাঝির খেদে—সর্বত্র মুকুন্দরামের সহৃদয় কবি-চিত্ত অকৃত্রিম মানব-রসের উৎসটির সন্ধান পাইয়াছে। জীবনে কবি অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে জীবন-রস তাঁহার কাছে তিক্ত হইয়া যায় নাই। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের মধ্যে শুধু মুকুন্দরামের প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-রচনার ভাব ও রস-দৃষ্টি ছিল।'

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'আত্মপরিচয়' একাধিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেদনাকীর্ণ ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীর এমন অকৃত্রিম বর্ণনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। সেই সঙ্গে সমকালীন ইতিহাস এবং তৎকালীন বাস্তব সমাজচিত্রের উপস্থাপনায় তাঁর 'আত্মপরিচয়' তুলনারহিত। রত্নাহু নদীর তীরে বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম। সেখানেই কবির সাত পুরুষের বাস। পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। শিবের পূজা করে পরম শান্তিতে দিন কাটছিল গ্রামবাসীদের। এমন সময় বাংলাদেশে ছুটে এলো প্রবল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত। সুবাদার মানসিংহের শাসনকালে ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে ভেঙে গেল দামুন্যার শান্তির নীড়। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কবিকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো অজানিতের পথে। তারপর পথে প্রতারিত, হৃত-সর্বস্ব, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত কবি আশ্রয় করলেন এক পুকুরপাড়। মর্মান্তিক ভাষায় কবি করেছেন সেই সব বেদনাবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা :

আত্ম-পরিচয়

তৈল বিনা কৈল স্নান   করিলু উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে। [উদক—জল, ওদন—ভাত]

তারপর ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত কবি পড়লেন ঘুমিয়ে। নিদ্রিত কবিকে চণ্ডী দিলেন স্বপ্নাদেশ—'আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।' শেষে দৈবানুগৃহীত কবি শিলাই অতিক্রম করে উপস্থিত হলেন মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ-ভূমি আড়রায়। 'ব্যাসের তুল্য সুধন্য' বাঁকুড়া রায় তাঁকে আশ্রয় দিয়ে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর পুত্র-প্রতিম শিষ্য রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে মুকুন্দরাম তাঁর 'অভয়া মঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যরচনা-কাল সম্পর্কে কিছু মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। কবি তাঁর স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তির যে তারিখ ১৫৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দ উল্লেখ করেছেন তাঁর 'আত্মপরিচয়ে', সে তারিখটি, প্রকৃতপক্ষে, মানসিংহের সুবেদারি লাভের [১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দ] বহু পূর্ববর্তী। অথচ 'প্রজার পাপের ফলে সে মানসিংহের কালে ডিহিদার মামুদ

সরিপ।'—এই উল্লেখ থেকে জানা যায়, কবি মানসিংহের সুবেদারির কালে তাঁর জন্মস্থান থেকে উৎখাত হয়েছিলেন। তার পূর্বে দেবীর স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্তি এবং কাব্য-রচনা 'আত্মপরিচয়ে'র ভিত্তিতে সংগতিহীন। আবার, যে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকালে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল, তিনি রাজা হন ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে; অর্থাৎ, মানসিংহের বাংলার সুবেদারি লাভের বহু পূর্বে। এইভাবে স্ববিরোধী তথ্যের সমাবেশে কবির 'আত্মপরিচয়' থেকে তাঁর কাব্য-রচনার কাল-নির্ণয় হয়ে উঠেছে সমস্যা-কণ্টকিত। তবে পণ্ডিতগণের অনুমান, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে [১৫৫৫—৫৬ খ্রীস্টাব্দে] কবিকঙ্কণের চণ্ডী-মঙ্গল রচিত হয়েছিল; এবং তখন বাংলায় আকবর-মানসিংহের রাজত্বকাল নয়, তখন শেরশাহের সঙ্গে বাংলার হোসেন শাহীর সংঘর্ষের কাল।

কাব্য-রচনা কাল

কবিকঙ্কণের চণ্ডী-মঙ্গলে ইতিহাস বড়ো জীবন্ত মূর্তিকে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বহিঃশক্তির আবির্ভাবে সমাজের উচ্চ-নীচ—সর্বস্তরে যে ভীতিসংকুল অনিশ্চয়তা নেমে এসেছিল, মুকুন্দরামের কাব্যেই তার বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন লক্ষণীয়। তার পেছনে ছিল যে বস্তুনিষ্ঠ রসদৃষ্টি, তা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবিত্বের অভিজ্ঞান। দরিদ্রের পর্ণ-কুটিরে জীবন-যাপন থেকে সমৃদ্ধ নগর-স্থাপন, পশুপক্ষী-শিকার থেকে সশস্ত্র যুদ্ধ, ছাগল-চরানো থেকে সুদূর বাণিজ্যযাত্রা, সপত্নী-কলহ থেকে গ্রাম্য দলাদলি, ব্যাধের সহজ সারল্য থেকে ব্যবসায়ীর কুটিল শাঠ্য—জনজীবনের বিচিত্র চিত্রে সমৃদ্ধ কবিকঙ্কণের কাব্য। অসহায় ভালুকের কাতরোক্তি—'উইচারা খাই পশু জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নই না রাখি তালুক॥'—যেমন হৃদয়স্পর্শী, বিপন্ন হস্তিনীর বিলাপও—'বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান নাই বীরের গোচর॥ পলাইয়া কোথা যাই কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি॥'—তেমনি মানবিক রসসমৃদ্ধ।

কাব্য-কৃতিত্ব

কবিকঙ্কণের এই কাব্য-কৃতিত্বের মূলে আছে তাঁর বাস্তব জগৎ ও জীবনের প্রতি অপূর্ব মমত্ববোধ। দেবতার মহিমা-কীর্তনের নামে তিনি গেয়েছেন মানুষেরই জয়গান। অপ্রধান চরিত্রগুলির নির্মাণে তিনি প্রদর্শন করেছেন অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য এবং সমকালীন সমাজ ও জীবনের আলেখ্য রচনায় রেখেছেন দুর্লভ বস্তু-নিষ্ঠার পরিচয়। মুকুন্দরাম কেবল চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যেরই শ্রেষ্ঠ কবি নন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সার্থক শিল্পী তিনি॥

শেষ-কথা

॥ কাহিনী ॥

ধর্ম-মঙ্গলের কাব্য-কাহিনী রাঢ় বাংলার লোক-মানসের দেব-ভাবনার অপূর্ব সৃষ্টি। ধর্মঠাকুর রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজিত এক অতি প্রাচীন দেবতা। সূর্য, শিব, বিষ্ণু, যম, ইন্দ্র এবং অন্যান্য বহু দেবতার কল্পনা-সমাহারে ধর্মঠাকুর দেব-কল্পনার উদ্ভব। লোক-জীবনের রুক্ষ কঠোরতা, স্থূল গ্রাম্যতা এবং শৌর্য এই কাব্যের কাহিনীকে দিয়েছে দুর্লভ দৃঢ়তা। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত-সংঘর্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, বঞ্চনা, চক্রান্ত এবং অলৌকিক ঘটনা-বিস্তারে এই কাব্য-কথা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

সূচনা

ধর্মঠাকুর মর্ত্যে নিজ পূজা প্রচারের জন্যে উৎসুক। বাহন উলুকের পরামর্শে তিনি দেব-সভায় নর্তকী জাম্ববতীকে নৃত্যকালে তালভঙ্গের অপরাধে অভিশাপ দিয়ে প্রেরণ করলেন মর্ত্যে। রমতি নগরে সে জন্মগ্রহণ করল বেণু রায়ের কন্যা রঞ্জাবতী নামে। তার জ্যেষ্ঠা ভগিনী গৌড়ের পাটরানী এবং ভ্রাতা মহামদ গৌড়ের প্রধান অমাত্য।

পূর্বাভাস

ঢেকুরগড়ের রাজা কর্ণসেন ছিলেন গৌড়-রাজের অনুগত সামন্ত শাসক। চণ্ডীর অনুগ্রহে ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষ দুর্জয় শক্তি লাভ করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তাঁর হাতে কর্ণসেনের ছয় পুত্র একে একে প্রাণ হারালো এবং পুত্রশোকে তাঁর পত্নীও প্রাণত্যাগ করলেন। কর্ণসেনও ইছাইর হাতে হলেন পরাজিত। শোকে, বেদনায়, অপমানে একেবারে ভেঙে পড়লেন কর্ণসেন। গৌড়েশ্বর সহানুভূতিবশে তাঁর সঙ্গে নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়ে তাঁকে ময়নাগড়ের সামন্তরাজা করে পাঠালেন। কিন্তু গৌড়ের রাজশক্তির প্রধান স্তম্ভ রাজশ্যালক মহামদ এই বিবাহে হয়ে উঠলো ক্ষিপ্ত। তার অনুপস্থিতিতে এবং বিনানুমতিতে এক বিপত্নীক বৃদ্ধের সঙ্গে ভগ্নীর এই বিবাহকে সে সমর্থন করতে পারলো না। সে ভগ্নীর অনিষ্ট সাধনের জন্যে হলো কৃত সংকল্প।

রঞ্জাবতীর বিবাহ

রঞ্জাবতী কুমারী-জীবনেই শিক্ষা করেছিল ধর্মঠাকুরের উপাসনা। সে সেই দুশ্চর তপস্যার সিদ্ধিতে লাভ করলো এক গুণবান পুত্র। নাম তার লাউসেন। মহামদ লাউসেনকে হত্যা করবার জন্যে হলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে লাউসেনকে হত্যা করবার তার সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হতে লাগলো। একবার মহামদ লাউসেনকে অপহরণ করলে ধর্মঠাকুর শোক-বিহ্বলা রঞ্জাবতীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কর্পূর-বিন্দু থেকে কর্পূরধবলকে সৃষ্টি করে তার কোলে দিয়ে গেলেন। অন্যদিকে, ধর্মঠাকুরের চেলা হনুমান উদ্ধার করে আনলো লাউসেনকে। রঞ্জাবতী এখন দুই পুত্রের জননী—লাউসেন ও কর্পূরধবল।

লাউসেনের জন্ম

লাউসেন ধীরে ধীরে কুশলী মল্লবীর হয়ে উঠলো। পার্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করে তার সংযম ও চরিত্রবলে সন্তুষ্ট হয়ে তার হাতে তুলে দিলেন বিজয়-খড়্গ। এবার শক্তির পরিচয় দিতে লাউসেন চললো গৌড়ে। পথে অপূর্ব বীরত্ব ও চরিত্র-সংযমের নানা পরিচয় দিয়ে সে গৌড়ে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাতুল মহামদের চক্রান্তে হলো বন্দী। পরে মুক্ত হয়ে সে রাজ-সমাদর লাভ করে ময়নাগড়ে ফিরে এলো। পথে তার পরিচয় হলো কালু ডোম ও তার পত্নী লখ্যার সঙ্গে। অনুচরবৃন্দসহ তারা এলো ময়নাগড়ে। কালু ডোম হলো লাউসেনের প্রধান সেনানায়ক।

মহামদের চক্রান্ত

মহামদের প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর লাউসেনকে প্রেরণ করলেন কামরূপ বিজয়ে। সে কামরূপ-রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর কন্যা কলিঙ্গাকে করলো বিবাহ। পরে লোহ-গণ্ডারের শিরশ্ছেদ করে শিমুলার রাজকন্যা কানাড়াকে বিবাহ করে বিজয়ী বীর সগৌরবে ফিরে এলো গৌড়নগরে। লাউসেনের বিজয়-গৌরবে হিংসায় জ্বলতে লাগলো মহামদ। এবার মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে ঢেকুরে পাঠালেন বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করবার জন্যে। ইছাই চণ্ডীর অনুগৃহীত, অমিত শক্তিধর। কিন্তু ধর্মঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনরই হলো জয়। সে ইছাইকে হত্যা করে সগৌরবে ফিরে এলো ময়নাগড়ে।

লাউসেনের বীরত্ব

তারপর মহামদের প্ররোচনায় ও গৌড়রাজের নির্দেশে লাউসেন দারুণ ঝটিকা-প্লাবনের হাত থেকে গৌড়-রাজ্যকে রক্ষা করে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় দেখিয়ে অসাধ্য সাধন করলো ধর্মের বরে। এদিকে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ আক্রমণ করলো ময়নাগড়। তার হাতে কালু ডোম, লখ্যা ও কলিঙ্গা প্রাণ হারালো। কিন্তু কানাড়া ও ধুমসীর বীরত্বে পরাজয় ও বন্দিত্ব স্বীকার করতে হলো মহামদকে। হরিহর বাইতি ছিল লাউসেনের পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়-দর্শনের সাক্ষী। সত্যকথনের জন্যে মহামদের চক্রান্তে তাকে প্রাণ দিতে হলো। লাউসেনের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর মহামদের সর্বশরীরে কুষ্ঠরোগ সঞ্চারিত করে তাকে দিলেন তার খলতার চরম শাস্তি এবং ময়নাগড়ের নিহত সকলকে দিলেন পুনর্জীবন। যাই হোক, লাউসেনের দয়ায় মহামদের দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগ সেরে গেল, কিন্তু মুখে থেকে গেল তার অপকীর্তির চিরস্থায়ী শেষ-স্বাক্ষর।

লাউসেনের চরম পরীক্ষা ও মহামদের শাস্তি

ধর্মঠাকুরের পূজা মর্ত্যলোকে প্রচারিত হলো। পুত্র চিত্রসেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে লাউসেন জননী রঞ্জাবতীর সঙ্গে চললো স্বর্গলোকে। ধর্ম মঙ্গলের কাহিনী যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত-মুখর, তেমনি রোমাঞ্চকর। মনসা-মঙ্গল কাব্য যেমন পূর্ববঙ্গের লোক-গাথা, চণ্ডী-মঙ্গলের মতো ধর্ম-মঙ্গলও তেমনি পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ় বাংলার লোক-কথা। কাব্য-কায়া নির্মাণে যেন স্ব-স্ব অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতিও হাত লাগিয়েছে। তাই মনসা-মঙ্গল যতখানি অশ্রু-বিধুর, ধর্ম-মঙ্গল মহাকাব্যের মতো ততখানি দৃঢ় এবং কাঠিন্যযুক্ত।

উপসংহার

॥ কবি-পরিচিত ॥

ময়ূরভট্ট

ধর্ম-মঙ্গলের আদি-কবি ময়ূরভট্ট। তাঁর উত্তরসূরীরা সবাই তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন লাউসেন-কাহিনীর প্রথম স্রষ্টারূপে: 'ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীতে আদ্য কবি।'—ঘনরাম চক্রবর্তী। ময়ূরভট্টের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। কাজেই, তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সমস্তই অনুমান-নির্ভর। তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতকের কবি এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁর কাব্যের নাম সম্ভবতঃ 'হাকন্দ পুরাণ'।

রূপরাম চক্রবর্তী

ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর আবির্ভাব-কাল অজ্ঞাত। তবে অনুমান, ষোড়শ শতকের অন্তিমপর্বে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে তাঁর কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর সাবলীল ভাষা ও সহজ ভঙ্গি তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার দুয়ার খুলে দিয়েছিল। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে অলৌকিক দৈবী প্রকাশের ছড়াছড়ি। কিন্তু রূপরাম দেবতার গুণগান করতে বসেও মানুষের কথা ভুলে যান নি। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবেদনশীল রূপকার। ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতার স্পর্শে তাঁর আত্মবিবরণটি যেমন জীবনরস-মধুর, তেমনি চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রূপরামের কাব্য তার বাস্তবতার জন্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

ঘনরাম চক্রবর্তী

অনেকের মতে, ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতাদেবী। অধ্যয়ন গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে। শিক্ষাগুরুই তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাব্য-রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। কবি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের দাক্ষিণ্যপুষ্ট। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সুষম সমাহারে এবং উপমা-অনুপ্রাসের নিপুণ প্রয়োগে তাঁর কাব্য লাভ করেছে নিটোল রস-মূর্তি। যে উন্নত রুচিবোধ গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট সেকালের একটি লৌকিক কাহিনীকে শিল্পসম্মত বাণীরূপ দান করেছে, তা সেই যুগের বিচারে দুর্লভ-দৃষ্টান্ত এবং বিস্ময়কর। তাঁর শব্দ-বিন্যাস ও বাক্য-যোজনার চমৎকারিত্ব সম্ভবতঃ তাঁর উত্তরসূরী ভারতচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তার ওপর, চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্য, বলিষ্ঠ জীবন-দর্শন ও স্বদেশ-চিন্তা সমালোচকদেরও বিস্ময় উৎপাদন করেছে। তাঁর 'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।'—চরণটি বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-চিন্তার প্রথম দৃষ্টান্ত।

তাছাড়া, অন্যান্য ধর্মমঙ্গল কাব্যকারদের মধ্যে মানিকরাম গাঙ্গুলি, খেলারাম চক্রবর্তী, শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, সহদেব চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥

অনুসরণী-৫

* ১. মঙ্গল-কাব্য কাকে বলে? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তা দেখাও। [৫০ পৃ., ৬১ পৃ.—৬৪ পৃ., ও ৬৭ পৃ.—৬৮ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮

২. মঙ্গল-কাব্য কি ধরনের কাব্য? তার শাখা কতগুলি? যে-কোন একটি শাখার কোন একজন কবির কাল ও রচনা বিষয়ে আলোচনা কর। [৫০ পৃ. ও ৫৯ পৃ.—৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৩. মঙ্গল-কাব্য কাকে বলে? মনসা-মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান বর্ণনা কর এবং মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রধান কয়েকজন কবির উল্লেখ কর [৫০ পৃ., ৫২ পৃ.—৫৫ পৃ. এবং ৫৭ পৃ.—৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৪

*৪. মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করে একজন মনসা-মঙ্গল-রচয়িতার পরিচয় দাও। [৫২ পৃ—৫৫ পৃ. এবং ৫৮ পৃ.—৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬১

৫. মনসা-মঙ্গল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই কাহিনী অবলম্বন করে যে সমস্ত কবি কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট কবি ও তাঁদের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৫২ পৃ.—৫৫ পৃ. এবং ৫৮ পৃ—৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৪

৬. মনসা-মঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের বাঙালীর জীবনযাত্রার কি পরিচয় পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [৫৫ পৃ—৫৭ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৭. যে মূল কাহিনী অবলম্বন করে মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে, তার বিবরণ দাও। মনসা-মঙ্গল-রচয়িতা যে-কোনও কবির সম্বন্ধে যা জান লেখ। [৫২ পৃ.– ৫৫ পৃ. এবং ৫৯ পৃ —৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৬

*৮. বাংলা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে অঙ্কিত নারীচরিত্রের কোন্ কোন্‌টি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে? যে-কোন একটি চরিত্রের আদর্শ ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও। [৫২—৫৫ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৯. কবির পরিচয় দিয়ে যে-কোন মঙ্গল-কাব্যের কাহিনী বিবৃত কর। [৫২ পৃ—৫৫ পৃ. এবং ৫৯ পৃ.—৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা. '৬২

*১০. চণ্ডী-মঙ্গলের দুটি কাহিনীর যে-কোনও একটি বিবৃত করে চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের একটি সাধারণ পরিচয় দাও। [৬১ পৃ.—৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১১. চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত প্রধান দুটি কাহিনীর যে-কোনও একটির বিবরণ দাও। চণ্ডী-মঙ্গল রচয়িতা একজন বিশিষ্ট কবি সম্বন্ধে যা জান লেখ। [৬১ পৃ —৬২ পৃ. এবং ৬৭ পৃ.– ৬৮. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৭

১২. মঙ্গল-কাব্য বলতে কি বুঝ? কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী কোন্ মঙ্গল-কাব্যের অন্তর্গত? সংক্ষেপে এই কাহিনী নিজের ভাষায় বিবৃত কর। [৫২ পৃ. ও ৬১ পৃ.—৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১৩. চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর আবির্ভাব-কাল, জীবন ও রচনা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৬৭ পৃ —৬৮ পৃ. দ্রষ্টব্য] ব. প্র. '৬৩

১৪. চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে অনার্য জাতির যে জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [৬১ পৃ —৬২ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা, '৬৪

১৫. নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর: কবিকঙ্কণ চণ্ডী-মঙ্গল কাহিনী অথবা ধর্ম-মঙ্গল কাহিনী। [৬১ পৃ.—৬৩ পৃ. এবং ৬৯ পৃ.—৭০ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. [কম্পার্ট] '৭৫

১৬. ধর্ম-মঙ্গল কাব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই কাব্যের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর সম্বন্ধে কি জান লেখ। [৬৯ পৃ.—৭১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১৭. পরিচয় দাও:

কবিকঙ্কণ [৬৭ পৃ.–৬৮ পৃ. দ্রষ্টব্য], ব. প্র '৬২। কবিকঙ্কণের চণ্ডী-মঙ্গল [৬৭—পৃ. ৬৮ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্র, '৬১। ঘনরামের ধর্ম-মঙ্গল [৭১ পৃ. দ্রষ্টব্য], ক. প্রা.'৬৩। বিজয়গুপ্ত [৫৮ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ [৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য]। নারায়ণ দেব [৫৯ পৃ দ্রষ্টব্য]। অভয়ামঙ্গল, সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত [৬৬ পৃ. দ্রষ্টব্য]। দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য [৬৬ পৃ দ্রষ্টব্য]। রূপরাম চক্রবর্তী [৭১ পৃ. দ্রষ্টব্য]।

———

৫.
শ্রীচৈতন্যের জীবন ও তার প্রভাব

"পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা॥" —পরমানন্দ

তুর্কী-আক্রমণে পরাজিত, আত্মবিস্মৃত, নিরস্ত্র জাতি এক আলোকহীন মহানিশায় নিমজ্জিত হয়ে চলেছিল আত্মবিলুপ্তির পথে। কিন্তু নিত্য সজীবতা ও প্রাণোচ্ছলতাই হলো বাঙালীর সংস্কৃতি ও তার জাতীয় জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর্য ও আর্যেতর নানা গোষ্ঠীর জীবন-ধারা ও সংস্কৃতি-চেতনার সমন্বয়ে গঠিত বাঙালীর জীবন এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিদেশী শক্তির চক্রান্তে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। তাই সবার অলক্ষ্যে ইতিহাসের নীরব যাত্রাপথে তার নবজাগৃতির প্রস্তুতি চলেছিল অতি নিঃশব্দে। তুর্কী বিজয়ের পটভূমিতে যে নবজাগৃতির ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিল, তা ছিল প্রধানতঃ ভাবমূলক। প্রায় দু'শতাব্দী ধরে চলেছিল সেই ভাবমূলক নবজাগৃতির প্রস্তুতি।

ভূমিকা

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের নবদ্বীপই হলো সেই নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র। পরাজিত সেনরাজাদের পরিত্যক্ত, হতমান রাজধানী—নবদ্বীপ। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে এই নবদ্বীপেই উচ্চারিত হলো নবজাগৃতির বাণী। রাধাকৃষ্ণ হলো তার সার্বজনীন মূর্তি, 'হরিবোল' হলো তার সার্বজনীন মূলমন্ত্র এবং হৃদয়ের উৎসারিত প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসা হলো সেই যুগ-বন্দনার শ্রেষ্ঠ উপচার। হতাশা-ক্লিষ্ট, শতধা বিচ্ছিন্ন জাতি নবযুগের আলোকে প্রত্যক্ষ করলো তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ। হতাশা, বিচ্ছিন্নতা ও জড়তাকে জয় করে স্থাপিত হলো তার সাংস্কৃতিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতির ভিত্তি। এবার বাঙালীর হিয়া-অমিয় মন্থন করে নির্মিত হতে লাগলো নবজাগৃতির কায়া।

নবজাগৃতির ভিত্তি

বিদেশী সংস্কৃতির প্রবল আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রয়োজন জাতির মর্মে মর্মে অনুভূত হচ্ছিল। সেই যুগ-বাসনাকে বাস্তব রূপ দানের জন্যে পুরাণ-ভাগবতের অনুবাদের এক সফল প্রয়াস সারাদেশে সূচিত হয়ে যায়। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ লীলার ভাব-তরঙ্গ ভক্তিপথগামী হয়ে ধীরে ধীরে স্পর্শ করলো বাংলাদেশের জল এবং তার শ্যামল মাটি। বাংলাদেশের জনমানসে প্রবহমান লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-লোককাহিনীর সঙ্গে হলো তার ভাব-সম্মিলন। পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ-লীলার ভাব জাহ্নবী বাংলার জনপদবিধৌত রাধাকৃষ্ণ-লোককাহিনীর জলধারায় লাভ করলো পুষ্টি, শ্রী এবং প্রাণোচ্ছ্বাস। ফলে, বাঙালীর ভাব-জীবনে

নবজাগৃতির উপাদান ও প্রস্তুতি

ঘটলো যে মহা-প্লাবন, তাতে সারা বাংলাদেশ প্লাবিত হলো, সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জীবনের উপকূলে লাগলো তার প্রবল ঢেউ। আর, যাঁকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের এই মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, তিনি হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনার অগ্রনায়ক—যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্য।

পরন্তু, হতমান এবং নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত, অসহায় জাতির সুপ্ত চেতনায় এই বিশ্বাসের ভিত্তি রচিত হয়েছিল যে, নিপীড়িত মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্যে, দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্যে এবং যুগধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে তাদেরই পর্ণকুটিরে অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন মুক্তিদাতা ঈশ্বর। তিনি পতিতের করবেন উদ্ধার, মানহীনকে ফিরিয়ে দেবেন তার লুপ্ত সম্মান, মুমূর্ষুকে দেবেন নবজীবনের আশ্বাস। মধ্যযুগের নীরন্ধ্র অন্ধকারে সমগ্র জাতি যখন মহাতামসিকতায় নিমগ্ন, যখন পাশব-শক্তির কাছে মানবাত্মার ঘটছিল দুঃসহ অপমান, যখন শাস্ত্রীয় শাসনের নিষ্ঠুর নিগড়ে অর্থহীন লোকাচারের নাগপাশে সমগ্র সমাজের ঘনিয়ে আসছিল মৃত্যুলগ্ন, তখনই বাংলাদেশের লুপ্ত গৌরব নবদ্বীপ-নগরে এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রবল সংকীর্তন-ধ্বনির মধ্যে বিঘোষিত হলো এক মহামানবের আবির্ভাব। তিনি প্রেম-ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ—শ্রীচৈতন্য। তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিত মানবতাকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তার পূজার আয়োজন করলেন। সত্যিই, মধ্যযুগের ইতিহাসের সে এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

নব-জাগরণ'

বলদর্পীর নিষ্ঠুর অত্যাচার তখন জয়যুক্ত হয়েছে, দিকে দিকে সূচিত হয়েছে হিংসারই জয়। সেদিন 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কেঁদে ফিরছিল। এবার পরাজিত, অপমানিত, দিশাহারা জাতি খুঁজে পেল নতুন আলো, নতুন শক্তি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি নিশ্চেতন জাতির হৃদয়ে সঞ্চারিত করলেন দুর্জয় শক্তি এবং তার নির্বাক্ মুখে দিলেন নবযুগের ভাষা। মুসলমান-আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত সমাজে ইতিমধ্যে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। বাহিরের পরাজয়ের গ্লানি বৃদ্ধি করে দিয়েছিল আভ্যন্তরীণ সামাজিক কঠোরতা। অন্যদিকে, সামাজিক নিষ্পেষণে নৈরাশ্য-নিপীড়িত নিম্নশ্রেণী-ভুক্ত হিন্দুরা ইসলাম-ধর্মের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল আশার আলো। ইসলাম-ধর্মের শ্রেণীবিহীন সাম্য ও ভ্রাতৃভাব তাদের ইসলাম-ধর্ম গ্রহণে আকৃষ্ট করে। সেদিন হিন্দু সমাজের ভাগ্যে ঘনিয়ে এলো চরম দুর্দিন। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে সকল নৈরাশ্য, অবিশ্বাস ও ঘৃণার অবসান ঘটিয়ে সেকালের জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণ-শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ-সন্তান উচ্চারণ করলেন—

শ্রীচৈতন্য ও বাংলার সমাজ

'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।'

[চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে ॥]

তাঁর আহ্বানে ধ্বংসোন্মুখ সমাজ আসন্ন বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেল।

একদিকে যেমন পুরাতন সংস্কারের কঠিন প্রাচীর প্রেমের সংস্পর্শে দ্রবীভূত হলো, অন্যদিকে তেমনি ঘরের ছেলে ফিরে এলো ঘরে। এইভাবে সমগ্র জাতির ভ্রান্তি-বিলাসের অবসানে এক মহাজাগরণের লগ্ন সমাগত হলো। নব-জাগরণের মহা-বেদনায় সমগ্র সমাজ কেঁপে উঠলো আবেগে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিকতার ক্ষুদ্র সীমিত গোষ্পদ নবজাগ্রত প্রেম-ভক্তিবাদের দুর্বার প্লাবনে প্লাবিত হয়ে ধারণ করলো মহাসমুদ্রের বিশাল রূপ। আমাদের সীমাবদ্ধ সমাজের ইতিহাসে সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাকেই আধুনিক ইতিহাসকারেরা অভিহিত করলেন 'চৈতন্য-রেনেসাঁস'। শ্রীচৈতন্যের মধ্যস্থতায় বাঙালীর চৈতন্যের বা চেতনালোকের যে জাগরণ, তাই-ই 'চৈতন্য-রেনেসাঁস'। অবক্ষয়, লাঞ্ছনা ও অপমানের ধূলিশয্যা থেকে বিষণ্ণ মানবতাকে তুলে এনে শ্রীচৈতন্য করলেন তার পূজার আয়োজন। প্রেমভক্তি হলো তার উপচার, আর মন্ত্র হলো আবেগকম্পিত নামগান।

'চৈতন্য-রেনেসাঁস'

এইভাবে শ্রীচৈতন্য এই জড়তাগ্রস্ত, পরিবর্তনবিমুখ, অনড় সমাজে ঘটিয়ে দিলেন এমন এক অকল্পিত-পূর্ব সামাজিক বিপ্লব, যার অনিবার্য প্রতিফলন পড়লো তার শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে—সর্বোপরি, তার সামগ্রিক জীবন-দর্শনে। বাঙালীর ইতিহাসে, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এত বড় ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। শ্রীচৈতন্যের আদর্শে এবং তাঁর লোকোত্তর জীবনের ভক্তিপূত দীপালোকে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো। সংকীর্ণ দেহবাদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হলো দেববাদ। সেই দেববাদ স্বর্গমুখীন্ না হয়ে হলো মর্ত্যমুখীন্, ভগবানাশ্রয়ী না হয়ে তা হলো মানবাশ্রয়ী—জীবনাশ্রয়ী। এই নতুন ভাব-প্রধান, ভক্তি-প্রধান যুগকে কবিও তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন দ্বিধাহীন ভাষায়ঃ

সমাজ-বিপ্লব

'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগসার ॥'

॥ শ্রীচৈতন্যের জীবন ॥

ভগবান বুদ্ধের পর শ্রীচৈতন্যের মতো এত বড় সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব [Personality] ভারতভূমিতে আর কখনো আবির্ভূত হয়নি, সমাজকে এত প্রবলভাবে নাড়াও দেয়নি কেউ। ত্যাগ, প্রেম ও ভক্তির গৌরবে তিনি তাঁর জীবনকে পবিত্র স্বর্গে রূপান্তরিত করেছিলেন; যার দিকে প্রবল আবেগে ধাবিত হয়েছিল লক্ষ-কোটি তাপদীর্ণ, মুমুক্ষু নরনারী। শ্রীচৈতন্য ভাবের প্রবল বর্ষণে অভিষিক্ত করে নবজন্মদান করলেন তাদের। ফলে, দিকে দিকে দেখা দিল ভাবের মহোৎসব, প্রাণ-প্রাচুর্যের মহোৎসব, নব নব সৃষ্টির মহোৎসব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় –'বর্ষার ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলা দেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া

মহাজীবন

দাঁড়াইয়াছিল, সকলে সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষায় এবং নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।' আর বিস্ময়ের কথা, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র আশ্বাসবাণী এইভাবে এক দেবকল্প মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে তার সফলতা খুঁজে পেয়েছিল। বিস্মিত, অভিভূত এবং আবিষ্ট কবি-সমাজ সেই লোকোত্তর মানব-মহিমাকে দেব-মহিমায় মণ্ডিত করে প্রকাশ করলেন তাঁদের সুভাষিত এবং সুবাসিত ভাষায়।

শ্রীচৈতন্যের দেবদ্যুতিময় জীবন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রেরণার এক পরম রমণীয় কল্পবৃক্ষ। তাঁর ঘটনাবহুল, কর্মময় জীবনের পরিধি মাত্র সাতচল্লিশ বছর কয়েক মাস। লীলাময় এই সংক্ষিপ্ত জীবন-কালকে পণ্ডিতেরা তিনটি লীলা বা পর্বে ভাগ করেছেন। সেগুলি হলো: এক. আদিলীলা, দুই. মধ্যলীলা এবং তিন. অন্ত্যলীলা। প্রথম পর্বটিকে বলা যায় 'গৌড়-পর্ব'; এই পর্বে প্রধানতঃ গৌড়ভূমিতেই তাঁর কর্মধারা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্বটিকে বলা যেতে পারে 'পরিব্রাজক-পর্ব'; সেই পর্বে তিনি দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারত ও মথুরা-বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেছেন এবং তাঁর প্রেমভক্তি-ধর্ম প্রচার করেছেন। সবশেষে, তৃতীয় বা অন্তিম পর্বটিকে 'নীলাচল-পর্ব' নামে অভিহিত করা যায়; এই পর্বে নীলাচলকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর কাটে। গৌড়-পর্বের পরিধি তাঁর সন্ন্যাস-গ্রহণ ও গৌড়ত্যাগ পর্যন্ত বিস্তৃত; পরিব্রাজক-পর্বের পরিধি গৌড়-ত্যাগ থেকে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে তীর্থ-ভ্রমণ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নীলাচল-পর্বের পরিধি নীলাচল-বাস থেকে তাঁর দেহত্যাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

জীবনের পর্ব-বিভাগ

॥ শ্রীচৈতন্যের জীবন ॥

আদিলীলা বা গৌড়পর্ব

বাংলা ৮৯২ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা। ইংরেজী ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী। নবদ্বীপের আকাশে উদিত হলো পূর্ণিমার চাঁদ। আর, নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ঘরেও উদিত হলেন নবযুগের পূর্ণচন্দ্র—যুগাবতার শ্রীচৈতন্য। প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর, ডাকনাম—নিমাই। শচীমাতার প্রাণের দুলাল নিমাইর অঙ্গকান্তি ছিল গৌরবর্ণ। তাই তাঁর এক নাম হলো গৌরাঙ্গ বা গৌরহরি, সংক্ষেপে 'গোরা'। চৈতন্যজীবনীকার জয়ানন্দের মতে, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ মূলতঃ ছিলেন উড়িষ্যার জাজপুরের অধিবাসী। কিন্তু সেখানে রাজরোষে পড়ে তাঁরা বাধ্য হন জাজপুর ত্যাগ করে শ্রীহট্টে চলে যেতে। তুর্কী-আক্রমণের পর দুর্ভিক্ষ, মড়ক, অনাবৃষ্টি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার দরুন যখন সেখানে জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তখন জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসবাস শুরু করেন। অবশ্য, জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার জাজপুরের অধিবাসী ছিলেন—জয়ানন্দের এই মতবাদ পণ্ডিত-সমাজে এখনো স্বীকৃতি পায়নি।

আবির্ভাব ও বংশ-পরিচয়

শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈত আচার্যের টোলে অধ্যয়ন করে সংসারের মায়াময় অনিত্যতা উপলব্ধি করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। পাছে গৌরাঙ্গও অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, পাছে তিনিও অদ্বৈতাচার্যের শিক্ষায় সংসারকে মায়াময় বলে পরিত্যাগ করে চলে যান, তাই জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে টোলে পাঠালেন না। কিন্তু নিমাই ও শচীদেবীর জিদের জন্যে তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হলো। নিমাইকে ভর্তি করে দেওয়া হলো গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে।

বাল্য-শিক্ষা

বাল্যকালে নিমাই ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত-প্রকৃতির। তাঁর দুরন্তপনায় নবদ্বীপ-বাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শচীমাতার কাছে তাঁর দুরন্তপনার বিরুদ্ধে আসতে লাগলো নিত্য-নতুন অভিযোগ। এইভাবে কিশোর নিমাইর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল অফুরন্ত প্রাণশক্তির অন্তহীন প্রকাশ। ছাত্র-হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। স্বল্পকালের মধ্যে নানাশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে তিনি প্রাচীন সামাজিক জড়ত্ব ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। মহাপণ্ডিত নিমাই হয়ে উঠলেন মহা-তার্কিক। সময়ে-অসময়ে তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন প্রবীণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সঙ্গে। বলাবাহুল্য, প্রবীণ ও নবীনের এই সংঘাতে নবীনেরই হতো জয়। এইভাবে তিনি যৌবনারম্ভেই মেতে উঠেছিলেন নবযুগের আলোকে প্রাচীন শাস্ত্র ও শাস্ত্রাচারের পুনর্মূল্যায়নের নেশায়। শাস্ত্রীয় বন্ধন-মুক্তির পিপাসা এবং স্বকীয় অন্বেষা তাঁকে অতি অল্প বয়সেই চঞ্চল করে তুলেছিল।

প্রবীণ ও নবীনের সংঘাত

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নবদ্বীপে খুললেন একটি চতুষ্পাঠী। শুরু হলো নিমাই পণ্ডিতের একনিষ্ঠ অধ্যাপনা। দেশ-দেশান্তর থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে ছুটে এলো। এই সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীর তাঁর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হলে এই তরুণ অধ্যাপকের অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এবং সেই সঙ্গে তাঁর অধ্যাপন-কৃতিত্বের কথা দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

তরুণ অধ্যাপক

ইতিমধ্যে নিমাই পণ্ডিতের জীবনে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে: এক. তাঁর পিতৃদেবের মৃত্যু এবং দুই. বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁকে শ্রীহট্টে তাঁর পূর্বপুরুষগণের বাসভূমি পরিদর্শনে যেতে হয়। পূর্ববঙ্গ এই তরুণ অধ্যাপককে সেদিন বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। বৎসরান্তে তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে জানলেন, সর্প-দংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পিতার মৃত্যু, লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু এবং তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ—এই বিয়োগান্তক ঘটনাবলী তাঁর মনকে ধীরে ধীরে সংসার-বিমুখ করে তুললো। শচীমাতার একান্ত অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই পণ্ডিতের সংসারে অতুলনীয় রূপ ও গুণ নিয়ে এলেন। কিন্তু যে একবার মুক্তির আহ্বান শুনেছে, সংসারে কি তার আর মন বসে? সংসার-সম্বন্ধে নিমাইর মন চির-উদাসীনই থেকে গেল।

সংসারী নিমাই

তারপর পুণ্যতীর্থ গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করতে গিয়ে এক নবানুভূতির উন্মেষে তাঁর অন্তরলোক সহসা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তিনি মহাসাধক ঈশ্বরপুরীর কাছে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। নব-ভাবানুভূতির ব্যাকুলতায় তিনি এখন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। তাঁর পাণ্ডিত্যের দুর্জয় কাঠিন্য এক বিচিত্র ভাবের স্পর্শে কোমল হয়ে উঠেছে।

গয়াগমন ও ভাবান্তর

নবদ্বীপের তরুণ অধ্যাপক নিমাই এখন ভক্ত-প্রেমিক। অন্তরের জ্ঞান এখন এক অপূর্ব ভক্তিরসে অভিষিক্ত। হরি-সংকীর্তন এবং ভাগবত-পাঠ হলো তাঁর দৈনন্দিন কার্যসূচীর প্রধান অঙ্গ। জ্ঞান-কেন্দ্র নবদ্বীপ রূপান্তরিত হলো ভক্তি-কেন্দ্রে। নবদ্বীপের পথে-পথে এলো হরি-সংকীর্তনের জোয়ার। এমন সময় নবদ্বীপে এলেন এক ভোগবাদী অবধূত, তিনি ভক্তি-বিভোর নিমাইর স্পর্শে হয়ে উঠলেন নিত্যানন্দ। এবার নবদ্বীপে প্রেমভক্তির জোয়ার হলো প্রবলতর। এই সময় জগাই ও মাধাই নামে দুজন মদ্যপ ব্যভিচারীর চরিত্রে প্রেমভক্তির বন্যা এনে নিমাই সকলের চোখে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠলেন।

ভক্ত-প্রেমিক নিমাই

সংকীর্ণ-চিত্ত, রক্ষণশীল হিন্দুগণ নিমাইর উদার ধর্মমতে শঙ্কিত হয়ে পথে-পথে হরি-সংকীর্তন বন্ধ করবার জন্যে কাজীর কাছে আবেদন জানালো। কাজীর আদেশে নবদ্বীপে নগর-সংকীর্তনের বিরুদ্ধে জারী হলো নিষেধাজ্ঞা। নিমাই কাজীর আদেশ অমান্য করে নবদ্বীপে নগর-সংকীর্তনের আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে জনসাধারণ হরিনাম কণ্ঠে নিয়ে বেরিয়ে এলো পথে। ইতিহাসে এটাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম আইন অমান্য আন্দোলন। একদিকে, প্রবল রাজশক্তি ; অন্যদিকে, প্রবলতর জনশক্তি। একদিকে, শাণিত অস্ত্র ; অন্যদিকে, হরিনামের অমোঘ মন্ত্র। অবশেষে জয় হলো নিমাইর, জয় হলো জনশক্তির, জয় হলো যুগের, যুগধর্মের। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলো।

গণশক্তি বনাম রাজশক্তি

চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই কাটোয়ার কেশবভারতীর কাছে দীক্ষা নিলেন— সন্ন্যাসের দীক্ষা। তারপর গৃহত্যাগের পালা। মাতার অনুমতি নিয়ে পুরীর পথে বেরিয়ে পড়লেন নবযুগের মুক্তি-পথিক। এবার নিমাইর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্য।

সন্ন্যাসে দীক্ষা

মধ্যলীলা বা পরিব্রাজক পর্ব

নবদ্বীপ থেকে পদব্রজে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হলেন নীলাচল পুরীতে। নীলাচলই হলো তাঁর প্রেম ও ভক্তি-সাধনার পুণ্যপীঠ। পুরী থেকে তিনি দুবার তীর্থ-পর্যটনে যাত্রা করেন। একদিকে দাক্ষিণাত্য-রামেশ্বর-সেতুবন্ধ, অন্যদিকে বৃন্দাবন-মথুরা-কাশী। পদব্রজেই তিনি সমস্ত তীর্থ-পর্যটন করেছিলেন। এইভাবে বাংলাদেশে প্রেমধর্মের যে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল, তা প্লাবিত করলো সমগ্র ভারত-ভূমি। ভারতের যেখানেই তিনি গিয়েছেন,

নীলাচল যাত্রা ও তীর্থ-পর্যটন

তাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহারে ও প্রেম ভক্তি-বিভোর রূপে বিমুগ্ধ জনতা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে।

অন্ত্যলীলা বা নীলাচল পর্ব

নীলাচল পুরীই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান সাধনপীঠ। তাঁর জীবনের অন্তিম আঠারো বছর এখানেই অতিবাহিত হয়েছিল। অগণিত শিষ্য তাঁর অমৃতময় স্পর্শে জীবন ধন্য করবার জন্যে এখানে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছেন। নীলাচলে অবস্থানকালে তিনি সারাক্ষণ বিভোর থাকতেন কৃষ্ণপ্রেমে। দিব্যোন্মাদ হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় কাটতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন—আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

জীবনাবসান

তাঁর জীবনাবসান সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে, রথযাত্রার দিন প্রেমাবেশে নৃত্যরত অবস্থায় তিনি পায়ে যে আঘাত পান, তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কারো কারো মতে, কৃষ্ণভ্রমে নীলকান্তি সমুদ্র-তরঙ্গকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে সমুদ্র-গর্ভে তাঁর দেহাবসান ঘটে। কারো কারো মতে, জগন্নাথ-মন্দিরে আরতির সময় ভাবতন্ময় হয়ে নৃত্য করতে করতে তিনি অবশেষে দারুব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়ে যান। বাংলার ছেলে নিমাইর পুণ্যস্মৃতি-মণ্ডিত পুরী তাই বাঙালীর কাছে পরম বেদনার তীর্থক্ষেত্র—বাঙালীর অশ্রুতীর্থ॥

শেষ-কথা

॥ বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ॥

শ্রীচৈতন্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেরণার এক সুমহান্ বল্লতরু। তাঁর জীবন ও জীবন-চর্চার দিব্যজ্যোতি থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে বহু কবি বাংলা সাহিত্যের কক্ষ-কক্ষান্তরকে আলোকিত করে তুলেছেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্য নানা সংকীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের গোষ্পদে ছিল খণ্ডিত, সীমিত। শ্রীচৈতন্যের সূচিত প্রবল ভাবের জোয়ারে সেই ক্ষুদ্র গোষ্পদগুলি পরিণত হলো বিশাল মহাসমুদ্রে। স্মরণীয় যে, শ্রীচৈতন্য প্রবল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রেমের মন্ত্র, ভক্তির মন্ত্র, মানবতার মন্ত্র। মুসলমান-আক্রমণের পটভূমিতে জনসমাজের এক অনিবার্য ভাঙনকে তিনি এইভাবে প্রতিহত করেছিলেন। নীরস শাস্ত্রীয় আচার ও কঠোর সামাজিক বিধি-বিধানের স্থানে এলো প্রেমভক্তির বন্যা। শাস্ত্রের উর্ধ্বে স্থান পেল মানুষ। প্রতিষ্ঠিত হলো 'সবার উপরে মানুষ সত্য—।'

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণীর স্পর্শে সমাজের মৌল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সমগ্র সমাজে জেগে উঠলো নবজীবনের এক অভূতপূর্ব মহোল্লাস। শ্রীচৈতন্য

বাঙালীর সামাজিক জীবনে এনেছিলেন যে ভাবমূলক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, স্বল্পকালের মধ্যেই সেই ভাবতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো সমাজ-মানসের সর্বত্র। তার কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে—জাতীয় সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই শ্রীচৈতন্যের জীবনের পরিশুদ্ধ অগ্নিশিক্ষা ব্যাপ্ত হয়ে গেল। এবার 'মরা গাছের ডালে ডালে' শুরু হয়ে গেল সেই পবিত্র অগ্নিশিখার সৃষ্টিমুখর নৃত্য। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শিল্প-চর্চা করেন নি কিংবা বাংলা সাহিত্যের চর্চাও করেন নি। তাঁর রচিত স্বল্প-সংখ্যক শ্লোক সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাব: সমাজে, শিল্পে ও সাহিত্যে

তবু শ্রীচৈতন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। তাঁর দেবোপম চরিত্রকে ঘিরে প্রথমেই গড়ে উঠলো জীবনী-সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে এতদিন কোন জীবনী-সাহিত্য ছিল না। যে মহাজীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী-সাহিত্য গড়ে ওঠে, বাংলাদেশে ছিল তার একান্তই অসদ্ভাব। শ্রীচৈতন্যের জ্যোতির্ময় জীবন তাঁর সমকালীন এবং উত্তরকালের কবি শিল্পীকে তাঁর জীবনী-রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, লোচন দাসের চৈতন্য-মঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত সেই ভক্তিপূত প্রয়াসের সার্থক পরিণাম-ফল। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম জীবনী-সাহিত্যের ধারাপথ উন্মুক্ত হয়। বলাবাহুল্য, এই ধারা বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন।

জীবনী-সাহিত্যে

শ্রীচৈতন্য যুগ-প্রয়োজনে সমাজে যে ভাব-বিপ্লব এনেছিলেন, তার গভীর প্রভাব মুদ্রিত হলো বিশাল পদাবলী-সাহিত্যে। প্রাক্-চৈতন্য যুগে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক যে সকল পদ রচিত হয়েছিল, মানব-মানবীর পার্থিব প্রেমই ছিল তার মূল ভিত্তি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য সেই সব পদের রসাস্বাদন করায় সেগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় ও কাব্যমূল্যের বিচারে তারা নতুন আলোকে বিবেচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করলো। ফলে, পার্থিব মানব-মানবীর প্রেম অপার্থিব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে পদগুলির জন্মান্তর ঘটালো। গৌরচন্দ্রকে নিয়ে ভক্তিবিহ্বল কিছু পদ রচিত হলো, 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে সেগুলি হলো বৈষ্ণব পদাবলীর নবতর সংযোজন। তাছাড়া, চৈতন্যোত্তর কালে যে পদগুলি রচিত হলো, তার ভাবে ও সুরে লাগলো শ্রীচৈতন্যের দেবকল্প চরিত্রের সুষমা। মোটকথা, এবার বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে এক ব্যাপকতর ও সূক্ষ্মতর পরিবর্তনের সুর অনুভূত হলো।

বৈষ্ণব পদাবলীতে

শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর জীবনের সার্বভৌম প্রভাব ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়ে গেল বাংলার শাক্ত-সাহিত্যেও। শ্রীচৈতন্য বাংলার সমাজ-জীবনে যে প্রবল ভাবের জোয়ার এনেছিলেন, তার প্রভাব থেকে বাংলার শাক্ত-সাহিত্য আর তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারলো না। কোন কোন সমালোচকের মতে, চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব গীতি কবিতার কান্তকোমল স্পর্শে মঙ্গল-কাব্যগুলির গ্রন্থনগত মহাকাব্যিক দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যায়। শাক্ত পদাবলী

শাক্ত পদাবলীতে

হলো তার সার্থক ফল-পরিণাম। বিশেষতঃ, শাক্ত পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদগুলিতে এবং উমা-সংগীতে অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়ার গানে বৈষ্ণব পদাবলীর কোমল স্নিগ্ধতা অনুভূত হয়।

বাংলার অনুবাদ-সাহিত্যও শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমভক্তিবাদের সার্বিক ভাব-বিপ্লবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। রামায়ণের কবিশ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাস এবং মহাভারতের কবিশ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাস বৈষ্ণব ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের কাব্যের পরিবেশ, চরিত্র এবং মৌল কাব্যরস সেই মতো নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাতে তাঁদের অনূদিত রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্যিক মহিমা ম্লান হলেও প্রেমভক্তির সুষমায় কাব্যগুলি অনুপম গৌরবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

অনুবাদ-সাহিত্যঃ রামায়ণ ও মহাভারতে

শুধু তাই নয়, বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলের লোক-সংগীতে এবং লোক-সাহিত্যেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অনিবার্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীচৈতন্যের ভাববিহ্বল দেবোপম জীবন-কাহিনী নানা সূত্রে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। প্রেমভক্তির সংগীতে সেদিন মুখরিত হয়ে উঠেছিল বাংলার আকাশ-বাতাস। স্বাভাবিকভাবেই তার স্পর্শ লেগেছিল বাংলার সুদূর পল্লীর কবিকণ্ঠেও। তাঁরাও এই সর্বব্যাপী প্রভাবের হাত থেকে দীর্ঘদিন তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেন নি। তাই দেখা যায়, বাংলার সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোক-গীতিকায়ও বাংলার প্রাণের 'নদের ঠাকুর' চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

লোক-সাহিত্যে

এমন-কি, আধুনিক কালের নাটকেও শ্রীচৈতন্যের জীবন ও তাঁর প্রচারিত প্রেমভক্তিবাদ প্রসারিত করে দিয়েছে তার অনবদ্য ভক্তিপূত প্রভাব। নিমাই-সন্ন্যাস, চৈতন্য-লীলা ইত্যাদি নাটক তো তাঁর ভাব-বিভোর জীবনের পরম রমণীয় আলেখ্য। একদিকে মর্ত্যরসে, অন্যদিকে ভক্তিরসে আশ্লিষ্ট হয়ে এই নাটকগুলি কালজয়ী মহিমা লাভ করেছে।

নাটকে

এইভাবে জাতির প্রাণ-চেতনায় ও ভাব-চেতনায় শ্রীচৈতন্যের সার্বভৌম প্রভাব হয়েছে অব্যর্থ। কোন মহামানবের জীবন এভাবে কোন বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে এমন গভীর এবং ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে—পৃথিবীর ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর, অনুপম জীবন বাংলা সাহিত্যের কক্ষে-কক্ষান্তরে জ্বেলেছে অনির্বচনীয় আলো, তার অলৌকিক পরশ-পাথরের স্পর্শ কত মূল্যহীনকে করেছে সোনা॥

উপসংহার

অনুসরণী-৬

*১. চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৭৫ পৃ.—৭৭ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৬০

*২. বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বর্ণনা কর। তুমি তাঁকে কেন ভালবাস? [৭৯ পৃ.—৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ মা. '৬১

*৩. বাঙালীর কাব্যে ও জীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৭৯ পৃ.—৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৬৩

**৪. শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৭৬ পৃ.—৭৯ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬২

৫. শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগের বাঙালী-সমাজে যে নবজাগৃতি ঘটিয়েছিলেন তার স্বরূপ কি? বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব কতখানি, আলোচনা কর। [৭৪ পৃ.—৭৫ পৃ. ও ৭৯ পৃ.—৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৬. শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তাতে বাংলা সাহিত্য কতখানি প্রভাবিত হয়েছিল সংক্ষেপে লেখ। [৭৪ পৃ.—৭৫ পৃ. এবং ৭৯ পৃ.—৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৭. বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে যে নবজাগরণ আসে, তার ভিত্তি ও উপাদান কি ছিল? তার দ্বারা বাংলার সমাজ ও সাহিত্য কতখানি উপকৃত হয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ কর। [৭৪ পৃ.—৭৫ পৃ. এবং ৭৯ পৃ.—৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৮. শ্রীচৈতন্যের জীবনের পর্ব-বিভাগ করে প্রতিটি পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি বিবৃত কর। [৭৫ পৃ.—৭৯ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৯. শ্রীচৈতন্যের জীবন কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য বিষয় হবার যোগ্য? কেন যোগ্য, তার উপযুক্ত উত্তর দাও। [৭৯ পৃ. —৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১০. বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [৭৯ পৃ.– ৮১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

---

৬. চৈতন্য-চরিত সাহিত্য

"পূর্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ।
এবে সেই লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥"
—চৈতন্য ভাগবত

শ্রীচৈতন্যের জ্যোতিষ্মান্ জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠলো বিশাল জীবনী-সাহিত্যের ধারা। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা, বলাবাহুল্য, নবাগত। এতদিন দেবতার মহিমা-কীর্তনই ছিল বাংলা সাহিত্যের মূল এবং প্রধান সুর। দেব-কাহিনীর মধ্যস্থতায় মানব-কাহিনীর পরিবেশনই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় 'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া' কায়া পরিগ্রহ করলেন যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য। তাঁর দিব্যভাব-বিলসিত জীবন এবং দেবোপম চরিত্র সমসাময়িক এবং উত্তরকালের ভক্ত-শিষ্যদের মনে যে বিস্ময়পুলকিত মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছিল, তা থেকেই উদ্ভূত হলো চরিত-সাহিত্যের অমৃত-ধারা। বলাবাহুল্য,

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্যই ছিলেন মধ্যযুগের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র—মধ্যমণি। ফলে, নতুন যে চরিত-সাহিত্যধারার উদ্বোধন হলো, শ্রীচৈতন্যই হলেন তার প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। কাজেই, শ্রীচৈতন্যের দেবকল্প জীবন ও চরিত্রকে অবলম্বন করে এই নতুন সাহিত্য-ধারার হলো উদ্বোধন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার নামকরণ হলো চৈতন্য-চরিত। শ্রীচৈতন্য এর প্রধান পুরুষ। শৈশবে বাল্যলীলা এবং যৌবনে তাঁর ভক্ত-শিষ্য ও প্রিয় পার্ষদ্‌বর্গের সঙ্গে তিনি তাঁর যে গৌড়-লীলা, পরিব্রাজক-লীলা ও নীলাচল-লীলা সম্পন্ন করে যান, সেই লীলামধুর জীবনের পবিত্র স্পর্শ ছড়িয়ে আছে এই চৈতন্য-চরিত সাহিত্যগুলির মধ্যে।

শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র-মাধুর্য, তাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহার এবং প্রেম-ভক্তি-বিভোর রূপ তাঁর অগণিত ভক্ত-শিষ্যকে মুগ্ধ করেছিল। সেই স্মরণীয় ও বরণীয় মহাজীবনকে সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করে তাঁর মানস-অনুষঙ্গ লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই অনেক ভক্ত-শিষ্যের মনে জেগেছিল। এইভাবে চৈতন্য-চরিত সাহিত্য-ধারার উদ্বোধন হলো। কিন্তু কেবল অবিমিশ্র তথ্য-সম্ভার বা

বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সহযোগে এই গ্রন্থগুলি রচিত হলো না। ভক্তি, ভালোবাসা এবং উন্নত দার্শনিকতার স্পর্শ লাগলো তাদের বস্তুকায়ায়। সমসাময়িক কালের চোখে শ্রীচৈতন্য ছিলেন একই অঙ্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল-সম্মিলনের অদ্বয় রূপ—'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তনু কৃষ্ণস্বরূপম্।' তাই বাস্তব তথ্য ও ভক্তি-বিহ্বলতার সংমিশ্রণে এই জীবনী-কাব্যগুলি হয়ে উঠলো এক বিচিত্র সাহিত্য। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব গোস্বামীগণের জীবন-কাহিনী নিয়েও এভাবে জীবনী-সাহিত্য রচিত হয়েছে।

মঙ্গল-কাব্য-ধারার সঙ্গে জীবনী-কাব্য-ধারার মৌল পার্থক্যটি প্রণিধানযোগ্য। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে দেবতাকে মানুষ করা হয়েছে ; কিন্তু জীবনী-কাব্যগুলিতে মানুষের

ওপর দেবত্ব আরোপ করে তাকে দেবতা করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া, শ্রীচৈতন্য ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি; ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কাজেই, শ্রীচৈতন্যের জীবনী-গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিক উপকরণের ছড়াছড়ি। অন্যান্য বৈষ্ণব-গোস্বামীগণের জীবনী-গ্রন্থগুলিও অনুরূপভাবে ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ। এই জীবনী-গ্রন্থগুলি বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের নিঃসন্দেহে মূল্যবান দলিল।

মঙ্গল-কাব্যগুলির সঙ্গে পার্থক্য ও ঐতিহাসিকতা

শ্রীচৈতন্যের মহিমময় জীবন-কথা নিয়েই বাংলা চরিত-সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তাঁর জ্যোতির্ময় জীবনকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্য মানুষের জীবন-ভূমিতে সেই প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। এ হলো সাহিত্যের এক নতুন মূল্যবোধ। বাংলা চরিত-সাহিত্য হলো সেই নতুন মূল্যবোধের প্রথম ফসল। সাহিত্য-ভূমিতে মানুষের এবং মানুষের জীবনের সেই প্রথম প্রবেশ হলেও দোষে-গুণে, ভালোমন্দে-ভরা যে রক্তমাংসের মানুষকে আমরা চিনি, জানি এবং দেখতে পাই, বাংলা চরিত-সাহিত্যের সেই প্রভাতকালে তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা। সেখানে চৈতন্য-জীবন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এবং এই জীবনীগ্রন্থগুলি রচনার পেছনে ছিল যে মুগ্ধতা ও ভক্তি-বিহ্বলতা, তাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। তাছাড়া, চৈতন্য জীবনের অনন্যসাধারণতা জীবনীকারদের ভাব, কল্পনা ও ভক্তির সংমিশ্রণে হয়ে উঠেছে অতি-লৌকিক—অতি-মানবিক। সে হিসেবে তাঁকে মানুষের চেয়ে অনেকাংশে দেবতা করা হয়েছে। চৈতন্য-চরিত সাহিত্য তাই চৈতন্য-মহিমারই কাব্য-রূপায়ণ। পরবর্তীকালে যখন কোন চৈতন্য-জীবনীকার রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে চৈতন্য-চরিত অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন, তখনই তা বৈষ্ণব-সমাজ কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হয়েছে।

দোষগুণ

কবি-পরিচিতি

॥ মুরারি গুপ্ত ॥

চৈতন্য-চরিত হলো অবিমিশ্র চৈতন্য-মহিমারই কাব্যরূপ। তার পেছনে রয়েছে বিস্ময়-বিমুগ্ধ, ভক্তি-প্রসন্ন হৃদয়ের বিনম্র অভিব্যক্তি। তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তী-কালের চরিতকারের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য তাই নিছক মানুষ নন, মানবশ্রেষ্ঠ, নরচন্দ্রমা—মহাপ্রভু। তাঁর পিতৃদত্ত বিশ্বম্ভর নাম তাঁর দিব্যদ্যুতিময় শ্রীচৈতন্য নামের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে। সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁর ভক্ত এবং অনুগৃহীত জীবনীকারদের হাতে কালে কালে হয়ে উঠলেন রাধাভাবদ্যুতিময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ।

নরচন্দ্রমা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁর দেবকল্প জীবন নিয়ে চরিতগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এইভাবে প্রথম চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব মুরারি গুপ্তের। তিনিই বাংলাদেশে জীবনী-সাহিত্য রচনার প্রথম পথিকৃৎ। শ্রীহট্টের মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সতীর্থ ও শৈশব-সহচর। তিনি

পরিচয়

শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর গৃহেই নাকি শ্রীচৈতন্যের প্রথম ভাবাবেশ ঘটেছিল। যে মুষ্টিমেয় কয়জন লীলা-পার্ষদের সাহায্যে শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে প্রচারিত হয়েছিলেন, মুরারি গুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত তাঁর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত' নামে পরিচিত হলেও বৈষ্ণব-সমাজে তা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে খ্যাত। গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর—সম্ভবতঃ ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য প্রথম অবতাররূপে চিত্রিত হন এবং পরবর্তীকালের চৈতন্য-জীবনীকারদের প্রায় সকলেই গৌড়-লীলা বর্ণনায় তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের আবাল্য অন্তরঙ্গ সঙ্গী মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত

মুরারি গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে 'কলিযুগাবতার' রূপে প্রথম ঘোষণা করেন। তাঁকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে গ্রন্থমধ্যে বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেই অলৌকিক ঘটনার ভিড়েও চৈতন্য-জীবনের প্রধান প্রধান তথ্যগুলিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। পরবর্তী জীবনীকারেরা সেই তথ্যগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন॥

বৈশিষ্ট্য

॥ স্বরূপ দামোদর ॥

স্বরূপ দামোদর ছিলেন নবদ্বীপ-নিবাসী। পূর্বনাম পুরুষোত্তম আচার্য। তিনি শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের পর কিছুকাল জীবিত ছিলেন। জীবনের অন্তিম দিনগুলি তিনি কাটান বৃন্দাবনে। নীলাচল-পর্বে তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ পার্ষদ্। গৌড়ীয় রসতত্ত্বের আদি ভাষ্যকারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম ব্যক্তি। তাছাড়া, শ্রীচৈতন্য যে রাধা-কৃষ্ণের যুগলতনু—তিনি এই মতবাদেরও প্রতিষ্ঠাতা। যা-ই হোক, স্বরূপ দামোদরের রচিত চৈতন্য-চরিত গ্রন্থটি 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামে খ্যাত। 'দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসার। রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচার॥' কিংবা 'প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥'—এই সব পদে স্বরূপ দামোদরের কড়চার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই মূল্যবান গ্রন্থখানি আজও আবিষ্কৃত হয়নি॥

স্বরূপ দামোদরের কড়চা

॥ কবি কর্ণপুর ॥

কবি কর্ণপুরের প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। সাত বছর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে পুরীধামে শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে 'কবি কর্ণপুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত চৈতন্য-চরিতামৃত' মহাকাব্য এবং 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'নাটক সংস্কৃতে রচিত চৈতন্য-জীবন-কথার

মধ্যে দু'খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' মহাকাব্যে মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রভাব আছে। কিন্তু স্মরণীয় যে, গ্রন্থ দু'খানি কবি কর্ণপূরের অল্প বয়সের রচনা। তবু গ্রন্থ দু'খানিতে যে পরিণত চিন্তা এবং শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে কবি কর্ণপূরের কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। চৈতন্য-জীবন-কথা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনায় কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' মহাকাব্যখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটকখানি রূপকের আঙ্গিকে রচিত। এতে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের চেয়ে বিবৃতি, আবেগ ও তত্ত্বকথার প্রাধান্য দেখা গেলেও বাস্তব চরিত্র ও রূপক চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি যে একটি সংগতি রক্ষা করতে পেরেছেন, তা কম প্রশংসনীয় নয়।

চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক

এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত। এগুলি পরবর্তীকালে বাংলায় জীবনী-কাব্য রচনায় বহু মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করেছে এবং রচনার প্রেরণা যুগিয়েছে।

॥ বৃন্দাবন দাস ॥

'ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥' —চৈতন্য-চরিতামৃত

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবত'ই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্য চরিত গ্রন্থ। গ্রন্থখানি 'চৈতন্য-মঙ্গল' নামেই প্রথমে রচিত হয়েছিল। পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'চৈতন্য-ভাগবত'। 'চৈতন্য-ভাগবতের নাম চৈতন্য-মঙ্গল ছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥' এই নাম পরিবর্তনের পেছনেও যুক্তি ছিল। ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় যেমন অনেক অলৌকিক ঘটনার উপস্থাপনা রয়েছে, চৈতন্য-ভাগবতেও তেমনি চৈতন্য-লীলা বর্ণনায় রয়েছে বহু অলৌকিক ঘটনার পরিবেশনা। ভাগবতের মতো চৈতন্য-লীলা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে ভাগবতের মতোই পূজিত হয়েছে। সেদিক থেকে এই নাম-পরিবর্তন সুসংগত। বৃন্দাবন-দাসও পরবর্তীকালে চৈতন্য-লীলাবর্ণনায় 'ব্যাস' নামে পরিচিত হয়েছিলেন—'চৈতন্য-লীলায় ব্যাস দাস বৃন্দাবন।'

চৈতন্য-ভাগবত

অন্যান্য চৈতন্য-চরিতকথায় চরিতকারদের বিস্তৃত আত্মপরিচয় আছে। কিন্তু চৈতন্য-ভাগবতের কবি বৃন্দাবন দাসের আত্মপরিচয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাতে আত্ম-প্রকাশের আগ্রহের চেয়ে আত্ম-সংকোচেরই প্রাধান্য। সম্ভবতঃ তার কারণও ছিল। তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়ে জননী নারায়ণীর নাম একাধিক স্থলে উচ্চারিত। কিন্তু পিতৃ-পরিচয় সম্পর্কে কবি নীরব। কবি-জননী নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী—বালবিধবা। তিনি ছিলেন আবাল্য চৈতন্যগত প্রাণ। বৃন্দাবন দাস বালবিধবা নারায়ণীর যৌবন বয়সের সন্তান। তাঁর

কবি-পরিচয়

জন্ম-কাহিনী নানা অলৌকিকতার স্পর্শে রহস্যময়। কৃষ্ণপ্রাণা ও চৈতন্য-উৎসর্গীকৃত-জীবন নারায়ণী ছিলেন পরম পুণ্যবতী মহিলা—'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।' শ্রীচৈতন্যের প্রসাদে জন্ম হয় কবি বৃন্দাবন দাসের। কবির দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার নিবিড় সহচর—শ্রীনিত্যানন্দ।

জননীর প্রেরণায়, দীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দের নির্দেশে রচিত হয় তাঁর 'চৈতন্য-ভাগবত' নামে মহাগ্রন্থটি। প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী চৈতন্য-পারিষদদের কাছ থেকে বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কবির জন্ম সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি সময়ে। শ্রীচৈতন্য-দর্শন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাই কবি আক্ষেপের সুরে আত্মধিকার দিয়েছেন নিজেকে—'হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল। হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥' কবির জন্মকালের মতো তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কেও প্রচুর মতভেদ আছে। বৃন্দাবন দাস মুরারি গুপ্তের কড়চা এবং স্বরূপ দামোদরের চৈতন্যলীলা-সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে রয়েছে তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ। কাজেই, অনুমান—বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' মুরারি গুপ্তের কড়চার পরে রচিত হয়েছিল। তাহলে চৈতন্য-ভাগবত ১৫৪৬ থেকে ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই রচিত হওয়াই সম্ভব।

গ্রন্থের প্রেরণা ও রচনা-কাল

চৈতন্য-ভাগবত আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। কাব্যের সূচনা থেকেই শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণাবতার রূপে স্বীকৃত। ফলে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্য-লীলাকে রূপায়িত করা হয়েছে—চৈতন্য-লীলায় কৃষ্ণলীলার মতো বহু অলৌকিক ঘটনাও আরোপিত হয়েছে। স্বভাবতঃই, এতে মুরারি গুপ্তের কড়চার প্রভাব অনস্বীকার্য। সুস্থির বিশ্বাস এবং অবিচলিত নিষ্ঠাই ছিল কবির চালক-শক্তি। তাই নিজের ভাব-কল্পনাকে অলৌকিক কাহিনী-বর্ণনার স্বপ্নলোকে অনায়াসে ভাসিয়ে দিয়েছেন বৃন্দাবন। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা ও সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের বর্ণনায় কল্পনা ও অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি। কারণ বৃন্দাবনের কাব্যের তথ্যের উৎস ছিলেন প্রধানতঃ শ্রীনিত্যানন্দ; এবং শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় শ্রীচৈতন্যের গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পর। কাজেই, সেই পর্বের তথ্য-সংগ্রহের জন্যে বৃন্দাবনকে মুরারি গুপ্তের কড়চার ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে বেশী। সেই তথ্যনিচয়ের ওপরে তিনি কবি-কল্পনাকে দিয়েছেন বাধাবন্ধনহীন মুক্তি। স্মরণীয় যে, শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের গৌড়লীলার সঙ্গী; নীলাচল-লীলায় তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। সেজন্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে'র অন্ত্যখণ্ড স্বাভাবিক কারণেই অসম্পূর্ণ। তাই চৈতন্য-জীবনের শেষ-লীলাও এতে অবর্ণিত।

তথ্যের উৎস ও লীলা-বর্ণনা

চৈতন্য-চরিত কাব্যসম্ভারের মধ্যে 'চৈতন্য-ভাগবতে'র স্থান অতি উচ্চে। যে বৈশিষ্ট্যের গুণে গ্রন্থখানি সেকালের এবং একালের সমাদর লাভ করেছে, তা হলো এর তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিকতা। অলৌকিক ঘটনা-বিস্তারের পাশাপাশি এতে যে সব

মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাবলী পরিবেশিত, সেগুলি, আবেগের আতিশয্য সত্ত্বেও, আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান। সেদিক থেকে 'চৈতন্য-ভাগবত' মধ্যযুগের ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপকরণের নির্ভরযোগ্য দলিল। সে সময়ের নবদ্বীপের ঐশ্বর্যখ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত। নবদ্বীপবাসী হিন্দু—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন ছিল বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। তাঁরা স্মৃতিশাস্ত্র, নব্যন্যায় ও তান্ত্রিকতা নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে ঘরে ঘরে মনসা পূজা এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত বহুলভাবে প্রচারিত ছিল। পুতুল নাচেও লোকে অকাতরে অর্থব্যয় করতো। 'ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনো জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥' তাছাড়া, ধর্মের নামে বাঙালী জাতি সে সময়ে নানা ব্যভিচারে ছিল লিপ্ত। 'বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে॥' কাজেই, গ্রন্থখানি যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বাংলা ও বাঙালীর সামাজিক ও নৈতিক জীবনের একখানি অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থ, তাতে ঐতিহাসিকেরা নিঃসংশয়।

ঐতিহাসিকতা

শৈল্পিক আবেদনের গুণেও 'চৈতন্য-ভাগবত'—এই মহাগ্রন্থখানি অসামান্য ও অনন্য। কেবল তথ্য-নিষ্ঠতা ও বিশ্বাস-নিষ্ঠতাই নয়, আবেগের উচ্চারণে, সহজ সরস ঘটনা-বর্ণনায় এবং কল্পনার সুদূরাভিসারে গ্রন্থখানি চৈতন্য-চরিত বিষয়ের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। সহজ সরল ভাষায় প্রধানতঃ পয়ার ছন্দই এর বাহন। কোথাও-কোথাও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হলেও পয়ারেরই প্রাধান্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্যের অপার্থিব অধ্যাত্ম-মহিমায় গভীর বিশ্বাসী হয়েও বৃন্দাবন দাস তাঁর রচিত কাব্যে মানবিক আবেদনের প্রতি উদাসীন হননি—এখানেই তাঁর রচিত চরিত-কাব্যের পরম সার্থকতা॥

বৈশিষ্ট্য

॥ লোচন দাস ॥

লোচন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল' বাংলা ভাষায় রচিত তৃতীয় চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ। লোচন দাসের জন্ম বর্ধমান জেলার কোগ্রামে—এক বৈদ্যবংশে। পিতার নাম কমলাকর দাস। মাতার নাম 'পুণ্যবতী' সদানন্দী—পাঠান্তরে অরুন্ধতী। কবির মাতুলালয়ও ছিল সেই একই কোগ্রামে। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তই ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। লোচন অত্যন্ত আদরে প্রতিপালিত বলে বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় একটু অধিক বয়সে। তাঁর দীক্ষা-গুরু ছিলেন চৈতন্য-লীলা-পারিষদ শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকার—'নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।' কিন্তু লোচন দাসের জন্ম কত সালে এবং তাঁর কাব্যই বা রচিত হয়েছিল কবে—সে বিষয়ে নিঃসংশয় কিছু জানা যায় না।

কবি-পরিচয়

অনুমান, তাঁর চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হয়েছিল ১৫৫০ থেকে ১৫৬৬ খ্রীস্টাব্দের কোন

এক সময়ে। আকারে 'চৈতন্য-মঙ্গল' 'চৈতন্য-ভাগবত' থেকে ক্ষুদ্রকায় হলেও ক্ষীণকায় নয়। গ্রন্থখানি চারটি খণ্ডে বিভক্ত: সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। লোচন স্বীকার করেছেন, মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকেই তিনি তাঁর কাব্য-রচনার প্রেরণা পান। লোচনের গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের প্রভাবও অনস্বীকার্য। তাছাড়া, ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। সর্বোপরি ছিল গুরু নরহরি সরকারের এবং তাঁর 'গৌর-নাগরবাদের' মৌল প্রেরণা। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ছিলেন শ্রীচৈতন্যের 'গৌর-নাগরবাদে'র প্রবর্তক। দীক্ষা-গুরুর কাছ থেকে 'গৌর-নাগরবাদে'র প্রেরণা নিয়ে লোচন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গির ও ভিন্ন স্বাদের কাব্য-রচনায় প্রয়াসী হন। মুরারি গুপ্তের কড়চা ও সমসাময়িক কালের ইতিহাস থেকে সামান্যতম উপকরণ আহরণ করে সাধারণ বিশ্বাস-প্রবণ বৈষ্ণব-ভক্তদের জন্যে সুললিত পাঁচালি-কাব্য রচনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বাস্তবিকই, 'ধামালী' ঢঙের সহজ সুরে রচিত এই গ্রন্থ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মঙ্গলকাব্যের মতো চৈতন্য-মঙ্গলও তখনকার দিনে আসরে গীত হতো। গ্রন্থমধ্যে রাগ-রাগিণীর উল্লেখও সে বিষয়ে আমাদের নিঃসংশয় করে।

কাব্য-বৈশিষ্ট্য

লোচনদাস তাঁর কাব্যে ইতিহাসকে বিশেষ প্রাধান্য দেন নি। চৈতন্য-জীবন অবলম্বন করে ভক্তি-ভাব-বিলসিত জনপ্রিয় কাব্য-চিত্রাঙ্কনই ছিল তাঁর মৌল উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে তাঁর সাফল্যও অসামান্য। 'গৌরনাগর-ভাবে'র মধ্য দিয়ে চৈতন্য-লীলা এবং প্রেমভক্তিধর্ম-প্রচারে তাঁর গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে বৈষ্ণব এবং তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব সাধন-ভজনের একটি ধারার প্রতিফলন লক্ষণীয়। কল্পনা ও গালগল্পের সূত্র থেকে কাহিনী চয়ন করে তিনি যে কাব্য রচনা করেন, তা সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তাঁর বর্ণিত বহু কাহিনী লোকমুখে বহুল প্রচারও লাভ করেছিল। লোচন দাস রচিত গৌরনাগর-ভাবের একটি দৃষ্টান্ত: 'আমার মন ছমছম করে সখি প্রাণ ছমছম করে। আধ কপাইল্যা মাথার ব্যামোয় রইতে নারি ঘরে॥' লোচন ইতিহাসকে অস্বীকার করলেও তাঁর কাব্যে কোথাও-কোথাও ইতিহাসের প্রলেপ আছে: 'শ্রীচৈতন্যলীলা যেহ করিল বর্ণন। গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গি সদন॥' তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে পর্তুগীজেরা যে বাংলাদেশে যাতায়াত শুরু করেছে এবং তার সঙ্গে কারো কারো ব্যবসায়িক সম্পর্ক যে ছিল, তা এই অংশে সুস্পষ্ট॥

গৌরনাগর-ভাব ও ঐতিহাসিকতা

॥ জয়ানন্দ ॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' আর একখানি বিশিষ্ট চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে অনেক নতুন ও কৌতূহলোদ্দীপক বিবৃতি আছে। তাই গ্রন্থখানি প্রকাশের পর থেকে পাঠক, ঐতিহাসিক, গবেষক ও ভক্ত—সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কবি-প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের জন্ম। পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র।

মাতার নাম রোদনী দেবী। মাতার মৃতবৎসা দোষ স্খালনের জন্যে জয়ানন্দের নাম দেওয়া হয়েছিল 'যমের অরুচি'—গুইঞা। নীলাচল থেকে গৌড় যাবার পথে শ্রীচৈতন্য সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এক বছরের শিশুপুত্র গুইঞাকে কোলে নিয়ে জননী রোদনী দেবী শ্রীচৈতন্যের ভোগ রন্ধন করেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য গুইঞার নামকরণ করেন—জয়ানন্দ। কাব্যমধ্যে জয়ানন্দ নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞির দাস' বলে অভিহিত করায় অনেকের অনুমান, তিনি অভিরামের শিষ্য ছিলেন। অনেকের মতে, তিনি নাকি গদাধর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

কবি-পরিচিতি

জয়ানন্দের আত্মপরিচয়ে যেমন জন্ম-সাল নেই, তেমনি নেই তাঁর কাব্যের রচনাকালের উল্লেখও। তবে পণ্ডিতদের অনুমান, সম্ভবতঃ ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে তাঁর কাব্যখানি রচিত হয়েছিল। জয়ানন্দের কাব্যের মৌল পরিকল্পনাই হলো পাঁচালী ঢঙের পালাগান রচনা। তাই তাঁর রচিত কাব্যখানির নাম 'চৈতন্য-মঙ্গল'। সমগ্র গ্রন্থটি পালাগানের মতো নয়টি খণ্ডে বিভক্ত: আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। খণ্ডগুলির উপস্থাপনা অনুক্রমিক নয়। সংগতির অভাবও স্পষ্ট। যা-ই হোক, জয়ানন্দ ছিলেন পেশাদার পাঁচালী-গায়ক। কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পালাগানের আসর জমিয়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাই তাঁর রচিত 'চৈতন্য-মঙ্গল' কাব্যোৎকর্ষের গৌরব দাবি করতে না পারলেও নানা নতুন তথ্যের পরিবেশনায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

কাব্য-বৈশিষ্ট্য

এই গ্রন্থে চৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রথযাত্রার দিন ভাবাবেশে নৃত্য করবার সময়ে শ্রীচৈতন্য ইষ্টকাহত হয়ে পায়ে যে আঘাত পান, তাতেই নাকি তাঁর মৃত্যু ঘটে। বৈষ্ণব-সমাজ কিন্তু জয়ানন্দের পরিবেশিত অনেক তথ্যই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, জয়ানন্দের এই প্রয়াস সস্তা জনপ্রিয়তা-লাভের জন্যে পরিকল্পিত। সে যা-ই হোক, শ্রীচৈতন্যের জীবনাবসান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন চরিতকার নানা অবিশ্বাস্য অলৌকিক তথ্যের অবতারণা করেছেন। সেদিক দিয়ে জয়ানন্দের পরিবেশিত তথ্য অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্য। তাছাড়া, আর একটি বিষয়ে জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর গ্রন্থে কৃত্তিবাস-বন্দনা আছে। সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যে কেবলমাত্র জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে কৃত্তিবাস-বন্দনাই কবি কৃত্তিবাসের একমাত্র উল্লেখ॥

সস্তা জনপ্রিয়তা বনাম ঐতিহাসিকতা

॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ॥

চৈতন্য-চরিতকাব্যের উজ্জ্বল গ্রন্থ-সমাজে কবিবর কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'ই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ। কি বৈষ্ণব-সমাজ, কি বাংলা সাহিত্যের

ঐতিহাসিক সমাজ—সকলের মতেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ। এর শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে অন্যান্য চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলির ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত একাধারে বিশ্বস্ত চৈতন্যজীবন-কাহিনী ও বৈষ্ণব-দর্শনের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

কবিবর কৃষ্ণদাস গোস্বামীর জন্ম কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর গ্রামে। অবশ্য, কবির নিজস্ব বর্ণনায় তাঁর জন্মস্থান নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুরে; কাটোয়ার নিকটবর্তী নয়। জন্ম সম্ভবতঃ ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে। পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। শৈশব থেকে পিতৃমাতৃহীন এই কবি জীবনে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেননি। বৈষ্ণব শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। প্রৌঢ় বয়সে প্রভু নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ লাভ করে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর দর্শন-সাধনা, গবেষণা ও লীলারসবাদ তাঁর জ্ঞানতৃষিত চিত্তকে শীতল ও তৃপ্ত করে। তিনি সেখানে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর কৃপা এবং রঘুনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করে ধন্য হন।

কবি-পরিচিতি

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে' শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণিত নেই। সেই অর্থে সে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ। তাছাড়া, ইতিপূর্বে রচিত কোন গ্রন্থেই শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ আঠারো বছরের যথাযথ কাহিনীর বর্ণনা নেই। জীবনের অন্তিম পর্বে শ্রীচৈতন্যের যে দিব্যোন্মাদ-অবস্থার মধ্যে কেটেছিল, যখন চেতন-অচেতন সকল অবস্থাতেই কৃষ্ণরসে তিনি আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকতেন, সেই সময়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সহ তার খুঁটিনাটি বর্ণনার অভাব বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীরা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করছিলেন। অন্যদিকে, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যে নতুন রস-ব্যাখ্যা করেছিলেন, এ পর্যন্ত কোনও চৈতন্য-চরিত গ্রন্থে তার উপস্থাপনা হয়নি। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে' বাংলাদেশের তৎকালীন বৈষ্ণব-আদর্শের প্রতিফলন আছে, কিন্তু বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর নবতর রস-বিশ্লেষণ তাতে অনুপস্থিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইতিমধ্যে সংস্কৃত-কাব্য গোবিন্দ লীলামৃত রচনা করে কবি-খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাছাড়া, বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ও ভক্তিরসে তাঁর মতো পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তখনকার দিনে আর ছিলেন না, বলা যায়। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ তাঁর ওপরেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপনীত কবি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এই মহান্ গ্রন্থ-রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তথ্য-সরবরাহে এবং রস-ব্যাখ্যানে এতে গোস্বামীগণের সাহায্য অব্যাহত ছিল। দীর্ঘকালের চেষ্টায় এই মহাগ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয় সম্ভবতঃ ১৬১২ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।

রচনার প্রেরণা ও রচনাকাল

'অতি বৃদ্ধ জরাতুর' কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-জীবনের অবর্ণিত, অথচ গুরুত্বপূর্ণ অন্ত্যলীলা বর্ণনার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। বাস্তবিকই, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের এমন নিপুণ বর্ণনা অন্য কোন গ্রন্থে আর নেই। বিশেষতঃ কবিত্বময় ভাবুকতা-সহকারে শ্রীচৈতন্যের অন্তিম পর্বের দিব্যোন্মাদ-অবস্থার

যে অপূর্ব বর্ণনা তিনি করেছেন, তা তুলনারহিত। শ্রীচৈতন্যের জীবনের অন্ত্যলীলাই তাঁর ভাব-গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার রস-প্রগাঢ় পরিণাম-ফল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর অপূর্ব মনীষা ও ভাবুকতার সমাহারে তার ওপরে আলোক-পাত করেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্রেষ্ঠত্ব তার দার্শনিক তত্ত্বের উপস্থাপনায় ও রস ব্যাখ্যানে।

গ্রন্থ-বৈশিষ্ট্য

যুক্তিনিষ্ঠ ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে শ্রীচৈতন্য-জীবন ও শ্রীচৈতন্য-বাদকে কৃষ্ণদাস একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছেন। অথচ গ্রন্থের সর্বত্র এই দার্শনিক কবির দীনতা ও সংকোচের সীমা নেই। সেদিক দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারের কাছে অবিস্মরণীয় বেদগ্রন্থের মতো প্রামাণ্য এবং নির্ভর-যোগ্য দলিল।

কাজেই, কি তাত্ত্বিক, কি দার্শনিক, কি রসপিপাসু ভক্ত-পাঠক এবং কি ঐতিহাসিক— সকলের কাছেই কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মূল্য অপরিসীম।

চৈতন্য চরিত কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠমণি

ইতিহাস-দর্শন, কাব্য-কলা ও ভক্তি-তত্ত্বের সমাহারে রচিত এ এক অনবদ্য গ্রন্থ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত: আদি, মধ্য ও অন্ত্য। অপূর্ব প্রজ্ঞা ও শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত এই গ্রন্থখানি চৈতন্য-চরিত কাব্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠমণি। বিনয়-নম্র সারল্য ও ভক্তিপূত নিষ্ঠা-সহকারে সুদীর্ঘ ন' বছরের অক্লান্ত সাধনায় পরিণত-বৃদ্ধ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করেছেন এক মহাজীবনের মহান্ আলেখ্য॥

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে একখানি গ্রন্থ শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব-সমাজ গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেন। রচয়িতা গোবিন্দদাস ছিলেন জাতিতে কর্মকার। তিনি ছিলেন একাধারে শ্রীচৈতন্য-ভক্ত এবং তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর। নিবিড়

গোবিন্দদাসের কড়চা

সান্নিধ্যে শ্রীচৈতন্যকে যেভাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, এতে তার বর্ণনা আছে। শ্রীচৈতন্যের জীবনের দু-তিন বছরের কাহিনী বিবৃত হলেও এতে এমন কতকগুলি ঘটনার উপস্থাপিত হয়েছে, যা বৈষ্ণব-সমাজ সত্য বলে স্বীকার করেন না। এর কোথাও প্রচার-প্রবৃত্তি নেই, ভাষা সহজ, সংযত ও অনেকাংশে আধুনিক। গ্রন্থখানি সম্পাদকের হাতে বহুলাংশে পরিমার্জিত বলে সকলের অনুমান॥

অনুসরণী-৭

*১. শ্রীচৈতন্যের বাংলা ভাষায় রচিত মুখ্য চরিত-গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে কোন্‌খানিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর, কারণসহ তার আলোচনা কর। [৮৭ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮

*২. চৈতন্যদেবের জীবন ও জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[৭৬ পৃ.—৭৯ পৃ., ৮৩ পৃ.—৮৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৩. শ্রীচৈতন্যের জীবন অবলম্বনে রচিত বাংলা জীবনী-কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৮৬ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৯

*৪. নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর: চৈতন্যজীবনী কাব্য। [৮৩ পৃ.—৮৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬৯

*৫. মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যগুলি ও তাদের রচয়িতাদের নামোল্লেখ কর। এদের মধ্যে কোন্‌টি, তোমার ভাল লাগে এবং কেন ভাল লাগে? [৮৬ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য]
ব. প্র. '৬১

*৬. বাংলায় রচিত চৈতন্য-চরিত কাব্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি, তোমার মতে, সর্বশ্রেষ্ঠ? তোমার অভিমতের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। গ্রন্থকার সম্বন্ধে যা জান লেখ। [৮৪ পৃ. ও ৮৬ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৭. বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্য-চরিত কাব্য কোন্‌টি? গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য কি? কবি সম্বন্ধে যা জান লেখ। [৮৬ পৃ.—৮৮ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*৮. বাংলায় রচিত জীবনী-কাব্যের সূত্রপাত কখন কিভাবে হয়েছিল? [৮৩ পৃ.—৮৩ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৬১

*৯. শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। তাঁকে অবলম্বন করে যে চরিতগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে, তার মধ্যে একখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৭৬ পৃ.—৭৯ পৃ. এবং ৯০ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য]
উ. মা. '৭২

*১০. বাংলা চৈতন্যচরিত কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য কি? এগুলির সাহিত্যিক মূল্য বা কাব্য-মূল্য কতখানি? [৮৩ পৃ.—৮৪ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১১. চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ দুটির রচয়িতা ও রচনাকালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৮৬ পৃ.—৮৮ পৃ. ও ৯০ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*১২. সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:

চৈতন্য-ভাগবত [৮৬ পৃ—৮৮ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা. '৬১; ব. প্র. '৬১। চৈতন্য-চরিতামৃত, [৯০ পৃ.—৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা. '৭২; ব. প্র. '৭২। গোবিন্দদাসের কড়চা [৯২ পৃ. দ্রষ্টব্য] লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল। [৮৮ পৃ.—৮৯ পৃ. দ্রষ্টব্য] জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল। [৮৯ পৃ.—৯০ পৃ. দ্রষ্টব্য]

'বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।'

— রবীন্দ্রনাথ

৭. বৈষ্ণব পদাবলী

॥ বৈষ্ণব-পদাবলী ॥

'বাঙ্গালীর কাব্য-মানসের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক বাহন হইল গীতি-কবিতা। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই গীতিকাব্যের সুরের সরণী বহিয়াই আমাদের চিত্তলোকে উপনীত হইয়াছেন।' যুগ যুগ ধরে বাঙালীর সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা ও মিলন-বিরহের অন্তরতর উপলব্ধি এই গীতি-কবিতার আঙ্গিকেই পরিবেশিত হয়ে আসছে। বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলীতে ঘটেছে তার চরমতম প্রকাশ। আর, এই বৈষ্ণব-পদাবলীই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে জীর্ণ গতানুগতিকতার ক্লান্ত রোমন্থন থেকে রক্ষা করেছে, মঙ্গলকাব্যের ভূমিচারী কল্পনাকে ভাব-বৃন্দাবনে উধাও হয়ে যেতে সাহায্য করেছে এবং অনুবাদ-সাহিত্যের পুনরাবৃত্তির স্রোতকে নিত্য-নব প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ করে তার বহুবর্ণ-বিলসিত রূপমাধুরী আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বৈষ্ণব-পদাবলী হলো বাঙালীর এমন একটা মানসিক সংস্কার, যার তুলনা সর্বভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ। শিল্প-রস, অধ্যাত্ম-সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির পটভূমিকায় বৈষ্ণব গীতি-সাহিত্য এমন এক অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে যে, মধ্যযুগের সুদীর্ঘ চারশো বছরের বিপুলায়তন পুঁথি-সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব-পদাবলীই দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে নিখিল মানব-হৃদয়ের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে।

ভূমিকা

'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান, মানুষের তরে নহে?' বৈষ্ণবদের মতে, বৈষ্ণব-পদাবলী বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-তত্ত্বেরই বাণীবদ্ধ রূপ—রাধামাধবের অলৌকিক লীলা-সংগীত। বৈষ্ণব-পদাবলীর আধ্যাত্মিক মূল্য যা-ই থাকুক, এদের কাব্য-মূল্য অপরিসীম। সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতির এমন সুললিত বাণীময় রূপ সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যিই দুর্লভ। গীতি-প্রবণতা বাঙালীর হৃদয়-ধর্ম। বৈষ্ণব-পদাবলীতে তার গীতি-প্রবণতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পার্থিব মানব-মানবীর প্রেমলীলার সহজ অনুভূতিতেই এদের উৎসারণ। পরে, এদের গায়ে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ লেগেছে। ফলে, কাব্যরস-পিপাসু এতে পায় অপূর্ব কাব্য-ব্যঞ্জনা; অধ্যাত্ম-ভাবের ভাবুক পায় অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ।

বৈষ্ণব-পদাবলীর কাব্য-মূল্য

পদাবলী বাংলার কান্ত-কোমল-মধুর রসাশ্রিত অনবদ্য গীতি-সাহিত্য। শান্ত, মধুর, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ইত্যাদি ভাবের আশ্রয়ে বাংলার কবিচিত্ত অনবদ্য পদের আকারে উৎসারিত করেছে নিজেকে। বাংলাদেশে পদাবলী-ধারার প্রথম প্রবর্তক

কবি জয়দেব। সংস্কৃতে রচিত তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের অনুরূপ অপভ্রংশ: ভাবরূপ বাংলা। গীতি ব্যঞ্জনাযুক্ত ভাবময় বাক্য-বিন্যাস হলো 'পদ' অর্থাৎ 'শ্লোক'। এই পদ-রচনার প্রথম গৌরব জয়দেবের। তাঁর 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' থেকেই বিশাল পদাবলী-সাহিত্যের উদ্ভব। সেই অর্থে চর্যাপদও পদ। শাক্ত গীতি-সাহিত্যও পদাবলী। কালক্রমে, জয়দেবের 'কান্ত-কোমল পদে'র অনুরূপ অপভ্রংশ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলা ভাষায় সংক্রামিত হয় এবং তাকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধ পদাবলী-সাহিত্য বিকশিত হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিগণের হাতে বৈষ্ণব-পদাবলীর হৃদয়রঞ্জন সমুচ্চ কাব্য-সৌধ নির্মিত হয়ে ওঠে।

পদাবলী কাকে বলে?

বৈষ্ণব-পদাবলীর মূল ভিত্তি হলো বৈষ্ণব ধর্ম। অবশ্য, প্রাথমিক স্তরে মানব-মানবীর প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে পদ-সাহিত্যের উন্মেষ, কিন্তু পরবর্তী স্তরে সেগুলির গায়ে বৈষ্ণব ধর্মের নামাবলী জড়িয়ে দেওয়া হয়; এবং তারও পরে যখন অনুরূপ পদ রচিত হয়, কবির মনোভূমিকে তার আগেই বৈষ্ণব ধর্মের গন্ধ-ধূপের সুবাসে সুবাসিত করে নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এই আশ্চর্য রস-প্রক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে লিখলেন: 'যারে বলি ভালোবাসা তারে বলি পূজা।' অর্থাৎ, প্রেম ও পূজা মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির দুটি সন্নিহিত পর্যায়। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—'পৃথিবীতে যে ভালোবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখা যায় না—যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধ-বন্ধন জড়িত নাই—এমন-কি, যাহা সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশায় আত্ম-বিসর্জন করিতে যায়, বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেসব ভালোবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবার্য নিগূঢ় ভালোবাসার আদর্শ রূপক-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।' অর্থাৎ, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

বৈষ্ণব পদাবলীর তাৎপর্য

বস্তুতঃ, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বই হলো বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ার কথা। রাধাকৃষ্ণ-লীলার অন্তরালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনন্তলীলাই রূপায়িত হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু একার দ্বারা লীলা সম্ভব নয়; তাই তিনি বিভক্ত হয়ে 'বহু' হলেন। তখন শুরু হলো পরমাত্মা ও জীবাত্মার অন্তহীন লীলা। রাধাকৃষ্ণ-লীলা এই জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। রাধা হচ্ছেন তিনি, যিনি আরাধনা করেন; অর্থাৎ ভক্ত। আর, কৃষ্ণ হচ্ছেন তিনি, যিনি আকর্ষণ করেন; অর্থাৎ, ভগবান। বাঁশীর ছয়টি ছিদ্রের মতো ছয় ঋতুর রূপ-রস-গন্ধের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা প্রতিনিয়ত আমাদের আহ্বান করছেন তাঁর অনাদি-অনন্ত লীলার মধ্যে। আমরা বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ, ক্লেদকীর্ণ মানুষ। তাই আমাদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির দুয়ারে-দুয়ারে কঠিন কপাট। সাংসারিকতার জটিল কুটিল সীমাকে অতিক্রম করে আমরা সবাই অসীমের অনন্ত লীলায় যোগ দিতে চাই। কিন্তু সে পথে অনেক বাধা। সেই বাধা অতিক্রম

বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকার্থ

করে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনই সার কথা। অতি-আধুনিক ভাষ্যকারদের মতে, কৃষ্ণ হলেন তিনি, যিনি কর্ষণ করেন ; অর্থাৎ কৃষক। তাঁদের মতে, কৃষ্ণ কৃষি-সভ্যতার প্রতীক। কিন্তু সেদিক থেকে 'কৃষ্' ধাতু 'কৃষ্ণ' শব্দের মৌল উপাদান হওয়ায় কৃষ্ণ বাঙালীর জীবন এবং সংস্কৃতিকে উত্তমরূপে কর্ষণ করে সেখানে কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চভাবের ফসল ফলিয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা প্রথমেই উচ্চারণ করেন : "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'—কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। এবং রাধা আরাধিকা—রাধিকা। এই হলো বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকার্থ।

বৈষ্ণব-পদাবলী বৈষ্ণব-সমাজে মহাজন-পদাবলী নামে পরিচিত। বৈষ্ণব-কবিগণ রাধাকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতির উপলব্ধিতে মহাজন ; অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কারণ বৈষ্ণব-পদাবলী ধর্মীয় সংগীত ছাড়া অন্য কিছু নয়। তার মানবিক রস বা শিল্পরস তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। তবে বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য, বৈষ্ণব প্রেম-ভক্তিবাদের সঙ্গে শিল্প-রসের বস্তুতঃপক্ষে কোন বিরোধ ছিল না ; তাই ধর্মীয় অনুশাসনের গণ্ডীর মধ্যেও এত উৎকৃষ্ট পদের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

বৈষ্ণব মহাজন

মূলতঃ গানের জন্যেই বৈষ্ণব-পদাবলী রচিত হয়েছিল, আবৃত্তির জন্যে নয়। কাজেই, বৈষ্ণব-পদাবলীর রসসিদ্ধি কীর্তনের আসরে সুর-লয়-তানের বিস্তারের মধ্যে। বৈষ্ণব-পদাবলীকে তাই রাধাকৃষ্ণ-লীলার অনুসরণে বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যায়িত করা হয়েছে। যেমন : পূর্বরাগ, মান, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, ভাব-সম্মিলন, বিরহ ইত্যাদি। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণের বাল্যলীলা। আবার, শ্রীচৈতন্য তাঁর রাধাভাব-দ্যুতিবিলসিত জীবনের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণলীলাকে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত করে যান। ফলে, কীর্তনীয়ারা সূচনায় গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদ দিয়ে আসরের 'গৌরচন্দ্রিকা' গান করেন। তাছাড়া, কোন কোন পদকার প্রার্থনার পদও রচনা করেছেন। তাতে সরাসরি কৃষ্ণের চরণে কবির হৃদয়ার্তি নিবেদিত হয়েছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর পর্যায়-বিভাগ

'কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি। মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কীর্তন-গান বাংলার একান্তভাবে নিজস্ব সম্পদ। মৃদঙ্গ-করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ভক্তিরস-পিপাসু শ্রোতৃবর্গের সমবেত আসরে গীত হতো রাধাকৃষ্ণ-লীলামাধুরী। বাংলার প্রচলিত রাগরাগিণীর ভিত্তিতে সংগঠিত হতো কোমল-মধুর রূপ-বিস্তার। মূল গায়কের কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর-লহরীর মধ্যস্থতায় এবং সহযোগী শিল্পী-গায়কদের সহযোগিতায় কবি-হৃদয়ের ভাবাকুতি সাবলীলভাবে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়ে যেত। কীর্তন গানের দুটি বিশিষ্ট দিক : গীত-অঙ্গ ও তাল-অঙ্গ। গীত-অঙ্গ ও তাল-অঙ্গের অদ্বয় সমন্বয়ে কীর্তন গানের কায়া-বিগ্রহ নির্মিত। সূচনায় কীর্তন-কলাবিদ্ গায়ক গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদ গান করে 'গৌরচন্দ্রিকা'র অবতারণা করেন। বলাবাহুল্য, এই 'গৌরচন্দ্রিকা'র পদ মূল কীর্তনগানের ভাবরসানুসারী হয়ে থাকে। 'গৌরচন্দ্রিকা'র মধ্যস্থতায় চিত্ত-পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে কীর্তনের মূল রসে অবগাহন করানোই

কীর্তন গান

কীর্তনগানের মৌল উদ্দেশ্য। কিন্তু কীর্তনগানের গায়ক একাধারে শিল্পী, ভক্ত এবং ব্যাখ্যাকার। গানের মাঝে মাঝে পদের অতিরিক্ত 'আখর' যোগ করেন তিনি। 'আখর' অংশ তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এবং সার্থক সংযোজক। তাতে মূল ভাব ও রসের ব্যাখ্যা সহজ ও মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলায় কীর্তনগানের ধারা প্রবাহিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মমুহূর্তেই নবদ্বীপ সংকীর্তন-মুখর ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবন ও জীবনাদর্শ বাংলার কীর্তনগানকে দেয় নতুন ভাবাকৃতি ও নতুন আবেদন। পরবর্তীকালে ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত 'খেতরী উৎসবে' বাংলা কীর্তনগানের বিশিষ্ট ধারারূপটি নির্ধারিত হয়ে যায়। এই উৎসবানুষ্ঠানের রূপকার ছিলেন নরোত্তম দাস। কীর্তনগান বৈষ্ণব গৃহস্থ এবং বৈষ্ণব সাধকদের কাছে কণ্ঠহারের তুল্য মূল্যবান। কীর্তনগানের তাল ও সুরলহরীর মধ্যস্থতায় এবং কীর্তনীয়াদের পরিবেশনের মাধুর্যে মহাজন-পদাবলী রসপিপাসু হৃদয়ে খুঁজে পেয়েছে তাদের প্রকৃত রস-সার্থকতা॥

বিশিষ্ট রূপ ও রসসিদ্ধি

বৈষ্ণব-পদাবলীর বিভিন্ন রস-পর্যায়

পৃথিবীতে কোন ধর্মকে অবলম্বন করে সমৃদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টি—বৈষ্ণব-পদাবলী তার অনন্য উদাহরণ। বৈষ্ণব-পদাবলী বা মহাজন-পদাবলী ভাবরসে সমৃদ্ধ অতুলনীয় সংগীত-সাহিত্য। হৃদয়রঞ্জন কোমল-মধুর রসের এমন বিচিত্র অপূর্ব প্রকাশ বিশ্ব-সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। একদিকে, মানবিক রসের ভাবঘন অপূর্ব প্রকাশ ; অন্যদিকে, বৈষ্ণবানুসারী আধ্যাত্মিক রসের রাগঘন বিচিত্র ব্যঞ্জনা বাংলার বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যকে স্থাপন করেছে স্বর্গ ও মর্ত্যের যুগল সম্মিলনের পরম বিন্দুতে। মানব-রস ও অধ্যাত্ম-রসের অদ্বয় সমাহারে বৈষ্ণব-পদাবলীর কান্ত-কোমল কায়া-বিগ্রহ নির্মিত। তাতে কঠোরতার স্থান নেই ; বৈষ্ণব-পদাবলী কোমল-মধুর রসেরই অনবদ্য প্রকাশ।

মানব-রস ও অধ্যাত্ম-রসের সমাহার

লক্ষণীয়, বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তরণ বস্তুলোক থেকে ভাবলোকে ; তার রসসিদ্ধি প্রেম ও ভক্তির বিমূর্ত ভাবলোকে—রসলোকে। সেদিক থেকে বৈষ্ণব-পদাবলী সৌন্দর্য-ভাবনা, ভাব-সৌকর্য ও রস-চেতনার উজ্জ্বল দীপবর্তিকা। একদিকে, তা যেমন রসসমৃদ্ধির উন্নত উদাহরণ ; অন্যদিকে, তা তেমনি জাতির কাব্য-পিপাসা ও রস-পিপাসার তৃপ্তি-সরোবর। বৈষ্ণব-পদাবলীর রসসাগরে অবগাহন করে কাব্য-পিপাসুরা পেয়েছেন এক অনবদ্য রসলোকের সন্ধান, ভক্তিবাদীরা পেয়েছেন ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ের অনাবিল মুক্তি। এইভাবে কাব্যরস ও ভক্তিরস এক অদ্বয় সম্মিলনের বিন্দুতে মিলিত হয়ে 'রসঃ বৈ সঃ'-র পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে তার পরম সার্থকতা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যস্থতায় কাব্যরস ও ভক্তিরসের যে ক্রমবিকাশ চিত্রিত হয়েছে, বৈষ্ণব দার্শনিকেরা তাকে বিভিন্ন রস-পর্যায়ে ভাগ করে একটি শিল্পসম্মত ও মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা দান করেছেন। সেই রস-পর্যায়গুলি

কাব্যরস ও ভক্তিরস

হলো : পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদি।

পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ

'পূর্বরাগে' প্রেমের উন্মেষ। সেই প্রেম মানবিক প্রেম বা ঈশ্বর-প্রেম যে-কোন প্রেমই হতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণজনিত যে ব্যাকুল মানসিক অবস্থা, তা যেমন পূর্বরাগ; ঈশ্বরের প্রতি ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তির সূত্রপাত এবং তজ্জনিত আকুল উৎকণ্ঠাও তেমনি পূর্বরাগ। পূর্বরাগ ও রূপানুরাগ একই মানসিক অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম। পূর্বরাগের পদরচনায় বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বংশীদাস প্রমুখ কবিরা। চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম', জ্ঞানদাসের 'রূপলাগি আঁখি ঝুরে' ইত্যাদি পদগুলি এই পর্যায়ের বিশিষ্ট পদ।

অভিসার

'অভিসার' পূর্বরাগের পরবর্তী রস-পর্যায়। এই পর্যায়ে লৌকিক প্রেমিকারা প্রিয়-মিলনাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করে সংকেত-স্থানে। বাধাসংকুল, বিপদাকীর্ণ পথ। নৈশ অন্ধকার, বৃষ্টি-মুখরতা, বজ্রপাত, পথের পিচ্ছিলতা ও কণ্টকাকীর্ণতা, সর্পভীতি ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা প্রেমের সুতীব্র ব্যাকুলতার কাছে পরাজিত হয়। অন্যদিকে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষায় ভক্ত তার সাধনপথের সমস্ত দুঃখকষ্ট, বাধা-প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অগ্রসর হন ঈশ্বরের অভিমুখে। তাও অভিসার। রাত্রিকালীন তিমিরাভিসার ছাড়া আছে দিবাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, বর্ষাভিসার ইত্যাদি অভিসারের বিভিন্ন প্রকারভেদ। অভিসারের পদরচনায় স্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন গোবিন্দদাস। তাঁর 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট' এবং 'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল' ইত্যাদি অনবদ্য পদগুলি বাংলা সাহিতের দ্যুতিময় অমূল্য সম্পদ।

মিলন

অভিসারের পরবর্তী রস পর্যায় 'মিলন'। দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং দুশ্চর অভিসার-যাত্রার অবসানে সূচিত হয় মিলনের পালা। রাধাকৃষ্ণের যে মিলন, তা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় পরম তাৎপর্যময়। জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মিলনের মধ্যস্থতায় ভক্ত-হৃদয়ের গভীর আত্মনিবেদনে এবং অতীন্দ্রিয় পুলকানুভবে এই পর্যায়ের চরম রসসিদ্ধি। এই মিলন-সম্ভোগের পদরচনায় যাঁরা অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রধান। গোবিন্দদাসের 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু' পদটি মিলন-সম্ভোগ সঞ্জাত রসোল্লাসের অনবদ্য উদাহরণ। কেবল মানবিক রস-প্রকর্ষের দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক ভাব-ব্যঞ্জনার দিক থেকেও পদটি তুলনারহিত।

বিরহ

মিলনের পর 'বিরহ'। মিলনের নিশাবসানে ঘনিয়ে আসে বিচ্ছেদের পালা, যার অন্য নাম বিরহ। সাহিত্য-রসশাস্ত্রে বিরহ যেমন মানবিক আবেদনের গুণে অনন্য, বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রেও বিরহ তেমনি আধ্যাত্মিক আবেদনের গুণে তুলনারহিত। বিচ্ছেদ-বেদনার রসসমৃদ্ধ বিরহের পদগুলি বিশ্বের মধুরতম সংগীতের [Sweetest Song] সম্মানে অভিষিক্ত। এই মিলন আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় যেমন ভারাক্রান্ত, চিরন্তন অতৃপ্তির [enternal unsatiety]

রসে যথার্থ। বলরাম দাসের 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এই পর্যায়ের রসঘন অনবদ্য সংগীত। আবার, মিলনপিয়াসী নায়িকার মিলনের আকাঙ্ক্ষা যদি চূর্ণ হয়ে যায় নায়কের অনুপস্থিতিতে, তবে সেই বিপ্রলব্ধা নায়িকার ব্যথাতি বিরহের সংগীতে পায় রসপ্রগাঢ় অভিব্যক্তি। জ্ঞানদাসের বিপ্রলব্ধা শ্রীরাধিকার কাতরোক্তি ব্যক্ত হয়েছে অতি মর্মস্পর্শী ভাষায়: 'বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ। কি ফল উপচার পুঞ্জ।' এই পর্যায়ের পদগুলির কাব্যিক উৎকর্ষ যেমন বিস্ময়কর, আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাও তেমনি তুলনারহিত।

ভক্ত-ভগবানের এই দ্বৈতলীলায় দয়িতরূপী ভগবান ছলনা করেন ভক্তের সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে, সেই ছলনাও তাঁর লীলার অঙ্গ। তখন ভক্তরূপিণী শ্রীরাধিকা হন মানিনী, খণ্ডিতা—কলহান্তরিতা। সেই মান-অভিমানের পালায় অভিমানিনী শ্রীরাধিকার অভিমান-ভঞ্জনের জন্যে ভগবানরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নানা ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়।

আক্ষেপানুরাগ

কারণ, ভক্তের প্রেম ভিন্ন ভগবানের প্রেম যে মিথ্যা। তাই তাঁকে সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে প্রেমের ভিখারীর মতো ভক্তের প্রেমের দুয়ারে এসে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়। ব্যথাহতা অভিমানিনী নায়িকা তাঁকে ফিরিয়ে দেয় অভিমান ভরে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুশোচনা ও আক্ষেপের বেদনায় হৃদয়ের দু'কূল প্লাবিত হয়। এইখানেই 'আক্ষেপানুরাগে'র সূচনা। জ্ঞানদাসের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' এবং 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' পদ দুটি এই পর্যায়ের কাব্যোৎকর্ষের উজ্জ্বল উদাহরণ।

তারপর 'মাথুর'। আলো এবং কলহাস্যমুখর বৃন্দাবন-লীলার ওপর নেমে আসে চির-বিচ্ছেদের যবনিকা। 'অব হরি মথুরাপুর গেল।' প্রাকৃত নায়িকার ক্ষেত্রে নায়কের প্রবাস যেমন সীমাহীন বিচ্ছেদ-বেদনায় বিধুর, কৃষ্ণগতপ্রাণা ভক্তরূপিণী শ্রীরাধিকার

মাথুর

ক্ষেত্রেও ঈশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন তেমনি চির-বিচ্ছেদ-কাতরিমায় করুণ। অন্ধকার বৃন্দাবন। তার গোষ্ঠে, যমুনা-পুলিনে, কুসুমকুঞ্জে সর্বব্যাপী শূন্যতার হাহাকার। বৈষ্ণব-কবিরা এই অসীম বিষাদমগ্ন পটভূমির হাহাকার বুকে নিয়ে রচনা করেছেন মাথুরের বহু কবিতা। বিদ্যাপতির 'সখি, হামারি দুখের নাহি ওর', 'হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা' কিংবা বলরামদাসের 'যাহার লাগিয়া হাম সব তেঞাগিল' ইত্যাদি পদ এই পর্যায়ের উজ্জ্বল নিদর্শন।

মাথুরের পালাতেই কাব্যিক এবং আধ্যাত্মিক রস-পর্যায়ের সমাপ্তি নয়। প্রাকৃত নায়কের প্রবাস-যাত্রায় কিংবা আধ্যাত্মিক নায়ক শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুর-গমনে দেহ-কামনার ঊর্ধ্বে দেহোত্তীর্ণ প্রেম এবং কামনাহীন ভক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠার মধ্যস্থতায় এবার সর্বোৎকৃষ্ট সংগীতের উন্মেষ ঘটেছে। এই পর্যায়ে অশ্রু-কাতরিমা মুছে গেছে, মুছে গেছে বিচ্ছেদের সীমাহীন বেদনা। নায়িকার কল্পনায়

ভাব-সম্মিলন

নায়কের কিংবা ভক্তের মানস-মন্দিরে ভগবানের নিত্য-আনাগোনা এবং স্থায়ী বসতি সূচিত হয়। এইখানেই এই পর্যায়ের চরম রসোৎকর্ষ। এই পর্যায়ই ভাব-সম্মিলন। বিদ্যাপতির 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর', 'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে' কিংবা চণ্ডীদাসের 'বঁধু কি আর বলিব আমি' ইত্যাদি পদ কাব্যোৎকর্ষ ও রসোৎকর্ষের অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

অপরাপর রস-পর্যায়

বৈষ্ণব-পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য রস-মঞ্জুষা। উল্লিখিত রস-পর্যায়ের অতিরিক্ত আরও কয়েকপ্রকার রস-পর্যায়ে বৈষ্ণব-কবিদের হৃদয় অপূর্ব ভাবৈশ্বর্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। সেই রস-পর্যায়গুলি হলো বাৎসল্য, সখ্য, প্রার্থনা ইত্যাদি।

বাৎসল্য ও সখ্য

কোমল-কান্ত, মধুর পদাবলী-সাহিত্যে বাৎসল্য-রসের কিছু নিজস্ব অবদান আছে। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জননী যশোদার স্নেহ-ব্যাকুলতা বৈষ্ণব-কবিদের হাতে পেয়েছে মর্মস্পর্শী রূপ। বলরামদাস, যাদবেন্দ্রদাস, বংশীবদন প্রমুখ কবিদের হাতে বাৎসল্য-লীলার এক অপূর্ব মধুর রসঘন রূপ ফুটে উঠেছে। বাৎসল্য-লীলায় যেমন মাতৃরূপে ভগবানরূপী শ্রীকৃষ্ণের ভজনা, সখ্য-লীলায় তেমনি সখারূপে তাঁর উপাসনা। সখ্য-লীলায়ও বৈষ্ণব-কবিরা সমান কবিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলিতে জীবন-সর্বস্ব সমর্পণ করে বৈষ্ণব-কবিকুঞ্জের আত্মনিবেদনের চরমতম অভিব্যক্তি ধ্বনিত হয়েছে। এ পর্যায়ে বৈষ্ণব-কবিকুঞ্জের শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গ হলেন বিদ্যাপতি। তাঁর 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' পদটি কাব্যোৎকর্ষ এবং রসোত্তীর্ণতার দিক থেকে তুলনারহিত। তাছাড়া, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস এই রস-পর্যায়ে তাঁদের আত্ম-নিবেদনের অশ্রুময় শেষ-স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। কবি হৃদয়ের নিঃশর্ত আত্মনিবেদনের মধ্যেই বৈষ্ণব-ভাবধারার চরম সার্থকতা ॥

প্রার্থনা

॥ বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ॥

বাঙালীর সমাজে, বাঙালীর জীবনে ও বাঙালীর সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব যেমন ব্যাপক, তেমনই সুগভীর। তাঁর অলোক-সামান্য চরিত্র-দ্যুতি বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে দিয়েছে সমুজ্জ্বল দীপ্তি এবং অপূর্ব মহিমা। বাংলা গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে বলা যায়, তিনি এক দুর্লভ 'পরশ পাথর'। 'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।' বাঙালী-হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কোমলতার মূর্ত বিগ্রহ হলেন শ্রীচৈতন্য। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 'পদাবলী-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ হইতেছে ষোড়শ শতাব্দী। ইহার প্রধান, এমন-কি একমাত্র উৎস হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ।' তাঁর ভাব-বিহ্বলতা, তাঁর চরিত্রের স্নিগ্ধ কোমলতা বাংলা গীতি-কবিতার আত্মাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। প্রথমতঃ, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও দিব্য-দ্যুতি-বিলসিত ভাব-ব্যাকুলতা এক নতুন কবিতা-ধারার উৎসমুখ খুলে দিল। তা 'গৌরচন্দ্রিকা'। শ্রীচৈতন্যের অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ ছিল বলে তাঁর বাল্যনাম ছিল গোরা—গৌরচন্দ্র বা গোরাচাঁদ—গৌরাঙ্গ। এই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক বা গৌরচন্দ্র-বিষয়ক পদগুলিকে বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকা মূলতঃ বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রবেশের ভূমিকা। শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধাভাবের মূর্ত প্রতীক। সেই মহাভাবে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে পদাবলী-জগতে প্রবেশের সিংহদ্বার

বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

হলো গৌরচন্দ্রিকা। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্য ছিলেন অন্তরঙ্গে রাধা, বহিরঙ্গে কৃষ্ণ। বৈষ্ণব-ভক্তের কাছে তিনিই প্রেম-ভক্তির পরিশুদ্ধতম আদর্শ। তাঁর ভাব-তন্ময়তা, কৃষ্ণ-ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হলো পদাবলী-সাহিত্যে। পদাবলী-সাহিত্য এভাবে শ্রীচৈতন্যের ভাব-প্রভাবে অপূর্ব রূপ-সৌন্দর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠলো। তৃতীয়তঃ, শ্রীচৈতন্যের দিব্যদ্যুতি-বিচ্ছুরিত জীবন-লীলা যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-কবিতাগুলি তাতে ভূমিষ্ঠ হয়ে লাভ করলো এক অনির্বচনীয় গৌরব। চতুর্থতঃ, শ্রীচৈতন্যের দিব্যভাব-বিলসিত জীবন-লীলাবসানের পর বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্যগণ বৈষ্ণবদর্শন রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সেই দর্শন-শাস্ত্রানুসারে রচিত পদগুলিই বৈষ্ণব-পদাবলীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটির অবদান এই প্রসঙ্গে অসামান্য। কিন্তু সেই দার্শনিক প্রাধান্য কিঞ্চিৎ ম্লান করে দিয়েছে পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-কবিতাগুলির সহজ সাবলীলতার স্বাভাবিক গৌরব।

কাজেই, শ্রীচৈতন্যের হীরকদ্যুতিময় দেবোপম কর্মবহুল জীবন বৈষ্ণব-গীতি-কবিতার মধ্যস্থলে প্রবাহিত যেন আলোক-গঙ্গার মতো দিব্যসুষমাময়। তাঁর জীবন-সাধনা ও ভাব-সাধনা সমগ্র বৈষ্ণব-পদাবলীর মাঝখান দিয়ে একটি অনবদ্য স্বর্ণসূত্রের মতো প্রবাহিত হয়ে গেছে। ফলে, পরবর্তীকালের বৈষ্ণব-পদাবলীতে যেমন পড়েছে তার স্বর্ণ-স্বাক্ষর, পূর্ববর্তীকালের পদসম্ভারে তেমনি আরোপিত হয়েছে নতুন তাৎপর্য—নতুন ভাষ্য। বৈষ্ণব-পদাবলী শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তির দিব্য স্পর্শে হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংগীত—দেহমালিন্যমুক্ত প্রেমভক্তির অনবদ্য স্বর্ণহার।

বৈষ্ণব পদকর্তা-পরিচিতি

॥ চণ্ডীদাস ॥

বাংলা পদাবলী-সাহিত্যের কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের প্রতিষ্ঠা বাঙালীর হৃদয়ের সিংহাসনে। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে, তাঁর জীবনকে ঘিরে বাঙালী মনের যত জিজ্ঞাসা, যত কৌতুহল ঘনীভূত হয়ে আছে, এমন আর কোন কবিকে নিয়ে ঘটেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলী সাহিত্যের চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি কিনা এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস একাধিক ব্যক্তি কিনা – সে বিষয়ে নিদারুণ মতভেদের অবকাশ থেকে গেছে।

ভূমিকা

পদাবলীতে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত চার রকমের ভণিতা লক্ষ্য করা যায়ঃ এক. বড়ু চণ্ডীদাস, দুই. দ্বিজ চণ্ডীদাস, তিন. দীন চণ্ডীদাস এবং চার. চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কোন এক সময়ে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেছিলেন। এখন প্রশ্ন, শ্রীচৈতন্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করতেন কি না? কাব্যটিতে আদিরসের প্রাধান্য থাকলেও বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ খণ্ডে প্রেম ও গভীর আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের পক্ষে এই অংশগুলির আস্বাদন করা সম্ভব।

বড়ু চণ্ডীদাস

বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ। সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥

তাছাড়া, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচলিত একটি পদের আদিরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ খণ্ডে আবিষ্কৃত হয়েছেঃ

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরেঁ। তোহ্মারে হে।
বসিআ কদমতলে সে কাহ্ন করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥

এই পদগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব-পদাবলীর আত্মিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিজ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কতকগুলি সুন্দর পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের কিছুতেই প্রাক্-চৈতন্য যুগের রচিত বলে মনে হয় না। তাতে দেহাতীত প্রেমলীলা এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের ভাবাদর্শ সামনে রেখেই পদগুলি রচিত হয়েছিল। দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধা শ্যাম-কলঙ্কিনী হতে পেরে কৃতার্থ। কাজেই, এই দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কোন কবি নন ; ইনি নিঃসন্দেহে চৈতন্য-পরবর্তীকালের একজন সূক্ষ্ম-রুচির কবি।

দ্বিজ চণ্ডীদাস

মণীন্দ্রমোহন বসু আর এক চণ্ডীদাসের পদ আবিষ্কার করেন ; তিনি দীনচণ্ডীদাস। পদগুলি নিকৃষ্ট মানের—সম্ভবতঃ, পঞ্চদশ শতকের অন্তিম পর্বের আগে এগুলি রচিত নয়। সতীশচন্দ্র রায়ের মতে, 'দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শত শত নিকৃষ্ট পদাবলীকে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের বলিয়া মানিতে পারি না।... আমরা দীন চণ্ডীদাসকে কিছুতেই দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া মানিতে পারি না।' কাজেই, পদাবলীর পরিচিত চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর মৌলিক প্রভেদ।

দীন চণ্ডীদাস

পদাবলীর যে পরিচিত ও প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদ নিরাবৃত প্রাণের নিরাভরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য কোমল স্নিগ্ধতার সৃষ্টি করে, তিনিই বাঙালীর প্রাণের কবি চণ্ডীদাস। তিনি আমোদ-বিলাসের কবি নন, তিনি বিরহ-বেদনার শান্ত-কবি। তাঁর কবিতায় অলংকার সজ্জার প্রাচুর্য নেই, নেই শিল্প-চাতুর্যের কারিগরি। কিন্তু সহজ ভাষায় ও হৃদয়ের গভীরতম ভাবের নিবিড় আবেদনে তাঁর কবিতা সত্যিই তুলনারহিত। চণ্ডীদাসের কবিতার সহজ সৌন্দর্যের মতো তাঁর অঙ্কিত শ্রীরাধিকার মূর্তিটিও সকল প্রকার অলংকার-আভরণহীনা, কৃষ্ণ-সর্বস্ব এবং আত্মনিবেদিতা—'যোগিনীপারা'। তাঁর 'পূর্বরাগে'র পদেই রাধিকা কৃষ্ণগতপ্রাণা :

পদাবলীর চণ্ডীদাস

'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥'

চণ্ডীদাসের কবিতা কানের ভিতর দিয়ে মর্মস্পর্শী। সেখানেই চণ্ডীদাসের কবিতার রসসিদ্ধি। তাঁর কবিতার অনন্যতা কেবল তাঁর বাক্-সংযমেই নয়, তাঁর কবিতার অতুল্যতা অনির্বচনীয় উপলব্ধির অতল গভীরতায়। উপলব্ধির সেই প্রগাঢ়তায় তাঁর কবিসত্তা এক ধ্যান-নিমীলিত তন্ময়তায় লীন হয়ে আছে। সেখানে বাণী মূর্ছিত ; শুধু এক অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা এই ধূলিমলিন পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করে এক সীমাহীন সুদূর ভাবলোকে উধাও হয়ে গেছে। চণ্ডীদাসের উপকরণ-বাহুল্যহীন এমনি কতকগুলি গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাব-প্রগাঢ় পদের দৃষ্টান্ত :

উপলব্ধির প্রগাঢ়তা

এক. সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া ॥

দুই.　　এ ঘোর রজনী　　　　মেঘের ঘটা
　　　　　　কেমনে আইল বাটে।
　　　আঙিনার কোণে　　　বঁধুয়া ভিজিছে
　　　　　　দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

তিন.　　　　বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
　　　　　　দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

চার.　　　　বঁধু কি আর বলিব আমি।
　　　মরণে জীবনে　　　জনমে জনমে
　　　　　　প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য—'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন ॥'

॥ জ্ঞানদাস ॥

'চণ্ডীদাস রসপদ্মে অলি জ্ঞানদাস।' জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। তিনি ছিলেন কাটোয়া অঞ্চলের লোক। তাঁর আবির্ভাব-কাল সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশক। একদিকে পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাসের কবিতার ভাব-প্রেরণা, অন্যদিকে চৈতন্যোত্তর যুগের কাব্যাদর্শ তাঁর কবি-চরিত্র নির্মাণে বিশেষ সহায়তা করেছিল। বাংলা, ব্রজবুলি এবং বাংলা-ব্রজবুলির মিশ্র ভাষায় পদ-রচনার সাফল্যে তিনি পাঠককে বিস্মিত করেছেন। সেই কারণে তাঁকে চৈতন্যোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলে মনে করা হয়। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তর-সাধক। তাঁর কাব্যাদর্শ ছিলেন কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের দুরবগাহ প্রেমের রহস্যময় গভীরতাকে বৈষ্ণব-দর্শনে বর্ণিত প্রেমের সমুচ্চ আদর্শের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি যে পদগুলি রচনা করেছেন, তা একাধারে যেমন সরল, তেমনি ভাব-গভীর ও মর্ম-সঞ্চারী। বৈষ্ণব-দর্শনের আদর্শানুসরণে যেখানে তাঁর কবিতা নীরস তত্ত্বমাত্রে পর্যবসিত হতে পারতো, সেখানে তিনি দুর্লভ কবিত্বের গুণে আশ্চর্য রস-সঞ্চার করে বহু সার্থক কবিতা সৃষ্টি করেছেন।

কাব্য-বৈশিষ্ট্য

জ্ঞানদাসের এই সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর উপলব্ধির প্রগাঢ়তা এবং ঘনপিনদ্ধ ভাষার শিল্পময় পরিবেশনা। ভাব এবং ভাষার গাঢ়বন্ধতাই তাঁর কবিতার স্থায়ী রূপ। চণ্ডীদাসের মতো তিনি কেবল অনুভূতি-মাত্রকেই সম্বল করে কাব্য-রচনায় অবতীর্ণ হন নি। অনুভূতির প্রগাঢ়তার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত বাণী-বন্ধন তাঁর কাব্য-পরিবেশ এবং আন্তর ভাবাকুতি প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। সেদিক দিয়ে চণ্ডীদাস যেখানে গভীরতম প্রাণ-বেদনার গীতিকার, জ্ঞানদাস সেখানে অন্তরতম প্রাণ-বেদনার সার্থক চিত্রকর। সেই কারণে

চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পার্থক্য

জ্ঞানদাস কোথাও বাংলা, কোথাও ব্রজবুলি, কোথাও বাংলা-ব্রজবুলির মিশ্র রূপকে তাঁর কবিতার বাহন হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু সেই নির্বাচন চেষ্টাকৃত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত; এবং সেইজন্যে সহজ ও সাবলীল। তাঁর রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগ-বিষয়ক পদগুলি হৃদয়-স্পন্দিত অনুভূতিতে এবং ভাব-ব্যাকুলতার নিরুপম উচ্চারণে শ্রেষ্ঠ এবং সমুজ্জ্বল।

এক. রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ [রূপানুরাগ]

দুই. রূপের সায়রে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ [রূপানুরাগ]

তিন. তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারি রূপে। [রূপানুরাগ]

চার. দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ [রূপানুরাগ]

পাঁচ. সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ [আক্ষেপানুরাগ]

রূপের মুগ্ধতায় একস্থানে মিলন-ব্যাকুলিত হৃদয়ের সুগভীর আর্তি, অন্যত্র নিদারুণ বিরহের আঘাতে বিধ্বস্ত হৃদয়ের সীমাহীন হাহাকার। অথচ প্রকাশভঙ্গি সর্বত্র সহজ এবং সুন্দর। সেই অর্থে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সার্থক 'ভাবশিষ্য' ॥

॥ গোবিন্দদাস ॥

মিথিলার কবি বিদ্যাপতির কবি-কর্ম চৈতন্যোত্তর যে বাঙালী কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হয়েছিল, তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজ। গোবিন্দদাস তাই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কেবল ব্রজবুলি ভাষার সার্থক ব্যবহারেই নয়, তাঁর কবিতার অলংকার-সজ্জা ও তাঁর প্রয়োগ-সিদ্ধিও বিস্ময়কর। বৈষ্ণব দর্শনে এবং অলংকার-শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রকৃত কবি-হৃদয় এবং রসানুভূতির গভীরতা তাঁর রচিত পদগুলিকে দিয়েছে অম্লান গৌরব।

'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'

গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের অন্যতম সহচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। জন্ম শ্রীখণ্ডে এবং তিনি ছিলেন জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। সুদীর্ঘকালের বৈষ্ণব কবিতার উত্তরাধিকার এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে গোবিন্দদাস কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার পার্থক্য এইখানেই। গোবিন্দদাসের কবিতায় সুনির্বাচিত শব্দ-সম্ভার ও ছন্দোঝংকারময় বাণীকে অতিক্রম করে এমন একটি সংযত, পরিশীলিত, ভক্তিনম্র হৃদয় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, যা চৈতন্যোত্তর যুগের সুনিশ্চিত পরিণাম-ফল। অবিচল নিষ্ঠায়, অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে এবং তদ্গত আত্মসমর্পণে গোবিন্দদাসের স্নিগ্ধ-মধুর পদগুলিকে চিনে নিতে আমাদের একটুও কষ্ট হয় না :

কবি-পরিচিতি

এক.　মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর-দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥　[বর্ষাভিসার]

দুই.　কণ্টক গাড়ি　কমলসম পদতল
মঞ্জরী চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি　ঢালি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূরত পন্থ-　গমনে ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥　[বর্ষাভিসার]

প্রেমের এই তপস্যা কঠোর দুঃখ-চর্যার চিত্র-অঙ্কনে গোবিন্দদাস সার্থকতম শিল্পী॥

॥ বলরামদাস ॥

নিত্যানন্দ-শিষ্য কবি বলরামদাস চৈতন্যোত্তর যুগের আর-একজন উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব-পদকার। বাংলা সাহিত্যে মোট পাঁচজন বলরামদাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরামদাস ছিলেন বর্ধমান জেলার দোগাছিয়া গ্রামের অধিবাসী। তিনি প্রভু নিত্যানন্দের আদেশ-অনুসারে তাঁর জন্মভূমিতে গোপাল-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি ছিলেন গোপাল-প্রেমিক; এবং প্রধানতঃ বাৎসল্য-রসের কবি হিসাবে এঁর পরিচয়। বলরামদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত বাৎসল্য-রসের পদগুলির অধিকাংশই এঁর রচনা। ভাষার স্বচ্ছতায় ও রীতি-প্রকরণের সরলতায় তাঁর রচিত পদগুলি চির-অম্লান। পুত্রের জন্যে কৃষ্ণ-জননী যশোদার স্নেহ-ব্যাকুলতার যে বাৎসল্য-রসের তন্ময় চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা সত্যিই অনুপম। আবার, জননীর ওপর বালক কৃষ্ণের অভিমান এক অভিনব কৌতুক-সহকারে বর্ণিত হয়েছে :

না থাকিব তোমার ঘরে　অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা।

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে আর এক বলরামদাসের পদ পাওয়া যায়; তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। সে হিসেবে এই বলরামদাস গোবিন্দদাসের পরবর্তীকালের কবি। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলিতে গোবিন্দদাসের ছায়া দেখা গেলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সেগুলির অনন্যতা প্রোজ্জ্বল। তাঁর 'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।' পদটি কিংবা পূর্বরাগের পদগুলির শিল্প-সংহত প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়'—পদটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধে রয়েছে সেই মুগ্ধতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর॥

॥ প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-পদাবলীর পার্থক্য ॥

প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-পদাবলীর পার্থক্য অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—উভয় দিকেই স্পষ্ট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর দেবোপম চরিত্র এবং তাঁর প্রেম-ভক্তির আদর্শ বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়ে সেখানেও এনেছে যুগান্তর। এমন-কি, বৈষ্ণব-কবিতায়ও তাঁর আবির্ভাবে নবতর কাব্যিক রূপায়ণ ও নবতর মূল্যায়নের সূচনা পরিলক্ষিত হলো। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যস্থলে প্রবাহিত যেন একটি বিগলিত স্বর্ণ-ধারা। তাঁরা উভয় প্রান্তে পৃথক্ সাহিত্যাদর্শ ; রূপায়ণের আদর্শ—তাও ভিন্ন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এবং তাঁর আবির্ভাবের পরে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ কবিগণ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতার সঙ্গে জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ কবিগণের পার্থক্য স্পষ্ট। প্রথমতঃ, প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবিগণ কোন ধর্মীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন নি। তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় আদর্শ এবং তাঁদের কাব্যাদর্শ সর্বদা এক ছিল না ; তাঁদের রচিত কবিতা সার্বভৌম ও সার্বজনীন মহিমান্বিত। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব-ভক্ত। বৈষ্ণব ভাব-দর্শন ও জীবন-দর্শন ছিল তাঁদের কাব্য-চর্চার চালক-শক্তি। তাঁদের পরিচয় কবি হিসেবে নয়, 'মহাজন' হিসেবে ; তাঁদের রচিত পদের পরিচয় কবিতা হিসেবে নয়, রাধামাধবের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত ভক্ত-হৃদয়ের সঙ্গীতাঞ্জলিরূপে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব-কবিতার সহজ সাবলীলতা চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতায় অনুপস্থিত। স্বাধীন ভাব-প্রেরণা দর্শনের শাসনে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। তৃতীয়তঃ, অন্তরঙ্গের এই স্বাভাবিকতার দৈন্য বহিরঙ্গের ছন্দ-অলংকার-কলা-বাহুল্যের দ্বারা পূর্ণ করবার প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর্থতঃ, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং 'গৌরচন্দ্রিকা'-বিষয়ক পদগুলি চৈতন্য-পরবর্তী কালের সংযোজন। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিগণ মুখ্যতঃ মানব-মানবীর প্রেমলীলার বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রপাত করেছেন 'পূর্বরাগ' থেকে। চৈতন্য-পরবর্তী কবিগণ নিতান্তভাবেই রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যস্থতায় ভক্ত ও ভগবানের আধ্যাত্মিক রহস্যময় সম্পর্কই বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রপাত করেছেন 'গৌরচন্দ্রিকা' থেকে।

বলাবাহুল্য, বৈষ্ণব-কবিতার এই সকল পরিবর্তন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল ॥

অনুসরণী-৮

*১. বাংলা বৈষ্ণব-পদাবলী কি ? তার বিষয়বস্তু কি ? বৈষ্ণব-পদাবলী থেকে অন্যূন তিনটি উদ্ধৃতি দ্বারা তোমার কথা বুঝিয়ে বল। [৯৪ পৃ.—৯৬ পৃ ও ১০২ পৃ.—১০৪ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৩

*২. পদাবলী কাকে বলে ? একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পরিচয় দাও। [৯৪ পৃ—৯৬ পৃ. ও ১০২ পৃ.—১০৪ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা [কম্পার্ট.] '৬১, '৬২

বৈষ্ণব পদকর্তা-পরিচিতি

৩. পদাবলী-সাহিত্য ও তাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯৪ পৃ.—৯৬ পৃ. ও ১০০—১০১ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা. '৬১

৪. বৈষ্ণব-পদাবলীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তার ওপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকদের প্রভাব বর্ণনা কর। [৯৪ পৃ.—৯৬ পৃ. ও ১০০ পৃ.—১০১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৫. বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন রস-পর্যায় ব্যাখ্যা করে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। [৯৭ পৃ.—১০০ পৃ. দ্রষ্টব্য]

৬. তিনজন বৈষ্ণব পদকর্তা মহাজনের পরিচয় দাও। [১০২ পৃ.—১০৫ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা. '৬৩

*৭. প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর। [১০৭ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৬৩

৮. মধ্যযুগের বাংলা গীতি-সাহিত্যের একটি সাধারণ পরিচয় দাও। [৯৪ পৃ.—৯৬ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬০

৯. বাংলা বৈষ্ণব কবিতার একটি সাধারণ পরিচয় দাও এবং দু'জন প্রসিদ্ধ পদকর্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [৯৪ পৃ.—৯৬ পৃ. ও ১০২ পৃ.—১০৫ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. [কম্পার্ট.] '৬২

১০. একজন বৈষ্ণব-পদকর্তার পরিচয় দাও। [১০৪ পৃ.—১০৫ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. [কম্পার্ট] '৬৩

১১. বৈষ্ণব-পদাবলীর রূপকার্থ বিশ্লেষণ করে তার বৈশিষ্ট্য ও কাব্যমূল্য নির্ণয় কর। [৯৪ পৃ. —৯৬ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*১২. 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের মূল অর্থ কি? শ্রীচৈতন্যের ভাব-জীবন [গৌরাঙ্গ-লীলা] নিয়ে পদ রচনা করেছেন এমন দুজন পদকর্তার পরিচয় দাও। [১০০ পৃ.—১০১ পৃ. দ্রষ্টব্য]

*১৩. জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজ কোন সময়কার কবি? তাঁদের কাব্যরচনা কি প্রকৃতির? উভয়ের রচনা থেকে তোমার ভালো-লাগা দুটি করে চরণ উদ্ধৃত কর। [১০৪ পৃ.—১০৬ পৃ. দ্রষ্টব্য]

১৪. সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও: [৯৬ পৃ.—৯৭ পৃ. দ্রষ্টব্য]

গৌরচন্দ্রিকা [১০০ পৃ.—১০১ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮; কীর্তন গান [৯৬ পৃ.—৯৭ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮; চণ্ডীদাস [১০২ পৃ. দ্রষ্টব্য] ব. প্র. '৭২; বিদ্যাপতি [১৫ পৃ.—১৭ পৃ. দ্রষ্টব্য] ব. প্রা. ৬১; ব্রজবুলি ২০ পৃ.—২১ পৃ. দ্রষ্টব্য] ক. প্রা. '৬৪; জ্ঞানদাস [১০৪ পৃ.—১০৫ পৃ. দ্রষ্টব্য] উ. মা. '৭৮; গোবিন্দদাস, [১০৫ পৃ.—১০৬ পৃ. দ্রষ্টব্য]; বলরাম দাস [১০৬ পৃ. দ্রষ্টব্য]।

প্রবন্ধ বিচিন্তা

দ্রুত-পঠন

'মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।
—কবি শ্রীমধুসূদন

॥ পাঠসূচী ॥

Rapid Reader 20 Marks.

The following books are recommended as rapid readers [*any one*] :

১. দেবী চৌধুরাণী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২. চারিত্র পূজা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. বৈকুণ্ঠের উইল : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪. পথে প্রবাসে : অন্নদাশঙ্কর রায়
৫. বর্তমান ভারত : স্বামী বিবেকানন্দ
৬. আরণ্যক : বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান ভারত

['বর্তমান ভারত' স্বামী বিবেকানন্দের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচনাকাল বাংলা সন ১৩০৫-০৭ সাল। এই গ্রন্থে শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের আত্মিক পরিচয় স্বামীজীর ধ্যান-সমাহিত দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, বিশ্ব-ইতিহাসের তথা মানব-ইতিহাসের আত্মিক পরিচয়ও এই কর্ম-সন্ন্যাসীর ধ্যান-নেত্রে ধরা পড়েছে। এমন বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টি—স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ—ইতিপূর্বে ভারতের কোন ইতিহাস-রচয়িতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। একদিকে মানবজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধে এবং সংবেদনশীলতায়, অন্যদিকে স্বদেশপ্রীতির পবিত্র উচ্চারণে গ্রন্থখানি অনন্য। আরো লক্ষণীয়, গ্রন্থখানির আদ্যন্ত একটি প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রবাহিত, যা সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর। ইতিহাসের এমন বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সত্যিই দুর্লভ। সেদিক থেকে পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের প্রতি ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বের প্রথম প্রবক্তা স্বামীজীই। তখনও রুশ-বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা'ও রচিত হয়নি। গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম অংশ হলো 'শূদ্র-জাগরণ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ' এবং 'স্বদেশমন্ত্র'। স্বামীজীর মতে, মানবজাতির মুক্তির স্বপ্ন শূদ্র-জাগরণের মধ্যস্থতায়ই সফল হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব-সংঘাতে ভারতবর্ষেরও সুপ্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতবর্ষের সফলতা সম্ভব হবে পাশ্চাত্যের গুণ-সম্ভার অর্জন এবং ভারতীয়তার বলিষ্ঠ প্রকাশের মধ্যস্থতায়।]

বস্তু-সংক্ষেপ

বৈদিক পুরোহিতের শক্তি

বৈদিক যুগে সাধারণের দৃষ্টিতে পুরোহিতেরা ছিলেন মহাশক্তিমান্। তাঁরা ছিলেন মন্ত্রবলে বলীয়ান্, দেবতাদের প্রীতির পাত্র এবং সেইহেতু যজমানদের শ্রদ্ধেয়। ইহলৌকিক মঙ্গল-কামনায় প্রজাবৃন্দ, এমনকি রাজন্যবর্গও ছিলেন তাঁদের দ্বারস্থ। বেদোক্ত রাজা সোম এমনি ছিলেন পুরোহিতের অনুগৃহীত। সাধারণের দৃষ্টিতে মানব-বল দৈববলের কাছে অসহায়। অথচ পুরোহিতদের হাতেই দেবতাদের সন্তুষ্টি-বিধানের মূল চাবিকাঠি। দেবতাদের প্রীতিকর আহুতিদানের অধিকার ছিল একমাত্র পুরোহিতদেরই। তাই দৈবানুগ্রহ-প্রার্থনায়, রাজকার্যে মন্ত্রণালাভে এবং স্থায়ী যশোলিপ্সা ইত্যাদি ব্যাপারে মানব-বলের কেন্দ্রীভূত শক্তি রাজাও দৈব-বলের কেন্দ্রীভূত শক্তি পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতেন। পুরোহিতেরাও নানা কঠোর আদেশ এবং সুকৌশল নীতিজালে নিয়ন্ত্রিত করতেন রাজশক্তিকে। লক্ষণীয় যে, যেসব রাজা মহাসত্র, অশ্বমেধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যস্থতায় পুরোহিতদের মধ্যে অজস্র ধন বিতরণ করেছেন, তাঁরাই পুরোহিত-প্রসাদে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক এবং পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয় ব্রাহ্মণ্য-জগতে দুটি পুণ্যশ্লোক নাম।

রাজা ও প্রজার শক্তি

প্রজা-শোষণ ছিল প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রজার শোষিত অর্থ ব্যয়িত হতো প্রতিরক্ষা, বিলাসিতা, স্বজন-পুষ্টি ও পুরোহিত-তুষ্টিতে। আর, বৈশ্যরা ছিল রাজার দুগ্ধবতী গাভী। রাজ্যশাসনে কি হিন্দুযুগে, কি বৌদ্ধযুগে, প্রজাদের কোন ভূমিকাই ছিল না। করগ্রহণ ও প্রতিরক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে রাজার ইচ্ছাধীন। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও প্রজার ইচ্ছা প্রতিফলিত হলেও তারা তখনও সুশৃঙ্খল ঐক্যশক্তির সন্ধান পায়নি।

নিয়ম-শৃঙ্খলা যে ছিল না, তা নয় ; কিন্তু তার মূলে ছিল ঋষির আদেশ ও দৈবভীতি। এবং তার স্থিতিস্থাপকতার সম্ভাবনাও ছিল অবলুপ্ত। রাজার সংগৃহীত রাজস্বে প্রজাদেরও যে অধিকার আছে কিংবা প্রজাকল্যাণেই যে রাজস্ব-লব্ধ অর্থের সার্থকতা কিংবা রাজস্বের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণে প্রজাপুঞ্জেরও যে কর্তৃত্ব থাকা দরকার—এই শিক্ষা তখনও উন্মেষিত হয়নি।

নিয়ম-শৃঙ্খলার নির্দেশ ছিল শুধুমাত্র গ্রন্থকেন্দ্রিক, তার বাস্তব রূপায়ণ ছিল সুদূর-পরাহত। ভারতের ইতিহাসে তাই অগ্নিবর্ণ, ধর্মাশোক ও ঔরঙ্গজীবের মতো রাজার সংখ্যা অগণ্য, কিন্তু রামচন্দ্র, ধর্মাশোক ও আকবরের মতো রাজার সংখ্যা অতি নগণ্য।

যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ধর্মাশোক বা আকবরের মতো রাজার শাসন আবার প্রজাপুঞ্জকে অত্যধিক পরনির্ভর ও হীনবল করে তোলে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে তখন তারা কেবলমাত্র দীর্ঘকায় শিশুতে পরিণত হয়। দেবতুল্য রাজার অধীনে বহুবাঞ্ছিত স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

স্বায়ত্তশাসন

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার প্রণেতা ছিলেন শাস্ত্র-রচয়িতা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষেরা। শাস্ত্রে যা-ই থাকুক, তার বাস্তব রূপায়ণ হয়েছে সুদূরপরাহত। শাসনকার্যে শাসিতদের মতামতের সার্বভৌমতা, যা পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যার শেষবাণী আমেরিকার সংবিধানে সোচ্চার কণ্ঠে বিঘোষিত, তা প্রাচীন ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল, এমন নয়। প্রজাকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রজাদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থার স্বাধীন অস্তিত্বের কথা গ্রীক পরিব্রাজকদের বিবরণগুলিতে এবং বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। গ্রামীণ পঞ্চায়েতে নিহিত ছিল সেই স্বায়ত্তশাসনের বীজ। পরিতাপের বিষয়, সেই বীজ ভারতের জাতীয় জীবনে অঙ্কুরিত হলো না। অবশ্য ধর্মসমাজে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের মধ্যে, নাগা-সন্ন্যাসীদের মধ্যে এখনও তার অস্তিত্বে আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

বৌদ্ধবিপ্লব ও তাহার ফল

বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতে পুরোহিত-শক্তির ক্ষয় এবং রাজশক্তির বিকাশ সূচিত হয়। বৌদ্ধযুগের পুরোহিতেরা ছিলেন সর্বত্যাগী, মঠবাসী এবং উদাসীন। শস্ত্র বা শাস্ত্রের

দ্বারা রাজশক্তিকে বশীভূত রাখার ব্যাপারে তাঁরা হলেন নিস্পৃহ। দেবতাদের প্রতিষ্ঠার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও প্রতিষ্ঠা হলো অবনত। বুদ্ধত্বে সকল মানুষের সমান অধিকার। এবং ইন্দ্র-ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাদের স্থান নির্দিষ্ট হলো সেই বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত নরদেবতাদের পদতলে।

কাজেই, রাজশক্তি আর যাজকশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন রইলো না। সে হয়ে উঠলো স্বচ্ছন্দচারী। এরপর প্রাচীন ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-জনপদের স্থানে মাথা তুলে দাঁড়ালো দিক্‌দিগন্ত-ব্যাপী অপ্রতিহতশাসন বিশালকায় সাম্রাজ্য। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাল শেষ হলো ; এলো চন্দ্রগুপ্ত ও ধর্মাশোকের যুগ। বৌদ্ধযুগের সম্রাটদের শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। এ যুগের অন্তিম পর্বে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুত ইত্যাদি জাতির অভ্যুত্থানে ভারতের রাজদণ্ড তার পূর্বগৌরব হারায়। সেই সুযোগে পুনরভ্যুত্থিত ব্রাহ্মণ্যশক্তি রাজশক্তির সঙ্গে গড়ে তোলে সহযোগিতার এক নতুন সম্পর্ক। ক্ষত্রিয়ের আর সেই মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্য নেই, ব্রাহ্মণের নেই সেই তপস্যালব্ধ ব্রহ্মশক্তি। উভয়ের এই অশুভ মিলনে শত্রুপীড়ন, মানব-শোষণ এবং ধনসম্পদ-অপহরণ ইত্যাদি বহু গর্হিত কর্মের বন্যায় ভারতের মাটি প্লাবিত হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রহসনে, ভাটচারণাদির স্তাবকতায় ও মন্ত্রতন্ত্রের ব্যভিচারে যখন ভারতের কেন্দ্রীয়শক্তি হীনবল, ঠিক তখনই তার মাথার ওপর ভেঙে পড়ে বহিরাগত মুসলমান-আক্রমণের প্রবল বন্যা।

ভারতে পুরোহিত-শক্তির সঙ্গে রাজশক্তির সংঘাতের সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে তার তীব্রতা হ্রাস পায় এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মহাপ্লাবনে পুরোহিত-শক্তি তার পূর্ব-প্রাধান্য হারিয়ে বিরুদ্ধ প্রতিবেশে কোনপ্রকারে তার অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে হুনসম্রাট মিহিরকুলের ভারতবিজয়ের পর তার পূর্ব-প্রাধান্যের পুনর্স্থাপন সম্ভব হয়। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার বিদ্যাবৈভবহীন বর্বর বাহিনীর বীভৎস রীতিনীতির প্রভাবে মন্ত্রতন্ত্রের বিকৃত পন্থানুসরণে সমগ্র আর্যাবর্তকে হতবিদ্য, হতবীর্য, হতাচার পুরোহিত-শ্রেণী এক বর্বরাচারের নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করে। তার ফলে মুসলমান-বিজয়ের পথ এত সহজ এবং সুগম হয় এবং পুরোহিত-শক্তির অধঃপতন স্থায়িত্ব লাভ করে।

মুসলমান অধিকার

মুসলমান-রাজত্বে পুরোহিত-শক্তির পুনরভ্যুত্থান ছিল অসম্ভব। হজরত মহম্মদের সংগ্রাম তো ছিল ঐ শক্তির বিরুদ্ধেই। মুসলমান-শাসনে রাজা স্বয়ং প্রধান পুরোহিত। ইহুদী বা খ্রীস্টান জাতি মুসলমানদের কাছে মূর্তি-উপাসক ও বলিদানপ্রথার অনুরক্ত হিন্দুদের মতো সর্বৈব ঘৃণ্য নয়।

একদিকে প্রবল ভিন্নধর্মী রাজশক্তি, অন্যদিকে সংস্কৃতের পরিবর্তে আরবী পার্সী এবং মনু প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রের স্থানে কোরানের আধিপত্য—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে পুরোহিত-শক্তি যাপন করতে লাগলো নিতান্ত নিষ্প্রভ জীবন এবং রাজশক্তির

করুণায় বিবাহাদি সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে সে কোনমতে বাঁচিয়ে রাখলো নিজের অস্তিত্ব।

বৈদিক যুগে ও তার সন্নিহিত উত্তরকালে পুরোহিত-শক্তির পেষণে রাজশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়নি। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর পুরোহিত-শক্তির বিনাশের ফলে ভারতে রাজশক্তির পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ-সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপন—এই দু'য়ের মধ্যে রাজপুত-জাতির মধ্যস্থতায় রাজশক্তির পুনরভ্যুত্থানের প্রয়াস পুরোহিত-শক্তির নবজীবনের চেষ্টার কারণে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সেই সুযোগে মৌর্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপা রাজারা তাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়। কিন্তু পুরোহিত-শক্তির গৌরব-সূর্য হলো চির-অস্তমিত। এ যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ তাই কেবল রাজায়-রাজায়। এ যুগের অন্তিম লগ্নে মহারাষ্ট্র এবং শিখ-শক্তির মধ্যস্থতায় হিন্দুশক্তির পুনর্জাগরণের মধ্যে পুরোহিত-শক্তির ভূমিকা ছিল কার্যতঃ নিষ্প্রভ।

ইংলণ্ডের ভারতাধিকার

ভারতের মৃত্তিকায় কয়েক শতাব্দীকাল মুসলমান-শক্তির সাম্রাজ্য-শাসনের পর তার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটলো। সে ইংরেজ-শক্তি।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অফুরন্ত সম্পদ প্রবল বৈদেশিক শক্তিকে আকৃষ্ট করেছে। বৈদেশিক শক্তির ভারত-বিজয় তাই কোন নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু ইংরেজ-জাতির ভারত-বিজয় নানা দিক দিয়ে অভিনব।

এতাবৎকাল ভারতবাসী রাজশক্তিকে পুরোহিত-শক্তির কাছে নতজানু হতে দেখেছে, প্রবল রাজশক্তির সম্মুখে দুর্বল প্রজার অসহায়তা প্রত্যক্ষ করেছে, বিত্তশালী বৈশ্য [বণিক] সম্প্রদায়কে রাজার—এমনকি, রাজকুটুম্বদের ঔদ্ধত্যের কাছে ভয়ত্রস্ত জীবনযাপন করতে দেখে এসেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য সংঘবদ্ধ হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে সাতসমুদ্র তেরো নদী অতিক্রম করে বুদ্ধি ও অর্থবলে এদেশের হিন্দু-মুসলমান রাজাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকায় পরিণত করে এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করবে এবং এদেশের সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীদের শাসন-যন্ত্রের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে রূপান্তরিত করবে—ভারতবাসীর কাছে তা ছিল স্বপ্নের অতীত।

বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়

সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই ত্রিবিধ গুণের তারতম্যে পৃথিবীর সভ্য-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের উদ্ভব। বিশ্ব-ইতিহাসের চরম নির্দেশই হলো, প্রাকৃতিক নিয়মে এই চারটি বর্ণ পর্যায়ক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করবে।

চীন, সুমের, বাবিল, মিশর, খল্‌দে, আর্য, ইরান, ইহুদী, আরব প্রভৃতি জাতির সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-শ্রেণীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় যুগের কর্তৃত্ব সবলে গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তি। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সমাজনেতৃত্বের রশিগাছি গ্রহণ করে বাণিজ্য-বৃত্তি বৈশ্যজাতি। প্রাচীন

টায়র, কার্থেজ এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে ভেনিসের মতো বাণিজ্যপ্রাণ দেশেও বৈশ্যশক্তির যথার্থ অভ্যুদয় ঘটেনি। ঐ সব দেশে প্রাচীন রাজকুলের বংশধরেরাই দাসবর্গের সহায়তায় বাণিজ্য-কার্য পরিচালনা করতেন। মিশর প্রভৃতি দেশে পুরোহিত-শক্তি স্বল্পকালের মধ্যেই রাজশক্তির আনুগত্য স্বীকার করে। চীন এবং তিব্বতে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ভারতে রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের বিকাশ বহু বিলম্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু ইহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি পুরোহিত-শক্তিকে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পদানত করতে ব্যর্থ হয়। বৈশ্য-সম্প্রদায়ও সে দেশে প্রাধান্য-বিস্তারে বিফল হয়েছে। পুরোহিত-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী সাধারণ ইহুদী প্রজাপুঞ্জ খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্ম-সংঘর্ষে এবং প্রবল রোমান সাম্রাজ্যের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পূর্বে রাজশক্তির সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে লুপ্ত পুরোহিত-শক্তির মতো বহু রাজমুকুট নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবল আক্রমণে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েছে, কত রাজদণ্ড ভেঙে পড়েছে চিরদিনের মতো। মাত্র কয়েকটি সুসভ্য দেশে বৈশ্যশক্তির করুণার পাত্র হয়ে রাজ-সিংহাসন কোনমতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে।

এই নবোদিত বৈশ্যশক্তি নিঃসন্দেহে এক মহাশক্তি। তার প্রবল পুচ্ছতাড়নায় সমগ্র বিশ্ব আজ প্রকম্পিত। দেশ-দেশান্তরের সম্রাটবৃন্দ তার অঙ্গুলিহেলনে কম্পমান। এই শক্তিশালী মহাতরঙ্গের ফেনশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত ইংলণ্ডের সিংহাসন।

কাজেই, ইংলণ্ডের ভারত-বিজয় বাইবেল-কথিত ভারত-জয় বা মুসলমানদের ভারত-বিজয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ঘটনা। খ্রীস্টধর্ম, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, সেনাবাহিনী, তূরীভেরীর নিনাদ, আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিংহাসন—এ সবের পশ্চাতে আছে বস্তুবাদী ইংলণ্ড; তার জয়ধ্বজা কলের চিমনি, তার বাহিনী পণ্যপোত, তার যুদ্ধক্ষেত্র পণ্যবীথিকা এবং তার সম্রাজ্ঞী স্বয়ং ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী।

ইংলণ্ডের ভারত-বিজয় এক অতি অভিনব ব্যাপার। এবং তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

পুরোহিত-শক্তি

পৃথিবী পর্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার বর্ণের ভোগের জন্যে প্রতিশ্রুত। প্রতি বর্ণের রাজত্বকালে কিছু হিতকর এবং কিছু গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পুরোহিত-শক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবল। কাজেই, পুরোহিতগণের মনোজগতেই বিশ্বের বিদ্যাচর্চার প্রথম আবির্ভাব। আধ্যাত্মিক জগতের বার্তাবহ ও পথপ্রদর্শক তাঁরা। সেই হেতু তাঁরা মানব-সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক। তাই তো দেশে দেশে দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত। কায়িক শ্রমের মাধ্যমে তাঁদের অন্ন-সংস্থান করতে হয় নি। সর্বভোগের অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য। পুরোহিতকুল দেবতার মুখস্বরূপ; কাজেই, সর্বভোগ পুরোহিতগণেরও প্রাপ্য। কায়িক শ্রমমুক্ত পুরোহিত-শ্রেণীর

চিন্তাশীলতায় পৃথিবীর জ্ঞানের উন্মেষ। একদিকে শক্তিমদমত্ত ক্ষত্রিয়-সম্রাট, অন্যদিকে নিরীহ অসহায় প্রজাপুঞ্জ; উভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান তপোবলসহায় পুরোহিত, যিনি তাঁর অনুশাসনে ক্ষত্রিয়ের শাসন-ত্রাসন ও শোষণ-পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করেন নিঃসহায়, নিঃসম্বল প্রজাপুঞ্জকে। সভ্যতার বিকাশের মূলেও এই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অবদান অসামান্য। পশুত্বের ওপর দেবত্বের বিজয়, জড়ের ওপর চেতনের অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জয়যাত্রা—এ সবই পুরোহিত-শ্রেণীর অবদান। পুরোহিত জড়-চেতনের প্রথম বিভাজক, ইহলোক-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মানবের বার্তাবহ এবং রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন। তাঁর তপোবলে, বিদ্যাবৈভবে ও ত্যাগমন্ত্রে বহু কল্যাণের উদ্ভব। এই কারণে পুরোহিত-শ্রেণীর কাছে মানব-সভ্যতা ঋণী।

কিন্তু যে কৃতিত্বের গৌরবে পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব, তাই-ই হলো শেষ পর্যন্ত তার পতন এবং বিনাশের অন্যতম কারণ। স্থূল ব্যাপার মাত্রই প্রত্যক্ষ এবং সর্বজনগ্রাহ্য। তাতে ব্রাহ্মণ নিস্পৃহ। তার শক্তির আধার এবং বিকাশ-কেন্দ্র কেবল মানসিক। শব্দ, উচ্চারণ, যপ-তপ ইত্যাদি, যা ব্রাহ্মণের উপজীব্য, তা এক অপ্রত্যক্ষ আলো-আঁধারী রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈর-নির্যাতন ইত্যাদিকে ব্রাহ্মণ দূর করতে চাইলো তার তপোলব্ধ মন্ত্রশক্তি দিয়ে। স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদিকে হাতিয়ার করে সে ইষ্টসিদ্ধির ঘোর তামসিকতায় হলো মগ্ন। কোথায় গেল হৃদয়ের সেই উদার প্রসারতা, আত্মিক সমুন্নতি, স্বর্গীয় সরলতা, মহিমান্বিত ত্যাগ ও তিতিক্ষা? তার স্থানে দেখা গেল অনুদার সংকীর্ণতা, নিদারুণ বহ্নিজ্বালাময় ঈর্ষা, অসহিষ্ণুতা, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য-লালসা, স্বার্থপরতা এবং কলুষকীর্ণ কপটতা। তার বংশধরেরাও সেই পৈতৃক তামসিকতার হলো সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

অধঃপতিত উদ্দেশ্যহীন পুরোহিত-শক্তি এইভাবে উর্ণাকীটের মতো আপন কোষে হলো আপনি আবদ্ধ। অপরকে শাসন করবার জন্যে তার নির্মিত শৃঙ্খল প্রতি পদে তার নিজের গতিশক্তিকে করলো ব্যাহত। সমাজের বহিঃশুদ্ধির জন্যে বিধিনিষেধের আচার-জালে সে নিজেই হলো আপাদমস্তক বন্দী। এই জাল ব্যতীত পুরোহিতের অস্তিত্বই বিপন্ন। এমনকি, যারা উন্নতি-বাসনায় ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেন, সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁদের পৌরোহিত্যের অধিকার কেড়ে নেন। য়ুরোপীয় বেশভূষা ও আচার-অনুষ্ঠানমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে সমাজ বিশ্বাসী নয়। ফলে, এদেশে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য এবং তার অনুষঙ্গরূপে য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থ-সাধনা যতই যুব-সমাজে সংক্রামিত হচ্ছে, ততই পুরোহিত-বৃত্তির বিনাশ-লগ্ন আসছে ঘনিয়ে।

যেমন, গুজরাট। সেখানে ব্রাহ্মণ-সমাজের দুটি ভাগ সৃষ্টি হয়েছে। পুরোহিত-বৃত্তিধারীরা পুরোহিত এবং ভিন্ন বৃত্তিধারীরা 'নাগর ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। অথচ, পুরোহিত-বৃত্তিধারীরা এবং টোলের অধ্যাপকেরা নিজের সন্তান-সন্ততিবর্গকে নাগর ব্রাহ্মণদের পুত্রদের মতো পাশ্চাত্য

শিক্ষাদীক্ষা দান করে রাজকর্ম কিংবা কোন অর্থকরী বৃত্তির দিকে পরিচালিত করতে ব্যস্ত। এ হচ্ছে স্বহস্তে নিজের মৃত্যুর পথ নিজেই রচনা করার প্রয়াস। এ প্রয়াস যে-কোন অভিজাত জাতির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এবং বাঞ্ছিত ; এবং তা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ।

প্রাকৃতিক নিয়মে, শক্তি-সংগ্রহের মতো শক্তি-বিকিরণও প্রয়োজন। শরীরের হৃৎপিণ্ড যদি রক্তসঞ্চালন না করে কেবল রক্ত-সঞ্চয়ে লিপ্ত হয়, তবে সে শরীরের মৃত্যুলগ্ন সমাসন্ন। একথা যে-কোন জাতি বা সমাজ সম্পর্কে সমান সত্য।

ক্ষত্রিয়-শক্তি

পুরোহিত যেমন সমস্ত বিদ্যার কেন্দ্রবিন্দু, রাজা তেমনি সমস্ত পার্থিব শক্তির কেন্দ্রভূমি। রাজার মধ্যে ক্ষত্রিয়-শক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ। এই ক্ষত্রিয়-শক্তি দোষগুণের এক আশ্চর্য সমাহারে সংগঠিত। সে একদিকে যেমন নিরীহ অসহায় ব্যক্তির প্রাণ-সংহার করে, তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, তেমনি অন্যদিকে সে শরণাগত অনুগতদের প্রাণ রক্ষা করে। নতজানু হয়ে রাজার আদেশ শিরোধার্য করাই সব দিক দিয়ে নিরাপদ। সম-প্রয়াস, সম-অভিপ্রায় এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যক্তিস্বার্থ-ত্যাগ প্রাচীনকালে তো বটেই, আধুনিক কালেও দুর্লভ। সেইজন্যেই রাজপদের সৃষ্টি। রাজা সেই কল্পিত সমতা-বিধানের কেন্দ্রীয় শক্তি। ব্রাহ্মণ-শাসনে যেমন সমাজের জ্ঞানেচ্ছার উন্মেষ, ক্ষত্রিয়-শাসনে তেমনি সমাজের ভোগেচ্ছা ও তার আনুষঙ্গিক বিদ্যাসমূহের সৃষ্টি ও পুষ্টি।

প্রবল প্রতাপান্বিত, উন্নতশির, মহিমান্বিত সম্রাটের পক্ষে পর্ণ-কুটিরবাস সাজে না, সাধারণ ভোজ্যে তার রসনার পরিতৃপ্তি নেই। তাই রাজপ্রাসাদ এবং রাজভোগের সৃষ্টি। রাজশরীরকে কোন পাপ বা অশুচি স্পর্শ করেনা। বহু দেশে রাজশরীরের বিনাশ নেই। রাজার উপভোগ্য বস্তু-লাভেচ্ছা, এমনকি তার প্রতি দৃষ্টিপাতও সাধারণের পক্ষে মহাপাপ। রাজার উপভোগের জন্যে সুরম্য অট্টালিকা, মনোহর উপবন, মনোরঞ্জন চিত্রসম্ভার, ভাস্কর্যরত্নাবলী, মনোমুগ্ধকর সংগীত-লহরী এবং জাঁকজমকপূর্ণ ও সুখকর বসনভূষণের সৃষ্টি। এই যুগে লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবীকে পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য পরিত্যাগ করে স্বল্পশ্রমসাধ্য, সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রসূত শিল্পকলায় আত্মনিয়োগ করতে দেখা গেল। এইভাবে লুপ্ত-গৌরব গ্রামের পরিবর্তে আবির্ভাব ঘটলো নগরের।

ভারতবর্ষে ভোগবাসনায় পরিতৃপ্ত মহারাজেরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে অরণ্যের শ্যামল ছায়ায় অধ্যাত্ম-চর্চায় নিমগ্ন হয়েছেন। সেই বৈরাগ্য ও গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলশ্রুতি হলো মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বিষয়-বৈরাগ্য। কর্মকাণ্ডের বিলোপে পুরোহিত-সম্প্রদায় বৃত্তিনাশের আশঙ্কায় হলো রীতিনীতি-রক্ষায় বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে, ক্ষাত্রশক্তি ও মন্ত্রশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতীক জনকাদি ক্ষত্রিয়গণের কাছে তারা তেমনি নিষ্প্রভ। কিন্তু স্মরণীয়, সভ্যতার শৈশবলগ্নে সমাজের কল্যাণের জন্যে পুরোহিত-শক্তি এবং ক্ষত্রিয়-শক্তি—উভয় শক্তিরই প্রয়োজন ছিল। ক্রমে সভ্যতা তার যৌবনাবস্থায়

উপনীত হলে তার প্রয়োজন লুপ্ত হয়। রাজা প্রজার পিতৃস্বরূপ এবং প্রজা রাজার সন্তানতুল্য। এদেশের শিক্ষাই হলো, পুত্র ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হলে তার সঙ্গে পিতার মিত্রবৎ আচরণ বিধেয়। কিন্তু সমাজ-শিশু কি কখনোই ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসে সাক্ষ্য আছে যে, সব সমাজেই শক্তিমান্ শাসকের সঙ্গে শাসিত সাধারণের একদিন নয় একদিন সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষের জয়পরাজয়ের ওপরেই সমাজের প্রাণের বিকাশ এবং সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ দেশ। এদেশে সব বিপ্লবই ধর্ম-কেন্দ্রিক। ফলে, এই ধর্মসর্বস্ব দেশে পুরুষকার অবহেলিত। অর্থহীন শব্দসমূহের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, তবে কে আর বাসনাসিদ্ধির জন্যে কষ্টসাধ্য পুরুষকার অবলম্বন করে? এ হলো সমাজের এক দুরারোগ্য ব্যাধি এবং এই উদ্যমবিহীনতাই মৃত্যুর নামান্তর। তাই তো ভারতে প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকের আবির্ভাব। পরবর্তীকালে তার পরিণামে পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের উদ্ভব, যার প্রবল প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈন সদাচারের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষকে নিদারুণ অত্যাচার এবং রক্তপাতের হাত থেকে কে রক্ষা করতো? আবার, বৌদ্ধ সদাচার যখন মহা অনাচারে পরিণত হলো এবং সাম্যবাদের আতিশয্যে যখন ভারতবর্ষে নানা বর্বরজাতির পৈশাচিক নৃত্য শুরু হলো, তখন যথাসম্ভব পূর্বাবস্থার পুনরুদ্ধারের জন্যে আবির্ভূত হলেন যুগনায়ক শঙ্কর এবং রামানুজ। তারপর আবির্ভূত হয়েছেন কবীর, নানক, চৈতন্য এবং স্থাপিত হয়েছে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ। এই সব মহামানব এবং মহাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া ভারতে হিন্দু-সমাজের অস্তিত্বই হতো বিপন্ন।

গ্রহণ এবং ত্যাগ একটি অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম। যে সমাজ কেবল গ্রহণ করে, অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে না, তার বিনাশের আর বিলম্ব নেই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন

সমষ্টির জীবনেই ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ—এই সত্যই জগতের মূল ভিত্তি। সমষ্টির সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়ে অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টি-জীবনের কর্তব্য। সমষ্টির বিরোধিতাই মৃত্যু, সমষ্টির সহযোগিতায় অমরত্ব। প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে প্রতারণার শক্তি কারও নেই। উপরিভাগের জঞ্জালরাশির তলদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রেম নিঃস্বার্থ সমাজ-জীবনকে প্রাণস্পন্দিত করে নিয়ত বহমান। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সমাজও সর্বংসহ। কিন্তু সেই সর্বংসহ সমাজ একদিন নয় একদিন সহসা জেগে ওঠে এবং তার প্রবল তাড়নায় যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত মলিনতা ও স্বার্থপরতা সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

অথচ পাশব প্রবৃত্তির বশে মানুষ মনে করে যে, প্রকৃতির চোখে ধুলো দিয়ে সে স্বার্থসাধনে সক্ষম; এবং তাই-ই তার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু স্মরণীয় যে, বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনজনবলবীর্য, যা প্রকৃতি মানুষের মধ্যে সঞ্চয় করেন, তা পুনঃসঞ্চারের জন্যে। সঞ্চিত ধনে স্বার্থবুদ্ধির উন্মেষ, তাতেই সূচিত হয় মানুষের সর্বনাশ।

রাজা প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্র। রাজার শক্তিসঞ্চয় কেবল শক্তি-সঞ্চারের জন্যে। ভাগবত-কথিত বেন রাজার মতো যদি তিনি নিজেতে দেবত্ব আরোপ করে প্রজা-পালনের পরিবর্তে প্রজাপীড়নে মেতে ওঠেন, তাহলে রক্ষকের স্থান গ্রহণ করে ভক্ষক। তখন রাজা এবং প্রজা—উভয়েই হতবল হয়ে সমাজের সামগ্রিক দুর্বলতা ডেকে আনে এবং অন্যতর শক্তিমান্ জাতির আক্রমণের শিকার হয়। এইভাবে কত রাজছত্র ভেঙে পড়েছে এবং কত সিংহাসন ইতিহাসের যাদুঘরে স্থান পেয়েছে।

বৈশ্যশক্তি

ক্ষত্রিয়-শক্তির পীড়ন-দমনের প্রতিক্রিয়ায় বৈশ্যশক্তি নামক মহাশক্তির আবির্ভাব। একদিন বিদ্যাবলকে হাতিয়ার করে ব্রাহ্মণ চেয়েছিল সমাজ-শাসন করতে। কিছুদিন পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব বজায় থাকে। তারপর অস্ত্রবলকে হাতিয়ার করে ক্ষত্রিয় সমাজ-শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করলো। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়-প্রভুত্ব চললো কিছুকাল। তারপর এলো বৈশ্যশক্তি। তার হাতিয়ার অর্থশক্তি। তা দিয়ে সে ব্রাহ্মণের বিদ্যাবল, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবল এবং শূদ্রের শ্রমশক্তিকে যথেচ্ছ ক্রয় করে বিশ্ব-ব্যাপী বাণিজ্যের মধ্যস্থতায় বিপুল পরিমাণ মুনাফা লুণ্ঠন করছে। পৃথিবী আজ বৈশ্য-শক্তির পদানত।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বে যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রসার, বৈশ্য-প্রভুত্বে তেমনি বিস্তার ধন-সম্পদের। সেই ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে বৈশ্যকুল তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র সম্পর্কে সদাসন্ত্রস্ত এবং যূথবদ্ধ।

বৈশ্য-প্রভুত্বে বাণিজ্য আজ বিশ্বপ্লাবিত। তার মধ্যস্থতায় এক দেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলাকৌশল অনায়াসে দেশান্তরে বাহিত এবং সঞ্চারিত হচ্ছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বে যে রক্ত সমাজ-হৃৎপিণ্ডে সঞ্চিত হয়েছিল, তা আজ বণিক-সম্প্রদায়ের ধমনী-যোগে সারা পৃথিবীতে সঞ্চারিত। বৈশ্য-প্রভুত্ব ছাড়া সভ্যতার এই বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ কখনোই সম্ভব হতো না।

শূদ্র-জাগরণ

আর, যাদের শারীরিক শ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের আস্ফালন ও বৈশ্যের ঐশ্বর্য, সেই শূদ্র সম্প্রদায়ের স্থান এতদিন ছিল সবার নীচে। সমাজের সর্বস্ব হয়েও তারা সমাজের ঘৃণিত, অবহেলিত। ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', 'ভারবাহী পশু'বৎ শূদ্র-সমাজ এক বিদ্যাহীন আলোহীন অন্ধকারে এতকাল ছিল নিমজ্জিত।

এদেশে ইংরেজ-রাজত্বে এ দুর্ভাগ্যের অংশীদার কেবল শূদ্ররাই ছিল না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সবারই ললাট-লিখন ছিল ভারবাহী পশুত্ব—তমোময় শূদ্রত্ব। সমগ্র জাতি এক দীপ্তিহীন, উদ্যোগহীন, শক্তিহীন, মর্যাদাহীন, প্রীতিহীন, আশাহীন, গৌরবহীন অন্ধকারে ছিল নিমজ্জিত। ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, সবলের পদলেহন ও দুর্বলের নির্যাতন হয়ে উঠেছিল জাতীয় চরিত্র। ঐশ্বর্য-প্রদর্শন, স্বার্থসাধন, অজ্ঞানতা, পৈশাচিক

আচার-নিষ্ঠা, পরদাসত্ব, বিজাতীয় অনুকরণ, কটুভাষণ, হীন স্তাবকতা, অশ্লীলতা-বিস্তারের মধ্যেই এ জাতি খুঁজেছে তার জাতীয় সার্থকতা। শূদ্রপূর্ণ এ দেশের শূদ্ররা ছিল বিদ্যাবঞ্চিত এবং স্বজাতিবিদ্বেষী। যে ঐক্যশক্তিতে সমাজ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং যাতে সমাজের পরমার্থ সাধিত হয়, তা ছিল সুদূরপরাহত।

কালপ্রভাবে দেশে দেশে ব্রাহ্মণদের শূদ্রত্বে এবং শূদ্রদের ব্রাহ্মণত্বে উত্থানপতন সংঘটিত হচ্ছে। রোম-পদানত য়ুরোপ ক্ষাত্রতেজে দীপ্ত, মহাবল চীন শূদ্র-তমসায় ম্লান, সদ্য-জাগ্রত জাপান উচ্চবর্ণত্ব অধিকারে সক্রিয় এবং গ্রীস-ইতালি ক্ষত্রিয়ত্বে ঊর্ধ্বমুখী এবং স্পেন ও তুরস্ক ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী। কিন্তু বিশ্বের শূদ্র তার শূদ্রত্বে একদিন সমাজে একাধিপত্য বিস্তার করবে। সেদিন আগত ঐ! তার পরিণাম চিন্তা করে সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ সেই আসন্ন বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।

পাশ্চাত্য জগৎ শূদ্রকুলে জাত অসাধারণ ব্যক্তিকে এতকাল আভিজাত্যে বরণ করে নিয়েছে। তাতে উচ্চশ্রেণী লাভবান হয়েছে; কিন্তু বঞ্চিত শূদ্র-সম্প্রদায় থেকেছে চির-বঞ্চিত। বশিষ্ঠ, নারদ, জাবাল, বেদব্যাস—এঁরা জন্মসূত্রে উচ্চবংশোদ্ভব ছিলেন না। কৃপ, দ্রোণ, কর্ণ—এঁদেরও পিতৃ-পরিচয় ছিল অপরিজ্ঞাত। অথচ উত্তরকালে তাঁদের কেউ ব্রাহ্মণত্বে, কেউবা ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু যে সম্প্রদায়ে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সম্প্রদায় কি তাতে কিছুমাত্র লাভবান হয়েছিল? হয়নি। আধুনিক ভারতবর্ষের চিত্র অন্যরূপ। শূদ্রসন্তান মহাপণ্ডিত কিংবা কোটিপতি হলেও তার স্বসমাজ-ত্যাগের কোন সুযোগ নেই। কাজেই, বিদ্যাবান বা বিত্তবান শূদ্রসন্তানের বিদ্যা বা বিত্ত স্বশ্রেণীর উন্নতিকর্মে আজ সার্থকতা লাভ করছে। কিন্তু যুগযুগান্তরের নিষ্পেষণে হতাশাক্লিষ্ট শূদ্র-সম্প্রদায়ের নেই চারিত্রিক দৃঢ়তা, নেই অপরাজেয় অধ্যবসায়।

স্মরণীয় যে, সমাজ-নেতৃত্বের হাতিয়ার বিদ্যাবল, বাহুবল বা ধনবল—যাই হোক না কেন, তার শক্তির আধার হলো প্রজাপুঞ্জ। সেই প্রজাশক্তি থেকে বিচ্ছিন্নতায় সমাজ-নেতৃত্ব দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু মায়ার এমনি খেলা, প্রজাশক্তির সহায়তায় নেতৃত্ব লাভ করে নেতৃ-সম্প্রদায় সেই শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করে। প্রজাসহায় ক্ষত্রিয়-শক্তির হাতে পুরোহিত-শক্তির পরাভবের মূলে ছিল প্রজাশক্তি থেকে তার দুস্তর বিচ্ছিন্নতা। আবার, ক্ষত্রিয়-শক্তি যখন প্রজাশক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তখনই সে পরাজিত হয়েছে প্রজাসহায় বৈশ্যশক্তির হাতে। বর্তমানে সেই বৈশ্যশক্তি অনাবশ্যক-জ্ঞানে প্রজাশক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত। বলাবাহুল্য, এই বিচ্ছেদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার মৃত্যুবীজ।

অন্যদিকে, সাধারণ প্রজারা সমাজ-শক্তির আধার হয়েও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধান সৃষ্টি করে সমাজ-নেতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কি পশু-সমাজে, কি মানব-সমাজে সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতিই পারস্পরিক ঐক্য-বিধায়ক। স্বজাতি-প্রীতি ও ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির ঐক্যের কারণ; কার্থেজ-বিদ্বেষ থেকে রোমের, কাফের-বিদ্বেষ থেকে আরবের, মুর-বিদ্বেষ থেকে স্পেনের,

স্পেন-বিদ্বেষ থেকে ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ থেকে ইংলণ্ড ও জার্মানীর এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ থেকে আমেরিকার জাতীয় ঐক্য এবং উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। সমষ্টির স্বার্থের খাতিরে ব্যষ্টির স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত। কারণ, স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। সমষ্টির প্রয়াস ভিন্ন আত্মরক্ষাও অসম্ভব। অথচ ভারতবাসী-মাত্রেরই স্বার্থচিন্তা হলো যেন-তেন-প্রকারেণ উদরপূর্তি এবং বংশবৃদ্ধি।

ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বে যেমন কতকগুলি উপকার সাধিত হয়েছে, তেমনি অপকার সাধিত হয়েছে অনেক বেশী। মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর এমন শক্তিশালী ও সর্বব্যাপী শাসন-যন্ত্র আর কখনও পরিচালিত হয়নি। কিন্তু বৈশ্য-শাসনের ফলে দেশ-দেশান্তরের পণ্যরাশির সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশিও ভারতবর্ষে আনীত হচ্ছে; তার কোন্‌টি কল্যাণকর, কোন্‌টি অকল্যাণকর—সে বিষয়ে ভারতবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবু জাতীয় ও বিজাতীয় ভাব-সংঘাতে এই দীর্ঘসুপ্ত জাতির কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙছে। সদ্য-জাগ্রত এই জাতি ভুল করুক, ক্ষতি নেই। কারণ, ভ্রমই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। নিয়মের বন্ধনে বন্দী মানুষের ভ্রমে পতিত হবার আশঙ্কা থাকে না। মননশীল জীবন্ত মানুষের পক্ষে ভুল করাই স্বাভাবিক। অথচ সেই চিন্তাশীলতার বিলুপ্তিতে ভারতবর্ষে অন্ধ তামসিকতাময় যুগের সূচনা। কি ধর্মনেতা, কি সমাজনেতা—সবাই জাতিকে অন্ধ তামসিকতায় নির্বাসিত করার জন্যে নিয়মের পর নিয়মের নিগড় রচনায় সদাব্যস্ত। কিন্তু নিয়মের নিগড় যে জাতির সর্বনাশ ডেকে আনে, সে কথা কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না।

অপ্রতিহত-শক্তি স্বৈরাচারী সম্রাটের শাসনে কোন প্রজারই রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু প্রজানিয়ন্ত্রিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র যখন অন্য কোন জাতির ভাগ্যবিধাতা হয়, সেখানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে রচিত হয় বিশাল ব্যবধান। যে শক্তি বিজিত জাতির কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হয়ে সুসম্পর্ক স্থাপনের আদর্শ হতে পারতো, তা শেষ পর্যন্ত বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখবার প্রাণান্তকর প্রয়াসে ব্যর্থ হয়। তার প্রধান দৃষ্টান্ত হলো রোম-সাম্রাজ্য। ইতিহাস সাক্ষী, রোম-শাসনে রোমের চেয়ে রোমের অন্যান্য বিজিত জাতির অধিক কল্যাণ সাধিত হয়েছিল। কোন কোন ইংরেজ ভারতবাসীকে কৃষ্ণবর্ণ, 'নেটিভ' বা অসভ্য বলে ঘৃণা করে। কিন্তু ভারতবাসীর মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী ঘৃণাবুদ্ধি নিত্যক্রিয়াশীল। ক্ষত্রিয়-সহায় ব্রাহ্মণ-শক্তি শূদ্রদের জিহ্বাচ্ছেদ করেছে, শরীর-ভেদ করে তাদের উত্থান-শক্তি অপহরণ করেছে। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের মারাঠাজাতির স্তবস্তুতির পেছনে সেই মনোভাবেরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

যাই হোক, ইংরেজ-জাতির ধারণা, ভারত-সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদের সামূহিক সর্বনাশের সম্ভাবনা। তাই যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতে ইংরেজ-অধিকার অটুট রাখা চাই। সেই অধিকার-রক্ষার সর্বোত্তম উপায় হলো ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজ-গৌরব প্রোথিত করা। সেজন্যে ইংরেজরা বহুতর কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু যে শক্তি, অধ্যবসায়, ঐক্য এবং বিজ্ঞান-সহায় বাণিজ্য-বুদ্ধিবলে

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের প্রধান পণ্য-বীথিকায় পরিণত হয়েছে, যতদিন ইংরেজ-জাতির ঐ গুণগুলি বিদ্যমান থাকবে, ততদিন ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য-লুপ্তির কোন কারণ নেই। কাজেই, যতদিন ঐ গুণগুলি বিদ্যমান থাকে, ততদিন নিরর্থক ইংরেজ-গৌরব-প্রচারে বিপুল শক্তিক্ষয়ের পরিবর্তে তা প্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হলে তাতে শাসক ও শাসিত উভয়েরই মঙ্গল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ

বহিঃশক্তির সংঘর্ষে সম্প্রতি ভারতের সুপ্তিভঙ্গ ঘটছে। তার ফলেই সম্ভব হচ্ছে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। তার একদিকে জড়বিজ্ঞানবুদ্ধি-নির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো জলুস্, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের শক্তিমত্তা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, শক্তির দম্ভ, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ; অন্যদিকে ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং অলৌকিক অধ্যাত্ম-বিস্ময়। একদিকে বিচিত্র বেশবাস, বিচিত্র পানভোজন, বিচিত্র যানবাহন, বিচিত্র ভাব এবং বিচিত্র ভঙ্গী; অন্যদিকে ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন এবং সমাধি-আত্মানুসন্ধান। একদিকে স্বার্থপর স্বাধীনতা, অন্যদিকে কঠোর আত্ম-শাসন। পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি; আর, ভারতের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত এই দুই ভাব-তরঙ্গের মাঝখানে দোদুল্যমান।

পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় মণ্ডিত আধুনিক ভারত পতিপত্নী-নির্বাচনে চায় অবাধ স্বাধীনতা; অন্যদিকে ব্রত-উপবাসক্লিষ্ট, ত্যাগনিষ্ঠ প্রাচীন ভারত বলে, বিবাহ প্রজা-উৎপাদনের জন্যে—নিছক ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে নয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে বিবাহ-বিধি প্রচলিত, তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুখের জন্যে তা পরিহার করা অনুচিত। আধুনিক ভারতের মতে, পাশ্চাত্য বলবীর্যলাভের উপায় হলো পাশ্চাত্যের ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন। প্রাচীন ভারতের মতে, তা নিতান্তই মূঢ়তা। কারণ, অর্জন ব্যতীত অনুকরণের মাধ্যমে পরের ভাব নিজস্ব হয় না। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ গর্দভই থাকে। পাশ্চাত্যের প্রবলতায় মুগ্ধ আধুনিক ভারতের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের সবই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের কণ্ঠে তার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়, তড়িতের ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটায় দৃষ্টির বিভ্রান্তি মূঢ়তারই নামান্তর।

এই দুই বিবদমান মতবাদের ঘূর্ণাবর্তের উর্ধ্বে স্বামীজীর বক্তব্য হলো, পাশ্চাত্যের যা-কিছু মহৎ, তা ভারতবর্ষের গ্রহণীয়। গ্রহণ-বর্জন জীবনের ধর্ম। কিন্তু নির্বিচারে সমস্ত কিছু গ্রহণ মূঢ় পরানুকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই-ই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য যার নিন্দামুখর, আমাদের তার নিন্দামুখর হতে হবে এবং পাশ্চাত্য যার প্রশংসায় শতমুখ, আমাদেরও তার প্রশংসা করতে হবে—এ কেমনতরো যুক্তি?

পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা; কাজেই, আমাদের সমাজে এই প্রথার প্রচলনে জাতীয় মোক্ষ সাধিত হবে। পাশ্চাত্যেরা আমাদের বেশভূষা অশনবসন ঘৃণা করে; কাজেই,

সেগুলি ঘৃণার্হ। তারা মূর্তি-পূজার নিন্দা করে ; কাজেই, মূর্তিপূজা নিন্দনীয়। তাদের মতে, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ দূষণীয় ; কাজেই, এ সব পরিত্যাজ্য। এই মনোভঙ্গি, বলাবাহুল্য, সুস্থতার পরিচায়ক নয়।

পাশ্চাত্য দেশ সম্পর্কে স্বামীজীর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী হলো, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও ভারতীয় সমাজের মৌল প্রবণতা এতই পৃথক্ যে, ভারতের মৃত্তিকায় পাশ্চাত্য ভাবধারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পাশ্চাত্য সমাজের চরিত্র না জেনে এদেশে নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের প্রশ্রয়দান এক প্রকারের নির্বুদ্ধিতা। ঠিক একই কারণে ইংলণ্ডে ভূমিষ্ঠ দুর্বল জাতির সন্তানেরা নিজেদের ইংরেজ বলে পরিচয় দান করতে লজ্জিত হয় না।

আসল কথা, বলবানের পক্ষাবলম্বন দুর্বল-মাত্রেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটায় দুর্বল-মাত্রেই কৃতার্থ হয়। য়ুরোপীয় বেশবাস-পরিহিত ভারতীয়রা বর্তমানে এই পরপদদলিত, বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের স্বজাতীয়তা স্বীকারে লজ্জিত। চতুর্দশ শতবর্ষব্যাপী ভারতের মৃত্তিকায় প্রতিপালিত পার্শীরাও এখন নিজেদের ভারতীয় পরিচয় দানে লজ্জা পান। আজ ভাগ্যের পরিহাস, পাশ্চাত্য শিক্ষাও আধুনিক ভারতকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত, অজ্ঞ, মূর্খ ভারতবাসীও অনার্য জাতি—নীচ জাতি।

স্বদেশমন্ত্র

পরানুকরণ, পরাধীনতা, দাসমনোবৃত্তি ও নির্বিচার নিষ্ঠুরতা জাতির সার্বিক উন্নতির প্রবল অন্তরায়। এই ঘৃণ্য কাপুরুষতায় বীরভোগ্যা স্বাধীনতা কখনো লাভ করা যায় না। স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান—ভারতের নারীজাতির আদর্শ সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী, তার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর, তার বিবাহ-ঐশ্বর্য-জীবন ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে নয়—জন্ম থেকেই সে জগন্মাতার কাছে বলিপ্রদত্ত। তার সমাজ মহাজননী মহামায়ার ছায়ামাত্র। নীচজাতি, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তার রক্ত—তার ভাই, একথা যেন ভারত কখনো বিস্মৃত না হয়। তাকে সাহস অবলম্বন করতে হবে। কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হয়ে সদর্পে তাকে ঘোষণা করতে হবে, সে ভারতবাসী, আর ভারতবাসী মাত্রই তার ভাই। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী তার ভ্রাতৃবৎ। ভারতবাসী তার ভাই—তার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী তার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ তার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। ভারতের মৃত্তিকা তার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণেই তার কল্যাণ। এবং তাকে প্রার্থনা করতে হবে, জগৎপিতা এবং জগজ্জননী যেন তাকে মনুষ্যত্ব দান করেন, সমস্ত দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দূর করে যেন তাকে যথার্থ মানুষ করেন ॥

আদর্শ প্রশ্ন : উত্তরসহ

●এক. 'প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।'—স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্যটি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? অথবা, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র—চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।'—স্বামীজীর এই মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার কর।

পৃথিবীর ইতিহাস কেবল রক্তাক্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও সিংহাসন-দখলের কাহিনীই নয়, পৃথিবীর ইতিহাস হলো মানব-সমাজের ধারাবাহিক জীবন্ত অভিব্যক্তি। ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা সামাজিক শক্তির বিকাশ, বিরোধ এবং বিলয় লক্ষণীয়। ইতিহাসের এই সত্য-স্বরূপ উদ্ঘাটন কোন স্বার্থপর, সংস্কারাচ্ছন্ন, খণ্ডিত দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। তাই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে কত বিকৃত ইতিহাস! বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁর বিজ্ঞানভাবিত, নিরপেক্ষ এবং ধ্যানসমাহিত দৃষ্টি বিশ্ব-ইতিহাসের ওপর ক্ষেপণ করেছেন। তাতে তার যে সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তারই উজ্জ্বল প্রকাশ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ শক্তির তারতম্যের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের উদ্ভব। স্বামীজীর মতে, বিশ্ব-ইতিহাসের চরম নির্দেশই হলো, প্রাকৃতিক নিয়মে এই চারটি বর্ণ পর্যায়ক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করবে।

চীন, সুমের, বাবিল, মিশর, খল্‌দে, আর্য, ইরান, ইহুদী, আরব প্রভৃতি জাতির সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ন্যস্ত ছিল ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-শ্রেণীর হাতে। পুরোহিত-শক্তির ভিত্তি ছিল বুদ্ধিবল—মননশীলতা। পুরোহিত-শ্রেণীর মনোজগতেই তাই বিশ্বের জ্ঞানচর্চার প্রথম আবির্ভাব। আধ্যাত্মিক জগতের বার্তাবহ ও পথ-প্রদর্শক এই পুরোহিতেরাই মানব-সমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক এবং দেশে দেশে দেবতার মতো পূজিত। সভ্যতার সেই সূচনা-লগ্নে দৈবভীতিবলে মানুষ যে পূজা দেবতাকে নিবেদন করতো, পুরোহিত ছিল তার অংশভাগী এবং অংশভোগী। কায়িক শক্তির পরিবর্তে মানস-শক্তিই ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার। সেদিন শক্তিমদমত্ত ক্ষত্রিয়ের শাসন-ত্রাসন ও শোষণ-পীড়নের হাত থেকে নিরীহ অসহায় প্রজাপুঞ্জকে কে রক্ষা করেছিল? সে তো এই তপোবল-সহায়, ত্যাগসর্বস্ব, অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। পশুত্বের ওপর দেবত্বের বিজয়, জড়ের ওপর চেতনের অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের বিজয়-অভিযান—এ সবই পুরোহিত-শ্রেণীর অবদান।

কিন্তু যে কৃতিত্বের গৌরবে পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব, তাই-ই শেষ পর্যন্ত হলো তার পতন ও বিনাশের অন্যতম কারণ। স্থূল জগৎ সম্পর্কে উদাসীন ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ছিল সূক্ষ্ম মানসিক ব্যাপারে আগ্রহী। জাগতিক ব্যাধি এবং আধিকে তারা চাইলো তাদের তপস্যালব্ধ মন্ত্রশক্তি দিয়ে বশ করতে। ফলে, জাগতিক ইষ্টসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হলো তার সুদীর্ঘ অধ্যাত্ম-সাধনার ঐতিহ্য। কোথায় গেল তার হৃদয়ের সেই উদার-প্রসারতা, আত্মিক সমুন্নতি, স্বর্গীয় সরলতা, মহিমান্বিত ত্যাগ ও তিতিক্ষা? তার

স্থানে ঘোর তামসিকতায় মগ্ন হলো তারা এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা। তার ওপর যে কঠোর বিধি-নিষেধের লৌহজালে সে সমগ্র সমাজকে বন্দী করেছিল, সে স্বয়ং তাতে হলো আপাদমস্তক বন্দী। তারপর ক্ষত্রিয়-শক্তির অভ্যুদয়ে এবং সমাজের বিরুদ্ধ পরিবেশে বৃত্তি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ তার আত্মবিলুপ্তির শ্মশানভূমি রচনা করে।

ব্রাহ্মণের গৌরব-সূর্য অস্তমিত হলে পৃথিবীর ভাগ্যাকাশে স্বমহিমায় উদিত হলো ক্ষত্রিয়-সূর্য। রাজার মধ্যেই ক্ষত্রিয়-শক্তির সংহত প্রকাশ। দোষগুণের সমাহারে গঠিত এই শক্তি একদিকে যেমন নিরীহ ও নিঃসহায়ের প্রাণ-সংহার করে, তার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে; অন্যদিকে সে তেমনি শরণাগত অনুগতদের প্রাণ রক্ষা করে। রাজপদ, প্রকৃতপক্ষে, সৃষ্ট হয়েছিল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সমতা-সৃষ্টির জন্যে। কিন্তু কোথায় সামাজিক সমতা? তার পরিবর্তে এই যুগে সৃষ্টি হলো বাধাবন্ধনহীন পার্থিব ভোগ-বাসনার! তাই পৃথিবীতে এলো রাজপ্রাসাদ, রাজধানী, রাজবেশ, মনোহর উপবন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যগীত এবং বিলাসিতাপূর্ণ নানা পান-ভোজন। পৃথিবীর ভাস্কর্য, শিল্পকলা, সৌন্দর্য-চর্চা—সবই ক্ষত্রিয়-যুগের অবদান।

অন্যদিকে, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজশক্তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণে প্রজাপুঞ্জ তার পুরুষকার-শক্তিকে হারিয়ে দুর্বল মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হলো। ব্রাহ্মণ-যুগে ইষ্ট-সাধনের জন্যে উদ্ভূত মন্ত্রতন্ত্র-ঝাড়ফুঁক থেকে এই ব্যক্তিত্বহীন দুর্বলতার সূচনা। এ এক দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি। এইভাবে এক মৃত্যুময় উদ্যোগহীনতার অন্ধকারে সমগ্র মানবজাতি নির্বাসিত হলো। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ায় ভারতে প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকের আবির্ভাব। তার পরিণামে পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি নানা নিষ্ঠুর ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব। বৌদ্ধ ও জৈন সদাচারের অভ্যুদয়ে সেই অর্থহীন রক্ত-মোক্ষণের হাত থেকে রক্ষা পেল পৃথিবী।

স্মরণীয়, সমষ্টির স্বার্থেই ব্যষ্টির স্বার্থ, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ। সমাজ সেই সমষ্টিরই প্রতিচ্ছবি। সর্বংসহ সমাজ স্বৈরাচারী রাজার অত্যাচার যুগের পর যুগ সহ্য করে যায়। কিন্তু একদিন নয় একদিন সেই সমাজ তার সকল জড়তা দূরে নিক্ষেপ করে সহসা জেগে ওঠে। তখন প্রকৃতই রাজশক্তির দুর্দিন। আবার, কখনো-বা রাজা নিজেতে দেবত্ব আরোপ করে প্রজা-পীড়নে মেতে ওঠে। তাতে প্রজাশক্তি হয়ে পড়ে দুর্বল। অথচ প্রজাশক্তিই রাজশক্তির মূল ভিত্তি। সেই শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন রাজা তখন প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে কত রাজছত্র ভেঙে পড়েছে, কত সিংহাসন স্থান পেয়েছে ইতিহাসের যাদুঘরে।

ক্ষত্রিয়-শক্তির দমন-পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীতে বৈশ্য-শক্তির আবির্ভাব। ব্রাহ্মণের বিদ্যাবল ও ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবলের দিন গত হলো। এলো বৈশ্যের অর্থবলের যুগ। তা দিয়ে সে ব্রাহ্মণের বিদ্যাবল, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবল এবং শূদ্রের শ্রমবলকে যথেচ্ছ ক্রয় করে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের মধ্যস্থতায় বিপুল পরিমাণ মুনাফা লুণ্ঠন করছে। পৃথিবী আজ বৈশ্য-শক্তির পদানত।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বে যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রসার, বৈশ্য-প্রভুত্বে তেমনি বিস্তার ধন-সম্পদের। এই ধন-সম্পদের নিরাপত্তা-বিধানে বৈশ্যকুল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র সম্পর্কে সদাসন্ত্রস্ত এবং যূথবদ্ধ।

কিন্তু বৈশ্য-প্রভুত্বে বাণিজ্য আজ বিশ্বব্যাপ্ত। তার মধ্যস্থতায় একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলাকৌশল দেশান্তরে প্রবাহিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বে যে রক্ত সমাজ-হৃৎপণ্ডে সঞ্চিত হয়েছিল, তা বৈশ্য-ধমনীযোগে সঞ্চারিত হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু প্রকৃতির নির্দেশে বৈশ্য-শক্তিরও গৌরবময় দিন একদিন অস্তমিত হবে।

এর পর আসবে শূদ্রযুগ। যাদের শারীরিক শ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের দম্ভ এবং বৈশ্যের ঐশ্বর্য, সেই শূদ্র-সম্প্রদায়ের স্থান এতদিন ছিল সবার পিছে, সবার নীচে। সমাজের সেই চলমান শ্মশান ও ভারবাহী পশুত্বের দায়ভাগ সমগ্র সমাজের ওপরে ন্যস্ত হলো। প্রবল বিদেশী-শাসনে সমগ্র সমাজই দীপ্তিহীন, শক্তিহীন, নিরুদ্যোগ অগৌরবের অন্ধকারে হলো নিমজ্জিত।

কালপ্রভাবে সামাজিক উত্থানপতনের ফলে ব্রাহ্মণ যেমন শূদ্রত্বে অবনত হচ্ছে, শূদ্র তেমনি ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হচ্ছে। পাশ্চাত্য জগৎ শূদ্রকুলজাত অসাধারণ ব্যক্তিকে আভিজাত্যে বরণ করে নিয়ে লাভবান হয়েছে। আর, বঞ্চিত শূদ্র-সম্প্রদায় থেকেছে চির-বঞ্চিত। কিন্তু আধুনিক ভারতের চিত্র ভিন্নরূপ। শূদ্রসন্তান মহাপণ্ডিত কিংবা মহাধনশালী হলেও তার স্বসমাজত্যাগের কোন সুযোগ নেই। কাজেই, শূদ্রসন্তানের কষ্টার্জিত বিদ্যা এবং বিত্ত আজ স্বশ্রেণীর উন্নতিকর্মে নিয়োজিত।

কিন্তু এই শূদ্র-সম্প্রদায়ই সমাজে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। সমাজের শক্তির আধার হলো এই প্রজাপুঞ্জ। প্রজাশক্তি থেকে বিচ্ছিন্নতায় সমাজ দুর্বল এবং পঙ্গু হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-শক্তির অধঃপতনের মূলেও আছে প্রজাশক্তি থেকে এই বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু প্রজাশক্তি যদি তার শক্তির সন্ধান না পায়, যদি সমস্বার্থে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত না হয়, তবে প্রজাশক্তি ব্যর্থ হতে বাধ্য। আজ দিকে দিকে প্রজাপুঞ্জ তার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, পেয়েছে ঐক্য-শক্তির সন্ধান। তাই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আজ দিকে দিকে শূদ্রশক্তি জাগছে। তার এই জাগরণ বিশ্বের ইতিহাসে সফল হবেই, শুভ হবেই॥

●দুই. ভারতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব-সংঘর্ষের ফলাফল সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত নিজের ভাষায় প্রতিফলিত কর।

কর্মযোগী, মহাসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বিজ্ঞানভাবিত প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অনুদ্‌ঘাটিত সত্য-স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে। রাজবংশের পরিবর্তন কিংবা রাজ্য-ভাঙাগড়া নয়, অন্তর্নিহিত সামাজিক শক্তির বিকাশই যে ভারতবর্ষের ই তহাসের মৌল বৈশিষ্ট্য, তার প্রথম প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ। প্রভুত্ব-বিস্তারের তাগিদে বাইরের এবং ভিতরের নানা বিরুদ্ধ-শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার ক্রমপরিণতির ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রান্তসীমায় ভারতবর্ষের

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে প্রবল ইংরেজ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-প্রভুত্বের অবসানে বৈশ্যশক্তির এই আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নবতর যুগের সূচনা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব-সংঘাতের ক্রম-পরিণামে স্বামীজীর ধ্যান-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এক নবজাগ্রত ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্র।

গণশক্তিই সমাজ-শক্তির উৎস-স্থল। আবার, সেই গণশক্তি চালিত হয় প্রবল স্বার্থের তাড়নায়। স্মরণীয় যে, স্বার্থ ই স্বার্থত্যাগের মহান্ শিক্ষক। তাইতো স্বার্থ-সংঘাত থেকে জাতির বিকাশ ও সংহতি। কি পশু-সমাজে, কি মানব-সমাজে সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ স্বার্থ ও প্রীতিই পারস্পরিক ঐক্য-বিধায়ক। গ্রীস, রোম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, জার্মানী, আমেরিকা এবং আরব জাতির ইতিহাসে রয়েছে তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। কিন্তু ভারতবাসীর স্বার্থচিন্তা হলো যেন-তেন-প্রকারেণ উদরপূর্তি এবং বংশবিস্তার। এমন সময়ে আধুনিক কালের উষালগ্নে বৈশ্যজাতির জয়ধ্বজা উড়িয়ে পাশ্চাত্যের পণ্যপোত ভারতের উপকূল স্পর্শ করলো। অর্থবলে এবং বুদ্ধিবলে আসমুদ্র-হিমাচল অচিরকালের মধ্যেই হলো তার পদানত। ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজত্বের সুযোগে প্রবাহিত হয়ে এলো যে পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও পাশ্চাত্য-ভাবধারা, তার সঙ্গে সূচিত হলো প্রাচ্য-সভ্যতা ও প্রাচ্য-ভাবধারার প্রবল সংঘাত।

ভালো ও মন্দের সংমিশ্রণে জাতীয় জীবন। ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনে তেমনি শুভ ও অশুভ ফলাফলের মিশ্র প্রকাশ পরিলক্ষিত হলো। শুভ ফলগুলি হলো : এক. মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর এমন শক্তিশালী ও সর্বব্যাপী শাসন-যন্ত্র ভারতবর্ষে আর কখনো পরিচালিত হয়নি। দুই. বৈশ্য-শাসনের ফলে দেশ-দেশান্তরের পণ্যসম্ভারের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশিও ভারতবর্ষে আনীত হয়ে এক অভিনব ভাব-সংঘাতের সূচনা করেছে। তিন. স্বাধীন চিন্তার উন্মেষে সমাজের রচিত নিয়মের নিগড়ে যে দুর্জয় আঘাত পড়ে, তাতে জাতির জাগৃতির লগ্ন হয় সমাগত। অশুভ ফলগুলি হলো : এক. ইংরেজ-প্রজাতন্ত্র এ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে রচিত হয় এক বিশাল ব্যবধান। তার ফলে, উগ্র বর্ণ-বিদ্বেষের সৃষ্টি। দুই. প্রজা-কল্যাণের পরিবর্তে ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্য অটুট রাখার প্রয়োজনে সূচিত হয় ভারতবাসীর হৃদয়ে ইংরেজ-গৌরব প্রোথিত করার ব্যয়বহুল নিশ্ছিদ্র প্রয়াস।

সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘর্ষে সুপ্তিভঙ্গ ঘটছে নিদ্রাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের। তার ফলেই সম্ভব হচ্ছে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। তার একদিকে জড়বিজ্ঞানবুদ্ধিনির্ভর পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখধাঁধানো জলুস, অন্যদিকে প্রাচীন সনাতন ভারতবর্ষের শক্তিমত্তা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, শক্তির দম্ভ, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ ; অন্যদিকে ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং অলৌকিক আধ্যাত্মিক বিস্ময়। একদিকে বিচিত্র বেশবাস, বিচিত্র পানভোজন, বিচিত্র যানবাহন, বিচিত্র ভাব এবং বিচিত্র ভঙ্গি ; অন্যদিকে, ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন এবং সমাধি-আত্মানুসন্ধান। একদিকে স্বার্থপর স্বাধীনতা, অন্যদিকে

কঠোর আত্মশাসন। পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি ; আর, ভারতের উদ্দেশ্যে—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত এই দুই ভাবতরঙ্গের সন্ধিস্থলে দোদুল্যমান।

তার সমাজের সর্বশরীরে এই দ্বন্দ্ব-চাঞ্চল্য আজ প্রকট। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় মণ্ডিত আধুনিক ভারত পতিপত্নী-নির্বাচনে চায় অবাধ স্বাধীনতা ; অন্যদিকে ব্রত-উপবাসক্লিষ্ট সনাতন ভারতবর্ষের মতে, বিবাহের মৌল উদ্দেশ্য প্রজা-উৎপাদন—নিছক ইন্দ্রিয়সুখ নয়। সামাজিক সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত বিবাহ-বিধি তুচ্ছ ব্যক্তিগত সুখের স্বার্থে পরিত্যক্ত হওয়া অনুচিত। আধুনিক ভারতের ধারণা, এবং ভ্রান্ত ধারণা, পাশ্চাত্য শক্তিসামর্থ্যলাভের উপায় হলো : পাশ্চাত্যের ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন। কিন্তু তা মূঢ়তা। কারণ, অর্জন ব্যতীত অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব নিজস্ব হয় না। সিংহচর্মাবৃত গর্দভ গর্দভই থাকে, কখনও সিংহে রূপান্তরিত হয় না। স্মরণীয়, পাশ্চাত্যের সবই গ্রহণীয় নয় এবং ভারতের সবই বর্জনীয় নয়। স্বামীজীর মতে, গ্রহণ-বর্জন জীবনের ধর্ম। পাশ্চাত্যের যা-কিছু মহৎ, তা ভারতের গ্রহণীয়। কিন্তু নির্বিচার মূঢ় পরানুকরণ এক প্রবল বিভীষিকা। ভারতীয়তার যে দিকগুলি পাশ্চাত্যের কণ্ঠে নিন্দিত, ভারতীয় কণ্ঠে তার নির্বিচার নিন্দা অবশ্যই নিন্দনীয়। পাশ্চাত্যের বিবাহ-প্রথা, অশন-বসন অনুকরণে যেমন আমাদের জাতীয় মোক্ষ সাধিত হবে না, তেমনি ভারতের অশনবসন দেবদেবী-বর্জনে আমাদের জাতীয় সিদ্ধি সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশ সম্পর্কে স্বামীজীর অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী হলো, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও ভারতীয় সমাজের মৌল প্রবণতা এতই পৃথক্ যে, ভারতের মৃত্তিকায় পাশ্চাত্য ভাবধারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই, বিজয়ী শক্তিমানের গৌরবচ্ছটার বিজাতীয় জলুস্ গায়ে মেখে হতভাগ্য স্বজাতির সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করার মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব নেই, আছে কাপুরুষতা—পরজাতির পদলেহনের নির্লজ্জ প্রকাশ।

এই পরানুকরণ, পরাধীনতা, দাসমনোবৃত্তি ও স্বজাতীয়দের প্রতি নির্বিচার নিষ্ঠুরতা জাতির সার্বিক উন্নতির অন্তরায়। এই ঘৃণ্য কাপুরুষতায় বীরভোগ্যা স্বাধীনতা কখনো লাভ করা যায় না। তাই স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান—ভারতের নারীজাতির আদর্শ সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী, তার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর, তার বিবাহ-ঐশ্বর্য-জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের জন্যে নয়—জন্ম থেকেই সে জগন্মাতার কাছে উৎসর্গীকৃত। তার সমাজ সেই মহাজননী মহামায়ার ছায়ামাত্র। নীচ জাতি, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তার রক্ত—তার ভাই, একথা যেন ভারত কখনো বিস্মৃত না হয়। তাকে সাহস অবলম্বন করতে হবে। কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হয়ে তাকে সদর্পে ঘোষণা করতে হবে, সে ভারতবাসী, ভারতবাসী তার ভাই। মূর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল—সকল ভারতবাসীর সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক, অচ্ছেদ্য নাড়ির সম্পর্ক। ভারতের দেবদেবী তার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ তার শিশুশয্যা, তার যৌবনের উপবন, তার বার্ধক্যের বারাণসী।

ভারতের মৃত্তিকা তার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণেই তার কল্যাণ। জগৎপিতা এবং জগজ্জননীর কাছে তার প্রার্থনা—শক্তি, পৌরুষ এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব॥

অনুসরণী

*১. 'প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।'—স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্যটি কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন? [১৬-১৮ পৃ.]

*২. 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র—চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।'—স্বামীজীর এই মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার কর। [১৬-১৮ পৃ.]

৩. ভারতে পুরোহিত-শক্তির বিকাশ ও পতনের যে ইতিহাস স্বামী বিবেকানন্দ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা নিজের ভাষায় বিবৃত কর। [৩ ও ৭-৯ পৃ.]

৪. স্বামী বিবেকানন্দের মতে, স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ কি? ভারতবর্ষে কোথাও কি তার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল? [৪ পৃ.]

৫. ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের কারণ কি? তার ফলাফল কি? স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' অনুসরণে যথাযথ উত্তর দাও। [৪-৫ পৃ.]

৬. স্বামীজী মুসলমান অধিকারে ভারতের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার পরিচয় দাও। [৫-৬ পৃ.]

৭. স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডের ভারতাধিকারকে 'অভিনব' অভিহিত করেছেন কেন? [৬ পৃ.]

৮. পৃথিবীতে বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়ের ইতিহাস স্বামীজীর অনুবর্তনে লিপিবদ্ধ কর। [৬-৭ পৃ.]

৯. পৃথিবীতে পুরোহিত-শক্তির আবির্ভাব, প্রভুত্ব ও পতনের ইতিহাস স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' অনুসরণে বিবৃত কর। স্বামীজী এই শক্তির যে দোষ-গুণের উল্লেখ করেছেন, তা লিপিবদ্ধ কর। [৭-৮ পৃ.]

১০. ক্ষত্রিয়-শক্তি পৃথিবীতে কিরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করে? স্বামীজীর অনুসরণে তার ইতিহাস এবং তার দোষগুণ সংক্ষেপে বিবৃত কর। [৯-১০ পৃ.]

১১. 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি।'—স্বামীজীর এই মন্তব্য বিশদ কর। [১০-১১ পৃ.]

১২. বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয় ও প্রভুত্ব-বিস্তারের যে ইতিহাস স্বামীজী বিবৃত করেছেন, তা নিজের ভাষায় উপস্থাপিত কর। [১১ পৃ.]

*১৩. পুরোহিত-শক্তি, ক্ষত্রিয়-শক্তি ও বৈশ্য-শক্তির প্রভুত্বে মানব-সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে, তার পরিচয় দাও। [৭-১১ পৃ.]

*১৪. ভারতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব-সংঘর্ষের ফলাফল সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত নিজের ভাষায় প্রতিফলিত কর। [১৮-২০ পৃ.]

১৫. 'স্বার্থই স্বার্থত্যাগের মহান্ শিক্ষক।'—'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার কর। [১২-১৩ পৃ.]

*১৬. 'অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না।'—স্বামীজী এই মন্তব্যটি কি প্রসঙ্গে কেন করেছেন, যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। [১৪-১৫ পৃ.]

১৭. 'হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা।'—প্রবল বিভীষিকা কি? তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কি উপায় স্বামীজী নির্দেশ করেছেন? [১৪-১৫ পৃ.]

১৮. 'বলবানের দিকে সকলেই যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা।'—স্বামীজীর এই মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার কর। [১৪-১৫ পৃ.]

১৯. 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।'—স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্যটি বিশদ কর। [১৪-১৫ পৃ.]

২০. 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীর শূদ্র-জাগরণের ইতিহাসের যে রূপ তুলে ধরেছেন, তার পরিচয় দাও। [১১-১৪ পৃ.]

বৈকুণ্ঠের উইল

'বৈকুণ্ঠের উইল' বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক অশান্তি ও তার ভাঙনের চিত্রকে শরৎচন্দ্র তাঁর দরদী ও সংবেদনশীল লেখনীর স্পর্শে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন এই উপন্যাসে। ১৯১৬ সালে 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র প্রথম প্রকাশ। বৈকুণ্ঠের উইলকে কেন্দ্র করে যে প্রবল ভ্রাতৃবিরোধ দানা পাকিয়ে ওঠে, শরৎচন্দ্র তার একটি মোহন-সুন্দর রূপ প্রকাশ করেছেন এই উপন্যাসে। গ্রাম্য স্বার্থ-কুটিল ক্ষুদ্রতার সঙ্গে গোকুলের স্ত্রী মনোরমা এবং তার পিতৃদেব নিমাই রায়ের নীচতা, ক্রূরতা ও প্রচ্ছন্ন স্বার্থক্ষুধা সেই ভ্রাতৃবিরোধকে তীব্র ও অনিবার্য করে তুলেছে। কিন্তু এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোকুল, ভবানী ও বিনোদ সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানে নির্মিত। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিনোদের প্রতি গোকুলের আচরণ ঠিক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মতো নয়—তার অমার্জিত, আপাত-রুক্ষতার অন্তরালে একটি স্নেহকোমল ভ্রাতৃ-হৃদয় নিয়ত প্রচ্ছন্ন। তার কথায় এবং আচরণে যে অসংযম, অসৌজন্য ও অসংগতি, তার মূলে আছে সম্ভবতঃ শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দৈন্য। কিন্তু গোলদারী দোকানদার গোকুলের এই রূঢ়তার আড়ালে এক স্নেহবিগলিত ভ্রাতৃ-হৃদয় ও অসাধারণ মাতৃভক্তি চারদিকের খলতা ও স্বার্থপরতার পাথরে মাথা কুটে মরেছে। তাকে সবাই ভুল বুঝেছে, তার প্রতি অবিচার করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খলতা, কপটতা ও স্বার্থপরতাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে হৃদয়-ধর্ম, যা কখনো ভুল করে না।

বস্তু-সংক্ষেপ

বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদির দোকান। বছর পাঁচ-ছয় পূর্বে দোকানটির বড়ো দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। সৌভাগ্যক্রমে, সেই দুর্দিন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তারপর থেকেই দোকানটি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসরমান।

বাড়বাড়ন্ত সুখৈশ্বর্যের মধ্যেও বৈকুণ্ঠ তাঁর বড় ছেলে গোকুলের বিদ্যাশিক্ষায় যবনিকা টেনে দিয়ে তাকে নিয়োগ করলেন দোকানের দেখাশোনার কাজে। পরলোকগতা প্রথমা পত্নীর পুত্র গোকুলের প্রতি বৈকুণ্ঠের এই আচরণ পাড়ায় খুবই সমালোচিত হয়। দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র বিনোদের লেখাপড়া থাকে অব্যাহত। বস্তুতঃ, গোকুল লেখাপড়ায় খুব মেধাবী ছিল না। বিনোদ ছিল ঠিক তার বিপরীত। সেবার গোকুল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো, আর বিনোদ পেল ডবল প্রমোশন। বিমাতা ভবানী গোকুলকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজের ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। সায়াহ্নে দোকান-প্রত্যাগত বৈকুণ্ঠ সমস্ত শুনে নীরবতা অবলম্বন করলেন।

২.

সেদিন সায়াহ্নেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারের বাড়ির অন্দর-মহলে আবির্ভূত হলেন স্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক জয়গোপাল বাঁড়ুয্যে। লোকটি ধূর্ত, কপট এবং স্বার্থশিকারী। বৈকুণ্ঠের

দোকানের বহু টাকা বাকি ফেলে তিনি ভবানীকে মাতৃ-সম্বোধনে অভিষিক্ত করেন। এটা ছিল তাঁর ঋণ-রেহাইর সহজতম কৌশল। হীন স্তাবকতার পথ ধরে তিনি তাঁর 'রত্নতুল্য' সন্তান বিনোদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এবং অকৃতকার্য গোকুলের নিন্দায় হলেন মুখর। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী—বিনোদ উত্তরকালে হবে হাইকোর্টের জজ। আর, গোকুলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ, পরীক্ষার দিন জয়গোপাল বাঁড়ুয্যের উপস্থিতিতে যখন অন্যান্য ছেলেরা বই খুলে টুকছিল, তখন গোকুল ছিল নির্বিকার এবং নিশ্চেষ্ট। এমনকি, বাঁড়ুয্যেমশাইর উৎসাহব্যঞ্জক ইশারায়ও সে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে উৎসাহিত বোধ করেনি। গোকুলের সততায় বিমাতা ভবানীর হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায়। অদূরে উপবিষ্ট বৈকুণ্ঠও বিস্মিত হন। অথচ ছোট ভাইয়ের সাফল্যে গোকুলের গর্বের অন্ত ছিল না, নিজের অসাফল্যজনিত লজ্জা তো দূরের কথা।

এদিকে, বিনোদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হবার অভিসন্ধি ফলপ্রসূ না হওয়ায় এবং তদুপরি গোকুলের প্রতি ভবানীর স্নেহের আতিশয্যে বিস্মিত হয়ে বাঁড়ুয্যেমশাই ভগ্নমনোরথে স্বগৃহে প্রস্থান করলেন।

গোকুলের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতায় বৈকুণ্ঠ হয়তো মনে ব্যথা পেয়েছিলেন, কিন্তু তার সততায় তাঁর পিতৃ-হৃদয় মুগ্ধ হয়ে যায় এবং খুঁজে পায় এক নতুন আশার আলো। বৈকুণ্ঠের মনে সংশয় ছিল, তাঁর অবর্তমানে হয়তো তাঁর দোকান দেখাশোনার লোকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন তিনি গোকুলের মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর দোকানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীকে।

পরদিন ভবানীর ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও বৈকুণ্ঠ গোকুলকে সানন্দে লাগিয়ে দিলেন দোকানের কাজে। তিনি ভবানীকে আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যতে গোকুলই হবে দোকানের সুদক্ষ কর্ণধার, যার ওপরে তাঁর অবর্তমানে সংসারটা নিশ্চিন্তে নির্ভরশীল হতে পারবে।

স্বামীর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ভবানীর দৃষ্টি এড়ায় নি। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত স্বামীর ইচ্ছায় সম্মতি দিলেন। কারণ, গোকুল যদি মানুষ হয় এবং দোকানের দায়দায়িত্ব বহনে সমর্থ হয়, তবেই আসন্ন বিপদের হাত থেকে সংসারটা রক্ষা পাবে ; নচেৎ ভরাডুবি অনিবার্য।

গোকুলের সংকল্প ছিল, আগামী বছরে সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে, সহপাঠীদের বিদ্রূপের উপযুক্ত জবাব দেবে। কিন্তু তার সে সংকল্প অপূর্ণই থেকে গেল। পিতার অবর্তমানে দোকানের দায়দায়িত্ব বহনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় তার অতি শৈশবেই। এইভাবে ঘটে তার বিদ্যাশিক্ষার অকাল পরিসমাপ্তি।

৩.

তারপর দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠ বর্তমানে মৃত্যুপথযাত্রী। গোকুল সম্পর্কে বৈকুণ্ঠের সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গোকুলের কৃতিত্বে বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি

ঘটেছে, মুদির দোকানের পরিবর্তে এখন লক্ষ টাকা মূল্যের বিরাট গোলদারী দোকান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে গঞ্জের বুকে। বিনোদ বর্তমানে কলকাতায় এম. এ. পাঠরত। কিন্তু তার সম্পর্কে নানা কুৎসিত জনশ্রুতি মৃত্যুপথযাত্রী বৈকুণ্ঠের মানসিক শান্তি হরণ করেছে। তাঁর অবর্তমানে তাঁর এত কষ্টের ব্যবসাটি উচ্ছৃঙ্খল বিনোদের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে—এই দুশ্চিন্তায় তিনি পরকালেও শান্তি পাবেন না। হতভাগ্য গোকুল সপরিবারে পথে গিয়ে দাঁড়াবে, তাও তাঁর অনভিপ্রেত। এই দুর্ভাবনার টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁকে সংকট-উত্তরণের পথ দেখালেন স্বয়ং ভবানী। বৈকুণ্ঠের রক্তজল-করা পরিশ্রমের বিষয় সম্পত্তি—সবই তিনি উইল করে দিয়ে গেলেন গোকুলকে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বিনোদের পক্ষে স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াতে অসুবিধে হবে না। আর ভ্রাতৃ-বৎসল গোকুল বিনোদকে কখনোই পরিত্যাগ করতে পারবে না। মরণোন্মুখ স্বামীর মানসিক শান্তি ও স্থৈর্য এবং তাঁর কষ্টার্জিত বিষয়-সম্পত্তির নিরাপত্তার খাতিরে উদারহৃদয় ভবানীও তাতে তাঁর সম্মতি দিলেন। তাঁর নিজের সন্তানকে সমস্ত বিষয়আশয় থেকে বঞ্চিত করে তার ভাগ্যকে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে নিক্ষেপ করার পরিকল্পনায় তাঁর স্নেহাতুর মাতৃহৃদয় এক গভীর বেদনায় হাহাকার করে কেঁদে উঠলেও মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তিবিধানের জন্যে নিজের সন্তানের সর্বনাশের দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করতে তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না।

উকিল ডেকে রীতিসম্মতভাবে উইল লিখিত হলো। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি বড় ছেলে গোকুলকেই অর্পণ করে গেলেন। সাক্ষী হিসেবে কম্পিত হস্তে তাতে স্বাক্ষর করলেন স্বয়ং ভবানী। তখন কোথায় গেল মাতৃস্নেহ? কোথায় ছিল বিনোদ? সে তখন কলকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে ছিল সুরাসক্ত। তার কাছে প্রেরিত দু'জন কর্মচারী বাসায় তার সাক্ষাৎ না পেয়ে বিফল মনোরথে ফিরে এলো। বিনোদের সঙ্গে শেষ দেখা হলো না বৈকুণ্ঠের। শেষ পর্যন্ত তাঁর কষ্টার্জিত বিষয়-সম্পত্তি এবং বিমাতা ও বিনোদের সমস্ত দায়দায়িত্ব গোকুলের হাতে তুলে দিয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে নিলেন তাঁর অন্তিম আশ্রয়।

বৈকুণ্ঠ ছিলেন অতি সৎ ব্যবসায়ী। পুত্র গোকুলকে তিনি তাঁর সেই সততার শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। কিন্তু সততাকে মূলধন করে তিনি চরম দরিদ্রাবস্থা থেকে লক্ষ্মীর প্রসাদে সম্পদের শিখরে উন্নীত হওয়ায় তাঁর যেমন মিত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছিল শত্রু-সংখ্যাও।

৪.

এবার শত্রুরা পরলোকগত বৈকুণ্ঠের সংসারে ভাঙন ধরাবার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠলো। অতিবৃদ্ধ শিক্ষক বাঁড়ুয্যে মশাইর পুত্র হারাণ নিজব্যয়ে কলকাতায় ছুটে গেছে বিনোদকে তার পিতৃ-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার কাহিনী সালঙ্কারে শোনাবার জন্যে। বিনোদের সাক্ষাৎ না পেয়ে বিফলমনোরথে সে ফিরে আসে। কাজেই, গঞ্জে বিনোদ সম্পর্কে নানা কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হতে থাকে।

গোকুলের ধারণা ছিল, বিনোদ পিতৃবিয়োগের কথা অতি-অবশ্য জানতে পারবে এবং অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু কোথায় বিনোদ? বিনোদের অনুপস্থিতি এবং পিতার আসন্ন শ্রাদ্ধ-কর্মের নানা দায়দায়িত্ব শান্তপ্রকৃতি গোকুলকে উদ্‌ভ্রান্ত এবং উগ্রস্বভাব করে তুললো।

পত্নী মনোরমা বিনোদের অমিতব্যয়িতা সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গোকুল কর্তৃক তিরস্কৃত হলো। বিষয়-আশয়ের এই দায়দায়িত্ব গ্রহণে গোকুলের ছিল প্রবল অনীহা। কিন্তু বিমাতার প্ররোচনাতেই তার ওপরেই বিষয়-আশয়ের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। তাই সে বিমাতাকে ভৎর্সনা করতে ছাড়ে না। সেই ভৎর্সনা মূর্খ দোকানদার গোকুলের মুখে শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে অনায়াসে তীব্র কটূক্তিতে পরিণত হলো। শুধু বিমাতাই নয়, দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য গোকুলের কাছে সকলেই অতি রূঢ় ভাষায় তিরস্কৃত, ভৎর্সিত হতে লাগলো।

এইভাবে ভ্রাতৃ-বৎসল গোকুলের হৃদয় যখন বিনোদের জন্যে ব্যাকুল, তখন তার আশঙ্কা হলো, উইলের বিষয় অবগত হয়ে বিষয়বঞ্চিত বিনোদ সম্ভবতঃ অভিমানে গৃহে প্রত্যাবর্তনে বিরত। বিনোদকে বুঝিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনে রাজী করাবার জন্যে সে স্বয়ং কলকাতায় যেতে উদ্যত হয়। জয়গোপাল বাঁড়ুয্যে তাকে নিরস্ত করেন। হারাণকে পাঠিয়ে বিনোদকে গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্যে সে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অকাতরে তুলে দিয়ে আসে বাঁড়ুয্যে মশাইর হাতে।

৫.

বিনোদ আসবে। চুঁচুড়া স্টেশনে গোকুল বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দেয়। গাড়ি ফিরে আসে। বিনোদ আসে নি। ক্রুদ্ধ গোকুল দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারায়। সে কোচম্যানকে তিরস্কার করে। দোকানের পুরাতন কর্মচারী রসিক চক্রবর্তী তাকে আশ্বাস দেয়, শান্ত করে। তবু অশান্তহৃদয় গোকুল অনুজ ভ্রাতার আগমন-প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে। রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ শ্রবণমাত্র সে অনুজের আগমন-সম্ভাবনায় বাড়িশুদ্ধ সবাইকে সচকিত করে তোলে। কিন্তু কোথায় বিনোদ? লজ্জায়, সংকোচে সে মনের ব্যাকুলতা গোপন করে। কাষ্ঠহাসি হেসে সে ভ্রাতার প্রতি তার আপাত বিরাগ প্রকাশ করে এবং সদম্ভে ঘোষণা করে, বিনোদ ফিরে এলে সে তাকে এ বাড়িতে প্রবেশ করতেই দেবে না; এমনকি, সম্পত্তির অংশ হিসেবে একটি পয়সাও সে দেবে না তাকে।

হতাশ, ব্যথিত, ক্লান্ত গোকুল সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করলো। দাসী দুধের বাটি নিয়ে ফিরে গেল। দোকানের গোমস্তা অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ নিয়ে এলে সে তা ক্রোধে ছিঁড়ে ফেলে দিল। বিমাতা ভবানী তা জানতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দিতে এলে ক্রোধে ফেটে পড়ে গোকুল। যে বিমাতার কথায় তার পরলোকগত পিতা বিষয়-সম্পত্তি উইল করার ব্যাপারে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, সে আর সেই বিমাতার কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। সে শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে ব্যয়-বাহুল্যের পথে

না গিয়ে সংক্ষেপেই কার্য-সমাধা করবে। তাতে যদি লোকনিন্দা হয়, তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। কিন্তু তাতে কি তার পরলোকগত পিতার আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে? ভবানীর এই প্রশ্নে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোকুল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে তার বিমাতাকে জানায়, অর্থব্যয়ে তার কোন অনীহা নেই। কিন্তু বিনোদের অনুপস্থিতিতে দুঃসহ একাকীত্বে সে যে মৃতপ্রায়।

ভবানীর ধারণা, বিনোদ হয়তো তার পিতৃ-বিয়োগের দুঃসংবাদ পায়নি। গোকুলও বাঁড়ুয্যেতনয় হারাণের সততায় সন্দিগ্ধ ছিল। তবু তার প্রবল বিশ্বাস, এত বড় দুঃসংবাদ বিনোদ না জেনে পারে না। সব জেনেশুনেও সে রাগে, অভিমানে দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেকে। ভবানীর ব্যথাতুর মাতৃহৃদয় কঠিন হয়ে ওঠে। যে সন্তান এত বড় দুঃসংবাদেও নির্বিকার থাকে, ভবানীর মতে, তার সঙ্গে এ বাড়ির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া উচিত।

অন্তরালবর্তিনী মনোরমা সমস্ত শুনে আর আত্মসংবরণ করতে পারে না। সে প্রকাশ্যে বলে বসে, শ্বশুর ঠাকুর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের কুকীর্তির কথা অবগত হয়েই সমস্ত বিষয় তাদের দিয়ে গেছেন। কাজেই, বিনোদের প্রতি গোকুলের অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহ মূঢ়তারই নামান্তর। ভবানী পুত্রবধূর অন্তরের এই নগ্ন বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলেন। গোকুলও স্তম্ভিত। সে পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে, 'শোনো, মা শোনো! ছোটলোকের মেয়ের কথা শোনো।'

পিতার প্রতি এই কটূক্তি-বর্ষণে ক্ষুব্ধ হয় মনোরমা। গোকুলও ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়। ভবানী মনোরমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন, এই সব কথার মধ্যে তার কথা বলতে আসা উচিত নয়।

ইতিপূর্বে মনোরমার মুখরতা কখনও প্রকাশ পায়নি। বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পর তার এই আকস্মিক পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর। সে শাশুড়ীর মুখের ওপর কখনও কথার ঝঙ্কার তোলে নি। সে আজ নির্দ্বিধভাবে জানিয়ে দিল যে, সে এ বাড়িতে মুখ বুজে কেবল প্রাণপাত পরিশ্রম করতেই আসেনি। মূর্খ অগ্রজের প্রতি পাশ-করা অনুজের অবজ্ঞার কথা তার অবিদিত নয়। তবু গোকুল যে নির্লজ্জের মতো সেই অনুজের সঙ্গে বাক্যালাপ করে, তার সম্পর্কে গর্ববোধ করে, তা নিঃসন্দেহে ধিক্কারজনক।

বাড়ির বড় বৌর অন্তরের এই কদর্য পরিচয় লাভ করে ভবানী মনে মনে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও আতঙ্কিত হলেন। তার ওপর মনোরমা যখন স্বাভাবিক সংকোচ ও শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে বিনোদের অমিতব্যয়িতার প্রতি কটাক্ষ করে সদ্য-উইলকরা সম্পত্তির ওপর নিজের অধিকার সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করলো, তখন অনাগত বিপদের আশঙ্কায় ভবানী মনে মনে শিউরে উঠলেন।

স্ত্রীর মুখে নিজের মূর্খতার গঞ্জনায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোকুল। প্রতিজ্ঞা করে, বিনোদ এলে বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে সে দরওয়ান দিয়ে তাকে বিতাড়িত করবে।

পাথরের প্রতিমার মতো অনেকক্ষণ বসে রইলেন ভবানী। তারপর নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন।

৬.

অনুষ্ঠানের মাত্র আর তিনদিন বাকি। বিনোদ আসেনি। তার সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন করলে গোকুল বিরক্ত হয়। পিতা যাকে ত্যাজ্যপুত্র করে গেছে, তার সম্পর্কে সে নিস্পৃহ। এমনকি, আজ বিনোদ তার কাছে মৃত—একথা ঘোষণা করতেও সে এতটুকু বিচলিত নয়।

গঞ্জের লোকেরা এই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের ঘটনায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলো। অনেকের সহানুভূতি বিনোদের দিকেই। সে এসে তার অংশের সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের জন্যে যদি আদালতের দ্বারস্থ হয়, তবে তারা সব রকমের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে—এমন প্রতিশ্রুতিও প্রদত্ত হতে লাগলো। সকলের চেয়ে বেশি উৎসাহ ধূর্ত জয়গোপাল বাঁড়ুয্যের। বহু পূর্ব থেকেই এই ঘটনা তাঁর প্রত্যাশিত ছিল। প্রত্যাশা-পূরণে তিনি এক অমানুষিক আনন্দে অভিষিক্ত হলেন।

সারা গঞ্জ আজ গোকুলের বিরুদ্ধে। গোকুল তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ভবানী মনোবেদনার ভারে স্তব্ধ। তাঁর সেই নীরবতার মধ্যে মনোরমা অন্য তাৎপর্য আবিষ্কার করে সেদিকে গোকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং তাতে তার মনটাকে তোলে বিষিয়ে। ভবানী যে বিনোদেরই মা এবং তার প্রতি বিনোদের পক্ষপাতিত্ব যে স্বাভাবিক—গোকুলের মনে এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে।

মনোরমা এটুকুতেই হাল ছাড়লো না। ভবানী এবং বিনোদ যাতে এ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয় এবং এ বাড়িতে যাতে একমাত্র তারই কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্যে শুরু হলো তার নতুন প্রয়াস। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার জন্যে মনোরমা গোকুলের ওপর তার খলপ্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস। সেজন্যেই মা তাকে ছেড়ে বিনোদের সঙ্গে চিরদিনের মতো অন্যত্র চলে যাবেন—এ কথা ভাবতেই গোকুলের মনোরমার কথাই যথার্থ মনে হয়। মা চিরদিনই স্বল্পভাষিণী। কিন্তু ইদানীং তাঁর বাক্‌স্বল্পতা সম্পূর্ণ নীরবতায় পরিণত হয়েছে। গোকুলের কাছে এই নীরবতা দুঃসহ। সে মার নীরবতা ভঙ্গ করার অভিপ্রায়ে প্রকাশ্য কলহের জন্যে তাঁর মুখোমুখি হয়। বলে, কাজের বাড়িতে তাঁর মুখভার করে বসে থাকা চলবে না। বিস্ময়-বিমূঢ় ভবানী গোকুলের মুখের মধ্যে তাঁর অতীতের গোকুলকে খোঁজেন। চারদিকের এই পরিবর্তনে তিনি বড়ো অসহায় বোধ করেন। গোকুল আরো রূঢ় হয়ে উঠে। বলে, পিতা তাঁর সম্পত্তি তাকে দিয়ে গেছেন। কাজেই, এ বাড়িতে বিনোদের স্থান নেই। শোকসন্তপ্ত, মর্মাহত ভবানীরও সেই কথা। অগত্যা গোকুল কলহ করতে না পেয়ে নিরুপায় ক্রোধে স্থান ত্যাগ করে।

অন্যদিকে, মনোরমা যথারীতি গোকুলের মনটাকে তোলে বিষিয়ে। এখন গোকুল মার প্রতিটি আচরণের মধ্যে দেখতে পায় শত্রুতার আভাস। দোকানের পুরনো কর্মচারী রসিক চক্রবর্তী এবং বাড়ির পুরাতন দাসী হাবুর মার কাছে সে তার এই মনোভাবের সমর্থন খোঁজে; কিন্তু পায় না। এরপর বাড়িতে অভ্যাগত সবাইকে সে

তার মনোভাবের কথা জানায়। তবু শান্তি পায় না সে। ভবানীর সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ বাদানুবাদ চাই। ভবানী তাকে তার বর্ধমানের ছোট-পিসীমাকে আনাবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। এখন গোকুল মরীয়ার মতো মাকে গিয়ে জানায়, এ ব্যাপারে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, সে এই সব ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে পড়ে ঋণের সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে রাজী নয়। ভবানী অস্ফুটস্বরে প্রত্যাহার করে নিলেন তাঁর অনুরোধ।

তাতেও গোকুলের অশান্ত হৃদয় শান্ত হয় না। ভবানী তার নিজের জননী নয়। অন্যের জননী কখনো নিজের হয়? এখন তার নিজের স্বার্থ নিজেকেই রক্ষা করতে হবে। নির্বিচার অর্থব্যয় বন্ধ করা উচিত। গোকুলের এই অভূতপূর্ব বিষয়াসক্তিতে ভবানী বিস্মিত হন। এদিকে, বর্ধমানের পিসীমাদের আনাবার জন্যে তাঁর নির্দেশ এবং তার প্রত্যাহারের মধ্যে গোকুল বিমাতার বৈমাত্রেয় আচরণ প্রত্যক্ষ করে মনে মনে ব্যথিত হয়। সে তার মাতৃস্নেহবুভুক্ষু হৃদয় নিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, বেন্দা তাকে পরিত্যাগ করেছে। মাও যদি তাকে পরিত্যাগ করে, তবে সমস্ত বিষয়-আশয় ফেলে যেদিকে দু'চোখ যায়, সে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

৭.

বিনোদ বাড়ি এসেছে। খবরটি প্রথম প্রচার করে গোকুলের বড় মেয়ে হেমাঙ্গিনী। মনোরমার মুখে ফুটে ওঠে নিরানন্দ বিস্ময়। কিন্তু গোকুলের বুকের মধ্যে একদিকে ভ্রাতৃস্নেহ, অন্যদিকে এক তীব্র অপরাধবোধ তাকে ক্রমশঃ বিব্রত করে তোলে। সে ইতিমধ্যে বেন্দা সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য করেছে, বেন্দা এবং বিষয়-সম্পত্তি বিষয়ে মাকেও সে বহু কটুভাষণ করেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় বেন্দা এবং মার মধ্যে কি কথোপকথন হয়েছে, তা জানবার জন্যে তার ঝটিকাসংক্ষুব্ধ হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কন্যা হেমাঙ্গিনী সে ব্যাপারে তাকে কোন ইঙ্গিতই দিতে পারে না।

গোকুল কন্যার গালে চপেটাঘাত করে মার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। গৃহপ্রত্যাগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কাছে বিমাতা তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নানা কথা লাগিয়েছে। তার এই অভিযোগে ব্যথাতুর জননীর মুখে শুধু বিহ্বলতার চিহ্নই ফুটে ওঠে। গোকুল দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে সাবধান করে দিয়ে আসে, বেন্দা যেন তার সামনে না পড়ে।

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে সে হাবুর মাকে ডাকে এবং তার কাছে বিমাতা এবং তাঁর ছেলে বিনোদের গোপন কথাবার্তার বিবরণ জানার চেষ্টা করে। হাবুর মা তাকে এ ব্যাপারে কোন তথ্যই সরবরাহ করতে পারে না। কারণ, সে দেখেছে, ছোটবাবুর সঙ্গে তার মার সাক্ষাৎই হয় নি। তারপর তার কাছে ছোটবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্য ও মুখ কালিবর্ণ হবার কথা শুনে গোকুলের সুপ্ত ভ্রাতৃস্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। পিতার মৃত্যুকালে ঘটনাক্রমে বিনোদের অনুপস্থিতি এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তার বঞ্চনা—এই দুই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় গোকুল যে অন্তরে-অন্তরে কতখানি ব্যথিত, আজ তা প্রথম প্রকাশিত হলো।

হাবুর মা বিনোদের পিতৃভক্তির গভীরতার কথা জানে। বেশি লেখাপড়া শিখতে গিয়ে ছোটবাবুর মাথাটা কেমনধারা গরম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত সবাই বিনোদের নিন্দাই করেছে, তার কৃতকর্মকে ধিক্কার জানিয়েছে। কিন্তু হাবুর মার মতো কেউ এমন আন্তরিক দরদ দিয়ে বিনোদকে সমবেদনা জানায় নি। সঙ্গে সঙ্গে গোকুলের হৃদয় প্লাবিত হলো। 'অনার গ্রাজুয়েট' ভাইয়ের বিদ্যা-গর্বে সে গর্বিত। চিরসুখে পালিত ভাইটির হৃদয়ে পিতৃশোকের আঘাতটা যে তীব্র শেলের মতো বিঁধেছে, তা গোকুলের চেয়ে বেশি কে জানে? পিতা যদিও গোকুলকে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন, তবু সে জানে, এর অর্ধাংশ বিনোদেরও প্রাপ্য। কোন্ অপরাধে বিনোদ তার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? দেশে আইন-আদালত আছে, মাথার ওপরে ধর্ম আছে। দুদিন বাদে বিনোদ যখন হাইকোর্টের জজ হবে, তখন কেউ ঠেকাতে পারবে না। সম্পত্তির অর্ধেক অংশ ঠিক কেড়ে নেবে সে। কিন্তু কেবল মার জন্যেই এই উইলের ব্যাপারটা ঘটলো। তিনিই তো বাবাকে উইল করার মতলব দিয়েছিলেন।

উইলের ব্যাপারটা হাবুর মারও পছন্দ ছিল না। তার বিশ্বাস, বড়বাবু যদি ছোটবাবুকে তার বিষয়-আশয়ের অংশ স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়, তাহলে কারো কিছু বলার নেই। এত সহজ ব্যাপারটা গোকুলের জানা ছিল না। তার ধারণা ছিল, পিতার সম্পাদিত উইলের বিরুদ্ধে কাউকে সম্পত্তির অংশ দেবার ক্ষমতা তার নেই। হাবুর মার কথায় সে প্রকৃত আলোর সন্ধান পেল। তার বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল।

কন্যা হেমাঙ্গিনীর কাছে গোকুল জানতে পারলো, বিনোদের ঘুম ভেঙেছে। সে নিঃশব্দে জানলার কাছে গিয়ে বিনোদকে একবার দেখে এলো। বিনোদ তখন নতমুখে চৌকির ওপর বসে ছিল। তার বিবর্ণ মুখ দেখে গোকুলের হৃদয় কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চক্রবর্তী মশাই অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ তৈরীর প্রসঙ্গ নিয়ে হাজির হলে সে তাকে সোজা বিনোদের কাছে যাবার পরামর্শ দেয়। বিনোদই তার বিচারে এ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু পরমুহূর্তেই অসুস্থ শোকার্ত বিনোদের মুখ তার মনে পড়লো। তার মনে হলো, সে নিজে থাকতে বিনোদকে এ ব্যাপারে কষ্ট দেওয়া সমীচীন নয়। এমনকি, ভট্টচার্যিমশাইকে মূল্য ধরে দিলে যদি সম্ভব হয়, তবে তাকে আলোচালের হবিষ্যির হাত থেকে রেহাই দেওয়ারও ব্যবস্থা করা দরকার। বিনোদের দুর্বল শরীরে এত নিয়ম-নিষ্ঠার ধকল সইবে না। লোকে যা-ই ভাবুক, সে জেনে-শুনে 'নিজের মায়ের' পেটের ভাইকে মেরে ফেলতে পারে না।

৮.

ব্রাহ্মণঠাকুর চায়ের বাটি নিয়ে গিয়েছিল বিনোদের ঘরে। বিনোদ চায়ের বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। গোকুলের চক্রান্তে খুব গোপনে এই চা প্রস্তুত হয়েছিল। গোকুল মনে খুব আঘাত পেল।

বিকেলে গোকুল সহসা হাসিমুখে বিনোদের ঘরে প্রবেশ করে পিতার মৃত্যুকালে বিনোদের অনুপস্থিতি, পিতৃ-সম্পাদিত উইলের অসারতা ইত্যাদি বলে বিনোদের মনটাকে প্রফুল্ল করার কত চেষ্টাই না করলো! সে এমনও আভাস দিল যে, শ্রাদ্ধ-শান্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হলে একটা দানপত্র করে তাকে তার সম্পত্তি সে ফিরিয়ে দেবে। তারপর লোহার সিন্দুকের চাবি এবং একটি ফর্দ বিনোদের হাতে তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ব্যাপারটি তাকে তদারকি করবার অনুরোধ জানিয়ে সে অতিদ্রুত প্রস্থানের উপক্রম করলে বিনোদ এই দায়িত্ববহনে তার অক্ষমতার কথা জানায়। এমনকি, সে এসব স্পর্শ করতেও অসমর্থ। কারণ, সে বাইরের মানুষ। দু'দিন পরেই চলে যাবে। তারপর হিসেব মেলাতে না পারলে গোকুলই হয়তো তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে।

প্রাণপ্রিয় অনুজের মুখের এই উত্তর গোকুলের বুকে করে কঠিন আঘাত। সে নতমুখে চাবি এবং কাগজের ফর্দটি তুলে নিয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করে।

সন্ধ্যের পরই গোকুল শয্যার আশ্রয় নিল। সুযোগ বুঝে মনোরমা ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের ইন্ধন যোগাবার জন্যে ঘরে আসে এবং বিনোদ সম্পর্কে নানা কথা বলে তার মনটাকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তার মুখেই গোকুল জানতে পারে, কালই মনোরমার বাবা আসছেন। তিনি নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের সর্বেসর্বা মানুষ। একমাত্র তাঁর হাতেই তাদের স্বার্থ উপযুক্তভাবে রক্ষিত হতে পারে। মাতা-পুত্রের যাবতীয় চক্রান্ত এবং ফন্দিফিকির তাঁর কাছে জব্দ হবে। আর, দোকানপত্রের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত ব্যক্তি তো একমাত্র তিনিই। কিন্তু গোকুলের নীরবতায় মনোরমা সে-রাত্রির মতো ক্ষান্তি দিল।

পরের দিন সকালে লোহার সিন্দুকের চাবির সন্ধানে গোকুল ভবানীর কাছে এসে হাজির। আসলে, এখানেও ছিল তার একটা অভিনয়। বিনোদের হাতে সিন্দুকের চাবি পড়ার বিপদ সম্পর্কে ভবানী তাকে সতর্ক করে দেবেন—এই প্রত্যাশাই ছিল গোকুলের। কিন্তু এ সম্পর্কে ভবানীর নির্লিপ্ততা তাকে যুগপৎ বিস্মিত ও ব্যথিত করে তুললো। পিসীমাদের আনানোর ব্যাপারে মার পরামর্শের অহেতুক প্রশংসা করে সে বুঝতে পারলো, মা এখন সে ব্যাপারেও সম্পূর্ণ উদাসীন। শেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় গোকুল বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো স্থান ত্যাগ করে।

বাইরে ততক্ষণে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সমাগম শুরু হয়ে গেছে। জেলার নতুন ডেপুটি, উকিল-মোক্তার প্রভৃতি সম্মানিত অতিথিরা উপস্থিত। বিনোদ পাশে বসে তাঁদের সঙ্গে আলাপে নিরত। তা দেখে গোকুলের ভ্রাতৃ-হৃদয় আবেগে কানায়-কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সে হাকিমকে সেলাম করে তার 'অনার গ্রাজুয়েট' ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারে না। বিনোদকে সেই গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে ইংরেজিতে বাক্যালাপ করার অনুনয় জানায়। লজ্জিত বিনোদ বাইরে এসে গোকুলকে তার এই বাড়াবাড়ির জন্যে তিরস্কার জানাতে বাধ্য হয়। তার মতো পাশকরা লোক যে দেশের গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়, তা গোকুলের অজ্ঞাত। বিনোদ জানতে চায়, তাকে এভাবে অপমানিত করে বিতাড়িত করার অর্থ কী? গোকুল

অন্যত্র প্রস্থান করে ও চীৎকার করে ভৃত্যদের সাবধান করে দেয়, ছোটবাবুর 'অনার গ্রাজুয়েটে'র সোনার মেডেলটা যেন সকলে ঘাঁটাঘাঁটি করে নোংরা করে না ফেলে।

৯.

শ্রাদ্ধের দিন গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। অত্যন্ত পাকা লোক তিনি। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি বাড়ির কর্মকর্তা হয়ে উঠলেন। মেয়ে-জামাইর সনির্বন্ধ অনুরোধে এ বাড়ির ব্যবসার দায়দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণের জন্যেই তিনি এসেছেন। হিসাবী এবং কর্মদক্ষ শ্বশুরকে পেয়ে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে গোকুল।

রাত্রি এক প্রহর। নিমন্ত্রিত-ভোজনের পালা প্রায় শেষ। এমন সময় গোকুলকে 'কর্তাবাবু'র আহ্বান। শ্বশুর নিমাই রায় বহুমূল্য কার্পেটের আসনে দৌহিত্রী সহ জলযোগে উপবিষ্ট। কন্যা মনোরমা অদূরে দণ্ডায়মান। শুরু হয় ধূর্ত নিমাই রায়ের ছল-চাতুরির খেলা। প্রথমেই কন্যা-জামাতার ছেলেমানুষীর অজুহাতে বিষয়-সম্পত্তি এবং ব্যবসাপত্রের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব তিনি স্বহস্তে গ্রহণের জন্যে নিশ্ছিদ্র বাক্‌জাল বিস্তার করলেন। হতবুদ্ধি গোকুল নীরব। কন্যা মনোরমা পিতার বদান্যতায় উৎফুল্ল। নিমাই রায়ের চাল হলো মামলার পথ ধরে শত্রু বিনোদ এবং তার মাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে এ বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা। এ বাড়ির কাউকে বিশ্বাস নেই। কারণ, এ বাড়ি হলো শত্রুপুরী। তবে তিনি নিমাই রায়— মামলা-মোকর্দমায় নিপুণ কাণ্ডারী। সাক্ষীই মোকর্দমার ভিত। কাজেই, টাকা ঢেলে শুরুতেই সাক্ষীগুলোকে হস্তগত করা চাই। সেজন্যে চাই পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা। আশঙ্কার হেতু নেই। নামজাদা উকিল-মোক্তার সব তাঁর হাতে।

গোকুল নিমাইর এই চক্রান্তপূর্ণ বাগ্‌বিস্তারের বিন্দুমাত্র বুঝে উঠতে পারেনা। সহজবুদ্ধির মানুষ সে। কিসের মোকর্দমা, কার বিরুদ্ধে-ই বা এই মোকর্দমার চক্রান্ত— সবই তার বুদ্ধির অগম্য।

আড়তে চক্রবর্তীকে নিমাই রায়ের কর্তৃত্ব বিস্তারের পথে একটি বাধা বলে মনে হয়। উনি তাকে বরখাস্ত করতে চান। কন্যা মনোরমা আড়তের বহাল-বরখাস্তের ব্যাপারে পিতাকে অবাধ স্বাধীনতা দান করে। পরিশ্রান্ত, অভুক্ত গোকুলের এবার মনে হলো, যে ছোট ভাইয়ের মনস্তুষ্টি-বিধানের জন্যে সে নির্বোধের মতো সদা-সচেষ্ট, সেই বিনোদই আজ তার বিরুদ্ধে মোকর্দমার চক্রান্তে লিপ্ত। ক্রোধে সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারায়।

মেয়ে-জামাইকে বিপন্মুক্ত করবার জন্যেই নিমাই রায়ের এই আবির্ভাব। তিনি প্রথমেই তাই চান, সাক্ষী-সংগ্রহ এবং মামলা-পরিচালনার নামে প্রচুর অর্থ। তা না হলে বৃথাই তাঁর এই দায়িত্ব-গ্রহণ, বৃথাই তাঁর এই ছল-চাতুরি ও বাক্‌জাল-বিস্তার।

১০.

রুক্ষ, বিপর্যস্ত মূর্তিতে গোকুল ভবানীকে অভিযুক্ত করে, বিনোদ সম্পত্তিঘটিত যে মামলা করতে চলেছে, তার পেছনে আছে তাঁরই প্ররোচনা। এটাই সংমাদের

স্বাভাবিক চরিত্র। ভবানী গোকুলের এই অমূলক সন্দেহে বিস্মিত হলেন। গোকুল সগর্বে ঘোষণা করে, তার পেছনেও আছেন বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়—বড়ো সাংঘাতিক মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীর মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপণ করে গোকুলের রুদ্রমূর্তি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আসে এবং তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে পলায়ন করে সে কোনরকমে আত্মগোপন করে। সারাদিন সে জরুরী তাগাদার অজুহাতে বাড়ির বাইরে কাটালো। কুটুম্ব-ভোজনের সময়ও সে অনুপস্থিত। নিমাই রায়ই তখন কর্মকর্তা। সোৎসাহে চলে অতিথি-আপ্যায়ন।

অতিথি-বিদায়ের পর বাড়িতে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বহন করে নেমে আসে এক নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা। গোকুলের আসন্ধ্যাসকাল বাড়ির বাইরেই কাটে। বিনোদ নীরবে বসে থাকে বৈঠকখানায়। দাসদাসীরা সকলেই কেমন যেন কুণ্ঠিত, সন্ত্রস্ত।

নিমাই রায় কুণ্ডুদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন। কুণ্ডুদের অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে মেয়ে-জামাইকে কূলে তোলার জন্যে তিনি সপুত্র ফিরে এলেন বাবুগঞ্জে। আহারান্তে মনোরমার ঘরে বৈঠক বসলো। চক্রবর্তীকে তলব করে কাগজপত্র বুঝে নিয়ে তাকে 'পাকা চোর' প্রতিপন্ন করে বরখাস্ত করা হলো। চক্রবর্তীর চার মাসের মাইনে বাকি। নিমাই রায় স্মরণ করিয়ে দেন, জেলে না পাঠিয়ে তাকে যে তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন, তা তার বাপের ভাগ্য। গোকুল এত নির্মম হতে পারে না। মনোরমা শাসায়, সে যদি তার বাবার কথার বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সে গলায় দড়ি দেবে কিংবা পিত্রালয়ে চলে যাবে। স্থির হলো, নিমাই রায়ের পুত্র নন্দদুলাল দোকানের কাজে বহাল হবে। চক্রান্তটি এমন নিশ্ছিদ্র এবং তার রূপায়ণ এমন নিখুঁত যে, সাফল্য সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হলেন মা ভবানী। অতি কঠিন স্বরে জানিয়ে দিলেন, চক্রবর্তী মশাইকে তিনি আমরণ দোকানের কাজে বহাল রাখলেন। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি কারও ছিল না। দোকানে কোন বাইরের লোকের কর্তৃত্ব তাঁর পছন্দ নয়। নিমাই রায় কুটুম্ব মানুষ। তিনি এ বাড়ি থেকে কুটুম্বের মতোই ব্যবহার পাবেন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে চক্রবর্তীর হাতে চাবি তুলে দেয়। চক্রবর্তী দোকানের কাজে প্রস্থান করলে মন্ত্রণাগৃহের আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। পিতা ও ভ্রাতার অপমানে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মনোরমার স্বামীকে তিরস্কার, গঞ্জনা এবং নানা ভীতি-প্রদর্শন নিষ্ফল হলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। গোকুলের কাছেও মার এই শত্রুতা অপ্রত্যাশিত।

এবার নিমাই রায়ের এ বাড়ি থেকে বিদায়-গ্রহণের পালা। তিনি নানাভাবে গোকুলকে শাসালেন, বহু তীব্র বক্র কটাক্ষ করলেন ; শেষে ভবিষ্যতে মেয়ে-জামাইকে এই নিঃস্বার্থ সাহায্য করার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা জোর কণ্ঠে ঘোষণা করে তিনি সেদিনই বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি আশা করেছিলেন, ঘটনার

পরিবর্তন হবে, তাঁর অপরিহার্যতা গোকুল উপলব্ধি করবে। তিন দিন অতিবাহিত হলো। নানা মান-অভিমান, রাগারাগি, কটূক্তিতেও গোকুলের মুখ থেকে মায়ের আদেশের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারিত হলো না।

১১.

নিমাই রায়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হয়ে গেল। এবার তিনি ভীষণ হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে চাকরি ছাড়িয়ে আনার দরুন তিনি মেয়ে-জামাইর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসলেন। যখন কিছুতেই কিছু হলোনা, তখন তিনি জয়গোপাল বাঁড়ুয্যেকে হাত করে গোকুলের সামনে হাজির করালেন। জয়গোপাল বাঁড়ুয্যে এমন ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, নিমাই রায়ের অপমান করা হলে তিনি প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্যে বিনোদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। গোকুলকে তিনি মার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বোঝাতে লাগলেন, রায়মশাইর বিষয়-বুদ্ধিতে খুব পাকা মাথা। মার কথার বিরুদ্ধে তাঁর হাতেই ব্যবসাবাণিজ্যের সমস্ত দায়দায়িত্ব তুলে দিয়ে গোকুলের দূরে সরে দাঁড়ানোই হবে বিষয়-আশয় রক্ষা করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু গোকুলকে যে তার পরলোকগত পিতা মার কথা শুনতে আদেশ করে গেছেন। সে কি করে তাঁর কথা অমান্য করে? তারপর বাঁড়ুয্যে মশাইর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন স্বয়ং নিমাই রায়। এই দুই মহারথীর অবিশ্রান্ত বাক্যবাণ-বর্ষণে অচিরেই গোকুল ধরাশায়ী হলো; এবং তার নীরবতাকে দায়িত্বদানের সম্মতিসূচক মনে করে তাঁরা দুজনে বিজয়-গৌরবে উল্লসিত হয়ে গোকুলের এই সুমতির জন্যে তাকে কত আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তাঁদের এই বিজয়োল্লাসের কারণ, দুজনেই মনে মনে গোকুলের বিষয়-আশয় এবং ব্যবসাপত্রের দায়দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন।

রায়মশাই এবার স্বমূর্তি ধারণ করে হুঙ্কার ছাড়লেন, চক্রবর্তীর পুনর্বহাল বাতিল। গোকুলের সসংকোচ আপত্তি স্বনিযুক্ত বাক্‌চতুর অভিভাবকদের কথার স্রোতে তৃণবৎ ভেসে যাবার উপক্রম হলো। নিরুপায় গোকুল বিনীত কণ্ঠে জানায়, মা যাকে বহাল করেন, তাকে বরখাস্ত করা অন্যের অসাধ্য। তাহলে রায়মশাইর কি হবে? গোকুলের সুস্পষ্ট উক্তি—'উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখতে চান না। আর চাকরি ছাড়ার ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেবো।'

উত্তরের জন্যে গোকুল আর অপেক্ষা করেনি। অপমানিত রায়মশাই কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃ আট-দশদিন থেকে গিয়ে দিনরাত নানা উপায়ে তাদের হিতচেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে গোকুলের অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে, পিতা ও কন্যার শব্দভেদী বাণে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ভবানী মনোরমার কাছে জানতে চাইলেন, তাঁর এ বাড়িতে

অবস্থিতি কি গোকুলের অনভিপ্রেত ? তাছাড়া, রায়মশাই ও তাঁর ছেলের তাঁকে দিনরাত্রি অপমানের অন্য উদ্দেশ্য কি ?

মনোরমা সুস্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তাদের বিষয়-আশয় চোরের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টাই করছেন তার বাবা এবং ভাই। তাতে ভবানী যদি তাদের সর্বনাশ করতে কৃতসংকল্পই হন, তাহলে তার উপযুক্ত প্রতিফলের ব্যবস্থা করা হবে।

স্তম্ভিত হয়ে যান ভবানী। তাঁর অনুরোধেই তো বৈকুণ্ঠ সমস্ত সম্পত্তি গোকুলকে উইল করে দিয়েছিলেন। তার এবং বিনোদের সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে তো তাঁরই নির্বুদ্ধিতা। কৃতকর্মের অনুশোচনায় জল আসে ভবানীর চোখে।

ওদিকে, বিনোদ আদালতে একটা চাকরি যোগাড় করে শহরের প্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে চলে যেতে উদ্যত হলো। ভবানীও বিনোদের সঙ্গে এ বাড়ি থেকে মুক্তি চান। মার কাছে গত কয়েকদিনের সমস্ত ইতিহাস শুনে সেও মাকে নতুন বাড়িতে সঙ্গে নিয়ে যাবার সংকল্প করে। পথে দোকান-প্রত্যাগত গোকুলকে তার ও তার মার গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানায়। গোকুল তার অজ্ঞাতে এই সিদ্ধান্তের সংবাদে মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হলো। তাছাড়া, বিনোদ এম. এ. পড়া ছেড়ে দিয়েছে—এ সংবাদ ব্যথায় ভারাক্রান্ত করে তুললো তার হৃদয়কে। তার 'অনার গ্রাজুয়েট' ভাই এম. এ. পাশ করবে। গঞ্জের সবাইর মাথা হেঁট হয়ে যাবে। আজ তার সেই গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় মা গোকুলকে ডেকে তাঁর আসন্ন বিদায়ের সংবাদ দিলেন। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে সে জবাব দেয়—'যেখানে খুশী যাও, আমাদের তাতে কি ? গেলেই বাঁচি।'

কিন্তু পরের দিন দশমীর অজুহাতে সে গাড়ি ফিরিয়ে দেয়। দশমীতে গৃহত্যাগে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। কাজেই, মার আজ কিছুতেই যাওয়া চলবে না। ভবানীর যাত্রা স্থগিত রাখায় ক্ষুব্ধ হয় মনোরমা। কিন্তু গোকুল তার সিদ্ধান্তে অবিচল।

১২.

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল। মাকে পাঠাবার মতো শুভদিন গোকুলের চোখে পড়লো না। বাড়ির পুরোহিত ত্রয়োদশীর দিনটিকে শুভদিন বলে নির্দেশ করায় গোকুল তার অকৃতজ্ঞতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নিজের কাজে চলে যেতে আদেশ করলো। কারণ, সে তার মাকে কোথাও যেতে দিতে পারবে না। এমনকি, নিমাই যখন মাকে বিনাবাধায় চলে যেতে দেবার পরামর্শ দিলেন, তখন সে অগ্নিশর্মা হয়ে স্পষ্টই জানিয়ে দিল, তাঁর পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। কারণ, শুধু অখ্যাতির ভয়েই নয়, মাকে কারো কাছে পাঠানোয় তার প্রবল অনিচ্ছা।

গোকুলের এই অনিচ্ছার কথা বিনোদের কানে যায়। প্রতিদিন গাড়ি ফেরত আসায় সে বিরক্ত। সেদিন মাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে জিদ দেখালে গোকুল জানায়, মৃত্যুকালে বাবা মাকে তার কাছেই দিয়ে গেছেন ; সুতরাং মার ওপরে একমাত্র তারই অধিকার। কিন্তু নানাভাবে লাঞ্ছিতা মাকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার জন্যে

বিনোদ বদ্ধপরিকর। ভবানীও চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। গোকুলের হৃদয়ের অকৃত্রিম অভিমান সেদিন মার জিদের কাছে পরাস্ত হলো। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?' গোকুলের রুদ্ধকণ্ঠ অভিমান, শিশুসুলভ অশ্রুপাত—সবই ব্যর্থ হলো। মা চলে গেলেন।

আপদ বিদায় হলে ক্রূর সর্পের মতো নিমাই জামাতাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। পিতার মৃত্যুর পর গোকুল অত্যন্ত উগ্র ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মার এ গৃহত্যাগের পর থেকে সে একেবারে ভিন্ন মানুষ। নিমাই জামাতার এই স্বভাব-পরিবর্তনে পুলকিত হলেও কন্যা মনোরমার মনে সংশয় পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

মার হাতের রান্নার প্রতি গোকুলের আসক্তি সর্ববিদিত। প্রতি রবিবার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে মার হাতের রান্না খাওয়ানো ছিল তার বাতিক। মার বিদায়ের পর সে পাট চুকে গেছে। এদিকে, নিমাইর শক্তহাতে এবং শাশুড়ীর আবির্ভাবে তার সংসারের সৌষ্ঠব ফিরে আসে। কিন্তু গোকুলের শূন্য মন্দির কোনদিন পূর্ণ হবার নয়।

এক মাস কেটে গেল। ভবানী হাবুর মার কাছে গোকুলের সমস্ত সংবাদ পান। কিন্তু গোকুল মা এবং বিনোদের কোন খবরই নিল না। নতুন বাসায় বিনোদ দিন-কয়েক সংযত ছিল। তারপরই তার স্বরূপ প্রকাশ পেল। সে মার কোন তত্ত্বতালাশ না নিয়ে গৃহের বাইরে রাত কাটায়। এই উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সম্পত্তিচ্যুতির নিমিত্ত হয়ে তিনি যে অন্যায় করেন নি, তাইই হলো তাঁর বর্তমান সান্ত্বনা।

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো ছিল ভবানীর বার্ষিক রীতি। নিজের কাছে টাকাকড়ি না থাকায় এবং বিনোদের ও ব্যাপারে ঔদাসীন্যে এ বছর ভবানী সে সংকল্প ত্যাগ করেছিলেন। সহসা সেদিন প্রত্যুষে ঘি, ময়দা, মিষ্টান্ন এবং ঝুড়িভরা পাকা আম ও প্রচুর লোকজন নিয়ে এসে গোকুল বাড়িময় সোরগোল তুলে ভবানীকে বিস্মিত করে দিল। এ বছরও যথারীতি মা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবেন। গোকুল ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে এসেছে। বিনোদ অপমানিত বোধ করলেও গোকুল তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

বাঁড়ুয্যে মশাইও সেদিন নিমন্ত্রিত। ভোজনের পর তিনি সেদিনের অপমানের শোধ তোলার জন্যে সর্বসমক্ষে বিনোদকে জানালেন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের এই আয়োজন মাকে হাত করার জন্যে গোকুলের একটা ছল মাত্র। কারণ মামলার সাফল্য মার সাক্ষ্যের ওপরেই নির্ভরশীল। বাঁড়ুয্যের এই উক্তিতে গোকুলের হৃদয় একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। সে ঘৃণায়, অপমানে সেস্থান ত্যাগ করে বাঁচে। বাঁড়ুয্যে মশাই গোকুলকে এ বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়ার পরামর্শ দেন বিনোদকে। বিনোদ দাদাকে বিলক্ষণ চিনতো। দাদার এই অপমান তার অন্তরে আঘাত করে। নিমন্ত্রিত-বিদায়ের পর সে ভিতরে গিয়ে দেখে, মা দ্বার রুদ্ধ করে শয্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কথাটা যে মার কানে গিয়েছে, তাতে তার আর কোন সন্দেহ রইলো না।

ওদিকে, গোকুল নিজের ঘরে প্রবেশ করে দেখে, সেখানেও চলেছে এক হৃদয়হীন চক্রান্তের নির্লজ্জ মহড়া। গোকুলের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিমাই এবং অন্যান্যেরা জ্বলছিলেন তীব্র অপমানের জ্বালায়। নিমাই তো সরাসরি তার প্রতিকার দাবি করলেন। গোকুল ও বাড়িতে পুনরায় গেলে মনোরমা আত্মহত্যা করার ভয় দেখায়। মেয়ের কথায় উৎসাহিত হয়ে রায়মশাই ভবানী সম্পর্কে কটূক্তি করায় গোকুলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে বোমার মতো ফেটে পড়ে, 'চোপরাও বলছি! আমার মায়ের নামে ও-রকম কথা কইলে ঘাড়ে ধরে বার করে দেবো।' রায়মশাই ও তাঁর কন্যা বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

১৩.

বিনোদের বন্ধুর দল মামলার জন্যে বিনোদকে প্রতিনিয়ত উস্কানি দিয়ে চলেছিল। কারণ, পরাজয়ে তাদের বিশেষ ক্ষতি নেই, জয়লাভে পরম প্রাপ্তি। বিনোদের পক্ষ থেকে জনৈক বন্ধুর আপসের প্রস্তাব গোকুল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে মামলা শুরু হয়ে যায়। তাসত্ত্বেও গোকুলের প্রতি বিনোদের গভীর সহানুভূতি সদাজাগ্রত ছিল। তার অগ্রজের ওপরে বিশ্বের সকলের হৃদয়হীন অবিচার তার অন্তরাত্মাকে বড়ো বিচলিত করে তুলেছিল। তার ওপর তার বন্ধুবান্ধব ও তথাকথিত নানা হিতৈষীর কত তামাসা, কত বিদ্রূপ তার নিরপরাধ অগ্রজের ওপর বর্ষিত হতে লাগলো! তাতে তার হৃদয় ব্যথায় জীর্ণ হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে স্থির হয়েছে, আগামী রবিবার গঞ্জের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক গোকুলের কাছে যাবেন এবং তাকে কথার ফেরে জব্দ করে আসল কথাটি কবুল করে আনবেন। কিন্তু তার আগেই একদিন মধ্যাহ্নে গোকুল বিনোদের অনুপস্থিতিতে সহসা বিনোদের বাসায় উপস্থিত হয়ে জানিয়ে গেল, মৃত্যুকালে বাবা মাকে তার হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন ; কাজেই, মার ওপর তার অধিকার পিতৃনির্দিষ্ট।

রাতে চক্রবর্তী এসে ভবানীকে সংবাদ দিল, গোকুল সারাদিন বাড়ি ফেরেনি। সেদিন আবার গোকুলের জন্মদিন। বাড়ি থেকে সে ঝগড়া করে মার প্রসাদ পাবার বাসনায় বেরিয়েছিল। শুনে দুঃখে, বেদনায় ভবানীর মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। তার ওপর চক্রবর্তীর কাছ থেকে জানা গেল, মার সেদিনের আদেশের পর রায়মশাইর দোকানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আর, জানা গেল, বিনোদের প্রতি তার অকৃত্রিম বাৎসল্যের কথা। বিনোদের সম্পর্কে প্রচারিত কোন দুর্নামই গোকুল বিশ্বাস করে না। এমনকি, এম. এ. পাস করবার জন্যে বিনোদের মনটাকে ভালো করে দেবার মিথ্যে আশ্বাস দেখিয়ে একশো-আট সোনার তুলসীপাতার মূল্য হিসেবে পাঁচশো টাকা তার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে গেছে কাশীর এক পণ্ডিত। ওভাবে বহু টাকা মেরেছে জয়গোপাল বাঁড়ুয্যেও। সমস্ত শুনে মাতাপুত্রের চোখে নামলো শ্রাবণের ধারা।

পূর্ব-নির্ধারিত সেই রবিবার। গঞ্জের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত কয়েকজন ব্যক্তি গোকুলের বৈঠকখানায় আপসের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলে গোকুল প্রথমেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানিয়ে

দেয়, মদ্যপানাসক্ত বিনোদকে সে সম্পত্তির অংশ কিছুতেই দেবে না। বাঁড়ুয্যেমশাই তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বিনোদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবার কোন অধিকার তার নেই। তাছাড়া, গোকুল তো জোচ্চুরি করে মৃত্যুকালে বাপের কাছ থেকে উইল লিখিয়ে নিয়েছে, তাও উল্লেখ করতে তিনি ছাড়লেন না। গোকুল বারুদের মতো জ্বলে উঠলো। কিন্তু যখন সে শুনলো, এ ব্যাপারে তার মাকে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তখন তার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মার এই অসম্মান তার পক্ষে দুঃসহ! সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানায়, সে সম্পত্তি চায় না। সমস্ত সম্পত্তি বিনোদই নিক। সে মাকে নিয়ে কাশীবাসী হবে। নিমাই রায়ের প্রবল নিষেধ সত্ত্বেও গোকুল বিনোদের সামনে এগিয়ে গিয়ে পা বাড়িয়ে দাঁড়ায়। বিনোদ যদি বলে, তার দাদা জোচ্চোর, তবে সে সমস্ত সম্পত্তি এই দণ্ডে ত্যাগ করে চলে যাবে।

আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস লক্ষ্য করে নিমাই রায় গোকুলকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করে গোকুল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বলে চলে, বিনোদ ভালো হয়ে ফিরে এলে তার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে—এই ছিল পিতার আদেশ। যক্ষের মতো সম্পত্তি আগলে বসে সে দিবারাত্রি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে বিনোদকে ভালো করে দেবার জন্যে, তার সুমতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে। আর, বিনোদ যদি মনে করে, সে চুরি করে তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছে, তাহলে সে তা তার পা ছুঁয়ে বলুক।

সবাই বিনোদকে গোকুলের পা ছুঁয়ে এই মিথ্যাবাক্য উচ্চারণে উৎসাহিত করতে থাকে। কারণ, এমন দুর্লভ সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না। বিনোদ নির্দ্বিধভাবে এগিয়ে এসে অগ্রজের পদস্পর্শ করে। স্বীকার করে, দাদাকে জীবনেও সে 'জোচ্চোর' বলে মিথ্যাভাষণ করতে পারবে না। সে শপথ করে, মদ্যপান পরিত্যাগ করে সে এবার থেকে গোকুলের যথার্থ অনুজ হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। সেজন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সে তার অগ্রজের পায়ের ওপর মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ে॥

আদর্শ প্রশ্ন ঃ উত্তর সহ

●এক. বৈকুণ্ঠ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি গোকুলকে উইল করে দিয়েছিলেন কেন? এই উইলের পরিণতি কি হয়েছিল?

'বৈকুণ্ঠের উইল' অমর-কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এক পারিবারিক ভাঙনের বেদনাশ্রু-নিষিক্ত মর্মস্পর্শী কাহিনী। একদিকে অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ, অন্যদিকে স্বার্থ-কলুষিত, লোভকুটিল বুদ্ধিবৃত্তি; এই দুই বিরুদ্ধ বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও জয়-পরাজয়ের টানাপোড়েনে উপন্যাসটির ঘনপিনদ্ধ কাহিনী-কায়া নির্মিত। শেষ পর্যন্ত সহজ নিঃস্বার্থ হৃদয়-বৃত্তিই জয়লাভ করেছে, স্বার্থকুটিল লোভপিচ্ছিল বুদ্ধিবৃত্তির ঘটেছে পরাজয়। লোভ-লালসা ও স্বার্থক্ষুধার ঊর্ধ্বে স্থাপিত হয়েছে হৃদয়ের দাবি—ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহের গৌরব। এই কাহিনীর উত্থান-পতন ও আবর্তন-বিবর্তনের

মর্মকেন্দ্রে আছে পরলোকগত বৈকুণ্ঠের স্বাক্ষরিত সংক্ষিপ্ত উইলটি, তাকেই বেষ্টিত করে উন্মোচিত হয়েছে কত মান-অভিমান, কত ব্যথা-বিড়ম্বনা এবং কত স্বার্থ ও স্বার্থহীনতার দুর্নিবার সংঘাত।

বাবুগঞ্জের মজুমদার-পরিবার। বৈকুণ্ঠ মজুমদার একটি সামান্য মুদিখানার মালিক। প্রথমা পত্নীর অকালমৃত্যুর পর পুত্র গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাঁকে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করতে হয়। বিনোদ দ্বিতীয়া পত্নী ভবানীর সন্তান। বিনোদ লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী, গোকুল সেই তুলনায় বড়োই নিষ্প্রভ। বিনোদ পায় ডবল প্রমোশন, গোকুল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। কিন্তু গোকুল আর একটি দিকে বড়োই উজ্জ্বল। সে দিকটি হলো তার সততার দিক, অম্লান মনুষ্যত্বের দিক। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সর্বপ্রকার সুযোগ লাভ করেও, এমনকি প্রহরারত শিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহদান সত্ত্বেও সে অসদুপায় অবলম্বন করেনি; ফলে, তার নাম অকৃতকার্যদের তালিকায় স্থান লাভ করেছে। তাতে সে দুঃখিত; কিন্তু অনুজ ভ্রাতার সাফল্যে সে অত্যন্ত গর্বিত।

গোকুলের চরিত্রের এই সুন্দর ও শোভাময় দিকটি সুবিষয়ী বৈকুণ্ঠের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্না, স্নেহশীলা ভবানীর অনুমতি নিয়ে গোকুলকে তাঁর ব্যবসা-পরিচালনার কর্মে নিযুক্ত করলেন। তাতে গোকুলের লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে; কিন্তু তার সততায় এবং কর্মনিষ্ঠায় উত্তরোত্তর দোকানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বৈকুণ্ঠের সামান্য মুদির দোকান অচিরে বৃহৎ গোলদারী আড়তে পরিণত হলো এবং কুটিরের স্থানে মাথা তুলে দাঁড়ালো বিশাল কোঠাবাড়ি। বৈকুণ্ঠ বর্তমানে গঞ্জের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। 'অনার গ্রাজুয়েট' বিনোদ বর্তমানে এম. এ. পাঠ-নিরত। কিন্তু কুসংসর্গে সে বিপথগামী। তার নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী শ্রবণে বৈকুণ্ঠ স্বভাবতঃই মর্মাহত।

শেষে বৈকুণ্ঠের অন্তিমকাল উপস্থিত হলো। বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসাপত্রের উত্তরাধিকার-চিন্তায় তাঁর অন্তিম মুহূর্ত হলো দুশ্চিন্তায় জর্জর। সেই পন্থাবিহীন অন্ধকারের মধ্যে তাকে আলোকিত পথ দেখালেন শুদ্ধশীলা ভবানী। তাঁর পরামর্শে এবং অনুরোধে মৃত্যুপথযাত্রী বৈকুণ্ঠ ব্যবসাপত্রসহ তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি গোকুলের নামেই উইল করে দিয়ে গেলেন। বিনোদের অমিতাচারের স্পর্শ থেকে দূরে তাঁর বিষয়-আশয়ের নিরাপত্তা সদাচারী গোকুলের হাতেই অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং ভ্রাতৃবৎসল গোকুল কর্তৃক বিনোদ কখনই বিষয়বঞ্চিত হবে না—এই ছিল তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পর ঘটনাস্রোত অতিক্রুত আবর্তিত হতে থাকে। পিতার মৃত্যুকালে বিনোদের অনুপস্থিতি এবং পিতার মৃত্যুর পরে তার গৃহে অনাগমন গোকুলকে বিক্ষুব্ধ এবং অস্থির করে তোলে। ঘরে-বাইরে যে বিভেদকামী বিরুদ্ধশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তা এবার সুযোগ বুঝে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। বিনোদকে বঞ্চিত করে পত্নী মনোরমার সমগ্র সম্পত্তি-লাভের লালসায় এবং গঞ্জের বৃদ্ধ জয়গোপাল বাঁড়ুয্যের বিভেদ-সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন চক্রান্তে বিনষ্ট হলো সরল-হৃদয় গোকুলের মানসিক

ভারসাম্য। বিষয়-আশয়ের দায়িত্ব গ্রহণে তার চিরকালই ছিল প্রবল অনীহা। কিন্তু বিমাতার প্ররোচনায় পাকেচক্রে তার স্কন্ধেই বিষয়-আশয়ের সমস্ত দায়দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। সেজন্যে স্নেহপরায়ণা বিমাতাকে সে ভৎর্সনা করতে ছাড়ে না। সেই ভৎর্সনা মূর্খ দোকানদার গোকুলের মুখে শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে অনায়াসে তীব্র কটূক্তিতে পরিণত হয়। শুধু বিমাতাই নয়, দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য গোকুলের কাছে সকলেই অতি রূঢ় ভাষায় তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হতে লাগলো। এইভাবে একদিকে বিনোদের অনুপস্থিতি ও পিতার আসন্ন শ্রাদ্ধকর্মের নানা ব্যবস্থাপনার চিন্তা এবং অন্যদিকে বিষয়-সম্পত্তির ন্যস্ত দায়দায়িত্ব শান্তপ্রকৃতি গোকুলকে ক্রমশঃ উদ্‌ভ্রান্ত এবং উগ্রস্বভাব করে তোলে।

তাসত্ত্বেও বিনোদকে গৃহে প্রত্যাবর্তনে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে সে জয়গোপাল বাঁড়ুয্যের শরণাপন্ন হয়েছে; অর্থলোলুপ জয়গোপাল তার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। পত্নী মনোরমা বিনোদ এবং বিমাতা সম্পর্কে শুরু করেছে সুতীব্র বিষোদ্‌গার। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর প্রতিঘাতে জর্জরিতা, শোকসন্তপ্তা ভবানী গোকুলের বিপরীত আচরণে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে নিঃসঙ্গ নির্জনতায় নির্বাসিত করেছেন।

এইভাবে গোকুলের জীবন যখন নানা বিড়ম্বনায় কানায় কানায় পূর্ণ, তখনই বিনোদ গৃহে ফিরে আসে। পিতৃ-বিয়োগ এবং সম্পত্তির উইল সম্পর্কিত ব্যাপারে সে অবহিত হয়েছে। গোকুলের সততা, মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য সম্পর্কে তার অভঙ্গুর প্রতীতি সত্ত্বেও ক্ষোভে, অভিমানে সেও তাকে ভুল বুঝেছে, অবিচার করেছে তার ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজকে। পিতার মৃত্যুতে বিনোদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় গোকুল বিরক্ত হয়ে তাকে এ বাড়িতে প্রবেশাধিকার দেবে না বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সে তো শুধুমাত্র মুখের বাক্য, তাতে মনের সমর্থন ছিল না। কিন্তু শ্রাদ্ধকর্মের দায়িত্ববহনে বিনোদের ঔদাসীন্যে গোকুলের হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার আশঙ্কা হয়, সম্পত্তির উইল সম্পর্কিত ব্যাপার এবং বিনোদের প্রতি তার রূঢ় মনোভাবের কথা বলে বিমাতা বিনোদের মনকে দিয়েছেন বিষিয়ে।

অতঃপর মনোরমার পিতা নিমাই রায় শ্রাদ্ধের দিন কন্যা-জামাতার বিপন্মুক্তির জন্যে উপস্থিত হয়েছেন; তিনিও গোকুলের সরলতা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সুযোগে এই পরিবারে মাতৃ-বিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বীজ বপন করে তাকে বিশাল মহীরুহে পরিণত করার চক্রান্ত করেছেন। পত্নী মনোরমা সেই চক্রান্তের সামিল হয়ে বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসাপত্র পূর্ণগ্রাসের আকাঙ্ক্ষায় তার করিৎকর্মা পিতার হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেবার জন্যে তাকে প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করে চলেছে। মনোরমা ও নিমাই রায়ের তীব্র কটূক্তি এবং বিষতিক্ত মন্তব্যের আঘাতে জর্জরিত মা ভবানী রুদ্ধদ্বার কক্ষের একান্ত নির্জনতায় আত্মনির্বাসিতা। জগতের সরল-হৃদয় নিরপরাধ মানুষগুলির ভাগ্যের বিড়ম্বনা এই যে, বিশ্বশুদ্ধ মানুষ তাদের ভুল বোঝে এবং তাদের প্রতি অবিচার করে; এমনকি, একান্ত আপনজনও তাকে পরিত্যাগ করে দূরে সরে যায়।

শ্রাদ্ধশান্তি ও কুটুম্ব-বিদায়ের পালা শেষ হলো। বিষয়-বুদ্ধিতে ধুরন্ধর নিমাই

রায় সম্পত্তির পূর্ণগ্রাসের জন্যে মামলা করার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেন। আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বহন করে সারা বাড়িতে নেমে আসে এক নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতা। নিমাই রায় প্রথমেই দোকানের প্রবীণ কর্মচারী চক্রবর্তীকে চুরির অপবাদ দিয়ে বরখাস্ত করে তার স্থানে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নন্দদুলালকে নিযুক্ত করলেন। গোকুল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ভবানীর দৃঢ়তায় এবং সময়োচিত হস্তক্ষেপে রায়মশাইর সেই চক্রান্ত বানচাল হয়ে যায়। নিমাই এবং মনোরমার ক্রোধ, অভিমান ও নানা ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও গোকুল বিমাতার আদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করলো না। এবার নিমাইর সঙ্গে যোগ দিলেন জয়গোপাল বাঁড়ুয্যে। তিনিও নিমাইর হাতে সমস্ত সম্পত্তির দায়দায়িত্ব তুলে দেবার ওকালতি করেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি গোকুলকে তার বিমাতার আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার জন্যে উত্তেজিত করতে থাকেন। গোকুলের নীরবতাকে সম্মতিসূচক মনে করে উল্লসিত হয়ে ওঠেন নিমাই ও জয়গোপাল। নিমাই রায় চক্রবর্তীকে পুনরায় বরখাস্ত করতে উদ্যত হলে গোকুল তাঁকে মার সর্বময় কর্তৃত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে এ গৃহত্যাগের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে আর পশ্চাৎপদ হয় না। অপমানিত রায়মশাই কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমত্ব-বশতঃ আট-দশদিন থেকে গিয়ে নানা উপায়ে তাদের হিত-চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে গোকুলের অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে, পিতা ও কন্যার মর্মভেদী বাণের আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে ভবানী গৃহত্যাগ করবার জন্যে কৃতসংকল্প হন।

বিনোদ এম. এ. পড়ায় ইস্তফা দিয়ে আদালতে একটি চাকরি সংগ্রহ করে গঞ্জের প্রান্তে ভাড়া-করা একটি বাসায় গিয়ে ওঠে। ভবানীও সেখানে চলে যাবেন। কিন্তু মার এই গৃহত্যাগ গোকুলের অভিপ্রেত নয়। নানা অজুহাতে সে মার যাত্রা পিছিয়ে দিতে থাকে। শেষে গোকুলের নিষেধ না মেনে মা চলে যান। এদিকে, রায় মশাইর শক্ত হাতে সংসারের সৌষ্ঠব ফিরে আসে। কিন্তু গোকুলের মন সংসারে বসে না। মার জন্যে তার প্রাণ সদাব্যাকুল। ওদিকে, বিনোদের অসংযত জীবনযাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন মা।

গঞ্জের কিছু ব্যক্তি এবং বন্ধুবান্ধবের প্ররোচনায় বিনোদ গোকুলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার পূর্বে গঞ্জের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি আপস-রফার প্রস্তাব নিয়ে গোকুলের কাছে আসেন। সে প্রথমেই ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানিয়ে দেয়, পানাসক্ত বিনোদকে সে সম্পত্তির অংশ কিছুতেই দেবে না। বাঁড়ুয্যেমশাই স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন, বৈকুণ্ঠের উইলের পেছনে প্রচ্ছন্ন ছিল গোকুলের জোচ্চুরি। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ওঠে গোকুল। কিন্তু যখন সে শুনলো, এ ব্যাপারে তার মাকে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, তখন সে মার অসম্মান-আশঙ্কায় বিনোদকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে মাকে নিয়ে কাশীবাসী হবার সংকল্প প্রকাশ করে। তবে বিনোদকে তার পা ছুঁয়ে বলতে হবে, তার দাদা জোচ্চোর, সে জোচ্চুরি করে তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করেছে। বিনোদ নির্দ্বিধচিত্তে এগিয়ে এসে অগ্রজের পদস্পর্শ করে

স্বীকার করে, দাদার সম্পর্কে এমন মিথ্যাভাষণ জীবনেও সে করতে পারবে না। সে শপথ করে, মদ্যপান ত্যাগ করে সে এবার থেকে গোকুলের যথার্থ অনুজরূপে পরিচয় দেবার যোগ্য হয়ে উঠবে। সেজন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সে তার অগ্রজের পদযুগলের ওপর মস্তক স্থাপন করে।

প্রকৃতপক্ষে, গোকুলকে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে বৈকুণ্ঠ কোন ভুলই করেন নি। এ বিষয়ে ভবানীর পরামর্শও ছিল অভ্রান্ত। কারণ, অসংযত বিনোদের হাতে তার সম্পত্তি দুদিনেই বিনষ্ট হয়ে যাবার ছিল সমূহ সম্ভাবনা। একদিন নয় একদিন তার হয়তো সুমতি হবে, সংযত জীবনধারায় সে প্রত্যাবর্তন করবে। ততদিন তার সম্পত্তির যোগ্য অভিভাবক নির্লোভ, উদারহৃদয়, ভ্রাতৃবৎসল গোকুল ছাড়া এই স্বার্থ-কুটিল, লোভসর্বস্ব পৃথিবীতে আর কে হতে পারতো ? সেদিক থেকে বিনোদের চরিত্র-সংশোধন এবং তার ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তির প্রত্যর্পণই শরৎচন্দ্রের বৈকুণ্ঠের উইলের সুসংগত পরিণতি ॥

●দুই. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসের গোকুল চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুল চরিত্রটি অমর-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই ধূলিধূসর পৃথিবীর দোষগুণ-সমন্বিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত অতি সাধারণ মানুষ গোকুল। অসাধারণত্ব তার কিছুই নেই। গ্রামগঞ্জের শিক্ষাদীক্ষাহীন এক সামান্য দোকানদার সে। কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে তার চরিত্র মাঝেমধ্যে সৌজন্য-শিষ্টাচারের সীমা অবলীলায় অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু এই বাহ্যিক দৈন্যের অন্তরালে মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অতি-সংবেদনশীল সাহিত্য-প্রতিভা উদ্ঘাটিত করেছে একটি চিরকালের সৎ, হৃদয়বান্ মানুষকে। চারদিকের স্বার্থকলুষিত ক্লেদকালিমাময় ধূলি-ঝঞ্ঝার মধ্যে সে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে রক্ষা করেছে তার হৃদয়ের অমলতা। আপন জন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাকে ভুল বুঝেছে, আঘাতে আঘাতে তার অন্তরাত্মাকে জর্জরিত করেছে। সে চারদিকের প্রবল বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে করেছে আপসহীন সংগ্রাম—একা এবং নিঃসঙ্গ। সেই সংগ্রামে ক্ষুরধার বুদ্ধি বা কুটিল ছলচাতুরি নয়, হৃদয়-সম্পদই ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার। বাইরের সহস্র দৈন্যের মধ্যে হৃদয়-সম্পদে সে ছিল অসামান্য বিত্তশালী। এখানেই স্রষ্টা শরৎচন্দ্র ও তাঁর সৃষ্টি গোকুলের অনন্যতা।

গোকুল পৃথিবীর শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতীক। আধুনিক বস্তুসর্বস্ব পৃথিবীতে যে সততা ও সদাচার মূল্যহীন বলে উপহসিত, সেই অম্লান সততাই গোকুলের চরিত্রের ভিত্তিভূমি। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই মহামূল্য সম্পদটির গৌরব-সুষমার পরিচয় পাওয়া যায় তার শৈশবের প্রারম্ভ-কাল থেকেই। পরীক্ষা-মন্দিরে যখন তার চারদিকের সতীর্থ সহপাঠীরা অসদুপায় অবলম্বন করে পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তরণের প্রয়াসে ব্যস্ত, তখন অবেক্ষণরত শিক্ষকের উৎসাহব্যঞ্জক প্ররোচনা সত্ত্বেও সে পরীক্ষা-পাশের সেই সহজতম উপায় অবলম্বনের লোভ সংবরণ করে রেখেছে চারিত্রিক নিষ্কলুষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। চতুপার্শ্বস্থ ক্লেদকলুষ দুর্নীতি ও অসদুপায়ের ঊর্ধ্বে সেই

তার প্রথম জয়লাভ। তার এই দুর্লভ চরিত্র-সুষমা বস্তুবাদী স্বার্থমলিন দৃষ্টিতে নির্বুদ্ধিতা বলে উপহসিত হলেও তা পিতা বৈকুণ্ঠ ও বিমাতা ভবানীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বার্ধক্য-ভারে ক্লান্ত বৈকুণ্ঠ মনে মনে তাঁর বিষয়-আশয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ছিলেন উদ্বিগ্ন। এবার বালক গোকুলের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর সম্পত্তির সুযোগ্য উত্তরাধিকারীকে। ফলে, সেখানেই গোকুলের শিক্ষাজীবনের ঘটে অকাল পরিসমাপ্তি। কিন্তু তার সততা ও কর্মনিষ্ঠার পরিণামে ঘটে তাদের দোকানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। বৈকুণ্ঠের সামান্য মুদির দোকান অচিরে বৃহৎ গোলদারী আড়তে পরিণত হয় এবং কুটিরের স্থানে মাথা তুলে দাঁড়ায় বিশাল কোঠাবাড়ি। এর পেছনে গোকুলের যে কতখানি ত্যাগ, পরিশ্রম ও সততা ছিল, তা জানতেন বৈকুণ্ঠ। অন্যদিকে, এম. এ.-পাঠনিরত বিনোদের বিপথগামিতায় তিনি ছিলেন চিন্তাকুল। তাইতো মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সমস্ত সম্পত্তি গোকুলের নামে উইল করে দিয়ে যান। গোকুল ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানের এবং বিপথগামী বিনোদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে ছিল?

কিন্তু বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পর ঘটনাস্রোত অতিদ্রুত আবর্তিত হতে থাকে। পিতার মৃত্যুকালে বিনোদের অনুপস্থিতি এবং পিতার মৃত্যুর পরে তার গৃহে অনাগমন গোকুলকে বিক্ষুব্ধ এবং অস্থির করে তোলে। ঘরে-বাইরে যে বিভেদকামী বিরুদ্ধশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তা এবার সুযোগ বুঝে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। বিনোদকে বঞ্চিত করে পত্নী মনোরমার সমগ্র সম্পত্তিলাভের লালসায় এবং গঞ্জের বৃদ্ধ জয়গোপাল বাঁড়ুয্যের বিভেদসৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন চক্রান্তে বিনষ্ট হলো সরলহৃদয় গোকুলের মানসিক ভারসাম্য। বিষয়-আশয়ের দায়িত্ব-গ্রহণে তার চিরকালই ছিল প্রবল অনীহা। কিন্তু বিমাতার প্ররোচনায় পাকেচক্রে তার স্কন্ধেই বিষয়-আশয়ের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। সেজন্যে স্নেহপরায়ণা বিমাতাকে সে ভৎর্সনা করতে ছাড়ে না। সেই ভৎর্সনা মূর্খ দোকানদার গোকুলের মুখে শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে অনায়াসে তীব্র কটূক্তিতে পরিণত হয়। শুধু বিমাতাই নয়, দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য গোকুলের কাছে সকলেই অতি রূঢ় ভাষায় তিরস্কৃত ও ভৎর্সিত হতে লাগলো। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'গোকুলের বাক্যে ও ব্যবহারে অসংযম, অস্থিরমতিত্ব যেন চরম মাত্রায় উঠিয়াছে—এইরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ব্যবসায় বা পরিবারের কর্তৃত্ব এই দুই-ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহার ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী ও পিতার অগাধ বিশ্বাসের সঙ্গে তাহার পরবর্তী খামখেয়ালী ব্যবহারের যেন একটা অসংগতি থাকিয়াই যায়।' কিন্তু স্মরণীয়, গোকুলের অপ্রিয় রূঢ়-ভাষণ ও অশোভন আচরণ তার কার্যকারণনিরপেক্ষ খামখেয়ালিপনা নয়। তার অস্থির-চিত্ততার মূলে ছিল কতকগুলি গভীরতর কারণ, যেগুলি সতর্কভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, সে মূলতঃ শিক্ষাদীক্ষাবর্জিত একজন গ্রাম্য দোকানদার। দ্বিতীয়তঃ, বিনোদ যতই বিপথগামী হোক, তার পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃভক্তি বিষয়ে গোকুল ছিল স্থির-বিশ্বাসী। পিতার মৃত্যুর পর গৃহে বিনোদের অনুপস্থিতি তাকে বিস্মিত, চিন্তিত ও অস্থির করে তোলে। পিতৃকৃত উইলের জন্যে বিনোদ কি তাকে সন্দেহ করে অথবা ঘৃণা করে

অথবা শত্রু মনে করে? নইলে বিনোদ পিতৃ-বিয়োগের মতো এমন বিপর্যয়কর ঘটনার পরেও বাড়ি ফেরে না কেন? এ সমস্ত যদি মিথ্যাই হয়, তবে বিনোদের বিপথ-গামিতার সংশোধন কিরূপে সম্ভব? ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হবার সম্ভাবনাপূর্ণ হীরের টুকরো ভাইটির ওপর তার যে অগাধ বিশ্বাস ও তাকে নিয়ে তার যে অন্তহীন গর্ববোধ, তা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। তৃতীয়তঃ, সম্পত্তিলোভী মনোরমার বিনোদকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার বাসনায় তার অন্তরাত্মা আহত হয়। চতুর্থতঃ, পিতার আসন্ন শ্রাদ্ধকর্মের নানা ব্যবস্থাপনা, এবং অন্যদিকে বিষয়-সম্পত্তির ন্যস্ত দায়-দায়িত্ব ও নানা বিভেদকামী শক্তির চক্রান্ত শান্তপ্রকৃতি গোকুলকে ক্রমশঃ উদ্‌ভ্রান্ত ও উগ্রস্বভাব করে তোলে।

জগতের সরলহৃদয় নিরপরাধ মানুষগুলির ভাগ্যের বিড়ম্বনা এই যে, বিশ্বশুদ্ধ মানুষ তাদের ভুল বোঝে এবং তাদের প্রতি অবিচার করে; এমনকি, একান্ত আপন জনও তাকে পরিত্যাগ করে দূরে সরে যায়। বিনোদ গোকুলকে ভুল বুঝেছে, মনোরমা তার-প্রতি অবিচার করেছে, ভবানী তাকে পরিত্যাগ করে দূরে সরে গেছেন। তাকে সবাই ত্যাগ করলেও তার সততা তাকে ত্যাগ করেনি। তার চরিত্রের সেই কেন্দ্রীয় শক্তির প্রেরণায় সে বিমাতার প্রতি তার মাতৃভক্তিকে এবং তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রতি তার ভ্রাতৃস্নেহকে বিসর্জন দিতে পারেনি। শত আঘাতের বেদনা সত্ত্বেও বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে সে রেখেছে সদাজাগ্রত দৃষ্টি। এমনকি, বিনোদ যেখানে মাতার প্রতি উদাসীন, সেখানে গোকুল অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ। মনোরমার তীব্র বিষোদ্‌গার, শ্বশুর নিমাই রায়ের দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্ররোচনা তাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিনোদ এম. এ. পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়েছে। গোকুল তাতে ব্যথিত হয়েছে। আবার, লেখাপড়ায় যাতে তার সুমতি হয়, সেজন্যে সোনার তুলসীপাতার মূল্য হিসেবে পাঁচশো টাকা দিয়েছে কাশীর এক পণ্ডিতকে। ভবানী তাকে ত্যাগ করে বিনোদের বাসায় চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। গোকুল নানা অজুহাতে তাঁর যাত্রা বিলম্বিত করেছে। তাসত্ত্বেও ভবানী চলে গেলে সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছে, ‘ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?’ এই অকৃত্রিম স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে গোকুলের মাতৃভক্ত হৃদয়ের প্রকৃত মানচিত্র।

ভবানীর গৃহত্যাগের পর মনোরমার সঙ্গেও গোকুলের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। নিমাই রায়ের সঙ্গেও সে সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ইতিপূর্বে, চক্রবর্তীকে পুনর্নিয়োগ করার ব্যাপারে সে শ্বশুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মার আদেশই শিরোধার্য করেছে। পরে তার মার সম্পর্কে নিমাই রায় কটূক্তি করলে তাঁকে গোকুল শাসিয়ে উঠেছে, ‘চোপরাও বলছি! আমার মায়ের নামে ও রকম কথা কইলে ঘাড়ে ধরে বার করে দেবো।’

শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠের উইলকে কেন্দ্র করে নানা বিরুদ্ধশক্তির প্ররোচনায় মামলার ঝড় ওঠার উপক্রম হয়। ঝড় আর ওঠেনি। তার পূর্বেই গোকুল বিনোদের কাছে জানতে চায়, পিতৃসম্পাদিত উইলের পেছনে তার কোনরূপ জোচ্চুরির অস্তিত্বের কথা বিনোদ

বিশ্বাস করে কি না। সেদিন হৃদয়ের কাছে হৃদয়ের দাবি সাড়া পেল। সকল চক্রান্ত, ভুল-বোঝাবুঝির অবসানে হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেল। অগ্রজের পদতলে মাথা খুঁতে দিয়ে বিনোদ তার নিরপরাধ অগ্রজের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অস্বীকার করে নিজের চরিত্র সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিল। গোকুলও উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করেছিল এই দিনটির, যেদিন সে বিনোদকে তার প্রাপ্য সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হবে।

হৃদয়-ধর্মের পূজারী শরৎচন্দ্র গোকুলের আপাত-রূঢ়তার আড়ালে এক স্নেহবিগলিত ভ্রাতৃহৃদয় এবং অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্তির এক অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত খলতা, কপটতা ও স্বার্থপরতাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে হৃদয়-ধর্ম, যা কোনদিন ভুল করে না॥

অনুসরণী

১. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। [৩৭-৪১ পৃ.]

*২. বৈকুণ্ঠ তাঁর সমস্ত-সম্পত্তি গোকুলকে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন কেন? এই উইলের পরিণতি কি হয়েছিল? [৩৭-৪১ পৃ.]

*৩. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসের গোকুল চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর। [৪১-৪৪ পৃ.]

৪. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসের ভবানী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে তার স্বাভাবিকতা বিচার কর। [২২-২৬, ২৮, ৩০, ৩১-৩২ ও ৩৪, ৩৬ পৃ.]

৫. বিনোদ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করে, 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে তার অপরিহার্যতা বিচার কর। [২২, ২৫, ২৭, ৩০ ও ৩৪-৩৭ পৃ.]

৬. জয়গোপাল বাঁড়ুয্যে, নিমাই রায় এবং মনোরমা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। [২২, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৫-৩৭ পৃ. ৩০, ৩৩, ৩৭ পৃ. এবং ২৫, ২৭, ৩১, ৩৫ পৃ.]

৭. গোকুল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করেনি কেন? তাতে তার ফল কি হয়েছিল? [২৩ পৃ.]

৮. অকালে গোকুলের বিদ্যাশিক্ষায় ছেদ পড়ে কেন? তার পরিণাম কি হয়েছিল? [২৩ পৃ.]

*৯. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসের গোকুল ও বিনোদের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিরোধের কারণ কি? কিরূপে এই বিরোধের অবসান ঘটে? [৩৭-৪১ পৃ.]

১০. বৈকুণ্ঠ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি গোকুলকে উইল করে দিয়ে কি কোন ভুল করেছিলেন? নিজের উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। এই প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠের দূরদর্শিতা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়? [৩৭-৪১ পৃ.]

১১. গোকুলের চরিত্রের অসংযম ও অস্থিরমতিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কে তার পিতার বিশ্বাসের সংগতি কোথায়? [৪২-৪৩ পৃ.]

১২. বিনোদের সঙ্গে গোকুলের সম্পর্ক কতখানি স্বাভাবিক ছিল, তা বিশ্লেষণ করে দেখাও। [৪১-৪৪ পৃ.]

১৩. শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে চোখের জলের বাড়াবাড়ির যে অভিযোগ রয়েছে, তা 'বৈকুণ্ঠের উইল' সম্পর্কে কতখানি প্রযোজ্য, আলোচনা কর। [২২ পৃ.]

১৪. গোকুলের কথাবার্তায় ও আচরণে যে রূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তা কি তার চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? [৪১-৪৩ পৃ.]

১৫. অশিক্ষিত ও চারিত্রিক দৃঢ়তাবর্জিত গোকুলকে বৈকুণ্ঠের তাঁর সম্পত্তির যোগ্য পরিচালক বলে মনোনীত করার কারণ কি ছিল? [৪১-৪৪ পৃ.]

১৬. ভবানী বৈকুণ্ঠকে তাঁর সম্পত্তি গোকুলকে উইল করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন? ভবানীর পরবর্তীকালের আচরণ কি তাঁর সেই মনোভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ? [২৪-২৬, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২ ও ৩৪-৩৬ পৃ.]

১৭. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে বাংলার গ্রামগঞ্জের যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। [২৪, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭ পৃ.]

১৮. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে বুদ্ধিবৃত্তির ওপরে মানুষের হৃদয়-বৃত্তির জয় হয়েছে। তুমি কি এই অভিমত স্বীকার কর? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। [২২ ও ৪৩, ৪৪ পৃ.]

১৯. 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাস পাঠ করে শরৎচন্দ্রকে তোমার আদর্শবাদী না বাস্তববাদী কোন্ শ্রেণীর লেখক বলে মনে হয়? তোমার অভিমতের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। [২২, ৩৭ ও ৪১ পৃ.]

২০. টীকা লিখ: চক্রবর্তী মশাই [৩১-৩৬ ও ৩৮ পৃ.] হাবুর মা [২৮, ২৯, ও ৩৫ পৃ.], হেমাঙ্গিনী [২৮ ও ৩১ পৃ.], নন্দদুলাল [৩২ পৃ.]।

দেবী চৌধুরাণী

বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্দেহে বাংলা উপন্যাসের আদিপুরুষ। তাঁর রচিত চৌদ্দখানি উপন্যাসের মধ্যে 'দেবী চৌধুরাণী' ত্রয়োদশ-সংখ্যক। সর্বশেষ উপন্যাসত্রয়—আনন্দমঠ—দেবী চৌধুরাণী—সীতারাম—যা 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' নামে পরিচিত, দেবী চৌধুরাণী তার অন্যতম—মধ্যমণি। দেবী চৌধুরাণীর রচনাকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ; প্রকাশকাল ১৮৮৪। বাংলায় মুসলমান-রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ-রাজত্বের সূচনায় যে শাসন-শৃঙ্খলার অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তারই বিচিত্র প্রক্ষাপটে উপন্যাসখানির মূল কাঠামোটি স্থাপিত। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, দেবীসিংহ, হেষ্টিংস্, গুড্‌ল্যাড সাহেব—এঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও উপন্যাসখানি কিছুতেই ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। কারণ 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' এই মতাদর্শের মহান্ প্রবক্তা ও রূপকার ভবানী পাঠক এবং তাঁর যোগ্য ব্রতচারিণী শিষ্যা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে ইতিহাসের ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরাণীর সাদৃশ্য অতি সামান্য। দরিদ্র-দুহিতা, শ্বশুর-পরিত্যক্তা প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক সুদীর্ঘ সাধনার মধ্যস্থতায় দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত করলেও তার দেবীগিরির অন্তরালে চলে তার দুর্বার পতিপ্রেমের গোপন অভিযান—তার হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের গৌরবময় সংগ্রাম। নবাগত তত্ত্ব ও আদর্শের অভিসিঞ্চন সত্ত্বেও উপন্যাসের অন্তিম পর্বে প্রফুল্লের নারীধর্মেরই জয় বিঘোষিত হয়েছে। আর, ভবানী পাঠকের শিক্ষা এবং দীক্ষা তার যথার্থ সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে, প্রফুল্লের রাণীগিরির মধ্যে নয়, তার গার্হস্থ্য জীবনের শ্রী, সৌন্দর্য ও সফলতার মধ্যে। সেদিক দিয়ে 'দেবী চৌধুরাণী'কে নিঃসংকোচে তত্ত্বপ্রধান পারিবারিক উপন্যাস রূপে অভিহিত করা যায়। এমনকি, রোমান্সের বর্ণবিলাসও তুচ্ছ কথা, এ উপন্যাসের মূল সমস্যাই হলো ধনী-দরিদ্রের সমস্যা—ধনিকের গৃহে দরিদ্রের কন্যাদানের সমস্যা। তবে বঙ্কিম এ উপন্যাসে পাশ্চাত্য উপন্যাস-রীতির পরিবর্তে বাংলার প্রচলিত মঙ্গল কাব্যের রীতির অনুবর্তনে প্রফুল্লের ধনপ্রাপ্তি, রাণীগিরি থেকে তার স্বর্গারোহণ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। 'আনন্দ মঠে'র যেমন রাঢ় বাংলা, 'সীতারামে'র যেমন দক্ষিণবঙ্গ, 'দেবী চৌধুরাণী'র পটভূমিও তেমনি—বরেন্দ্রভূমি—উত্তরবঙ্গ।

বস্তু-সংক্ষেপ

ঘটনাস্থল বরেন্দ্রভূমি ; অর্থাৎ উত্তর বঙ্গ। রংপুরের কাছে একটি গ্রাম। গ্রামের নাম ভূতনাথ। ভূতনাথ গ্রামের জমিদার হরবল্লভ রায়ের একমাত্র পুত্র ব্রজেশ্বর। হরবল্লভ তাঁর পুত্রের বিবাহ দিলেন দুর্গাপুরের এক দীন দরিদ্র বিধবার কন্যা প্রফুল্লের সঙ্গে। প্রফুল্ল পরমা সুন্দরী এবং অত্যন্ত সুলক্ষণা। কেবলমাত্র এই কারণেই হরবল্লভ প্রফুল্লের মাতার অর্থ-সংগতির কথা বিচার-বিবেচনা করেন নি। কন্যার বিবাহে প্রফুল্লের মাতা যথাসর্বস্ব বিক্রী করে বরযাত্রীদের পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজন করালেন। কিন্তু গ্রামের লোকজনদের আপন জন মনে করে তাদের আহারাদি সংক্ষেপে সারবার ব্যবস্থা করেন। তাতে তারা অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে আহার না করে চলে যায় এবং রটনা করে যে, প্রফুল্লের মা কুলটা, জাতিভ্রষ্টা। সেইজন্যে প্রফুল্লের পাকস্পর্শে

তারা হরবল্লভের বাড়িতে ভোজনের নিমন্ত্রণেও অনুপস্থিত রইলো। হরবল্লভ প্রফুল্লের পিতৃগ্রামের নীচমতি ব্যক্তিদের মিথ্যা রটনায় বিশ্বাস স্থাপন করে পুত্রবধূকে ত্যাগ করলেন এবং পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন। সেই থেকে হরবল্লভ তাঁর প্রথম পুত্রবধূর কোন খোঁজখবর নিতেন না।

প্রফুল্লের মা নিরুপায় হয়ে চরকা কেটে, ধার করে, ভিক্ষা করে, কোন-কোনদিন একবেলা খেয়ে, কোন-কোনদিন অনাহারে থেকে অতিকষ্টে দিনযাপন করতে লাগলেন। শেষে দিন আর যায় না। প্রফুল্ল একদিন বেঁকে বসলো, সে আর অন্যের কাছে চেয়ে-চিন্তে খাবে না; শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে, খাবে; নইলে সে খাবে না। শ্বশুর-গৃহে তাকে নিতে না এলেও সেখানে যেতে তার কোন লজ্জা-সংকোচ নেই; সেখানকার অন্নে-তার অধিকার আছে। অগত্যা মেয়ের জিদের কাছে মাতাকে নতি স্বীকার করতে হলো। প্রফুল্লের জননী অভুক্ত অবস্থায় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন ভূতনাথ গ্রামে হরবল্লভের বাড়িতে।

ব্রজেশ্বর-জননী তাঁকে বিনা-আমন্ত্রণে বাড়িতে উপস্থিত দেখে ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর দুর্ব্যবহারে অপমানিত হয়ে প্রফুল্লের মা প্রফুল্লকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে রেখে বিদায় নিলেন। কিন্তু প্রফুল্লের করুণ-সুন্দর মুখশ্রী এবং তার শান্তনম্র সম্ভাষণে ব্রজেশ্বর-জননীর মন নরম হলো। তিনি প্রফুল্লের ব্যাপারে হরবল্লভের মন গলাতে চললেন। সমস্ত শুনে হরবল্লভ তেলেবেগুনে উঠলেন জলে এবং সেই রাতেই 'বাগ্দী বেটিকে' ঝাঁটা মেরে বিদায় করতে আদেশ দিলেন।

ইত্যবসরে প্রফুল্লকে একা পেয়ে ব্রজেশ্বরের বালিকা-বধূ সাগর তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সন্দেশ দিয়ে আপ্যায়িত করলো। তার কাছে প্রফুল্ল শুনলো যে, তাদের আর এক সতীন আছে। তার নাম নয়ান বৌ। সাগরের আন্তরিক বন্ধুত্বে মুগ্ধ হলো প্রফুল্ল। কৌতুকপরায়ণা সাগরের চেষ্টায় সে-রাতে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে প্রফুল্লের সাক্ষাৎ হলো। প্রফুল্লের রূপে মুগ্ধ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে গ্রহণ করবার জন্যে পিতাকে একবার অনুরোধ করে দেখতে চাইলো। কিন্তু প্রফুল্ল তাকে জানালো যে, তাকে নিয়ে পিতার সঙ্গে তার কোন বিবাদ হোক, তা তার অভিপ্রেত নয়। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের ভরণপোষণের অভাব আংশিক মেটাবার জন্যে তার নামাঙ্কিত নিজস্ব আংটিটি তাকে দিয়ে দেয়। কিন্তু প্রফুল্ল প্রতিশ্রুতি করে যে, অনাহারে মৃত্যুর বিনিময়েও সে আংটিটি রক্ষা করবে।

সে-রাতে আহারের সময় হরবল্লভের কাছে সর্বসুলক্ষণা বধূ প্রফুল্লকে গ্রহণ করবার জন্যে ব্রজেশ্বর-জননীর কাতর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি প্রফুল্লের ভরণপোষণের উপায় নির্দেশ করতে জানালেন। প্রত্যুত্তরে হরবল্লভের উক্তি—'চুরি করুক, ডাকাতি করুক।'

পরদিন প্রভাতে প্রফুল্ল সকরুণ অশ্রুপাতের মধ্যে ব্রজেশ্বরের কাছে বিদায় নিল। বিদায়কালে মুখরা নয়ান বৌ প্রফুল্লকে হরবল্লভের কঠোর উক্তি—'চুরি করুক, ডাকাতি করুক' ইত্যাদি স্মরণ করিয়ে দিল। উত্তরে প্রফুল্ল শুধু জানালো, 'দেখা যাবে।' আর,

সাগরকে সে জানিয়ে গেল যে, সাগর পিত্রালয়ে গেলে সে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। প্রফুল্লের মা বাগানের দ্বারের কাছে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কন্যাকে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।

এবার প্রফুল্লের মা পড়লেন জ্বরে। চিকিৎসার অভাবে এবং অনিয়ম ও অত্যাচারে জ্বর ক্রমাগত বাড়তে লাগলো। শেষে তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বিকার দেখা দিল। প্রফুল্লের মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিষ্কৃতি পেলেন দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে। গ্রামবাসীরা, যারা প্রফুল্লের মায়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়েছিল এবং প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মায়ের জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল, তারাই সমবেত হয়ে প্রফুল্লের মায়ের সৎকার করলো এবং শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করলো। তারা প্রফুল্লের মাতার শ্রাদ্ধে হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ পাঠালো ; জানালো, প্রফুল্লের মা ছিলেন নির্দোষ ; তাঁর কলঙ্ক যা-কিছু, সবই তাদের মিথ্যা রটনা মাত্র। কিন্তু হরবল্লভ তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। ভাবলেন, ওরা টাকা খেয়ে প্রফুল্লের পক্ষে ওকালতি করতে এসেছে। ফলে, প্রফুল্লের প্রতি তাঁর মনোভাব হলো কঠোরতর। প্রফুল্লের সেই বিপদের কথা শুনে ব্রজেশ্বর একদিন রাতে গোপনে দুর্গাপুরে গিয়ে তাকে দেখে আসার জন্যে মনস্থির করলো।

মাতৃহীনা প্রফুল্লকে একা ঘরে থাকতে হয়। রাতে প্রতিবেশী বিধবা ফুলমণি নাপতিনী তার ঘরে এসে ঘুমোয়। এই ফুলমণি ছিল অত্যন্ত ভ্রষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষ। সে গ্রামের জমিদারের নীচপ্রকৃতি গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তীর বিশেষ অনুগৃহীতা। তার চক্রান্তে একদিন রাতে দুর্লভচন্দ্র প্রফুল্লের হাত-মুখ বেঁধে তাকে পাল্কিযোগে অপহরণ করে নিয়ে যায়। দস্যু-পরিকীর্ণ বনপথ দিয়ে পালাবার সময় বেহারারা দুজন অপরিচিত পথচারীকে দূর থেকে দেখে তাদের ডাকাত মনে করে পাল্কি ফেলে প্রাণভয়ে যায় পালিয়ে। দস্যুভয়ে ভীত দুর্লভচন্দ্রও পলায়ন করে। ফুলমণিও করে তার অনুসরণ। বাড়িতে ফিরে এসে ফুলমণি প্রফুল্লের অন্তর্ধানের এক অবিশ্বাস্য গল্প দেয় রটিয়ে—প্রফুল্লের পরলোকগত মাতা নাকি তাকে সশরীরে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

আকস্মিক বিপৎপাতে প্রফুল্ল প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে সময় লাগে নি। সে পাল্কির মধ্যে নিজের হাত ও মুখের বাঁধন খুলে ফেলেছিল। পাল্কি ফেলে বেহারারা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে সে নতুন কোন বিপদের সম্ভাবনার কথা অনুমান করলো। পাল্কির দরজা সামান্য ফাঁক করে সে দেখলো, দুটি লোক আসছে। তারা নিঃশব্দে চলে গেলে প্রফুল্ল আর পাল্কিতে থাকা নিরাপদ মনে না করে বাইরে এলো এবং পুনরায় ডাকাতদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সে বনের ভেতর অদৃশ্য হলো। প্রথমে সে একটি অস্পষ্ট পথ-রেখা ধরে অগ্রসর হতে লাগলো। পথ-রেখা দেখে সে গ্রাম-জনপদের অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলো। গৃহে প্রত্যাবর্তনেও তার ভয়—যদি ডাকাতরা আবার তাকে অপহরণ করে। কিন্তু খানিক পরে পথের রেখাও গেল মিলিয়ে। গভীর হতাশার মধ্যে প্রফুল্ল বনের মধ্যে ইতস্ততঃ চলতে চলতে একটি ভাঙা বাড়ির সামনে উপস্থিত হলো। ঘরের দরজা খোলা, কোন

মানুষের সাড়াশব্দ নেই। অথচ মনুষ্যবাসের চিহ্ন বর্তমান। হঠাৎ সে এক বৃদ্ধের কাতরানি শুনে একটি ঘরে উপস্থিত হয়ে একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধকে দেখতে পেল। বৃদ্ধের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। প্রফুল্ল তার যথাসাধ্য সেবাশুশ্রূষা করলো। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মাটির নীচে একটি ঘরের বায়ুকোণে সংরক্ষিত তার সমুদয় গুপ্তধন তাকে দান করে গেল। প্রফুল্ল বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে যথাবিহিত সমাধিস্থ করে তার গুপ্তধন আবিষ্কার করলো। সেই গুপ্তধন হলো, কুড়ি ঘড়া সোনার মোহর।

পরের দিন সকালে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর প্রফুল্ল অরণ্যবাসই শ্রেয় মনে করলো। তার মতো অসহায় অনাথের পক্ষে গৃহ ও অরণ্য—দুইই সমান। বরং গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তার ধনরত্নের সংবাদ পেলে চোর-ডাকাতে সব লুট করে নেবে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে রন্ধনের আয়োজন করতে গিয়ে প্রফুল্ল দেখলো, গৃহে সব জিনিসেরই অভাব। তখন একটি মোহর নিয়ে সে হাটের সন্ধানে যাত্রা করলো। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে তার সাক্ষাৎ হলো এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তাঁর গায়ে নামাবলী, কপালো ফোঁটা, মস্তক মুণ্ডিত। প্রফুল্ল এই ব্রাহ্মণের কাছে তার ধনপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য বিষয় গোপন করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে কিছুই গোপন করতে পারলো না। ব্রাহ্মণের আত্মপরিচয়ে প্রফুল্ল জানতে পারলো যে, তিনি অন্য কেউ নন—দস্যু-দলপতি দুর্ধর্ষ ভবানী পাঠক—যাঁর ভয়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। ভবানী পাঠক দেখলেন, প্রফুল্ল সুলক্ষণা এবং বুদ্ধিমতী। প্রফুল্লও দেখলো, এ অবস্থায় ভবানী পাঠকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নিজের কুটিরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি দামামায় আঘাত করা মাত্র পঞ্চাশজন কালান্তক যমের মতো ডাকাত লাঠি হাতে এসে উপস্থিত হলো। প্রফুল্লকে দেখিয়ে ভবানী পাঠক বললেন—"এই বালিকাকে চিনে রাখো। একে আমি 'মা' বলেছি। এর যেন কোন অনিষ্ট না হয়।" প্রফুল্ল তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এলো সেই ভাঙা বাড়িতে। দাম নেবার জন্যে সঙ্গে এলেন ভবানী পাঠক। প্রফুল্ল তাঁকে তার ধনপ্রাপ্তির কথা সবিস্তারে জানালো। ভবানী পাঠক প্রফুল্লের মধ্যে একজন আদর্শ-চরিত্র, নির্লোভ, স্থিরবুদ্ধি নেত্রীর সন্ধান পেলেন। এখন প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। ভবানী পাঠক তাকে নিজের কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হলো। তার দেখাশোনার জন্যে দুজন স্ত্রীলোক প্রেরিত হলো—একজন দিবা, অন্যজন নিশি। সেখানেই প্রফুল্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো ভবানী পাঠকের বিশ্বস্ত অনুচর—রঙ্গরাজের।

এদিকে যে-রাতে প্রফুল্ল দুর্লভচন্দ্রের অনুচরদের দ্বারা অপহৃত হয়েছিল, সেই রাতেই ব্রজেশ্বর অশ্বারোহণে প্রফুল্লের সন্ধানে দুর্গাপুরে আসে। প্রফুল্লের সাক্ষাৎ না পেয়ে সে ভগ্নমনোরথে সেই রাতেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। প্রফুল্লের চিন্তায় ব্রজেশ্বরের শরীর ও মন দিন দিন ভেঙে পড়তে থাকে। সেই অবকাশে প্রফুল্লের অন্তর্ধানকাহিনী রূপান্তরিত হয়ে ভূতনাথ গ্রামে এসে পৌঁছলো—প্রফুল্লের মৃত্যু ঘটেছে। জ্বরের বিকারে ব্রজেশ্বরের শরীর-মন আরো ভেঙে পড়লো। শেষে সে শয্যা গ্রহণ করলো। তাই নিয়ে বাড়িতে উঠলো অশান্তির ঝড়। ব্রজেশ্বর-জননী শপথ করলেন, ব্রজেশ্বর সুস্থ না

হলে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করবেন। নিরুপায় হরবল্লভ প্রমাদ গণলেন। যাই হোক, ব্রজেশ্বর 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ' শ্লোকটি প্রবলভাবে আঁকড়িয়ে ধরে প্রফুল্লের শোক বিস্মৃত হবার চেষ্টা করতে থাকে।

অন্যদিকে, বনমধ্যে ভবানী পাঠকের পরিকল্পনা-অনুসারে শুরু হলো প্রফুল্লের শিক্ষা। আহার, পরিচ্ছদ, শয্যা ও নিদ্রা ইত্যাদিতে ভবানী পাঠকের নির্দেশমতো তাকে কঠোর ব্রহ্মচর্যে অভ্যস্ত করানো হলো। শারীরিক ব্যায়ামে তার দেহ হলো সুগঠিত এবং কঠোর ব্রহ্মচর্যে তার মনের সংযম হলো সুদৃঢ়। এইভাবে ভবানী পাঠক প্রফুল্লের মধ্যে যে ভালো ইস্পাতের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা দশ বছরের শিক্ষায় শানিত অস্ত্রে—দস্যুদল-অধিনেত্রী দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হলো। কিন্তু ভবানী পাঠক লক্ষ্য করেন নি, প্রফুল্ল একাদশীতে হিন্দু সধবাদের মতো মৎস্য ভক্ষণ করতো।

দেশব্যাপী তখন অরাজকতা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কুখ্যাত ইজারাদার দেবীসিংহের নিষ্ঠুর অত্যাচার আর দুর্ধর্ষ ডাকাতদলের প্রতিকারহীন উপদ্রব। জমিদার হরবল্লভ রায়ের তালুকের চালানী টাকা দস্যুদলের হাতে লুণ্ঠিত হলো। ইজারাদারের খাজনা পড়লো বাকি। দেবীসিংহ মাত্র আড়াই শো টাকায় হরবল্লভের দশ হাজার টাকা মূল্যের তালুক কিনে নিল। তবু হরবল্লভের ঋণ শোধ হলো না। অগত্যা অত্যাচারের ভয়ে হরবল্লভকে আরো কিছু সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ-শোধের জন্যে অর্থ-সংগ্রহ করতে হলো। সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় তাঁর আর্থিক সংগতি ক্রমাগত দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। এদিকে, দেনায় এবং সুদে দেবীসিংহের মোট পাওনা গিয়ে দাঁড়ালো পঞ্চাশ হাজার টাকায়। তখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হল হরবল্লভের বিরুদ্ধে। অর্থ-সংগ্রহের জন্যে ব্রজেশ্বরকে যেতে হলো সাগরের পিতার কাছে।

সাগরের পিতা সংগতিবান্ ব্যক্তি। টাকা ধার দিলে একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। সাগর তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে সংরক্ষিত অর্থে ব্রজেশ্বরের পিতাকে বিপন্মুক্ত করে তার অপচয় করতে তিনি তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাতে ব্রজেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে শ্বশুরালয় ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। শাশুড়ীর অনুনয়, সাগরের মিনতি—সবই ব্যর্থ হলো। শেষে পরিস্থিতি এমন হলো যে, ক্রোধের অসতর্ক মুহূর্তে সাগরের গায়ে ব্রজেশ্বরের পা ঠেকে যায়। সাগর তাকে পদাঘাত মনে করে শপথ করে, সে যদি যথার্থ ব্রাহ্মণ-কন্যা হয়, তবে ব্রজেশ্বরকে তার পা—এমন সময় জানালায় অকস্মাৎ দেবী চৌধুরাণী আবির্ভূত হয়ে তার শপথের অবশিষ্টাংশ পূরণ করে দেয়—সাগরের পা কোলের ওপর নিয়ে চাকরের মতো টিপে দিতে হবে। ব্রজেশ্বরও পাল্টা শপথ করে, যদি সে সাগরের পা টেপায় বাধ্য না হয়, তবে সে অব্রাহ্মণ। ক্রুদ্ধ ব্রজেশ্বর শ্বশুরালয় ত্যাগ করে। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে সাগরও বেরিয়ে পড়ে প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্যে।

অসামান্য শক্তিধর ও সুকৌশলী রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের বজরায় চড়াও হয়ে তাকে দেবীর বজরায় বন্দী করে আনলো; দেবাবেশিনী নিশির মধ্যস্থতায় ব্রজেশ্বর এক কড়া কানাকড়ি মূল্যে বিক্রীত হলো অপরিচিতা এক নারীর কাছে। অবগুণ্ঠিতা এই

অপরিচিতা নারী তার বাক্‌-চাতুর্যে ব্রজেশ্বরকে তার পা টিপতে বাধ্য করে। ঠিক সেই মুহূর্তে অবগুণ্ঠিতা তার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে। দেখা গেল, সে অন্য কেউ নয়—সে সাগর। সাগর প্রমাণ করলো, সে যথার্থ ব্রাহ্মণ-কন্যা। ব্রজেশ্বরের বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেল। তার ক্রোধও ক্রমে প্রশমিত হলো। স্থির হলো, সাগর ব্রজেশ্বরের সঙ্গে যাবে। কিন্তু বিদায়ের আগে দেবীর সঙ্গে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ করার জন্যে আদেশ এলো। তদনুযায়ী ব্রজেশ্বর দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে পিতাকে ঋণমুক্ত করবার উপযুক্ত এক ঘড়া মোহর দেবীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে দেবী মর্যাদাস্বরূপ ব্রজেশ্বরের হাতে পরিয়ে দেয় তার হাতের আংটি। ব্রজেশ্বর সেই অর্থ দান হিসেবে গ্রহণ না করে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করলো। এবং কথা হলো, ঋণ-পরিশোধের জন্যে সে বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের আগে ত্রিবেণীর সন্ধানপুরের কালসাজির ঘাটে অর্থসহ উপস্থিত হবে। দেবী চৌধুরাণীর বজরা সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

মোহরের ঘড়া এবং সাগরকে নিয়ে ব্রজেশ্বর তার নৌকায় স্বগৃহে ফিরে চলেছে। দেবী চৌধুরাণীর বজরাও পাল তুলে দিয়ে অজানা স্থানের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। ব্রজেশ্বর দেবী চৌধুরাণীর প্রদত্ত আংটিতে নিজের নাম দেখে এবং সাগরের স্বীকারোক্তিতে জানতে পারলো যে, দেবী চৌধুরাণী অন্য কেউ নয়; সে প্রফুল্ল। ব্রজেশ্বর বুঝলো, প্রফুল্লের মৃত্যু-সংবাদ মিথ্যা রটনা মাত্র। তার মন আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে পড়লো, প্রফুল্ল ডাকাত—দস্যুবৃত্তি তার পেশা। ব্রজেশ্বরের মনের সব আনন্দ হঠাৎ নিবে যায়।

ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে শুরু হলো তুমুল বিপর্যয়। দেবীগিরিতে তার আর সাধ নেই। সে আসলে প্রফুল্ল। প্রফুল্লই সে হতে চায়। নিশির কাছে তার এই দুর্বলতা ধরা পড়লে সে তা চাপা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু রাণীগিরির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই তার এখন একমাত্র প্রার্থনা।

তীরে বজরা বেঁধে রেখে প্রফুল্ল একা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ এক শিবমন্দিরে গিয়ে ভবানী পাঠকের দেখা পেল। প্রফুল্ল দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করতে চায়। কিন্তু ভবানী পাঠক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যে দস্যুবৃত্তিকে গর্হিত কর্ম মনে করেন না। কথায় কথায় ব্রজেশ্বর রায়কে সাহায্যের প্রসঙ্গ ওঠে। কুখ্যাত হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বরকে সাহায্য করা ভবানী পাঠক সমর্থন করলেন না। কারণ তিনি জানেন, হরবল্লভের দুর্ব্যবহারেই তাঁর এক বেহান ও এক পুত্রবধূর মৃত্যু ঘটে। যাই হোক, ইজারাদারদের অত্যাচারে বহু ব্যক্তি বর্তমানে খাদ্যাভাবে মৃত্যুপথযাত্রী। দরবার করে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। সেইজন্যে আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার ডাকা হয়েছে। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল, এই তার শেষ রাণীগিরি; এ ধরনের কাজে তার আর কোন আগ্রহই নেই।

বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে নির্দিষ্ট দিনে দেবীর দরবার বসলো। দেবী সারাদিন উপবাসী থেকে দশ সহস্র দরিদ্রকে অকাতরে ধন বিতরণ করলো। রংপুরের কালেক্টর গুড্‌ল্যাড

সাহেবের কাছে এর সংবাদ কিছুটা বিকৃত হয়ে পৌছলো—দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতের দল প্রচুর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে রাশি রাশি টাকাকড়ি নিয়ে যে-যার ঘরে ফিরছে।

এদিকে, গৃহে প্রত্যাগত ব্রজেশ্বর পিতাকে তার অর্থ-সংগ্রহের সুসংবাদ দিল। হরবল্লভ খুশী হলেন; কিন্তু পরে কুখ্যাত দস্যুদলনেত্রী দেবী চৌধুরাণীর কাছ থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে শুনে তিনি কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করলেও পুত্রমুখে ঋণ-পরিশোধের নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের সঠিক বার্তাটি পেয়ে তিনি দেবী চৌধুরাণীকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্যে এঁটে ফেললেন একটি গোপন অভিসন্ধি।

ততক্ষণে অন্তঃপুরে ব্রজেশ্বরের নতুন বিবাহের সংবাদ বেশ ফলাও করে প্রচারিত হয়ে গেছে। ব্রজেশ্বরের পিতামাতাও একমত হলেন যে, যদি ব্রজেশ্বর নতুন বিবাহ করে সুখী হয়, তাতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই।

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আগতপ্রায়। কিন্তু দেবী চৌধুরাণীর ঋণশোধে হরবল্লভের কোন আগ্রহ না দেখে ব্রজেশ্বর চিন্তিত হলো। হরবল্লভ ষষ্ঠীর দিন গৃহে প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়ে যাত্রা করলেন বাড়ি থেকে। তিনি সোজা রংপুরের কালেক্টর সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলেন এবং সঙ্গে পাঁচশো সিপাই দিতে পরামর্শ দিলেন—তিনি দেবী চৌধুরাণীকে ধরিয়ে দেবেন। তদনুযায়ী হরবল্লভকে সঙ্গে নিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট ব্রেনান দেবীকে ধরতে বেরিয়ে পড়লেন। লেফ্‌টেন্যান্ট পাঁচখানা ছিপে হরবল্লভ আর কিছু সিপাই নিয়ে সন্ধানপুরের কালসাজির ঘাটের দিকে চললেন। আর, দেবী যাতে জঙ্গলের পথে পালাতে না পারে, সেজন্যে জঙ্গলের পথেও কিছু সিপাই পাঠানো হলো। দেবী রাণীর হাতেও এক হাজার সুদক্ষ বরকন্দাজ ছিল। তাদের অস্ত্র ছিল লাঠি। এই লাঠিয়ালদের অসাধ্য কোন কাজ ছিল না।

ঘাটে দেবীর বজরা বাঁধা। বজরায় কোন লাঠিয়াল, এমনকি কোন পুরুষ মানুষ নেই। দেবীকে ধরবার জন্যে যখন একটি বিরাট চক্রান্ত রূপায়িত হতে চলেছে, তখনই দেবী সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় বজরায় বসে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে দিবা ও নিশির সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় মগ্ন। অথচ সে জানে, ইংরেজ সিপাইরা সসৈন্যে তাকে ধরবার জন্যে আসছে। সে তার দলের অন্যান্যদের বাঁচাবার জন্যে স্বয়ং ধরা দিতে কৃতসংকল্প। একথা শুনে দিবা ও নিশি বিব্রত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় একখানি পান্‌সিযোগে ব্রজেশ্বর এসে উপস্থিত। সে দেবীর ঋণশোধের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি। পরে আবার কবে কোথায় দেখা হবে, তা সে জানতে চায়। উত্তরে দেবী অশ্রুপূর্ণ চোখে জানালো, আর দেখা হবে না। ঋণ-পরিশোধে প্রয়োজন নেই। গরীব-দুঃখীদের মধ্যে ঐ অর্থ বিলিয়ে দিলেই হবে। এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে ব্রজেশ্বর অভিভূত হয়ে দেবীর হাত ধরে তাকে প্রফুল্ল নামে ডেকে বসে। ফলে, বাঁধ-ভাঙা আবেগে প্রফুল্লের দুচোখে নামলো অশ্রুর বন্যা। ব্রজেশ্বরের চোখেও আজ অশ্রু কোন বাধা মানলো না। প্রফুল্লের অনুধ্যানেই তার গত দশটি বছর কেটেছে। কিন্তু তার সর্বাধিক মানসিক যন্ত্রণার কারণ—প্রফুল্লের দস্যুবৃত্তি। তার উত্তরে প্রফুল্ল তার কাছে স্বীকার করলো যে, সে কোনদিন ডাকাতি করেনি, ডাকাতির একটি পয়সা স্পর্শ করেনি, কঠোর

সংযমের মধ্যে থেকে সে শুধু দেবতাজ্ঞানে মনে মনে ব্রজেশ্বরেরই পূজা করেছে, অন্য কোন দেবতাকে সে জানে না। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লের এই সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে লজ্জিত, বিস্মিত ও পুলকিত হলো। নিজেকে তার আজ প্রফুল্লের সামনে বড়ো নিষ্প্রভ মনে হলো। প্রফুল্লের এখন আর ইংরেজদের হাতে ধরা দিতে এবং মৃত্যুবরণ করতে কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু ব্রজেশ্বর এবং নিশি ও দিবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি হবে? সংকট আসন্ন। সে ব্রজেশ্বরের হাতে নিশি ও দিবার নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দিয়ে স্বয়ং ধরা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

কিন্তু তার এই সংকল্পে ব্রজেশ্বর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। ধরা না দেবার জন্যে সে তাকে অনুনয় করে। সে তার পিতাকে অনুরোধ করে তাকে তার সংসারের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু এদিকে যে বড়ো দেরী হয়ে গেছে! এখন আর ফেরার উপায় নেই। ব্রজেশ্বরও প্রফুল্লকে মৃত্যুর মুখে ফেলে এক তিল নড়বে না। এ বিষয়ে সে কৃতসংকল্প। এমন সময় আকাশের অবস্থা দেখে প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে উঠলো। হয়তো শেষ পর্যন্ত সংকটত্রাণের একটা উপায় হতে পারে। কিন্তু হরবল্লভের উপায় কি হবে? ব্রজেশ্বর এই প্রথম শুনলো, প্রফুল্লকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দেবার চক্রান্তের নাটের গুরু হচ্ছেন তার পিতৃদেব স্বয়ং হরবল্লভ। তিনিই এ অভিযানের গোয়েন্দা। তবু তাঁর প্রাণরক্ষাও প্রফুল্লের লক্ষ্য।

বনপ্রান্তে রণভেরী বেজে উঠলো। এ তূর্যধ্বনি রঙ্গরাজের। কিছুক্ষণের মধ্যেই রঙ্গরাজ বজরায় এসে উঠলো। জঙ্গলের ভেতর থেকে অগণিত মানুষের স্রোত। রঙ্গরাজ ভবানী পাঠকের আজ্ঞানুসারে বরকন্দাজ সৈন্য সংগ্রহ করে সিপাইদের ঘিরে ফেলেছে। রঙ্গরাজের কথায় দেবী মর্মাহত হলো। একজন স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষার জন্যে হবে কত লোকক্ষয় এবং রক্তপাত! না, তা সে হতে দেবে না।

এদিকে, সিপাইদের পাঁচখানা ছিপ নিকটবর্তী হতে লাগলো। সেদিকে দেবীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। সে দূর আকাশপ্রান্তে একখানা কালো মেঘের টুকরো দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বজরার ছাদ থেকে নেমে এলো। শঙ্খনাদ করে সে তার লোকজনদের প্রস্তুত হবার সংকেত দিল।

ঢাল সড়কি হাতে অগণিত বরকন্দাজ সৈন্য বন থেকে বেরিয়ে এসে বজরা ঘিরে দাঁড়ালো। সিপাইদের ছিপ এসে তাদের ঘিরে ফেললো। বরকন্দাজদের মধ্যে যারা মাঝিমাল্লা ছিল, তারা বজরায় উঠে যে-যার জায়গায় বসলো। তারপর বরকন্দাজ আর সিপাইদের মধ্যে বেধে গেল তুমুল লড়াই। দেবী দেখলো, তার নির্দেশমতো কাজ হয়নি। সে সেই মুহূর্তে সাদা নিশান তুলে ধরে ব্রজেশ্বরের হাতে দিয়ে পরামর্শের জন্যে ভেতরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লড়াই থেমে গেল। রঙ্গরাজ বজরায় এসে ব্রজেশ্বরের হাতে সাদা নিশান দেখে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যায়। পরে বুঝতে পারে, দেবীর কোন গোপন অভিসন্ধি আছে। ভবানী ঠাকুর ওদিকে লড়াই চালিয়ে চলেছেন। দেবী রঙ্গরাজকে দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই নিষ্প্রয়োজন। আকাশে ঈশ্বর তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করছেন। ভবানী ঠাকুর আকাশে আসন্ন

কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে যুদ্ধ থামিয়ে বরকন্দাজ সৈন্যদের নিয়ে স্বস্থানে সরে গেলেন।

এদিকে, রঙ্গরাজ সাদা নিশান নিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেবের ছিপে উঠে তাঁকে জানালো, একা দেবী চৌধুরাণী ধরা দেবেন; তবে আর কেউ নয়। সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি সবাইকে ধরতে এসেছেন। অথচ বরকন্দাজ সৈন্যরা সব জঙ্গলে পালিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, ঝড় আসন্ন দেখে তিনি আর ওদের ধরবার জন্যে সিপাইদের অজানা জঙ্গলে পাঠালেন না। কিন্তু সাহেব বজরা দখল করবেন। তিনি রঙ্গরাজের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বজরায় উঠলেন। দেবীর আদেশে বজরায় যার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলে দেওয়া হলো। রঙ্গরাজ সাহেবকে নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে এলো। সুসজ্জিত কক্ষ। দুটি মসনদে বহুমূল্য বেশবাস ও রত্নালংকার ভূষিত হয়ে নিশি ও দিবা বসে আছে। একপাশে সামান্য বেশে দাঁড়িয়ে আছে দেবী। সাহেব জানতে চাইলেন, কে দেবী চৌধুরাণী। নিশি, দিবা আর দেবী—সবাই নিজেকে দেবী চৌধুরাণী বলে পরিচয় দেয়। তখন নিশানদিহির জন্যে গোয়েন্দা হরবল্লভের ডাক পড়লো। হরবল্লভ দেবীকে কখনো দেখেননি। তিনি নিশানদিহি করবেন কিরূপে? শেষে ডাক পড়লো গোয়েন্দার ছেলে ব্রজেশ্বরের।

ব্রজেশ্বর এলো। সে বললো, দেবীকে সে চেনে ঠিকই, কিন্তু সে দেবীকে চিনিয়ে দেবে না। সাহেব ক্রোধে গর্জন করে উঠলো। ব্রজেশ্বর তার গালে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত সহ স্মরণ করিয়ে দিল যে, সে গোয়েন্দা নয়। সাহেবের গালে চড়! কক্ষের মধ্যে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ কাঁপিয়ে শুরু হলো প্রবল কালবৈশাখীর ঝড়। বজরা টলমল করতে করতে তীরবেগে ছুটতে লাগলো। সাহেব ও হরবল্লভ হলেন কার্যতঃ দেবীর বজরায় বন্দী।

সাহেব ও ব্রজেশ্বরের মধ্যে ঘুষাঘুষির উপক্রম দেখে হরবল্লভ পুত্রকে দিয়ে সাহেবের কাছে ক্ষমা চাওয়ালেন। বজরা ঝড়ের বেগে ভেসে চলেছে। নিশির হুকুম, সাহেব ও হরবল্লভের ফাঁসি। হরবল্লভ ভয়ে নিশির কাছে প্রাণ-ভিক্ষা করেন। নিশি তাঁর প্রাণদণ্ড মকুব করে; কিন্তু একটি শর্তে—হরবল্লভকে বিনিময়ে এক কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীনকে উদ্ধার করতে হবে। হরবল্লভ তাঁর ছেলের সঙ্গে কুলীনকন্যার বিবাহে সম্মত হলেন।

ঝড় থামলো। বজরার গতিবেগ স্তিমিত হলো। সাহেবকে মুক্তি দেওয়া হলো। পথ-খরচ হিসাবে দেবী রাণী তাঁকে একশো মোহর দেয়। হরবল্লভ বউভাতের আয়োজন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি রওনা হলেন।

অতএব দেবীর মৃত্যু হলো। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ি চললো। এবার বিদায়ের পালা। রঙ্গরাজকে উপযুক্ত সান্ত্বনা দিয়ে প্রফুল্ল তাকে লাঠিবাজি ত্যাগ করে বাকি জীবন ঠাকুরের সেবায়েত হয়ে কাটাবার পরামর্শ দেয়। নিশি ও দিবার জন্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা হলো। বজরায় যেসব মূল্যবান সম্পদ আছে, তা দিয়ে তারা তাদের অভাব মিটিয়ে যা বাকি থাকবে, তা তারা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দেবে বিলিয়ে। প্রফুল্ল

নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ি যাবে, নিশি তা হতে দিল না। সে তার নিজের মূল্যবান অলংকারে প্রফুল্লকে সাজিয়ে দিল। তারপর পরস্পরের অশ্রুবর্ষণে বিদায়ের মুহূর্তটি অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠলো। দেবী চৌধুরাণীর সুসজ্জিত বজরাখানি শেষ পর্যন্ত ইন্ধনের উপযোগী চেলা কাঠে পরিণত হলো।

প্রফুল্লের বজরা এসে ভিড়লো ভূতনাথ গ্রামের ঘাটে। বৌ দেখার জন্যে গ্রামময় সাড়া পড়ে গেল। ব্রজেশ্বরের নতুন বৌ। বরবধূ এসে পিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে। ব্রজেশ্বর-জননী বরণ করতে গিয়ে ঘোমটার আড়ালে বধূর মুখ দেখে চমকে গেলেন। তিনি প্রতিবেশিনীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির হাত থেকে বধূকে বাঁচিয়ে ঘরে এনে তুললেন। প্রতিবেশিনীরা তাতে চটে গিয়ে অসাক্ষাতে বহুবিচিত্র নিন্দা রটাতে লাগলো।

জনকোলাহল এখন শান্ত। নিভৃতে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎ হলো। মুহূর্তমধ্যে দুজনেই দুজনের মন বুঝে নিল। কিন্তু এখন হরবল্লভকে কে সমস্ত বিষয়টা বোঝাবে? ব্রজেশ্বর-জননী সেই গুরুদায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিজের হাতে নিলেন। ব্রজেশ্বর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আগে ভালোয়-ভালোয় পাকস্পর্শ টা মিটে যাওয়া দরকার। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাকস্পর্শ পর্ব মিটে গেল। এবার ব্রজেশ্বর-জননী একদিন হরবল্লভকে ব্যাপারটা নিবেদন করলেন, এ নতুন বিবাহ নয়। এ বৌ কোন নতুন বৌ নয়—সেই বড় বৌ।

কী!

হরবল্লভ ক্রোধে ফেটে পড়বেন, এমন সময় ব্রজেশ্বর-জননী জানিয়ে দিলেন, এবার যদি কর্তা কোনরকম গোলমাল সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি গলায় দড়ি দেবেন। হরবল্লভ শান্ত হলেন। তবে গৃহিণীকে উপদেশ দিলেন, লোকের কাছে নতুন বিবাহের প্রসঙ্গটিই প্রচারিত থাক। তাই হলো। সবাই জানলো, ব্রজেশ্বরের এ নতুন পক্ষ। গৃহিণী এবার বড় শক্তহাতে হাল ধরেছেন।

প্রফুল্লের ইচ্ছানুসারে সাগরকে পিত্রালয় থেকে আনানো হলো। এই বিবাহ সম্পর্কে সাগর ও নয়নতারার কিঞ্চিৎ রসালাপ হলো। কিন্তু প্রফুল্ল কোথায়? সাগর তাকে বাড়ির সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও না পেয়ে অবশেষে গেল খিড়কির পুকুরঘাটে। সেখানে প্রফুল্ল বসে বাড়ির বাসন মাজছে। মুখ ফেরাতেই সাগর বিস্ময়ে হতবাক্। এ কি সেই দেবী চৌধুরাণী? এ কি সেই প্রফুল্ল? সে বুঝতে পারলো, দেবী চৌধুরাণীর মৃত্যু হয়েছে; প্রফুল্লেরও মৃত্যু হয়েছে, এখন যাকে সে দেখছে, সে বাড়ির নতুন বৌ। এখন সাগর জানতে চায়, অতুল ঐশ্বর্য, অপরিসীম ক্ষমতা এবং অগণিত মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর অর্থাৎ দেবী চৌধুরাণীর রাণীগিরির পর এই খিড়কির পুকুরঘাটে বসে বাসন-মাজা তার কেমন লাগে। প্রফুল্ল তাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিল যে, সংসার-ধর্মই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ, সংসার-ধর্মই সর্বাপেক্ষা কঠিন ধর্ম, সংসার-ধর্মই সর্বপেক্ষা কঠিন সন্ন্যাস।

ব্রজেশ্বরের কাছে সংসার এখন তিক্ত নয়। সে এখন ঘোরতর সংসারী এবং সংসার এখন তার কাছে প্রকৃত মধুময়।

স্বল্পকালের মধ্যেই প্রফুল্ল সংসারের মধ্যমণি হয়ে উঠলো। শ্বশুর, শাশুড়ী, দুই সতীন—সবাই শুধু তার ব্যবহারে মুগ্ধই হলো না, সে সবার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। প্রফুল্ল এতদিন যথার্থ সন্ন্যাসিনী হতে পারেনি; কিন্তু সংসারে এসে সে যথার্থ সন্ন্যাসিনী হলো। সে অদ্বিতীয় পরম পণ্ডিত ভবানী পাঠকের শিষ্যা—নিজেও পরম পণ্ডিত। কিন্তু সেকথা সবার কাছে অজ্ঞাতই থাকলো। সে ব্রজেশ্বরকে পরামর্শ দেয়, সে যেন সাগর ও নয়নতারাকে তার মতোই ভালোবাসে।

কেবল অন্তঃপুরের কাজেই যে প্রফুল্ল অপরিহার্য, তাই নয়: বাইরের নানা বৈষয়িক কাজেও সে হরবল্লভের কাছে অপরিহার্য। তার পরামর্শমতো সাংসারিক সমস্ত কাজকর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ায় সংসারের দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বৃদ্ধি পেতে লাগলো। জমিদারীতে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকায় প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের কাছে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণশোধের অনুরোধ করলো। সেই অর্থে নির্মিত হলো 'দেবীনিবাস' নামে একটি বিশাল অতিথিশালা।

যথাসময়ে প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করলে দেশের লোকে বুঝতে পারলো, তারা এতদিনে প্রকৃত মাতৃহীন হলো।

এদিকে রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি প্রফুল্লের নির্দেশিত উপায়ে জীবন-যাপনের অবসানে পরলোক গমন করে। কিন্তু ভবানী পাঠকের মনে হলো, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করে হাসিমুখে গ্রহণ করলেন কঠোর দ্বীপান্তর দণ্ড॥

আদর্শ প্রশ্ন ঃ উত্তরসহ

●এক· 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে তৎকালীন যে সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। উ. মা. '৭৮

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাতে প্রতিবিম্বিত হয় সমসাময়িক সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। বিশেষতঃ, উপন্যাসের কুল-চরিত্রের সঙ্গে সমাজ-মানসের রয়েছে যে সুগভীর নাড়ির সম্পর্ক, তার ধারানুযায়ী দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে তৎকালীন বাঙালী-সমাজের বিশ্বস্ত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে অতি স্বাভাবিক কারণেই। তাছাড়া রোমান্সের আতিশয্য এবং আদর্শবাদের প্রক্ষেপণ সত্ত্বেও দেবী চৌধুরাণী শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে তত্ত্বমূলক পারিবারিক উপন্যাস। আবার ইতিহাসের এক ঘোর দুর্যোগময় যুগসন্ধিকালের মাটিতে এই উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি স্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থখানি তৎকালীন সমাজ-জীবনের একখানি অতি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিলও বটে। কাজেই, সমাজ-সচেতন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-তন্ময়তা ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের দ্বারা এই গ্রন্থে সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা বলাবাহুল্য।

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে যে কাল এবং যে দেশের চিত্র অঙ্কিত, তা উনবিংশ শতকের অন্তিম পর্বের ক্ষতবিক্ষত অন্ধকারময় বাংলাদেশ। এমন অভূতপূর্ব

দস্যুভীতি বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। দেশ তখন অরাজক। মুসলমান-রাজত্বের ওপর যবনিকাপাত ঘটে গেছে, ইংরেজ-রাজত্বও যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গোধূলি-কালে কেন্দ্রীয় শাসন-শৃঙ্খলার অভাবের সুযোগে সমাজের যে অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, তার সর্বব্যাপী প্রবল প্রতিক্রিয়ায় বাংলার বুকে নেমে আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সারা দেশ ছিন্ন-ভিন্ন, জনজীবন বিপর্যস্ত। তার ওপর প্রবল অত্যাচারী দেবীসিংহের ইজারা। বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মী এডমণ্ড বার্কের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় অত্যাচারী দেবীসিংহের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যা শুনে বহু বিদেশিনী মহিলা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই নির্মম, পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার ছিল বরেন্দ্রভূমি। লুণ্ঠিত-সর্বস্ব, হতভাগ্য দেশবাসীর সেদিন জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। অন্ন নেই, গৃহবাসও নিরাপত্তাহীন। প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে সেদিন সামাজিক মূল্যবোধ হয় ধূল্যবলুণ্ঠিত। তার ফলে দেশময় চুরি, লুণ্ঠন, হত্যা ও আনুষঙ্গিক নৃশংস কার্যাবলী হয়ে ওঠে নিত্যনৈমিত্তিক।

তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভূম্যধিকারী এবং তাদের অত্যাচারী কর্মচারীদের দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য। প্রজাপীড়নের এমন কদর্য ইতিহাস সারাবিশ্বে বিরল। গ্রাম্য জমিদার পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তী তার এক বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। দরিদ্র, নিঃস্ব, নিরীহ, সহায়সম্বলহীন প্রজাদের ঘরবাড়ী তারা নির্বিচারে লুণ্ঠন করেছে, পুড়িয়ে ছারখার করেছে। প্রহার, লুণ্ঠন, রক্তপাত, হত্যা, গৃহদাহ সেদিন ছিল দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। সেদিন ছিল না ধর্মাচরণের নিরাপত্তা, নিরাপত্তা ছিলনা নিষ্পাপ শিশুদের জীবনেও। যুবকদের বুকে বাঁশ দিয়ে দলন, বৃদ্ধের অক্ষিকোটরে পিঁপড়া এবং নাভিতে পতঙ্গ পুরে হত্যা এবং নারীহরণ ও বর্বর নারী-নির্যাতন এক নিস্ফল কান্নায় সেদিন সারা বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে দিয়েছিল। তার প্রতিরোধেই কোন আদর্শনিষ্ঠ দস্যুদল গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। বাংলার নানা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীতে তার সমর্থন আছে। কিন্তু তা এমনই ইতস্ততঃ এবং অকিঞ্চিৎকর যে, তাতে জনজীবনের অসহায় দুঃখ-লাঞ্ছনার কিছুমাত্র লাঘব হয়নি।

এই অবর্ণনীয় রাজনৈতিক অত্যাচারের সঙ্গে নানা সামাজিক অনাচার ও অবিচার যুক্ত হয়ে জনজীবনের দুঃখমাত্রাকে তুলেছিল আরো বাড়িয়ে। খলতা, শঠতা, ক্রূরতা, ছলনা, কলহ এবং নানা অপবাদ ও কুৎসা-রটনার কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যস্থতায় সে দিনের বাংলার সমাজের যে কলঙ্কিত চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছেন, তা পরবর্তীকালের শিল্পী শরৎচন্দ্রের হাতে আরও মর্মস্পর্শী, আরো বিশ্বস্তরূপে পরিবেশিত হয়।

বস্তুতঃ, দেবী চৌধুরাণীতে আমরা তৎকালীন বঙ্গ-সমাজের এক বহুধা-বিভক্ত, পাপ-পঙ্কিল, কদর্য-কলুষিত মুখ দেখি। ধনী-দরিদ্র—এই অসমান সমাজ-বিন্যাস তো ছিলই। একদিকে ধনীর অট্টালিকায় ভোগবিলাস, দাসদাসী, ঐশ্বর্যের অফুরন্ত প্রাচুর্য; অন্যদিকে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে অন্নাভাব, উপবাস, দারিদ্র্যের দুর্নিবার হাহাকার। দেবী

চৌধুরাণী উপন্যাসের মৌল সমস্যাই তো এক পরমাসুন্দরী দরিদ্র-দুহিতার ধনীগৃহে বিবাহ এবং সেই উপলক্ষে তার হতভাগিনী জননীর ব্যয়-সামর্থ্যের অভাব থেকে উদ্ভূত নানা জটিলতা।

বিবাহের রাতে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদের আপ্যায়ন—ব্যবস্থার তারতম্যের মূলে ছিল প্রফুল্ল-জননীর নিদারুণ দারিদ্র্য। কিন্তু তাইই হলো প্রফুল্লের ভাগ্য-বিড়ম্বনার প্রধানতম কারণ। এবং তাতে বাংলার পল্লীসমাজের প্রতিবেশী-চরিত্রের যে ঘৃণিত কদর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে, তা তুলনারহিত। লুচিমণ্ডার শোকে উদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষিপ্ত প্রতিবেশীরা প্রফুল্লের মায়ের বিরুদ্ধে যে প্রতিশোধ নিয়েছে, তাতে বাংলার হৃদয়হীন সনাতন হিন্দুসমাজের প্রকৃত পরিচয় অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে মুদ্রিত। কন্যাদায়গ্রস্ত বিধবা নারীকে কন্যাদায়মুক্ত করার মানবিক প্রয়াস তো সুদূর-পরাহত, সামান্য আপ্যায়ন-বৈষম্যের জন্যে এই নীচ, আহার-লোভী, ঈর্ষাতুর, প্রতিশোধপরায়ণ প্রতিবেশীরা তার চরিত্র সম্পর্কে রটিয়েছে এক মিথ্যা, দুরপনেয় কলঙ্ক-কাহিনী। প্রফুল্লের মা নাকি কুলটা—জাতিভ্রষ্টা। সেই কুলটার সঙ্গে জমিদার হরবল্লভ রায়ের কুটুম্বিতার অনৌচিত্য ঐশ্বর্যের জলুসের আড়ালে ঢাকা পড়তে পারে; কিন্তু যারা কাঙাল গরীব, জাতই যাদের একমাত্র সম্বল, জাত গেলে তাদের আর কী থাকে? কাজেই, নিরপরাধা বিধবার কন্যা প্রফুল্ল বিনা দোষে, কেবল ঘৃণ্য স্বার্থপর প্রতিহিংসাপরায়ণ সমাজের চক্রান্তে 'বাগ্‌দীর মেয়ে' বলে অভিহিত হলো, পরিত্যক্ত হলো তার আজন্ম সঙ্গী দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের কোলে।

আবার, প্রফুল্লের মায়ের মৃত্যুতে এই পল্লীসমাজের দেখা গেল ভিন্নতর মূর্তি। নিজেদের কুকীর্তির কথা বিস্মৃত হয়ে তারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে মৃতদেহ-সৎকার করবার জন্যে, শ্রাদ্ধশান্তি সুসম্পাদনের জন্যে। এমনকি, হরবল্লভ রায়কে আমন্ত্রণ জানাতেও তারা গেছে ভূতনাথ গ্রামে। তাদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—'অমন পাড়া-পড়শিতে গোলযোগ হয়—সেটা কোন কাজের কথা নয়।' হরবল্লভ বিষয়ী লোক। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মনে হয়েছে, এ বেটারা বাগ্দী বেটীর কাছে টাকা খেয়েছে। কাজেই, তদানীন্তন সমাজে জাতিচ্যুতি বা জাতিলাভ ছিল একান্তভাবেই অর্থনির্ভর।

সমাজে সেদিন পুরুষদের সম্পর্কে বিধিনিষেধগুলি ছিল অত্যন্ত শিথিল। কৌলীন্য-প্রথার ছত্রছায়ায় বহুবিবাহ ছিল কুলীন-সন্তানদের একটি জন্মার্জিত অধিকার, যার পরিণতি ছিল নানা পারিবারিক কলহ ও ঘোরতর অশান্তি। তার পাশাপাশি ছিল নির্লজ্জ পণপ্রথার কুৎসিত প্রচলন। তাছাড়া, পুরুষ-সমাজের কদর্য ব্যভিচারের কাহিনীও দেবী চৌধুরাণীতে দুর্লভ নয়।

তার পাশাপাশি সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি নিম্নে। হরবল্লভ-গৃহিণীকে হরবল্লভ রায়ের অযৌক্তিক এবং নির্মম জিদের কাছে নিরুপায়ভাবে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। অন্যদিকে, বালবিধবা ফুলমণিকে লিপ্ত হতে হয়েছে নানা পাপ ও ব্যভিচার-কর্মে। সেদিক থেকে নিশির জীবনের অভিজ্ঞতাও সুমধুর নয়। কন্যাহরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ছিল সেকালের সমাজের আর এক দুরপনেয় কলঙ্ক। বিবাহে

পাকস্পর্শ যেমন আনুষ্ঠানিক রীতি ছিল, নব-বধূদর্শন যেমন ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনাময় একটি প্রচলিত প্রথা, তেমনি শ্বশুরালয়ে জামাতার আগমনও ছিল আড়ম্বরপূর্ণ একটি ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান। দিবাভাগে স্বামীদর্শন ছিল নিষিদ্ধ; অবশ্য পিতৃগৃহে এই রীতি ছিল অনেকাংশে শিথিল ও উদার।

স্মরণীয়, দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের যে সমাজ বিরাজিত, তা, বলাবাহুল্য, অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্বের অন্ধকারময় সমাজ। সেই সমাজ ছিল অসাম্য, পাপ, ব্যভিচার ও নানা পক্ষপাতিত্বে দুষ্ট। একদিকে, দারিদ্র্যের কাছে সেই সমাজ ছিল উদ্যতহস্ত; অন্যদিকে, ঐশ্বর্যের কাছে তাই ছিল আবার নতজানু। বাইরের শাসনতান্ত্রিক অরাজকতার প্রশ্রয়ে আভ্যন্তরীণ ভেদ-বৈষম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশব্যাপী অত্যাচারে কিংবা মন্বন্তরের দুর্জয় আঘাতে তার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েনি, যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনেও তার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়নি। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস বাংলার সেই বহুধাবিভক্ত, অরাজক, ক্লেদকলঙ্কময় সমাজের একখানি প্রামাণ্য দলিল॥

●দুই. 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের প্রফুল্ল চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

প্রফুল্ল—প্রফুল্লমুখী 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সমগ্র কাহিনী আবর্তিত-বিবর্তিত, তাকে আশ্রয় করে বিচিত্র ভঙ্গিমায় পল্লবিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই নারীচরিত্রের প্রাধান্য। সেদিক থেকে তাঁর দেবী চৌধুরাণী কোনরূপ ব্যতিক্রম নয়। প্রফুল্লের চরিত্র-সুষমা তার চারদিকে যে উজ্জ্বল জ্যোতির্বলয় সৃষ্টি করেছে, তার দীপ্তিচ্ছটায় নায়ক ব্রজেশ্বর চরিত্রটি পর্যন্ত কিঞ্চিৎ ম্লান, নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ, প্রফুল্ল বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট, বিতর্কিত চরিত্র।

লক্ষণীয়, প্রফুল্ল চরিত্রের তিনটি প্রধান পর্ব—প্রফুল্ল, দেবী চৌধুরাণী এবং প্রফুল্ল। প্রথম পর্বের বিস্তার সূচনা থেকে তার দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তর পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্বের বিস্তার তার দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তর থেকে পুনরায় প্রফুল্ল-তে রূপান্তর পর্যন্ত এবং প্রফুল্ল-তে রূপান্তর থেকে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তৃতীয় পর্বের বিস্তার। তার এই পর্ব থেকে পর্বান্তরে উত্তরণে আছে বিস্ময়ের স্পর্শ, আছে কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্যতার প্রলেপ। কিন্তু কোন সামান্য মেষপালিকা বালিকা যদি উত্তাল ঘটনাবর্তের প্রেরণায় জোয়ান অব্ আর্ক-এ রূপান্তরিত হতে পারে, যদি কোন রাজকুলবধূ ইতিহাসের আহ্বানে ঝান্সীর রাণীতে রূপান্তরিত হতে পারেন, তবে এক দরিদ্র-দুহিতার পক্ষে প্রতিকূল ঘটনাচক্রে দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরের মধ্যে অবাস্তবতা কোথায়? তাছাড়া, শৈশব থেকেই উত্তরকালে নেত্রীপদের দায়িত্ব-বহনের প্রচুর সম্ভাবনা এবং যোগ্যতার আভাস যখন তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তখন তার সম্পর্কে এই অবাস্তবতার অভিযোগ অবান্তর।

প্রথম দর্শনেই পাকা জহুরী ভবানী পাঠকের সন্ধানী দৃষ্টি তার মধ্যে আবিষ্কার

করেছে তাঁর উত্তরকালের সুযোগ্য দলনায়িকাকে। 'ইস্পাত ভাল পাইয়াছি; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে।' এবার শুরু থেকে শুরু করা যাক।

গ্রন্থ-সূচনায় আমরা প্রফুল্লের মধ্যে দেখি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বাধিকার-সচেতন নারীকে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে প্রফুল্ল স্বামী-পরিত্যক্তা এবং শ্বশুরের অন্নবঞ্চিতা। অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে দরিদ্র অনাথা জননীর গলগ্রহ সে। কিন্তু দিন আর চলে না। অথচ প্রতিবেশীদের কাছে কোনরূপ সাহায্য কিংবা ঋণ-প্রার্থনায় তার প্রবল সংকোচ। এই প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, স্বাধিকার-সচেতন প্রফুল্লের কণ্ঠে সেদিন শোনা গেল তার সহজ স্বীকারোক্তি—'শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে, তবে খাইব—নইলে আর খাইব না।' এ তো কেবল সহজ স্বীকারোক্তিই নয়, এ তো এক প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর মরণপণ প্রতিজ্ঞা। শ্বশুরালয়-যাত্রার প্রাক্কালে স্নেহাতুরা জননীর তার সামান্যতম সাজসজ্জা-প্রসাধনের প্রস্তাব কন্যার ব্যক্তিত্বের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—'থাক, সেজেগুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি!' সাজসজ্জা-প্রসাধনের কৃত্রিম জলুস্ দিয়ে সে তার লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধার করবে না, সে তা পুনরুদ্ধার করবে তার প্রেমের অধিকারে, তার ব্যক্তিত্বের অধিকারে।

শ্বশুর-গৃহে স্বল্পকালের মধ্যেই তার লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত রূপে, নম্রমধুর ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম ভালোবাসায় সে একে একে শাশুড়ী, সাগর এবং ব্রজেশ্বরের হৃদয় জয় করে নেয়। কিন্তু পাষাণহৃদয় শ্বশুর ঠাকুরের হৃদয় গললো না। প্রত্যাখ্যাত হয়ে মূর্তিমতী বিষাদের মতো সে ফিরে চললো দরিদ্রা জননীর স্নেহের আশ্রয়ে। তারপর একদিন যখন তার সেই স্নেহ-নিকেতন ভেঙে গেল, তখন আকস্মিক শোকের আঘাতে সে বিহ্বল হয়নি। এক আশ্চর্য সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমের মধ্যস্থতায় সে পালন করেছে নানা আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব। তারপর যেদিন তার ভাগ্যের ওপর ভেঙে পড়লো দুর্নিবার বিপদের ঝড়—নীচমতি, লম্পটচরিত্র দুর্লভচন্দ্র কর্তৃক সে অপহৃত হলো, সেই ভয়াবহ অনিশ্চয়তার সংকটময় মুহূর্তেও সে একেবারে ভেঙে পড়ে নি। এক অপূর্ব সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখে সে বন্ধনমুক্ত হয়ে অনিশ্চিত অরণ্যের অন্ধকারে আত্মগোপন করে নিজেকে সম্ভাব্য সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছে। বিপদ মানুষকে সাহসী করে, বিপদ-উত্তরণের শক্তি জোগায়। কিন্তু প্রফুল্লের এই শক্তি ও সাহসে তার চরিত্রের যে অন্তর্নিহিত সুষমা প্রতিফলিত,তাতে প্রকাশিত আকস্মিকতার 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি'। আবার, জনমানবহীন অরণ্যের কোলে বিধ্বস্তপ্রায় অট্টালিকার এক কোণে মুমূর্ষু বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে যখন প্রফুল্লকে দেখি, তখন মনে সংশয় জাগে—প্রফুল্ল দেবী না মানবী। মুমূর্ষু কৃষ্ণগোপাল তাকে উদ্ধারকর্ত্রী কোন দেবী বলেই অনুমান করেছিল। কিন্তু আমরা তার মধ্যে দেখতে পেলাম এক মাধুর্যময়ী, সেবাপরায়ণা, কর্তব্যনিষ্ঠা নারীকে। বিপদে যার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, আসন্ন সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাহস, শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তাকে অবলম্বন করে যে বিপদের মোকাবিলা করে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তার হাতেই

তুলে দেয় অপ্রত্যাশিত ধনভাণ্ডার। সেই অপ্রত্যাশিত ধনপ্রাপ্তিতে প্রফুল্ল আত্মহারা হয়নি ; এমনকি, দস্যুদলপতি, দুর্ধর্ষ ভবানী পাঠকের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকারে সে তার স্বাভাবিক সাহসিকতাকে বিসর্জন দেয়নি। তাই তো ভূয়োদর্শী, মহাপণ্ডিত ভবানী পাঠক তার মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন উত্তম ইস্পাতের, যা দিয়ে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন একখানি ক্ষুরধার অস্ত্র নির্মাণের।

এখানেই প্রফুল্লের চরিত্রের প্রথম পর্বের সমাপ্তি এবং তার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। ধনৈশ্বর্য ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগের জন্যে নয়, জনকল্যাণকর্মেই তার চরম সার্থকতা—ভবানী পাঠকের এই মন্ত্রে সে দীক্ষিত হয়েছে। শুরু হয় তার দেবী চৌধুরাণী হয়ে ওঠার একনিষ্ঠ সাধনা। এভাবেই পারিবারিক দুঃখজালায় জর্জরিত প্রফুল্ল ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার মধ্যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম, সহিষ্ণুতা, সাহস, ধৈর্য ও পরার্থপরতার এক আশ্চর্য বিকাশ দেখা গেল, যা মহামহোপাধ্যায় ভবানী পাঠকের সুপরিকল্পিত নিষ্কাম কর্ম-শিক্ষার এক শুভ পরিণাম-ফল। তার ঐশ্বর্য ও বিলাসের ঠাট নির্ভোগ 'দোকানদারি' মাত্র। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে 'দেবীরাণীর দরবার' উপলক্ষে দরিদ্র জনগণের মধ্যে যে অকাতর ধনবিতরণ তাইই তার দেবীগিরি। 'দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।'

দস্যুদলনেত্রী দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে বস্তুতঃ দস্যুবৃত্তি কোথাও উদ্‌যাপিত হয়নি। দৈবলব্ধ ধনৈশ্বর্য দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণই তার একমাত্র দস্যুবৃত্তি। তাইতো জনগণের দৃষ্টিতে সে 'সাক্ষাৎ ভগবতী'—মঙ্গলময়ী জননী। এমনকি, তার যে শ্বশুর তাকে স্বাধিকার-বঞ্চিত করে গৃহ থেকে বিতাড়িত করেছে, অর্থ-সাহায্যের প্রতিদানে তাকে ইংরেজ-হস্তে সমর্পণের মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা-শোধের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে, দেবী রাণী তার প্রতিও আশ্চর্যভাবে ক্ষমাপরায়ণ। স্বামীদেবতার প্রাণ-রক্ষার জন্যে অযথা রক্তক্ষয়ে এই পতিগতপ্রাণা প্রকাশ করেছে তার প্রবল অনীহা। আর, তার দল এবং ইংরেজদের মধ্যে চরম সংঘাতময় মুহূর্তে যে দূরদৃষ্টি, স্থৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় সে দিয়েছে, তাতে তার কর্মনৈপুণ্যের স্বাক্ষরই শুধু মুদ্রিত নয়, দেবী রাণীর অগ্নি-পরীক্ষায়ও সে সসম্মানে সমোত্তীর্ণা।

এইখানে প্রফুল্লের দেবী চৌধুরাণী জীবনের ওপর যবনিকাপাত। 'দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরাণী আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনও আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে?' কাজেই, জয়লাভের পর বিজয়োৎসবের পরিবর্তে শুরু হলো বিদায়োৎসব। দল ভেঙে দিয়ে সবাইকে বিদায় জানিয়ে প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরের সঙ্গে ফিরে চললো তার লুপ্ত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যে। তাহলে ভবানী পাঠকের এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা কি প্রফুল্লের জীবনে ব্যর্থ? সমালোচকেরা এখানে প্রফুল্লের চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন এক তীব্র অসংগতি। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখর থেকে ব্রজেশ্বরের সংসারে বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়ার মতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মে প্রফুল্লের আত্মনিয়োগের মধ্যে যে বিপুল অসংগতি, তার সদুত্তর কোথায়? সত্য কথা, দেবী চৌধুরাণী একটি ধার-করা, আরোপিত ভাবাদর্শ মাত্র। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের শিক্ষায় দীক্ষায় দেবী

চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল; কিন্তু সর্বাংশে নয়। ভবানী পাঠকের মহান্ ভাবাদর্শ তার চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করলেও তার স্বাভাবিক নারীধর্মকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। দেবী চৌধুরাণীর একাদশী তিথিতে মৎস্যাহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল পতিগতপ্রাণা এই বঙ্গবধূ—প্রফুল্ল। দেবী রাণীর বহুমূল্য ছদ্মবেশের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে তার প্রাণ। সে খুঁজেছে সেই জলুসময় দোকানদারি থেকে মুক্তি, সে চেয়েছে—রূপার সিংহাসন নয়, হীরার মুকুট নয়; সে চেয়েছে প্রিয়পরিজনভরা একটি পরিপূর্ণ সংসার—দুঃখ-সুখের গৃহস্থালি। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য ধর্ম। 'এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম নয়। কঠিন ধর্ম এই সংসারধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।'—প্রফুল্লের এই উক্তির সঙ্গে তার চরিত্র অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। সম্ভবতঃ, স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। তাই তিনি প্রফুল্লের দেবী-মূর্তির মধ্যে যা পাননি, তার মানবী-মূর্তির মধ্যে পেয়েছেন সেই শিল্পগত তৃপ্তি।

পরিশেষে, প্রফুল্ল তার কামনার স্বর্গ সংসারাশ্রমে ব্রজেশ্বরের গৃহলক্ষ্মীরূপে ফিরে এসেছে। উত্তম ইস্পাত দিয়ে ভবানী পাঠক যে শাণিত অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, তা এইরূপে কঠিনতম আশ্রম—সংসারাশ্রমে নিত্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ গৃহকর্মের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সহস্র সার্থকতা সত্ত্বেও নারীর জীবনের পরম সার্থকতা যে তার যথার্থ সংসার-ধর্ম পালনের মধ্যে—বঙ্কিমচন্দ্র এই ভারতীয় আদর্শেরই কাহিনী-ভাষ্য রচনা করেছেন তাঁর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে। এবং প্রফুল্ল সেই ধারানুসরণে বাংলাদেশের উপকরণে রচিত এক অপরূপ মাটির প্রতিমা॥

●তিন. 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের ব্রজেশ্বর চরিত্রটির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

ব্রজেশ্বর বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকা-প্রধান উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীর নিষ্প্রভ নায়ক। তার বিরুদ্ধে এই নিষ্প্রভতার অভিযোগ নিতান্ত অবান্তর নয়। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবর্তে প্রফুল্ল চরিত্রের যে বিচিত্র গতিময় প্রকাশ, ব্রজেশ্বরের জীবনে তার একান্ত অসদ্ভাব পাঠক-চিত্তকে পীড়িত ও হতাশ করে। কিন্তু স্মরণীয়, এ দেশের জীবনে দর্শনে নারী যেমন সক্রিয়, পুরুষ তদনুপাতিকভাবে নিষ্ক্রিয়। তাছাড়া, সূচনা থেকেই এদেশের সকল সমাজ-আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নারী। কাজেই, সূচনা-লগ্নে অধিকাংশ উপন্যাসই হয়ে উঠেছে নায়িকা-প্রধান। নায়ক সেই তুলনায় ম্লান, নিষ্প্রভ। দেবী চৌধুরাণীর ব্রজেশ্বর তার কোনরূপ ব্যতিক্রম নয়।

এই ব্রজেশ্বর চরিত্রের প্রধান উপকরণ মূলতঃ দুটি: নিষ্কলুষ বিবেকবুদ্ধি এবং দুর্জয় পিতৃভক্তি। এই দুই প্রবল শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তার অন্তরপুরুষ নিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং তার জয়পরাজয়ের মধ্যস্থতায় আলোছায়ার দুর্বোধ্য স্পর্শ গায়ে মেখে এই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে অসঙ্গত। তাই ব্রজেশ্বর বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত চরিত্র। তার উপকরণগত মূল সূত্র দুটির উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে চরিত্রটি কখনও 'মেরুদণ্ডহীন' 'ব্যক্তিত্বহীন', 'পৌরুষহীন' বলে নিন্দিত, কখনও আবার 'কচি খোকা'

বলে উপহসিত। কিন্তু উপকরণ দুটির উপযুক্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, এই নিন্দা-উপহাস সর্বাংশে তার প্রাপ্য নয়।

লেখক যখন ব্রজেশ্বরকে পাঠকদের সম্মুখে প্রথম উপস্থিত করেন, তখন দেখা যায়, তার 'বয়স একুশ-বাইশ; অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ।' পিতার অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধেও সে নিরুত্তর। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তার এই প্রতিবাদহীন নীরবতাকে সপ্রশংস মন্তব্যে অভিনন্দিত করেন, 'বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।' পিতৃশাসিত পরিবারে সেকালের বাইশ বছরের যুবকের পক্ষে পিতার দুষ্কর্মের প্রতিবাদে মুখর হওয়া কিংবা বিদ্রোহ ঘোষণা করা ছিল সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে সেদিন ঘরে ঘরে বিদ্রোহীর জন্ম হতো—বহু পূর্বেই দেশ এবং সমাজের দেখা যেত পরিবর্তিত রূপ। বঙ্কিম সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় এক যুবকের প্রকৃত স্বরূপই অঙ্কিত করেছেন ব্রজেশ্বর চরিত্রের মধ্যস্থতায়। কিন্তু পিতৃভক্তির আতিশয্যই ব্রজেশ্বর চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, শুভ্র বিবেকবুদ্ধিও তার চরিত্রের অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। তাইতো দেখি, প্রফুল্লকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে সে তার পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেনি। তার পরিবর্তে প্রফুল্লকে দেখে তার প্রতি করুণায় ও সমবেদনায় তার হৃদয় আপ্লুত হয়েছে। পিতার দুষ্কর্মের সোচ্চার সমালোচনা যেমন তার দ্বারা সম্ভব হয়নি, তেমনি তার পক্ষে সম্ভব হয়নি তার শুভ্র বিবেকবুদ্ধির তাড়নায় নিরপরাধা, জন্ম-দুঃখিনী প্রফুল্লকে বিতাড়িত করাও। এমনকি, সে প্রফুল্লকে চলে যেতে নিষেধ করেছে এবং প্রফুল্লের প্রতি সুবিচার করার জন্যে পিতাকে অনুরোধ জানাতে সে তার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রফুল্ল প্রশ্ন করেছে, 'বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে?' ব্রজেশ্বরের সপ্রতিভ উত্তর—'না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া, আমি কি অধর্মে পতিত হইব?' এমনকি, প্রফুল্লের দুঃখভার লাঘবের জন্যে সে খরপোষের দাবি নিয়ে তার পরমারাধ্য পিতৃদেবের সম্মুখে দাঁড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাতেও প্রফুল্ল কর্তৃক সে নিরস্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তবু স্বয়ং লেখকও উপন্যাসের একস্থানে ব্যঙ্গোক্তি করতে ছাড়েন নি— 'ও ব্রজেশ্বর! কি বলিলে? স্ত্রীর মত ধন আর নাই? তবে বাপ বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?' স্মরণীয় যে, বাপ তাকে তাড়ালেও বেটায় তাকে তাড়ায় নি, তাড়াতে চায়ও নি। এমনকি, প্রফুল্লের মাতৃ-বিয়োগের পর সে তার তথ্যতালাশ গ্রহণের প্রয়োজনে অন্ধকার নিশীথে একাকী দস্যুপরিকীর্ণ পথে অশ্বারোহণে যে দুর্গাপুর যাত্রা করেছে, তার মূলেও ছিল তার শুভ্র বিবেকবুদ্ধি এবং দুর্বার দাম্পত্য-প্রেম। তার এই নিষ্কলুষ বিবেকবুদ্ধির বিচারে সে তার পিতার বিপন্মুক্তির জন্যে দেবী চৌধুরাণীর প্রস্তাবিত অর্থ-গ্রহণে স্বাভাবিক কুণ্ঠা ও দ্বিধা প্রকাশ করেছে। সেই অর্থ চুরি-ডাকাতির দ্বারা সংগৃহীত নয়—এ কথা দেবী চৌধুরাণীকে

শপথ করে জানাতে হয়েছে, তবে তা ঋণস্বরূপ গ্রহণে ব্রজেশ্বর সম্মত হয়েছে। সেই ঋণ-পরিশোধে পিতার নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যোগ তাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। নির্দিষ্ট দিনে পিতার ঋণ-পরিশোধের ব্যর্থতায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে গেছে কালসাজির ঘাটে প্রফুল্লের কাছে অতিরিক্ত সময় চাইবার জন্যে। আবার তার মানসপটের সোনার প্রতিমা প্রফুল্লই দস্যুদলনেত্রী দেবী চৌধুরাণী এবং দস্যুবৃত্তিই তার বৃত্তি—এই তথ্যে তার বিবেকবুদ্ধি অত্যন্ত ব্যথিত হয়; তাতে সে লাভ করে মর্মান্তিক মানসিক যন্ত্রণা। প্রফুল্লের মুখে তার বিগত দশ বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্যস্থতায় সে যখন নিশ্চিত হলো, প্রফুল্লের দস্যুবৃত্তি নিছক প্রচার মাত্র, তখন সে আশ্বস্ত হয়েছে।

তার চরিত্রের এই পরিচ্ছন্ন বিবেকবুদ্ধি থেকে প্রফুল্লের প্রতি তার হৃদয়ে যে গভীর করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে, তাইই পরিণতি লাভ করেছে দুর্বার পত্নীপ্রেমে। তা রূপজ মোহ মাত্র নয়। অন্তরের অন্তস্তলে তার মজ্জাগত পিতৃভক্তির সঙ্গে নবজাগ্রত পত্নীপ্রেমের দ্বন্দ্ব সূচিত হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বের কথা সে কারো কাছেই প্রকাশ করতে পারেনি। সেই দ্বন্দ্বে যখন পত্নীপ্রেম জয়ী হয়েছে, তখন তাকে রাতের অন্ধকারে পথের বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে প্রফুল্লের তথ্যতালাশ সংগ্রহের জন্যে ছুটে যেতে হয়েছে। আবার, যখন সে প্রফুল্লের মৃত্যু-সংবাদ শুনেছে, তখন সে গভীর মর্মবেদনায় একেবারে ভেঙে পড়েছে এবং পিতৃভক্তিমূলক চাণক্য-শ্লোকের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার মধ্যে সান্ত্বনার অনুসন্ধান করেছে।

সত্যকথা, ঘটনাচক্রে প্রফুল্ল যেভাবে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হয়েছে, তার পতিদেবতা ব্রজেশ্বর সেরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। সেজন্যে ব্রজেশ্বরের পরিবেশ এবং তার গণ্ডিবদ্ধ জীবনধারাই দায়ী। তার পিতৃভক্তি এবং শাদা নিশান ও 'শেক হাণ্ডের' অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা অতি-আধুনিক দৃষ্টিতে উপহসিত হতে পারে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপিত হবার বিশ বছরের মধ্যে এই আধুনিকতার প্রত্যাশা কি খুব বাড়াবাড়ি নয়? সদ্য-মাতৃহারা প্রফুল্লের তথ্য-তালাশের জন্যে সকলের অজ্ঞাতে তার দুঃসাহসিক প্রেমের অভিযানে, দস্যুদলের সঙ্গে আপসহীন সংগ্রামে এবং সাহেবের গালে বিরাশি সিক্কার চপেটাঘাতে তার নায়কোচিত ব্যক্তিত্বে সাহসিকতার যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে, তা অবিস্মরণীয়। এবং তার রঙ্গপ্রিয়তা সেই সাহসিকতা ও নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রকাশ। আর, অপরিচিতা নারীর পদসেবা এক প্রকার লঘু রসিকতারই অঙ্গ। সেকালের নৈতিক অধঃপতন ও নানা সামাজিক ব্যভিচারের বিচারে ওটা তেমন গুরুতর অপরাধ নয়।

আসল কথা, প্রতিটি চরিত্র সমকালের প্রেক্ষাপটে তার পরিবেশ ও জীবনধারার তুল্যমানে বিবেচিত হওয়া উচিত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেশ্বরকে 'সর্বগুণ-সম্পন্ন'-রূপে দেখেছেন। ব্রজেশ্বর সম্পর্কে এই বিশেষণের প্রযুক্তি আমাদের কাছে প্রশ্নাতীত নয়। তবে ব্রজেশ্বর যে অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্বের দোষেগুণে-ভরা একটি স্বাভাবিক এবং বাস্তব বাঙালী যুবক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রফুল্লের মধ্যে প্রেমের স্ফুরণে এবং দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে প্রেমময়ী

প্রফুল্লের অক্ষুণ্ণ ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্রজেশ্বর চরিত্র যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে, তাতে তার অনিবার্যতা এবং অপরিহার্যতা প্রমাণিত ॥

●চার. দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের ভবানী পাঠক চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।
উ. মা. '৭৮

দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের ভবানী পাঠক বঙ্কিম-মানসের একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ইতিহাসের দস্যুদল-নেতা ভবানী পাঠক বঙ্কিমের মনন-মানসিকতা ও সমুন্নত আদর্শবাদের সংশ্লেষণে হয়ে উঠেছেন স্বদেশপ্রেমিক, জনদরদী মহানায়ক, মহামহোপাধ্যায় ভবানী ঠাকুর। তিনি কর্মে মহান্, ধর্মে মহান্। আনন্দমঠ উপন্যাসের স্বামী সত্যানন্দের মতো তিনি আদর্শনিষ্ঠ মহাগুরু—মহাশিক্ষক, মুক্তি-সংগ্রামের তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক নেতা।

আদর্শবাদী এই ব্রাহ্মণ চরিত্রটির মধ্যে বঙ্কিমের আদর্শবাদ—স্বদেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে, সেখানেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে আবির্ভূত হন মহাত্যাগী, মহাপ্রেমিক ভবানী পাঠক। তাঁর চেহারায় অসাধারণত্ব কিছুই নেই। গায়ে নামাবলী, কপালে ফোঁটা, মস্তক মুণ্ডিত—গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। কিন্তু নাগরা বা দামামায় তাঁর হাতের কয়েকটি আঘাত মাত্র কালান্তক যমের মতো মুহূর্তমধ্যে তাঁর আদেশ পালনের জন্যে উপস্থিত হয় পঞ্চাশ-ষাটজন জওয়ান। আশ্চর্য তাঁর সংগঠনী প্রতিভা। নিমেষ-মধ্যে বরকন্দাজ-দল সংগঠিত করে ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণ করতে তিনি সক্ষম। মুসলমান-রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ-রাজত্বের সূচনায় দেশব্যাপী যে অরাজকতার ঝড় উঠেছিল, তাতে তাঁর ছিল দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদাতা এবং দুর্বল অসহায় জনগণের পরিত্রাতার ভূমিকা। সারা বরেন্দ্রভূমি তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত, কম্পমান। যখন অত্যাচারী ইজারাদারের সিপাহীরা গ্রাম লুণ্ঠন করে, তখন ভবানী পাঠকের বরকন্দাজ-বাহিনী ইজারাদারের কাছারি লুঠ করে গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়ে আসে ফিরিয়ে। তাতে তাঁর দল গ্রামের লোকের লাভ করে সার্বিক আনুকূল্য।

অথচ ভবানী পাঠক ব্যাকরণে, কাব্যে, দর্শনে, বেদান্তে ও যোগশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অহংকার কোথাও তাঁর উন্নত চরিত্র-মহিমাকে খর্ব করেনি। তার মূলে ছিল তাঁর আশ্চর্য সংযম এবং নৈতিক চরিত্র-বল।

ভবানী পাঠকের চরিত্রের শক্তির প্রধান উৎস ছিল গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম। তাঁর ত্যাগ, নিঃস্বার্থ পরোপকার, দেশাত্মবোধ, লোক-প্রীতি এবং উচ্চতর জীবনাদর্শ—সবই গীতার নিষ্কাম-ধর্ম থেকে উৎসারিত। এত গুণপনা এবং যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং দলের নেতৃপদে বৃত হননি। সেজন্যে তাঁকে প্রতিভাসম্পন্ন, সুযোগ্য রাজা অথবা রাণীর সন্ধান করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পরিকল্পিত রাণীর সন্ধান পেয়েছেন দরিদ্র-দুহিতা, ভাগ্যহতা প্রফুল্লের মধ্যে। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অসাধারণ লোক-চরিত্রজ্ঞান। প্রথম সাক্ষাৎকারেই তিনি প্রফুল্লের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অধিনায়িকার

আদর্শ গুণাবলী। 'ইস্পাত ভাল পাইয়াছি ; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে।' প্রাপ্ত ইস্পাত থেকে মহান্ অস্ত্র নির্মাণের সাধনায় ব্রতী হয়েছেন তিনি। তাঁর দশ বছরের নিরলস সাধনায় দরিদ্র-কন্যা প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। গীতার নিষ্কাম ধর্ম ছিল সেই সাধনার ভিত্তি। কিন্তু ত্যাগ, তিতিক্ষা, দয়া, ক্ষমা ও পরোপকার-ব্রত দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে বিকশিত হলেও তার অন্তর্নিহিত প্রফুল্লের বিলুপ্তি ঘটেনি। তার নারীধর্ম রাজত্ব-শাসন বা দেবী রাণীর দোকানদারির মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজে পায় নি। এইখানেই ভবানী পাঠকের ব্যর্থতা। এত বিচক্ষণ, ভূয়োদর্শী হওয়া সত্ত্বেও প্রফুল্ল সম্পর্কে তাঁর হিসাবের গরমিল দেখা গেল।

তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর হিসাব মেলেনি। প্রফুল্ল ইংরেজদের হাতে ধরা দেবার নাম করে দল ভেঙে দিয়ে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে শ্বশুরের সংসারে ফিরে গেছে। ফলে, এই আদর্শনিষ্ঠ, সর্বত্যাগী, মহাসন্ন্যাসী ভবানী পাঠকের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। অবশ্য, তারপর প্রফুল্লের গার্হস্থ্য-জীবনে নিষ্কাম ধর্মের সার্থকতা প্রদর্শন করে লেখক কাহিনীর ওপর যবনিকা-পাত করেছেন।

কিন্তু এই মহান্ আদর্শনিষ্ঠ, লোকপ্রিয় মহানায়কের জীবনাবসান সম্পর্কে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই সুবিচার করে উঠতে পারেন নি। ভবানী ঠাকুর তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় ইংরেজ-হস্তে ধরা দিলেন এবং দণ্ড-প্রার্থনা করলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেলেন। ভবানী পাঠকের চরিত্রের এই বিপর্যয় প্রকারান্তরে চরিত্রটি সম্পর্কে লেখকের সামগ্রিক পরিকল্পনার বিপর্যয়। এখন প্রশ্ন—ভবানী ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত কেন? কী তাঁর অপরাধ? দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, দেশাত্মবোধ, নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলন, নির্যাতিত মানব-গোষ্ঠীর দুঃখমোচন কি অপরাধ? অথবা, অত্যাচার-দমন, মানবতার শত্রুদের শাস্তিদান? কোন্ বিচারে এগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ? এখানেই লেখকের চরিত্র-কল্পনায় নিদারুণ অসংগতি। সম্ভবতঃ ডেপুটি বঙ্কিম ঐতিহাসিক ভবানী পাঠককে শাস্তি দিতে গিয়ে উপন্যাসের ভবানী পাঠককে শাস্তি দিয়ে বসেছেন। ইতিহাসের ভবানী পাঠক শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী হতে পারে, কিন্তু দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের ভবানী পাঠক নিরপরাধ, সংযত এবং নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক—মানবতার শেষ আলোকশিখা॥

অনুসরণী

১. প্রফুল্ল কিরূপে দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হয়েছিল, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৪৬—৪৯ পৃ.]

২. দেবী চৌধুরাণীর দেবীগিরির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৫০ পৃ. ও ৫১ পৃ.]

৩. হরবল্লভ দেবী চৌধুরাণীর ঋণশোধের চেষ্টা কিভাবে করেছিলেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৫০—৫৩ পৃ.]

৪. সাগর ব্রজেশ্বরের কাছে কি শপথ করেছিল এবং কেন করেছিল? সে তার শপথ কিরূপে রক্ষা করেছিল, লিখ। [৪৯—৫০ পৃ.]

৫. হরবল্লভ প্রফুল্লকে কি করে খেতে বলেছিলেন ? প্রফুল্ল তাঁর কথা কিভাবে রেখেছিল ? [৪৬—৪৭ পৃ. ও ৪৬—৪৯ পৃ.]

৬. দেবী রাণীকে ইংরেজপক্ষের সিপাইরা ধরতে এলে বরকন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়, তা বর্ণনা কর। যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ? [৫১—৫৩ পৃ.]

৭. রাণীগিরি ছেড়ে প্রফুল্ল হরবল্লভের সংসারে ফিরে এসে যেভাবে জীবনযাপন করেছিল, তা বর্ণনা কর। [৫৪—৫৫ পৃ.]

●৮. দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থার যে চিত্র পাও, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [৫৫—৫৮ পৃ] উ. মা. '৭৮

৯. ভবানী পাঠকের আদর্শ কি ছিল ? তিনি তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি করেছিলেন ? তাঁর শেষ পরিণতি কি হয়েছিল ? [৬৪—৬৬ পৃ.]

১০. দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার যে পরিচয় পাও, তা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [৫৫—৫৮ পৃ.]

●১১. দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে প্রফুল্ল চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর। [৫৮—৬১ পৃ.]

●১২. দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে ব্রজেশ্বর চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর। [৬১—৬৪ পৃ.]

১৩. ব্রজেশ্বর পিতাকে বিপন্মুক্ত করার জন্যে কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছিল ? তার পিতা কিভাবে সেই ঋণ শোধ করেছিলেন ? [৪৯—৫০ পৃ.]

১৪. প্রফুল্লকে হরবল্লভ কি করে জীবনযাপন করতে বলেছিলেন ? সে কিভাবে তাঁর নির্দেশ পালন করেছিল ? [৪৬ পৃ. ও ৪৭—৪৯ পৃ.]

●১৫. দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে ভবানী পাঠক চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর। [৬৪—৬৫ পৃ.] উ. মা. '৭৮

●১৬. নিম্নলিখিত অপ্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ কর :

সাগর, নিশি, হরবল্লভ, ব্রহ্মঠাকুরাণী, রঙ্গরাজ।

চারিত্রপূজা

প্রাবন্ধিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। প্রয়োজনীয় তথ্যসম্ভারকে অস্বীকার না করে তিনি প্রবন্ধকে দিলেন তার প্রকৃত শিল্পময় রূপ। হৃদয় ও মনের সংশ্লেষে তাঁর হাতে প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে যথার্থ সাহিত্য—প্রবন্ধ-সাহিত্য। 'চারিত্রপূজা' [১৩১৪] নিছক প্রবন্ধ-সাহিত্য নয়—জীবনী-সাহিত্য। তবে 'চারিত্রপূজা' মামুলি জীবনী-সাহিত্য নয়; তার অনন্যতা এবং দীপ্তিময়তা গ্রন্থটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই মুদ্রিত।

গ্রন্থভুক্ত 'চারিত্রপূজা' শীর্ষক প্রথম নিবন্ধটি বঙ্গদর্শনে [নব পর্যায়, চৈত্র-সংখ্যা : ১৩০৮] 'বারোয়ারি মঙ্গল' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৩১৪ সালে সংক্ষেপিত আকারে তা 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থভুক্ত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে জীবন-চরিতের বড়ো ছড়াছড়ি। কিন্তু যে মহাপুরুষেরা মানবজাতির আলোকিত পথ-প্রদর্শক, কেবলমাত্র তাঁদেরই জীবন-চরিত রচিত হবার যোগ্য।

'বিদ্যাসাগর-চরিত' নিবন্ধটি মূলতঃ দুটি নিবন্ধের সংকলন। প্রথম নিবন্ধটি ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় পঠিত হয়ে ঐ বছর 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নিবন্ধটি 'ভারতী'র ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বিদ্যাসাগর' নামে।

'ভারতপথিক রামমোহন রায়' নিবন্ধটিও মূলতঃ দুটি নিবন্ধের সংকলন। প্রথম নিবন্ধটি রামমোহনের প্রথম মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে [১৪ই পৌষ, ১৩৪০] সভাপতি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, যা ঐ বছর পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি রামমোহন-মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ। নিবন্ধটি প্রবাসীতে [ফাল্গুন, ১৩৪০] প্রকাশিত হয়।

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নিবন্ধটি মূলতঃ চারটি নিবন্ধের সংক্ষেপিত সংকলন। প্রথম নিবন্ধটি ১৩১১ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষির জন্মোৎসবে পঠিত হয়। পরে নিবন্ধটি 'মহর্ষির জন্মোৎসব' নামে 'ভারতী'তে [আষাঢ়, ১৩১১] প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় নিবন্ধটি মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে পঠিত এবং 'বঙ্গদর্শনে' [নব-পর্যায়, ফাল্গুন : ১৩১১] প্রকাশিত হয়। তৃতীয় নিবন্ধটি মহর্ষির ১৩১৩ সালের শ্রাদ্ধ-সভায় পঠিত এবং 'বঙ্গদর্শনে' [নব পর্যায়, মাঘ : ১৩১৩] 'মহাপুরুষ' নামে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ নিবন্ধটি ১৩৪২ সালের ৬ই মাঘ মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পঠিত এবং 'প্রবাসী'তে [ফাল্গুন, ১৩৪২] 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামে প্রকাশিত হয়।

বস্তু-সংক্ষেপ

মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। মহাত্মাদের ভক্তি করলে মহাত্মাদের কল্যাণ হয় না; কল্যাণ হয় তাদের, যারা তাঁদের ভক্তি করে। সেজন্য ভক্তিভাজনদের নামের তালিকা সুদীর্ঘ হবার সুযোগ নেই। নিজেদের প্রকৃতি-অনুসারে রচিত ভক্তিভাজনদের নামের তালিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক; এবং কোনরূপ কৃত্রিমতা নয়, সজীব ভক্তিই তাঁদের চারিত্রপূজার একমাত্র উপচার।

ভক্তির আতিশয্যে অনেকে দল বেঁধে ভক্তিভাজনদের মূর্তি স্থাপন করে বা মৃতদেহ বিশেষস্থানে সমাধিস্থ করে। তাতে খ্যাতির মোহ থাকতে পারে। কিন্তু তাতে প্রকৃত ভক্তির অভাব প্রকটিত হয়ে পড়ে। মহাপুরুষদেরও এভাবে নগদ বিদায় দেওয়া অনুচিত। সমাজের কল্যাণের জন্যে মহাপুরুষদের কার্যাবলীর বাহ্যমূল্য দিতে গেলেই কল্যাণের মূল্যহানি ঘটে।

দলবদ্ধভাবে কাকেও স্মরণ করা হলে তাতে যে ভক্তির ঝড় ওঠে, তা ক্ষণস্থায়ী হয়। এই ক্ষণকালের দেবতাদের চিরকালের আসনে বসাবার চেষ্টা ভক্তিভাজন বা ভক্তিমান্ —কারো পক্ষেই শুভ হয় না। য়ুরোপে এই দলবদ্ধভাবে ভক্তির উচ্ছ্বাস বেশী করে দেখা যায়। তাতে গ্রাম্য দেবতাকে বিশ্বদেবতার উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়। কিন্তু তা অনুচিত। কেবলমাত্র যে সব ব্যক্তিদের নাম স্মরণ আমাদের প্রাত্যহিক কল্যাণপ্রয়াসের শুভ সূচনারূপে বিবেচিত হয়, তাঁরাই প্রাতঃস্মরণীয়। তার অতিরিক্ত নামের বোঝা নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যা বিনষ্ট হবার, তাকে বিনষ্ট হতে দেওয়া দরকার। যদি মৃতদেহ বিলুপ্ত করবার ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীই মৃতদেহে পূর্ণ হয়ে যেত। যা চিরস্থায়ী, কেবলমাত্র তাকেই রক্ষা করে, যা ক্ষণস্থায়ী, তা বিস্মৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সঞ্চয়ের নেশা বড়ো দুর্জয় নেশা। সেই নেশায় য়ুরোপকে পেয়েছে। য়ুরোপ ডাকের টিকিট, পুরনো জুতো থেকে শুরু করে মৃত বড়লোক পর্যন্ত জমায়। যার মধ্যে সামান্য বিশেষত্ব আছে, তাকেই য়ুরোপ দেবতা বানিয়ে তুলে পূজো করতে লেগে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার পার্থক্য আছে। মহাত্মারা এমন একটি আদর্শ রেখে যান, যার অনুধ্যানে আমাদের জীবন মহত্ত্বের পথে চালিত হয়। কিন্তু প্রতিভাবান্ বা ক্ষমতাবান্দের অনুধ্যানে আমাদের প্রতিভাবান্ বা ক্ষমতাবান্ হবার আশা নেই। শেক্স্পীয়রকে স্মরণ করলে আমাদের শেক্স্পীয়র হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সাধু বা বীরকে স্মরণ করলে সাধুতা বা বীরত্ব অর্জন অনেকটা সহজ হয়। তবে গুণীদের তাঁদের গুণের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের পার্থক্য লুপ্তপ্রায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আভিঙের সম্মান যে-কোন পরম সাধুর চেয়ে কম নয়। রামমোহন একালে যদি ইংলণ্ডে যেতেন, তা হলে তাঁর গৌরব ক্রিকেট-খেলোয়াড় রঞ্জিত সিংহের গৌরবের পাশে নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

সেদিক থেকে য়ুরোপকে 'চরিতবায়ুগ্রস্ত' বলা যেতে পারে। যে নাচে, যে গান করে, যে লোক হাসায়, যে কবিতা লেখে—য়ুরোপে এদের প্রত্যেকের জীবনচরিত চাই। কিন্তু যিনি কবি বা গায়ক, তিনি কবিতা বা গান দান করলেও জীবন তো দান করেন নি। এঁদের জানতে হবে এঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, এঁদের জীবনচরিতের মধ্য দিয়ে নয়।

আমাদের দেশে আধুনিককালে পাপ ও পুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম। যে ব্যক্তি নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ, তাঁর চেয়ে, যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করে ও আচার পালন করে, তার সম্মান বেশী। এই মানসিকতায় দেশের মানুষ নির্বিবেক হয়ে ওঠে, কে প্রকৃত ভক্তিভাজন বুঝে ওঠা যায় না।

আজ আমাদের দেশে বারোয়ারিভাবে যে স্মৃতিপালন ও শোকপ্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, তাতে একটা অবান্তর উত্তেজনা প্রকাশিত হয়। জনারণ্যের কোলাহলের মধ্যে ভক্তি বা পূজার অভিনয় করা হয় মাত্র। হৃদয়ের ভক্তি প্রকাশের যথার্থ স্থান বারোয়ারি স্মৃতিমণ্ডপ নয়।

কীর্তির মধ্যেই কীর্তিমানেরা বেঁচে থাকেন। তাঁদের জন্যে স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা অবান্তর। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে কোন ধুমধাম করা হয়নি; তার অর্থ এই নয় যে, বাঙালী কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করেছে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো কৃত্তিবাসের কাব্যের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস শতাব্দীর পর শতাব্দী মুদির দোকান থেকে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছেন। তাই তো প্রত্যক্ষ পূজা॥

বিদ্যাসাগর-চরিত

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর গ্রাম্য সংস্কার এবং বাঙালীসুলভ জড়ত্বকে সবলে জয় করে মনুষ্যত্বের উদার উন্মুক্ত জগতে উপনীত হয়েছিলেন। তাই তিনি যে শ্রেষ্ঠ বাঙালী বা শ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তা নয়, তিনি ছিলেন যথার্থ মানুষ।

তাঁর প্রধান কীর্তি বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা যদি কখনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্পদে সমৃদ্ধ হয়, তবেই তাঁর কীর্তি হবে যথার্থ গৌরবমণ্ডিত।

বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। ইতিপূর্বে বাংলা গদ্যের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তিনিই বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথমে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। কোনমতে ভাবটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা না করে তিনি বিশৃঙ্খল বাংলা গদ্যকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করে তাকে শিল্পসম্মত প্রকাশ-কুশলতা দান করেছেন। তাকে অনাবশ্যক সমাসের আড়ম্বর থেকে মুক্ত করে তিনি সুনির্বাচিত শব্দগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামঞ্জস্য স্থাপন করেন। এইভাবে বাংলা গদ্যে তিনি একটি আশ্চর্য ছন্দ-সুষমা প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। তার ফলে, গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাংলা ভাষা যথার্থ আর্য ভাষা বা ভদ্র ভাষায় উন্নীত হয়। ভাষা নদীর স্রোতের মতো নিত্যপ্রবাহমান, নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাজেই, বাংলা ভাষার বর্তমান উন্নতি দেখে বিদ্যাসাগরের প্রতিভার কৃতিত্ব উপলব্ধি করা যাবে না।

প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলেও, একটি অংশ মাত্র; আর মনুষ্যত্ব জীবনের সর্বত্রব্যাপী। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যথার্থ শ্রেষ্ঠতা। বিদ্যাসাগর সেই চরিত্র-রচনায় অনন্যতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর এই অনন্যতন্ত্রতার অধিকারী ছিলেন। একদিকে তাঁরা নিজস্ব প্রভাবে

স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তাঁরা মানবজাতির একান্ত আপন জন। একদিকে তাঁরা যেমন বাঙালী ছিলেন, অন্যদিকে তাঁরা তেমনি য়ুরোপীয় মহাজনদের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন। শুধু য়ুরোপীয় কেন, বিদ্যাসাগর সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালদের সঙ্গেও যথার্থ একাত্মতা অনুভব করতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বকর্মা চার কোটি বাঙালীর মধ্যে হঠাৎ একজন বিদ্যাসাগর নির্মাণ করে বসেন কেন, তা বড়ো রহস্যময়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ছাঁচটি যে ভালো ছিল, তা তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে লক্ষণীয়।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ। এই মানুষটি ছিলেন অনন্যসাধারণ। মেদিনীপুরের বনমালীপুরে ছিল তাঁর পৈতৃক বাসভবন। পিতৃবিয়োগের পর বিষয়-বিভাগ নিয়ে সহোদরদের মধ্যে মনান্তর দেখা দিলে তিনি অভিমানে সংসার ত্যাগ করে চলে যান। দীর্ঘকাল ব্যবধানে ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরদের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় থেকে বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ে এবং পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধ পিতার সাহায্যে পিতৃগৃহের অনতিদূরে একটি কুটিরে বাস করছেন; সেখানে চরকা কেটে দুই পুত্র ও চার কন্যা নিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটছে তাঁর। অত্যন্ত তেজস্বী এবং স্বাধীনচেতা এই ব্যক্তিটিকে একান্নবর্তী পরিবার ধরে রাখতে পারেনি। তেমনি পারেনি উদ্ধতস্বভাব শ্যালকের ঔদ্ধত্য তাঁকে বশীভূত বা অনুগত করে রাখতে। গ্রামের জমিদার তাঁদের নতুন বাস্তুভিটে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করে দেবার প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বসতবাটি লাখেরাজ করবার জন্যে বহুজনের উপদেশও তিনি উপেক্ষা করেন। এমন মানুষের দারিদ্র্যও মহান্ ঐশ্বর্য।

অথচ তর্কভূষণ মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও নিরহংকার প্রকৃতির মানুষ। সবার সঙ্গে করতেন সদয় ও সাদর ব্যবহার। কপট বা ভণ্ডদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন। আর ছিলেন যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনি যথার্থবাদী। যার মধ্যে তিনি ভদ্র আচরণ দেখতেন, তাকেই ভদ্র বলে মনে করতেন; আর, যার মধ্যে অভদ্রতা দেখতেন, সে বিদ্বান্ ধনবান্ বা ক্ষমতাবান্ হলেও তাকে তিনি ভদ্র বলে মনে করতেন না।

তর্কভূষণ মহাশয়ের আশ্চর্য বল ও সাহস ছিল। সঙ্গে থাকতো নিত্যসঙ্গী একখানি লৌহদণ্ড। সেই লৌহদণ্ড দিয়ে পথিমধ্যে একাকী দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তিনি কয়েকবার তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। একুশ বছর বয়সে পথে একবার এক ভালুকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি ঐ লৌহদণ্ডটির প্রহারে ভালুকটিকে হত্যা করে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এমন নির্ভীক ঋজুচরিত্রের রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন অত্যন্ত পরিহাস-নিপুণ, কৌতুকপ্রবণ মানুষ। ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কোমরগঞ্জের হাট থেকে ফিরছিলেন। রামজয় পুত্রকে

একটি শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' ঠাকুরদাস বাড়ি ফিরে গোয়ালের দিকে যেতে উদ্যত হলে রামজয় 'ওদিকে নয়, এদিকে এসো' বলে তাঁকে সূতিকাগৃহে নিয়ে গিয়ে নবজাত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখালেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে আর কোন ধনসম্পত্তি দান করে যেতে পারেন নি, উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁকে কেবল দান করে গিয়েছিলেন তাঁর দুর্লভ উন্নত চরিত্রমহিমা।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ মানুষ ছিলেন না। যখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর, তখনই তিনি মাতা দুর্গাদেবীর দুঃখ-লাঞ্ছনা দূর করবার জন্যে পাড়ি দিয়েছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় প্রথমে তিনি তাঁর আত্মীয় জগমোহন তর্কালংকারের বাড়িতে থেকে এক শিপ-সরকারের কাছে ইংরেজি শিখতে যেতেন। বাসায় যখন ফিরতেন, তখন বাসায় আহারপর্ব সমাধা হয়ে যেত ; অগত্যা তাঁকে এক-একদিন উপবাসে রাত কাটাতে হতো। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁর একমাত্র সম্বল একখানি পেতলের থালা ও একটি কাঁসার ঘটি তিনি কাঁসারির দোকানে বেচতে গেলেন। কাঁসারি পাঁচ সিকায় কিনতে রাজী হয়েও শেষ পর্যন্ত অজানা লোকের কাছ থেকে তা কিনলো না। আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় পথে বাহির হয়ে ঠাকুরদাস চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় একটি মুড়ি-মুড়কির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। দোকানে উপবিষ্টা বিধবা স্ত্রীলোককে তিনি তৃষ্ণার জল চাইলে ব্রাহ্মণ-বালকটিকে তিনি কিছু মুড়কিসহ জল দিলেন। ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাসের মুড়কি-ভক্ষণের ব্যগ্রতায় সেই বিধবা মহিলা বুঝতে পারলেন, এই ব্রাহ্মণ-বালক অভুক্ত। তিনি সস্নেহে তাঁকে পেট ভরে ফলার করিয়ে ছাড়লেন ; এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে ফলার করে যাবার অনুরোধ জানালেন।

এইভাবে দুঃখকষ্টের মধ্যে কিছু ইংরেজি শিখে ঠাকুরদাস একটি চাকরি পেলেন। পরে যখন তাঁর মাইনে মাসিক আট টাকা হলো, তখন জননী দুর্গাদেবী আনন্দিত হয়ে গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবী ছিলেন অসামান্য রমণী। তাঁর মুখশ্রীর মধ্যে এমন একটি স্বর্গীয় পবিত্রতা, এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত উদারতা এবং স্নেহবর্ষী গভীরতা ছিল যে, বিদ্যাসাগরকে অন্য কোন দেবী-বিগ্রহের পদতলে পূজা নিবেদন করতে হয়নি।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া পল্লী-প্রতিবেশকে সর্বদা অভিষিক্ত রাখতো। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, দরিদ্র ছাত্রদের আহারের ব্যবস্থা ছিল তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী। এমনকি, দরিদ্রদের অন্ন বিতরণকে তিনি দেবতার পূজারও ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। অর্থাৎ, তাঁর কাছে মানব-সেবাই ছিল যথার্থ দেবতার পূজা। সেদিক দিয়ে বিদ্যাসাগর-জননী ছিলেন উদার-হৃদয়, উন্নতমনা এবং সংস্কারমুক্ত মহিলা। সিবিলিয়ান হ্যারিসান সাহেবকে যেমন তিনি আপন সন্তানের মতো কাছে বসিয়ে ভোজন করাতেন, তেমনি যে-সব ব্রাহ্মণজাতীয়া বিধবাদের বিবাহ হতো, তাদের প্রতি সামাজিক অবিচার দূর করবার জন্যে তিনি তাদের স্বগৃহে এনে তাদের সঙ্গে একপাত্রে ভোজন করতেন। কোনরূপ শাস্ত্রীয় নির্দেশ নয়, মানবতার এই মহৎ কর্মে তিনি

সর্বদা হৃদয়ের নির্দেশেই চালিত হতেন। সেদিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত ভগবতী দেবীর জীবন-চরিত থেকে অভিন্ন।

শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত জেদী-প্রকৃতির। এ বিষয়ে তাঁর 'বর্ণপরিচয়ে' বর্ণিত গোপাল নামক সুবোধ বালকটির সঙ্গে তাঁর ছিল অমিল। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, পিতাকেই তাঁর মন বুঝে চলতে হতো। যেদিন তিনি যে কাপড় পরে কলেজ যাবেন, স্থির করতেন, সেদিন তাঁকে অন্য কাপড় পরানো যেত না ; কিংবা যেদিন তিনি স্নান করবেন না, স্থির করতেন, সেদিন তাঁকে কিছুতেই স্নান করানো যেত না। আরও আগে গ্রামের মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাবার জন্যে তিনি যে সভ্য-বিগর্হিত কাজ করতেন, তা তাঁর 'বর্ণপরিচয়ে'র কু-বালক রাখালও করতো না। লেখাপড়ার ব্যাপারেও রাখালের সঙ্গে তাঁর অমিল ছিল। এই ক্ষুদ্র একগুঁয়ে বালকটি মস্ত একটি ছাতা মাথায় যখন বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্গার সংস্কৃত-কলেজে পড়তে যেত, তখন মনে হতো, একটি ছাতাই শুধু চলে যাচ্ছে। চেহারার খর্বাকৃতির জন্যে সহপাঠীরা তাঁকে 'যশুরে কৈ, কশুরে যৈ' বলে ক্ষেপাতো। রাগে তাঁর তোত্‌লামি এসে পড়তো, তিনি আর কথা বলতে পারতেন না।

রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে তাঁকে পড়া মুখস্থ করতে হতো। ফলে, মাঝে মাঝে সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতা তাঁকে পরাস্ত করতে পারতো না। এমনকি, বাসার বাজার করা, রান্না করা, বাটনা বাটা, বাসনমাজা ইত্যাদি কাজ সেরে তবে তিনি বিদ্যালয়ে যেতে পারতেন। রান্না করতে করতে কিংবা বিদ্যালয়-পথে চলতে চলতে চলতো তাঁর বিদ্যাভ্যাস। অথচ দোকানে জল খেতে গিয়ে ধার করে সহপাঠীদের মিষ্টি খাওয়াতেন, দরিদ্র ছাত্রদের নতুন কাপড় কিনে দিতেন। বৃত্তির টাকায় সে-ধার শোধ করে দিতেন তিনি। যে অবস্থায় তিনি নিজেই দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় তিনি অন্যকে দয়া করেছেন। সেইজন্যে এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান বাংলাদেশে 'দয়ার সাগর' নামে বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কাজে তিনি যে সব উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সংস্পর্শে আসেন, তিনি তাদের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রীতিভাজন হন। কিন্তু স্বদেশের মর্যাদা বা আত্মাপমানের বিনিময়ে তিনি সাহেবদের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেননি। একবার তাঁর আগমনে হিন্দু-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেব টেবিলের ওপর সবুট পদস্থাপন করে যে অভদ্রতা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাঁর সর্বজনবন্দনীয় চটিজুতার সাহায্যে তার অবিকল অনুসরণ করে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হলে তিনি সংস্কৃত-কলেজে পদত্যাগ করেন। সম্পাদক রসময় দত্ত ও শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের অনুরোধ-উপরোধ তাঁকে টলাতে পারেনি। আত্মীয়-বন্ধুরা সে অবস্থায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার চলবে কি

করে ?' বিদ্যাসাগর সদর্পে জবাব দিয়েছিলেন, 'আলু পটল বেচে, মুদির দোকান করে চালাবো।' সে অবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত পিতাকে সংসার-খরচের অর্থ-প্রেরণে এবং বাসায় প্রায় কুড়িটি দরিদ্র ছাত্রের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থায়ও কোনরকম ব্যত্যয় হয়নি। এমনকি, সে-অবস্থায় ময়েট সাহেবের প্রেরিত কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামে জনৈক ইংরেজকে তিনি কয়েকমাস বিনা বেতনে বাংলা ও হিন্দী শেখান। সাহেব টাকা দিতে এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে তার প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এখানে আট বছর দক্ষতার সঙ্গে কার্য পরিচালনার পর শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কর্মত্যাগ করেন।

সংস্কৃত-কলেজে কর্মরত অবস্থায় তিনি সমাজ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বীরসিংহ গ্রামে এক বালিকার বৈধব্য-সংঘটনে জননী ভগবতী দেবী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়লি, তাতে বিধবার কি কোন উপাই নেই ?' সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংগ্রাম সূচিত হয়।

স্ত্রীজাতির প্রতি স্নেহ ও ভক্তি বিদ্যাসাগরের সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় থাকাকালীন তিনি জগদ্দুর্লভবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির যে স্নেহযত্ন লাভ করেছিলেন, তা তিনি জীবনেও বিস্মৃত হননি। সেই দয়াময়ী সৌম্য নারীর নিজের পুত্র গোপালচন্দ্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে স্নেহযত্নের পার্থক্য ছিল না। রাইমণির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের যে কৃতজ্ঞতা ছিল, তা তিনি নারীজাতির দুঃখদুর্দশা-মোচনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোধ করার চেষ্টা করেছেন।

বাংলা দেশে বেথুন সাহেবের সহায়তায় তিনি স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দেন। তারপর বাল্যবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তিনি সূচিত করেন বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রাম। তখন চারদিক থেকে মুষলধারে যে শাস্ত্র-বাক্য ও গালি বর্ষিত হতে থাকে, তার মধ্যে এই দুর্জয় ব্রাহ্মণ-সন্তান বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ও বিধিসম্মত প্রমাণ করিয়ে নেন। তাছাড়া, সংস্কৃত-কলেজে প্রবল বাধা অতিক্রম করে তিনি শূদ্র ছাত্রদেরও যে প্রবেশাধিকার দেন, তা তাঁর অন্যান্য জয়ের মধ্যে অন্যতম।

সংস্কৃত কলেজে কর্মত্যাগের পর তাঁর প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুশন। বাঙালীর চেষ্টায় বাঙালীর নিজস্ব কলেজ-স্থাপন এই প্রথম। দরিদ্র হয়েও তিনি হলেন প্রধান দাতা, লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও তিনি হলেন লোকাচারের হাত থেকে প্রধান মুক্তিদাতা, নিজে সংস্কৃত-বিদ্যার দিক্‌পাল হয়েও হলেন এদেশে ইংরেজি-বিদ্যার স্থায়ী প্রবর্তক।

এইভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল স্কুল ও কলেজটিকে পালন করে, দীন-দুঃখীর সেবা করে, অকৃতজ্ঞদের মার্জনা করে, বন্ধুবান্ধবদের অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করে এবং জাতির মনে তাঁর কুসুমকোমল ও বজ্রকঠিন মহান্ চরিত্র চির-অঙ্কিত করে ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ তিনি পরলোক গমন করেন।

বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে তাঁর অক্ষয় দয়ার জন্যে বিখ্যাত। তবু বিদ্যাসাগরের দয়া অশ্রুপ্রবণ বাঙালীর সাধারণ কোমল হৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়; তা যথার্থ পৌরুষের প্রতীক। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হলে সেই পদে তারকনাথ বাচস্পতিকে নিয়োগের জন্যে তিনি শুধু মার্শালসাহেবকে অনুরোধই করেন নি; স্বয়ং ত্রিশ ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে কালনা থেকে বাচস্পতি-মহাশয়ের সম্মতি ও প্রশংসাপত্রাদি নিয়ে আসেন। কাজেই, দয়া কেবল স্ত্রীলোকের ধর্মই নয়, দয়া পুরুষের প্রকৃত পৌরুষেরই প্রকাশ।

একবার এক অত্যুৎসাহী সরকারী ভৃত্য জাহানাবাদ মহকুমায় আয়করের অযোগ্য একাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে একত্র জোটবদ্ধ করে আয়করের আওতায় আনবার অপচেষ্টা করলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ করেন। তাতে কাজ না হওয়ায় তিনি লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নরের কাছে বাদী হলেন। গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন সাহেবকে দিলেন তদন্তের ভার। বিদ্যাসাগর হ্যারিসন-সাহেবের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করে এই অন্যায় নিবারণে সফল হন।

বিদ্যাসাগরের জীবনী থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। যে দেশে নিমজ্জমান নৌকাকে সাহায্যের চেষ্টামাত্র না করে অন্যান্য নৌকাগুলি নিরাপদে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, যে দেশে গ্রাম্যমেলায় কোন বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে ডোমের দ্বারা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়, সে দেশেরই মানুষ বিদ্যাসাগর তাঁর কার্মাটাড়ে বাসকালে এক কলেরা-রোগাক্রান্ত মেথর-জাতীয়া স্ত্রীলোকের কুটিরে গিয়ে তার সেবার দায়িত্ব নিজহাতে গ্রহণ করেছিলেন; অন্নসত্রে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মাথায় নিজহাতে তেল মাখিয়ে দিতেন। আসল কথা, বিদ্যাসাগরের করুণা ছিল যথার্থ পুরুষোচিত। বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করবার বাসনার কথা তাঁর প্রিয়তম ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে জানালে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল নিষেধ করেন। বাচস্পতি মহাশয় তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই নববিবাহিতা বালিকাবধূকে দেখে তার আসন্ন বৈধব্যের কথা চিন্তা করে অশ্রুবিসর্জন না করে পারেন নি। শুধু তাই নয়, সেই গুরুগৃহে তিনি আর জলস্পর্শ করেন নি।

মেট্রোপলিটন-বিদ্যালয়কে তিনি যেমন নানা বিঘ্নবিপত্তি থেকে রক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেন, তেমনি বাল্যবিধবাবিবাহ-প্রবর্তনেও তাঁর সহজ সরল চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিধবা হওয়া মাত্র বালিকারা দেবী হয়ে যায় না এবং সমাজও তার চারদিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করে বসে নেই—এ সত্যটি উপলব্ধি করতে বিদ্যাসাগরের বিলম্ব হয় নি। এর ফলে যে সামাজিক দুঃখ-যাতনা ও অকল্যাণের সৃষ্টি হতো, বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে সবলতা ও সরলতার সাহায্যে তার নিবারণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সেই সরলতা ও সবলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সাধারণ লোকব্যবহারেও। কাশীতে পিতৃদর্শনে গেলে

বিদ্যাসাগরকে অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ টাকার জন্যে ধরে। কেবলমাত্র কাশীবাসের জন্যে বিদ্যাসাগর তাদের বিশ্বেশ্বররূপে জ্ঞান করতে এবং কোনরকম সাহায্য করতে অসম্মত হন। তারা প্রশ্ন করে, 'আপনি তবে কী মানেন?' 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী'—এই হলো বিদ্যাসাগরের সুস্পষ্ট উত্তর।

নিজের অশনে বসনেও বিদ্যাসাগরের এক অটল সরলতা। কলকাতায় অধ্যয়নকালে তাঁর দরিদ্রা জননী দেবী চরকায় সুতো কেটে তাঁর জন্যে যে কাপড় বুনে পাঠাতেন, সেই মাতৃস্নেহ ম ণ্ডত দারিদ্র্য এবং ভূষণহীন সারল্যই ছিল তাঁর রাজভূষণ। তাঁর বন্ধু হালিডে সাহেব তাঁকে পরিদর্শনের উপযুক্ত বেশভূষা পরিধান করে আসতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে দিন-দুই চোগা-চাপকান পরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করতে না পেরে তিনি সে-পোশাকে তাঁর পুনরায় যাবার অক্ষমতা প্রকাশ করলে হালিডে-সাহেব তাঁকে তাঁর অভ্যস্ত বেশে আসার অনুমতি দেন। এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শের আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়কর।

সেইজন্যে এদেশে বিদ্যাসাগর আজীবন একা ছিলেন। তাঁর স্বজাতি সেদিন কেউ ছিল না। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, দাম্ভিক ও তার্কিক জাতির ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের মধ্যে বৃহৎ বনস্পতির মতো বিদ্যাসাগর নিজের উন্নত মস্তক স্বাতন্ত্র্যের সুদূর নির্জনে উন্নীত করে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করেছেন। আজ ক্ষুধিত-পীড়িত-অনাথ-অসহায়দের দয়া বিতরণ করবার জন্যে তিনি আর বর্তমান নেই, কিন্তু বঙ্গভূমিতে তিনি যে তাঁর চরিত্রের অক্ষয় বট রোপণ করে গিয়েছেন, তার ছায়া আজ তীর্থস্থানে পরিণত। দয়া নয়, বিদ্যা নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গৌরব হলো তাঁর অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষম মনুষ্যত্ব।

২.

শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের জীবনী-প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্ঠ থেকে একটি সার্থক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটির অর্থ হলো, তরুলতা-পশুপাখি জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত থাকে, যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে—'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।'

মনের জীবনই মনন; এবং সেই জীবনই মনুষ্যত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করে, মাটি জল থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে ও উন্নত করে রচনা করে। মনের যে-জীবন মনন, তাও মনকে সমস্ত তুচ্ছতা, অসংবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে উন্নতরূপে রচনা করে।

কিন্তু পৃথিবীতে তেমন মানুষ দুর্লভ, যিনি মননের দ্বারা জীবিত থাকেন। সাধারণ মানুষের মন প্রথা ও অভ্যাসের দ্বারা চালিত হয়, মননের দ্বারা নয়। সেইজন্যে

বিদ্যাসাগরের আচরণ ও কার্য-প্রণালী ঠিক সাধারণ মানুষের মতো ছিল না ; সাধারণের চেয়ে তাঁর একটা জীবন বেশী ছিল। তিনি কেবল 'দ্বিজ' ছিলেন না, দ্বিগুণ জীবিত ছিলেন। সাধারণের সামনে থাকে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, লাভক্ষতি। তাঁর সামনে সেগুলির ওপরে ছিল অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। বরং এগুলিই ছিল তাঁর কাছে বড়ো।

মানুষের মনোজীবন চালিত হয় স্বার্থ ও পরমার্থের দ্বারা। দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু সাধারণতঃ পরমার্থ থাকে অসাড়। তার ফলে সমাজে দয়াহীন দান, ভক্তিহীন পূজা, চিন্তাহীন কর্ম এবং বোধহীন তর্কের এত বাড়াবাড়ি।

মানুষ সাধারণতঃ গতানুগতিক হয়ে থাকে ; পরমার্থিক ব্যক্তি দুর্লভ। বিদ্যাসাগর গতানুগতিক মানুষ ছিলেন না। তার কারণ, মননজীবনই তাঁর মুখ্য জীবন ছিল। ইংরেজ-লেখক কার্লাইলের মতে, তিনিই প্রকৃত বীর, যিনি বস্তুর সত্য, দিব্য ও অনন্ত রূপ দেখতে পান, ক্ষণিক ও তুচ্ছ ঘটনাবলীর মধ্যে শাশ্বতকে প্রত্যক্ষ করেন এবং কর্ম ও বাক্যের দ্বারা যিনি তাঁর অন্তরের অনন্ত রূপকে বাইরে প্রসারিত করেন। কার্লাইলের মতে, তাঁরা শুধু কাপড় ঝোলাবার আলনা বা খাদ্য হজম করবার যন্ত্র মাত্র নন ; তাঁরা প্রকৃত সজীব মানুষ—পারমার্থিক ; গতানুগতিক নন। বিদ্যাসাগর তেমনি বাংলাদেশে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মানুষ একটিমাত্র চেতনা নিয়ে জন্ম-গ্রহণ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন তার অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় চেতনা নিয়ে। তাই তাঁর বেদনার অন্ত ছিল না। তাই তিনি নিছক পাণ্ডিত্য ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকবিক্রীর সাহায্যে অর্থোপার্জনে স্বস্তি পাননি, নিষ্ঠুরতা থেকে দেশের বিধবাদের রক্ষা করতে তাঁকে সমাজ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কাজেই, তিনি যে চেতনারাজ্যে, যে মননলোকে বাস করতেন, সাধারণের কাছ থেকে তার দূরত্ব বহুদূর। সেইজন্যে তাঁকে অতিচেতনার দণ্ড বহন করতে হয়েছিল। সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মতো তাঁকে একাকী বিদ্রোহের জয়ধ্বজা জীবনরণভূমির প্রান্তসীমা পর্যন্ত নিজের কাঁধে বহন করতে হয়েছিল। তিনি কাউকে ডাকেননি, কারো সাড়া পাননি। তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে।

এমনকি, ইংলণ্ডেও বিদ্যাসাগরের উপমা পাওয়া যায় না। কয়েকটি বিষয়ে কেবল জনসনের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য দেখা যায়। কাজের দিক থেকে বিদ্যাসাগর জনসনের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। কিন্তু সাদৃশ্য ছিল অন্তরের সবল প্রবল ও অকৃত্রিক মনুষ্যত্বে। জনসনও বিদ্যাসাগরের মতো বাইরে কঠোর এবং অন্তরে সুকোমল ছিলেন। জনসনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, আলাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, অন্তরে সরল এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন। দুঃসহ দারিদ্র্য তাঁর আত্ম-সম্মানকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

লেস্‌লি স্টীফ্‌নের মতে, শুধু কথায় জনসনকে ভোলানো যেত না, তাঁকে ভোলাবার

জন্যে প্রয়োজন ছিল অকৃত্রিম আবেগপূর্ণ মতবাদ। তাঁর হৃদয়বৃত্তি ছিল গভীর এবং সুকোমল। বৃদ্ধা কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রেম ছিল পবিত্র। দীনদুঃখীর প্রতি তিনি ছিলেন যথার্থ করুণাবান্। অথচ সকল প্রলোভন থেকে পৌরুষের সহিত তিনি আত্মসম্মান রক্ষা করেছেন। তাঁর পিতৃভক্তি খ্যাপামি-অপবাদকে গ্রাহ্য করতো না। পিতার মৃত্যুর বহু বছর পরেও বহুদিনগত এক অবাধ্যতা-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তিনি কঠোর শ্রম করেছিলেন। সমাজত্যক্তা নারীকে তিনি কাঁধে করে নিজের বাড়ি নিয়ে এসে তার অভাব-মোচন করে জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা করে দিতেন।

কার্লাইলের মতে, জনসন ছিলেন বলিষ্ঠচেতা মহান্ ব্যক্তি। তবু তাঁর মধ্যে বহু জিনিস অপরিণত থেকে যায়। অনুকূল উপকরণ পেলে তিনি হতে পারতেন—কবি, ঋষি, রাজাধিরাজ। সমকালই তো নিজের উপকরণ। জনসনের সময়টা ছিল খারাপ। তাঁর সাধনা ছিল তাকে ভালো করা। তাঁর কৈশোর ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগ্যময় ছিল। সমকাল অনুকূলতম হলেও জনসনের জীবন দুঃখময়ই হতো। তাঁর মধ্যে দুঃখ ও মহত্ত্বের ছিল আশ্চর্য সহাবস্থান। যেভাবেই হোক, হতভাগ্য জনসনকে রোগজ্বালা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা, বিশাল ক্ষুধার্ত হৃদয়, অনির্বচনীয় চিন্তারাশি এবং দৈনিক সাড়ে চারআনা বরাদ্দ নিয়ে পৃথিবীতে বিপন্ন বিদেশীর মতো ফিরতে হয়েছে। অথচ তাঁর হৃদয় ছিল বলিষ্ঠ, অপরাজেয়। অক্‌স্‌ফোর্ডের দাগকাটা-মুখ, কঙ্কালসার, এই দরিদ্র ছাত্রটির জীর্ণ জুতো দেখে এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র তার দরজার কাছে রেখে এলো একজোড়া জুতো। সেই দরিদ্র ছাত্রটি জুতো জোড়া তুলে চিন্তাভারাক্রান্ত দৃষ্টির সামনে ধরলো। তারপর জানালার বাইরে ফেলে দিল ছুঁড়ে। পায়ের নীচে জল পাঁক বরফ—সবই সহ্য করা যায়, কিন্তু ভিক্ষা—কিছুতেই নয়।

জনসন সম্পর্কে লেস্‌লি স্টীফ্‌ন্ বা কার্লাইলের বক্তব্যের সারটুকু বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও খাটে। বিদ্যাসাগর তেমনি স্বতন্ত্র, সচেতন ও পারমার্থিক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জুতা তাঁর চটি জুতাই ছিল। তবে দুঃখের বিষয়, জনসনের মতো বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল ছিলেন না। তার ফলে, বিদ্যাসাগরের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর যে তীক্ষ্ণতা, বলিষ্ঠতা, গভীরতা ও সহৃদয়তার প্রকাশ পেয়েছে, তা সংরক্ষণের অভাবে গেছে চিরতরে হারিয়ে। তবে তাঁর মনুষ্যত্ব এবং তাঁর মনস্বিতা যে অপরিস্ফুট জনশ্রুতির আকারে ছড়িয়ে আছে, তাই-ই থাকবে চিরবিরাজমান॥

ভারতপথিক রামমোহন রায়

নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল, দেয় গতি। এই গতি দূরের সঙ্গে দেয় যোগবন্ধন ঘটিয়ে, এই গতি মানুষের অন্তরে—তার চিন্তায়-ভাবনায় আনে প্রাণের বেগ। এরূপ দেশই যে শুধু নদীমাতৃক, তা নয়; তার জনচিত্তও নদীমাতৃক। নদী শুকিয়ে গেলে যেমন দেশের মাটির উৎপাদিকা-শক্তি দেউলে হয়ে যায়, তেমনি বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ-ধারা শুকিয়ে গেলে তার চিন্তার ক্ষেত্রও হয়ে পড়ে অনুর্বর।

একদিন ভারতের ছিল জীবন্ত চিত্ত, উর্বর চিন্তার ক্ষেত্র। সেদিন সে বিশ্বকে ডেকে বলেছিল, আমি এমন কিছু জানি, যা বিশ্বের সবাই শুনুক। তারপর অনেক শতাব্দী কেটে গেল। ভারতের মনোলোকে চিন্তার সেই মহানদী গেল শুকিয়ে। তখনই বার্ধক্য তাকে গ্রাস করলো। সংকীর্ণ হয়ে পড়লো তার মনোলোক। বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র গেল ছিন্ন হয়ে। জ্ঞানের চলমান গতি হলো অবরুদ্ধ, তার নিত্য-নতুন উন্মেষপ্রবণ বুদ্ধি হলো পঙ্গু, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল তার অর্থহীন আচার-সংস্কার, প্রবল হয়ে দেখা দিল তার চিন্তাহীন লোক-ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি।

সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে এ দেশে আবির্ভূত হলেন রামমোহন। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত, তার কণ্ঠ সেদিন বাণীহারা; সে তখন শুধু মৃত যুগের মন্ত্রজপে নিরত। সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এলো তার দ্বারে। তাকে অতিথিরূপে ভেতরে ডেকে নেবার শক্তি তার ছিল না। তাই দ্বার ভেঙে সে দ'•রূপে প্রবেশ করলো তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

সেই অজন্মার দিনে রামমোহন জন্মেছিলেন যথার্থ সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়, অর্থহীন আচার-সংস্কারে এবং চিন্তাহীন লোক-ব্যবহারের পুনরাবৃত্তিতে তাঁর ক্ষুধার্ত হৃদয় তৃপ্তি পায়নি। দেশের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে, তাতে তাঁর বিতৃষ্ণা হলো। তিনি খুঁজলেন মোহমুক্ত বুদ্ধির আশ্রয়—মানুষের মিলনতীর্থ।

প্রত্যেক জাতির আছে নিজস্ব বিশেষ সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসের মধ্যেই সেই জাতির জয়যাত্রার ইতিহাস রচিত হয়। তার মধ্য দিয়েই তার জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়, জাতীয় সমৃদ্ধির রাজপথ নির্মিত হয়। যতদিন প্রাণ, ততদিনই তার সমস্যা; এবং সমস্যা সমাধানই প্রকৃত বেঁচে থাকার লক্ষণ। যে জাতি সমাধান করতে ভুল করেছে, সে জাতি মরেছে।

মানুষের সমাজের, মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সমস্যাই হলো মানুষের ঐক্য। ভারতের ইতিহাসের সমস্যাও মূলতঃ তাই। এখানে এত জাতের মানুষ এসে জুটেছে, পৃথিবীতে তার আর দ্বিতীয় নজীর নেই। তাদের মধ্যে আত্মিক ঐক্য-স্থাপনই হলো ভারতের প্রধান সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান ভারতে যেমন দুরূহ, তেমন আর কোথাও নয়। কিন্তু যত দুরূহই হোক, তার সাধনার সফলতা লাভ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধিতে আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু তার সেই সমৃদ্ধির সাধনা আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা তার ইতিহাসের মলাটটা দেখি, ভেতরের পাতাগুলো পড়ি না। তাই আমরা দেখতে পাই না যে, তার স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার পশ্চাতে আছে জাতিগত ঐক্যের সাধনা। ভারতের সাধনা হলো জাতিতে জাতিতে ঐক্যসাধনা; আর, পশ্চিম-মহাদেশের সাধনা হলো শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঐক্যসাধনা।

স্মরণীয় যে, মাটিতেই ফসল ফলে, বালিতে নয়। মাটিতে আছে কণায় কণায় বন্ধন, বালিতে আছে কণায় কণায় বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদে মানুষ বর্বর হয়। ঐক্যই সত্যধর্ম,

শ্রেষ্ঠতার হেতু। ভারতের উপনিষদ্ বলেছে, যিনি নিজের চৈতন্যকে সবার অন্তরস্থ করে জানেন, তিনিই বিদ্বান্। অথচ ভারতবর্ষই নানা বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে পৃথক্ করে দেখেছে। কাজেই, ভারতের ভেতর ও বাইরের মধ্যে একটা ফারাক্ থেকে গেছে, যার প্রকাশ আমাদের নানা দুঃখে, দারিদ্র্যে, অপমানে। অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ভারতের শাশ্বত বাণী শোনাবার জন্যে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়েছেন। আধুনিক যুগে আসেন রামমোহন। ঐক্য-সাধনার পথই ভারতের পথ— ভারতপথ। মধ্যযুগের অচল আচার-সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে কবীর নিজেকে সেই 'ভারতপথিক' বলে অভিহিত করেছিলেন। দাদূ এবং রজ্জবও ছিলেন তেমনি ভারত-পথিক। এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন, তা মনুষ্যত্বের সাধনার মাধ্যমে মিলন, সে-ঐক্য ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তির সাধনার মধ্য দিয়ে ঐক্য। এই ঐক্যের পথই যথার্থ ভারতের পথ।

কিন্তু তা বিস্মৃত হয়ে আমরা অবজ্ঞা আর অস্পৃশ্যতা দিয়ে আপনাকে পর করবার সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি, তা দিয়ে সর্বনাশের শনির চর আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলোর ফাঁক দিয়ে যে জলরাশি উঠছে, তাতে লবণাশ্রুসমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়াই কখনই ভারত-ইতিহাসের লক্ষ্য হতে পারে না।

এরপর রামমোহন রায়ের কণ্ঠে প্রথম শোনা গেল যুগের আহ্বান—সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। প্রত্যেক দেশেই একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব থাকে। একটা দিকে তার অন্ধকার, সেদিকটা কৃষ্ণপক্ষ ; অন্যদিকে আলো, সেদিকটা শুক্লপক্ষ। য়ুরোপও একদিন ডাইনী জ্ঞানে শতশত স্ত্রীলোককে পুড়িয়ে মেরেছিল। আবার ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে দেখা গেছে মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। ইংলণ্ডে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা ইংরেজ-জাতির স্বভাববিরুদ্ধ কাজের জন্যে অন্তরে পীড়িত। বস্তুতঃ সব ইংরেজই ইংরেজ নয়। তেমনি রামমোহন রায় আবির্ভূত হলেন ভারতের সত্য পরিচয় অন্তরে বহন করে। মানুষের সেই ঐক্যের বার্তা যখন তিনি ভারতের বাণীতে প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কার জানিয়েছিল। তিনি ভারতের মহা-অতিথিশালায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান—সবাইকে আহ্বান করেছিলেন।

রামমোহন যে-কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার একদিক চলে গেছে প্রাচীন ভারতে, অন্যদিক চলে গেছে ভারতের ভাবীকালের দিকে, যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সম্মিলিত হয়ে ভারতের অখণ্ড মহাজাতীয়তার মধ্যে সার্থক হয়েছে। কাজেই, অতীতে-অনাগতে ব্যাপ্ত সেই রামমোহনের কালকে আমরা আজও অতিক্রম করতে পারিনি। আজ বিশ্বে আমাদের অজস্র লজ্জা, সহস্র দুঃখ এবং স্তূপীকৃত অপমানের মধ্যেও আমাদের প্রাণের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, রামমোহন আমাদের দেশেই জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যেই ভারতের প্রকৃত পরিচয়॥

২

জড়ের চক্রান্ত হলো প্রাণকে সংকুচিত করে আপন অধিকার বিস্তৃত করা ; আর, প্রাণের প্রয়াস হলো সেই চক্রান্তকে পরাজিত করে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখা। সেজন্যে আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে-রাতে এক মুহূর্তও ছুটি নিতে পারে না।

প্রাণের এই নিত্য প্রয়াসের মতো মনেরও নিত্য প্রয়াস আমাদের মনকে বাঁচিয়ে রাখে। মনের তাই অনন্ত জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। মননের জড়তায় দেখা দেয় জ্ঞানের বিকৃতি। তখনই ঘনিয়ে আসে মনুষ্যত্বের চরম দুর্গতি।

এমনি করে আমাদের মনের স্বরাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এতদিন সে যা শুনেছে, মেনে নিয়েছে ; যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে, তাই সে আউড়েছে। যখন কোন উৎপাত এসে পড়েছে, তখন তাকে সে মেনে নিয়েছে বিধিলিপি বলে। মনের আত্মপ্রকাশ এমনিভাবে তার অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সামনে না চলে পেছনের কালকেই শুধু প্রদক্ষিণ করেছে। অনুসন্ধান না করে সে শুধু অনুসরণই করেছে। চিন্তার মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই, সে কখনো বাইরে থেকে স্বাধীন থাকতে পারে না। নির্জীব মন নিয়ে বাইরের কোন আক্রমণই প্রতিরোধ করা যায় না। ভারত তাই তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিল। এইরূপে যখন ভারতের আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, তার দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত এবং তার সৃষ্টিশক্তি যখন আড়ষ্ট, তখনই এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। সেদিন তিনি আমাদের অজ্ঞানতাকে, অন্ধতাকে, যাকে আমরা সনাতন বলি, তাকেই করেছিলেন কঠোর আঘাত। সেজন্যে সেদিনের জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজ আর আমরা তাঁকে শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি না। তাঁর গৌরবে আজ দেশ বিশ্বের কাছে নিজেরই গৌরবের পরিচয় দিতে পারে। তিনি তাৎস্থানিক ও তাৎক্ষণিকের মধ্যে যদি আবদ্ধ থাকতেন, তাহলে তিনি দেশের লোকের সমাদর পেতেন। কিন্তু সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না তিনি। বিস্মৃতি বা উপেক্ষা তাঁর স্মৃতিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করলেও সেই বাষ্পের আবরণ কেটে গিয়ে সর্বকালের মানুষ রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি প্রকাশিত হবেই।

তাঁর পূর্বে কবীর ভারতের পথকে বলেছিলেন মহাপথ এবং নিজেকে বলেছিলেন 'ভারতপথিক'। এই পথে হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি এসেছিল, মুক্তির বাণীর আশায় এসেছিল চৈনিক তীর্থযাত্রীরা। আবার, কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এসেছে অর্থকামনায়। সবাই এখানে আতিথ্য পেয়েছে। এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে যে মিলন, সেই মিলনই চরম সত্য। রামমোহন রায় সেই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান —সকলের হৃদয়েরই প্রতীক। সেখানে ভারতের যে ঐক্যতত্ত্ব আসন পেতেছিল, তা একমেবাদ্বিতীয়ম্। ভারতের আধুনিক কবিও সেই ভারতপথের সংগীতে ভারততীর্থে ঐক্য ও মিলনের মহাবাণীকে রূপদান করে বিশ্বের নিখিল মানবকে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে মিলিত হবার জন্যে আহ্বান করেছেন॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্যস্রোতা জাহ্নবী বহু দেশ জনপদকে উর্বর করে, তাদের তৃষ্ণা দূর করে অবশেষে যেখানে মহাসমুদ্রের সুগভীর শান্তির মধ্যে লীন হয়, সেই সাগরসংগম যেমন তীর্থস্থান, তেমনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পবিত্র জীবন একটি মহান্ তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ। একদা স্বর্গলোক থেকে এক শুভ সূর্যকিরণে যে তুষারবেষ্টন অশ্রুধারায় বিগলিত হয়ে তার কল্যাণযাত্রা শুরু করেছিল, আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তার অবাধ, উদ্বেল, অবিরাম চলা ক্রমে এক ধ্যানসমাহিত পরম পরিণামের সম্মুখীন হলো।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে একটি প্রধান বাধা—ঐশ্বর্য। মানবাত্মার চিরন্তন ক্রন্দনই হলো—আমাকে সত্য দাও, আমাকে আলো দাও, আমাকে অমৃত দাও। কিন্তু মহর্ষির জীবনের প্রথম যৌবনে ঐশ্বর্য তেমনি তাঁর অনন্ত পিপাসার চরিতার্থতার পথে প্রবল বাধারূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর, মহর্ষি তার উর্ধ্বে উঠে সত্যের অমৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন।

আবার, যখন দুর্দিনের বজ্রাঘাতে সেই ঐশ্বর্যের পাহাড় পড়লো ভেঙে, ঋণ যখন উদ্যত হলো তাঁকে গ্রাস করতে, তখনও তিনি তাঁর হৃদয়কে সত্যের অমৃতরূপের অভিমুখে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। সম্পদ যেমন তাঁকে অমৃত লাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি, বিপদও তেমনি তাঁকে অমৃত-সঞ্চয় থেকে পারেনি বিমুখ করতে। ঐশ্বর্যের সুখশয্যা ত্যাগ করে তিনি এসে দাঁড়ালেন ধর্মের সুকঠিন পথে। সে পথ লোকাচারের পথ নয়, চিরাভ্যস্ত আরামের পথ নয়। সেই তরুণ বয়সের বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে তিনি বংশমর্যাদার দিকে না তাকিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন চিরন্তন ব্রহ্মের কাছে।

সে সময়ে তাঁর জীবনে আর এক গুরুতর সংগ্রাম উপস্থিত হলো। তখন ভারতের সাধনা থেকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করে তাকে অন্য দেশীয় আকার দেবার প্রয়াস সূচিত হয়েছিল। ভারতের সাধনার শ্রেষ্ঠধন যেমন সার্বভৌমিক, য়ুরোপের সাধনার শ্রেষ্ঠধনও তেমনি সার্বভৌমিক। তবু ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তার আছে স্বতন্ত্র সার্থকতা। তাকে অস্বীকার করে উভয়কে একাকার করে দেওয়া এক প্রকার মূঢ়তা। বৈচিত্র্যের মধ্যেই যেমন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, নানা সমাজের ইতিহাসের বৈচিত্র্যের মধ্যেও তেমনি ধর্মের সত্যরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত।

তরুণ ব্রাহ্ম-সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সংকীর্ণতা মনে করে ভারতবর্ষীয় শাখায় বিদেশী ইতিহাসের ফল ফলাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল, তখন মহর্ষি তার বিরুদ্ধাচরণ করায় সমাজভুক্ত বহু তেজস্বী প্রতিভাবান্ যুবকের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। আর একবার হিন্দু-সমাজের অনুকূলে তিনি ক্ষতির আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অনুবর্তীদের ত্যাগ করলেও ব্রহ্মকে ত্যাগ করেননি। তাঁর প্রার্থনা ছিল—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন।

ব্রহ্ম তাঁকে ত্যাগ করেন নি—ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের দিনেও নয়, আসন্ন দারিদ্র্যের সম্ভাবনার দিনেও নয়। দলবৃদ্ধি দলপুষ্টির মুখেও বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি ছিলেন ব্রহ্মে সমর্পিতপ্রাণ। সেই মহর্ষির জীবনের সায়াহ্নকাল সমাগত। সারা জীবন জীবনেশ্বরের আদেশ পালন করে জীবনের কর্মাবসানে তিনি তাঁর বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন হৃদয়েশ্বরের সঙ্গে নির্বাধ মিলনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে।

সন্নিকটবর্তী মহাপুরুষকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখার পথে বাধা বিস্তর। সাংসারিক সম্বন্ধই সে পথের প্রধান বাধা। বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত এবং বিচিত্র প্রবৃত্তির দ্বারা নানা সময়ে বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করে। তখন ছোট জিনিস ওঠে বড়ো হয়ে, ক্ষণকাল শাশ্বত কালের চেয়ে হয়ে ওঠে প্রবল। সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় খণ্ডিত হয়ে যায়। মহর্ষির অষ্টাশীতিতম জন্মদিবস তাঁর আত্মীয়দের পক্ষে যথার্থ দূর থেকে সাংসারিক সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রাত্যহিকতার ধূলিরাশি অপসারিত করে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে সমগ্রভাবে মহিমময় নিত্যপ্রতিষ্ঠার আসনে সমাসীন দেখার জন্যে. শুভতম অবসর। এইদিনই তাঁকে সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের অতীত করে, তাঁকে বিশ্বভুবন ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-যুক্ত করে দেখার দিন। এবং তাঁর জীবনের মধ্যে যে চিরজীবনের ধন সঞ্চিত, তাকে পৈতৃক সম্পত্তিরূপে গ্রহণ করার দিন।

ধর্মেই ধর্মের সার্থকতা এবং যাকে সম্পদ বলে উন্মত্ত হই, তা প্রকৃত সম্পদ নয়; যাকে বিপদ বলে ভীত হই, তা বিপদ নয়—মহর্ষির জন্মদিনই একথা উপলব্ধির দিন। সমস্ত জীবন দিয়ে ভূমাকেই জানা উচিত এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ করা উচিত। এবং প্রার্থনা করা উচিত—হে স্বপ্রকাশ, আমার কাছে প্রকাশিত হও। সেই প্রকাশ আমাদের অতিক্রম করে বিশ্বমানবের মধ্যে দীপ্যমান হয়ে উঠবে। তাহলে আমাদের জীবন নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হবে। তবেই আমাদের সীমিত মানবজন্ম সার্থক হবে।

২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইহলোক ত্যাগের পর একাদশ দিবস। সুদীর্ঘ জীবন-যাত্রার অবসানে যাঁর ব্রহ্মলোকে পরম ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হবার চরম আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি আজ নিশ্চয়ই পরম শান্তি এবং অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে চরম চরিতার্থতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দান-প্রতিদানের প্রত্যাশী। কিন্তু পিতামাতার স্নেহ সমস্ত প্রত্যাশার অতীত। তা পাপ, অপরাধ, কদর্যতা ও কৃতঘ্নতারও অতীত। এবং তা আলোবাতাসের মতো অযাচিতভাবে আমাদের আশৈশব রক্ষা করে। এই পিতৃস্নেহের জন্যে বিশ্বপিতা আমাদের প্রণম্য।

দ্বারকনাথের মৃত্যুর পর যখন দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল, তখন মহর্ষি সেই দুস্তর ঋণসমুদ্র একাকী উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর পরিবার-পরিজনদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে সক্ষম

হয়েছিলেন। তাঁর সেই সময়ের দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টস্বীকার অতুলনীয়। ধনপতির পুত্র হয়েও তিনি নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব করে, ধনী-সমাজের প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করে শান্ত সংযত শৌর্যের সঙ্গে তাঁর সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে বহন করে দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করেছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর সেই সুদৃঢ় চারিত্র বল, অবিশ্বাস্য সংযম, অতুলনীয় দৃঢ়চিত্ততাই ছিল তাঁর সেই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু যদি তিনি অধর্মের সাহায্যে সেই সম্পত্তি রক্ষা করতেন, তাহলে তিনি সর্বসমক্ষে হতেন অশ্রদ্ধেয়। তিনি আগে ধর্মকে রক্ষা করেছেন, পরে রক্ষা করেছেন ধন। সেদিন তাঁর বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে কৌশলে তাঁর পূর্ব সম্পত্তির বহুতর অংশ উদ্ধার করতে পারতেন এবং ধন-গৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বলেই তিনি আরো বেশী শ্রদ্ধেয়। ঘোর সংকটের দিনে শ্রেয় ও প্রেয়োপথের মধ্যে তিনি শ্রেয়োপথই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যা অর্জন করেছিলেন, তা যেমন গৌরবের ; তিনি যা বর্জন করেছিলেন, তাও তেমনি আরো গৌরবের।

তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। তিনি শুধুমাত্র বিষয়ী হলে তিনি তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিকে বহুগুণে বর্ধিত করতে পারতেন। বিষয়-বৃদ্ধির দিকে মন দিয়ে তিনি ঈশ্বর-সেবা থেকে নিবৃত্ত হননি। তাঁর ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্যে মুক্ত ছিল—কত অনাথ-পরিবারের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল, কত দরিদ্র গুণী তাঁর সহায়তায় অভাবমুক্ত হয়েছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে করেছেন সাহায্য। সেদিকে কার্পণ্য করে তিনি তাঁর সন্তানদের বিলাসভোগ ও ঐশ্বর্যের অভিমানকে প্রশ্রয় দেননি। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থের মতো অতিথিসেবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তাই দিয়ে তিনি পরিবার প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাতে লক্ষ্মীর স্বর্ণ-পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানেরা যদি ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধ বিহারের কিছুমাত্র শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের পিতৃদেবের পুণ্য প্রসাদেই তা সম্ভব হয়েছে।

মহর্ষি তাঁর পুত্রদের যেমন দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি ধনের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সমস্ত পৃথিবীই তাঁদের সম্মুখে ছিল মুক্ত—তাঁদের বাড়িতে ধনী দরিদ্র—সকলেরই ছিল অবাধ গতি। সমাজে ধনগৌরবে যাঁরা ছিলেন নিম্নতর, তাঁরা বন্ধুভাবেই সংবর্ধিত হতেন, পারিষদভাবে নয়। মহর্ষির প্রসাদেই তাঁর সন্তানদের সর্বসাধারণের সংস্রব লাভ সম্ভব হয়েছিল।

অথচ পরিবারের মধ্যে ছিল উদার স্বাধীনতা। যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানে লাভ করেছিলেন, যাকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করেছেন, যে ধর্মের জন্য তিনি উৎসর্গীকৃত-জীবন, সেই ধর্মকে নিজের বাড়িতে শাসনের বস্তুতে পরিণত করেননি। তাঁর দৃষ্টান্ত, তাঁর উপদেশ তাঁর সন্তানদের সম্মুখে ছিল। কিন্তু কোনদিনই তাদের মধ্যে তিনি নিয়মের শাসন প্রবর্তন করেননি। কোন বিশেষ মতবাদকে তিনি তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেননি। স্বাধীনভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে সন্ধান করবার পথ উন্মুক্ত

রেখেছিলেন। ধন ও খ্যাতি চিরন্তন নয়। একদিন এই পরিবারের সমৃদ্ধি বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়ে যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম-জিজ্ঞাসায় সজীব করে তুলেছেন, যিনি ইংরেজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, যিনি দেশকে প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটনে অনুপ্রাণিত করেছেন, যিনি বিষয়লোলুপ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ স্থাপিত করে তাঁর পরিবারকে সমস্ত মানব-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে তাঁর সন্তানদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কত সাম্রাজ্য, কত প্রবল প্রতাপ, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি, কত কুবেরের ধনভাণ্ডার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কিন্তু যিনি 'আনন্দরূপমমৃতম্'. তাঁর অনন্ত মাধুর্যের ক্ষয় নেই। মহর্ষির লোকান্তরগমনের বিষাদ-অবসাদ দূর হয়ে বায়ু, সমুদ্র এবং পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক।

৩

সব মানুষের গ্রহণ-শক্তি সমান নয়। যে পথ একজনের পক্ষে সহজ, তা অন্যের পক্ষে কঠিন। কিন্তু মানুষের সেই মানসিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে সাধারণতঃ সব মানুষের জন্যে একটিমাত্র রাজপথ নির্মাণ করে তাতে সবাইকে একই পথে টানার চেষ্টা করা হয়। এই টানাটানিতে কেউ আপত্তি প্রকাশ করলে, মনে হয়, নিজের কল্যাণে তার আগ্রহ নেই কিংবা তার হীনতা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যে গতিশক্তির বৈচিত্র্য দিয়েছেন, তার লক্ষ্য এক হলেও তার পথ অনেক। সব নদীরই লক্ষ্য সমুদ্র ; কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, সব নদী এক নদী হয়ে চলেনি। কাজেই, আমরা সবাই একটা বাঁধা পথে একজনের পেছনে আর-একজন চলবো, তা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কারণ প্রত্যেক মানুষের মনে একটা গভীরতার স্বাতন্ত্র্য আছে ; সেখানে সে তার নিজস্ব। কেউ কাউকে তা ছেড়ে দিতে চায় না। যে ছেড়ে দেয়, সে ধর্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে নিয়ে চোখ বুজে বসে থাকে। তাই মহাপুরুষেরা যে-ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে যান, আমরা তার ধর্মটা বাদ দিয়ে সম্প্রদায়কে নিয়ে হই-চই করি। তাতে যা পাওয়া যায়, তাতে আত্মার পেট ভরে না, কিন্তু তার জাত যায়।

তাহলে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটা কী ? ধর্মসম্প্রদায় হলো জলপানের পাত্র মাত্র, তৃষ্ণা মেটাবার জল নয়। ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের সাধ্যমতো একটা পাত্র গড়ে দিয়ে যান। কিন্তু সেই পাত্রকেই যদি আমরা তাঁদের মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় বলে মনে করি, তাহলে আমরা ভুল করবো। কথামালার শেয়াল ও সারসের ভোজে পারস্পরিক নিমন্ত্রণের গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কাজেই, সবার রুচি ও প্রয়োজনের উপযোগী সর্বজনীন ধর্মসমাজ কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর ধর্মগুরুদেরও সেইভাবে ছোট করে দেখাও উচিত নয়। তবে তাঁদের মধ্যে একটিমাত্র সাধারণ জিনিস লক্ষ্য করা যায়, তা আলো—প্রদীপ মাত্র নয়। সাধারণ মানুষ তা বোঝে

না। মহাপুরুষেরা যা দিতে চান, তা তারা নিতে পারে না। কিংবা এক নিতে আর এক নিয়ে বসে। এইভাবে তারা ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে তেমনি সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভুল করা হবে। তিনি তাঁর ভাষা-ব্যবহারে, কর্মে, শিক্ষা-সংস্কারে এবং ভাবনায়—এককথায়, তাঁর সমগ্র জীবনে প্রদীপের মতো আলোকেই প্রকাশ করে গেছেন। সেই প্রদীপের আলোই সত্য। মহর্ষি একদিন ভোগ-বিলাসের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করে তাঁর আধ্যাত্মিক পিপাসার চরিতার্থতার জন্যে দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন এবং সেই অমৃত-উৎস থেকে তিনি শুধু নিজের জীবনই ভরে নেননি, সকলের জন্যেই তিনি অঞ্জলি ভরে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাতেই সবার তৃপ্ত হওয়া উচিত নয়। সবাইকে সেই অমৃত-উৎসে যাত্রা করতে হবে। সম্রাট যখন আহ্বান করেন, তখন কোন প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় সাক্ষাৎকার হয় না। তাঁর সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে হয় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে।

মহাপুরুষদের মধ্যস্থতায় আমরা আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান শুনতে পাই; আর দেখতে পাই, সুখে-দুঃখে-প্রলোভনে তাঁরা কেমন শান্ত, অবিচল। সর্বস্বক্ষতির সম্ভাবনাও তাঁদের সত্য-পথ থেকে বিচলিত করতে পারে না। যার আকর্ষণে তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন এবং যা পেয়ে তাঁরা সার্থক হয়েছেন, সেই দিকে সাধারণের মনের জাগরণই পরম লাভ।

মহর্ষির জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত সংস্কার, প্রথা ও শাস্ত্র পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে রিক্তহাতে ঈশ্বরলাভের জন্যে যাত্রা করেছিলেন। সেজন্যে তাঁর নিজের পথ নিজেকেই আবিষ্কার করতে হয়েছিল। ঈশ্বরলাভের জন্যে নিজের চাবি নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজের দিকে কাউকে আকর্ষণ না করে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করেছেন। এই পৃথিবীর সমস্ত খণ্ডতা, ভঙ্গুরতা ও অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে সেই পরম পরিণামের দিকে আমাদের শান্তদৃষ্টি স্থির রাখতে হবে।

৪

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে এবং দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতেন। দু-তিন বছর অন্তর যখন বাড়ি আসতেন, তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর পিতৃদেবের একটি একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। কাছে থাকলেও, মনে হতো, তিনি দূরে আছেন। উত্তুঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো তিনি ছিলেন আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গের মধ্যে সমুচ্চ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিত্ব। পুত্রেরা নানা উপলক্ষে তার সান্নিধ্য লাভ করলেও তাঁকে সব সময় আকাশে বৃক্ষের মতো নিস্তব্ধ মনে হতো।

তাঁর সেই নিঃসঙ্গতা ছিল আসলে নিরাসক্তি। মহর্ষির পিতার ছিল বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার। বাড়িতে আহার-বিহার-বিলাস-বাসনে হতো কত ধুম ও জনসমাগম।

কিন্তু মহর্ষি সেই ভিড়ের ভেতরে থেকেও ভিড় থেকে থাকতেন দূরে। বিষয়-কর্মে নৈপুণ্য-অর্জনের জন্যে তাঁর পিতা সামান্য পারিশ্রমিকে তাঁকে তাঁর ব্যাঙ্কে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সম্যক্ দায়িত্ব নির্বাহ সত্ত্বেও তাঁর নিরাসক্তিতে তাঁর পিতা ক্ষুণ্ণ হতেন। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর পিতার কাছে আসতেন। তাছাড়া, বিশাল আত্মীয়-সমাজ তো ছিলই। মহর্ষি তাঁদের মধ্যে নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। দ্বারকানাথের বিলাত-বাসকালে প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা তাঁর কাছে প্রেরিত হতো। তাঁর মৃত্যুর পরে এক ভূমিকম্পের ফলে যেন সমস্ত ঐশ্বর্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সেই সংকটের মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অবিচল—'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ'। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—উপনিষদের এই মহাবাণীকে তিনি জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁর পিতৃদেবকে আত্মীয়স্বজনদের বিয়োগবিচ্ছেদে তেতলার ঘরে আত্মসমাহিত অবস্থায় দেখেছেন। কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেও সাহসী হতো না।

দশ বছর বয়সে উপনয়ন হলো রবীন্দ্রনাথের। পিতৃদেব তাঁকে তাঁর হিমালয়যাত্রার সঙ্গী করে নিলেন। প্রথম যাত্রা-বিরতি হলো শান্তিনিকেতনে। বর্তমান অতিথিশালার একটা ছোট ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য ঘরে থাকতেন তাঁর পিতৃদেব। বিশাল প্রান্তর, শ্যামলতার অবকাশ কোথাও ছিল না। তখন শুধু দেবেন্দ্রনাথের রোপণ-করা শালবীথিকা সবে বড়ো হতে শুরু করেছে। কাব্যচর্চার সেই পর্বে রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'পৃথ্বীরাজবিজয়' ['পৃথ্বীরাজের পরাজয়'] রচনা করেন। ভোরবেলায় পিতৃদেব তাঁকে জাগিয়ে শ্রীভগবদ্গীতা থেকে নির্বাচিত শ্লোক নকল করতে দিতেন। রাতে সৌরজগতের গ্রহতারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিতেন। আর, অল্পস্বল্প ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়াতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতেন, তিনি দূরে দূরেই থাকেন। তারই মধ্যে তাঁকে সকালে ছাতিমতলায় ধ্যানমগ্ন দেখা যেত।

সৌর পরিবারের সূর্যের মতো তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারে একা এবং আত্ম-সমাহিত। তাঁর সেই নিরাসক্তির দান হলো শান্তিনিকেতনের আশ্রম। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ এবং আত্মার আনন্দ—এই দুইয়ের প্রতীক হলো সেই আশ্রম। এই দুই আনন্দে তাঁর জীবন ছিল পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই আনন্দকে তিনি ছোট করে প্রকাশ করেননি। সেইজন্যে কোন সম্প্রদায় তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। আর, ঐ আশ্রমে প্রবেশ করতে হলে দীক্ষা নিতে হয় না, খাতায় নাম লেখাতে হয় না। কারণ এ তো কোন সম্প্রদায়ের নয়। তার ভেতরের বাণী হলো শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্। প্রাচীন সংস্কার নিয়ে তাঁর আধুনিকপন্থী পুত্রদের সঙ্গে মতের অমিল হয়েছে ; কিন্তু তিনি কখনো প্রতিবাদ করেননি বা স্বমতে আনতে কোনরূপ চেষ্টাও করেননি। তিনি নিজে যেমন স্বতন্ত্র ছিলেন, তেমনি পুত্রদের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আদেশ ছিল, আশ্রমে যেন তাঁর কোন বাইরের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি রাখা না হয়। তাতেও যেন তাঁর নিরাসক্ত আত্মার মুক্তির বাণী ধ্বনিত ॥

আদর্শ প্রশ্ন : উত্তরসহ

●এক. কিরূপ ব্যক্তির জীবন-চরিত রচিত হওয়া উচিত? তাঁর জীবন-চরিত রচিত হওয়ার সার্থকতা কী? রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজা' অবলম্বনে যথাযথ উত্তর দাও।

মানব-চরিত্র বহু বিচিত্র। প্রত্যেক মানুষেরই কোন-না-কোন বিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। সেদিক থেকে প্রত্যেক মানুষেরই জীবন-চরিত রচিত হবার যোগ্য। কিন্তু তেমন জীবন-চরিত রচনা এবং পাঠের সার্থকতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের মতে, জীবন-চরিতের মালার দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, সকল মানুষের জীবন-চরিত রচনা নিষ্প্রয়োজন; যে মহাপুরুষেরা জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করে দিশাহারা মানব-জাতিকে আলোকিত পথরেখার সন্ধান দিয়ে তাদের আত্মিক সমুন্নতির সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়ে গিয়েছেন, কেবলমাত্র তাঁদেরই জীবন-চরিত রচিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের মতে, সব মহাপুরুষের জীবন-চরিত সবার পাঠ্য হওয়া অনুচিত; গ্রহণ-বর্জনের মধ্যস্থতায় স্ব-স্ব প্রকৃতি-অনুসারে নির্বাচিত মহাপুরুষগণের তালিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

বিশ্বের পুণ্যাত্মা মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। মহাত্মাদের ভক্তি করলে মহাত্মাদের কল্যাণ হয় না; কল্যাণ হয় তাদের, যারা তাঁদের ভক্তি নিবেদন করে। সেজন্যে ভক্তিভাজনদের নামের তালিকা সুদীর্ঘ হবার সুযোগ নেই। নিজেদের প্রকৃতি-অনুসারে রচিত ভক্তিভাজনদের নামের তালিকা সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক; এবং কোনরূপ কৃত্রিমতা নয়, সজীব ভক্তিই তাঁদের চারিত্রপূজার একমাত্র উপচার।

ভক্তির আতিশয্যে অনেকে দল বেঁধে বারোয়ারিভাবে ভক্তিভাজনদের মূর্তি স্থাপন করে বা মৃতদেহ বিশেষস্থানে সমাধিস্থ করে। তাতে খ্যাতির মোহ থাকতে পারে। কিন্তু তাতে প্রকৃত ভক্তির দৈন্য প্রকটিত হয়ে পড়ে। মহাপুরুষদেরও এভাবে বারোয়ারি ভিত্তিতে নগদ বিদায় দেওয়া অনুচিত। সমাজের কল্যাণের জন্যে মহাপুরুষদের কার্যাবলার বাহ্যমূল্য দিতে গেলেই কল্যাণের মূল্যহানি ঘটে।

দলবদ্ধভাবে কাকেও স্মরণ করা হলে তাতে যে ভক্তির ঝড় ওঠে, তা স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণকালের দেবতাদের চিরকালের আসনে বসাবার চেষ্টা ভক্তিভাজন বা ভক্তিমান্—কারো পক্ষেই শুভ হয় না। য়ুরোপে এই দলবদ্ধভাবে ভক্তির উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য চোখে পড়ে। তাতে গ্রাম্য দেবতাকে বিশ্বদেবতার উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়। কিন্তু তা অনুচিত। কেবলমাত্র যে সব ব্যক্তিদের নাম-স্মরণ আমাদের প্রাত্যহিক কল্যাণপ্রয়াসের শুভ সূচনারূপে বিবেচিত হয়, তাঁরাই প্রাতঃস্মরণীয়। তার অতিরিক্ত নামের বোঝা নিষ্প্রয়োজন। তাতে বোঝা বাড়ে, ভক্তি খর্ব হয়।

পৃথিবীতে যা বিনষ্ট হবার, তা বিনষ্ট হতে দেওয়া দরকার। যদি মৃতদেহ বিলুপ্ত করবার ব্যবস্থা না থাকতো, তাহলে সমগ্র পৃথিবীই মৃতদেহে-পূর্ণ এক বিশাল

কবর-ভূমিতে পরিণত হতো। চিরস্থায়ীকে রক্ষা করা এবং ক্ষণস্থায়ীকে বিস্মৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সঞ্চয়ের নেশা বড়ো দুর্জয় নেশা। সেই নেশায় য়ুরোপকে পেয়েছে। য়ুরোপ ডাকের টিকিট, পুরনো জুতো থেকে শুরু করে বড়োলোক পর্যন্ত জমায়। যার মধ্যে সামান্য বিশেষত্ব আছে, তাকে য়ুরোপ দেবতা বানিয়ে তুলে পূজো করতে লেগে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার পার্থক্য আছে। মহাত্মারা এমন একটি আদর্শ রেখে যান, যার অনুধ্যানে আমাদের জীবন মহত্ত্বের পথে চালিত হয়। কিন্তু প্রতিভাবান্ ও ক্ষমতাবান্দের অনুধ্যানে আমাদের প্রতিভাবান্ বা ক্ষমতাবান্ হবার আশা নেই। শেক্‌স্‌পীয়রকে স্মরণ করলে আমাদের শেক্‌স্‌পীয়র হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সাধু বা বীরকে স্মরণ করলে সাধুতা বা বীরত্ব অর্জন অনেকটা সহজ হয়। তবে গুণের মধ্য দিয়ে গুণীদের স্মরণ করা আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য।

য়ুরোপে আজ এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের পার্থক্য লুপ্তপ্রায়; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান যে-কোন পরম সাধুর চেয়ে কম নয়। রামমোহন যদি একালে ইংলণ্ডে যেতেন, তা হলে তাঁর গৌরব ক্রিকেট-খেলোয়াড় রঞ্জিত সিংহের গৌরবের পাশে নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

'সেদিক থেকে য়ুরোপকে 'চরিতবায়ুগ্রস্ত' বলা যেতে পারে। যে নাচে, যে গান করে, যে লোক হাসায়, যে কবিতা লেখে—য়ুরোপে এদের প্রত্যেকেরই জীবন-চরিত চাই। কিন্তু যিনি কবি বা গায়ক, তিনি কবিতা বা গান দান করলেও জীবন তো দান করেননি। তাই তাঁদের জানতে হবে তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তাঁদের জীবন-চরিতের মধ্য দিয়ে নয়।

আমাদের দেশে আধুনিককালে পাপ ও পুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম। যে ব্যক্তি নির্লোভ ও সত্যপরায়ণ, তাঁর চেয়ে, যে ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করে ও আচার পালন করে, তার সম্মান বেশী। এই মানসিকতায় দেশের মানুষ নির্বিবেক হয়ে ওঠে, কে প্রকৃত ভক্তিভাজন বুঝে ওঠা যায় না।

আজ আমাদের দেশে বারোয়ারিভাবে যে স্মৃতিপালন ও শোকপ্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়, তাতে একটা অবান্তর উত্তেজনা প্রকাশিত হয়। জনারণ্যের কোলাহলের মধ্যে ভক্তি বা পূজার অভিনয় করা হয় মাত্র। হৃদয়ের ভক্তি প্রকাশের যথার্থ স্থান বারোয়ারি স্মৃতিমণ্ডপ নয়।

কীর্তির মধ্যেই কীর্তিমানেরা বেঁচে থাকেন। তাঁদের জন্যে কৃত্রিম স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা অবান্তর। মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে কোনরূপ আড়ম্বরপূর্ণ ধুমধাম করা হয়নি; তার অর্থ এই নয় যে, বাঙালী জাতি মহাকবি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করেছে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতো কৃত্তিবাসের কাব্যের মধ্য দিয়ে কৃত্তিবাস শতাব্দীর পর শতাব্দী মুদির দোকান থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পূজিত হয়ে আসছেন। তাই তো প্রত্যক্ষ পূজা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্রপূজা' নিবন্ধে মহাত্মাদের প্রতিভাবান্ ক্ষমতাবান্ বা কীর্তিমানদের থেকে পৃথক্ আসনে বসিয়ে তাঁদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদনের বিধান দিয়েছেন। প্রতিভাবানেরা মানব-সভ্যতাকে তাঁদের প্রতিভার উপচার দিয়ে উন্নত করে গিয়েছেন; আর, মহাত্মারা তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ যে দান—জীবনদান, তা তিল তিল করে দান করে মানুষের আত্মিক সমুন্নতির দ্বারোদ্‌ঘাটন করে গিয়েছেন। তাঁরাই প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁদের প্রাত্যহিক স্মরণের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক সমুন্নতি ঘটুক, সভ্যতার শতদল পূর্ণ বিকশিত হোক, তাইই রবীন্দ্রনাথের কাম্য॥

●দুই. "বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন।"—রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তব্যকে কিভাবে পরিস্ফুট করেছেন, বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও। উ. মা. '৭৮

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর গ্রাম্য সংস্কার এবং বাঙালীসুলভ জড়ত্বকে সবলে জয় করে মনুষ্যত্বের উদার উন্মুক্ত জগতে উপনীত হয়েছিলেন। তাই তিনি যে শ্রেষ্ঠ বাঙালী বা শ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তা নয়; তিনি ছিলেন যথার্থ মানুষ।

তাঁর প্রধান কীর্তি বাংলা ভাষা। বাংলাগদ্যে তিনি একটি আশ্চর্য শব্দ-শৃঙ্খলা ও ছন্দ-সুষমা প্রবর্তন করেন, যার ফলে বাংলা ভাষা উন্নত সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলেও একটি অংশ মাত্র; আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সর্বব্যাপী। চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যথার্থ শ্রেষ্ঠতা। বিদ্যাসাগর সেই চরিত্র-রচনায় অনন্যতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বকর্মা চার কোটি বাঙালীর মধ্যে হঠাৎ একজন বিদ্যাসাগর-নির্মাণ করে বসেন কেন, তা বড়ো রহস্যময়। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের ছাঁচটি যে ভালো ছিল, তা তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে লক্ষণীয়। এ বিষয়ে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ মানুষ। তেজস্বী, স্বাধীনচেতা এই মানুষটি কপটতা এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ছিলেন চির-আপসহীন। এমন মানুষের দারিদ্র্যও মহান্ ঐশ্বর্য। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে আর কোন ধনসম্পত্তি দান করে যেতে পারেন নি, উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁকে কেবল দান করে গিয়েছিলেন তাঁর দুর্লভ উন্নত চরিত্রমহিমা। পিতা ঠাকুরদাসও সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর কাছ থেকে বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ঐশ্বর্য। পিতা ঠাকুরদাস তাঁর কাছে যেমন ছিলেন বিশ্বেশ্বর, মাতা ভগবতী দেবী তেমনি ছিলেন তাঁর কাছে অন্নপূর্ণা। জননী ভগবতী দেবীর এমন একটি স্বর্গীয় পবিত্রতা, এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত উদারতা এবং স্নেহবর্ষী গভীরতা ছিল যে, বিদ্যাসাগরকে অন্য কোন দেবী-বিগ্রহের পদতলে পূজা নিবেদন করতে হয়নি। এই মহীয়সী মহিলার কাছে মানবতার সেবাই ছিল যথার্থ দেবতার পূজা। সেদিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত ভগবতী দেবীর জীবন-চরিত থেকে অভিন্ন।

শৈশবে বিদ্যাসাগর যে অবস্থায় নিজেই দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় তিনি অন্যকে দয়া করেছেন। এইভাবে এক দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান মানবতার ইতিহাসে 'দয়ার সাগর' নামে বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কাজে তিনি যে সব উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সংস্পর্শে আসেন, তিনি তাদের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রীতিভাজন হন। কিন্তু স্বদেশের মর্যাদা বা আত্মাপমানের বিনিময়ে তিনি সাহেবদের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেননি। একবার তাঁর আগমনে হিন্দু-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেব টেবিলের ওপর সবুট পদস্থাপন করে যে অভদ্রতা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি তাঁর সর্বজনবন্দনীয় চটিজুতার সাহায্যে তার অবিকল অনুসরণ করে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর উপস্থিত হলে তিনি সংস্কৃত-কলেজে পদত্যাগ করেন। সম্পাদক রসময় দত্ত ও শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের অনেক অনুরোধ তাঁকে টলাতে পারেনি। আত্মীয়-বন্ধুরা সে অবস্থায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার চলবে কি করে ?' বিদ্যাসাগর সদর্পে জবাব দিয়েছিলেন, 'আলু পটল বেচে, মুদির দোকান করে চালাবো।' সে অবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত পিতাকে সংসার-খরচের অর্থ-প্রেরণে এবং বাসায় প্রায় কুড়িটি দরিদ্র ছাত্রের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থায়ও কোনরকম ব্যত্যয় ঘটেনি। এমনকি, সে-অবস্থায় ময়েট সাহেবের প্রেরিত কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামে জনৈক ইংরেজকে তিনি কয়েকমাস বিনা বেতনে বাংলা ও হিন্দী শেখান। সাহেব টাকা দিতে এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে তার প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এখানে আট বছর দক্ষতার সঙ্গে কার্য-পরিচালনার পর শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কর্মত্যাগ করেন।

সংস্কৃত-কলেজে কর্মরত অবস্থায় তিনি সমাজ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বীরসিংহ গ্রামে এক বালিকার বৈধব্য-সংঘটিত হলে জননী ভগবতী দেবী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়লি, তাতে বিধবার কি কোন উপাই নেই ?' সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংগ্রাম সূচিত হয়।

স্ত্রীজাতির প্রতি স্নেহ ও ভক্তি বিদ্যাসাগরের সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় থাকাকালীন তিনি জগদ্দুর্লভবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির যে স্নেহযত্ন লাভ করেছিলেন, তা তিনি জীবনেও বিস্মৃত হননি।

বাংলা দেশে বেথুন সাহেবের সহায়তায় তিনি স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দেন। তারপর বাল্যবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে তিনি সূচিত করেন বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রাম। তখন চারদিক থেকে মুষলধারে যে শাস্ত্র-বাক্য ও গালি বর্ষিত হতে থাকে, তার মধ্যে এই দুর্জয় ব্রাহ্মণ-সন্তান বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ও বিধিসম্মত প্রমাণ করিয়ে নেন। তাছাড়া, সংস্কৃত-কলেজে প্রবল বাধা অতিক্রম

করে তিনি শূদ্র ছাত্রদেরও যে প্রবেশাধিকার দেন, তা তাঁর অন্যান্য জয়ের মধ্যে অন্যতম।

সংস্কৃত-কলেজে কর্মত্যাগের পর তাঁর প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিট্যুশন। বাঙালীর চেষ্টায় বাঙালীর নিজস্ব কলেজ-স্থাপন এই প্রথম। দরিদ্র হয়েও তিনি হলেন প্রধান দাতা, লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও তিনি হলেন লোকাচারের হাত থেকে প্রধান মুক্তিদাতা, নিজে সংস্কৃত-বিদ্যার দিক্‌পাল হয়েও হলেন এদেশে ইংরেজি-বিদ্যার স্থায়ী প্রবর্তক।

এইভাবে জীবনের অবশিষ্ট কাল স্কুল ও কলেজটিকে পালন করে, দীন-দুঃখীর সেবা করে, অকৃতজ্ঞদের মার্জনা করে, বন্ধুবান্ধবদের অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করে এবং জাতির মনে তাঁর কুসুমকোমল ও বজ্রকঠিন মহান্ চরিত্র চির-অঙ্কিত করে ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ তিনি পরলোক গমন করেন।

বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে তাঁর অক্ষয় দয়ার জন্যে বিখ্যাত। তবু বিদ্যাসাগরের দয়া অশ্রুপ্রবণ বাঙালীর সাধারণ কোমল হৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়; তা যথার্থ পৌরুষেরই প্রতীক।

একবার এক অত্যুৎসাহী সরকারী ভৃত্য জাহানাবাদ মহকুমায় আয়করের অযোগ্য একাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে একত্র জোটবদ্ধ করে আয়করের আওতায় আনবার অপচেষ্টা করলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে এই অন্যায় নিবারণে সফল হন।

বিদ্যাসাগরের জীবনী থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করলে সেই গুরুগৃহে তিনি আর জলস্পর্শ করেন নি।

নিজের অশনে-বসনেও বিদ্যাসাগরের ছিল এক অটল সরলতা। কলকাতায় অধ্যয়নকালে তাঁর দরিদ্রা জননী দেবী চরকায় সুতো কেটে তাঁর জন্যে যে কাপড় বুনে পাঠাতেন, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য এবং ভূষণহীন সারল্যই ছিল তাঁর রাজভূষণ। তাঁর বন্ধু হ্যালিডে-সাহেব তাঁকে রাজদর্শনের উপযুক্ত বেশভূষা পরিধান করে আসতে অনুরোধ করলে তিনি দিন-দুই চোগা-চাপকান পরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করতে না পেরে তিনি সে-পোশাকে তাঁর পুনরায় যাবার অক্ষমতা প্রকাশ করলে হ্যালিডে-সাহেব তাঁকে তাঁর অভ্যস্ত বেশে আসার অনুমতি দেন। এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শের আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়কর।

সেইজন্যে এদেশে বিদ্যাসাগর আজীবন একা ছিলেন। তাঁর স্বজাতি সেদিন কেউ ছিল না। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, দাম্ভিক ও তার্কিক জাতির ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের মধ্যে বৃহৎ বনস্পতির মতো বিদ্যাসাগর নিজের উন্নত মস্তক স্বাতন্ত্র্যের সুদূর নির্জনে উন্নীত করে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করেছেন। আজ ক্ষুধিত-পীড়িত-অনাথ-অসহায়দের দয়া বিতরণ করবার জন্যে তিনি আর বর্তমান নেই, কিন্তু বঙ্গভূমিতে তিনি যে তাঁর চরিত্রের অক্ষয় বট রোপণ করে

গিয়েছেন, তার ছায়া আজ তীর্থস্থানে পরিণত। দয়া নয়, বিদ্যা নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গৌরব হলো তাঁর অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

বিদ্যাসাগরের আচরণ ও কার্য-প্রণালী ঠিক সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। সাধারণের চেয়ে তাঁর একটা জীবন বেশী ছিল। তিনি কেবল 'দ্বিজ' ছিলেন না, দ্বিগুণ জীবিত ছিলেন।

মানুষ সাধারণতঃ গতানুগতিক হয়ে থাকে ; পারমার্থিক লোক দুর্লভ। বিদ্যাসাগর গতানুগতিক মানুষ ছিলেন না। ইংরেজ-লেখক কার্লাইলের মতে, তিনিই প্রকৃত বীর, যিনি বস্তুর সত্য, দিব্য ও অনন্তরূপ দেখতে পান, ক্ষণিক ও তুচ্ছ ঘটনাবলীর মধ্যে শাশ্বতকে প্রত্যক্ষ করেন এবং কর্ম ও বাক্যের দ্বারা যিনি তাঁর অন্তরের অনন্ত রূপকে বাইরে প্রসারিত করেন। কার্লাইলের মতে, তাঁরা শুধু কাপড় ঝোলাবার আলনা বা খাদ্য হজম করবার যন্ত্র মাত্র নন ; তাঁরা প্রকৃত সজীব মানুষ—পারমার্থিক, গতানুগতিক নন। বিদ্যাসাগর তেমনি বাংলাদেশে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক মানুষ একটিমাত্র চেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন তার অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় চেতনা নিয়ে। তাই তাঁর বেদনার অন্ত ছিল না। তাই তিনি নিছক পাণ্ডিত্য ও বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বিক্রীর সাহায্যে অর্থোপার্জনে স্বস্তি পাননি, নিষ্ঠুরতা থেকে দেশের বিধবাদের রক্ষা করতে তাঁকে সমাজ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কাজেই, তিনি যে চেতনারাজ্যে, যে মননলোকে বাস করতেন, সাধারণের কাছ থেকে তার দূরত্ব অসীম। সেইজন্যে তাঁকে জীবনে অতিচেতনার দণ্ড বহন করতে হয়েছিল। সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মতো তাঁকে একাকী বিদ্রোহের জয়ধ্বজা নিজের কাঁধে বহন করতে হয়েছিল জীবনরণভূমির প্রান্তসীমা পর্যন্ত। তিনি কাউকে ডাকেননি, কারো সাড়া পাননি। তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে। বঙ্গদেশে তাই বিদ্যাসাগরের উপমা একমাত্র বিদ্যাসাগরই নিজেই ॥

● তিন. 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' শীর্ষক অধ্যায়টির সারমর্ম লিখ।

উ. মা. '৭৮

নদীর হাতেই দেশের ভাগ্য এবং চরিত্র সংগঠিত হয়। সে দেশকে দেয় ফল, দেয় গতি। সে যেমন সুদূরের সঙ্গে দেয় যোগবন্ধন ঘটিয়ে, তেমনি মানুষের চিন্তায়-ভাবনায় আনে প্রাণের বেগ। এইরূপ দেশই শুধু নদীমাতৃক নয়, নদীমাতৃক তার জনচিত্তও। নদী শুকিয়ে গেলে যেমন দেশের মাটির উৎপাদিকা-শক্তি দেউলে হয়ে যায়, তেমনি বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ-ধারা শুকিয়ে গেলে তার জীবন্ত চিত্ত মৃত্যু বরণ করে, তার উর্বর চিন্তার ক্ষেত্রও হয়ে পড়ে অনুর্বর।

একদিন ভারতের ছিল জীবন্ত চিত্ত, ছিল উর্বর চিন্তা। সেদিন সে বিশ্বকে ডেকে বলেছিল আমি এমন কিছু জানি, যা বিশ্বের সবাই শুনুক। তারপর অনেক শতাব্দী কেটে গেল। ভারতের মনোলোকে চিন্তার সেই মহানদী গেল শুকিয়ে। তখনই বার্ধক্য এসে গ্রাস করলো তার মনোলোককে, বিশ্বের সঙ্গে তার সংযোগ-সূত্র গেল ছিন্ন হয়ে। জ্ঞানের চলমান গতি হলো অবরুদ্ধ, তার নিত্য-নতুন উন্মেষপ্রবণ বুদ্ধি হলো পঙ্গু, উদ্ধত

হয়ে দেখা দিল তার অর্থহীন আচার-সংস্কার, প্রবল হয়ে দেখা দিল তার চিন্তাহীন লোক-ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি।

সেই আত্মবিস্মৃতির প্রদোষের অন্ধকারে এ দেশে আবির্ভূত হলেন রামমোহন। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত, তার কণ্ঠ সেদিন বাণীহারা; সে তখন শুধু মৃত যুগের মন্ত্রজপে নিরত। সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এলো তার দ্বারে। তাকে অতিথিরূপে ভেতরে ডেকে নেবার শক্তি তার ছিল না। তাই দ্বার ভেঙে সে দস্যুরূপে প্রবেশ করলো তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

সেই অজন্মার দিনে রামমোহন জন্মেছিলেন যথার্থ সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়, অর্থহীন আচার-সংস্কারে এবং চিন্তাহীন লোক-ব্যবহারের পুনরাবৃত্তিতে তাঁর ক্ষুধার্ত হৃদয় তৃপ্তি পায়নি। দেশের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে, তাতে তাঁর বিতৃষ্ণা হলো। তিনি খুঁজলেন মোহমুক্ত বুদ্ধির আশ্রয়—মানুষের মিলনতীর্থ।

প্রত্যেক জাতির আছে নিজস্ব বিশেষ সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধানের প্রয়াসের মধ্যেই সেই জাতির জয়যাত্রার ইতিহাস রচিত হয়। তার মধ্য দিয়েই তার জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়, নির্মিত হয় জাতীয় সমৃদ্ধির রাজপথ। যতদিন প্রাণ, ততদিনই তার সমস্যা; এবং সমস্যা সমাধানই প্রকৃত বেঁচে থাকার লক্ষণ। যে জাতি সমাধান করতে ভুল করেছে, সে জাতি মরেছে।

মানুষের সমাজের, মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সমস্যাই হলো মানুষের ঐক্য। ভারতের ইতিহাসের সমস্যাও মূলতঃ তাই। এখানে এত জাতের মানুষ এসে জুটেছে, পৃথিবীতে তার আর দ্বিতীয় নজীর নেই। তাদের মধ্যে আত্মিক ঐক্য স্থাপনই হলো ভারতের প্রধান সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান ভারতে যেমন দুরূহ, তেমন আর কোথাও নয়। কিন্তু যত দুরূহই হোক, তার সেই সাধনার সফলতা লাভ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধিতে আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু তার সেই সমৃদ্ধির সাধনা আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা তার ইতিহাসের মলাটটা দেখি, ভেতরের পাতাগুলো পড়ি না। তাই আমরা দেখতে পাই না যে, তার স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার পশ্চাতে আছে জাতিগত ঐক্যের সাধনা। ভারতের সাধনা হলো জাতিতে জাতিতে ঐক্যসাধনা; আর, পশ্চিম-মহাদেশের সাধনা হলো শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঐক্যসাধনা।

স্মরণীয় যে, বন্ধনময় মাটিতেই ফসল ফলে, বিচ্ছেদময় বালিতে নয়। বিচ্ছেদে মানুষ বর্বর হয়। ঐক্যই সত্যধর্ম, শ্রেষ্ঠতার হেতু। ভারতের উপনিষদ্ বলেছে, যিনি নিজের চৈতন্যকে সবার অন্তরস্থ করে জানেন, তিনিই বিদ্বান্। অথচ ভারতবর্ষই নানা বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে পৃথক্ করে দেখেছে। কাজেই, ভারতের ভেতর ও বাইরের মধ্যে একটা ফারাক্ থেকে গেছে, তার প্রকাশ আমাদের নানা দুঃখে, দারিদ্র্যে, অপমানে। অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ভারতের শাশ্বত বাণী শোনাবার জন্যে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হয়েছেন। আধুনিক যুগে আসেন রামমোহন। ঐক্য-

সাধনার পথই ভারতের পথ—ভারতপথ। মধ্যযুগের অচল আচার-সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে কবীর নিজেকে সেই 'ভারতপথিক' বলে অভিহিত করেছিলেন। দাদূ এবং রজ্জবও ছিলেন তেমনি ভারতপথিক। এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন, তা মনুষ্যত্বের সাধনার মাধ্যমে মিলন, সে ঐক্য ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তির সাধনার মধ্য দিয়ে ঐক্য। এই ঐক্যের পথই যথার্থ ভারতের পথ।

কিন্তু তা বিস্মৃত হয়ে আমরা অবজ্ঞা আর অস্পৃশ্যতা দিয়ে আপনাকে পর করবার যে সহস্র পথ প্রশস্ত করেছি, তা দিয়ে সর্বনাশের শনির চর আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলোর ফাঁক দিয়ে যে জলরাশি উঠেছে, তাতে লবণাশ্রুসমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়াই কখনই ভারত-ইতিহাসের লক্ষ্য হতে পারে না।

এরপর রামমোহন রায়ের কণ্ঠে প্রথম শোনা গেল যুগের আহ্বান—সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। প্রত্যেক দেশেই একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব থাকে। একটা দিকে তার অন্ধকার, সেদিকটা কৃষ্ণপক্ষ; অন্যদিকে আলো, সেদিকটা শুক্লপক্ষ। য়ুরোপও একদিন ডাইনী জ্ঞানে শতশত স্ত্রীলোককে পুড়িয়ে মেরেছিল। আবার, ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে দেখা গেছে মৈত্রী, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। ইংলণ্ডে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা ইংরেজ-জাতির স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজের জন্যে অন্তরে পীড়িত। বস্তুতঃ সব ইংরেজই ইংরেজ নয়। তেমনি রামমোহন রায় আবির্ভূত হলেন ভারতের সত্য পরিচয় অন্তরে বহন করে। মানুষের সেই ঐক্যের বার্তা যখন তিনি ভারতের বাণীতে প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কার জানিয়েছিল। তিনি ভারতের মহাঅতিথিশালায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান—সবাইকে আহ্বান করেছিলেন।

রামমোহন যে-কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার একদিক চলে গেছে প্রাচীন ভারতে, অন্যদিক চলে গেছে ভারতের ভাবীকালের দিকে, যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সম্মিলিত হয়ে ভারতের অখণ্ড মহাজাতীয়তার মধ্যে সার্থক হয়েছে। কাজেই, অতীতে-অনাগতে ব্যাপ্ত সেই রামমোহনের কালকে আমরা আজও অতিক্রম করতে পারিনি। আজ বিশ্বে আমাদের অজস্র লজ্জা, সহস্র দুঃখ এবং স্তূপীকৃত অপমানের মধ্যেও আমাদের প্রাণের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, রামমোহন আমাদের দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যেই ভারতের প্রকৃত পরিচয়।

জড়ের চক্রান্ত হলো প্রাণকে সংকুচিত করে আপন অধিকার বিস্তৃত করা; আর, প্রাণের প্রয়াস হলো সেই চক্রান্তকে পরাজিত করে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখা। প্রাণের এই নিত্য প্রয়াসের মতো মনেরও নিত্যপ্রয়াস আমাদের মনকে বাঁচিয়ে রাখে। মনের তাই অনন্ত জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। মননের জড়তায় দেখা দেয় জ্ঞানের বিকৃতি। তখনই ঘনিয়ে আসে মনুষ্যত্বের চরম দুর্গতি।

এমনি করে ভারতের মনের স্বরাজ ধ্বংস হয়ে যায়। নানা কথাকে সে বিশ্বাস করেছে, বাঁধা বুলিকে সে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছে। আর, যখন কোন উৎপাত এসে পড়েছে, তখন তাকে সে মেনে নিয়েছে বিধিলিপি বলে। মনের অগ্রসরণ

এমনিভাবে তার অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সামনে না চলে পেছনের কালকেই শুধু প্রদক্ষিণ করেছে। অনুসন্ধান না করে সে শুধু অতীতকেই অনুসরণই করেছে। এই নির্জীব মন নিয়ে বাইরের কোন আক্রমণই প্রতিরোধ করা যায় না। ভারতকে তাই তার মর্মান্তিক পরাভব মেনে নিতে হয়েছে। এইরূপে যখন ভারতের আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, তার দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত এবং তার সৃষ্টিশক্তি যখন আড়ষ্ট, তখনই এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। সেদিন তিনি আমাদের অজ্ঞানতাকে, অন্ধতাকে, যাকে আমরা সনাতন বলে গর্ববোধ করি, তাকেই করেছিলেন কঠোর আঘাত। সেজন্যে সেদিনের জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজ তাঁর গৌরবে সমগ্র দেশ বিশ্বের কাছে গৌরবান্বিত। তিনি তাৎস্থানিক ও তাৎক্ষণিকের মধ্যে যদি আবদ্ধ থাকতেন, তাহলে তিনি হয়তো দেশের লোকের সমাদর পেতেন। কিন্তু সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না তিনি। বিস্মৃতি বা উপেক্ষা তাঁর স্মৃতিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করলেও সেই বাষ্পের মেঘ কেটে গিয়ে সর্বকালের মানুষ রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি প্রকাশিত হবেই।

তাঁর পূর্বে কবীর ভারতের মানব-ঐক্যের পথকে বলেছিলেন মহাপথ এবং নিজেকে বলেছিলেন 'ভারতপথিক'। এই পথে হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি এসেছিল, মুক্তির বাণীর আশায় এসেছিল চৈনিক তীর্থযাত্রীরা। আবার, কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এসেছে অর্থকামনায়। সবাই এখানে আতিথ্য পেয়েছে। এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে যে মিলন, সেই মিলনই চরম সত্য। রামমোহন রায় সেই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান—সকলের হৃদয়েরই প্রতীক। সেখানে ভারতের যে ঐক্যতত্ত্ব আসন পেতেছিল, তা একমেবাদ্বিতীয়ম্। ভারতের আধুনিক কবিও সেই ভারতপথের সংগীতে ভারততীর্থের ঐক্য ও মিলনের মহাবাণীকে রূপদান করে বিশ্বের নিখিল মানবকে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে মিলিত হবার জন্যে আহ্বান করেছেন॥

●চার. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছিল?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধান পথের নিঃসঙ্গ পথিক। অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে একটি প্রধান বাধা—ঐশ্বর্য। মানবাত্মার চিরন্তন ক্রন্দনই হলো—আমাকে সত্য দাও, আমাকে আলো দাও, আমাকে অমৃত দাও। কিন্তু মহর্ষির জীবনের প্রথম যৌবনে ঐশ্বর্য তেমনি তাঁর অনন্তপিপাসার চরিতার্থতার পথে প্রবল বাধারূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর, মহর্ষি তার ঊর্ধ্বে উঠে সত্যের অমৃত রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন।

আবার, যখন দুর্দিনের বজ্রাঘাতে সেই ঐশ্বর্যের পাহাড় পড়লো ভেঙে, ঋণ যখন উদ্যত হলো তাঁকে গ্রাস করতে, তখনও তিনি তাঁর হৃদয়কে সত্যের অমৃতরূপের অভিমুখে উন্মুক্ত রেখেছিলেন। সম্পদ যেমন তাঁকে অমৃতলাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি, বিপদও তেমনি তাঁকে অমৃত-সঞ্চয় থেকে পারেনি বিমুখ করতে। ঐশ্বর্যের

সুখশয্যা ত্যাগ করে তিনি এসে দাঁড়ালেন ধর্মের সুকঠিন পথে, বংশমর্যাদার দিকে না তাকিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন চিরন্তন ব্রহ্মের কাছে।

তখন ভারতের সাধনা থেকে তার নিজস্ব-বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করে তাকে অন্য দেশীয় আকার দেবার প্রয়াস সূচিত হয়েছিল। ভারতের সাধনার শ্রেষ্ঠধন যেমন সার্বভৌমিক, য়ুরোপের সাধনার শ্রেষ্ঠধনও তেমনি সার্বভৌমিক। তবু ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে।

তরুণ ব্রাহ্ম-সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সংকীর্ণতা মনে করে ভারতবর্ষীয় শাখায় বিদেশী ইতিহাসের ফল ফলাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল, তখন মহর্ষি তার বিরুদ্ধাচরণ করায় সমাজভুক্ত বহু তেজস্বী প্রতিভাবান্ যুবকের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। আর একবার হিন্দু-সমাজের অনুকূলে তিনি ক্ষতির আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে একাকী দাঁড়িয়েছিলেন। এইভাবে তিনি অনুবর্তীদের ত্যাগ করলেও ব্রহ্মকে ত্যাগ করেননি। তাঁর প্রার্থনা ছিল—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন। সম্পদে, বিপদে তিনি ছিলেন ব্রহ্মে সমর্পিত-প্রাণ।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর যখন দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল, তখন মহর্ষি সেই দুস্তর ঋণসমুদ্র একাকী উত্তীর্ণ হয়ে পরিবার-পরিজনদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সেই সময়ের দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টস্বীকার অতুলনীয়। ধনপতির পুত্র হয়েও তিনি নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব করে, ধনী-সমাজের প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করে শান্ত সংযত শৌর্যের সঙ্গে তাঁর সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে বহন করে দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করেছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন। সুদৃঢ় চারিত্র বল, অবিশ্রান্ত সংযম, অতুলনীয় দৃঢ়চিত্ততাই ছিল তাঁর সেই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। তিনি আগে ধর্মকে রক্ষা করেছেন, পরে রক্ষা করেছেন ধন। সেদিন তাঁর বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলে কৌশলে তাঁর পূর্ব সম্পত্তির বহুতর অংশ উদ্ধার করতে পারতেন এবং ধন-গৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি বলেই তিনি আরো বেশী শ্রদ্ধেয়। ঘোর সংকটের দিনে শ্রেয় ও প্রেয়োপথের মধ্যে তিনি শ্রেয়োপথই নিয়েছিলেন বেছে।

তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। শুধুমাত্র বিষয়ী হলে তিনি তাঁর উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিকে বহুগুণে বর্ধিত করতে পারতেন। বিষয়-বৃদ্ধির দিকে মন দিয়ে তিনি ঈশ্বর-সেবা থেকে নিবৃত্ত হননি। তাঁর ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্যে মুক্ত ছিল—কত অনাথ-পরিবারের তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল, কত দরিদ্র গুণী তাঁর সহায়তায় অভাবমুক্ত হয়েছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে করেছেন সাহায্য। মহর্ষি তাঁর পুত্রদের যেমন দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি তিনি তাঁর সন্তানদের বিলাসভোগ ও ঐশ্বর্যের অভিমানকেও প্রশ্রয় দেননি। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থের মতো অতিথিসেবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তাই দিয়ে তিনি পরিবার প্রতিপালন করেছিলেন। তাতে লক্ষ্মীর স্বর্ণ-পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানেরা যদি ভাবলোকের

মুক্ত আকাশে অবাধ বিহারের কিছুমাত্র শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের পিতৃদেবের পুণ্য প্রসাদেই তা সম্ভব হয়েছে। বাড়িতে ধনীদরিদ্র—সকলেরই ছিল অবাধ গতি। মহর্ষির প্রসাদেই তাঁর সন্তানদের সর্বসাধারণের সংস্রব লাভ সম্ভব হয়েছিল।

অথচ পরিবারের মধ্যে ছিল উদার স্বাধীনতা। যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানে লাভ করেছিলেন, যাকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করেছেন, যে ধর্মের জন্যে তিনি উৎসর্গীকৃত-জীবন, সেই ধর্মকে তিনি নিজের বাড়িতে শাসনের বস্তুতে পরিণত করেননি। তাঁর দৃষ্টান্ত, তাঁর উপদেশ তাঁর সন্তানদের সম্মুখে ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদকে তিনি তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেননি। স্বাধীনভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে সন্ধান করবার পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন। যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করে তুলেছেন, যিনি ইংরেজি-শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, যিনি দেশকে প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটনে অনুপ্রাণিত করেছেন, যিনি বিষয়লোলুপ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ স্থাপিত করে তাঁর পরিবারকে সমস্ত মানব-পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁর উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের কাছে পৈতৃক সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

মহর্ষি তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত সংস্কার, প্রথা ও শাস্ত্র পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়ে রিক্তহাতে ঈশ্বরলাভের জন্যে যাত্রা করেছিলেন। সেজন্যে তাঁর নিজের পথ নিজেকেই আবিষ্কার করতে হয়েছিল। ঈশ্বরলাভের জন্যে নিজের চাবি নিজেকেই আবিষ্কার করে নিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজের দিকে কাউকে আকর্ষণ না করে সমস্ত খণ্ডতা, ভঙ্গুরতা ও অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে এবং দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতেন। দু-তিন বছর অন্তর যখন বাড়ি আসতেন, তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে পিতৃদেবের একটি একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। কাছে থাকলেও, মনে হতো, তিনি দূরে আছেন। উত্তুঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো তিনি ছিলেন আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গের মধ্যে সমুচ্চ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিত্ব। পুত্রেরা নানা উপলক্ষে তার সান্নিধ্য লাভ করলেও তাঁকে সব সময় আকাশে বৃক্ষের মতো নিস্তব্ধ মনে হতো।

তাঁর সেই নিঃসঙ্গতা ছিল আসলে নিরাসক্তি। মহর্ষির পিতার ছিল বিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভার। বাড়িতে আহার-বিহার-বিলাস-ব্যসনে হতো কত ধুম, কত জনসমাগম। কিন্তু মহর্ষি সেই ভিড়ের ভেতরে থেকেও ভিড় থেকে থাকতেন দূরে। বিষয়-কর্মে নৈপুণ্য-অর্জনের জন্যে তাঁর পিতা সামান্য পারিশ্রমিকে তাঁকে তাঁর ব্যাঙ্কে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সম্যক্ দায়িত্ব নির্বাহ সত্ত্বেও তাঁর নিরাসক্তিতে তাঁর পিতা ক্ষুণ্ণ হতেন। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর পিতার কাছে আসতেন। তাছাড়া, বিশাল আত্মীয়-সমাজ তো ছিলই। মহর্ষি তাঁদের মধ্যে নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করতেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্য ছিল বিপুল। দ্বারকানাথের বিলাতবাসকালে প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা তাঁর কাছে প্রেরিত হতো। তাঁর মৃত্যুর পরে এক ভূমিকম্পের ফলে যেন সমস্ত ঐশ্বর্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সেই সংকটের মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অবিচল —'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ'। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য—উপনিষদের এই মহাবাণীকে তিনি জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবকে আত্মীয়স্বজনদের বিয়োগবিচ্ছেদে তেতলার ঘরে আত্মসমাহিত অবস্থায় দেখেছেন। কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেও সাহসী হতো না।

দশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর পিতৃদেব তাঁকে তাঁর হিমালয়যাত্রার সঙ্গী করে নিলেন। প্রথম যাত্রা-বিরতি হলো শান্তিনিকেতনে। বর্তমান অতিথিশালার একটা ছোট ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। অন্য ঘরে থাকতেন তাঁর পিতৃদেব। ভোরবেলায় পিতৃদেব তাঁকে জাগিয়ে শ্রীভগবদ্‌গীতা থেকে নির্বাচিত শ্লোক নকল করতে দিতেন। রাতে সৌরজগতের গ্রহতারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দিতেন। আর, অল্পস্বল্প ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়াতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখতেন, তিনি দূরে দূরেই থাকেন। তারই মধ্যে তাঁকে সকালে ছাতিমতলায় ধ্যানমগ্ন দেখা যেত। সৌর পরিবারের সূর্যের মতো তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারে একা এবং আত্মসমাহিত। তিনি নিজে যেমন স্বতন্ত্র ছিলেন, তেমনি পুত্রদের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতেন। মহর্ষির চরিত্রের এই অম্লান বৈশিষ্ট্যগুলি কষ্টার্জিত পৈতৃক সম্পত্তির মতো রবীন্দ্রনাথের জীবনে লাভ করেছিল পরম সার্থকতা॥

অনুসরণী

১. কোন্ ব্যক্তির জীবনচরিত হওয়া উচিত? তাঁর জীবনচরিত রচিত হবার সার্থকতা কি? [৬৭—৬৯ পৃ.]

২. 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।'—উক্তিটির সার্থকতা বিচার কর। [৬৯ পৃ.]

●৩. 'বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন।'—রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তব্যকে কিভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও। [৮৯—৯২ পৃ.] উ. মা. '৭৮

৪. রামজয় তর্কভূষণ সম্বন্ধে যা জান লেখ। তাঁর পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর চরিত্রের কোন্ গুণগুলি পেয়েছিলেন? [৭০—৭১ পৃ.]

৫. ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যা জান লেখ। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার কোন্ গুণগুলি পেয়েছিলেন লেখ। [৭১ পৃ.]

৬. ভগবতী দেবী সম্বন্ধে যা জান লেখ। তাঁর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে তাঁর কোন্ প্রভাবগুলি পড়েছিল, লেখ। [৭১—৭২ পৃ. ও ৭৩—৭৫ পৃ.]

●৭. 'বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ—পুরুষোচিত।'—এই মন্তব্যটির আলোকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিচার কর। [৭৪—৭৫ পৃ. ও ৭৬—৭৭ পৃ.]

৮. কার্লাইলের সংজ্ঞানুসারে 'বীর' কে? বিদ্যাসাগরকে কি সেই অর্থে 'বীর' বলা যায়? [৭৬—৭৭ পৃ.]

৯. জন্‌সন্ কে ছিলেন? কোন্ কোন্ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন? [৭৬—৭৭ পৃ.]

১০. 'ভারতপথ' কি? 'ভারতপথিক' কথাটির তাৎপর্য কি? কে প্রথমে নিজেকে 'ভারতপথিক' বলে অভিহিত করেছিলেন? রামমোহন রায়কে 'ভারতপথিক' বলার সার্থকতা কি? [৭৯—৮০ পৃ.]

১১. 'যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে।'— উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [৭৭—৭৮ পৃ.]

●১২. 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' শীর্ষক অধ্যায়টির সারমর্ম লিখ। [৯২—৯৫ পৃ.] উ. মা. '৭৮

১৩. 'সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে।'—কোন্ অজন্মার দিনে? তাকে অজন্মার দিন বলা হয়েছে কেন? 'সত্যের ক্ষুধা' বলতে কি বুঝ? রামমোহন তা নিয়ে জন্মেছিলেন —একথাটির তাৎপর্য কি? [৭৮—৮০ পৃ.]

১৪. 'সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন।'—কবেকার জনতার কথা বলা হয়েছে? কাকে তারা শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল? তাঁকে কেন শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল? তিনি কি প্রকৃতই শত্রু ছিলেন? [৭৮—৭৯ পৃ.]

১৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করে তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দিকটিকে সুপরিস্ফুট কর। [৯৫—৯৮ পৃ.]

১৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃবিয়োগের পর তিনি যেভাবে তাঁর পরিবারবর্গকে এবং ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, তা বর্ণনা কর। [৯৫—৯৮ পৃ.]

১৭ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পদে বিপদে যে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, তার স্বরূপ কি ছিল? [৯৫—৯৮ পৃ.]

১৮. 'সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি।'—এখানে কোন্ সঞ্চয়ের কথা বলা হয়েছে? তাকে পৈতৃক সম্পত্তি বলে গণ্য করবার সার্থকতা কি? [৯৫—৯৭ পৃ.]

১৯. 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ' বলিতে কি বুঝ? রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবকে 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ' বলেছেন কেন? [৯৫—৯৭ পৃ.]

২০. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল? [৯৫—৯৮ পৃ.]

পথে-প্রবাসে

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' বাংলা সাহিত্যের বহু-প্রশংসিত একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। ভ্রমণ-কাহিনীর আঙ্গিকে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবনদর্শন, সমাজদর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে এমন রসস্নিগ্ধ, অথচ মননশীল আলোচনা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। গ্রন্থটির রচনা-কাল: ১৯২৭-২৯। প্রথমে গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৩১ সালে।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম ১৯০৪ সালে—উড়িষ্যার ঢেনকানলে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যয়ন শেষ করে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং আই. সি. এস. পরীক্ষায় পাস করে স্বদেশে ফিরে অসেন। 'পথে-প্রবাসে' তাঁর সেই প্রবাস-জীবনের পরম রমণীয় ফসল।

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী—সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই অন্নদাশঙ্করের অবাধ বিচরণ। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সগৌরব যাত্রা-শুরু মূলতঃ 'পথে-প্রবাসে' থেকেই।

বস্তু-সংক্ষেপ

পূর্বকথা

লেখকের যাত্রাপথ কটক থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লণ্ডন। রাতে ভোর হবার আগেই ট্রেন চিল্কা পেরিয়ে এলো। চিল্কা থেকে গোদাবরী—পথে একধারে রুক্ষ পাহাড়ের সারি, অন্যধারে ক্ষেত—কিন্তু বাংলার মতো মিহিন্ শ্যামল নয়। প্রকৃতির এই রঙের কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের রং দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছে। মেয়ে-পুরুষ সবাই রঙীন কাপড় পরে। এদেশে অবরোধ-প্রথা নেই, বিধবা ছাড়া মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না। দক্ষিণ-ভারত নারীকে জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করেনি, স্বাধীন বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। উত্তর-ভারতের মানুষ নারীকে তা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে এবং নিজেকে চিনতে ভুল করেছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে কেবলি প্রান্তর—কখনো তা শৈলগুণ্ঠিত, কখনো শস্যময়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে দুর্গ—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা-পাখিপাখাল নেই। তবু লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। পূব দিকে তেলেগু এবং পশ্চিম দিকে মারাঠা ও কানাড়ীর বাস। রাজার জাত হলো মুসলমান। কানাড়ী মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষদের কর্মসহচরী—একসঙ্গে খাটে।

পাহাড়-পর্বতের দেশ মহারাষ্ট্রের বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র-সুন্দর। নরনারীর চোখে-মুখে নেই কোন কমনীয়তা। নারী ও পুরুষের বেশভূষা প্রায় একই রকম। মালাবারে নারী ও পুরুষ যেমন কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তারা উভয়েই তেমনি কাছা দেয়। নারীর অনাবৃত পায়ের পশ্চাদ্ভাগ সেজন্যে একটু কটু দেখায়। নারীকে পুরুষদের মতো

স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি করতে হলে এ ছাড়া উপায় নেই। মারাঠা মেয়েদের রমণীয়তার অভাব সত্ত্বেও তারা সুস্থ, সবল, সপ্রতিভ এবং সুশ্রী—তাদের চালচলন ও চেহারায় পৌরুষের ছায়া। তাদেরও কর্মক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতার পাশে বাঙালী পুরুষেরাও কুঁড়ে।

বম্বে শহরটা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। কিন্তু বম্বে শহরে মহারাষ্ট্রের অবস্থিতি গলির বস্তিতে, আর গুজরাটের অবস্থিতি বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের উঁচু উঁচু বাড়িতে। বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোঘের বাসা, মারাঠী বাঘের ঘরেও তেমনি গুজরাটী ঘোঘের বাসা। গুজরাটী মানে পারসীও; তাদের মাতৃভাষা গুজরাটী। বর্তমানে তারা কায়ে-বাক্যে ইংরেজ হবার সাধনায় মগ্ন।

গুজরাটীরা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশের অর্থের সঙ্গে নানা দেশের ভাবেরও আমদানি করছে। তাদের সাহিত্য তাই রবিহীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমকক্ষ। এই জাতি গান্ধীর মতো ভাবশিল্পীর জন্ম দিয়েছে। গুজরাটী পুরুষদের কর্মক্ষমতা, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ব্যবসায়বুদ্ধি বহুবিশ্রুত। গুজরাটী মেয়েদের বেশবাস বাঙালী মেয়েদেরই মতো। তাদের আপদচুম্বী অন্তর্বাস। শোনা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীর সাহায্যে তা বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল। বাঙালী মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য, গুজরাটী মেয়েদের দেহসৌষ্ঠব তেমনি সুসমঞ্জস্।

পারসীরা যেমন কাঞ্চনকুলীন, রীতিরুচিতে তারা তেমনি অভিজাত; পোশাকেও তারা অগ্রণী। মেয়েদের জাঁকালো বেশভূষা চোখে পড়ার মতো। তিন প্রস্ত অন্তর্বাসের ওপর শাড়ির বাহার। মারাঠা মেয়েদের যেমন আঁচলের বাহার, এদের তেমনি পাড়ের বাহার। এরা মাথায় কাপড় দেয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গয়নার বাহুল্য নেই, পায়েও এরা জুতো পরে না।

বম্বে শহর কলকাতার চেয়ে আকারে ছোট, কিন্তু প্রকারে সুন্দর। চারদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভেতরেও অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপর বড় বড় সুন্দর অট্টালিকা। রাস্তাগুলি সুপরিকল্পিত। প্রত্যেকটি বাড়ির নক্শা স্বতন্ত্র। নগর-স্থাপত্যের রীতিটিও ঠিক ভারতীয় নয়, অনেকটা ইংরেজি—খাঁটি ইংরেজি নয়। শহরটা তাই খুবই চিত্রময়।

১

জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের সঙ্গে বিচ্ছেদ। বিশাল ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে একটি নগর-প্রান্তে। জাহাজ থেকে বম্বে শহরটা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি করুণ। আর, ভারত ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী মানচিত্রের সংকীর্ণ স্থানটিই এখন দিক্‌চিহ্নহীন আরবসাগর। বর্ষার মন্‌সুনের দাপটে আরব সমুদ্রের দুরন্ত ঢেউগুলো ফুটন্ত তেলে পাঁপরভাজার মতো জাহাজটাকে উল্‌টে পাল্‌টে যেন ভাজছে এবং গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিচ্ছে।

অতএব সমুদ্র-পীড়ায় যাত্রীদের ডেক ছেড়ে শয্যাগ্রহণ করতে হলো। তিনদিন

কাটলো আচ্ছন্নের মতো। সৌভাগ্যবান্ তু'একজন আশ্বাস ও ডেকের খবর দিয়ে যায়। স্টুয়ার্ড দিয়ে যায় খাবার। রসনা তা গ্রহণ করলেও উদর তা রাখতে পারে না। বমনে ও উপবাসে প্রায় সকলের অন্তিমকাল উপস্থিত। কেবলমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া সমুদ্র-পীড়ার তুঃসহতা কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। মাথার যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'ও পড়তে ইচ্ছা করে না। চুপ করে পড়ে থেকে আকাশ-পাতাল ভাবতেই শুধু ভালো লাগে।

কেউ কেউ স্থির করলো, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাঁদেরও তো ফিরতে হবে এই সমুদ্রপথেই। লেখক এবং অন্যান্য অনেকে স্থির করে ফেললেন, মার্সেল্সে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাবেন।

আরব সাগরের পর লোহিত সাগর—হ্রদতুল্য শান্ত সমুদ্র। সমুদ্র-পীড়াও প্রশমিত হলো। এখন জাহাজটির ওপরে মায়া পড়ে গেছে। মন চায়না কোথাও নামতে বা থামতে—সে চায় কেবলি গতির নেশায় ছুটে চলতে। কেবিনের সমস্ত ব্যবস্থাই হোটেলের মতো। সমুদ্র-পীড়া সারলে কেবিন ছেড়ে ডেকের ওপর সময় কাটে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র দেখতে দেখতে চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়।

লোহিত সাগরের পর ভূমধ্যসাগর; তুয়ের মাঝখানে ছিল সুয়েজ যোজক—এশিয়া-আফ্রিকার সংযোগ-ভূমি। সেখানে সুয়েজ কেনাল হয়ে এশিয়া-আফ্রিকার বিয়োগ ঘটিয়ে লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের তথা ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। কলম্বাস যা পারেননি, লেসেপ্‌স তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শো মাইলের ব্যবধান জুড়ে ছিল গোটাকয়েক হ্রদ। অথচ ভূমধ্য থেকে লোহিতে আসতে কয়েক হাজার মাইল পথ ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা এর প্রতিকারের একটা উপায় খুঁজছিলেন। মধ্যবর্তী হ্রদগুলোকে জুড়ে দিলেই একটা পথ হয়ে যায়। কিন্তু তা সফল হতে অনেক শতাব্দী লেগে গেল। এবং তা সফল হলো ফরাসী স্থপতি লেসেপ্‌সের হাতেই। সেদিক থেকে তিনি একজন বিশ্বকর্মা। তাঁর সৃষ্টি দূরকে করেছে নিকট। একথা ভেবে যন্ত্রসভ্যতার শত অপরাধ মার্জনা করা যায়।

সুয়েজ খাল বেশ অপ্রশস্ত; তাতে পাশাপাশি তুখানা জাহাজ যাওয়া-আসা করতে পারে। যেখানে হ্রদ, সেখানে বেশ প্রশস্ত। কেনালটির এক ধারে সযত্নে রোপিত ও সযত্নে রক্ষিত নানা রকমের গাছ, অন্যধারে শ্যামলতার চিহ্নহীন ধূ-ধূ প্রান্তর। খালের তুদিকেই পাহাড়—মিশরের দিকেই বেশী। পাহাড়গুলিকে কোন শিল্পী যেন ত্রিকোণাকার জ্যামিতিক রূপ দিয়েছে।

খালটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে, সেখানে পোর্ট সৈয়দ। শহরে ফরাসী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—বাড়িঘরে, এমনকি রাস্তাঘাটেও। কাফেতে ফুটপাতে বসে খেতে হয়, রাস্তায় ডানদিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ নানা দেশের নানা মুসাফিরদের তীর্থস্থল—তীর্থের কাকের সংখ্যাও কম নয়। ফলে, প্রতারণার সংখ্যাও বেশ। পোর্ট

সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। য়ুরোপের সান্নিধ্যের জন্যে মিশরীয়রা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে অনায়াসে মেশে এবং অনুকরণ করে।

এরপর শান্ত শিষ্ট ভূমধ্যসাগর। প্রথম কয়েকদিন শান্ত থেকেও সেও শেষ পর্যন্ত আর ভদ্রতা রক্ষা করতে পারলো না। ফলে, আবার অনেকের সমুদ্র-পীড়া দেখা দিল। অধিকাংশকেই মার্সেল্‌সে নামতে হলো। সৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স পর্যন্ত পথে দুটি দৃশ্য চোখে পড়ার মতো—একটি, ইটালি ও সিসিলির মধ্যবর্তী মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুদিকের পাহাড়ের সারি ; অন্যটি, স্ট্রম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্‌স ভূমধ্যসাগরে সেরা বন্দর ও দ্বিতীয় বড় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর। এখানেই ফ্রান্সের জাতীয় সংগীতের জন্ম। বসন্ত এখানে দীর্ঘস্থায়ী, জ্যোৎস্না এখানে স্বচ্ছ—ফরাসী সহজিয়া কবিদের প্রিয়ভূমি। পূর্বদিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট গ্রাম—এই সব গ্রামে পৃথিবীর লোকেরা গ্রীষ্ম-যাপনে আসে। পাহাড়ের ওপরের উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে ব্যাণ্ডল গ্রামে দুপুর কাটিয়ে লেখক চললেন প্যারিসের পথে। মার্সেল্‌স থেকে রেলপথে প্যারিস, প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

২

লেখক লণ্ডনে উপস্থিত হলেন এক সন্ধ্যায়। পরের দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। আকাশের মুখ ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলের মতো। চিম্‌নিওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে। এইটেই সরকারি আবহাওয়া। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ-কখনো এই ধূমলা নগরীতে রূপালী সূর্য ওঠে। লোকজন পরস্পরকে বলে, 'হাও লাভ্‌লি!' কিন্তু মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই আকাশের মুখ মেঘগম্ভীর হয়ে ওঠে। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সর্বোচ্চে তাই ছাপা হয় আবহাওয়া-বার্তা।

টেম্‌স নদীর কূলে লণ্ডন শহর। টেম্‌স অপ্রশস্ত, কিন্তু সুগভীর—নৌবাহ। শহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন। কিন্তু শহরের ভেতরে তার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ। ধারে বাতাস নেই, আছে দম-বন্ধকরা ধোঁয়া। আর আছে মদ, সিগারেট আর খবরের কাগজের বিজলী বিজ্ঞাপন। আয়তনে লণ্ডন সাত-আটটা কলকাতার সমান। সেই ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-ট্রেন। সেই গলি-বস্তি-মাঠ-প্রাসাদ। কিন্তু সবই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতম অঞ্চলও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে দক্ষিণ কলকাতার মতো। এত বড় শহরে কোন জনকোলাহল নেই, ফেরিওয়ালার হাঁক নেই। আছে শুধু দুধওয়ালার ডাক। তাও কোকিলের ডাকের মতো। জরুরী চিঠির ডাকপিয়ন দরজায় দেয় দুটো ঠোকর। অন্যান্য ফেরিওয়ালাদের আছে মৃদু নিজস্ব সংকেত। আর আছে নানা চলন্ত বিজ্ঞাপন। এদেশে নিরক্ষরতা নেই। তাই কানের ক্লেশ কমেছে, কিন্তু চোখের ক্লেশ বেড়েছে।

লণ্ডনের পথে রথযাত্রার ভিড়। পুলিশী ব্যবস্থার চেয়ে জনতার শৃঙ্খলা প্রশংসনীয়। ট্রেনের টিকিট কাটা থেকে ট্রেনে ওঠানামা—সবই সুশৃঙ্খল লাইন করে। কিন্তু কোন শব্দ নেই, কথাবার্তা নেই। রাস্তাঘাটে আলাপ বলতে যা, তাও শুধু আবহাওয়া-সম্পর্কিত এবং সংক্ষিপ্ত। এখানে নেই অন্তরঙ্গতার দাবি, সামাজিকতার দাবি। লণ্ডনের মানুষ বাচাল নয়, বাক্‌পটুও নয়—কথাবার্তার আর্ট এদের অজানা।

লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখার নেই। আছে পাতাল-রেল আর আছে কলের কেরামতি। কলে পয়সা ফেললেই সিগারেট, চকোলেট থেকে স্নানের জল, উনুনের আগুন পর্যন্ত সব আপনিই এসে হাজির হয়। উঁচু-নিচু পাহাড়-কাটা রাস্তার দুধারে একই রকমের একই রঙের বাড়ি, আশেপাশে সবুজের ছোপ ; তাতে লাল বা হলুদ ফুল। মাঝে-মাঝে মাঠ, তাতে কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, পুতুল-জাহাজ ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায়। মাঠের গায় সবুজ ঘাসের কার্পেট—চোখ জুড়িয়ে দেয়।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় পূর্ণ। কিন্তু এদেশের ফুলে গন্ধ নেই। ফলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতৃপ্ত থেকে যায়। লণ্ডনের পার্কগুলি জাতীয় খেলার মাঠ, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবাই যে-যার খুশীমতো খেলাধূলো করে, বেড়ায় বা সময় কাটায়। পার্কে এলে মনে হয় না, শহরে আছি। যেন সমুদ্রের মাঝখানে এক-একটি দ্বীপ। শহরের পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড—ওখানে ধনী লোকদের বাড়ি, হোটেল, বাজার, সিনেমা, থিয়েটার, কনসার্ট হল, চিত্রাগার, মিউজিয়াম, প্রদর্শনী। দরিদ্রদের জন্যে ইস্ট এণ্ড, মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরতলি। ওগুলিও নিরালা, স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। এদের নগর-পরিকল্পনায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সৈনিক-নাবিকের জাত—ইংরেজরা প্রয়োজন ছাড়া কিছু জানে না। শৈশব থেকেই এরা ড্রিল করতে অভ্যস্ত। এরা তাই সারি বেঁধে গির্জায় যায়, ইস্কুল থেকে ফেরে, চালে-চলনে, উঠতে-বসতে ড্রিল। বাড়িগুলোও একই রঙের ইউনিফর্ম পরে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ভীষণ একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর ঠেকে।

শহরের রাস্তায় মদের দোকান আর রেস্তোরাঁর প্রাধান্য। তারপর জামা-কাপড়ের দোকান, আসবাবের দোকান, কাগজের স্টল, চুল-কাটার সেলুন, এবং ব্যাঙ্কই প্রধান। রবিবারেও মদের দোকান, সিগারেটের দোকান এবং কাগজের স্টল খোলা থাকে। ভদ্রতা রক্ষায় সিগারেটের ডিবে না হলে এদের চলে না। শুধু এ বিষয়েই কেন, ভালোমন্দ সব বিষয়েই এদেশের মেয়েরা পুরুষদের অনুধর্মিণী।

লণ্ডন শহরে রেস্তোরাঁ আছে কয়েক লক্ষ। আহারের জন্যে রেস্তোরাঁ আর নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট্ বা রুম্‌স্—এই হচ্ছে এখানকার সাধারণ গৃহস্থালি। সময় ও ব্যয়-সংক্ষেপই রেস্তোরাঁ-নির্ভরতার প্রধান কারণ। তাছাড়া, বাড়ি থেকে কর্মস্থানের দূরত্বও একটা কারণ। কাজেই, এদেশে গৃহস্থালি মেয়েদের কাজ নয়। মেয়েরা স্কুলে-কলেজে যায়, আপিসে যায়। মায়েরাও আপিসে যায়, বাচ্চাদের হাওয়া খেতে নিয়ে যায়,

সময় পেলেই জামা সেলাই করে। যার কাজ নেই, সে কোন একটা বিষয়ে সভা-সমিতি খুলে বসে যায়। হাইড পার্কে গেলেই বোঝা যায়, এদেশে কত সভা-সমিতি আছে। এদেশে ধর্মসম্প্রদায় আছে হাজার রকমের, রাজনীতির দলের সংখ্যাও অজস্র। হাইড পার্কে চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দেয় অনেক বক্তা। বিনে-পয়সায় বক্তৃতা শোনার জন্যে অন্ততঃ দশ-পঁচিশ জন শ্রোতা জুটলেই হলো। কেউ টিটকারি দেয়, কেউ শ্রোতা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে উল্‌টো বক্তৃতা শোনায়। কিন্তু বক্তার মেজাজ তরুর চেয়েও সহিষ্ণু, মেরুর মতো অটল। একটিও শ্রোতা থাক্ বা না থাক্, বক্তৃতার স্রোত ব্যাহত হবে না। আসলে, এরা কাজের মানুষ। চুপ করে বসে থাকতে অনভ্যস্ত। ছুটি পেলে, ভেবে বিব্রত হয়, কি করে ছুটি কাটাবে। ভিক্ষে করা এদেশে বেআইনী। তাই ভিখিরিরা বাজনা বা গান শুনিয়ে বা কিছু বিক্রির ভান করে হাত পাতে।

জামাকাপড়ের দোকানের যে বাহুল্য, তার মূলে আছে শৈত্যের আধিক্য। এদেশে ভিখিরিকেও গায়ে ওভারকোট ও পায়ে বুটজুতো পরতে হয়। নয়তো পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। মেয়ের গায়ে গয়নার রিক্ততা বসনের বাহার দিয়ে পূরণ করা হয়। এখানেও প্রয়োজনের জয়-জয়কার। মেয়েরা এখানে কাজের মানুষ। চলাফেরা ও দৌড়ঝাঁপের সুবিধের জন্যে তাদের পোশাক হ্রস্ব করতে হয়েছে, মাথার চুল ছেঁটে ছোট করতে হয়েছে। তাই বলে নারীত্বকে এরা বিসর্জন দেয়নি। বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েও নারীত্ব বিদায় দেওয়া যায় না। কিন্তু স্মরণীয় যে, পোশাক কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীতবর্ষার বর্ম নয় ; তা দেহের সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলও। মাথায় টুপি ও লোমশ ওভারকোটের অন্তরালে নারীকে মনে হয় দুটি চলন্ত স্তম্ভের ওপর উপুড়-করা একটি কালো বা মেটে রঙের বস্তার মতো। এদেশে প্রয়োজনই শেষ কথা, তার ওপরে সৌন্দর্য বলে কিছু নেই। আর মজার কথা, এদেশে মেয়েদের পোশাক যত সরল হচ্ছে, পুরুষদের পোশাক হচ্ছে তত জটিল।

ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ বলে এদেশে খাটপালঙ্ক, পুরু বিছানা ও লেপকম্বলের ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সোফা-কোচ-চেয়ার-টেবিল অত্যাবশ্যক। এছাড়া, ওয়ার্ডরোব, কাবার্ড থেকে প্রসাধনের আয়না-দেরাজ এবং ঘর-গরম-রাখার অগ্নিস্থলীও চাই। গরীব ঘরেও এসব দরকার। বাড়ির ঝি-র জন্যেও আলাদা ঘর, ঘরের মেজেয় কার্পেট, দেয়ালে ওয়ালপেপার, খাটে পুরু বিছানা, ঘরে অগ্নিস্থলী, টেবিল-চেয়ার-আয়না-দেরাজ, ইলেক্‌ট্রিক আলো, জানালায় নক্‌শাকাটা পর্দা চাই। তাই এদেশে আসবাবের দোকানের এত প্রাচুর্য। বাড়ির ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে। তবে তাদের কাগজে গুরুগম্ভীর লেখা থাকে না, থাকে হালকা খবর। এদেশের কাগজগুলোতেও কোন অশ্লীলতা থাকে না। অশ্লীলতা সম্পর্কে ইংরেজ জাতির আছে একটি স্বভাবভীরুতা। এদেশে ঝিয়েরাও এক-একজন ভদ্রমহিলা। গণতন্ত্র এদেশের অন্ত্যজকেও কুলীন করেছে।

তারপর আসে সেলুনের সংখ্যাধিক্যের কথা। আগে পুরুষদের প্রয়োজনে এদের

সংখ্যা ছিল প্রায় অর্ধেক। কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের মতো চুল ছোট করে ছাঁটে, অথবা বাবরি রাখে। চুল শিংল্ করাটা এখানকার একটি ব্যয়সাধ্য আর্ট। মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা গুনতে হয়। চুল ছেঁটে মেয়েরা নাকি সোয়াস্তি পায়। এখানেও সেই প্রয়োজনের জয়, সৌন্দর্য কোণঠাসা।

সব শেষে ব্যাঙ্কের কথা। ইংরেজরা খুব হিসেবী জাত। যেমন স্ফূর্তি করে, তেমনি করে পরিশ্রম। যত ব্যয় করে, সঞ্চয় করে তার চেয়ে বেশী। ব্যাঙ্ক হচ্ছে সবার খাজাঞ্চিখানা। ব্যাঙ্কে ওরা সবাই টাকা জমায়। সে টাকা ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটে। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের শাখা। ব্যাঙ্ক না থাকলে বাড়ির ঝি পর্যন্ত টাকা উড়িয়ে দিত। ব্যাঙ্ক থাকায় বাড়ির ঝিয়ের টাকাও দেশবিদেশে খেটে সুদ ঘরে আনতে পারছে।

৩

নতুন দেশে এসে মানুষের সব ক'টা ইন্দ্রিয় বড় বেশী সচেতন হয়ে ওঠে। সব কিছুই দেখার জন্যে শোনার জন্যে, তার সমান ব্যাকুলতা। কোন্‌টা দেখবে, কোন্‌টা দেখবে না, সে বুঝে উঠতে পারে না। মনে হয়, আরো বেশী চোখ, আরো বেশী কান, আরো মন থাকলে সুবিধে হতো।

এদিকে লণ্ডনের ঐশ্বর্যপুরীতে আকাশ নেই, আকাশে চন্দ্রসূর্যতারা নেই। দিনের পর দিন সূর্য দেখা যায় না। মেঘে ধোঁয়ায় কুয়াশায় দিনগুলোকে রাতের মতো মনে হয়। গ্যাসের আলোয় সূর্যের আলোর অভাব মেটায়। রাস্তায় হাঁটতে হয় সাবধানে, গাড়ি চলে ধীরগতিতে। গ্যাসের আলো বা বিজলীর আলো কি চন্দ্রসূর্যের অভাব মেটাতে পারে?

তবু রাস্তায় বেরোলেই সব দিকই একসঙ্গে টানে। শেষে একটা দিক বেছে নিতে হয়। দোকান, রেস্তোরাঁ, রেস্তোরাঁর বাইরে ভিক্ষুক-দম্পতি, রাস্তা-মেরামতে-রত কুলিমজুর, অশ্বারোহী সৈন্যদল, সিনেমাহলের সামনে নারীপুরুষের সারি। সবখানেই মেয়েদের উপস্থিতি বেশী। সভাসমিতি, স্কুলকলেজ, থিয়েটার, কনসার্ট, দোকান, অফিসে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। কেরানী, স্কুল-শিক্ষক থেকে গৃহস্থ পর্যন্ত সব নারী

রাস্তার মোড়ে শালপ্রাংশু পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। কলেজে ক্লাসে অধ্যাপকদের শ্রুতিলিখন নিচ্ছে সুবোধ বালিকারা। বক্তৃতান্তে চঞ্চলতা-সহকারে বহির্গমন।

নতুন দেশে মনটাও হয়ে ওঠে নতুন। আহারের ব্যাপারে যদিও-বা নতুন দেশের খাদ্যগ্রহণের মধ্যে রসনা স্বদেশী খাদ্যের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরিচ্ছদের ব্যাপারে কোন রক্ষণশীলতা থাকে না। ধুতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে লেখক এখানে য়ুরোপীয় ধড়াচূড়ায় দিব্যি চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন। স্বদেশী পোশাক পরে বাইরে বেরোলে ভিড় জমে যাবে এবং ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে নির্ঘাত হাজতবাস।

নতুন দেশের নতুন আবহাওয়ায় মানুষের অন্তরের পরিবর্তন ঘটে যায়। দেশে

ফিরে গেলে সারা দেশটাকে আবদ্ধ ঘরের মতো ঠেকবে এবং নিজেকে মনে হবে বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের মাছের মতো। এদেশে কেউ কারো কাছে মাথা নোয়ায় না—সবাই সমান। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভু-মানসিকতা ও দাস-মানসিকতার দাস। প্রত্যেকটি মানুষ একই সঙ্গে প্রভু এবং দাস।

৪

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজ্াঁয় গেলেন লেখক—সুইট্‌জারলণ্ডের লেজ্াঁ।—নিসর্গের তুষারময় তাজমহল। আকাশ সেখানে নিবিড় নীল, মাটি বরফের, মেঘ বরফের।

উজ্জ্বল নীল আকাশের প্রান্তে পাহাড়ের মাথায় যখন সূর্য উঠি-উঠি করে, তখন বিভিন্ন পাহাড়ের রং-বদল হয়। সারাদিন সূর্যকিরণে মাঠ, মাটি, গাছ, ছাদ, ঝরনা ও পাহাড়ের বরফ কখনো সোনালি, কখনো রূপালি হয়ে ওঠে। সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। শুধু শোভা নয়, সংগীতও। গ্রাম-মোরগের ডাক, স্লেজবাহী অশ্বের গলায় ঘণ্টা, তার সঙ্গে ঝরনার নূপুর। এখানকার কাজের নাম খেলা। এখানকার ছোকরা ডাকপিয়ন চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে যে গাড়িতে, তার না আছে চাকা, না আছে ঘোড়া। দুহাতে ঠেলা দিয়ে গাড়ির মধ্যে লাফ দিয়ে উঠলো বসে। গাড়ি চললো বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছলে। এমনি করে রাস্তায় রাস্তায় দরজায়-দরজায় ও চিঠি বিলি করে। এক বাড়ির লোক অন্য বাড়ি যাবে পিঁড়ির মতো উঁচু 'লুজে' চড়ে। যারা শী-খেলা করতে চায়, তারা দু'পায়ে নৌকোর মতো দু'খানা কাঠ বেঁধে হাতে লগি তুলে নেয়। সুইট্‌জারলণ্ডে প্রতি শীতকালে নানা দেশ থেকে আসে বহু নরনারী; তারা পাহাড়ে ওঠে, শী করে, লুজে চড়ে, স্লেজে চড়ে। খাটো, খেলো আর খাও—এই হলো এদের ত্রিনীতি। য়ুরোপে কেউ কাঁদে না, সবার মুখে সহজ হাসি। সাত্ত্বিকতার চর্চা য়ুরোপে নেই, আছে বীর্যের সাধনা।

প্রচণ্ড শীতে যে-দেশে রক্ত হিম হয়ে যায়, সে-দেশে দেহকে বাঁচানোর জন্যে অনেক রকম তোড়জোড় চাই। দেহকে মায়া বলে সে দেশ উপেক্ষা করতে পারে না। দেহের সঙ্গে মনকে উত্তপ্ত রাখতে তারা নিয়ত ব্যস্ত। তাই এদের ভিতরে-বাইরে কেবলি দ্বন্দ্ব, কেবলি ব্যস্ততা। এদের মননও এক রকমের যুদ্ধক্রিয়া। য়ুরোপের মাটিতে বিনা পরিশ্রমে নীবার ধান্যও গজায় না। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ওদের জীবনধারণ। তাই ওদের দেশে উপনিষদ্‌ রচিত হয় না, বাল্মীকি বা বুদ্ধ কখনো ওদের দেশে জন্মাবেন না। য়ুরোপ তাই প্রকৃতিকে দেবী বলে পূজা করে না, শত্রুর মতো তাকে দমন করে তার জীবনযাপনের অনুকূল করে নেয়।

ছোট ট্রেনে করে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে লেজ্াঁয় পৌছতে হয়। গ্রামটির কাছে পৌছলে বাংলো ধরনের একটি-দুটি 'শালে' দেখা যায়। 'শালে'র আগাগোড়া কাঠের, ছাদটা হয়তো স্লেটের, ভেতরটা পাথরের। দোচালা ছাদ, ঝোলানো বারান্দা,

ছোট জানালা, জ্যামিতিক নক্শা, রঙীন আল্পনা, গায়ে হয়তো কোন উক্তি উৎকীর্ণ, দু'তিনশো বছর বয়স। সব মিলিয়ে অপূর্ব। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষ এখানে তার অন্তরের সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়েছে। পাথর-বাঁধানো ঝরনা, পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি। দুশো-তিনশো বছরের পুরনো বাড়িতে অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য। সেইজন্যে নিরালা ছোট্ট গ্রামেও কেউ কোন কিছুর অভাব বোধ করে না।

লেজাঁ গ্রামে দু'তিন হাজার লোকের বাস। তাদের অর্ধেক নানা দেশের যক্ষ্মারোগী। যক্ষ্মারোগের সৌর চিকিৎসার পক্ষে স্থানটি উপযুক্ত। শীত ও রৌদ্রের এ-হেন সমাবেশ জগতে বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—এমন আর কোথায় আছে? শুধু প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই নয়, কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা আছে এখানে। ক্লিনিক, হোটেল, দোকান, বাজার, ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা, গির্জা, কাফে—কোন কিছুরই অভাব নেই। বড় ক্লিনিক ও বড় হোটেলগুলিতে নাচ-গানের ব্যবস্থা। দু'তিন বছর ধরে যারা শয্যাশায়ী, পাশ ফিরে শুতে যাদের দেওয়া হয় না, তাদের ঘরে আধুনিক সুখ-সুবিধা, আধুনিক আমোদ-প্রমোদেরও রয়েছে সুন্দর ব্যবস্থা। খ্রীস্টমাস-ইভে খ্রীস্টমাস ট্রী স্থাপন থেকে কনসার্ট, ধর্মোপাসনা, রঙ্গতামাশা, উপহার-বিতরণ পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই নিখুঁত।

ছোটদের ক্লিনিকেও খ্রীস্টমাস-ইভের আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গতামাশা, উপহার-বিতরণ—সবই আরো আকর্ষণীয়, আরো সুন্দর। বছরের শেষ রাতের উৎসবে বড় ক্লিনিকের রোগীরাও নানা রকমে সেজেছেন। তাঁদের বন্ধুবান্ধবীরাও সেজে এসেছেন। বন্ধু-বান্ধবীরা ব্যাণ্ডের তালে তালে নাচছেন। এমনি করে য়ুরোপীয়রা খেলার দাপটে রোগ-শোক-জরাকে দেয় ভাগিয়ে।

স্ত্রীপুরুষের মিলিত নাচকে য়ুরোপীয়রা কুনীতিকর মনে করে না। স্বাস্থ্যবান্ সমাজ মাত্রেই মিলিত নাচের প্রচলন আছে। আমাদের দেশে আদিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌথ নাচ প্রচলিত রয়েছে। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। তাতে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম রুচির সৃষ্টি হয়। বিচিত্র রূপ-শব্দ-স্পর্শের মধ্য দিয়ে মানুষের সৌন্দর্য-চেতনা বাড়ে। তাতে শিল্পসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

বল্রুমের নাচ সামাজিকতার একটি অঙ্গ—নারী-পুরুষের পরিচয়ের একটা উপায়। যে-দেশে নিজের স্ত্রী নিজেকে সংগ্রহ করতে হয়, সে-দেশে এ-রকম পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যিক। এদেশে নারীর সাধনা যেমন বিশেষ পুরুষকে লাভ করা, পুরুষের সাধনাও তেমনি বিশিষ্টাকে জয় করা। তাছাড়া, বল্রুমের নাচ একটা কসরৎ বা অবসর-বিনোদনের উপায়। য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল, পুষ্ট ও পেশল। এই নাচে হাতের ব্যায়ামও খানিকটা হয়ে যায়।

আমাদের দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখা পাপ। সমাজের নির্দেশে মেয়েদের সতী বা যতি বানানো হয়, অন্তরের নিয়মে নয়। একটু ঘরোয়া ধরনের

হোটেলকে ফরাসীতে পাঁশিঅঁ বলে। ওখানে খাবার টেবিলে সমবেত হয় নানাদেশের মানুষ। সেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ ঘটে। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে দুদিনেই হিন্দু-মুসলমান ও অস্পৃশ্যতা মহাসমস্যার সমাধান হয়ে যেত। খাবার টেবিলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এমন অনেক দুরূহ বিষয় শিখে নিতে পারে, যা আমাদের দেশে বি. এ. ক্লাসেও শিখতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়। প্রত্যেক স্কুলেই নাচ-গানের আয়োজন আছে, দু'একটা বিদেশী ভাষা শেখারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইংরেজি, ফরাসী ও জার্মান—য়ুরোপের এই প্রধান তিনটি ভাষা শেখা হয়ে যায় বেড়াতে গিয়ে খাবার টেবিলে। সেদিক দিয়ে সুইট্জারলণ্ড খুবই অনুকূল স্থান।

ছত্রিশ লক্ষ লোকসংখ্যার দেশ সুইট্জারলণ্ড টুরিস্টদের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রী করে বেশ ধনী। এইটুকু দেশেই তিনটে ভাষা, দুটো ধর্ম; অথচ ওর ঐক্য ইতিহাসবিশ্রুত। টুরিস্টদের জন্যে হোটেল, কাফে, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ঔষধালয়, খেলা ও বাজারের ব্যবস্থা—সব মিলে সারা দেশটাই যেন টুরিস্টদের জন্যে একটি বিরাট পান্থশালা। ভারতবর্ষও যদি সুইট্জারলণ্ডের মতো উদ্যোগী হয়, তবে তারও দারিদ্র্য ঘোচে। কিন্তু টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে? তবে য়ুরোপীয় সমাজ বৈচিত্র্যহীন, সর্বত্রই এক রকম। সেখানে টুরিস্টরা খাপ খাওয়াতে পারে। ভারতবর্ষে তার উল্‌টো।

লেজাঁর নিচে জেনেভা হ্রদের ধারে এক পল্লীতে থাকতেন রম্যা রলাঁ। লেখক তাঁর সঙ্গে একদিন চা খেয়ে এলেন।

৫

রলাঁর পল্লীর নাম ভিল্‌নভ আর তাঁর কুটিরের নাম ভিলা অলগা। কাছেই Chateau de Chillon. এই দুর্গে Bonnivard-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, বায়রনের কাব্যে বর্ণনা আছে তার। এর কারাকক্ষটির জানালা দিয়ে দেখা যায় কেবল জল আর আকাশ। আসল মানুষটিকে এরা কতটুকু বন্দী করে রাখতে পেয়েছিল? ভিলা অলগার পাশেই হোটেল বায়রন। রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এখানে ছিলেন।

রলাঁর কুটিরটি রলাঁর মতোই—বাহিরটা জরাজীর্ণ, ভেতরটা সাজানো। রলাঁ মানুষটির দীর্ঘ দেহ, ন্যুব্জ পৃষ্ঠ, প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শানিত নাসা, শীর্ণ কপোল, সংকীর্ণ চিবুক, দুচোখে ক্লান্তি, মুখে করুণ সরল হাসি, সাদাসিদে পোশাক। তিনি মণীন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মরাগ', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এবং দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ভারতীয় সংগীতের প্রশংসা করলেন। কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনার কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। নেশনরা যতদিন ঠেকে না-শিখছে যে, এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, ততদিন যুদ্ধ থাকবে—এর প্রতিরোধ হলো শিক্ষা—এই হলো তাঁর মত। তিনি

মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মায় বিশ্বাসী। আর্টিস্ট শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবেন না, তিনি ভালোর সপক্ষে এবং মন্দের বিপক্ষে ভল্‌তেয়ার ও জোলার মতো মসীযুদ্ধ চালাবেন। কিন্তু রলাঁ আর্টকে আর্ট এবং প্রোপাগাণ্ডাকে প্রোপাগাণ্ডা বলেন। তাঁর মতে, টাকার জন্যে বই লেখা উচিত নয়। সবারই কিছু কিছু কায়িক শ্রম করা উচিত। গান্ধীর সর্বভারতীয় মিলন-সূত্র যেমন চরকা, রলাঁর সর্বমানবিক মিলন-সূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবসূত্রটি টলস্টয়ের সুরে বাঁধা।

এটা হচ্ছে শূদ্র-বিদ্রোহের যুগ। আজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রীকরণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যার হাতে বীণা-তুলি, তার হাতে কাস্তে-হাতুড়ি দিলে সৃষ্টির স্বাধীনতা, স্রষ্টার স্বাধীনতা থাকে না। এটা রলাঁর ধারণা নয়, লেখকের ধারণা। অন্নবস্ত্রের জন্যে সর্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্বমানবের যে একীকরণ, সে-মন্ত্রের উদ্‌গাতা যদি রলাঁ-গান্ধী-টলস্টয়ও হন, তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

রলাঁর মতে, জনসাধারণের সুখদুঃখের কথা থাকে না বলে এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না। আর্টের শেষ বিচারক জনগণের আদালত। অবশ্য, একথা কখনও তিনি বলেন নি যে, জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। খাঁটি আর্ট নিম্নতম অধিকারীরও হৃদয় স্পর্শ করবে। তবে অসুস্থমনা সাহিত্যিকের সাহিত্যকে সাহিত্য বলা অনুচিত। সুস্থমনা সাহিত্যিকের সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে, তার জন্যে সাহিত্যিককে দায়ী করা ঠিক হবে না।

জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে লেখক যে কল্পমূর্তি গড়েছিলেন, তাঁকে দেখে তা ভেঙে গেলেও তাঁকে ভালোবাসতে বাধলো না। দেহমনে যে সুসমঞ্জস্ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ছিল, তা গান্ধী বা রলাঁর ছিল না। কিন্তু তা বলে তাঁদের ভালো না বেসেও পারা যায় না।

৬

ফরাসীদের পারী ইতিহাস-বিশ্রুত নগরী। দু'হাজার বছর তার বয়স, তবু তার চুল পাকেনি। তাকে কেন্দ্র করে কতবার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, কতবার তার পথে পথে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটেছে, কত ত্যাগী, ভোগী, কর্মী তাকে মানুষের অমরাবতীতে পরিণত করেছে। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, নাট্যকলায়, সুগন্ধি-শিল্পে, পরিচ্ছদকলায়, স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে এখনো সভ্যজগতের শীর্ষে। বিশ্বের টুরিস্টরা পারীতে এসে ভিড় করে। অন্যদিকে, পারী বিশ্বের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, অন্নদাত্রী। জাতিবিদ্বেষ তার নেই। সে নিগ্রোকেও শ্বেতসেনার নায়ক করে, বিদ্যার্থীকে দেয় বিদ্যা, কর্মপ্রার্থীকে দেয় কর্ম।

পারী আয়তনে ও লোকসংখ্যায় লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক, কিন্তু য়ুরোপের কালচার-পীঠ। এখানে ট্রাম, মেট্রো, বাস, ট্যাক্সি, ধোঁয়া, কাদা, বস্তি, ব্যারাক—লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে। তবে সে লণ্ডনের মতো অতো ফিটফাট নয়, বেশ নোংরা,

বেশ গরীব। পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, নদী, নদীমধ্যস্থ দ্বীপটি এবং নগরীর দুই প্রান্তের প্রমোদোদ্যান দুটি।

পারীর রাজপথগুলি খুব প্রশস্ত। এক-একটা দশটা চৌরঙ্গীর মতো—যেন একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ। ইন্দ্রধনুর সাতভাগের মতো ফুটপাত, রাস্তা, গাছের সারি, ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, আবার গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, আবার রাস্তা, তারপর ফুটপাত। ফুটপাতে মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো ছোট ছোট দোকান।

ফরাসী-ইতালিয়ানদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত মিল আছে। ওরাও বিশ্রামপ্রিয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। ফরাসী মেয়েরা খুব খাটতে পারে। মেয়েরা ও শিশুরা খুব পোশাকপ্রিয়। পুরুষদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলী গোঁফ। সম্ভবতঃ সেইজন্যেই পারী সুগন্ধি-শিল্পের পীঠস্থান। রন্ধন-শিল্পেও পারীর স্থান সর্বোচ্চে। এত সস্তায় এত বেশী খাবার লণ্ডনে পাওয়া যায় না। সব দেশের খাদ্যের কিছু নমুনা সব রেস্তোরাঁয়ই থাকে।

ফরাসীরা পান-রসিকও বটে। পারীর গলিতে গলিতে অন্ততঃ পঞ্চাশটা কাফে। এই কাফেগুলি থেকেই ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। কাফেই ফরাসীদের চণ্ডীমণ্ডপ, ক্লাব। এক পেয়ালা কাফী বা শোকোলা নিয়ে তাস খেলা দাবা খেলা থেকে লেখাপড়া পর্যন্ত করেও চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখান থেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্, শ্রেষ্ঠ কর্মবীর, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয়। কাফেগুলিও খুব সস্তা। পাতিসেরী রুটির দোকানে কেক কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়। ফরাসীরা ইংরেজদের মতো গম্ভীরপ্রকৃতি, নীরবপ্রকৃতি নয়; বরং বাচাল, বকে এবং বকায়।

পারীতে অন্ততঃ বিশটি উঁচুদরের থিয়েটার আছে। তাছাড়া আছে সিনেমা, কাবারে ও সংগীতশালা। কাবারেগুলি পারীর বৈশিষ্ট্য। রুচিবোধের ব্যাপারে, ফরাসীরা ইংরেজদের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ফরাসীরা আত্মবিপরীত জাতি। তাদের মধ্যে দুই চরমপন্থীর সমন্বয়। ওরা যেমন গোঁড়া ক্যাথলিক, তেমনি গোঁড়া যুক্তিবাদী; যেমন ভাবপ্রবণ, তেমনি নাস্তিক। কিন্তু রসবোধ এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, দক্ষিণ-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে উত্তর-য়ুরোপীয়দের একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। দক্ষিণ-য়ুরোপীয়রা দেহবাদী, প্রতিমাপূজক; এদের দেবতারা সশরীরী আর উত্তর-য়ুরোপীয়রা প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী। উত্তর-য়ুরোপ যেন মুসলমান, দক্ষিণ-য়ুরোপ হিন্দু। উত্তরের তেজ বেশী, দক্ষিণের বেশী লাবণ্য।

পারীর থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা এবং অসম্ভব জাঁকালো। সরকারী সাহায্যে থিয়েটারগুলি পুষ্ট। তাই সস্তায় বহুলোককে এরা থিয়েটার দেখিয়ে আনন্দ দিতে পারে। থিয়েটারগুলির কোনটাতে অপেরা, কোনটাতে শুধু কমেডী, কোনটাতে শুধু ক্লাসিক অভিনীত হয়।

ফরাসীদের আর একটা জাতীয় সম্পদ্ তাদের মিউজিয়ামগুলো। ছোট বড়ো ডজনখানেক মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভ্‌রের আকার ও ঐশ্বর্য এত বেশী যে,

ওটাই যেন একটা যাদুপাড়া। একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু'দিন লেগে যায়। তাতে গ্রীক ভাস্করের মানসী-মূর্তি Venus de Milo-র জন্যে স্বতন্ত্র একটি ঘর। এখানে ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের মৌলিক তফাৎ। ভারত জননী-মূর্তিকেই প্রাধান্য দেয়, ওরা দেয় প্রেয়সী-মূর্তিকে। লুভ্‌র মিউজিয়ামে আছে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-র 'মোনা লিসা'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি আছে ওখানে। কিন্তু মোনা লিসার হাসি অবিস্মরণীয়। ফরাসীরা এ সব মূর্তি ও ছবি—সব সাধু উপায়ে সংগ্রহ করেনি। কখনো রাজ্য জয় করে—ধনরত্ন হরণ না করে হরণ করেছে শিল্পসম্ভার।

ফরাসীরা কস্‌মোপলিটান জাতি; অর্থাৎ বিশ্বচেতন। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও ভূগোলের নির্বাচিত নামের নামাবলী পারীর গায়ে জড়ানো। শৈশব থেকেই পথ চলতে গিয়ে ওদের পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল পড়া হয়ে যায়।

৭

ইংলণ্ডে প্রত্যেক ঋতুই অংশতঃ বর্ষাঋতু। এটা বসন্তকাল। সমস্ত দিন ধরে পাখিদের কিচিমিচি। এখন আকাশ খুব নীল, গাঢ় সবুজ, বাতাস কবোষ্ণ, পাখিরা বড়ো অস্থির, গাছে গাছে অজস্র ফুল। কিন্তু দেখতে দেখতে কোথায় গেল বসন্তের সৌন্দর্যরাশি? হঠাৎ আকাশের মুখ কালো হয়ে এলো। শুরু হয়ে গেল বিরক্তিকর বৃষ্টি।

এইভাবে নিত্য অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের ফিলজফীটাই যায় বদলে। তাই ওরা প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ মনে করে। প্রতিপক্ষকে হার মানানোই তার সাধনা। সেই সাধনার নাম বিজ্ঞান-সাধনা। ইংলণ্ড প্রকৃতির থেকে যা পায়, তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা; আর, আমরা ভারতীয়রা যা পাই, তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির দক্ষিণ হস্তের অঞ্জলিভরা দান। তাই আমাদের দেশে ভিক্ষা ধর্মীয় অঙ্গ। ভিক্ষা উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন; আমাদের শিব স্বয়ং ভিখারী। তাই সারা দেশে পুরুষকারের এত অভাব।

এই কারণে ভারতের ব্রত হলো ত্যাগ; আর, ইংলণ্ডের মানুষের ব্রত হলো ভোগ। জীবনটাকে ভোগ করার জন্যে তার বিচিত্র আয়োজন। এমনকি, ইস্টারের ছুটিতেও দেখা যাবে ইংলণ্ডের ভোগের চেহারা। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, ইংরেজদের তেমনি হলি-ডে হ্যাবিট। লেখক যে অঞ্চলে গিয়েছিলেন, তার নাম আইল অব ওয়াইট্। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ১০ মাইল। আট-দশটি শহর এবং বিশ-পঁচিশটি ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে এই দ্বীপটিতে। গ্রীষ্মকালে যেসব টুরিস্ট আসে, তাদের দৌলতে বছরের বাকি সময়টা এরা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। হোটেলগুলো তখন খাঁ খাঁ করতে থাকে। স্থানীয় লোকেরা চাষা, মুদি, রুটিনির্মাতা, মাঝি, জেলে আর মজুর। তারা নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে চালায় স্বায়ত্তশাসন।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার, তেমনি পরিপাটি। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার

[চিমনি-স্থইপ] যে বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির বাইরে আছে বেল্, তার কাঁচের জানালার ওপাশে ধবধবে পর্দা, ঘরে অল্পবিস্তর আসবাব। আমরা ভারতীয়রা পরলোকের আকর্ষণে ইহলোকের বাসাকে এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি। যে-দেহে বাস করি, তাকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে বাস করি, তাকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। কিন্তু ইংরেজরা মরেও ইহলোককে ছাড়তে চায় না, কফিনের ভেতরে শুয়ে মাটি আঁকড়ে থাকে।

তবে এদেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পরিপাট্যের মূলে আছে এদেশের নারীশক্তির সক্রিয়তা। ইংলণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রানী। শাশুড়ী-জা'দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই—নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে। সেইজন্যে সে ঘরটির ঝাড়ামোছা-ঘসা-মাজাতে সব সময় ব্যস্ত। ইংলণ্ডের ছেলেরা যে 'হোম' পায়, তার একদিকে বাবা, অন্যদিকে মা ; মাঝখানে ছোটবড় ভাইবোনগুলি।

ইংলণ্ডের গৃহিণীদের কাছে আমাদের গৃহিণীদের কিছু শেখার আছে। সেটি হচ্ছে গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্যসাধন। আমাদের গৃহিণীদের রন্ধনপর্ব সুদীর্ঘ। কিন্তু গ্যাসের উনুনে এদেশে দরিদ্রতম গৃহিণীও আধঘন্টায় একবেলার রান্না চুকিয়ে ফেলে। গ্রামে প্রত্যেকেরই বাগান আছে। তাতে বাড়ির মেয়েরা কাজ করে, ছেলেরা ব্যস্ত বাইরের কাজে। শহরে ইংরেজও বাগান বড়ো ভালোবাসে। অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসে যায়। এদেশের মেয়েরা উপার্জনে পটু, উপার্জন বাঁচাতেও পটু। কত সস্তায় পোশাক বানানো যায় বা কত সস্তায় নৈশ আহার প্রস্তুত করা যায়, তাই নিয়ে এদের প্রতিযোগিতা। এরা বাগানে পর্যটকদের চা খাইয়ে, ফার্ম হাউসে পেয়িং গেস্ট রেখে সংসারের আয় বাড়ায়। মেয়েরা সাইকেলে চড়ে বাজারে যায়, ছেলেরা চড়ে মোটর-সাইকেলে।

এদেশের যুবকরা জেনেছে, যে-কোন দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে ; এ-যুগে প্রাণের মূল্য নেই। যুবতীরা জেনেছে, পুরুষদের সংখ্যাস্বল্পতাবশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যেই নেই। তবু তারা পণ করেছে, তারা কাঁদবে না। সেইজন্যে সবার এত দেহের দিকে নজর। য়ুরোপের লোকের স্বাস্থ্য এবং আয়ু বেড়ে চলেছে।

আইল অব ওয়াইট বড় সুন্দর জায়গা। যেন নীলরঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা সবুজ ছবি। এদেশের সবুজ তীব্র আর ঝাঁঝালো। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকো ভেসে যাচ্ছে, পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরগামী জাহাজ, মাথার ওপরে উড়ছে এরোপ্লেন। কানে বাজছে জলকণ্ঠের ছলাৎছল, আপনভোলা শিশুগুলি বালি দিয়ে ঘর বানাচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে সব।

গ্রামের লোকেরা বিদেশী দেখলেই সম্মান করে, কুশল প্রশ্ন করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। তবে সব দেশেই গ্রাম্য সভ্যতার অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। নগরের মতোই গ্রামও হোটেল আর ভাড়াঘরে ভরে যাচ্ছে।

কয়েকদিন থেকে আলোর শেষ নেই—ভোর চারটে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত। তার উত্তাপ কোনদিন আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো; কোনদিন চৈত্র মাসের মতো। তাতেই এদেশের লোকগুলি ছটফট করতে শুরু করেছে। শীত, বর্ষা, কুয়াশায় এরা খুঁতখুঁত করে। কিন্তু ওছাড়া আর কিছু ওরা ভালোও বাসে না।

রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যে পৃথিবীর কোন-না-কোন দেশে কাটিয়ে এসেছে কিংবা পয়সা জমাতে পারলে পৃথিবীর কোথাও নতুন ব্যবসা ফাঁদবে বা নতুন চাকরি নেবে। এদের কাছে পৃথিবীটা ছোট; প্রায় সবাই পথিক, কেউ গৃহস্থ হতে চায় না। এর ফলে বিদেশের স্বপ্নে এদের মন সব সময় বিভোর। শনিবার হলে চলো লণ্ডন ছেড়ে পারী, ওখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো সোমবারে। পরের শনিবার চলো বেলজিয়ামে কিংবা হল্যাণ্ডে। সাতদিনের ছুটিতে জার্মানী কিংবা স্থইট্‌জারলণ্ড, তিন সপ্তাহের ছুটিতে নিউইয়র্ক কিংবা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। দেড় মাসের ছুটিতে সাউথ আফ্রিকা কিংবা ইণ্ডিয়া। ছ'মাসের ছুটিতে ওয়ার্ল্ড্ টুর।

আমাদের নাতিনাতনিরা ভাববে, এই তো জীবন। শহরময় হোটেল, হোটেলে বিশুদ্ধ খাবার। তাদের পিতামহদের জীবনকে তারা জীবন বলতে চাইবে না। সে সময়ে নাকি স্নেহ-প্রেম-আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল—বাজে কথা! সে সময়ে গ্রামে গ্রামে মামলা আর দেশে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। মেয়েরা গৃহকোণে বন্দী থেকে স্বামীপুত্রের সেবা করতো। কিন্তু তারা যখন দ্রুততম এরোপ্লেনে ভ্রমণের মূর্ছাস্থখ পাবে, তখন ওরা বুঝবে না মন্থরতম গোরুর গাড়িতে চড়ে তন্দ্রাস্থখের আনন্দ। আমাদের সেই রাত ভোর করে যাত্রা দেখার আনন্দ ওরা কি কখনো উপলব্ধি করতে পারবে? আসলে, এক যুগের মানুষ আর এক যুগের মানুষের চেয়ে স্থখী। লাখ বছর পরের মানুষদেরও জীবন দুঃখে-স্থখে বিচিত্র এবং প্রেমে-হিংসায় জটিল থাকবেই। ক্রমে ধীরে-চলার আনন্দ বিদায় নিয়ে ছুটে-চলার আনন্দ আসছে।

আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজ্‌ম্, তারপরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজ্‌ম্, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। এই ইংলণ্ডের এক অতি অখ্যাত গ্রামে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও অশিক্ষিত তামিল চাষা ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ছেলেপিলে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। তার ছেলেপিলে হয়তো বাসা বাঁধবে ক্যানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কোন্ দেশের প্রতি তার পেট্রিয়টিজ্‌ম্ যাবে? এইভাবে জগৎ জুড়ে একটা সংকরজাতি গড়ে উঠেছে, সে জাতির নাম মানবজাতি। এই নতুন মানবের জন্যে নতুন সমাজ এবং নতুন নীতিসূত্র গড়ে উঠেছে। সে নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খায়, গোরুর গাড়ির সঙ্গে বেখাপ্পা।

এতদিন নর-নারীর সম্পর্কগুলো ছিল পারিবারিক—মাতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-কন্যা। এখন নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়েছে সখা-সখী। এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, তাতে ভুল হতে পারে এবং সে ভুলের দায়ভাগ তার নিজের। বিয়ের আগে স্ত্রী হয়তো কোন কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে, বিয়ের পর সে

যদি স্বামীর সঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তা হবে মস্ত একটা ত্যাগ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতি। সুতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর স্বামী যদি ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিক হয়, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হবে হয়তো বছরে একবার। এইভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। স্ত্রী আর গৃহিণী নয়, হোটেল-বাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন নেই। স্ত্রীও দূরে কোথাও নিজের কাজে ব্যস্ত। কাজেই, স্ত্রী আর সচিবও নয়। স্বামী-স্ত্রীর এই-যে অনিবার্য ব্যবধান, এটিকে পূরণ করতে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ।

এইভাবে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমতঃ, প্রেম যে চিরস্থায়ী, এমনকি দীর্ঘস্থায়ী হবে, এমন কোন কথা নেই। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীর সঙ্গে সতী নারীর যেমন ব্যবহার, সখার সঙ্গে তেমন ব্যবহারেও সতীধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই স্বতন্ত্র, দুইজনেই স্বাবলম্বী, দুজনেই ভ্রাম্যমাণ—একদিন যে দুটি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল, চিরদিন তারা সেই স্থানে থাকতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

য়ুরোপে স্ত্রী-পুরুষের তীব্র সংখ্যা-বৈষম্যের ফলে নরনারীর সম্পর্কেও এই কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রনায়কেরা দুনিয়া জয় করতে গিয়ে যুদ্ধে বহু পুরুষকে বলি দিয়েছেন। তাতে সমাজে নারী-সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ-সংখ্যা গেছে কমে। নারী ও পুরুষের ক্রমবর্ধমান নীতিভ্রষ্টতার জন্যে মূলতঃ তাইই দায়ী।

৯

য়ুরোপে যুদ্ধের পর থেকেই হঠাৎ ধর্মচর্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তার ফলে অর্থচর্চা এবং কামচর্চাও কমেনি। এখানে আজ ধর্ম, অর্থ, কাম—ত্রিমূর্তির উপাসনা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের এক্সচেঞ্জে, ডারবিতে, থিয়েটারে, নাচঘরে, হোটেলে, পার্কে, গির্জায়—সর্বত্র লোকারণ্য। একটা জাতির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ সমান জীবন্ত। শনিবার সন্ধ্যায় যে-সব যুবক-যুবতী মাঠে-বাগানে প্রেমালাপে নিমগ্ন, তারাই রবিবার সকালে গির্জায় ভিড় করে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ধর্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো নতজানু হয়, আবার তারাই সোমবার দুপুরে অফিসে শৃঙ্খলার সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করে। আবার কাল যদি যুদ্ধ বাধে, ছেলেরা মরণ-যাত্রা করবে, মেয়েরা ঘরে বাইরে দেশের কাজ করবে। সব সময়ের সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকাই য়ুরোপের ধর্ম।

আমাদের দেশে ক্ষত্রিয়-সমাজের মধ্যেই ছিল সামরিক সংস্কার। য়ুরোপের আবালবৃদ্ধবনিতা যুদ্ধে বিশ্বাসী। যুদ্ধ যে মন্দ, তা সে অনেক বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে, সংস্কার থেকে পায়নি। য়ুরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল, এখনো তাই আছে। শুধু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি বিশ্বাস—খ্রীস্টধর্ম। য়ুরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। য়ুরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। অথচ সেই য়ুরোপের নিজস্ব ধর্মীয় অভিব্যক্তিকে

রাহুগ্রস্ত, আচ্ছন্ন করে রাখলো খ্রীস্টধর্ম। সেই দুঃখে পুরো মধ্যযুগটাই সে অন্ধকারে কাটালো। য়ুরোপের মনীষীরা চার্চের ওপরে তাই অনাস্থাশীল। ইংলণ্ডে চার্চ তাই আজ জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। চার্চ ও স্টেট এদেশের সমাজের এ-পিঠ ও-পিঠ। চার্চ শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সংঘ। ভারতে বৌদ্ধ যুগের পর আর সংঘ নেই। কেশবচন্দ্র যে আধুনিক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দুধর্মের কোন সংঘ ছিল না। এদেশে যে-কেউ বাস করতো, সে-ই ছিল হিন্দু।

কিন্তু য়ুরোপ নিজের মাটিতে নিজের ফুল ফোটাবে। সে অন্যের ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করবে, কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। য়ুরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। য়ুরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব, শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি ; আর, আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব, মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। আমাদের সাহায্যে য়ুরোপ যদি নিজের রিলিজন্ নিজে সৃষ্টি করে, য়ুরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজন্‌গুলি শোধিত করে নিই, তবে দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম।

য়ুরোপের বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছে মাত্র দেড়শো বছর। এদেশে অনেক উদ্ভাবন বাকি। জীবন যতই জটিল হয়, তখনই রিলিজনের দরকার হয়। রিলিজন্ খুলে দেয় গ্রন্থি, রিলিজন্ জীবনকে করে সরল। যন্ত্র বা বিজ্ঞানকে ত্যাগ করা আজ আর কোনমতে সম্ভব নয়। কাজেই, আধুনিক য়ুরোপের সাধনা হলো, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সফল করা যায়। খ্রীস্টধর্ম দেহকে তাচ্ছিল্য করে আত্ম-নিগ্রহকেই ধর্ম বলে চালিয়েছিল ; কিন্তু এ ধর্ম য়ুরোপের প্রকৃতিগত নয়, এ ক্ষেত্রে গ্রীসকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপরে খ্রীস্টানকে ঢেলে সাজালেই বোধ হয় সোনায় সোহাগা হয়।

১০

বৈশাখ মাসের গরম—ষোল-সতেরো ঘণ্টা সূর্যালোক। রাত্রে ঘুমোতে যাবার সময় লোক রাতের আহার শেষ করে সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে। রাস্তার মোড়ে একটা টুল বা চেয়ার বা ভাঙা বাক্স জোগাড় করে তার ওপরে দাঁড়িয়ে বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছে। পার্লামেন্টের নির্বাচন হয়ে গেলেও সারা বছর সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপতে থাকে। এ দেশের লোক ভাবপ্রবণতার ভক্ত নয়। এরা বোঝে যুক্তিতর্ক। কাজেই, পরিসংখ্যানের মারপ্যাচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বানাতে না পারলে ইংলণ্ডের মন গলানো যাবে না। বক্তারা নিপুণ ক্যান্‌ভ্যা-সারের মতো বুদ্ধিমানের বুদ্ধি দেয় ঘুলিয়ে। দ্বিতীয়তঃ, বক্তারা নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি, মান-অপমানে একটুও বিচলিত হবেন না। রাজনৈতিক দলাদলির নীচে আছে ধর্মনৈতিক দলাদলি। সেখানেও তারা অত্যন্ত আন্তরিক। বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখিন বাচালতা নয়। সেজন্যে তারা কারো হাততালির আশা রাখে না, কেউ না শুনলেও রণে ভঙ্গ দেয় না, যে পর্যন্ত

একটি শ্রোতাও থাকে, সে পর্যন্ত ওরা ওদের বক্তৃতা চালিয়ে যায়। আমাদের দেশে কেবল পাণ্ডা আর ঘটকের এই নাছোড়বান্দা স্বভাব দেখা যায়।

ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের হাতেই ভাণ্ডারের চাবি। সেই চাবিটার জন্যেই দিনরাত লড়াই। দেশের কাজের জন্যে এদেশে বাহবা পাবার প্রশ্নই ওঠে না। দেশপূজ্য হওয়া দূরে থাক, লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে। বলডুইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড় কম করেননি, তবু তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম্-ডিক্ও পিছ-পা নয়। লয়েড জর্জ দুর্দিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করলেন, অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও ক্ষেপানো এদেশের ফ্যাশান।

ক্রমশঃ ইংলণ্ডের মাটিতে মাঝারি মানুষ ছাড়া অন্য কোন মানুষই অসম্ভব হয়ে উঠছে। সমাজের দশজন চায় না যে, তাদের মধ্যে কোন একজন সর্বেসর্বা হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা, কেউ বামন হবে না, কেউ দৈত্য হবে না।—সবাই প্রমাণ-সাইজ হবে। তবু আমেরিকা, ফ্রান্স বা রাশিয়ার চেয়েও ইংলণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি। সেইজন্যে ইংলণ্ডে একটি ফোর্ড বা আনাতোল ফ্রাঁস বা লেনিন সম্ভব নয়।

এটা সব দেশের অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ঐ একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সবাইকে সমান করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। ভাবীকালের গণতন্ত্রে রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র—সব সমান হবে; কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বেশী বুদ্ধিমান হবে, তারা বেশী সুবিধা আদায় করে নেবেই। গান্ধী লেনিন ফোর্ড বার্নার্ড শ—সবাই নিজ নিজ কল্পরাজ্যে সব মানুষকে সমান রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সব মানুষ কি দেহমনে সমান হতে পারে —কোনদিন সমান হবে? সেই কারণে আর্টকে জনসাধারণের যোগ্য করতে হলে দুধের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল মেশাতে হবে। আজ আর তাজমহল তৈরী হবে না, সেই টাকায় এক লাখ বাসগৃহ তৈরী হবে। আজ ময়ূর সিংহাসন তৈরী হবে না, সেই টাকায় একরাশ এক ধরনের লোহার বেঞ্চি তৈরী হবে, যাতে একজন সামান্য কুলি-মজুরও বসে বিশ্রাম করতে পারে। এইভাবে পৃথিবীতে আভিজাত্যের ভাবটা পর্যন্ত অভিজাতেরাই নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকের একটা মাত্রই নেশা—পরস্পরের সমান হতে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী স্বর ছিলেন নীট্শে। আসল কথা, বৈষম্যবাদেরও শুরু হচ্ছে। অসম পুরুষ যখন আসবেন, তখন আপনিই আসবেন। তিনি এলে তাঁর সমাজের চেহারা কেমন হবে, তার নক্শা তৈরী করা এইচ. জী. ওয়েল্সেরও অসাধ্য।

১১

সম্প্রতি লণ্ডনে বিমান আক্রমণ হয়ে গেল। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে ঘটে গেল যে, খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও তার রেশ রইলো না। ইংলণ্ডে যুদ্ধ ব্যাপারটা সন্ধ্যাহ্নিকের মতো নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম। তাই সামরিক সংস্কার এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। পরিবারে দু'টি ছেলে থাকলে একটি ছেলে যুদ্ধকে

জীবিকা করবেই। একান্নবর্তী পরিবার না থাকায় এদেশের যুবকদের দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। বিধবা বিবাহ এদেশে নিষিদ্ধ নয়। কাজেই, স্বামী যুদ্ধে নিহত হলে স্ত্রীর পুনর্বিবাহে কোন বাধা থাকে না। এদেশে যশস্বী হতে স্ত্রীরা স্বামীদের যেমন যুদ্ধে পাঠাতে পারে, আমাদের দেশে স্ত্রীরা স্বামীদের তেমন বিদেশে পাঠাতেও চায় না। এদের তুলনায় আমাদের স্ত্রীলোকেরা স্নেহান্ধ। কোন দুঃসাহসিক কর্মে তারা পুরুষদের সহযোগিতা করে না। তাই আমাদের দেশে 'পথি নারী বিবর্জিতা।'

ইংলণ্ডে যুদ্ধ-নিবারণের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে চার্চের নেতৃত্ব নেই, যেটুকু যোগ আছে, তা ব্যক্তিবিশেষের। ইংলণ্ডে অবশ্য শান্তিবাদীদের সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান। কেবল বর্ষীয়ানরাই রয়েছেন সেই দলে। তাঁদের ভাবনা, আধুনিক যুদ্ধ-প্রক্রিয়া প্রশ্রয় পেলে পৃথিবীকে একেবারে ছারখার করে দেবে। আধুনিক যুদ্ধ-প্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যে-দেশ যুদ্ধে যোগদান করবে না, সে দেশেও মহামারী পৌঁছতে পারে। এতদিনে মানুষ যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী কুফল সম্পর্কে বুঝতে শিখেছে।

কিন্তু প্রবৃত্তি তো বুদ্ধির অবাধ্য। গত মহাযুদ্ধে মানুষ যে শিক্ষা পেয়েছিল, তা ইতিমধ্যে বাসি হয়ে গেছে। শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি যৌবনে যাবে মিলিয়ে। এবং সেই যুবকেরা এখন করবে দেশ-শাসন। চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্তির আয়োজন। তরুণীরা তরুণদের দেবে প্রেরণা। মানুষ তো প্রেমিক। সে আঘাত করতে এবং আঘাত পেতে ভালোবাসে। প্রেমে অবহেলা সয় না। অহিংসা অবহেলারই নামান্তর। এবং তা একলা নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম। তেমন সমাজে বাস করে আনন্দ নেই।

আধুনিক যুদ্ধ-প্রক্রিয়া মানুষকে মানুষের নিকটতর করেছে। গত মহাযুদ্ধে জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পর উপলব্ধি করলো যে, তারা দুজনেই মানুষ, তাদের দুজনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। অমূল্য এ মিলন। কিন্তু মিলনমাত্রই বিয়োগান্ত। ভাবী যুদ্ধে অকথ্য লোকসান দিয়ে মানুষ জানবে, সকলেরই স্থান এক নৌকায়।

'লীগ্ অব্ নেশন্স্ ইউনিয়ন' যুদ্ধ-নিবারণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। সমগ্র পৃথিবীকে ধনসাম্যমূলক একরাষ্ট্রে পরিণত না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। রেল-ষ্টীমার যেমন ভারতবর্ষকে একরাষ্ট্র করেছে, এরোপ্লেন তেমনি পৃথিবীব্যাপী একরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু যদি যুদ্ধ উঠে যায়, তবে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে। যুদ্ধহীন পৃথিবী যৌবনের পক্ষে দুর্দিন। ভাবুকরা খেলাধুলো দিয়ে যুদ্ধের আশা মিটিয়ে দিতে চাইছেন। যুদ্ধ যদি ক্ষতিকর হয়, তবে সে ক্ষতি স্বীকার করবার ক্ষমতা পৃথিবীর নেই। মানুষের পশুত্বকে দুর্বল করলে মানুষও দুর্বল হয়ে পড়বে। আজ তাই আদিম যুগের সঙ্গে অন্বয়রক্ষার চেষ্টা চলেছে। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কূটনীতি, গুপ্তচর-বৃত্তি, বিষবায়ু-প্রয়োগ, ব্যাধিবীজ-বিক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কার্য। মানুষ ধর্মযুদ্ধ ভালোবাসে, সে-যুদ্ধে মরণেও সে

তৃপ্তি পায়। আধুনিক যুদ্ধে যত লোক প্রাণে মরে, তার চেয়ে বেশী মরে আত্মায়। সেইখানেই অধর্ম।

যুদ্ধনিবারণী দল বলছে, 'যুদ্ধ করোনা'; কিন্তু যুদ্ধের বদলে কি করবে, সে সম্পর্কে কোন স্থির পথ-নির্দেশ নেই। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাজ নয়; এবং যুদ্ধের বদলে পুলিশি করেও তরুণের তৃপ্তি নেই। এ সময়ে কেউ যদি এসে বলতেন, 'প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে নাও', সে ডাক হতো প্রেমিকের, সেই ডাকের প্রতীক্ষায় এই যুগ পদচারণা করছে।

১২

বসন্তে যত ফুল ফোটে, কুঁড়ি ঝরে যায় তার চেয়ে বেশী। কিন্তু যৌবন অফুরন্ত। তাই যুদ্ধে পরাজিত সর্বস্বান্ত জার্মানী ধন দিলেও যৌবন দেয়নি।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ শর্তবদ্ধ—প্রকৃতির দান তারা পালা করে ভোগ করবে। একদলকে মরতে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। তাই হয় যুদ্ধে, নয় দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর জন্যে সমাজকে প্রস্তুত থাকতে হয়। যে-সমাজ এ দুটির কোনটিই চায় না, তাদের জন্যে তৃতীয় পন্থা হলো জন্মশাসন। অবশ্য, যে-সমাজের যৌবন অফুরন্ত, সে-সমাজ যুবাকেই মরতে পাঠায় পরবর্তীকালের যুবাকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে। আর, যে-সমাজের যৌবন অল্প, সেখানে এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে আরেক স্থবিরকে এগিয়ে আসতে হয়। সুতরাং সে সমাজকে শৈশব থেকেই বার্ধক্য-চর্চা করতে হয়।

কিন্তু য়ুরোপে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা বালক-বালিকাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শরীরকে শক্ত মজবুত করবার চেষ্টা করে। যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয়, তারা সমাজের প্রাণবান পুরুষ। যারা বেঁচে থাকে, তারা বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদের ভেতর থেকেই হয় নতুন সৃষ্টি। ভারতবর্ষ জীবনকে বলে লীলা, য়ুরোপ বলে সংগ্রাম। বহু শতাব্দী ধরে দেখা যায়, প্রতি প্রজন্মেই ফ্রান্স একবার করে নিঃক্ষত্রিয় হয়। তবু ভস্মের ভেতর থেকে আগুন জ্বলে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি তার পুরাতন গৌরবকে ম্লান করে দেয়। তেমনি নতুন জার্মানী যেভাবে উৎসাহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবন-চর্চা করছে, তাতে, মনে হয়, ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে। এমনকি, পৃথিবীর যেখানে যে বই প্রকাশিত হয়, জার্মানী তার অনুবাদ করে পড়ে। জার্মানীর শিক্ষার গুণে এখানকার মানুষ জানে, পৃথিবীর কোন্ দেশ কতটা উন্নতি করলো।

জার্মানীর দুটি বিষয় লক্ষণীয়: এক. এখানে গ্রাম ও শহরে কোন বস্তি নেই। মজুরদের বাড়িগুলি মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় উপভোগ্য। জার্মানীর গরীবেরা ইংলণ্ডের গরীবদের চেয়ে অনেক ভালো। দুই. জার্মানীর শ্লীলতাবোধ কলকারখানার কদর্যতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কলকারখানাগুলি যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম ও শহরের চতুঃসীমায় বাগান করা হয়েছে এবং বাড়ির সঙ্গে বাগান করতে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক-নিবাসগুলির গড়ন এবং রং সুন্দর।

হোটেল-রেস্তোঁরার দেয়ালে আলপনা। সরকারী অপেরা হাউস ও থিয়েটার রয়েছে প্রতি শহরে। জার্মানীর সবাই গান-বাজনায় যোগ দেয়। জার্মানদের ফটো-তোলার বাতিকের চেয়ে ছবি-আঁকার ঝোঁক বেশী।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দুটি জাতির আছে—আমেরিকান এবং জার্মানের। আমেরিকানরা ভেসে ভেসে বেড়ায়; কিন্তু জার্মানরা বেড়ায় পায়ে হেঁটে। ছোট্ট দেশ জার্মানী—উত্তর দিকটা প্রোটেস্টান্ট-প্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিক-প্রধান। জার্মানী আগে ছিল বহুধা-বিভক্ত। যুদ্ধে হেরে জার্মানী এক হয়েছে।

ইংলণ্ড প্রোটেস্টান্ট-প্রধান, ফ্রান্স ক্যাথলিক-প্রধান; কিন্তু জার্মানীতে উভয় সম্প্রদায়ই প্রধান। দক্ষিণ জার্মানীতে যেমন অসংখ্য গির্জা, তেমনি ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য মূর্তি ও চিত্র। এখনো লোকে সে সব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল দেয়, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায় ও মনস্কামনা জানায়; এই মূর্তি ও চিত্রগুলি প্রায়ই ক্রুসবিদ্ধ যীশুর বা যীশু-জননী মেরীর। যীশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু বিষয়ে অসংখ্য চিত্রকর ছবি এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সংগীতকার গান রচনা করেছেন। রেনেশাঁসের পর য়ুরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়লো।

খ্রীষ্টিয়ানিটিকে তার বাড়ির পাশের আরব-পারস্যের লোক গ্রহণ করলো না; এমন-কি, তার বাড়ির লোক ইহুদীরা পর্যন্ত অসম্মান করলো, কিন্তু দূর থেকে য়ুরোপ ডেকে নিয়ে মান দিল। এইভাবে ভোগলোলুপ য়ুরোপকে ত্যাগ শিক্ষা দেবার প্রয়োজন ছিল।

য়ুরোপের সর্বত্র একই পোশাক, একই খাদ্য, একই রীতিনীতি। বহিরঙ্গে সব এক। কিন্তু জার্মানরা ভয়ানক কাজের মানুষ, সাজসজ্জার বড় একটা ধার ধারেনা—সে ব্যাপারে ভোলানাথ। ইংরেজরা আপাদমস্তক ফিটফাট। জার্মানীর মেয়েদের মোটা কাপড়ের প্রতি টান। তারা গোরু ও ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায়, পিঠে বোঝা বয়ে হাঁটে। তাদের তুলনায় ফরাসী মেয়েরা অনেকটা মোমের পুতুল—শৌখিন।

১৩

গত মহাযুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সর্বনাশ ঘটে গেছে। চার শতাব্দীর অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য। রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। সুন্দরী ভিয়েনার আজ বিধবার সাজ। অষ্ট্রিয়ার না আছে বন্দর, না আছে খনি—লোকসংখ্যাও অল্প। নাগরিক হবার জন্যে সে আমেরিকানদের সাধাসাধি করে।

ভিয়েনা শিল্পনগরী। কিন্তু তার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যা ছিল, তা কেড়ে নিয়েছে ইটালী; খনি যা ছিল, তা কেড়ে নিয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া। শুধু টুরিস্ট নিয়ে বেঁচে আছে অতুলনীয়া সুন্দরী—ভিয়েনা। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব নদী, ভেতরে নদীর খাল। তার পথঘাট লণ্ডন-প্যারিসের চেয়ে পরিচ্ছন্ন, তার সৌধগুলি লণ্ডন-প্যারিসের চেয়ে সুধা-ধবল।

ভিয়েনার কত বড় বড় বাড়ি, কত বড় বড় রাস্তা; কিন্তু এত জনবিরল যে, ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেস্তোরাঁ—সস্তায় চমৎকার রান্না, অথচ লোক নেই। প্যারিস থেকে ভিয়েনায় গেলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। এই বিগতযৌবনা রূপসী একদা য়ুরোপের রানী ছিল। তখন কত কূটনীতিবিদ্‌, বণিক, গুণী, কত পর্যটক তাকে দেখতে আসতো। সংগীতে সে ছিল অতুলনীয়া। তার অপেরা ছিল বিশ্ব-বিশ্রুত।

তার সেদিন আজ লুপ্ত। এখন সে সোশ্যালিস্ট দেশ। কিন্তু সে কায়দা-দুরস্ত। রেস্তোরাঁর ওয়েটারের পোশাক এখনো জাঁদরেল, রাস্তার পাহারাওয়ালার সৈনিকের সাজ, কোমরে স্বর্ণখচিত তরবারি। অথচ অস্ট্রিয়া এখন য়ুরোপের দরিদ্রতম দেশ—লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌সের মধ্যস্থতায় টাকা ধার করছে। যে ছিল একদা সমগ্র য়ুরোপের রাজধানী, আজ সে জার্মানীর কাছে হতমান। কিন্তু এই ছোট ছোট রাষ্ট্র আর বেশীদিন টিকবে না। মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গড়ে তুলতেই হবে।

তবু অস্ট্রিয়ানরা আমাদের মত দরিদ্র নয়। য়ুরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিত্ত। য়ুরোপের পারিয়াদের দাবি—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, ঘন ঘন ছুটি, প্রচুর পেনসন, বিপদে-আপদে জীবনবীমা। আমাদের দাবি তো কোনমতে বংশরক্ষা এবং মৃত্যুর পরে পিণ্ডলাভ। এদের দাবি জীবন নয়, রাজসিক মৃত্যু। এদের সমাজ তাই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই যুদ্ধ খোঁজে। তাতে তার স্বাস্থ্য থাকে। লোকসংখ্যা সীমিত রাখার জন্যে তারা চিরকুমার থাকে, অধিক বয়সে বিবাহ করে অথবা জন্মশাসন করে। অন্নের ভাগ দিতে পারবে না বলে অভক্ষ্য প্রাণীদের এরা সাবাড় করে ভক্ষ্য প্রাণীকে অন্নে পরিণত করেছে। হত্যা ব্যাপারটাকে কম যন্ত্রণাদায়ক করবার জন্যে কসাইদের পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। য়ুরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশীর সংখ্যা বাড়ছে, সবাই প্রায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

য়ুরোপ অনাবশ্যককে নির্মমভাবে ছেঁটে, আবশ্যকের বহর বাড়িয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য—শতবর্ষের যৌবন। আমরা বলি, নিজের ছাড়া বাকি সকলের উপকার করো। আর, ওরা বলে, নিজের মাথায় তেল দাও। বেকার-সমস্যা নিয়ে ইংলণ্ড বিব্রত। কিন্তু ভিক্ষা দেওয়া এদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ধনী-দরিদ্রের দর-কষাকষি এদের দেশের মতো আমাদের দেশে নেই। তবে যুদ্ধের সময় এরা সন্ধি করে। খাবারের জন্যেই এরা গোরু-শূওরকে খাইয়ে মোটা করে। ছাল-ছাড়ানো গোরুর ধড় এরা দোকানে ঝুলিয়ে রাখে, ঝুলিয়ে রাখে একশোটা মরা পাখি কিংবা একশোটা মরা খরগোশ।

দোকান সাজাতে ইংরেজ, জার্মান, অস্ট্রিয়ান আর সুইস্‌রা ওস্তাদ। ফরাসীরা আমাদের মতো এলোমেলো। দোকান, রেল, ষ্টীমার, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পথঘাট, প্রদর্শনী—সর্বত্রই উত্তর-য়ুরোপের পারিপাট্য লক্ষণীয়। ভিয়েনায় আঁকাবাঁকা নদী নেই, কূলে বসে মাছধরা নেই, কূলে দাঁড়িয়ে ছবি-আঁকা নেই, পুরনো বইয়ের দোকানে ঝুঁকেপড়া বুড়ো নেই, কার্পেট-কাঁধে চলমান মিশরীয় ফেরিয়ালা নেই। প্যারিসের রাস্তায় বহুতর দৃশ্য দেখার সুযোগ আছে। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল

জমেছে, ফুটপাথে দোকানের নিচে দোকান, তাতে নানারকমের জিনিসের জটিলতা। দোকানের গায়ে কাফে আর মদের দোকান।

ভিয়েনার সম্রাটের প্রাসাদগুলি এখন মিউজিয়ামে পরিণত। বারো আনা পয়সা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই—প্রাসাদগুলি নিতান্তই মানুষের আহার-নিদ্রার স্থান। এবার মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে নিদারুণ মোহভঙ্গের যুগে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বর্গ কল্পনা করার মতো পৃথিবীতে আর কোন রাজপ্রাসাদ নেই। তাই পৃথিবীতে আর শেক্‌স্‌পীয়ার হয় না, রবীন্দ্রনাথও হবে না।

১৪

পোশাকে-প্রাসাদে-ভোগে-সম্ভোগে আমাদের রাজা-মহারাজারাই সেরা। রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও তার তুলনা নেই। আমরা ধাতে চরমপন্থী। রাজা-বাদশা এবং ভিখিরি-ফকির ছাড়া আমরা কাউকে সম্মান করি না।

ভোগের আর ত্যাগের আড়ম্বর প্রখর সূর্যালোকিত দেশগুলির চরম দুর্ভাগ্য। গ্রীসে ও মিশরে এক দল লোক দাসত্ব করেছে, অন্য দল তার ওপর পিরামিড তৈরী করেছে। এত চরমাবস্থা প্রকৃতির অসহ্য। তাই মিশর ও গ্রীস টলে পড়েছে। ভারতবর্ষেও কোন রাজবংশ দু'চার পুরুষের বেশী টেকেনি। ইংরেজের বেলায় ব্যতিক্রম ; কারণ ইংরেজ ভারতের জলহাওয়া ও ধাত—কোনটাই স্বীকার করেনি। সে নাতিশীতোষ্ণ, মধ্যপন্থী—ধীরে-সুস্থে চলাই তার অভ্যেস। সে তুলনায় ফরাসীরা আমাদের মতো চরমপন্থী। তবু য়ুরোপের কোন দেশই অসাম্যের আতিশয্য সহ্য করে না। সময় থাকতে প্রতিকার করে। সেদিক থেকে সোশ্যালিস্ট মুভ্‌মেণ্ট প্রায় প্রতি শতাব্দীতে হয়েছে। য়ুরোপের ধনীরা পৃথিবীকে দোহন করে যে-ধন ঘরে আনছে, শ্রমিকেরাও তার সমান বখরা চায়।

আমাদের দেশের বৈরাগ্যাভিমানীরা চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। তারা কোনদিন ধনীদের ধনভার এবং দরিদ্রদের দারিদ্র্যভার লাঘবের চেষ্টা করে নি। তাই ভারতের প্রাসাদে ও কুটিরে স্বর্গ-পাতালের ব্যবধান থেকে গেছে। ভারতের রাজা-মহারাজারা যে-চালে থাকেন, য়ুরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন ; আর, ভারতের চাষী-মজুররা যে-চালে থাকে, য়ুরোপের ভিখিরিদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন।

য়ুরোপের রাজপ্রাসাদগুলি পুরুষ ও নারীর দুঃখ-সুখের নীড়। ইংরেজ স্ত্রী বিবাহকালে একটি স্বাধীন গুহা প্রত্যাশা করে, যেখানে সে সিংহীর মতো শাসন করবে এবং সেখানে তার স্বামী পর্যন্ত তার অতিথি। স্বামীর এলাকা গুহার বাইরে, ভেতরে স্ত্রীর এলাকায় তার অনধিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ। ভৃত্যের বহাল-বরখাস্ত, বাজার করা, পোশাক-আসবাব-গয়নার দোকানে কেনাকাটা, ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাতায়াত, পার্টিতে নাচ ইত্যাদিতে স্ত্রীর বিজয়-বৈজয়ন্তী। কিন্তু আপিস আর ক্লাব ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না।

কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে। মেয়েরা ঘর করবে কাকে নিয়ে? ছেলেরা তো সারাজীবন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ফলে, মেয়েরা আজ বলছে, ঘরের দায়িত্ব তোমরা যখন গ্রহণ করছো না, তখন আমরাও তা স্বীকার করবো না, আমরাও তোমাদের মতো মুক্ত হবো।

আমাদের মোগল বাদশাদের সামাজিক অস্তিত্ব ছিল না। রাজপ্রাসাদ অপ্সরাপুরী হয়েও তা দুঃখ-সুখের নীড় হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের রাজারাও সমাজের আইনকানুনের ঊর্ধ্বে—সমাজহীন। কিন্তু য়ুরোপের রাজারা ছিলেন সামাজিক মানুষ। রাজা এবং প্রজা পোপের নির্দেশে চালিত হয়েছে। তবে পোপেরা ঘুষ খেয়ে অনেক সময় ছাড়পত্র লিখে দিতেন। কিন্তু সামাজিক বিবেক তার বিরুদ্ধে চিরদিন বিদ্রোহ করেছে।

আসবাবপত্রের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। য়ুরোপের সর্বত্র আসবাব-শিল্পের বিপ্লব চলেছে। গত মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। কাজেই, এই দুই শ্রেণীর জন্যে অল্প দামে মজবুত বাড়ি ও আসবাব দরকার। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরলবসতি, নিরলংকার। যারা বস্তিতে থাকতো, তাদের রুচিবোধ খুব সূক্ষ্ম নয়; কাজেই, তাদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত রুচিকে মেলাতে হচ্ছে।

১৫

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ইংলণ্ড অত্যন্ত আঁটসাঁট ও ছোট দেশ। সে তুলনায় ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, তার আকাশও বিরাট। ইংলণ্ডে মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ এবং কুয়াশার প্রাচীর। এই আকাশহীন দ্বীপে কোন আন্তর্জাতিক আন্দোলন টেঁকেনি। যেমন চার্চ অব্ ইংলণ্ড নিজস্ব খ্রীস্টধর্ম এবং লেবার পার্টি নিজস্ব সমাজতন্ত্র সৃষ্টি করেছে। ইংলণ্ড যে দিন দিন সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠছে, তার বোর্ডিং-স্কুল-নার্সিংহোম, হাসপাতাল-পাব্লিক লাইব্রেরীই প্রমাণ। এইগুলি জনগণের চাঁদায় চলে। সমাজের অলিখিত নিয়মে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং-স্কুলে দেয়, রুগ্‌ণ ছেলেকে হাসপাতালে রাখে। সাবধানী পিতামাতার স্বল্প-সহোদরবিশিষ্ট সন্তানেরা বোর্ডিং-স্কুলে একান্নবর্তী পরিবারের দান-প্রতিদান-কলহ-মিলনের শিক্ষা পায় না। মেয়েরা তারপর জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে ছটফট করতে থাকে; স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা। বিবাহের সৌভাগ্য ঘটলেও নিভৃত জীবনে মন বসে না; সে চায় অভ্যস্ত ব্যস্ততা, খাটুনি, নাচ এবং সন্তান ও স্বামী সম্পর্কে ঔদাসীন্য। তারা নার্স, শিক্ষয়িত্রী, হোটেলের ম্যানেজারেস্ বা আপিসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হিসেবে একেবারে আদর্শ। গৃহহীন, স্নেহহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যে অটল, এই স্বতন্ত্রা নারী সমস্ত পুরুষের সহকর্মিণী, কোন একজনের রানী বা দাসী নয়—সকলের সম্মানের পাত্রী, কোন একজনের প্রেম বা ঘৃণার পাত্রী নয়। সচিব, সখী ও শিষ্যারূপে এরা পুরুষের শ্রদ্ধার পাত্রী। ইংরেজ নারী চিরদিনই

স্বাধীন-মনস্ক, শক্তিকামী। এইজন্যে বিবাহ ব্যাপারটা এ দেশে দুটি স্বাধীন মানুষের মধ্যে চুক্তিমাত্র। নারীত্বের কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শ এদেশের নারীদের সামনে ধরা হয়নি। আর, আমাদের দেশে সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারী জাতকে আমরা সীতা-সাবিত্রীর জাত বানিয়েছি, নারীত্বের অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি কোন মনোযোগ নেই। এদের সাজসজ্জা রূপকথার সিণ্ডারেলার মতো। পুরুষের প্রেমের চেয়ে তার শ্রদ্ধাই এদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতা।

১৬

আবার সোনার সূর্য উঠেছে, দশদিক সোনা হয়ে গেছে। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম, নিষ্পত্র গাছগুলো ফুলের ভারে ভেঙে পড়ছে, মেঠো ফুলের বাহারে চারদিক বর্ণময়। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরাও দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরলো। রং, রূপ, গান—একসঙ্গে এতগুলো আনন্দের আয়োজন! এমন দিনে একমাত্র অভাব বাণীর অভাব—প্রকাশের ক্ষমতার অভাব। আদিম মানবের মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে। সেইজন্যে সব মানুষের মধ্যে কবিই শ্রেষ্ঠ। কবিকে কাছে রাখলে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে।

শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন। আর, আমরা বসন্তকালে ভালোবাসার সীমা খুঁজতে বেরোই। কখনো ফুলের গন্ধে দিশেহারা হই, কোন শহর থেকে কোন গ্রামে গিয়ে পৌছাই, কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন বেড়া টপ্‌কাই, কোন গাছের তলায় শুয়ে কোকিলের গান শুনি, কোন চেরির গুচ্ছ চুরি করে প্রিয়জনকে সাজাই, অচেনা শিশুর গায়ে চকোলেটের ঢিল ছুঁড়ে ভাব করি।

ইংলণ্ড বন্ধুরগাত্রী—অযুত-সমতল। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংলণ্ডে বর্ষা। কিন্তু জল দাঁড়াবার মতো সমতল কোথাও নেই। ইংরেজের মন যে আইন-শৃঙ্খলার জন্যে ব্যাকুল, তার কারণ সে তলে তলে ইংলণ্ডের মাটির মতো আইন-শৃঙ্খলাহীন—অযুত-সমতল। ইংরেজ-সমাজও যুগে যুগে তেমনি সাম্যের চেষ্টা করে এসেছে, পায়নি। স্নবারি ইংরেজ-সমাজের মজ্জাগত। ওপর-তল না হলে তার সামাজিক রথ চলতে পারে না। অথচ মন চায় সাম্য। আসলে, ওরা চায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা লাভের চেষ্টা যেন কোনদিন ক্ষান্ত না হয়। সমস্যা সমাধানের ঊর্ধ্বে যে স্তর, সেখানে এরা কোনদিনই উঠতে পারবে না।

ইংলণ্ডেরও নাকি এককালে বারোমাসে তেরো পার্বণ ছিল। এখন প্রতিরাত্রে পার্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়। কোটি কোটি নরনারীর চিত্ত-বিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা-অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় করে চলে। পরিণামে ক্লান্তি এবং বিরক্তি অনিবার্য। এই একঘেয়েমি ও রুটিনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে যুদ্ধ। অকস্মাতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে সেখানেই। আর, বেশী সংঘবদ্ধতাকে প্রকৃতি সহ্য করতে পারে না।

বৌদ্ধ সংঘ টেকেনি, খ্রীস্টান সংঘও বেশীদিন টেকেনি। অন্নবস্ত্রের জন্যে যে সোশ্যালিজমের সংঘ, তারও উপসংহার আছে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বংশধর ইংরেজদের প্রকৃতি-প্রীতি এখনো লোপ পায়নি। বৃক্ষরোপণের জন্যে সমিতি আছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপান্ত রচিত হচ্ছে। পল্লীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আন্দোলন বহুপূর্বেই সূচিত হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিবিশারদেরা তাকে আমল দেন না। তারা বড় বড় কল-মালিকদের তাঁবেদার অথবা শ্রমিক-সর্দার। দু'দলের স্বার্থই পাকা সড়ক, নতুন বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকার-সমস্যা দূর করতে এঁরা সমস্ত ইংলণ্ডকেই একদিন একটামাত্র শহরে পরিণত করবে, যার লোকেরা নিজেদের এককণা খাদ্যও নিজেরা উৎপাদন করেনা। সোশ্যালিস্টরা শহরে শ্রমিকদের ভোটের ওপর নির্ভর করে, গ্রাম্য কৃষকদের জন্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। অন্যান্য দলের একটা কৃষি-নীতি আছে বটে, কিন্তু রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের কাছে দূরদর্শিতা আশা করা বৃথা।

আজ আমেরিকার নৌবহর ইংলণ্ডের নৌবহরকে ছাড়িয়ে গেছে, ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলো পর হয়ে যাচ্ছে, তার অধীন দেশগুলি স্বাধীন হয়ে উঠছে, অন্তর্বিবাদে ধনোৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ইংলণ্ড বেহিসেবীর মতো একহাতে অর্জন করেছে, অন্যহাতে উড়িয়ে দিয়েছে। একদিন সে যাদের ক্রীতদাস করেছে, অন্যদিন তাদের মুক্ত করে দিয়েছে। যেদিন সে আমেরিকাকে হারিয়েছে, সেইদিন ভারতবর্ষকে পেয়ে গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ডের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে। যে ইংলণ্ডের প্রাণ ছিল বিপদ্‌প্রেমিক, সে আজ হয়েছে নিরাপত্তাপ্রেমিক। সে যা অর্জন করেছে, তা এখন নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। যার ক্ষমতা নেই, তার ধনভোগেরও অধিকার নেই। ধনকে মানুষ পরম কাম্য মনে করে কোটিপতি হয়ে দেখে যে, আর একজন দ্বি-কোটিপতি হয়ে গেছে। ইংলণ্ডেরও হয়েছে সেই অবস্থা। সে আজ দেখছে, আমেরিকা তার চেয়ে বড়ো শক্তি হয়ে উঠেছে। এখন তাই সে ভারতবর্ষের মতো বলতে শুরু করেছে, 'আমি গরীব, বড় গোবেচারা।' এখন তাকে হয় ভারতের মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে বড় হতে হবে, নয় আমেরিকার মতো ঐশ্বর্যে ধনী হতে হবে। অস্তিত্ব জাহির করার জন্যে তাকে যে-কোন ভাবে ধনী হতে হবে।

১৭

গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড। মেঘ-কুয়াশার কপাট যেই খুললো, অমনি দেখা দিল সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক—আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ এত কাছে, কিন্তু হাত বাড়ানো শক্ত। কারণ হাত যে মাটি আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত।

এমন মধুর গ্রীষ্মকালে কি করে য়ুরোপের যুদ্ধপ্রবৃত্তি আসে? আকাশের রহস্যঘন অপার বিস্ময়, পক্ষী-কাকলি, কুসুম-পর্যাপ্তি নিয়ে যে অম্লান-যৌবনা ইংলণ্ড, তার মূলে

আছে সূর্যের করুণা। সূর্যালোকিত এমন দিনে বেড়ানোই সর্বাপেক্ষা সুখের। ফলপাতা-শাকসব্‌জির হাট, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া টাট্টু, ঘোড়ার গাড়ি, গাধার গাড়ি, তাদের গাড়োয়ান কিংবা হাটের কাছে অপেরা হাউসে ভিড়—এসব চোখে পড়ে। বোঝা যায়, থিয়েটার যেমন ফ্রান্সের ধমনী, ইংলণ্ডের ধমনী তেমনি ক্রিকেট খেলার মাঠ, তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

কাছেই হাইকোর্ট—ভারতবর্ষের হাইকোর্টের চেয়ে ছোট ও জনবিরল। যুদ্ধজাহাজ ছাড়া ইংলণ্ডে দর্শনীয় তেমন কিছুই নেই। লণ্ডনের অর্ধেকের বেশী লোক অকথ্য বস্তির বাসিন্দা, মেফেয়ারের অদূরেই ওয়েস্টমিন্‌স্টারের বস্তি। পার্লামেন্টের প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। মেফেয়ারও আমাদের মালাবার হিল থেকে নিকৃষ্ট। ব্যাঙ্ক-পাড়া কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের দোসর। টেমস্ নদীর চেয়ে সিন্ধুপ্রদেশের জলের নালাগুলোও বড়। লণ্ডনের বাগানগুলোর তেমন কোন আকর্ষণীয় সৌন্দর্য নেই। উত্তর ভারতের যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর মসজিদ বা দক্ষিণ ভারতের যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির ইংলণ্ডের ক্যাথিড্রালগুলোকে হার মানায়। আর, রাজবাড়ির তুলনা? ভারতবর্ষের যে-কোন সামন্ত রাজাই একটি চতুর্দশ লুই। সেই তুলনায় পঞ্চম জর্জ একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জায়গা ইংলণ্ড নয়। সিনেমা দেখা, বিদ্যার্জন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে সারা পৃথিবী পড়ে আছে। তবু ভারতীয়দের বেশী করে ইংলণ্ডে আসা উচিত। ভারতের যে গুণগুলি আছে, ইংলণ্ডের তা নেই; আবার, ইংলণ্ডের যে গুণগুলি আছে, তা ভারতের নেই। ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া অনেকটা ভারতের সগোত্র। কিন্তু ইংলণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বের করে দেয়। ইংলণ্ড খোঁজায়, ভারত খোঁজার শেষ বলে দেয়। ইংলণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি গৃহস্থ,—সে শোকার্তা ক্রৌঞ্চীকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামী-বর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সে-ই তার স্নেহের অতিথি। একের বিপদ্‌স্পৃহা অন্যের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে অন্বিত হওয়াই বুঝি বিধাতার অভিপ্রায়।

ফ্রান্স যদি ভারতবর্ষের হাত ধরতো, ভারতবর্ষের চরিত্রের পূর্ণতা কোনদিনই সম্ভব হতো না। ফ্রান্স যেদেশে গেছে, তাকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, তাদের অধিবাসীদের স্বাধীন এবং ফরাসীতে রূপান্তরিত করেছে। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরাও ফ্রান্সের সেনাপতি হয়ে কোনদিন নেপোলিয়নের মতো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বা সম্রাটও হতে পারতুম। ফরাসীরা অনেকটা মুসলমানদের মতো। পৃথিবীর যেখানে গেছে, নামটুকু ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। আমরা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা পেতুম; কিন্তু কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবার কথা ভাবতে পারতুম না। আমাদের কোন বৈশিষ্ট্যই স্বীকৃতি পেত না। হিন্দু-মুসলমান আইনের বদলে পেতুম কোড্ নেপোলিয়ন। আমাদের ভারতীয়ত্বের বদলে ফরাসীত্ব পেতুম।

ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষগুণ মোটামুটি আমাদের মতোই। ফরাসীরা গৃহপ্রিয়—

বড় জোর আফ্রিকা পর্যন্ত ওদের গতিবিধি। গৃহপ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে বিবাদ ও সন্ধি করে কাছাকাছি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভায় যতগুলি চেয়ার, ততগুলি দল। ফ্রান্সে যতজন লেখক, ততগুলি পত্রিকা; যতগুলি পত্রিকা, ততগুলি দল। ফ্রান্স পরিবার-প্রধান দেশ। কিন্তু ইংরেজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। বৃহৎ পার্টির একজন না হলে তাকে সরে যেতে হবে, যেমন শেলিকে ইতালিতে চলে যেতে হয়েছিল।

ইংলণ্ডের চরিত্রের আর একটি গুণ, তার ঘন ঘন পরিবর্তনশীলতা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ যেন দুই স্বতন্ত্র জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সামাজিক উত্থানপতনের ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে ঘটে গেছে এক ধীর লয়ের বিপ্লব। ইংলণ্ড সবাইকে একই গদিতে বসাবে বলেই কাউকে দীর্ঘদিন গদিয়ান হতে দেয় না। অভিজাতেরা স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির মানসে অতিরিক্ত জন্ম-শাসন করে, বংশলোপ হয়। উচ্চ-মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসনের সাহায্যে নিজেদের সংখ্যা-হ্রাস করছে এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তরা একই উপায়ে হয়ে উঠছে উচ্চ-মধ্যবিত্ত। শ্রমিকেরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত। গলস্ওয়ার্দির মতে, এটাই বিবর্তনমূলক পদ্ধতি এবং তা ইংরেজদের একটা বিরাট অধিকার। এইভাবে ইংলণ্ড প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবর্তনের সাহায্যে বিপ্লবকে ঠেকিয়েছে।

ইংরেজমাত্রই কোন-না-কোন বিষয়ে বিদ্রোহী। পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অজুহাতে ইংলণ্ডে সার্কাস নেই। খরগোস-শিকার, পাখি-শিকার, খুনীকে প্রাণদণ্ড দেওয়াও নিষ্ঠুরতা। এ সব বন্ধ করার জন্যে পার্লামেণ্টে আবেদন চলছে। প্রত্যেক ইংরেজ তাই মৃত্যুকালে এইভাবে সান্ত্বনা পায় যে, সে কিছু-না-কিছু ঘটিয়েছে।

১৮

নিঃশব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। মাসখানেক আগে এখানে-ওখানে বক্তৃতা চলছিল, ঘরে ঘরে নির্বাচন-প্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুলছিল, কাগজে কাগজে বাক্যবাণ বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু যেই মন্ত্রীদল গঠন করুক, রাষ্ট্র যেমন চলছিল, তেমনি চলে। কোথাও কোন পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয় না। অথচ দল জিতলে সমর্থকরা আনন্দ করে।

ইংরেজ শ্রমিকেরা খুবই শিষ্ট। তারা কখনো হল্লা দাঙ্গা করে শান্তিভঙ্গ করে না। ট্রেড ইউনিয়ন ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব স্বীকৃত হওয়ার পর তারাই সবচেয়ে আইন-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনাস্থা যদি কেউ দেখায় তো তারা বড়লোক। তবে মোটের ওপর ইংরেজ জাতি অত্যন্ত আইন-বশ। পুলিশকে বাধা না দিয়ে এরা পুলিশকে সাহায্য করে। অন্যদিকে, পুলিশের ওপর খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিশও যথেষ্ট ভদ্র। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংলণ্ডে অপরাধের মাত্রা কমে আসছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতার বিচারের জন্যে আদালতের অনেক সময় কেটে যায়। কোন আইন অযৌক্তিক বিবেচিত হলে মানুষ আইন ভাঙতে শুরু করে।

তখন আইনভঙ্গ করাটা প্রশ্রয় পায়। তার আগেই ওরা তেমন অযৌক্তিক আইন বদলে ফেলে।

ভারতীয় চরিত্রের মূলকথা যেমন সমন্বয়, ইংরেজ-চরিত্রের মূলকথা তেমনি বিনিময়। ইংরেজকে নেপোলিয়ন দোকানদার বলে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন, তার মর্ম—ইংরেজরা বিনিময়শীল। সেইজন্যে স্বামীস্ত্রীর দুই উপার্জন—দুই তহবিল। যার যেটুকু যোগ্যতা, টাকা দিয়ে তার পরিমাপ হবে।

ইংরেজ যতগুলো দেশকে শাসন করেছে, শোষণ করেছে, তাদের একসূত্রে বেঁধেছে। লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ যতদিন না আন্তর্জাতিক ঘটকালির দায়িত্ব নেয়, ততদিন ইংরেজ জাতি তা করে যাবে। ইংরেজী ভাষাও ক্রমশঃ সার্বভৌম ভাষা হয়ে উঠেছে। লণ্ডন এখন বিশ্বের ভাষা-শিক্ষার রাজধানী, নিউইয়র্ক বাণিজ্য-রাজধানী, যন্ত্রশিল্প-রাজধানী বার্লিন, প্যারিস আমোদ-প্রমোদের রাজধানী এবং জেনেভা রাজনীতির রাজধানী।

বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো—এক দেশের অভিজ্ঞতা অন্য দেশে পৌঁছিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ইজিপ্টের। তবে ঘরছাড়া ইংরেজের আমাদের মতো কোমল-বৃত্তিগুলি নেই। কোলের ছেলেকে সে ভারতবর্ষ কিংবা হংকং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়, বয়স্ক ছেলের সঙ্গে বিয়ের পর এক শহরে থেকেও কদাচিৎ দেখা করে। আর, আমাদের মামা-মামী, মাসী-মেসো, কাকা-কাকী ও পিসে-পিসীতে বৃহৎ ঘর-সংসার জম-জমাট।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, প্রেমের কবিতা ইংরেজী ভাষায় যত রকমের এবং যত গভীর, অন্য কোন ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোন বাঙালী কবি কোনো দিন এমন সর্বস্ব পণ করে ভালোবাসেননি, প্রেমের কবিতাও লেখেন নি। গদ্য-কবিদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজরা প্রেম কথাটির সংজ্ঞা কি, জানে না। ফরাসীরা প্রেম নিয়ে মুখর হলেও প্রেম ওদের মস্তিষ্কজাত ও বচনবহুল।

১৯

য়ুরোপের পাতাঝরা শরৎকাল। শরৎ আমাদের দেশে শীতের অগ্রদূত নয়, আমাদের দেশে শরৎ স্বাধীন। কিন্তু এদের শরৎ যৌবনের শেষের দিকে প্রথম পাকা চুলটির মতো অনাহূত আগন্তুক—দুর্বাসার মতো আতঙ্কের পাত্র।

ইংলণ্ড থেকে গ্যয়টে-শিলার-বাখ-এর বনরাজিনীলা থুরিঙ্গিয়ায় এলেন লেখক। অঞ্চলটিতে গ্রামে গ্রামে কারখানার চিমনি। তবু এখানে প্রাচীন ভারতের তপোবনের মতো আকাশের উদার ব্যাপ্তি রয়েছে। এখানকার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে স্বাদু।

গ্যয়টের যুগে থুরিঙ্গিয়া ছিল আরো বন্য, আরো বিজন। তাঁর কর্মস্থল ভাইমার ছিল অরণ্যপল্লী, পাশে একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী। তাঁর বাগানবাড়িটি ছিল অরণ্যের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র কুটির। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে তিনি সেখানেই

প্রস্থান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও তিনি ছিলেন মুক্ত পুরুষ—অন্ততঃ মুমুক্ষু পুরুষ। তিনি শুধু নাগরিকই ছিলেন না, আরণ্যকও ছিলেন। গ্যয়টের মধ্যে দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সমন্বয়। মনের মধ্যে তাঁর সত্য-অসত্যের চলতো অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবু তিনি ছিলেন সকল দ্বন্দ্বের অতীত। আসলে, তিনি স্রষ্টা বা বিদ্রোহী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিশ্বরূপদ্রষ্টা। গ্যয়টের প্রতিকৃতিতে তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠযুগে তাঁর চক্ষুর সংকল্পেরই অভিব্যক্তি।

বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানীই করেছে। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। সে ঐ জার্মানী। তাই ইংরেজ-ফরাসীরা যখন বড় বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলো, জার্মানরা তখন দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন, সংগীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেনজোলার্নরা তাদের ধ্যান ভাঙিয়ে দিল, বিসমার্ক তাদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। অথচ জার্মানরা স্বভাবতঃ যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। বিংশ শতাব্দীর জার্মানীর মার্জিত মন যন্ত্রশিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পে জার্মানীর উন্নতি যেমন অদ্ভুত, তেমনি কিম্ভূত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিশ হলে যা হয়। বার্লিন হচ্ছে একটা রাক্ষুসে শহর। তার প্রাণ আছে ; কিন্তু হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রাজ্ঞান নেই।

বার্লিনের পেছনে নেই দীর্ঘকালের ইতিহাস, অনভিজাত সে। ওর সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বের স্মৃতি জড়িয়ে নেই, আছে দস্যুতার স্মৃতি। হোহেনজোলার্নরা শহরটাকে পিটিয়ে মজবুত করেছে। বার্লিন সবে স্বাধীন হয়ে আমেরিকান হয়ে ওঠার জন্যে স্বপ্ন দেখছে।

লাইপৎসীগ সংগীতের রাজধানী—সুপ্রাচীন, সুপরিকল্পিত। লাইপৎসীগ মুদ্রণ-শিল্পেরও রাজধানী।

সুশ্রী ড্রেসডেন কতকটা ভিয়েনার মতো। তার লাবণ্য লালিত্যে রূপান্তরিত। এখানে রাজা গিয়ে রিপাবলিক এসেছে, রিপাবলিক গিয়ে কমিউন আসবে। কিন্তু যৌতুক রূপে যে নিধি একদিন ইতালি থেকে ড্রেসডেনে এসেছিল, সেই মহাশিল্পী রাফেলকে পৃথিবী শুদ্ধ মানুষ বাঁচিয়ে রাখবে। তাঁর গতিহিল্লোলময়ী ম্যাডোনার বসনের যেন খসখস শব্দ শোনা যায়। তরুণী মা তাঁর দুরন্ত শিশুকে কোল থেকে নামতে দিচ্ছেন না, তাঁর চাউনিতে ভয়। দেবতা এখানে মানুষ হয়েছেন।

ড্রেসডেন থেকে এলবে নদী ধরে প্রাগে যাবার পথটি অতুলনীয়। চেকোস্লোভাকিয়া ওরফে বোহেমিয়া পর্বত-বন্ধুর, যদিও প্রাগ অঞ্চলটি সমতল। কিন্তু প্রাগ যেমন কালের সঙ্গে তাল রেখে ছুটে চলেছে ; মনে হয়, অচিরেই সে আমেরিকান কলেবর ধারণ করবে। চেকরা দীর্ঘকাল নাবালক থাকার পর অল্পদিন আগে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। তাদের অতীত বড় নয়, তাই তাদের মন ভবিষ্যতের ওপর বেশী নির্ভরশীল। এই কয়েক বছরে তারা বৈষয়িক উন্নতি তো করেছেই, শিক্ষায়-দীক্ষায় য়ুরোপকে নতুন আদর্শ দিয়েছে, নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে। চেকদের রক্ত নতুন। তাদের মনের জমিতে অষ্ট্রিয়ান জার্মানরা ভাবের পলিমাটি বিছিয়ে উর্বর করে গেছে।

স্থনবার্গ স্থন্দর। পুরাতন স্থনবার্গের সীমানার বাইরে নতুন স্থনবার্গ তার অসংখ্য কারখানায় ষ্টীম এঞ্জিন, মোটর গাড়ি, খেলার পুতুল তৈরী করছে। পুরাতন স্থনবার্গে এলে মনে হয় দুর্গপ্রাচীর, তোরণ, গম্বুজ, পরিখাময় প্রাচীন শতাব্দী যেন এসে পড়েছে। স্থনবার্গ যন্ত্রশিল্পের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

হল্যাণ্ড আমাদের যে-কোন একটি বড় জেলার চেয়ে বড় নয়। তবু বহু সহস্র ক্রোশ দূরে তার সাম্রাজ্য আছে। তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব হল্যাণ্ড সমুদ্রকে পিছু হটিয়েছে। সমুদ্র হল্যাণ্ডের বেগার খাটছে কবে থেকে। ওলন্দাজ তার বেশীর ভাগ জমি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে। হল্যাণ্ড এখন বিশ্ব-শান্তি পঞ্চায়েতের চণ্ডীমণ্ডপ। দি হেগ শুধু হল্যাণ্ডের রাজধানী নয়, আন্তর্জাতিক রাজধানীগুলির অন্যতম। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্স্ যেন প্যারিসের শহরতলী। যেটুকু প্রাচীন সেটুকুই ব্রাসেল্সের বিশেষত্ব।

২০

অক্টোবর মাসে যখন ইংলণ্ডে অষ্টপ্রহর বৃষ্টি এবং শীত, ইতালির আকাশ তখন নির্মেঘ, নীল—সূর্যকরোজ্জ্বল। আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইতালি অনেকটা ভারতবর্ষের মতো। নারীরা মুখের কমনীয়তায়, কেশে ও বেশে ভারতীয় নারীর মতোই। ভারতের মতোই এখানে ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী, চর ও চোরের প্রাচুর্য। মাটি ও মেঘ ভারতের মতোই রঙীন। এখানে কোথাও দিগন্তপ্রসারী সমতল শস্যক্ষেত্র, তিন হাজার বছরের পুরাতন জমি, তার ওপর দিয়ে কত যুগ-যুগান্তরের সৈনিক জয়যাত্রায় গেছে, তার নীচে প্রোথিত হয়েছে কত নগরী; কোথাও ভগ্ন ক্রীড়াস্থলী, ভগ্নাবশিষ্ট স্নানাগার, ভাঙা মঠ, ভাঙা গির্জা। সেদিকে নজর না দিয়ে এখন ইতালি হাল্কা সুর ভাঁজছে। লক্ষ লক্ষ প্রস্তরমূর্তি দিয়ে যেখানে সারা দেশ জুড়ে একটা মিউজিয়াম বানানো যায়, সেখানে এরা নির্বিকার। বিদেশীরা তা নিয়ে গিয়ে স্বদেশে মিউজিয়াম বানাচ্ছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইতালির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্যও রয়েছে। কিন্তু তার ফ্যাসিস্ট সংঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বংশে জন্মেছে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। চার্চ যদি বহির্মুখীন না হতো, ইতালি গত সহস্র বছরে বহুধা-বিভক্ত হতো না, ফ্যাসিস্ট সংঘও প্রতিষ্ঠা করতো না। ইতালীয় চরিত্র বাঙালী চরিত্রের মতো। ওরা অভিনয়ের পোশাক পরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের চুল ছাঁটা, টেরিকাটা, ঝুলপি, ভুরু—সবই অভিনয়ের মেক্-আপ। অতিকথন দোষ ওদের মজ্জাগত। বিশ্ববিজয় তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না, তা তারা মনেপ্রাণে জানে। তবু ওকথা থিয়েটারী ঢঙে না বলতে পারলে ওরা নিজেদের কাপুরুষ জ্ঞান করে।

আধুনিক ইতালীয় চরিত্রে প্রাচীন রোমক চরিত্রের আদল নেই। মাৎসিনি,

গারিবল্ডি, ক্রোচে ও ছুজের ইতালিও নানা গুণে ভূষিত। একটা বৃহৎ আদর্শবাদ ইতালির চরিত্রে নিহিত আছে। তারই শক্তিতে সে বিশ্ব-সভায় আসন করে নিচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় ঢক্কানিনাদের প্রাবল্যই বেশী। তবু দান্তে, পেত্রার্কা মিকেলাঞ্জেলোর ইতালি অমর। তার একই মানুষ পাথরের মূর্তি নির্মাণ করেছে, প্রাচীরগাত্রে ছবি এঁকেছে, শব-ব্যবচ্ছেদ করে শারীরতত্ত্ব চর্চা করেছে এবং নগররক্ষী সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে নির্বাসিত হয়ে নানা সংকটের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের প্রেমকাহিনী যেমন বিচিত্র ও বীরত্বপূর্ণ, তেমনি করুণ—মর্মস্পর্শী।

মধ্যযুগের ইতালি ছিল ধর্মপ্রাণ। কিন্তু তার ধর্মপ্রাণতা ছিল সংকীর্ণ। রোমক যুগের সরল উন্নত নিরীশ্বর মন্দিরগুলিকে ভেঙে তাদের পাথর খুলে নিয়ে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। তাও দু' একটি বাদ দিলে রোমের বাকী ক্যাথিড্রালগুলি জাঁকজমকের ভারে দৃষ্টিকটু। তবে ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল তস্করের নয়, শিল্পীর কীর্তি। মিলনের ক্যাথিড্রাল বিরাট, গম্ভীর, বহুশীর্ষ, বহুমুখ। ভেনিসের ক্যাথিড্রাল সাড়ম্বর, প্রাচ্যভাবাপন্ন।

ভেনিস ভাবীকালের জন্যে শ্রদ্ধেয় কিছু রেখে যেতে পারেনি। তবু চন্দ্রালোকিত ভেনিসের খালে খালে গন্দোলায় আন্দোলিত হয়ে আনন্দ আছে, দুর্গন্ধের ভয়ে যদিও শ্বাসরোধ হয়ে আসে। যৌবনকালে ভেনিস কেমন রঙ্গিনী ছিল, তা অনুমান করা যায় তার সুসজ্জিত গন্দোলায় নৃত্যগীতের আয়োজন আর গন্দোলা-প্রতিযোগিতা থেকে। গন্দোলায় এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাবার মধ্যে একটা আনন্দ আছে।

ফ্লোরেন্স এখনো বেঁচে আছে। জার্মানীর লুণ্ঠনের ভয়ে মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা প্যারিস থেকে মোনালিসা ও ভিনাস ডি মাইলোকে দক্ষিণ ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলে।

রোম চিরন্তন শহর। অনেকগুলি পাহাড় তিন হাজার বছর ধরে তাকে পাহারা দিচ্ছে। তার দিগ্বিজয়ের বার্তা নিয়ে দূত এসেছে, দিগ্বিজয়ী বীরকে নিয়ে নগরী বিজয়োৎসবে মত্ত হয়েছে। একদল বিজেতা এলো কয়েকটি খ্রীস্টান দাস নিয়ে। বাঘ-সিংহদের সামনে ছেড়ে দিয়ে রোম তাদের মরণ-তামাশা দেখলো। ক্রমে একদিন সম্রাট হলেন খ্রীস্টান, রাষ্ট্র হলো খ্রীস্টান। রাজগুরুই হলেন রোমের মালিক। রোমকে কেন্দ্র করে তাঁর দূতেরা সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়লো, সব দেশের রাজা-প্রজা খ্রীস্টান হয়ে গেল। রোমের পর্বত-প্রহরীরা দেখলো সেই নতুন দিগ্বিজয়ের উৎসব। তারপর উচ্চাভিলাষীরা পোপ হবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলো। ধ্যানী ও প্রেমিকের ইতালি নেপোলিয়নের নিষ্ঠুর হাতে ও কাভুরের চতুর মস্তিষ্কে মূর্তিমতী হলো। মাঝখানে মুসোলিনির কাণ্ডটাই ইতালিকে স্বধর্মচ্যুত করেছে। কিন্তু মাৎসিনির মানসী চিরকাল ভাবলোকে থাকবেন না—সেই অসম্পূর্ণ মূর্তি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হবে।

য়ুরোপ থেকে বিদায়ের দিন নিকটবর্তী হলো। চোখের পাতা আর্দ্র হয়ে আসে। আবার যদি লেখক আসেন, তবে দেখবেন, সে য়ুরোপ নেই। পদে পদে য়ুরোপ পরিবর্তনশীল।

মাটি যে কত বড় আশ্রয়স্থল, সমুদ্রে ভাসমান না হলে তা হৃদয়ঙ্গম হয় না। কূলে বসে সমুদ্রকে দেখে আপ্লুত হওয়া যায়, কিন্তু দিনের পর দিন যখন নয়দিকে সমুদ্র এবং দশম দিকে সমুদ্র দিগ্বলয়িত আকাশ দেখতে হয়, তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। সঙ্গে লোকজন থাকলে ভরসা থাকে। বাইরে যত বড় বিপদ হাঁ করে থাকুক, ভেতরে তাস খেলার বিরাম নেই। কখনো নাচ চলছে, কখনো বাজি রেখে নকল ঘোড়দৌড়।

য়ুরোপের অধিকার ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে শেষ হলে ভারতবর্ষের কথা মনে পড়তে থাকে। লেখক প্রেমসূত্রে য়ুরোপকে চিনলেও জন্মসূত্রে ভারতীয়। সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহলের উর্ধ্বে যে ভারতবর্ষ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর সামনে সুন্দরী য়ুরোপ নূপুর বাজাচ্ছে। কিন্তু পার্বতীর মতো তপশ্চারিণী না হলে কে তাঁর ধ্যান ভাঙাবে? আসল কথা, য়ুরোপকে ভারতবর্ষের যোগ্য হতে হবে। তা নইলে সে বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে বাঁধতে ও বিচার করতে থাকবে।

বম্বেতে নেমে মারাঠা কুলিদের কর্ম-কোলাহল, গাছতলায় মানুষ গোরু ও ছাগলে মিলে একত্র বিশ্রাম-সুখ, মাটিতে বসে হিন্দু নাপিতের ক্ষৌরকর্ম, মাথায় বিরাট বোঝা ও বগলে শিশু নিয়ে মারাঠা মেয়ের দৃপ্ত চলা, গুজরাটী মেয়ের সলজ্জ ললিত-গতি সুন্দর লাগে লেখকের।

ভারতবর্ষে ফিরলেন লেখক। দু'বছরে ভারতবর্ষ নবীন তাঁর কাছে। তার সঙ্গে সতর্কভাবে মিতালি করতে হবে। পুরাতন বন্ধুরা তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন না দেখে নিরাশ হলেন।

বিলেত-ফেরতরা কয়েক বছর ও কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান ভুলতে না পেরে নিজেরা স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় বা আড্ডা রচনা করে। কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় য়ুরোপ। মাঝখানে কত দেশ পড়ে রইলো। অথচ দুটো দেশ পরস্পরের হাত ধরলো। বিলেত-ফেরতরা দু'দেশেরই নুন খেয়েছেন। নিন্দা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-অবজ্ঞার উর্ধ্বে উঠে এঁদের উচিত—উভয় মহাদেশকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে তোলা।

দেশের প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর। মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই। বিশেষ করে য়ুরোপে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। য়ুরোপ তাহলে মহামানবের মানস-সরোবর। সাগরে যেমন সব নদী মিলিত হয়, মানস-সরোবর থেকে তেমনি সব নদী নির্গত হয়। য়ুরোপের মানস থেকে যুগে যুগে কত ভাবধারা নিঃসৃত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে। পৃথিবী তো য়ুরোপেরই দান, য়ুরোপেরই আবিষ্কার। য়ুরোপই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার অস্তিত্ব পৃথিবীকে জানিয়েছে। পৃথিবীর আকার, গতি ও অবস্থান—এসবও তো য়ুরোপের আবিষ্কার। য়ুরোপের সত্য ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে, ভারতবর্ষের সত্য য়ুরোপকে। তবেই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মহামিলনের লগ্ন আসবেই ॥

[১৯২৭-২৯]

আদর্শ প্রশ্ন : উত্তরসহ

●এক. 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীতে লেখক ভারতবাসী ও ইংরেজদের জীবন ও চরিত্রে যে সব বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, তার পরিচয় দাও।

উ. মা. '৭৮

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হলো লণ্ডন শহর। লণ্ডনকে কেন্দ্র করে লেখক য়ুরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। দেশ-ভ্রমণই এই ভ্রমণ-কাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য নয়; প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন, জাতীয় চরিত্রের ওপর তাদের প্রতিফলন, সেই সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশ, জীবনধারা ও সমাজাদর্শের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্যও এই গ্রন্থের আলোচনার লক্ষ্যবস্তু। আবার, যেহেতু তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী লণ্ডন শহরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, তাই ইংরেজ-চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখক অধিকতর মনঃ-সংযোগ করেছেন। কিন্তু লেখকের জীবনে এবং তাঁর চরিত্রে ভারতীয়তার উপস্থিতি জন্মগত। তাই ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারার সঙ্গে ইংলণ্ডের সমাজ ও জীবনধারার বৈপরীত্য অতি-স্বাভাবিক কারণেই আলোচিত হয়েছে।

ইংলণ্ডে প্রত্যেক ঋতুই অংশতঃ বর্ষাঋতু। তাই প্রকৃতির রমণীয়তা কিংবা তার প্রসন্ন রূপ মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। উজ্জ্বল প্রভাত, পরিচ্ছন্ন আকাশ, মৃদুমন্দ বাতাস বা ঋতুগত পুষ্প-পর্যাপ্তি কোন সুপ্রসন্ন রমণীয় দিনের বার্তা বহন করে আনে না। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো ছুটে আসে কালো মেঘের দল, শুরু হয়ে যায় বিরক্তিকর বৃষ্টি। এইভাবে নিত্য অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিটাই যায় বদলে। তাই ইংরেজরা প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ মনে করে। প্রতিপক্ষকে হার মানানোই ইংলণ্ডের সাধনা। সেই সাধনার নাম বিজ্ঞান-সাধনা। ইংলণ্ড প্রকৃতির থেকে যা পায়, তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা; আর, আমরা ভারতীয়রা যা পাই, তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির দক্ষিণ হস্তের অঞ্জলিভরা দান। তাই আমাদের দেশে ভিক্ষা ধর্মীয় অঙ্গ। ভিক্ষা আমাদের উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন; আমাদের দেবতা শিব স্বয়ং ভিখারী। তাই সারা দেশে পুরুষকারের এত অভাব। কিন্তু ইংলণ্ড তার জীবন এবং সমাজকে গঠন করেছে পুরুষকারকে সম্বল করেই।

প্রত্যেক ইংরেজই কোন-না-কোন বিষয়ে বিদ্রোহী। পশুক্লেশ-নিবারণে কিংবা প্রাণদণ্ড-বিলোপে তার চরিত্রের এই দিকটি প্রতিফলিত। ইংলণ্ডের চরিত্রের আর একটি গুণ তার ঘন ঘন পরিবর্তনশীলতা। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার মধ্যস্থতায় সে বিপ্লবকে প্রতিরোধ করেছে। এমনিতে ইংলণ্ড বন্ধুর-গাত্রী—অযুত-সমতল। ইংরেজ জাতির মন যে আইনশৃঙ্খলার জন্যে ব্যাকুল, তার কারণ সে তলে তলে ইংলণ্ডের মাটির মতো আইন-শৃঙ্খলাহীন। উন্নাসিকতা ও উন্নত রুচিবোধ ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত। এমনকি, ইংরেজ শ্রমিকেরাও খুবই শিষ্ট। ইংরেজ জাতি

আইন-শৃঙ্খলার অত্যন্ত বশবর্তী। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করে কিংবা সংশোধন করে ইংরেজ জাতি সর্বপ্রকার আইনভঙ্গকে প্রতিরোধ করে। আসলে, ইংরেজরা সৈনিক-নাবিকের জাত—প্রয়োজন ছাড়া কিছু জানে না। শৈশব থেকেই এরা ড্রিল করতে অভ্যস্ত। এরা তাই সারি বেঁধে গির্জায় যায়, ইস্কুল থেকে ফেরে, চালে-চলনে, উঠতে-বসতে ড্রিল। বাড়িগুলোও একই রঙের ইউনিফর্ম পরে যেন ড্রিলের অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

লণ্ডন শহরে রেস্তোরাঁ আছে কয়েক লক্ষ। সময় ও ব্যয়-সংক্ষেপই রেস্তোরাঁ-নির্ভরতার প্রধান কারণ। এদেশে গৃহস্থালি মেয়েদের কাজ নয়। মেয়েরা স্কুলে-কলেজে যায়, আপিসে যায়। মায়েরাও আপিসে যায়, বাচ্চাদের হাওয়া খেতে নিয়ে যায়, সময় পেলেই জামা সেলাই করে, সভা-সমিতি খুলে বসে যায়। হাইড পার্কে গেলেই বোঝা যায়, এদেশে কত সভা-সমিতি আছে। ধর্মসম্প্রদায় রাজনীতির দলের সংখ্যাও অজস্র। হাইড পার্কে চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দেয় অনেক বক্তা। কেউ টিটকারি দেয়, কেউ শ্রোতা ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে উল্‌টো বক্তৃতা শোনায়। কিন্তু বক্তার মেজাজ তরুর চেয়েও সহিষ্ণু, মেরুর মতো অটল। আসলে, এরা কাজের মানুষ। তাই ভিখিরিরা বাজনা বা গান শুনিয়ে বা কিছু বিক্রির ভান করে হাত পাতে।

জামাকাপড়ের দোকানের যে বাহুল্য, তার মূলে আছে শৈত্যের আধিক্য। এদেশে ভিখিরিকেও গায়ে ওভারকোট ও পায়ে বুটজুতো পরতে হয়। নয়তো পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। মেয়েদের গায়ে গয়নার রিক্ততা বসনের বাহার দিয়ে পূরণ করা হয়। এখানেও প্রয়োজনের জয়-জয়কার। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ বলে এদেশে খাটপালঙ্ক, পুরু বিছানা ও লেপকম্বলের ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সোফা কোচ চেয়ার টেবিল ও ঘর-গরম-রাখার অগ্নিস্থলী চাই। গরীব ঘরেও এসব দরকার। বাড়ির ঝি-র জন্যেও ওসব চাই। তাই এদেশে আসবাবের দোকানের এত প্রাচুর্য। বাড়ির ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে। এদেশে ঝিয়েরাও এক-একজন ভদ্রমহিলা। গণতন্ত্র এদেশের অন্ত্যজকেও কুলীন করেছে।

তারপর আসে সেলুনের সংখ্যাধিক্যের কথা। মেয়েরাও পুরুষদের মতো চুল ছোট করে ছাঁটে, অথবা ববরি রাখে। চুল ছেঁটে মেয়েরা নাকি সোয়াস্তি পায়। এখানেও সেই প্রয়োজনের জয়, সৌন্দর্য কোণঠাসা। সব শেষে ব্যাঙ্কের কথা। ইংরেজরা খুব হিসেবী জাত। যেমন স্ফূর্তি করে, তেমনি করে পরিশ্রম। যত ব্যয় করে, সঞ্চয় করে তার চেয়ে বেশী। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের শাখা। ব্যাঙ্ক থাকায় বাড়ির ঝিয়ের টাকাও দেশবিদেশে খেটে সুদ ঘরে আনতে পারে।

অন্যদিকে, ভারতের ব্রত হলো ত্যাগ ; আর, ইংলণ্ডের মানুষের ব্রত হলো ভোগ। জীবনটাকে ভোগ করার জন্যে তার বিচিত্র আয়োজন। এমনকি, ইস্টারের ছুটিতেও

দেখা যাবে ইংলণ্ডের ভোগের চেহারা। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, ইংরেজদের তেমনি হলি-ডে হ্যাবিট।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার, তেমনি পরিপাটি। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার [চিমনি-স্থইপ] যে বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির বাইরে আছে বেল্, তার কাঁচের জানালার ওপাশে ধবধবে পর্দা, ঘরে অল্পবিস্তর আসবাব। আমরা ভারতীয়রা পরলোকের আকর্ষণে ইহলোকের বাসাকে এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি। যে-দেহে বাস করি, তাকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে বাস করি, তাকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। কিন্তু ইংরেজরা মরেও ইহলোককে ছাড়তে চায় না, কফিনের ভেতরে শুয়ে মাটি আঁকড়ে থাকে।

ইংলণ্ডের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পরিপাট্যের মূলে আছে এদেশের নারীশক্তির সক্রিয়তা। ইংলণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রানী। শাশুড়ী-জাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে। সেইজন্যে সে ঘরটির ঝাড়ামোছা-ঘসা-মাজাতে সব সময় ব্যস্ত। ইংলণ্ডের ছেলেরা যে 'হোম' পায়, তার একদিকে বাবা, অন্যদিকে মা ; মাঝখানে ছোটবড় ভাইবোনগুলি।

ইংলণ্ডের গৃহিণীদের ব্রত গৃহের শৃঙ্খলাবিধান এবং পারিপাট্যসাধন। আমাদের গৃহিণীদের রন্ধনপর্ব সুদীর্ঘ। কিন্তু গ্যাসের উনুনে ওদেশে দরিদ্রতম গৃহিণীও আধঘণ্টায় একবেলার রান্না চুকিয়ে ফেলে। গ্রামে প্রত্যেকেরই বাগান আছে। তাতে বাড়ির মেয়েরা কাজ করে, ছেলেরা ব্যস্ত বাইরের কাজে। অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসে যায়। এদেশের মেয়েরা উপার্জনে এবং সঞ্চয়ে পটু। এরা বাগানে পর্যটকদের চা খাইয়ে, ফার্ম হাউসে পেয়িং গেস্ট রেখে সংসারের আয় বাড়ায়। মেয়েরা সাইকেলে চড়ে বাজারে যায়, ছেলেরা চড়ে মোটর-সাইকেলে।

ইংলণ্ডের যুবকরা জানে, যে-কোন দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে। যুবতীরাও পণ করেছে, তারা কাঁদবে না। সেইজন্যে সবার এত দেহের দিকে নজর। সারা য়ুরোপের লোকের স্বাস্থ্য এবং আয়ু বেড়ে চলেছে।

ইংলণ্ডের কাছে পৃথিবীটা এখন ছোট ; প্রায় সবাই পথিক, কেউ গৃহস্থ হতে চায় না। বিদেশের কোথাও ব্যবসা বা চাকরির স্বপ্নে ওদের মন সব সময় বিভোর। শনিবার হলে চলো লণ্ডন ছেড়ে পারী, ওখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো সোমবারে। পরের শনিবার চলো বেলজিয়ামে কিংবা হল্যাণ্ডে। সাতদিনের ছুটিতে জার্মানী কিংবা সুইট্জারলণ্ড, তিন সপ্তাহের ছুটিতে নিউইয়র্ক কিংবা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। দেড় মাসের ছুটিতে সাউথ আফ্রিকা কিংবা ইণ্ডিয়া। ছ' মাসের ছুটিতে বিশ্বভ্রমণ।

ইংলণ্ডে এখন নরনারীর কেবল সখা-সখী সম্পর্কের সূচনা হয়েছে। এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে স্ত্রীর ঘুরে বেড়ানোতে সমাজের পক্ষে ক্ষতি। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ অনিবার্য হয়ে পড়ছে এবং পরিবার-প্রথা ভেঙে পড়ছে দ্রুত।

আমাদের দেশে ক্ষত্রিয়-সমাজের মধ্যেই ছিল সামরিক সংস্কার। য়ুরোপের আবালবৃদ্ধবনিতা যুদ্ধে বিশ্বাসী। শুধু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে খ্রীস্টধর্ম। য়ুরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল। য়ুরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। অথচ সেই য়ুরোপের নিজস্ব ধর্মীয় অভিব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখলো খ্রীস্টধর্ম। চার্চ ও স্টেট ইংলণ্ডের সমাজের এ-পিঠ ও-পিঠ। চার্চ শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সংঘ। ভারতে বৌদ্ধ যুগের পর আর সংঘ নেই। কেশবচন্দ্র যে আধুনিক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম ব্রাহ্মসমাজ। হিন্দুধর্মের কোন সংঘ ছিল না। এদেশে যে-কেউ বাস করতো, সে-ই ছিল হিন্দু। এদেশ সবাইকে ঘরে টানে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বের করে দেয়। ইংলণ্ড খোঁজায়, ভারত খোঁজার শেষ বলে দেয়। ইংলণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি গৃহস্থ। সে শোকার্তা ক্রৌঞ্চীকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামী-বর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সে-ই তার স্নেহের অতিথি। তাই য়ুরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। য়ুরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব, শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি; আর আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব, মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। আমাদের সাহায্যে য়ুরোপ যদি নিজের রিলিজন্ নিজে সৃষ্টি করে, য়ুরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজন্‌গুলি শোধিত করে নিই, তবে দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম॥

●দুই· রম্যাঁ রলাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করে তাঁর সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর ও মণীন্দ্রলালের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর। এই সাক্ষাৎকারে রলাঁর মানবধর্মের কোন্ কোন্ দিকগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে, তার পরিচয় দাও।

উ. মা. '৭৮

বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিক, মহামনীষী রম্যাঁ রলাঁ। জন্মসূত্রে ছিলেন ফরাসী; কিন্তু শিল্প ও চিন্তাসূত্রে ছিলেন বিশ্বমানবের ঘনিষ্ঠ সহোদর। মানুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধে, শিল্পীয় সার্বজনীনতায় এবং উদার বিশ্বমানবিকতায় তিনি ছিলেন ঋষি টলস্টয়ের সগোত্র শিল্পী। একদিকে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল সমাজচেতনা এবং অন্যদিকে প্রাচ্যের দার্শনিক অধ্যাত্মবোধ—এই দুই বিপরীত ভাবধারার অন্বয় সমাহার মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই মহামনীষীর জীবনে। ভারতের জীবনদর্শন ও তার অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতি রলাঁর ছিল এক অকৃত্রিম মমত্বপূর্ণ আগ্রহ এবং সুগভীর সম্ভ্রমবোধ, যার উজ্জ্বল ফলশ্রুতি—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চরিত এবং ভারতবর্ষ'। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর সঙ্গেও এই বিশ্বদরদী চিন্তানায়কের ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং 'জাঁ ক্রিস্তফ' [নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত] ও 'ল্য অমা শাঁতে'র মতো বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাসের লেখক রম্যাঁ রলাঁর প্রতি ভারতীয় লেখকদের আগ্রহ এবং শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'পথে-প্রবাসে'র লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় একদা-খ্যাত 'পদ্মরাগ' ও 'রমলা' উপন্যাসের স্রষ্টা মণীন্দ্রলাল বসুর সাহচর্যে চললেন একালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও বিশ্বপ্রেমিক মহামনীষী রম্যা রল্ঁার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের মনোরম শৈলাবাস। একদিকে নীলহ্রদ, অন্যদিকে ক্রমোন্নত শৈলমালা। হ্রদের কূলে কূলে, শৈলমালার মূলে মূলে পল্লীর পর পল্লী। রলাঁর পল্লীর নাম 'ভিল্নভ' আর তাঁর কুটিরের নাম 'ভিলা অলগা'। কাছেই Chateau de Chillon. এই দুর্গে Bonnivard-কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, বায়রনের কাব্যে বর্ণনা আছে তার। এর কারাকক্ষটির জানালা দিয়ে দেখা যায় কেবল জল আর আকাশ। আসল মানুষটিকে এরা কতটুকু বন্দী করে রাখতে পেরেছিল? ভিলা অলগার পাশেই হোটেল বায়রন। রল্ঁার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি ছিলেন এখানেই।

রল্ঁার কুটিরটি রল্ঁারই প্রতিরূপ—বাহিরটা জরাজীর্ণ, ভেতরটা সাজানো। রল্ঁা মানুষটির দীর্ঘ দেহ, ন্যুব্জ পৃষ্ঠ, প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শানিত নাসা, শীর্ণ কপোল, সংকীর্ণ চিবুক, দুচোখে ক্লান্তি, উল্টো-করে-ধরা ন্যাসপাতি ফলের মতো বেদনার্ত মুখে করুণ সরল হাসি! সারা মুখে নিষ্পাপ হরিণ-শিশুর নিরীহতা। সাদাসিদে পোশাক, নীলকৃষ্ণ স্যুট, টাই নেই, পাদ্রীসুলভ কলার। আজন্ম এক হাতে তিনি লড়াই করেছেন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অন্য হাতে লড়াই করেছেন অসত্যের বিরুদ্ধে। মণীন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মরাগ', শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এবং দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ভারতীয় সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি। মধ্য যুগের য়ুরোপীয় ধর্ম-সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ার ফলে উভয় সংগীতের ধারার মধ্যে এসেছে সুদূর ছাড়াছাড়ি। আধুনিক য়ুরোপ ভারতীয় সংগীতে আকৃষ্ট হবে কিনা, কে জানে? কিন্তু যুদ্ধের সম্ভাবনার কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। সেই উত্তেজনা প্রকাশ পেল তাঁর আবেগদীপ্ত চেহারায় এবং উত্তেজিত বাক্‌ভঙ্গিতে। গত মহাযুদ্ধের গভীর ক্ষত তিনি তাঁর হৃদয়ে বহন করে চলেছেন। তাঁর বিশ্বাস, যুদ্ধের পরিণাম কখনোই শুভ হতে পারে না। নেশনরা যতদিন ঠকে না-শিখছে যে, এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, ততদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ থাকবে। এর প্রতিরোধ হলো শিক্ষা—এই হলো তাঁর সুচিন্তিত অভিমত। পৃথিবীর মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে করে তুলতে হবে আলোকিত। শ্রেয়োবোধের আলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যুদ্ধের সকল সম্ভাবনা। তবে তিনি মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মায় বিশ্বাসী। কোনটা করে আত্মার পূজা, কোনটা করে সমাজের সেবা। আর্টিস্ট শুধু সৌন্দর্য-সৃষ্টি নিয়েই থাকবেন না, তিনি ভালোর সপক্ষে এবং মন্দের বিপক্ষে ভল্‌তেয়ার ও জোলার মতো মসীযুদ্ধ চালাবেন। কিন্তু রল্ঁা আর্টকে আর্ট এবং প্রোপাগাণ্ডাকে প্রোপাগাণ্ডা বলেন। তাঁর মতে, টাকার জন্যে বই লেখা উচিত নয়। সবারই কিছু কিছু কায়িক শ্রম করা উচিত।

গান্ধীর সর্বভারতীয় মিলনসূত্র যেমন চরকা, রল্যাঁর সর্বমানবিক মিলন-সূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবসূত্রটি টলস্টয়ের সুরে বাঁধা।

তাঁর মতে, এটা হচ্ছে শূদ্র-বিদ্রোহের যুগ। আজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রীকরণ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যার হাতে বীণা-তুলি, তার হাতে কাস্তে-হাতুড়ি দিলে সৃষ্টির স্বাধীনতা, স্রষ্টার স্বাধীনতা থাকে না। এটা রল্যাঁর ধারণা নয়, লেখকের ধারণা। তাঁর মতে, অন্নবস্ত্রের জন্যে সার্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্বমানবের যে একীকরণ, সে-মন্ত্রের উদ্গাতা যদি রল্যাঁ-গান্ধী-টলস্টয়ও হন, তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

রল্যাঁ বলেন, অর্থের জন্যে অন্য পরিশ্রম, কিন্তু আনন্দের জন্যে গ্রন্থ-রচনা। যৌবনে তিনি দারিদ্র্যের দায়ে শিক্ষকতা করেছেন, স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টার্জিত স্বল্প-পরিমিত অর্থে সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেন নি। তবু সমাজের শ্রেণী-বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কায়িক শ্রম করা উচিত। শিল্পী যেহেতু একজন ব্যক্তি, তাঁরও কায়িক শ্রম করা কর্তব্য। শিল্পীর সম্পূর্ণটা শিল্পী নয়, কিছুটা মানুষ। কাজেই, মানুষের দুঃখ-মোচনের জন্যে তার তুলি-লেখনীকে হাতিয়ার করে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত।

রঁলার মতে, জনসাধারণের সুখদুঃখের কথা থাকে না বলে এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না। আর্টের শেষ বিচারক জনগণের আদালত। অবশ্য, একথা কখনও তিনি বলেন নি যে, জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। খাঁটি আর্ট নিম্নতম অধিকারীরও হৃদয় স্পর্শ করবে। তবে অসুস্থমনা সাহিত্যিকের সাহিত্যকে সাহিত্য বলা অনুচিত। সুস্থমনা সাহিত্যিকের সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে, তার জন্যে সাহিত্যিককে দায়ী করা ঠিক হবে না। সেজন্যে ভিক্তার উগোর মতো জনসাধারণের কবিকে সমাজের প্রয়োজন। যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু শিব, তা থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে, তবে আর্টিস্টের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। আসল কথা হলো, খাঁটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—শেক্স্পীয়রের নাটক। তার রসোপলব্ধির জন্যে বৈদগ্ধ্যের প্রয়োজন থাকতে পারে, তবে জনসাধারণের সহজ রসবোধও শেক্স্পীয়রের সৃষ্টির অন্তরলোক স্পর্শ করতে সক্ষম।

এই প্রতিবেদন রল্যাঁর বক্তব্যের প্রতিলিপি নয়, তাঁর বক্তব্যের ভাবছায়া মাত্র। এই সাক্ষাৎকারের আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণীন্দ্রলাল বসু ও রল্যাঁর মধ্যে। অন্নদাশঙ্করের ফরাসী ভাষায় অজ্ঞতা এবং রল্যাঁর ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞতার জন্যে 'পথে-প্রবাসে'র লেখককে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে মণীন্দ্রলাল বসু ও রল্যাঁর কন্যা ম্যাদলীন রল্যাঁর ওপর।

সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার কল্পমূর্তির বাস্তব রূপ মিলিয়ে দেখার কৌতূহল পাঠকমনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। জ্যাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর আলোকচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে লেখক যে কল্পমূর্তি গড়েছিলেন, তাঁকে দেখে তা ভেঙে গেলেও তাঁকে ভালোবাসার

পথে কোন বাধা থাকে নি। দেহে-মনে সুসমঞ্জস্ ব্যক্তিত্ব ছিল স্রষ্টা ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের, তা গান্ধী বা রলাঁর ছিল না। তাঁদের মনের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁদের দেহ, অন্তরের তপস্যাকে ঢেকে ফেলেছে সর্বাঙ্গের ত্যাগের বিভূতি। ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত সেই বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্বকে ভালো না বেসে পারা যায় না॥

●তিন. অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থে ফরাসী জাতির চরিত্র ও তাদের সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে পরিস্ফুট কর।

ফ্রান্স য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং পারী বিশ্বের ভ্রমণ-বিলাসীদের কাছে তীর্থভূমি—'স্বপ্নের মায়াপুরী'। আরব্য রজনীর বোগ্‌দাদের মতো সেও যেন 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' ইতিহাস-বিশ্রুত এই মহানগরীর চোখে লেগে আছে কত শতাব্দীর স্বপ্নের মায়া-অঞ্জন। দু'হাজার বছর তার বয়স, তবু তার চুল পাকে নি, বার্ধক্য তাকে স্পর্শ করেনি। তাকে কেন্দ্র করে কতবার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, কতবার তার পথে পথে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটেছে। কত ত্যাগী, ভোগী, কর্মী তাকে মানুষের অমরাবতীতে পরিণত করেছে। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, নাট্যকলায়, সুগন্ধি-শিল্পে, পরিচ্ছদকলায়, স্থাপত্য ও বাস্তুকলায় সে এখনো সভ্যজগতের শীর্ষে। বিশ্বের টুরিস্টরা পারীতে এসে ভীড় করে। অন্যদিকে, পারী বিশ্বের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, অন্নদাত্রী। জাতিবিদ্বেষ তার নেই। সে নিগ্রোকেও শ্বেতসেনার নায়ক করে, বিদ্যার্থীকে দেয় বিদ্যা, কর্মপ্রার্থীকে দেয় কর্ম।

প্রাসাদপুরী পারী আয়তনে ও লোকসংখ্যায় লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক ; কিন্তু য়ুরোপের সংস্কৃতি-পীঠ। ট্রাম, মেট্রো, বাস, ট্যাক্সি, ধোঁয়া, কাদা, বস্তি, ব্যারাক ইত্যাদি বিষয়ে লণ্ডনের সঙ্গে আছে তার নিকট সাদৃশ্য। তবে লণ্ডনের মতো তার কাঞ্চন-কৌলীন্য নেই, নেই বেশবাসের পারিপাট্য, উন্নাসিক আভিজাত্যও নেই ; তবে আছে সাংস্কৃতিক কৌলীন্য। সেদিক থেকে সে ভারতের কাশী কিংবা কামরূপ। পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদী, নদী-মধ্যস্থ স্বপ্নময় দ্বীপটি এবং নগরীর দুই প্রান্তের অনন্যসুন্দর, মনোরম প্রমোদোদ্যান দুটি।

সৌন্দর্যময়ী পারীর রাজপথগুলি খুব প্রশস্ত। এক-একটা দশটা চৌরঙ্গীর মতো—যেন একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথের সমাহার, ইন্দ্রধনুর সাতভাগের মতো ফুটপাত, রাস্তা, গাছের সারি, ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, আবার গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, আবার রাস্তা, তারপর ফুটপাত। ফুটপাতে মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান।

ফরাসী-ইতালিয়ানদের সঙ্গে ভারতীয়দের কতকগুলি প্রকৃতিগত মিল আছে। ওরাও বিশ্রামপ্রিয়, প্রচণ্ড আড্ডাবাজ—আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ফরাসী মেয়েরা খুব পরিশ্রমী। মেয়েরা ও শিশুরা খুব পোশাকপ্রিয়। পুরুষদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলী গোঁফ। সম্ভবতঃ সেইজন্যেই পারী

সুগন্ধী-শিল্পের পীঠস্থান। রঞ্জন-শিল্পেও পারীর স্থান সর্বোচ্চে। ওরা খুব ভোজনরসিক। রন্ধন-শিল্পেও পারীর স্থান সবার ওপরে। এত সস্তায় এত বেশী খাবার লণ্ডনে পাওয়া যায় না। সব দেশের খাদ্যের কিছু নমুনা সব রেস্তোরাঁয়ই থাকে।

ফরাসীরা পান-রসিকও বটে। পারীর গলিতে গলিতে অন্ততঃ পঞ্চাশটা কাফে। এই কাফেগুলি থেকেই ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। কাফেই ফরাসীদের আড্ডাখানা, চণ্ডীমণ্ডপ এবং ক্লাব। এই কাফেগুলিই ফরাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর। এই কাফে জিনিসটি ফরাসী সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরী হয়েছে। এক পেয়ালা কাফী বা শোকোলা নিয়ে তাস খেলা, দাবা খেলা থেকে লেখাপড়া পর্যন্ত করেও চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখান থেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্, শ্রেষ্ঠ কর্মবীর, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয়েছে। ফরাসী জাতির যেমন খাটুনির সীমা নেই; তেমনি কুঁড়েমিরও অন্ত নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজ্‌লিসী রসিকতা আর মজলিসী আদব-কায়দা। কাফেগুলিও খুব সস্তা। পাতিসেরী রুটির দোকানে কেক কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া যায়। খেতে খেতে দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে ওরা দেশকে চিনতে শেখে, বিদেশের মানুষকে চিনতে চিনতে বিদেশকে চিনতে শেখে। ফরাসীরা ইংরেজদের মতো নীরব-প্রকৃতি নয়, গম্ভীর-প্রকৃতিও নয়; বরং বাচাল, বকে এবং বকায়।

পারীর লোক জন্ম-রসিক। আমোদ-প্রমোদের জন্যে এমন অকৃপণ ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও নেই। পথে-ঘাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভ কৌতুক। পারীতে অন্ততঃ বিশটি উঁচুদরের থিয়েটার আছে। তাছাড়া আছে সিনেমা, কাবারে ও সংগীতশালা। কাবারেগুলি পারীর বৈশিষ্ট্য। রুচির ব্যাপারে ফরাসীরা ইংরেজদের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। প্যারীতে আছে দশ-বারোটা মিউজিয়াম। সেই সব মিউজিয়ামের গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাদের দৃষ্টিকে করেছে শিক্ষিত, চিত্তকে করেছে নির্বিক্ষেপ। তারা রুশো-ভলতেয়ার ও জোলা-ফ্লবেয়ারের রচনা পড়ে সুনীতি-দুর্নীতি ও সুরুচি-কুরুচির হিসেব-নিকেশ করে রেখেছে। মানবদেহের সৌন্দর্যকে তারা প্রকাশ বলেই জানে। 'মূলঁ্যা রুজ' বা 'ফোলী বেরজেয়ারে' তারা অর্ধ-বিবসনাদের দেখে কোনরূপ বিচলিত বোধ করে না। তবে পারীর বহু-সংখ্যক প্রমোদাগার মার্কিন মুদ্রার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাস খাটছে। মার্কিন ডলারের আক্রমণে বিশুদ্ধ ফরাসী আর্টের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। তবে আশা করা যায়, ফ্রান্স নীলকণ্ঠের মতো সেই বিষকেও পরিপাক করতে পারবে।

ফরাসীরা আত্মবিপরীত জাতি। তাদের মধ্যে দুই চরম পন্থীর সমন্বয়। ওরা যেমন গোঁড়া ক্যাথলিক, তেমনি গোঁড়া যুক্তিবাদী; যেমন ভাবপ্রবণ, তেমনি নাস্তিক। কিন্তু রসবোধ এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, দক্ষিণ-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে উত্তর-য়ুরোপীয়দের একটা স্পষ্ট পার্থক্য আছে। দক্ষিণ-য়ুরোপীয়রা

দেহবাদী, প্রতিমাপূজক ; এদের দেবতারা সশরীরী আর উত্তর-য়ুরোপীয়রা প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী। উত্তর-য়ুরোপ যেন মুসলমান, দক্ষিণ-য়ুরোপ হিন্দু। উত্তরের তেজ বেশী, দক্ষিণের বেশী লাবণ্য।

পারীর থিয়েটারগুলি খুব সস্তা এবং জ'াকালো। সরকারী সাহায্যে এগুলি পুষ্ট। তাই সস্তায় বহুলোককে এরা থিয়েটার দেখিয়ে আনন্দ দিতে পারে। থিয়েটারগুলির কোনটাতে অপেরা, কোনটাতে শুধু কমেডী, কোনটাতে শুধু ক্লাসিক অভিনীত হয়।

ফরাসীদের আর একটা জাতীয় সম্পদ্ তাদের মিউজিয়ামগুলো। ছোট-বড়ো ডজনখানেক মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভ্রের আকার ও ঐশ্বর্য এত বেশী যে, ওটাই যেন একটা যাদুপাড়া। একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু'দিন লেগে যায়। তাতে গ্রীক ভাস্করের মানসী-মূর্তি Venus de Milo-র জন্যে স্বতন্ত্র একটি ঘর। এখানেই ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের মৌলিক তফাৎ। ভারত জননী-মূর্তিকেই প্রাধান্য দেয়, ওরা দেয় প্রেয়সী-মূর্তিকে। লুভ্র মিউজিয়ামে আছে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-র 'মোনা লিসা'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি আছে এখানে। কিন্তু মোনা লিসার হাসি অবিস্মরণীয়। ফরাসীরা এ সব মূর্তি ও ছবি—সব সাধু উপায়ে সংগ্রহ করেনি। কখনো রাজ্য জয় করে—ধনরত্ন হরণ না করে হরণ করেছে শিল্পসম্ভার।

ফরাসীরা কস্‌মোপলিটান জাতি; অর্থাৎ বিশ্বচেতন। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও ভূগোলের নির্বাচিত নামের নামাবলী পারীর গায়ে জড়ানো। শৈশব থেকেই পথ চলতে গিয়ে ওদের পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল পড়া হয়ে যায়।

ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষগুণ মোটামুটি আমাদের মতোই। ফরাসীরা গৃহপ্রিয়—বড় জোর আফ্রিকা পর্যন্ত তার গতিবিধি। গৃহপ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে বিবাদ ও সন্ধি করে কাছাকাছি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধিসভায় যতগুলি চেয়ার, ততগুলি দল। ফ্রান্সে যতজন লেখক, ততগুলি পত্রিকা ; যতগুলি পত্রিকা, ততগুলি দল। ফ্রান্স পরিবার-প্রধান দেশ। ফরাসী মেয়েরা পোশাক-পরিচ্ছদে অনেকটা মোমের পুতুল—অত্যন্ত শৌখিন। ফরাসীরা প্রেম নিয়ে মুখর হলেও প্রেম ওদের মস্তিষ্কজাত ও বচনবহুল।

বহু শতাব্দী ধরে দেখা যায়, প্রতি প্রজন্মেই ফ্রান্স একবার করে নিঃক্ষত্রিয় হয়। তবু ভস্মের ভেতর থেকেই আগুন জলে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি তার পুরাতন গৌরবকে দেয় ম্লান করে। তাই এই বহু প্রাচীন জাতি বহু দুর্যোগ জয় করে আজও টিকে আছে পৃথিবীতে-মানবজাতিকে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো দেবার জন্যে॥

●চার. 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীতে লেখক জার্মান জাতির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভারতীয়দের সঙ্গে তার যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় কেবল ভ্রমণের নেশায় য়ুরোপ ভ্রমণ করেন নি ; তাঁর অন্তরে ছিল আবিষ্কারের আগ্রহ, ছিল বন্ধুত্বের অনুসন্ধান। সেই আবিষ্কারের আগ্রহ

এবং মানব-মৈত্রীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে য়ুরোপের দেশে-দেশে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-রূপে। তাদের অতীতের গৌরবের প্রতি তিনি যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমনি বর্তমানের আনন্দোচ্ছলতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। কিংবা দৈন্য-দুর্দশায় ব্যথিত হয়েছেন ; আবার, তেমনি ভবিষ্যতের রূপ-কল্পনায় তিনি আশান্বিত কিংবা আশঙ্কিত হয়েছেন।

বসন্ত-ঋতু শাশ্বত যৌবনের মূর্ত প্রতীক। কণ্ঠে তার চির-যৌবনের জয়গান। সেই বসন্তকালেই লেখক যুদ্ধবিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত জার্মানী পরিভ্রমণে গিয়ে সেখানে দুর্মর যৌবনের দুর্বার অভিব্যক্তি দেখে বিস্মিত হলেন। মাত্র কয়েক বছর আগে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সে সর্বস্বান্ত, ঋণগ্রস্ত এবং অংশতঃ পরাধীন হয়েছে। কিন্তু মুখে তার প্রাণোচ্ছল হাসি এবং শরীরে অনবদ্য স্বাস্থ্য। বিজয়ী শত্রুরা তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিলেও তার যৌবন কেড়ে নিতে পারেনি। জার্মানী অফুরন্ত যৌবনে সমৃদ্ধ এক দেশ। তার গ্রামে-গঞ্জে শহরে-শহরে চলেছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অবিশ্রান্ত যৌবন-চর্চা। এই ক্লান্তিহীন যৌবন-সাধনার মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে যে নবীন জার্মানী, তার শরীর লোহের মতো শক্ত, সমর্থ ও ঘাতসহ। নারীরাও আজ এই যৌবন-সাধনায় সর্বতোভাবে পুরুষদের সামিল হয়েছে। জার্মানরা গোঁড়া খ্রীস্টান জাতি। চার্চ নারী-পুরুষের যৌবন-চর্চার বাড়াবাড়িতে আপত্তি করলে ওরা চার্চকে অস্বীকার করতে উদ্যত হয়। ফলে, নীরব থাকতে হয় চার্চকে। কিন্তু নতুন জার্মানী যেভাবে উৎসাহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবন-চর্চা করছে, তাতে, মনে হয়, ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে। পৃথিবীকে জানবার জন্যে জার্মানীর আগ্রহের অন্ত নেই। তার ছোট-বড়ো শহরের মিউজিয়ামগুলোতে পৃথিবীর কোন দেশ বাদ পড়েনি। এমনকি, পৃথিবীর যেখানে যে বই প্রকাশিত হয়, জার্মানী তার অনুবাদ করে পড়ে। জার্মানীর শিক্ষার গুণে এখানকার মানুষ জানতে পারে, পৃথিবীর কোন্ দেশ কতটা উন্নতি করলো।

● জার্মানীর দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় : এক. এখানে গ্রাম ও শহরে কোন বস্তি নেই। মজুরদের বাড়িগুলি মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় উপভোগ্য। জার্মানীর গরীবেরা ইংলণ্ডের গরীবদের চেয়েও অনেক ভালো। জার্মানীর জাতীয় দুর্দশার দিনে তার শক্তির অপচয়কে রক্ষা করেছে তার অন্তর্বিবাদের স্বল্পতা। দুই. জার্মানীর শ্লীলতাবোধ কলকারখানার কদর্যতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কলকারখানা-গুলি যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম ও শহরের চতুঃসীমায় বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাড়ির সঙ্গে বাগান রচনা করার অনুমতি নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক-নিবাসগুলির গড়ন এবং রং সুন্দর। হোটেল-রেস্তোরাঁর দেয়ালে-দেয়ালে আলপনা। শহরের সর্বত্র, এমনকি, বাড়িতে-বাড়িতে জার্মান জাতির সুরুচি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার স্বাক্ষর সুমুদ্রিত। সরকারী অপেরা হাউস ও থিয়েটার রয়েছে প্রতি শহরে। জার্মানীর সবাই গান-বাজনায় যোগ দেয়। জার্মানদের

ফটো-তোলার বাতিকের চেয়ে ছবি-আঁকার ঝোঁক বেশী। অর্থাৎ, অনুকরণের চেয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির দিকে তার আকর্ষণ সমধিক।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দুটি জাতির আছে—আমেরিকান এবং জার্মানদের। আমেরিকানরা বেড়ায় ভেসে-ভেসে; কিন্তু জার্মানরা বেড়ায় পায়ে হেঁটে। কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর রেল-কামরায় চড়ে। তারা বিশ্রাম করতে করতে ছবি আঁকে, চলতে চলতে প্রাণ খুলে গান গায়। ছোট্ট দেশ জার্মানী—উত্তর দিকটা প্রোটেস্টান্ট-প্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিক-প্রধান। তার প্রত্যেকটি জেলাই স্বতন্ত্র; প্রত্যেকের আছে স্বতন্ত্র ইতিহাস, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। সেদিক থেকে জার্মানীকে একটি ছোটখাটো ভারতবর্ষ বলা যায়। জার্মানী আগে ছিল বহুধা-বিভক্ত। যুদ্ধে হেরে জার্মানী এক হয়েছে।

ইংলণ্ড প্রোটেস্টান্ট-প্রধান, ফ্রান্স ক্যাথলিক-প্রধান; কিন্তু জার্মানীতে উভয় সম্প্রদায়ই প্রধান। দক্ষিণ জার্মানীতে যেমন অসংখ্য গির্জা, তেমনি ভেতরে ও বাইরে অসংখ্য মূর্তি ও চিত্র। এখনো লোকে সে সব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল দেয়, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায় ও মনস্কামনা জানায়; এই মূর্তি ও চিত্রগুলি প্রায়ই ক্রুসবিদ্ধ যীশুর বা যীশু-জননী মেরীর। যীশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু বিষয়ে অসংখ্য চিত্রকর ছবি এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সংগীতকার গান রচনা করেছেন। রেনেশাঁসের পর য়ুরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়লো।

জার্মানরা ভয়ানক কাজের মানুষ, সাজসজ্জার বড় একটা ধার ধারে না—সে ব্যাপারে ভোলানাথ। জার্মানীর মেয়েদের মোটা কাপড়ের প্রতি টান। তারা গোরু ও ঘোড়ার গাড়ী হাঁকায়, পিঠে বোঝা বয়ে হাঁটে।

ইংলণ্ড থেকে গ্যয়টে-শিলার-বাখ-এর বনরাজিনীলা থুরিঙ্গিয়ায় এলেন লেখক। অঞ্চলটিতে গ্রামে-গ্রামে কারখানার চিমনি। তবু এখানে রয়েছে প্রাচীন ভারতের তপোবনের মতো আকাশের উদার ব্যাপ্তি। এখানকার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে সুস্বাদু।

বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানীই করেছে। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। সে ঐ জার্মানী। তাই ইংরেজ-ফরাসীরা যখন বড় বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলো, জার্মানরা তখন দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন, সংগীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেনজোলার্নরা তাদের ধ্যান ভাঙিয়ে দিল, বিসমার্ক তাদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। অথচ জার্মানরা স্বভাবতঃ যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। বিংশ শতাব্দীর জার্মানীর মার্জিত মন যন্ত্রশিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পে জার্মানীর উন্নতি যেমন অদ্ভুত, তেমনি কিম্ভূত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিশ হলে যা হয়। বার্লিন হচ্ছে একটা রাক্ষুসে শহর। তার প্রাণ আছে; কিন্তু হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রাজ্ঞান নেই।

বার্লিনের পেছনে নেই দীর্ঘকালের ইতিহাস, অনভিজাত সে। ওর সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বের স্মৃতি নেই, আছে দস্যুতার স্মৃতি। হোহেনজোলার্নরা শহরটাকে পিটিয়ে

মজবুত করেছে। বার্লিন সবে স্বাধীন হয়ে আমেরিকান হয়ে ওঠার জন্যে স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু আমেরিকার মতো ধনৈশ্বর্য-অন্বেষায় জার্মানীর অমরত্ব নেই ; তার অমরত্ব চিত্ত-সমৃদ্ধিতে এবং চিন্তার মৌলিকতায়। ধনৈশ্বর্য নয়, ধ্যানৈশ্বর্যই জার্মানীর প্রকৃত ঐশ্বর্য। গ্যয়টের কল্পনায়, শিলারের দর্শন-ভাবনায়, বাখ্-এর সংগীতে, কান্ট-হেগেল-মার্কসের মনীষায় যে জার্মানীর প্রকাশ, নানা বিপর্যয় ও উত্থান-পতন সত্ত্বেও সে জার্মানীর বিনাশ নেই। সে জার্মানী অবিনশ্বর ॥

অনুসরণী

১. কটক থেকে বম্বে যাবার পথে লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১০০—১০১ পৃ.]

২. বম্বে থেকে লণ্ডন যাত্রাপথে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। [১০১—১০৩ পৃ.]

৩. লেখক লণ্ডন শহরের প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং লণ্ডনবাসীদের জীবনযাত্রার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১৩৩—১৩৬ পৃ.]

৪. লেজঁ৷ কোথায় অবস্থিত ? অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেজঁ৷ ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১০৭—১০৯ পৃ.]

৫. বিশ্ববিখ্যাত লেখক রম্যা রলাঁর সঙ্গে লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকারের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। [১৩৬—১৩৯ পৃ.]

৬. লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্যারী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর [১১০—১১২ পৃ.]

৭. 'আইল অব ওয়াইট' বেড়াতে গিয়ে লেখক ইংলণ্ডের গ্রামীণ জীবনের যে পরিচয় পান, তার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১১২—১১৩ পৃ.]

৮. য়ুরোপের নরনারীর সম্পর্কের কৃত্রিমতার জন্যে লেখক কাকে দায়ী করেছেন ? [১১৪—১১৫ পৃ.]

৯. 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীতে য়ুরোপের ধর্মবিশ্বাসের যে পরিচয় পাও, তা নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ কর। [১১৫—১১৬ পৃ.]

১০. ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের স্বরূপ এবং জাতীয় চরিত্রের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে লেখক যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর। [১১৬—১১৭ পৃ.]

১১. 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীতে লেখক কোন্ যুক্তিতে যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন ? যুদ্ধের বিকল্প হিসাবে তিনি কোন্ অভিযানের সুপারিশ করেছেন ? [১১৭—১১৯ পৃ.]

১২. লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীতে জার্মান জাতির যে বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন, তা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১৪১—১৪৪ পৃ.]

১৩. লেখক যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েনার যে বিবরণ করেছেন, তার পরিচয় দাও। লণ্ডন ও প্যারিস থেকে ভিয়েনা কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বতন্ত্র ? [১২০—১২৩ পৃ.]

১৪. ভারতবর্ষের ধন-বৈষম্য থেকে য়ুরোপের ধন-বৈষম্যের পার্থক্য কোথায় ? এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের রাজারাজড়াদের থেকে য়ুরোপীয় রাজারাজড়াদের পার্থক্য বিষয়ে আলোকপাত কর। [১২২—১২৩ পৃ.]

১৫. ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য কি ? ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রের প্রসার কিভাবে হচ্ছে ? পারিবারিক সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব কতখানি, 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীর অনুসরণে পরিস্ফুট কর। [১২৩—১২৪ পৃ.]

১৬. শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতি ইংলণ্ডের ঐকান্তিক আগ্রহের মূল কারণ কি ? প্রকৃতির সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কের অবনতির কারণ ও পরিণতি কি, 'পথে-প্রবাসে'র অনুসরণে বিবৃত কর। [১২৪—১২৫ পৃ.]

১৭. ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালের সৌন্দর্য বর্ণনা কর। ইংলণ্ডে দর্শনীয় কিছু নেই—একথা লেখক বলেছেন কেন? কেন লেখক ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন? ইংলণ্ড বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখে কি করে? [১২৫—১২৭ পৃ.]

১৮. ইংলণ্ডের আইন-শৃঙ্খলা-প্রীতি, বিনিময়শীলতা এবং ইংরেজ জাতির প্রেমের কবিতার বৈচিত্র্য বিষয়ে লেখকের মতামত ব্যক্ত কর। [১২৭—১২৮ পৃ.]

১৯. জার্মানীর সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল কোথায়? তবু জার্মানীর বর্তমান যন্ত্র-সর্বস্বতার কারণ কি? [১২৯ পৃ.]

২০. গ্যয়টে কে ছিলেন? তাঁর বাসস্থান ছিল কোথায়? লেখক তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সমন্বয় দেখেছেন কেন? [১২৮—১২৯ পৃ.]

২১. লেখকের ড্রেসডেন, প্রাগ, নুনবার্গ, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ভ্রমণের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১২৯—১৩০ পৃ.]

২২. ভারতবর্ষের সহিত ইতালীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক মিল কোথায়? লেখক ইতালিয়ান চরিত্রের সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের কোথায় মিল খুঁজে পেয়েছেন? ইতালিয়ান চরিত্রের সঙ্গে রোমক চরিত্রের মিলই বা কোথায়? [১৩০—১৩১ পৃ.]

২৩. লেখকের ভেনিস এবং রোম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। [১৩১ পৃ.]

২৪. য়ুরোপকে লেখকের 'মহামানবের মানস-সরোবর' বলার সার্থকতা বিচার কর। [১৩২—১৩৩ পৃ.]

২৫. টীকা লিখ: লেসেপ্‌স্ [১০২ পৃ.], রম্যা রলাঁ [১০৯—১১০ পৃ.], গ্যয়টে [১২৮—১২৯ পৃ.], শেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ [১২৫ পৃ.], নেপোলিয়ন [১২৮ পৃ. ও ১২৬ পৃ.], মোনালিসা [১১২ পৃ.], ভেনাস ডি মাইলো [১১২ পৃ.], গন্দোলা [১৪১ পৃ.]।

আরণ্যক

'আরণ্যক' প্রকৃতি-প্রেমিক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি বিশিষ্ট উপন্যাস। উত্তম পুরুষে রচিত এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র—প্রকৃতি—লবটুলিয়া, আজমাবাদ, ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহারের আরণ্য প্রকৃতি। প্রকৃতিই এই উপন্যাসের অপূর্ব রহস্যময়ী, বৈরাগিণী, মোহময়ী নায়িকা। মামুলি উপন্যাসের ঘনপিনদ্ধ, সংহত কাহিনী-বিন্যাস এতে নেই, আছে প্রকৃতির শ্যামল সান্নিধ্যে বিচিত্র, রহস্যময় অনুভূতি, রূপমুগ্ধতা এবং এক অতীন্দ্রিয় দার্শনিকতার অনবদ্য উপস্থাপনা। অথচ, উপন্যাসখানি লেখকের আত্ম-জবানীতে রচিত নিছক দিনলিপিমাত্র নয়; বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অনুভূতির এক অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যের বিশাল প্রান্তরেও আরণ্যকের তুল্য সাহিত্যকর্ম বিরল। ইংরেজ-কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-প্রীতির সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রীতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যের ব্যবধান সুদূর। মহাকবি কালিদাসের সঙ্গেও সাদৃশ্য অতি-সামান্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-তন্ময়তা এবং তাঁর দুরবগাহ অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে 'আরণ্যকে'র আন্তর সাদৃশ্য দুর্লভ নয়। প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপবিলাসের অন্তরালে যে নিগূঢ় প্রাণসত্তা বিরাজমান, তারই সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী বিভূতিভূষণ। অরণ্য-প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মনুষ্যবসতি স্থাপিত হলেও প্রকৃতি তার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে থাকবে সদা-সক্রিয়। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি যেমন কোমল, সুন্দর এবং রুদ্ররূপা; আরণ্যকের মানুষগুলিও তেমনি সহজ, সরল এবং ধূলি-ধূসরিত। তবে প্রকৃতি মুখ্য; মানুষ গৌণ।

'আরণ্যকে'র রচনাকাল ১৯৩৭-১৯৩৯। 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থখানির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এবং লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসখানি "রবীন্দ্রপুরস্কারে' সম্মানিত হয়।

বস্তু-সংক্ষেপ

প্রস্তাবনা

লবটুলিয়া, বইহার এবং আজমাবাদের অরণ্য-ভূভাগ সৌন্দর্যের অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত। সেখানকার রাত্রির অন্ধকারে, জ্যোৎস্নার ধবলতায়, ধূ ধূ ঝাউবন ও কাশবনে, ধূসর শৈলশ্রেণীতে, নীলগাই ও বন্যমহিষের ক্ষুরধ্বনিতে, ফুটন্ত রক্তপলাশ ও বনফুলের শোভায় প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের মন উদাসীন হয়ে ফেরে। মনে পড়ে ভাগ্য-পীড়িতা কুন্তার কথা, সে বুনো কুল সংগ্রহ করে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিনাতিপাত করে।...মনে পড়ে নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার কথা, যাকে নেচে-গেয়ে সংগ্রহ করতে হতো তার পেটের ভাত। মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহু আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ের কথা। কত দরিদ্র বালকবালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখিরির সঙ্গে সেখানে পরিচয় হয়েছিল তাঁর।

সেই সব স্মৃতি শুধু আনন্দেরই নয়, দুঃখেরও। প্রকৃতির সেই স্বচ্ছন্দ লীলাভূমি লেখকের হাতেই বিনষ্ট হয়েছিল। সেজন্যে বনের দেবতারা হয়তো তাঁকে ক্ষমা করবেন না। তবু নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে স্বীকার করলে লঘু হয়ে যায় অপরাধের ভার।

তাই এই কাহিনীর অবতারণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পনেরো-ষোল বছর আগের কথা। বি. এ. পাস করে বেকার সত্যচরণ বসে আছে কলকাতার একটি মেসে। সরস্বতী পূজার দিন মেসে উত্তম আহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেসের ম্যানেজার চাকরকে দিয়ে বাকি টাকার জন্যে সত্যচরণের কাছে তাগাদা পাঠায়। কিন্তু সে নিরুপায়। অগত্যা মেসে উত্তম আহারের আশা ত্যাগ করে তাকে তার শেষ সম্বল দু' টাকা কয়েক আনা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো রাস্তায়।

হঠাৎ রাস্তায় হিন্দু হোস্টেলের বন্ধু সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশ তাকে হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখতে নিয়ে গেল। হোস্টেলের পরিচিত ছেলেদের অনুরোধে সত্যচরণ ওখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে বিকেলের জলসার আসরে যোগ দিল। হিন্দু হোস্টেলের ডিবেটিং ক্লাবের অন্যতম চাঁই অবিনাশের সঙ্গে দেখা হলো তার। অবিনাশ রাতে তাকে তার মেসে পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়।

পরের দিন হ্যারিংটন স্ট্রীটে অবিনাশের বাড়িতে সত্যচরণের নিমন্ত্রণ। ধনী লোকের বাড়ি। অবিনাশ সত্যচরণকে সাদরে আপ্যায়িত করলো। কথায় কথায় সত্যচরণের কাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো। অবিনাশ তাকে তাদের পূর্ণিয়া জেলার জঙ্গল-মহালের বিলি-বন্দোবস্তের কাজের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলো। সত্যচরণ সম্মতি জানিয়ে সপ্তাহ-দুই পরে বি. এন. ডব্লিউ. রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে এসে নামলো। ভয়ানক শীত। ঘোড়ার গাড়িতে সারা রাত ধরে পনেরো-ষোল মাইল পথ চলার পর সকালের সূর্য উঠলো। কেবল ছোটবড়ো বন, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর। লোকবসতি নেই, ক্ষেতখামার নেই, ফসলের আবাদ নেই।

বেলা দশটার সময় কাছারিতে পৌঁছলো সত্যচরণ। জঙ্গলের মধ্যে দশ-পনেরো বিঘে জমি পরিষ্কার করে বনঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া দিয়ে খড়ের ঘর কয়েকটি। কাছেই একটা ঝরনা। এই হলো কাছারি। জনাকীর্ণ কলকাতা থেকে জনহীন এই অরণ্য-প্রদেশে নির্বাসিত জীবন ক্লান্তিকর মনে হয় সত্যচরণের। একমাত্র বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পেয়ে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। গোষ্ঠবাবু এখানকার স্থানীয় লোক-চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান করে দেন তাকে। গোষ্ঠবাবু ম্যালেরিয়ার তাড়নায় সতেরো-আঠারো বছর ধরে দেশত্যাগী। এখন জঙ্গল ছেড়ে কোথাও দু'দিনের বেশী থাকতে পারেন না। অরণ্যের মায়ায় বন্দী হয়ে গেছেন এই বৃদ্ধ। কিন্তু সত্যচরণের মন এই আরণ্যক জীবনকে গ্রহণ করতে পারে না। গোষ্ঠবাবুর বিদায়ের পর দূরে জঙ্গলের মাথায় উদীয়মান চাঁদের পটভূমিকায় আকাবাঁকা বনঝাউর ডালপালা দেখে সত্যচরণের জাপানী চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবির কথা মনে পড়ে যায়। সেই অপরূপ দৃশ্য সত্যচরণকে মুগ্ধ করে।

বনপাহাড়ের নিঃসঙ্গ নির্জনতায় কলকাতার জনাকীর্ণ জীবনের জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে মনে মনে স্থির করে, আর একমাস কাটিয়ে সে অবিনাশকে

লিখে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে। মানুষের সঙ্গ যে তার এত প্রিয়, তা এর আগে তার জানা ছিল না।

দরিদ্র সিপাই মুনেশ্বর সিংয়ের বহুদিনের স্বপ্ন একটি ছ-আনা দামের লোহার কড়া। আরজি রাখলো সে সত্যচরণের কাছে। পরদিন মুনেশ্বর সিংয়ের কড়াইর ব্যবস্থা হয়ে গেলে তার মুখে যে হর্ষোৎফুল্লতা প্রকাশ পেল, তা অবিস্মরণীয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অরণ্যভূমির নির্জন জীবনের সঙ্গে সত্যচরণ কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না। বিকেলের দিকে এক-একদিন সে অনেকদূরে চলে যায়। কাছারির কাছে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কিন্তু সামান্য দূরে গেলেই কাছারির ঘরগুলো দীর্ঘ বনঝাউ আর কাশ-জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। তখন সত্যচরণের নিজেকে এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ একাকী মনে হয়। কিন্তু গাছ-গাছালির মাথায় সূর্যাস্তের রংবাহার, বন্য কুসুম ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ, পাখির কলকাকলি, দূর-প্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর এবং শ্যামল বনভূমির অপরূপ মায়া তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে।

কাছারির ক্রোশখানেক দূরে একটি নাবাল জায়গায় কয়েকটি ক্ষুদ্র ঝরনা। সেখানে বুনো স্পাইডার লিলি তার মৃদু কোমল সুবাস হাওয়ায় ছড়িয়ে দেয়। সেখানে গিয়ে সত্যচরণ মাঝে মাঝে আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জনতা উপভোগ করে আসে।

এখানে সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়া শিখে নিয়েছে। কাছারি থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে সার্ভে পার্টির কাজ হচ্ছে। সত্যচরণ সকালে চা খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে চলে যায়, ফেরে বিকেলে কিংবা সন্ধ্যার অন্ধকারে, কোন-কোনদিন বনকুসুমের গন্ধমদির জ্যোৎস্নার সুবিপুল নির্জনতায়।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে এখানকার জমিগুলি গঙ্গাগর্ভে সিকস্তি হয়ে গিয়েছিল। পুরাতন প্রজারা উৎখাত হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এখন এই সব জমি পুরাতন প্রজাদের না দিয়ে টাকার লোভে নতুন প্রজাদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করাই জমিদারের সংকল্প। কিন্তু জমি বিলি-বন্দোবস্তের গতি বড়ো মন্থর।

এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে আছে লবটুলিয়ার জঙ্গল-মহাল। সেখানে আছে ডিহি কাছারি। গোয়ালারা তাতে গোরু-মহিষ চরায়। আর আছে তিনশো বিঘের একটি কুলবন। লাক্ষাকীট পোষার জন্যে এই কুলবন জমা দেওয়া হয়। বার্ষিক খাজনা আদায় করার জন্যে সেখানে দশটাকা মাইনের একজন পাটোয়ারি আছে। কুলবন ইজারা দেবার জন্যে সত্যচরণ লবটুলিয়ায় এই প্রথম গেল। ছোট্ট একটি খড়ের ঘর। প্রচণ্ড শীত। শীত নিবারণের জন্যে বনের ডালপালায় আগুন জ্বালিয়ে চারদিকে বসার ব্যবস্থা হয়েছে। ম্যানেজারবাবু আসছেন শুনে সাত-আটজন লোক ভাত খেতে পাওয়ার লোভে কাছারিতে এসে বসে আছে। রান্নার পর অনেক রাতে খাওয়া শেষ হলে সত্যচরণ ঘুমোতে গেল আর শীতার্ত লোকগুলো আগুনের ধারে বসে ঢুলতে

লাগলো। হঠাৎ মাঝরাতে কিসের শব্দে সত্যচরণের ঘুম ভেঙে যায়। সে প্রশ্ন করে জানতে পারে, বাঘ কিংবা ভালুকের তাড়া খেয়ে নীল গাইয়ের দল প্রাণের ভয়ে দৌড়াচ্ছে। সত্যচরণ দেখলো, কাছারি-ঘরের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। যাই হোক, একটু পরেই ভোর হয়ে যায়।

জঙ্গল ক্রমশঃ তার মোহিনী মায়ায় সত্যচরণকে বাঁধতে থাকে।

দোল পূর্ণিমার দিন। সিপাহীরা সারাদিন ছুটি নিয়ে ঢোল বাজিয়ে হোলি খেলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যচরণ মাঝরাতে কাজ শেষ করে বাইরে এসে দেখতে পায়, সীমাহীন নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় অরণ্যভূমি প্লাবিত হয়ে গেছে। সেই জ্যোৎস্না-রাত্রির সৌন্দর্য যেন অলৌকিক—অনির্বচনীয়। জ্যোৎস্নারাত্রির এমন অপরূপ রূপ মনে কেমন একটা ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব সঞ্চারিত করে, যা বাংলাদেশের জ্যোৎস্নারাত্রিতে কখনো সম্ভব নয়।

একদিন ডিহি আজমাবাদের সার্ভে-ক্যাম্প থেকে অশ্বপৃষ্ঠে ফেরার সময় সন্ধ্যার মুখে সত্যচরণ বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। দু' ঘণ্টা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেও সে পথ খুঁজে পায় না। নক্ষত্রের সাহায্যেও সে দিক্-নির্ণয় করে উঠতে সক্ষম হলো না। শেষে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখে সে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলো, একটা কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বালিয়ে একটা লোক বসে আছে। লোকটি সত্যচরণকে চিনতে পেরে সসম্মানে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো। লোকটির নাম গনু মাহাতো, জাতে গাঙ্গোতা। চাষবাস ও পশুপালন তার উপজীবিকা। পাঁচটি মহিষ আছে তার। জঙ্গলে সে তাদের চরায়; আর, এক জায়গায় খুপরি বেঁধে বাস করে। ভাত জোটে না। জঙ্গলের বাথুয়া শাকের সঙ্গে নুন দিয়ে খেড়ীর দানার সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটে। ফাল্গুন মাসে গুড়মী ফলই হয় সম্বল। একবার ভাগলপুর শহরে মোটর গাড়ি দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। শহরের প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই। মহিষের দুধ থেকে তৈরী ঘি জমে গেলে ন' মাইল দূরে ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের কাছে বিক্রি করে আসে।

গনুর কাছে সত্যচরণ অরণ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গল্প শোনে। সেগুলি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। শহরের কৃত্রিম পরিবেশে সেই সব কাহিনীকে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু অরণ্যের সেই শ্যামল পরিবেশে গনুর কাহিনীগুলিকে অতি উপাদেয় ও রহস্যময় মনে হতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকালের শুরু। একদিন কাছারি থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় এগারো মাইল দূরে সুংঠিয়া গ্রামের নন্দলাল ওঝা এসে সত্যচরণকে আগামী পূর্ণিমার দিন তার বাড়িতে আহারের জন্যে নিমন্ত্রণ করে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সত্যচরণকে রাজী হতে হলো। পূর্ণিমার দিন বিকেলে নন্দলালের প্রেরিত হাতীর পিঠে চড়ে সত্যচরণ

তার বাড়ি গেল। বন্দুকের আওয়াজ থেকে শুরু করে বরণ-থালা পর্যন্ত—আপ্যায়নের কোন ত্রুটি ছিলনা। নন্দলালের চাষবাস আছে, সুদের কারবার আছে, কয়েকঘর প্রজাও আছে। সত্যচরণকে ঘটা করে খাইয়ে একথলি টাকা নজরানা দিতে এলে সে তার সম্মানের জন্যে থলি থেকে একটি টাকা নিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে কাছারিতে ফিরে এলো। পরের দিন নন্দলাল তার বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিতে এসে হাজির। সে সত্যচরণকে একান্তে অনুরোধ করলো, তার বড়ো ছেলেকে ফুলকিয়া বইহারের তহশীলদার নিযুক্ত করতে হবে। কাউকে স্বাধীনভাবে বহাল-বরখাস্তের ক্ষমতা সত্যচরণের নেই। তাছাড়া, ফুলকিয়া বইহারের তহশীলদার বর্তমানে নিযুক্ত আছে। এ ব্যাপারে সত্যচরণ তার অক্ষমতার কথা জানালে নন্দলাল তাকে পাঁচশো টাকা উৎকোচদানের প্রলোভন দেখায়। পরে সে বারো শো টাকা উৎকোচদানের প্রতিশ্রুতি দিলে সত্যচরণ তার সঙ্গে ক্রমাগত কঠোর ব্যবহারে তাকে মহাশত্রু করে তোলে।

কয়েক মাস এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয়নি। তাই গ্রীষ্মের শুরুতেই নিদারুণ জলকষ্ট দেখা দিল। জঙ্গল-মহালের খাল, ডোবা, কুণ্ডী—সব গেল শুকিয়ে। একটা নদী এই জমিদারী আর মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তাতে শুষ্ক বালুময় খাত পড়ে আছে। দূর গাঁয়ের মেয়েরা বালি কাদা ছেঁকে কোন রকমে আধ কলসী জল নিয়ে বাড়ি ফেরে। কাছারির ছোট পাতকুয়াটিতে তিন বালতি জল সংগ্রহ করতে দুপুর কেটে যায়। তাম্রাভ, অগ্নিবর্ষী আকাশ। আগুনের হল্‌কার মতো তপ্ত বাতাস। চারদিক যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দ্বিপ্রহরের এ রকম ভয়ানক রুদ্র রূপ অন্য কোথাও দেখা যায় না। পশ্চিম দিক থেকে খরতপ্ত বাতাস বয়। ঘন বালি ও ধূলারাশির আড়ালে দূরের জিনিস ঢাকা পড়ে যায়। গ্রীষ্ম দ্বিপ্রহরের এই রুদ্র রূপ বাংলাদেশের কোথাও দেখা যায় না। সূর্য যেন একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড। তাতে ক্যালসিয়াম, হাইড্রোজেন, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি জানা-অজানা কত রকমের গ্যাস ও ধাতু পুড়ছে ; আর, তার ধূ-ধূ আগুনের তরঙ্গ শূন্য ঈথারের স্তর ভেদ করে এখানকার বনভূমির সমস্ত প্রাণরস শোষণ করে এক রুদ্র ভৈরব রূপ সৃষ্টি করেছে। পাখির দলও এই উত্তাপের ভয়ে দেশছাড়া হয়ে গেছে।

মাইল তিনেক দূরে একটা কুণ্ডীতে সামান্য জল আছে। কিন্তু জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, জল নিয়ে তীরে ফিরে আসার আশা থাকে না। একদিন সন্ধ্যায় সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে সেই কুণ্ডীটার পাশে গিয়ে দেখে, কাদার ওপরে অনেকগুলি বিষধর সাপ পড়ে আছে, অন্যদিকে তিনটি বিশালকায় বুনো মহিষ জল পান করছে। সে যাত্রায় সত্যচরণ প্রাণে বেঁচে যায়। কারণ বুনো মহিষ তাড়া করলে প্রাণ বাঁচানো দায় হতো।

বৃষ্টি নেই। গ্রীষ্মের প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই কুণ্ডীতে বুনো জানোয়াররা জল খেতে আসে। এমন-কি, ওখানে বাঘকেও জল খেতে দেখা যায়।

সত্যচরণ সেখানে শিকার করতে যায়; পিপাসার্ত পশুদের জলপানের করুণ দৃশ্য দেখে গুলি করে তাদের হত্যা করতে হাত ওঠে না।

বৈশাখ মাসও ফুরুলো। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। একদিন একটা অদ্ভুত ধরনের পাগলা লোককে দেখে কাছারির কাছে ভিড় জমে গেল। লোকটাকে কাছারিতে আনা হলো। গায়ে তার জামা নেই, পরনে একখানা ফর্সা ধুতি, সুন্দর চেহারা, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তার মুখের আকৃতি ভীষণ। গালের দু' কশে ফেনা। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল—ঠিক উন্মাদের দৃষ্টি। জিভ ফোলা। সে জলের বালতি দেখে তার দিকে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিল। মুনেশ্বর শিং বালতি সরিয়ে তার মুখে অল্প অল্প জল দিল। সত্যচরণ তাকে লেবুর রস ও গরম জল খেতে দিল। লোকটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

সে গালার চাষ করবার উদ্দেশ্যে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধানে পূর্ণিয়া থেকে দুদিন আগে যাত্রা করেছিল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে সে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করেছে, চীৎকার করেছে। তার ওপর সে ভয় পেয়ে যায়, বুঝি জিন-পরীতে তাকে পেয়েছে। অসহ্য পিপাসায় কোথাও একফোঁটা জল খেতে পায়নি সে। বুকফাটা তৃষ্ণায় সারা গায়ে এমন জলুনি শুরু হয় যে, সে কোথায় জামা খুলে ফেলে দিয়েছে। কাছারির হনুমানের লাল নিশান দেখতে না পেলে বেঘোরে মারা পড়তো লোকটা।

একদিন খবর পাওয়া গেল, নৈঋত কোণে মাইলখানেক দূরে জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লেগেছে এবং আগুনটা কাছারির দিকেই এগিয়ে আসছে। সবাই বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখা গেল, নীল ধূম্ররাশি, অগ্নিশিখা আর তার চটচট শব্দ ডাকগাড়ির বেগে ধেয়ে আসছে কাছারির খড়ের বাংলোগুলোর দিকেই। দাবানলের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা ইত্যাদি বের করে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলা হলো। কাছারি রক্ষা করতে দু' দশজন মহিষওয়ালা ছুটে এসেছিল। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি কাছারির পাশের গাছগুলি কেটে ফেললো। সে কী অদ্ভুত দৃশ্য! নীলগাই, শেয়াল, খরগোশ ও বন্য শূকরের দল প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কাছারি রক্ষা পেল। দু' তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল, আট-ন' মাইল দূরে কারো কুশীনদীর কাদায় পড়ে অনেকগুলি বুনো মহিষ, চিতাবাঘ ও নীলগাইর মৃত্যু ঘটেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের প্রথমেই কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। এখানে মানুষের মুখ বড়ো একটা দেখা যায় না। তাই সত্যচরণ গনোরী তেওয়ারীকে দিয়ে দূর-দূরান্তের বস্তির লোকেদের নিমন্ত্রণ করে আনলো খাওয়াবার জন্যে। আগের দিন থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। পুণ্যাহের দিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। তারই মধ্যে দলে দলে

লোক এসে হাজির। অনেক মেয়েও ছেলেপুলে নিয়ে এসেছে। খাবার হলো চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। তাই খাবার জন্যে এরা মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এসেছে। এরা বড়ো গরীব—বাংলাদেশের গরীবদের চেয়েও গরীব।

একদিন সার্ভে-ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে ধাওতাল সাহুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সত্যচরণের। সে পাত্রের অভাবে একখানা ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তে প্রকাণ্ড একতাল ছাতু মাখছিল খাবে বলে। খবর নিয়ে সত্যচরণ জানতে পারলো, ধাওতাল সাহু একজন লাখপতি। এ অঞ্চলের প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার—সবাইকে সে সুদে টাকা ধার দেয়। নিরীহ ভালোমানুষ বলে অনেকে তার টাকা ফাঁকি দিয়েছে। রঁাইচি আর রেড়ীর বীজ বিক্রী করে সে টাকা করেছে। কিন্তু টাকার প্রতি তার মায়া-মমতা নেই। একদিন সে সত্যচরণকে কয়েকখানা দলিল এনে দেখালো। প্রায় পনেরো-ষোল হাজার টাকার দলিল—মামলা না করার ফলে তামাদি হয়ে গেছে। সেজন্যে তার কোন ক্ষোভ বা আপশোস নেই। লোকে টাকা ফাঁকি দেয়। তবু সে টাকা ধার দিতে ছাড়ে না। কারণ টাকা বসিয়ে রাখলে চলে না। সবাই তো টাকা ফাঁকি দেয় না। এখনো চন্দ্রসূর্য ওঠে, মাথার ওপরে আছেন দীন-দুনিয়ার মালিক। ধাওতালের দার্শনিকতায় সত্যচরণ বিস্মিত হয়।

ফুলকিয়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় দেখা হল জয়পাল কুমারের সঙ্গে। সে তার মকাইয়ের পাতায়-ছাওয়া কুঁড়ের সামনে সব সময় বসে থাকে। কোন কাজ করে না, কারো সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না, এমনকি গানও গায় না। এভাবে তার দিন কাটে কি করে? বিশ-পঁচিশ বছর আগে তার পরিবার মরেছে। দুটো মেয়ে ছিল। তারাও মরেছে বছর তেরো-চোদ্দ আগে। সত্যচরণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারে, এভাবে তার খারাপ লাগে না। অবাক হয় সত্যচরণ। সে নিজের কথা ভাবে। এই অরণ্য-নিবাসে দূরে নীল পাহাড়ের সারি, দূরবিসর্পী নিবিড়শ্যাম বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীলগাইয়ের দল, তারাভরা নিশীথ আকাশ, সূর্যালোক এবং ধরণীর মুক্ত প্রসারে সে নিজেই অভিভূত হয়ে যায়। কার্য-উপলক্ষে মুঙ্গের বা পূর্ণিয়া শহরে গেলে ভালো লাগে না। অরণ্যের শ্যামল মায়ায় ফিরে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

পৌষ মাসের শেষ। হাড়-কাঁপানো শীত। লবটুলিয়ার ডিহি কাছারিতে কাজের তদারক করতে গেছে সত্যচরণ। সেখানে রাতের আহার শেষ হতে এগারোটা বেজে যেত। একদিন রাতে কাছারির উঠোনের সীমানায় সেই শীতে একটি মেয়েমানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। পাটোয়ারির কাছে সে জানতে পারলো, মেয়েটির নাম কুন্তা। সে মৃত রাজপুত মহাজন দেবী সিংয়ের বিধবা স্ত্রী—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে লবটুলিয়ার বস্তিতে থাকে। দেবী সিং যৌবন বয়সে কাশীতে বাইজী বাড়িতে গান শুনতে গিয়ে বাইজীর চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে কুন্তাকে নিয়ে পালিয়ে এসে তাকে বিয়ে করে। দেবী সিংয়ের জাতভাই রাজপুতরা কুন্তার পূর্ব-পরিচয়

জানতে পেরে দেবী সিংয়ের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন কুন্তা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পাল্‌কিতে চেপে সে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত। দেবী সিং বাবুগিরিতে আর অন্য মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের সঙ্গে মামলায় সর্বস্বান্ত হয়ে বছর চারেক আগে মারা গেছে। ক্ষেতের পড়ে-থাকা গমের শীষ কুড়িয়ে আধপেটা খেয়ে এখন দিন কাটে কুন্তার। কিন্তু সে কখনো ভিক্ষে চায় না। ম্যানেজারবাবু এসেছে শুনে সে তার পাতের উচ্ছিষ্ট ভাত ক'টি নেবার জন্যে এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অপেক্ষা করে থাকে। সত্যচরণের খাওয়া হয়ে গেলে সে তার পাতের উচ্ছিষ্ট ভাত ক'টি নিয়ে চলে যায়। পরের বার লবটুলিয়ার কাছারিতে গিয়ে সত্যচরণ মহালের উত্তর সীমানায় বেড়াতে যায়। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, একটি মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের চাকরেরা চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসছে। মেয়েটির পরনে ছিন্ন বাস। সঙ্গে দু' তিনটি রোরুদ্যমান বালক-বালিকা। সত্যচরণ জানতে পারলো, এই মেয়েটিই কুন্তা। সত্যচরণের হস্তক্ষেপে কুন্তা সে যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু চুরি করার লজ্জায় কুন্তা একেবারে মরে গিয়েছিল। তার কুলের ধামা আর আঁকশি সত্যচরণ পাইক দিয়ে লবটুলিয়ায় কুন্তার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সেদিন থেকে কুন্তা লজ্জায় আর কখনো কাছারিতে ভাত নিতে আসেনি।

শীতের পর বসন্ত। দোল-পূর্ণিমা। কাছারি থেকে চৌদ্দ-পনেরো ক্রোশ দূরে হোলি উপলক্ষে বসে একটা প্রসিদ্ধ মেলা। সত্যচরণের সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হলো। কিন্তু পথ দুর্গম ও বিপদসংকুল—বাঘ-ভালুক ও বন্য মহিষের ভয়। কাছারির লোকদের নিষেধ অমান্য করে খুব সকালে সে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লো মেলার উদ্দেশ্যে। অরণ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্য ও পথ-চলার আনন্দে মগ্ন থেকে সে পথ হারিয়ে ফেলে। পরে পথের নিশানা ঠিক করে সে তাদের জঙ্গল-মহালের সীমানা পেরিয়ে এলো। দেখলো, এক জায়গায় একদল লোক কাঠ পুড়িয়ে কয়লা তৈরী করছে। তাদের কাছে সে জল চেয়ে খেয়ে আবার যাত্রা করলো। আরো মাইল পাঁচেক গিয়ে কারো নদী পেরিয়ে যে বনভূমির মধ্যে সে প্রবেশ করলো, তার সর্বত্র পলাশ ফুলের মেলা। দূরে একটা বুনো মহিষ মাটিতে ক্ষুর ঘষছিল। যাই হোক, একটু পরে সে তাকে আক্রমণ না করে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সত্যচরণ আবার সেই রুক্ষ, অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রীর মধ্য দিয়ে দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে থাকে। মাথার ওপর আশ্চর্য নীল আকাশ। আকাশের কোথাও একটা পাখি পর্যন্ত নেই। মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও জনপ্রাণী নেই। তারই মধ্য দিয়ে দুলকি চালে ছুটে চলে সত্যচরণের ঘোড়া।

মেলায় পৌঁছতে একটা বেজে গেল। কাছের দূরের গ্রাম থেকে লোকজন মেলায় এসেছে—বিশেষতঃ মেয়েরা। বন্য তরুণী মেয়েরা এসেছে—মাথার চুলে পিয়াল কিংবা ধাতুপ ফুল। কারো মাথার বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুণি। বেশ সুঠাম, লাবণ্যভরা ওদের দেহের গড়ন। তারা খেলো পুঁতির মালা, সস্তা সাবান, বাঁশি, আয়না কিংবা

অতি বাজে এসেন্স কিনছে। পুরুষরা কিনছে সস্তা সিগারেট। ছেলেমেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা কিনে খাচ্ছে। হঠাৎ মড়াকান্না শুনে সত্যচরণ চমকে ওঠে। আসলে, কোন বধূর তার বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে মেলায় সাক্ষাৎ হলে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে এভাবে উভয়ের কান্নাটাই এখানকার রীতি। সস্তা বইয়ের দোকান, একটু দূরে রান্না-খাওয়ার ধুম। সেখানে তরিতরকারি থেকে শুঁটকি কুঁচো চিংড়ি আর নালসে পিপড়ের ডিম বিক্রী হচ্ছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য।

হঠাৎ লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতোর সঙ্গে সত্যচরণের দেখা। ব্রহ্মা এই মেলার ইজারাদার। সে সত্যচরণকে খুব খাতির করে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুতে সত্যচরণ দেখলো গিরিধারীলাল নামে ব্রহ্মার এক আদায়কারীকে। বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, খালি গা, রং কালো, মাথার চুল কাঁচাপাকা। তার চোখ-মুখের অসাধারণ দীন-নম্রভাব সত্যচরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তার দৈনিক বেতন চার আনা এবং আহার। খুব সাচ্চা মানুষ।

বেলা পড়ে এলো। সত্যচরণ ফেরার জন্যে প্রস্তুত হলো। সবাই অবাক হলো তার এই দুঃসাহস দেখে। তাদের নিষেধ অমান্য করে বাসন্তী পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না রাতে জনহীন পাহাড়-জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়ে যাবার যে রোমাঞ্চ, তার আকর্ষণে সত্যচরণ রওনা হলো। কারো নদীতে পৌছবার অল্প পরেই টকটকে লাল বৃহৎ সূর্য অস্ত গেল। সামনে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় ঠিক তখনই পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। এক আশ্চর্য অনুভূতিতে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দিগন্তব্যাপী অপার্থিব জ্যোৎস্নার মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে সে প্রায় রাত ন'টায় কাছারিতে ফিরে আসে।

কাছারিতে একদিন ঢোলের শব্দ শোনা গেল। দক্ষিণ দেশে সে বছর অজন্মা। তাই ওখানকার লোকেরা নাচের দল নিয়ে পেটের দায়ে বেরিয়ে পড়েছে। সতেরো-আঠারো জন মানুষ বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নাচলো অপরিচিত নাচ, গাইলো অপরিচিত গান। তাদের গানের ভাষা সত্যচরণ কিছুটা বোঝে, কিছুটা বোঝে না। তাতে সত্যচরণ বুঝতে পারলো, তাদের গানের মধ্যে একটি ছিল প্রেমের গান। তার বিষয় হলো : একটি যুবক পাখি শিকার করতে গিয়েছিল ঝরনার ধারে। একটি মেয়ে গিয়েছিল ঝরনায় জল আনতে। মেয়েটি তাকে পাখি শিকার করতে বারণ করে। সে তার কথায় লজ্জা পেয়ে ফেলে দিল বাঁশের নল আর আঠাকাঠির তাড়া। বনের পাখি গেল উড়ে, কিন্তু মনের পাখি বন্দী হলো প্রেমের ফাঁদে।

সত্যচরণ রাতে ওদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিল। পরের দিন সকালে সত্যচরণ তাদের দু'টাকা দেয়। তারা বিস্মিত হয়। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে, চেহারাটি তার যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মতো, দলের সামনে নাচে এবং গায়। দুটি খাওয়ার জন্যে সে দলের সঙ্গে ঘুরছে। সে খাওয়া কি! চীনা ঘাসের দানা,

একটু নুন আর বড় জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি। সত্যচরণ তার প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে তাকে কাছারির কাজে রেখে যাবার জন্যে সর্দারকে বলে।

সর্দার জানায়, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে সে ভালো আছে। কাছারিতে তার ভালো লাগবে না। পরে আবার সে ওকে কাছারিতে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাছারি থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গল। ওখানে দুখানা ঘরে থাকে আমীন রামচন্দ্র সিং আর তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল। খবর পাওয়া গেল, আমীন রামচন্দ্র সিং হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। সত্যচরণ খবর পেয়ে ওখানে গিয়ে শুনলো, প্রতিদিন মাঝরাতে রামচন্দ্র নাকি দেখতে পায়, তার ঘরে একটা শাদা কুকুর আসে, তার গা ঘেঁষে বসতে চায়। সে চীৎকার করে ডাকে আসরফি টিণ্ডেলকে। আসরফি টিণ্ডেল দেখতে পায়, একটি মেয়ে বেরিয়ে যায় আমীন রামচন্দ্রের ঘর থেকে। এর পর আসরফি আমীন রামচন্দ্রের ঘরে রাত জেগে কাজ করে। সেও একদিন দেখলো, একটা মেয়ে রামচন্দ্রের খাটের নিচে বসে হাসছে তার দিকে চেয়ে। লণ্ঠন নিয়ে কাছে যেতেই একটা শাদা কুকুরকে সে বেরিয়ে যেতে দেখে।

সত্যচরণ ওদের দুজনকেই কাছারিতে নিয়ে আসে। কিন্তু রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। সে ঘোর উন্মাদ হয়ে ওঠে। শেষে তার এক দাদা এসে তাকে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার মাস ছয় পরে এক বৃদ্ধ তার ছেলেকে নিয়ে কাছারিতে এলো। তারা বোমাইবুরুর জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে মহিষ চরায়। পিতাপুত্রে একটি ঘরে থাকে। হঠাৎ একদিন পুত্রকে নিয়ে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধভাবে কাছারিতে এলো এবং খারাপ হয়ে যাবার জন্যে ছেলেকে শাসন করতে সত্যচরণকে অনুরোধ করে। বৃদ্ধ প্রায়ই একটি মেয়েকে ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে। সত্যচরণ ছেলেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানলো, সে তার পিতার অভিযোগের কিছুই জানে না। কদিন পরেই বোমাইবুরুর জঙ্গলে মাঝরাতে হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে কাকে খুঁজতে গিয়ে ছেলেটি মারা গেল।

ঘটনাটি এমন অলৌকিক, অবিশ্বাস্য এবং ভয়াবহ যে, সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার আগেই সবাই দরজা বন্ধ করে গৃহে অন্তরীণ হয়। সত্যচরণও কম আতঙ্কিত হয়নি। সেও একা কাছারিতে শুয়ে ধবধবে শাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চেয়ে এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। তার মনে হয়, এই অরণ্যকান্তার বহুকাল ধরে রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের বাসভূমি। মানুষের অনধিকার প্রবেশ বোধহয় তাদের কাম্য নয়। কোনদিন রূপকথার রাক্ষসরাণীর মতো মায়াবী জ্যোৎস্নাভরা নৈশপ্রকৃতি তাকে ভুলিয়ে অরণ্যের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হয়তো মেরে ফেলবে।

একদিন পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছরের এক সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ এসে বিনা সেলামীতে সামান্য কিছু জমি চাষের জন্যে বন্দোবস্ত চাইলো। বড় দুঃখী মানুষ এই রাজু পাঁড়ে। বাড়ি ধরমপুর পরগনায়। বাড়িতে তার তিন ছেলে, দুই মেয়ে এবং এক বিধবা বোন। বড়ো কষ্টের সংসার। সত্যচরণ তাকে লবটুলিয়ার জঙ্গলে দু বিঘে জমি বন্দোবস্ত দেয়। প্রথম দু বছর তাকে কিছু দিতে হবে না। তৃতীয় বছর থেকে বিঘে পিছু চার আনা হিসেবে খাজনা। জমি বন্দোবস্ত নিয়ে রাজু চলে যায়। বছর দেড়েক তার দেখা নেই। একদিন লবটুলিয়ার কাছারি থেকে ফেরার পথে সত্যচরণের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে গাছের তলায় বসে কি একটা বই পড়ছিল। ম্যানেজারবাবুকে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো। সত্যচরণ তার কাছ থেকে জানতে পারে, পনেরো কাঠা জমি পরিষ্কার করে সে তাতে চীনার দানা ফলিয়েছে, অন্য কিছু ফলাতে পারেনি। তার সঙ্গে গিয়ে সে দেখলো, একটা নীচু খুপরিতে সে থাকে, অন্য একটা খুপরিতে থাকে তার চীনা বীজের স্তূপ। রাজুর খুপরিতে একমাত্র তৈজস—একটি বড় লোটা। ওতে ও চীনার দানা সিদ্ধ করে। একপাশে সিঁদুর-মাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি। ভক্ত মানুষ রাজু। সে দার্শনিকও। সে বলে, ফুলের দল কতকাল থেকে ফুটছে, পাখি ডাকছে, দেবতারা এখানেই পৃথিবীর মাটিতে পা রাখেন। রাজুকে সত্যচরণ আরো বেশী জমি দেয়। কিন্তু জমি পরিষ্কার করে উঠতে সে পারেনা। পূজা ও গীতাপাঠ করে উঠতেই তার দশটা বেজে যায়। ঘণ্টা-দুই কাজ করার পর রান্না-খাওয়া করে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খাটে। সন্ধ্যের পর আবার পূজাপাঠ।

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা শুরু হয়। শুয়োরমারি বস্তি কাছারি থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। ডাক্তার-কবিরাজশূন্য অঞ্চল। সত্যচরণ কিছুদিন হোমিওপাথির চর্চা করেছিল। সে তার স্বল্প বিদ্যা নিয়ে ওখানে চিকিৎসা করবার জন্যে যায়। ওখানে তার আগেই রাজু পাঁড়ে বাটুয়াতে শিকড়বাকড় ,জড়ি বুটি নিয়ে রোগী দেখতে গিয়েছে। সে-ই সত্যচরণকে বাড়ি বাড়ি রোগী দেখিয়ে ঘুরতে লাগলো।

এক বাড়িতে জনৈক বৃদ্ধ কলেরায় আক্রান্ত। দোরগড়ায় একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে বসে কাঁদছে। রাজুর কাছে সত্যচরণ জানতে পারে, মেয়েটি বৃদ্ধের স্ত্রী। মেয়েটির আর কেউ নেই। বিধবা মা গত বছর মারা গেছে। সত্যচরণের চোখে পড়লো, রোগীর মাথার কাছে একটি তাকে আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তা ভাত। ভাত এ অঞ্চলের অত্যন্ত দুর্লভ একটি প্রিয়খাদ্য। সত্যচরণ সেই পান্তাভাত ফেলে দিতে নির্দেশ দেয়। পান্তাভাত দুটি গত রাতে ওঝাজীর বাড়ি থেকে তাকে খাবার জন্যে দিয়ে গিয়েছিল। ওগুলো ফেলে দিলে মেয়েটি কি খাবে? বৃদ্ধ মারা গেল। বস্তির প্রত্যেক ঘরেই রোগী। রাজুর সঙ্গে সত্যচরণ রোগী দেখে। রাজু দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে। এ ক'দিনে রাজু এক টাকা তিন আনা উপার্জন করেছে।

তাতেই সে খুশী। দুপুরে খবর পাওয়া গেল, ওবেলার সদ্য-বিধবা মেয়েটিরও কলেরা হয়েছে। সত্যচরণ ও রাজু হতভাগিনীকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলো। সকালেই মেয়েটি মারা গেল। সত্যচরণের মনে একটা কষ্ট চিরন্তন হয়ে থেকে গেল, সে মেয়েটিকে তার অত সাধের দুটি ভাত খেতে দেয়নি।

মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব রহস্যময় দেখায়। শোনা যায়, সেখানে বাঘ-ভালুকের বাস, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বনমোরগ আর দুষ্প্রাপ্য চন্দ্রমল্লিকায় ভর্তি। কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গলের অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্য সত্যচরণকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

একদিন সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ে। ন' মাইল ঘোড়ায় গিয়ে দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখানে পথ। চন্দ্রমল্লিকা, শেফালী, সপ্তপর্ণ, অর্জুন, পিয়াল ও বিচিত্র বন্যপুষ্পের ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে শুঁড়ি পথ। কাশ ফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল হয়ে উঠেছে। কিছুদূর গিয়ে পথটা ওপরের দিকে ঠেলে উঠে নীচে গড়িয়ে গিয়েছে। কিছুদূর নেমে একটা পিয়াল গাছের নীচে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সত্যচরণ এক শিলাখণ্ডে বসলো। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো সে। এই মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল আজ যেমন আছে, হাজার হাজার বছর আগেও হয়তো তেমনি ছিল। আর্যদের ভারতভূমিতে আগমনের দিনে, বুদ্ধের গৃহত্যাগের দিনে, বাল্মীকির রামায়ণ রচনার দিনে, চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের দিনে, সংযুক্তার স্বয়ম্বরা হবার দিনে, শাজাহান-পুত্র দারার পরাজয়ের দিনে, শ্রীচৈতন্যের শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তন করার দিনে, পলাশীর যুদ্ধের দিনে এই শৈলচূড়া যেরকম ছিল, আজও তেমনি আছে। মানুষের সভ্যতা নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে উন্নতির শিখরে ক্রমাগত আরোহণ করেছে, কিন্তু পাপুয়া, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা—ভারতের মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকীরা পাঁচ হাজার বছর আগে যেখানে ছিল, আজও সেখানে আছে। এর কারণ কি?

বিকেলের রোদ রাঙা হয়ে আসে। বাতাসে হেমন্তের হিমের আমেজ। আর দেরী করা উচিত নয়। সম্মুখে কৃষ্ণা একাদশীর রাত এবং বাঘ-ভালুকের ভীতি। সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে ফিরতে লাগলো। পথে দেখলো বন্য ময়ূর। কিন্তু মনের মধ্যে ছিল বাঘের ভয়। তাই দেরী না করে দ্রুতগতিতে সে নামতে লাগলো মহালিখারূপের পাহাড় থেকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের জন্যে সত্যচরণের মন বড়ো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কতদিন বাংলাদেশের মুখ সে দেখেনি, কতদিন বাংলাদেশের দুর্গোৎসব দেখেনি সে, চড়কের ঢাকের বাজনা কতকাল শোনা হয়নি তার। দেবালয়ের ধূপধুনোর গন্ধ, বৈশাখী প্রভাতে পাখির কলকূজন কতকাল সে উপভোগ করেনি। বাঙ্গালীর শান্ত বিচিত্র গৃহস্থালির চিত্র কতকাল সে দেখতে পায় নি।

শীতের পর বসন্ত এসেছে পৃথিবীতে। সরস্বতী কুণ্ডের ধারে বেড়াতে গেছে সত্যচরণ। একটা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ফুলের ঝাড় যেন বসন্তোৎসবে মেতেছে। অনেকক্ষণ সে সেই গোত্রহীন, বংশপরিচয়হীন বুনো ফুলগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ আমীন পূরণচাঁদের সঙ্গে তার দেখা। সে নাঢ়া বইহারের পশ্চিম সীমানায় জরীপের কাজ থেকে ফিরছে। সে সত্যচরণকে আসন্ন সন্ধ্যায় সেই ব্যাঘ্রসংকুল বনভূমিতে বেশীক্ষণ থাকতে নিষেধ করলো। তার টিণ্ডেল নিজের চোখে ওখানে বাঘ দেখেছে। দূর থেকে পূরণচাঁদের টিণ্ডেলের গান শোনা যায়—'দয়া হোই জী—।' তার গান শুনলে সত্যচরণের বাংলাদেশে ফেরার জন্যে মন বড়ো ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর কি কখনো তার বাংলাদেশে ফেরার সৌভাগ্য হবে?

এমন এক মন-কেমন-করা দিনে রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ি থেকে হোলির নিমন্ত্রণ এলো। রাসবিহারী সিং এ অঞ্চলের দুর্দান্ত মহাজন। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিশেষ পটু। অনেকগুলি লাঠিয়াল পাইক সে পুষে রেখেছে। পুলিশও নাকি তার হাতে আছে। গরীব গৃহস্থ প্রজারা তার নামে ভয়ে কাঁপে। কিন্তু জঙ্গল-মহালের প্রজাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবার অধিকার তার নেই। তবু দু'দুবার জঙ্গল-মহালের সিপাইদের সঙ্গে তার পাইকদের গোলমাল হয়ে গেছে। পুলিশের দারোগা এসে মিটমাট করে দিয়ে গেছে। কাছারির কর্মচারীরা সত্যচরণকে রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ি যেতে নিষেধ করলে। কিন্তু না গেলে রাসবিহারীর অত্যন্ত অপমান করা হয়। হোলির উৎসব রাজপুতদের প্রধান উৎসব। তাছাড়া, সত্যচরণ না গেলে রাসবিহারী তাকে ভীতু মনে করতে পারে। তাই সত্যচরণ হোলির দিন রাসবিহারীর বাড়িতে উপস্থিত হলো হোলির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বন্দুকের দুটি আওয়াজ করে তাকে অভ্যর্থনা করা হলো। রাসবিহারীর বড় ভাই রাসউল্লাস সিং বিনীতভাবে তাকে অভ্যর্থনা করে ঘোড়া থেকে নামালো। আধঘন্টা পরে রাসবিহারী এসে তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। খুব খাতির যত্ন করলো সে। পরে একটি বালক বরণ-থালা নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো। তাতে আছে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটা টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা, মিছরির টুকরো এবং একছড়া মালা। রাসবিহারী সত্যচরণের কপালে আবীর মাখিয়ে দিল, সত্যচরণও রাসবিহারীর কপালে আবীর দিয়ে ফুলের মালাটি তুলে নিল। রাসবিহারীর অনুরোধ, নজরানাগুলি তাকে গ্রহণ করতেই হবে। সত্যচরণ পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে থালায় রেখে সবাইকে তা দিয়ে মিষ্টিমুখ করবার অনুরোধ জানায়।

রাসবিহারী সিং তাকে ঘুরে ঘুরে তার ঐশ্বর্যসম্ভার দেখালো। গোয়ালে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি গোরু, আস্তাবলে সাত-আটটি ঘোড়া। হাতী নেই, কিন্তু শীগ্‌গীর কিনবে। আটশো মণ গম উৎপন্ন হয়, দুবেলা আশি-পঁচাশিজন লোক খায়। একটা কড়ায় দেড়মণ দুধ জাল দেওয়া হয়। সে নিজে সকালে জলযোগ করে দেড় সের দুধ আর এক সের বিকানীর মিছরি দিয়ে। একটি ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙ্গি,

তলোয়ার নিয়ে একটি রীতিমতো অস্ত্রাগার রয়েছে রাসবিহারীর। তার ছয় ছেলের মধ্যে চারজনই বাপের মতোই দীর্ঘকায় এবং জোয়ান।

এত যার ঐশ্বর্যরাশি, তার ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছুই নেই, বই নেই, শিক্ষা-দীক্ষা নেই। সত্যচরণের সামনে এনে হাজির করা হলো প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য—হাতীর কানের মতো বৃহদাকার পুরী খান পনেরো, খুরিতে নানা রকমের তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপো, চাটনি ও পাঁপর। সত্যচরণ এর অংশ মাত্র খেয়ে বাইরে এলো। উঠোনে গাঙ্গোতা প্রজার দল পাতায় মহা আনন্দে দই ও চীনা ঘাসের ভাজা খাচ্ছে।

সেখানে সেদিন সত্যচরণ নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার নাচ দেখলো। ধাতুরিয়া তাকে চিনতে পারলো। হোলি উৎসবে নাচবার জন্যে তাকে বায়না করে আনা হয়েছে। বিনিময়ে সে চার আনা পয়সা আর আহার পাবে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ভালোভাবে ফুটলে সত্যচরণ নাটুয়া বালক ধাতুরিয়াকে কাছারিতে আমন্ত্রণ করে রাসবিহারীর কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হলো। কিছুদূর আসার পর মনে হলো, কেউ তার পেছনে ছুটছে। সত্যচরণ ঘোড়া থামালো। ধাতুরিয়াকে দেখে সত্যচরণ ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ধাতুরিয়া কলকাতায় যেতে চায়। সে অনেক কষ্টে গয়া জেলার ভিটল দাসের কাছে লুপ্তপ্রায় ছক্করবাজির নাচ শিখেছে। সেই নাচ দেখার মতো সমঝদার দর্শক এখানে নেই। কাউকে দেখাতে না পেরে সে নাচটা প্রায় ভুলে যেতে বসেছে। কলকাতায় গুণের আদর আছে। কলকাতায় তাই তাকে নিয়ে যাবার জন্যে সে সত্যচরণকে অনুরোধ জানায়। সত্যচরণ তাকে এ বিষয়ে কথা বলার জন্যে একদিন কাছারিতে আসতে বলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রকৃতি তাঁর দান কেবলমাত্র তাঁর ভক্তদেরই দিয়ে থাকেন। অনন্যমনা হয়ে প্রকৃতিতে ডুবে থাকলেই শুধু তা পাওয়া যায়। অরণ্যপ্রান্তরে, লবটুলিয়ার মাঠে-মাঠে নক্ষত্রাকৃতি দুধলি ঘাসের ফুল চারদিক আলো করে ফুটে থাকে। অনবদ্য তার রূপ। আর, সেই জঙ্গল-মহালের বাইরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দিকে—মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে আছে রক্তপলাশের বাহার।

এক-একদিন বাংলাদেশে ফেরার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে, বঙ্গপল্লীর সুমধুর বসন্ত-ঋতুর কথা। মনে ভেসে ওঠে স্নানান্তে আর্দ্র বসনে গমনরতা গ্রাম্য বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলন্ত ঘেঁটুবন, বাতাবী লেবুফুলের গন্ধে মায়াময় অপরাহ্ণের স্থিরচিত্র। কিন্তু এখানকার অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে আছে এক অসীম রহস্যময়, গা-ছমছম-করা, ভয়াল সৌন্দর্য। কখনো সে দেখা দেয় ভয়ের রূপে, কখনো দেখা দেয় উদাস-গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনো মধুর স্বপ্নরূপে, কখনো বা তারাভরা

আকাশের নীরব সংগীতের রূপে। সে রূপ যারা দেখেছে, তাদের পক্ষে শান্তিতে ঘর-সংসারের নীড় রচনা সম্ভব নয়।

একদিন পূর্ণিয়া থেকে উকিলের 'তার' এলো—পরের দিন সকাল দশটার মধ্যে সেখানে হাজির হতে না পারলে জঙ্গল-মহালের হার সুনিশ্চিত। সেই মতো সত্যচরণ ও তহশীলদার সুজন সিং—দুজনে সন্ধ্যায় ঘোড়া ছাড়লো। জ্যোৎস্নালোকিত বনপথ। যেন কোন পরীর রাজ্যের মধ্য দিয়ে তারা পথ চলেছে। সারারাত বন-পাহাড়-প্রান্তরের ছায়াহীন উদাস-গম্ভীর জ্যোৎস্নায় ঘোড়া ছুটিয়ে পরের দিন সকালে তারা পূর্ণিয়া শহরে পৌছলো। স্টেটের কাজ শেষ হলে সুজন সিং দিনের আলোয়-আলোয় কাছারিতে ফিরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। কিন্তু সত্যচরণের ইচ্ছে অন্যরূপ। সে বনপথের বিচিত্র সৌন্দর্য উপভোগের লোভে রাতে ফেরার পক্ষপাতী। তাই হলো। কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক জ্যোৎস্নায় বন-পাহাড়ে যে শান্ত, স্নিগ্ধ স্বপ্নলোক রচিত হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে জ্যোৎস্নাস্নাত বনশ্রীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে তারা ফিরে এলো কাছারিতে।

চৈত্রের মাঝামাঝি খবর এলো, সীতাপুরের বাঙালী ডাক্তার রাখালবাবু মারা গিয়েছেন। সত্যচরণ আগে কখনো তাঁর কথা শোনেনি। তিনি নাকি বিশ-বাইশ বছর ঐ গ্রামে ছিলেন। খবর পেয়ে বাঙালী হিসেবে সত্যচরণ ওখানে যায় এবং তাঁর বাড়িটি খুঁজে বের করে। তিনটি ছোট ছোট ছেলে এবং বিধবা স্ত্রী রেখে রাখালবাবু মারা যান। তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায়, আত্মীয়স্বজন বলে তাঁদের বড়-একটা কেউ নেই। ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলেবেলা থেকেই সে সাহেবগঞ্জে তার ভগ্নীপতির বাড়িতে মানুষ। সম্প্রতি দিদির মৃত্যুর পর ভগ্নীপতি পুনরায় বিবাহ করেছেন। রাখালবাবুর জ্ঞাতিভাইরা দেশে আছেন, কিন্তু দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। ডাক্তারবাবুর সে দ্বিতীয় পক্ষ। বিবাহের পর থেকে সে দেখে আসছে, ভিজিটের টাকার বদলে সবাই, গম, মকাই, কলাই দেয়। তাতেই তাদের সংসার চলতো। একবছর ধরে রাখালবাবু শয্যাশায়ী ছিলেন। সঞ্চয় যা ছিল, সব তাতেই নিঃশেষিত। রাখালবাবুর শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা করার মতো কোন সঙ্গতি নেই তাদের।

সত্যচরণ সান্ত্বনা দিয়ে আসে। সে রাখালবাবুর শ্রাদ্ধের জন্যে স্টেট থেকে একশো টাকার ব্যবস্থা করে দেয়; সেই সঙ্গে প্রতি মাসে দশ টাকার সাহায্যেরও ব্যবস্থা করে দেয় সে। সময় পেলেই সে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসে। সেই দূর বিদেশে অগ্রজাতুল্য মহিলার স্নেহযত্ন বড়ো ভালো লাগে তার।

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্তে সরস্বতী কুণ্ডী। কুণ্ডীর তিন দিকে নিবিড় বন। বড় বড় বনস্পতির নিবিড় সমাবেশ এখানে। একদিকে ফাঁকা। সেদিকে বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও শৈলমালা চোখে পড়ে। কত রকমের পাখির মেলা এখানে! ফুলও ফোটে বহু রকমের।

নাঢ়া বইহারে এখন জরীপ হচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথে সত্যচরণ একটু ঘুরে যায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারের বনপাদপের ছায়ায়। কোনদিন বিচিত্র অনুভূতির প্রলোভনে সে গাছে চড়ে চারদিকের সৌন্দর্য উপভোগ করে। কোনদিন অয়েলক্লথ বিছিয়ে ঝোপের তলায় শুয়ে পড়ে। লোকে বলে, সরস্বতী কুণ্ডীর বনে বাঘ আছে। কিন্তু সত্যচরণ কোনদিন এখানে বাঘ দেখেনি। একদিন সে দেখলো একটা হরিণছানাকে। হরিণছানাটি তাকে দেখে নির্ভয়ে এগিয়ে এলো তার দিকে, অপলকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কিন্তু সত্যচরণের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে ভয় পেয়ে বনের আড়ালে উধাও হয়ে গেল।

এখানে বহু বিচিত্র পাখির কলকাকলিতে কানে তালা লেগে যায়। পাখিরাও অসংকোচে তার সন্নিহিত হয়, ভয় পায় না। পক্ষী-কূজনের সঙ্গে বনকুসুমের সুবাসও বাড়তে থাকে সেখানে। বিচিত্র বনস্পতিদের মগডাল জড়িয়ে ওঠে ভিঁয়োরা লতা। সত্যচরণ তার নাম দিয়েছে ভোমরা লতা। তাতে ছোট ছোট বনযুঁইয়ের মতো সাদা সাদা ফুলে গাছের মাথা ভরে যায়। চমৎকার সুঘ্রাণ। কুণ্ডীর বনে কত বুনো শিউলির গাছ। রাশি রাশি ফুল ঝরে পড়ে। সরস্বতী কুণ্ডীকে সত্যচরণ কত রূপেই দেখেছে! এক রাস-পূর্ণিমার রাতে তার জ্যোৎস্নাস্নাত সৌন্দর্য দেখবার জন্যে সে তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধুলো দিয়ে চলে আসে। সে অপার্থিব সৌন্দর্যের কোন তুলনাই নেই। এ অঞ্চলের অরণ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আমীন রঘুবর প্রসাদ বলে, সরস্বতী কুণ্ডী হলো মায়ার কুণ্ডী। জ্যোৎস্নারাতে ওর জলে পরীহুরীরা নামে। কেউ তা দেখতে পেলে, তাকে ওরা জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে।

এক দুপুরে সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সত্যচরণ দেখতে পায়, একটি লোক মাটিতে কিসের যেন বীজ পুঁতছে। পরিচয় নিয়ে সে জানতে পারে, লোকটির নাম যুগলপ্রসাদ —লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই। লোকটার সুন্দর হস্তাক্ষর, লেখাপড়ার এলেম আছে, বিয়ে করেছে; কিন্তু সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ-সাধু-সন্ন্যিসিও নয়। ওর বাতিক হলো, নানা জায়গা থেকে নানারকম ফুলের বীজ সংগ্রহ করে এখানকার জঙ্গলের মাটিতে পুঁতে জঙ্গলের শোভা বৃদ্ধি করা। এ কাজে তাকে কেউ নিয়োগ করেনি। সে স্বেচ্ছায় অর্থ ব্যয় করে এবং শ্রম স্বীকার করে এই কাজ করে আসছে বহু বছর ধরে।

তার কথা শুনে সত্যচরণ মুগ্ধ হয়ে তাকে কাছারিতে দশ টাকা মাইনের খাতা-লেখার কাজে নিয়োগ করে এবং সবার অলক্ষ্যে সে যুগলপ্রসাদের সঙ্গে নানা দুষ্প্রাপ্য ফুলের বীজ জঙ্গলের আনাচে-কানাচে পুঁতে চলে। যথাসময়ে সেগুলিতে ফুল ফোটে। তা দেখার জন্যে যুগলপ্রসাদ সাত মাইল পথ ছুটে গিয়ে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরে উপস্থিত হয়।

সত্যচরণ গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনলো, জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে দুধিয়া নামে এক রকম বনফুল হয়। হলুদ গাছের মতো গাছ—চার-পাঁচটা লম্বা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক

ডাঁটায় চারটি করে হলুদ রঙের ফুল হয়। রাতে অনেক দূর পর্যন্ত তার সুবাস ছড়ায়। বর্ষাকালে যুগলপ্রসাদ অনেক অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল থেকে দশ-বারো গণ্ডা দুধিয়া গাছের গেঁড় সংগ্রহ করে আনলো।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। লবটুলিয়া আর আজমবাদের বন্যপ্রকৃতি সত্যচরণের চোখে যেন মায়া-কাজল পরিয়ে দিয়েছে। সে পাটনায় কয়েক দিনের জন্যে গিয়ে এখানে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ওপরওয়ালারা প্রজাবিলি অবিলম্বে শেষ করবার জন্যে তাগাদা দেয়। কিন্তু প্রজা বসিয়ে প্রকৃতির এমন নিভৃত সৌন্দর্যলোক ধ্বংস করতে সত্যচরণের প্রাণ চায় না। জমি বিলি হয়ে গেলে এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হবে। বনলক্ষ্মীরাও বিদায় নেবেন।

পাটনা থেকে ছটু সিং নামে এক রাজপুত হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত চেয়ে দরখাস্ত করে। তার দরখাস্তটা সদরে পাঠিয়ে দিয়ে অরণ্য-বিনাশ ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সত্যচরণ কালহরণ করতে থাকে।

একদিন নাঢ়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে সত্যচরণের দেখা হলো ষাট বছরের বৃদ্ধ মটুকনাথ পাঁড়ের সঙ্গে। মটুকনাথ সত্যচরণের নাম শুনে অনেক দূর থেকে রোজগারের প্রত্যাশায় আসছে। তিনদিন ধরে পথ হেঁটেছে সে। কিন্তু এখানে লোকজন কোথায়? রোজগার হবে কিসে? মটুকনাথ প্রস্তাব করে কাছারির পাশে একটা টোল খুলে দেবার জন্যে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-বংশের ছেলে সে—সংস্কৃত-জ্ঞান আছে। সত্যচরণ মটুকনাথকে কাছারিতে নিয়ে আসে। সে তাকে জমি নিয়ে চাষ করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু মটুকনাথ তাকে একটা টোল খুলে দেবার জন্যে ধরে পড়ে। টোলে ছাত্র কোথা থেকে আসবে, সে বিষয়ে ভালোমানুষ মটুকনাথের কোন ধারণাই নেই।

সত্যচরণ কাছারির পাশেই টোলের ঘর তৈরী করে দেয়। মটুকনাথ দু' তিনটে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে টোলের প্রতিষ্ঠা করে। দিনের পর দিন সে সকালে-বিকেলে একা-একাই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করে। কিন্তু ছাত্রের দেখা নেই। নিজের হাতে প্রতিমা তৈরী করে সে সরস্বতী পূজো করলো। তার দশ-বারো দিন পরে মটুকনাথের একটি ছাত্র জুটলো। চৌদ্দ-পনেরো বছরের শীর্ণকায় এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ বালক। বড়ো গরীব। পরনের দ্বিতীয় বস্ত্রও নেই। মটুকনাথের নিজের আহার জোটে না। তবু সে সেই বিদ্যার্থী দরিদ্র বালকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। অন্ধকারে কিংবা জ্যোৎস্নালোকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত হরীতকী গাছের তলায় তার বিদ্যাদান চলে। কিন্তু একটা গুণ আছে মটুকনাথের। জমি ও ঘর বেঁধে দেওয়া ছাড়া সত্যচরণের কাছে অন্য কোন সাহায্যই সে চায়নি।

সিপাইরা স্বেচ্ছায় তাকে যা দেয়, তাতেই সে চালিয়ে নেয়। কয়েক মাসের মধ্যে আরো দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো বালক বিনা-পরিশ্রমে খেতে পাওয়ার লোভে মটুকনাথের টোলে এসে জুটলো ; সিপাইরা চাঁদা করে আটা ও ছাতু দেয়। তাতে সব দিন চলে না। কখনো কখনো শুধু বাথুয়া শাকের সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতে হয় ওদের। শেষে বাথুয়া শাকও দুর্লভ হলে তাদের উপবাস করার কথা সত্যচরণের কানে আসে। সে দু' তিন দিনের চাল, ডাল, ঘি, আটা দিয়ে টোল তুলে দেবার পরামর্শ দেয়। মটুকনাথ তাতে ব্যথা পায়। টোল সে তুলে দিতে পারে না —ওটা ওর পৈতৃক ব্যবসায়। বনভূমির প্রান্ত-দেশে মটুকনাথ যেন একটি ঋষির আশ্রম খুলে বসেছে। কিন্তু ঋষির আশ্রম-বালকদের কেউ কেউ কাছারির মাচা থেকে লাউ-কুমড়ো থেকে কাছারির কর্মচারীদের জিনিসপত্র চুরি করতে লাগলো। একবার নায়েবের খোলা ক্যাশবাক্স থেকে কিছু টাকা ও একটি সোনার আঙ্‌টি চুরি গেল। কয়েকদিন পরে একটি ছেলের কোমরের ঘুন্‌সী থেকে আঙ্‌টিটি পাওয়া গেল। সত্যচরণ মটুকনাথকে কিছু জমি দেবার প্রস্তাব করে। তার ছাত্ররা পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়ে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করুক। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই বারোজন ছাত্রের মধ্যে আটজনই গেল পালিয়ে। সেই থেকে মটুকনাথের টোল চলছে সুষ্ঠুভাবেই।

ছটু সিং এবং অন্যান্য প্রজাদের জমি বিলি হয়ে গেল। তারপরই শুরু হয়ে গেল জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ। আগুনে পুড়তে লাগলো সৌন্দর্যময় বনভূমি। কার্তিক মাসের মধ্যেই মাঠে সর্ষে বোনা হয়ে গেল। লোকবসতি গড়ে উঠলো এখানে-ওখানে। শীতকালে দিগন্তবিস্তৃত সর্ষে ক্ষেত হলুদ ফুলে ছেয়ে গেল। ইন্দ্রনীলমণির মতো নীলাকাশের নীচে হলুদ রঙের ধরণীকে অপরূপ লাগে। গরীব প্রজাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষেতের ধারে খেলে বেড়ায়। সত্যচরণ তাদের জন্যে একটি নৈশস্কুল স্থাপনের কথা ভাবে।

ফসল ওঠার মুখে প্রচণ্ড রকমের দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল নাঢ়া বইহারে। ছটু সিং এক হাজার বিঘা জমির বন্দোবস্ত নিয়েছে। কিন্তু দখল করতে চায় দু' হাজার বিঘে জমি। ফলে, গরীব গাঙ্গোতা প্রজাদের জমিও সে লাঠির জোরে দখল করতে চায়। সে গোপনে রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা আনিয়েছে। শুধু তাই নয়, নন্দলাল ওঝা আর রাসবিহারী সিং গোপনে ওর সঙ্গে ভিড়েছে। যাই হোক, সত্যচরণের হস্তক্ষেপে এবং পুলিশের ভয়ে দাঙ্গা আপাততঃ বন্ধ হলেও নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরকালের মতো তিরোহিত হলো।

ফসল-কাটার সময় এ অঞ্চলে ক্ষেতে বসেই খাজনা আদায় করতে হয়। কাটুনী মজুরেরা পূর্ণিয়া, তরাই, জয়ন্তীর পাহাড় অঞ্চল থেকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ফসল কাটতে এসে কাশের খুপরিতে বাস করে। তাদের মধ্যে সত্যচরণকেও একটি কাশের খুপরিতে আদায়-ওয়াশিলের উপলক্ষে কয়েকদিনের জন্যে বাস করতে হলো। সেখানে সারাদিনের কাজের পর খুপরির সামনে আগুন জেলে শীত তাড়াতে হয়। এক-

একদিন গনোরী তেওয়ারী এবং আরো অনেকে এসে জোটে। শুরু হয় গল্প। সেখানে সত্যচরণ গনোরীর মুখে শোনে বন্য-মহিষদের দেবতা টাঁড়বারোর কথা। টাঁড়বারো সব রকম বিপদ থেকে বন্যমহিষদের রক্ষা করেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ফুলকিয়া বইহারে হাড়ভাঙা শীত পড়েছে। একদিন রাতে এক গাঙ্গোতা প্রজার খুপরির ভেতর থেকে একটি ছ' মাসের শিশুকে বাঘে নিয়ে যায়। তার তিনদিন পরে সন্ধ্যের সময় নিয়ে গেল এক রাখালকে। ফলে, ঘুম বন্ধ করে খুপরির লোকেরা সারা রাত টিনের ক্যানেস্তা পেটায়, সত্যচরণ আর বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের আওয়াজ করে। শুধু বাঘ নয়, বন্য মহিষের দলও মাঝে মাঝে এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিয়ে যায়।

সত্যচরণের খুপরির দু' তিনশো হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুরের কাটুনীর দলের অনেকগুলো খুপরি। একদিন সত্যচরণ আসার সময় একটি খুপরির সামনে ওদের কয়েকজনকে আগুন পোয়াতে দেখে কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করলো। দলের বৃদ্ধ ব্যক্তির নাম নক্‌ছেদী ভকত। সে তাকে আগুন পোয়াতে আমন্ত্রণ করলো। সত্যচরণ আগুনের পাশে বসে খুপরির দিকে তাকালো। সেই প্রচণ্ড শীতে লেপ-কম্বল দূরের কথা, পরনের বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত বস্ত্র খুপরিতে নেই। খুপরির কোণে মজুত কলাইয়ের ভুষির মধ্যে শুয়ে শীতের রাত কাটায়। খায় মকাই-সেদ্ধ ঘাটো। সঙ্গে একটু নুন, একটু শাক। সারা বছর স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে ফসল কাটে —সর্ষের পর ধান, ধানের পর গম, গমের পর খেড়ী। তারপর কিছুদিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে মকাই, মকাইর পর কলাই, কলাইর পর কার্তিক-শাল ধান। এক-এক অঞ্চলে ফলে এক-এক ফসল। এইভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ফসল কাটতে কাটতেই তাদের বছর ঘুরে যায়। বাঘ, বন্য মহিষ, বন্য শূকর, বুনো হাতীর ভয় ওদের গা-সওয়া। তারা শহর কলকাতার নাম শুনেছে মাত্র। শহর সম্বন্ধে ওদের কোন ধারণাই নেই।

দিন-পনেরোর মধ্যেই ফুলকিয়া-বইহারে সর্ষে কেনার জন্যে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা দাঁড়ি পাল্লা ও বস্তা নিয়ে হাজির হলো দলে দলে। সঙ্গে সঙ্গে এলো কুলি ও গাড়োয়ানের দল। এলো মিঠাইর দোকানদারেরা। তারা সতেজে পুরী, কচৌরী, লাড্ডু, কালাকন্দ্‌ বিক্রী করতে লাগলো। এলো ফেরিওলারা সস্তা মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি নিয়ে। তাছাড়া এলো আরো নানা ধরনের লোক। তারা নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে, রামসীতা সেজে ভক্তের পূজো আদায় করে, হনুমানজীর সিঁদুর-মাখা মূর্তি-হাতে প্রণামী কুড়োয়। জনশূন্য ফুলকিয়া-বইহারের প্রান্তর এখন জনজীবনের উল্লাসে জমজমাট। সরল নির্বোধ প্রজারা তাদের অমানুষিক পরিশ্রমলব্ধ ফসল দুদিনেই উড়িয়ে দেয়। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সবাই ওদের ঠকায়।

বাইরের লোকদের কাছেও খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা হলো। একদিন খাজনা না দিয়ে পালাবার চেষ্টার অপরাধে কাছারির সিপাইরা একটা লোককে ধরে আনলো। সে 'ননীচোর নাটুয়া' সেজে নাচ দেখিয়ে এখানে পয়সা রোজগার করেছে। তার নাম দশরথ—ভূমিহার ব্রাহ্মণ। সে স্বীকার করলো, খাজনা দেবার মতো তার সামর্থ্য নেই। এখানে সে যা রোজগার করেছে, তাতে সে খেয়ে মাত্র তেরো আনা পয়সা বাঁচিয়েছে। এতে আগামী গমের মরশুম পর্যন্ত তাকে চালাতে হবে। তা এখনো তিনমাস বাকি। সত্যচরণ তার কথা শুনে তার খাজনা মকুব করে দেয়। কিন্তু বিনিময়ে তাকে নাচ দেখাতে বলে। সে তাতে খুশী হয়ে মুখে রং মেখে, মাথায় ময়ূরপাখাখচিত রাংতার মুকুট পরে ননীচোর শ্রীকৃষ্ণের নাচ দেখালো। ষাট বছরের বৃদ্ধের বালক-শ্রীকৃষ্ণের নাচ দেখে সিপাইরা হাসি চাপতে পারছিল না। সত্যচরণ তার নাচ দেখে হাসবে না কাঁদবে—বুঝতে পারলো না। সে খুশী হয়ে ওর নাচের প্রশংসা করে ওকে দু' টাকা বকশিশ দেয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই ফসল বেচাকেনা ফুরিয়ে গেল। প্রজারা ছাড়া সবাই একে একে চলে গেল। ফুলকিয়া-বইহার ফাঁকা হয়ে গেল।

একদিন সত্যচরণ নক্ছেদী ভকতের খুপরিতে গেল। ওরাও এবার চলে যাবে। নক্ছেদী ভকতের দুই স্ত্রী। একজন প্রৌঢ়া, অন্যজন অল্পবয়সী—নাম তার মঞ্চী। কাজ ফুরিয়েছে অনেক দিন। এতদিনে ওদের চলে যাবার কথা। কিন্তু মঞ্চী মেলা দেখবে, নাচ-তামাশা দেখবে, লোকজন দেখবে, মেলায় শৌখিন জিনিসপত্র কিনবে ; তাই তরুণী বৌর আবদারে বৃদ্ধ নক্ছেদীকে এতদিন থেকে যেতে হলো।

মঞ্চীর মধ্যে আছে এক আশ্চর্য বালিকাসুলভ চাপল্য। সে মেলায় কি কিনেছে, সব এনে সত্যচরণকে দেখায়। সে কিনেছে চিরুণী, গন্ধ সাবান, মাথার কাঁটা, পাথরের আংটি, চীনামাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ, চওড়া লাল ফিতে আর একটা নীল ও হলদে হিংলাজের মালা। সবই সর্ষের বিনিময়ে। এরা মজুরী পায় ফসলের হিসাবেই। সত্যচরণ দাম শুনে অবাক হয়ে গেল। ব্যবসায়ীরা এই সরল বন্য বালিকাকে ভীষণ রকমের ঠকিয়েছে। সে কথা সে প্রকাশ করলে পাছে মঞ্চীকে নক্ছেদীর বকুনি শুনতে হয়, তাই সে চুপ করে রইলো। পরের বছর যাতে ব্যবসায়ীরা এদের এভাবে ঠকাতে না পারে, তার ব্যবস্থা করবার জন্যে সে মনে মনে সংকল্প স্থির করে ফেললো।

পরের দিন নক্ছেদী সপরিবারে বিদায় নিল। যাবার আগে নক্ছেদী খাজনা দেবার জন্যে সত্যচরণের খুপরিতে এলো। সঙ্গে এলো মঞ্চী। সে তার গলায় হিংলাজের মালাটি পরেছে। হাসিমুখে বলে গেল, আগামী মকাইর মরশুমে সে যখন মকাই কাটতে আসবে, তখন সে এই বাবুজীর জন্যে জংলী হর্তুকির আচার তৈরী করে নিয়ে আসবে।

তাকে ভালোবাসে। সে তখন খুব সাহস করে অধ্যাপকের কাছে তার মনোবাসনার কথা বলে ফেলে। কোন বাধা ছিল না। স্বজাতি, স্বঘর। অধ্যাপক রাজুর সঙ্গে সরযূর বিবাহ দিলেন। কিন্তু সেই সরযূ সতেরো-আঠারো বছর আগে মারা গেছে।

মিছি নদীর উত্তর পাড়ের জঙ্গল-পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হচ্ছে। সেখানে সত্যচরণ তাঁবুতে আট-দশদিন আছে; আরো আট-দশদিন থাকতে হবে। সুন্দর জায়গাটি। অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা—কাঁটাবাঁশ আর নানা গাছপালার জঙ্গল। হরিণ আছে। বড় মোরগ আছে, আর আছে বাঘ। কিন্তু সত্যচরণ এখানে কোন বাঘ দেখেনি।

ঝরনার ধারে কুটির বেঁধে বাস করে একটি গোঁড় পরিবার। সুন্দর দুটি মেয়ে আছে। একটির বয়স ষোল-সতেরো, অন্যটির বছর চৌদ্দ। রং কুচকুচে কালো, নিটোল স্বাস্থ্য—মুখশ্রীতে সরল সৌন্দর্য। ওরা মহিষ নিয়ে রোজ সকালে পাহাড়ে চরাতে যায়—ফেরে সন্ধ্যের আগে। একদিন ছোট মেয়েটি সত্যচরণের কাছে এসে তার দিদির জন্যে বিড়ি চাইলো। সত্যচরণের কাছে বিড়ি ছিল না—চুরুট ছিল। সে তা বেশী কড়া বলে ওদের দিল না।

সেদিন সত্যচরণ ওদের কুঠিতে গেল। গৃহকর্তা খাতির করে ওকে বসালো। মেয়ে দুটি নুন দিয়ে মকাই-সেদ্ধ খাচ্ছে। পরিবারটির বাড়ি শিউলি জেলাতে। এখানে মহিষ চরাবার ঘাস ও পানীয় জলের প্রাচুর্যের জন্যে তারা এখানে বছর-খানেক হলো আছে। তাছাড়া, কাঁটাবাঁশে ধামা ও মাথায় দেবার টোকা তৈরী করার প্রচুর সুযোগ এখানে। শিবরাত্রির সময় অখিলকুচার মেলায় তা বিক্রী করে দুটো পয়সাও হয়। তার ওপর পাহাড়ে প্রচুর বুনো আতা ফলে। কেউ নেয় না—পেকে ফেটে মাটিতে পড়ে থাকে ছড়িয়ে। এখানে আশ্রয় নেবার ওটাও একটা আকর্ষণ।

সেখানে দেখা হয় এক জটাজুটধারী বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে। তিনি পনোরো-যোলো বছর হলো এই পাহাড়ের গুহায় থাকেন। বন থেকে পান পাকা আমলকী আর পাকা আতা। গাঁয়ের লোকেরা মাঝেমধ্যে দিয়ে যায় দুধ, ছাতু, ভুরা। বাঘ দেখেন নি তিনি এখানে, দেখেছেন একটা বিরাট অজগর—তালগাছের মতো মোটা।

সত্যচরণের ক্যাম্পে একদিন এলো কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। লম্বা কালো চেহারা, সার্জের কোট গায়ে। পরনে আধময়লা ধুতি, মাথার চুল রুক্ষ। বয়স চল্লিশোত্তীর্ণ। সুন্দর, মার্জিত হিন্দীতে কথা বলে। সে চাকরির উমেদারি করতে আসেনি। সে এসেছে তার লেখা কবিতা শোনাতে। এই শিক্ষিত বাঙালীবাবুকে সে কবিতার একজন সমঝদার শ্রোতা ভেবেছে। সত্যচরণ বহুক্ষণ ধরে তার কবিতা শুনলো। বিশেষ কিছুই না বুঝলেও সে তার কবিতার প্রশংসা করে। তাতে খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ।

সেদিন সে বিদায় নিল। পরদিন বিকেলে সে সত্যচরণকে চকমকিটোলায় তার বাড়িতে নিয়ে গেল। পায়ে হেঁটেই সত্যচরণ গম-যবের ক্ষেতের পাশ দিয়ে তার বাড়ি যায়। চারদিকে এক নীরব শান্তি। গ্রামখানি চালে-চালে ঠাসা। একখানা

মাঝারি গোছের খোলা-ছাওয়া বাড়িতে বেঙ্কটেশ্বর সত্যচরণকে নিয়ে তুললো। একটু পরে কবি-পত্নী রুক্মা স্বহস্তে মকাইভাজা ও দইবড়া নিয়ে এলেন। একটি সরল সৌজন্য, শ্রী ও স্বাস্থ্য তাঁর চোখেমুখে। তিনি অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গিতে অতিথির সঙ্গে আলাপ করেন। সত্যচরণের প্রস্তাবে তিনজন একত্র আহার করলেন। তারপর স্বহস্তে তৈরী প্যাঁড়া নিয়ে এলেন কবিপত্নী। কবিপত্নীর মুখে মধুর দেহাতী হিন্দী শুনতে সত্যচরণের খুব ভালো লাগলো।

সত্যচরণের অনুরোধে বেঙ্কটেশ্বর শোনালো একটি কাহিনী-কবিতা। কাহিনীটি একটি রোমান্টিক প্রেমের। এক তরুণ যুবক খালের ধারে ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত। ওপারের ঘাটে রোজ একটি মেয়ে কলসী কাঁখে জল নিতে আসতো। ছেলেটি গোরু-ছাগল তাড়াতো, শিস দিত, গান করতো আর মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে তাকাতো। লজ্জায় মেয়েটি চোখ নামাতো। ছেলেটি রোজ ভাবতো, কাল সে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায়, সে তার মনের কথাটি মেয়েটিকে বলতে পারে না। তারপর একদিন মেয়েটি এলো না, পরের দিনও এলো না। দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে যায়—মেয়েটি আর কোনদিনই আসেনি। ছেলেটি আজও মেয়েটিকে ভুলতে পারেনি। সত্যচরণের মনে হয়, কাহিনীটি বেঙ্কটেশ্বরের কিশোর বয়সেরই অভিজ্ঞতা। সুরূপা রুক্মাকে পেয়েও কি তার কৈশোরের দুঃখ আজও ঘোচেনি? বেঙ্কটেশ্বর সত্যচরণকে ফেরার পথে একটি বটগাছ দেখায়, যার নীচে একটি কবিসভায় সে কবিতা-পাঠের সুযোগ পেয়েছিল। পাটনার 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে তার কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। দিনটি তার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সার্ভে-ক্যাম্পে তিনমাস কাটলো। মূল কাছারিতে ফিরে আসে সত্যচরণ। এই ক'বছরে সে এই লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারকে ভালোবেসে ফেলেছে। এদের ছেড়ে দূরে গেলে প্রাণ কেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ফেরার পথে চোখে পড়ে, কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কুসুম ফুল কাটছে। ওকে দেখে কাস্তে হাতে 'বাবুজী' 'বাবুজী' বলে ছুটে এলো একটি মেয়ে। সে মঞ্চী। তাকে চিনতে সত্যচরণের অসুবিধে হয় নি। মঞ্চী আরো স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। কুসুম-ফুলের পাপড়ির গুঁড়ো লেগেছে তার হাতে আর সামনের দিকের কাপড়ে।

সেদিন বেলা হয়ে গিয়েছিল। মঞ্চীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাকে তাদের খুপরিতে যেতে হলো। খুপরিতে নক্‌ছেদীর বড় বৌ তুলসী রান্না করছিল। নক্‌ছেদীও ক্ষেতের কাজ ফেলে চলে এলো। সবাই খুশী। মঞ্চী মহুয়ার তেল এনে দিল স্নানের জন্যে। কাছের কুণ্ডীতে স্নানের জন্যে যেতে ডাকলো। কিন্তু সেই একই কুণ্ডীর জলে এরা কাপড় কাচে, বাসন মাজে, মুখ ধোয়, স্নান করে। সত্যচরণ তাতে স্নান করতে চাইলো না। সে ও জল খাবেও না। কিন্তু মঞ্চী কোথায় পাবে ভালো জল? সে

মঙ্কীকে ঐ জল ভালো করে ফুটিয়ে দিতে বললো। মঙ্কী স্নানের জন্যেও এক টিন জল ফুটিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। সে নিজে জল নিয়ে এসে সত্যচরণকে রান্না করে নিতে অনুরোধ করলো। সত্যচরণ শুনলো না। মঙ্কীকেই তার রান্না করে দিতে হলো। নক্‌ছেদী কোথা থেকে মোষের দুধ সংগ্রহ করে আনলো। খেতে বসে তাকে শুনতে হলো মঙ্কীর দেশ-বিদেশ ঘোরার গল্প। মঙ্কী একটা রামছাগলের বাচ্চা পুষেছিল, বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে। কাঁকোয়াড়ায় গরম জলের কুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে পাণ্ডাদের হাতে সে একবার মার খেয়েছিল। সে কলকাতায় গিয়ে এ সব লেখার জন্যে অনুরোধ করে সত্যচরণকে—যেন পাণ্ডারা জব্দ হয়।

বিদায় নেবার সময় সত্যচরণ আগামী বোশেখ মাসে লবটুলিয়া-বইহারে যব গম কাটতে আসার জন্যে তাকে বারবার অনুরোধ করে এলো। মঙ্কী যেন বনলক্ষ্মীর আশ্চর্য প্রতিমূর্তি। তার সরল বালিকা-মূর্তি অবিস্মরণীয়।

শ্রাবণ মাসে চারদিকে সবুজের ঢল নেমেছে। একদিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি এলো—আগামী শ্রাবণ-পূর্ণিমায় ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ। সত্যচরণ ঘোড়ায় চড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললো। সঙ্গে চললো রাজু পাঁড়ে ও মটুকনাথ। তারা রাজা ও রাজবাড়ির দৈন্যদশা দেখে হতাশ হলো।

এবারে সত্যচরণের অভ্যর্থনার জন্যে আগেকার সেই খড়ের ঘরখানা সুন্দর করে লেপেপুঁছে রাখা হয়েছে। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্মগাছ ও ময়ূর আঁকা। শালের খুঁটিতে লতা ও ফুল জড়ানো। ঘরে নতুন মাদুর পাতা। তাতে গোটা দুই ফর্সা তাকিয়া।

একটু পরে ভানুমতী বড়ো একটা পেতলের সরাতে কাটা ফলমূল আর একবাটি জ্বাল-দেওয়া দুধ নিয়ে এলো। তার পেছনে এলো আর একটি মেয়ে একখানা কাঁচা শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপুরি আর পানের অন্যান্য মশলা নিয়ে। ভানুমতী আরো স্বাস্থ্যবতী, আরো লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে তেমনি সরলা বন-বালিকাই আছে। প্রথম আলাপের পর সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পেতলের থালা থেকে সত্যচরণের হাতে দুখানা পেঁপের টুকরো দিল। এদেশের অরণ্য-প্রান্তরের মতো ভানুমতীর ব্যবহার সরল, সঙ্কোচহীন এবং উদার। রাজা দোবরু উৎসবের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এক সময় এসে দেখা করলেন। পাশের টোলা ও পাহাড়ী বস্তি থেকে ভানুমতীর সমবয়সী প্রায় ত্রিশজন মেয়ে এসে জুটেছে। মাঝরাতে আগামী কালের জন্যে ঝুলনের গানের মহড়া শুরু হয়ে যায় মেয়েদের কণ্ঠে। সত্যচরণ তা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন দুপুরে খাবার সময় ভানুমতী একবাটি দুধ নিয়ে এলো। অন্য মেয়েরা তামাশা করার জন্যে নিয়ে এলো কাঁচালঙ্কা।

সন্ধ্যের আগেই তরুণ-তরুণীরা ঝুলন-পূর্ণিমার নাচগানের জন্যে পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় একটা সমতল জায়গা। তার মাঝখানে একটা

প্রাচীন পিয়াল গাছ। গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নাচতে গাইতে লাগলো। তাদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গয়না। পুরোভাগে ভানুমতী। তাদের পাশে পাশে একদল যুবক মাদল বাজিয়ে ঘুরছে। ওদের নাচ-গানের মধ্য দিয়ে আদিম ভারতের সংস্কৃতি মূর্ত হয়ে ওঠে। গভীর রাতে সবাই পাহাড় থেকে নেমে আসে। সত্যচরণ খেতে বসলে ভানুমতী দুধ ও পেঁড়া নিয়ে এলো। সত্যচরণ ওদের নাচের প্রশংসা করে। কিন্তু ভানুমতীর মনে সংশয় থেকে যায়, কলকাতার বাবুজীর কি ওদের নাচ সত্যিসত্যিই ভালো লেগেছে। ভানুমতীর একটা আয়না ছিল, ওটা ভেঙে গেছে। সত্যচরণকে সে কলকাতা থেকে একখানা আয়না এনে দেবার জন্যে খুব সরলভাবে অনুরোধ করে। সত্যচরণ কাছারিতে ফিরে এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া থেকে একখানা আয়না কিনে পাঠিয়ে দেয় ভানুমতীর কাছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসের প্রথমে একদিন লবটুলিয়া থেকে কাছারিতে ফেরার সময় সত্যচরণ দেখতে পায়, আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক পাঁচ-ছয়টি মেয়ে এবং ছ-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে পিকনিক করতে এসেছে। সত্যচরণকে তারা ছাতুখোর অবাঙালী ভেবে কয়েকটি স্থূল রসিকতা করে। সত্যচরণ পরিষ্কার বাংলায় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তারা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে যায় এবং মার্জনা চায়।

সত্যচরণ জানতে পারে, দলের প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—রায়বাহাদুর। বাকি সবাই তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাতনী, জামাই ও জামাইয়ের বন্ধু ইত্যাদি। রায়বাহাদুর বই পড়ে জানতে পারেন, এখানে শিকার করার অপূর্ব সুযোগ। তাই পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাইয়ের কাছে এসে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কাটারিয়া এবং কাটারিয়া থেকে কুশী নদীতে নৌকায় করে এখানে এসেছেন পিকনিক করার জন্যে। পিকনিক সেরে আজই ফিরে যাবেন কাটারিয়ায়। মেয়েগুলি চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় রান্নায় ব্যস্ত। চীৎকার চেঁচামেচি করে স্থানটির নিন্দে করছে তারা। ছেলেমেয়েগুলি ছুটোছুটি দাপাদাপি করে খেলছে, গান করছে। লোকগুলিরও বকুনির বিরাম নেই। পূর্ণিয়ায় সিনেমা দেখার গল্প চলেছে। অথচ এদের চারদিকে প্রকৃতির যে সৌন্দর্যের অপরূপ লীলা-নিকেতন মায়াজাল বিস্তার করে বিরাজমান, তা দেখার জন্যে কেউ এতটুকু উৎসাহী নয়—তা দেখার চোখও নেই কারো। এরা কেউ জানেনা, এরা যেখানে মহাকলরবে পিকনিক করছে, তার আট-দশ হাত দূরেই জ্যোৎস্নারাতে পরীরা খেলা করে বেড়ায়।

ওরা সেদিন পিকনিক সেরে চলে গেল। কিন্তু ফেলে গেল কয়েকটা খালি জমাট দুধের টিন আর জ্যামের টিন। লবটুলিয়ার বনে সেগুলি কী খাপছাড়াই না দেখাচ্ছিল!

বসন্তের শেষেই গম পেকে উঠলো। গত বছর সর্ষের চাষ বেশী হয়েছিল। এ বছর

গমের চাষই বেশী। দু'তিন হাজার বিঘে জমিতে গম হয়েছে। কাটুনী এলো প্রায় তিন-চার হাজার। তাদের ঠকাবার জন্যে লোকও এসেছে বহু। একবার এক জুয়াখেলা-ওয়ালাকে ধরে আনলো সিপাহীরা। তাকে মহালের বাইরে বের করে দেওয়া হলো।

কাটুনীদের মধ্যে মঞ্চীকে না দেখে সত্যচরণ উদ্বেগ ও বিস্ময় দুই-ই অনুভব করলো। কেউ তাদের কথা বলতে পারে না। অনেক সন্ধানের পর এক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে শোনা গেল, সে নাকি ওদের গত ফাল্গুন মাসে আকবরপুর গবর্নমেণ্ট খাসমহলে ফসল কাটতে দেখেছে।

ফসলের মেলা শেষ হলে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি একদিন নক্‌ছেদী ভকত সপরিবারে কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত হলো। তার কাছে সত্যচরণ জানতে পারে, মঞ্চী তাদের ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে। সস্তা বিলাসদ্রব্যের প্রতি এবং কলকাতা দেখার জন্যে মঞ্চীর যেরূপ আগ্রহ দেখেছিল সত্যচরণ, তাতে তাকে প্রলোভন দেখিয়ে কারও ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তার ছেলেটি গত মাঘ মাসে বসন্ত রোগে মারা গেছে। তারপরই সে কেমন পাগল হয়ে যায়। তারপর এক ধূর্ত রাজপুত যুবক ওখানে ওদের খুপরির কাছে ঘুরঘুর করতো। সম্ভবতঃ সে-ই মঞ্চীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। সে তার অত শখের জিনিসগুলোর বাক্সটা ফেলে গেছে; নক্‌ছেদী ও তার বড় বৌ তুলসী দুজনে মঞ্চীর চলে যাওয়ার জন্যে দুঃখিত। মঞ্চীর পরিশ্রমেই এই পরিবারের পেট চলতো। এবার নক্‌ছেদী সত্যচরণের কাছে স্থায়ীভাবে বসবাস করে চাষ করবার জন্যে কিছু জমি চাইলো। সত্যচরণ নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের মধ্যে তাকে কিছু জমি দেয়। সেখানে লোকবসতিহীন নির্জন জঙ্গলের মধ্যে দুটি কাশের খুপরি তৈরী করে বৃদ্ধ নক্‌ছেদী তার বৌ তুলসী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করে।

সেদিন নক্‌ছেদী খুপরিতে ছিল না। তুলসী সত্যচরণকে খুব খাতির করে বসায়। তার মেয়ে সুরতিয়া মঞ্চীর বাক্স বের করে এনে সত্যচরণকে তার ছোটমার শখের জিনিসগুলো দেখায়। সুরতিয়া একটা নীলগাইয়ের বাচ্চাকে ধরে এনে পুষছে। সে আরো পুষছে একটা ভালুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখি।

সত্যচরণের কাছে অবিলম্বে নাঢ়া বইহারের জঙ্গলটা প্রজাবিলি করে দেবারনির্দেশ এসেছে। এরপর এই অরণ্যের শ্রী লুপ্ত হবে। তার জায়গায় দাঁড়াবে খোলা চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই-জনাইর ক্ষেত—দেখা দেবে মানুষের নানা রকমের নোংরামি এবং রোগ-মহামারী।

একদিন সুরতিয়া সত্যচরণকে তার ফাঁদে পাখি-ধরা দেখালো। খাঁচার গুড়গুড়ি পাখি বনের একটা গুড়গুড়ি পাখিকে ডেকে আনলো। বনের পাখিটা ফাঁদে পা জড়িয়ে ধরা পড়ে গেল। সুরতিয়া এমনি করে পাখি ধরে আর নক্‌ছেদী ওগুলো তিরাশীরতন-গঞ্জের হাটে বেচে দিয়ে আসে। সত্যচরণ সেদিনের ধরা-পাখিটাকে কিনে নিতে চাইলে সুরতিয়া তাকে পাখিটা এম্‌নই দিয়ে দেয়।

আশ্বিন মাস। সত্যচরণ পত্র পেল, রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়েছেন এবং

রাজ-পরিবার খুব বিপন্ন। সত্যচরণ চকমকিটোলায় গিয়ে শুনলো, গোরু চরাতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে রাজা দোবরু হাঁটুতে যে আঘাত পান, তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ামাত্র মহাজন বীরবল সিং এসে রাজার সব গোরু-মহিষ বেঁধে রেখেছে। এই গোরু-মহিষ থেকে রাজ-পরিবারের অর্ধেক খরচ চলে। টাকা না পেলে বীরবল সিং গোরু-মহিষ ছাড়বে না। সত্যচরণ বীরবল সিংকে অনেক বোঝালো। সে কিন্তু লোক সুবিধের নয়। তবে সে মাস-দুই সময় মঞ্জুর করেছিল। ততদিন তার হেপাজতেই গোরু-মহিষ বাঁধা থাকবে।

ভানুমতী খুব কাঁদছিল। বিকেল হতেই সে সত্যচরণকে একা নিয়ে গেল রাজার কবর দেখাতে। নারী সব অবস্থাতেই সমান। বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া। রাজা দোবরুর মৃত্যুর জন্মে ভানুমতী তার বিয়োগ-ব্যথা দিয়ে সত্যচরণের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। সত্যচরণ ভানুমতীকে কিছু বনফুল কুড়িয়ে আনতে বলে। সমাধির ওপর ফুল ছড়ানোর প্রথা এরা জানে না। ভানুমতী ফুল কুড়িয়ে আনলে সে ও সত্যচরণ দুজনেই ওগুলি রাজার সমাধির ওপর ছড়িয়ে দেয়। আর্যজাতির বংশধরের হাতে অনার্য রাজার সমাধির উদ্দেশে সেই বোধহয় প্রথম সম্মান-নিবেদন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেবার দশ হাজার টাকা রেভিনিউ দাখিল করতে হবে। হাজার তিনেক টাকা কম্‌তি পড়েছে। তিন হাজার টাকা ধার করতে হবে। সত্যচরণ কাউকে কিছু না বলে বনোয়ারীলালকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে ধাওতাল সাহুর বাড়ি গেল। ধাওতাল সাহুর বাড়ি পওসদিয়ার একটা ঘিঞ্জি টোলার মধ্যে। ধাওতাল সাহু উঠোনের একপাশে তামাকের ক্ষেত নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করছিল। সত্যচরণকে দেখে সে শশব্যস্তে ছুটে এলো। তার ছেলে ঘোড়াকে ছায়ায় বেঁধে রেখে এদের পা ধোবার জল এনে দিল। ধাওতাল সাহু নিজেই পাখার হাওয়া করতে লাগলো। তাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করে এক সময় সত্যচরণ সাহুজীর কাছে টাকা কর্জ করার প্রস্তাব করে। ধাওতাল সাহু বললো, কাছারি থেকে এজন্মে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেই হতো। সত্যচরণ টাকাটা ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিতে চায়। ধাওতাল সাহু টাকা তো ধার দিলই, অধিকন্তু মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করিয়ে ছাড়লো।

টাকা শোধ দিতে ছ'মাস সময় লেগেছিল। এই ক'মাস ধাওতাল সাহু জঙ্গল-মহালের ত্রিসীমানার মধ্য দিয়েই হাঁটেনি।

প্রায় বছর খানেক সত্যচরণ রাখালবাবুদের বাড়ি যায়নি। ফসলের মেলার পরে সে ওখানে গেল। ওকে দেখে রাখালবাবুর স্ত্রী কেঁদে ফেললেন। রাখালবাবুর বড়ো ছেলেটি বাড়িতে টিনের মিস্ত্রীর কাজ করে। তাতেই কোনমতে সংসার চলে। দিদি তাকে তখনই চলে আসতে দিলেন না। মকাইর ছাতুর সঙ্গে ঘি ও চিনি দিয়ে

লাড্ডু ও কিছু হালুয়া তৈরী করে দরিদ্রা দিদি সত্যচরণকে আপ্যায়িত করলো। সত্যচরণ যখন জানতে পারলো, দিদি সেই মকাই ক্ষেত থেকে কুড়িয়ে সংগ্রহ করেছেন, তখন তার দুঃখের সীমা রইল না। যে কাজ গাঙ্গোতাদের মেয়েরা করে থাকে এবং যা রাজপুত-ছত্রিদের মেয়েরা অসম্মানজনক বলে মনে করে, এই বাঙালী বধূ অভাবের তাড়নায় তাই করতে বাধ্য হয়েছেন। এই নিঃস্ব বাঙালী পরিবার শিক্ষা-সংস্কৃতি পেল না। কিছুদিন পরে এরা হয়তো গঙ্গোতাদের সঙ্গেই মিশে যাবে।

রেলস্টেশন থেকে বহুদূরে এক অজ পাড়া-গাঁয় সত্যচরণ আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবারকে জানে। তার বাড়িতে তিনটিই বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে—স্বঘর বাঙালী পাত্রের অভাবে তাদের বিবাহই হতে পারেনি। এক বর্ণ বাংলা জানে না। বিহারীদের মতো নাম। কথায়-বার্তায়ও বিহারী। বড় বোনটি ধ্রুবা—গায়ে অসীম শক্তি নিয়ে মোট বয়, গম পেষে, ছাতু কোটে, গোরু-মহিষ চরায়। পাত্রের অভাবে ওদের দাদা একবার প্রস্তাব করেছিল, তিন ভগিনীকেই এক পাত্রে সম্প্রদান করবেন। তাতেও মেয়েদের অমত ছিল না। তাও সফল হয়নি। মঙ্গলশঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে কোনদিন ওদের বিবাহ হবে না। হয়তো সেই হতভাগিনী বাঙালী কুমারী গাঙ্গোতীনদের মতো দাদার সংসারে যব কুটছে, কিংবা ক্ষেত থেকে কলাইর বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরছে অথবা কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড় থেকে নামছে। রাখালবাবুর স্ত্রীও হয়তো এখন গভীর রাতে ক্ষেতে ঝরা ভুট্টা কুড়িয়ে ফিরছেন।

এক-একদিন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে। দিনরাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তরেখা ঝাপ্‌সা দেখায়, মহালিখারূপের পাহাড় অদৃশ্য হয়ে যায়। আপিস ঘরের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে বসে বৃষ্টি দেখা সত্যচরণের পোষায় না। সে ঘোড়ায় জিন কষে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে এক প্রবল মুক্তির আনন্দে। মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে সে সরস্বতী কুণ্ডীর বনের মধ্যে ঢোকে। যুগলপ্রসাদের স্বহস্ত-রোপিত নানা বন্যলতায় ও ফুলে এই বনভূমি অপরূপ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে কাছারিতে ফিরে আসে।

এমনি এক বর্ষণমুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া কাছারিতে এসে হাজির। ধাতুরিয়া আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে। সে খুব কষ্টে পড়েছে। কাছারিতে তাই নাচ দেখাতে এসেছে। ক'দিন ধাতুরিয়ার খাওয়াই হয়নি। সত্যচরণ তাকে দুধ আর চিঁড়ে খেতে দিল।

সন্ধ্যের আগে ধাতুরিয়া নাচ দেখালো। যথার্থ শিল্পী সে। এখন তার নাচের অনেক উন্নতি হয়েছে। সত্যচরণ নিজে তাকে কিছু দিল। কাছারির লোকেরা চাঁদা তুলে কিছু সংগ্রহ করে দিল। কিন্তু ওতে ধাতুরিয়ার ক'দিনই বা চলবে? পরের দিন সত্যচরণ ওকে খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো। কিন্তু আট ক্রোশ দূরে ঝল্লুটোলায় এক ভূমিহারের মেয়ের বিবাহে নাচবার সুযোগ গ্রহণের জন্যে সে তখনই চলে যেতে চায়। মটুকনাথ ধাতুরিয়াকে তার ছাত্র হিসেবে পেতে চায়। সত্যচরণ ওকে কিছু জমি নিয়ে

চাষ করতে বলে। চাষের সময় চাষ করবে। অন্য সময় সে নেচে পয়সা রোজগার করবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধাতুরিয়া সম্মত হয়। সত্যচরণের সহানুভূতিতে সে মুগ্ধ। কথা হলো, সে ঝল্লুটোলা থেকে এখানে চলে আসবে। যাবার আগে তাকে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ দেখাতে সত্যচরণ অনুরোধ করলো। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ দেখিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল ধাতুরিয়া। যাবার আগে তাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সে সত্যচরণকে অনুরোধ জানিয়ে গেল। সেখানেই যথার্থ নাচের আদর আছে।

ধাতুরিয়ার সঙ্গে সত্যচরণের সেই শেষ দেখা। মাস-দুই পরে তার মৃতদেহ কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে রেললাইনের ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওটা কি দুর্ঘটনা অথবা আত্মহত্যা? আত্মহত্যাই যদি হয়, তবে কি দুঃখেই বা ধাতুরিয়া আত্মহত্যা করেছিল?

নাঢ়া বইহার এবং লবটুলিয়ার সমস্ত জঙ্গল-মহাল বিলি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। কোথাও আর আগেকার বনভূমি নেই। যেখানে জ্যোৎস্নারাতে মায়া-পরীরা নামতো, যেখানে দয়ালু টাঁড়বারো বন্য মহিষদের রক্ষা করতেন, সেখানে আজ খোলার চালের লোকবসতি গড়ে উঠেছে। চাকরির খাতিরে বনভূমিকে ধ্বংস করলেও সত্যচরণ সরস্বতী কুণ্ডীর তীরভূমির অপূর্ব বনকুঞ্জ বন্দোবস্ত দিতে পারেনি। অনেক প্রজাই বর্ধিত হারে সেলামী ও খাজনা দিয়ে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী জঙ্গল বন্দোবস্ত নেবার জন্যে এসেছিল। সত্যচরণ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে বাংলাদেশের জন্যে মন উতলা হয়। বাংলাদেশে ফেরার দিন ঘনিয়ে আসছে। মনে এক অকারণ আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সেই আনন্দে জ্যোৎস্নারাতে ঘোড়ায় উঠে সে ছুটে যায় সরস্বতীর তীরে। জ্যোৎস্নালোকিত জলরাশি, বনফুলের শোভা, জ্যোৎস্নামাখানো বন্য শেফালীর সুবাস, শান্ত স্তব্ধতা—সব রইলো। সে এবার দেশে ফিরে যাবে। বিদায়, সরস্বতী কুণ্ডী!

ফেরার পথে সে একটি গৃহস্থ বাড়িতে রাজু পাঁড়ের গলা শুনে ঘোড়া থেকে নামলো। সবাই সত্যচরণকে খুব খাতির করে বসালো। হঠাৎ রাজু পাঁড়ে তাকে প্রশ্ন করে বসে, পৃথিবীর কি শেষ আছে? সে বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দেয়। সূর্য কোথাও যায় না—উদিতও হয় না, অস্তও যায় না—সে এক জায়গায় স্থির। পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমণ করে। তার উত্তর শুনে সমবেত সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। রাজু উদয় পাহাড়ের গুহা থেকে সূর্য-ওঠা এবং তাঁর অশ্বের রথের বর্ণনা দেয়। তার পরিচিত কোন এক সাধু সেই গুহা দেখে এসেছে, সূর্যের রথের অশ্বের কুচি নিয়ে এসেছে, তা রাজুর এক গুরুভাই স্বচক্ষে দেখেছে।

এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর হয় না। এই প্রমাণের পর অগত্যা বাঙালী-বাবুকে চুপ করে থাকতে হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যুগলপ্রসাদ সত্যচরণকে সঙ্গে নিয়ে মহালিখারূপের পাহাড়ে চীহড় ফলের সন্ধানে যাত্রা করলো। সঙ্গে চললো দুজন সিপাই।

লবটুলিয়া বইহারে এতটুকু বনজঙ্গল আর নাই—সবই নিঃশেষ। তাতে যুগলপ্রসাদ খুবই দুঃখিত। তার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ম্যানেজারবাবু সরস্বতীকুণ্ডীর তীরবর্তী জঙ্গল যেন প্রজাবিলি না করেন। সত্যচরণ কোন ভরসা দিতে পারে না।

মহালিখারূপের পাহাড়ে ওরা উঠতে লাগলো। কী সুন্দর রোদ্দুর, আর আকাশ কী আশ্চর্য নীল! চীহড় ফলের গাছ পাওয়া গেল অনেক উঁচুতে। স্থলপদ্মের মতো পাতা, মোটা কাষ্ঠময় লতা, সীমজাতীয় ফল—ভেতরে গোল বীচি। একটা গাছের ডালে ময়ূর বসে। একজন সিপাই গুলি করতে বন্দুক তুলেছিল। সত্যচরণ তাকে বারণ করে। যুগলপ্রসাদ বললো, ওখানে একটি গুহার গায়ে অনেক প্রাগৈতিহাসিক ছবি খোদাই করা আছে। অনেক অনুসন্ধানের পর গুহাটি আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু তার ভেতরে এত অন্ধকার যে, ঢোকার সাহস হলো না। বেলা ফুরিয়ে আসছিল। সিপাইরা নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বাঘ এবং বিষধর চন্দ্রবোড়া ও শঙ্খচূড়ের ভয় আছে ও-পাহাড়ে। অগত্যা সবাইকে নামতে হলো।

একদিন দেখা গেল, স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারী এক গৃহস্থ বাড়ির দাওয়ায় বসে শালপাতায় বিরাট একটা ছাতুর তাল মেখে জল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাচ্ছে। সত্যচরণ তাকে কাছারিতে নিমন্ত্রণ করে আসে। বিকেলে গনোরী কাছারিতে এলো। সত্যচরণ তাকে তার ব্যক্তিগত বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে জানতে পারে, পল্লী-অঞ্চলে পাঠশালা করে তার দিন কেটেছে। কিন্তু ছাত্রেরা মাইনে দেয় না। কাজেই, কোন পাঠশালাই দু'-তিনমাসের বেশী টেকে না। নিজের পেট চলে না, তাই বিবাহও করেনি। বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হলো। জাতিতে ব্রাহ্মণ, গত বছর যে গাঁয়ে সে পাঠশালা খুলেছিল, সে গাঁয়ে ছিল একটিমাত্র ব্রাহ্মণ-পরিবার। স্বজাত। সেই পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের সব ঠিকঠাক। গনোরী মুঙ্গের থেকে একটা ভাল মেরজাই কিনে আনলো। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা ভাঙচি দিল—গরীব স্কুল-মাস্টার, চাল-চুলো নেই, ওকে মেয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বিয়ে ভেঙে গেল। গনোরী তাতে বেশ দুঃখিত। কিন্তু সেও স্বীকার করে, তার মতো গৃহহীন নিঃস্ব ব্যক্তিকে কন্যাদান না করে সত্যিই বুদ্ধিমানের কাজ করা হয়েছে। গনোরীর বাসনা, এই জঙ্গল-মহালে সে একটা পাঠশালা খুলবে। সত্যচরণও মনে মনে তার সংকল্পকে রূপ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত। যুগলপ্রসাদ ও রাজু পাঁড়ে কাছারিতে গল্প করতে এলো। কাছারির কাছে একটা ছোট বস্তি হয়েছে। সেখান থেকেও একটি লোক এলো। লোকটি তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে। সে জীবনে উন্নতি করবার জন্যে এখানে এসেছে। রাজু পাঁড়ে এখানে যখন আসে, তখন তার ছ'টা মহিষ ছিল, এখন

সে দশটা মহিষের মালিক। গনোরীও উৎসাহিত হয়ে মহিষ কিনে উন্নতি করার কথা ভাবে। কেবল যুগলপ্রসাদ ওদের মতো বৈষয়িক উন্নতির কথা ভাবে না। সরস্বতী কুণ্ডীর ধারের বনে কোথায় কোন্ ফুলগাছের লতা ঝাঁপালো হয়ে উঠেছে, সে তার কথাই ভাবে। এমন সময় মটুকনাথ এলো। তার টোলে এখন প্রায় পনেরোটি ছাত্র। গত ফসলের সময় সে এত গম আর মকাই পেয়েছে যে, টোলের উঠোনে তাকে একটা ছোট গোলা বাঁধতে হয়েছে। কাছারির সিপাই ও আমলারা পর্যন্ত তাকে এখন খাতির করে। রাজু পাঁড়েও তার রুগী দেখার বেশ পসার জমিয়ে নিয়েছে।

আগে জমি বিলি হয়ে চাষ শুরু হলেও এত লোকজন ছিল না। এ বছর দলে দলে লোক এসে রাতারাতি গ্রাম বসিয়ে ফেললো। তবু লোকের আসার বিরাম নেই।

গ্রাণ্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মেপে দিচ্ছে আস্‌রফি টিণ্ডেল। সত্যচরণ ঘোড়ায় বসে তা দেখছিল। · এমন সময় ওপথে কুন্তাকে দেখা গেল। অনেকদিন পরে সত্যচরণ কুন্তাকে দেখলো। আস্‌রফির কাছে সে শুনলো, দুর্ধর্ষ রাসবিহারী সিং তাকে তার বাড়ীতে স্থান দিয়ে তার ওপর অত্যাচার করতে চেয়েছিল। ছোরা নিয়ে ভয়ও দেখিয়েছিল। কিন্তু কুন্তা এত দুঃখ-অপমান সয়েও তার প্রেমের মর্যাদা বজায় রেখেছে। রাসবিহারী সিংয়ের বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে সে ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়ীর গোয়ালঘরের পাশে ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা ছোট চালায় আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে থেকে সে ক্ষেতে ফসল কুড়োয়, কলাই-গম কেটে দিন কাটায়।

সত্যচরণের নির্দেশে আস্‌রফি কুন্তাকে পরের দিন সকালে কাছারিতে হাজির করে। সত্যচরণ কুন্তাকে কিছু জমি দেবার প্রস্তাব করে। কুন্তার এখানে একদিন অনেক জমি ছিল। 'আজ সে নিঃস্ব। জমির কথায় তার চোখে জল এসে পড়ে। আসরফি তাকে বিনা সেলামীতে এই জমি গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। কুন্তা জলভরা বিস্মিত চোখে চেয়ে থাকে। সত্যচরণ তাকে দশবিঘে জমি বিনে-সেলামীতে দেবার ব্যবস্থা করে। প্রথম দু' বছর খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে। দুঃখে, আনন্দে কুন্তা লজ্জাবিজড়িত মুখে হঠাৎ বিহ্বলার মতো কেঁদে ফেলে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যের পর লবটুলিয়ার নতুন বস্তিগুলি দেখতে বেশ লাগে। বন কেটে গ্রাম বসেছে, চাষ হচ্ছে সেখানে। এখানে বছরে তিনটি ফসল : ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই আর বোশেখ মাসে গম। কলাইই ফলে বেশী। সেজন্যে কলাইয়ের ছাতুই এখানকার প্রধান খাদ্য। ধান হয় না একেবারে। তাই ভাত খাওয়া এখানকার শখ বা বিলাসিতার ব্যাপার। এখানকার সকলেরই বাড়িঘর কাশ-ডাঁটার বেড়া দিয়ে তৈরী, কাশের ছাওয়া। প্রত্যেক বস্তিতে হনুমানজীর ধ্বজা। অন্য দেবদেবী নেই। শুধু কাছারির হনুমানজীর ধ্বজার নীচে কে নাকি একটা শিলাখণ্ড

রেখে দিয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধ দ্রোণ মাহাতো প্রতিদিন কল্‌বলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করে একঘটি জল এনে তার ওপর ঢালে এবং সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে বাড়ি ফেরে। তাতে মটুকনাথ পণ্ডিত আপত্তি করে, কিন্তু দ্রোণ মাহাতোই কাছারির শিবলিঙ্গের স্থায়ী পূজারী হয়ে যায়।

কার্তিক মাসে ছট্ পরব এদেশের বড়ো উৎসব। মেয়েদের গানে, তাদের ছোপানো হলুদ শাড়ীতে এবং তাদের তৈরী পিঠের গন্ধে চারদিক উৎসবমুখরিত হয়ে ওঠে। নানা বাড়ি থেকে এলো ছট্ পরবের নিমন্ত্রণ। সত্যচরণ গোষ্ঠবাবু ও রাজু পাঁড়েকে সঙ্গে নিয়ে চললো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। প্রত্যেক বাড়িতে মেয়েরা পিঠে তৈরীর জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও যত্নের পরিচয় দিলেও তাদের রন্ধন-বিদ্যার প্রশংসা করা যায় না। সত্যচরণ নামমাত্র নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু রাজু পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম করে ক্রমশঃ অসীমের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। শুধু তাই নয়, দু' তিন দিন চালাবার মতো ছাঁদাও বেঁধেছে সেই সঙ্গে।

সব শেষে সত্যচরণ গেল নকৃছেদীর বাড়ি। সুরতিয়া ছুটে এসে তাকে আপ্যায়িত করলো। তুলসী আসন করে দিল। সুরতিয়া জোর করে সত্যচরণকে খেতে বসালো। নকৃছেদী ভালো আটা এবং কিশমিশ এনেছে সংগ্রহ করে। তাই দিয়ে তুলসী সুন্দর করে পিঠে বানিয়েছে। তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে অনেক রাতে সত্যচরণ কাছারিতে ফিরে আসে।

সকালে কুন্তা ছট্ পরবের পিঠে দিয়ে একখানা পেতলের থালা সাজিয়ে নিয়ে এলো। কাল রাতে দু'বার এসে ফিরে গেছে সে। থালায় রয়েছে কয়েকখানি পিঠে, কিছু চিনি, দুটি কলা, একখানা ঝুনো নারিকেল ও একটা কমলালেবু। সত্যচরণকে এগুলি খাবার অনুরোধ করে কুন্তা প্রণাম করে চলে যায়।

মুনেশ্বর সিং একদিন সকালে খবর দিল, একটা লোক গাছের নীচে ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে। বস্তির লোকেরা তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না। ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে মারে। খবর পেয়ে সত্যচরণ গিয়ে গ্রাণ্ট সাহেবের বটগাছের ওদিকে অর্জুন-গাছের নীচে একটা বনঝোপের ভেতরে অসুস্থ গিরিধারীলালকে আবিষ্কার করলো। শিকারীর-তাড়া-খাওয়া পশুর মতো ভয়ার্ত দৃষ্টিতে গিরিধারীলাল বেরিয়ে এসে একটু জল চাইলো খেতে। ওর হাতে-পায়ে ঘা হয়েছে, শুকোতে চায় না। সবাই ভাবে, ওর বুঝি কুষ্ঠ হয়েছে। সত্যচরণ বুঝতে পারে, ওর কুষ্ঠ হয়নি। সে কাছারির সিপাইদের সেকথা বুঝিয়ে তাকে কাছারিতে সিপাইদের ঘরের পাশে একটা খালি ঘরে নিয়ে আসে। তার অনুরোধে রাজু তার চিকিৎসা আরম্ভ করে। সেবা-শুশ্রূষা করার জন্যে সে একটা লোকের খোঁজ করে। কুন্তা স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব নেয়। মাসখানেক চিকিৎসার পরে গিরিধারীলাল সেরে ওঠে। কুন্তাকে তার সেবার জন্যে সত্যচরণ কিছু দেবার প্রস্তাব করলে সে তা গ্রহণ করলো না। সে গিরিধারীলালকে ইতিমধ্যে বাবা বলে ডেকেছে। কাজেই 'বাবা'র সেবার জন্যে সে কিছু নিতে পারে না।

সত্যচরণ গিরিধারীলালকে বিনা-সেলামীতে কিছু জমি দিয়ে লবটুলিয়ায় বসিয়ে দেয়। সে তার খুপরির চারপাশে বিঘে চারেক জমি পরিষ্কার করে গম বোনে। শরবতী লেবুর প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ। তাই খুপরির পাশে কতকগুলি শরবতী লেবুর চারা বসিয়েছে সে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এখান থেকে সত্যচরণের বিদায়ের দিন সমাসন্ন হলো। যাবার আগে ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করবার প্রবল ইচ্ছে হলো তার। যুগলপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে সে চললো ধনঝরি পাহাড়ের জঙ্গলে। সত্যচরণের অপ্রত্যাশিত আগমনে ভানুমতী খুব খুশী। সে সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার বেশভূষা ও প্রসাধনে সহজ সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের ছাপ আছে। ভানুমতীর ছোটকাকা জগরু এবং রাজবাড়ির অন্যান্য সবাই এসে নমস্কার করে ঘিরে দাঁড়ালো।

সত্যচরণ স্নান করে এলে ভানুমতী তার সেই আয়নাখানি এবং একখানা কাঠের কাঁকুই চুল আঁচড়াবার জন্যে এনে দিল। আহারাদির পর বিশ্রামান্তে ভানুমতী সত্যচরণ ও যুগলপ্রসাদ এবং তার খুড়তুতো বোন নিছনিকে নিয়ে ধনঝরির পাহাড়ে উঠলো। সেখানে ছাতিমগাছের বনে ফুল ফুটেছে। তার সুবাসে বাতাস আমোদিত। হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত ছাতিমগাছের ঘন বনে নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীকে মূর্তিমতী বনদেবী বলে মনে হচ্ছিল সত্যচরণের। ভানুমতী ছাতিম ফুল পেড়ে খোঁপায় গুঁজেছে।

পাহাড়ের ওপরে প্রাচীন রাজ-সমাধি। রাজা দোবরু পান্নার সমাধির ওপর সবাই ফুল ছড়িয়ে দিল।

ভানুমতীর সঙ্গে এই শেষ দেখা। কিন্তু ওকথা সত্যচরণ ওকে বলতে পারলো না। সন্ধ্যের পর ওরা পাহাড় থেকে নেমে এলো। সেদিন রাতে যুগলপ্রসাদের রান্না সত্যচরণ ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা এবং নিছনিকে খাওয়ালো। পরের দিন সকালে ভানুমতী সত্যচরণকে আসতে দিল না। আহারাদির পর বিকেলে বিদায় নিয়ে আসবার সময় সত্যচরণের মনে হলো, বনপথের ধারে কোথাও হয়তো রাজকুমারী ভানুমতী দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে মনে মনে আশীর্বাদ করে।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সত্যচরণ লবটুলিয়া ত্যাগ করলো। আসবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আসরফি টিণ্ডেল পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার শেষ সীমানা মহারাজাটোলা পর্যন্ত এসেছিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলো। রাজু বললো—'হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।' 'উদাস' শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী। তার কাছারি ছেড়ে আসার সময় দেখা গিয়েছিল, কাছারির উঠোনে দাঁড়িয়ে কুন্তা হাপুস নয়নে কাঁদছে। নকছেদীর ঘরের সামনে দিয়ে আসার সময় সুরতিয়া ছুটে এসে পাল্কীর

পাশে দাঁড়ালো। লবটুলিয়া থেকে সত্যচরণের চির-বিদায়ের কথা তার বালিকা-মন কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারলো না।

পাল্কী এগিয়ে চললো। সত্যচরণ পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলো, ঘন বন কেটে ছ'-সাত বছরের মধ্যে সে কলহাস্যমুখর, শস্যপূর্ণ জনপদ বসিয়ে দিয়েছে। আজ সে বিদায় নিচ্ছে। দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরার অরণ্যানীর উদ্দেশে সে দূর থেকে নমস্কার করে: হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, আমাকে ক্ষমা করো। বিদায়······

প্রায় পনেরো-ষোলো বছর কেটে গেছে। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের সেই নাঢ়া ও লবটুলিয়ার স্মৃতি মাঝে-মাঝে সত্যচরণের মনে পড়ে। মন উদাস হয়ে যায়। এখন কুন্তা কেমন আছে, কত বড় হয়েছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজো আছে কি, ভানুমতী শৈলবেষ্টিত অরণ্যভূমিতে কি করছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল —এরাই বা কেমন আছে? আর মঞ্চী? অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরে এসেছে?···নাকি আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলছে এখন?

সত্যচরণ কতকাল তাদের খবর রাখে না।

আদর্শ প্রশ্ন: উত্তরসহ

●এক. 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রীতির যে বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দাও। উ. মা. '৭৮

'আরণ্যক' প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের একটি অনবদ্য, অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। যে নিগূঢ় প্রকৃতি-প্রীতি বিভূতিভূষণের রচনার অপরূপ স্বভাব-সৌন্দর্য, তার সর্বোত্তম প্রকাশ লক্ষণীয়ভাবে ঘটেছে এই অনন্যসুন্দর উপন্যাসখানিতে। প্রকৃতিই এই উপন্যাসের অপূর্ব কান্তিময়ী, রহস্যময়ী, বৈরাগিণী, মোহময়ী নায়িকা। তাকে কেন্দ্র করে এক গভীর, কবিত্বপূর্ণ, রহস্যময় অনুভূতি অনবদ্য কবিত্বময় ভাষায় সমগ্র উপন্যাসে পল্লবিত হয়েছে। সেদিক থেকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিশ্বসাহিত্যে বিভূতিভূষণ তুলনারহিত। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি যেমন কোমল-সুন্দর, তেমনি ভয়ঙ্করী রুদ্ররূপা। এক কথায়, 'আরণ্যক' বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অনুভূতির এক অনন্যসাধারণ শিল্পকর্ম।

এই অনুপম আরণ্য-কাহিনীর কথক সত্যচরণ নীরব, নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র; এবং সে যে প্রকৃতির রূপমুগ্ধ বিভূতিভূষণ স্বয়ং, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নাগরিক সভ্যতা ও জীবনধারার প্রতি মোহগ্রস্ত সত্যচরণ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে কলকাতার জনাকীর্ণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপনীত হয় বিহারের লবটুলিয়া, আজমাবাদ, ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহারের বনপাহাড়ের নিঃসঙ্গ নির্জনতায়। অরণ্যভূমির নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে সে প্রথমে কিছুতেই সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। কিন্তু সেখানকার গাছ-গাছালির মাথায় সূর্যাস্তের রংবাহার,

জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির কুহক-মদিরা, নানা বন্যকুসুম ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ, পাখির কলকাকলি, দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর এবং শ্যামল বনভূমির অপরূপ মোহিনী-মায়া তার হৃদয়-মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করতে থাকে।

'আরণ্যকে'র আরণ্য ভূখণ্ডের আয়তন নিতান্ত সংকুচিত নয়; তার শ্যামল কলেবর যেমন বহুবিস্তৃত, তেমনি অপরূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত তার রূপসম্ভার। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভিন্ন প্রকৃতির সেই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের অপূর্ব রংমহলের দ্বার উন্মোচিত হয় না। ভক্ত, প্রেমিক এবং সেবকদের মাথায়ই অবারিত দাক্ষিণ্য-ধারায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও লাবণ্যসম্ভার অমৃতময় অমেয় আশীর্বাদরূপে ঝরে পড়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর! যে অন্যমনা কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত, অভিমানিনী প্রকৃতিরাণী কিছুতেই তার কাছে বিজন বনছায়ায় তার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করে না। জনমানবের কর্মকোলাহল থেকে দূরে লবটুলিয়া-আজমাবাদ-ফুলকিয়া-নাঢ়া বইহারের সেই অরণ্য-ভূভাগের মোহময়ী জ্যোৎস্না, তিমিরময়ী আরণ্যক শুব্ধ রাত্রি, ধূ-ধূ ঝাউবন আর শুভ্র কাশবনের চর, দিগ্-বলয়হীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাতে যূথবদ্ধ বন্য নীলগাইয়ের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জল-সীমানায় পিপাসার্ত বন্য মহিষ, শিলাময় মুক্ত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের অপূর্ব শোভা এবং ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের নিবিড় সৌন্দর্য যে স্বর্গীয় মাধুরীর অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনা করে, তার তুলনা নেই। কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তরের সবুজ সমুদ্র, কোথাও ঢেউ-খেলানো মরকতশ্যাম তৃণভূমি, কোথাও বাবলা ও কাঁটাবাঁশের শ্যামল ঝোপঝাড়ের অন্তহীন মেলা, কোথাও বনফুল আর কেঁয়োঝাঁকার দূর-বিসারী জঙ্গল! একস্থানে অর্ধ-চন্দ্রাকারে বিচিত্র লতাপাতা ও পুষ্পবীথিকায় বেষ্টিত, বনহংসের কাকলি-মুখরিত সরস্বতী কুণ্ডীর তটলগ্ন স্বপ্নসৌন্দর্যের মায়াকানন; অন্যস্থানে বিবিধ বনপাদপ ও পুষ্প-সুগন্ধের নেশায় মাতাল মহালিখারূপের শৈলশানু ও রহস্যময় জঙ্গল। কোথাও উপকূলবর্তী বালুচরী নদী, কাকলিমুখরিত হ্রদ, ছোট ছোট টিলা, পাহাড়, চারণভূমি, মকাই ও চীনাদানার ক্ষেত, কোথাও দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশের নীচে রৌদ্রকরোজ্জ্বল হলুদ সর্ষেফুলের বিস্তৃত সমারোহ! তার ওপর ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে এই আরণ্য-প্রকৃতির যে রূপ-বদল ঘটে, তাও তার ভক্তপ্রেমিকের মনে ছড়িয়ে দেয় মুগ্ধতার এক পরম-বিস্ময়। তাছাড়া আছে ভাগ্য-নিপীড়িতা কুন্তা, রাজকুমারী ভানুমতী, প্রকৃতি-প্রেমিক যুগলপ্রসাদ, ভাবুকস্বভাব রাজু পাঁড়ের মতো মানুষ। এরাও এই উপন্যাসে প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যময়তার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার।

কিন্তু 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি কেবলমাত্র শান্ত-শ্যামল সৌন্দর্য ও স্বপ্নমন্দির কোমল মাধুর্যের মায়াময় অমরাবতী নয়, 'তার রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছমছম-করানো সৌন্দর্যে'রও তা মূর্ত প্রকাশ। সেখানে বাঘ, বন্য মহিষ, চিতাবাঘ, হায়েনা, বন্যশূকর ইত্যাদি হিংস্র জীবজন্তুর উপস্থিতি মোটেই অপ্রচুর নয়। ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিন দুরন্ত দাবানল সেখানে তার প্রলয়ঙ্কর লেলিহান রসনা মেলে

ছুটে আসে দুর্নিবার ধ্বংসের মূর্তি নিয়ে। রৌদ্রদগ্ধ গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে সেখানকার জলহীন ধূসর অরণ্যে পথ হারিয়ে বুকফাটা তৃষ্ণা নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায় কোন কোন পথহারা পথিক। আবার জ্যোৎস্না-বিধৌত রাত্রিতে সেখানে কখনো-কখনো নানা অমঙ্গলমূর্তি ধারণ করে নেমে আসে অশরীরী জিন্-পরীরা; তাদের দেখতে পেলে কিংবা মুখোমুখি হলে আর নিস্তার নেই। আর আছে বন্য মহিষের দেবতা—ভয়ঙ্কর-দর্শন টাঁড়বারো, অন্ধকার অরণ্য-পথে অবধারিত মৃত্যুর মতো আকস্মিক যার আবির্ভাব। এইভাবে সেই নির্জন অরণ্যকান্তারে বন্যপ্রকৃতি কখনো-কখনো দেখা দেয় মূর্তিমতী ভয়ের আকারে। একে তো সারা অঞ্চলটাই প্রতিভাত হয় এক অচেনা, অজানা রহস্যময় পরী-রাজ্যরূপে; তার নীরব জ্যোৎস্না, তার সুদূর নির্জনতা, তার শব্দহীন অপার রহস্যময়তা, তাঁর বিচিত্র পক্ষী-কূজন, তার বিচিত্রতর মানুষজন, তার বন্য ফুলশোভা—সবই যেন মনে হয়—বড়ো অদ্ভুত, বিস্ময়কর বলে। তার ওপর, চকচকে শাদা বালি ও অর্ধশুষ্ক কাশবনের ছায়াবিহীন নিঃশব্দ জ্যোৎস্না যে অপার্থিব সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করে, তা দেখে মনে কেমন একটা অপার্থিব ভীতির সঞ্চার হয়। সেই নীরব নিশীথ রাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে পরীদের এই বিচরণভূমিতে মানুষের অনধিকার প্রবেশকে মনে হয় নিতান্তই অবাঞ্ছিত। আবার, রৌদ্রদগ্ধ জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নের ভীম ভৈরব রূপ যে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তারও তুলনা নেই কোথাও। সূর্যকে মনে হয় যেন কোটি-যোজন-ব্যাসযুক্ত একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড। আকাশের রং তাম্রাভ, কটা। চারদিক শূন্য—নিস্তব্ধ; একটি চিল-শকুনিও নেই—পাখির দল নিরুদ্দেশ। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের কী সুন্দর রুদ্র-ভৈরব রূপ!

'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতির এই কোমল-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এবং ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপের অন্তরালে আছে এক গভীর মৌন মহিমময় রূপ—সে হলো এক অসীম রহস্যানুভূতির দিক। সত্যচরণের মনে সেই অনুভূতি কখনো আসে ভয়ের রূপে, কখনো আসে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গভীর মনোভাবের রূপে, আবার কখনো আসে কত মধুময় স্বপ্ন ও দেশবিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। 'সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সংগীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।' যে গৃহস্থ কিংবা যাকে সংসারধর্ম পালন করতে হবে, তার পক্ষে সেই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যামা অরণ্য-প্রকৃতির সর্বনাশা রূপ না দেখাই ভালো। 'প্রকৃতির সে মোহিনী রূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে' করে তোলে। সেই অবগুণ্ঠিতা মোহিনীর সৌন্দর্য যে একবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার পক্ষে অসম্ভব ঘরকন্না করা। নক্ষত্রালোকে উদ্ভাসিত জনবসতিহীন নীরব নির্জন প্রান্তরে, ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, অন্ধকার নির্জন বনপথে কিংবা সরস্বতী কুণ্ডীর সন্নিহিত জ্যোৎস্নাস্নাত বনপাদপশোভিত পরী ও বনদেবীদের রাজ্যের সেই আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে এক অতীন্দ্রিয় অপার্থিব অনুভূতিতে প্লাবিত হয় লেখকের হৃদয়। মনে হয়, তিনি যেন সুদূর কোন্

নক্ষত্রলোকের অশরীরী এক যাত্রী ; তাঁর যাত্রা যেন 'ভগবান বুদ্ধের' সেই নির্বাণ-লোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ, অন্ধকারও নেই।

প্রকৃতির মধ্যস্থতায় উপলব্ধ এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লেখককে পৌঁছিয়ে দেয় স্বর্গীয় উপলব্ধির জগতে, এক অপার্থিব সত্তার স্বপ্নময় দেবলোকে, বিশ্বদেবতার আলোকিত সত্তার সান্নিধ্যে। সেই দেবতার আশীর্বাদধারায় নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নব নব প্রাণের প্রকাশ। তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয় অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার, তা নয় ; তিনি 'প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা'র অদ্বয় সমাহার। একদিকে প্রিয়জনের প্রীতির মধ্যে এবং অন্যদিকে, গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টির মধ্যে তাঁরই মূর্ত প্রকাশ। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু থেকে বিশালতম গ্রহনক্ষত্র পর্যন্ত তাঁরই লীলার বিভূতি। বৃক্ষলতা থেকে মহাকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জ পর্যন্ত মহাপ্রকৃতির এক নিঃশব্দ লয়-বিস্তারের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব সমতালে বিধৃত। সেই মহাপ্রকৃতির হৃৎস্পন্দন লেখক অনুভব করেছেন তাঁর নাড়ির রক্তধারায়। তাই দেখা যায়, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রেম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, হাড্‌সন কিংবা টমাস হার্ডির প্রকৃতিপ্রেম থেকে স্বতন্ত্র ; একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গেই সুলভ যার আত্মিক সাদৃশ্য॥

● দুই. 'আরণ্যক' উপন্যাসের কুন্তার চরিত্র বর্ণনা কর। উ. মা. '৭৮

ভাগ্য-নিপীড়িতা কুন্তা 'আরণ্যক' উপন্যাসের একটি করুণ, অবিস্মরণীয় চরিত্র। ভোগ, সুখ এবং ঐশ্বর্যের সমুচ্চ মিনার থেকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের অতলান্ত গভীরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে সে তার পিতৃহীন হতভাগ্য সন্তানদের নিয়ে খুঁজেছে শুধু দিনযাপন ও প্রাণধারণের সামান্যতম উপকরণ। কিন্তু পায়নি। বিনিময়ে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পরিবেশের কাছ থেকে সে পেয়েছে ধিক্কার, অপমান এবং দুঃসহ লাঞ্ছনা। আরণ্য প্রকৃতির বিশালব্যাপ্ত শ্যামলসুন্দর পরিবেশেও মানুষের লোভ, দম্ভ এবং নীচতার শিকার হয়েছে সে। কিন্তু তার অপরাজিত প্রেম এবং অনবদ্য মনুষ্যত্বের মহিমায় সে আত্মরক্ষা করে নিজেকে নিয়োজিত করেছে জীবনের চরম পূজায়। হৃতসর্বস্ব, জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত কুন্তা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে মানুষের সমবেদনা এবং সহানুভূতির স্পর্শ, পায়ের তলায় পেয়েছে এক চিলতে মাটি, দুঃখ-রজনীর অবসানে তার ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছে তার জীবনের নতুন ভোরের সূর্য।

কুন্তার জীবন-চিত্র আনন্দ-বেদনার আশ্চর্য সমাহারে বড়ো বৈচিত্র্যপূর্ণ। সুসম্মত কুন্তা। কাশীর মুসলমান বাইজীর সুন্দরী যুবতী-কন্যা কুন্তা। অপূর্ব তার রূপ-কান্তি, অপরূপ তার প্রেম-সৌন্দর্য। আজমাবাদ-ইসমাইলপুর-লবটুলিয়া অঞ্চলের দুর্ধর্ষ প্রতাপশালী রাজপুত মহাজন দেবী সিং যৌবন-বয়সে কাশীতে বাইজী বাড়িতে গান শুনতে গিয়ে সেই বাইজীর চৌদ্দ-পনেরো বছরের কন্যা কুন্তাকে অপহরণ করে আনে

এবং তাকে বিবাহ করে। দেবী সিংয়ের জাতভাইরা কুন্তার পূর্ব-পরিচয় জ্ঞাত হয়ে দেবী সিংয়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাকে তাদের সমাজে পতিত ঘোষণা করে। তখন দেবী সিংয়ের ঐশ্বর্য-খ্যাতি ছিল বিস্ময়কর। অপূর্ব রূপবতী কুন্তা দেবী সিংয়ের সেই অমেয় সম্পদ ও সুখসমৃদ্ধির দিনে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পাল্‌কিতে চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে যেত স্নান করবার জন্যে। বিকানীর মিছরি দিয়ে জল খেত সে।

দেবী সিং ঐশ্বর্যের অহংকারে জাতভাইয়ের সামাজিক অত্যাচার উপেক্ষা করে প্রেম, প্রাচুর্য এবং বিলাসিতায় ঘিরে রাখে মধুর-স্বভাবা, লাবণ্যময়ী পত্নী কুন্তাকে। কিন্তু কুন্তার সেই সুখ-সম্পদের দিন দীর্ঘস্থায়ী হলোনা। মাত্র ছ'বছরের মধ্যেই জাতভাই রাসবিহারী সিংয়ের সঙ্গে ক্রমাগত মামলা-মোকদ্দমা এবং অতিরিক্ত বিলাস-বাহুল্যের ফলে দেবী সিংয়ের সুখৈশ্বর্যের সৌধ ধূলিসাৎ হলো। সর্বস্বান্ত দেবী সিং মৃত্যুর কোলে শেষ আশ্রয় খুঁজে পেল। এবং কয়েকটি অবোধ শিশুসন্তান নিয়ে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের কোলে পরিত্যক্ত হলো ভাগ্য-নিপীড়িতা কুন্তা।

জীবন-সংগ্রামে অভ্যস্ত দুঃখী মানুষের সহনশীলতায় দুঃখ-দারিদ্র্যকে অনেক সময় সহনীয় মনে হয়। কিন্তু যে আজন্ম ভোগ-সুখে পালিত এবং অবিশ্বাস্য সম্পদের কোলে লালিত, তার পক্ষে দারিদ্র্যের এই আকস্মিক আবির্ভাব যে দুঃসহ, তা অনস্বীকার্য। সুখ ও সম্পদের সমুচ্চ গিরিশিখর থেকে দুঃখ-দারিদ্র্যের অতলে তার এই পতনে রচিত হয়েছে এক প্রেমসর্বস্বা নারীর বেদনার করুণ ইতিহাস। কোথায় গেল অপরিমেয় ঐশ্বর্যের ভোগবিলাস?……কোথায় গেল প্রেমবিহ্বলা কুন্তার সুখ-সম্পদময় অভ্যস্ত জীবনধারা? দেবী সিংয়ের মৃত্যুর পর এক সর্বরিক্ত, হৃদয়হীন, নিঃস্ব পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই প্রেমের প্রতিমা। সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, প্রেম নেই, নেই মানবিকতার স্পর্শ। এ যেন কুন্তার চরম অগ্নিপরীক্ষা। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, এমনকি মাথা গোঁজার সামান্যতম আশ্রয়ও নেই তার। পেটের গুটিকয় ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এখন বাস করে লবটুলিয়ার অন্ধকার বস্তিতে। ক্ষেতের পড়ে-থাকা গমের শীষ কুড়িয়ে আধপেটা খেয়ে কোনমতে দিন কাটে কুন্তার। কিন্তু প্রবল তার আত্মসম্ভ্রমবোধ। তাই কারও করুণার দ্বারে ভিক্ষে চেয়ে সে হাত পেতে দাঁড়ায় নি কোনদিন। কাছারির পাটোয়ারীর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'বড় ভাল আর শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই নাক সিঁটকে থাকে, নীচু চোখে দেখে, বোধহয় বাইজীর মেয়ে বলে।'

অথচ অম্লান প্রেমের তেজে কুন্তার চরিত্র দীপ্তিমান্‌। দেবী সিংয়ের অকাল মৃত্যুর পর তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতভাই রাসবিহারী সিং কুন্তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে স্বগৃহে আশ্রয়দানের প্রস্তাব করে। নিষ্পাপ কুন্তা তার সেই আপাত-নিরীহ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু রাসবিহারী সিংয়ের আশ্রয় তার কপালে বেশীদিন সইলো না। কয়েক দিনের মধ্যেই রাসবিহারী সিংয়ের

আপাত ঔদার্যের ছদ্মবেশ ছিন্ন করে প্রকাশিত হলো তার প্রকৃত পাপ অভিপ্রায়। অত্যাচারী মহাজন রাসবিহারী সিংয়ের শারীরিক নিগ্রহ ও সর্বপ্রকার ভীতিপ্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে কুন্তা তার ক্ষুধার্ত সন্তানদের হাত ধরে আবার জ্বালাযন্ত্রণাময়, কূলহীন অনিশ্চিত সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। প্রাণে বাজে এই একনিষ্ঠা সাধ্বী নারীর তেজোদৃপ্ত উক্তি : 'জান দেগা বাবুজী, ধরম দেগা নেহি।' প্রেমের যে উজ্জ্বল দীপ-বর্তিকা হাতে নিয়ে প্রেমময়ী কুন্তা কাশীর বাইজী-মাতার গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল, সহস্র দুঃখ-দৈন্য, মান-অপমান ও ব্যথা-বেদনার মধ্যে তার শিখাকে সে অনির্বাণ রেখেছে। অপ্রেমের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে প্রেম, দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে একনিষ্ঠ ভালোবাসা।

ভিক্ষা তার স্বভাববিরুদ্ধ, সংকোচ তার স্বভাবের সুষমা। সে যেমন তার নারীত্বের অপমানকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেছে, তেমনি সে রক্ষা করেছে তার কোমল স্বভাব-সৌন্দর্যকে। ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তার সেই স্বভাব-সুষমার খাপ খায় না। তাই সে ভিক্ষাবৃত্তির পথ পরিহার করে পৌষের হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে থালা-হাতে সামান্য আঁচল গায়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে থাকে ম্যানেজারবাবুর ভুক্তাবশিষ্ট ক'টি ভাতের জন্যে। ম্যানেজারবাবু জমিদারের প্রতিনিধি—রাজার সমান; তার ভুক্তাবশেষ গ্রহণে তার কোন অপমান নেই।

কিন্তু এভাবে চলে না এই ভাগ্যহতা নারীর। ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে তাকে বুনোফল সংগ্রহ করতে হয়। একদিন লবটুলিয়ার জঙ্গলের উত্তর সীমানায় বেড়াতে গিয়ে সত্যচরণ এক আর্ত নারীকণ্ঠের কান্না শুনে ভীষণ বিচলিত বোধ করে। তার চোখে পড়ে, একটি ক্রন্দনভরা মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের কর্মচারীরা চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। তার পরনে ছিন্ন বাস। সঙ্গে দু'তিনটি রোরুদ্যমান বালক-বালিকা। ভাগ্য-নিগৃহীতা কুন্তাকে চিনতে সেদিন সত্যচরণের একটুও দেরী হয়নি। তার হস্তক্ষেপে সে যাত্রায় কুন্তা বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু চুরি করার লজ্জায় অপমানে সে অন্তরে একেবারে মরে যায়। কুলের ধামা এবং আঁকশি না নিয়ে সে দ্রুত বনের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল। সেদিন থেকে কুন্তা কাছারিতে আর কখনো ভাত নিতেও আসেনি।

অবশেষে সহায়-সম্বলহীনা কুন্তা আশ্রয় নেয় ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়িতে। গোয়ালঘরের পাশে একটি ছোট্ট চালাঘরই তার এখন আশ্রয়। ক্ষেতে-কুড়োনো গম ও কলাইর দানায় তার কোনক্রমে দিন চলে। দিবালোকে লোকচক্ষুর দৃষ্টি এড়িয়ে ফসলের দানা কুড়োবার প্রশস্ত সময় হিসেবে সে বেছে নিয়েছে রাতের অন্ধকারকে। এই দয়াহীন, মায়াহীন, হৃদয়হীন পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়হীনতায় সে অভ্যস্ত। তাই হৃদয়বান্ মানুষের হৃদয়ানুভূতির স্বাভাবিক প্রকাশ গাত্র উদ্বেল হয়ে ওঠে তার হৃদয়। বিনা-সেলামীতে এবং প্রথম দু'বছর বিনা-খাজনায় সত্যচরণের দশ বিঘে জমি দেবার প্রস্তাবে আনন্দ ও আবেগের উচ্ছ্বাসে তার বিহ্বল হৃদয় প্লাবিত হয়ে যায়, দুচোখ ছাপিয়ে

নামে অশ্রুর বন্যা। মানুষের উদারতায়, তার মহানুভবতায় আস্থা ফিরে আসে তার। হৃদয়-সম্পদে মানুষের ঐশ্বর্যময় রূপে মুগ্ধ হয়ে যায় সে। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে যায়। তাইতো দেখি, পিতলের থালায় ছট্-পরবের পিঠে সাজিয়ে সে ম্যানেজারবাবুর সামনে সসঙ্কোচে নম্র মূর্তিতে উপস্থিত হয়। তাইতো দেখি, দুষ্টক্ষতাক্রান্ত, মরণাপন্ন গিরিধারীলালকে তার নিপুণ সেবাপরায়ণতায় সে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। ভিন্নজাতের নিঃসম্পর্কীয় গিরিধারীলালকে সে 'বাবা' বলে ডাকে। সেবার বিনিময়ে কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করে সে তার নিঃস্বার্থ, পবিত্র সেবাকে দেয়নি অপমানিত হতে।

এইভাবে দুঃখ-রজনীর অবসানে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কুন্তার জীবনে উদিত হয়েছে নতুন ভোরের সূর্য। মানুষের সহানুভূতি ও সমবেদনায় সে খুঁজে পেয়েছে তার জীবনের নতুন মূল্যবোধ। মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা যে পরম ধর্ম—সেকথা আজ কুন্তা বুঝে নিতে পেরেছে।…'সেবা করে আবার পয়সা নেব? ধরমরাজ মাথার উপর নেই?' দুঃখের আগুনে জ্বলে পুড়ে নিখাদ হয়ে কুন্তা এইভাবে শুরু করেছে তার জীবনের চরম পূজা—আর্ত-পীড়িতের নিরলস, নিঃস্বার্থ সেবা। দরদী-শিল্পী বিভূতিভূষণ তার মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এক মহীয়সী নারীকে। তাই লবটুলিয়া থেকে লেখকের বিদায়-মুহূর্তে একখানি অনবদ্য ক্লাসিক চিত্রের মতো অশ্রুবিধুরা চোখে দাঁড়িয়ে থাকে কুন্তা। অবিস্মরণীয় তার সেই বিষাদ-করুণ মূর্তি, অনবদ্য তার সেই বিদায়-বিহ্বল বিষণ্ণতা॥

●তিন. প্রকৃতি-পাগল যুগলপ্রসাদের চরিত্রটি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ কর।

'প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে,……গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা—একবার সে ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।'

—আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'আরণ্যক' উপন্যাসের যুগলপ্রসাদ প্রকৃতির মোহিনীমায়ায় অভিভূত একটি বিচিত্র আশ্চর্য-সুন্দর চরিত্র। সে প্রকৃতি-প্রেমিক বিভূতিভূষণের প্রকৃতিসর্বস্ব মনন ও মানসিকতার নিকটতম অধিবাসী। রহস্যময়ী প্রকৃতির গোপন ভুবনের অপরূপ সৌন্দর্যময় রূপ প্রত্যক্ষ করেছে সে। তার অনির্বচনীয় রূপসাগরে ডুব দিয়ে সে লাভ করেছে এক দুর্লভ অরূপ রতন। তাই তার কাছে সমাজ-সংসার সমস্তই মিথ্যা, মিথ্যা এই পৃথিবীর দৈনন্দিন লাভক্ষতিসর্বস্ব যাবতীয় জাগতিক কলরব; একমাত্র সত্য—প্রকৃতির অন্তরালবর্তী সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী সত্তা এবং তার মোহন-সুন্দর অনবদ্য রূপ। যুগলপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

যুগলপ্রসাদ লবটুলিয়ার সদর কাছারির পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই। যেখানে প্রকৃতির রূপের কোন মূল্যই নেই, সেই জন্মান্ধ মানুষের দেশে যুগলপ্রসাদের মতো প্রকৃতি-পাগল একটি মানুষের জন্ম সত্যিই বিস্ময়কর। হিন্দী লেখাপড়ায় এলেম আছে তার, চমৎকার হাতের অক্ষর। বিবাহ করে সংসারী হয়েছে সে; কিন্তু সংসার দেখে না। অথচ সাধু-সন্ন্যাসিও সে নয়। এক আশ্চর্য বাউণ্ডুলের

মতো সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এক অদ্ভুত বাতিকগ্রস্ত সে। নানা স্থান থেকে নানাপ্রকার দুর্লভ ফুলের বীজ সংগ্রহ করে এখানকার জঙ্গলের মাটিতে পুঁতে জঙ্গলের শোভা বৃদ্ধি করাই তার একমাত্র নেশা। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণভাবে স্ব-নিযুক্ত। সে লেখককে জানিয়েছে—'লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারি চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে-ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাবো, এ আমার বহু দিনের শখ।' তার এই সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত শখের জন্ম শৈশবের সূচনাকাল থেকেই। শৈশবে কুশী নদীর ধারে-ধারে যখন সে মহিষ চরিয়ে বেড়াতো, তখন সেখানে ভাণ্ডীর ফুলের ঝাড় দেখে তার মনে ও-অঞ্চলের ফুলহীন স্থানে সৌন্দর্যসৃষ্টির বাসনার জন্ম হয়। তারপর সেই বাসনা পরিণত হয় এক প্রকৃতিসর্বস্ব বাতিকে। সেই নির্জন অরণ্য-প্রদেশে, যেখানে তার কিছুমাত্র ভূ-স্বত্ব নেই, সেখানে সে ফুল ফুটিয়ে সৌন্দর্য সম্পাদন করে আসছে দশ-বারো বছর। লবটুলিয়াতে যত বাহারী ফুলের ঝাড় এবং যত লতাবিতান—সবই এই নিসর্গ-শিল্পীরই হাতের সৃষ্টি। সম্পূর্ণ বিনা-স্বার্থে সময় ও অর্থ ব্যয় করে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য-সৃষ্টির এই প্রয়াস সত্যিই অভিনব। বন্য গাছপালা ও লতাপুষ্পের নাম তার মুখস্থ। ও ব্যাপারে সে নিশ্চিতরূপে একজন পুষ্প-বিশেষজ্ঞ।

একদিন মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে লেখক দেখতে পেলেন, একটি অদ্ভুত-প্রকৃতির লোক জঙ্গলের মাটিতে নিজের মনে ফুলের বীজ পুঁতে চলেছে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সঙ্গে চটের থলেতে ছোট্ট একটি কোদাল, পাশে একটি শাবল এবং ইতস্ততঃ ছড়ানো কাগজের মোড়ক। এই খামখেয়ালী, উদাসীন-প্রকৃতির মানুষটি যে যুগলপ্রসাদ—প্রকৃতি-প্রেমিক লেখকের চিনতে এতটুকুও বিলম্ব হয়নি। যুগলপ্রসাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল নয়—দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী। তবু দারিদ্র্য দূর করে নিজের বৈষয়িক অবস্থান্তর ঘটাবার জন্যে তার বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠা নেই। এমন-কি, রাজু পাঁড়ে, গনোরী মাহাতো বা মটুকনাথ পাঁড়ের মতো মানুষ যেখানে বৈষয়িক উন্নতির স্বপ্নে বিভোর, সে তখন বনের সৌন্দর্য-সম্পদবৃদ্ধিকল্পে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, স্বহস্ত-রচিত নানা লতাবিতান ও বনের পুষ্পকুঞ্জের নিরাপত্তা-চিন্তায় ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন।

লেখক যুগলপ্রসাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কথা জানেন। তাই তিনি তাকে তাঁদের আজমাবাদ কাছারিতে দশ টাকা মাইনের মুহুরীর চাকরিতে নিয়োগ করেন। নিতান্ত পেটের দায়ে মুহুরীর কাজ করে যুগলপ্রসাদ। কিন্তু তার প্রকৃতিপাগল মন আকুল উদাস হয়ে ফেরে বনের পুষ্পিত লতাবিতানের নানা বর্ণগন্ধময় ফুলমদির কুসুম-মঞ্জরীতে। ধনলক্ষ্মীর প্রসাদ তার কাম্য নয়, বনলক্ষ্মীর প্রসাদ সে পাগল খুঁজে ফেরে। নিত্য-নতুন পুষ্পতরু রোপণ করে সে বনলক্ষ্মীকে সাজায় নিত্য-নতুন কুসুমের আভরণে, সৌন্দর্য রচনা করে চলে বনপ্রকৃতির। বিনিময়ে সে কিছু চায় না। শুধু বনলক্ষ্মীর সৌন্দর্য কানায় কানায় উপচিয়ে পড়বে, তা দেখে তার এবং অন্যান্য প্রকৃতি-প্রেমিকের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে—এই তার আশৈশব স্বপ্ন।

ঘরের মায়া তাকে তার মায়াময় রজ্জুতে বেঁধে রাখতে পারেনি, সংসারের কোন বন্ধনই তাকে বন্দী করতে পারেনি। তার শরীরের রক্তধারায় সে শুনেছে অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী মহাপ্রকৃতির গভীর আহ্বান। সে ডাক যে শুনেছে, অসম্ভব তার পক্ষে গৃহস্থ সেজে ঘরকন্না করা। মুক্ত পুরুষের মতো সে প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-সম্ভারের মধ্যে উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের ক্ষুদ্র সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে মহাপ্রকৃতির বৃহৎ সংসারের মধ্যে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

তার স্বহস্ত-রোপিত গাছগুলি যখন পত্রপল্লবে এবং পুষ্পমঞ্জরীতে অপরূপ সৌন্দর্য বিস্তার করে, তখন যুগলপ্রসাদের আনন্দ আর ধরেনা। একদিকে সৃষ্টি-সুখের উল্লাস, অন্যদিকে মহাপ্রকৃতির বর্ণগন্ধবিলসিত অপরূপ লাবণ্যময়ী মূর্তি তার হৃদয়ে বইয়ে দেয় এক সীমাহীন আনন্দের বন্যা। সেই অনাবিল আনন্দের গভীরতা ও ব্যাপ্তি উপলব্ধির শক্তি সাধারণ সংসারী মানুষের নেই। এমন-কি, তা বিষয়-বিকারে ক্লীন্ন মানুষের কাছে অর্থহীন পাগলামি-রূপে উপহসিত হতে পারে। তাই লেখক তাকে বিষয়ী মানুষদের কাছে তার প্রকৃতিপ্রীতির বিষয়ে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য প্রকাশে নিষেধ করে।

সরস্বতী কুণ্ডী লেখকের মতো যুগলপ্রসাদেরও পরম প্রিয় স্থান। সে বলে, 'সরস্বতী কুণ্ডীর মতো চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই, বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা!' সেই সরস্বতী কুণ্ডীর জলে পদ্মফুল ফোটানো তার অনেক দিনের সাধ। স্মরণীয় যে, ম্যানেজার সত্যচরণ প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের প্রথম সত্তা, প্রকৃতি-পাগল যুগলপ্রসাদ তাঁর দ্বিতীয় সত্তা। তাইতো দেখি, দুজনের নতুন গাছ, পাতা ও ফুলে সাজাবার মিলিত প্রয়াসে সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি অপরূপ হয়ে ওঠে। দেশী-বিদেশী বহু বিচিত্র বন্য পুষ্পের সম্ভারে সুসজ্জিতা বনভূমির রূপ যেন ধরেনা! বয়ড়া লতায় কুঁড়ি আসার সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল যুগল-প্রসাদ কাছারির কাজ ফেলে তা দেখবার জন্যে অবলীলায় সাত মাইল পথ ছুটে গেছে। সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমির প্রতি তার আশ্চর্য মায়া। সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি তার চোখে দিয়েছে অপরূপ মায়াকাজল পরিয়ে, নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের বিলুপ্তি এবং সেখানে মনুষ্যবসতি-বিস্তারে সে ব্যথিত। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যময়ী সরস্বতী কুণ্ডীর ভাবী বৈধব্য-মূর্তি তার পক্ষে হবে দুঃসহ। বহু কষ্টে সে দূর-দূরান্তর থেকে কত দুর্লভ গাছপালা এনে সে সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমিকে স্বহস্তে বহুবিচিত্র পুষ্পবাহারে সাজিয়েছে। সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমিকে ইজারা না দেবার জন্যে সে ম্যানেজারবাবুর কাছে করে কাতর মিনতি।

অরণ্য-প্রকৃতির প্রতি এমন নিঃস্বার্থ অকপট ভালোবাসা, প্রকৃতির সৌন্দর্য-পাগল এমন অবিস্মরণীয় চরিত্র কেবল বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যেও দুর্লভ। প্রকৃতির রূপরসসৌন্দর্যের অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছে সে। তাই ঘরে তার মন বসে না। মহাপ্রকৃতির সেই মহা আকর্ষণ গৃহস্থকে বনবাসী করে, সংসারীকে করে

অরণ্য-প্রেমিক—নীরব কবি। 'আরণ্যক' উপন্যাসের যুগলপ্রসাদ তেমনি এক সংসার-উদাসীন উদ্ভিদের নীরব কবি॥

●চার. 'আরণ্যক' উপন্যাসের ধাতুরিয়া চরিত্রটি সংক্ষেপে পরিস্ফুট কর।

কিশোর নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া 'আরণ্যক' উপন্যাসের একটি বেদনাবিহ্বল, অনন্যসুন্দর শিল্পী-চরিত্র। তার শিল্প-নিষ্ঠা, অকুণ্ঠ শিল্প-সাধনা, সুদূর জীবন-স্বপ্ন এবং ব্যর্থতার বেদনা চরিত্রটির সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়েছে কারুণ্যের একটি অবিস্মরণীয় সুষমা। জীবনের সর্বস্ব পণ করে সে শিল্প-সরস্বতীর সেবা করেছে। বিশ্বের প্রকৃত রসিকজনকে সে তার নৃত্যরসে আনন্দ পরিবেশন করে কৃতার্থ হবে, এই ছিল তার হৃদয়ের স্বপ্ন। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন সফল হয়নি। স্বপ্নভঙ্গের ধূসর বেদনা নিয়ে সে এই পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। কারও বিরুদ্ধে তার অভিযোগ নেই, কারও বিরুদ্ধে নেই কোন নালিশ।

'এমন নির্লোভ, সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক খাঁটি শিল্পীমনের' একটি মানুষ শুধু সেই অরণ্য-অঞ্চলে কেন, বিশাল সভ্য-অঞ্চলেও দুর্লভ। একটি গ্রাম্য নাচের দলের সঙ্গে কাছারিতে নাচ দেখাতে এসেছিল বারো-তেরো বছর বয়সের একটি কিশোর নৃত্য-শিল্পী। যাত্রাদলের কেষ্ট ঠাকুরের মতো চেহারা। কষ্টিপাথরের মতো কালো কুচকুচে গায়ের রং, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, ওষ্ঠলগ্ন হাসি। দলের সামনে নিপুণ শিল্পীর মতো সে নাচে, গায়। চেহারায়, নৃত্যভঙ্গিমায় এবং সুরেলা কণ্ঠস্বরে সে ছিল দলের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

দক্ষিণ দেশে সে বছর অজন্মা। তাই সে অঞ্চলের খাদ্যান্বেষী মানুষেরা নাচের দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পেটের দায়ে। ধাতুরিয়াও দুটি অন্নের জন্যে ঘুরছে সেই দলের সঙ্গে। অক্লান্ত নেচে গেয়ে সে তার খাওয়া জোটায়। সে খাওয়া কি! চীনা ঘাসের দানা, একটু নুন আর 'বড় জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি—আলু-পটল নয়, জংলী গুড়মী ফল ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ কিংবা ধুঁধুল ভাজা।' সেই সামান্য আহারেই সে পরিতৃপ্ত। 'দিব্যি স্বাস্থ্য, অপূর্ব লাবণ্য তার সারা অঙ্গে।'

কিন্তু ধাতুরিয়ার মনের মধ্যে আছে একজন সত্যিকারের শিল্পীর চিরন্তন অতৃপ্তি। নৃত্য-শিল্পকে সে তাই শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো ভালোবেসেছে। সেই শিল্পচর্চাকে সে গ্রহণ করেছে জীবনের ব্রতরূপে। তার জন্যে এই শিল্পী-কিশোরের ত্যাগ-স্বীকার, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং একাগ্র অধ্যবসায়ের কাহিনী সত্যিই বিস্ময়কর। ধাতুরিয়ার জীবনের স্বপ্ন ছিল লুপ্তপ্রায় ছক্করবাজির নাচ শেখা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বহু ঘুরে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সে ছক্করবাজির নাচের গুরু বৃদ্ধ ভিটলদাসের সাক্ষাৎ পায়। তার কাছে একনিষ্ঠ অভিনিবেশ, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের মধ্যস্থতায় সে আয়ত্ত করে সেই দুর্লভ নৃত্যশিল্পের কলাকৌশল। অথচ সে-অঞ্চলের গ্রাম্য গাঙ্গোতাদের কাছে সেই দুর্লভ নৃত্যকলার কোন মূল্যই নেই। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাকে নাচতে হয় নানাপ্রকারের সস্তা নাচ। তাতেও তার পেট ভরে না। যখন নাচের বায়না থাকে না, তখন তাকে

ক্ষেত-খামারের কাজ করে পেটের অন্ন জোটাতে হয়। সে তাই কলকাতায় যেতে চায়; 'হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?' সে শুনেছে, শহর কলকাতায় নাচগানের যথেষ্ট সমাদর। তার বিশ্বাস, তার ছক্করবাজির নাচ সেখানকার প্রকৃত সমঝদার দর্শকদের কাছে তার যোগ্য সমাদর পাবে। তাহলে তাকে আর অরসিকদের গৃহপ্রাঙ্গণে দু-মুঠো পেটের অন্ন আর চার আনা পয়সার জন্যে অর্ধেক রাত পর্যন্ত এই সব সস্তা নাচ নাচতে এবং হালকা গান গাইতে হবে না।

ধাতুরিয়ার চেহারার মধ্যে এমন একটা করুণ লাবণ্য আছে, যা সহজেই মনে অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক করে। স্নেহপ্রবণ ম্যানেজারবাবু তাকে কাছারির কাজে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু দলের সর্দার সে প্রস্তাবে রাজী হয় না। সে বলে, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ধাতুরিয়া ভালো আছে—কাছারিতে তার ভালো লাগবে না। দলের সর্দার সম্ভবতঃ জানতো না ধাতুরিয়ার গভীর গোপন বাসনার কথা। জানলেও তার কাছে তার কোন মূল্যই ছিল না। তাই, তারপর ধাতুরিয়াকে দেখা যায় দলভ্রষ্ট একক নৃত্যশিল্পীরূপে। কিন্তু তাতেও সেই অরণ্য-অঞ্চলে তার শিল্পী-প্রতিভার যোগ্য সমাদর কোথায়?

এক বর্ষণমুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া কাছারিতে এসে হাজির। অবস্থাচক্রে সে বর্তমানে বেশ শীর্ণকায়। ক'দিন তার আহার জোটেনি। তাই কাছারিতে সে এসেছে তার নাচ দেখাতে। সন্ধ্যের আগে সেদিনে ধাতুরিয়া তার নাচ দেখালো। যথার্থ শিল্পী সে। এখন তার নাচের অনেক উন্নতি হয়েছে। ম্যানেজারবাবু তাকে দুধ আর চিঁড়ে খাওয়ালেন। স্বয়ং তাকে সামান্য অর্থদান করলেন। কাছারির কর্মচারীরাও চাঁদা তুলে তাকে অর্থ-সাহায্য করলো। ম্যানেজারবাবু তার স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্যে কিছু জমি দেবার প্রস্তাব করেন। চাষের সময় সে চাষ করবে, অন্য সময় সে নিজেকে শিল্পসাধনায় নিয়োজিত রেখে দু' পয়সা রোজগার করবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধাতুরিয়া সম্মত হয়। ম্যানেজারবাবুর এই অকৃত্রিম সহানুভূতিতে সে মুগ্ধ। কথা হলো, ঝল্লুটোলায় নাচ দেখিয়ে সে ওখানে ফিরে যাবে। বিদায়-গ্রহণের পূর্বে সে ম্যানেজারবাবুর অনুরোধে 'ননীচোর নাটুয়ার' নাচ দেখালো। জমিজমা, ক্ষেতখামার, বিষয়-আশয় নয়, সুরসিক দর্শকদের কাছে নৃত্যকলা প্রদর্শনই ছিল এই কিশোর-শিল্পীর একমাত্র স্বপ্ন। তাই বিদায়ের প্রাক্কালে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সে জানিয়ে যায় তার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

ধাতুরিয়ার সেই শেষ যাত্রা। সে আর কাছারিতে আসেনি জমিজমা চাষ করতে কিংবা তাকে কলকাতার সুরসিক দর্শকদের সামনে হাজির করাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে:

'হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?···কখনও কলকাতায় যাইনি, শুনেছি সেখানে গাওনা বাজনা নাচের বড় আদর।'

মাস দুই পরে তার মৃতদেহ কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে রেললাইনের ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটা কি দুর্ঘটনা অথবা আত্মহত্যা? আত্মহত্যাই যদি হয়, তবে কি দুঃখেই বা ধাতুরিয়া আত্মহত্যা করেছিল, তা অজ্ঞাতই থেকে যায়। তবে শিল্পই ছিল তার জীবনের একমাত্র ধ্যানধারণা। শিল্পের জন্যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ এই গ্রাম্য কিশোর যে বুকভরা বেদনা নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাতে প্রতিফলিত শিল্পী-জীবনের এক বিষাদঘন করুণ হাহাকার। ধাতুরিয়া এই বস্তুমুখী, হৃদয়হীন, রূঢ় পৃথিবীর এক ব্যর্থ-শিল্পীর সার্থক প্রতিনিধি॥

অনুসরণী

১. 'আরণ্যক' উপন্যাসের নায়ক সত্যচরণ কি প্রকারে লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গল-মহালের ম্যানেজারবাবু নিযুক্ত হয়েছিল, তা নিজের ভাষায় বিবৃত কর। [১৪৭—১৪৮ পৃ.]

● ২. 'আরণ্যক' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-প্রীতির যে বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দাও। [১৮০—১৮৩ পৃ.] উ. মা. '৭৮

● ৩. 'আরণ্যক' উপন্যাসের কুন্তা চরিত্রটি বর্ণনা কর। [১৮৩—১৮৬ পৃ.] উ. মা. '৭৮

৪. 'আরণ্যক' উপন্যাসে গনোরী মাহাতো সম্পর্কে যা জানা যায়, তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১৪৯ পৃ.]

৫. 'আরণ্যক' উপন্যাসে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা সম্পর্কে যা জানতে পারা যায়, তা বিবৃত কর। [১৪৯—১৫০ পৃ. ও ১৬৩ পৃ.]

৬. ধাওতাল সাহু সম্পর্কে 'আরণ্যক' উপন্যাসে যা জানা যায়, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [১৫২ পৃ. ও ১৭৩ পৃ.]

● ৭. ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কুন্তার জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১৮৩—১৮৬ পৃ.]

৮. হোলি উপলক্ষে সত্যচরণের গ্রাম্যমেলায় যাবার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১৫৩—১৫৪ পৃ.]

৯. ধাতুরিয়া কে? তার সঙ্গে সত্যচরণের পরিচয়ের সূত্র কি? তার জীবনের সংকল্প কি ছিল? কিভাবে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে? [১৮৯—১৯১ পৃ.]

১০. বোমাইবুরু জঙ্গলে আমিন রাম সিং এবং ইজারাদারের ছেলের মৃত্যুর ঘটনা দুটি বিবৃত কর। লেখক এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে কোন্ যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন? [১৫৫ পৃ.]

১১. রাজু পাঁড়ের জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ। [১৫৬—১৫৭ পৃ., ১৬৭—১৬৮ পৃ., ১৭০ পৃ. ও ১৭৫ পৃ.]

১২. রাসবিহারী সিংয়ের বাড়িতে সত্যচরণ যে আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, তা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১৫৮—১৫৯ পৃ.]

১৩. রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে সত্যচরণের পরিচয় হয় কিরূপে? তাঁর জন্যে সত্যচরণের দুঃখের কারণ কি? [১৬০ পৃ. ও ১৭৩—১৭৪ পৃ.]

●১৪. যুগলপ্রসাদের সঙ্গে সত্যচরণের কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হয়? যুগলপ্রসাদ সম্পর্কে যা জান লেখ। [১৮৬—১৮৯ পৃ.]

১৫. মটুকনাথ পণ্ডিতের টোল ও তার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে যা জান, সংক্ষেপে লিখ। [১৬২—১৬৩ পৃ., ১৭৪ পৃ., ১৭৭ পৃ. ও ১৭৯ পৃ.]

১৬. নাঢ়া বইহারে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ কি? সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিরূপে শান্ত হয়? [১৬৩ পৃ.]

১৭. মঞ্চীর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। [১৬৪ পৃ., ১৬৫—১৬৬ পৃ., ১৬৯—১৭০ পৃ., ১৭২ পৃ. ও ১৮০ পৃ.]

১৮. ভানুমতীর সঙ্গে সত্যচরণের পরিচয় হয় কিরূপে? সেই পরিচয় কিরূপে ঘনিষ্ঠ হয়, তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। [১৬৬—১৬৭ পৃ., ১৭২—১৭৩ পৃ. ও ১৭৮—১৮৯ পৃ.]

১৯. রাজা দোবরু পান্না এবং তার রাজাপ্রসাদ সম্বন্ধে যা জান লেখ। রাজবাড়ির ঝুলন উৎসব বর্ণনা কর। [১৬৬—১৬৭ পৃ., ১৭০—১৭২ পৃ. ও ১৭৩ পৃ.]

২০. জঙ্গল-মহাল থেকে সত্যচরণের বিদায়-দৃশ্য বর্ণনা কর। জঙ্গল-মহালে সত্যচরণের দায়িত্ব কি ছিল? তার ওখান থেকে বিদায়ের কারণ কি? [১৪৭ পৃ. ও ১৭৫ পৃ., ১৭৯ পৃ.]

২১. টীকা লিখ: গিরিধারীলাল, টাঁড়বারো, মুনেশ্বর সিং, গোষ্ঠ চক্রবর্তী, সুরতিয়া, সরস্বতী কুণ্ডী, আস্রফি টিণ্ডেল, ধ্রুবা, জগরু, সজ্জন সিং, দ্রোণ মাহাতো, নক্‌ছেদী, বেঙ্কটেশ্বর, বুদ্ধু সিং, দশরথ ভূমিহার, ছট্টু সিং, দশরথ সিং, ঝাণ্ডাওয়ালা, পাটোয়ারী ও ব্রহ্মা মাহাতো।

১৯৭৮

১. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা কর : ১৫

ক. গৃহকার্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার। ['প্রবন্ধ' অংশ, ৫১ পৃ.]

খ. আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা এবং ইহার প্রতিকারের উপায়। [ঐ, ১৯১ পৃ.]

গ. তোমার আদর্শ মহাপুরুষের জীবনচরিত। [ঐ, ৬৯ পৃ.]

ঘ. জলপথে বা স্থলপথে কোনও দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। [ঐ, ২৪৫ পৃ.]

ঙ. সহিষ্ণুতার মূল্য। [ঐ, ২৪৯ পৃ.]

২. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির সার-সংক্ষেপ কর : ১২

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

তাই ঐক্য-বিস্তার ও শৃঙ্খলা-স্থাপন কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় নয়, ধর্মনীতিতেও দেখি, গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

[**সংকেত : ভারতের সাধনা :** বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনই ভারতের সাধনা।]

অথবা, নিম্নলিখিত পদ্যাংশটির ভাবার্থ লিপিবদ্ধ কর : ১৫

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে। [সারমর্ম, ৩১ পৃ.]

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত অংশটির ভাব-সম্প্রসারণ কর :

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত, একই রবি শশী মোদের সাথী।

[৪৫-সংখ্যক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : ১৩৭ পৃ.]

৩. একজন শ্রমিক বা সাধারণ মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বহু লোককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাইয়া সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল, এমন ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি গল্প রচনা কর। [গল্প-রচনা, ১২৫ পৃ.] ১২

অথবা, কোন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর সম্বর্ধনা উপলক্ষে একটি অভিভাষণ প্রস্তুত কর। [প্রস্তুত ভাষণ, ১৪৭ পৃ.]

অথবা, একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কতিপয় শিক্ষানবীশ নেওয়া হইবে। উক্ত পদের জন্য তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া একটি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ২]

অথবা, নিম্নোক্ত বিষয় অবলম্বনে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর :

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্র। [কাল্পনিক সংলাপ, ১৮৮ পৃ.]

৪. 'ঙ'-চিহ্নিত প্রশ্ন এবং অপর যে-কোনও একটি প্রশ্ন, সর্বসমেত দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. শ্রীচৈতন্যের বাংলা ভাষায় রচিত মুখ্য চরিতগ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়া কোন্‌খানিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর, কারণসহ আলোচনা কর। [বা. সা. ই., ৮৬-৯২ পৃ.] ১২

খ. বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ ভাষায় রচিত ? তাঁহার জীবনী ও কবি-প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ঐ, ২০ ও ১৫-১৭ পৃ.] ১২

গ. কৃত্তিবাস কে ছিলেন ? বাংলাদেশে তাঁহার রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় কর। [ঐ, ৩৮-৪৩ পৃ.] ১২

ঘ. মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে ? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাহা দেখাও। [ঐ, ৫০, ৬১-৬৪ ও ৬৭-৬৮ পৃ.] ১২

ঙ. যে-কোন দুইটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর : ৬

মালাধর বসু [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং] ; জ্ঞানদাস [বা. সা. ই., ১০৪-১০৫ পৃ.] ; ব্রজবুলি [ঐ, ২০-২১ পৃ.]; গৌরচন্দ্রিকা [ঐ, ১০০-১০১ পৃ.]; কীর্তনগান [ঐ, ৯৬-৯৭ পৃ.]; বিজয় গুপ্ত [ঐ, ৫৮ পৃ.]।

৫. যে-কোনও তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৩×৫ = ১৫

ক. লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।

নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

১) 'আদ্রিল' ক্রিয়াপদটি কিভাবে নিষ্পন্ন হইল ?

২) 'পঙ্কজ-রবি', 'ত্বিষাম্পতি' ও 'মহাবল', এই তিনটি পদের ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম দাও।

৩) 'মহাবল' পদটি অপর কোন সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায় কিনা এবং তাহাতে অর্থের কি পরিবর্তন হয় ? [পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক ব্যাকরণ, ৭৮ পৃ.]

খ. তখন পুত্র কহিল, মাতঃ ! প্রথমতঃ, আপনার আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ, স্বামিকার্য, তৃতীয়তঃ, অবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবেক।

'অবিনশ্বর' ও 'পাঞ্চভৌতিক'—এই দুইটি পদের প্রকৃতি-প্রত্যয় লিখ।

'নিয়োজিত' পদটির প্রকৃতি-প্রত্যয় দাও। 'নিযুক্ত' ও 'নিয়োজিত' দুইটি পদের পার্থক্য দেখাও। 'স্বামিকার্য'—পদটির বানান হ্রস্ব-ই-কার কেন ? [ঐ, ৩১ পৃ.]

গ. নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন্ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা দেখাও : কলিয়ারী [ঐ, ৪০ পৃ.], জানালা [ঐ], চুরুট [ঐ], রসিদ-পত্তর [ঐ, ৪৭ পৃ.] ভিখারী [ঐ, ৪০ পৃ.] অথবা অগ্রদানী [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং]।

ঘ. চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, এবং তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কে, কি দুঃখে, এই ঘোর রজনীতে, একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ ? সে কোনও উত্তর দিল না ; বরং পূর্ব অপেক্ষায় অধিকতর রোদন করিতে লাগিল।

[**উত্তর :** বীরবর দেখে খুব অবাক হলো এবং সামনে গিয়ে শুধালো, তুমি কে, কি দুঃখে এই ঘুট্‌ঘুটে রাত্তিরে একলাটি শ্মশানবাসী হয়ে কাঁদছো আর দুঃখ করছো ? সে কোন জবাব দিল না, বরং আগের চেয়ে বেশী করে কাঁদতে লাগলো।]

ঙ. দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো
ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল।

১) 'ভীমপুচ্ছে' এবং 'আত্মশিরে'—এই দুইটি পদের কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর।

২) 'দুঃসহ' এবং 'গতিহীন'—এই দুইটি পদের বিপরীতার্থবোধক শব্দ গঠন কর।

৩) 'দীপ্ত'—পদ হইতে বিশেষ্যপদ গঠন কর। [পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক ব্যাকরণ, ৭৯ পৃ.]

চ. নিম্নলিখিত গদ্যাংশকে একটি সরল বাক্যে পরিণত কর :

এক একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে ; ওপারের গাছগুলি কালো ; নদীর

উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়; ওপারের জলরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলির মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায়।

[**উত্তর:** এক একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসায় নদীতে ওপারের কালো গাছগুলির কালো ছায়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া ওপারের জলরেখা (যেন) চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করিলে ফুলিয়া-ফুলিয়া-ওঠা নদীর ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলির মধ্যে যা-খুশি তাই করিয়া বেড়ায়।]

৬. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যে যে-কোন একটির উত্তর দাও: ১৮

ক. "বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন"।—যথাযথভাবে আলোচনা কর। [দ্রুতপঠন, ৮৯ পৃ.]

অথবা, "ভারতপথিক রামমোহন রায়" শীর্ষক অধ্যায়টির সারমর্ম লিখ। [ঐ, ৯২ পৃ.]

খ. "আরণ্যক" উপন্যাসে বিভূতিভূষণের নিসর্গ-প্রীতির যে পরিচয় মিলে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [ঐ, ১৮০ পৃ]

অথবা, "আরণ্যক" উপন্যাস হইতে কুন্তার চরিত্র বর্ণনা কর। [ঐ, ১৮৩ পৃ.]

গ. "নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়"—অধ্যায়ে স্বামীজী কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর। [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং]

অথবা, "কর্মই উপাসনা"—স্বামীজীর এই মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ঐ]

ঘ. 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ-কাহিনীতে লেখক ভারতবাসী ও ইংরেজদের জীবন ও চরিত্রে যে-সব বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দাও। [দ্রুতপঠন, ১৩৩ পৃ.]

অথবা, "পথে-প্রবাসে" গ্রন্থে রম্যা রলাঁর সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের সাক্ষাৎকারের বিবরণ দাও। [ঐ, ১৩৬ পৃ.]

ঙ. "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে যে সমাজের চিত্র রূপায়িত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [ঐ, ৫৫ পৃ.]

অথবা, ভবানী পাঠকের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ঐ, ৬৪ পৃ.]

চ. "নিষ্কৃতি" উপন্যাসের সিদ্ধেশ্বরী চরিত্রটি আলোচনা কর। [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং]

অথবা, "নিষ্কৃতি" উপন্যাসে চাটুজ্যেদের পারিবারিক সমস্যার শেষ পরিণতি কতখানি স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। [ঐ]

১৯৭৯

১. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে-কোন একটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা কর: ১৫

ক. তোমার প্রিয় লেখক ['প্রবন্ধ' অংশ, ২২১ পৃ.]

খ. সামাজিক জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব [ঐ, ৯৯ পৃ.]

গ. নিয়মানুবর্তিতা [ঐ, ১১৪ পৃ.]

ঘ. ভারতের খনিজ সম্পদ [ঐ, ১৮৮ পৃ.]

ঙ. শ্রমের মূল্য [ঐ, ১১৬ পৃ.]

২. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির সার-সংক্ষেপ কর : ১২

সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ কিছু হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে। আনন্দ সংসারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মের মধ্যে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে। আনন্দ, দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এইজন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।

[**সংকেত : সুখ বনাম আনন্দ :** সুখ ও আনন্দের মধ্যে আছে বিপুল ব্যবধান। সুখ ক্ষুদ্র, আত্মসর্বস্ব, শ্রীহীন এবং ভোগকেন্দ্রিক ; আনন্দ অসীম, বিশ্বসর্বস্ব, শ্রীমণ্ডিত এবং ত্যাগ-সুন্দর।]

অথবা, নিম্নলিখিত পদ্যাংশটির ভাবার্থ লিখ : ১২

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এ'বার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক,
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ।

[**সংকেত :** আঘাত-সংঘাতই জীবনের চরম পরীক্ষা।]

অথবা, নিম্নোদ্ধৃত অংশটির ভাব-সম্প্রসারণ কর : ১২

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু ;
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির-বিন্দু।

[**সংকেত ঃ** সৌন্দর্য-দর্শনের জন্যে দূর-দূরান্তরে গমন নিষ্প্রয়োজন। মানুষের চারদিকেই সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। তা দেখার জন্যে চাই প্রকৃত সৌন্দর্য-দৃষ্টি।]

৩. ক. তোমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া ডাকঘরের কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদন-পত্র রচনা কর। [পত্রাদর্শ ৪] ১২

অথবা, খ. তোমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে একখানি বিদায় সম্বর্ধনা পত্র রচনা কর। [১২-সংখ্যক প্রস্তুত ভাষণ] ১২

অথবা, গ. একটি বই পড়িয়া তোমার ভাল লাগিয়াছে ; সেইজন্য বইখানির প্রশংসা করিয়া তোমার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখ। [পত্রাদর্শ ৩৯] ১২

৪. 'ঙ'-চিহ্নিত প্রশ্ন এবং অপর যে-কোনও একটি প্রশ্ন, সর্বসমেত দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. ভাগবত-পুরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কর। তাঁহার জীবন ও কাব্য সম্পর্কে যাহা জান, তাহা লিখ। [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং] ১২

খ. খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমতের কি প্রভাব অনুভব করা যায়, তাহা আলোচনা কর। [বা. সা. ই., ৭৯ পৃ.] ১২

গ. বৈষ্ণব-কবি গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব কি? তাঁহাকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলিয়া উল্লেখ করিবার কারণ কি, তাহা আলোচনা কর। [ঐ, ১০৫ পৃ.] ১২

ঘ. মনসা-মঙ্গল কাব্য মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়? এই কাব্যে চাঁদ-সদাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বিবৃত কর। [ঐ, ৫০ ও ৫৩-৫৫ পৃ.] ১২

ঙ. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে-কোনও দুইটি বিষয় লইয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর : ৬

বড়ু চণ্ডীদাস [ঐ, ১০২ পৃ.]; জ্ঞানদাস [ঐ, ১০৪-১০৫ পৃ.]; দ্বিজমাধব [ঐ,৬৬ পৃ.]; সঞ্জয় ; লোচনদাস [ঐ, ৮৮-৮৯ পৃ.] ; শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত [ঐ, ৮৬-৮৮ পৃ.] ; ময়ূর ভট্ট, [ঐ, ৭১ পৃ.]।

৫. যে-কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৩×৫ = ১৫

ক. 'তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়োয়ানকে ডবল বখশিশের প্রলোভন দেখাইয়া স্টেশনেও পৌঁছিলাম, আর ট্রেনখানিও ছাড়িয়া দিল।'

১) উদ্ধৃত বাক্যটিতে কোন্ কোন্ ভাষা হইতে কি কি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ কর। [পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক ব্যাকরণ, ৪০ পৃ.]

২) 'প্রলোভন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর। [ঐ, ৩৩ পৃ.]

৩) 'গাড়োয়ান' শব্দটির ব্যাকরণগত টীকা লিখ। [ঐ, ৩৩ পৃ.]

খ. 'সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণ-শোণিত প্লাবন।'

১) ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর :

অপসারণ, প্লাবন। [ঐ, ৫৪ পৃ.]

২) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :

বিদীর্ণবক্ষ, স্বর্ণ-শোণিত। [ঐ, ৫৩ পৃ.]

৩) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

ছায়া, উপর।

[**সংকেত :** আলো, নীচ।]

গ. নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ হইতে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দগুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়া তাহাদের স্থানে খাঁটি বাংলা বা তদ্ভব শব্দ ব্যবহার কর :

'একদিন নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া, রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, দক্ষিণ দিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে, ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দাও।' [ঐ, ৩০ পৃ.]

ঘ. নিম্নলিখিত বাক্যটিকে সরল ও যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :

'শিক্ষা সম্পর্কে যখন দেশের এই দুরবস্থা, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

[**সংকেত : সরল বাক্য**—শিক্ষা সম্পর্কে দেশের সেই দুরবস্থা-কালে নানা কারণের···হইতে লাগিল। **যৌগিক বাক্য**—শিক্ষা সম্পর্কে সে সময়ে দেশের দুরবস্থা চলিতেছিল এবং নানা কারণের··· হইতে লাগিল।]

ঙ. 'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার!
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া পিক-চন্দনার।

১) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :

'নন্দপুরচন্দ্র, 'সন্ধ্যাদীপ', 'কলকণ্ঠ-সুধা'। [পাঠ্যগ্রন্থ-ভিত্তিক ব্যাকরণ, ৬৩ পৃ.]

২) সন্ধি বিচ্ছেদ কর : 'মলয়ানিল'; [ঐ]

৩) অর্থ লিখ : 'চল মলয়ানিল'। [ঐ]

চ. 'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্রমন্থর বচন কও।
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম!

১) বাঙ্গালী কবিগণ এই তিন রকম বানানে এই একটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,—নভতল, নভস্তল, নভোতল।

তোমার মতে কোন্ বানানটি শুদ্ধ ও কেন?

[**সংকেত :** নভঃ+তল=নভস্তল।]

২) বিশেষ্য হইতে বিশেষণে অথবা বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে পরিণত কর :

রক্তিম, হর্ষ। [ঐ, ৬২ পৃ.]

৬. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৮

ক. বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্ল দেবীও হইতে চাহে নাই, রাণীও হইতে চাহে নাই, সে ব্রজেশ্বরের স্ত্রী হইয়াই বাঁচিতে চাহিয়াছে।

বিষয়টি আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দাও। [দ্রুতপঠন, ৫৮-৬০ পৃ.]

অথবা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের নায়ক ব্রজেশ্বরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [ঐ, ৬১-৬৪ পৃ.]

খ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চারিত্রপূজায় মহাপুরুষের চরিত্রে কি কি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ? [ঐ, ৮৭-৮৯ পৃ.]

অথবা, রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজা' অবলম্বন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিভাবে শিশু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাহা লিখ। [ঐ, ৯৫-৯৮ পৃ.]

গ. শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের যে বাস্তব চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে তাহা আলোচনা কর। [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং]

অথবা, শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে পারিবারিক বিরোধটি কিভাবে ঘটিয়াছে এবং কিভাবে তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা কর। [ঐ]

ঘ. অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' অবলম্বন করিয়া লণ্ডন সহরের নাগরিক জীবনের পরিচয় দাও। [দ্রুতপঠন, ১৩৩-১৩৬ পৃ.]

অথবা, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁহার 'পথে-প্রবাসে' গ্রন্থে ইউরোপীয় জাতিসমূহকে কেন যাযাবর জাতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দাও। [ঐ, ১১৪-১১৫ পৃ.]

ঙ. স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'কর্মযোগ' গ্রন্থে অনাসক্তি যে পূর্ণ আত্মত্যাগ, তাহা কিভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, দেখাও। [প্রবন্ধ বিচিন্তা, দ্বিতীয় সং]

অথবা, স্বামী বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ' গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া 'কর্মযোগে'র আদর্শ কি, তাহা বর্ণনা কর। [ঐ]

চ. বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া সত্যচরণের অরণ্য-জীবনের কয়েকটি রহস্যময় অভিজ্ঞতার বর্ণনা কর। [১৮০-১৮৩ পৃ.]

অথবা, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া লবটুলিয়ার নূতন বস্তি ও তাহার জীবন-যাত্রার পরিচয় দাও। [ঐ, ১৭৭-১৭৯ পৃ.]

"প্রবন্ধকে কেউ কেউ বলেন 'রচনা' [Composition]। এই 'রচনা' শব্দের মধ্যেও তার শৈল্পিক স্বাক্ষর মুদ্রিত। গল্প, উপন্যাস, নাটকের মতো প্রবন্ধও শিল্পকর্ম। ভাব, বিষয়, তথ্য, তত্ত্ব—বাহনের এ সব সামগ্রীতে সকলেরই সমান অধিকার। তবু একই বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা হয় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এর মধ্যেই নিহিত আছে শিল্পের রহস্য—সৃষ্টির রহস্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।'..."

"'প্রবন্ধ বিচিত্রা'র প্রত্যেক প্রবন্ধের শীর্ষে প্রবন্ধ-সূত্র প্রদত্ত হয়েছে। তাতে বিষয়টির উপলব্ধি ও মনে রাখা সহজ হবে এবং তা দ্রুত পরীক্ষা-প্রস্তুতিতেও সহায়ক হবে। গ্রন্থ-শেষে পাঠ্যসূচির অনুসারী প্রবন্ধ-সূচী প্রদত্ত হয়েছে। তার সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে প্রবন্ধ-রচনার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। তাছাড়া, বহু প্রবন্ধের বিস্তারিত প্রবন্ধ-সংকেতও দেওয়া হয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অনায়াসে সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করে নিতে পারবে। আমাদের বিশ্বাস, 'প্রবন্ধ বিচিত্রা' ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধ-রচনার শক্তি জাগিয়ে তাদের আত্মনির্ভর করে তুলবে॥"

—গ্রন্থ পরিচয়